প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস

[প্রায় দেড়শো বছরের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের
সামগ্রিক মূল্যায়ন ও আঙ্গিক বিচার]

সম্পাদনা

ডঃ অরুণ সান্যাল

অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলকাতা
['সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কারে' সম্মানিত]
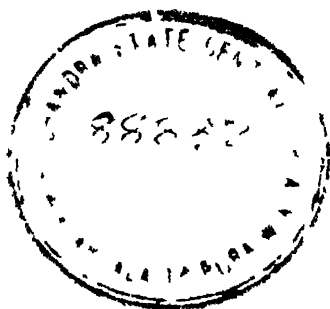
॥ প্রস্তাবনা ॥

বাংলা সাহিত্যের সাম্রাজ্য আজ সুদূর-বিস্তৃত। এই সমৃদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপ—উপন্যাস; নানা প্রতিভাধর স্রষ্টার সৃষ্টির মাধ্যমে নিরন্তর বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং করছে। বিচিত্র সুন্দর এই সব উপন্যাস পাঠের আকাঙ্ক্ষাও পাঠকদের মধ্যে হয়ে উঠেছে প্রবল। তাই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত ও পরিবর্তনশীল পটভূমিতে উপন্যাসের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে ও ঘটছে তার মূল্যায়নও হয়ে উঠেছে প্রত্যাশিত। শুধু তাই নয়,—আঙ্গিকের যে বিবর্তন ঘটেছে তার সম্যক ধারণা লাভ করার আকর্ষণও কম নয়। সেই আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণের কথা স্মরণে রেখেই আমি ও আমার প্রকাশক 'প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা করেছি। প্রসঙ্গত স্মরণ করি প্রয়াত অধ্যাপক—প্রাবন্ধিক, স্বনামধন্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জাতীয় উদ্যোগের কথা। তিনি আমাদের নমস্য।

আমাদের এই গ্রন্থে রসাস্বাদন উপযোগী এমন বহু প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের উপন্যাসাবলী নির্বাচন করেছি, যাতে একশো পঁচিশ বছরেরও অনেক বেশী সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলা উপন্যাসের রূপ ও স্বরূপ সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, আমাদের নির্বাচিত এই সব প্রতিভাসম্পন্ন কথাশিল্পী ব্যতীত আরো অনেক স্রষ্টাই সৃষ্টির কাজে ছিলেন ব্রতী। তাঁদের সকলের উপন্যাসাবলী আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আমাদের এই পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারত, কিন্তু একটি মাত্র গ্রন্থে তা সম্ভব নয় বলেই আমরা প্রতিনিধি স্থানীয় কথাকারদের নির্বাচন করেছি। বলতে বাধা নেই, প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিকেরা, যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য, তাঁরা এক একজন ঔপন্যাসিকের রচিত উপন্যাসাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করেছেন এবং মূল্যায়নের অঙ্গ রূপে আঙ্গিক বিচারেও অগ্রসর হয়েছেন। ফলে বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিক-আলোচনা সমন্বিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধাবলী এক ধারাবাহিক ইতিহাস সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিকদের তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক এই সব মূল্যবান প্রবন্ধ একদিকে সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের, অন্যদিকে সাধারণ রস পিপাসু পাঠকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে হবে সফল। সে বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম সাহিত্যানুরাগী সোৎসাহী সংখ্যাহীন পাঠকদের ওপর।

সম্পাদক হিসেবে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনা করতে গিয়ে এমন একটি গ্রন্থের প্রত্যাশা বার বার মনে জেগেছে, তাই সাহিত্যাঙ্গনের এক সামান্য কর্মী রূপে এই গুরুদায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছাব্রতী হয়েছি। আমার এই স্বেচ্ছাব্রত সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়, তবুও একথা জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে সামর্থ সীমিত হলেও এ কাজে আমার আন্তরিকতার অভাব ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের প্রত্যেক প্রবন্ধকারের প্রতি আমার অকুণ্ঠ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

জানাই যাঁরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তাঁদের গবেষণাধর্মী, সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলি বিনা দ্বিধায় আমার হাতে তুলে দিতে সময়ক্ষেপ করেন নি। প্রাসঙ্গিক ভাবেই জানাই আমার দুই অপরিচিত বাংলাদেশী অধ্যাপক প্রবন্ধকারের কথা। তাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক যখন একবিংশ শতাব্দীকে স্পর্শ করতে হাত বাড়িয়েছে, সেই বিশেষ সময়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক প্রাবন্ধিক বর্তমান রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিতে পরিস্থাপিত করে তাঁদের প্রবন্ধগুলি রচনা করায় আধুনিক চিন্তা ও মননে প্রতিটি প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে অনাগত আগামী দিনের সমৃদ্ধ সম্পদ।

আমার এই গুরু দায়িত্ব পালনে যে দুজন বন্ধু সর্বদাই সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন ডঃ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ও ডঃ কান্তি গুপ্ত। এঁদের কাছে আমি ঋণী। এই প্রসঙ্গে জানাই যে আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী সন্দীপা, পুত্র শ্রীমান ইন্দ্রনীল ও কন্যা শ্রীমতী সুদেষ্ণার সাহায্য আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহী করে তুলেছে। এদের সহায়তা না পেলে একাজ করা আমার পক্ষে হত অসম্ভব। এ কাজে যাঁরা যে ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও সম্পাদনা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি প্রয়াত প্রাবন্ধিকদের জন্ম-সালানুসারে উপস্থাপিত করেছি, যাতে এক ধরণের ঐতিহাসিক ক্রম বজায় রাখা সম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। যদি 'প্রথম গ্রন্থ' প্রকাশের তারিখানুসারে সাজাতে হত, তাহলে এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হত; কেননা গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম তারিখ নিয়ে নানা বিভ্রান্তি আছে—এই পদ্ধতিতে সেই ভ্রান্তির সম্ভাবনা অনেকটাই পরিহার করা গেছে। এই পদ্ধতিতে কাজ করতে বসে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি নির্ভুল—এমন দাবি আমার নেই।

আমার পরিকল্পনানুসারে সমস্ত নির্বাচিত প্রয়াত ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টির সামগ্রিক মূল্যায়ন ও আঙ্গিক আলোচনাই ছিল লক্ষ্য; কিন্তু দুই একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। যেমন ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-সমুদ্র বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে। তাই এখানে প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক রায় যখন আমাকে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের একটি প্রায় অনালোচিত দিকের ওপর আলোকপাত করার প্রস্তাব করলেন, তখন সম্পাদক হিসেবে তা মেনে নিতেই আমি আগ্রহী হয়েছি। প্রাসঙ্গিক ভাবে জানাই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও 'বাংলা ও অসমীয়া উপন্যাস: তুলনার আলোকে' প্রবন্ধটি উপযুক্ত একজন প্রাবন্ধিকের সন্ধান না পাওয়ায় সংযোজিত করতে ব্যর্থ হয়েছি বলেই সম্পাদক হিসেবে এক ধরণের অভাববোধ অনুভব করেছি।

'বানান' সম্পর্কে একটি বক্তব্য উপস্থিত না করে পারছি না। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বন্ধুরা অনেকেই অনেক ধরণের 'বানান' ব্যবহার করেছেন। আমি সম্পাদক

হিসেবে সব প্রবন্ধে একই ধরণের বানান ব্যবহার করব বলে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম --ব্যাপারটি আমার সাধ্যাতীত, তাই সে প্রয়াসে প্রয়াসী হইনি। এই সঙ্গে অবাঞ্ছিত 'মুদ্রণ প্রমাদ' তো আছেই। প্রাসঙ্গিক ভাবে দু তিনটির কথা উল্লেখ করি। 'ভূমিকা'-য় বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসের প্রকাশ সাল ১৮৮৭-র পরিবর্তে ১৮৮৮ মুদ্রিত হয়েছে। প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' নামটি দুটি স্থানেই 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর' মুদ্রিত হয়েছে, আবার বিখ্যাত হাস্যরস স্রষ্টা 'শিবরাম' যিনি চিরকাল নিজেই শব্দ নিয়ে নানা প্রয়োগ-পরীক্ষা করেছেন--তাঁরই নামটি শিবরমা মুদ্রিত হওয়ায় প্রমাণ হয়েছে ইংরাজী 'Printers Devil' কথাটি নিতান্তই সত্য। এর ফলে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নির্ভুল রূপ নিয়েছে এমন অবাস্তব দাবি করার মত বাতুল আমি নই। কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েই গেল। এর জন্য আমি পাঠকবৃন্দের কাছে আন্তরিক ভাবে মার্জনা চাইছি। সহৃদয় সোৎসাহী পাঠকদের গঠনমূলক সমালোচনা আমি সর্বসময়ে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকলাম।

প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী প্রচ্ছদ আঁকার দায়িত্ব নিয়ে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, যাঁর কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে, সেই বন্ধুবর প্রকাশক শ্রীশক্তিরঞ্জন গুঁই এর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমার পরিকল্পিত ও সম্পাদিত এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে তিনি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সঙ্গেই উচ্চারণ করব শ্রীগুঁই-এর ভাই শ্রীকৃষ্ণ গুঁই-এর কথা, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এই গ্রন্থটি প্রকাশে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

আমাদের এই পরিকল্পনা যদি বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে বাঙালী পাঠকদের যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম হয়, তাহলে কৃতার্থ বোধ করব। ইতি—

বিনীত
অরুণ সান্যাল
সম্পাদক

॥ সম্পাদক-পরিচিতি ॥

ডঃ অরুণ সান্যাল ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে তিরিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় রত। ১৯৮০ সালে কলকাতার একটি সুবৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—শ্যামাপ্রসাদ কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে অধ্যাপনায় যুক্ত থেকে একজন প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী রূপে প্রতিষ্ঠা পান।

১৯৭২ সালে পি এইচ ডি. ডিগ্রি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বছরেই 'বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ' গ্রন্থ রচনা করে 'সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার' বিজয়ী হয়ে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ সম্পর্কিত সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় তিনিই পথিকৃৎ হওয়ার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছেন।

তিনি যুগ্মভাবে ডঃ জিতেন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে 'সাহিত্যকোষ' গ্রন্থটি রচনা করে সুহৃদ পাঠকসমাজে সম্মানিত হয়েছেন।

প্রায় আড়াই বছরের একাগ্র ও প্রায় একক প্রচেষ্টায় 'প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থটি প্রকাশ করে তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা ও যোগ্যতা। প্রকাশক হিসেবে তাঁর এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত।

প্রকাশক।

□ সূচীপত্র □

॥ প্রথম খণ্ড ॥

● প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস ●

।। প্রাবন্ধিক-পরিচিতি ।।

ক্ষেত্র গুপ্ত—এম. এ, পি এইচ. ডি —প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—এম এ, পি এইচ, ডি, পি আর এস, এফ আর এ. এস (লন্ডন) কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু, এম এ পি এইচ ডি.—দেশবন্ধু গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

রমাপ্রসাদ দে এম এ (ডবল) ডি ই এল টি—লেকচারার, বাংলা বিভাগ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলকাতা।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এম এ রীডার বিভাগীয় প্রধান), বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা।

বিজিত কুমার দত্ত এম এ, পি এইচ ডি, ডি লিট প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

বাসন্তী মুখোপাধ্যায় এম এ, পি, এইচ, ডি—রীডার বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা।

রমেন্দ্রনাথ রায় এম এ লেকচারার বাংলা বিভাগ, কান্দী রাজ কলেজ, মুর্শিদাবাদ।

শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি এইচ ডি প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার।

কান্তি ভূষণ গুপ্ত—এম এ পি এইচ ডি—রীডার, বাংলা বিভাগ, নেতাজী নগর কলেজ, (দিবা বিভাগ) কলকাতা।

অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, পি এইচ ডি—প্রাক্তন রীডার, বাংলা বিভাগ, যোগমায়াদেবী কলেজ কলকাতা।

রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এম এ পি এইচ ডি রীডার বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণী, নদীয়া।

হীরেন চট্টোপাধ্যায় এম এ পি এইচ ডি—রীডার, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়—এম এ, পি এইচ ডি, ডি লিট—প্রফেসার বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

সঞ্জীবকুমার ঘোষ—এম এ, পি এইচ ডি —রীডার, দর্শন বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া।

সরোজ দত্ত—এম এ, পি এইচ ডি—রীডার বাংলা বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ, কলকাতা।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র—এম. এ., পি. এইচ. ডি.—প্রাক্তন রীডার, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

শিবচন্দ্র লাহিড়ী—এম. এ., পি. এইচ. ডি.—রীডার, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।

অরুপকুমার ভট্টাচার্য—এম. এ., পি. এইচ. ডি.—রীডার, বাংলা বিভাগ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলকাতা।

মিহির দেববর্মন—এম. এ., পি. এইচ. ডি.—প্রাক্তন রীডার (বিভাগীয় প্রধান), মেদিনীপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর; রীডার, মৌলনা আজাদ (সরকারী) কলেজ, কলকাতা।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য —এম. এ., পি. এইচ. ডি.—রীডার, (বিভাগীয় প্রধান) বাংলা বিভাগ, কাটোয়া কলেজ ও অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

সমরেশ মজুমদার—এম এ, পি. এইচ. ডি.—রীডার, (বিভাগীয় প্রধান) বাংলা বিভাগ, সোনারপুর কলেজ, সোনারপুর।

অশোক কুন্ডু—এম এ, পি আর. এস, পি এইচ. ডি—অধ্যক্ষ. হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়, হাওড়া।

নিখিলকুমার নন্দী—এম. এ.—প্রাক্তন রীডার (বিভাগীয় প্রধান), বাংলা বিভাগ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলকাতা।

আশিসকুমার দে—এম এ, পি. এইচ. ডি রীডার, (বিভাগীয় প্রধান) বাংলা বিভাগ, নেতাজী নগর কলেজ ও অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

অসিত মুখোপাধ্যায়—এম. এ, পি. এইচ ডি.—রীডার, বাংলা বিভাগ, খিদিরপুর কলেজ. কলকাতা।

চিত্তরঞ্জন লাহা—এম এ, পি. এইচ. ডি, ডি. লিট—প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, বিহার।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—এম. এ, পি. এইচ ডি.—প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী—এম এ, পি এইচ. ডি. প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তি-নিকেতন, বোলপুর।

পরিতোষ সান্যাল (সুবিনয় মুস্তাফী)—এম এ., পি এইচ. ডি—রীডার, (বিভাগীয় প্রধান) ইংরাজী বিভাগ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলকাতা ও অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া।

রবীন্দ্র গুপ্ত এম এ, পি এইচ ডি—রীডার, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়—এম এ, পি এইচ ডি—উপাধ্যক্ষ, বি এস কে কলেজ মাইথন, বিহার।

সৌমেন সেন এম এ, পি এইচ ডি--সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রের রীডার (বিভাগীয় প্রধান), উত্তর-পূর্ব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়, শিলং, মেঘালয়।

শঙ্কর চক্রবর্তী—এম এ, পি এইচ, ডি—রীডার, বাংলা বিভাগ, যোগমায়াদেবী কলেজ, কলকাতা।

প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত এম এ, পি এইচ ডি—রীডার, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

অলোক রায় এম এ, পি এইচ ডি রীডার বিভাগীয় প্রধান) বাংলা বিভাগ, স্কটিশচার্চ কলেজ, কলকাতা।

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী এম এ, পি এইচ ডি—রীডার, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

বীরেন্দ্র দত্ত—এম এ, পি এইচ ডি রীডার, বাংলা বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া।

দিলীপকুমার মিত্র—এম এ, পি এইচ ডি—রীডার, বাংলা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (দিবা কলকাতা।

দীপা চক্রবর্তী এম এ সাহিত্য গবেষিকা।

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—এম এ, পি এইচ ডি—রীডার, বাংলা বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় -এম এ. পি এইচ ডি—রীডার, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

অজিত কুমার ঘোষ -এম এ. পি এইচ ডি -প্রাক্তন প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

বিবেকানন্দ দেব এম এ, পি এইচ ডি—রীডার, হিন্দী বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

কৃষ্ণচন্দ্র ভূঁয়া এম এ, পি এইচ ডি - রীডার (বিভাগীয় প্রধান ওড়িয়া বিভাগ, আনন্দ মোহন কলেজ, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ এম এ এ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

আকরম হোসেন—এম এ, পি এইচ ডি—প্রফেসার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বণিত বন্দ্যোপাধ্যায়—এম. এ, পি এইচ ডি—লেকচারার, ইংরাজী বিভাগ, ল' কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

প্রথম খণ্ড

॥ ভূমিকা ॥

॥ ১ ॥

জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—উপন্যাস, ইতিহাসের বিচারে আধুনিক কালের সাহিত্য সাধনার শক্তিশালী শাখাই শুধু নয়, তা আধুনিক কালের স্বহস্তে রচিত সেই গদ্যময় প্রতিমা—যা জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারে সমর্থ। এই উপন্যাস যেমন সর্বগ্রাসী, ঔপন্যাসিকও তেমনি সর্বত্রচারী—তিনি তাঁর নির্ভীক, নিরাসক্ত, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে কল্পিত আখ্যানের মাধ্যমে জীবনব্যাখ্যা করেন। তিনি জীবন-পিপাসার তৃপ্তি সাধনের জন্যই জন্ম দেন উপন্যাসের—যার মধ্যে আমরা পাই, আরনল্ড কেট্‌ল কথিত, জীবন ও জীবনের বিন্যাসগত শিল্পরূপ। এই দুই উপাদানের সার্থক সমন্বয়েই গড়ে ওঠে শিল্পসফল উপন্যাস।

আবার অন্য ভাবে বলা যায়, উপন্যাস হচ্ছে সেই আধুনিক শিল্প-প্রতিমা যা শুধু সমগ্রতাস্পর্শীই নয়, যেখানে শিল্পিত স্বরগ্রামে প্রকাশিত হয় ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ আর তার স্বদেশ, সমাজ ও সমকাল।

বুর্জোয়া সমাজের সমূহ শক্তি ও সবিশেষ স্বাতন্ত্র্যে আত্মস্থ হয়ে মধ্যযুগীন জীর্ণ ও ভঙ্গুর সামন্ত সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা নিয়েই জন্ম গ্রহণ করেছে উপন্যাস। এই উপন্যাসের জন্মদাতা নিঃসন্দেহে নবোত্থিত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুর্জোয়া সমাজ। সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে আধুনিক মানুষের যে সংগ্রাম—তারই মহাকাব্যিক রূপও উপন্যাস। বাল্‌ফ ফক্স-এর ভাষায়ঃ

'The novel is the epic form of our modern bourgeois society'

আধুনিক বাংলা কথাশিল্পেরও অন্যতম সমৃদ্ধ ফসল উপন্যাস, যা আধুনিক কালের কথাশিল্পীর আত্মপ্রকাশের উল্লেখ্য শক্তিশালী বাহন।

এখন প্রশ্ন হলঃ বাংলা উপন্যাস-ধারার উৎসমুখ ঠিক কোন্‌টি? রামমোহন সহযোগী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' কিংবা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' জাতীয় নক্সাধর্মী কাহিনী, না ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' জাতীয় ঐতিহাসিক কাহিনীভিত্তিক কথাশিল্প? যদিও ইতিহাস-নিষ্ঠা নিয়ে দেখলে আরো কতকগুলো বই-এর নাম স্মরণে আসে যা মূলত কাহিনী-নির্ভর রচনা, যেগুলিকে উপন্যাসের প্রায় সমধর্মী বললে অত্যুক্তি হয় না; সেগুলি হলঃ শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কৃত হানা ক্যাথারিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', লালবিহারী দে-র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান', মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' আর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'।

সমকালীন জীবন সম্পর্কে বাস্তবাগ্রহ উপন্যাসের জন্মলাভের যদি প্রাথমিক শর্ত হয়, তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই জীবনাগ্রহ একটু একটু করে পরিস্ফুট

হলেও, তা কিন্তু ততটা স্পষ্টতা পায়নি ; আসলে এই সময়কার ঘটনাবলী ও তথ্যরাজি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই সময়ে মূলত কলকাতা নগরী ভিত্তিক জীবনের এক সুস্থির আদর্শ সন্ধানই ছিল মূল লক্ষ্য। সেই সময়ে বাঙ্গালী জাতির জীবনের একটি দ্বান্দ্বিক রূপ ধীরে ধীরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক মানসে ধরা পড়েছিল মাত্র। এই সময়কার সামাজিক ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় একদিকে বর্ণমর্য্যাদাচ্যুত নব্য ধনীদের বিলাসব্যভিচারী জীবনধারায়, অন্যদিকে প্রাচীন পুঁথি-সর্বস্ব, সংস্কৃতবিদ্যাশ্রয়ী দুর্বল নিঃসহায় শ্রেণীর জীবন-প্রবাহের পরিচয় প্রকাশে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র যোগ্য সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস'-এ আমরা এই দুই ধারার প্রথমটিকে অর্থাৎ বিলাস-বিকারের প্রগল্ভ জীবনবৃত্তকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখি, সুতরাং এই বই-দুটি কোন ক্রমেই তাই উপন্যাসের পংক্তিভুক্ত হতে পারে না।

হানা ক্যাথারিন মুলেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর (১৮৫২) আবিষ্কারক, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিশ্রম স্বীকার করে শুধু এই বইটি আবিষ্কারই করেননি, তিনি একই সঙ্গে এটিকে বাংলা সাহিত্যের 'প্রথম উপন্যাস' বলে প্রতিষ্ঠিত করতেও প্রয়াসী হয়েছেন।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কৃত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বইটিতে ইংরাজীতে লেখা 'Preface'-এ (ভূমিকা) বলা হয়েছে ঃ

"The nature and object of this little work are thus explained by the writer herself, in a note addressed to the Secretary of the Calcutta Christian Tract and Book Society :

"It is a book specially intended for Native Christian women. I have endeavoured to show in it the practical influence of Christanity on the various details of domestic life, such as the forming of marriage connections,behaviour to husbands, moral training of children and the duty of women specially to the poor, to the sick and to the heathen." এই সূত্রেই লেখিকা মুলেন্স আরো জানিয়েছেন যে তাঁর এই বইটিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাইবেল পাঠ, চার্চে যাওয়া, মেয়েদের শিক্ষা লাভ, ঋণের পাকে জড়িয়ে পড়া প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এই সব বিষয়কে একটি কল্পিত কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরতেই তিনি রচনা করেছেন— 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। তিনি 'Preface'-এ সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন ঃ

"The above subjects are worked into a little story fictitious on the whole, but founded upon facts"

বলা বাহুল্য, সুস্পষ্ট ও সুচিহ্নিত উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখেই শ্রীমতী মুলেন্স তাঁর এই কাহিনী রচনা করতে বসে, নিঃসন্দেহে উপন্যাস রচনার কিছু উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, এমনকি উপন্যাস সৃষ্টির উপকরণগুলিকে ব্যবহারের জন্য একটি কাহিনীও

তিনি উদ্ভাবন করেছেন, তবুও প্রধানত উপন্যাস বলতে যে রসোত্তীর্ণ শিল্পরূপকে আমরা বুঝি, তা এখানে অনুপস্থিত। তাই ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বইটির 'পরিচিতি' লিখতে বসে এটিকে একটি 'উপাখ্যান' বলেছেন, কোথাও উপন্যাস বলে উল্লেখ করেননি। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে এই বইটির একটি বিশেষ স্থান আছে এবং বাংলা গদ্যের বিকাশেও এই বই-এর দান যে স্বীকার্য, সেকথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাই বেশীর ভাগ সচেতন সমালোচক ও পাঠক যথেষ্ট যুক্তি-আশ্রয়ী আলোচনার মাধ্যমে এটিকে একটি খৃষ্টধর্ম প্রচারধর্মী গদ্য-কাহিনী রূপেই চিহ্নিত করেছেন ও হতে দেখেছেন, তাই এটি কোনক্রমেই উপন্যাসের দাবিদার হতে পারে না। খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে ফুলমণির সুখ ও খৃষ্টধর্মাচরণ করতে না পেরে করুণার দুঃখ ও পরে ঈশ্বর প্রেরিত পরামর্শে তার অপরিসীম আনন্দ লাভের ঘটনায় স্থূল প্রচারই প্রশ্রয় পেয়েছে—রসোৎকর্ষ ঘটেনি।

প্রকৃতপক্ষে, ঔপন্যাসিকের গভীরগভর্ মানসদৃষ্টি, সুবিস্তৃত জীবনপ্রেক্ষায় অভিজ্ঞতার সুচারুবিন্যাস ও উপন্যাসের উপযোগী সমস্যা—মূলত যে তিনটি স্তম্ভের ওপর একটি সার্থক উপন্যাস-সৌধ গড়ে ওঠে, তার কোনটিই এই আলেখ্যে নেই, তাই এ গদ্য কাহিনীকে 'উপন্যাস' আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত।

আমাদের তাই দৃষ্টি ফেরাতে হয় প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর দিকে। আসলে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর' গ্রন্থে। তিনি তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করে বলেছেন যে 'আলালের ঘরে দুলাল'—"একটি যথার্থ উপন্যাসেব সমস্ত লক্ষণ অঙ্গীভূত করেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছে।" সার্থক উপন্যাসের পূর্বোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলী তিনি এই আখ্যানটির মধ্যে আবিষ্কার করেই বিস্তৃত আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন ও যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহী বিচারের মাধ্যমে এই গদ্য কাহিনীকেই বাংলার প্রথম উপন্যাস বলে চিহ্নিত কবেছেন। এই বক্তব্যের কথা স্মরণে রেখেই বলতে হয়, বাংলা-সাহিত্য-ধারায় সম্পূর্ণ সফল না হলেও বাংলা ভাষায় উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত প্রথম কাহিনী 'আলালের ঘবের দুলাল'। তবে কোন ক্রমেই এই কাহিনীর স্রষ্টাকে 'উপন্যাসের জনক' আখ্যা দেওয়া যায় না।

কেউ কেউ 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'—ঐতিহাসিক কাহিনী-ভিত্তিক এই দুটি গ্রন্থকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে চিহ্নিত করতে আগ্রহী, কিন্তু এ সত্য স্বীকার্য যে এই দুটি গ্রন্থ উপন্যাসের আদল পেয়েছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হওয়ার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থদ্বয়ে বর্তমান নেই। সেই সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে এই গ্রন্থদ্বয়ের লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও ঠিক জানতেন না যে উপন্যাস শিল্পের প্রকৃত তাৎপর্য কি?

পূর্ণাঙ্গ ও সফল উপন্যাসর জন্য আমাদের তাই অপেক্ষা করতে হয়েছে সেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব-কাল পর্যন্ত, যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সার্ধ-

শতবৎসর পরেও জাতির জীবনপ্রবাহের সঙ্গেই অবিমিশ্র অবিস্মরণীয়, যে বঙ্কিমচন্দ্রই এখনও আমাদের কাছে আলোকিত ও আবেগময়। এই বঙ্কিমচন্দ্রই যখন উপন্যাসের অঙ্গনে আবির্ভূত হন তখন তাঁর চতুর্দিকে কেবলই এক ধরণের শূন্যতা। শুধুমাত্র বাংলা নয়, ভারতীয় গদ্যেরই কোন আদর্শ ছিল না তাঁর সামনে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতীয় উপন্যাসের জন্ম' প্রবন্ধে [২০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত] বিভিন্ন ভারতীয় গদ্যসাহিত্যের নাতিদীর্ঘ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে মারাঠী ঔপন্যাসিক হরিনারায়ণ আপ্তে ও ওড়িয়া ঔপন্যাসিক ফকিরমোহন সেনাপতি বঙ্কিম-সমসাময়িক হলেও, ইতিহাসের দিক থেকে বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেরই পূর্বসূরী ছিলেন। তিনি যখন তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনা করেন, তখন এঁরা দুজন লেখনী ধারণ করেননি। "সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে ছিলেন নিঃসঙ্গ। তাই ভারতে উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্রই।"

এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বলতে হয়, বাংলা কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধ শাখা—উপন্যাসের 'প্রথম শিল্পী' বঙ্কিমচন্দ্র না হলেও তিনিই 'প্রথম সফল শিল্পী'। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রচিত 'সীতারাম' উপন্যাসাবলীতে আমরা পাই বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ সমগ্রতার সার্থক পরিচয়। বাংলা উপন্যাসের 'জনক'ও তাই বঙ্কিমচন্দ্রই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা রোমান্সধর্মী উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের প্রতিক্রিয়ার রূপটুকু আঁকতে বসে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩৪৫ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখেন ঃ

"১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী যখন নূতন জ্যোতিষ্কের মত বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইল, তখন উহা সর্বত্র অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল এমন কথা বলা যায় না। বিচক্ষণ বোদ্ধাগণ কিন্তু বুঝিতে পারিলেন, 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'হুতোম পেঁচার নক্সা'র যুগ শেষ হইয়া গেল, নব যুগের অরুণোদয় রাগে রঞ্জিত হইয়া দুর্গেশনন্দিনী বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়াছে। প্রভাত-সূর্যের আলোকপাতে স্নাত শুভ্র পক্ষ বিহঙ্গমের পক্ষ সঞ্চালনলীলা আমরা যেমন মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত নিরীক্ষণ করি, বাঙ্গালার রসিক সম্প্রদায় তেমনি বিস্ময়ে বঙ্কিমসৃষ্ট এই প্রথম বিহঙ্গটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।"

আমাদের এই গ্রন্থের পরিকল্পনার সূচনায় তাই আছেন উনিশ শতকের সবচেয়ে যুক্তিবাদী মনন ও সৃজনশীল শিল্পী-স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র আর সমাপ্তিতে আছেন বিশ শতকের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত শিল্পী—সমরেশ বসু।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শক্তিমান শিল্পী সমরেশ বসু পর্যন্ত যে কয়েকজন ঔপন্যাসিককে আমি নির্বাচন করেছি, তাঁরা সকলেই একটি সূত্রে আবদ্ধ—তাঁরা প্রয়াত। আমি নানান কারণেই এই সময়সীমার মধ্যে স্রষ্টা রূপে যাঁরা কম-বেশি সাফল্যের সাক্ষ্য রেখেছেন এবং যাঁরা এখনও জীবিত ও সৃষ্টিকর্মে ব্রতী,

তাঁদের রচনার মূল্যায়নে আগ্রহী হইনি। উপযুক্তকাল প্রেক্ষাপটেই তাঁদের সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন হবে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে স্বনামধন্য শিক্ষক ও সার্থক সাহিত্য সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত 'বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছিলেন ; সেই প্রচেষ্টা যে বহুল পরিমাণে সফল এবং বাংলা উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি, রূপ ও স্বরূপ নির্ধারণে তা যে ছিল প্রায় নির্ভুল—আজও গ্রন্থটির বহুল প্রচারে সেই সত্যই প্রমাণিত। কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধানের পর গ্রন্থটির সংস্কার আর সম্ভব হয়নি। ফলে গ্রন্থটিতে নতুন কালধর্মের প্রেক্ষাপটে নতুন করে যে সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল জরুরী, তা রয়ে গেছে অপূর্ণ। এই শূন্যতা সাহিত্যরস পিপাসুদের নতুন মূল্যায়নের প্রত্যাশায় উন্মুখ করে তোলে। সেই প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই আমার 'প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থের উপস্থাপনা। তবে একথা সত্য যে বাংলা উপন্যাস সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ এর পরেও রচিত হয়েছে। সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রকে যথাসাধ্য সম্প্রসারিত করেছেন বেশ কিছু সংখ্যক সাহিত্যরস-পিপাসু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, যাঁদের কেউ বা আছেন অধ্যাপনার জগতে, কেউ বা বাইরে। তবে এই সব প্রচেষ্টা অনেকখানি পরিমাণে কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কালসীমায় সীমিত। 'ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর আশির দশক'—এই কালসীমা পর্যন্ত প্রসারিত কালের পটভূমিতে বাংলা উপন্যাসাবলীর গতি-প্রকৃতির ও প্রকার-প্রকরণের যে ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তন তার একটি সামগ্রিক চিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টা সেই সব গ্রন্থে অনুপস্থিত. তা স্বাভাবিকও। এই সত্য স্মরণে রেখেই আমাদের এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় আমি অনেক সাহিত্যসচেতন সমালোচকের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসের যে বিবর্তনমূলক ক্রমবিকাশ– সেই পরিচয়ই প্রকাশে উদ্যোগী। বলতে বাধা নেই যে, নির্বাচিত ঔপন্যাসিকদের পাশাপাশি প্রয়াত অ বা কোনো কোনো কথাশিল্পীর সৃষ্টিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে এই পরিচয় আরো পূর্ণাঙ্গ হত, কিন্তু গ্রন্থের কলেবর আয়ত্তাধীন রাখতেই সেই সদিচ্ছা সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, যে সব ঔপন্যাসিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের কালের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী ও তাঁদের রচনাবলী বাংলা উপন্যাস শিল্প-প্রকরণের নানান বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে অপরিহার্য।

প্রাসঙ্গিকভাবে একটি বিষয় উল্লেখ্য। এই গ্রন্থের প্রবন্ধকারেরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। এরা এঁদের প্রবন্ধের শেষে বা অভ্যন্তরে যিনি যেভাবে 'সূত্র নির্দেশ' করেছেন, আমি সম্পাদক হিসেবে সেই রীতিই বজায় রেখেছি। সেখানে প্রাবন্ধিকের স্বাধীনতাই স্বীকার্য বলে আমি মনে করি। আমার এই প্রচেষ্টা কতখানি সফল, সে বিচারের ভার পাঠকদের, আমার নয় ; শুধু এইটুকু বলতে দ্বিধা নেই যে, আমার এই প্রচেষ্টা আন্তরিক।

॥ ২ ॥

শুরুতেই বলে রাখি, উপন্যাস কি ? কিভাবে উপন্যাস তার রূপ লাভ করে ? আঙ্গিকই বা কিভাবে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে বিকাশ লাভ করে ?—এসব প্রশ্নের সুবিস্তৃত উত্তর দেওয়ার জন্য এ ভূমিকা নয় ; কেননা, এ বিষয়গুলি বহুদিন ব্যাপী বহু আলোচিত। বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞরা এক এক ভাবে এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত যে সার্বজনীন সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল—উপন্যাস জীবন-সম্ভব। নির্দ্দিষ্ট কালের প্রেক্ষাপটে তা জটিল-গূঢ় জীবন-সংবাদই বহন করে। তার কাজ মানব মনের গভীরে যে বিভিন্নধর্মী প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া বিচিত্রভাবে দেখা দেয় তাকেই সুষমামণ্ডিত করে সুচারুভাবে প্রকাশ করা। আর সেই প্রকাশ করার প্রকরণও কাল থেকে কালান্তরে নানা বৈশিষ্ট্য নিয়েই বিকশিত। বাঙলা উপন্যাস সম্পর্কেও একথা সত্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোমান্সধর্মী ও সামাজিক বাংলা উপন্যাসের উপস্থাপনার মাধ্যমেই বাংলা সফল উপন্যাসের যাত্রা শুরু। উনিশ শতকী পটভূমিকায় শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-ব্যক্তিত্বের সৃজনী-সমগ্রতার সন্ধানে বেরোলে পৌঁছতে হয় যেখানে, সেখানে আমরা তাঁর গদ্যময় বাস্তবতা-বিবর্জিত রোমান্সধর্মিতার পরিচয় পাই। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সেই রোমান্সধর্মিতার সূচনা ; এর পর আরো তেরটি উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন যার মধ্যে অল্পবিস্তর রোমান্সের উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গতার বিচারে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র যে উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন তার উল্লেখ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে, 'Rajmohon's wife' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস—ইংরাজীতে লেখা। এ-উপন্যাসে তিনি 'প্রবল প্রতিষ্ঠা' পাননি বটে, কিন্তু তাহলেও এটি কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় প্রকাশের পর উপন্যাসটি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাওয়ায় এটি প্রথমদিকে আলোচনার আওতায় আসেনি। বঙ্কিম-প্রয়াণের পরই আকস্মিকভাবে এটি আবিষ্কার হওয়ায় এটি পুনর্জীবন পায়। একটি প্রসঙ্গ এইখানে স্মরণীয়—জীবনের অন্তিম লগ্নেই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই ইংরাজী উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদে অগ্রসর হন এবং তাঁর জীবিতকালে তিনি মাত্র ন'টি অধ্যায়ের ভাষান্তর সমাপ্ত করেন। পরে অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ করেন তাঁর জীবনীকার ও ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র। অথচ মাত্র দু বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৮-তে 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ্'-এর পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ—'বারিবাহিনী'। এ নামকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের নয়—শচীশচন্দ্রের।

এই অনূদিত উপন্যাসটির আলোচনায় বসে একজন সাহিত্য সমালোচক যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তা উপস্থাপিত হলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের প্রতিভা বিচারে সহায়তা হবে মনে করেই সেই সমালোচনার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল, কেননা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের 'পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মানচিত্রকে আরও কিছুটা সম্প্রসারিত করে দেওয়ার অজস্র উপকরণ এর পাতায় পাতায়।'

"বারিবাহিনী পড়তে পড়তেও ··পরতে পরতে খুলে যায় বঙ্কিমের উপন্যাস নির্মাণের মূল প্রবণতার আদি রূপগুলো। পরবর্তী সামাজিক উপন্যাসের যাবতীয় কৃৎকৌশলের আদি বীজ যে বোনা হয়ে গিয়েছিল বিদেশী ভাষায় লেখা জীবনের প্রথম উপন্যাসেই, তার নমুনাগুলো খুঁজে পেতে পেতে আগের বঙ্কিমকে পরে আবিষ্কার করে নেওয়ার আবেগ আমাদের বোধের ভেতর স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে থাকে যেন ঃ নমুনাগুলো--উইল চুরি, ডাকাতি, দুর্যোগের রাতে নৌকাযাত্রা, গল্প থামিয়ে পাঠককে চরিত্রের পরিচয় দান, নারীর রূপ বর্ণনায় পুঙ্খানুপুঙ্খতা, ঝটিকারাতে সহসা প্রদীপ নেভা, রসালো সংলাপ, জলে ডুবে নারী চরিত্রের আত্মহননের চেষ্টা ইত্যাদি। আর একেবারে শেষ পাতায় পৌঁছে পাঠক চমকে উঠবেন কপালকুণ্ডলার অন্তিম মুহূর্তের সঙ্গে এর নাটকীয় সাদৃশ্যে। তফাতও অনেক।" ['আজকাল' ১৯শে জুন 'আগের বঙ্কিম পরে'—পূর্ণেন্দু পত্রী।] বলা বাহুল্য, এটিও একটি রোমান্সধর্মী উপন্যাস। তবে একথা সত্য ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির পূর্ণাঙ্গ দলিল নিঃসন্দেহে 'বারিবাহিনী'—এই প্রস্তুতি নিয়েই 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে তাঁর প্রবল প্রতিষ্ঠা যা তাঁকে উপন্যাসের 'জনক' আখ্যায় আখ্যায়িত করতে সাহায্য করেছে। তাই বলতেই হয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিম মূলত রোমান্টিক। তা হলেও তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসই—যেমন 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি তাঁর নিজস্ব দেশকালের পটে স্থাপিত মূল্যবান ফসল রূপেই চিহ্নিত। আবার একথাও উল্লেখ্য যে, আমরা তাঁর সামাজিক পারিবারিক উপন্যাসে তাঁরই সমকালীন নবোদ্ভূত ভদ্রলোক শ্রেণীর নতুন মূল্যবোধই ব্যবহৃত হতে দেখি। গঠনগত দিক থেকেও তাঁর উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য সুচিহ্নিত। এইভাবেই কি বিষয় নির্বাচনে, কি গঠনে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সফল শিল্পী রূপেই হয়েছে তাঁর অক্ষয় প্রতিষ্ঠা।

তবে শুরুরও শুরু থাকে—একথা স্মরণে রেখে বঙ্কিম পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির সম্ভাবনা ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনা করেই বঙ্কিম প্রসঙ্গ দিয়ে মূল আলোচনার সূত্রপাত করেছি। তারপর তাঁরই অনুপ্রেরণায় এলেন ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, যিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস সৃষ্টিতে হলেন অনেকাংশে সফল। সাহিত্যাসরে রমেশচন্দ্র দত্তের আবির্ভাব প্রসঙ্গে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা আজও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন ঃ

"সুপ্রসিদ্ধ লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অনেকেই আত্মক্ষমতায় সন্দিহান ছিলেন, তাঁহাদের কলমে বাঙ্গালা বাহির হইবে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। ব্রহ্মা যেমন বাল্মিকীকে বর দিয়াছিলেন—তুমি যাহা লেখ তাহাই রামায়ণ হইবে, বঙ্কিমও তেমনি এই সকল লেখককে অভয় দিয়াছিলেন—তোমাদের মত কৃতবিদ্য লোক যাহা লেখে তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য হইবে।" সেই আশ্বাসের ফলেই জন্মাল বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সাহিত্যাসরে স্থায়ী হল রমেশচন্দ্রের আসন।

বঙ্কিম-বলয়ের মধ্যে উপস্থিত হয়েও যিনি সম্পূর্ণভাবেই আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠার প্রতিভা প্রদর্শন করেছিলেন, তিনি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ঔপন্যাসিক গঙ্গোপাধ্যায় শুধুমাত্র তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' লেখার পর যদি লেখনী চালনা বন্ধ করতেন তাহলেও উপন্যাস সাহিত্যের পৃষ্ঠায় তাঁর আসন থাকত অক্ষয়। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিম সরণিতে পদার্পণ না করে তিনি সমকালীন সমাজ ও সংসারের, মূলত গার্হস্থ্য জীবনের যে সহজ স্বাভাবিক রূপটি চিত্রিত করেছিলেন তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে, তাতে তারকনাথের সৃষ্টি প্রতিভার ও শিল্প-চেতনার পরিচয়ই পরিস্ফুট। কাঁরো কাঁরো মতে তাঁর রচিত উপন্যাসাবলী 'উনিশ-বিশ শতকের মধ্যে সেতু রচনা করেছে। বেহালাওয়ালা, নীলকমল, তোৎলা গদাধরচন্দ্র ও ডাকসাইটে শ্যামা—এর সাক্ষ্য। ছোটখাটো সুখ দুঃখে অগ্রসরশীল দৈনন্দিন জীবনই এখানে প্রতিপাদ্য।'

বঙ্কিম-সমসাময়িক হয়েও বঙ্কিম প্রভাবিত না হয়ে তারকনাথ ছিলেন ব্যতিক্রম, কেননা এই সময়েই বঙ্কিম প্রভাবিত হয়েও নিজস্ব নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী। বলা চলে, সমাজ সচেতনতায় তিনিই প্রথমা।

সোনার কলমে লেখা স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসাবলীতে ছোটখাটো সুখদুঃখে অগ্রসরশীল, পারিবারিক ও দৈনন্দিন জীবনই পেয়েছে প্রাধান্য। এরপরই আমরা বাংলা উপন্যাস প্রবাহে এক পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করি। উপলব্ধির পথে বাংলা উপন্যাসের যাত্রাপথ যে কোথাও কোথাও হাস্য ও ব্যঙ্গের সরসতায় স্নিগ্ধ হয়েছে তারই প্রমাণ আছে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় থেকে সাম্প্রতিক কালের 'শিবরমা'-এর সৃষ্টির সাবলীলতায়, যা বাস্তবায়নের পরিচিতি বহন করছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' প্রথম সার্থক ব্যঙ্গ উপন্যাসরূপে স্বীকৃত; এখানে রুচি কিছুটা নিম্নস্তরের হলেও চিত্রণ অনেকাংশে প্রাণধর্মী। যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'মডেল ভগিনী', 'নেড়া হরিদাস' কিংবা 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' ব্যক্তিব্যঙ্গ হিসেবে বিশেষ উল্লেখ্য। বলা চলে, ইনি ইন্দ্রনাথের সমগোত্রীয়। প্রায় এঁদের সহযাত্রী হিসেবেই সহজ সৃষ্টির অধিকার নিয়ে উপস্থিত হলেন অদ্ভুত রসের অনন্য স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কঙ্কাবতী,' 'ফোকলা দিগম্বর' কিংবা 'ডমরুচরিত'-এর মত উপন্যাসের সম্ভার নিয়ে, যার মধ্যে আমরা পেলাম এক নতুন জগতের সন্ধান, যে জগতে ব্যঙ্গের প্রকাশ ঘটে রহস্যের পাখনায়। প্রাসঙ্গিক ভাবেই স্মরণে রাখব যে এই সব রচনা সাময়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করেনি। একজন বিদগ্ধ আলোচক এই উপন্যাসগুলিকে 'লোকায়ত' বলে চিহ্নিত করেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও প্রায় এই সময়েই সমাজ-সচেতন কথাশিল্পী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জহুরী যেমন জহর চিনে নিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ ও তেমনি ঠিক চিনে নিতে পেরেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অত্যুৎসাহী কর্মী শিবনাথকে ও

তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভাকে। তাই 'ভারতী'র সম্পাদক রবীন্দ্রনাথও শিবনাথ শাস্ত্রীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন " বঙ্গ সাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না—কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।" বিশ্বকবির এই সাদর আহ্বানে সাড়া দিয়েই শিবনাথ সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। ফলে আমরা পাই কবি, প্রবন্ধকার, সমালোচক ও সর্বোপরি ঔপন্যাসিক শিবনাথকে, যিনি উপন্যাস সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেই পান সাফল্যের স্বাদ। তাঁর আটদশ দিনের মধ্যে লেখা প্রথম উপন্যাস 'মেজবৌ'-এর উনিশটি সংস্করণ তার সাক্ষী।

শিবনাথ শাস্ত্রীর সমবয়সী ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন মূলত একটি উপন্যাস লিখেই সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজের নামাঙ্কনে সফল হন। বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন প্রভাবিত এই কথাশিল্পী মৌখিক মহাকাব্যের আদর্শে রচনা করেন তাঁর উপন্যাস—'বিষাদ সিন্ধু'। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

পণ্ডিত ও ঔপন্যাসিক শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারণ করতে হয় আর এক শাস্ত্রীর নাম। সমাজ-সচেতন এই ঔপন্যাসিকের নাম—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনিও অল্প কয়েকটি উপন্যাস রচনা করে পাঠক মনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর নিজের লিপি-কুশলতা তাঁর রচনাবলীকে করেছিল সুখপাঠ্য। প্রথম দিকের দুটি রচনায় ছিল ইতিহাস-পুরাণের প্রভাব, কিন্তু শেষের উপন্যাসটিতে আমরা তাঁর শৈল্পিক বিভূতিরই প্রকাশ দেখেছি। বিশেষভাবে বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিচায়ক এই উপন্যাসে আমরা খেয়ালী কল্পনা বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না পেলেও, পেয়েছি ইতিহাসের উপাদান ও সাহিত্যিক রসবোধ—যা তাঁর উপন্যাস 'বেণের মেয়ে'-কে রসোত্তীর্ণ করেছে। এতদসত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারায় আধুনিকতার মুক্তি তখনও অপেক্ষিতই থেকে গেছে।

মুক্তি এল অনন্য স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে। এখানেই পূর্বচিহ্নিত পথ থেকে সরে গিয়ে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ যে পথে যাত্রা করলেন—সে পথ বাস্তবতার পথ। ঔপন্যাসিক রূপে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত যাত্রারম্ভ—'চোখের বালি' থেকে। কেন ? সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা 'চোখের বালি'—উপন্যাসের ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন :

"সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা গেল চোখের বালিতে।"

অর্থাৎ ঘটনা-নির্ভরতা পরিত্যাগ করে ঔপন্যাসিক ক্রমেই জীবনবিষয়ক চিন্তা প্রকাশেই আকৃষ্ট হন। অখণ্ড এক জীবন-চেতনাই তাঁর উপন্যাসে প্রকাশ পেতে থাকে। কেননা সৎ ঔপন্যাসিকের সমগ্রতা-সন্ধানী শিল্পী-মানস উপন্যাসে 'গোটা' মানুষকেই সন্ধান করে থাকে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপন্যাসাবলীতে বার বার সমাজ ও সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপকেই, এক গভীর গূঢ়ার্থকেই রূপায়িত করতে

চেয়েছেন। এইখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা উপন্যাস-ধারায় রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। প্রাসঙ্গিকভাবেই এই স্বাতন্ত্র্যের সূত্রধ রেই বলা যায় যে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক কারণেই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে নিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসগুলিতে অভিজাত বাঙ্গালী জীবনের ঔজ্জ্বল্য ও ম্লানতার, সংগ্রাম ও আশাভঙ্গের ইতিহাসই মূর্ত করে তুলেছেন। এদিক থেকে বিচারেও তিনি বাংলা উপন্যাস-ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র থেকে পৃথক পথগামী।

'চোখের বালি' উপন্যাস—বাংলা উপন্যাস প্রবাহের একটি বিশেষ বাঁক রূপেই চিহ্নিত। এই উপন্যাসেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ 'প্রথম কাহিনীর ভার পরিহার করে ব্যক্তিত্বের ফল স্বরূপ নানা সংকটকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে ব্যবহার করলেন।' অর্থাৎ তিনি 'রাজর্ষি', 'বৌঠাকুরাণীর হাট' রচনার পথ পরিত্যাগ করে, প্রচলিত ছক ভেঙ্গে এগোবেন—এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। প্রখ্যাত সাহিত্য-ইতিহাসকার ডঃ সুকুমার সেন 'চোখের বালি' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

"ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের অপেক্ষা মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্ত ও তাহার পরিণতির গুরুত্ব আধুনিক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চোখের বালিতে পাত্রপাত্রীর গুরুত্ব অবলম্বনে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশ স্বাভাবিক ও সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত। তাই ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস।"

শুধু বক্তব্য বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য নয়, আঙ্গিক নির্বাচনেও এল আধুনিকতা। তারই পরিচয় পাওয়া গেল 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে—যেখানে interior monologue প্রয়োগ করে চেতন-প্রবাহের (stream of consciousness) নিকটবর্তী এক শিল্পরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'চতুরঙ্গ' থেকেই বাংলা উপন্যাসের ফর্মের ভাঙ্গাচোরার সূচনা। আবার সমাজ মনের সংঘর্ষ থেকে ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বে পৌঁছে গেলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যোগাযোগ'-এ যেখানে সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে ব্যক্তির অন্তর্গূঢ় সংঘাত। আমরা এখানে পেলাম আধুনিক জটিল জীবন-বিন্যাস। এখানে 'রূপের চেয়ে রসের', 'বস্তুর চেয়ে রূপের' দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন লেখক। 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ' এবং 'চার অধ্যায়' মূলতঃ এই পাঁচখানি উপন্যাসে অখণ্ড মানুষকে ধরার চেষ্টায়, প্রাগ্রসর নায়ক-নায়িকার বিশেষ পরিকল্পনায়, তাঁর নাগরিক মনের পরিচয় প্রকাশে ও ফর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখেই একথা বলা অসঙ্গত নয় যে, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার দিকটি সঠিক ভাবেই অনুভব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এইভাবেই এই ঔপন্যাসিক ও তাঁর অসামান্য সৃষ্টির মাধ্যমে এল বাংলা উপন্যাস-ধারায় আধুনিকতার অনায়াস মুক্তি।

রবীন্দ্রালোকেই আত্মপ্রকাশ করলেন দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র—যিনি হৃদয়বৃত্তির আবিষ্টতা থেকে মননবৃত্তির গভীরে প্রবেশের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেও

তেমন সাফল্য পাননি ; কেননা তিনি আধুনিক নন, বিদ্রোহী নন, বরং রোমাণ্টিক ভাবালুতার দ্বারাই হয়েছেন চালিত। বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করা যাক্। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ছিল 'তেতলা থেকে বটতলা' পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর বাস্তব-অভিজ্ঞতা, সমাজ-সচেতনতা, হৃদয়ানুভূতি, করুণা আর রোমাণ্টিক ভাবাবেগ—সাধারণ মধ্যবিত্ত পাঠকদের (average readers) মুগ্ধতা আকর্ষণে অসফল হয়নি ; তিনি নিজেই এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বলেই এক ভক্ত পাঠক যখন আপ্লুত হৃদয় নিয়ে জানিয়েছিলেন : 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়ে বোঝা যায় না, আপনার উপন্যাস সহজেই বুঝতে পারি।' তখন শরৎচন্দ্র নাকি উত্তর দিয়েছিলেন ; 'তা ঠিক। তিনি লেখেন আমাদের জন্য। আমি লিখি তোমাদের জন্য।' বলা বাহুল্য, পাঠক জনতাবর্গ (Reader public) তত্ত্বগত বিশ্লেষণ অপেক্ষা নিটোল গল্প লাভে বেশী আকাঙ্ক্ষী। শিল্পী শরৎচন্দ্র এই আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তাঁর নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও জনপ্রিয়তার বিচারে সর্বোত্তম শিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ আজও তাই তাঁর আসন অনড়।

কিন্তু জনপ্রিয়তাই কি শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের শেষ মাপকাঠি? অবশ্যই নয়। শরৎ-সাহিত্যে মহৎ উপন্যাস সৃষ্টির অনেক উপাদান থাকা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টি সম্ভার 'মহৎ সাহিত্য' হয়ে উঠতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, মূল্যবোধের অসঙ্গতি ও জীবনসৃষ্টির দ্বিধাবিভক্তিই শরৎ-সাহিত্যের দুর্বলতার উৎসমুখ। সেই সঙ্গে রোমাণ্টিক ভাবাতিশয্য এই দুর্বলতাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। মনে রাখতে হবে, 'The deepest quality of a work of art will always be the quality of the mind of the producer.' এই 'quality of mind'-টারই অভাব সূচিত হয়েছে তাঁর দোলাচলচিত্ততার মধ্যে ও তাঁর সাহিত্যে। তা সত্ত্বেও জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছেন, কেননা সংবেদনশীল এই শিল্পীর 'দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয় রহস্যে বাঙ্গালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে।' এই বাঙ্গালীর ছোট জীবনপরিধির মধ্যে সহজ আনন্দ-বেদনার অসাধারণ রূপকার রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা তাই চিরকালীন।

সমসাময়িক কালে শরৎ-সাহিত্যের ভাবাবেগকে সামনে রেখে, আবেগকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে যিনি আধুনিকতার স্পন্দনটুকু অনুভব করতে পেরেছিলেন তিনি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কল্লোল গোষ্ঠীর পুরোগামী রূপেই যিনি চিহ্নিত ; যিনি যৌন-জিজ্ঞাসাকে পাংক্তেয় করতে হয়েছিলেন সক্ষম। এখানে হ্যাবলক্ এলিস ও ফ্রয়েড হাত মিলিয়েছিলেন বলেই যৌন-জিজ্ঞাসার দ্বার হয়েছিল উন্মুক্ত। তবে মনে রাখতে হবে যে নরেশচন্দ্রের পূর্বেই 'ভারতী' গোষ্ঠীর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যৌনবোধের প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন তাঁর 'পঙ্ক তিলক'-এ। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে কয়েকটি ধারার সাক্ষাৎ মেলে ; যেমন প্রথম স্তর—যেখানে যৌনতাবোধের উদগ্রতা আঘাত করেছে নীতিবাদকে ; দ্বিতীয় স্তর—যেখানে উদ্দেশ্য অপেক্ষা শিল্পবোধ

প্রাধান্য পেয়েছে আর আছে আরো একটি স্তর—যেখানে বাস্তবের উত্তরণ ঘটেছে আদর্শায়নে। আর ছিল মনস্তত্ত্বপ্রীতি। এমন স্থূল বিভাজনে যে সবাই ঐকমত্য হবেন এমন প্রত্যাশা অমূলক।

অথচ নরেশচন্দ্রের সমকালেই শরৎচন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যে দুজন মহিলা ঔপন্যাসিক তাঁদের সৃষ্টিশীলতার সম্ভার নিয়ে এগিয়ে আসেন—তাঁরা 'ভাগলপুর গোষ্ঠী' রূপেই পরিচিত। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই উপস্থিত হয়েছিলেন অনুরূপা দেবী (১৮৮২) ও নিরুপমা (ওরফে অনুপমা) দেবী (১৮৮৭)।

অনুরূপা দেবী প্রধানত চার ধরনের অর্থাৎ ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের উপচার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন ; কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসাবলীতে ঘটনার ঘনঘটা, নাটকীয়তা ও বিরোধের রূপায়ন থাকা সত্ত্বেও, সেগুলি ঐতিহাসিক যাথার্থ্য পায়নি বলাই সঙ্গত ; সেই তুলনায় তাঁর সামাজিক উপন্যাস অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রাজনীতির ধারার উপন্যাস 'চক্র'-তে শেষ পর্যন্ত প্রেম প্রাধান্য পাওয়ায় রাজনীতি হয়েছে ব্যর্থ। প্রকৃতপক্ষে, সংখ্যায় অনুরূপা দেবী অনেক লিখলেও শেষ পর্যন্ত কোন মৌল সৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেননি। প্রাচীন পন্থী হিসেবে গতানুগতিকতার পথচারিণী হয়েই তিনি তার উপন্যাসগুলিকে শৈল্পিক সুষমা দানে দীপ্ত করে তুলতে পারেননি।

তবে শরৎ-দ্যুতিতে দীপ্যমতী হলেও নিরুপমা দেবীর স্বল্প সংখ্যক উপন্যাস কিছুটা পরিমাণে প্রতিভার স্পর্শ পেয়েছে। সৃষ্টি হিসেবে এগুলি কিছুটা ভাবাতিশয্য মুক্ত হলেও এগুলিতে অপরিণতির প্রভাব স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে তাঁর সহজ, সুন্দর সামাজিক উপন্যাসগুলি পাঠকের প্রশংসাধন্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে ; কিছুটা সাহিত্যোৎকর্ষ না থাকলে তা নিশ্চয়ই সম্ভব হত না।

প্রসঙ্গত, নরেশচন্দ্রের সমসাময়িক আর যে পুরুষ ঔপন্যাসিকের নাম স্মরণে আসে, তিনি—জগদীশ গুপ্ত। জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সুতীব্র বিরোধিতা করেই সাহিত্যের আসরে আসন পেতেছিলেন তিনি। এই বিরূপ সমালোচনায় জগদীশ গুপ্তের অসহিষ্ণুতার পরিচয় প্রকাশিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে এক নির্মোহ মানসিকতার সন্ধানও পাওয়া যায়। মোহহীন মানসিকতা নিয়ে নিজ শিল্প-সাধনাজাত অভিজ্ঞতার আলোকেই জগদীশ গুপ্ত শরৎচন্দ্রীয় ভাবালুতাকে আঘাত হেনেছিলেন এবং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এক জীবন শিল্পীর ভ্রান্তি ও অসঙ্গতির সমালোচনার পথ ধরেই আবির্ভূত হয়েছিলেন আর এক জীবনশিল্পী।

কল্লোলের কালবর্তী কথাশিল্পী জগদীশ গুপ্ত রবীন্দ্র-অতিক্রমণ করার জন্যই বা সৌখিন সাহিত্য সৃষ্টির অভিরুচি নিয়ে কলম ধরেননি। কলম ধরেছিলেন নিজের অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশের অভিপ্রায় নিয়ে। বলা হয়ে থাকে, 'রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্য রুচি গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্প-প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তের। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর পূর্বতন সাহিত্য

স্রষ্টারা যা সৃষ্টি করেছিলেন, আর সেই সব সৃষ্টি তাঁর মানসজগতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, যে সব প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল সেগুলিকে নিজস্ব শিল্পসম্মত দৃষ্টিতে বোঝার সৎ চেষ্টার ফসলই হল জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসাবলী।

রোমাণ্টিকতা ও ভাবালুতার পরিবর্তে এঁর বাস্তবদৃষ্টি নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নতর বিত্তের মানুষের জীবনের যে বক্র জটিলতা তাকেই সৃষ্টির উপাদান রূপে গ্রহণ করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—মানুষের আদিমতম আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনে জটিল জটের সৃষ্টি করে, তাই উপন্যাসের উপকরণ রূপে তিনি তা ব্যবহার করেন। এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল অনড়, তা হল এক অদৃশ্য ক্রূর ব্যক্তির হাতেই মানুষ হল ক্রীড়ানক, যার অন্য নাম নিয়তি। ফলে এক ধরণের নৈরাশ্যের রূপ তাঁর সাহিত্যে সুচিহ্নিত। প্রথম মহাসমরের সময় সঞ্জাত বিশ্বাস হারানোর কালে নৈতিকতাকে কোন রকম প্রশ্রয় না দিয়ে আদিম বাসনায় বন্দী মানুষের জীবনজটিলতার রহস্যকে বাংলা উপন্যাসের উপজীব্য করে তোলায় বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রটি হয়েছে সম্প্রসারিত, এসেছে বাঞ্ছিত বৈচিত্র্য।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রবহমান ধারা তখন এসে পৌঁচেছে প্রথম যুদ্ধোত্তর কুড়ির দশকে, যখন একদিকে বিশ্বযুদ্ধ বিস্তৃতিদান করেছে অভিজ্ঞতার দিগন্তকে অন্যদিকে ঘটেছে মধ্যবিত্তের ধ্যান-ধারণার সমূহ বিপর্যয়। একদিকে দেখা দিয়েছে বহির্মুখর বিপ্লব, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে চলেছে জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল উতরোল। একদিকে ঘটেছে এঙ্গেলস্ মার্কস্-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উল্লেখ্য উপস্থাপন, অন্যদিকে আবিষ্কৃত হয়েছে ফ্রয়েড চিহ্নিত অজ্ঞাত অবচেতন-লোক। এই সব কিছু মিলিয়ে বাস্তব জীবনের জটপাকানো জটিলতা—সেই জটিলতা-জর্জরিত কঠিন বাস্তবকে ব্যাখ্যা করতেই সেই সময়ে অগ্রসর হলেন ঔপন্যাসিকেরা। কিন্তু প্রশ্ন হোল—সেই সময়কার কথাকারেরা, যাঁরা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল-গোষ্ঠী' রূপেই পরিচিত, তাঁরা কি এই কঠিন দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত ছিলেন? অনেক আলোচকই মনে করেন, 'এই গোষ্ঠী এই দুরূহ দায়িত্ব পালনে যতখানি আগ্রহী ছিলেন, ততখানি সৃজনশক্তির অধিকারী ছিলেন না। সৃষ্টির কাজে তাঁরা যতখানি ব্যস্ততা দেখিয়েছেন, ততখানি প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি। উপন্যাসেব পক্ষে যা পরম প্রয়োজনীয়—দেশকালের সঙ্গে উপন্যাসের ভাব-মণ্ডলের যোগ-সাধন, কল্লোল গোষ্ঠীর ভেতরে তার চরম অভাব তাঁদের সার্থক উপন্যাস লিখতে দেয়নি।'—এক প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিকের এই মন্তব্য তাই যথার্থ।

প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্র ও শরৎ-দ্রোহিতার অভীপ্সা নিয়ে অগ্রসর হয়েও যাঁরা রবীন্দ্র-পরিক্রমাতেই যাত্রা শেষ করেছেন—তাঁরাই 'কল্লোল গোষ্ঠী' রূপে পরিচিত। এঁরাই শেষ পর্যন্ত যুগান্তরের বার্তাবাহী রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আধুনিকতার দিশারীকে আবিষ্কার করে হয়েছেন আনন্দিত। সত্তরোর্ধ শিল্পী রবীন্দ্রনাথই অবলীলায় যেমন নতুন বক্তব্য উপস্থিত করলেন, তেমনি কাহিনী বিস্তারে মনোযোগী না হয়ে জটিল মনোবিশ্লেষণে তৎপর হয়ে আধুনিকতার পুরোধা-পুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠা

পেলেন। এই আধুনিক রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করে, বিদেশী সাহিত্য থেকে প্রেরণা পেয়ে ও প্রকরণ-বিলাসীদের মতো বাস্তবের নামে মগ্ন চৈতন্যে ডুব দেওয়ার প্রয়াসে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা যে প্রবণতা দেখালেন তা জীবন উৎসারিত নয়, তাই সাহিত্য-সভায় স্থায়ী আসন লাভে তাঁরা অনেকেই হয়েছেন অসমর্থ।

কল্লোল-কালের তরুণ প্রগতিপন্থী লেখকগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে ছিলেন এক নতুন পথের সন্ধানী। সেখানে রোমান্টিকতার পথ পরিহার না করেও তাঁরা বস্তুনিষ্ঠ জীবন বর্ণনে ছিলেন আগ্রহী। এঁদের এই কালই 'কল্লোল যুগ' বলে চিহ্নিত, যে যুগে 'কালি-কলম', 'প্রগতি', 'উত্তরা', সংহতি'র সমন্বয় ঘটেছিল। কল্লোলের বৃত্তটি বর্ণনা করে কল্লোলোত্তর কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

"চরিত্রধর্মের দিক থেকে নাগরিক—শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতাবোধ ও গ্লানির সঙ্গে নিরুপায় বিদ্রোহ প্রয়াসেই কল্লোলের বৃত্ত রেখা নির্দিষ্ট।" এই প্রেক্ষাপটে রেখেই কল্লোল কালের কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ প্রমুখদের শিল্পীব্যক্তিত্ব আলোচিত হয়েছে।

উল্লিখিত ঔপন্যাসিকবৃন্দ এমন এক তাৎপর্যময় পরিস্থিতিতে স্যাহিত্য-সৃজনে ব্রতী হয়েছিলেন, যখন ভারতের রাজনৈতিক জীবনে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা, মনুষ্যত্বের মূল্যবোধহীনতা—সমাজ-মানসকে করেছে নৈরাশ্যের শিকার, হতাশায় আচ্ছন্ন, পরিণতিবিহীন ভবিষ্যতের ভয়াবহ রূপ মানুষকে করেছে আতঙ্কিত। তবুও 'চিরযুবা বলে চিরজীবি' এঁদের সাহিত্য নবযুগের আশ্বাস দানে অপরাগ হয়নি। তাই বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল যুগের' অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়। যৌবন শক্তিতে সমুজ্জ্বল ও যৌবনধর্মে প্রাণিত এই লেখকদের চিত্ত সমকালীন জীবনের হতাশায়, সংশয়ে নিষ্ফলতায় হয়ে উঠেছিল ক্ষুব্ধ ও বিরূপ ; প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের নানান ক্ষতচিহ্ন তাঁদের মনকেও ক্ষতবিক্ষত করে তোলে, ফলে অস্থিরচিত্ততা ও ধৈর্যহীনতায় তাঁদের পথ ছিল না সুগম। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে সাহসিকতার সঙ্গে বিস্ময় সৃষ্টির দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাই ছিল কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মূল প্রয়াস।

কল্লোল কাল-বৃত্তের মধ্যে থেকেও যে প্রতিভা স্বল্পসময়ের জন্য উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়ে আপন স্বতন্ত্র পথটি চিহ্নিত করে নিয়ে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অল্পকালীন উপস্থিতি আমাদের স্মৃতিতে পেয়েছে স্বতন্ত্র স্থান।

প্রায় একই সময়ে বা সামান্য কিছু পরে ও একই পরিবেশে প্রবল প্রত্যয় ও প্রত্যাশিত স্থৈর্য্য নিয়ে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেন, যাঁরা ঠিক কল্লোল বৃত্তের বাইরে থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য রেখেছিলেন, তাঁরা হলেন মূলত 'হৃদয়-প্রধান' ধারার ধারক তিন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক। এঁদের

মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর সম্পর্কটি অস্বীকৃত হবার নয়। বাংলা উপন্যাসে তিন প্রধান বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে এঁদেরই বোঝান হয়।

প্রকৃতপক্ষে, সংশয়, সন্দেহ, বিক্ষুব্ধতাক্লিষ্ট ও অস্থির অবিশ্বাসীকালের কথাশিল্পী হয়েও তারাশঙ্কর এক অভিমানী ভারতচেতনা ও সংশয়বিমুক্ত, শান্ত স্থিতধী জীবনবোধের সার্থক রূপকার। এমনই আর এক রূপকার হলেন—বিভূতিভূষণ। এঁরা দেশীয় ঐতিহ্য অনুসরণের মাধ্যমে স্বদেশের প্রকৃত প্রাণ-শক্তির উৎসভূমি গ্রামীন জীবনের গভীরে দৃষ্টিপাত করে, শুধু আপন আপন স্বাতন্ত্র্যেই উজ্বল হয়ে ওঠেননি, বাংলা সাহিত্যের পরিধিকেও করেছেন অনেকখানি প্রসারিত। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল এই দুই শিল্পীর সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণ হল—এঁদের শিল্পসত্তা ও জীবননিষ্ঠা।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের কথা উঠলেই 'আঞ্চলিক' কথাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে পড়ে কেননা, যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে ও তার ঘটনাবলীকে শিল্পী তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসাবলীতে চিত্রিত করেছেন সেই অঞ্চলটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর লালনভূমি, তাঁর স্বক্ষেত্র। 'একদিকে বর্ধমান জেলার শষ্যপূর্ণ প্রান্তরের বিস্তার, অন্যদিকে বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার তরঙ্গসঙ্কুল কাঁকুড়ে রুক্ষতার প্রসার'—এই দুই বৈশিষ্ট্য যেন জীবনের দ্বৈত রূপেরই পরিচয়বাহী। সামগ্রিকভাবে রাঢ় অঞ্চল রূপে পরিচিত এইখানকার দ্বন্দ্বসঙ্কুল জীবনের পরিচয়ই প্রকাশিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট উপন্যাসগুলিতে। আবার এই বিষয়বস্তুকে রূপায়িত করতে গিয়ে শিল্পী তারাশঙ্কর উপন্যাসের কাঠামো-গত পরিকল্পনায় আনেন বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য মূলত লোকসাহিত্য ধারার অঙ্গ রূপকথার প্যাটার্ন থেকে পাওয়া। তার উপন্যাসগুলিতে গ্রামীণ পরিবেশই পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই এই রূপ-কথার প্যাটার্নটি অতি স্বাভাবিক রূপ নিয়েই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মনে রাখতে হবে, তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতার সঙ্গে রূপকথার এই প্যাটার্নের সম্বন্ধ সুগভীর ও সুনিশ্চিত। এই ধারা শিল্পী তারাশঙ্করের সম্পূর্ণ নিজস্ব, যা বাংলা সাহিত্যে আঙ্গিক রচনায় তাঁর অবদান রূপেই স্বীকৃত। 'তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতা যেমন তাঁর উপন্যাসের প্যাটার্নকে গঠন করতে সাহায্য করেছে, তেমনি তারাশঙ্করের নৈতিক সিদ্ধান্ত এবং প্রশ্নাবলীও সেই প্যাটার্নের কাছ থেকে বিশেষ সহায়তা পেয়েছে।' এমনি ভাবেই বিষয় নির্বাচনে ও আঙ্গিক গঠনে নিজস্বতা নিয়ে বাংলা উপন্যাস-ধারায় তারাশঙ্কর হয়ে আছেন আপন সাহিত্য-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

তিরিশের দশকের দুই উল্লেখ্য ঔপন্যাসিক শিল্পী শরৎচন্দ্রের সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করে, কল্লোলের সাহসিকতাকে স্বীকার করেই সৎ উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়াসে মননশীলতার প্রয়োগে হয়ে ওঠেন প্রয়াসী। তাই এই কালের প্রেক্ষায় প্রধান প্রবণতার বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে ও তার পরবর্তীকালে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানসে চিন্তাকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ করে তোলার প্রবণতার মূলে একদিকে যেমন ছিল

বিশ্ববীক্ষা এবং স্বদেশকে বিশ্বের বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে উপলব্ধি করার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তেমনি ছিল মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎ সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসা। সামগ্রিক বিচারে এই সময় জেগেছিল জীবন সম্পর্কে মানুষের প্রবল আশা ; আসলে এই সময়ে ক্ষমতা সম্পর্কে, মানুষের জীবনের মমতা সমন্ধে জেগেছিল এক পরম মানবিক বিশ্বাস, যাকে এককথায়—পূর্ণায়িত জীবনবোধ বলে অভিহিত করা যায়। এই জীবনবোধের বিস্তৃতি ও গভীরতারই সন্ধান পাওয়া যায় গণজীবনের সঙ্গে পরিচিত ঔপন্যাসিক তারাশংকরের গ্রামীণ সমাজ-বীক্ষায় ও মাটির মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তায় আবদ্ধ বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-অভিমুখীনতায়, তাঁদেব বিষয় নির্বাচনে ও শিল্পপ্রয়াসে। এঁরা নিঃসন্দেহে উপন্যাসে কাম্য সমগ্রতা-সন্ধানে ছিলেন ব্রতী। এই সমগ্রতা সন্ধানের মধ্যেই নিহিত ছিল বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রসার।

একথা স্মরণে রাখতে হবে যে তিরিশের যুগে—যে যুগে 'যন্ত্রণাও যত, প্রেরণাও তত' ; সেই যুগে জীবন সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক আগ্রহ অনেকখানি পরিমাণে সমগ্রতা নিয়েই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্ভবত এই যুগেই স্বদেশ জিজ্ঞাসা ও জীবন-জিজ্ঞাসা মিলিত হয়েই উপন্যাসে জন্ম দিয়েছিল জীবনসংলগ্নতার, যা এই সময়কার উপন্যাসের মূল লক্ষণ বলে চিহ্নিত। এই পটভূমিতে রেখেই বিভূতিভূষণের উপন্যাসাবলী বিচার্য।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে যে প্রকৃতি-চেতনার প্রকাশ, তা জীবনের অংশ রূপেই প্রতিভাত। তাই জীবন সম্পর্কে এই শিল্পীর মনোভঙ্গি কি?—সে কথা বিচার করতে বসলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রকৃতি-চেতনার প্রাসঙ্গিকতা সত্য হয়ে ওঠে। এই শিল্পীর দৃষ্টি মূলত উদগ্র কৌতূহলীর দৃষ্টি, যাতে আছে বিশ্ব সম্পর্কে অপার বিস্ময়, যে বিস্ময় মূলত তাঁর বিশ্ববোধের সঙ্গেই বিজড়িত। বাংলা উপন্যাসে—এই বিশ্ববোধ এসেছে বিভূতিভূষণের সৃষ্টির মাধ্যমে—এ সত্য স্বীকার্য। বিভূতিভূষণ অপার বিস্ময় নিয়ে যা কিছু দেখেছেন, সেই সব কিছুকেই তিনি পূর্ণের অংশ রূপেই গ্রহণ করেছেন ; ফলে তাঁর দৃষ্টিতে সব কিছুই স্বরূপ বিচারে পূর্ণ—এ দৃষ্টি বিভূতিভূষণের নিজস্ব। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সমৃদ্ধির ইতিহাসে—বিভূতিভূষণের দৃষ্টির এই নিজস্বতা তাঁর সৃষ্টিকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু উল্লেখ্য অপর দুজন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সন্দেহাতীত ভাবে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র আসে স্বতন্ত্র জীবন দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের বিচারে। যে কোন শিল্পীর শিল্পকর্ম ও শিল্পধর্মের বিচারকালে জীবন সম্পর্কে লেখকের মনোভঙ্গি বা 'attitude towards life'—এর আলোচনা অপরিহার্য ; কেননা লেখকের নিজস্ব শক্তি যার সাহায্যে লেখক নিজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুধু স্বাধীনই হন না, স্বচ্ছন্দ গতিও লাভ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা তাঁর শিল্পী সত্তার স্বাধীনতা ও সৃজনে স্বচ্ছন্দতার সন্ধান তাই সহজেই পাই। বস্তুত জীবন সম্পর্কে তাঁর কি জিজ্ঞাসা? তারই সন্ধান পাই তাঁর 'লেখকের কথা'-য়। তিনি লিখেছেন ঃ

উপন্যাসের সার্বিক দ্বিধামুক্তি, যাঁরা তাঁদের পৃথক পৃথক প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের সম্মুখে এই শ্রেণীর অস্তিত্বের যে সংকট তার চিত্রই শুধু অংকন করেননি, মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকার অর্থেরও সন্ধান দিয়েছেন। তারাশঙ্কর তাঁর ইতিহাস-বোধে, বিভূতিভূষণ তাঁর প্রকৃতিবোধে আর মানিক তাঁর সমাজবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই সৃষ্টির সাধনায় বিচিত্রমুখী বাঙ্গালী জীবনকেই উপন্যাসের উপজীব্য করে তুলেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক ভাবে বাংলাদেশী একজন সাহিত্য-বোদ্ধার বিশ্লেষণের অংশোদ্ধার অপ্রাসঙ্গিক হবে না ; তিনি লিখেছেন ঃ

"রবীন্দ্র-শরৎ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে যথার্থ সৎ উপন্যাস দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন যাঁরা, সেই তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক—মুক্তিরই পথ সন্ধান করেছিলেন। অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের দর্শন এঁদের কাউকেই দিক্‌ভ্রষ্ট করতে পারেনি। তারাশঙ্করের বিরুদ্ধে সামন্তবাদের প্রতি মোহগ্রস্ততার অভিযোগ করেছেন অনেকে। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে সামন্ত সমাজে অনুশীলিত অনেক সার্মায়ক মূল্যবোধের প্রতি তারাশঙ্করের মমতা থাকলেও সামন্ততন্ত্র অবসানের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্থির নিশ্চিত ; আবার সামন্ততন্ত্রের বদলে অবক্ষয়ী ধনতন্ত্রী মূল্যবোধ গ্রহণেও ছিলেন নারাজ, তাই লৌকিক জীবন বৃত্তের মধ্যেই অনুসরণীয় মানবিকতার সন্ধান করেছেন তিনি। প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ অধ্যাত্মপন্থী হলেও ছিলেন যথার্থ জীবন রসরসিক, তাই কোনোরূপ জীবনবিরোধী ক্ষয়িষ্ণুতাই তাঁর শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ যে সুস্থতার সাধনা করলেন ঐতিহ্যগত মানবিক মূল্যবোধের অনুসরণে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুস্থতাকেই অন্বেষণ করলেন নির্মোহ বৈজ্ঞানিক চেতনার মধ্যে। তাঁর প্রথম জীবনের ফ্রয়েডানুসারিতাও ছিল বিজ্ঞান মনস্কতারই ফল ; কিন্তু যে মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন যে ফ্রয়েডের তত্ত্ব 'ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি'তে ভরা, সেই মুহূর্তেই তিনি সে তত্ত্ব পরিত্যাগ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে জীবনদর্শন ও শিল্পদর্শন রূপে গ্রহণ করলেন। কল্লোল গোষ্ঠীর ফ্রয়েডানুসারিতার সঙ্গে এইখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য। কল্লোলীয়রা ভাববাদী মনস্তত্ত্বের অনুসরণ করতে গিয়ে নির্জ্ঞান ও মগ্ন চৈতন্যের অন্ধকারে মানুষের সত্তাকে বন্দী করে ফেলেছিলেন আর মানিক নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন মানব-সাধনায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই সূচনা করে ছিলেন বাংলা উপন্যাসে ব্যক্তিগত আত্মব্যবচ্ছেদের সঙ্গে সমাজগত জীবন্ত বাস্তবতার সম্মিলন ঘটানোর।" এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। [আমাদের উপন্যাস ঃ স্বাধীন বাংলাদেশ—যতীন সরকার ; বইয়ের খবর / ২য় বর্ষ, নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৮৭]

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বছর পরে জন্মগ্রহণ করে প্রায় একই সময়ে সাহিত্য-সাধনায় যে তিনজন কথাশিল্পী সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জনে ব্যর্থ হননি—সেই তিনজন কথাশিল্পী হলেন জীবনানন্দ দাশ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। চিকিৎসক-লেখক বলাইচাঁদের ছিল চিকিৎসকের নিস্পৃহতা, নির্মমতা ও এক তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি। এই ধরণের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বনফুলের সৃষ্ট সাহিত্যে আমরা পাই বিষয়ের নানামুখী বিস্তার, উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ, জীবন অভিজ্ঞতার অজস্রতা আর সেই সঙ্গে প্রকরণের বিচিত্রতা। এই কথাশিল্পী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় বক্তব্য বিষয়ের জন্য নয়, চিহ্নিত হয়ে থাকবেন তাঁর নিরন্তর আঙ্গিক নিরীক্ষার জন্য। বাঙ্গালী যুব মানসের অসঙ্গতির চরিত্র চিত্রণে তিনি সিদ্ধহস্ত হলেও তাঁর নির্মম নাটকীয় ব্যঙ্গদৃষ্টি যতখানি সার্থক ছোটগল্প সৃষ্টিতে সমর্থ, ততখানি মহৎ উপন্যাসের জন্মদানে সফল নয়—এইখানেই এই শিল্পীর সীমাবদ্ধতা।

বনফুলের সমবয়সী কবি-ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশের ঔপন্যাসিক প্রতিভা আমাদের স্মরণে আনে বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গ। কেননা এই দুই স্রষ্টারই খ্যাতি প্রসারিত হয়েছিল তাঁদের প্রকৃতিকে জানার জন্য। আপাত দৃষ্টিতে সাদৃশ্য থাকলেও দুজনের দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দেহে সুচিহ্নিত। সাহিত্যিক জীবনানন্দের মন সচেতন ভাবেই আধুনিক বলেই তাঁর মর্মে ধরা পড়ে—'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ।' এই অসুখ সম্পর্কে ছিল তাঁর সুতীক্ষ্ম অনুভূতি যা তাঁর প্রেরণায় ছিল সম্পূর্ণতাই সক্রিয়। তিনি যতখানি সভ্যতা-সচেতন, বিভূতিভূষণ কোনক্রমেই ততখানি সচেতন নন। অথচ সচেতন বলেই সংকটাপন্ন সভ্যতার আর্তিতে জীবনানন্দের সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে সংকটবিধুরতা। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের উপন্যাসগুলিতে এই সত্যেরই স্বরূপ উদ্ঘাটিত, ফলে জীবনানন্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা চলে যে, জীবনানন্দের উপন্যাসের আলোচনায় চেতন-প্রবাহ ও অধি-বাস্তবতার প্রয়োগ-পদ্ধতি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রূপেই স্মরণীয়।

এঁদের প্রসঙ্গ স্মরণে রেখে বিচার করতে বসলে সাহিত্যের আসরে যিনি 'চন্দ্রহাস-বি' নামে পরিচয় দিয়েছিলেন সেই ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণে আসে। তাঁর সৃষ্টির জগৎ অনেকখানি পরিমাণে সীমাবদ্ধ। তাঁর অন্যতম প্রধান প্রবণতার প্রকাশ ছিল সুদূর অতীতচারিতায় ও ইতিহাসের পৃষ্ঠার আকর্ষণে—যা যথেষ্ট পরিমাণে রোমাণ্টিক। আর আছে রহস্যের চক্রান্ত। ইউরোপে এই চমক সৃষ্টির রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কোনান ডয়েল, রাইডার হ্যাগার্ড আর হল নাইনের মত স্রষ্টারা; স্বল্প পরিসরে এই রহস্যের চমক বেশ ঘন রূপ লাভ করলেও, বৃহত্তর পরিসরে হয়ে পড়েছে কিছুটা বিবর্ণ। তাই ছোট গল্পের সাফল্য পায়নি তাঁর উপন্যাস।

রহস্যের চমক নয়, হাসি-কান্নার সহজ, স্নিগ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার নিয়ে এলেন যিনি বাংলা উপন্যাস ধারায় সেই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এক বিশিষ্ট নাম। আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এই কথাশিল্পীর হাস্যরসরসিকতা আমাদের স্মরণে আনে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম, যাঁকে তাঁর স-ধর্মী বলাই সঙ্গত। বিভূতিভূষণের

প্রথম দিকের সৃষ্টিতে আমরা দেখেছি হাসি ও অশ্রুর টানা-পোড়েনে গড়া জীবন-বৃত্তকে। তার পরিচয় আছে তাঁর তিন খণ্ডে রচিত 'স্বর্গাদপী গরিয়সী' উপন্যাসে। এই রচনায় যে মাতৃবন্দনা তাতে সন্ধান পাওয়া যায় মাতৃহৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরের। একে 'জীবনোপন্যাস' বলে চিহ্নিত করাও হয়েছে কেননা জীবনের মতোই উপভোগ্য এর বৈচিত্র্য। তাই এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়েছে : 'স্বর্গাদপি গরীয়সী জীবনী নয়, যদিও অস্বীকার করা চলে না যে ইহাতে জীবনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান।' নিঃসন্দেহে, বাৎসল্য রসের এই উপন্যাস আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এক অনন্য সৃষ্টি। এই বাৎসল্য রসই ক্রমে পরিণতি পেয়েছে সখ্য বা মধুর রসে। 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাস তারই প্রমাণ। শুধু তাই নয়, ঔপন্যাসিক দৃষ্টি ফিরিয়েছেন প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটনে যেখানে তিনি সহায়তা নিয়েছেন ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের, কেননা আকর্ষণ ও বিকর্ষণের যৌন রূপের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে প্রেমের স্বরূপ। এককথায় বলা যায়, বিভূতিভূষণের জীবনধর্মী বাংলা উপন্যাসে জীবনের পরিচয় যেমন বিস্তৃত পরিধি পেয়েছে তেমনি পেয়েছে বৈচিত্র্য।

এঁদের সমসাময়িক কালের হয়েও যে ঔপন্যাসিক এই সময়ে এক স্বতন্ত্র পথের যাত্রী রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন—তিনি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি দৃপ্ত বুদ্ধি, মনন ও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় নিয়েই প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের বিষয় রূপে তিনি নির্বাচন করেছিলেন বুদ্ধিজীবী মানুষের মনোজগৎ। আধুনিক মানুষের তীব্র জটিল দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মন বিশ্লেষণে বাংলা উপন্যাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় তাঁরই হাতে। আর এই উপন্যাস রচনায় তিনি যে 'চেতন-প্রবাহ'-র রীতি প্রয়োগ করেন, তা উপন্যাসের অন্যতম আধুনিক আঙ্গিক রূপেই পায় স্বীকৃতি।

কবি হিসেবে সাহিত্য জীবনের সূচনা যাঁর সেই সরোজ রায়চৌধুরী ছিলেন উপন্যাস সৃষ্টির পথের এক নিঃসঙ্গ পথিক, যিনি কারুর দিকে তাকিয়ে নয়,—লিখেছিলেন অন্তরের তাগিদে। নিজে তিনি একে 'আত্মার তাগিদ' বলেই উল্লেখ করেছেন! সাংবাদিক হয়েও যিনি সফল সাহিত্যিক—তাঁর লেখার সংযম ও সংক্ষিপ্ত উল্লেখযোগ্য গুণ। বলা বাহুল্য, কল্লোলের লেখকবৃন্দ যখন বাক্‌বিস্তৃতির অতিরেকের ফলে সংযমহীন ও বেশীকিছু পরিমাণে রোমান্টিক অতিশয্যেরও শিকার, তখন তিনি অতিরিক্ত রোমান্স প্রবণতা ও বহুভাষণের দায়মুক্তও, বরং তাঁর লেখনী শুধু শান্তই নয়, ছিল সূক্ষ্মও। এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে, শহরমুখী দৃষ্টির অধিকারী হয়েও সরোজ রায়চৌধুরী সমকালীন পল্লী-সমাজের মধ্যবিত্ত জীবনকে যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন পল্লী প্রকৃতিকে, এঁকেছেন পল্লীর বাস্তবতা। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির পরিধিটি আরো প্রসারিত। তাঁর সাংবাদিক জীবন, রাজনীতি-সচেতন ক্রিয়াকলাপ, পারিবারিক জীবন, কয়েদজীবন ও সাম্যবাদী ভাবনা—তাঁর শিল্পী জীবনের বৃত্তটিকে ব্যাপ্তি দান করেছে আর, এগুলির সম্মিলিত ফসল তাঁর উপন্যাসাবলী।
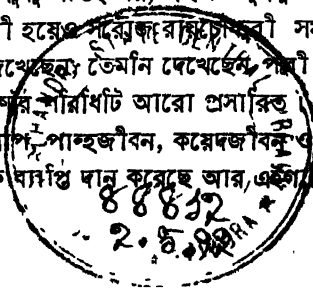
সরোজ রায়চৌধুরীর সমসাময়িক কালে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়ে যে দুজন দক্ষশিল্পী নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য রাখতে সফল হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন সতীনাথ ভাদুড়ী ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

ব্যাপক পরিচিতির প্রত্যাশী না হয়ে আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে লেখা উপন্যাস নিয়ে যাঁর আত্মপ্রকাশ অনেককেই বিস্মিত করেছিল তিনি বিহার-বাসী বাঙালী সতীনাথ ভাদুড়ী। রাজনীতির পটভূমিকায়, বিশেষভাবে বিয়াল্লিশের বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত পটে তিনি আত্মোৎসর্গের যে চিত্রাঙ্কন করেছেন তার আকর্ষণ হয়েছিল অনিবার্য। এরপর তিনি অগ্রসর হন গণসাহিত্য সৃষ্টিতে। প্রকৃতপক্ষে, স্বল্প সংখ্যক উপন্যাস রচনা করেও রচনা-বৈচিত্র্যে যিনি বৈশিষ্ট্যের দাবিদার—তিনিই স্বনামধন্য সতীনাথ ভাদুড়ী। ইনি রাজনৈতিক উপন্যাস রচনা করেও ছিলেন, পক্ষপাতহীন সত্যসন্ধানী, কোন প্রলোভনেই তিনি কখনও স্বধর্মচ্যুত হননি। সেইখানেই তাঁর গৌরবময় কৃতিত্ব।

অন্যদিকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সেই ঔপন্যাসিক—জীবন বিশ্লেষণে যিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অধিকারী। মনায়নের উগ্রতাও যেমন তাঁর নেই, তেমনি নেই ভাবাবেগের প্রাবল্য; অনুভূতিও তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত। দৈব ও পুরুষাকারের দ্বৈত লীলায় যে জীবননাট্য—তারই রূপকার তিনি। সেই রূপ সৃষ্টি করতে বসে তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভা আবেগের দোলায় দুলে জীবনজিজ্ঞাসার হাজার জটিলতা উন্মোচিত করেছে। ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে একই সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর এক কথাশিল্পী যিনি বাংলা উপন্যাসের পরিধিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে, তাঁর নাম—সুবোধ ঘোষ; ভিন্নধর্মী গদ্যে 'ভারত প্রেম কথা' লিখে যিনি অমরত্বের আসনে হয়েছেন অধিষ্ঠিত।

বহুবৃত্তির অভিজ্ঞতা নিয়ে বহুদর্শী এই লেখক যখন লেখনী ধারণ করে প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেন, তখন তার পটভূমি রচনা করেছিল বিয়াল্লিশের উত্তালকাল আর তেতাল্লিশের মন্বন্তর। এই সময়ে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস সমকালীন প্রগতিশীল সংস্কৃতিমূলক গোষ্ঠীর বিতর্কের বিন্দু হয়ে পড়ে, ফলে সেই সৃষ্টি সার্থক সম্বর্ধনা পায়নি। মানবপ্রেমিক, দেশপ্রেমী এই শিল্পীর প্রতিষ্ঠার পথ হয়েছিল কণ্টকিত। সমাজ-সচেতন এই শিল্পীর প্রতিভা সব বাধা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত যে প্রকাশিত হয়েছিল—সেই সত্যই স্মরণীয়।

প্রধানত নিম্ন মধ্যবিত্ত ও প্রায় বিত্তহীন মানুষের জীবনালেখ্য চিত্রণে যিনি বাস্তববাদিতার পরিচয় দিয়ে বাংলা উপন্যাসের অঙ্গনে নিজেকে সহজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, তিনি কথাকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে না, কেননা তাঁর দৃষ্টি শুধুমাত্র নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনেই আবদ্ধ থাকেনি, তা প্রসারিত হয়েছিল প্রকৃতি জগতের দিকেও। মানুষকে প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন করে তিনি যেমন দেখেননি, তেমনি প্রকৃতিকেও দেখেননি স্বতন্ত্রভাবে। তাই তাঁর সৃষ্ট নরনারী নিসর্গ-বিচ্ছিন্ন নয়। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পরিচিত প্রকৃতি-

জগতের সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ ছিল সুগভীর, তাই তার মধ্যে সৌন্দর্য সন্ধানে তিনি ছিলেন উৎসাহী। ফলে ঐ কথাশিল্পীকে একই সঙ্গে সমাজ-সচেতন ও নিসর্গ-সচেতন কথাশিল্পী বলাই সঙ্গত। এই সঙ্গে আরো যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ বাঞ্ছনীয় তা হল, বাস্তবদৃষ্টি ছাড়িয়ে তাঁর অন্তর্লোকে উত্তরণ। তিনি নিজে অন্তর্মুখীন শিল্পী বলেই তাঁর লেখাতেও এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

আধুনিক কালের সাহিত্যরথী রূপে যাঁদের উপস্থিতি বাংলা উপন্যাসের সংশয় ও অতৃপ্তির অবসান ঘটিয়ে প্রজ্ঞার সহায়তায় বৈদগ্ধ ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দান করল ও যাঁরা মানবমুক্তির প্রতীক রূপে দেখা দিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের আসরে তিনি মার্জিত জীবনচর্চার অধিকারী। প্রাজ্ঞ-পুরুষ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অপরিসীম সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে মানব মনের গভীরে প্রবেশের প্রবল শক্তি নিয়ে। এই প্রবেশাধিকারে তিনি প্রত্যয়ী প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্যের, বিশেষভাবে স্বদেশের ও বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগসাধনের ফলে। আর তাঁর অন্যতম সহায় হয়েছিল তাঁর ঐশ্বর্যময়ী বেগবতী ভাষা—যা তাঁর অনন্য সম্পদ। ঈপ্সিত-ভূমি ভারতের কথাকার রূপে তিনি ঘোষণা করেছিলেন :

"আমার যদি কোনো দল থাকে সে আমার স্বদেশ, আমার যদি কোনো রাজনীতি থাকে সে আমার ভারতবর্ষ এবং মানবতা; আমার যদি কোনো কর্তব্য থাকে তাহলে তা এদের জন্যই নিবেদিত।"—সুতরাং এমন কথাশিল্পীর সাহিত্যে শুভবুদ্ধির সহায়তার মানবমুক্তির ভাবনাই হয়েছে বিমুক্ত।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁরা সৃষ্টির জগতে প্রবেশ করে মহাকালের ভাণ্ডারে নিজেদের সঞ্চয় রেখে যেতে পেরেছেন তাঁদের অনেকেই উল্লেখ্য। এঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র—একটি বিশেষ নাম।

সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণকে খোঁজার আর সামান্যের মধ্যে বৃহতের স্পন্দন অনুভব করার প্রত্যাশায় লেখনী চালনা করেছিলেন—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের রূপকার রূপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা পেয়েছিলাম শিবনাথ শাস্ত্রীকে, আর বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা পেলাম নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে—যদিও এই দুই স্রষ্টা'র সৃষ্টির প্রতিভা যেমন স্বতন্ত্র, দুটির পার্থক্যও তেমনি স্পষ্ট। বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের অনন্য রূপকার হলেও তিনি মানবচরিত্রের জটিলতার বিশ্লেষণে ছিলেন আগ্রহী। এ ব্যাপারে তাঁকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী বললে অত্যুক্তি হয় না। নিরলংকার স্বল্প ভাষণই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর সহজাত বস্তুনিষ্ঠা নিয়েই জীবন সমস্যার মর্মমূলে পৌঁছতে উন্মুখ। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেছেন :

"সাধারণ মানুষ বেদনায় মূক। শিল্পী বেদনায় মুখর। সে তার একার বেদনা নয়। তাঁর কণ্ঠধ্বনি হাজার হাজার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি।"

সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের গভীরতর বেদনা প্রকাশ করতে, মানুষের সঙ্গে

মানুষের সম্পর্কসূত্র চিত্রিত করাতেই যাঁর প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল, তিনি প্রায় নিঃশব্দেই সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে প্রায় নিঃশব্দেই প্রস্থান করেছিলেন। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করার তা হল—যশোলিপ্সার বশবর্তী হয়ে তিনি কখনও অচেনা অপরিচিত জগতের চিত্রাঙ্কন করতে বসে স্বধর্মচ্যুত হননি।

জীবন-শিল্পী সন্তোষ ঘোষ সাম্প্রতিককালের বাংলা উপন্যাসে বিশ্লেষণ ও মনন, অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি জীবন অন্বেষায় ছিলেন সদা অতৃপ্ত। এই নগর শিল্পীর সাহিত্যে গ্রামীন জীবন ছিল সম্পূর্ণতই অনুপস্থিত ; কেননা কলকাতা তাঁর আজন্ম প্রিয়, 'আকৈশোর প্রেয়সী' বলাই সঙ্গত। ষোল বছর বয়স থেকে কলকাতা বাসের মাধ্যমেই তাঁর জীবনের কৈশোর পর্বের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। তাই তিনি তাঁর উপন্যাসে কল্লোলিনী কলকাতার বিচিত্র-জটিল জীবনের রূপায়নে ছিলেন অতি আগ্রহী। গল্পে বা প্লটে অনাগ্রহী এই উপন্যাসিকের বক্তব্য প্রায়সই জীবনকেন্দ্রিক বা বলা চলে অনেকখানি পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক।

ইতিহাসের কোন্ সন্ধিকালে উপস্থিত হয়েছিলেন এই শিল্পী আরো অনেক আধুনিক কথাশিল্প স্রষ্টার সঙ্গে? বলা বাহুল্য, সেই কাল প্রধানত বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবনে ও সমাজে আগত অতি দ্রুত পরিবর্তনের কাল ; যখন আগ্রাসী জাপানীদের আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিনাশ, আগস্ট আন্দোলন, মেদিনীপুরের বন্যা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের আগমন—বাঙ্গালীর জীবনকে রুধিরাক্ত করে তুলেছে, সমাজকে করেছে সমস্যা-সঙ্কুল। এই প্রেক্ষাপটেই লেখনী চালনা করলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নবেন্দু ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ আর সমরেশ বসুর মত প্রতিভাবান সাহিত্যিকবৃন্দ। তাই সেই সময়কার তরুণ শিল্পীর দল দেখেছিলেন প্রাণ রাখতে আত্মার অবমাননা, মূল্যবোধ বিকিয়ে দেওয়ার বিপর্যয়, ব্যক্তিগত শুচিতা ও সম্প্রীতির শিথিলতা এবং পরিবারগত বন্ধনের সমূহ সর্বনাশ—এক কথায় মনুষ্যত্বের বিপুল বিনষ্টি। এই সব কিছুরই প্রকাশ ঘটেছিল পূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়। তাই কলকাতাবাসীদের, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ইজ্জতের আর ইমানের মূল্য মেটাতে হয়েছিল বুকের রক্তে। ইতিহাসের এই অবক্ষয়িত অধ্যায়ই হয়েছিল এই সব সাহিত্যিকদের শিল্পসৃষ্টির উপকরণ। এইসব ঔপন্যাসিক জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্যের সন্ধান করতে বসে হলেন একদিকে নির্মোহ ও নির্মম, অন্যদিকে তাঁদের ভাষা হল তীর্যক ও জটিল। আত্মবিশ্লেষণে তাঁরা হলেন অকুণ্ঠ ও নিরাসক্ত। তাই তাঁদের সৃষ্টিতে চিত্রিত হল বিচ্ছিন্নতা, বিষাদ আর নিঃসঙ্গতা। সন্তোষ ঘোষ—এই আত্মান্বেষণেই অঙ্গীকারবদ্ধ।

সন্তোষ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ননী ভৌমিক, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ ঔপন্যাসিকবৃন্দ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত বাস্তবোধের যে রূপান্বেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন—সমরেশ বসু ছিলেন তাঁদের সহযাত্রী। সহযাত্রী

হয়েও কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে নিজস্ব পথ চিহ্নিত করে পদচিহ্নের পদাবলী সৃষ্টিতে হয়েছেন সক্ষম। পরিণত মন ও নিরাসক্ত মানসিকতার অধিকারী সৎ কথাশিল্পী সমরেশ বসু নানা উপকরণের সহায়তায় ও গভীর মননের মাধ্যমে নিজের কালের যন্ত্রণাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, যেভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টির জগতে বিষয় বৈচিত্র্যের আয়োজন করেছেন, যেভাবে প্রকাশশৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—তার মূল্য ও তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

মনে রাখতে হবে, সমুজ্জ্বল সম্ভাবনার অধিকার নিয়েই সমরেশ বসু সাহিত্য জগতে উপস্থিত হন। এই সম্ভাবনা বিকাশের পথটি প্রশস্ত হয় যখন তাঁর সাহিত্য-রুচির সার্থক উন্মেষ ঘটে মায়ের মুখে শোনা ব্রতকথায় ও লোককাহিনীতে। এই সাহিত্য রুচি নিয়ে তিনি কৈশোরে ও যৌবনে বাংলা সাহিত্যের সফল স্রষ্টাদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ক্রমেই তাই পরিশীলিত হয়েছে তাঁর মন ও মনন। আরো স্মরণে রাখতে হবে, যে সময়ে সমরেশ বসু সৃজনের কাজে প্রথম ব্রতী হলেন, সেই সময় বাংলা কথাসাহিত্যের আকাশটি অনেক প্রতিভার আলোকে ছিল উজ্জ্বল। তাই বিংশ শতাব্দীর সেই চল্লিশের দশকে নিজের অধিকারটুকু অর্জন করা ছিল সুকঠিন। তবুও তা যে সম্ভব হয়েছিল—তা জানতেই আমাদের যেতে হবে সেই সময়কার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের প্রাসঙ্গিক আলোচনায়।

বিশ শতকের চল্লিশের দশক ছিল বড় কঠিন কাল। বিশ্ব ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে সেই সময়কাল ছিল সমস্যায় সঙ্কটাপন্ন। দ্বিতীয় বিশ্বসমর সমূহ সর্বনাশের হেতু হয়ে উঠেছিল। ফ্যাসিবাদের পরাভব ঘটলেও পৃথিবী তখন দারুণভাবে রুধিরাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। এই একই সময়ে বিশ্বের অন্যান্য পরাধীন দেশের সঙ্গে ভারতেও দেখা দিয়েছিল পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনরোষ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল সক্রিয়তা। আন্দোলিত ও আবর্তিত এই কালের মধ্যে পড়ে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রও রাজনীতিমুক্ত থাকেনি। সংস্কৃতির গণভিত্তির রূপটি এই সময়েই সুস্পষ্টতা পায়। লক্ষ্য করার মত, সেই সংকটকালেও বজায় থাকে প্রগতিপন্থীদের সৃজনশীলতা ; ফলে চল্লিশের দশক এক নতুন সৃষ্টির কাল রূপেই সুচিহ্নিত। এই পটভূমিতেই একই সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন অনেক বুদ্ধিজীবী ও কথাশিল্পী। এঁদের অনেকেই ছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিষ্ঠাবান সৈনিক ও সক্রিয় সদস্য। সাহিত্যিক সমরেশ বসু নিজেও এই আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"...কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই আমার চার পাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে। আমার নিজের দারিদ্র্য, দুঃখী মানুষের সম্পর্কে এক আত্মিক চেতনা গড়ে তোলে।"

বলতে দ্বিধা নেই, কমিউনিস্ট পার্টির কল্যাণেই তিনি যেমন একদিকে বহু

বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীর সংস্পর্শে এসে নতুন চিন্তা ও দৃষ্টির দ্বারা জগৎকে দেখতে শিখেছেন, তেমনি নতুন চেতনার দ্বারা জীবনকে উপলব্ধি করার শক্তিকে প্রসারিত করতে পেরেছেন। এই সুবাদেই তিনি পেয়েছিলেন সমভাবনায় ভাবিত অগ্রজ-প্রতি শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উষ্ণ সান্নিধ্য ও প্রশ্রয়।

সাহিত্যিক সমরেশ বসুর স্বীকৃতি থেকেই এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইতিহাসের এই আবর্তসঙ্কুল সংকটকালে মার্কসবাদের মাধ্যমেই তিনি সব দ্বিধা কাটিয়ে প্রত্যয়ের ভূমিটি খুঁজে পেয়েছিলেন। তার ফলে জীবন ও শিল্প সম্পর্কে এক সুস্থির সংকল্পে পেঁছিতে তাঁকে কোন অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়নি; বরং সামনে প্রসারিত চলার পথটি হয়েছে আরো প্রশস্ত; ব্যক্তিসম্ভাবনার দ্বারটি হয়েছে উন্মুক্ত। এই প্রশস্ত পথটিতে হাঁটতে গিয়েই তিনি ক্রমে লাভ করেন বাস্তব দৃষ্টি ও সংগ্রামী জীবনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। এই বিশেষ দৃষ্টি, জীবনকে জানার অসীম আগ্রহ, ঝুঁকি নেওয়ার অপরিসীম ক্ষমতা ও বিচিত্র বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালের অন্যতম সফল কথাশিল্পীকে স্বাতন্ত্র্য লাভে সহায়তা করে।

যে পথে স্রষ্টা-শিল্পী সমরেশ বসু যাত্রা শুরু করেছিলেন সে পথ ক্রমেই উপলবন্ধুর হয়ে ওঠে; বিশেষভাবে অগ্রসর হওয়ার আদর্শ হিসেবে যে বিশ্বাসে তিনি স্থিত ছিলেন—সেই বিশ্বাসই হয়ে পড়ল সংশয়াচ্ছন্ন। মার্কসবাদে বিশ্বাস না হারালেও, মার্কসবাদের প্রয়োগগত ভুলত্রুটিতে তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন. তাই বলে সমাজের বাস্তবভূমিতে রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা কখনই তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েনি। তাঁর পরিণত বয়সের সৃষ্টিতে আমরা এই সত্যেরই সন্ধান পাই। তবে তাঁর শেষ অসমাপ্ত উপন্যাসে তিনি বহুদিনের প্রস্তুতি শেষে, সমস্ত মতাদর্শগত দোলাচলতা কাটিয়ে এবং 'আমাদের বাস্তবতার সব প্রতিরোধ ভেঙ্গে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার এক মহাকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন।' দুঃখ এই, এই সৎ শিল্পী তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা প্রসূত, সম্ভবত, শেষ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফিরে দেখা' অসম্পূর্ণ রেখেই চির বিদায় নিলেন।

॥ ৩ ॥

আঠারোশো পঁয়ষট্টি থেকে উনিশশো নব্বই এই একশো পঁচিশ বছরে প্রসারিত কালের প্রেক্ষাপটে আমরা উপলবন্ধুর পথের যাত্রী বাংলা উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় যে পরিচয়টি প্রকাশিত হতে দেখেছি. সেই সুবিস্তৃত পটভূমিতে রেখেই উনচল্লিশজন প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক এমন চল্লিশজন ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট সম্ভারের মূল্যায়ন করেছেন, যাঁরা নিজের কালের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। এই গ্রন্থে আমরা সেই রকম প্রবন্ধ সংকলন করেছি, যেখানে উপযুক্ত বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যক্তি-ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য হয়েছে আলোচিত, তেমনি অন্যদিকে বাংলা উপন্যাস-ধারায় সেই ঔপন্যাসিকদের অবদান হয়েছে মূল্যায়িত। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিকেরা আঙ্গিক-আলোচনায় সচেষ্ট থেকে প্রবন্ধগুলিকে করে তুলেছেন আরো

মূল্যবান ও আরো তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিষয়গুলি স্মরণে রেখেই প্রবন্ধগুলির বক্তব্য বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে সম্পাদক শুধু আগ্রহীই নন, অগ্রসরও হয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে জানাই কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত প্রবন্ধগুলির শিরোনাম নির্বাচন করেছেন সম্পাদক স্বয়ং সুতরাং এই শীর্ষনাম নির্ধারণে প্রাবন্ধিকদের কোন দায়িত্ব নেই, তবে প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণভাবেই প্রাবন্ধিকদের—এ ব্যাপারে সম্পাদক সম্পূর্ণই দায়িত্বমুক্ত। আর সেই সঙ্গে একথাও বলে রাখি যে ভূমিকায় সম্পাদক যে দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষায় দায় প্রাবন্ধিকদের নেই। তাঁরা তাঁদের নিজের নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গিতেই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

১. বাংলা উপন্যাসালোচনার সূচনাতেই আছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : একাল সেকাল অনেককাল' প্রবন্ধে অতীতের বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সৃষ্টিকে আধুনিক কালের প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর একটি বিশেষ মন্তব্য : 'মানবজীবন ও ভাগ্যের এমন সব জায়গায় তিনি হাত দিতে পেরেছিলেন যার আয়ু দীর্ঘ। বৈচিত্র্যের মধ্যে এক দীর্ঘায়ু সত্যকে খোজাই তাঁর ঔপন্যাসিক দায়িত্ব। জীবনানুসন্ধানী এই শিল্পী উল্লিখিত দায়িত্ব পালন করতে বসে 'বিশ্বের আকাশে নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন, কারুর হ্যাট কোট ধার করেননি।'

২. প্রত্যক্ষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ইংবাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, সুপণ্ডিত ও আই. সি. এস. রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্য সেবায় ব্রতী হন। প্রাবন্ধিক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রমেশচন্দ্র দত্ত : বঙ্কিমানুসারী হয়েও স্বতন্ত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির পাশাপাশি রমেশচন্দ্রের সৃষ্টিকে রেখে মন্তব্য করেছেন : 'অসাধারণ কল্পনাশক্তি' সুদূর বিস্তৃত ছিল না বলেই তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর অধিকতর নির্ভর করেছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই রোমান্সের রূপ পরিগ্রহ করেছে কিন্তু রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকৃত অর্থেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে এবং এই দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি অভাবকে তিনি কেবলমাত্র পূরণ করেছেন তাই নয়, ঐতিহাসিক তথ্যের সমবায়ে তিনি একটি ফাঁক ভরাট করে দিয়েছেন।'

৩. সাহিত্য সৃষ্টির সহজাত প্রতিভা নিয়ে বঙ্কিমবৃত্তের মধ্যেই উপস্থিত হয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁর 'শিবনাথ শাস্ত্রী : শিল্পিত গার্হস্থ্য জীবন' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, সাহিত্য সৃষ্টির সহজাত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও, ঔপন্যাসিক সত্তা অপেক্ষা শিবনাথের ব্রাহ্মধর্মের সত্তা প্রাধান্য পাওয়ায় ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়েছে ব্যাহত।

৪. সমাজ ও ধর্ম-সচেতন সাহিত্যিক শিবনাথের সমবয়স্ক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন—মুসলমান সমাজের এক প্রতিভাধর কথাশিল্পী। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—'বিষাদ সিন্ধু'। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে তাঁর 'মীর মশাররফ হোসেন: মৌখিক মহাকাব্যের অনুসৃতি' প্রবন্ধে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা অতীত আলোচনাবলীতে ছিল প্রায় অনুল্লেখ্য। তিনি দেখিয়েছেন যে 'বিষাদ সিন্ধু' পরিধিতে ও প্রকৃতিতে প্রায় মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য অর্জনে সমর্থ হয়েছে; যদিও এটি মহাকাব্য নয়। তাই তিনি এটিকে 'মৌখিক মহাকাব্যের সার্থক অনুসৃতি' বলে মন্তব্য করেছেন।

৫. বঙ্কিম সমসাময়িক হয়েও বঙ্কিম প্রভাবিত না হয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে ধূমকেতুর মত উপস্থিত হয়েছিলেন কথাশিল্পী তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: সমকালীন সমাজ-জীবনের রূপকার' প্রবন্ধে এই মন্তব্য করে লিখেছেন: 'প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের অতি রোমান্স-ধর্মিতার পথ পরিহার করে এই কথাশিল্পী নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে পথ তৈরী করে বাঙলা উপন্যাসের একটি নতুন ধারার সূচনা করলেন।' এ সত্য স্মরণে রেখেও প্রাবন্ধিক শেষ মন্তব্য করেছেন: 'তারকনাথ যত বড়ো গল্প লেখক ছিলেন, তত বড়ো ঔপন্যাসিক ছিলেন না।'

৬. ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথমদিকে আকর্ষণ ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি। এই সূত্র ধরেই তাঁর 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরহ মিলনের ছবি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—'বেণের মেয়ে'। এই উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: 'বাঙালি এখন কেবল একেলে গণিকাতন্ত্রের উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন?' এখানে যে অভিযোগের সুর তারই সঙ্গে উপন্যাস সম্পর্কে আরো প্রশ্ন তুলেছেন: 'চুটকিই কি আমাদের যথাসর্বস্ব হইবে?' যেন এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতেই তিনি রচনা করেছিলেন 'বেণের মেয়ে' যেখানে তিনি বঙ্কিমী রোমান্সকে গ্রহণ করলেও 'সেই রোমান্সে চাপা মুগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মননের দীপ্তি।' 'বাস্তবতাকে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন এখানে।' এই বিশ্লেষণ আমরা পাই ডঃ বিজিত দত্ত রচিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী' শীর্ষক প্রবন্ধে। এই সূত্রেই প্রাবন্ধিক আমাদের জানিয়েছেন যে ঔপন্যাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উপন্যাসে 'কথকে'র ভূমিকা গ্রহণ করে এক নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছেন। তাই ডঃ দত্ত একটি প্রণিধান যোগ্য মন্তব্য করেছেন: '...বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহারে অভিজাত শিল্পীর নৈপুণ্য। হরপ্রসাদও শিল্পী, কিন্তু তিনি ব্রতকথার শিল্পী।'

৭. বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে সোনালী কলম হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ন' দিদি স্বর্ণকুমারী। একদিকে পিতা ও অগ্রজদের অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐতিহাসিক ও সামাজিক

উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন ও সাফল্য লাভ করেন। ডঃ বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, 'স্বর্ণকুমারী দেবী ঃ সমাজ সচেতনতায় প্রথমা' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন ঃ'…বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের আদর্শে তিনি উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস বা ঘটনা সংস্থাপন করলেও হয়ত আপন অজ্ঞাতসারেই তাঁর মন একটি নিজস্ব রীতি উদ্ভাবনের পথ খুঁজছিল।' অনভিজ্ঞতা ও মাত্রাবোধের অভাবে পুরো সাফল্য না পেলেও তিনি 'মধ্যযুগের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সমকালীন যুগধর্মকে এমন অনায়াসে মিলিয়েছিলেন' যে কাহিনীর রস পরিণতিতে পাঠকের মনে নবজাগ্রত স্বদেশী প্রেরণার মহান রূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তিনি ক্রমেই একটি স্ব-নির্বাচিত রীতি গ্রহণে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ যেটি, সেটি হল চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে লেখিকার আগ্রহ। বস্তুজগতের ঘনঘটার পরিবর্তে ব্যক্তি অনুভূতি প্রকাশে আগ্রহী হয়ে স্বর্ণকুমারী আগামী দিনের পথটিরই যেন ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৮. রবীন্দ্র-উপন্যাস সংখ্যায় বিপুল না হলেও বৈচিত্র্যে ও গভীরতায় প্রায় অনন্য। সেই নানাধর্মী উপন্যাসবলীর মধ্যে একটি দিককে নির্বাচন করে নিয়েছেন অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জননী ও প্রিয়া—একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে প্রথমেই 'চোখের বালি' উপন্যাসের শুরুতেই উল্লেখিত 'মায়ের ঈর্ষা'র প্রসঙ্গটি তুলেছেন—যে 'চোখের বালি' উপন্যাসেই 'সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতির সূচনা। প্রাবন্ধিক বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-উপন্যাসাবলীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে এগুলির বৈশিষ্ট্যাবলী চিহ্নিত করে মন্তব্য করেছেন ঃ 'গোরা, যোগাযোগ ঘরেবাইরে, বা চার অধ্যায়—এর মতো প্রধান উপন্যাসগুলিতে 'মা'-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে এবং মায়ের এই অস্তিত্ব ক্রমশই রূপান্তরিত হয়ে ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। আর একই সঙ্গে সবিস্ময়ে দেখি—তাঁর নায়িকারা কেউই নন মা।' এরপর প্রাবন্ধিক আরো বলেছেন—এই প্রবন্ধে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য কালানুক্রমিক-ভাবে উপন্যাসগুলিকে বিন্যস্ত করে সেখানে জননীর ভূমিকা ও নায়িকার মধ্যে মাতৃসত্তার অস্তিত্ব ইত্যাদি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। পরিশেষে তিনি সেই সত্যের সন্ধান করেছেন যা রবীন্দ্রমানসে মাতৃচেতনার উৎস।

৯. উপন্যাস সাহিত্যে সদাপ্রিয় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ডঃ শিবেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দরদী জীবনশিল্পী' প্রবন্ধে বলেছেন যে অসাধারণ মৌলিক প্রতিভা না থাকলে রবিকরোজ্জ্বল পটভূমিতে তাঁর প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব হত না, এমন কি জনপ্রিয়তাতে প্রায় সবাইকে অতিক্রম করাও সম্ভব হত না। প্রাসঙ্গিকভাবে ডঃ চট্টোপাধ্যায় একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন ঃ '…সার্বজনীন কোমলবৃত্তির আলোকেই শরৎ সাহিত্য বিচার্য এবং সেখানেই তিনি পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত।'

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনচিত্র অঙ্কনে তাঁর ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রয়োগ করেছেন। প্রাবন্ধিক চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: 'বহুযুগ ধরে সামাজিক বিষমতা, ক্ষমতা মদমত্তের হাতে অসহায় মানুষের নিপীড়ন, তথাকথিত সামাজিক সতীত্ববোধের ধারণার কাছে প্রকৃত নারীত্বের মূল্যহীনতার জন্য ক্ষোভ ও মানবতার সত্য স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ঘনিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।' অথচ একদল সমালোচক যখন শরৎচন্দ্রীয় রচনাকে রবীন্দ্রনাথের রচনার তরলীকৃত রূপ বলে ব্যঙ্গ করেন, তখন ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাকে 'অশ্রদ্ধেয়' বলেই উপেক্ষা করেন।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালী সুলভ আবেগপ্রিয়তার প্রসঙ্গ এনেছেন, এই সঙ্গে তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে বসে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গটি তুলেছেন, যা ছিল শরৎ উপন্যাসগুলির মূল্যবান উপকরণ। তবে শেষ বিচারে শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী অপেক্ষা আদর্শবাদী রূপেই বেশি চিহ্নিত হয়েছিলেন। এমনি নানা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে এক অপরাজেয় শিল্পীরূপেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১০. প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যখন পৃথিবীর বুকে নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয়, তখনই এসেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আপনার প্রতিভার আলোকজ্জ্বল প্রদীপ নিয়ে। বাংলা সাহিত্যে তখন শরৎচন্দ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠিত। অনুজ নরেশচন্দ্র তাঁকে অগ্রজের সম্মান দিলেন। কিন্তু দুজনের দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। হৃদয়াবেগের পরিবর্তে বাস্তবজীবনের বিন্যাস রচনায় ব্রতী নরেশচন্দ্র কোনভাবেই ভাববাদী শরৎচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন না—এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ কান্তি গুপ্ত তাঁর 'নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত: সমাজ সংলগ্নতাই মুখ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে নরেশচন্দ্রের যে দুস্তর ব্যবধান সে কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে সমকালীন সংঘাত ও সংকট-সচেতন নরেশচন্দ্রের কাছে সাহিত্য সৃষ্টি রোমান্টিক বিলাসমাত্র ছিল না; তাঁর ছিল পুরোনো ধ্যানধারণার স্বাধীন গণ্ডী অতিক্রম করে অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধির অবিচ্ছিন্ন অনুশীলন। লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রায় বিস্মৃত নরেশচন্দ্র এখনও বুদ্ধদেব বসু কথিত criminal morbidity-র লেখক রূপেই চিহ্নিত হয়ে আছেন। অথচ একথা সত্য যে তিনি শুধু এই ব্যাখ্যার মধ্যে আবদ্ধ থাকার প্রতিভা নিয়ে জন্মাননি, বরং আইনজীবী ও শিক্ষাব্রতী নরেশচন্দ্র জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে সম্পদ করেই সাহিত্য সৃষ্টিতে ছিলেন অতি নিষ্ঠ। আলোচ্য প্রবন্ধে ডঃ গুপ্ত বিস্তৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্রের একটি দুর্বলতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঔপন্যাসিক যতখানি উপাদান সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন, রসোৎকর্ষ সৃষ্টিতে ততখানি মনোযোগী ছিলেন না। এমনকি আঙ্গিক সম্পর্কেও তিনি ততখানি সচেতন ছিলেন না, ফলে রসোত্তীর্ণ উপন্যাস রচনায় যা অনায়াসে অর্জিত হতে পারত, তা অনধিকৃতই রয়ে গেল। তবুও সৎ ও

অকৃত্রিম পাঠকের কাছে নরেশচন্দ্র সমাজ অভিমুখিতা ও সমাজ সংলগ্নতার সফল প্রয়াসী রূপে চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

১১. ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্রের সঙ্গে একই সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহিলা ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী আর এক বছর পরেই জন্মেছিলেন আর এক মহিলা ঔপন্যাসিক নিরুপমা দেবী। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসই অনুরূপা দেবীকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে; এই এক পত্রিকাতেই 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিতি পান নিরুপমা দেবী।

দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এঁরা কিন্তু সমাজ-সচেতনতা ও নীতিবোধের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী ছিলেন—এই মত প্রকাশ করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ অলোকা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অনুরূপা ও নিরুপমা দেবী ঃ সনাতন সমাজের প্রতিচ্ছবি' প্রবন্ধে। এখানে তিনি বলেছেন ঃ 'লেখিকাদ্বয় পারিবারিক দাম্পত্য সম্পর্কের নিষ্ঠা, একান্নবর্তী পরিবারের ঐক্যবন্ধন, হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, নৈতিক চেতনার মূলে বিকাশকে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন।' নারীরা সাধারণত স্বভাবে রক্ষণশীল ও একনিষ্ঠ, তাই এঁদের উপন্যাসে পাশ্চাত্যপন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় সনাতন আদর্শের মূল্যবোধগুলি মহিমাময় করে তোলার প্রচেষ্টাই প্রবল। উনিশ শতকী মনীষার উজ্জ্বলাধার ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র', 'বাগদত্তা', 'মা' প্রভৃতি উপন্যাস এই প্রচেষ্টার প্রকৃত সাক্ষ্য বহন করেছে। কিন্তু ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে অনুরূপা দেবী অনেক সময়ই শিল্পসৃষ্টির চেয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির মহিমা প্রচারে ছিলেন বেশী প্রয়াসী। শুধু তাই নয়, হিন্দু নারীর জীবনাদর্শের মহিমাময় রূপায়নে তিনি আগ্রহী; ফলে একধরণের প্রচারধর্মিতা ও উদ্দেশ্যপ্রবণতা তাঁর উপন্যাসাবলীতে প্রাপ্য সাফল্য এনে দেয়নি। বলা বাহুল্য, নিরুপমা দেবীর উপন্যাসেও সনাতন হিন্দুসমাজ ও পরিবারের আনন্দবেদনার রূপ রূপায়িত। হিন্দুঘরের বাল্যবিধবা এই লেখিকা কোথাও সমাজ-নিষিদ্ধ প্রণয় বা সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধকে তাঁর উপন্যাসে স্থান দেননি। দুই লেখিকার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও জীবন সম্পর্কে অনুরূপা দেবীর দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় নিরুপমা দেবীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেক সহজ; তা আদর্শ, উদ্দেশ্য বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা পিষ্ট হয়নি।

প্রাবন্ধিক ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সৃষ্টিশক্তির দিক দিয়ে অনুরূপা দেবী শ্রেষ্ঠ হলেও রচনাকুশলতা ও চিত্তবিশ্লেষণে নিরুপমা দেবীই পারেন প্রাধান্য দাবি করতে; যদিও দুজনের রচনাতেই যেমন আছে রমণীয়তা তেমনি আছে সৌকুমার্য।

১২. ঐতিহাসিক হয়েও উপন্যাস সৃষ্টিতে যিনি তীব্র আগ্রহবোধ করেছিলেন, তিনি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মহেঞ্জোদাড়োর সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কর্তা। বলা চলে, তিনিই শুধুমাত্র একাধারে ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক।

ফলে একদিকে ইতিহাস অন্যদিকে মানব জীবন—এই দুয়ের বন্ধন সৃষ্টিতে তিনি হয়েছিলেন সফল, যদিও আঙ্গিক গঠনে সেই সাফল্য আসেনি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পাষাণের কথা'-কে আঙ্গিকের অসম্পূর্ণতার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস—'শশাঙ্ক'।

প্রবন্ধকার ডঃ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ একাধারে ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক' প্রবন্ধে শশাঙ্ক সম্পর্কে লিখেছেনঃ 'এই Historical fact-কে সামনে রেখে Historical Imagination'-এর সাহায্যে লেখা হল শশাঙ্ক উপন্যাসটি—যার 'প্লট' গঠন নিঃসন্দেহে দুর্বল। এই উপন্যাসের 'চরিত্রগুলি বর্তুলাকৃতি (round) হয়ে উঠতে পারেনি। শশাঙ্কের মানবিক বৃত্তিগুলিও অবিকশিত রয়ে গিয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ঐতিহাসিক রস' বলেছেন তা প্রবাহিত হতে পারত যদি শশাঙ্কের পতনের জন্য কেবল তার ভাগ্যকেই দায়ী করা না হত।' এরপর তিনি 'ধর্মপাল' উপন্যাসটি ইংরাজী 'Chronical novel' বলতে যা বোঝায় সেই রীতিতে রচনা করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন যে শশাঙ্কের তুলনায় এই উপন্যাসটি পরিণত। অথচ এর পরের উপন্যাস 'করুণা'কে লেখক নিজেই 'ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা' বলেছেন, এখানে করুণাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করার উদ্দেশ্য থাকলেও তা সফল হয়নি। তবে তাঁর 'ময়ূখ' উপন্যাসটি স্বতন্ত্র গোত্রের। তবে এর পরের উপন্যাস 'অসীম' ঔপন্যাসিকের মতে—'সত্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস'। রাখালদাস তাঁর উপন্যাসের ধারায় 'অসীম' উপন্যাসের প্লটকে তুলনামূলক ভাবে নিটোল করেছেন। তবে এই উপন্যাসটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটেছে 'গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্নিগ্ধ কোমল রসধারা বর্ষণে'—এ মত প্রবন্ধকারের। এরপর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় রাখালদাসের আগ্রহ ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। আজ ঔপন্যাসিক রাখালদাস প্রায় বিস্মৃত কথাকার।

১৩. আঠারোটি উপন্যাস রচনা করা সত্ত্বেও, জগদীশ গুপ্ত ছোট গল্প রচনায় যতটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, উপন্যাসে ততটা নয়। এই মন্তব্য করেছেন ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জগদীশ গুপ্তঃ আপোসে অনাগ্রহী স্রষ্টা' প্রবন্ধে। তিনি ছিলেন কোনরকম আপোষ মীমাংসায় অনাগ্রহী এক ব্যতিক্রমী শিল্পী।

ছোটগল্পকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করতে বসে জগদীশ গুপ্ত ছোট গল্পের 'সংহতি' ও 'নৈর্ব্যক্তিকতা'কে হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। এটি যেমন একটি ত্রুটি তেমনি আর একটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তাঁর কথাসাহিত্যে উত্তরাধিকার অস্বীকৃতির উদ্দেশ্যে প্রথাবিরোধী আঙ্গিক নির্বাচনে। এই ঔপন্যাসিক গড়ার চাইতে ভাঙ্গায় বেশী উৎসাহী বলে তাঁর পক্ষে দীর্ঘ মনঃসংযোগী হয়ে নিটোল বৃত্ত গঠন বা চরিত্র সৃষ্টি করা ছিল কঠিন—এই বিশ্লেষণী মন্তব্য প্রাবন্ধিকের। তবে এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন 'জগদীশ গুপ্তের বিশিষ্ট মানসিকতা, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী

এবং বস্তুধর্মী' রচনা রীতির জন্যই তাঁর সবক'টি সাহিত্য প্রকরণ আমাদের কাছে আকর্ষণীয়—উপন্যাসও'।

সাহিত্য সৃষ্টিতে 'শৌখীন মজদুরী' করার বা 'যৌনতা সৃষ্টির জন্যই যৌনতা সৃষ্টির' প্রলোভন পরিত্যাগ করে 'মানুষের অকৃত্রিম সত্তা' ও 'সভ্যতার প্রলেপ-বর্জিত চেহারাটি' রূপায়িত করার শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন। একদিকে পল্লীসমাজ কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় তিনি যেমন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি মানুষের কামপ্রবৃত্তি, বিবাহিত নারীপুরুষের যৌন সম্পর্ক, নারীর ন্যায্য অধিকার হরণে সামাজিক বিধির নির্মমতা সংক্রান্ত উপন্যাস রচনাতেও তিনি প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছেন। এই ঔপন্যাসিকের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা তাঁর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববোধ। আঙ্গিক প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে বসে প্রাবন্ধিক চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে জগদীশ গুপ্ত প্লট-নির্মাণে যত্নবান নন, আবার ভাষাভঙ্গীও ছিল নৈর্ব্যক্তিক—যা অনেকটা পরিবেশনধর্মী'। প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক বিচারে তিনি ছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যে এক প্রথাবিরোধী সৃষ্টিকর্তা।

১৪. অনুরোধে নয়, অনুপ্রেরণাতেও নয়—শুধুই মান বাঁচাতে গল্প লিখলেন সময়-সাহিত্য-সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক গ্রাম্য স্কুলমাস্টার; কিন্তু কি যেন পেলেন 'প্রবাসী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক—মুদ্রিত হল গল্প। প্রতিষ্ঠা পেলেন 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টা বিভূতিভূষণ।

'পথের পাঁচালী' বাংলাদেশের এক সেতুবন্ধ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর মত বাংলাদেশের বিচিত্র কর্মরত অঞ্চলবাসীর আনাগোনা এই পথের পাঁচালীকে ঘিরে।'

এতো শুধু বই নয়, এ যেন সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্র। এখানে অমোঘ অব্যর্থতায় সুর ওঠে যা হৃদয় থেকে উঠে হৃদয়েই গিয়ে পেঁছায়। এখানে অনুভবের প্রকাশ ঘটে সুপ্ত আলোর বিচ্ছুরণে। বিস্মিত হতে হয় যখন উপলব্ধি করি 'প্রহর-পরিবেশ-পরিজন' ছাপিয়ে এক পরিবর্তনের কালকে।

'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মর্মে ও মায়ায়' প্রবন্ধে এই বক্তব্যই উপস্থাপিত করে প্রাবন্ধিক ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন ঃ '...স্বীকারোক্তি যাঁর স্মৃতির পুনরাবৃত্তি দিয়ে, উক্তি তাঁর বল্লাই-বালাইয়ে কেন?' আর এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে তিনিই জানিয়েছেন, 'আসলে বল্লালী-বালাই পথের পাঁচালীর এক বিচিত্র চালচিত্র, আগত আম আঁটির ভেঁপুর অনাদি অতীত।' এরপর বিশ্লেষণের পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে প্রাবন্ধিক চট্টোপাধ্যায় আমাদের পেঁছে দিয়েছেন বিভূতি-ভূষণের সাহিত্যসাম্রাজ্যে, যেখানে আমরা পেয়েছি দয়ালু ইন্দির ঠাকরুণ থেকে শিশু অপুকে, পেয়েছি হরিহর সর্বজয়া দুর্গাকে, শুধু তারা কেন আরো অনেককে।

এই সাহিত্যসাম্রাজ্যে ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুতে এসেছে বল্লালী বালাইয়ের অবসান, দুর্গার মৃত্যুতে আম আঁটির ভেঁপুর। এরপরই আমরা পেয়েছি 'অপরাজিত'-এর সূচনা।

'পথের পাঁচালী' থেকে 'অপরাজিত', তারপর 'ইছামতী' 'মূলত অসংলগ্ন এবং চরিতার্থ লেখা তবু বাস্তব উপন্যাস যাকে আমরা novel of action বলি তার অনেকখানি ছায়া ঘটনায়-নাটকীয়তায়, সংলাপে-চরিত্রে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পথের পাঁচালী, আরণ্যক এত বস্তুহীন, স্বপ্নমূর্তিময়, নভোচারী যে এর শিথিলবদ্ধতা পাঠকের চোখে না পড়ে যাবে না।'—এ মন্তব্য করেছেন প্রাবন্ধিক চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিশিষ্ট আলোচনায়। এমনই নানান বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি যা এ গ্রন্থের সম্পদ।

১৫. বাংলা উপন্যাস ধারার মননপ্রধান ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যিনি উপন্যাস সৃষ্টিতে অগ্রসর হয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন—তিনি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নিঃসন্দেহে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত একটি নাম। জীবন থেকে গভীরতর ও সূক্ষ্মতর পাঠ গ্রহণ করে তিনি তাকে করে তুলেছিলেন রসসমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভার।

আত্মসচেতন ধূর্জটিপ্রসাদ তিনজন মনীষীর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন—প্রমথ চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথ—এই তথ্য উপস্থাপিত করে প্রবন্ধকার ডঃ সঞ্জীব ঘোষ তাঁর 'ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ঃ মননধর্মে উজ্জ্বল' প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে, ঔপন্যাসিক মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সমাজ-ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা করেছেন 'মার্কসীয় বীক্ষার জীবনদর্শনের কাঠামোয়।' ঔপন্যাসিক নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর জীবনের মার্কসীজমের প্রভাব তাঁর উপন্যাসেও সঞ্চারিত। তিনি নিজেকে মার্কসতত্ত্ববিদ (মার্কসোলজিস্ট) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, মার্কসবাদী রূপে নয়।

একালের বুদ্ধিজীবীদেব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণাকে সামগ্রিক জীবন তাৎপর্যের প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর উপন্যাসে তার প্রকাশ ঘটেছে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে। 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহনা'—এই তিনটি মাত্র উপন্যাস সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

মাত্র তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন বলেই কি তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায় ঔপন্যাসিক? এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ ঘোষ কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর পেয়েছেন। প্রথম কারণ, তাঁর নতুন আঙ্গিক ও ভাষারীতিতে রচিত উপন্যাসে পাঠকেরা স্বস্তি পাননি; দ্বিতীয় কারণ, ব্যবসার দিক থেকে এই উপন্যাসগুলি লাভজনক নয়; তৃতীয় কারণ, ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে স্বার্থান্বেষীরা মহান পাঠকবর্গকে সুকৌশলে সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালপ্রেক্ষায় আবার সেগুলি মূল্যায়িত হওয়া প্রয়োজন বলেই ডঃ ঘোষ মনে করেন।

১৬. সম্ভবত সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন কম। এ সম্পর্কে ডঃ সরোজ দত্ত তাঁর 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ঃ অভ্যস্ত পরিচিতির নেপথ্যে' প্রবন্ধে

অনুমান করেছেন যে, প্রথম দিকে উপন্যাস রচনায় এই শিল্পীর কিছুটা দ্বিধা ছিল, ছিল কিছুটা অনাগ্রহ। সেই দ্বিধা ও কিছুটা অনাগ্রহ অতিক্রম করে তিনি শেষ পর্যন্ত উপন্যাস লিখেছেন সাতাশটি—যা পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়নি।

তাঁর রচিত 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' শুধুমাত্র লেখকের নিজস্ব মতানুযায়ীই নয়, পাঠকবর্গের রায়েও শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে, 'উপন্যাসটির স্থান ও কালগত ব্যাপ্তি, সেই সঙ্গে পারিবারিক জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রণের মধ্য দিয়ে একটি দেশের প্রায় শতাব্দীব্যাপী জীবনযাত্রার প্রাণস্পন্দনকে ধরবার প্রয়াস, সেইসঙ্গে এক মহত্তর আদর্শে উত্তরণের চিত্র—এইসব মিলিয়েই উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্বের দাবি।'—এ মন্তব্য প্রাবন্ধিক ডঃ দত্তের। কিন্তু জনপ্রিয়তার বিচারে 'নীলাঙ্গুরীয়'ই বিশেষ উল্লেখ্য; যদিও এই সঙ্গেই তাঁর 'পঙ্ক পল্বল', 'নব সন্ন্যাস', 'ঊর্মি আহ্বান', 'ফেরারী ফিরে এল', 'সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে', 'নয়ান বৌ' প্রভৃতিও স্মরণযোগ্য। এই সব উপন্যাসে বৈচিত্র্যের যত রূপই দেখা যাক না, এগুলির শিল্পরূপে ও বক্তব্যে বিভূতিভূষণ অনুভূত এক মূল সত্যেরই সন্ধান মেলে।

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কেন লিখি' প্রবন্ধে বলেছিলেন—'বড় অপরূপ এই জীবন—ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া বিরাট এখানে ক্রমাগতই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। এই বলার আকুতি আমার স্বধর্ম।' এই স্বধর্ম থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি। প্রাবন্ধিক ডঃ দত্ত বিভূতিভূষণের বিভিন্নধর্মী বিশেষত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী। তিনি দেখিয়েছেন যে 'আমাদের জীবনে নানান বিপরীতধর্মী শক্তির টানে অশান্ত অস্তিত্বের পাশে নিজস্ব সত্যে বিভূতিভূষণের অবিচলিত থাকার শক্তি—যা তাঁর সত্যনিষ্ঠা—একটা সম্ভ্রম জাগায়।'

১৭. 'বাংলা উপন্যাসের রক্তাল্পতা নিরাময়ে' ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের আগমন ছিল জরুরী—এই মন্তব্য করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ সুরেশ মৈত্র তাঁর 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ উপন্যাসে ও উপকথায় অকৃত্রিম' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে ডঃ মৈত্র সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রায় অপরিচিত গিরিবালা দেবী পর্যন্ত অনেক ঔপন্যাসিকের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে এঁরা গ্রামভিত্তিক কাহিনী এনেছেন বটে, কেউ কেউ সফলও হয়েছেন কিন্তু তবুও প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এই অবস্থায় আসার প্রয়োজন ছিল শিল্পী তারাশঙ্করের, 'যিনি বসলে আর উঠবেন না।' প্রকৃতপক্ষে, তারাশঙ্করের অনন্য-মনস্কতা বাংলা সাহিত্যকে রক্তাল্পতা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

এযুগের সর্বাপেক্ষা অনন্যমনা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন বাস্তবক্ষেত্রে। তবে পথপ্রদর্শক রূপে শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি ছোট লেখা ভূমিকা নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রবন্ধকার। তারাশঙ্কর সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছেন বৈষ্ণবী ভাবরসের সাহিত্য নিয়ে, কেননা এটি তিনি কুড়িয়ে

নিয়েছেন চণ্ডীদাসের বীরভূম থেকে। তাঁর অভিজ্ঞতায় তাই দেশের মাটি, মানুষ ও আকাশ সমানভাবে ধরা পড়েছে।

তারাশঙ্কর যখন সাহিত্যসেবায় ব্রতী হলেন তখন প্রথম থেকেই বাস্তবের একেবারে মুখোমুখি হলেন। প্রকৃতপক্ষে, 'আকাড়া রাশীকৃত বাস্তব নিয়ে তিনি সারাজীবন খেলা করে গেলেন।' এমনিভাবেই ত্রিশের দশকে একে একে 'নীলকণ্ঠ', 'পাষাণপুরী', 'চৈতালী ঘূর্ণি' ও 'আগুন' প্রকাশ পেলে বাঙ্গালী পাঠক সমাজ বিস্মিত হলেন—'বিষয়ের অপরিমেয়তা ও লেখকের শক্তির বহুমুখীনতা দেখে।'

তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে কাম প্রসঙ্গ থাকলেও তা অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আসত; তাই তাঁর পাত্রপাত্রীরা ক্ষেতখামার থেকে ধুলো মাখা হাত পা নিয়েই উপস্থিত হয়েছে। ফলে তাঁর লেখায় মাটির গন্ধ, মাটির রঙে মাখামাখি। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক মৈত্র 'পাষাণ পুরী', 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'নীলকণ্ঠ' প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লেখ করে বলেছেন যে এই সব উপন্যাসে আছে খোলামেলা—বীরভূমের মাঠ নদী গাছ-গাছালির সঙ্গে তাঁর প্রাকৃতজ সম্পর্ক। আবার এই পর্বেই বীরভূম বহির্ভূত অঞ্চলের গল্পও বললেন। 'আগুন' মানভূমের গল্প। এ গল্পের নায়ক জমিদার নয়, কারখানার মালিক। এ নায়ক নব্যজীবনকে স্বীকৃতি দিয়ে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। 'আগুনে' তারাশঙ্কর এক স্বতন্ত্র সাহিত্য-রূপ তুলে ধরলেন।

এল 'ধাত্রীদেবতা' যেখানে রাঢ়ের ভূপ্রকৃতির চেহারা বাস্তব-নির্ভর। এখানে তিনি শিল্প অঞ্চলের গল্প বলার চেষ্টা করেননি। এখানে তাঁর গল্প গ্রাম জীবনের, ...জমিদার গৃহের নব্যশিক্ষিত তরুণের গল্প। তারাশঙ্কর তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিটি বুঝে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ মৈত্রের একটি মন্তব্য উল্লেখ্য: 'তারাশঙ্কর জমিদারীকে একটা ইনস্টিটিউশন' হিসাবে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসে অন্য কাউকে এমন দেখি না।' তাঁর রচিত 'কালিন্দী' অপসৃয়মান জমিদারতন্ত্রের গল্প; কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। কালিন্দীর বুকে জাগা নয়াচরে গড়ে উঠেছে কারখানা। গড়ে উঠল নতুন জীবন। আসলে তারাশঙ্কর সমাজ বিকাশের মূল ধারাটি জানতেন, তবে তাকে খুশি মনে মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি পথ বদলালেন বা পুরোণো পথেই সরে এলেন।

তারাশঙ্কর গ্রামীণ জীবন ভাল বোঝেন; কৃষি-ভিত্তিক সমাজ তাঁর মানসলোক দখল করে রাখে। 'ধাত্রীদেবতা'য় যে গল্প শুধু একটি পরিবারের, সেখানে 'গণদেবতা'য় এল পরিবার শুধু নয়, বহু গ্রামের গল্প। ফলে এই উপন্যাসে 'নায়ক কেন্দ্রিকতা' উঠে গেল। উপন্যাস হয়ে উঠল বহুতন্ত্র বিশিষ্ট (multilinear)।

এবার ক্রনিকাল-ধর্মিতা আরও ব্যাপক অর্থে সত্য হল। এই বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই রচিত হল 'পঞ্চগ্রাম'। 'পঞ্চগ্রাম'—'গণদেবতা'র আখ্যান ভাগকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। 'গণদেবতা'র মুখ্যত ছিল একটি গ্রামের গল্প, এখানে পাঁচটি। 'পঞ্চগ্রাম' নায়কহীন, নায়িকাও নেই। তবে তারা আভাসে আছে। তাহলেও তাঁর পরবর্তী উপন্যাসে আবার নায়ক ফিরে আসবে, প্রতিনায়কও আসবে।

উল্লিখিত দুটি উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে ঘুরেছে ফিরেছে। এরপরই এসেছে আর একটি উপন্যাস—'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। 'হাঁসুলী বাঁক শিল্পী তারাশংকরের নিজের হাতের সৃজিত নদী'—এ মন্তব্য প্রবন্ধকারের। হাঁসুলী বাঁকের ধারে কাহার পল্লী ও সদ্‌গোপ চাষীদের বাসভূমি। তাদেরই হাসি কান্না ভরা দৈনন্দিন জীবনের গল্প শুনিয়েছেন লেখক।

এরপর আরো উপন্যাস রচিত হয়েছে—এসেছে 'অরণ্যবহ্নি'—যা চূড়ান্ত বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত। তারাশংকরের পূর্বপুরুষেরা এই বিদ্রোহের সঙ্গে প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত জড়িত ছিলেন। বীরভূম, বাঁকুড়া, রাজমহল, সাঁওতাল পরগণার দুমকা দেওঘর জুড়ে এই হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। বহু লোকসংগীত, লোকচিত্র বা গল্প এই ঘটনা নিয়ে রচিত। সিধু কানু এই অঞ্চলের জাতীয় বীরের পর্যায়ে উঠে এসেছিল! তারাশংকর ভিন্ন আঙ্গিকে লৌকিক রীতিতে এক নতুন উপন্যাস রচনা করলেন। প্রবন্ধকার মন্তব্য করেছেন—'লোকসাহিত্যের উত্তরাধিকার নিয়ে তারাশংকর ভদ্র সাহিত্যে রচনার উদ্যোগ নিয়েছেন।'

তারাশংকর বারবার পথ পরিবর্তন করেছেন। 'সপ্তপদী' ও 'আরোগ্য নিকেতন' দুটি ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস। এখানে তারাশংকর ক্রনিকালধর্মী উপন্যাসের সীমান্ত পেরিয়ে এলেন। লিখলেন আরো উপন্যাস।

ডঃ মৈত্র প্রবন্ধের শেষে এসে মন্তব্য করেছেন : 'নিষ্ঠার অপর নাম তারাশংকর। যত মাটি আজীবন তিনি ছেনেছেন, তা স্তূপীকৃত করলে মাটির পাহাড় হয়ে যেত। পাহাড় তিনি করেননি। মাটি ছেনে অজস্র পুতুল তৈরি করেছেন। শিল্পীর হাতের পুতুলই শিশুর কাছে খেলনা, ভক্তের চোখে প্রতিমা, পাঠকের কাছে শিল্প উপঢৌকন। তিনি রাঢ়ের আদিম প্রকৃতির আধুনিক প্রতিভূ।'

১৮. মূলতঃ কবি জীবনানন্দ দাশ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও যে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তারই পরিচয় পাই ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী লিখিত—'জীবনানন্দ দাশ : সময়চেতনা ও অতিবাস্তবতা' প্রবন্ধে, যেখানে তিনি শুরুতেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে কবিসৃষ্ট উপন্যাসগুলিতে 'গল্পখোর পাঠকের কোনো তৃপ্তি নেই।' সাধারণতঃ 'প্রথাবাঁধা গল্পে ঘটনায় ঘটনায় যে আঁট বেঁধে থাকা কিংবা পরের সঙ্গে নিজের অথবা নিজের সঙ্গে নিজের জটিল সংঘাতে উপন্যাসের প্লট ব্যাপারটির ইমারতী নিয়মে যে গড়ে ওঠা'—তা একেবারেই নেই জীবনানন্দের উপন্যাসে। তাহলে কি পাওয়া যাবে জীবনানন্দের উপন্যাসে? এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে গিয়ে প্রাবন্ধিক ডঃ লাহিড়ী জানিয়েছেন :—"সৃষ্টি ও 'সময়' রহস্যে বিভোর হয়ে গেলে মানুষের অস্তিত্বের আবিষ্ট ভূমিকা হঠাৎই খুলে যায়। সেই ভূমিকা থেকে দেখতে পাওয়া যায়, অস্মিতায় নিগৃহীত ঐ একই মানুষের করুণ সংসারী ছবি। কেবল তখনই জীবনের অন্তর্মগ্ন সংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায় জীবনানন্দের উপন্যাসে।"

জীবনানন্দের উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা নেই, আছে ছবির পর ছবি। প্রত্যেকটি

পৃথক অথচ পাশাপাশি বসানো। তাই উপন্যাস রচনায় জীবনানন্দ যতটা স্থপতি, তার চেয়ে অনেক বেশি চিত্রী।

এই চিত্রধর্মিতার সূত্রেই প্রাবন্ধিক ডঃ লাহিড়ী জীবনানন্দের উপন্যাস আলোচনায় ইউরোপের ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রাংকন রীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এই সব শিল্পীর নেতৃত্বে ছিলেন ক্লোদ মোনে, সঙ্গে ছিলেন দেগা, মানে, রেনোয়ার প্রমুখ শিল্পীর দল, যাঁরা 'প্রকৃতির দৃশ্যকে বিষয়বস্তু করে আলোর খেলা আঁকার শিল্পী।' এরপর প্রবন্ধকার একের পর এক কিউবিজম, কিউবিজম থেকে অ্যাবস্ট্রাকট্ আর্ট এবং তা থেকে সুররিয়ালিজমের স্তর পর্যন্ত উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে,—'জীবনানন্দের উপন্যাস প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের আন্দোলন আলোচনার প্রয়োজন আছে।' কেননা ছবির জগতের এই ইম্প্রেসনিস্ট এবং পরবর্তী রীতি-প্রকৃতি ক্রমে সাহিত্য ভাবুকদের আকৃষ্ট করেছিল। আকৃষ্ট যে করেছিল তার প্রমাণ পাশ্চাত্যে যেমন মার্শেল প্রুস্ত, জেমস্ জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ্-এর রচনাবলী, আমাদের বাংলা সাহিত্যে তেমনি জীবনানন্দ, ধূর্জটিপ্রসাদ, গোপাল হালদার প্রমুখের উপন্যাসগুলি। তবে জীবনানন্দের উপন্যাস মূলত জীবনানন্দের কবিতারই সম্প্রসারিত রূপায়ণ। 'কবিতার মতোই তাঁর উপন্যাসের অন্তর্মগ্নতা, স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে দেখা ঘুমের ছবি। সময় ও ইতিহাসের অনিঃশেষ চেতনাপটে খণ্ডিত অস্তিত্বের যন্ত্রণা—প্রকাশ পেয়েছে জীবনানন্দের রচনায়'—এ মন্তব্য প্রবন্ধকারের। এই বৈশিষ্ট্যালোচনার আলোকেই প্রবন্ধকার ডঃ লাহিড়ী ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের সাতটি উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১৯. নৈর্ব্যক্তিক স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে যে ঔপন্যাসিক বাংলা উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন—তিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্র-স্রষ্টা রূপে তাঁর পরিচিতি তাঁর ঔপন্যাসিকের পরিচয়কে আচ্ছন্ন করেছে। এ মন্তব্য করেছেন ডঃ অরূপকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : রোমান্টিক অতীতচারিতায় মগ্ন' প্রবন্ধে।

ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিশেষভাবে যা লক্ষণীয় তা হল তাঁর সুদূর অতীতচারিতা—যে অতীত অনালোকিত স্বপ্নময় অতীত। তিনি সেই 'স্বপ্নময় অতীতকে সুললিত ভাষার মায়াজালে আবদ্ধ করে ইতিহাস এবং কল্পনার সংমিশ্রণে এক রোমান্টিক জগৎ তৈরী করেছেন।' তাঁর বেশীর ভাগ উপন্যাসই যেমন 'কালের মন্দিরা' 'গৌরমল্লার' 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', 'কুমার সম্ভবের কবি', তুঙ্গভদ্রার তীরে' প্রভৃতি অতীত পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত না হয়ে তিনি সুদূরচারী কল্পনার সাহায্যে নিজস্ব রীতিতে অতীতযুগের অজানা জীবনধারার রূপরেখা অংকনেই ছিলেন আগ্রহী। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক কল্পনার সুসম ও সার্থক প্রয়োগের মধ্যেই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যাবলী বিধৃত। লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি অতীতের মধ্যে যে স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, তারই মধ্যে জীবনের সত্যটি খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস করেছেন—এ মন্তব্য প্রাবন্ধিকের। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রবন্ধকার ডঃ ভট্টাচার্য

স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ঔপন্যাসিকের অতীতের প্রতি আন্তরিক মোহ থাকলেও তিনি রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করেন নি। এই ভাবেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা-রীতির বিশেষ ভঙ্গিটির মত তাঁর সাহিত্যও বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারাটি থেকে সর্বদাই এক নির্মোহ স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে চলেছে। তিনি তাঁর উপন্যাসটিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—প্রথম, সমকালীন বাস্তবধর্মী রোমান্টিক উপন্যাস। যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—'বিষের ধোঁয়া', 'ছায়া পথিক', 'রিমঝিম', 'দাদার কীর্তি' প্রভৃতি আর দ্বিতীয়, অতীত যুগের পটভূমির উপর রচিত উপন্যাসাবলী, যেমন—'কালের মন্দিরা' গৌর মল্লার প্রভৃতি যা আগেই উল্লিখিত। প্রবন্ধকার ভট্টাচার্য এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখেই তাঁর প্রবন্ধে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার বিস্তৃত বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন।

২০. আঠারোশ নিরানব্বই সালে একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চারজন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। এঁরা হলেন—জীবনানন্দ দাশ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ও কাজী নজরুল ইসলাম মূলত কবি। কাব্যের ক্ষেত্রে এঁদের দুজনের প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল স্বতঃস্ফূর্ত সহজতায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এঁদের প্রতিভা উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। সম্পাদক স্বয়ং 'কাজী নজরুল ইসলাম : অপরিচিতের বিস্ময়' প্রবন্ধে তাঁর উপন্যাস সৃষ্টির প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ করতে বসে যে দিকটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা হল কাজীর নিজস্ব ভঙ্গী। কল্লোল কালের স্রষ্টাদের সঙ্গে গভীর পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বতন্ত্র পথটি নির্বাচন করতে ব্যর্থ হন নি। মাত্র তিনটি উপন্যাস লিখেই তিনি উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, তবে একথা সত্য যে কাজী নজরুল যদি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে আরো কম্পনার কাজ করতেন তবে নিঃসন্দেহে তিনি সাফল্যের শীর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারতেন।

২১. 'বনফুল' ছদ্মনামের নেপথ্যে থেকে ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর চিকিৎসক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আহরিত অজস্র সম্পদকে উপজীব্য করে লিখেছিলেন অজস্র উপন্যাস যেগুলি কোন কোনটি আকারে ক্ষুদ্র, কোন কোনটি মাঝারি, আবার কোন কোনটি বা সুবৃহৎ। 'তাঁর সৃষ্টির ইতিহাসে 'তৃণখণ্ড'র মত ক্ষুদ্র উপন্যাসও যেমন আছে, তেমনি আছে সুবৃহৎ উপন্যাস জঙ্গম। প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন প্রতিবারই বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন এই সদা কৌতূহলী স্রষ্টা, তেমনি প্রকরণের ক্ষেত্রেও বিচিত্রতার উদ্ভাবন করেছেন এই সদা সন্ধিৎসু শিল্পী। এইখানেই তিনি সাহিত্যিক হিসেবে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। ডঃ মিহিরদেব বর্মন তাঁর 'বনফুল : বৈচিত্র্যতৃষিত সদা সন্ধিৎসু শিল্পী' প্রবন্ধে এই দুটি দিকের প্রতিই দৃষ্টিপাত করে এই সাহিত্যিকের সৃষ্টির পর্যালোচনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন :

'উপন্যাসে আমরা চাই বৈচিত্র্য। চাই প্রকরণের অভিনবতা। কিন্তু এই চাওয়াই সব নয়, এই চাওয়াই চূড়ান্ত চাওয়া নয়। আসলে উপন্যাসে সাম্প্রতিকতাবোধ পাঠকদের প্রত্যাশিত, প্রত্যাশিত মানব চরিত্রের গভীরতলশায়ী বৈশিষ্ট্যের গভীর পরিচয়। বনফুলের উপন্যাস এই প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ নয়। এই সত্য স্মরণে রেখেই প্রাবন্ধিক ডঃ দেববর্মণ আরো তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঃ

'তবু পুনরাবৃত্তিময় বাংলা উপন্যাসের ধারায় ঝুঁকি নিতে কুণ্ঠিত এবং পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় বীতরাগ কথাকারদের ভিড়ে বনফুল নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।"

২২. তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়েই যাঁর বহু উপন্যাস বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে সেই হতভাগ্য ঔপন্যাসিকের নাম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাই ছোট গল্পকার হিসেবে তাঁর যেটুকু খ্যাতি, ঔপন্যাসিক হিসেবে সেটুকু খ্যাতির অধিকারী নন এই ঔপন্যাসিক। এই বক্তব্যই প্রকাশিত হতে দেখি ডঃ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের 'শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ অক্লান্ত সৃষ্টি, অ-প্রতিষ্ঠিত স্রষ্টা প্রবন্ধে। প্রকৃত পক্ষে, ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ প্রতিষ্ঠা হারিয়েছেন চলচ্চিত্রকার শৈলজানন্দের কাছে। তাই প্রায় দুশো উপন্যাস রচনা করেও তিনি বিস্মৃতপ্রায় কথাকার। শুধু তাই নয়, এমন মন্তব্যও শোনা গেছে—"তাঁহার বড় উপন্যাসের মধ্যে কোনটি উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করে নাই।"

এসব কথা সত্য হলেও যে বৈশিষ্ট্যের দিকটি অস্বীকৃত হওয়ার নয়, তা হল, ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দের 'কাহিনী জৈবিক, মানুষগুলি স্থান-কাল-পরিবেশের মধ্যে খর্ব হয়ে যায়নি, বিষয় সর্বদা জীবন্ত, অনেক সময়ে নিষ্ঠুর ভাবে জীবন্ত।' বলাবাহুল্য, তাঁর উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্যাবলী নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে নতুন।

এই নতুন পথের পথিক শৈলজানন্দ 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখক বলেই সাধারণতঃ পরিচিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই কল্লোলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁর 'ছাড়াছাড়ি' হয়ে গিয়েছিল। এর পরই তিনি 'কালিকলম'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর 'কালিকলম'ও ছেড়ে তাঁকে ফিরতে হয় পুরোনো পত্রিকায়। তা সত্ত্বেও ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় তাঁকে 'যথার্থ কল্লোলীয়' বলে মনে করেন। প্রশ্ন হল—তিনি কি সত্যিই যথার্থ কল্লোলীয়? 'কল্লোল' বললেই উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উচ্ছলতা' আর 'দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজম' বোঝায়, অথচ 'মধ্যবিত্তর রোমাণ্টিক ভাবাবেগ' থেকে বহু দূরবর্তী শৈলজানন্দ কখনই দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজমে'র স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি। 'কয়লাকুঠির দেশ' রচয়িতার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি বাইরে থেকে দেখায় তৃপ্ত ছিলেন না। একেবারে গভীরে প্রবেশ করাই ছিল তাঁর স্বধর্ম। 'আবাল্য পরিচিত এই দেশ, এখানকার প্রকৃতি ও মানুষ বার বার তাঁর বিভিন্ন রচনায় ঘুরে-ফিরে এসেছে।' এই বক্তব্যের আলোকেই ডঃ ভট্টাচার্য শৈলজানন্দের উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন।

২৩. গতানুগতিকতাকে পরিহার করে যে শিল্পী 'কল্লোল' বৃহের অধিকাংশ

লেখকের মতই বহুরচনা-প্রসূ ছিলেন, তিনি মনোজ বসু—নতুন পথে চলতেই যিনি আকাঙ্ক্ষী। তাই শহরে বাস করেও তাঁর দৃষ্টি পড়ত প্রধানতঃ বনে-বাদাড়ে, খালে-বিলে, পতিত আবাদে, যেখানে এই শিল্পী খুঁজে পেয়েছেন মানুষের স্বাভাবিকতা। তারাশংকর, বিভূতিভূষণের সগোত্রীয় হয়েই এই শিল্পী বর্ণনা করেছেন বঙ্গভূমির প্রাচীন জীবনধারাকে—এ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে ডঃ সমরেশ মজুমদার লিখিত 'মনোজ বসু ঃ বৈচিত্র্যানুসন্ধানে মনোযোগী' প্রবন্ধে। এখানেই ডঃ মজুমদার লিখেছেন ঃ 'প্রায় অচেনা দক্ষিণ বঙ্গকে একান্তভাবে চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবাসীমাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন'—মনোজ বসু। এই লেখকই বিশ্বাস করেন—'আগে গ্রামকে চেনা দরকার কেননা আমাদেব দেশের অধিকাংশ মানুষের বাস গ্রামাঞ্চলে। তাদের বাদ দিয়ে কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না।' তাই দেখি, দক্ষিণ বঙ্গের বিল আর বিলের প্রান্তবর্তী মানুষদের নিয়েই তাঁর উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে। কিন্তু ঔপন্যাসিক এর বাইরে বিষয়ের অভিনবত্বে মনোযোগী হয়ে রচনা করেছেন 'নিশিকুটুম্ব', 'রূপবতী', 'আমি সম্রাট', 'নবীন যাত্রা' 'সাজবদল' প্রভৃতি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। এই সব উপন্যাসের চরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু গ্রাম্য পটভূমিকায়। বলা চলে মনোজ বসুর সাহিত্যিক জীবনের সাধনা—'মাটি, প্রকৃতি ও মানুষ'কে নিয়ে।

এই মানুষ মূলতঃ সুন্দরবনাঞ্চলের, তাই মনোজ বসুর উপন্যাস 'আঞ্চলিকতা কেন্দ্রিক'—এ মত প্রকাশ করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ মজুমদার। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টিতে নিরত হয়েও তারাশংকর অঞ্চলের উর্ধ্বে উঠে চিরন্তন-কালের অমর সৃষ্টিব মহিমায় যেভাবে মহিমান্বিত হয়েছেন, মনোজ বসু সেই মহিমা লাভ না করলেও তিনি নোতুন দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলেছেন—এই অর্থে তিনি এযাবৎ একক ও অদ্বিতীয়।' এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ডঃ মজুমদার মনোজ বসুর সৃষ্টির মূল্যায়ন করেছেন।

ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর জীবনের একটা মূল্যবান সময় জড়িত ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী অভিজ্ঞতাও উপজীব্য করে রচিত তাঁর উপন্যাসগুলিতে এক দিকে যেমন এদেশের মাটি-মানুষের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষায় অধীর দিনগুলোর চিত্র চিত্রিত হতে দেখেছি, তেমনি স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতির জীবনের সঞ্চিত ক্লেদাক্ত রূপ দেখে তাঁকে বেদনায় দীর্ণ হতে দেখেছি। সক্রিয় রাজনীতি পরিত্যাগ করলেও দেশের মঙ্গল অমঙ্গল তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এই সঙ্গেই একটি বিষয় উল্লেখ্য, তা হলো মনোজ বসু সমাজ-সচেতন শিল্পী—তাই 'মানুষ গড়ার কারিগর,' 'নবীনযাত্রা' প্রভৃতি উপন্যাস যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি রচিত হয়েছে 'নিশিকুটুম্বে'র মত উপন্যাস। বিষয়বস্তুর বিচারে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ সংযোজন।

২৪. সাহিত্যের সব শাখাতে বিচরণ করলেও ঔপন্যাসিক সত্তাই ছিল প্রমথনাথ বিশীর অন্যতম প্রধান সত্তা ; অথচ তিনি তাঁর সৃষ্ট প্রথম উপন্যাস 'দেশের শত্রু'-কে

পরবর্তীকালে স্বীকৃতি দিতে চান নি। সম্ভবত অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য—বইটিকে সমালোচনার সম্মুখীন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, প্রমথনাথের দেশপ্রেমের ধারণা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্র-শিষ্য তাঁর গুরুর মতই উচ্ছ্বাসপ্রবণতাকে গ্রহণ করতে পারেননি। শুধু দেশপ্রেমের ধারণাতেই নয়, উপন্যাস নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি স্বতন্ত্র পথের পথিক হতে আগ্রহী ছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের গঠনরীতি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মিতা মেনে নিয়েও তিনি বাংলা উপন্যাসে ভিন্ন স্বাদের স্পর্শ আনতে চেয়েছিলেন। —এই মন্তব্য করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ অশোক কুণ্ডু তাঁর 'প্রমথনাথ বিশী : সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথের পথিক' প্রবন্ধে।

প্রমথনাথ তাঁর প্রথম স্বীকৃত উপন্যাস—'বিপুল সুদূর তুমি যে' উপন্যাসে আদিম মানুষ, যারা ছিল যাযাবর—তাদেরই কথা দিয়ে শুরু করে ক্রমে ক্রমে আধুনিক মানুষকে নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর উপন্যাস। 'পনেরই আগস্ট' তার প্রমাণ। তাঁর উপন্যাস প্রধানতঃ দু শ্রেণীর—এক, সামাজিক ; আর দুই ঐতিহাসিক। আসলে তাঁর রচনায় ছিল বহুমুখীতা যা বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক প্রমথনাথের সঠিক স্থানটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বড় বাধার সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বসে ডঃ কুণ্ডু তাঁর 'প্রমথনাথ বিশী : আদিম থেকে আধুনিক কালে বিচরণ' প্রবন্ধে লিখেছেন 'আসলে প্রমথনাথ তাঁর উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের কালপ্রবাহকে ধরতে চেয়েছেন। আদিম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত মানব সংস্কৃতি তথা ভারতীয় তথা বাঙ্গালী জীবনবোধই তাঁর উপন্যাসের মূল সুর !' তবুও তাঁর উপন্যাসে বর্তমান সমাজের জটিলতা, সমস্যা অনুপস্থিত। এইখানেই ঔপন্যাসিক বিশীর সীমাবদ্ধতা।

২৫. সংখ্যায় স্বল্প হলেও, যাঁর উপন্যাসাবলী প্রভাবে-প্রতিনিধিত্বে-আবেদনে প্রবল ও গভীর, সেই সরোজকুমার রায়চৌধুরী অন্তরের তাগিদে আন্তরিক সততায় সৃষ্টির রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, আকস্মিক মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর সৃষ্টির সম্ভার সম্পূর্ণ সমৃদ্ধি পেল না। তাঁর দেখার ও দর্শনযোগ্য বিষয় ছিল 'নিছক মানুষ'। এই সম্পর্কে আলোচনায় নিরত হয়ে প্রাবন্ধিক নিখিলকুমার নন্দী তাঁর 'সরোজকুমার রায়চৌধুরী : 'মনুষ্য সত্তার নিরপেক্ষ দ্রষ্টা' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন : 'যুগ-দেশ-দশক-মাটি-পরিবেশ-পটভূমি-সংলগ্ন যে মানুষ তার ও তাদের ভালোয়-মন্দ, আলোয়-আঁধার মেশা সম্পর্কের নানাবিধ দ্বিধা-বহুধা বিরোধের দ্বান্দ্বিকতায় স্থূল-সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতে যুগপৎ চঞ্চল প্রচণ্ড এবং সময় বিশেষের ঘটনার অবস্থানপাতে যা শান্ত স্তিমিত ; তারই রূপায়ন করেছেন শিল্পী সরোজকুমার কারণ অন্তরতম মানুষ বা মনুষ্যত্ব সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় ও গাঢ় প্রত্যয় ছিল।' ঔপন্যাসিক সরোজকুমারের দৃষ্টিতে—'মানুষ অনেকগুলি সত্তার সমষ্টি। সে উদার, সে সংকীর্ণ, সে দাতা, সে কৃপণ। সে সবই। বিশেষ বিশেষ আবেষ্টনে বিশেষ সত্তা প্রাধান্য লাভ করে।'

ফলে 'বিশেষ আবেষ্টনগত মানুষের বিশেষ সত্তা প্রাধান্যের স্বতঃস্ফূর্ত সত্যস্ফূর্ত অংকন মূর্তনই সরোজকুমারের ঔপন্যাসিক সাফল্য সার্থকতার প্রথম ও শেষকথা।' এই প্রণিধান যোগ্য মন্তব্যের আলোকেই প্রাবন্ধিক অধ্যাপক নন্দী সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাসবলীর মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন।

এই মূল্যায়নে অগ্রসর হয়ে প্রাবন্ধিক আরো বলেছেন যে, সহজ-স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ-সাবলীল প্রসাদগুণে ভরা মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পশৈলী তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। বলা চলে, আলডুস্ হাক্স্‌লির 'whole truth'-এর সন্ধান-সাধনার সঙ্গে তাঁর সাধনার সান্নিধ্য খুব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এই সাধনায় তাঁর সহায়ক ছিল তাঁর প্রকৃষ্ট নাট্যোকারোচিত জীবনমুক্তি ও নিরাসক্তি, যুগপৎ গৃহী-পথিক, সংসার-সন্ন্যাসী 'জীবনরসিক' মুক্ত পুরুষের মন-মানসিকতা; তাঁকে ঘিরে নিত্য বিরাজ করত জগৎ ও জীবনের প্রতি একটি নির্লিপ্ত অথচ সহৃদয় মনোভাব—হিউমারের যা মূল উৎস। বলা চলে তিনি ছিলেন খাঁটি হিউমারিস্ট। এমনিভাবেই প্রাবন্ধিক নন্দী সাহিত্যিক সরোজকুমারের সৃষ্টি-সাধনার সঙ্গে আমাদের সার্থক পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন।

২৬. ডঃ আশিসকুমার দে তাঁর প্রবন্ধ 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ বিস্মৃতপ্রায় কথাশিল্পী' প্রবন্ধের সূচনাতেই কতকগুলি প্রাথমিক সমস্যার উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে তিনি ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার কেন বিস্মৃত হতে বসেছেন তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রাবন্ধিক লিখেছেন – প্রথমতঃ, অচিন্ত্যকুমার বহু সংখ্যক পাঠকের কাছে রামকৃষ্ণ-জীবনী লেখক রূপেই বেশী পরিচিত; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তিনি ছোট গল্পকার রূপেই সাহিত্য ক্ষেত্রে সম্মানিত, ঔপন্যাসিক রূপে নয়। একমাত্র ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমারকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের লেখক ডঃ দে আমাদের দৃষ্টি একটি বিশেষ দিকে আকর্ষণ করে লিখেছেন ঃ 'আমাদের মনে হয় একটা অন্বেষণ বৃত্তি তাঁকে বাস্তব ঘটনার জগৎ থেকে ক্রমশঃ অধ্যাত্ম জগতে পৌঁছে দিয়েছে। এটা জীবনদর্শন, এমন বললে হিসাবী সমালোচকরা ক্ষিপ্ত হবেন। কিন্তু লেখক জীবনের একটা মানে খুঁজতে চেয়েছিলেন —একথা সত্য।' প্রবন্ধকার উপন্যাস বিশ্লেষণ করে লেখকের সেই অন্বেষণের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়েছেন। প্রাবন্ধিক অচিন্ত্যকুমারের সব উপন্যাস নয়, বরং 'বেদে' থেকে 'দুই পাখি এক নীড়' পর্যন্ত প্রায় বিশ বছরের ঔপন্যাসিক প্রহর থেকে কয়েকটি উপন্যাস-মুহূর্তের বিচার' করেছেন। বিচার করতে বসে প্রাবন্ধিক ডঃ দে ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমারের 'আত্ম আবিষ্কারের' দিকটির ইঙ্গিত করে লিখেছেন ঃ "জীবনকে চিরে চিরে আনন্দ ব্যথার উৎস খুঁজতে গিয়ে এই জানা-বোঝা ঘটে যায়। এর মধ্যে একটা আত্ম আবিষ্কারের প্রক্রিয়া আছে। বিশের দশকের সংশয়, পাশ্চাত্যের অমূল (রুটলেস) দর্শন, কবিমনের দায়, চেতনা-প্রবাহের অতিরেক অথচ একটা সন্ধান কামনা তাঁর অজস্র উপন্যাসে নানাভাবে

নিজেকে মেলে ধরেছে।" এই বক্তব্যের আলোকেই ডঃ দে ঔপন্যাসিক অচিন্ত্য-কুমারের সৃষ্টির মূল্যায়ন করেছেন।

২৭. রম্য-রচনার সার্থক স্রষ্টা রূপে বেশি পরিচিত সৈয়দ মুজতবা আলীর চারটি উপন্যাস—'শবনম্', 'অবিশ্বাস্য', 'শহর-ইয়ার' আর 'তুলনাহীন' লিখে ঔপন্যাসিক রূপেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন—এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে ডঃ অসিত মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'সৈয়দ মুজতবা আলী: মানবিকতায় মুক্তি'তে। ডঃ মুজতবা আলীর চারটি উপন্যাসই স্বাধীনতা পরবর্তী কালের সৃষ্টি—প্রথমটির জন্ম ১৯৫৩-তে আর শেষটির জন্ম ১৯৭৪-এ। অথচ এই চারটি উপন্যাসের কোনটিতেই 'স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষ বা তাদের জীবনচিত্র চিত্রিত হয়নি। সেদিক থেকে 'তাঁর উপন্যাসগুলি স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস নয়।' না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসাবলীর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার মন্তব্য করেছেন, 'তাঁর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, তিনি তাঁর উপন্যাসে বাস্তব তথ্যের সঙ্গে জীবনরসের, সাহিত্যিক সত্যের সঙ্গে জীবন সত্যের এক অপূর্ব সমীকরণ ঘটিয়েছেন। (তাঁর) উপন্যাসে বস্তুধর্ম, রসধর্ম ও তার সঙ্গে আদর্শবাদ মিশে গিয়ে এক বিশেষ জীবন সত্যের প্রকাশ ঘটেছে।' এই বক্তব্য সম্মুখে রেখেই প্রাবন্ধিক ডঃ মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত চারটি উপন্যাসের বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছেন।

২৮. একাধারে যিনি কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, শিশু সাহিত্য স্রষ্টা, গোয়েন্দাকাহিনী রচয়িতা, তিনিই আবার ঔপন্যাসিকও। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উপন্যাস সৃষ্টিতে তাঁর সাফল্য সংশয়াপন্ন'—এ মন্তব্য করেছেন ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা তাঁর 'প্রেমেন্দ্র মিত্র: পট পরিবর্তনের অন্যতম পুরোধা' প্রবন্ধে। একটা কথা এখানে আমরা স্মরণে রাখব যে ডঃ লাহা প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম উপন্যাস 'পাঁক' বিশ্লেষণ করেই এই মন্তব্য করেছেন; আরো কয়েকটি উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে পারলে এই মন্তব্যই স্থায়ী হত কিনা!—বলা কঠিন। ডঃ লাহা মূলতঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম উপন্যাস 'পাঁক' সম্পর্কে যে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন তা হল 'পাঁক' বাংলা উপন্যাসের 'এক নবদিগন্ত' উন্মোচিত করেছিল। কিন্তু দুঃখের কথা 'পাঁক অনন্ত সম্ভাবনার অপূর্ণ আভাস হয়েই থেকে গেল, সেই সম্ভাবনা স্বাভাবিক প্রবণতায় নিটোল নিরুপম পঙ্কজ সৃষ্টির দিকে এগিয়ে গেল না।' এ সত্য স্বীকার করেও বলতে হয় বাংলা উপন্যাসের পটপরিবর্তনে তাঁর দান ও স্থান অনন্য ও অনস্বীকার্য।

২৯. জীবনের জন্য—জীবিকা, কিন্তু কারো কারো কাছে জীবিকাই সব নয়। এই জীবিকার বাইরে থাকে এক ধরনের আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টা। স্রষ্টা সতীনাথের মধ্যেও তাই ছিল। এই আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টাই জীবনবোধ সম্পন্ন শিল্পীকে তাঁর স্বক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। 'শুধু নিজের জীবন নয়, সতীনাথের যাবতীয় সৃষ্টিতেই এই আত্মসন্ধানের মগ্নতা লক্ষ্য করা যায়।'—এই মন্তব্য দিয়েই

প্রাবন্ধিক ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার তাঁর 'সতীনাথ ভাদুরী ঃ অন্তর্দর্শনে প্রতিহত মানুষ' প্রবন্ধটির সূচনা করেছেন।

আত্মসন্ধানে রত এই কথাশিল্পী এমন একটা উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন যা এই অন্তর্মুখী শিল্পীকে কিছুটা নাড়া দিয়েছিল। অসহযোগ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত সেই উত্তেজনাময় কালের কিছু পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ইতস্তত লেখালেখিতে যেখানে 'স্বাদেশিক অভিমানের ছিটেফোঁটা' প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর দৃষ্টির সামনে তৎকালীন রাজনীতির একটি নির্দিষ্ট 'ফ্রেম' তৈরী হয়েছিল বটে, কিন্তু এই রাজনৈতিক ফ্রেমের বাইরে থাকা সাধারণ মানুষকে নিয়ে নানামুখী চিন্তাই তাঁকে 'মানবিক সম্পর্কের অপরিহার্য টানাপোড়েনের জগতে নিয়ে গিয়েছিল।' কথাশিল্পী সতীনাথকে বুঝতে গেলে এই সত্যই স্মরণে রেখে অগ্রসর হতে হবে। প্রাবন্ধিক ডঃ মজুমদার এই পথেই অগ্রসর হয়ে সাহিত্যিক সতীনাথের সফল সৃষ্টির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, 'যাঁর ভেতরে একটি গভীর জীবনবোধ সম্পন্ন শিল্পী বসে আছে তাঁর পক্ষে বিশেষ একটি রাজনৈতিক ফ্রেমের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়।'

প্রকৃত পক্ষে, রাজনৈতিক ফ্রেমের মধ্যে বাঁধা না পড়ে ঔপন্যাসিক সতীনাথ তাঁর 'জাগরী', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', ''ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'অচিনরাগিনী', 'সংকট', 'দিগভ্রান্ত'—যে ছটি উপন্যাস রচনা করেছেন তা মূলতঃ নানা আধারে জটিল অন্তর্লোক উন্মোচনের কাহিনী। 'অন্তর্লোককে ফুটিয়ে তোলবার যে সচেতন ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে শুরু হয়েছিল, সতীনাথের মননশীলতায় তারই সমৃদ্ধি দেখি।' প্রবন্ধের সমাপ্তি পর্বে এসে এই মূল্যবান মন্তব্য করেছেন ডঃ মজুমদার।

৩০. ঔপন্যাসিকের প্রতিভার বিচার ও রচনা বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে বসলে প্রথমেই কথাশিল্পীর 'শিল্প সত্তার স্বরূপ অন্বেষণ'-ই হবে প্রধান লক্ষ্য—এ মত প্রকাশ করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধ—'প্রবোধকুমার সান্যাল ঃ শিল্প ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট' প্রবন্ধে। তিনি ঔপন্যাসিক প্রবোধকুমার সান্যালের রচনা বৈশিষ্ট্য অন্বেষণে অগ্রসর হয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা হল প্রবোধকুমার সান্যালের 'নানামুখী প্রবণতার মধ্যে আপাত বিরোধ।'

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ঔপন্যাসিক প্রবোধকুমার সান্যাল সৃষ্টি করেছেন যে বিপুল রচনা সম্ভার, তার বিষয় বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তবুও অনেকের চোখে তাঁর প্রধান প্রতিষ্ঠা মূলতঃ বিচিত্রস্বাদী ভ্রমণ-সাহিত্যের স্রষ্টা রূপে ; ঔপন্যাসিক রূপে নয়। অথচ উপন্যাস সৃষ্টিতেও তাঁর সাফল্য অনস্বীকার্য।

অনেক তরুণের মতই প্রবোধকুমার 'কল্লোলে'র আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এ আকর্ষণ তারুণ্যের। এই তারুণ্যের চেতনাই ছিল কল্লোলের মূল প্রেরণা। আর এই তারুণ্যের চেতনাই 'প্রবোধকুমারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ সাধন করেছিল কল্লোলের।'—এই মন্তব্য করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ রায়চৌধুরী।

বস্তুত তরুণ প্রবোধকুমারের ব্যক্তিত্বের গভীরে ছিল যাযাবরের নেশা আর তার সঙ্গে বিজড়িত হয়েছিল এক ধরণের 'বোহেমিয়ানিজম'—যা তিনি পেয়েছিলেন স্ক্যাণ্ডিনেভীয় লেখক হ্যামসুন ও বোয়ারের রচনা পড়ে। এই বোহেমিয় যাযাবর মনই সৃষ্টি করেছিল তাঁর ভ্রমণ কাহিনীগুলিও, কিন্তু এই এলোমেলো পথ চলার মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনে এসেছিল বাস্তব জীবনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ—ফলে তিনি লাভ করেছিলেন অজস্র বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই বৈশিষ্ট্যাবলীকে সম্পদ করেই কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার উপন্যাস ও ছোটগল্প সৃষ্টির জগতে প্রবেশ করেছেন। এই বক্তব্যেরই সমর্থন আছে প্রবোধকুমারের স্বীকারোক্তির মধ্যে: 'আমি লিখতুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রি, গারোয়ান, মুদি, ফড়ে—এই সব চরিত্র নিয়ে। কারণ তাদের জীবন—যাত্রাটা চোখে দেখতুম। তাদের নিয়ে গল্পের ইন্দ্রজাল সহজেই বুনতে পারতুম। কোথাও অনাচার ঘটল, কেউ বিনা রোগে মারা গেলো, কেউ অহেতুক অপমানে পড়লো—অমনি আমার গল্প লেখা শুরু।'

বলা বাহুল্য, এই 'গল্প' বলতে উপন্যাস ও ছোটগল্পই বোঝায়। এই প্রেক্ষাপটে রেখেই প্রাবন্ধিক ডঃ রায়চৌধুরী ঔপন্যাসিক প্রবোধকুমার সান্যালের সৃষ্টির মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন।

৩১. 'আর্ট'কে প্রায় 'ইণ্ডাস্ট্রিতে' পরিণত করে তুলতে সফল হয়েছিল যাঁর বহুপ্রসূ লেখনী, সেই বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হলে—এক কথায় বলতে হয়—'কৈশোরের কাব্যময় স্তুতি'—এই মন্তব্য উচ্চারিত হয়েছে সুবিনয় মুস্তাফীর 'বুদ্ধদেব বসু: কৈশোরের কাব্যময় স্তুতি' প্রবন্ধে। সামগ্রিক ভাবে ঔপন্যাসিক বসুর উপন্যাস সেই জীবনবোধে আবিষ্ট এবং সেই লাবণ্যে জড়ানো যার নিজেকেই সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই, অথচ যে নিজেকে ঠিক জানেই না এখনো ।'

'কল্লোল' গোষ্ঠীভুক্ত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসুই সর্বাপেক্ষা বেশী আক্রান্ত হয়েছিলেন 'উনিশ শতকী ইউরোপীয় সাহিত্যের সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য—অবক্ষয়ী ধারার নান্দনিকতা ও ব্যক্তি-সর্বস্বতায়'। ফলে তিনি তাঁর সমকালীন ও প্রায় সমকালীন ঔপন্যাসিকদের দ্বারা চিহ্নিত পথে অগ্রসর না হয়ে এমন একটি পথ বেছে নিয়েছিলেন, 'এমন এক জীবনবাদ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যা মূলতঃ পলায়নধর্মী'—এ মত প্রকাশ করেছেন প্রবন্ধকার মুস্তাফী। প্রধানতঃ এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপটেই প্রাবন্ধিক মুস্তাফী বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলির মূল্যায়ন করে একটি স্থির প্রত্যয়ে পেঁছেছেন যা তাঁর প্রবন্ধের নামকরণের মধ্যেই সুস্পষ্ট।

৩২. শিল্প সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে যে সাহিত্যিককে নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়েছে, যে বিতর্ক আজও শেষ হয়নি, সেই সাহিত্যিকের নাম—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কল্লোলের কুলবর্ধন' না হয়েও ইনি খ্যাতির তুঙ্গ শিখরে পেঁছোতে সমর্থ হয়েছিলেন—এই বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে ডঃ রবীন্দ্র গুপ্তের—"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবন খুঁজতে শিল্পের খোঁজে' প্রবন্ধে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ বাজি রেখে গল্প সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোযোগী হলেও শৈশব কাল থেকেই তাঁর স্বভাবে ছিল এক 'কেন'-র তাড়না। এই তাড়নাই তাঁকে শ্রেয়সের সন্ধানে ব্রতী করেছিল আর তারই ফসল হিসেবে আমরা পেয়েছি অনেকগুলি ব্যতিক্রমী রচনা 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য,' 'পুতুল নাচের ইতিকথা' 'পদ্মানদীর মাঝি', 'শহরতলী,' 'অহিংসা,' 'প্রতিবিম্ব' 'চিহ্ন,' 'আরোগ্য' প্রভৃতি। এই মূল্যবান উপন্যাস-সম্ভার প্রমাণ করে যে এই ঔপন্যাসিক গতানুগতিকতার সরণি ধরে হাঁটেন নি।

ব্যতিক্রমী রচনা 'দিবারাত্রির কাব্য' 'বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের উপন্যাসের ছকের বাইরে'—এ মন্তব্য প্রাবন্ধিক অধ্যাপক গুপ্তের। তিনি আরো বলেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞানীর মতো জীবনকে দেখা, উপভোগ নয় নিরীক্ষা, এক্সপেরিমেণ্ট—বাংলা উপন্যাসে নতুন। এই নিরীক্ষায় কৌতূহল যত তীব্র, বাস্তব অভিজ্ঞতা ততটা গভীর নয়। অনেকটাই কল্পনাবিলাস। তাই গদ্যবাহন উপন্যাসে এসেছে কবিতা—অনিবার্য টানে'। বলা বাহুল্য, পাঠকেরা পেলেন নতুনত্বের স্বাদ।

এরপরই প্রাবন্ধিক ডঃ গুপ্ত 'জননী'র আলোচনায় প্রবেশ করে আমাদের জানালেন যে, 'জননী শ্যামার মনের জগতই এ কাহিনী পরিধি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সে পরিধির রঙ, সীমা, আয়তন বদলেছে।' এই বক্তব্যকে তুলে ধরতেই ডঃ গুপ্ত দুটি ছকের সাহায্য নিয়েছেন। যা প্রবন্ধালোচনায় নতুন সচেতন রীতি রূপে স্বীকৃতি পেতে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের দুটি উপন্যাস—একই বছরে প্রকাশিত 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি'র ভিতরে মিল অল্প, প্লটের বিন্যাসও ভিন্নতর। একটিতে পদ্মার মাছমারাদের জগৎ, অন্যটিতে একটি অঞ্চলের ভদ্রেতর মানুষের জীবনযাত্রা—এই দ্বিতীয়টিতে লেখক পেয়েছেন মানব মনের রহস্যকন্দরে প্রবেশের চাবি।'—এ মন্তব্য প্রাবন্ধিকের।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোচনায় নিরত হয়ে প্রাবন্ধিক ডঃ গুপ্ত 'রেখাচিত্রে'র সাহায্যে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। এ প্রয়াসও নিঃসন্দেহে নতুনত্বের স্বাদ বহন করে।

জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির মূল্যায়নে সব উপন্যাসের ধারাবাহিক আলোচনা সব থেকে নির্ভুল পদ্ধতি হলেও প্রাবন্ধিক ডঃ গুপ্ত বিখ্যাত উপন্যাস সমালোচক আরনল্ড কেট্‌ল অনুসৃত নির্বাচন-মূলক পদ্ধতিকে গ্রহণীয় মনে করেছেন। এই ভাবেই আমরা অধ্যাপক গুপ্তের কাছ থেকে পেয়েছি 'অহিংসা', 'চতুষ্কোণ', 'শহরতলী' প্রভৃতি উপন্যাসের মূল্যবান মূল্যায়ন।

৩৩. কল্লোলোত্তর কাল—যে কালের সাহিত্যে 'সমসাময়িক কালের কান্না-ঘাম-রক্ত এবং হাসি-ভালবাসার কলরব ধ্বনি সদাজাগ্রত', যে কালে প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিকেরা সমসাময়িক 'জীবন জীবিকা, যৌনচেতনা ও বোধ এবং মনস্তত্ত্বের

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যায়নে, মানুষের সুখদুঃখ, পার্থিব অপার্থিব চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াসী', সেই কালের অন্যতম কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষ।

সুসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের উপন্যাসের 'ক্যানভাসটি প্রশস্ত। সেই ক্যানভাসে আছে রঙ-বেরঙের তুলির আঁচড়।...জীবনকে লেখক খণ্ড খণ্ড ধারায় না দেখে অখণ্ড ও সামগ্রিক মর্মবস্তু রূপে দেখার চেষ্টা করেছেন। জগৎ, জীবন ও মানব সংসার সম্পর্কে অখণ্ড চেতনাবোধই সার্থক ঔপন্যাসিকের বড়ো ধর্ম। সুবোধ ঘোষ মানবজীবনবোধের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন।...কল্লোলোত্তর যুগে পরিবর্তনের বিচিত্র খাতবদলের সন্ধিক্ষণে সুবোধ ঘোষ এক অনন্যসাধারণ দূরদর্শী পথিক।'—এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে রেখেই ডঃ সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের উপন্যাসগুলির মূল্যায়ন করেছেন তাঁর লিখিত 'সুবোধ ঘোষ : গভীরাশ্রয়ী জীবনবোধে সুচিহ্নিত' প্রবন্ধে।

৩৪. প্রাবন্ধিক সৌমেন সেন তাঁর 'সঞ্জয় ভট্টাচার্য : মননে ও ইতিহাসবোধে বিশিষ্ট সমন্বয়' প্রবন্ধের সূচনাতেই উপন্যাসের 'রূপ ও স্বরূপ' নির্ধারণে ব্রতী হয়েছেন, কেননা ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ঠিক গতানুগতিকতার অনুসারী ঔপন্যাসিক নন। উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর উক্তি—

> 'ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সমাজজীবনের যে অবশ্যম্ভাবী সংঘাত ও ফলে সমাজজীবনে বা ব্যক্তিজীবনে যে রূপান্তর তা যেমন কথাসাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে, তেমনি ইতিহাসেরও। এখানেই কথাসাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের মিলন সম্ভবপর।...সব উপন্যাসই ইতিহাস।'

বুঝতে অসুবিধে হয় না, এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ, এক বিশেষ ধ্যানধারণার অধিকার নিয়েই সঞ্জয় ভট্টাচায উপন্যাস সৃষ্টির জগতে প্রবেশ করেছিলেন। প্রাবন্ধিক ডঃ সেন সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণের পরিচয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

> "গদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে উপন্যাসের উদ্ভব। কবিতার মতো গদ্য একান্ত নয়; বহু কণ্ঠস্বর, সংলাপ ও সংঘাতের সূত্রে গদ্য কাহিনীতেই তার সত্যবস্তু শোনা যায়। এবং যেহেতু এই কণ্ঠস্বর একক নয়, বহু, তাই সেই কণ্ঠস্বরে ইতিহাস স্ফূর্তি পায়। এই প্রক্রিয়া কতোটা বস্তুগত তার উপরই নির্ভর করে উপন্যাসের সত্যকার উপন্যাস হয়ে ওঠা। কারণ বস্তুজগৎ তো মাত্র উপস্থিত নয়, সেই উপস্থিতিতে যে দ্বান্দ্বিকতা ক্রিয়াশীল, তার ফলে বস্তুবিশ্বের অস্তিত্বও সংঘাতময়, পরিবর্তনশীল। এই বস্তু-জগৎকে চেনা, যাকে আমরা বাস্তবতা বলি, তাই তো ঔপন্যাসিকের অনিষ্ট।"

সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই কারণেই বিশ্বাস করেন যে সব উপন্যাসই ইতিহাস। এই পটভূমিতে পরিস্থাপিত করেই ডঃ সৌমেন সেন তাঁর প্রবন্ধে উনিশ শ' একচল্লিশ থেকে

ঊনিশ শ' আটষট্টি—প্রায় তিন দশকে রচিত তিনটি উপন্যাসের স্রষ্টা ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সৃষ্ট উপন্যাসাবলীর মূল্যায়ন করেছেন।'

৩৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে যে সব বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তাঁদের সৃষ্টিকর্মে নিরত থেকে বাংলা উপন্যাসের উৎকর্ষসাধনে ব্রতী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—যাঁর শিল্পকর্মের বিচারে বসে প্রাবন্ধিক ডঃ শংকর চক্রবর্তী তাঁর সুচিন্তিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ঃ অন্তর্মুখিনতাই স্বধর্ম' প্রবন্ধে এই কথাশিল্পীর 'মানস বিচার'কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ 'লেখকের মনোভঙ্গীই (attitude towards life) তাঁর চালিকাশক্তি, যা গল্পের কাহিনী বয়নে, চরিত্র সৃষ্টিতে, ভাষা নির্মাণে এবং জীবনদর্শনে বিলক্ষণ অনুভূত হতে বাধ্য।'

কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাসাবলী মূলতঃ রচিত হয়েছিল সমকালীন কলকাতার অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পটভূমিতে। বিশেষত 'সতীত্ব-মাতৃত্ব-নারীত্ব প্রভৃতিকে এতকাল যে শ্রদ্ধার মূল্য দান করা হত' তা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। 'ধীরে ধীরে সমাজ...নারীর দেহগত শুচিতার বিনষ্টিকে' মেনে নিল—এই চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসে। 'মীরার দুপুর' কিংবা 'বারো ঘর এক উঠোন' সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। কেউ কেউ মনে করেন এই 'মীরার দুপুর' উপন্যাসটিই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সফল স্রষ্টাদের পংক্তিভুক্ত করেছে। 'এই উপন্যাসটিতেই তাঁর লেখক হিসেবে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত।'—এ মন্তব্য প্রাবন্ধিকের, কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যটি তাঁকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে তা হল—'এই শিল্পী মারাত্মকভাবে আত্মকেন্দ্রিক।'

এই লক্ষণগুলির প্রসঙ্গেই ডঃ চক্রবর্তী মনে করেন যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিমল কর প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের পংক্তিভুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র ; 'এরা কয়জন মিলে যে উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন তা' এক বিশেষ সময়ের মধ্যবিত্ত সমাজের সামগ্রিক মানসিকতার পরিচয়বাহী। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।'

শেষ পর্যন্ত প্রাবন্ধিক ডঃ চক্রবর্তী একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা উল্লেখ্য। তিনি লিখেছেন ঃ 'তিনি (জ্যোতিরিন্দ্র) তাঁর একটা দেখার চোখ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যা অনেকের দ্বারা প্রথম দিকে প্রভাবিত হলেও শেষ পর্যন্ত একটা নিজস্ব পূর্ণতায় স্থিত হতে পেরেছিল। একজন লেখকের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।'

৩৬. বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিনায় 'প্রশ্নাতীত মৌলিকতা' নিয়ে যিনি স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেছিলেন তিনি প্রতিভাধর নরেন্দ্রনাথ মিত্র ; 'যিনি সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে এক উন্নত রুচিশীল সাহিত্যাদর্শকে জীবনের বীজমন্ত্র রূপে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন।' এই সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত তাঁর—'নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ মমতাসমৃদ্ধ জীবনরসবোধে ঋদ্ধ' প্রবন্ধে।

জীবনমুখীন এই কথাশিল্পী—'জীবনের প্রীতিস্নিগ্ধ মাধুর্য, তার সাফল্য-

অসাফল্য, দ্বেষ-বিদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা-প্রসারতার নানা উপাদান তিনি ছড়িয়ে থাকা জীবন থেকেই আহরণ করেছেন, তার শিল্পিত রূপে দিয়েছেন।' কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু তাঁকে তাঁর সৃষ্টির 'পূর্ণ ফসল' ঘরে তুলতে দেয়নি।

'নম্র ও স্নিগ্ধ' এই কথাকার 'চেনা জগৎ' ও 'চেনা ভালোবাসা'র চিরন্তন লেখক। কাছের পরিচিত হৃদয়ে তাঁর অভিযাত্রা। সেই অভীষ্ট তাঁর লেখনীতে রসগম্য হয়েছে—আর এই সাফল্য এসেছে যেহেতু তিনি 'আশ্চর্য রূপে ঘরোয়া'। এই অভিমত প্রকাশিত হয়েছে প্রাবন্ধিক ডঃ সেনগুপ্তের প্রবন্ধে। এই বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা স্মরণে রেখেই ডঃ সেনগুপ্ত কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বল্প-সৃষ্ট-সম্ভারের মূল্যায়ন করেছেন।

৩৭ ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলম ধরেছিলেন 'পরাধীন ভারতের দুঃসহ অগ্নিযন্ত্রণার মধ্যে।' কেন ধরেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন তাঁর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে—'যদি কলম ধরতে হয়, তবে তা দেশের জন্য; যদি লিখতে হয় তবে তা স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে দেবার জন্য।'

এই আদর্শ সম্মুখে রেখেই স্কুলের ছাত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখনী চালনা করে গেছেন তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। ফলে আমরা পেয়েছি সাহিত্যের সমৃদ্ধ সম্ভার। তবুও এ মৃত্যু—অকাল মৃত্যুই। মৃত্যু তাকে তুলে নিয়ে না গেলে বাংলা সাহিত্য আরো মূল্যবান সম্পদে ঐশ্বর্যময়ী হোত, তা সন্দেহাতীত।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী স্কুলছাত্র তারকনাথ গান্ধীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু 'উপনিবেশ' উপন্যাসের স্রষ্টা নারায়ণকে আমরা বলতে শুনলাম, 'অহিংসার রাজনীতি থেকে বিপ্লববাদের পথেও পদক্ষেপ করতে হলো একদিন।' এই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ই কলকাতাবাসী হওয়ার পর মার্কসবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন—এ তথ্য জানা যায় সুহৃদ অচ্যুত গোস্বামীর 'স্মৃতিচারণ' থেকে। তবে তিনি নিজেই জানিয়েছেনঃ 'আমি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য নই, কোনোদিন ছিলামও না।' তবে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও কম্যুনিস্ট হওয়া যায়—তাঁরাই পার্টির সহযাত্রী রূপে স্বীকৃতি পান। এ তথ্য পাওয়া যায় 'গোপাল হালদার থেকে শুরু করে সুনীল জানা' প্রমুখ অনেকের লেখাতেই, যেখানে তাঁরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে 'সহযাত্রী' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই 'সহযাত্রী' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'নতুন সাহিত্যে' প্রকাশিত 'শান্তিবিপ্লবী সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজের সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর পরিণত ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় রাখেন তাঁর লেখায়ঃ

> "আসলে জীবননিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যই প্রগতিশীল হতে পারে—যদি তার দৃষ্টি সাম্যবাদের আদর্শে নিবদ্ধ থাকে। আর সেই সঙ্গে যদি সে যথাযথ শ্রদ্ধা নিয়ে স্বীকার করতে পারে তার বৈপ্লবিক উত্তরাধিকারকে, তাহলেই তার আদর্শ সার্থক হবে।"

সৃষ্টিশীল ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যাদর্শের সন্ধান দিতে বসে ডঃ অলোক রায় তাঁর 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ শিল্প-ব্যক্তিত্বের সংকট' প্রবন্ধে এই বিস্তৃত তথ্যের অবতারণা করেছেন। কেননা বুদ্ধিমান ও সংবেদনশীল ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে হলে এই তথ্যাদি জরুরী—তা অনুভব করেছেন ডঃ অলোক রায়।

ডঃ রায়ের এই ভাবনা যে কত প্রাসঙ্গিক তার পরিচয় আছে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের রচিত উপন্যাস 'তিমিরতীর্থ', 'মন্দ্রমুখর', 'শিলালিপি' থেকে 'মহানন্দা' প্রভৃতি উপন্যাসে, যেখানে প্রাকৃতিক ঝড় থেকে রাজনৈতিক ঝড়ের বর্ণনা ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ।

কম্যুনিস্ট পার্টির এই সহযাত্রী কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'সহযাত্রী'ও থাকতে পারেননি, তারই সুস্পষ্ট ঘোষণা তিনি করেছিলেন তাঁর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন—

> "দেশের শুভাশুভের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রয়োগফলের উপরেই যে কোনো মতবাদকে আমি বিচার করি। আজ দেখছি, কমিউনিজম চৈনিক পররাজ্য লোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হয়েছে। এই কমিউনিজম আমার শত্রু, সমস্ত মানবতার শত্রু। আমার লেখায় তার বিরুদ্ধে ধিক্কার সহস্রকণ্ঠে ফেটে পড়ুক।"

এই বক্তব্যের কথা স্মরণে রেখেই বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করে ডঃ রায় লিখেছেন ঃ 'মনে হয়, ক্রমশ এক ধরণের হতাশা নৈরাশ্য গ্রাস করছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে, পলিটিক্যাল বিশ্বাস আর রক্ষা করতে পারছেন না, নৈরাজ্যবাদী মনোভাবও প্রচ্ছন্ন থাকছে না…।' ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিল্প-ব্যক্তিত্বের' এই সংকটই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসাবলীতে, সেই বিচারেই নিরত হয়েছেন প্রাবন্ধিক ; কিন্তু তিনি অন্য আর একটি দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বলেছেন ঃ

> "আমি বাঙালী আর ভারতবাসীর কথা লিখবো—লিখবো তাদের দুঃখের কাহিনী, বেদনার রূপ, সংগ্রামের ইতিহাস।"
>
> (শিল্পীর স্বাধীনতা)

ঔপন্যাসিকের দেওয়া এই নিজস্ব প্রতিশ্রুতিই পালন করেছেন তিনি তাঁর 'উপনিবেশ' থেকে শুরু করে 'কৃষ্ণচূড়া', 'নির্জন শিখর' পর্যন্ত নানা উপন্যাসে যেখানে তিনি প্রকরণ নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কেননা 'ছায়াচিত্রে'র প্রয়োজনে উপন্যাস লিখতে বসে তাঁকে উপন্যাসকে 'চিত্রনাট্যধর্মী'ও করে তুলতে হয়েছে। তবে প্রাবন্ধিক ডঃ রায় একটু ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর প্রবন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন—'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কুড়ি বছর প্রায় কাটলো কিন্তু এখনও তাঁর উপন্যাস নিয়ে ভালোমতো আলোচনা শুরু হয়নি।' আশা করি, উত্তর-কাল এই ক্ষোভ মেটাবে।

৩৮. 'সস্তা জনপ্রিয়তার স্বাদে আটকে' না থেকে যে শিল্পী পরিবর্তন-

শীলতাকেই তাঁর স্বধর্ম বলে জেনেছিলেন, সময়ের স্রোতে না ভেসে, যে শিল্পী সমকালীন সময় থেকে এগিয়ে থাকতেই সদাগ্রহী ছিলেন তাঁরই নাম সন্তোষকুমার ঘোষ ; যিনি চল্লিশ পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তর দশকেও বাংলা সাহিত্যের আসরে ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায় আপন আসনটি সুদৃঢ় করতে সফল হয়েছিলেন।

সাহিত্যের সব শাখায় সতত বিচরণশীল এই শিল্পী প্রধানতঃ ছোটগল্পকার, সেই তুলনায় তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য।

তাঁর প্রথম উপন্যাস—'নানা রঙের দিন' সম্পর্কে মন্তব্য করতে বসে প্রাবন্ধিক ডঃ কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী তাঁর 'সন্তোষকুমার ঘোষঃ আত্মজিজ্ঞাসায় উন্মুখ শিল্পী' প্রবন্ধে দুটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—এক, সমসাময়িক জটিল ঘটনা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ; দুই, 'হৃদয়াবেগ' যেগুলি এই উপন্যাস আলোচনায় উচ্চারিত হয়েছে। অথচ এরই পাশাপাশি তাঁর পরিণত কালের রচনা 'জল দাও' ও পরবর্তী উপন্যাসগুলি মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ; সেগুলিকে 'মনন-পরিস্রুত' আখ্যায় আখ্যায়িত করাই সঙ্গত।

এই পরবর্তী পর্বের উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে বসে প্রাবন্ধিক একটি গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ এই পর্বের উপন্যাসাবলীতে 'সমসাময়িক বিদেশী উপন্যাসের গঠন বা আঙ্গিক সুপার ইমপোজড্ হচ্ছে দেশি সমাজ ও ব্যক্তির জীবনকাহিনীতে।...ফলে বেঁকে-চুরে যাচ্ছে কাহিনীকথনের ভঙ্গিমা, দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে চেনা চেহারার আদল। এই ভগ্ন, ভঙ্গ, জটিল মুখচ্ছবি আসলে সময়, সমাজ ও লোকেরই, তাঁর সমকালীন পাঠক যাকে এখনও আয়ত্ব করতে নারাজ। প্রাপ্ত জনপ্রিয়তার সেখানেই সলিল-সমাধি।'

বিষয়-নির্বাচন ও আঙ্গিকের এই নিয়ত পরিবর্তনশীলতাকে বজায় রেখেই তিনি কেমন করে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ করে গেছেন তারই সার্থক রূপটি তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ চক্রবর্তী ; দেখিয়েছেন সস্তা জনপ্রিয়তার লোভ কখনই তাঁকে স্বধর্মচ্যুত করেনি।

• ৩৯. এক বিশেষ দেশে জন্মগ্রহণ করে, সেই বিশেষ দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম, মানুষ ও কালকে গ্রহণ করেও তাকে অতিক্রমণের ক্ষমতা যিনি দেখিয়েছেন, উপন্যাসে নিত্য নূতন বিষয় গ্রহণ ও বিষয়ানুগ মানুষকে যথাযথ চিত্রণের মাধ্যমে যিনি শিল্পী হিসেবে সকলের মধ্যেই হয়ে উঠেছেন সর্বভারতীয়—সেই জাতশিল্পীর নাম—সমরেশ বসু ; জীবিতাবস্থাতেই যিনি ছিলেন 'বহুবিতর্কিত প্রতিভা'।—এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ বীরেন্দ্র দত্ত তাঁর 'সমরেশ বসু ঃ পালাবদলের কথাকার' প্রবন্ধে।

উনিশশ' চব্বিশে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের দারিদ্রের দাপটে নিষ্পেষিত পরিবার-সমাজে জন্মগ্রহণ করে যে কিশোর বিদেশী শাসককুলের চাপানো আর্থসামাজিক বঞ্চনা, হতাশা আর বেদনা, অবক্ষয় আর অপচয়ের প্রেক্ষাপটে নিজের কৈশোর ও যৌবনকে যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই অনুভূতিপ্রবণ কিশোর চোখের সম্মুখে যেমন দেখেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলন,

তেমনি দেখেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সর্ববিনাশী মন্বন্তর আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষক্রিয়া। এই পরিবেশ ও কালই গঠন করেছিল এমন এক কিশোর-মনকে যাতে ব্যক্তি সমরেশ হয়েছিলেন সংসার-উৎকেন্দ্রিক জীবনস্বভাবী; কিন্তু একথাও সত্য যে এই যুগ পরিবেশই ভবিষ্যতের কথাকারের কেন্দ্রানুগ মানসগঠনের অন্তর্গূঢ় রসদ যুগিয়েছিল। ফলে কালগত ফলাফলের এক অবধারিত ফসল রূপেই আমরা পেলাম এক নতুন প্রজন্মের কথাকারকে আর তাঁর সৃষ্ট সমৃদ্ধ সাহিত্য ফসলকে। আমরা দেখলাম অজস্র কাহিনী, অসংখ্য চরিত্রস্রষ্টা সমরেশ বসুকে, আবার তারই পাশাপাশি জীবনরসিক 'কালকূট'কে, যিনি একাধারে 'কথাকার' ও 'চিত্রী'। এই কথাকার ও চিত্রীই রেখে গেছেন জীবনের শেষ অসমাপ্ত রচনা 'দেখি নাই ফিরে'।

ডঃ বীরেন্দ্র দত্ত তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কথাশিল্পী সমরেশ ও 'কালকূট' ছদ্মনামের নেপথ্যে থাকা চিত্রী সমরেশের শিল্প-প্রতিভার ও শিল্পী-স্বভাবের বিস্তৃত বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। এই প্রবন্ধের সমাপ্তি পর্বে এসে তিনি লিখেছেন : '...পূর্বসূরী ও সমকালীন—সমস্ত লেখকদের থেকে সমরেশ বসু উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও প্রকরণে নতুন এক বাস্তবতায় যে শিল্প-উপচার উপহার দিয়েছেন, তাঁর উপন্যাস পরিক্রমার সূত্রে তা প্রমাণ করে, তিনি বাংলা উপন্যাসের ধারায় লক্ষণীয় পালাবদলের প্রথম এবং প্রধান নায়ক।'

[৪]

'প্রথম খণ্ডে'র প্রবন্ধগুলির তুলনায় শেষ দশটি প্রবন্ধ চরিত্র বিচারে বিভিন্ন বলেই 'দ্বিতীয় খণ্ডে'র পরিকল্পনা। এই শেষ দশটি প্রবন্ধ আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাই এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি গ্রন্থ-পরিকল্পনার মূল বিভাগে সেইসব অমর স্রষ্টাকে আনিনি, যাঁরা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আঙিনায় হাস্যরসের প্রাণবন্ত প্রস্রবণ সৃষ্টি করতে হয়েছিলেন সফল। মূল ধারা থেকে পৃথক করে একটি মাত্র প্রবন্ধে আমি হাস্যরসধর্মী প্রথম সফল উপন্যাসের স্রষ্টা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আধুনিককালের সদাহাস্যময় শিবরাম চক্রবর্তী পর্যন্ত পাঁচজন বিশিষ্ট কথাশিল্পীকে নির্বাচন করেছি। প্রবন্ধটির শীর্ষনাম—'ইন্দ্রনাথ থেকে শিবরাম : হাস্যরসের প্রবাহ'।

রসস্রষ্টা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮—১৯১১) সাহিত্য জীবন শুরু করেন 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' নামে এক ক্ষুদ্র ব্যঙ্গকাব্য গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। কিন্তু 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের স্রষ্টা তারকনাথের উৎসাহে রচনা করেন 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' নামক দুটি ব্যঙ্গরসাত্মক উপন্যাস। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই দুটি উপন্যাসের প্রশংসা করতে বসে এই উপন্যাসদ্বয়ের স্রষ্টাকে টেকচাঁদ ও হুতোমের সমকক্ষ বলে উল্লেখ করেন। লক্ষ্য করার বিষয় 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' উপন্যাস দুটিতে ঔপন্যাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গের বিষয় হিসেবে ব্রাহ্মধর্মের নব্যচিন্তা-ধারাকেই নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু সর্বত্রই তিনি শুদ্ধ রুচিবোধকে বজায় রাখতে পারেননি।

ঔপন্যাসিক ইন্দ্রনাথের পথানুসরণ করেই ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুও (১৮৫৪—১৯০৫) নব্য ব্রাহ্মদের নিয়ে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই রচনা করেন তাঁর 'মডেল ভগিনী' যা ব্যঙ্গ হিসেবে হয়েছিল উপভোগ্য। এছাড়াও 'নেড়া হরিদাস', 'মহীরাবণের আত্মকথা' ও 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' নিঃসন্দেহে ব্যক্তি-ব্যঙ্গ হিসেবে উল্লেখ্য। তাই তাঁকে ইন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় বললে অত্যুক্তি হয় না।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই আর এক 'বন্দ্যোপাধ্যায়' হাস্য ও ব্যঙ্গের প্রবাহ সৃষ্টিতে কুশলতার সাক্ষ্য রেখেছিল, তিনি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩—১৯৪১)। কেদারনাথের উপন্যাসে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্রে 'হাসির সঙ্গে অশ্রুর মিলন'। আর এই হাস্যরসের ধারাটি এসেছে দেশ পরিভ্রমণের পথ ধরে। দেশ পরিক্রমা করতে গিয়ে তিনি যে সব অসঙ্গতি দেখেছেন, তাই হয়েছে তাঁর হাস্যরস সৃষ্টির উপজীব্য, তবে কোথাও কোথাও তা স্থূল হয়ে পড়ায় সাহিত্য-সুষমা হয়েছে ব্যাহত। কথার মার'প্যাঁচে যে শ্লেষের অভিব্যক্তি ঘটে তা যেমন তাঁর 'আই হ্যাজ' উপন্যাসে লক্ষনীয়, তেমনি 'অনুপ্রাসে ও বিরোধাভাসে যে রস উথলে ওঠে', তাও তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্মরণীয়। তাঁর 'শেষ খেয়া', 'ভাদুড়ি মশাই', 'পাওনা' নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য উপন্যাস। কেউ কেউ তাঁর রচনায় বিদেশী কথাশিল্পী ডিকেন্সের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। উপন্যাসের ব্যাপক ক্ষেত্রে হাস্যরসের প্রয়োগে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

হাস্যরসের সহজ প্রবাহে যিনি তরঙ্গ সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯)। তাঁর সৃষ্ট 'উদ্ভট হাস্যরস' বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারা সৃজনে হল সমর্থ। কেউ কেউ একে 'অদ্ভুতরস' রূপেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তমালা' ও 'ডমরু চরিত' আমাদের সামনে এক অজ্ঞাত-পরিচয় জগতের রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করে দিল, আমরা এক অজানা দেশের অধিবাসীদের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হলাম।

রসস্রষ্টা ইন্দ্রনাথ থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত স্বল্পকালে যে হাস্যরসের ধারা প্রবাহিত হয়ে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে রসসিক্ত করে তুলেছিল,—সেই রসধারা সৃষ্টির উত্তরাধিকার নিয়ে আধুনিককালে উপস্থিত হলেন সাহিত্যিক শিবরাম, যিনি অন্যকে হাসান কিন্তু নিজে হাসেন না। যাঁর মধ্যে 'শ্লেষ আছে কিন্তু দ্বেষ নেই—সে সরসতা সরলতারই অন্য নাম।' যাঁকে 'আজকালকার গণসাহিত্যের নির্ভুল পথগামী' বলেছেন বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। শিবরামের সহজ-সৃষ্ট কথাসাহিত্যে আমরা পেলাম কলহাস্যের মুখরতা। তাঁর 'হাসির হাওয়ার জন্য প্রত্যেকের হৃদয়ে উন্মুক্ত নিমন্ত্রণ।' তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে শিবরাম হাসির গল্প ও বিশেষত চুটকিধর্মী রচনায় যতখানি পারঙ্গম ছিলেন, উপন্যাসের সৃষ্টির ক্ষেত্রে ততখানি পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন নি। আসলে উপন্যাসের বৃহত্তর পটভূমিকায় 'যে ব্যাপক বিশ্ববীক্ষার দরকার, হয়তো

তার অভাব' ছিল শিবরামের সৃষ্টি কর্মে—এ মন্তব্য করেছেন একজন বিদগ্ধ সমালোচক। তিনি আরো বলেছেন—'জীবনের গভীরতর তলদেশে না গিয়ে, তিনি এর উপরিকার ঊর্মিমালায়ই বেশি কৌতূহলী।' ফলে ডবলিউ, ডবলিউ জেকবস্-এর প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও রসস্রষ্টা শিবরাম শুধু ব্যঙ্গরসিকই থেকে গেছেন —বুদ্ধিজীবিদের কাছে যাঁর আবেদন হয়েছে বিবর্ণ। জন-চিত্ততোষণের আয়োজন করতে গিয়ে শব্দানুপ্রাসে মেতে উঠেছেন, শব্দের কারিকুরিতেই হয়ে পড়েছেন সীমাবদ্ধ; জীবনের গভীরে প্রবেশ করা হয়ে ওঠেনি। ফলে বৈচিত্র্যপন্থী হয়ে উঠতে পারেননি বলেই এক ধরণের একঘেয়েমি তাঁর অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্ট প্রবাহকে স্বতোচ্ছল করেনি।' এরই প্রমাণ বহন করছে তাঁর 'প্রেমের প্রথম ভ গ', 'মেয়েদের মন', 'মেয়ে ধরা ফাঁদ', 'পাত্রপাত্রী সংবাদ' প্রভৃতি উপন্যাসাবলী। ডঃ দিলীপকুমার মিত্র পরিশ্রম করে এই পাঁচজন কৃতী স্রষ্টার রচনাবলী পর্যালোচনা করে একটি মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হল, যে সব বাঙালী মহিলা ঔপন্যাসিক বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছিলেন, তাঁদের সেই অন্ধকারের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে পাঠকদের স্মৃতির মুকুরে নতুন করে প্রতিবিম্বিত করার দায়িত্ব পালন করেছেন সাহিত্য-গবেষিকা শ্রীমতী দীপা চক্রবর্তী তাঁর রচিত 'বিস্মৃতপ্রায় মহিলা ঔপন্যাসিক ঃ সৃষ্টি ও সুর বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে।

এই প্রবন্ধে তিনি মূলতঃ ছজন বিস্মৃতপ্রায় মহিলা ঔপন্যাসিকের প্রসঙ্গ এনেছেন; এঁরা হলেন 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপ ধ্যায়েব দুই কন্যা সীতা ও শান্তাদেবী, আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া ও প্রভাবতীদেবী সরস্বতী। এছাড়াও আরো দু-তিন জনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, অনুসন্ধানে অগ্রসর হলে আরো নাম হয়তো সংগ্রহ করা অসম্ভব হত না, কিন্তু তা সম্ভব নয়। সম্পাদকই সেখানে বাধা হয়েছেন।

সীতাদেবী ও শান্তাদেবী—সহোদরা। প্রতিভার বিচারে এঁরা দুজনেই প্রায় সমতুল্য—এই ইঙ্গিত দিয়েই শ্রীমতী চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যে স্মরণীয় স্রষ্টা রূপে দুজন ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকের নামোচ্চারণ করেছেন, তাঁরা হলেন—শারলটী ব্রণ্টি ও এমিলি ব্রণ্টি, সম্পর্কে যাঁরা ছিলেন দুই সহোদরা। এই আকর্ষণীয় প্রসঙ্গটি নিয়ে সুবিস্তৃত বিচারে না বসেও শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেছেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যে ব্রণ্টি ভগ্নীদ্বয় যে ভূমিকা পালন করেছিলেন—বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই দুই বাঙালী মহিলা শিল্পীও অনেকটা সেই ধরণেরই ভূমিকা পালন করেছিলেন বাংলা-সাহিত্যাঙ্গনে; যদিও প্রতিভার বিচারে বাঙালী ভগ্নীদ্বয় ইংরেজ ভগ্নীদ্বয়ের সমপর্যায়ভুক্ত হয়তো নন। তবুও এঁদের নিজেদের উপন্যাসগুলি এবং যৌথভাবে রচিত 'উদ্যানলতা' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ রূপেই স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। শ্রীমতী চক্রবর্তী সীতাদেবীর 'রজনীগন্ধা' উপন্যাসটির সঙ্গে শান্তাদেবীর

'চিরঞ্জনী' উপন্যাসটির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে কোথায় এই দুই মহিলা কথাশিল্পীর দৃষ্টিতে আছে সাদৃশ্য আর কোথাই বা আছে বৈসাদৃশ্য। ভাষার বিচারেও এঁদের দুজনের রচনাতেই আছে সরসতা। এই তুলনামূলক আলোচনার ফলে প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য দুজন প্রমীলা শিল্পীর তুলনায় আশালতা সিংহ বা জ্যোতির্ময়ী-দেবীর প্রতিভা ছিল সীমিত; অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও ছিল স্বল্প। তা সত্ত্বেও স্বল্প সংখ্যক উপন্যাস রচনা করেও এঁরা তাঁদের স্বতন্ত্রতার সাক্ষ্য রেখেছেন। বিশেষ-ভাবে বলতে হয় এঁদের উপন্যাসের কোথাও কোথাও প্রতিভার বিদ্যুৎদীপ্তি যেন অংশ বিশেষকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর একটি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে বসে শ্রীমতী চক্রবর্তী তাঁর উপন্যাসে 'ভ্রমণ কাহিনী'র স্বাদ যেন আস্বাদন করেছেন। এতে হয়তো উপন্যাসের গঠনে কিছুটা শিথিলতা এসেছে, কিন্তু একথাও সত্য যে মহিলা শিল্পী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন।

কিন্তু যাঁর উপন্যাস বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে বলে শ্রীমতী চক্রবর্তী মনে করেছেন, তিনি হলেন তৎকালীন যুগের একজন স্বল্প পরিচিত মহিলা ঔপন্যাসিক শৈলবালা ঘোষজায়া। কারণ তৎকালীন সনাতন হিন্দু সমাজের একজন অন্তঃপুরিকা হয়েও তিনি সেই সময়কার সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ পরিবেশে লেখনী ধারণ করে এমন দুটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, যে দুটি উপন্যাস মুসলমান জীবন ও সমাজ-আশ্রয়ী। এই দুটি উপন্যাস হল—'শেখ আন্দু' ও 'মিষ্টি সরবৎ'। আজকের সাম্প্রদায়িক নানা সমস্যায় পীড়িত সমাজে বাস করে কথাশিল্পী ঘোষজায়ার এই প্রচেষ্টা যে আমাদের কাছে অভিনন্দনযোগ্য—তা অনস্বীকার্য।

তুলনায় বহু গ্রন্থ লেখিকা প্রভাবতীদেবী সরস্বতী সংখ্যায় অনেকগুলি উপন্যাস লিখলেও বিষয়বস্তু বা প্রকাশভঙ্গী—কোন দিক থেকেই তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন নি। তবুও নারীর অন্তর-মনের, সামান্য হলেও, সন্ধান দিতে তাঁর উপন্যাসগুলি পুরোপুরি অনুল্লেখ্য নয়। অন্তত কাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা দক্ষতা দেখিয়েছেন—এ মন্তব্য অসঙ্গত নয়।

এই প্রবন্ধে শ্রীমতী চক্রবর্তী একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে কাঠবেড়ালিদের যে ভূমিকা ছিল, যত তুচ্ছই হোক, তা কখনো অস্বীকৃত হওয়ার নয়। ঠিক তেমনি বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই সব বিস্মৃতপ্রায় মহিলা ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিও সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য সৃষ্টি করতে না পারলেও, এগুলি কোন ক্রমেই অপাংক্তেয় বলে অবহেলিত হওয়ার নয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধ রূপে এসেছে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর চরিত্রচিত্রণের বৈশিষ্ট্যালোচনা, বাংলা উপন্যাসের পরিধি প্রসারে যাঁদের সৃজনীশক্তি বিস্ময়কর ভূমিকা গ্রহণে সার্থক হয়েছিল। প্রথম সফল কথা-শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে যে সব বিচিত্রধর্মী পুরুষ ও নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রবন্ধটির শীর্ষনাম 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঃ বিচিত্র চরিত্রের চিত্রশালা।' রবীন্দ্র-উপন্যাসে আমরা পেলাম সেইসব পুরুষ ও নারী চরিত্রকে যারা আধুনিক কালের প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত, তাই এই প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ আধুনিক পুরুষ ও নারীর উপস্থিতি' শীর্ষনাম নিয়ে উপস্থাপিত। আর শরৎ-সাহিত্যে আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি যে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসাবলীতে নারীকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে নারী অনেক ক্ষেত্রেই পাদ-প্রদীপের আলোকে বেশী সমুজ্জ্বল তাই প্রবন্ধটি 'শরৎ-উপন্যাস ঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য' শীর্ষনামে নামাঙ্কিত হয়ে উপস্থাপিত। অধ্যাপক ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ডঃ অজিত ঘোষ—এই তিনটি প্রবন্ধ রচনায় পরিশ্রমসাধ্য প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন।

ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের সূচনাতেই নানা মুনির নানা মতের উল্লেখ করেও একটি সাধারণ সত্যকে মেনে নিয়েছেন, সেটি হল—তাঁর ভাষায় ঃ 'ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য সম্পর্কে—নানা মতের মধ্যে একটি সত্য অস্বীকার করা যায় না যে উপন্যাসে গল্প, মনোবিশ্লেষণ, তর্ক, ব্যক্তিত্ব-পরিচয়—যাই থাক না কেন, তা হবে চরিত্র-আশ্রয়ী। আর চরিত্রের মধ্য দিয়েই মানব জীবন সম্পর্কে একটি গভীর ও ব্যাপক সত্যকে রূপদানই তার কাজ।' এই প্রেক্ষাপটে রেখে বঙ্কিমসৃষ্ট চরিত্রগুলি বিচার করেত বসে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাও উল্লেখ্য। তিনি জানিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে উপন্যাসের কোন সৃষ্টি-ঐতিহ্য ছিল না। তাই তর্ক, মনোবিশ্লেষণের অতি সূক্ষ্ম গভীরতা বা আধুনিক কালের অতি পরিচিত 'চেতন প্রবাহ'-এর পরিচয় পাওয়ার প্রয়াস অবাস্তব। তবে তিনি গল্পকে বা বস্তুকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েই চরিত্রচিত্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রাবন্ধিক ডঃ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ—"তাঁর (বঙ্কিমচন্দ্রের) চরিত্র-চিত্রণে গভীরতার অভাব নেই, কিন্তু বিশ্লেষণের অভাব কতকটা আছে। চোখে দেখা জীবন্ত সর্বস্তরের সামাজিক মানুষের অভিজ্ঞতা কম থাকায় তাঁকে সৃষ্টিশীল কবিত্বপূর্ণ কল্পনার সহায়তা নিতে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই এবং ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার দিকেই তাঁর প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা গেছে।" মূলতঃ এই মন্তব্যের আলোকেই প্রবন্ধকার ডঃ মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রাবলীর বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন।

ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ক প্রবন্ধটি রচনা করতে বসে প্রথমেই জানিয়েছেন কথাশিল্প-সৃষ্টিপ্রয়াসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল চরিত্রসৃষ্টি। এই প্রসঙ্গেই তিনি ঔপন্যাসিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ এনে জানিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস সৃষ্টি করতে বসে চরিত্র সৃষ্টির দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং তিনি বুঝেছিলেন যে 'উপন্যাস লেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন।' কিন্তু এই 'অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে' বঙ্কিমচন্দ্র যতখানি সফল তার চাইতে অনেক বেশী সফল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—এই মন্তব্য করেছেন

প্রাবন্ধিক গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতে বঙ্কিম-পরবর্তীকালে উপস্থিত হয়ে পাশ্চাত্য জীবনরসরসিত-চিত্ত রবীন্দ্রনাথ, রেনেসাঁসের নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাসে মর্ত্যমানবের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে যথোচিত মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁর কথাসাহিত্যে তাই নারী ও পুরুষ চরিত্রের ব্যক্তিত্ববোধের ক্রমোন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে রেখেই প্রাবন্ধিক অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্র-উপন্যাসের অসংখ্য পুরুষ ও নারী চরিত্রের বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছেন।

ডঃ অজিত ঘোষ অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উল্লেখের মধ্য দিয়েই শরৎ উপন্যাসের চরিত্রাবলী বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। শরৎচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন যে,—"প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই। তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিস আছে তাহাতে প্লট কিছু নাই, আসল জিনিস, কতকগুলি চরিত্র ; তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়।" শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য স্মরণে রেখেই প্রাবন্ধিক ডঃ ঘোষ বলেছেন যে—'প্লট কখনও আপনি এসে পড়ে না।' লেখকের সুস্পষ্ট চিন্তা, পরিকল্পনা ও বিন্যাস কুশলতা থেকেই প্লটের উদ্ভব হয়। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে ক্রিয়া ও ঘটনার সুগঠিত, সুবিন্যস্ত রূপের মধ্যেই চরিত্র সবল ও সজীব হয়ে ওঠে।" শরৎচন্দ্র সৃষ্ট চরিত্রাবলী বিশ্লেষণে বসে ডঃ ঘোষ মূলতঃ এই প্রেক্ষাপটটিকেই ব্যবহার করেছেন।

প্রবাসী বাঙালী হওয়ার সুবাদে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে যাঁর সহজ অধিকার সেই প্রাবন্ধিক ডঃ বিবেকানন্দ দেব তাঁর মূল্যবান 'বাংলা ও হিন্দী উপন্যাস : তুলনার আলোকে' প্রবন্ধে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করে স্বীকার করেছেন যে হিন্দী উপন্যাস সাহিত্য বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের কাছে ঋণী। কেননা শুধু বাংলা উপন্যাসই নয়, ভারতীয় উপন্যাসেরই জনক হলেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডঃ দেব দেখিয়েছেন প্রকৃত পক্ষে প্রথম দিকে বাংলা উপন্যাস অনুবাদের মাধ্যমেই হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তবে ক্রমেই তা অনুবাদের ধারাতিক্রম করে আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উপযোগী হয়ে উঠতে থাকে। বলা বাহুল্য, স্বাধীন ভারতে 'হিন্দী' রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ায় হিন্দী ভাষার চর্চার উদ্যোগ যেমন বর্ধিত হয়েছে, তেমনি হিন্দী সাহিত্য সৃজনের খাতে দেখা দিয়েছে দুর্বার জোয়ার।

প্রাবন্ধিক ডঃ দেব তাঁর সুলিখিত প্রবন্ধটি লিখতে বসে সূচনাকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়ের পরিধিকে তিনটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি প্রথম পর্বকে বলেছেন—'প্রেমচাঁদ-পূর্ববর্তী-যুগ, দ্বিতীয় পর্বটির নামকরণ করেছেন—'প্রেমচাঁদ যুগ' ও তৃতীয়টিকে—'প্রেমচাঁদ-উত্তর-যুগ' রূপে চিহ্নিত করেছেন। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে হিন্দী সৃজনী সাহিত্যে 'প্রেমচাঁদের' ভূমিকা অনন্যসাধারণ। বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে প্রেমচাঁদই তাঁর অসাধারণ

প্রতিভার স্পর্শে হিন্দী উপন্যাস ও ছোট গল্পের মানকে শুধুমাত্র ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নি, সেই মানকে তিনি বিশ্বপর্যায়ে উন্নীত করে দিয়েছেন। প্রেমচাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনাদর্শ, কাহিনী-কথনরীতি সম্পর্কিত আলোচনায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই একজন বাঙালী কথাশিল্পীর প্রসঙ্গ এসে পড়েছে, তিনি হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র যেমন বাংলা সাহিত্যে সামান্য জীবনের অসামান্য রূপকার রূপে, দরদী কথাশিল্পী রূপে চিরকালীন প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, হিন্দী তথা ভারতীয় সাহিত্যেও তেমনি প্রেমচাঁদ মানব দরদী কথাশিল্পী রূপে সম্মানিত হয়েছেন, যাঁর সাহিত্যে অবহেলিত মানুষের অধিকার পেয়েছে সার্বিক স্বীকৃতি। ডঃ দেব তাঁর প্রবন্ধকে এই তিন পর্বে বিভক্ত করে কিভাবে নানান ধারায় হিন্দী উপন্যাস সাহিত্য ক্রমে সমৃদ্ধির পথে জয়যাত্রা করেছে তারই সুন্দর রূপায়ণ করেছেন। প্রবন্ধটি আমাদের জানার জগতকে যে অনেকখানি প্রসারিত করেছে—তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূয়াঁ তাঁর 'বাংলা ও ওড়িয়া উপন্যাস : তুলনার আলোকে' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমেই আমাদের জানিয়েছেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ খৃস্টাব্দে রচিত হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' নামক যে গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন রেভারেণ্ড জে. স্টবিনস্ সেই উপন্যাসধর্মী রচনাটি ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেন ও তা প্রকাশিত হয় ১৮৫৭-৫৮ খৃস্টাব্দে। ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সমালোচক এই গ্রন্থটিকেই ওড়িয়া ভাষার প্রথম উপন্যাস বলে উল্লেখ করতে আগ্রহী। কিন্তু ডঃ ভূয়াঁ এই মন্তব্য সমর্থন করতে প্রস্তুত নন। তিনি জানিয়েছেন—রামশঙ্কর রায়ের 'সৌদামিনী' (১৮৭৮)-কে কিছু সমালোচক প্রথম ওড়িয়া উপন্যাস রূপে অভিহিত করার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু সমালোচক তাঁর 'বিবাসিনী' (১৮৯১)-কে প্রথম উপন্যাস বলে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু 'বিবাসিনী' রচিত হওয়ার পূর্বেই উমেশচন্দ্র সরকার 'পদ্মমালী' (১৮৮৮) উপন্যাস রচনা করেছিলেন। প্রাবন্ধিক ভূয়াঁ লিখেছেন যে এই 'পদ্মমালী' উপন্যাসটির ওপরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'ওয়ালটার স্কটের' প্রভাব পড়েছে বলে অনুমান করা হয়। 'বালেশ্বর সংবাদ বাহিকা' পত্রিকা ১৮৮৯-এর ২-রা মে তারিখে এই গ্রন্থটিকেই ওড়িয়া ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একটা তথ্য বোধহয় লক্ষ্য করা অযৌক্তিক হবে না, যে ওড়িয়া ভাষায় প্রথম দিককার উপন্যাসগুলি মূলতঃ উড়িষ্যা প্রদেশে বসবাসকারী বাঙালী কথাশিল্পীদেরই রচিত। রামশঙ্কর রায় কিংবা উমেশচন্দ্র সরকার নামগুলি সেই সত্যেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক ডঃ ভূয়াঁ অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করে আমাদের কাছে যে তথ্যবহুল সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠিয়েছেন তাতে তিনি নানান ক্ষেত্রে বাংলা ও ওড়িয়া ঔপন্যাসিকদের তুলনার আলোকে এনে আলোচনা করেছেন। কোথাও কোথাও বিষয়ের নতুনত্ব সৃষ্টিতে ওড়িয়া ঔপন্যাসিকেরা যে বিশেষ কৃতিত্বের

পরিচয় দিয়েছেন, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে রচিত গোপালবল্লভ দাসের 'ভীমাভূয়া' উপন্যাসটি মূলত আদিবাসী জীবন নিয়ে রচিত একটি উল্লেখ্য উপন্যাস। সম্ভবতঃ ভারতীয় কোন ভাষাতেই আদিবাসী জীবনকে উপজীব্য করে এর পূর্বে কোন উপন্যাস রচিত হয়নি; সুতরাং বিষয়বস্তুর বিচারে এই অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে গোপালবল্লভের প্রাপ্য।

আরো একটি বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ডঃ ভূয়াঁ। বরেণ্য স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা ঔপন্যাসের গতিকে অন্য দিকে মোড় ফেরান; যাকে ডঃ ভূয়াঁ 'মনস্তাত্ত্বিক ধারা' বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি ওড়িয়া ঔপন্যাসিক কুন্তলাকুমারী সাবত-এর (১৯০০—১৯৩৮ খৃস্টাব্দ) 'পরশমণি' ও 'রঘু অরক্ষিত' উপন্যাসদ্বয়ের নামোল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের সফলতার তুলনায় কুন্তলাকুমারী নগণ্য হলেও ওড়িয়া উপন্যাসের গতি তিনিই বদলে দেন।' বলা বাহুল্য, এমনই নানান তথ্যে সমৃদ্ধ একটি মূল্যবান প্রবন্ধ উপহার দিয়ে ডঃ ভূয়াঁ বাঙালী পাঠকদের কৃতজ্ঞ করেছেন।

[৫]

ইতিহাসের আমোঘ ইঙ্গিতে রাজনীতির আবর্তে বঙ্গভূমি বিভক্ত হয়ে জন্ম নিল পূর্ব পাকিস্তান, যার আবার নবজন্ম ঘটল 'বাংলাদেশ-এর আবির্ভাবে। এই পূর্ব পাকিস্তানেই ওপারের বাঙ্গালীর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত ঘটে নানা পথে—তার মধ্যে উপন্যাস সৃষ্টির সাধনা অন্যতম। মনে রাখতে হবে, 'মহাকাব্যের যুগের সমাপ্তিতে জীবনের সামগ্রিকতাকে ধারণ করে রাখার জন্যে সাহিত্যের যে প্রকরণটির জন্ম হয়—তাই উপন্যাস। এই নবোদ্ভূত প্রকরণের মাধ্যমে জীবনের সার্বিক রূপায়ণে ইউরোপীয় সাহিত্যে গত শতক থেকেই যে তৎপরতা দেখা যায়; বাংলা সাহিত্যে তার সার্থক সূত্রপাত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাস থেকে। তার অনেক পরবর্তীকালে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে সামাজিক জীবনের যথার্থ রূপ ফুটে উঠতে দেখা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এ। বাংলাদেশের সাহিত্যে এই একই ধরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তান-যুগেই; ষাটের দশকের শুরুতে। শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' ও সরদার জয়েনউদ্দীনের 'অনেক সূর্যের আশা'—নিঃসন্দেহে ইতিহাস চেতনা সমৃদ্ধ এপিক ধর্মী উপন্যাস। এই দুটো উপন্যাসেরই কাহিনী রচিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিস্তৃত পটভূমিকায় এবং সে কাহিনীর প্রসারণ পাকিস্তান যুগ পর্যন্ত।

লক্ষ্য করা যায় যে, পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকেই ইতিহাসের দর্পণে জীবনাবলোকনে সচেষ্ট হলেন প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক আবু জাফর শামসুদ্দীন যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পরিক্রমা করে রচনা করলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস —'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান।' এই উপন্যাসের রচনা শুরু হয় ১৯৬১ সালের ১লা নভেম্বর আর তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৬৮ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী। 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' মূলতঃ একটি সুবৃহৎ পরিকল্পনার সূচনা; ঊনবিংশ শতাব্দী

থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসকে উপন্যাসের আধারে পরিবেশন করাই ছিল এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাধীন বাংলাদেশে এই উপন্যাসই নতুন নামে প্রকাশিত হয়, নাম হয়—'পদ্মা মেঘনা যমুনা।' গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত প্রসারিত পটভূমিতে পরিস্থাপিত এই উপন্যাসে আমরা ঔপন্যাসিককে অত্যন্ত সততার সঙ্গে মুসলমান ও হিন্দুসমাজের বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত চিত্রণ করতে দেখি। বলা চলে, এই উপন্যাসটির সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্য-এর ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রকাশে। ইনি যেমন ঐতিহাসিক বাস্তবের দ্বান্দ্বিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি ছিলেন ঔপন্যাসিক সরদার জয়েনউদ্দীনও। তাই তাঁকে আমরা পাকিস্তান আমলেই পাকিস্তানের মোহভঙ্গের পাঁচালী রচনা করতে দেখি তাঁর 'অনেক সূর্যের আশা' –উপন্যাসে। একজন বাংলাদেশী আলোচক মন্তব্য করেছেন ঃ 'অনেক সূর্যের আশা'-র যেখানে শেষ স্বাধীন বাংলায় প্রকাশিত 'বিস্তৃত রোদের ঢেউ'-এর শুরু সেখানেই।'

স্বাধীন বাংলাদেশ বলতেই উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল ভয়ংকর রাত্রির কথা স্মরণে আসে—যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে বাংলাদেশ, বিশেষ করে ঢাকা নগরী। দুঃস্বপ্নের সেই রাতে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে নিযুক্ত থেকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক তিন মাসের মধ্যে লিখলেন একটি উপন্যাস—'রাইফেল রোটি আওরাত।' সেই ঔপন্যাসিকের নাম আনোয়ার পাশা। এই উপন্যাসেই তিনি আশা প্রকাশ করে উচ্চারণ করেছিলেন যে পুরোনো জীবনটা শেষ হয়ে জাগবে নতুন আশা, নতুন মানুষ—যে মানুষ নতুন প্রভাতে নতুন পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। গভীর প্রত্যয় নিয়ে যা তিনি লিখেছিলেন তাই সত্য হল। মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষিত ষোলই ডিসেম্বরের প্রার্থিত প্রভাত এল। বিজয় ঘোষিত হল, হল স্বাধীন বাংলাদেশ। তার দুদিন আগেই উৎসর্গিত হয়েছে আনোয়ার পাশার প্রাণ দেশমাতৃকার পদপ্রান্তে। বলা সঙ্গত যে এই শহীদ ঔপন্যাসিকের হাতেই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্তের আত্মসমীক্ষা মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্তেরই শ্রেণীচরিত্রের সমীক্ষা। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের কঠিন আত্মসমীক্ষা ও বৈপ্লবিকবোধের এক নতুন মাত্রা যে বাংলাদেশের উপন্যাসে এই সময় অভিযোজিত হয়েছিল এই ঔপন্যাসিকের সার্থক প্রচেষ্টায়—সে সত্য অনস্য কার্য।

আনোয়ার পাশার সঙ্গে পাশাপাশি রাখার মত আর একজন ঔপন্যাসিকের নাম শওকত ওসমান যিনি ইয়াহিয়া খানের উল্লাসমুখর পশুশক্তির আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ ত্যাগ করে এসে লিখলেন এক উপন্যাস—'জাহান্নাম হইতে বিদায়' যে বইটি 'দুঃখিনী জননী বাংলাদেশ ও তার বীর সন্তান মুক্তি ফৌজের জন্যে উৎসর্গীকৃত'। ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে রচিত এই উপন্যাসটি শুধুমাত্র সচেতন ঔপন্যাসিক ওসমানেরই নয়, মূলতঃ সেদিনের শত শত স্বদেশত্যাগী বিবেকী বাঙালীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াই এই উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত।

পরাধীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে

কথাশিল্পীদের যাত্রা শুরু হল নতুন করে, নতুন ভাবে। স্বাধীন স্বদেশভূমিতে দাঁড়িয়ে শওকত ওসমান রচনা করলেন একটি উল্লেখ্য উপন্যাস—'নেকড়ে অরণ্য।' বলা বাহুল্য, এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু মুক্তি-সংগ্রামের সেই আন্দোলিত দিনগুলির সঙ্গে বিজড়িত। মুক্তিযুদ্ধের সংকটকালে পাকিস্তানের বর্বর সৈন্যদের পাশবিকতা ও রিরংসা চরিতার্থতার জন্য বন্দিনী কয়েকজন বাঙালী নারীর জীবনালেখ্যই এই উপন্যাস। স্বল্প কয়েকটি রেখার টানে শুধুমাত্র জীবনচিত্রগুলিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, এক গভীর জীবন সত্তাও সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে। এইখানেই কথাশিল্পী ওসমানের সাফল্য। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত সমালোচক এই উপন্যাসটিকে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি আত্মিক দলিল' বলে অভিহিত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, "ভবিষ্যতে যিনি স্বাধীন-সংগ্রাম ভিত্তিক উপন্যাস রচনা করবেন কিংবা এ ইতিহাসের একটি অখণ্ড পরিচয় অনিষ্ট হবে যাঁর, তথ্যের জন্য নানা নথিপত্র যেমন ঘাটতে হবে তাঁকে, তেমনি শওকত ওসমানের 'নেকড়ে অরণ্য'ও হতে পারবে তাঁর জন্য এক মূল্যবান উপাদান; কারণ 'বাংলায় ইতিহাসের একটি বেদনার্ত পরিচ্ছেদের সজীব অভিজ্ঞান' এই উপন্যাসটি।"

এই উপন্যাসটির সূত্র ধরেই একে একে সমগোত্রীয় যে উপন্যাসগুলির নামোল্লেখ করা যায়। সেগুলি হল: শওকত আলীর 'যাত্রা', রসীদ হায়দারের 'খাঁচায়', আমজাদ হোসেনের 'অবেলায় অসময়', শওকত ওসমানের 'দুই সৈনিক', রাবেয়া খাতুনের 'ফেরারী সূর্য' আর সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড'। বলা বাহুল্য, এগুলি কোন অর্থেই মুক্তির সংগ্রামের রক্তাক্ত পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মহাকাব্যিক উপন্যাস নয়, তবে এই সব উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের কালের আবেগ গ্রথিত যে খণ্ডচিত্রগুলি রচিত হয়েছে তাই হবে অনাগত কালের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত মহাকাব্যিক উপন্যাসের সার্থক উপাদান। এইসব উপন্যাসে উপন্যাসোচিত সামগ্রিকতা বা আঙ্গিকগত অসম্পূর্ণতা থাকলেও, একথা সত্য যে এইসব উপন্যাসে অবক্ষয়বিরোধী এক সুস্থ চৈতন্যের ধারা প্রবাহিত।

সময়ের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের দুরন্ত অভিঘাতের যে আলোড়ন, যে আবেশ, যে চঞ্চলতা সৃষ্ট হয়েছিল তা কেটে যেতে শুরু করল। কথাশিল্পীরা ক্রমেই দৃষ্টি ফেরালেন ব্যক্তিমনের রহস্য উদ্ঘাটনে। রশীদ করিমের 'আমার যত গ্লানি'—এই বক্তব্যেরই সত্যতা বহন করছে। এই ঔপন্যাসিক ব্যক্তি-মনের রহস্য সত্তার বিষয়েই বেশী আগ্রহী তাই তিনি সমাজে পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে না দেখে ব্যক্তিমানস-দর্পণে সমাজের প্রতিচ্ছবি দেখতে উৎসুক—এইখানেই তাঁর শৈল্পিক সাধনার সার্থকতা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এরপর এমন কয়েকজন কথাশিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁরা প্রচুর সম্ভাবনার উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন। এঁদের মধ্যে হুমায়ুন আহমেদ সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। প্রাসঙ্গিকভাবেই এই সঙ্গে উচ্চারিত হয় একটি নাম—সোমেন চন্দ, যিনি মূলত স্বল্প সময়ের উপস্থিতিতেই বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে তাঁর অক্ষয় সম্পদ রেখে গেছেন। এই সোমেন চন্দই আহমেদের প্রেরণার উৎস। তিনি লিখেছেন:—"সোমেন চন্দের

লেখা অসাধারণ ছোট গল্প 'ইঁদুর' পড়ার পরই নিম্নমধ্যবিত্তদের নিয়ে গল্প লেখার একটা সুতীব্র ইচ্ছা হয়। নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার ও মন সুবিজন নামে তিনটি আলাদা আলাদা গল্প প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেলি।" তবে একথা অসত্য নয় যে হুমায়ুন সোমেন চন্দের চেতনার গভীরে প্রবেশে সমর্থ নন। আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যধারার এক অনামান্য শক্তিশালী শিল্পী বিপ্লবী সত্তার অধিকারী সোমেন চন্দ যদি ফ্যাসীবাদীর ছুরিকাঘাতে অকালপ্রয়াত না হতেন, তবে তিনি বাস্তববাদী শিল্পী-রীতির এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা রূপেই স্বীকৃতি লাভ করতেন। প্রকৃতপক্ষে, হুমায়ুন আহমেদ সোমেন চন্দের চেতনার গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি ঠিকই, কিন্তু তাঁর রচনা শৈলীর দ্বারা হয়েছিলেন বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত। তাই হুমায়ুনের রচনায় বাস্তব বর্ণনায় কথাশিল্পী চন্দের প্রায় আক্ষরিক অনুসৃতি লক্ষ্য করার বিষয়।

সোমেন চন্দ-অনুপ্রাণিত হুমায়ুন আহমেদের নামের সঙ্গেই নাম করা যায় মাহমুদুল হক-এর যিনি তাঁর 'যেখানে খঞ্জনা পাখী' উপন্যাস নিয়ে অতি সহজেই প্রবেশ করলেন সাহিত্যাঙ্গনে। কিন্তু তাঁর প্রতিভার কথা স্বীকার করেও বলতে হয় যে এই শিল্পী ব্যক্তিকভাব বৃত্তে বন্দী। পুঁজিবাদী অবক্ষয়ের অবাধ সংক্রমণও এঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে দুষ্ট করে তুলেছে। ইনি জীবনের খণ্ডাংশকে যতখানি আলোকিত করতে পারেন, জীবনের সামগ্রিকতাকে ততখানি ধরতে পারেন না; সমাজ জীবনের যবনিকা উত্তোলন তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় না বলেই—এঁর সৃষ্ট সাহিত্যে আছে এক ধরণের সীমাবদ্ধতা। ঐখানেই ঔপন্যাসিক হকের সৃষ্টি-শক্তির সীমাবদ্ধতা সুচিহ্নিত।

'একজন' শীর্ষক উপন্যাস নিয়ে উপস্থিত হলেন সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, যাঁর উপন্যাসের শীর্ষ নামের মধ্যেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার; যদিও তাঁর উপন্যাসে পরিপার্শ্ব চেতনার পরিচয়ও প্রকাশিত। তাঁর 'দেশ গেরামের মানিষ্যি'-তে যেমন পরিপার্শ্ব চেতনার পরিচয় আছে, তেমনি আছে পরিণত সৃষ্টির বেশ কিছু চিহ্ন। তবুও উল্লিখিত তিন শিল্পীকে এখনো অনেক পথ পেরোতে হবে সাফল্যের শীর্ষে উত্তরণে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সৃজনমূলক সাহিত্য ধারায় ক্রমেই নতুন নতুন শিল্পীর নাম সংযোজিত হচ্ছে, পাশে থাকছেন পুরোনো শিল্পীরা। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাণবন্ত শিল্পসম্পদে প্রথমেই সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের উপন্যাস—তারই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সার্থক সমীক্ষা করেছেন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ—তাঁর প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ একটি মূল্যায়নধর্মী সমীক্ষা'য়। তাঁর নিজস্ব অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে যেভাবে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছেন, তাতে উপন্যাসের এক প্রবহমান রূপাঙ্কন লক্ষ্য করি। আর এই প্রবন্ধেরই পরিপূরক-রূপে এসেছে ডঃ আক্রম হোসেন লিখিত 'বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ আঙ্গিক বিবেচনা' শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধটি। এই দুটি প্রবন্ধ 'প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস'

গ্রন্থের মর্যাদাই বৃদ্ধি করেনি, তা দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ধারার যুগ্মবেণী রচনায় হয়েছে সমর্থ। এক আত্মিক সম্পর্কে আমরা হয়েছি আবদ্ধ।

[৬]

শেষ প্রবন্ধ 'বাঙালী ঔপন্যাসিক : ইংরাজী উপন্যাস' নিঃসন্দেহে এক বিশেষ বিষয় সংযোজন' রূপেই বিচার্য। আমরা বাঙালী উপন্যাস পাঠকেরা বাঙালীর হাতে ইংরাজী উপন্যাস রচনার প্রসঙ্গ উঠলেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত—'Rajmohon's wife'-এর নাম স্মরণ করি। কিন্তু প্রাবন্ধিক ডঃ রণিত বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ইংরাজী উপন্যাস রচিত হওয়ার বহু পূর্বেই অন্তত চারজন বাঙালী স্রষ্টা ইংরাজী উপন্যাস রচনা করে তাঁদের প্রতিভার পরিচয় রেখেছিলেন। তাঁরা হলেন—মোহনপ্রসাদ ঠাকুর. ইনি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহ-গ্রন্থাগারিক। রামতনু গঙ্গোপাধ্যায়, কৈলাশচন্দ্র দত্ত ও শশীচন্দ্র দত্ত। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৬ সালে মোহনপ্রসাদ ঠাকুর রচিত উপন্যাসের কাল থেকে বর্তমান কালের ১৯৯১ পর্যন্ত সময়ের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত বাঙালী ঔপন্যাসিকের প্রসঙ্গ আলোচনায় যাঁদের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা হলেন মোহনপ্রসাদ ঠাকুর. রামতনু গঙ্গোপাধ্যায়, কৈলাশচন্দ্র দত্ত, শশীচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, তরু দত্ত, শরৎকুমার ঘোষ, শুদ্ধমোহন মিত্র (এস. এম. মিত্র নামেই বেশী পরিচিত). ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানী ভট্টাচার্য, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, শকুন্তলা দত্ত, উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ ঘোষ ও ভারতী মুখোপাধ্যায়। উল্লিখিত আঠারোজন রচয়িতার রচনা সম্বন্ধে তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থিত করে তিনি আমাদের জানার পরিধিকে প্রসারিত হতে যোগ্য সহায়তা করেছেন।

প্রাবন্ধিক ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী উপন্যাসের স্রষ্টারূপে যে আঠারোজন বাঙালী ঔপন্যাসিকের নাম করেছেন, কালের বিচারে উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত তাঁদের সেই সৃষ্টিধারা প্রসারিত। এ মন্তব্য অযৌক্তিক নয়। এঁদের মধ্যে মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের—'Persian Tales' রচিত হয় ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে আর উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস রচিত হয়েছে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে। বিশেষত এই সব নতুন লেখক-লেখিকারা আজও সৃষ্টির কাজে ব্রতী বলেই সময় কালকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত প্রসারিত বলে মন্তব্য করেছি।

আলোচ্য স্রষ্টাদের মধ্যে দুটি নামের উল্লেখ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য বিশদ করা প্রয়োজন। স্বর্গীয় শুদ্ধমোহন মিত্র ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে—'Hindupour' নামে ৩১৭ পৃষ্ঠার যে গ্রন্থটি রচনা করেন, গ্রন্থাগারে সেই গ্রন্থের পরিচিতি লিখতে বসে এটিকে —'Autobiographical Romance' অর্থাৎ 'আত্মজীবনীমূলক রোমান্স' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সুতরাং এক বিশেষ ধরণের রচনা নিঃসন্দেহে তবুও রচনার উপন্যাসধর্মিতাকে অস্বীকার করা যায় না বলেই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় শুদ্ধমোহন মিত্রের রচিত গ্রন্থটিকে তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গেই নীরদ চন্দ্র

চৌধুরীর কথা আসে। 'An Autobiography of an Unknown Indian' গ্রন্থটি রচনা করে যিনি ইউরোপের পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠা পান, তিনিই পরবর্তী কালে 'Thy Hand, Great Anarch' লিখে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হন। লেখক হিসেবে তিনি বিতর্কিত পুরুষ। সে আলোচনায় প্রবেশ না করেও 'An Autobiography of an Unknown Indian' গ্রন্থটি সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রখ্যাত বিদেশী সাহিত্য সমালোচক 'Edward Shils ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত 'Autumn' পত্রিকার ৫৪৯ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন—'An Autobiography of an Unknown Indian' হল 'an autobiography of a kind of life—not of a man'। তার জীবনই তো উপন্যাসের উপজীব্য, তাই এই মন্তব্যটিকে মনে রেখেই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থটিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা আরো জানি যে বিশ্ব বিখ্যাত 'The Spcetator' পত্রিকার ৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত সংখ্যার ৩৮ নং পৃষ্ঠায় 'ThyHand, Great Anarch' গ্রন্থটিকে '···is the sequel to the Autobiography of an Unknown Indian' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। তাই মনে হয় এই আলোচনায় নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর অন্তর্ভুক্তি অযৌক্তিক নয়; বিশেষত তাঁর মত বিরাট মাপের প্রতিভার উল্লেখ প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বিরল প্রতিভার অধিকারী, বিদেশবাসী, প্রখ্যাত বাঙালী বুদ্ধিজীবী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসের স্রষ্টা রূপে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের সকলের পক্ষে দাঁড়িয়েই যেন সওয়াল করেছেন—'কেন ইংরাজীতে লিখি?'

১৯৮৯ সালের ১লা এপ্রিল সংখ্যা, সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ'-এ একটি সাক্ষাৎকারে এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন ঃ

> "···১৯৩০-৩২ সালের পর থেকেই আমার ধারণা জন্মাল, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তা হলে আমি সময় নষ্ট করি কেন? ভারতবাসীর কাছে যদি বলতে হয়, বাঙালীর কাছেও যদি বলতে হয়, তা হলে আমি ইংরেজিতে লিখে সকলের কাছে যেতে পারব। খালি বাঙালীর কাছে বললে বাঙালী শুনবেও না, বুঝবেও না; কিছু করবেও না।"

পণ্ডিত প্রবর নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর এই বক্তব্যের সবটাই হয়তো ইংরাজী উপন্যাস রচয়িতা সব আধুনিক বাঙালী ঔপন্যাসিকদের বক্তব্য নয়; তবুও এই বক্তব্যের খানিকটা নিঃসন্দেহে সত্য। বিদেশে বসবাসকারী এইসব আধুনিক বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা বিশ্বের সাহিত্যাসরে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছেন যথেষ্ট সফল। ডঃ রণিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি এই দিক থেকেই শুধু তাৎপর্যপূর্ণ নয়—এ গ্রন্থের মূল্যবান সম্পদও।

সম্পাদক

অরুণ সান্যাল

ক্ষেত্র গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সেকাল, একাল, অনেককাল

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উঠলেই, এবং ১৯৮৮তে তাঁর জন্মের ১৫০-তম বর্ষে বার বারই কথা উঠছে—প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়ে যায়। পুরনো দিনের লেখকদের এখন এই প্রাসঙ্গিকতার ছাড়পত্র নিয়ে তবে কাছে আসতে হবে—যেন এটাই দস্তুর। মধুসূদন-বঙ্কিম তাঁদের সময়ে হয়তো বড় লেখক ছিলেন, হয়তো ইতিহাস তৈরি করেছিলেন ঃ সেসব ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের সহায় সম্পত্তি। শিক্ষিত সাধারণ বাঙালির কাছে সমকালীন উপযোগিতা ছাড়া তাঁদের পৌঁছবার পথ নেই।

এ জাতীয় মনোভাব যদি বেড়ে যেতে থাকে তো জাতির অতীতটাকে কেটে ছিঁড়ে বর্তমানের প্রয়োজন মাফিক ঘর্মাটে বেঁধে ফেলা হবে। পুরনো যা—পুরনো বলেই দামী নয়, কিন্তু দামী পুরনো—পুরনো থেকেই দামী, এখনও।

বঙ্কিম এখন থেকে একশ সোয়াশ বছর আগে তাঁর গল্পগুলো লিখেছিলেন। তারপর বাঙালির জীবন এবং মনের অনেকটাই বদলে গিয়েছে। সে সমাজ, পারিবারিক আদর্শ, মূল্যবোধ আর নেই। সাহিত্যের ভাষারও বত পরিবর্তন। এখনকার শিক্ষিত বাঙালি পাঠকও শুধুই উপন্যাস পড়ার আনন্দে কজন আর বঙ্কিম পড়বেন, যদিও অনেকেই বঙ্কিমকে বাংলা সাহিত্যের গর্ব বলে মুখে মানবেন। বঙ্কিম-রচনাবলীর অবশ্য ভালো বাজার আছে। তা দিয়ে পুরো বোঝা না গেলেও, এখনও কিছুলোক অ্যাকাডেমিক প্রয়োজন ছাড়াও বঙ্কিম পড়েন বলে মনে হয়। সম্ভবত রবীন্দ্র উপন্যাসের চেয়ে তাঁর পাঠক বেশি, শরৎ-ব্যতীত আধুনিক-পূর্ব যে-কোনো ঔপন্যাসিকের চেয়ে তো বেশিই। এর পরিসংখ্যান-ভিত্তিক সমীক্ষা কোনো গবেষক করেছেন বলে জানা নেই। তেমন কাজ হলে একালের পাঠকের মনের সঙ্গে বঙ্কিম সংযোগের বিষয়ে কিছু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছন যেত।

তবে একথা সবাই মানবেন, আজও বঙ্কিম উত্তপ্ত আলোচনার বিষয়। অ্যাকাডেমিক মহলে তো বটেই, তার বাইরেও। এবং এই বঙ্কিমচর্চার বেশির ভাগ তাঁর উপন্যাসকে কেন্দ্র করে।

তাঁর চিন্তা একসময় দেশকে জাগিয়েছিল, ঊনবিংশ শতকের প্রগতি ভাবনা এবং হিন্দু রক্ষণশীলতার টানাপোড়েনে গড়া মননশীল ঐতিহ্য হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধিজীবীদের বিশ্লেষণে সযত্নে সংরক্ষিত। যেন আরকাইভসে ঠাণ্ডা ঘরে তুলে রাখা—প্রয়োজনে নামানো হয়। প্রত্যক্ষ উৎসাহ যতটা আছে তা বঙ্কিম উপন্যাস সম্পর্কেই। এবং বঙ্কিম উপন্যাস যাঁরা কমবেশি পড়েন, কিংবা পড়েন না, তাঁরা অনেকেই—তিনি বাংলার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এই অভিধা বিচার না করেই মেনে বসে আছেন।

[২]

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রথম উপন্যাস-কার নন—ইতিহাস নিষ্ঠা থাকলে এ কথা বলতেই হবে। তাঁর আগে অন্তত আটজন এমন কাহিনী লিখেছেন যা প্রায় বা পুরো উপন্যাস। একটি তালিকা দেওয়া হল—

১. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস।
২. হানা ক্যাথারিণ ম্যলেন্স—ফুলমণি ও করুণার বিবরণ।
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস।
৪. প্যারীচাঁদ মিত্র—আলালের ঘরের দুলাল, মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়।
৫. লালবিহারী দে—চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান।
৬. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়—সরলার উপাখ্যান।
৭. ভূদেব মুখোপাধ্যায়—অঙ্গুরীয় বিনিময়।
৮. কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ।

আরও যে দু-একটি গদ্যকাহিনী লেখা হয়েছে তা অনুল্লেখ্য। বিশ্লেষণে দেখা যাবে ঐ আটজন লেখক তিনটি ভিন্নপথে গদ্য কাহিনীর সদর রাস্তাটি খুঁজেছেন।

প্রথম ধারা। ব্যঙ্গাত্মক সমাজ-বাস্তবতা—নকসা ও কাহিনীর মিশ্রণ : ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ।

দ্বিতীয় ধারা। ধর্ম ও নীতি প্রচারমূলক গল্প—কখনও বা পারিবারিক চিত্রাশ্রয়ী : ম্যলেন্স, লালবিহারী, মধুসূদন।

তৃতীয় ধারা। অতীতাশ্রয়ী (পৌরাণিক, কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক) ঘটনা প্রধান স্বাদু গল্প : বিদ্যাসাগর, ভূদেব, কৃষ্ণকমল।

এদের মধ্যে প্রথম দুই ধারা মিলে সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসের আদিরূপ এবং তৃতীয় ধারা ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সের। তবুও এঁরা যতটা আন্দাজে আধুনিক রূপের সন্ধানী, ততখানি সুনিশ্চিত পথপ্রদর্শক নন। এঁরা অনেকেই জানতেন না, কি করতে চাইছেন—উপন্যাস নামক শিল্পরূপের তাৎপর্য কি।

বঙ্কিমচন্দ্র উপরে উল্লেখ করা তৃতীয় ধারা ধরেই চললেন, সচেতন এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে, এ কথাও বলা গেল না। কারণ ১৮৬৫-তে 'দুর্গেশ নন্দিনী' বেরুবার আগে কিংবা প্রায় সমকালে তিনি 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ্' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। ১৮৬৪ সালে সেটি কাগজে ছাপা হয়। সে বইটি ইংরেজিতে লেখা এবং বিষয়বস্তু লেখকের সমকালের। এ দিয়ে বোঝা যায়, লেখক উপন্যাসে সামাজিক বর্তমানকেই ধরতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের আশ্রয়ে কাল্পনিক কাহিনীর প্রচলিত ধারাটি ধরে নিতে তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল। আবার সামাজিক-পারিবারিক-নৈতিক-ধর্মীয়-ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী কথনে তাঁর রুচি ছিল না, যদিও তিনি আলালকে বাংলা ভাষার প্রথম নভেল বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পুরোদস্তুর গল্প বলতে—

উত্থান পতন বন্ধুর নাটকীয় রীতির গল্প ; সেই কাহিনী হবে মানুষের কামনা-ঘৃণা তৃষ্ণা, ক্রোধ-ব্যর্থতায় তপ্ত। ইংরেজি ভাষার আড়াল দিয়ে একটি সামাজিক উপন্যাস লিখে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলেন—তাঁর অভিপ্রায় কাদম্বরী করা আদৌ সম্ভব কিনা। কিন্তু ফল যা দাঁড়াল তাতে তিনি যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তার প্রমাণ পরপর ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস লেখার মধ্যে (১৮৬৩-৬৯)। এবং প্রথম বাংলা উপন্যাস লেখার পরে সাতবছর সামাজিক কাহিনীর দিকে হাত বাড়ান নি।

অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ভেবেচিন্তে কোন্ দিক থেকে বাংলা উপন্যাসের ব্যাপারটা ধরবেন ঠিক করেছিলেন, আগেকার লেখকেরা একটা বাতাবরণ তৈরি করে তাঁর সন্ধানে সাহায্য করেছিলেন মাত্র। বঙ্কিম যেভাবে ইংরেজি সামাজিক উপন্যাসটি লিখেছিলেন তার সঙ্গে প্যারীচাঁদের রচনার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি যেভাবে ইতিহাস-মিশ্র রোমান্স লিখলেন তাতে ভূদেব-কৃষ্ণকমলের খুব দূরাগত ছায়াই শুধু আবিষ্কার করা যাবে।

[৩]

ভবানীচরণ-প্যারীচাঁদ-লালবিহারী সামাজিক জীবন নিয়ে যাঁরাই লিখেছেন তাঁরা সমাজের—পরিবারের ছবি এঁকেছেন, জমানো গল্প লিখতে চেষ্টা করেননি। জমাটি-গল্প চাই-ই, বঙ্কিম প্রথম থেকে এ-রকম ভেবে নিয়েছিলেন—ভূদেব, কৃষ্ণকমলের চেয়েও যা পাঠককে টানবে, ঘটনার পাকে পাকে এগুবে, কখনও সুর চড়বে, আবার নামবে, হঠাৎ করে বাঁক ফিরবে, উত্তেজনার শীর্ষে উঠবে—নিশ্চিত পরিণতিতে শেষ হবে। চারদিকের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়লেও আবার গুটিয়ে আসবে মূলধারায়। কোনো কিছুকে মুঠোর বাইরে যেতে দিলে চলবে না।

প্রশ্ন উঠবে, এ-জাতীয় রোমাঞ্চকর গল্প লঘু মনের উপযোগী খাদ্য হলেও উঁচু মানের শিল্প হিসাবে গণ্য হতে পারে কিনা। নাটকের ক্ষেত্রে এরূপ কাহিনী-ভিত্তি সবাই মেনে নিয়েছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। নেহাৎ একালে সুবলয়িত গল্পের হাত থেকে তার মুক্তি নতুন চিন্তার মুখ খুলেছে। য়ুরোপীয় ভালো উপন্যাস প্রথম থেকেই নাটককে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিল ওদেশে—ইংরেজিতে তো বটেই, এমন সব নাটক লেখা হয়েছিল, অন্য রকম কিছু না-করে উপন্যাসকে একটা স্বাধীন শিল্পরূপ হিসেবে ওদেশে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন হত। ইতিহাসাশ্রয়ী এবং ঘটনাবহুল পশ্চিমী উপন্যাসে উপাদান হিসাবে নাটকীয়তা যথেষ্টই আছে, কিন্তু বিবরণ বর্ণনার বিপুল আয়োজনের মধ্যে তার স্থান বেশ সংকীর্ণ। বাংলায় বঙ্কিমের সমকালে উচ্চাঙ্গের নাটক তেমন লেখা হয়নি। 'কৃষ্ণকুমারী'র কথা ছেড়ে দিলে শেক্সপিয়র অনুসরণ ছিল একেবারে বহিরঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন শিল্পী হিসেবে এই সুযোগ নিলেন। মানুষের জীবন, স্বভাব ও ভাগ্যসম্পর্কিত যে বোধ নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন তার সঙ্গে শেক্সপিয়রের কিছু কিছু সাদৃশ্য ছিল। ফলে ইংরেজ নাট্যকারের 'প্যাসন-কার্ভ'-এর মডেলটি অনেকটা আয়ত্ত করে নিতে তাঁর সুবিধে হয়েছিল। উপন্যাসকে তিনি এমন একটা শিল্পরূপ দিলেন যাতে ঐ সব নাটকের ধর্ম বর্তাল। য়ুরোপীয় উপন্যাসে দেখে

শেখা বুলি উচ্চারণ করাটা কোনো কাজের কথা নয়, যে নাট্যরীতিতে লেখা হলেই উপন্যাসের জাত নীচু হবে। মান উঁচু না নীচু তা রচনার ভেতর থেকে বুঝে নেওয়া দরকার।

বঙ্কিম উপন্যাসের মানের কথায় পরে আসব, আপতত এই সিদ্ধান্ত—

১. বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে নাট্যরীতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ;

২. তিনি ইতিহাস ও কল্পনা-মিশ্র কাহিনী কথনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

এই পথে বাংলা উপন্যাস মুক্তি পেল—অনেকদিন এই দুই বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হতে লাগল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে একটি স্বাধীন চরিত্র দিলেন, যা য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় জন্ম নিলেও তার অনুগত হল না।

[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম তিনটিতে এবং মোট বারোটির আটটিতেই ইতিহাসের অতীতে ঘুরে বেড়ালেন কেন, সে সমস্যার কোনো সমাধান সূত্র এখনও পেলাম না। শুধুই নাট্যরীতির খাতিরে? শুধু গল্পরস জমানোর জন্য? তিনি কি বর্তমান জীবনের তুচ্ছতা বিবর্ণতা থেকে অতীতের বর্ণাঢ্যতায় পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন?

তাঁর উপন্যাসগুলির ভেতরে একটু ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি দিলে এ প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যাবে। ভূমিকা হিসাবে দু-একটি প্রাথমিক কথা বলছি।

সমাজবাস্তবতার নানা মাত্রা আছে—সরল এবং জটিল। কোনো সময়ের জীবনধারার প্রত্যক্ষ ছবি ধরে রাখার চেষ্টা ঔপন্যাসিকেরা করতে পারেন। স্খলন পতনের দিকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিপাতে যে ছবি গড়ে ওঠে তাতে একধরণের বস্তুনিষ্ঠা পাওয়া যায়, তাতে শুধু বাইরের দিকটা ধরা পড়ে এবং আংশিকতার সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। যেখানে সোজা চোখে দেখা, তখন দৈনন্দিন জীবনচিত্র—যা সচরাচর শুধু বিবরণ। কখনও শক্তিশালী লেখক এইসব ছবিকে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস, সামাজিক ভাবাদর্শের সংঘাত প্রভৃতির মধ্যে নিয়ে যান—সেখানে বাস্তবতার গভীরতর মাত্রা।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্য বাস্তবতার সাধনা করেছিলেন। তিনি নতুন কালের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সন্ধানী ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের স্পর্শে যে নতুন মানবিক বোধের বিকাশ ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতায় তাকে কাহিনীতে ঠিকভাবে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। এই নবচেতনার মূলকথা ছিল মানুষের ব্যক্তিত্বের মুক্তি—কর্মে ও হৃদয়াবেগে এবং স্বদেশচেতনার উন্মেষে। শুরুতে ঐ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথাই প্রধানত ভেবেছিলেন। এদেশে সামাজিক কর্মের বিপুলতায় ও বৈচিত্র্যে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশের সব দরজাই বন্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় এখানে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিধিবিধানে ভারতবাসীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার সুযোগ ছিল না। তারা সমুদ্রে বাণিজ্যতরী বা নৌবহর ভাসাতে পারেনি। শাসনে, দৌত্যে, যুদ্ধে—রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে হাত দেবার সুযোগ পায়নি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার শহরে বিলাস-ব্যসনে টাকা উড়িয়েছে। ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণেরা নীচু ধাপের হাকিমী, স্কুলশিক্ষকতা, কেরাণিগিরি করেছে। প্রতিভায় শীর্ষে যাঁরা মহিমান্বিত তাঁরা সহমরণ নিষিদ্ধ বা বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো কর্মবীরকেও এ-ধরণের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। মুক্তি ছিল না বাস্তব জীবনের কর্মের উদ্দামতায়, বৈচিত্র্যে, বিশালতায়। মুক্তি শুধু চিন্তায়—স্বাতন্ত্র্য অনুভবে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে প্রণয়ে এই হৃদয় স্বাতন্ত্র্যকে খুঁজেছেন,—যে প্রেম সংরাগতপ্ত এবং বিদ্রোহী, ভয় বা লোভ, নীতি ও সমাজের বন্ধন, পাপপুণ্যের ধারণাকে ভেদ করে, সুখের তুচ্ছতা থেকে তীব্র যন্ত্রণায় আপনাকে চিনে নেয়—সেই প্রেম।

বঙ্কিম নব যুগের এই নব উপলব্ধির উপযোগী ঘটনাভিত্তি খুঁজে পেলেন না সমকালীন সমাজে। সে চেষ্টা যে করেছিলেন 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' নামের ইংরেজি উপন্যাস তার সাক্ষ্য হয়ে আছে। 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' সে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়েছে, সফল হল 'দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা'। উত্তাল জীবনের পাত্রেই মাত্র ধরা পড়বে সেই স্বাধীন উদ্দাম মন। অন্তত বঙ্কিমের এরূপ বিশ্বাস ছিল—ঘটনা আর চিত্তকে তিনি সমতালে বাজাতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর অতীতের বর্ণবহ্ন ইতিহাসে, তীব্র ঘটনাবর্তে পরিক্রমণ—ইতিহাসের কোনো বিশেষ পর্যায়কে তথ্যনিষ্ঠায় পুনর্নির্মাণ নয়। মধুসূদনও প্রায় একই কারণে পুরাণকে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

ইতিহাস ও কল্পনামিশ্র অতীতে সমাজবাস্তবতার এ এক অভিনব প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিম তাঁর নিজের মতো করে সময়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন, বর্তমানের দিকে পেছন ফেরেন নি।

[৫]

এর পরেও দু-একটি কথা ভাববার থাকে। বঙ্কিমের উপন্যাসে বারংবার ইতিহাসের মিশ্রণের ফলে আরও কি ধরণের প্রাপ্তি ঘটেছে, খুব সংক্ষেপে সূত্রাকারে তা নির্দেশ করছি।

১. লেখক যে উদ্দেশ্য নিয়েই নিকট বা দূর ইতিহাসকে ব্যবহার করুন না, তা থেকে কিছু স্বাদ—অতীতাশ্রয়ী বর্ণাঢ্যতা, তীব্র ঘটনাবর্ত, রাজকীয় ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর, ঘোর যুদ্ধ, চতুর ষড়যন্ত্র, মহিমান্বিত আত্মদান প্রভৃতির আবেদন আদায় করে নিয়েছেন। লোকেদের আচরণ ও কথায়ও পুরনো কালের ছাপ, মানবিক সত্যে—মানস বিকাশে তারা যতই আধুনিক হোক।

২. ব্যক্তিগত সমস্যাকে পারিবারিক আবেষ্টনীর সংকীর্ণতার মধ্য থেকে মুক্তি দিয়ে কাহিনীকে দেশের অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা বিস্তার দেবার—বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য ঐতিহাসিক পটভূমিকে বঙ্কিম ব্যবহার করেছেন।

৩. জাতীয়তাবাদী আবেগ সঞ্চারের জন্য তিনি ঐতিহাসিক প্রাচীনতার বাতাবরণকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন। অন্তত তিনটি গল্পে ইংরেজদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধের প্রসঙ্গ আছে,—'চন্দ্রশেখর'-'আনন্দমঠ'-'দেবীচৌধুরাণী'তে।

আনন্দমঠে তো সশস্ত্র বিপ্লবের একটি সুশৃঙ্খল পরিকল্পনাই আছে। 'রাজসিংহে' পররাজ্যলোলুপের আগ্রাসন থেকে দেশরক্ষা, 'মৃণালিনী'-'চন্দ্রশেখর'-'সীতারামে' স্বাধীনতা হারাবার দুঃখ ও দাহ। কোথাও অল্প অতীত, কোথাও সুদূর ইতিহাসের সহযোগে ঔপনিবেশিক দেশের বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্র একটা মহৎ কর্তব্য পালনের সুযোগ করে নিলেন। শুধু শাসক ইংরেজদের এড়িয়ে যাবার জন্য প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে এই অতীতাশ্রয় নয়। সমকালীন জীবনে এ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনার কোনো বাস্তব সম্ভাবনাই তৈরি হয়নি—যদিও ভাবলোকে এই বোধ হয়ে উঠেছিল একটি প্রধান সত্য, একটি পরমকাম্য বেদনামথিত স্বপ্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ—স্বাধীনতার চেতনা যে হিন্দুয়ানির দ্বারা কতক সীমাবদ্ধ ছিল, একথা মেনেও বঙ্কিমের দৃষ্টি ও কল্পনার এই বিরাট গুরুত্বকে কোনো ভাবেই কমিয়ে দেখা যাবে না।

[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুপুনরুত্থানবাদী এবং মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন, এরূপ অভিযোগ ব্যাপক প্রচারিত, অবশ্য ততখানি বস্তুনিষ্ঠ বিচারের দ্বারা পরীক্ষিত নয়। সে-বিবেচনায় প্রবেশের সুযোগ এখন নেই, একটা স্বতন্ত্র বড় আকারের প্রবন্ধ সেজন্য প্রয়োজন। উপন্যাস প্রসঙ্গে এই অভিযোগের সত্যতা কতটা এবং পাঠকের প্রাপ্তিতে তা কি তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়, আপাতত শুধু সেই অনুসন্ধান।

১. বঙ্কিমের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে মুসলমান নরনারীর সংখ্যা কম নয়। ওসমান-আয়েষা-কতলু/দুর্গেশনন্দিনী। লুৎফা (মতি)-মেহের-সেলিম/কপালকুণ্ডলা। মীরকাসিম-দলনি-তকি-গুরগন[১] / চন্দ্রশেখর। পীরকাজী-চাঁদশাহ / সীতারাম। ঔরংজেব-মবারক-জেবুন্নিসা-দরিয়া-উদিপুরী / রাজসিংহ। সীতারামে এরা গৌণ, অন্যত্র অনেকেই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় আছে। এদের মধ্যে শিথিল চরিত্র পাপিষ্ঠ, ষড়যন্ত্রী, লালসা লোলুপ, এবং ধর্মোন্মাদ লোক আছে; আছে নিষ্ঠাবান প্রেমিক, উদারচেতা ধর্মজ্ঞ, ত্যাগব্রতী মানুষ;—হিন্দু পাত্রপাত্রীদের মধ্যেও যেরকম আছে আর কি। সাহিত্যে জীবন-সম্ভোগ যাঁরা করাতে চান এবং যাঁরা করতে চান, তাঁরা পাপপুণ্যের পরোয়া করেন না। এবিষয়ে গোষ্ঠী, শ্রেণী, পেশা বা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা অর্থহীন যে লেখক তাদের কাউকে দুষ্টমতি করে এঁকে শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মর্যাদায় আঘাত করেছেন। বোদ্ধা পাঠক নিশ্চয়ই আরও লক্ষ্য করে থাকবেন যে আদর্শ পুরুষ রাজসিংহের তুলনায় সংকীর্ণচেতা কপট ও আগ্রাসী ঔরংজীব চরিত্র হিসাবে অনেক উঁচু পর্যায়ের; এবং পরম সতী দলনীবেগমের চেয়ে পাপীয়সী শৈবলিনী মানব-অস্তিত্বের গভীরতর রহস্য প্রকাশ করেছে। মধুসূদন দত্ত একবার চিঠিতে লিখেছিলেন, মুসলমান নারীচরিত্রে সংরাগগাঢ়তা সৃষ্টির সুযোগ বেশি বলেই শিল্পী হিসাবে তিনি আগ্রহী—সে কারণে তিনি রিজিয়াকে নিয়ে বাংলা নাটক লিখতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমেরও কি অনুরূপ ভাবনা ছিল না? মধ্যযুগলালিত হিন্দুনারীর

১. আর্মেনীয় গুরগন ধর্মে মুসলমান ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না, তার বোন দলনী মুসলমান নবাবের পত্নী, অবশ্য মুসলমান।

অবগুণ্ঠিত অনুজ্জ্বল অস্তিত্বের তুলনায় ইতিহাসের মুসলমান নারীচরিত্রের খোঁজ করতে করতে—আয়েষা, মতি, মেহের, জেবুন্নিসা, দরিয়ার ছবি আঁকতে আঁকতে বঙ্কিম হিন্দু শৈবলিনীকে আবিষ্কার করে ফেললেন।

২. 'রাজসিংহ' এবং 'সীতারামে' বঙ্কিম স্বাধীন স্বদেশের প্রতিনিধিরূপে হিন্দু রাজাকেই বেছে নিয়েছিলেন, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদীরূপে মুসলমান রাজশক্তি চিহ্নিত। বাংলার শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপের পতনকে জাতীয় স্বাধীনতার অবসান রূপে দেখেছেন[২]। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে—নাটকে, কিছুটা কাহিনী-কাব্যেও এরকম একটা ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধ প্রশ্রয় পেয়েছিল, তাতে হিন্দুসাম্প্রদায়িকতার একটা দৃষ্টিকোণ সচেতনভাবে কিংবা অজ্ঞানত কাজ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সরাসরি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বলেছেন, যেমন 'দেবীচৌধুরাণী'-'আনন্দমঠে'—তখনও কিন্তু হিন্দুয়ানী আদর্শের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে ; আনন্দমঠে প্রায় কাহিনী-বিশ্লিষ্টভাবেই মুসলিম-বিরোধী কিছু বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। এ-মনোভাব শুধু বঙ্কিমের লেখায় ছিল, এমন নয় ; এবং এর পেছনে সামাজিক নানা কারণও কাজ করেছে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান শিক্ষিত জনের মনে যে বিরূপতা তৈরি হয়েছিল বাংলাসাহিত্যের তা এক বড় রকমের ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য।

৩. 'আনন্দমঠ' গ্রন্থটি বাংলার বিপ্লব-সাধনার পথপ্রদর্শকরূপে যেমন গণ্য হয়েছে, অনেক মুসলমানের কাছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রচনা হিসাবে তেমনি তীব্রভাবে নিন্দিতও হয়েছে। আনন্দমঠ উপন্যাসে কোম্পানির ইংরেজ সেনাধ্যক্ষদের পরাভবের কাহিনী বলা হয়েছে—সব কটি যুদ্ধ কোম্পানির সঙ্গে। মূল আক্রমণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে। তাদের সেপাইদের মধ্যে গোরা সৈন্যের সঙ্গে বাঙালি অবাঙালী যারা ছিল তারা ধর্মে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র সেক্ষেত্রে মুসলমানদের দিকে বিশেষভাবে তর্জনি তুলেছেন। সন্তান সেনাদলের মুসলমান গ্রাম ধ্বংস করার যে সোল্লাস বর্ণনা বঙ্কিম দিয়েছেন, আনন্দমঠের কাহিনীগত অভিপ্রায়ের জন্য তার প্রয়োজন ছিল না—বঙ্কিমের হিন্দুয়ানির প্রতিফলন হিসেবে তা মুসলমান পাঠকদের সাধারণভাবে বিরূপ করবেই। যদি এই হিন্দুয়ানি বিপ্লবপন্থার কারণ বিশ্লেষণ যুক্তি-নিষ্ঠও হয়, তবুও মানতেই হবে শিল্পী বঙ্কিম তার শিকার হয়েছেন, তাকে ডিঙোতে পারেননি। খুব দুঃখের ব্যাপার হলেও কথাটা সত্য, জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পরিধিতে মুসলমান সমাজের দীর্ঘ অনুপস্থিতির যে সব কারণ তার মধ্যে বঙ্কিমের আনন্দমঠ অন্যতম। বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে 'আনন্দমঠে'র এই দ্বৈত ভূমিকা।

৪. সামাজিক উপন্যাসগুলিতে নৌকার মাঝি, থানার দারোগা এরূপ দু-একটি ক্ষেত্রে উল্লেখ ছাড়া মুসলমান চরিত্র বঙ্কিমে নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সমাজের বৃহৎ অংশকে উপন্যাসের সীমায় আনতে চান নি, সুবিস্তৃত মুসলমানী জীবনধারাকেও

২, পাঠকের ভোলা উচিত নয় 'চন্দ্রশেখরে' মুসলমান মীরকাশেমের বৃটিশ বিরোধিতার সঙ্গে পাঠকের জাতীয়ভাবকে উদ্বুদ্ধ করেছেন বঙ্কিমই।

নয়। এর কারণ কি? লেখকের অভিজ্ঞতার অভাব—উপন্যাসের সামাজিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে যা একরূপ অপরিহার্য? অথবা ঐ সব অংশকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চান নি? মোটকথা, বঙ্কিমের উপন্যাসে সমকালীন বঙ্গদেশ সমগ্রত প্রতিফলিত—এ দাবি করা যায় না।

উপরে মুসলমানদের সম্পর্কে বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রকাশিত মনোভাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া হল এবং তার ফলে তাঁর উপন্যাসে যে সীমাবদ্ধতা এসেছে তা নির্দেশ করা হল। সঙ্গে সঙ্গে এই সূত্রে তাঁর চরিত্র-ভাবনায় যে অন্য শক্তির সংযোগ ঘটেছিল তারও উল্লেখ করেছি। কিন্তু পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতা বঙ্কিম-উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যের অবনমন ঘটায় নি। একে একটি অপূর্ণতা বলে চিহ্নিত করা যায় তার বেশি কিছু নয়।

[৭]

একালের পাঠকেরা বঙ্কিম-বিষয়ক একটা অভিযোগ মোটামুটি বিশ্বাস করে বসে আছেন। বঙ্কিম নাকি বটুব নীতিবাগীশ ছিলেন এবং এই মনোভাব তাঁর উপন্যাসের নরনারীর হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে বাধা দিয়েছে। এমন কি স্থিতধী পাঠক, বঙ্কিমের উপন্যাসের বিবিধ গুণে যাঁদের আস্থা, তাঁরাও এই গুরুতর সীমাবদ্ধতাকে সত্য বলে মনে করে আসছেন। কিভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল হল তার ইতিহাস সম্প্রতি বিস্তারিত আলোচনা করব না। শুধু এটুকু বলব, শরৎচন্দ্রের সোচ্চার বক্তব্য এবং সুবোধ সেনগুপ্তের মতো জনপ্রিয় কোনো কোনো সমালোচকের ব্যাখ্যা এ বিষয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে। বঙ্কিম উপন্যাসে মোহিতলালের গভীর প্রবেশ এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিপুণ উপন্যাস-বিশ্লেষণ আমাদের ততটা প্রভাবিত করল না—এ ঘটনা বিস্ময়ের। আধুনিক কালে কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায় এবং পরিবেশ পরিস্থিতির দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁকে এক শৃঙ্খলিত প্রতিভা বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন। এও কিন্তু বঙ্কিম রক্ষণশীল ধরে নিয়ে তার কারণ ও কৈফিয়ৎ দেওয়া। ভোলা ঠিক নয়, পৃথিবীর সব বড় শিল্পীর পায়ে শৃঙ্খল—তার স্বরূপ ও দৈর্ঘ্যে থাকে পার্থক্য

আলোচ্য সমস্যাটি জীবন ও শিল্পবিষয়ে খোলা মন দিয়ে বিচার করে দেখা দরকার।

১· বঙ্কিমের সমকালে হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করা নিয়ে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিধবা-নারীর ছবি এঁকেছেন তাঁর উপন্যাসে। কুন্দ, হীরা, রোহিনী। এই তিনজনের পরিণামই মর্মান্তিক। কুন্দ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। হীরা পাগল হয়ে গিয়েছে। রোহিনী পিস্তলের গুলিতে মরেছে। কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবেসেছিল, তাদের বিয়েও হয়েছিল। হীরা ও রোহিনীর প্রণয়-বঞ্চিত বৈধব্যে তীব্র প্রেমের সঞ্চার ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত একজনকে উন্মাদ করে দিয়েছেন এবং একজনকে বিশ্বাসচ্যুতির দায়ে খুন করিয়েছেন। এ থেকে সহজ সিদ্ধান্ত হতে পারে বিধবাদের প্রেম ও বিয়েকে বঙ্কিম ভালো চোখে দেখেন নি। তাদের জন্য কঠিন দুর্ভোগের ব্যবস্থা করেছেন।

২. বিবাহিত নারীর অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মূল বিষয়। আধুনিক মন এই অবৈধ আচরণকে সমাজ-ধর্ম, পারিবারিক আদর্শ-বিরোধী বলে অভিশপ্ত করতে রাজী হবে না। তারা এর মধ্যে মানব ব্যক্তির মুক্তির ইঙ্গিত পেতে পারে, মানব স্বভাবের দুচ্ছেদ্য জট ও রহস্যের খোঁজ করতে পারে। বঙ্কিম শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠা বলে তর্জনি তুলেছেন, তাকে উন্মাদরোগগ্রস্ত করেছেন, তার যে কঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন, তা লৌকিক 'যমপটে' অঙ্কিত অসতী নারীর শাস্তির কাছাকাছি একটা ব্যাপার।

৩. যৌবনের সব চাঞ্চল্য সংযত করে বৃদ্ধ স্বামীতে মন প্রাণ অর্পণ করে লবঙ্গলতা সতীত্বের পরাকাষ্ঠারূপে লেখকের স্তুতিধন্য হয়ে উঠেছে।

৪. চিত্তকে যারা নিবৃত্ত করতে পারেনি কামনার প্রবল তাড়না থেকে, সেই সব নায়কদের বঙ্কিম ক্ষমা করেননি। অমরনাথের পিঠে 'চোর' লেখা হয়েছে, গোবিন্দলাল চূড়ান্ত লাঞ্ছনা অপমান দুর্দশার মধ্যে দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল (প্রথম সংস্করণে, পরে অবশ্য সন্ন্যাসী হয়ে তত্ত্ব আওড়েছে), নগেন্দ্রনাথ তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে— পত্নীমিলনের পরেও কুন্দর অদৃশ্য মৃতদেহ তার নিজ প্রবৃত্তির শবরূপে দম্পতির মধ্যে অনড় হয়ে থেকেছে। বঙ্কিম মানসের 'উদ্দাম অনিয়ন্ত্রিত' বাসনার কঠিন শাসক।

বঙ্কিমের এই মনোভাবের নিদর্শন হিসাবে আরও নানা রকম বিষয় উল্লিখিত হতে পারে। যেমন কামনার তীব্রতা পশুপতি ও সীতারামের সর্বনাশের কারণ হয়েছে, একটা গোটা রাজ্যের বিনষ্টি ঘটিয়েছে। বিবাহিত নারীর প্রতি লোলুপতার জন্য অতবড় দেশভক্ত বিপ্লবী ভবানন্দের প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়েছে, জীবানন্দের হৃদয় দৌর্বল্যজাত সাময়িক ব্রতভঙ্গ নিজ স্ত্রী সম্পর্কিত বলেই তার দাম্পত্য মিলনের একটা ব্যবস্থা হয়েছে। ব্রজেশ্বর যতই অপদার্থ অমানুষ হোক পিতৃভক্তির নৈতিকতায় নিষ্ঠাবান বলেই সুখসমাপ্তির নায়ক হতে পেরেছে। শচীশ সাংসারিক স্বার্থের ঋণে অন্ধ রজনীকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে—প্রতিষ্ঠিত নীতিবোধের বিরোধী নয় বলে বঙ্কিম তার মানবিক ক্ষুদ্রতায় প্রশ্ন তোলেন নি।

উপরের ভাবনা এবং প্রশ্নগুলির আলোচনায় বঙ্কিমের রক্ষণশীল নীতিবাগীশতার স্বরূপ, তাঁর শিল্পচেতনা তথা জীবনবোধের বৈশিষ্ট্য অনেকটাই ধরা পড়বে।

১. বিংশ শতকের শেষভাগে এসে আমাদের সামাজিক নীতিবোধ অনেকটা বদলে গিয়েছে। এক'শ সোয়া'শ বছর আগে বঙ্কিমের সময় যেমন ছিল সেরকম আর নেই, থাকার কথাও নয়। কোনো বিধবা নারী প্রেমে পড়লে তাকে অস্বাভাবিক ভাবা হয় না, পাপ বলে চিহ্নিত কেউ করে না। আবার এ একটা প্রগতিশীল কাজ বলে উৎসাহ দেখাবারও কিছু আছে—এমন কথাও কেউ বলে না। অবশ্যই এই সমাজটা হল বঙ্কিমাদির উপন্যাস পড়ে আধুনিক যে পাঠক সমাজ তাদের। যেখানে ডাইনি অভিযোগে কাউকে পোড়ানো হয় সমাজের সেই সব অংশ আমার বর্তমান হিসাবের বাইরে।

বিবাহিত মেয়ে অন্যপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হলে তাকে মহান সমাজ বিপ্লব বলে ঘোষণার যেমন কারণ ঘটে না, তেমনি তা নরকে পাঠাবার মতো অপকর্ম রূপেও গণ্য

হয় না। এ সম্পর্কে আইনসঙ্গত বিধি নিষেধ সব দেশেই নানারকম আছে। এবং পুরুষ-নারী নিরপেক্ষভাবে স্বভাবচরিত্র নিয়ে গুঞ্জন ও পরচর্চা সর্বত্রই চলে, তাতে সভ্যতা, ন্যায় বা নীতির কোনো বালাই থাকে না।

কিন্তু বঙ্কিম যখন উপন্যাস লিখেছিলেন সেকালে বিধবার প্রণয় বা বিবাহ (আইনসিদ্ধ হলেও) সাধারণভাবে নিন্দার ব্যাপার তো বটেই, পাপের কাজ বলে মনে করা হত। বিবাহিত নারীর পরকীয় প্রেম ছিল অত্যন্ত গর্হিত। অসতীর নরকেও স্থান ছিল না।

সেকালে লেখা উপন্যাসে তখনকার সমাজ তো থাকবেই। আমাদের দৃষ্টিতে তার পশ্চাৎদৃষ্টি, নির্মম রক্ষণশীলতা—সে সব নিয়েই থাকবে। বাস্তবতার সে-দাবি না-মেনে অলীক কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে রূপকথা লেখা যায়—উপন্যাস নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিকোণের ফ্রেমটাই গ্রহণ করেছেন। শৈবলিনীকে সমকালের সমাজ যে চোখে দেখবে তা এড়িয়ে যান নি। আর সে সমাজ যে শৈবলিনীর অবচেতনায় কত দৃঢ়মূল এক দুর্মর সংস্কার সে সত্যও ধরে দিয়েছেন তার বিপর্যস্ত মানসিকতায়। কিন্তু লেখক শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি আকর্ষণকে অসতীর কামবিকাররূপে চিত্রিত করেন নি। মানবচিত্তের রহস্য হিসাবে তাকে অনুভব করতে চেয়েছেন। এই বোধই সমকালে ছিল বিস্ময়কর আধুনিকতা। এবং গৃহত্যাগিনী সেই নারীকে শেষপর্যন্ত অনিবার্য পতিতা-বৃত্তিতে ছুঁড়ে না ফেলে স্বামীগৃহে সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে তিনি দুঃসাহসী কাজ করেছিলেন।

২. তিনটি বিধবার কাহিনীতে, তারা বিধবা বলে সামাজিক ভর্ৎসনা সরব হয়ে ওঠে নি। এরা কুমারী মেয়ে হলেও মানবিক পারিবারিক সমস্যার রবমফের হত না। তবে একথা ঠিক, রোহিনী ও হীরা বিধবা হওয়ায় এদের আচরণে কিছুটা বাড়তি স্বাধীনতা দেখাবার সুযোগ হয়েছে। তিনজনের ক্ষেত্রেই বিধবা নির্বাচনের অন্যতম কারণ স্বাধীন প্রেমের যোগ্য বয়সী কুমারী সেকালে সুলভ ছিল না। তেমন দেখালে সামাজিক ভাবে তা অবিশ্বাস্য হত। আবার হীরা ও রোহিনীর বেলায় শুধু পরিণত যৌবন হলেই কাজ চলত না। বৈধব্যেরও প্রয়োজন ছিল। কারণ ভোগবঞ্চনা, কঠিন নিয়মের বাধা (যার প্রতিক্রিয়ায় তীব্র হয়ে থাকে বাধা ভাঙার ইচ্ছা) এবং পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতা ছাড়া এদের চরিত্রের যথার্থ ভিত্তি তৈরি হয় না। কুন্দে কিন্তু কুমারীর কোমল অনভিজ্ঞতাই বড়।

সে যা-ই হোক, বঙ্কিম তিন-তিনটি বিধবার প্রণয়াসক্তির গল্প বলেছেন, অবশ্য তাদের ব্যাভিচারের কাহিনী নয়। যারা 'প্রেম' শব্দটি উচ্চারিত হলেই দেহভাবনা-মুক্ত, কামগন্ধশূন্য শুদ্ধ হৃদয় ব্যাকুলতা বোঝেন, তাদের সঙ্গে বঙ্কিমের কিংবা পৃথিবীর কোনো বড় সাহিত্যিকেরই মতের মিল হবে না। মানুষের মুখশ্রীর মতো, স্বভাব-স্বাতন্ত্র্যের মতো প্রেম ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক। প্রত্যেকের প্রেম তার নিজের প্রেম। তাতে ঘৃণা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-জয়ের নেশা কিংবা পরাজিত হবার বাসনা, ছলনা ও আত্মছলনা, পূর্ণ আত্মনিবেদন বা আত্মত্যাগ নানা মাত্রায় মিশ্রিত থাকে। এই আশ্চর্য প্রেমই বঙ্কিমের উপন্যাসের সাধ্যবস্তু ছিল। মানবমনের অনন্ত বৈচিত্র্যের

সন্ধানে বঙ্কিম তিনটি প্রেমিকা বিধবার একেবারে পৃথক পৃথক চরিত্রে পৌঁছেছিলেন। জীবনরহস্য-বিমূঢ় সৃষ্টি-সাফল্যে তাঁর যাবতীয় নারী চরিত্রের মধ্যে এদের স্থান একেবারে প্রথম সারিতে। শিল্পীর যে মমতায় মানুষের অন্তরের বাসনা ও বিফলতা ধরা পড়ে এদের তিন স্বতন্ত্র মনুষ্যত্বের রূপায়ণে তার পরিচয়—কার্পণ্য বা কুণ্ঠা কোথাও নেই। বিরূপ মনের দর্পণে এরা প্রতিবিম্বিত নয়, যদিও শিল্পীর মমতাকে কোথাও ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত কারুণ্যে অশ্রুসজল করে তোলার চেষ্টাও নেই। শরৎচন্দ্র স্খলিতচরিত্র পাত্রপাত্রীর বিষয়টিকে সেন্টিমেন্টালাইজ করেছেন বলেই লেখকের সহানুভূতি প্রকাশের ঐ একটাই পদ্ধতি নয়—শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি তো নয়ই। বঙ্কিম যেন স্রষ্টা ঈশ্বরের দূরত্ব নিয়ে নরনারীর জীবনের জটিলতা ও রহস্যের খোঁজ নিতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে। সমাজ যাকে পাপ বলে মনে করে, লেখক সেই বাইরের বিচারের পটভূমিতে চিত্তের গভীরে নেমেছেন। ভালো মন্দ বাইরের পরিচয়, পাপী পুণ্যাত্মা—সামাজিক সাংসারিক হিসেব। বড় শিল্পী মানুষকে চিনতে চান—ভালোমন্দ, পাপী পুণ্যবান সবাইকে, এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের চরিত্র ও ভাগ্যের হদিশ না পেয়ে বিমূঢ় হন। বঙ্কিম সে রকম বড় শিল্পী।

৩. বঙ্কিমের সমকালীন সামাজিক দৃষ্টিতে পুরুষের নৈতিক অপরাধ বলে কিছু ছিল না। একাধিক বিয়ে বা রক্ষিতা রাখার ঢালাও অধিকার স্বীকৃত ছিল। বঙ্কিমের দুজন নায়ক নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল কিন্তু সমাজ-স্বীকৃত এই কাজ করেও অনুশোচনায় এবং হৃদয়গ্লানিতে ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। তারা চিত্তদমন করতে পারে নি, প্রবৃত্তি পরবশ হয়ে নগেন্দ্র দ্বিতীয় বিয়ে করেছে কুন্দকে, যদিও সূর্যমুখীর প্রতি তার গভীর প্রেম ছিল। গোবিন্দলাল স্ত্রী ভ্রমরকে ভালোবাসলেও রোহিনীকে ভালোবেসেছে—তাকে নিয়ে পালিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু পুরুষ বলে এদের পাপ ও স্খলনকে মেনে নেন নি। কোন পতিত নারীর তুলনায় এদের কিছু কম দুঃখ পেতে হয়নি। নারী-পুরুষ নিরপেক্ষ বঙ্কিমের নৈতিক বোধ। এ ভাবেই নগেন্দ্র-গোবিন্দে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক পুরুষের জন্ম। তারা সময়ের সীমা ডিঙিয়েছে।

৪. এ বিষয়ে সর্বশেষ বক্তব্য হল, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নরনারী কিন্তু পাপদ্মত। যারা সরলভাবে চলেছে, সব মেনে নিয়েছে, নিয়মভঙ্গ করে নি, নীতির অনুগামী থেকেছে তাদের ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি ঘটে নি, তাদের ঘিরে উজ্জ্বলতা নেই। পিতৃভক্ত ব্রজেশ্বর নয়, নিয়মনিষ্ঠ শচীশ কিংবা জগৎসিংহ নয়, অপাপবিদ্ধ হেমচন্দ্র নয়, সীতারাম, পশুপতি, ভবানন্দ—পরিণাম যাই হোক অনেক উঁচু মাপের সৃষ্টি। সতী ভ্রমরের চেয়ে রোহিনী, এমন কি হীরাও মানব জীবনের বিদ্যুৎবিদীর্ণ জিজ্ঞাসা।

কার পরিণতিতে সুখ, কার ঘটল সর্বনাশ তা দেখে শিল্পীর সহানুভূতির পরিমাপ নয়। লেখকদের পক্ষপাত অনেক জটিল ব্যাপার, বিশেষ করে বঙ্কিমের মাপের বড় লেখকদের। উঁচুদরের পাত্রপাত্রী যেমন অসরল, স্খলিত বা অল্পাধিক বিকারগ্রস্ত, পাপপ্রবণ বা নিয়মভঙ্গকারী, তেমনি তাদের জীবনও যন্ত্রণাক্লিষ্ট, অনুশোচনাদগ্ধ, হাহাকারশুষ্ক। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মহৎ সাহিত্য এ রকম বহু নিদর্শন জমা করে রেখেছে।

[৮]

বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চাঙ্গের চিন্তাবিদ ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিক গোষ্ঠী নির্মাণের সময়ে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টি পরিণত প্রজ্ঞায় দানা বেঁধে ওঠে। বঙ্কিমের এই বোধের ভিত্তিতে রুশো-কোঁৎ-বেন্থাম-মিল প্রমুখের চিন্তাধারা সক্রিয় ছিল। বঙ্কিম অবশ্য দেশীয় অর্থনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, নীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে বেশি বা কম বিদেশী প্রাগ্রসর চিন্তার ঋণ নিয়েছেন, অথবা ঋণ না বলে একে চিহ্নিত করব বিশ্ব মানবজ্ঞানের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার বলে। এদের নানা আনুপাতিক মিশ্রণ এবং অভিজ্ঞতা ও অভিপ্রায় মিলে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব মতামত ও মনোভাব।

উপন্যাস লেখায় বঙ্কিমের এই মনন কিভাবে কতটা কার্যকর তা খতিয়ে দেখা যাক।

১. এই সময়ে বঙ্কিম সামাজিক উপন্যাস লেখা শুরু করেন, এবং মূলত সেই শ্রেণীর বই-ই লেখেন। 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'; ছোটগল্প 'রাধারানী' ক্ষুদ্র 'ইন্দিরা', ব্যতিক্রম 'চন্দ্রশেখর' ৩। এই উপন্যাসের মূল অংশ অর্থাৎ শৈবলিনীর কাহিনী, একটি সামাজিক নৈতিক সমস্যার উপরে দাঁড়িয়ে। মোটকথা বঙ্কিম এই পর্যায়ের উপন্যাসেও প্রত্যক্ষত সমাজসচেতন।

২. বঙ্কিমের একটি প্রধান চরিত্র অমরনাথ ('রজনী') মিল-বেন্হামের আদর্শে গড়ে-ওঠা নব্য যুবাশ্রেণীর প্রতিনিধিস্বরূপ। নেপথ্যবাসী হরদেব ঘোষালও ('বিষবৃক্ষ') হয়ত আধুনিক মননের অধিকারী—কিন্তু তাকে স্পর্শযোগ্য ব্যক্তিত্ব দেন নি লেখক। অবশ্য নব্যসংস্কার পন্থার নাম করে উচ্ছৃংখলতায় সজ্জিত যে কয়েকজনের প্রসঙ্গ 'বিষবৃক্ষ'-'রজনী'-তে আছে তারা বিবিধ ব্যঙ্গরচনার কল্যাণে বাঙালী পাঠকের কাছে আগে থেকে সুপরিচিত।

৩. বঙ্কিম 'সাম্য' বইতে মেয়েদের বিষয়ে যে-কথা লিখেছেন, যার মূলে জন স্টুয়ার্ট মিলের নারীমুক্তি সম্পর্কিত অভিসন্দর্ভের প্রত্যক্ষ প্রভাব, কুন্দ-হীরা-রোহিনীর পরিকল্পনায় তার সক্রিয়তা দুর্লক্ষ্য নয়।

৪. 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে জমিদারদের যে শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ আছে, তার বিশেষ প্রতিফলন নেই নগেন্দ্র-গোবিন্দের চরিত্রাঙ্কনে।

৫. মিল-বেন্হামের নীতিতত্ত্ব বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রকাশিত নৈতিকতা ও পাপ-পুণ্যের বোধকে কিছু প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য তার সঙ্গে হিন্দু সংস্কারও মিশেছিল।৪

৬. বঙ্কিমচন্দ্রের মননের প্রতিধ্বনি এখানে-সেখানে থাকলেও উপন্যাস ও উপন্যাসের নরনারীকে সমাজসত্য প্রতিষ্ঠার উপকরণ করে তোলেন নি লেখক। সর্বত্র তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরেই জোরটা পড়েছে; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জটিল সম্পর্কই তাদের কাহিনী ও ভাগ্যের নিয়ন্ত্রা হয়ে উঠেছে। মানব জীবনসত্যের খোঁজে কোনো সর্বজনীন নীতিতত্ত্বই যে শেষপর্যন্ত কাজে লাগে না সে-জ্ঞান ছিল বলেই বঙ্কিম এত বড় উপন্যাস-শিল্পী।

---

৩ 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং ক্ষুদ্র 'রাজসিংহ'ও এসময়ে লেখা। এগুলি ছোটগল্প জাতীয়। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস একমাত্র 'চন্দ্রশেখর'।

৪. এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচারের প্রয়োজন এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধেই তা করা সম্ভব।

[৯]

বঙ্কিম উত্তর-'বঙ্গদর্শন' পর্বে, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে একটি বিশিষ্ট তত্ত্ববোধে পৌঁছেছিলেন। বিদেশী দর্শনের কিছু প্রভাব এবং হিন্দু ধর্ম দর্শনের মৌল ব্যাখ্যানের সংযোগে এই ভাবনা গড়ে উঠেছিল। 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে এর বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন। অনুশীলনতত্ত্ব নামে এটি পরিচিত।

এই পর্যায়ের তিনটি উপন্যাস—'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম'কে উক্ত তত্ত্বের নিদর্শন বলে অনেকে মনে করেন। বঙ্কিম নিজেও প্রায় সেকথা বলেছেন; সামাজিক উপন্যাসগুলিকে কিন্তু কখনই তাঁর বিশিষ্ট সমাজ বা নীতিবোধের বাহক বলে দাবি করেন নি।

উক্ত উপন্যাস তিনটি পরীক্ষা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা যাক।

১. অনুশীলন তত্ত্বের ধারক হিসেবে যে সব ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়েছে—সত্যানন্দ-ভবানন্দ-জীবানন্দ ('আনন্দমঠ'), ভবানীপাঠক-দেবীচৌধুরাণী ('দেবী-চৌধুরাণী'), শ্রী-জয়ন্তী ('সীতারাম')। এদের মধ্যে ভবানন্দ আদর্শচ্যুত হয়ে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। পাঠকের কাছে তা ব্রতচ্যুতের প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে স্বদেশপ্রাণ-বীরের আত্মদানরূপে মর্যাদা পেয়েছে। জীবানন্দ স্বল্প হলেও আদর্শভ্রষ্ট। সত্যানন্দ আর মহাপুরুষের মধ্যে প্রকৃত সিদ্ধব্যক্তি কে—সে সম্পর্কে মনস্থির করা কঠিন হয়। মহাপুরুষের কথামত সত্যানন্দের জ্ঞানসিদ্ধি ঘটে নি, ঘটলে সে বুঝত ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিষ্ফল হবে। তাই যদি সত্য হয় তবে গোটা আনন্দমঠ ও সন্তান-বিদ্রোহ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

লেখক প্রফুল্লকে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে চরম সিদ্ধিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীকে দেখেই তার দেবীত্ব টলে উঠেছে, সব ছেড়ে সে গৃহবধূ হয়ে ঘরে ফিরেছে। ভবানী পাঠকের নিষ্কাম ডাকাতি তথা দেশসেবা ভ্রান্ত পন্থা বলে চিহ্নিত হয়েছে।

'আনন্দমঠ'-'দেবীচৌধুরাণী' দুটি উপন্যাসই বঙ্কিমের তত্ত্বভাবনা ভেতর থেকে বিপর্যস্ত—বিপুল আয়োজন একমুঠো ভস্মাবশেষের মতো পরিত্যক্ত।

'সীতারাম' উপন্যাসে শ্রীর সিদ্ধি ঘটল উপন্যাসের শেষপ্রান্তে, যখন আদর্শ হিন্দু রাজ্য গঠনের স্বপ্ন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এবং সীতারাম ও তার রাজ্যধ্বংসের প্রধান কারণ শ্রী, তার ধর্মসাধনা।

২. বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি উপন্যাসেই তাঁর পরিকল্পিত অনুশীলন ধর্মের ব্যর্থতা দেখিয়েছেন। ঔপন্যাসিকে-তাত্ত্বিকে ভেতরে ভেতরে বিরোধ জমে উঠেছিল, এ কি তারই প্রকাশ? তত্ত্ববিদ্ বঙ্কিম যা গড়ে তুলেছিলেন পরম যত্নে, শিল্পী বঙ্কিম তাকে সর্বাংশে অস্বীকার করেছেন। তাত্ত্বিক ও শিল্পীর বিরোধে 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাস হিসেবে উঁচুতে উঠতে পারেনি, অবশ্য অনুশীলন তত্ত্বকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে একটি রোমান্টিক প্রণয় কমেডি হিসেবে পাঠ করলে আমরা বঞ্চিত হব না। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসরূপে বিফল নয় যদিও প্রথম স্তরের সৃষ্টি হয়ে উঠবার জন্য যে জটিল মনের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়, এ বইয়ে তার অভাব। সে ইচ্ছাও লেখকের ছিল না। এ-এক স্বতন্ত্র ধারার লেখা। একটা মহাকাব্যিক বিশালতার সুর এর অন্য

অনেক অপূর্ণতার ক্ষতিপূরণ করেছে। এই উপন্যাস পড়তে গিয়ে লেখকের ধর্মতত্ত্ব ভাববার সুযোগ মেলে না, একটা জাতীয়তাবাদী উল্লাসে চিত্ত আন্দোলিত হতে থাকে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নিজের মননে বোনা তত্ত্বের খোলস ভেঙে পুরো বেরিয়ে এলেন 'সীতারামে'। নিষ্কাম ধর্মের সাধন, ব্যর্থতা ও সিদ্ধি নায়িকা শ্রী চরিত্রের একটি প্রধান সূত্র হতে পারে। কিন্তু মুখ্যপাত্র সীতারামের আদর্শবাদ, বীর্যবত্তা, কার্যকুশলতা কিংবা কামনার দাহ ও দুর্নিবার প্রণয়তৃষ্ণা, নিজের হাতে-গড়া সব মহিমাকে ধ্বংস করে ফেলার উন্মত্ততা উপন্যাসকে শেকসপিরিয় ট্র্যাজেডির তুল্য গৌরব দিয়েছে।

[১০]

বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাস সমান মাপের নয়—কোনো লেখকের বেলাতেই তা ঘটে না, ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু সর্বত্র বড় শিল্পীর হাতের কাজ কিছু না কিছু থেকে গিয়েছে। তাঁর কাহিনীগুলির মান-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হচ্ছে। (অবশ্য আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে অন্যের ঐক্যমতের দায় নেই।) সঙ্গে সঙ্গে অপ্রধান লেখাগুলোয় বড় মাপের কাজ কোথায় তাও নির্দেশিত হচ্ছে।

১. শ্রেষ্ঠ লেখা সাড়ে তিন খানা। বঙ্কিমের এই শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি বিশ্বমানেও শ্রেষ্ঠ। 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'সীতারাম'। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে পুরোপুরি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা গেলে খুশি হতাম। এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে—দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে মানবহৃদয়ের যে রূপ বিকশিত হয়ে উঠেছে, তাতে একে অবশ্যই প্রথম স্তরে স্থান দেওয়া যেত। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের (এক-তৃতীয়াংশের) রীতিঘটিত স্খলনের জন্য এবং জীবনবোধে কিছু নীতিঘটিত বিপর্যয় ও আদর্শবাদের আরোপের ফলে বোদ্ধা পাঠককে প্রচণ্ড অতৃপ্তি নিয়ে উপন্যাসটির মান নামিয়ে দিতে হয়, যদিও কোনো ক্রমেই এর বৃহত্তর প্রথম দিকের অত্যুচ্চ মূল্য ভোলা যায় না। এ কারণে 'অর্ধ' চিহ্নিত করে মনকে বুঝ দেওয়া।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই উপন্যাসগুলির উল্লেখ করব যাদের বিবিধ গুণপনা সত্ত্বেও অসূচীভেদ্য মনে করা যায় না। 'চন্দ্রশেখর', 'ইন্দিরা', 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ'।

'চন্দ্রশেখর'। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর চরিত্র রচনা, উপন্যাসের গঠন ও পরিণতি উচ্চাঙ্গ শিল্পসিদ্ধি ও সুগভীর জীবন ভাবনার ফল। মীরকাশিম-দলনী সরল হলেও প্রাণোত্তাপে সত্য। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং নবাবের সংঘাতে সমকালীন ইতিহাস-বোধ তথা উনিশ শতকী জাতীয়তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত। একটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল গঙ্গা নদীর ব্যবহার—প্রকৃতি-পটভূমি থেকে তা গল্প ও চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তবুও এই উপন্যাসকে প্রথম স্তরে ফেলা গেল না, দুটি কারণে। প্রতাপ চরিত্রে প্রত্যাশিত জটিলতা নেই, পরিণত বোধ ও বুদ্ধির মানুষ হিসেবে সে গড়ে ওঠে নি। নিজের ভেতরে সে একবারও তাকায় নি। আর শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে অতিবর্ণনা মনস্তাত্ত্বিকতার সীমা ছাড়িয়েছে। শিল্পীর সংযমচ্যুতির এরূপ নিদর্শন বঙ্কিমে বেশি নেই।

'ইন্দিরা'। লঘু রোমান্টিক প্রণয় কমেডি রূপে সার্থক। কৌতুক ও মাধুর্যের দুই তার সমানে বেজেছে, যতিভঙ্গ ঘটে নি। পুরো গল্প একটা মেয়েলি মেজাজে

পরিবেশিত। লেখকের পুরুষালি দৃষ্টি কোণ বিস্ময়কর ভাবে সংহরিত। তবুও এই নিটোল রচনাকে প্রথম স্তরে রাখছি না, কারণ এর উচ্ছল তরল হাস্যে মানব অস্তিত্বের সত্যভেদী শক্তি নেই।

'আনন্দমঠ'। এই বইয়ের শক্তি (উপন্যাস হিসেবে এর শক্তির কথাই বলছি, রাজনৈতিক প্রভাবের বিশ্লেষণ এখানে স্থগিত রইল) এবং দুর্বলতা। কথা আগেই প্রসঙ্গান্তরে বলেছি।

'রাজসিংহ'। দুই সংগ্রামরত জাতির বৈশিষ্ট্য একটা মহাকাব্যিক বিস্তারের মধ্যে ধরা পড়েছে। জেবুন্নিসা-মবারক-দরিয়া প্রসঙ্গ মানবজীবন এবং স্বভাবজাত নিয়তির এক তীব্র দগ্ধ চিত্র। তাছাড়া একটি অসাধারণ দিক প্রায়ই সমালোচক-পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়, তা হল নির্মলকুমারীর সংস্পর্শে ঔরঙ্গজীব-চরিত্রের এক নিগূঢ় ট্র্যাজেডির চকিত সংযত প্রকাশ। তবুও প্রধান পাত্রপাত্রী রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর অতিসরলতার জন্যই এই উপন্যাসকে প্রথম পর্যায়ে রাখা চলবে না।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে আমরা অন্য উপন্যাসগুলিকে ধরছি, যেগুলি নানা ধরণের বিচ্যুতি এবং অগভীরতার জন্য সাধারণ উপন্যাস বলে গণ্য হবে। তবে এদের মধ্যেও কোথাও কোথাও হঠাৎ দীপ্ত হয়ে উঠেছে খুব বড় মাপের লেখকের হাতের ছাপ।

'দুর্গেশনন্দিনী'। মূল্য প্রধানত ঐতিহাসিক। তবে বঙ্কিম ছাড়া খুব কম লেখকই এত নিপুণ গল্প গঠনে সমর্থ হতেন। তার চেয়েও বড় কথা বিমলার মত জটিল ও বহুমাত্রিক নারীচরিত্র বাংলা উপন্যাসের যে কোনো সময়ের সম্পদ।

'মৃণালিনী'। অত্যন্ত অগভীর এবং সাজানো হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর কাহিনী। কিন্তু পার্শ্বচরিত্র পশুপতিকে, ভিলেন বলে গোড়ায় যাকে মনে হয়, কিন্তু তার ট্র্যাজেডির নায়কোচিত বিকাশ ও পরিণতি বিস্ময় জাগায়।

'রজনী'। কাহিনী কথনের কলাকৌশল দৃষ্টি আকর্ষক। অন্ধ তরুণীর শ্রুতি-স্পর্শময় জগত কতকটা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু লবঙ্গ চরিত্রের অন্তর্লীন প্রেম-ঘৃণা-হিংস্রতা-নীচ স্বার্থবোধের, মর্মগামী মনোভাবের যে ইঙ্গিত আছে তাকে যদি লেখক বিকশিত করে তুলতেন তো বাংলা-সাহিত্যে আর একটি পয়লা নম্বরের রমণী পাওয়া যেত।

'দেবীচৌধুরাণী'। এ বইয়ের দ্বিধা-দুর্বলতা নিয়ে আগেই কিছু বলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এর উপভোগ্যতা নিয়েও।

[১১]

সংক্ষিপ্ত হলেও নানা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের সব উপন্যাস নিয়ে দু চার কথা বলেছি। 'কপালকুণ্ডলা'কে উচ্চতম স্তরে জায়গা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। কারণ, 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে এমন কিছু আছে যা বঙ্কিমেরও অন্য উপন্যাসে পাওয়া যাবে না। কপালকুণ্ডলার শিল্পরূপ, চরিত্রভাবনা ইত্যাদি নিয়ে নানা কথা নিয়ে একাধিক গ্রন্থ লিখেছি। তার মধ্যে এ-রচনার অনেক মহিমার পরিচয় দিয়েছি। আপাতত আমি সে-সবের পুনরুল্লেখ করব না। অন্য দু একটি দিকে তাকাব, যাকে এ উপন্যাসের অনন্য সাধারণ লক্ষণ বলে আমি মনে করি।

১. কপালকুণ্ডলায় সমুদ্র, মোহনা, উপকূলবর্তী অরণ্য, খরস্রোতা নদীর ঢেউয়ে ভেঙেপড়া তটভূমি যেমন আছে, তেমনি আছে শবসাধক কাপালিক, নির্জনে লালিতা যুবতী, যার কোনো সামাজিক সংস্কার নেই। বাইরে থেকে এ সবই রোমান্সের চমৎকার উপকরণ। বিলিতি সাহিত্যের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। বঙ্কিম সেই আপাত মিলকে ভেতর দিক থেকে দেশজ প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

২. বামাচারী তান্ত্রিকের সাধনা, দক্ষিণা কালীর উপাসনা, অনন্ত নভোব্যাপ্ত আদ্যাশক্তির কসমিক অনুভব—এই উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক বিষয় মাত্র নয়, আভ্যন্তর কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা। কাহিনীতে নিসর্গ হয়ে ওঠে মানব-নিয়তি। প্রায়ই মানুষ তার হাতে ক্রীড়ারত পুতুল।

৩. কপালকুণ্ডলাকে মানবীরূপে পুরো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন লেখক। কোনো তত্ত্বের প্রতিভূ নয় সে। কিন্তু মানববিশ্বে অসাধারণ এই মানবী—যার জীবনের এবং মনের চারপাশে সমুদ্র, নির্জন বেলাভূমি-বনভূমি, কাপালিকের নরবলি, শ্মশান—যেখানে অর্ধদগ্ধ শব পড়ে আছে, আর দিগন্তস্পর্শী আকাশ যেখানে নক্ষত্রে নক্ষত্রে মহাকালীর ত্রিশূল সংকেতে (কালপুরুষ নয়, মহাকালিকা—নারী, মূল প্রকৃতি) মানব অস্তিত্বের চরম জিজ্ঞাসা—"এ জীবন লইয়া কি করিব ?" তখন কপালকুণ্ডলা নাম্নী তরুণীর মধ্যে আমরা কুণ্ডলরূপে কপাল বা নরমুণ্ড ধারিনী মহাশক্তিকে অনুভব করি।

৪. এ-সব তান্ত্রিক সাধনায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। এর ভিত্তিতে যে আদিম ধর্মীয় উপলব্ধি, যার শিকড় এ দেশের মাটির গভীরে ছড়িয়ে আছে—তার দিকে লেখক ফিরেছেন। য়ুরোপের ভাব ও ভাবনালোকে যে মনের সহজ ভ্রমণ তাঁর পক্ষে এই ফেরা সহজ ছিল না। প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাব ধর্ম—এদেশে দীর্ঘকাল তা সরবে স্বীকার করা হয় নি। পশ্চিমী বিদ্যা ও সাহিত্য আমাদের সাহস জোগাল বলবার 'এ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'। অথবা 'এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য আমি আগ্রার মসনদের লোভ ছেড়েছি'। সেই উত্তপ্ত কামনা—মতিবিবির এবং নবকুমারেরও অনুল্লেখ্য অর্থহীন হয়ে যায় কপালকুণ্ডলায়। অস্তিত্বের কোন্ আদি সত্য—কোন্ দুষ্প্রতিরোধ্য নিয়তি, মানুষের সব চেষ্টা সব সংরাগ, সব হাস্য এবং ক্রন্দন অবলীলায় মুছে দেয়।

কপালকুণ্ডলা বাঙালীর কোনো প্রাচীন ও 'অবস্কিওর' প্রত্যয়ে লেখকের প্রত্যাবর্তন নয়, আধুনিক মনন নিয়ে বঙ্কিমের আদি নৈসর্গিক শক্তিরূপী নিয়তি-দর্শন। এই বোধে পৌঁছেই বড় শিল্পী বিপন্ন বিস্ময় অনুভব করেন, তা শুধু য়ুরোপ থেকে পাওয়া ট্র্যাজিক বোধই নয়।

[১২]

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন সন্ধানী। সময়ের কাছে অনুগত থেকেও সানন্দ অতীত সম্ভোগে রত ছিলেন এবং ভবিষ্যতের অনেকটা দখল করে নিয়েছিলেন। মানব জীবন ও ভাগ্যের এমন সব জায়গায় তিনি হাত দিতে পেরেছিলেন যার আয়ু দীর্ঘ। বৈচিত্র্যের মধ্যে এক দীর্ঘায়ু সত্যকে খোঁজাই তাঁর ঔপন্যাসিক দায়িত্ব। পাশ্চাত্যবোধের পরিক্রমার মধ্যে দেশীয় সাধনার মিশ্রণ এই জীবনানুসন্ধানে তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছিল। তিনি বিশ্বের আকাশে নিশ্বাস নিয়েছিলেন, কারুর হ্যাট কোট ধার করেন নি।

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেশচন্দ্র দত্ত : বঙ্কিমানুসারী হয়েও স্বতন্ত্র

রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁর উপন্যাস এবং অন্যান্য রচনাবলী ইতিহাসের বিষয়বস্তু তথাপি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং অতীত ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যের আলোচনাসূত্রে তাঁর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় নবজাগরণের যে প্রধান দুটি ভূমিকা তৎকালীন মনীষীবৃন্দের মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল তা হলো অতীত ইতিহাস, পুরাণ, মহাকাব্য, বেদ, বেদান্তের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস এবং ভারতবর্ষের নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারাটিকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস—অপরদিকে ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নয়নসাধনে ব্রতী হয়ে নব নব পন্থাবিষ্কার এবং নতুন নতুন ধারায় ও পথে নিজেদের আত্মোপলব্ধির ও আত্মপ্রকাশের পথ সন্ধান। তাই উনিশ শতকের নবজাগরণ ছিল—আত্মোপলব্ধি, আত্মানুসন্ধান ও আত্মপ্রকাশের এক নতুন নেশায় মেতে ওঠা। সেখানে ভূমিকা ছিল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের সমাজসংস্কার ও আত্মোন্নয়নের। ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, গিরীশচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নব নব পথে আত্মপ্রকাশের পথ সন্ধানের ভূমিকায় সেদিন মুখর হয়ে উঠেছিল জাতীয় জনজীবন। রমেশচন্দ্রের ভূমিকার স্বরূপসন্ধানে ব্রতী হতে গেলে এইখান থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে। উনিশশো তিন সালে রমেশচন্দ্র বিলেত থেকে পত্র লিখে তাঁর এক বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তকে জানান :

My Dear Behari,

I have not seen any one in London, nor have I regularly commenced my work. ... I am also going to lecture at University college from next week, if I can form a class The great work before me is the second volume of my Economic History' —the Victorian Age (1837—1900), and if I can finish that in the present year my life's literary work is done ! I may write novels and political articles after that, but am not likely to engage in any great work again at this age ! My, 'Ancient. India,' and 'Epics' and 'Economic History' will remain the most important productions of my rather prolific pen during the maturest period of my life, between forty and sixty—রমেশচন্দ্র সেদিন তাঁর অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং অতীত ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ইংরাজী লেখাগুলিকে তাঁর জীবনে 'great

work' এবং 'most important production' বলে যে চিহ্নিত করেছিলেন, তার পিছনে ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর আত্মানুসন্ধানের চাহিদা। সেখানে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অনুসন্ধানে এবং ভারতের অতীত গৌরবের মহিমা আলোচনায় আত্মোপলব্ধির স্বরূপে মুখর। আবার অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নামক ইংরাজী গ্রন্থে যখন তিনি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপদেশ ও প্রেরণা স্মরণ করে বলেন ঃ

"You will never live by your writings in English', said he on this or on another occasion, "look at others, your uncles Govind Chandra and Sashi Chandra and Madhu Sudan Dutta were the best educated men of the Hindu College in their day. Govind Chandra and Sashi Chandra's English poems will never live; Madhu Sudan's poetry will live as long as the Bengali language will live." These words created a deep impression in me, and two years after this conversation, my first Bengali work, BANGA BIJETA, was out in 1874."—তখন রমেশচন্দ্রের আত্মোপলব্ধির স্বরূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন তৎকালীন যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও আই. সি. এস.। সুতরাং ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং ইংরাজীতে লেখার চর্চা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং বিশেষ করে তাঁর 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যে অনুশীলনের জন্য যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন তার উল্লেখ এখানে বিশেষ প্রয়োজন। রমেশচন্দ্র নিজেই সেকথার উল্লেখ করেছেন তাঁর একটি প্রবন্ধের মধ্যে। তিনি বলেছেন ঃ

"একদিন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লিখ না কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম—আমি যে বাঙ্গালা লিখা কিছুই জানি না। ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি! ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনা পদ্ধতি জানি না। গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন,— 'রচনা পদ্ধতি আবার কি, তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।' এই মহৎ কথা আমার মনে বরাবর জাগরিত রহিল, তাহার তিন বৎসর পর আমার বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উদ্যম 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশ করিলাম। (নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০১)

সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে বলেছিলেন যে রচনাপদ্ধতি ঠিক করবে আগামী দিনের শিক্ষিত যুবকেরা এবং তাঁরা যে পদ্ধতিতে লিখবেন সেটাই হয়ে উঠবে রচনাপদ্ধতি।

এই অনুপ্রেরণাতেই রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব। একদিকে তিনি যেমন ঋগবেদের অনুবাদ করেছেন এবং তার নবতম ভাষ্য রচনা করেছেন 'নবজীবন' পত্রিকার পাতায়, অপরদিকে 'নব্যভারত' পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নব মূল্যায়নে ব্রতী হচ্ছেন, আবার 'ভারতী' পত্রিকায় হিন্দু দর্শনের গভীরতায় ডুব দিচ্ছেন, ভারতীয় দুর্ভিক্ষ ও ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর গবেষণা ও চিন্তায় বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যাপারটি যেমন ধরা পড়ছে, ঠিক তেমনি ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার তথ্যানুসন্ধানে সক্রিয় হচ্ছেন। এই পটভূমিকায় আঠারোশো চুয়াত্তর সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'। যদিও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপাঠ এবং তাঁর উৎসাহ অনুপ্রেরণায় উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তথাপি বলা যেতে পারে তাঁর রচনাধারা এবং উপন্যাসের গঠনশৈলী বঙ্কিমের অনুসরণে অগ্রসর হলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর রচনার স্বতন্ত্র শৈলী পরিলক্ষিত হয়। বাংলা উপন্যাসের প্রখ্যাত গবেষক ও ইতিহাসকার ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা চলে, 'তিনি বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন, এক শূন্য পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন।' এখন আমাদের নতুন করে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়েছে যে বঙ্কিমযুগে অবস্থান করে ইংরাজীনবীশ যুবক সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত যিনি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখেন চিত্তাকর্ষক ইংরাজীতে, যিনি সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে ঋগ্বেদের অনুবাদে ভারতসত্যের মর্মকথা ও দার্শনিক উপলব্ধিকে জানবার প্রয়াসী হন, যিনি অতি প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ব ও শিলালিপির মধ্যে ভারত ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধান করেন তাঁকেই বঙ্কিমচন্দ্রই বা কেন উৎসাহিত করে বলেন, 'তোমরা শিক্ষিত যুবক তোমরা যা লিখবে তাই হবে রচনা পদ্ধতি', সেই তিনি ছয়খানি মাত্র উপন্যাস লিখে পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক বিচারে কেন রায় প্রাপ্ত হন যে 'তিনি বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন, এক শূন্য পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন।'

আসলে আমাদের ক্ষীণ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে যে জাতীয় অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব অর্থাৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও জাতীয় ভাগ্য নির্ধারক বীরপুরুষদের জীবন্তচিত্র, গুরুতর রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিবরণ, যুদ্ধবিগ্রহের নানা রোমাঞ্চকর বর্ণনা, মোগল ইতিহাসের শত বৎসরের ঐতিহাসিক তথ্যের জীবন্ত বিবরণ, সমাজ ও সংসার জীবনের গ্রামীণ ও লোকায়ত জীবনবর্ণনার চিত্র—এ সমস্তই রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র যদি বাংলা সাহিত্যকে শৈশব হতে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করে থাকেন তাহলে রমেশচন্দ্র দত্ত সেই যৌবনকে প্রাণচঞ্চল ও বৈচিত্র্যময় ঘটনামুখী জীবনের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি বাংলা সাহিত্যকে কল্পনা ও রোমান্সের স্বপ্নরাজ্যে, সৌন্দর্যের রূপসুধায় সেই যৌবনকে পরিপূর্ণ করে থাকেন, তাহলে রমেশচন্দ্র সেই যৌবনের অন্তঃস্থলে কঠোর বাস্তব ঘটনার

ঘনঘটা ও বীরত্বের মহিমায় সমন্বিত করেছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই প্রয়োজন ছিল রমেশচন্দ্রের। যেমন প্রয়োজন হয় রোমান্সের কল্পজগতে আকাশ সঞ্চারের পরে কঠিন এবং কঠোর মৃত্তিকাভূমিতে অবতরণ। একজন যদি ইতিহাসের স্বপ্ন রাজ্যে অতীত বিহারে আমাদের সঞ্চারিত করে থাকেন, তাহলে আর একজন সেই ইতিহাস কতো দুর্মূল্য ও দুর্নিবার তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে বোঝা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের সূচনায় আমরা দেখি একটি দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ের রাত্রে এক পথহারা অশ্বারোহী একটি মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হয়েছে ক্ষীণ প্রদীপালোক অবলোকন করে। মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুই অপরূপ সুন্দরীর রূপদর্শন করিয়েই আবার প্রদীপালোক অপসৃত করে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। অন্ধকার বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম রোমান্সের স্বপ্নরাজ্যের পথ উন্মুক্ত করেছেন বাংলা গদ্যে এবং নবতর রচনাশৈলীতে। আর তারই নয় বছর বাদে প্রকাশিত হলো রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা'। তার প্রথম পরিচ্ছেদে হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর পাঠান রাজত্বের ইতিহাস সামান্য বর্ণনা করেই তিনি সেই সময় হিন্দু মুসলমান, জমিদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলের মধ্যে কি রকম সম্বন্ধ ছিল তারই স্বরূপ নির্ধারণে উপন্যাসের সূচনা করেছিলেন। সেখানে এই উপন্যাসের সূচনা হয়েছে এইভাবে ঃ

[অর্থনৈতিক চিত্র]

"শিখণ্ডি। এবার শস্য কেমন হইয়াছে?

নবীন। ঠাকুর, আমার দুই কুড়ি বৎসর পার হইয়াছে, এমন সুন্দর শস্য কখনও দেখি নাই। এ বৎসর বিধাতার অনুগ্রহের সীমা নাই।"

[জমিদারের সঙ্গে সম্পর্ক]

"নবীন। শুনিয়াছি আমাদের জমিদার পুত্র কখন কখন বলেন, স্ত্রীরত্ন পরম রত্ন, কখন বলেন, বন্ধু হত্যার মত পাপ নাই; আবার কখন বলেন প্রজার কষ্ট দেখা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। শিখণ্ডি বাহন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—আমার বোধ হয়, তিনি কোন ভয়ানক পাপ করিয়া থাকিবেন, মহাপাপে চিত্তের উন্মত্ততা জন্মে।

নবীন। তিনি কোন পাপ করিবেন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।

"এই বলিয়া নবীনদাস ক্ষণেক স্থির হইয়া যেন পূর্বকথা স্মরণ করিতে লাগিল। পুনরায় বলিল,—তাঁহার অন্তঃকরণে যে দয়া, তিনি পাপ করিতে পারেন না। আজ অনুমান দ্বাদশ বৎসর হইল, আমি একবার ইচ্ছাপুরে গিয়াছিলাম, দেখিলাম দুই চারিজন প্রজা খাজনা দিতে পারে নাই বলিয়া ঘরে আবদ্ধ আছে। তখন আমাদের জমিদার পুত্রের বয়স আট বৎসর হইবে। তিনি লুকাইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দিলেন

এবং প্রজাগণের হস্তে দুইটী করিয়া মুদ্রা দিলেন। প্রজারা আনন্দে খাজনা দিয়া চলিয়া গেল।"

এখানে রমেশচন্দ্র উপন্যাসের সূচনাতেই ইতিহাসের বাস্তব কঠিন ভূমিতে তার চরিত্রগুলিকে নিয়ে এসেছেন। সেখানে শস্যের ফলন সম্পর্কে কথা হয়েছে, জমিদারের কর সম্পর্কে কথা হয়েছে, জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্কের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ এককথায় আমরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে যে আর্থিক সামাজিক পরিস্থিতি ছিল সেখানেই এক মুহূর্তে পৌঁছে যাই। বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন এবং একটি শূন্য পৃষ্ঠাপূরণ সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন তার মূল সূত্রটি বোধ হয় এখানে নিহিত আছে।

'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের ঐতিহাসিক চরিত্র তোডরমল্ল এর নায়ক। এই ঐতিহাসিক চরিত্র তরুণ বীরকে নায়ক করে বঙ্গদেশের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের মানব জীবনের চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। পনেরোশো তিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দে শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁ বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহন করেন। তার পরের বছরেই শাহেনসা আকবরের পূর্বাঞ্চলের এই দেশটি অধিকার বরবার ইচ্ছা জাগে। কেবলমাত্র পাটনা জয়ের পরেই মনায়ম খাঁ-কে সেনাপতি করে এবং তার সঙ্গে রাজা টোডরমলকে রেখে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজা টোডরমল দায়ুদ খাঁকে বারবার পরাস্ত করে শেষে কটকের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। অবশেষে দায়ুদ খাঁ পনেরোশো চুয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র উড়িষ্যাপ্রদেশ নিজ অধীনে রেখে বঙ্গ এবং বিহার প্রদেশ মোগলদের হাতে সমর্পণ করেন। পরে হুসেন কুলী খাঁ নিযুক্ত হওয়ায় দায়ুদ খাঁ বিদ্রোহ করেন, পরে রাজমহলের যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। হোসেন কুলী খাঁ-কে বঙ্গ বিহারের শাসন কর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পনেরোশো আশি খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশে পুনরায় বিদ্রোহ হয়। টোডরমলকে আকবর পুনরায় পূর্ব ভারতে প্রেরণ করেন এবং তিনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সেনাপতি ও শাসন কর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশে হিন্দু মুসলমান, জমিদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলের মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক ছিল এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কিভাবে নির্বাহ হোতো এই উপন্যাসে তার একটি সার্থক রেখা-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রমেশচন্দ্রের সার্থকতা এই যে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'র মধ্যেই তাঁর ঐতিহাসিকতাকে অর্থাৎ তাঁর ঐতিহাসিক নিষ্ঠাকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর ইতিহাসে প্রখর জ্ঞান, তৎকালীন ঐতিহাসিক জীবনের নানা বৃত্তান্ত সম্পর্কে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য তৎকালীন ঐতিহাসিক পুরুষ ও নারীচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান এই উপন্যাসটির মধ্যে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে শ্রীখণ্ডীবাহন, মহাশ্বেতা, সরলা, অমলা, ইন্দ্রনাথ, বিমলা, সতীশচন্দ্র, শকুনি, হুমায়ুন, চন্দ্রশেখর, কমলা এবং সর্বোপরি টোডরমলের চরিত্র ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে এক কথায় যথাযথ। অনেক

সময় মনে হয় এগুলি ইতিহাসের তৎকালীন জীবন থেকে যেন সোজাসুজি তুলে আনা হয়েছে। কিন্তু কোথাও যেন একটি প্রাণহীনতার স্পর্শ উপন্যাসের সর্বত্র বিরাজমান। রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কল্পনায় রোমান্সের স্বপ্ন সৃষ্টিতে বিভোর হননি বটে কিন্তু উপন্যাস পাঠে একথা মনে হয় যে তিনি ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে বাস্তব অর্থেই পদচারণা শুরু করেছিলেন এবং সেখান থেকেই তিনি ইতিহাসের বাস্তব মালমশলা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রতিমা যতই সার্থকভাবে গঠিত হোক না কেন সেখানে চাই প্রাণের স্পর্শ—প্রকৃত চক্ষুদানেই দেবীপ্রতিমা জীবন্তরূপ ধারণ করে। 'বঙ্গবিজেতা'র ক্ষেত্রে সেরকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল বলেই তা একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমিকা সৃষ্টি করতে পারলেও, উপন্যাসটিকে সামগ্রিকভাবে সার্থকতার শ্রেণীতে উন্নীত করতে পারেননি।

তাই তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর এ জাতীয় ত্রুটি মুক্ত হয়ে তিনি উপন্যাসের সজীব মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'মাধবীকঙ্কন' (১৮৭৭) তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমিকাও ঐতিহাসিক। লেখক এইভাবে সেই ঐতিহাসিক পটভূমিকাটিকে উপস্থিত করেছেন ঃ

"...১৬৫৭ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা নগরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আগ্রার রাজদ্বার লোকে সমাকীর্ণ, সমস্ত নগরবাসী ভীত ও শশব্যস্ত, বাজার দোকান সমস্ত বন্ধ, ওমরাহ, মনসবদার, রাজপুত, মোগল, পাঠান সকলেই অস্থিরচিত্ত ও চিন্তাবিহ্বল। কার্য্যকর্ম্ম বন্ধ হইল, সকলেই ভীত ও উৎসুক। সম্রাট শাজাহান কয়েকদিন অবধি পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন। আজি সংবাদ রটনা হইল যে, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

"মিথ্যা সংবাদে শীঘ্রই সমুদায় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, দক্ষিণ হইতে আরংজীব, গুজরাট হইতে মোরাদ, রণসজ্জায় বহিস্কৃত হইলেন, পিতৃবিয়োগে সকলেই সিংহাসনারোহণে লোলুপ হইলেন।"—এরই ফলশ্রুতিতে ঘটলো ষোলশো সাত্তান্ন খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী যুদ্ধ। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও পরিবেশের মধ্যে রচিত রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কন'। এই উপন্যাসে রমেশচন্দ্র ইতিহাস ও মানবজীবনের স্বাভাবিক সম্বন্ধগুলিকে উপন্যাসের মনস্তত্ত্বে ধরবার চেষ্টা করেছেন। মোগল যুগের পটভূমিকায় এবং তার ঐশ্বর্য আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রেক্ষাপটে তিনি নগেন্দ্রনাথ, শ্রীশ ও হেমলতার জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তা মূলতঃ পারিবারিক জীবন। উপন্যাসের সূচনায় আমরা দেখি লেখক বর্ণনা করছেন ঃ

"দুইটী বালকে বালুকার গৃহ-নির্ম্মাণ করিতেছিল, কাহার ভাল হয় হেমলতা দেখিবে। নরেন্দ্র গৃহ-নির্ম্মাণে অধিকতর চতুর কিন্তু চঞ্চল ; হেম যখন নিকটে দাঁড়ায় নরেনের ঘর ভাল হয় ; আবার হেম শ্রীশের ঘর দেখিতে গেলেই নরেন রাগ করে, বালুকাগৃহ পড়িয়া যায়। মহাবিপদ, দুই তিন বার উৎকৃষ্ট ঘর পড়িয়া গেল।"

এই সূত্রে সমগ্র উপন্যাসখানি পরিচালিত হয়েছে। সেখানে নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীশ হেমলতার জীবনে প্রেম-ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষার টানা-পোড়েনে এক নবতর মালা রচিত হয়েছে। আসলে মানব জীবনের এই কামনা বাসনার. সুখ দুঃখের এই কাহিনী রচনা করার কালে রমেশচন্দ্র 'মাধবীকঙ্কনে' ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে ইতিহাসের পটভূমিকায় নরনারীর প্রেম ভালবাসার সুনিপুণ চিত্রই অংকন করেছেন। তাই উপন্যাসের শেষ অংশে যখন দেখি হেমলতা বলছেন—"—নরেন্দ্র! অনেক দিন পর আমাদের দেখা হইয়াছে, আবার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না, আইস আমাদের মনের যা কথা তাহাই কহি। নরেন্দ্র! বাল্যকালে আমরা দুইজনে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, কত স্বপ্ন দেখিতাম। এক্ষণে তুমি সৈনিকের ব্রতে ব্রতী হইয়াছ, আমি পরের স্ত্রী। নরেন্দ্র, বাল্যকালের স্বপ্ন একেবারে বিস্মৃত হও।" নরেন্দ্র হেমলতার এই প্রণয় কাহিনীর মধ্যে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করেন। এই প্রভাব বর্তমান থাকলেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে 'মাধবীকঙ্কন' উপন্যাসে রমেশচন্দ্র দত্ত নিজেকে ঔপন্যাসিকের সাবলীল ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

রমেশচন্দ্রের চারখানি উপন্যাসকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দুটি উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কন' আর 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' অপর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপন্যাসের ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা চলে—"প্রথম দুইখানি উপন্যাসের বর্ণনীয় বস্তু ও মুখ্য চরিত্রগুলি প্রধানতঃ কাল্পনিক; কেবল ঐতিহাসিক আবেষ্টনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহারা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী উপন্যাসদ্বয় প্রধানতঃ ইতিহাসের সংশয়হীন ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত; তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত কাল্পনিক বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে, তাহারা কেবল বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিতেছে; তাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে শূন্য স্থানটুকু আছে তাহাদিগকে রসে ও বর্ণে ভরিয়া তুলিতেছে। অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্যের চারিদিকেও কল্পনাশক্তির ক্রীড়ার যথেষ্ট অবসর আছে। ইতিহাসের শুষ্ক অস্থিরতার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে, কল্পনার সাহায্য অপরিহার্য্য। রমেশচন্দ্রের শেষের দুইখানি উপন্যাসে যে কল্পনার পরিচয় পাই, তাহা মুখ্যতঃ এই জাতীয়। তাহা ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী নহে, অনুগামী; তাহা ইতিহাসকে বিকৃত করে না, কেবল বিস্মৃত-মলিন সত্যের রেখাগুলির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিতে চেষ্টা করে মাত্র।" —সমালোচকগণ রমেশচন্দ্র দত্তের চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যে দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন, সেখানে একভাগে অর্থাৎ 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কনে'র মধ্যে কল্পনা-আধিপত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন—যা বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সমালোচকগণ

এ কথাও স্বীকার করেছিলেন যে রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করেছেন এবং এক শূন্য পৃষ্ঠাকে পূর্ণ করেছেন। দ্বিতীয় ভাগের উপন্যাসের মধ্যে 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'-র মধ্যে যে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, সেখানেই বঙ্গ সাহিত্যে তাঁর ভূমিকা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্কিমের অব্যবহিত পরেই ঐতিহাসিক তথ্যে এই সত্যনিষ্ঠ জীবন রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তিনি বঙ্গ সাহিত্যের একটি বৃহৎ শূন্য অংশকে পূরণ করেছিলেন। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতে' ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অন্তরালে রঘুনাথ এবং সরযূবালার একটি প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং উপন্যাসের এই প্রেমকাহিনীর পাশাপাশি ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্ঠা সমস্ত উপন্যাসটিকে একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

পনেরোশো নব্বুই খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে দিল্লীর অধীনে আনবার চেষ্টা করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই খন্দেস ও আহম্মদ নগর রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। আকবরের পৌত্র শাহজিহানের সময় সমগ্র আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর করতলগত হয়, কেবলমাত্র বিজাপুর ও গোলখোন্দ এই দুটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গোলখন্দের অধীনে হিন্দুদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। মুসলমান রাজা হলেও হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়দের বুদ্ধিবলে রাজ্য শাসিত হত। আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে যাদব রাও ও ভঁসলা নামে দুটি পরাক্রান্ত বংশ ছিল। এই বংশেরই সন্তান ছিলেন শিবাজীর মাতা ও পিতা। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের রঘুনাথ, সরযূবালা, শিবাজী, তন্নজি, জনার্দ্দন, যশোবন্ত, মহাদেও ইত্যাদি চরিত্রগুলি যথার্থভাবে ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে অঙ্কিত করেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। যুদ্ধ ও মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্মাণে লেখক অসাধারণ ঐতিহাসিক পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। পর্বতসঙ্কুল দুর্গ পরিবেষ্টিত মহারাষ্ট্রের যে পরিবেশ বর্ণনা করেছেন তা এক কথায় জীবন্ত।

পরিবেশ বর্ণনা : উদাহরণ হিসাবে দুটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

গিরি কন্দরে, দুর্গ প্রাকারে শিবাজীর যুদ্ধ পরিচালনা :

"শিবাজী নিস্তব্ধে সেই বৃক্ষ শ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল, সেই দিক হইতে শিবাজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্য সকল সেই দিকে ধাবমান হইল, এদিকে প্রাচীরোপরি যে আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল। তখন শিবাজী বলিলেন,—মহারাষ্ট্রীয়গণ। শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবাজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও। তন্নজী! বাল্যকালের সৌহৃদ্যের পরিচয় অদ্য প্রদান কর।"

প্রাকৃতিক পরিবেশ : "প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইল, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পৌঁছিল। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশবায়ু সেই পর্বত বৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্মর শব্দে প্রবাহিত হইতেছে।"

উপরোক্ত দুটি উদ্ধৃত অংশের মধ্যে আমরা সেকালের রুক্ষ-কঠোর পার্বত্য অঞ্চলের যেমন মর্মরধ্বনি শুনতে পাই, ঠিক তেমনি ইতিহাসের পার্বত্য মূষিক শিবাজীর দুর্গ অভিযানের একটি পূর্ণচিত্র আমাদের কাছে প্রস্ফুটিত হয়।

'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় লেখক রাজপুত জাতির পতনের ইতিহাসকে মানবিক অনুভূতিতে সিঞ্চিত করে তুললেন। এই উপন্যাসে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীর হৃদয়বৃত্তান্তের কথা সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে ঠিক এ-ভাবে—পনেরোশো ছিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবসে মেওয়ার প্রদেশের অন্তর্গত সূর্য্য মহল নামক পর্বত দুর্গের ঝনঝন্ শব্দে দ্বারোদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে শত শত অশ্বারোহী বর্শা হাতে বেরিয়ে এলেন, তাদের শানিত বর্শাফলক সূর্যকিরণে ঝকমক্ করতে লাগলো, অশ্বক্ষুরের আঘাতে শিলাখণ্ড থেকে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হতে থাকলো। লেখক এর কিছু পরেই যে বর্ণনাটি দিয়েছেন তা একান্তভাবে ঐযুগেরই ইতিহাস সংক্রান্ত বর্ণনা :

"রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্বত গহ্বরে অপরিচিত লোক দ্বারা বেষ্টিত দেখিলেন। গহ্বরে একটি মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, সেই দীপালোকে দুর্জ্জয়সিংহ আপনার চতুর্দ্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতীয় লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা পরস্পরে কি কথা কহিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরক্ষণেই বাহিরে যাইতেছে, তাহার কারণও জানিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুত ভাষায় কথা কহিলেন, পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ সে কথা বুঝিতে পারিল না। যুবক তাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, যুবক তাহাকে বিশ্রামের জন্য এই গুহায় আনিয়াছেন, যুবক এই পর্য্যন্ত তাহাকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি দুর্জ্জয়সিংহ সেই যুবকের দিকে চাহিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন কি জন্য? দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না : কিন্তু সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলযোদ্ধা, সেই অল্পভাষী যুবকের দিকে যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।" —এই জাতীয় অসাধারণ ঐতিহাসিক পরিবেশ বর্ণনা ও ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'-র কাহিনীটি অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ফলে একদিকে পরিবেশের বর্ণনার নিপুণতায় ও অপরদিকে সজীব তথ্যনিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতে'র মতো 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাসটিকে যথার্থ ঐতিহাসিক

উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করেছে। তাই একথা বলা চলে রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাটিকে যেমন পরিপুষ্ট করেছেন আর কেউ তেমন পারেননি। অসাধারণ কল্পনাশক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেমন নিজেকে কেবলমাত্র নীরস ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন নি, ঠিক তেমনি রমেশচন্দ্রের কল্পনাশক্তি সুদূরে বিস্তারিত ছিলনা বলে তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর অধিকতর নির্ভর করেছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই রোমান্সের রূপ পরিগ্রহ করেছে কিন্তু রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকৃত অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে এবং এই দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি অভাবকে কেবলমাত্র তিনি পূরণ করেছেন শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিক তথ্যের সমবায়ে তিনি একটি ফাঁককে ভরাট করে দিয়েছেন। এইখানেই রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের যথার্থ মূল্যায়ন।

রমেশচন্দ্র পরবর্তী ক্ষেত্রে দুটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন—একটি 'সংসার কথা' (১৮৮৬) অপরটি 'সমাজ' (১৮৯৪)। এই উপন্যাস দুটিতে রমেশচন্দ্র একান্তভাবে বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবার জীবনকে কেন্দ্র করেই তাঁর বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন। কেবল তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মধ্যে বিধবা বিবাহকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জানাতে পারেন নি, সেক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র কেবল বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেন নি, এই উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের পক্ষেও তিনি তাঁর মতামতকে সার্থক ভাবে প্রকাশ করেছেন। সেই হিসাবে এই উপন্যাস দুটিকে কেবল পারিবারিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত না করে সমাজ সংস্কারমূলক উপন্যাসরূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে 'সংসার কথা' উপন্যাসের সংলাপের একটি অংশ উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে—

"শরৎ। কলঙ্ক কি? আমি বিধবা বিবাহ করিয়াছি এই কথা? এটী যদি পাপ কার্য্য না হয় তবে সে কলঙ্ক আমার গায়ে লাগিবে না; যাহারা নিন্দা করিবেন তাঁহাদের মতামতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আর যদি আপনি এ কাজ নিন্দনীয় মনে করেন, আজ্ঞা করুন, আমি ইহাতে নিরস্ত হই।

হেম। বিধবাবিবাহ বোধ হয় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, কিন্তু আধুনিক রীতি বিরুদ্ধ।

শরৎ। ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রগমনও রীতি বিরুদ্ধ ছিল, অদ্য জাহাজে করিয়া সহস্র সহস্র যাত্রী জগন্নাথ যাইতেছে। চন্দ্রনাথবাবু সেদিন বলিলেন, অস্বাস্থ্যকর নিয়মগুলির ক্রমশঃ সংস্কার হওয়াই জীবিত সমাজের লক্ষণ। ক্রমশঃ উন্নতিই জীবনের চিহ্ন, গতিহীনতা মৃত্যুর চিহ্ন।" —এখানেই রমেশচন্দ্র দত্তের কৃতিত্ব। ইতিহাসের সুবিস্তীর্ণ মুঘল পটভূমিকায় ঝড়-ঝঞ্ঝা, অন্তর্বিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ,

হিংসা-প্রতিহিংসা, রক্তপাত, হত্যা, নাশকতা, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা ইত্যাদির পথ অতিক্রম করে বাংলার ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলিতে তিনি নেবে আসতে পারেন। তারপর সেখানকার নিভৃত শান্ত পরিবেশে লোকায়ত মানুষগুলির সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নানা পারিবারিক দুঃখ বেদনা, সমাজ জীবনের নানা সমস্যার গভীরে ঢুকে তাঁকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। সেই সত্যেরই পরিচয় আমরা পাই নায়ক-নায়িকার সংলাপের মধ্যে—

"সাদরে সে জল মুছাইয়া দিয়া সে সুন্দর নয়নদ্বয়ে বারবার চুম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, সুধা—আমি জগতের মধ্যে ভাগ্যবান যে তোমার মত রমণীরত্ন আমার হৃদয়াকাশে শোভা পাইতেছে, আমার জীবনাকাশে চিরকাল দীপ্ত রহিয়াছে। স্বদেশে, বিদেশে, সুখে, শোকে, সন্তাপে, তুমিই আমার নয়নমণি, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী।

"সুধা কিছু উত্তর দিতে পারিল না,—স্বামীর স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে আবার সজল নয়নে চাহিল, আবার স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া নয়ন জল ত্যাগ করিল।

"পতিপ্রাণা সুধার মনের কথা যদি বাক্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে সে বলিত, 'পথের কাঙ্গালিনীকে কুড়াইয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছ,—দুঃখিনীর জন্য নিন্দা ও কষ্ট সহ্য করিয়াছ,—হৃদয়েশ্বর! আমি কি তোমার রত্ন হইলাম? চিরজীবন তোমার দাসী হইয়া থাকিব, জন্মে জন্মে ঐ পুণ্যপদ সেবা করিব।" —শতাধিক বৎসর পূর্বে পল্লীবাংলার লোকায়ত দাম্পত্য জীবনের ও পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনের এ জাতীয় চিত্রাংকনে রমেশচন্দ্র এক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রমেশচন্দ্র ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সৌন্দর্যচেতনা ও শিল্প-সচেতন মানসিকতা হয়তো তাঁর ছিল না; ফলে তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শিল্পগুণ সমন্বিত জীবনরসরসে সমন্বিত হতে পারেনি। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা, ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস, ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা ও পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা, সমসাময়িক যুগে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে মানুষ ও তার সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে ঐ যুগের এক অসাধারণ স্রষ্টারূপে চিহ্নিত করেছিল। রমেশচন্দ্র তাই সঠিক অর্থে যুগস্রষ্টা না হলেও তিনি ছিলেন যুগন্ধর পুরুষ—যাঁর রচনাগুলির মধ্যে যুগের প্রতিফলন ঘটেছিল।

তাই রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দের 'মডার্ন রিভিউ'-র জানুয়ারী সংখ্যায় স্বয়ং ভগিনী নিবেদিতা একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন : Unassuming, simple, generous to a fault his expression might be modern, but his greatness within was ancient greatness. Romesh Chandra Dutta was a man of his own people. The object of all he ever did

was not his own fame, but the uplifting of India. ভগিনী নিবেদিতারই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাই তাঁর সামগ্রিক রচনাগুলির মধ্যে। একদিকে ভারতীয় ভাবধারার সুমহান ঐতিহ্য-বোধের প্রতি সুগভীর আগ্রহ, অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় জীবনধারা ও অর্থনীতি সম্পর্কে নিষ্ঠানুগ অনুসন্ধিৎসা তাঁকে একদিকে যেমন ভারতপ্রিয় করে তুলেছে, ঠিক তেমনি কেবল আদর্শ আর ঐতিহ্যের ভাবগত প্রেরণার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ ব্যথাবেদনা, ভারতের নিরবচ্ছিন্ন সমস্যাগুলির সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছে। এরই বাস্তবরূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রশাসনিক জীবনের মধ্যে, আর মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন পাই তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধাবলীতে এবং উপন্যাসগুলির মধ্যে। তাঁর রচিত 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যায়' একদিকে যেমন ভারতের অতীত ইতিহাস, জাতীয় সংকট ও ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলিকে কল্পনার মৌলিকতায় ভাস্বর করে তোলা হয়েছে, ঠিক তেমনি 'সংসার', 'সমাজ'—উপন্যাসদ্বয়ে ভারত তথা বাংলার নিভৃতপল্লীর প্রাত্যহিক দিনযাপনের লোকায়ত জীবন চর্যার কথাকে তৎকালীন নানা সমাজ ও পারিবারিক সমস্যার সঙ্গে একীভূত করে বাস্তবতার প্রত্যক্ষ ভূমিকায় পরিবেশন করা হয়েছে। প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভাষায় "সংসার ও সমাজে রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল হইতে শান্ত পল্লীর সৌন্দর্যের মধ্যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি নূতন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা এতদিন ইতিহাসের সুবিশাল ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনা সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সমাজ ও পরিবারের ক্ষুদ্র ব্যাপার লক্ষ্য করিতে তিনি অবসর পান নাই, কিন্তু তাঁহার শেষ উপন্যাসদ্বয়ে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে ইতিহাসের বিশাল ও সমাজের সংকীর্ণ এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার তুল্য অধিকার ও সমান শক্তি আছে।"

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রমেশচন্দ্র দত্তের গুরুত্ব এইখানে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। Life and work of Ramesh Ch. Dutta by J. N, Gupta (1911)

২। রমেশচন্দ্র গ্রন্থাবলী

৩। নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০১

৪। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

শিবনাথ শাস্ত্রী : শিক্ষিত গার্হস্থ্য জীবন

শিবনাথ শাস্ত্রী একাধারে কবি, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃত ত বটেই, সমাজ-সংস্কারক এবং ঐতিহাসিক হিসাবেও তিনি আজও বঙ্গসংস্কৃতিলোকের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' যেমন সুললিত জীবন-কথা, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস বিষয়ের প্রামাণ্য দলিলও বলা যায়। আজো এই দুই গ্রন্থের পাঠ্যতাগুণে যেমন দীপ্তিময় লাবণ্যে ভরা, তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক রসে সিক্ত ; একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ছাড়তে পারা যায় না।

ঠিক এই প্রসাদগুণেই তাঁর উপন্যাসগুলিকে আজো বিস্মৃতির নিরালোক থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিক, যদিও বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে ন'-দশ বছরের ছোট ছিলেন, তবু বলা যায় যে বঙ্কিম-আদর্শের পরিবৃত্তেই তাঁর সাহিত্য সাধনা।

কবিতা রচনার মাধ্যমেই সাহিত্যলোকে শিবনাথের প্রথম আবির্ভাব হলেও গদ্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। শিবনাথ নিজেও তাঁর ডায়েরিতে এক জায়গায় লিখেছেন (২৩. ৯. ১৯১১) 'প্রকৃতি ও মানুষকে কবির চোখে দেখিতাম।' নিজের চোখে দেখা মানুষজনই তাঁর উপন্যাসের চরিত্র, কী 'মেজবৌ' বা 'নয়নতারা' অথবা 'যুগান্তর'—সর্বত্রই লেখকের জীবনপথে দেখা কিছু সজীব চরিত্রই তাঁর উপন্যাসে এসে ভিড় করেছে।

নিজের চরিত্রধর্মে শিবনাথ দৃঢ়চেতা ছিলেন, সাহিত্যসাধনা অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম প্রসার এবং প্রচারের ব্রতই তাঁর জীবনে বড় হয়ে ছিল, তিনি ছিলেন প্রগতিপন্থী, সামাজিক কোনো প্রাচীন কুপ্রথা ও কুসংস্কার তিনি কখনোই বরদাস্ত করেন নি। ইংলণ্ডে কিছু কাল থেকে এলেও তিনি মদ্যপানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি কৌলীন্য প্রথার ত্রুটির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। বাল্যবিবাহকে নিন্দা করেছেন। বিধবা-বিবাহের তিনি সমর্থক। মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া যে একান্ত জরুরী এবং মর্যাদার সঙ্গে সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা যে জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক—এ কথা তিনি সর্বদা স্বীকার করতেন। তাই তাঁর উপন্যাসগুলিতে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারীচরিত্রের ওপরই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মেজবৌ, যুগান্তর এবং নয়নতারা এই তিনটি উপন্যাসেই নারী চরিত্রই প্রধান হয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাস সংখ্যা হলো চারটি, এদের মধ্যে শেষেরটি খুবই অপরিচিত। তাঁর প্রথম উপন্যাস হলো 'মেজ বৌ', এটির প্রকাশ কাল হলো ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ, তখন তাঁর বয়স হলো তেত্রিশ বছর। দ্বিতীয় 'যুগান্তর'—এটি বের হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয় উপন্যাস হচ্ছে 'নয়নতারা'—ঈষৎ দীর্ঘায়তন, এই উপন্যাসটি

প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। এ ছাড়া 'গরীবের ছেলে' বলে তাঁর চতুর্থ উপন্যাসের উল্লেখ আছে। এটির প্রকাশকাল নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। অনেকের মতে এটি লেখকের মৃত্যুবৎসরে অর্থাৎ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বের হয়, অন্যের মতে 'গরীবের ছেলে' শিবনাথের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে। 'গরীবের ছেলে' উপন্যাসটি তাঁর আগের তিনখানি গ্রন্থের মতো পরিচিত ও সমাদৃত হয় নি ; এমন কি, 'শিবনাথ রচনা সংগ্রহ'—গ্রন্থেও এটি অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে বইটি দুর্লভদর্শন বলা চলে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসবিচারে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে তিনি হলেন বঙ্কিম সমসাময়িক ঔপন্যাসিক। তাই একালের ঔপন্যাসিকদের যে সব দোষগুণ, তা অল্পবিস্তর শাস্ত্রীমশায়ের রচনাতেও দেখতে পাওয়া যাবে।

বঙ্কিম সমকালের ঔপন্যাসিকদের রচনার মধ্যে অতিকথন দোষ ছিল ; শাস্ত্রীমশাই যে এই দোষ থেকে একেবারে বিমুক্ত ছিলেন—এমন কথা বলা চলে না। সংক্ষিপ্ত আকারে সূক্ষ্ম দু' একটি রেখায় যে ছবি আঁকা যেত, সেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণাঢ্য জৌলুসের সঙ্গে তা বর্ণনা করেছেন। 'মেজ বৌ' উপন্যাসে প্রমদার চরিত্রপরিচয় আরো কম কথায় বললে কোনো ক্ষতি হতো না, কিন্তু তৎকালীন রীতির আনুগত্যেই তিনি বিস্তারিতভাবে প্রমদাকে পাঠকের কাছে হাজির করেছেন। 'নয়ন তারা' উপন্যাসেও হরেন্দ্রর বীরত্ব ও গুণপনার মধ্যে অতিকথন আছে ; অথচ তার ভীরু প্রেমনিবেদনের কাজটি খুবই সংক্ষেপে লেখক সেরেছেন। ফলে তা পাঠকের মনে সহজেই গভীর রেখাপাত করেছে।

শাস্ত্রী মশাই যুগধর্মকে ডিঙোতে চান নি, তাই বঙ্কিমযুগের লেখকদের মতোই তিনি নিজের উপন্যাস রচনা করেছেন। আসলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও সমাজসেবার প্রতিই তাঁর প্রথম মনোনিবেশ ; তাই তিনি উপন্যাসে কোথায় শিল্পাতিশায়ী অতিকথন ঘটছে—তা ভাবেন নি। বরং একথা বলাই তাঁর সম্পর্কে যথার্থ কথা যে তিনি সংক্ষেপেই ব্যাপক ও বিস্তৃত বিন্যাসের রস উজাড় করে দিতে পারতেন। তাঁর 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'—এই দুই গ্রন্থ বেশী বলা ত' দূরস্থান, জায়গায় জায়গায় তিনি সংক্ষেপে বক্তব্য রেখেছেন, ফলে পাঠকের আগ্রহ বাড়ে। 'আত্মচরিত' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ততার কথা নিশ্চয়ই পাঠক ক্ষোভের সঙ্গে উত্থাপন করে থাকবেন। ছোট ছোট কাহিনীকল্প বিন্যাসের মাধ্যমে শিবনাথ নিজের জন্ম, শৈশব, শিক্ষা প্রভৃতির কথা যেমন বলেছেন, তেমনি পিতা, পিতামহ, পত্নী প্রভৃতি বহু ব্যক্তির জীবন্ত ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং তুলেছেন তা অতি সংক্ষেপেই। এটি তাঁর জীবনী-গ্রন্থ, কিন্তু এর পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন যে তাঁর কলম ঔপন্যাসিকের।

তাই বলছিলাম যুগকবলিত ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি অতিকথনের দোষভাগী হয়েছেন।

বঙ্কিম সমসাময়িক ঔপন্যাসিকের সংখ্যা বড় কম ছিল না, সর্বসাকুল্যে তাঁদের গ্রন্থও অগুনতি ; কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে যদি কোনো ঔপন্যাসিক জনপ্রিয়তা লাভ করতেন, তৎক্ষণাৎ সেই বিষয় নিয়ে অনেকেই উপন্যাস লিখে ফেলতেন। অর্থাৎ তাঁদের

লেখার প্রাচুর্য ছিল, বিষয়ের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য ছিল না। শিবনাথও গতানুগতিক পথ অবলম্বন করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে 'নয়নতারা' উপন্যাসের উল্লেখ করতে পারি। তখনকার অনেক নায়িকা প্রেমে অসফল হয়ে ধর্মকে আশ্রয় গ্রহণ করে কিংবা সমাজের সেবিকা হয়ে জীবন কাটাতো। শিবনাথের 'নয়নতারা' গ্রন্থের নায়িকাও প্রেম বিড়ম্বিতা, শেষে ধর্মজীবনে আশ্রিতা হয়েছে। এই যুগে এই বিষয়টি নতুন নয়, চর্বিত চর্বণ বিশেষ।

এই সময়ের লেখকেরা একদিকে সমাজ ও ব্যক্তির চিত্র এঁকেছেন, দোষত্রুটী দেখিয়েছেন, অন্যদিকে মত ও আদর্শকে প্রচার করার মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসকে ব্যবহার করেছেন; গুণগত শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের বিষয়ে ঔপন্যাসিকেরা যতটা না সচেষ্ট ছিলেন, আদর্শ প্রচারে তার চেয়ে ঢের বেশী মনোযোগী ছিলেন। শিবনাথের উপন্যাসেও নীতিশিক্ষার ইঙ্গিত আছে। আজ যেমন উপন্যাস সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে মানব জীবনের পূর্ণস্বরূপের কাহিনী বর্ণনাই উপন্যাসের ধর্ম, জীবন-সমস্যার সার্বিক রূপায়ণ তাতে থাকবে; কিন্তু নীতিশিক্ষার মাধ্যমে মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটানো উপন্যাসের কাজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে উপন্যাসের এই ধর্ম অনুসৃত হতো না; সমাজ ও জাতির কল্যাণ কীসে হয়—তার চিন্তাই লেখকের কাছে অগ্রাধিকার পেত। তখন জাতির কল্যাণ বোধই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল। জাতির মঙ্গল কীসে এবং কোন্ সামাজিক ব্যবস্থায়—সাহিত্যই তা ঘোষণা করবে। শিবনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন; নারী শিক্ষা সমাজের কল্যাণ আনবে—এই বিশ্বাস তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন 'মেজ বৌ' উপন্যাসে; 'নয়নতারা' এবং 'যুগান্তরে'ও সেই আদর্শ রূপায়িত হয়েছে। 'মেজ বৌ' গ্রন্থের প্রসঙ্গে শিবনাথ ত' বলেই ফেললেন—"কুলকন্যাদিগের পাঠোপযোগী।" শিক্ষাপ্রাপ্ত রুচিশীল গৃহবধূ যে একান্নবর্তী পরিবারকে সুখী করে তুলতে পারে—মেজো বউ প্রমদার চরিত্রের ব্যাখ্যানে সেই কথাই বলার চেষ্টা হয়েছে। শিক্ষা নারীকে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দান করে—নয়নতারার চরিত্র সৃষ্টি করে শিবনাথ তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। স্ত্রী শিক্ষা শুধু যে নারীজাতিরই কল্যাণ করে—তা নয়, বলিষ্ঠ সমাজগঠনেও স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা দেখানো হয়েছে—বিশেষ করে 'যুগান্তরে'।

যদিও প্রাসঙ্গিক নয়, তবু ঊনবিংশ শতকের উপন্যাস সম্পর্কিত ব্যাপার বলেই এখানে তার উল্লেখ করা চলে। এই সময় যে সব উপন্যাস খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, সে সব উপন্যাসের গল্পের পরিণতির পর থেকে তাদের উপসংহার রচনার প্রবণতা খুব বেশী দেখা গিয়েছিল। 'মেজ বৌ'-এর উপসংহার হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'শান্তিমঠ' নামে এক উপন্যাস লেখেন। 'শান্তিমঠে' মেজ বৌ-এর নায়িকা প্রমদাকে কাশীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রমদা শান্তিমঠ স্থাপন করে একেবারে ধর্মভাবাপন্ন জীবন যাপন করেন এবং ভগবানের চরণে নিজেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমর্পণ করেন।

শিবনাথের প্রথম উপন্যাস হলো 'মেজ বৌ', ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত। এটিতে সামাজিক কল্যাণবোধের আদর্শ দেখা যায়। লেখক তাঁর স্বকালের দেখা মানুষজনের মধ্যে থেকেই চরিত্র বেছে নিয়েছেন, তাঁর সময়ের সমাজব্যবস্থায়, জীবনাচার, চিন্তাভাবনা —সে সবের পটভূমিতে যৌথপরিবারের মেয়ে-বউয়ের জীবনচর্যার আদর্শটি শিবনাথ 'মেজ-বৌ' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে সাহিত্যে একটি আদর্শের প্রবর্তন করেন, তাঁর সমকালের লেখকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শকেই হয় প্রত্যক্ষভাবে, না হয় পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছিলেন। 'মেজ-বৌ' উপন্যাসও সমাজের সামনে একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন। লেখক নিজেই বলেছেন যে 'হিন্দু কন্যাদের পাঠোপযোগী' করে এটি রচিত হয়েছে। ভূমিকাতে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন—"সুকুমারমতি কুলকন্যাদিগকে মানবপ্রকৃতির নীচ ও অপকৃষ্ট বিভাগের সহিত পরিচিত করা অকর্তব্যবোধে পাপের চিত্র সন্নিবেশিত করিতে পারা যায় নাই। গুরুজনের শুশ্রূষা, পতিসেবা, দাসদাসীদিগের প্রতি বাৎসল্য, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যা, প্রতিবেশীদিগের প্রতি সৌজন্য, এইগুলিই নারীগণের শিক্ষণীয় প্রধান সদ্‌গুণ। এইগুলিকে প্রদর্শন করিবার দুই-একটি মাত্র চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।...ইহাকে উপন্যাস না বলিয়া অল্পবয়স্কা কুলকন্যাদিগের পাঠ্যগল্পের পুস্তক বলিলে ভাল হয়। ইহাতে গল্পচ্ছলে গার্হস্থ্য-জীবনের দুই-একটি ভাল ছবি চিত্রিত করিবার এবং আমাদের চারিদিকে, গৃহের পশ্চাতে দুইশত হস্তের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার দুই-চারিটি প্রদর্শন করিয়া দুই-একটি নীতি শিক্ষা দিবার ও দুই-এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।"

মেজ বৌ' উপন্যাসটি আট দশ দিনের মধ্যেই তিনি লিখে ফেলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৯ সালে বঙ্গদেশ থেকে বিহারে পাটনায় তাঁর বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায়ের (বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা) বাড়িতে আসেন, কিন্তু প্রকাশবাবু তখন পাটনার বাইরে ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীকে সেই বাসায় কয়েকদিন অপেক্ষা করতেই হলো ; সেই অবসরে পাটনায় বসে তিনি 'মেজ বৌ' উপন্যাসটি রচনা করেন। এবিষয়ে তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন—"ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকটে একখানি পারিবারিক উপন্যাস লিখিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাটা এখানে পূরণ করিলাম। এই ৮/১০ দিনের মধ্যে 'মেজ বউ' নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম।"

'মেজ বৌ' উপন্যাসটি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালী যৌথ পরিবারের শিক্ষিত, উদার, বুদ্ধিদীপ্ত, পরিচ্ছন্নরুচির একটি গৃহবধূর চরিত্রালোচনা ; চরিত্রটি আদর্শ করে তোলা হয়েছে, এবং সকল বাঙালী কন্যার পক্ষেই যেন এই চরিত্র অনুকরণীয় হয়।

'মেজ বৌ'-এর কাহিনী বেশ সরলভাবেই বলা হয়েছে। নদীয়া নিশ্চিন্দপুর গ্রামে বাস করেন মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্রবোধচন্দ্র কলকাতায় বি. এ. পড়ে। এর স্ত্রী প্রমদা সুশ্রী সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা, পরিচ্ছন্ন রুচিসম্পন্না এবং পড়াশুনোর প্রতি বিশেষ আগ্রহশীলা। বড় জা, মেজ জা, ননদ, ভাসুর, দেওর—তাদের ছেলে মেয়ে শ্বশুর শাশুড়ী—সকলের প্রতি যত্নশীল ও কর্তব্যপরায়ণ। এসব সত্ত্বেও শাশুড়ী প্রমদাকে একেবারেই দেখতে পারেন না, শ্বশুর ও মেজবউকে ভালবাসলেও ভাবেন যে প্রমদার মধ্যে বড়মানুষী চাল আছে।

এই কর্তার অসুখ হলে মেজ বৌ প্রমদা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নিজের গহনা বিক্রী করে চিকিৎসা করায়, তাতে কিছু ফল হয় না। শ্বশুরের মৃত্যু আসন্ন জেনে তাঁকে দেশের বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো। কর্তার মৃত্যুর পর থেকে সংসার কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

বাপের বাড়ীতে প্রমদার একটি কন্যা হয়। প্রবোধ তখন বি. এ. পাশ করে মাষ্টারি করতো, পরে অবশ্য ল' পাশ করে ওকালতিতে বেশ পসার করে। প্রমদা এবং কন্যাকে নিয়ে প্রবোধ কলকাতায় বাসা ভাড়া করে, ছোট ভাইকে কাছে রেখে ডাক্তারি পড়াবার চেষ্টাও করে।

বেরিলিতে সেজ ভাইয়ের জেল হয়েছে শুনে প্রবোধ সেখানে গেল। এদিকে দেশের বাড়ীতে প্রবোধের মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। পত্রে প্রমদা স্বামীকে সে খবর জানায়; আর অসুস্থ শাশুড়ীকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে আসে কলকাতায় ছোট দেওর প্রকাশের বন্ধু হরিতারণের সাহায্যে। শাশুড়ীর সঙ্গে আসে দুই জা, দুই ননদ শ্যামা আর বামা। শ্যামার কুলীনের ঘরে বিয়ে হয়েছিল, তাকে আর স্বামীর ঘর করতে হয় নি, আর বামা বালবিধবা।

বেরিলিতে গিয়ে প্রবোধ অসুবিধার মধ্যে পড়ে, তার টাকা চুরি হয়ে যায়। মা-র অসুখের খবর পেয়ে ছোট ভাইয়ের মামলা আপিল করার জন্যে উকীল বন্দোবস্ত করে প্রবোধ ফিরে এল। ক'দিন বাদেই মা মারা গেলেন।

এর কিছুদিন পরে প্রমদার ছোট্ট মেয়েটাও জলে ডুবে মারা গেল। অন্যদিকে দেখা গেল বিধবা বামার সঙ্গে হরিতারণের বেশ একটা মধুর ও গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রমদার দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে এক পুত্র জন্ম মাত্র আটদিন বেঁচেছিল; এর জন্মকাল থেকেই প্রমদা অসুস্থ হয়ে পড়লো। প্রবোধ পশ্চিমে চেঞ্জে নিয়ে গিয়ে প্রমদাকে সুস্থ করে তুললে বটে, কিন্তু নিজের হলো যক্ষ্মা। সংসারে চরম অর্থাভাব এল। মুঙ্গের বাসাভাড়া নিয়ে থাকা হলে হবে কী—সংসার যেন আর চলে না। প্রমদা নিজের সব গহনা বিক্রী করে দিয়েছে; তাদের বিশ্বস্ত চাকর খোদাই—সেও তার নিজের যা-কিছু ছিল, প্রবোধ-প্রমদার জন্যে গোপনে খরচ করে ফেললো। বামার একটা স্কুল মাষ্টারি জুটলো বটে, কিন্তু সংসারে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব কাজ করা, শরীর ভেঙে গেল। প্রমদা স্বামীর সেবা নিয়েই থাকে। বামারও যক্ষ্মা হলো।

প্রকাশ ও হরিতারণ এসে ওদের কলকাতায় নিয়ে এল। চিকিৎসায় বিশেষ কোনো ফল হলো না, বামা মারা গেল। হরিতারণ কান্নায় ভেঙে পড়লো। প্রবোধ বললে,— পরলোকে দাদার জন্যে জায়গা ঠিক করতে ও আগে চলে গেল।

এ কথা শুনে প্রমদা ডুকরে কেঁদে উঠলো। কাহিনীর সমাপ্তি এইখানে।

এটি যেমন ঘটনাবহুল উপন্যাস, তেমনি উদ্দেশ্যপূর্ণ এর চরিত্রসৃষ্টি। অবশ্য প্রমদাই একক বিশিষ্ট চরিত্র, এবং তাকে কেন্দ্র করেই অন্যচরিত্রগুলি পরিস্ফুট হয়েছে। প্রমদাকে আদর্শ হিসাবে খাড়া করার জন্যে নারীর পক্ষে যতগুলি সদ্‌গুণ সঞ্চয় ও অনুশীলন করা সম্ভব—প্রমদার সে সব গুণই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি যত্নশীলতা, ননদ ও জায়েদের সঙ্গে সুমিষ্ট ব্যবহার, পীড়িতের নিরলস সেবাশুশ্রূষা—বঙ্গনারীর যেন শিক্ষণীয় হয় এই উদ্দেশ্যেই প্রমদাচরিত্রের সৃষ্টি। তাই লেখক চিত্রধর্মী টুকরো টুকরো গল্পাংশ সৃষ্টিতে অনবদ্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অন্যচরিত্র সৃষ্টির প্রতি তেমন মনোযোগী হন নি। এমন কি বামা-হরিতারণের প্রণয়ঘটিত হৃদয়দৌর্বল্যকে ভিত্তি করে শাখা কাহিনীও তৈরী করেন নি। প্রমদাকে সব দিক থেকে সর্বগুণসম্পন্ন করার জন্যেই গোটা উপন্যাসে লেখকের উদ্যম ও ব্যস্ততা দেখা গেছে। প্রমদার পাতিব্রত্য অতুলনীয়, কল্যাণীয়দের প্রতি তার স্নেহমমতা অভাবনীয়, পাড়াপড়শীর প্রতিও তার ব্যবহার অকল্পনীয়ভাবে সুমধুর।

'মেজ বৌ' উপন্যাসের সব চরিত্রই বাস্তবানুগ, শুধু প্রমদার চরিত্রকে বিরলদৃষ্ট আদর্শ চরিত্র হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। এই উপন্যাসের চরিত্র কেমন স্পষ্ট এবং বাস্তব—তার একটা নজিরের উল্লেখ করি। শিবনাথ তাঁর আত্মচরিতের দশম পরিচ্ছেদে 'ভৃত্যের ভালবাসা' নামক অনুচ্ছেদে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ভৃত্য খোদাই-এর কথা লিখেছেন। তিনি তাঁর অসুখের সময় খোদাই-এর আনুগত্যের পরিচয় পান। "খোদাইয়ের স্মৃতি আমার মনে পবিত্র প্রেমের উৎস স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমার 'মেজ বৌ' নামক উপন্যাসে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছি।...দিনের পর দিন যায়, দেখি প্রসন্নময়ী (প্রথম স্ত্রী) আমার নিকট সংসার খরচের টাকা চান না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—'কে জানে খোদাই কোথা হতে চালাচ্ছে। সে বলেছে, 'মা, বাবুকে এখন বিরক্ত কোরো না, টাকা না থাকলে আমাকে বল।' পরে অনুসন্ধানে জানিলাম, খোদাই আপনার গলার সোনার দানা বাঁধা দিয়া টাকা আনিয়া প্রসন্নময়ীর হাতে দিতেছে।"

খোদাই-এর এই চরিত্রই হুবহু 'মেজ বৌ' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

'মেজ বৌ' উপন্যাসটিকে লেখক সাহিত্যীয় শিল্পগুণে মণ্ডিত করার চেয়ে পাঠ্যপুস্তকের যে সব মনোহারীগুণ থাকা উচিত, সে দিকেই লক্ষ্য করেছেন। বস্তুতঃ এটি বঙ্গবালার পাঠ্যপুস্তক হোক—এই রকম ইচ্ছা তাঁর ছিল, সেই জন্যে গ্রন্থের নানা স্থানে তিনি পাঠিকাকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলার প্রয়াসী হয়েছেন।

শিবনাথ তাঁর উপন্যাসগুলিতে যুগচেতনারও পরিচয় দিয়েছেন। 'মেজ বৌ' গার্হস্থ্য উপন্যাস। ঊনিশ শতকের পরার্ধে বঙ্গ দেশে যৌথ পরিবারের ভাঙন সবে শুরু হয়। এই উপন্যাসেও দেখা যায় যে প্রবোধের দাদা হরিশচন্দ্র সপরিবারে একান্নবর্তী সংসার থেকে সরে গিয়ে আলাদা হয়েছে। যৌথপরিবারের বঙ্গনারীর কতদূর ধৈর্য, ঔদার্য এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার শাস্ত্রী মশাই সে দিকটাও দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন।

শুধু তাই নয়, লেখক বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন, এই উপন্যাসেও বিধবা-বিবাহের প্রতি তাঁর প্রসন্ন সম্মতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিধবা বামা ও হরিতারণের প্রেমের কথা তিনি বলেছেন, এবং তাদের মধ্যে বিবাহ হলেও কারুর আপত্তি নেই, বরং সকলের সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু বামার মৃত্যুতে এই বিয়ে ঘটতে পারেনি,—যা পরবর্তী উপন্যাস 'যুগান্তর'-এ ঘটানো হয়েছে।

'মেজ বৌ' উপন্যাসটির বরং স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে একটা ভূমিকা আছে বলা চলে। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'নয়নতারা'-র নায়িকা উচ্চশিক্ষিতা—সেখানে নারী শিক্ষিত হলে জীবনপথে চলার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়, এই ইঙ্গিত আছে।

[২]

শিবনাথ শাস্ত্রীর দ্বিতীয় উপন্যাস হলো 'যুগান্তর'। এটির প্রকাশ-কাল হলো ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।

আয়তনের দিক থেকে 'যুগান্তর' বেশ বড় উপন্যাস; 'মেজ বৌ-এর তুলনায় প্রায় তিনগুণ বড়। এই উপন্যাসটির কাহিনী অবিন্যস্ত, গাঁথুনির শৈথিল্যের জন্যে কোথাও গল্পরস জমাট বাঁধে নি। গোড়ার দিকে সরস বর্ণনাভঙ্গিতে উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছে—এবং তাতে পাঠকের মন আকৃষ্ট হলেও মধ্যভাগ থেকে নানাদিকে কাহিনীর বিস্তৃতি ঘটায়, পাঠকেরা একমুখী গল্পের আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়। মূল কাহিনীর খণ্ডিত অংশ বা টুকরো টুকরো গল্প যদি শাখা কাহিনী হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ অনিবার্য হয়ে উপন্যাসে যুক্ত হতো,—তবে তা নিশ্চয়ই রসগ্রাহী হতো, কারণ শিবনাথের রচনামাত্রেরই যেমন আশ্চর্য জীবনীশক্তি আছে, তেমনই আছে প্রচণ্ড প্রসাদগুণ।

'যুগান্তর' উপন্যাসের দুটি পটভূমি, কিন্তু বলার এবং প্রচারের কথা অনেক। ব্রাহ্ম ধর্মের আন্দোলনের কথা প্রচারিত হয়েছে, ঐ ধর্মের সঙ্গে সামাজিক আদর্শের যোগসূত্র সংস্থাপনের বিষয়েও লেখকের অভিমতের সন্ধান পাওয়া যাবে। এ ছাড়া স্ত্রী শিক্ষা ও নারীজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তাসূত্র আছে, আর আছে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে লেখকের ইঙ্গিত। এ সবের মাধ্যমেই আমরা লেখকের সমকালীন যুগের একটি স্পষ্ট ছবি পেয়ে যাই। ফলে 'যুগান্তর' উপন্যাস হিসাবে যতটা না সার্থক, তারচেয়ে ঢের বেশী ঐতিহাসিক দলিলরূপে স্মরণযোগ্য।

বিচিত্রগতি এই উপন্যাসের কাহিনী কখনো দ্রুততালে, কখনো বা মন্থরগতিতে এগিয়েছে। কাহিনীর শুরু পল্লীর পটভূমিতে, তখন তার গতি স্নিগ্ধ এবং গল্পটিও গার্হস্থ্যরসের ভিয়েনে মাধুর্যমণ্ডিত। নদীয়া জেলার নসিপুর গ্রামবাসী হলেন বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, তাঁর ছোট মেয়ে ভুবনেশ্বরীর বিয়ে উপলক্ষে তর্কভূষণ মশায়ের সদ্য বিধবা বোন বিজয়া তার দশ বছরের ছেলে ও ছ'সাত বছরের মেয়ে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিয়ে নসিপুরে এলেন। বিয়ে চুকে গেলে বিজয়ার সঙ্গে কথা বলে তর্কভূষণ মশাই বুঝলেন যে বিজয়া স্বামীর শেষ ইচ্ছা অনুসারে দেওরের কাছে থাকতে চান। বিজয়ার স্বামী ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক সভ্য ছিলেন, বিজয়ার কানে তিনি ব্রাহ্মধর্মের মন্ত্র ঢুকিয়েছেন, বিজয়াকে তিনি পৌত্তলিকতার প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলেছেন।

দেবরেরা বিজয়ার ভার না নেওয়ায় বিজয়া কলকাতায় গিয়ে ফের নসিপুরে ফিরে এলেন। স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী তর্কভূষণ মশাই বিজয়ার অনুরোধে বিন্ধ্যকে নসিপুরের স্কুলে ভর্তি করেন। গোবিন্দ নামে প্রতিবেশী যুবককে বিন্ধ্যবাসিনীকে পড়াবার জন্যে বহাল করা হলো।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণের মত নিয়ে বিজয়া গোবিন্দকে সংস্কৃত কলেজে পড়ার জন্যে কলকাতায় শিবচন্দ্রের বাড়ীতে পাঠান। এ দিকে ভুবনেশ্বরী শ্বশুরবাড়ীতে লাঞ্ছিত হতে থাকে, শেষে চুরির অপরাধও ঘাড়ে চাপে।

এরপর বিজয়া নিজের ছেলেমেয়ে ভাইপো-বউ এবং তার ছেলে মেয়ে সহ কলকাতায় শিবচন্দ্রের বাড়ীতে এলেন। কলকাতায় তখন নবযুগের হাওয়া, স্কুল কলেজ যেমন স্থাপিত হচ্ছে, তেমনি বিদ্যাসাগর সমর্থিত বিধবাবিবাহ নিয়ে আন্দোলন চলছে।

নসিপুরে চতুষ্পাঠীতে বসে তর্কভূষণ মশাই দেশাচারকেই সমর্থন করলেন। এদিকে পণ্ডু বিধবাবিবাহ নিয়ে মেতে উঠলো, গোবিন্দও বিধবাবিবাহের সমর্থক। শিবচন্দ্র এদের দুজনকে তাঁর বাড়ীতে আসতে বারণ করে দিলেন।

নবীনচন্দ্র বসু নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠা করে মদ্যপানের বিরুদ্ধে মত প্রচার করতে থাকে। বন্ধু ব্রজরাজের বাড়ীতে নবীনচন্দ্র একদা থাকতো, তখন সে ব্রজরাজের বিধবা বোন কৃষ্ণকামিনীকে ভালবাসে; অথচ ব্রজরাজের বিধবা মাসী মাতঙ্গিনী নবীনকে এক পত্র লিখে জানালে যে তাকে বিয়ে করতে চায়। মাতঙ্গিনীর মধ্যে লালসার তীব্রতা ছিল। নবীন মনে মনে ঠিক করলে যে সে কৃষ্ণকামিনীকে নিয়ে পালাবে। নবীনের বাবার টাকা জ্যাঠামশায়ের কাছে গচ্ছিত ছিল, জ্যাঠামশাই সে-টাকা ঠিকমতো ভাগ করে নবীনকে দিলেন, বাড়ীর প্রাপ্য অংশের জন্যেও নবীন আট হাজার টাকা পেল। নবীন ফরিদপুরে এক স্কুলে মাস্টারির কাজ নিয়ে চলে গেল।

বিজয়ার ইচ্ছা ছিল গোবিন্দের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর বিয়ে হয়, কিন্তু তর্কভূষণ মশাই জাতের প্রশ্ন তুলে গোবিন্দকে বাতিল করে কুলীন পাত্র চারুচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে দেন, এবং দু মাসের মধ্যেই বিন্ধ্যবাসিনী বিধবা হয়।

বিদ্যাসাগর মশায়ের উৎসাহে তখন এখানে ওখানে বিধবাবিবাহ হতে থাকলে বৃদ্ধেরা বলতে লাগলো—এ যে দেখি যুগান্তর এল !

ফরিদপুর থেকে নবীনচন্দ্র ব্রজরাজের কাছে প্রস্তাব দিলে যে সে কৃষ্ণকামিনীকে বিয়ে করতে চায়। এটা জানতে পেরে কৃষ্ণকামিনীর মামা তাকে তার মার সঙ্গে কাশী পাঠিয়ে দিলে। কৃষ্ণকামিনী কাশী থেকে নবীনকে পত্র লিখে সে কথা জানালে নবীন কাশীতে যায়, এবং সেখানে গিয়ে সে কৃষ্ণকামিনীকে বিয়ে করে।

সহসা একদিন নারকোলডাঙ্গায় খালের ধারে সধবারূপিনী মাতঙ্গিনীর মৃতদেহ পাওয়া গেল।

নবীন ফরিদপুরের শিক্ষকতা ছেড়ে সস্ত্রীক কলকাতায় এসে বাস করতে লাগলো। ইতিমধ্যে বিজয়ার নেতৃত্বে 'কৃপাময়ী বিধবাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিন্ধ্যবাসিনী সেখানে শিক্ষকতার কাজ নেয়। গোবিন্দ জানায় যে সে বিন্ধ্যকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না, তাতেও বিন্ধ্যবাসিনীর মন টলে না।

এ দিকে বাইরে সর্বত্র ব্রাহ্মধর্মের জোর প্রচার চলছে, এবং বহু ব্রাহ্মণ যুবক পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজে এসে যোগ দিচ্ছে, তাদের ওপর নিগ্রহ ও লাঞ্ছনাও হচ্ছে। এ সব ঘটনার কথা শুনে নবীনচন্দ্র পণ্ডুকে বললে—"পণ্ডু, এইবার বুঝি সত্যসত্যই দেশে যুগান্তর ঘটিল।"

গার্হস্থ্য কথায় যে কাহিনীর শুরু, তার সমাপ্তি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে। তবে বিধবা-বিবাহ, কৌলীন্য-প্রথা, স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে লেখকের মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশও এই উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। ফলে বিষয় বৈচিত্র্যের জন্যে কাহিনীর একমুখিনতা যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনি দু একটি ছাড়া চরিত্রগুলিরও বেধ গড়ে ওঠেনি। প্রচার সর্বস্বতার জন্যে চরিত্রগুলি সুপরিকল্পিত হয় নি।

শুধু গার্হস্থ্য রসের ভিয়েনেই যদি আস্বাদ্যমানতাকে বজায় রাখা যেত—তবে এটি ঐ যুগে একখানি স্মরণীয় উপন্যাস বলে চিহ্নিত হতো। মত প্রচারের ব্যগ্রতাই উপন্যাসটিকে সাধারণস্তরে নামিয়ে এনেছে।

শিবনাথের জীবনে ব্রাহ্মধর্মের সেবাই প্রথম এবং প্রধান ব্রত ছিল, সাহিত্যকর্ম তাঁর দ্বিতীয় সাধনা ছিল। এ জন্যে রাজনারায়ণ বসু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন—"হায়, কি পরিতাপ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যাঁতায় পড়িয়া শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন খর্ব হইল।" এ নিয়ে শিবনাথের কিন্তু কোনো ক্ষোভ ছিল না।

'যুগান্তর' উপন্যাসে প্রধানভাবে যেটি প্রচার করা হয়েছে, তা হলো শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীর সংস্কাররাহিত্য। পাঁচটি নারী চরিত্র এই উপন্যাসে রয়েছে ; এদের মধ্যে বিধবা বিজয়া অবশ্যই প্রধান। বিন্ধ্যবাসিনী, কৃষ্ণকামিনী এবং মাতঙ্গিনী—তিনটি চরিত্রও বিধবা ; ভুবনেশ্বরী কৌলীন্য-প্রথার শিকার। বিধবা বিজয়ার শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী, হিন্দুদের পৌত্তলিক বিশ্বাস বিসর্জন দিয়েই পরম ব্রহ্মস্বরূপ

ঈশ্বরের ভজনা যে জীবনে প্রশান্তি আনে—এই প্রত্যয়ী মন নিয়েই জীবনের পথে তিনি চলেছেন। তিনি তাঁর কন্যা বিন্ধ্যকে গোবিন্দের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন নি, তর্কভূষণ মশাই সৎকুলীন পাত্রের সঙ্গে বিন্ধ্যর বিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু দু মাসের মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী বিধবা হলো। গোবিন্দ তাকে ছাড়া অন্য কোনো পাত্রীকে বিবাহ করবে না জেনেও বিন্ধ্যবাসিনী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেনি, লেখাপড়া শিখে শিক্ষকতা ও সমাজসেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে। বিজয়ার পুনর্বিবাহের কোনো প্রশ্ন ছিল না বা নেই, কিন্তু তাঁর মেয়ের ত' আবার বিয়ে হতে পারতো। শাস্ত্রী মশাই বিধবার বৈরাগ্য এবং সংযমবোধের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তাই তিনি বিধবাবিবাহের উগ্র সমর্থক হয়েও নারীজাতি শিক্ষা ও সংযমের মাধ্যমে সমাজের সেবিকা হলে দেশের যথার্থ কল্যাণ হবে—তাই তিনি দেখিয়েছেন বিন্ধ্যবাসিনীর চরিত্রের মাধ্যমে। বিধবা-বিবাহ নতুনভাবে দিইয়েছেন কৃষ্ণ কামিনীর ; নবীনকে সে ভালবেসেছে, নবীনও তাকে ভালবেসেছে, সুতরাং এখানে বিবাহ হওয়া দরকার এবং তা কল্যাণপ্রদ হবে। বিধবা মাতঙ্গিনী যে নবীনকে বিয়ে করার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে—তার পেছনে প্রেম নেই, জৈব তাড়নাই মাতঙ্গিনীকে উতলা করেছে, এই অধৈর্য নারীকে পরিণামে খুন হতে হয়েছে। লালসাজাত আকাঙ্ক্ষায় প্রেম থাকে না—তার পরিণতি ভয়াবহ হবেই ঃ এ প্রসঙ্গে লেখক উপন্যাসের এক জায়গায় কৈলাস চক্রবর্তীর বিধবা কন্যা নিস্তারিণীর অবৈধ গর্ভের উল্লেখ করে নিন্দা করেছেন—সে কথাও এখানে মনে করা যেতে পারে।

বিজয়ার চরিত্রই মুখ্য নারী চরিত্র, যেমন কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী, স্বামী যে ব্রত দিয়ে গেছেন, জীবনের পথে সেই ব্রতপালন করেছেন। নেতৃত্ব দেবার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল, তাই অসংযত হরচন্দ্রকে সংশোধন করেছেন। তবে এই চরিত্রটিকে প্রচারের যন্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে ঈষৎ কৃত্রিমতা এসে গেছে।

এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ হয়েছে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের, নসিপুরের পটভূমিতে গল্পের যতটা প্রসার—সেখানে তর্কভূষণেরই প্রাধান্য। তাঁর মতো পরোপকারী ব্যক্তি নেই, তিনি সংস্কারকেই আঁকড়ে থাকতে ভালবাসেন, স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতা তিনি পছন্দ করেন। জাত পাত সম্পর্কেও তাঁর ঔদার্য নেই, কৌলীন্য প্রথার প্রতি তাঁর অতুলনীয় নিষ্ঠা। চরিত্রটিকে অল্প কথার আঁচড়ে তিনি বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলেছেন।

নবীনচন্দ্রের চরিত্র সুচিত্রিত, তবে আদর্শ চরিত্র হিসেবে দেখানোর চেষ্টায় কখনও কখনও আড়ষ্টতা স্পর্শ করেছে। কৃষ্ণকামিনীও স্বাভাবিকতার সঙ্গে ফুটে ওঠেনি। হরচন্দ্র পণ্ডু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রের পূর্ণতা নেই। তবে অসৎ প্রকৃতির যে দুচারটে চরিত্রের ছবি আঁকা হয়েছে, সেগুলি অল্প পরিসরে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যেমন চিমু ঘোষ, জহরলাল প্রভৃতি।

উপন্যাসে অজস্র চরিত্র, নানা ঘটনা—বিধবার সংযম, বিধবার লালসা ও তার পরিণাম, যথার্থ প্রেমভিত্তিক বিধবা বিবাহের সুফল লাভ, সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নবরত্ন সভাস্থাপন, কৌলীন্য প্রথার কুফল প্রদর্শন প্রভৃতি নানা ঘটনা-সূত্রে দিয়ে কাহিনী গাঁথা হয়েছে, ফলে গল্পের আঁটোসাঁটো বাঁধুনি হয় নি, শিথিল ঢিলে ঢালা বিন্যাসেই প্রচার কাজ চলেছে। যতক্ষণ না 'যুগান্তর'কে প্রচারধর্মী উপন্যাস বলে বোঝা গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত 'যুগান্তর' পাঠকের মনোহরণ করেছে। অর্থাৎ গোড়ায় যখন গল্পটি নসিপুরে কেন্দ্রীভূত ছিল, সেই পল্লীপটভূমিতে কাহিনী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। যেই গল্পটি পটভূমি বদলেছে, পল্লীবাসী মানুষেরা শহরে এসেছে প্রচারের তাগিদে, তখনই গল্পের রসহানি ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই পটভূমি বদলের অসঙ্গতির কথা বলেছেন। তাঁর সমালোচনার সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করি—"তর্কভূষণ তাঁহার গ্রাম, তাঁহার পরিবার, তাঁহার ছাত্রবর্গ, তাঁহার শত্রুমিত্র সকলকে লইয়া একটি গ্রাম্যগৃহমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্তী সূর্যের ন্যায় আমাদের নিকট প্রবল উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। এমন সময় আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তর লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর, হাঁসের দল—কোথা হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র, হাতিবাগান, নবরত্ন সভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতি প্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন।"

প্রথমার্ধের আনন্দ নিকেতন উপন্যাসের শেষার্ধে পাঠশালা হয়ে দাঁড়ালো, ঘটনাপ্রবাহ অসংলগ্ন হলো। এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ সরস মন্তব্য করে বলেছেন যে দুটো মানুষকে এক দড়ি দিয়ে বাঁধলে ঐক্য হিসেবেও তাদের বলবৃদ্ধি হয় না এবং দ্বৈত হিসেবেও তা সুবিধের হয় না। পল্লীর সচিত্র গার্হস্থ্য গল্প যখনই শহরের প্রচার ধর্ম দীক্ষিত হয়ে মত প্রচারের নীরস কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে—তখন 'যুগান্তর' উপন্যাস স্বধর্মচ্যুত হয়েছে। শাস্ত্রী মশাই যদি দুটি গল্প রচনা করতেন—তা হলে পাঠকের তথা সাহিত্যের পক্ষে লাভের অংক যে বাড়তো—তাতে আর সন্দেহ কী!

[৩]

শিবনাথের আর একটি বিশিষ্ট উপন্যাস হলো 'নয়নতারা', এটি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটিকে পারিবারিক উপন্যাস বলা যায়, এখানে শিক্ষিত নারী সমাজের পক্ষে যে অপরিহার্য এবং সংসারেও যে অলংকার স্বরূপ—সে কথা বলা হয়েছে। নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে। এই উপন্যাসে শিবনাথ ধর্মমত প্রচারের

কথা ব্যক্ত না করে দারিদ্র্যের সঙ্গে আভিজাত্যের দ্বন্দ্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এক কথায় বলা যায় এক ধনী অভিজাত প্রগতিশীল পরিবারের শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন এক যুবতী দরিদ্র, সুভদ্র, শিক্ষিত এক যুবককে ভালবেসে নিজের জীবনের সঙ্গী করে নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, এবং প্রেমাস্পদকে বিয়ে করতে না পেরে শেষে মেয়েটিকে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে হয়—মূল এই উপজীব্য কাহিনীকে আনুষঙ্গিক বিবিধ ঘটনায় পল্লবিত করা হয়েছে।

এখানেও শিবনাথ স্ত্রীশিক্ষার দিকটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা দ্বারা সমাজের সেবায় উদ্বুদ্ধ হবে, নিজেদের প্রণয়ীকে নির্বাচন করার ব্যাপারে এগিয়ে আসবে, কুসংস্কারকে বর্জন করে প্রগতির পথে পা বাড়াবে—এমন ইঙ্গিত 'নয়নতারা' উপন্যাসে লেখক দিয়েছেন। নারীর পবিত্রতার প্রতি শিবনাথের বরাবরই একটা উপদেশ দেখা যায়। এই উপন্যাসেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। নায়িকা নয়ন তারা শিক্ষিত আদর্শ যুবক হরেন্দ্রকে ভালবাসে, হরেন্দ্র দরিদ্র কিন্তু সচ্চরিত্র এবং সদ্‌গুণবিভূষিত। নয়নতারা তাকে বিবাহ করতে পারে নি। সে এই পরাভবকে মেনে নিয়েছে, কোনো রকম পতনস্খলনের পথে না গিয়ে ধর্মাচরণের মাধ্যমেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছে মুঙ্গের সন্ন্যাসিনীর জীবন চর্যায়। প্রেমিককে না পেয়ে হতাশ নয়নতারা নিজেকে পবিত্র রেখেছে— উপন্যাসকার বলতে চেয়েছেন—এখানেই নারীর মাহাত্ম্য।

শিবনাথ চরিত্রসৃষ্টিতে নিপুণ শিল্পী; অল্প কথায় তিনি গোটা চরিত্রই সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রতি কটাক্ষ করার জন্যে যেমন তিনি 'ন্যাংডে'-র চরিত্র উপস্থিত করেছেন, তেমনি নয়নতারার দু ভাই সুরেশ ও যোগেশকে উপস্থিত করেছেন।

তখন পথে ঘাটে মেয়েদের বের হওয়া খুব নিরাপদ ছিল না, বিশেষ করে কিছু দুর্বৃত্ত প্রকৃতির গুণ্ডা যুবকের উৎপাত ছিল, নয়নতারা যখন কাকার বাড়ী কলকাতা থেকে চুঁচড়া একা ট্রেনে ফেরার সময় চুঁচড়ার দুই দুর্বৃত্ত যুবক তাকে বিরক্ত করেছে।

'নয়নতারা' বৃহদায়তনের বই, 'যুগান্তরে'র মতোই। তবে গুণগতভাবে পাঠকেরা 'নয়নতারা'কে বেশী পছন্দ করেন—কারণ নয়নতারা এবং হরেন্দ্র—এই দুজনের গভীর প্রেম উপন্যাসটিকে দৃশ্যতঃ এবং অদৃশ্যতঃ আগাগোড়া জড়িয়ে রেখেছে। কাহিনী একমুখী, শাখাকাহিনী উল্লেখ্য নয়,—মূল কাহিনীর পোষকতায় তথা নয়নতারা-হরেনের প্রেমের ব্যাপারে পুষ্টি জোগানোর জন্যেই শাখাকাহিনী ও অপ্রধান চরিত্রগুলি।

মূল কাহিনী হলো নয়নতারা-হরেনের প্রেম। চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে বাগান সমেত প্রশস্ত এক বাড়ী কিনে রেল অফিসের অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষিত ধনী কালীপদ রায় বাস করেন। বড় ছেলে সুরেশচন্দ্র, বিলেত থেকে লেখা পড়া শিখে এসে এখন কলেজে প্রফেসারি করে, মেজ বিলেতে গিয়ে ব্যারিষ্টারি পাশ করেছে—শীগ্‌গির

আসবে। সেজ এ বছর সিভিল সার্ভিস পাশ করেছে। কালীপদ রায় শুধু ধনী নন, উদার, সদাশয় নিরহঙ্কার, এবং সুভদ্র সংস্কারমুক্ত সুপণ্ডিতও।

এঁর বড় মেয়ে নয়নতারা, মেজ মেয়ে সৌদামিনী। এই কুড়ি একুশ বছরের রূপবতী লাবণ্যময়ী সর্বগুণান্বিতা নয়নতারাকে নিয়েই কাহিনী। এর বিয়ের জন্যে দাদা সুরেশ ভাবিত; কিন্তু মা বাবা নিশ্চিত নয়নতারার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ওপর তাঁরা আস্থাশীল। সুরেশের দুশ্চিন্তা এই যে হরেন নামক এক রাঁধুনী বামনীর ছেলের প্রতি নয়নতারার কেমন যেন টান। এই ছেলের সঙ্গে অভিজাত রায়বাড়ির মেয়ের বিয়ে হলে লোকালয়ে মুখ দেখানো যাবে না।

মা সুরেশকে বোঝান—হরেন বড় ভালো ছেলে; হাজারে একটাও অমন ছেলে মেলে না, লেখাপড়া শিখেছে, পরোপকারী। আজ গরীব আছে বলে কী চিরদিন গরীব থাকবে?

রায় মশাই বললেন—মেয়েটা কী সত্যিই হরেনকে ভালবাসে—আগে তা জানতে হবে। হরেন আমার বন্ধু হরদেব চাটুয্যের ছেলে। ছাত্রজীবনে হরদেব আমাকে সংস্কৃত পড়াতো। হরদেব ছিল সৎ, বিনয়ী ও বুদ্ধিমান। আমি যখন বিলেত যাই, তখন অকালে সে মারা যায়। তখন তার বিধবা স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে বক্টে পড়লো, রান্নার কাজ করে ছেলেকে মানুষ করলো। বিলেত থেকে ফিরে আমি ওদের দুঃখের কথা জানতে পাই। এজন্যে আমি মাসিক পঁচিশটাকা বেতনে হরেনকে ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়ানোর কাজে নিযুক্ত করেছি। হরেনের সঙ্গে মিশে নয়নতারারও ত' বেশ উন্নতি হয়েছে, সর্বদা লেখাপড়া ভাল বিষয়ের চর্চা করে।

হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সত্যিই এক আদর্শ যুবক। গুণ্ডাদমনে যেমন নির্ভীক, তেমনি নিজের জীবন বিপন্ন করে জলমগ্ন নারীকে রক্ষা করতেও পেছপা নয়। এমন কী পুলিশী অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবারও সাহস তার আছে। গঠনমূলক সব কাজেই সে অগ্রণী। রায় পরিবারের বাড়ীতে পড়াতে এসে সেও যেন এই পরিবারের একজন সভ্য হয়ে যায়। নয়নতারাকে তার ভালো লাগে, প্রতিদানে নয়নতারারও।

নয়নতারার জন্মদিনে রায়বাড়ী থেকে শিবপুরে বনভোজনে গেল, হরেনকেও যেতে হলো। সে নৈকট্য লাভ করে নয়নতারার, বড় ভালো লাগে দুজনের, বুঝিবা প্রচ্ছন্ন প্রেমের উন্মোচন ঘটে। দুজনেই পরস্পরের অন্তরের কাছে আসে।

ভাইয়ের বন্ধু বিলাত ফেরৎ দেশী সাহেব ডাক্তার ন্যাণ্ডে আসেন, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রতি লেখকের কটাক্ষ বোঝা যায়। এই ন্যাণ্ডে নয়নতারাকে বিয়ে করার একজন প্রার্থী বলা চলে, কিন্তু সুবিধা হয় না।

পুলিশের অকারণ জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হরেনকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে পুলিশের কর্তব্যে বাধা দেওয়ার অপরাধে তাকে আসামী করে মামলা করা হয়, সেই মামলায় রায় মশায় কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার মিঃ ব্যানার্জিকে আনেন, তাঁর কৃতিত্বে ও হরেনের সত্যভাষণে প্রমাণ হয় যে পুলিশ

মিথ্যা মামলা করেছে। মিঃ ব্যানার্জি মামলার সূত্রে চুঁচুড়ার রায় মশায়ের বাড়ীতে পরিচিত হলেন।

রায় মশায়ের বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত এলে, তাঁদের সেবার ভার নয়নতারার ওপর বর্তায়, এবং সেই কাজ সে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে করেও থাকে। নয়নতারাকে মিঃ ব্যানার্জির বড় মনে ধরে গেল। সুরেশ অবশ্য চেষ্টা করেছিল—যদি এবার নয়নতারার মন থেকে হরেন মুছে যায়, আর সেখানে স্থলাভিষিক্ত হন মিঃ ব্যানার্জি। কিন্তু তা হলো না। সুরেশ হরেনকে দেখতে পারে না—তা আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না।

রায়মশায়ের পুরনো বন্ধু মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন চুঁচড়োয় এসে থাকেন, নয়নতারার যত্ন ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন। কলকাতায় এঁর বাড়ীতে নয়নতারা বেড়াতে গেলে এঁর ভাইপো গোবিনও তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। গোবিন গানবাজনার ক্ষেত্রে ওস্তাদ, নয়নতারাও গানবাজনা ভালই জানে, তাই সহজে উভয়ের আলাপ হয়,—আর পরিচয়ের সূত্র ধরে চুঁচুড়ার বাড়ীতে গোবিন কলকাতা থেকে প্রায়ই যেত। গোবিনের অসৎসঙ্গ ছিল। চুঁচুড়ার বাড়ীতে গিয়ে সৌদামিনীরও গোবিনের ভালো লাগে। হরেন নয়নতারাকে গোবিন সম্পর্কে অতীতের কিছু কথা বলতে চায়, কিন্তু নয়নতারা সে কথায় আমল দেয় না। এই গোবিনের সঙ্গে সৌদামিনীর বিয়ে হয়।

নয়নতারা এবং হরেনের অনুচ্ছ্বসিত প্রেম ক্রমশই তা গভীরে মূল বিস্তার করে।

কালধর্মে রায় মশায়ের শরীর ভেঙে পড়ে, তাঁর বায়ু-পরিবর্তন দরকার। ঠিক হয় গঙ্গাবক্ষে বোটে ক'দিন থাকবেন, পরে শান্তিপুর ও গুপ্তিপাড়ার মধ্যে গঙ্গা থেকে যে চর উঠেছে—সেখানে রায় মশায়ের এক বন্ধুর বাসা আছে—সেখানে রায় মশায়ের থাকার ব্যবস্থা হলো। শুশ্রূষার সঙ্গে থাকবে নয়নতারা, হরেন পৌঁছে দিতে গেল। রায় মশাই সেরে উঠলেন না, তাঁর শরীর আরো ভেঙে পড়লো। কোনো রকমে তাঁকে চুঁচুড়ায় নিয়ে আসা হলো। ইংলণ্ড থেকে মেজ ছেলে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এল।

রায়মশাই মারা গেলেন। বাড়ীতে সুরেশ, যোগেশ বন্ধুদের সঙ্গে মদের আসর বসাতে লাগলো। নয়নতারার শাসনে যোগেশ নিজের ভুল বোঝার চেষ্টা করে। রায় বাড়ীতে হরেন যে অবাঞ্ছিত, সুরেশ তা শুধু বুঝিয়ে দেয় না, একদা হরেনের সামনেই বলে যে হরেনকে যেন আর কখনো এ বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া না হয়।

আত্মমর্যাদাবান হরেন সরে গেল দৃশ্য থেকে, চুঁচুড়া ছেড়ে দিয়ে কলকাতার কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে চলে গেল। নয়নতারাও বাড়ী ছেড়ে চলে গেল কলকাতায়,—হরেনের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে চুঁচুড়ার বাড়ীতে দাদা ডেকে না আনা পর্যন্ত সে আর এ বাড়ীতে ঢুকবে না—নয়নতারার এই পণ। কলকাতায় কাকার বাড়ীতে সে প্রথমে যায়, সেখান থেকে সে চলে যায় মুঙ্গেরে। সেখানে সে বৈরাগ্যের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তায় রত থেকে সন্ন্যাসিনীর মতো জীবনযাপন করতে থাকে।

অনেক ঘটনা ও চরিত্রের ভিড় থাকলেও নয়নতারা ও হরেনের প্রেম উপন্যাসটিকে একমুখী করে ধরে রাখতে পেরেছে। এই উপন্যাসে শিবনাথ চরিত্রসৃষ্টিতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রায় মশায়, নয়নতারা, সুরেশ, হরেন, নয়নতারার মা—সব চরিত্রই নিখুঁতভাবে অঙ্কিত। উপন্যাসে প্রচুর অপ্রধান চরিত্র—এবং বলা বাহুল্য তারাও সু-অঙ্কিত।

এই চরিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে লেখকের মতও প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে মেয়েদের নিজের নিজের পাত্র নির্বাচনে স্বাধীন মত থাকা উচিত, মদ্যপায়িতার উচ্ছৃঙ্খলতা নিন্দনীয়, প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরকে যথার্থ পাওয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হলেই মানুষ প্রগতির সাহায্যে নিজের জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে, জীবনকে সুন্দর করে রচনার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য কোনো বাধা নয়—এ সব মতই প্রচ্ছন্নভাবে শাস্ত্রীমশাই এই উপন্যাসে প্রচার করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে যে সব প্রচার-বাণী আছে, তাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়নি, প্রসঙ্গক্রমেই এসেছে—এমনভাবে তাদের কথা বলা হয়েছে।

'নয়নতারা'-ই শাস্ত্রী মশায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

শাস্ত্রীমশাই সধবা প্রমদা, বিধবা বিজয়া এবং কুমারী নয়নতারার চরিত্র এঁকেছেন, এবং এই তিন প্রধান চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নীতি, ব্রাহ্মধর্মমত এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেছেন। প্রমদার চরিত্রের মাধ্যমে সংসার জীবনে আচার-আচরণ শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিজয়ার চরিত্রের নেতৃত্ব আছে, স্ত্রী শিক্ষার দৌলতে স্বাধীনভাবে জীবনের পথে চলার নির্ভরতা জাগে—তা দেখানো হয়েছে, সেই বিজয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের হাতিয়ার হয়েছে, নয়নতারা শিক্ষার দ্বারা নিজেকে তৈরী করেছে, শিক্ষা নারীকে সাহস জোগায়, বিচক্ষণতা দেয়, সে আভিজাত্য বনাম দারিদ্র্যের সংগ্রামে জয়ী হতে পারে নি। এই তিন চরিত্রে বিছু বিছু ভিন্নতা থাকলেও একটি প্রধান বিষয়ে মিল আছে; প্রমদা, বিজয়া ও নয়নতারা—সবাই শিক্ষিত, তাই স্বাধীন চিন্তার দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ভাগ্যের মার ও পরিহাসে প্রমদা ছিন্নভিন্ন হয়েছে। বিজয়ার ব্রাহ্মধর্মই তাকে অবিচলিত রেখেছে, তার পাণ্ডিত্য এবং সতীত্ববোধ মহিমান্বিত হয়েছে। নয়নতারার সংযম ও জীবননিষ্ঠাও বড় কম নয়, মর্যাদাবোধই তার জীবনকে নতুন মাত্রা ও তাৎপর্য দান করেছে। আমাদের তাই লক্ষ্য করা দরকার যে তিনটি চরিত্রই শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত, তাই সচ্চরিত্র। সংস্কারের দিক থেকেও তিনটি চরিত্র সগোত্রের। প্রমদার প্রাথমিক অবস্থা—বিশেষ করে তার বাপের বাড়ীর দিকটার প্রতি লক্ষ্য করে বলা চলে সে ধনী কন্যা, কিন্তু শেষ জীবনে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে। বিজয়া উচ্চ মধ্যবিত্ত; যথার্থ ধনী বলতে হবে নয়নতারাকে। তিন চরিত্রই নিরহঙ্কার,

এবং তিনেরই ভেতর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা নেতৃত্বভার গ্রহণের শক্তি আছে, তবে শাশুড়ীর প্রতাপে প্রমদার এই ক্ষমতার সম্যক্ প্রকাশ দেখা যায় নি।

শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসগুলি সরস এবং স্বাদুপাঠ্য। তবে টানা ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনা করতে মাঝে মাঝে ক্লান্তিবোধ করেছেন, এক বিষয়ের মধ্যে বিষয়ান্তরের কথা এসে পড়েছে, 'যুগান্তর' এবং 'নয়নতারা'—তে সেটা দেখা গেছে। কিন্তু খণ্ড কাহিনী রচনায়, টুকরো টুকরো গল্পাংশ সৃষ্টি করে, অল্প কথায় পূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি গুণী ও ওস্তাদ শিল্পীর স্বাক্ষর রেখেছেন। 'যুগান্তরে' চিনু ঘোষ, মাতঙ্গিনী, হলধর, কৃষ্ণকামিনীর মামা মিত্রজ প্রভৃতির কথা খুব অল্প কথায় বর্ণিত হয়েছে, 'নয়নতারাতে'ও এমন অনেক চরিত্র ও খণ্ড কাহিনী আছে, যেমন গোষ্ঠবিহারী, ডক্টার ন্যাণ্ডে, বিদ্যারত্ন, গোবিন প্রভৃতি। লেখকের সূক্ষ্ম রসবোধ, তীক্ষ্ণ কল্পনা শক্তি এবং লেখনীর প্রসাদগুণ—তাঁর মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত খণ্ডাংশগুলিতেও লাবণ্য ও আস্বাদ্যমানতা যুক্ত করে সেগুলিকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। স্বল্প কথায় তিনি গোটা একটি চিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম।

তাঁর রচনারীতির কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তিনি বঙ্কিমযুগের লেখক, সুতরাং লেখায় বঙ্কিমী ঢঙ এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। বর্ণনার মধ্যেই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করার রীতি শিবনাথের মধ্যেও দেখা গেছে। 'মেজ বৌ' উপন্যাস থেকেই উদাহরণ দিই। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যখন অন্তিম দশা, তখন তাঁকে গঙ্গাযাত্রী করানো হয়; লেখক তখন লিখছেন—"সদাশয় পাঠিকা, ক্রন্দন করিও না, সেই সময়কার দৃশ্যটি একবার মনে করো।" দ্বিতীয় সন্তান হবার পর প্রমদা অসুস্থ হয়, তখনও লেখক পাঠিকাকে সম্বোধন করে বলেছেন—"পাঠিকা, আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন, চিকিৎসার কিরূপ আয়োজন হইল।" শেষ পরিচ্ছেদেও এই রীতি বজায় আছে। "সুজন পাঠিকা আরও কি শুনিবার ইচ্ছা আছে? তবে রোদন করিবেন না, আর একটু শুনুন।" শিবনাথ ভাবতেন যে তাঁর বই পাঠিকাই বেশি পড়বে, তাই তিনি পাঠিকাকেই সম্বোধন করেছেন।

কথোপকথনের ক্ষেত্রেও শিবনাথ নাটক লেখার মতো পাত্রপাত্রীর বক্তব্যই উপস্থিত করেছেন, এটিও যুগরীতির প্রতি আনুগত্য বলে মনে হয়। প্রবোধ-প্রমদার কথাবার্তা অথবা প্রবোধ-প্রকাশের কথোপকথনে এই ধরণ রয়েছে। শিবনাথ সব উপন্যাসেই এই রীতি প্রয়োগ করেছেন। দু' চার লাইন নিচে উদাহরণ হিসেবে দিলাম।

প্রবোধ। আজ আমি এসেছি বলেই বুঝি ঘরে আসতে বিলম্ব হচ্ছিল?
প্রমদা। যে তোমার মা, ওঁর সুমুখ দিয়ে কি আসতে পারা যায়?
প্রবোধ। কেন মা কি তোমায় খেয়ে ফেলতেন?
প্রমদা। কেবল তা নয়, দিদি আজ রাগ ক'রে কিছু খান নাই, তাঁকে খাওয়াবার চেষ্টাও করছিলাম।

প্রবোধ। খান নাই কেন?

প্রমদা। ঠাকরুণ কতকগুলো গালাগালি দিয়েছেন।

'যুগান্তর' এবং 'নয়নতারা' উপন্যাসেও এই রীতি দেখা গেছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় মাধুর্য আছে; সাধুভাষার গদ্যরীতিতে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন, কিন্তু রাঢ়ী উপভাষার শব্দাদি তিনি সাধুরীতির গদ্যে ব্যবহার করতেন, তাতে মুখের ভাষার মতোই সহজ সাবলীলতা ভাষায় একটা গতির সঞ্চার ঘটাতো, পাঠ্যতাগুণ সহজেই উপস্থিত হতো। তার ওপর শাস্ত্রী মশাই অলংকৃত গদ্য ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং সহজবোধ্যভাবে তাঁর গদ্যকে তিনি অলংকৃত করতেন। তাঁর সব উপন্যাসেই দেখা যাবে যে তাঁর ভাষায় মৃদুব্যঙ্গ এবং নির্দোষ শ্লেষের ব্যবহার আছে, আর আছে অলংকারের সৌকর্য। কয়েকটি উদাহরণ দিই—

(১) তাঁহারা তীর্থের কাকের ন্যায় মক্কেলের পথ চাহিয়া থাকেন।

(২) তিনিই পূর্বাবধি কুপিতা ফণিনীর ন্যায় স্পর্শ করিবামাত্রই ফোঁস করিয়া উঠিতেন।

(৩) কাঁচের গ্লাসটি ভাঙিলে যেমন আর তাকে জোড়া যায় না, সেইরূপ মৃত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহের ভগ্নসুখ আর প্রতিষ্ঠিত হইল না।

সরস শ্লেষের ব্যবহারও শিবনাথের ভাষারীতির এক বৈশিষ্ট্য। তিনি লিখছেন—"প্রমদার তিনটি মহৎ দোষ আছে। সে দোষগুলির এখানেই উল্লেখ করা ভাল। প্রথম দোষ—তিনি বড় পরিষ্কার। তাহার ঘরটি খড়ের ঘর, কিন্তু ভিতরটি এরূপ পরিপাটীরূপে সাজানো যে দেখিলে দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রমদার কাপড়গুলি পরিষ্কার, বিছানার চাদর পরিষ্কার, মশারিটি পরিষ্কার, অন্নব্যঞ্জন পরিষ্কার। এইজন্য কেহ তাহাকে 'বাবু বউ', কেহ 'বিবি বউ', কেহ 'মেমসাহেব' প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন। প্রমদার দ্বিতীয় দোষ—তিনি পড়াশুনা করিতে ভালবাসেন। ...তাঁহার তৃতীয় দোষ এই যে তাঁহার পিতা ৪০০ শত টাকা বেতনের একটি চাকরী করেন। অবোধ পাঠকরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহাতে তাঁহার দোষ কি? দোষ আছে বৈ কি! নতুবা শ্বশ্রূঠাকুরাণী এই কারণে তাঁহার প্রতি এত বিরক্ত হইবেন কেন? এই জন্য তাঁহাকে 'রাজার মেয়ে', 'নবাবের ঝি', 'বড় মানুষের মেয়ে' প্রভৃতি নানা প্রকার বাক্যে লাঞ্ছনা দিবেন কেন? অতএব ইহাও তাঁহার একটি দোষ।"

তৎসম শব্দবহুল গদ্যও তিনি সহজ অনায়াস ভঙ্গীতে ব্যবহার করেছেন—"বামার চঞ্চলতা অচঞ্চল ভাব ধারণ করিল। ক্রমে যখন কালরাত্রি অবসানপ্রায়, যখন প্রভাতসমীরণ রজনীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ন্যায় দ্বারে গবাক্ষে বহমান, যখন সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গকুল নিজ নিজ স্বরে পরস্পরকে সম্ভাষণ-তৎপর... যখন গৃহস্থের ঘরে সুপ্তোত্থিত পরিজনের আলাপ ও শোকগ্রস্ত গৃহে আত্মীয়জনের রোদনধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তখন প্রাণ-বায়ু বামার কমনীয় দেহ-যষ্টিকে ধূলিসাৎ রাখিয়া পলায়ন করিল।"

অন্য আর একটি নিদর্শনও দিই—"শরদের বেলা অবসান-প্রায়; ছিন্নবিচ্ছিন্ন শরদভ্রে অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের সিন্দুরাভ কিরণমালা পড়িয়া পশ্চিমাকাশকে বিচিত্র শোভা সম্পন্ন করিয়াছে; সান্ধ্য সমীরণের সুরভিনিঃশ্বাস শরীর মনকে পুলকিত করিতেছে; অদূরে গঙ্গাসলিলে নৌকাসকল মরালকুলের ন্যায় পালপক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে; গঙ্গার পরপারবর্তী বৃক্ষশ্রেণীর পাদদেশে সন্ধ্যার ছায়া ও মস্তকে রবি-কিরণের বঙ্কিম ছটা পড়িয়া তাহারা এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে।"

এমন অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তবে কথ্য-ভাষার শব্দ এই জাতীয় গদ্যে তিনি অনায়াস সাবলীলতার সঙ্গে মিশিয়েছেন; যেমন—"দোকানের 'ঝাঁপতাড়া' একপ্রকার বন্ধ", "পরীক্ষার কটা মাস 'ষো শো' করিয়া চালাইতে হইবে। চলতি ভাষার প্রচুর শব্দ তিনি অনায়াসেই কুলীন তৎসম শব্দের সঙ্গে বান্ধবতা ঘটিয়েছেন; সেই শব্দগুলির কয়েকটি হলো—ওস্তাদ, কুচ্ছো (কুৎসা-অর্থে), শোর (গণ্ডগোল), শিটকানো, ছেপলা (ছ্যাবলা অর্থে), বিসমিল্লায় গলদ, চোয়াড়, কাবু প্রভৃতি। আবার ইংরাজী শব্দও প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শাস্ত্রীমশাই দ্বিধা করেন নি, যেমন ফার্স্ট, এঙ্গেলো-ভার্ণেকিউলার, স্পিরিচুয়ালিস্ট প্রভৃতি।

আগেই এ কথা বলেছি যে শিবনাথ শাস্ত্রীর ঔপন্যাসিক সত্তা অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্মের সেবক-সত্তাই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর কাব্য ও গদ্য-রচনা তাঁর কাছে প্রাধান্য পায় নি, অথচ সাহিত্য সৃষ্টির বিরল সহজাত প্রতিভা তাঁর ছিল; তাঁর সম্পর্কে সব সমালোচকের এই একটি রায়ই উচ্চারিত হয়ে থাকে।

রমাপ্রসাদ দে

মীর মশাররফ হোসেন : মৌখিক মহাকাব্যের অনুস্মৃতি

সাহিত্যে অনেক সময় সৃষ্টি ও স্রষ্টা একে অন্যকে অর্থান্তরিত করে। 'শ্রীকান্ত' ও শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ ও 'পথের পাঁচালী' গভীর অন্বয়ে সম্পর্কিত। 'বিষাদ-সিন্ধু'ও তেমনি একটি সৃষ্টি। মীর মশাররফ হোসেন ও 'বিষাদ-সিন্ধু' একে অন্যের প্রতিশব্দ বলে মনে হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালিকা অনুযায়ী মীর মশাররফ হোসেনের গ্রন্থ-সংখ্যা পঁচিশ। উপন্যাস চার। 'বিষাদ-সিন্ধু' ছাড়া 'রত্নবতী', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'কেও তিনি উপন্যাসের মধ্যে গণ্য করেছেন। রত্নবতী মীরের উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াস। উপন্যাস নয়, রূপকথার সঙ্গেই তা তুলনীয়। উদাসীন পথিকের মনের কথা ও গাজী মিয়াঁর বস্তানী আত্মজীবনীমূলক রচনা। উদাসীন পথিকের মনের কথায় আছে লেখকের ছেলেবেলার গল্প, মা-বাবার জীবন-বৃত্তান্ত, নীলকুঠি সাহেবের অত্যাচারের কাহিনী। ঘটনাকাল আনুমানিক ১৮৬০। বইটিতে প্রকৃতপক্ষে দুটি কাহিনীর সন্নিবেশ। একটি কাহিনী নীল কুঠিয়াল টমাস কেনীর আর একটি মশাররফের বাবা মীর মোয়াজ্জম হোসেনের। গাজী মিয়াঁর বস্তানী মীর মশাররফের পরিণত বয়সের কর্মজীবনের বিবরণী। আনুমানিক ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত দশ বছরের ঘটনা। এ গ্রন্থেও আছে দুটি কাহিনী—একটিতে সোনাবিবি ও মনিবিবির সংঘর্ষ, অন্যটিতে বেগম সাহেবা পয়জারন্নেসার কীর্তিকলাপ। দুটি কাহিনীর পরিণতি দুই দিকে। সোনাবিবি ও মনিবিবির সংঘর্ষের সঙ্গে বেগম সাহেবার কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক নেই। উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০) ও গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯)—দুটিই উপন্যাস-আঙ্গিকে লেখা, যদিও কাহিনীগত মেলবন্ধনের অভাবে উপন্যাস হয়ে ওঠে নি। বিষাদ-সিন্ধুই মীরের একমাত্র উপন্যাস।

'গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়ার এই আমার প্রথম উদ্যম।'—লিখেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'রত্নবতী'র ভূমিকায়। ৬১ পৃষ্ঠার শীর্ণকায় এই রত্নবতীর প্রকাশকাল ১৮৬৯। সময়টা 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) থেকে খুব বেশী দূরবর্তী নয়। সুতরাং ঐতিহাসিক কারণেই রত্নবতী স্মরণযোগ্য। রত্নবতীর সময়সীমায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন তিনটি উপন্যাস : দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী। মীর মশাররফের উপার্জনে সম্ভবত ছিল বঙ্কিম রচনা পাঠের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা। তাঁর রত্নবতীও অতিপ্রাকৃত-নির্ভর। তবে এখানে অলৌকিকতা এসেছে রূপকথার আদলে। বাংলার লোককাহিনীর উপাদান নিয়ে একটি 'কৌতুকাবহ গল্প' উদ্ভাবন করেছেন লেখক।

রূপকথার ভঙ্গীতেই গল্পের উপস্থাপনা ঃ 'গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সহিত সেই রাজ্যের মন্ত্রীপুত্রের অভেদ্য প্রণয় ছিল। রাজপুত্রের নাম সুকুমার আর মন্ত্রীপুত্রের নাম সুমন্ত্র। সুমন্ত্র বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।' শুরুতেই একটা মোটাদাগের বিরোধ : 'ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ ?' রাজপুত্রের অভিমত ঃ 'নির্ধন ব্যক্তি যতই কেন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হউক না, তাহাদিগকে চিরদিন ধনীদিগের পদানত ভৃত্য থাকিতে হয়।' আর মন্ত্রীপুত্রের ধারণা ঃ 'অভাবনীয় এবং আশ্চর্য আশ্চর্য কার্যসমূহ কেবল বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারাই সম্ভব।'—এ তর্কের মীমাংসায় রত্নবতীর কাহিনী লৌকিক সীমানা অতিক্রম করেছে। দেখা দিয়েছে সন্ন্যাসী, তাঁর ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুরীয়ক, তাঁর বরদান, শারীর আকৃতির রূপান্তর প্রভৃতি। রত্নবতীর দুই প্রধান চরিত্রেরই চালিকাশক্তি অতিপ্রাকৃত। অলৌকিকতা-সাহায্যপ্রাপ্ত, তবে একান্তই কল্পলোকবিহারী নয়। পিতা রত্নধ্বজের স্নেহ কিংবা কন্যা রত্নবতীর বিবাহে অনীহা লৌকিক জীবনের কথাই। বরং বলা যায় লৌকিকতাই এখানে অলৌকিকতার সীমানায় প্রসারিত হয়েছে। তবে সব কটি চরিত্রই সমতলিক। নানা ঘটনার আঘাতে নব নব সৃজিত মূর্তিতে দেখা দেয় না। মীর মশাররফ ভালোবাসেন প্রত্যক্ষ চরিত্রায়ণ। এক একটি চরিত্র হাজির করার সাথে সাথেই তিনি তাদের সাধারণ প্রকৃতি স্পষ্ট রেখায় এঁকে দেন।

গল্পের পটভূমি গুজরাট হলেও আসলে তা বাংলাদেশ। সহজেই আমাদের চোখে পড়ে যায় বকুলগাছ, কলসী কাঁখে মেয়ের দল, পা ছুঁয়ে প্রণাম করার রীতি কিংবা সিঁথিতে সিঁদুর পরা কোন রমণীর রমণীয় মুখ। কাহিনী ঘিরে হিন্দুজীবনের আবহ এতটাই প্রবল যে রত্নবতীর লেখক সম্পর্কে 'Calcutta Review'-এর একজন আলোচক তো বলেই বসলেন, '···We take it that the author has concealed his name under the nom de plume of a Musalman.' এই অনুমানের আর একটি কারণ মীর মশাররফের ভাষা। উইলিয়ম হাণ্টার কথিত 'মুসলমানি বাংলা'কে তিনি আমল দেন না। তাঁর ভাষা সংস্কৃত অনুসারী, চিত্রময়, প্রসাদগুণসম্পন্ন। 'রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে কমলবন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। কুমুদিনী ক্লান্ত বিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল।'—এরকম লিখতে পারেন মীর মশাররফ।

সুবিশাল 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশিত হয় তিনটি পর্বে ঃ

মহরম পর্ব। ১৮৮৫। পৃ ২০৪
উদ্ধার পর্ব। ১৮৮৭। পৃ ১৯১
এজিদ বধ পর্ব। ১৮৯১। পৃ ৪৩

হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র এমাম হাসান ও হোসেনের সঙ্গে এজিদের সংঘর্ষ এবং পরিণামে হাসান-হোসেনের মৃত্যু এ কাহিনীর বর্ণনীয় বিষয়। এজিদ চরিত্রের উত্থানে এ কাহিনীর সূত্রপাত, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে সমাপ্তি। কাহিনীর উৎস বর্ণনা প্রসঙ্গে মীর মশাররফ বিষাদ-সিন্ধুর ভূমিকায় লিখেছেন, 'পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার

সারাংশ লইয়া বিষাদ-সিন্ধু বিরচিত।' মুনীর চৌধুরী তাঁর 'মীর মানস' গ্রন্থে এ কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে করেছেন। তাঁর অভিমত, 'মীর মানস প্রধানত বাংলা পুঁথির দুনিয়াতেই লালিত ও বর্ধিত।' ফারসী বিদ্যায় মীরের কিছু অধিকার ছিল, তাঁর 'আমার জীবনী' থেকে সেটা জানা যায়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হয়তো তিনি পারস্য ও আরবী গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে থাকবেন। তবে পূর্বসূরী পুঁথি-রচয়িতাদের তিনি সমীপবর্তী ছিলেন, হায়াত মামুদ বা গরীবুল্লাহের 'জঙ্গনামা' পাশে রাখলে তা বোঝা যায়। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মাবতী', 'সিকন্দরনামা,' 'সপ্তপয়কর' প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসাবলীর যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেন।[৩] গরীবুল্লাহর 'জঙ্গনামা'র সঙ্গেও মীরের মিল লক্ষ্য করার মতো। যেমন,

(১) জিব্রাইল এসে হজরতকে হাসান ও হোসেনের জীবনের মর্মান্তিক পরিণাম সম্বন্ধে আভাস দিয়েছে।

(২) মাবিয়ার বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের অসুস্থতা

(৩) বন্ধ্যা রমণীকে বিবাহ

(৪) জয়নাবের রূপে এজিদের মুগ্ধতা

(৫) মাবিয়ার অগোচরে এজিদের ষড়যন্ত্র, জাব্বার কর্তৃক জয়নাবকে পরিত্যাগ

(৬) জয়নাবের কাছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে দূত প্রেরণ

(৭) নাবীর প্রলয়ঙ্কর মহিমা

(৮) হাসান চরিত্রের উদারতা

(৯) মোসলেমকে কুফায় প্রেরণ, আক্রমণ, প্রাণদান

(১০) কারবালায় হোসেনের অশুভলক্ষণ দর্শন

(১১) কারবালার প্রান্তরে কাসেমের সঙ্গে সখিনার বিবাহ

(১২) ফোরাত নদীতে তৃষ্ণা নিবারণে উদ্যত হয়েও তৃষ্ণা না মেটানো

(১৩) আহত হোসেনকে হত্যার বর্ণনা

(১৪) হোসেনের ছিন্ন শিরের অপমান করা হলে ফেরেস্তারা তা অদৃশ্যভাবে তুলে নিয়ে যায়।

কিন্তু শুধু পুঁথি সাহিত্য নয়, মীরের সংযোগ ছিল নতুন কালের সঙ্গেও। তাই তিনি ভিন্ন অবয়বে হায়াত মামুদ বা গরীবুল্লাহকে পুনর্নির্মাণ করেন নি, বরং অতিক্রম করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা মধুসূদনের জীবনচেতনা তাকে স্পর্শ করেছিল বলেই বিষাদ-সিন্ধুর প্রধান চরিত্রসমূহ 'কিসসা-কাহিনীর ক্রোড়োদ্ভূত হয়েও বহুদূর পর্যন্ত মৃত্তিকা-সংলগ্ন, প্রিয়-পরিজন-বেষ্টিত, শত্রুমিত্র পরিবৃত, সজীব নরনারী।'[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শেষ উপন্যাস সীতারাম প্রকাশ করেন ১৮৮৭ সালে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৭ মোট বাইশ বছরের মধ্যে তাঁর চোদ্দখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলি উপন্যাসই প্রকাশিত হয় বিষাদ-সিন্ধুর উদ্ধার পর্বের সময়

সীমায়। মেঘনাদ বধ কাব্যের আত্মপ্রকাশ ১৮৬১. বিষাদ-সিন্ধুর ২৪ বছর আগে। মীরের মানসগঠনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহ অবশ্যই কাজ করেছে কিন্তু কারবালা কাহিনীকে নতুন তাৎপর্যে অন্বিত করতে যে বইটির সহায়ক ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার নাম মেঘনাদ বধ কাব্য। সতের বছরের তরুণ মশাররফ একদিন বাড়ির দক্ষিণ দিকে বেড়াতে গিয়ে মাইকেলের জন্মভূমির সমীপবর্তী হন। মুগ্ধচোখে তাকিয়ে দেখেন 'কবতক্ষ নদী নিকটে। পাঁচ শত হাত ব্যবধান হইয়া কবতক্ষ পূর্ব পশ্চিমদিকে সাগরদাড়ী মাইকেল মধুসূদন দত্তের পবিত্র জন্মস্থান দিকে চলিয়া গিয়াছে।'—এই মুগ্ধতা পরবর্তীকালে বিষাদ-সিন্ধুতেও সঞ্চারিত হয়েছিল। কাজী আবদুল ওদুদ লক্ষ্য করেছেন, 'এই গ্রন্থের চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে মেঘনাদ বধ কাব্যের সাদৃশ্য আছে। মেঘনাদ বধ কাব্যের নায়ক রাবণের যেমন অসীম ক্ষমতা, তেমনি তার দুঃখ। এজিদও রাবণের মতো শক্তিশালী…মেঘনাদ বধের সীতা হচ্ছে বিষাদ-সিন্ধুর জয়নাব। জয়নাবের স্বগতোক্তি সীতা-সরমার আলাপের কথা মনে করিয়ে দেয়।' দানব নন্দিনী প্রমীলাও অনুপস্থিত নয়। আবদুল ওহাব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে একবার স্ত্রীর মুখখানি দেখতে চায়। স্ত্রী 'অশ্ববল্গা ধারণ পূর্বক' ওহাবকে বলে, 'যদি আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রকে ভয় করেন, তবে আমরাই,—এই আমরাই এলোচুলে রণরঙ্গিনী রণবেশে সমরাঙ্গণে অসিহস্তে নৃত্য করিব। রণরঞ্জিত বস্ত্রে আমরাও রণসাজে সাজিতে কুণ্ঠিত হইব না। দেখি, কোন্ বিপক্ষ যোদ্ধা আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে?' (মহরম পর্ব ঃ চতুর্দশ প্রবাহ)

এক ব্যাপ্ত বিষাদের পটভূমি রচনা করেছেন মীর মশাররফ। 'বিষাদ-সিন্ধুতে হাসিবার কোন কথা নাই, রহস্যের নাম মাত্র নাই. আদ্যন্ত কেবল বিষাদ, ছত্রে ছত্রে বিষাদ, বিষাদেই আরম্ভ এবং বিষাদেই সম্পূর্ণ।'—মীরের এ বর্ণনায় আমরা যেন শুনতে পাই সুধীন্দ্রনাথের কবিতার ধ্বনি ঃ 'মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা/যাতনা কেবল যাতনা সুচির সাথী।' (অর্কেস্ট্রা) বিষাদ-সমুদ্রের এই ব্যাপ্ত পটভূমির কথা মনে রেখে আবদুল লতিফ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'এক হিসাবে বিষাদ-সিন্ধুকে গদ্যে রচিত মহাকাব্য বলা যায়।'[৬] এখানে ভাগ্য ও পুরুষকার, মহত্ত্ব ও প্রতিহিংসা, লৌকিক ও অলৌকিক সকলই এক মহারণভূমে অবতীর্ণ। বহুসংখ্যক পাত্রপাত্রী সম্বলিত কাহিনী—শাখাকাহিনী। আর সমস্ত ঘটনাই জয়নাবকে কেন্দ্র করে। রামায়ণে যেমন সীতা, ইলিয়াদে যেমন হেলেন। মহাকাব্য 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।' মীর তাঁর উপন্যাসের জন্য নির্বাচন করেছেন স্বশ্রেণীর গৌরব গাথা, যা 'বৃহৎ বনস্পতির মতো' অসংখ্য মানুষকে দীর্ঘকাল 'আশ্রয়ছায়া' দান করেছে। মহরমে আজও যুগান্তরের ওপার থেকে বিষাদের ঘনকৃষ্ণ মেঘ তাদের আচ্ছন্ন করে। এ কাহিনীতে পাওয়া যায় কেডনে কথিত **'totality of the beliefs of a people'**। মীর মহাকাব্যের প্রতিমান রচনা করেছেন তাঁর উপন্যাসে, এটা ধরে নিলে একটা প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক ঃ মীর কি জাতীয় মহাকাব্যের সমান্তরলতায় অববাহিত হয়েছেন—প্রাচীন

অথবা আধুনিক? মেঘনাদ বধ কাব্যে অনুপ্রাণিত ছিলেন মীর। কিন্তু তিনি আধুনিক মহাকাব্য অনুসরণ করেন নি। তাঁর অবলম্বন ছিল প্রাচীন অথবা মৌখিক মহাকাব্যের আদর্শ। বিষাদ-সিন্ধুর যৌথ পাঠ আজও বহু শ্রোতার আনন্দের অভিজ্ঞতা। ভাষার যে সারল্য ও স্পষ্টতা যৌথ পাঠের পূর্বশর্ত, বিষাদ-সিন্ধু তা মেটায়। শব্দের যে সূক্ষ্ম জটিলতা ও মসৃণ কারুকার্যে কবি মিলটন 'darkness visible'-এর মতো শব্দ-বন্ধ রচনা করেন, মীর তা পারেন না; কারণ তাঁর পাঠক বা শ্রোতাকে একটি বাক্য থেকে আর একটি বাক্যে যেতে হবে দ্রুত। শব্দ বা শব্দ-বন্ধের অন্তর্গত নান্দনিক নিরীক্ষণ যৌথ পাঠে সম্ভব নয়।

গ্রন্থের নাম বিষাদ-সিন্ধু। অন্তর্গত পরিচ্ছেদের নাম 'প্রবাহ'। নদীর প্রবাহ সমুদ্রে হারায়। তেমনি পরিচ্ছেদ সমূহের প্রবাহ গ্রন্থের সমুদ্রোপম বিশালতায় ধাবমান। প্রবাহ অবশ্যই ঘটনার প্রবাহ। ঘটনার আঘাতে আঘাতে তরঙ্গায়িত গতিধারার মধ্যেই উপন্যাসের ছন্দের বোধ পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। 'The form of novel lies in the rhythmical movement of the sequence of events.' —জর্জ টমসনের এই উক্তিতে এটা সুস্পষ্ট যে উপন্যাসেরও ছন্দ আছে। কবিতার পর্বে পর্বে ছন্দের যে অনুরণন, উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেটা আমরা পাই এক একটি ঘটনার ছন্দিত সন্নিবেশে। মীর মশাররফ ব্যবহৃত 'তরঙ্গ', 'প্রবাহ', 'সিন্ধু' শব্দাবলী বুঝিয়ে দেয় উপন্যাসে ঘটনাবলীর ছন্দিত রূপায়ণ সম্পর্কে তিনি কতটা অবহিত ছিলেন। মৌখিক মহাকাব্যের রীতি অবলম্বন করলেও মীর সামগ্রিক কাহিনীর ওপর শিল্পিত নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে দেন নি। বিষাদ-সিন্ধুর তিনটি পর্ব অ্যারিস্টটল-কথিত মহাকাব্য-কাহিনীর আদি, মধ্য ও অন্ত।

বিষাদ-সিন্ধুর ঘটনাগুলো ঘটছে যেন চোখের সামনেই। এরকম ধারাবিবরণী পাওয়া যায় মৌখিক মহাকাব্যে। ইলিয়াদের ষোড়শ সর্গে হেকতরের পাত্রক্লস বধের কাহিনীর সূচনা অংশে আকিল্লেস জিজ্ঞাসা করছেন, 'পাত্রক্লস, তুমি কোমল প্রাণ কুমারীর মতো কাঁদছ।' পাত্রক্লসের উত্তর প্রসঙ্গে হোমার বলছেন, 'কিন্তু বিপুল বিলাপধ্বনি সহ, হে যোদ্ধা পাত্রক্লস, তুমি তাকে উত্তর দিলে, 'পেলেউসনন্দন আকিল্লেস, হে আকাইনদের মধ্যে শূরশ্রেষ্ঠ, আকাইনরা যে এত বড় বিপদে পড়েছে, তাতে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না।"' লক্ষণীয়, আকিল্লেসের সঙ্গে মহাকবি নিজেও একজন সম্বোধক। পাত্রক্লসকে জিজ্ঞাসা করছেন দুজনেই। যেন হোমার তার কাব্যকাহিনী বর্ণনা করছেন পাত্রক্লসের কাছেই কোন এক স্থানে দাঁড়িয়ে। বিষাদ-সিন্ধুতে এরকম দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত। একটি উৎকলন করি। মহরম পর্বে ষড়বিংশ প্রবাহের অন্তর্গত সীমারের বর্ণনা: 'যে সীমারের নামে অঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছিল, যে সীমারের নামে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, পাঠক! এই সেই সীমার! সুধার খঞ্জর হস্তে সেই সীমার, ঐ হোসেনের বক্ষের উপর বসিয়া গলা কাটিতে উদ্যত হইল!!!'—লেখক একটু দূরে দাঁড়িয়েই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিচ্ছেন যেন। 'সম্বোধন' এই প্রত্যক্ষীকরণের একটি

শিল্পসম্মত প্রক্রিয়া। ইলিয়াদে আকিল্লেসের সঙ্গে হোমার নিজের কণ্ঠস্বর মিলিয়েছেন। বিষাদ-সিন্ধুর উদ্ধার পর্বের চতুর্থ প্রবাহে মীরও অনুরূপভাবে আবদুল্ল ওহাবকে প্রশ্ন করছেন, 'ঐ যে শিরশূন্য মহারথ-দেহ ধূলায় পড়িয়া আছে, খরতর তীরাঘাতে অঙ্গে সহস্র সহস্র ছিদ্র দৃষ্ট হইতেছে, পৃষ্ঠে একটি মাত্র আঘাত নাই,—সমুদয় আঘাতই বক্ষ পাতিয়া সহ্য করিতেছ, এ কোন্ বীর? কবচ, কটিবন্ধ, বর্ম, চর্ম, অসি, বীর সাজের সমুদয় সাজ সাজওয়া অঙ্গেই শোভা পাইতেছে, বয়সে নবীন যুবা। কি চমৎকার গঠন! হায়! হায়! তুমি কি আবদুল ওহাব? যিনি চির প্রণয়িনী প্রিয়তম ভার্যার মুখখানি একবার দেখিতে বৃদ্ধা মায়ের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে, অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই যিনি বীর রমণী বীরবালার বঙ্কিম আঁখির ভাব দেখিয়া ও রণোত্তেজক কথা শুনিয়া অসংখ্য বিধর্মীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন,—তুমি সেই আবদুল ওহাব?'

উদ্ধৃত অংশে ঘটনার পূর্ব ইঙ্গিতও লক্ষণীয়। প্রিয়তম ভার্যার মুখখানা দেখতে বৃদ্ধা মায়ের নিকট অনুনয়, মাতৃ-আজ্ঞায় অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থেকেই বীর রমনীকে দেখা প্রভৃতি পূর্ব ঘটনার উল্লেখে মীর মৌখিক মহাকাব্যের রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। মৌখিক মহাকাব্যের যুগে কাহিনী কথনে বর্ণক আশ্রয় নিতেন পুনরুক্তির। পুনরুক্তি শ্রোতাদের ম্লান হয়ে আসা স্মৃতিকে উসকে দিত। বিষাদ-সিন্ধুতে এই রীতির অনুসরণ আছে বহুক্ষেত্রে। মহরম পর্বের অষ্টাদশ প্রবাহে এজিদ মনের মতো সুরাপান করেছেন। 'বোধ হয় সুরাদেবীর প্রসাদে তাঁহার পূর্বকৃত কার্য একে একে স্মরণপথে উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমে জয়নাবকে দর্শন,—তাহার পর পিতার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ,—তাহার পর মাবিয়ার রোষ, পরে আশ্বাসপ্রাপ্তি,—আবদুল জাব্বারের নিমন্ত্রণ, কল্পিতা ভগ্নির বিবাহ প্রস্তাব,—অর্থলালসায় আবদুল জাব্বারের জয়নাব পরিত্যাগ, বিবাহ জন্য কাসেদ প্রেরণ—বিফল মনোরথে কাসেদের প্রত্যাগমন,—পীড়িত পিতার উপদেশ, প্রথমে কাসেদের শরনিক্ষেপে প্রাণসংহার, মোসলেমকে কৌশলে কারারুদ্ধ করা, পিতার মৃত্যু, নিরপরাধ মোসলেমের প্রাণদণ্ড, হাসানের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধে পরাজয়ের পর নূতন মন্ত্রনা, মায়মুনা ও জায়েদার সহায়ে হাসানের প্রাণবিনাশে মারওয়ানের প্রভুভক্তি,—জায়েদা ও মায়মুনার দামেস্কে আগমন, প্রমোদ ভবনে স্থান নির্দেশ! এজিদ ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলেন।'—এভাবে লেখক সপ্তদশ প্রবাহ পর্যন্ত পূর্বকথার খেই ধরিয়ে দিচ্ছেন সুরাপ্রভাবিত এজিদের স্মরণপথে।

ইন্দ্রিয়ের সীমানায় যা কিছু প্রত্যক্ষ, মীর তার অনুপুঙ্খ বর্ণনায় ক্লান্তিহীন। বাস্তবকে তিনি দেখেন সরাসরি, তাঁর পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে। ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করেন না তিনি। অলৌকিকতাও এখানে ধরা দেয় ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বাস্তবের সীমানায়। এই উপন্যাসে অমরাত্মারা আমাদের অবাক দৃষ্টির সম্মুখে মরলোকের নিয়মেই চলাফেরা করেন। 'অল্পক্ষণের জন্য আবার মর্ত্যলোকে? অমরাত্মা এই বলিয়া স্ব স্ব রূপ

ধারণ করিলেন (উদ্ধার পর্ব : চতুর্থ প্রবাহ)। স্বর্গ ও মর্ত্য, জীবন ও জীবনান্তরের মধ্যে কোন ভেদরেখা এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। মর্ত্যের মতো স্বর্গকেও যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। কিংবা বলা যায়, বিষাদ সিন্ধুতে জীবনান্তর বা স্বর্গ বলে কিছু নেই। জীবনান্তর হল প্রসারিত জীবন, স্বর্গ প্রসারিত মর্ত্য। উদ্ধারপর্ব চতুর্থ প্রবাহে মীর লিখছেন, 'মর্ত্যলোকে থাকিয়া স্বর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক-পাঠিকাকে দিতে হইতেছে।'—কিন্তু সত্যি কি তিনি অতীন্দ্রিয় কোন ধারণা পাঠকের মনে সঞ্চারিত করছেন? মীরের 'স্বর্গীয় দূতেরা, অমর পুরবাসীগণ' ভিড় করে দাঁড়ায় লোকায়ত সহজ বিশ্বাসের ওপর। মীর কখনই বিমূর্ত কোন ধারণায় আমাদের উত্তীর্ণ করে দেন না। তিনি আমাদের ধু ধু বালিরাশির সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, ধূসর মরু প্রান্তরের সামনে, কিন্তু কখনই বালিরাশি বা মরু প্রান্তর থেকে শূন্যতাকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারেন না। বাস্তবকে অবলোকনের এই সারল্য মহাভারত বা ইলিয়াদের মতো মহাকাব্যেই লভ্য।

মীরের বাক্যরচনা পদ্ধতিও এপিক কবিদের অনুরূপ। অনুপুঙ্খ বাস্তব বর্ণনার অনুরোধেই হোমার পারাতাকসিস রীতির বাক্যরচনা করতেন। এই রীতিতে পৃথক পৃথক বক্তব্য পর পর বিন্যস্ত হয়। যেমন, 'সূর্য অস্ত গেল, আকাশ অন্ধকার।'—এখানে সূর্য ও আকাশ সমান ভাবেই আমাদের মনোযোগ টানছে। কিন্তু যদি বলি, 'সূর্য অস্ত গেলে আকাশ অন্ধকার',—আমাদের মনোযোগ থেকে সূর্য সরে যায়, মনোযোগের কেন্দ্রে আসে প্রধানত আকাশ। প্রথম দৃষ্টান্ত পারাতাকসিস রীতির, দ্বিতীয় সিনতাক্সিস। এপিক কবিদের মতো মীর মশাররফও জীবনের ছোট বড় প্রত্যেকটি ঘটনার ওপর সমান মনোযোগ অর্পণ করেন, কথা বলেন অনেকটা জায়গা জুড়ে। যেমন, মহরম পর্ব দ্বাদশ প্রবাহের সূচনা। ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ, শত্রুর শেষ থাকিলে ভবিষ্যতে মহাবিপদ।'—এখানে 'শেষ' শব্দটির একবার প্রয়োগ থাকলেও চলত। কিন্তু শব্দটিকে লেখক বার বার ফিরিয়ে এনে ঋণ, অগ্নি, ব্যাধি ও শত্রু সকলকেই পৃথকত্ব ও গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু বাক্যরচনা নয়, চিত্র রচনাতেও মীর পারাতাকসিস রীতির পক্ষপাতী। মহরম পর্বের পঞ্চবিংশ প্রবাহে 'মহাবীর কাসেমের ঘটনা বিষাদ-সিন্ধুর একটি প্রধান তরঙ্গ।' বিবাহের দিনই কাসেমের মৃত্যুদিন। শত্রুদল ভেদ করে বহু কষ্টে রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে কাসেম। কাসেম 'সখিনাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন। কাসেমের দেহ-বিনির্গত শোণিত প্রবাহে সখিনার পরিহিত বস্ত্র রক্তবর্ণ হইল। শরাঘাতে সমুদয় অঙ্গ জর জর হইয়া সহস্র পথে শোণিতধারা শরীর বাহিয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে। সজ্জিত মস্তক ক্রমশই সখিনার স্কন্ধদেশে নত হইয়া আসিতে লাগিল। সখিনার বিষাদিত বদন নিরীক্ষণ করা কাসেমের অসহ্য বলিয়াই যেন চক্ষু দুটি নীলিমা বর্ণ ধারণ করিয়া ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে সময়ও কাসেম বলিলেন, 'সখিনা! নব অনুরাগে পরিণয়সূত্রে তোমার প্রণয়-পুষ্পহার কাসেম

বাক্য ঃ ২

পর্ব

শব্দ

বাক্য ঃ ৩

পর্ব

শব্দ

আবার, প্রতি পর্বের সম্বোধন বা প্রশ্নশব্দে আসছে প্রস্বন (Stress) ও কণ্ঠস্বরের আরোহণ। কণ্ঠস্বর কখনো ওঠে, কখনো পড়ে। উঠতি সুরের সঙ্গে যুক্ত হয় লেখকের অসহায় প্রশ্নকাতরতা, পড়তি সুরে প্রকাশ পায় তাঁর প্রত্যয়। এভাবেই বাক্যের সুরতরঙ্গে ধরা দেয় অর্থগত তাৎপর্য। কখনো তা করুণায় দ্রব্য হয়, ক্রোধে উত্তেজিত কিংবা প্রত্যয়ের স্থিরতায় সমতলিক। মহাকাব্য ছন্দে লেখা হয়। বিষাদ-সিন্ধুর গদ্যে সেই নিয়মিত ছন্দ আশা করা যায় না। কিন্তু গদ্যেরও যে ছন্দ আছে আর তা দিয়ে ভাষাকে স্পন্দিত করে পদ্যের 'effect' তৈরী করা যায়, মীর মশাররফ তা জানতেন। আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বে বলা হয়েছে, 'শুরুছন্দই সবচেয়ে গম্ভীর, সবচেয়ে

রাজকীয়, এর মধ্যেই অপরিচিত শব্দ ও রূপক ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য সবচেয়ে বেশী।' বিষাদ-সিন্ধুর তৎসম শব্দ ঝংকৃত গম্ভীর গদ্যে একদিকে যেমন শব্দছন্দের প্রতিভাস, তেমনি 'Strange words and Metaphor' ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তা সিদ্ধ ও ঋদ্ধ। হোসেন ও এজিদের সেনাবাহিনী যুদ্ধ করেছে কারবালা প্রান্তরে, আর বিষাদ-সিন্ধুর লেখক অবতীর্ণ হয়েছেন আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে। শব্দ-সৈনিকদের নিয়ে বক্তব্যের অব্যর্থ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবার যুদ্ধে। বিষাদ-সিন্ধুর বিশাল প্রেক্ষাপট নির্মাণে শব্দবলে বলীয়ান মীর বিষাদ-সিন্ধুর এজিদের মতই শক্তিমান পুরুষ।

বিষাদ-সিন্ধুতে বিশ্বাস অবিশ্বাস, ঘৃণা ভালোবাসা প্রভৃতি মানবিকবোধ এক একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে মূর্তি নেয়। হাসান, হানিফা, এজিদ, জয়নাব বা জায়েদা—প্রত্যেকেই এক একটি প্রধান মানবিক বোধের প্রবহণ। আশ্চর্য দৃঢ়তা নিয়ে তারা দাঁড়ায়। যদি বিশ্বাস করে দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে। যদি অবিশ্বাস করে তাও দৃঢ়তার সঙ্গেই। তাদের মনোজগতে কোন দোলাচলতা নেই। কখনই একই মানুষের মধ্যে দুই বিরোধী অনুভবের আলো ও ছায়া খেলা করে না। **'I hate and love / you ask how that can be ? / I do not know, but know / it tortures me'—Catullus** এর এই কবিতার মতো মিশ্র অনুভূতির রক্তাক্ত যন্ত্রণা নেই কোন চরিত্রে। বিষাদ-সিন্ধুর কাহিনীর মতো তার চরিত্রেরাও সরল সমতলবিহারী। বিষাদ-সিন্ধুর চরিত্র চিত্রণের এই বৈশিষ্ট্য, তার কাহিনী কথন ও ভাষা ব্যবহারের কথা মনে রেখে আমরা বলতে পারি বাংলা সাহিত্যে বিষাদ-সিন্ধুই সম্ভবত মৌখিক মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র উপন্যাস।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৮ ও ২৯ নং পৃ. ৩৭
২. The Calcutta Review, Vol I No 99, 1870, P 235
৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (২য় সং)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৭
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে কোথাও বিষাদ-সিন্ধুর নামোল্লেখ করেন নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাদের কাছে মীর মশাররফ উপেক্ষিত। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড, ৪র্থ সং)—এ ২৭০ পৃষ্ঠায় মীর মশাররফের 'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'হজরত বেলালের জীবনী' ও 'মদিনার গৌরব'কে গদ্য-রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে, এগুলি সব কাব্যগ্রন্থ। বোঝা যায় ডঃ সুকুমার সেন বইগুলো চোখেও দেখেন নি।
৪. মীর মানস—মুনীর চৌধুরী। পৃ ৪৭
৫. শাশ্বত বঙ্গ (১ম সং)—কাজী আবদুল ওদুদ
৬. মীর মশাররফ হোসেন—আবদুল লতিফ চৌধুরী। পৃঃ ১৮
৭. Marxism and Poetry—George Thomson, 2nd Indian Edition. P. 23
৮. দ্রষ্টব্যঃ মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রকল্প—জগন্নাথ চক্রবর্তী। পৃঃ ৩২

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সমকালীন সমাজজীবনের রূপকার

পুরাণে কথিত আছে, মনসা জন্মমুহূর্ত থেকেই যৌবনবতী। তাঁর কোনও ক্রমবিকাশ ছিল না। বাংলা সাহিত্যে যে দু'চারজন কথাশিল্পী আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন থেকেই পরিণত, যাঁরা সাহিত্যের আসরে এসেই বলতে পেরেছিলেন—ভিনি, ভিডি, ভিসি—সেই স্বল্পজনের একজন হচ্ছেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ, তারপর ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রগমণ—এটাই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে বেশীর ভাগ মনীষী লেখকের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। সূর্যের উদয় থেকে অস্তাচলে যাবার পথে যে পরিক্রমা, তাতে প্রভাত সূর্য থেকে মধ্যাহ্ন সূর্য, শেষে অপরাহ্নের ম্লান আলোর ছটা বিকশিত করে সূর্যের অস্তাচলে যাত্রা—এই হচ্ছে প্রকৃতির রীতি। কিন্তু ধূমকেতুর কোন ক্রমবিকাশ নেই। হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে আকাশ তার আলোকচ্ছটায় বিচ্ছুরিত করে দিয়ে তা বিলীন হয়ে যায়। বাংলা কথাশিল্পে এই শেষোক্ত দলের শিল্পী তারকনাথ।

শিল্পীর এই পরিণত আত্মপ্রকাশের অন্তরালে তাঁর মননের যে অনুশীলন লোকচক্ষুর অগোচরে তাঁর অভিজ্ঞতাকে রসসিঞ্চন করে হৃদয়ের ডালিকে পূর্ণ করে দেয় কি ভাবে জীবনপাত্রকে উচ্ছলিত করে মাধুরী দান করে বাঙালী পাঠককে সচকিত করে তুলল, সেদিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

কর্মজীবনে তারকনাথ ছিলেন ডাক্তার। ডাক্তারি পেশায় সরকারী চাকুরে হিসেবে বিভিন্ন স্থানে তিনি ছিলেন ও রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসে তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছিলেন। তাছাড়া ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ, বিশেষ করে ডিকেন্সের উপন্যাস তারকনাথকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ডিকেন্সের সমকালীন জীবনযাত্রাকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার মানসিকতা তারকনাথকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। ফলে ডাক্তারি ছাত্র হিসেবে তাঁর বাস্তববোধ এবং বিজ্ঞান-মনস্কতা ও আবেগহীন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে জীবনকে যথাযথ রূপে দেখা ও বিশ্লেষণ করা তাঁর সাহিত্য মানসকে গঠিত করেছিল। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তাঁর রচনায় রোমান্স বিমুখতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে তারকনাথের ব্যক্তি জীবনের দু'চারটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। তারকনাথ আট বছর বয়সে মাতৃহীন হন। মাতৃস্নেহের অভাব পূরণ করেন তাঁর জ্যাঠাইমা। নারীর এই স্নেহময়ী রূপ পরবর্তীকালে সরলা এবং শ্যামা চরিত্র রূপায়ণে তারকনাথকে অনুপ্রাণিত করে। জনৈক সমালোচক বলেছেন, 'তারকনাথের চিত্ত সুখসমৃদ্ধ, আনন্দনিবিড়, দৃঢ় জীবনের জন্য ব্যাকুল। বাস্তবজীবনে এই সুখনীড় গঠনে ব্যর্থ হয়ে সাহিত্যে তারই পরিপূর্ণ রসমূর্তি সৃজন করেছেন।' জীবনের শেষপ্রান্তে তারকনাথ গৃহগত সুখ অনেকটা পেয়েছিলেন। বক্সারে থাকাকালীন তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। এক্ষেত্রেও তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত—

"অভাগিনী সরলা যেমন বিধুভূষণকে দেখিবার জন্য প্রাণ ধারণ করিয়াছিল, তেমনি তারকনাথের পত্নী অল্পকাল সংসারে বাস করিবার পর পতিপুত্র পশ্চাতে ফেলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।" অভিজাত চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা সাধারণ মানুষের চিত্র-চরিত্র চিত্রিত করতেই তারকনাথের আগ্রহ বেশী ছিল। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে এই সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা কী পরম মমত্বের সঙ্গে তারকনাথ চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে তাঁর 'হরিষে বিষাদ' উপন্যাসে মুন্সেফ, ডেপুটি, হাকিম প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তারকনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকাতে কিছু গল্প-প্রবন্ধাদি লিখেছেন। কবিতা রচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল।

যে যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-ধর্মিতা বাঙালী পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছিল, সেই প্রচলিত পথে যাত্রা না করে 'তারকনাথ নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে পথ তৈরী করে' বাঙলা উপন্যাসের একটা নতুন ধারার সূচনা করলেন, যার উত্তরসূরী হিসেবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ যেন বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ধারানুসরণ! নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনকে তিনি তাঁর কর্মজীবনসূত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। সাহিত্যে দু'ধরণের লেখক পাওয়া যায়। একদল অভিজ্ঞতার স্বল্প পুঁজি অবলম্বন করেও কল্পনার মায়াজাল বিস্তার করতে পারেন, সৃষ্টিক্ষমতার দৈবী প্রতিভা তাঁদের এই লেখাকে আকর্ষণীয় ও রসসম্পৃক্ত করে' তোলে। এই শ্রেণীর শক্তিশালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা। কিন্তু অপর এক শ্রেণীর লেখক আছেন, যাঁরা বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেন, তাকেই বিশ্লেষণ করে সাহিত্য-কর্মে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটান। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার পুঁজিটুকুতেই তাঁদের সাহিত্যকর্ম সীমায়িত। এই শ্রেণীর লেখক হলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

এই কথাকেই আমরা অন্যভাবে বলতে পারি। সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে কোন কোন ব্যক্তি সমুদ্রের বিরাট গর্জন, তার গাম্ভীর্য, অনন্তবিস্তারী গগনচুম্বী তার বিচিত্র প্রকাশ, সৌন্দর্যের নানা বর্ণচ্ছটা, মোহময় প্রকাশ—সমস্ত কিছু জড়িয়ে সমুদ্রের ব্যাপকতা ও বিরাটত্ব আস্বাদ করেন এবং সেই বিরাটত্বকে হৃদয়ে সঞ্চারিত করে' রসসম্পৃক্ত হন। আর একদল মানুষ আছেন, যাঁরা সমুদ্র তীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা, তার সফেন সৌন্দর্য, সূর্যালোকে তার বর্ণবৈচিত্র্য, বালুকাতটের বিস্তৃতি এবং শামুক, ঝিনুকের সন্ধানে মনোনিবেশ করেন ও তাতেই তন্ময়ীভূত হন। দুটি পর্যবেক্ষণই সত্য, দুটি দেখাই সমুদ্রকে দেখা। সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকেরা ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা।

ফলে যে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্রাটরূপে বাঙলা সাহিত্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই যুগের লেখক হ'য়েও তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেননি। বঙ্কিম বলয়ের বাইরে নিজস্ব কক্ষপথ সৃষ্টি করা কম কৃতিত্বের নয়। বঙ্কিমচন্দ্র অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে কল্পনার পক্ষ মেলতে পারতেন। কিন্তু তারকনাথ কল্পনাশ্রয়ী ছিলেন না। তাঁর সম্বল ছিল শুধুমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা। তিনি মাটির কাছাকাছি ছিলেন। তাই তাঁর রচনা কল্পনা-বিমুখ হয়েও অভিজ্ঞতাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তারকনাথের মন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়েই পরিপূর্ণ ছিল এবং সেই প্রত্যক্ষ দেখা সামাজিক জীবন সাহিত্যে উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে তারকনাথের

গল্প বলার ক্ষমতা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। এই পুঁজি স্বল্প থাকার জন্য একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তিনি লিখতে পেরেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি অকিঞ্চিৎকর, কারণ সেগুলি এই একটি গ্রন্থেরই অনুসারী বলা যায়। বাকী উপন্যাস-গল্পগুলিতে তিনি নতুন কিছু শোনাতে পারেননি। ব্রজেনবাবু বলেছেন, "ভ্যাক্সিনেশন সুপারিন্টেডেন্ট রূপে তারকনাথের কার্য ছিল—উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি পর্যটন করিয়া অধীন কর্মচারিবর্গের কর্মের তত্ত্বাবধান করা। এই উপলক্ষে তাঁহাকে নানা শ্রেণীর লোকের সহিত দেখাশুনা ও মেলামেশা করিতে হইয়াছে। তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম উদ্যম 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস প্রধানতঃ এই অভিজ্ঞতার ফল।"

'স্বর্ণলতা' ছাড়া তারকনাথ আর যে কটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, তা হ'লো 'ললিতা', 'সৌদামিনী' নামে গল্পগ্রন্থ, 'হরিষে বিষাদ' নামে উপন্যাস এবং 'অদৃষ্ট' নামে একটি সামাজিক উপন্যাস। এছাড়া 'বিধিলিপি' নামে একটি উপন্যাস সম্পূর্ণ করার আগেই তাঁর দেহান্তর ঘটে।

আমাদের আলোচনা এবং তারকনাথ সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রধানতঃ তাই 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হবে। যে পটভূমিকায় 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটি রচিত তা উনিশ শতকের। এই যুগে একান্নবর্তী বাঙালী পরিবার নানা সুখদুঃখের টানা-পোড়েন মানের দিক দিয়ে পৃথক হ'য়েও বাইরে পৃথগন্ন হতে পারছে না। সেই একান্নবর্তী পরিবারের নানা সুখদুঃখ, স্বার্থপরতা, হীনতা, উদারতা প্রভৃতি নানা দোষগুণ পরিবারকেন্দ্রিক মানুষগুলির মধ্যে প্রবেশ পাচ্ছে এবং এই জীবনের প্রকাশ মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামীণ জীবনের গণ্ডীবদ্ধ পরিসরের মধ্যে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে নানা নরনারীর যোগাযোগ এবং তাদের সুখদুঃখের দ্বন্দ্বের কাহিনী তারক-নাথের প্রতিপাদ্য বিষয়। ফলে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে তারকনাথ তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করলেন, যার ফলে এই একখানি গ্রন্থই বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনলাভ করলো এবং তারকনাথের নাম ঔপন্যাসিক হিসেবে বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয় হ'য়ে রইল।

তারকনাথের কবি-মানস বা জীবনদর্শন যত না স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, তার চেয়েও প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর গল্পবলার ক্ষমতা। 'স্বর্ণলতা'-র এই গল্পবলার চিত্রটি অত্যন্ত মনোরম। ফলে এই সামাজিক তথা পারিবারিক উপন্যাসটিতে গ্রামীণ বাংলার অল্পশিক্ষিত পরিবারের যে চিত্র এবং বিচিত্র চরিত্রের যে সমাবেশ দেখি, তাতে বিভিন্ন চরিত্র দর্শনে এবং পর্যালোচনায় তারকনাথের ক্ষমতার পরিচয় পাই। তার অতিরিক্ত আর কিছু নয় এবং সবকিছু বর্ণনার মধ্যে অতিশয্যকে বর্জন করা তারকনাথের মনস্বীয়ানার পরিচয় দেয়। এর কারণ হয়তো তাঁর বিজ্ঞানী-মন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, গ্রামজীবনে একটি পরিবারে, একজনের রোজগারের টাকায় কিভাবে সংসার চলে, দেখেছেন যৌথ পারিবারিক আয়ের উৎস কী, ভিত্তির জীবনধারা কিভাবে হারিয়ে গিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ ঘটছে। ডাক্তারী শাস্ত্রপাঠে তিনি যেমন দেহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করার বিদ্যা অর্জন করেছিলেন এবং সেখানে চিকিৎসা করতে হলে সংযম যেমন একটা প্রধান গুণ হওয়া চাই, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মনোবিশ্লেষণ ও

অতিশয্যবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো তারকনাথের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

১৮৭৪ খৃঃ তারকনাথের প্রথম গ্রন্থ 'স্বর্ণলতা'-র রচনাকাল। অর্থাৎ এই সময়টি হচ্ছে উনিশ শতকের শেষার্ধ। এই সময়ে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস নতুন বাঁক নেবার মুখে দাঁড়িয়ে। পরাধীন ভারত প্রথম আত্মোপলব্ধিতে জেগে উঠলো সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। জীবনের এই বিচিত্র বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তিবাদ বা Reason. এই যুক্তিবাদের নিরিখে জীবনের সববিছুকে বিচার-বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা দিল। যুগোপযোগী যে উপলব্ধি বঙ্কিমচন্দ্রের রসচেতন্য সৃষ্টির প্রবাহ বয়ে আনলো, তারকনাথ তা নিতান্তই সীমাবদ্ধ রইল গ্রামীণ গার্হস্থ্য জীবনের পটভূমিকায়। তবে যুক্তির নিরিখে তারকনাথ তাঁর চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, যদিও সর্বত্র তিনি সেই যুক্তির মানদণ্ড বজায় রাখতে পারেননি। প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে যে জাতিকুল বংশ মর্যাদার কোন সম্পর্ক নেই, সেযুগে একথা বলার মতো সাহস তারকনাথের ছিল। তাই তিনি নীলকমল, শ্যামা প্রভৃতি ভদ্রেতর চরিত্রের মহিমা দেখিয়েছেন। অন্যদিকে কুলীন ব্রাহ্মণ শশিভূষণ বা গুরুদেব শশাঙ্কের হীনতা তিনি চিত্রিত করেছেন।

বাঙলা সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারকনাথের সামনে কোনও আদর্শ লেখা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস লিখলেও তা জমিদারবাড়ী বা ধনীগৃহস্থ কেন্দ্রিক জীবন কাহিনী। অন্য কাহিনী এসেছে অনুষঙ্গ হিসেবে। কিন্তু তারকনাথের মূল কাহিনী সাধারণ সামান্য গ্রামীণ চরিত্রদের নিয়ে যারা সাধারণভাবে জীবন নির্বাহ করে—কেউবা ধনী হয় অসাধু উপায়ে। ফলে গল্প বলাই তারকনাথের লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর গল্পবলার ঢঙটি শুধু মনোরম ও আকর্ষনীয় নয়, তাঁর ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনা ভঙ্গীতে সংযম ও আঙ্গিককৌশল তাঁর লেখাতে প্রসাদগুণ এনে দিয়েছে। যেটা সবচেয়ে উল্লেখ্য, তা হচ্ছে, যা তিনি দেখেছেন, তার ফটোগ্রাফিক্ বর্ণনা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। জীবনের কোনও গভীরতত্ত্ব ব্যাখ্যান নয়, সমাজের কোনও গূঢ় সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা নয়—প্রতিদিনের সাধারণ গৃহস্থঘরের ঘটে যাওয়া নিছক ঘটনার বর্ণনা করাই লেখকের লক্ষ্য। এর ওপর আছে তাঁর রঙ্গব্যঙ্গ নিপুণতা, জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্জাত আপ্তবাক্যের সুকৌশল বর্ণনা। রঙ্গব্যঙ্গের আলোকছটা সমস্ত বর্ণনীয় বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। এই গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের ছলে তিনি মাঝে মাঝে কাহিনীর মধ্যে যেসব সরস মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর চিন্তাশীলতা, জীবনবোধ ও উপলব্ধিসঞ্জাত। কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যগুলি সমকালীন লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'-র কথা মনে করিয়ে দেয়। দু' একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন,—
"তুমি কাহাকেও ৫ টাকা দান করিলে তোমার কষ্ট হয়না। তোমার দশ টাকা হারাইয়া গেলেও তোমার বিশেষ দুঃখ হয়না। কিন্তু বাজারে যদি চারি পয়সার জিনিস কিনিতে তোমার নিকট হইতে ছয় পয়সা লয়, তাহাতে তোমার মর্মান্তিক কষ্টবোধ হয়। কেন? কারণ, তোমার মনে হয়, তোমা অপেক্ষা দোকানী অধিক চতুর, অধিক বুদ্ধিমান। লোকে নিজের বুদ্ধির ন্যূনতা স্বীকার করিতে চায়না।"

অথবা—"আশ্চর্যের বিষয় এই লোকে পরস্পর ঐশ্বর্যেরই হিংসা করে, বুদ্ধিবিদ্যার

হিংসা করিতে দেখা যায় না। আমার অপেক্ষা এত জমি বেশি, এত টাকা বেশি, অনেকেই বলে। কিন্তু কে কোথায় কাহাকে বলিতে শুনিয়াছ, 'আমার অপেক্ষা অমুকের বুদ্ধি বেশি।"

নীতিবোধ বা Sense of Justice তারকনাথের মানসিকতায় অত্যন্ত প্রকট ছিল। সেটা তাঁর ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় দেখাতে গিয়ে তারকনাথ হয়তো তাঁর বাস্তববোধ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। যেমন, প্রমদার নৌকাডুবি বা গদাধরের গৃহে অগ্নিসমাধি। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার রস সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি আতিশয্যকে বর্জন করেছেন—সেই সংযম, যা তাঁর মানস গঠনেরই প্রকাশ। বিভিন্ন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তারকনাথের এই প্রবণতাই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—নীলকমল চরিত্র সৃষ্টিতে হাস্যরস ও বেদনার মিশ্রণ, গদাধরচন্দ্র একটি কৌতুক চরিত্র. ঠানদিদি চরিত্রটি বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্ররীতির Parody, স্বর্ণলতার প্রণয় কাহিনী আকর্ষণীয়. সরলার সারল্য ও প্রমদার কুটিলতা—দুই বিপরীত মেরুর চরিত্র হলেও যথাযথ। বিধুভূষণ চরিত্র নিজের সংসার সম্পর্কে যিনি উদাসীন, অথচ অন্যের কাজ করে বেড়ান। এইসব বিচিত্র চরিত্রের প্রকাশ দেখে আমরা বলতে পারি, এই সাধারণ জীবনের বিচিত্র চরিত্র সম্পর্কে তারকনাথের অভিজ্ঞতা কত ব্যাপক ছিল। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির নিদর্শন হিসেবে আমরা 'স্বর্ণলতা'-র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি স্মরণ করতে পারি। চরিত্রগুলির যথাযথ ও বাস্তব রূপায়ণের জন্য তা আজও জীবন্ত। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "প্রতিদিনের বাঙালী জীবনের বর্ণরিক্ত ঘটনার এমন নিঃস্পৃহ ও বাস্তবানুগামী চিত্রাঙ্কন বঙ্কিম যুগের কোন ঔপন্যাসিকের মধ্যেই পাওয়া যায় না। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এ ধনে ধনী ছিলেন না।" বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' একই সময়ের রচনা। বঙ্কিম-যুগে বাস করেও বঙ্কিম-প্রতিভার আলোকচ্ছটায় আচ্ছন্ন না হ'য়ে তিনি যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, সেটা তারকনাথের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বর্ণলতা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এই উপন্যাসে ত্রিবিধ আকর্ষণসূত্র অনেকটা শিথিল-গ্রন্থনে পরস্পর সম্পৃক্ত। (১) পারিবারিক জীবনে ভ্রাতৃবিরোধ ও দাম্পত্য সম্পর্কের বিপরীতমুখী প্রকাশ; (২) পথিক জীবনের বিচিত্র আকস্মিকতা ও উদ্ভট অভিজ্ঞতা; (৩) অনুকূল দৈব সংঘটনের সহায়তায় পাপের শাস্তি ও ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং উপন্যাসখানি একদিকে বস্তুধর্মী, অন্যদিকে নীতিতে আস্থাশীল ও রোমান্স-কৌতূহলী। অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ পাদের বাঙালী মানসিকতায় যে বাস্তব দুঃখ ও দৈব নির্ভরতার বিপরীত-জাতীয় উপাদান মিশ্রিত ছিল, উপন্যাসে তারই সার্থক প্রতিফলন।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তারকনাথের অবিমিশ্র বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্সের সহাবস্থান দেখেছেন। তাই তারকনাথ তাঁর গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের অতি-রোমান্সধর্মিতাকে কটাক্ষ করলেও তাঁর মধ্যেও রোমান্সের ভাব কল্পনা অনুপস্থিত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের "সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের নিগূঢ় মর্মবাণী ও রোমান্সের বর্ণাঢ্য অনুরঞ্জন তাঁহার পরবর্তীদের নিকট অনধিগম্যই রহিয়া গেল। কিন্তু উহার বাহিরের কাঠামোটি ও স্থূল, অতি-প্রত্যক্ষ সংঘর্ষটি ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয়

বিষয়রূপেই প্রতিভাত হইল। এই জাতীয় উপন্যাসে অন্তর-সমস্যার তীব্রতা ও জটিলতা যেমন হ্রাস পাইল, উহার সমাধানটিও তেমনি সুলভ হইল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই নূতন ধারার পথিকৃৎ।...তিনিই বঙ্কিমের প্রতিভার... একটি মাত্র উপাদান পৃথক করিয়া উহাকে বাঙালী সুলভ সহজ জীবনপ্রীতি ও কোমলভাব রমণীয়তায় অভিষিক্ত করিয়া পরবর্তী যুগের ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীর হাতে সমর্পণ করিলেন ও এই ধারা দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রে উহার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।" তারকনাথের জয় এখানেই এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় তিনি নিজের একটি আসন স্থায়ী করে নিতে পেরেছেন।

তারকনাথের এই বাস্তবপ্রিয়তা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ধ অনুকরণের অন্তরায় হয়েছিল। এই বোধের জন্যই তিনি বঙ্কিমকে যে আনুকূল্য দেখাননি, তার পরিচয় আমরা 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের মন্তব্যের মধ্যেই পাই। বঙ্কিম নিজেও বোধ করি এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নানা গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশ পেলেও, বিভিন্ন লেখক সম্পর্কে বঙ্কিমের নানা মন্তব্য শোনা গেলেও, সে যুগের আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'স্বর্ণলতা' সম্পর্কে বঙ্কিম বিস্ময়কর ভাবে নীরব। তারকনাথের এই বঙ্কিম-বিরোধিতার কারণ হয়তো সে যুগের অক্ষম লেখকদের বঙ্কিমের অন্ধ অনুকরণের প্রবণতাকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাছাড়া বাস্তববাদী তারকনাথ বঙ্কিমের গভীর কল্পনাশক্তির বৈভবকে হয়তো সে ভাবে আস্বাদ করতে চাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির গভীরতা এবং ব্যাপকতাকে এড়িয়ে তারকনাথ নিজস্ব পথে নিজ অভিজ্ঞতার পুঁজি সম্বল করে প্রত্যক্ষ দর্শনজাত চরিত্রগুলিকে আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং বস্তুনিষ্ঠতাই তার পেছনে সক্রিয় ছিল। এইজন্য তারকনাথের রচনার অন্তরালে কোন বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিক ডিকেন্স যেমন তৎকালীন সমাজজীবনের রূপকার ছিলেন, তারকনাথও সমকালীন সমাজজীবনেরই রূপকার। এ সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রেও ডিকেন্স ও তারকনাথের সাদৃশ্যতা বিশেষভাবে লক্ষনীয়। ডিকেন্স তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন, চরিত্রগুলি মোটা রেখায় অঙ্কিত। কিন্তু সেই অসংখ্য অগভীর চরিত্রগুলি আপনাদের প্রবৃত্তির লীলায় ভাস্বর পাঠকচিত্তেই চিরমুদ্রিত। ডিকেন্সের সৃষ্ট চরিত্র নিতান্তই ভালো বা মন্দ। দুয়ের মিশ্রণেই যে মানবচরিত্রের পূর্ণতা ও সার্থকতা, মহৎ চরিত্রের ভয়াবহ ত্রুটি ও ভ্রান্তি যে সর্বনাশা রূপে বিদ্যমান অথবা অত্যন্ত নীচ চরিত্রের ভিতরেও মানবতা কচিৎ দৈবীমুহূর্তে ঝলসে ওঠে, ডিকেন্সের সর্বত্র তার পরিচয় পাই না। ডিকেন্সের চরিত্র চরম ভালো অথবা মন্দের আতিশয্য দোষে দুষ্ট। তারকনাথের চরিত্রচিত্রণে ডিকেন্সের এই প্রভাব বিদ্যমান। প্রমদা, গদাধরচন্দ্র, রমেশ অথবা গোপাল, স্বর্ণলতা প্রভৃতির চরিত্র এইরূপ।...ডিকেন্সের পোয়েটিক জাস্টিস্ বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়েছে এবং তন্নিমিত্ত মন্দ চরিত্র তিরস্কৃত অথবা সৎ চরিত্র তদ্রূপ পুরস্কৃত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজজীবনের যে খুঁটিনাটি পরিচয় পাই, সেখানে বঙ্কিমের ঐশী কল্পনা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেজন্য

বঙ্কিমচন্দ্রের নরনারীর কথাবার্তা অলঙ্কার নাগরিকধর্মী। তাছাড়া বঙ্কিম সাহিত্যে নরনারীর হৃদয়গত যে দ্বন্দ্ব এবং তার প্রকাশ তা তারকনাথে অনুপস্থিত। তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মত চরিত্রসৃষ্টি করতে পারেননি। চরিত্রের যথাযথ রূপ তুলে ধরেছেন। তারকনাথের চরিত্রসৃষ্টি যদি ফটোগ্রাফি হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টি শিল্পীর তুলির আঁচড়ে অপরূপতা পেয়েছে। তাই ফটোগ্রাফির যেটুকু সৌন্দর্য, তা তারকনাথের চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনার যথাযথ বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শিল্পের মহিমা তাঁর চরিত্র বা ঘটনাকে রঞ্জিত করতে পারেনি। তাই ঊনিশ শতকের যৌথ পারিবারিক জীবনের যে উত্থান-পতনের চিত্র আমরা পাই, তা মূলতঃ অর্থনৈতিক। কিন্তু হৃদয়জাত যে সমস্যা বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রকট হয়ে উঠেছে, তারকনাথে সে মননের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব আমাদের নজরে পড়ে না। কারণ তারকনাথে প্রেম কোনও সমস্যার সৃষ্টি করেনা এবং সমাধানের প্রসন্নতায় তা তৃপ্ত।

আধুনিক কালে বাঙলা উপন্যাসের এই অগ্রগতি তার বিচিত্র প্রকাশ, ভাবে-ভাষায় আঙ্গিকে তার অনবদ্যতা সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের কাছে আজও তারকনাথ এবং তাঁর 'স্বর্ণলতা' গ্রন্থের নাম [illegible] হারিয়ে যায়নি, তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

আমাদের মনে হয়, ঊনিশ শতকের বাঙলার সমাজজীবনের যথাযথ চিত্র এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা জানতে পারি। এই সমাজজীবন সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত গৃহস্থ-জীবনের, নগরের বুদ্ধিজীবী সমাজের নয়। নগরজীবনের ঊনিশ শতকের চিত্র আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করে মাত্র। কিন্তু এই গ্রামকেন্দ্রিক সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে যেন আমরা নিজেদের খুঁজে পাই। অদূর অতীত সম্পর্কে কৌতূহলী-মন আমাদের তৃপ্ত হয় এই গ্রন্থপাঠে।

তাছাড়া 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের ভাষারীতি, বাকভঙ্গী, রচনাশৈলী সংলাপ ও বর্ণনা এত সহজ এবং সাবলীল ভঙ্গীতে চিত্রিত যে, যে কোনও পাঠকের কাছেই তা সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। হৃদয়ের অনুভূতি তার অনুরণন তুলতে পরিশীলিত বিদ্যার প্রয়োজন হয়না তারকনাথের গ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সেই মেদুরতা ও গাম্ভীর্য, বাক্যপ্রয়োগের ব্যঞ্জনাধর্মিতা বিদগ্ধ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হলেও সাধারণ পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যকে আত্মস্থ করতে পারেনা।

বিভিন্ন আধুনিক উপন্যাসের সাংকেতিকতা, ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণে প্রতীক এবং রূপকের ছড়াছড়ি সাধারণ পাঠককে আধুনিক উপন্যাস থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। গল্প শোনার [illegible] নেশায় যে সব পাঠক উপন্যাস পড়তে চায়, আধুনিক কালে সে ধরনের উপন্যাস পাঠক খুঁজে পায় না। পায় না বলেই গল্প শোনার নেশায় তারা 'স্বর্ণলতা'য় তাদের মনের খাদ্য খুঁজে পায়। ফলে বিদগ্ধ জনেরা [illegible]-প্রসূত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-সঞ্জাত গভীর জীবনদর্শন প্রকাশের অভাব দেখে তারকনাথকে লেখকের মর্যাদা না দিতে পারেন; কিন্তু অগণিত সাধারণ বাঙালী পাঠক—যাদের নিস্তরঙ্গ জীবন থেকেও গল্পের উপাদান অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে, তারা তারকনাথের এই গল্প শোনার জন্য আজও সমান কৌতূহলী। তাই শতাধিক বছর আগেকার গ্রন্থ হলেও আজও 'স্বর্ণলতা'র কাহিনীর আকর্ষণ, চরিত্রগুলির জীবন্ত প্রকাশ অম্লান।

তারকনাথ যত-বড়ো গল্প লেখক ছিলেন, ততবড়ো ঔপন্যাসিক ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে ঔপন্যাসিক হিসেবে সার্থক, তারকনাথ সে অর্থে গল্প-লেখক। ঔপন্যাসিক একটি বিশেষ জীবন-দর্শন বা উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করেন একটি কাহিনীর মাধ্যমে। গল্প বলা তাঁর জীবন-দর্শন প্রকাশের বাহন। সেখানে জীবন-দর্শন গুরুত্ব পায়। কিন্তু গল্প-লেখকের পক্ষে গল্পবলাটাই বড় কথা। তাঁর মূল লক্ষ্য কতো মনোরম করে' সহজ করে' আমার কাহিনী ও চরিত্রকে তুলে ধরলাম। তবে সেই কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে মাঝে মাঝে তারকনাথ জীবনমথিত, অভিজ্ঞতা সঞ্জাত যেসব মন্তব্য করেছেন, সেগুলি যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি সত্য। এসব ক্ষেত্রেই তারকনাথের ঔপন্যাসিক সত্তা মাঝে মাঝে পাঠকের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন বলা চলে, তাঁর পূর্ববর্তী লেখক প্যারীচাদ মিত্রের কথা। তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে কলকাতার সামাজিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে কয়েকটি খণ্ড চিত্রের সাহায্যে। ঔপন্যাসিকগুণের চেয়ে গল্পলেখকের গুণই সেখানে প্রকাশ পেয়েছে। Novelist আর Story-teller-এর মধ্যে মানসিক প্রবণতার পার্থক্য দেখা যায়।

এই গল্প বলতে গিয়ে তারকনাথ যে ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন, তা হচ্ছে মুখের ভাষা। তাই সাহিত্যের লেখ্য ভাষা নয়, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কথ্য ভাষা তাঁর গল্পবলার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এভাষা আলালী ভাষা নয়, বিদ্যাসাগরের বিষয়ানুসারী বিদগ্ধ ভাষা-ও নয়। এভাষা আটপৌরে গৃহস্থজীবনের ভাষা। এ ভাষায় সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনার মর্মবাণী প্রকাশ করা যায়। এই ভাষায় সমগ্র কাহিনী বিবৃত হয়েছে বলেই শতাধিক বছর পরেও সে ভাষা আজও সজীব। এটা তারকনাথের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। তৎসম শব্দের ব্যবহার যেমন তিনি করেছেন, তেমনি তদ্ভব, অর্ধতৎসম ইত্যাদি শব্দাবলীর ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। তবে কোথাও অপরিচিত শব্দপ্রয়োগের দ্বারা তাঁর কাহিনী-বর্ণনা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি।

'স্বর্ণলতা' এবং তার নাট্যরূপ 'সরলা' একদিন বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে যে আলোড়ন তুলেছিল, আজ সে ইতিহাসও স্মরণযোগ্য। তৎকালীন এক সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"In describing Bengali domestic life, in delineating real character, in sketching ordinary scenes, the author of "Swarnalata", Babu Taraknath Ganguly is without a rival among Bengali writers and fiction. He is a close observer of men and manners and he has a faculty which seems to be exclusively his, for working up ordinary materials into a highly effective picture. As a painter of real ordinary life, both in its comic and in its serious tragic side Taraknath 's unrival among Bengali authors."

বিজিতকুমার দত্ত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী

নিজবাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকার বেদনাবোধ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু উপন্যাসেও তিনি তাঁর বেদনাকে প্রকাশ করেছিলেন। বিচিত্র প্রবন্ধে তিনি শুধু স্বদেশচর্চার সূত্রপাতই নয়, ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ভারত-কলঙ্কের স্বরূপ বুঝতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কলঙ্ক তাঁকে যেমন উৎসাহিত করেছে নবভারত চিন্তায়, তেমনি প্রাচীন ভারতের গৌরবও তাঁকে উদ্দীপিত করেছে জাতিগঠনের প্রচেষ্টায়। বঙ্কিম-শিষ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গুরুর নির্দেশ শিরোধার্য করেছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে নয়, নিজস্ব উদ্‌ভাবনায়। 'বাল্মীকির জয়' এরকম একটি রচনা।

'বাল্মীকির জয়' উপন্যাস নয়। কিন্তু উপন্যাসের কিছু উপাদান এ গ্রন্থে লভ্য। পুরাণ থেকে তিনটি চরিত্র বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং বাল্মীকিকে নির্বাচন করে তিনি কাহিনীটি রচনা করলেন। বলা বাহুল্য, পুরাণের কাহিনীর কিছু বাদসাদ দিয়ে, তার সঙ্গে নিজের ভাবনাকে যুক্ত করে কাহিনীটি তৈরি করলেন তিনি। এরকম ব্যাপার উনবিংশ শতাব্দে সাহিত্যে খুবই ঘটছিল। আমরা এখন একে বলি মিথ-তৈরি (Mythmaking)। পুরাণের যেসব ঘটনাকে শিল্পীরা গ্রহণ করেছিলেন সেখানেও নূতনত্বের স্পর্শ ছিল। সে নূতনত্ব বিষয়ের গুরুত্বদানে। পুরাণে প্রায় অবহেলিত, উপেক্ষিত বিষয়গুলি নূতন ভাবে গড়ে তুলেছিলেন শিল্পীবৃন্দ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তাঁর বর্ণনা-বিবৃতিতে সেই মেজাজ রক্ষা করেছেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তো নিজের মতো করে করেইছেন, রামায়ণের ইঙ্গিতকেও বিস্তৃত করেছেন উপন্যাসের শৈলীতে। গুহক, চণ্ডাল, বালী, পরশুরাম, ভরদ্বাজমুনির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

রামায়ণের প্রতি আমাদের টান যে কতখানি 'মেঘনাদ বধ' কাব্য তার নিদর্শন। যিনি যতই বলুন মধুসূদনের টান কিন্তু ছিল রামের প্রতিই। না হলে সীতা একটা সর্গ কেড়ে নেন কেমন করে? রামকে নিয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন মধুসূদন নিশ্চয়ই কিন্তু ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিলেন তিনি রাবণকেই 'মরে পুত্র জনকের পাপে।' বিহারীলাল বাল্মীকির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন 'সারদামঙ্গল' কাব্যে। ক্রৌঞ্চমিথুনের শোক তাঁর কাব্যেও বিস্তৃত হয়েছে। আর বোধ করি তিনি অনুভব করেছিলেন করুণা, মায়া, মমতা তার সঙ্গে বিরহের গভীরতা মিলে জগতের সৌন্দর্য, মঙ্গল এবং সান্ত্বনার প্রতিষ্ঠা। কবিই যথার্থ মানবমিলনের দূত।

কিছু পরেই আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' (১২৮৮) লেখার কিছু আগে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রকাশ (১২৮৭)। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ সৃষ্টির মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে চাইছিলেন। বাল্মীকির করুণায়

নিজেকে অভিষিক্ত করেছিলেন তিনি। হরপ্রসাদও সেই বাল্মীকিকেই স্মরণ করলেন এবং লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে 'বাল্মীকির জয়' নামটির তাৎপর্য যা সিলভ্যাঁ লেভি দেখিয়ে দিয়েছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের সাধনা এবং কর্ম অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি না বাল্মীকির মানবতা তার সঙ্গে যুক্ত হয়। যে মানবতা বলে 'আমরা সবাই ভাই'।

রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভায় সরস্বতী এসেছেন। হরপ্রসাদও এনেছেন। রবীন্দ্রনাথের সরস্বতীর আগমন 'দীনহীন বালিকার সাজে,/এসেছিনু, এ ঘোর বনমাঝে,/ গলাতে পাষাণ তার মন—', আর হরপ্রসাদের সরস্বতী 'বশিষ্ঠের আশ্রম থেকে চলে আসেন বাল্মীকির সান্নিধ্যে।' বশিষ্ঠ-বাল্মীকির দ্বন্দ্বটি ধরিয়ে দেন শাস্ত্রীমশায়। উপন্যাসের চকিত ইঙ্গিত এখানে ফুটে ওঠে। এর বেশি কিছু নয়। বাল্মীকির গানে ফুটে উঠল 'আমরা সবাই ভাই' আর রবীন্দ্রনাথের সরস্বতী বাল্মীকিকে সাব সত্য শিখিয়ে দিলেন 'আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান, / তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ'।

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় দেখেছিলেন, প্রশংসা করেছিলেন। হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে কতটা ঋণী সেকথা বঙ্কিম বলেনান কিন্তু তুলনা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাল্মীকির জয়' বইয়ের টাইটেল পেজে ইংরেজিতে ছাপিয়েছেন The Three Forces (Physical, Intellectual and Moral)। তার মানে রূপক রচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রূপক কাব্য লিখেছিলেন। সত্যকে রূপকে মুড়ে প্রকাশ করার প্রবণতা ঊনবিংশ শতকের সামান্য হলেও একটি প্রবণতা ছিল। 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেসে'র কথা অবশ্যই মনে পড়বে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (বাল্মীকির জয়ের আগে রচিত) রূপক নয়, কিন্তু অতীতের ঘটনাকে উল্টো করে দেখার আকাঙ্ক্ষা সেখানে।

হরপ্রসাদ উল্টো করে বলেননি, কিন্তু পুরাণকারের ধ্যানধারণাকে রূপান্তরিত করেছেন। বাহুবল, নৈতিকবল এবং বুদ্ধিবলের সংঘর্ষ এবং মিলনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন হরপ্রসাদ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'Force তো কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট মূর্তি'—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি। যদি বল এই তিনটিই তোমার Force, আমার উত্তর তোমার Force লইয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্রিমূর্তির উপাসনা করিব।' সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্বভাবে সাহিত্যকেই দেখেন। অতএব তত্ত্বকে তিনি আপাতত আমল দিচ্ছেন না। সেজন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বলে দিয়েছেন 'বাল্মীকির জয়' কাব্য নয়, নাটক নয়, 'নবেল' নয়। রচনাটি পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞানও নয়। তাহলে এর পরিচয় কি? বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ।' এখানেই বাল্মীকির জয়কে উপন্যাসোপম রচনা বলতে উৎসাহ পাওয়া যায়। উপন্যাসের গড়ন নিয়ে নানা তর্ক এবং কূটতর্ক হওয়া সত্ত্বেও শেষ কথা কেউ বলতে চাননি। ঘুরিয়ে বলেছেন উপন্যাসের ধর্ম হল এর গঠন

শিথিলতা। এর ধর্ম আগ্রাসী। অর্থাৎ কাব্য, নাটক, পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান সব কিছুকে আত্মসাৎ করে নিতে পারে উপন্যাস। বাস্তব মানুষের রহস্যমোচনে সব কিছুরই প্রয়োজন। সেই সব কিছু উপন্যাসে উঠে আসে। যেমন পয়ার ছন্দ সব কিছুকে গ্রাস করে নিতে পারে। 'বাল্মীকির জয়' শিথিল অর্থে উপন্যাস।

একথা ঠিক টাইটেল পেজের তত্ত্বভাবনাকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কিন্তু শাস্ত্রীমশায় মানুষ গড়েছেন। এই মানুষ সমাজেরই মানুষ। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের অহংমন্যতা নিপুণভাবে বিশ্লেষিত। স্বভাবতই পুরাণের মোড়ক আছে বলে সমকালীন সমাজকে তেমন ভাবে স্পর্শ করা যায় না। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দের শিক্ষিত বাঙালীর গড়নের পরিকল্পনাটি ফুটে উঠেছে ঐ তিনপুরুষকে কেন্দ্র করে।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে পরাজিত হলেন ব্রহ্মবিদ্যার অভাবে। তাঁর ছিল ক্ষাত্রবল। দেশের পর দেশ জয় করেছেন তিনি। জাতির পর জাতিকে পর্যুদস্ত করে সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করবার বাসনা তাঁর। সাফল্যের পর সাফল্যে আত্মবিস্মৃত বিশ্বামিত্র। থমকে দাঁড়ালেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলেন যেন কিছুক্ষণের জন্য।

বশিষ্ঠের আজীবন সাধনা, বিশ্বামিত্রের দিগ্বিজয় এবং বাল্মীকির দস্যুতা কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়ল। 'আমরা সবাই ভাই' এই আদর্শ তাঁদের কর্মে, ধ্যানে, জীবনচর্চায় কতটা প্রতিফলিত হয়েছে? বশিষ্ঠের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন শাস্ত্রী। বশিষ্ঠ ভাবছেন বুদ্ধির দ্বারা তিনি ক্ষাত্রয়কে ফাঁকি দিয়েছেন। এবারে তিনি বুদ্ধি আর শাস্ত্র দ্বারা সকলকে মিলিয়ে দেবেন। বিশ্বামিত্র ভাবছেন বাহুবলে কি সকলকে মিলিয়ে দেওয়া যায় না? বাল্মীকি তাঁর কর্মের ব্যর্থতা বুঝতে পারলেন। এ যেন গ্রীক পুরাণের কাহিনীর মতো। দেবতাদের কলহে মানবের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া। 'বাল্মীকির জয়ে' তিনপুরুষের মধ্যে কে 'আমরা সবাই ভাই' এই ভাবনার রক্ষক—এই নিয়ে দ্বন্দ্ব। আসলে দ্বন্দ্বটা দুইপুরুষের মধ্যে। ঘাত প্রতিঘাতও দুইজনের মধ্যে। বাল্মীকি সরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি কেবলই আত্মগ্লানির আগুনে পুড়তে পুড়তে শুদ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ দ্বন্দ্ব ধন থেকে ঘনতর হয়েছে। বিশ্বামিত্র এ জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক জগৎ নির্মাণ করেছেন। হরপ্রসাদ এখানে বিশ্বামিত্রকে তুলে এনেছেন কঠিন বাস্তবে। বিশ্বামিত্র হতে চেয়েছেন সফল রাজা। তাঁর রাজ্যে সকলেই ভাই ভাই হয়ে থাকবে। বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের আদর্শ রাজ্যের পরিকল্পনার যে দ্বন্দ্ব সেখানে শাস্ত্রী মশায় বিশ্বামিত্রের শক্তি ও দৃঢ়তার চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। বশিষ্ঠের ভাই ভাই প্রতিষ্ঠার আদর্শকে আমরা মানব কেমন করে? তিনি বলছেন নীচজাতির (অস্পৃশ্য) স্বাধীন চিন্তাকে ঘুচিয়ে দিতে হবে। তাদের মনকে ভোগের দিকে ঠেলে দিতে হবে। বইপড়া নিষিদ্ধ হবে। বলা বাহুল্য, এই নীতিকেই আমরা

সামন্ততান্ত্রিক বলতে পারি। বশিষ্ঠ সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ। ঊনবিংশ শতাব্দের মানুষের কাছে প্রত্যাশা ছিল স্বাধীন চিন্তা, শোর্যবীর্য। বিশ্বামিত্র সে কথাই বলেছেন 'আপনাদের পরম শত্রু আকাশ আছে, দেখিতেছেন না? অনন্ত আকাশের দিকে একবার চাহিলে স্বাধীন চিন্তা যে আপনিই উদ্বেল হয়ে ওঠে'। বাল্মীকির জন্ম রচনাটির প্রাসঙ্গিকতা এইখানে। হরপ্রসাদ ঊনবিংশ শতকের ইউলিসিসকে স্মরণ করেছেন। মধুসূদন একভাবে বলেছিলেন, হরপ্রসাদ অন্যভাবে। বশিষ্ঠ বলেছেন মানুষকে সমস্ত আকাশের দিকে চোখ মেলতে দেবেন না। সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করে দেবেন তিনি। আমাদের মনে পড়ে যায় সমুদ্রযাত্রা ভারতবাসীর পক্ষে সঙ্গত কি অসঙ্গত এই নিয়ে ঊনবিংশ শতকের বুদ্ধিজীবী মহলে (এই সময়) বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও যোগ দিয়েছিলেন এই বিতর্কে। তাহলে মানুষ কি হবে? রবীন্দ্রনাথের দাদাঠাকুরের চেলাচামুণ্ডাদের মতো? যারা কেবল দাদাঠাকুরকেই চেনে? যারা নিজেদের ওপর নির্ভর করতে জানে না? বশিষ্ঠ তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের এই প্রস্তাব ঘৃণ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি একে বলেছেন ব্রাহ্মণের 'বিটলামি'। তবু তিনি ব্রাহ্মণের কাছে পরাজিত হলেন।

বিশ্বামিত্র এবারে ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের জন্য কঠোর তপস্যায় বসলেন। ভীষণ সেই তপস্যা। এ যেন ঊনবিংশ শতাব্দের মানুষকে কর্মযজ্ঞে আহবান। প্রলোভন, কষ্ট, সব সহ্য করলেন তিনি। শুনলেন গায়ত্রীমন্ত্র। কিছুটা তিনি শান্ত হলেন। কিন্তু এবারও ব্রাহ্মণত্ব অর্জন হয়নি। দেবতারা চঞ্চল হলেন। তাদের সভার প্রস্তাব বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব পেলেই ব্রহ্মত্ব চাইবেন। অতএব যেভাবেই হোক বিশ্বামিত্রকে নিবৃত্ত করা হোক। প্রথমবারে দেবতা ব্যর্থ হলেন। দ্বিতীয়বারে দেবতাদের সঙ্গে ছিলেন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র রেগে গেলেন। এই ক্রোধ বিজয়ীর। মানুষের উষ্ণস্পর্শ পাই বিশ্বামিত্রের চরিত্রে। উপন্যাসের নায়কের ভূমিকায় বিশ্বামিত্র। দেবতারা বিশ্বামিত্রকে থামাতে না পেরে ঘুষঘাষ দিতে চাইলেন। বিশ্বামিত্র এবার চাওয়ার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেন। তিনি একেবারে ব্রহ্মত্ব চাইলেন। দেবতাদের ছলচাতুরি তিনি ধরে ফেলেছিলেন। রাজনীতির প্রলম্বিত ছায়া দেবতাদের সভায় বিস্তৃত। কখনও বলে, কখনও ছলে ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা রাজনীতির অস্ত্র। আমরা দেখি সে রাজনীতিতে দেবতারা ব্যর্থ। তাঁরা বিশ্বামিত্রকে তৃতীয় স্থান দিতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষির পরে রাজর্ষির স্থান। বিশ্বামিত্র এ মেডেল (রাজর্ষি) নিলেন না। প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কই ছিন্ন করলেন। নিজে নূতন রাজ্যপরিকল্পনায় মনোযোগী হলেন। দেবতারা ভয় পেলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তখন তরুণ গড়ুরের ক্ষুধা। তিনি এগিয়ে চললেন সৃষ্টি কর্মে। ঊনবিংশ শতাব্দের বাঙালীর এই তৃষ্ণাই ছিল। শাস্ত্রীর রচনায় তার প্রকাশ। বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূত্রটি জট পাকাতেই লাগল। শাস্ত্রী বলেছেন বিশ্বামিত্রের নূতন পৃথিবী রচনা বশিষ্ঠের 'যে হৃদয় মহারণে অটল, ব্রহ্মর্ষিসভায় অশঙ্ক, সে হৃদয় অকস্মাৎ ভীত ভীত হইয়া উঠিল'।

বিশ্বামিত্র যে জগৎ গড়ে তুললেন সে জগৎ সৌন্দর্যময়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সেতুবন্ধন সে জগতে। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পুষ্ট সে পৃথিবী (স্কুল-কলেজ স্থাপিত সেখানে, বিশ্বামিত্রের জগৎ যে আধুনিক জগৎ, আধুনিক মানুষেরই বাঞ্ছিত পৃথিবী স্কুল-কলেজের উল্লেখে তা স্পষ্ট। অতএব বিশ্বামিত্র আধুনিক কালের মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিনিধি)। মানুষে মানুষে মিলন সে জগতে। প্রেমের প্রবাহ বিস্তৃত হয়েছে সেখানে। বুদ্ধির প্রাধান্য সেখানে। এ-ও তো এক ধরণের সাম্যবাদী সমাজ। বলা বাহুল্য, এই সাম্যবাদ আধুনিক কনসেপ্টের সমতুল্য নয়। অথবা আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থারও প্রতিরূপ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যবিত্ত সমাজ যে লিবারেল মানবতার কথা ভেবেছিল, শাস্ত্রী মশায়ের ভাবনায় যা অধিষ্ঠিত তাই আমরা পাই তাঁর বিশ্বামিত্র চরিত্র রূপায়ণে। বঙ্গদর্শনের পাঠে আছে 'সকলেই ব্যস্ত everything onward and forward'। হঠাৎ শাস্ত্রী মশায় বলেন, 'আহা! এমন পৃথিবী যদি আমাদের হইত, তবে না জানি কত সুখই হইত (বঙ্গদর্শনের পাঠ)।'

আমাদের কৌতূহল জাগতে শুরু করে ততঃ কিম্। বিশ্বামিত্রের পরিণাম সম্বন্ধে কৌতূহল জীবন্ত রেখেছেন হরপ্রসাদ। একবার বশিষ্ঠের 'ভীত ভীত' প্রতিক্রিয়া দেখেছি। আর একবার বাল্মীকির ভেঙ্গে হৃদয়কে চাবিত করেন লেখক। ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির মৃত্যুতে শোক থেকে শ্লোক গল্পটি সেরে নেন লেখক। গল্পটির সঙ্গে জুড়ে দিলেন হরপ্রসাদ নিজস্ব কল্পনা। যে সরস্বতী বশিষ্ঠের আশ্রমে ছিলেন, তিনিই বাল্মীকিকে আশ্রয় দিলেন।

রচনাটিতে দ্বন্দ্বের চেহারা বহিরঙ্গ। তিনপুরুষের তিন মতের দ্বন্দ্ব। বহিরঙ্গ দ্বন্দ্বের উপাখ্যান অনেক সময় ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার হয়ে যায়। বাল্মীকির জয়ে ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার আছে। রূপকের চরিত্রও তাই। আমরা দেখি বাল্মীকিও পৃথিবীব্যাপী অরাজকতার, হিংস্রতার, স্বার্থের, লালসার বীজ উৎপাটন করতে চাইছেন। তিনি করুণার দ্বারা মানুষের শুভবোধ জাগাতে চাইছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন সৃষ্টি করুণাময়ী, মনুষ্য বড়ই অকরুণ (কৃষ্ণকান্তের উইল)। এই কারুণ্যকে বাল্মীকি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ এই করুণার স্রোতেই স্নাত। আমাদের মনে হয় ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'ই তার ভূমিকা বিস্তৃত হয়েছে।

যাই হোক, বাল্মীকির কর্তব্যে আমরা ঠিক অ্যাকশন বলতে যা বুঝি তা পাই না। বাল্মীকির করুণার মূল্য অস্বীকার করা হচ্ছে না এখানে। কিন্তু যত বড়ো চরিত্রই হোক বাল্মীকি কিন্তু অ্যাকশনের মধ্য দিয়ে যাননি। এখানে রচনাটি শিথিল। ব্যক্তিত্বের নিরাবরণ প্রকাশ নেই এই চরিত্রে।

আর তাই পাই বিশ্বামিত্রের চরিত্রে। অনেকটা প্রমিথিয়ুসের আগুন নিয়ে আসার মতো। প্রমিথিয়ুসও তো স্বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বামিত্রও তাই। গোটা সৃষ্টির পরিকল্পনাকেই তিনি উল্টে দিতে চাইছেন। কিন্তু এরও সীমা আছে। এখানেই বহিরঙ্গ দ্বন্দ্ব থেকে আমরা অন্তরঙ্গ দ্বন্দ্বে পৌঁছে যাই। মানুষের ইতিহাসে নেমে আসি

আমরা। এবারে 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র পালা।' বিশ্বামিত্র পৃথিবী গড়লেন। কিন্তু তিনি সুখী নন। তিনি সমব্যথী মানুষকে খুঁজলেন। এখানে সে মানুষ কই? এক ধরণের বিচ্ছিন্নতার বেদনা বিশ্বামিত্রকে দগ্ধ করতে লাগল। 'ইহারা তো কেবল সুখী, বিশ্বামিত্র তো মানুষ। দুঃখ-ভোগ তো তাঁহার অদৃষ্ট লিপি। তিনি দুঃখিত হইলে, উন্মনা হইলে, তাঁহার মুখপানে তাকায় এমন লোক কই?' এও তো বন্ধন। বন্ধনমুক্তির জন্য বিশ্বামিত্র বহুমানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা সেই পুরনো পৃথিবীর মানুষকেই চাইলেন। কিন্তু ব্যক্তির অভিমান বড়ো কঠিন। উনবিংশ শতাব্দের ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা এখানে দেখতে পাই। আপন সীমা লঙ্ঘন প্রয়াসী সে। বিশ্বামিত্র পৃথিবীর মানুষকেই আনতে চাইলেন তাঁর পৃথিবীতে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বাধা দিলেন। বিশ্বামিত্র খেপে গেলেন। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত বাণ এইরকম 'পাষণ্ড যত বড়ো মুখ তত বড়ো কথা, আমায় বল কিনা বুঝিয়া চলো'। ব্রহ্মা-বিশ্বামিত্রের এই সংলাপ মানুষের উত্তাপে ভরা। কিন্তু বিশ্বামিত্র পরাজিত হলেন। তিনি পৃথিবীতেই নামতে লাগলেন। এ নামা বড়ো ট্রাজিক। কলোনিয়াল মানুষের এখানেই সীমাবদ্ধতা। তার নবনির্মাণ এইভাবেই পর্যুদস্ত হয়। হরপ্রসাদের কাহিনীতে এই ট্রাজেডির ঈষৎ উদ্ভাস আছে, 'ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দরবিগলিত অশ্রুধারা ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল।' বলা বাহুল্য, এইখানে হরপ্রসাদ উপন্যাসটি শেষ করেননি। বিশ্বামিত্রকে মেনে নিতে হয় ব্রহ্মার আদর্শকে। বাল্মীকির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিতে হয় তাঁকে। ব্রহ্মা বুঝিয়ে দিলেন মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। এই মানুষের অদৃষ্ট। বিশ্বামিত্রের জ্ঞানোদয় মধ্যবিত্তের জ্ঞানোদয়। পোষমানা শান্তিতে শয়ান বাঙালীই যেন উঠে আসে এই রচনায় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু পাঠকের চিত্তে ঐ উদ্ধত, বিদ্রোহী বিশ্বামিত্র বার বার হানা দিয়ে যায়, এ অস্বীকার করব কেমন করে?

[২]

১২৮৯ সালে হরপ্রসাদ 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস প্রকাশ করতে থাকেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। ইতিমধ্যে শাস্ত্রীমশায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছেন। ইতিহাসচর্চায় রাজেন্দ্রলালের পথ অনুসরণ করতে তিনি উৎসাহিত হন। কাঞ্চনমালার বিষয় বৌদ্ধসংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। বৌদ্ধধর্মের প্রতি হরপ্রসাদের আগ্রহ ও নিষ্ঠা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সূত্রেই লব্ধ। ধীরে ধীরে হিন্দুবৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরোধ-মিলনের ছবিটি তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হতে থাকে। তখন পর্যন্ত তিনি যে তথ্য পেয়েছিলেন তাতে তাঁর মনে হয়েছিল হিন্দুবৌদ্ধ সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে। তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন সে তথ্যের মধ্যেই কিন্তু বিরোধ-মিলনের অন্যতর ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল। কিন্তু শাস্ত্রী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় নূতন একটি

তত্ত্ব যেন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল। সে তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। হরপ্রসাদ রচনাবলীর সম্পাদক হরপ্রসাদের ইতিহাসচর্চা বিশেষত জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অবদান নিপুণভাবে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের কথা প্রায় অনুল্লেখিত। ভেবে দেখতে গেলে লেখ্যাকমে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা হরপ্রসাদের জীবনে বড়ো সম্পদ। বঙ্কিমচন্দ্রই হরপ্রসাদকে উৎসাহ দিয়ে বঙ্গদর্শনের লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই সূত্রেই শাস্ত্রী উপন্যাস-রচনাতেও প্রাণিত হন। বাল্মীকির জয়-এ তার যথার্থ সূচনা। ১২৮৭ সালের পর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি 'কাঞ্চনমালা' লিখতে মনোযোগী হন। কাঞ্চনমালা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এত বেশি যে উদ্ধৃতি দিয়ে তার প্রমাণ করার কোনো মানে হয় না। আষ্টেপৃষ্ঠে বঙ্কিমের প্রভাব কাঞ্চনমালায়।

দাম্পত্যপ্রেমের বর্ণনায় হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কুমতি সুমতির দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে উঠে আসে। নায়িকার আচরণ বঙ্কিমচন্দ্রের অবলা নায়িকাদের মতোই। আবার ক্রোধে দীপ্ত নারীর উত্তাপ উত্তেজনা কপালকুণ্ডলার মতিবিবিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হরপ্রসাদের সৃষ্ট কুণাল ও কাঞ্চনমালা একেবারেই হরপ্রসাদের ইতিহাস-ভাবভাবনার দ্বারা পীড়িত। হরপ্রসাদ যেমনটি চান সেইভাবেই তিনি গড়েছেন কুণাল-কাঞ্চনকে। উপন্যাসের সূচনা যেভাবে করা হয়েছে তাতে রূপকথার আমেজ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিষয়টি পেয়েছেন দিব্যাবদান' এবং 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা'র কাহিনী থেকে। সে কাহিনীও 'কল্পলতা'। তার উপর হরপ্রসাদ আরো কল্পনার রং চাপিয়েছেন। নিজের মতো করে নিয়েছেন তিনি।

তিষ্যরক্ষার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে সরলরেখায়। সামান্য ক্ষৌরকারের কন্যার ধীরে ধীরে পাটরানি হওয়ার কাহিনী শাস্ত্রী মশায় যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে মতিবিবির ওমরাহদের ছদ্ম ভালোবাসা বিতরণ এবং জাহাঙ্গীরের প্রধান মহিষী হওয়ার ধাপগুলির প্রসঙ্গ স্বতই মনে হতে পারে। কুণালের চক্ষুউৎপাটন বিবরণ সুলভ কাহিনীবর্ণনার প্রকরণকেই গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে পিশাচী বলেই চিহ্নিত করতে হরপ্রসাদ কৃতসংকল্প। তিষ্যরক্ষার চিত্তের টানাপোড়েন হরপ্রসাদ দেখতে পাননি। দেখতে তিনি চানওনি। তিষ্যরক্ষা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবে ঠিক করলে তার সম্পর্কে শাস্ত্রীর উক্তি 'এই ভাবিয়া পাপীয়সী নিজ পাপবাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে অনায়াসে এক ধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল'। পাপীয়সী, পাপবাসনা—এ সবই বঙ্কিমীরীতি। পাপের বীজবপন, অঙ্কুরের উৎপত্তি এবং মহীরুহে রূপান্তর এই স্তরগুলি উদ্‌ঘাটন করেছেন উপন্যাসে লেখক। আর আমরা দেখতে পাই তিষ্যরক্ষার জালে একের পর এক সৎ মানুষ ধরা পড়ছে। যে কুণাল যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম সেও তিষ্যরক্ষার অযৌক্তিক দাবি মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো মেনে নেয়। ব্রাহ্মণরা তিষ্যরক্ষার খেয়ালে চলে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিষ্যরক্ষা আপন কর্মের ফল ভোগ করেছে। তার চরিত্রটি পুতুলের ধর্মই বজায় রেখেছে।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ অধ্যায়টিতে অলৌকিকত্বের অবতারণা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অতিপ্রকৃতের ক্ষীণ বর্ণনা দেখা যায়। হরপ্রসাদ তাকেই বিস্তৃত করেছেন নিজের মতো করে। বৌদ্ধধর্মের আদর্শ রক্ষায় কাঞ্চন-কুণালের প্রচেষ্টা এবং অশোকের বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী রাজ্যশাসনের প্রয়াস এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাই কাঞ্চনমালা আর্তের জন্য উদ্বিগ্ন, সেবায় সমর্পিত এবং কুণালের হিতাকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন। তার গতিবিধি অবাধ। ঐ সময়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে নারীর এই অবাধ গতিবিধির বিবরণ খুবই সুলভ। রমেশচন্দ্র দত্তের জেলেখার কথা এখানে স্মরণ করি। এই ব্যাপারের সূত্রপাত বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা চরিত্র থেকে। কাঞ্চনমালার অন্ধ কুণালকে আবিষ্কার রোমান্সের সীমাকেও লঙ্ঘন করে। রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে বিভা-উদয়াদিত্য রাজপরিবারের মানুষ হয়েও রাজঅন্তঃপুরের রুদ্ধশ্বাস পরিবেশকে তারা ঘৃণাই করেছে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল তাদের অন্তরে। হরপ্রসাদ কাঞ্চনের কুণাল সন্ধানে যাত্রার পূর্বে যে মনোভাবকে ব্যক্ত করেছেন সেখানে সেরকমই ভাবনা দেখি 'সে রাজপুরীর সুখকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে। রাজপুরীতে পাখিরা প্রাণ খুলিয়া গান গাইতে পাবে না। যে বায়ু পর্বত-শীর্ষে প্রাণ প্রফুল্ল করিয়া দেয়, সে বায়ু রাজবাড়িতে পাওয়া যায় না।' কাঞ্চনের পথচলায় কষ্ট, দস্যুহস্তে তার লাঞ্ছনা হরপ্রসাদ বিস্তৃতভাবে বলেছেন। কিন্তু কাঞ্চনমালার দস্যুদল থেকে পরিত্রাণ লেখকের অভিপ্রায় অনুসারেই ঘটেছে। এখানে ঘটনার অবতারণা করেছেন হরপ্রসাদ রোমান্স সৃষ্টির জন্য। এইরকম ঘটনার পর ঘটনা ঘটিয়ে 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসকে জাঁকালো করবার ইচ্ছা ছিল হরপ্রসাদের।

উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক তথ্য খুব বেশী নেই। তবে ইতিহাসের ফল কি হয়েছে তা হরপ্রসাদ দেখিয়েছেন। হিন্দুদের বৌদ্ধবিদ্বেষ ভালোভাবেই দেখিয়েছেন হরপ্রসাদ। অশোকের বিরুদ্ধে এরকম হিন্দুধর্মের ষড়যন্ত্র হয়েছিল কিনা তার যুক্তিগ্রাহ্য কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। সেদিক থেকেও রচনাটি দুর্বল।

হরপ্রসাদ ১২৯০ সালে বঙ্গদর্শনে 'কাঞ্চনমালা' প্রকাশিত হলেও কেন বিলম্বে (১৩২২) বই আকারে প্রকাশ করলেন সে সম্বন্ধে বলেছেন 'কেন, কি বৃত্তান্ত—সে অনেক কথা—বলিয়া কাজ নাই।' কেউ কেউ অনুমান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মনোমালিন্য এর কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত চাননি 'কাঞ্চনমালা' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হোক। বঙ্কিমচন্দ্রের এই না-চাওয়া যদি শিল্পগত কারণ হয়ে থাকে তবে তিনি ঠিকই করেছিলেন।

[৩]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির ভূমিকায় তিনি বলেছেন 'বেণের মেয়ে' একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ-কালের কথা নাই। সব সেই সে কালের, যে কালে বাংলার

সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসা ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। বাঙালী এখন কেবল এ-কেলে 'গণিকাতন্ত্রের' উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সে-কেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন?' হাল্‌কাচালে বললেও হরপ্রসাদ ১৯১৯ সালে যখন বইটি প্রকাশ করেছিলেন তখন বাংলা উপন্যাস আকারে প্রকারে অনেক পাল্টে গেছে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র তখন বাংলা উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত। ছোটগল্প তখন অনেকটাই অগ্রসর। 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হবার আগেই বাস্তব সাহিত্য নিয়ে বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (বর্ধমান, ১৩২১) হরপ্রসাদ সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিরূপতা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে বাংলা সাহিত্য 'চুটকি'তে ভরে যাচ্ছে। ক্ষণস্থায়ী, লঘু সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অনেককেই চটিয়েছিল। হরপ্রসাদ ভাষণে বলেছিলেন, 'কিন্তু চুটকিই কি সমাজের যথাসর্বস্ব হইবে? বড় জিনিষ কি আর হইবে না?' হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও হতাশ হয়েছিলেন। জবাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যঙ্গ কবিতা লিখলেন 'অ'। তাঁর ভাষায়, 'দেখ চুটকি সূত্র গোটা সত্তর লিখিল সাংখ্যকার,/তাই কনফারেন্‌সে ডায়েসের পরে চেয়ার পড়েনি তার।' বলা বাহুল্য, 'বেণের মেয়ে' লেখার আগে হরপ্রসাদ বাংলা উপন্যাস লেখা সম্বন্ধে খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন না। 'নারায়ণ' আর 'সবুজ পত্র' এই দুই পত্রিকায়, যখন দ্বন্দ্ব তুঙ্গে, তখনই হরপ্রসাদের উপন্যাসের সূত্রপাত। সবুজ পত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীও চুটকির জবাব দিয়েছিলেন। এই সময়েই ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণে প্রবন্ধ লিখলেন। গণিকাতন্ত্র সাহিত্য (১৩২৬)। পতিতারা সাহিত্যে উঠে আসছিল এই দেখে রক্ষণশীল সমাজ চমকে উঠেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গণিকাতন্ত্রের উপন্যাস কথাটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এইভাবে। সম্ভবত শাস্ত্রী গণিকাতন্ত্র কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যাঁরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, তাঁরা বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম, গণিকার প্রেম ইত্যাদির মধ্যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে—এরকম আশংকা করেছিলেন। শাস্ত্রী তাঁর উপন্যাসে কাঞ্চনমালা—কুণালের প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা এবং তিষ্যরক্ষার প্রেমের হীনতানীচতার বিবরণ দিয়েছিলেন কাঞ্চনমালা উপন্যাসে। বেণের মেয়েতে তিনি প্রেমকে বর্জন করেননি সত্য কথা। কিন্তু এ প্রেম ভীরু, অনতিস্ফুট, প্রকাশকুণ্ঠ। উপন্যাসে প্রেমকে তিনি বড়ো মাপের জায়গাও দেননি।

উপন্যাসের বিষয়বস্তুই তিনি পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন। শিষ্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ কাজে আগেই ব্রতী হয়েছিলেন। হরপ্রসাদ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের বিষয়কে স্থাপন করলেন 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে। ইতিহাসকে গ্রহণ করলেও বঙ্কিমী উপন্যাসের প্যাটার্নকে তিনি গ্রাহ্য করেননি। রোমান্সকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি ঠিকই কিন্তু এ রোমান্স চাপা, মুগ্ধদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মননের দীপ্তি। বাস্তবতাকে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন এখানে। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কাব্যে সহজ

('সত্যেরে লও সহজে') নৃত্যচপল ছন্দ যেমন তথ্যের নুড়ির উপর দিয়ে বয়ে যায়, হরপ্রসাদের ইতিহাসের তথ্যের মধ্যেও সেই নাচনির ইশারা ইঙ্গিত। যতই হালকাচালে রবীন্দ্রনাথ প্রেম, প্রকৃতির বর্ণনা দিন না কেন সেখানেও রয়েছে রোমান্সের ইশারা ইঙ্গিত। হরপ্রসাদের বাস্তবতার বোধও এইরকম। তিনি সে-কেলে জীবনকে প্রচলিত উপন্যাসের কাঠামোয় ধরতে চাননি। সরলতাই বেণের মেয়ের নির্মিতি।

আরো বিশদ করা যাক। উপন্যাসে মানুষের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়। দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণ সহজ নয়। উত্তরণে আমরা যখন যাই পৌঁছে তখন সেটাই হয়ে ওঠে আর এক দ্বন্দ্বের ছক। এক ছক থেকে বেরিয়ে এসে অন্য এক ছকে পৌঁছে যাওয়ার ঝোড়ো রাস্তাটা যেমন মর্মান্তিক তেমনি ভয়ংকর। উপন্যাসে এই জটিলতাই মুখ্য স্থান অধিকার করে। এমন কি শরৎচন্দ্র যিনি কিছুটা সরল, তিনিও জটিল মানুষকে পরিহার করতে পারেননি। মধ্যবিত্ত সমাজের যে-অর্থে আমরা সংকট বলি হরপ্রসাদের সময়ে সে অর্থে সংকট ছিল না হয়ত। তবু নাগরিকতা লোভজটিলদ্বন্দ্বকে ঘনিয়ে তুলেছিল কিছুটা। এই স্বাভাবিক। আবার কিছুটা অস্বস্তিকরও বটে। মানুষকে পরিবর্তন মানতেই হয়। কিন্তু কিছু মূল্য দিয়ে। বোঝাপড়া করতে হয় নিজের সঙ্গেই। হরপ্রসাদ ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দের মানুষ। ঊনবিংশ শতাব্দের মূল্যবোধের যে মডেলে তিনি দীক্ষিত এবং শিক্ষিত, সে মূল্যবোধে গ্রহণ-বর্জন ছিল, ভালোমন্দের প্রান্তগুলি স্পষ্ট ছিল। বড়ো মাপের আদর্শকে লালন করতে কিছু মানুষ ভালোবাসতেন। সে আদর্শের বাস্তব দৃষ্টান্ত কোথাও না থাকলেও হরপ্রসাদ সেই আদর্শে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণের একটি বৈশিষ্ট্য তিনি অর্জন করেছিলেন। আপোষ তিনি করতেন না। সেজন্যে হরপ্রসাদ একালে বসে একবার সেকালকে দেখতে চেয়েছেন। যেই সেকালের সব কিছু তাঁর ভালো না লাগলেও সেকালের সমাজে ভারসাম্য ছিল। জটিলতা ছিল না এমন নয়। কিন্তু সে জটিলতা উপরিতলে উঠে আসত না। একালের তুলনায় হরপ্রসাদ সেই সরল সমাজকে স্পর্শ করতে চাইছেন। হরপ্রসাদ কেমন অনায়াসে বলতে পারেন সেকালে গোলাভরা ধান ছিল, শিল্প ছিল ইত্যাদি। এই বিশ্বাসে কোনো দ্বিধা ছিল না হরপ্রসাদের। একথাও হরপ্রসাদ বলেছেন তাঁর উপন্যাসটি সহজিয়াতন্ত্রের কথাটি দ্ব্যর্থ। এক অর্থে সহজ সরল। অন্য অর্থে সহজিয়াপন্থার সাধনার কথা। উপন্যাসে সহজিয়াসাধক এবং বৌদ্ধদের বিহার, মহাবিহার এবং সাধক লুই সিদ্ধার কথা বিস্তৃত ভাবেই আছে। অবশ্যই সহজিয়া সাধনা উপন্যাসটির একটি অংশ মাত্র। সেকালের জনজীবনই মুখ্য। যা শাস্ত্রী মশায়ের মতে সহজ। নাগরিকতার সংশয় জটিলতা সেখানে নেই। হরপ্রসাদ বলেছেন 'বেণের মেয়ে' ইতিহাস নয়। এটা সেকালের গল্প। পাথুরে প্রমাণ এতে। 'বিজ্ঞান-সঙ্গত' তথ্য নিষ্ঠারও অভাব আছে এখানে। একজন ইতিহাসবিদ যেন এই কথা বলেন? তাঁর বক্তব্যের ঈষৎ ঝাঁঝালো ভঙ্গি দেখে মনে হয় তিনি 'আজকালকার' ইতিহাস রচনা পদ্ধতির সঙ্গে ঠিক একমত নন। শাস্ত্রী মশাই দোহাকোষ, চর্যাগীতি, রামচরিত মানস, তাঁর দ্বারা বৌদ্ধতান্ত্রিকদের নানা

আবিষ্কৃত পুঁথি, সৌন্দরানন্দ কাব্য, বিদ্যাপতির কীর্তিলতা-কে ইতিহাসের উপাদান-রূপেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। পাথুরে প্রমাণ অপেক্ষা সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ জীবনের স্পন্দন এসব আবিষ্কৃত রচনায় রয়েছে। হরপ্রসাদের সৃজনশীল মন সেকালের কল্লোলকোলাহলকে অনুভব করল এসব রচনায়। অথচ সমগ্র জীবনের টুকরো টুকরো চিত্রচরিত্র আছে এসব রচনায়। এইসব উপাদানকে তিনি ব্যবহার করেন তাঁর উপন্যাসে। সূত্রধারের মতো তিনি প্রাপ্ত তথ্যকে মালার রূপ দেন। যেখানেই প্রয়োজন বোধ করেছেন, সেখানেই কল্পনাকে যুক্ত করেছেন। সে কল্পনাও নিয়ন্ত্রিত। তথ্যের পুঞ্জই কল্পনাকে অবাধ হতে দেয়নি।

যে উপাদান হরপ্রসাদ সংগ্রহ করেছিলেন তার চাপ তিনি অনুভব করেছেন ঠিকই। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসও গড়ে উঠেছিল। সেকালটা হরপ্রসাদের কাছে ছিল হস্তামলকতবৎ। আস্তে আস্তে তিনি সেকালের মর্মে পৌঁছে ছিলেন। তিনি সেকালের কবি লেখকের সমপর্যায়ে উঠে এসেছিলেন। সুকুমার সেন বলেছেন, 'বেণের মেয়ে' Creative History. হরপ্রসাদ নিজেই ইতিহাস রচনায় ব্রতী হলেন এইভাবে। এ ইতিহাস গল্প কেন? কেননা এ বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস নয়। কিন্তু কবি লেখকের আহৃত ইতিহাস। আসলে কথাসাহিত্য তো সমাজের ইতিহাসই। 'বেণের মেয়ে' সেই জাতীয় ইতিহাস। বিভিন্ন উপাদানে শাস্ত্রী আখর, তুক, ছুট জুড়ে দিয়েছেন। আমাদের মনে পড়তে পারে কীর্তনের কথা এইখানে। কীর্তন যে উপন্যাসে উঠে এসেছে (লুই সিদ্ধার এবং অন্যান্যদের গানে) এই উপন্যাসে তা স্বাভাবিক। হরপ্রসাদ সেই কীর্তনের ব্যাখ্যাও করেছেন যেমন সম্প্রসারিত করেন কীর্তনীয়ারা পদকর্তার পদাবলীকে আখর তুক-ছুট দিয়ে। কিন্তু হরপ্রসাদ উপন্যাস কথনে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি নিয়েছেন। আমাদের এও মনে পড়ে যায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কথনে চারণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। হরপ্রসাদও তেমনি একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই ভূমিকা কথকের। কথকতা জনশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম। কঠিন বস্তুও কথকের কথকতায় সরল হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে শ্রোতার যখন ক্লান্তি আসে তখন কথক চমক সৃষ্টি করেন। চমকে দিয়ে শ্রোতার চটকা ভেঙে দেন। হরপ্রসাদ যে গ্রন্থের সর্বত্র কথকতা করেছেন এমন নয়। কখনও কখনও ব্রতকথা, উপকথার ভঙ্গিও উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। মস্করীর মায়া-কে স্বামীর চিত্রপ্রদর্শন এবং মায়ার স্বামীর মূর্তিনির্মাণ বৃত্তান্তে উপকথার রীতি চলে আসে। আবার ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে রহস্যভঙ্গিমা কালের, বোধের মডেলটিকে রচনা করে, হরপ্রসাদও সেরকম রহস্যের জাল বুনেছেন। একালের পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে তুলতেও ঘটনাটিকে অযথা রূপকথা পর্যায়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঠেলে দেননি। আবার রূপকথার সঙ্গে মিলও যে নেই এমন কথাও জোর করে বলতে পারি না। সুন্দরবনের কাছে এসে নদীর চরে মায়া যখন ঝিনুক কুড়োতে গেল তখন তার সামনে এসে দাঁড়াল বাঘ। আর সেই মুহূর্তে আমরা পেয়ে যাই রাজপুত্র (এখানে অবশ্যই বণিকপুত্র) জীবনকে। জীবন তীরবিদ্ধ করল বাঘকে

আর মায়া বেঁচে গেল। কন্যাসিদ্ধার এক কন্যাপ্রাপ্তির এমন অভিনব ঘটনাটি এই উপন্যাসে জায়গা পেয়ে যায়। একি ধর্মমঙ্গলের (হরপ্রসাদ ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন) বাঘবধপালা? বুদ্ধিমান পাঠক উপন্যাসে এসব প্রসঙ্গের অবতারণাকে নিশ্চয়ই লেখকের পক্ষে একটা বড়ো ঝুঁকি নেওয়া বলে গ্রহণ করবেন। হরপ্রসাদ জানতেন না—এমন মনে হয় না। তিনি এও মেনে নিয়েছিলেন যে সহজিয়াতন্ত্রে এরকম ঝুঁকি নেওয়া অনিবার্য।

আবার হরপ্রসাদ সে-কেলে জীবনকে স্পর্শ করতে গিয়ে সে-কেলে কবির প্যাটার্নই সন্ধান করেন। বিহারী দত্তকে বাণিজ্যে পাঠিয়েছেন কবি। আমাদের মনে পড়তেই পারে বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার কথা। মঙ্গলকাব্যের কবিরা যখন চাঁদ সদাগর, ধনপতি-শ্রীপতিকে বাণিজ্যে পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁদের স্মৃতিতেও বিদেশবিভুঁয়ের জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল না। তার কিছুটা আন্দাজ, কিছুটা কল্পনা কিছুটা আশাকে ভাষা দিতে চেষ্টা করেছেন। হরপ্রসাদ তার সঙ্গে জুড়ে দেন দ্বীপময় ভারতের কিছুটা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞান। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবিদের মতোই তিনি গদ্যে কথকতা করেন। সমুদ্রযাত্রার ছোটো-বড়ো ঢেউয়ের ওঠানামার মতোই হরপ্রসাদের সমুদ্রের বর্ণনা। নৌকার আকার প্রকার, নৌকার শ্রেণীরূপ, তার নির্মাণ কৌশল। মাঝিমাল্লাদের কাহিনীগুলি উঠতে পড়তে থাকে। এমন কি সমুদ্রে সূর্যোদয়ের কবিসুলভ নয়, গদ্যকাহিনীর কথক রূপে হরপ্রসাদ চমৎকার বর্ণনা দেন। ধনপতি-শ্রীপতির মতো বিহারী দত্তের কমলেকামিনী দর্শন হয়নি ঠিকই কিন্তু বিদেশ থেকে ফেরার পথে সামুদ্রিক ঝড়ের যে উথালপাতাল রূপের বর্ণনা দিয়েছেন হরপ্রসাদ তা যেমন ভয়জাগানো তেমনি চিত্তকাঁপানো। ভর্তিতেলের পিপেগুলো থেকে তেল ঢেলে দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ সামলানো এ হরপ্রসাদেরই আবিষ্কার। আশ্চর্য সুন্দর এই বর্ণনা। সেকালের বণিকজীবন মূর্ত হয়ে ওঠে হরপ্রসাদের রচনায়। বলা বাহুল্য, সেকালের কথা শুনতে হলে সংস্কার প্রয়োজন। মঙ্গলকাব্যের বর্ণনার সূত্রে সেই প্রসঙ্গেই চলে আসে। হরপ্রসাদ ধর্মমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত যুদ্ধবর্ণনার কিছু চিত্র পেয়েছিলেন। সেই চিত্র এবং বাংলার লৌকিক ছড়ায় প্রাপ্ত ইতিহাসের ইঙ্গিত অবলম্বন করে রূপা বাগদির যুদ্ধসজ্জা এবং যুদ্ধোদ্যোগ পরিস্ফুট করলেন উপন্যাসে। 'আগডোম বাঘডোম ঘোড়াডোম' শব্দ তিনটিকে বাগদি এবং ডোম সৈন্যের কথা বলা হয়েছে বলে ধরে নিলেন। 'বামনপাড়া' ব্রাহ্মণপাড়ার প্রতিশব্দ। হরপ্রসাদ হিন্দু বৌদ্ধ সংঘাতকে রূপ দিলেন দুইয়ের মিশেল দিয়ে। এরকম মিশ্রণ আরও আছে। হরপ্রসাদের 'ইতিহাসে' লৌকিক ছড়ার মূল্যও কম নয়। সে যাই হোক, ধর্মমঙ্গল কাব্যের উপর নির্ভর করে হরপ্রসাদ রূপা রাজার এবং তার সেনাপতি মেঘার উত্তাপ-উত্তেজনাকে প্রকাশ করলেন। সঙ্গে তিনি কথকতার চমক সৃষ্টি করলেন এই বাক্যে—রাজা হুকুম দিলেন 'সব বাগদি সাজো।' শ্রোতাও সচকিত হয় রাজার হুকুমে।

আগে বলেছি হরপ্রসাদের কিছু পুঁথি আবিষ্কারের কথা। শাস্ত্রী মশাই কিন্তু কেবল পুঁথির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেননি। সেকালের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য-শিল্পের প্রতিও তিনি মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। একালের ইতিহাসবিদ্‌ও তাই করেছেন। নগরপরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই দুটির শিল্পজ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান। হরপ্রসাদ এই মূল্যবান উপাদানকে ব্যবহার করে বাংলার অন্তরঙ্গ জীবনকে ঘনিষ্ঠ করতে পেরেছিলেন। আমরা জানি উপন্যাসে স্থানকালপাত্রের পরিচয় আবশ্যিক। একথাও সকলে জানি কোনো কোনো ঔপন্যাসিক এই স্থানকালকে ভেতর থেকে জানবার জন্য নির্বাচিত স্থানে বসবাস করেন, সেই স্থানের মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় নেন। উপন্যাসে অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিসীম। একালে সমরেশ বসু যখন 'টানাপোড়েন' উপন্যাস লেখেন অথবা তিনি যখন 'গঙ্গা' উপন্যাসে মাছমারাদের কাহিনী রচনা করেন তখন খুঁটিনাটি তথ্যের উপর কি শ্রমসাধ্য যত্ন নেন! শাস্ত্রী মশায়ের পক্ষে এ সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওঁর অধ্যয়নের পরিধি এবং ভালোলাগা এতই আন্তরিক ছিল যে তিনি অনায়াসে সেই কালের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারতেন। মঙ্গলকাব্যে চৌতিশা, নারীগণের পতিনিন্দা, সেকালের বিদ্যাচর্চা, সাধভক্ষণ, বৃক্ষরাজি, পাখপাখালির ডিটেল বর্ণনা আছে। আমাদের সামনে ঝিকিয়ে ওঠে সেকাল।

হরপ্রসাদ সেকালকে তাঁর অভিজ্ঞতার (অবশ্যই অন্যতম হল পুঁথিপাঠ) দ্বারা বর্তমানের কাছে পেঁাছে দিতে পেরেছেন। আর সেকালকে কি আমরা পুরোপুরিই নির্বাসনে দিয়েছি? বলা বাহুল্য, তা সম্ভবও নয় পারাও যায় না। মস্করী যখন মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য পুজোর আয়োজন করলেন তখন শাস্ত্রী এই পুজোর উপকরণ উপাদান সাজিয়ে তোলেন। টাটকা গব্যঘৃত, বেলপাতা, ফুল, চন্দন, বেলকাঠ-তুলসীকাঠ, আলোচাল, যব, তিল, আপাঙের গাছ, আপাঙের শিকড়, আপাঙের শিষ—শাস্ত্রী মশাই সবের কথাই বলেন। 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের এই হচ্ছে প্যাটার্ন। হরপ্রসাদ যখন রাজসভা, বাড়িঘর, বিহার-মহাবিহার, উৎসব-অনুষ্ঠান, চণ্ডীমণ্ডপ, ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা, স্মৃতির বিচার ইত্যাদির কথা বলতেন তখন তাঁর খুঁটিনাটি উপাদানের প্রতি অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক থাকতেন। কি অক্লান্ত উৎসাহে তিনি এসবের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

একালে নলেজ বুমের (Knowledge boom) কথা বলা হয়। মানুষের জানার পরিধি যতই বাড়ছে ততই সে তৃষ্ণা তাকে অস্থির করে তুলছে। সংবাদপত্র সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। উপন্যাসেও তার বিস্তার। এজন্যে উপন্যাস হয়ে উঠছে ডকুমেণ্টারি। এর মূল্য আমরা দিয়ে থাকি। শাস্ত্রীর উপন্যাস একদিক থেকে ডকুমেণ্টারি উপন্যাস। তিনি একের পর এক সংবাদ উপস্থিত করেন। সুরু হল সাতগাঁয়ের বিবরণ দিয়ে। তখনকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বন্দর। তারপর চলে আসে রূপা রাজার বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব আয়োজন। সেই টানে চলে

আসে লুইসিন্ধা, তাঁর চেলা, লুইসিন্ধার খাদ্যের বিবরণ, চাকতে পুকুরভর্তি মাছের কথা, এক মণের কম ওজনের মাছকে ছেড়ে দেওয়া, নিমন্ত্রণে বসবার জায়গা, সেখানের বাছবিচার ইত্যাদি। কোনো পরিচ্ছেদে আমরা চলে আসি সেকালের পণ্ডিত সমাজের দৈনন্দিন জীবনের কথায়। তাদের শাস্ত্রবিচারের উৎসাহ, কোন বৌদ্ধপণ্ডিত কতকগুলি সূত্র উপেক্ষা করেছেন, কেন করেছেন তার বিশদ বিবরণ। আবার আমরা চলে আসি সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের কথায়। তাঁর বিবেচনা, রাজার সঙ্গে তার রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি নিয়ে কথাবার্তা, প্রয়োজনে দূরদূরান্তে দূত প্রেরণের কথা—এসবের প্রতি শাস্ত্রী মশাই কৌতূহলী হয়েছেন, আমাদের কৌতূহলকে জাগিয়েছেন। রাজা হরিবর্মা কেমন করে মন্ত্রীদের সাহায্যে রাজত্ব চালাতেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন শাস্ত্রী। ভবদেব ভট্টের অফিসের কথায় আসি। শাস্ত্রী লিখছেন 'বজরায় একটি আপিস ; একজন বৃদ্ধ কায়স্থ, তাহার নীচেও অনেকগুলি কায়স্থ, সবাই নিরন্তর ঘাড় গুঁজিয়া লেখাপড়া করিতেছে। ভবদেবের কাছে দিনরাত্রি লোক আসিতেছে। বিহারী প্রায়ই আসিতেছেন ; পরামর্শ করিতেছেন। গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য কোনো কাজেই ভবদেব বজরা হইতে নামেন না।' হরপ্রসাদ 'অফিস' কথাটি ব্যবহার করে একালের পাঠকের কাছে সেকালের কোর্টকাছারি কোনো অংশে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ব্যাপার যে নয় তা বুঝিয়ে দেন। ভবদেবের অফিসে এক সঙ্গে অনেকগুলি বিভাগের কাজ চলে। সেরকম একটি দিনের কাজ কর্মের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে শাস্ত্রী কৌতূহলী হয়েছিলেন।

রূপা রাজার পরাজয়ের পর নগরে যখন শান্তিস্বস্তি ফিরে এল তখন ভবদেব রাষ্ট্র এবং সমাজের শাসন প্রণালীতে মনোযোগ দিলেন। হরিবর্মার সঙ্গে তিনি যুক্তি করলেন। হরিবর্মাকে তিনি পরামর্শ দিতে লাগলেন। আমরা পেয়ে যাই সেকালের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সমাজবিন্যাসের একটা নিখুঁত চিত্র। ২৩৮ খানা গ্রামের মধ্যে ১৫০ খানা রণশূরের এক্তিয়ারে রাখা হল। ৮৮ খানা গ্রাম রাজা নিজের কাছে রাখলেন ঘাঁটি আগলানোর জন্য। রূপা রাজার পরিবারবর্গের জন্য পেনসন দেওয়া হল মাসিক এক হাজার টাকা। ব্রাহ্মণদের পুরস্কারের ব্যবস্থা হল। সেখানে একটু কল করা হল। প্রান্ত ব্রাহ্মণের জমির মাঝখানে বৌদ্ধবিহার থাকবে। বৌদ্ধবিহারের এখন ভগ্নদশা। এরা নিশ্চিহ্ন হলে বিহারের জমি ব্রাহ্মণরা অধিকারে চলে আসবে। এখানে সেকালের সমাজব্যবস্থার কথা হরপ্রসাদ খুঁটিয়ে বললেন। এক সময় ছিল সমাজ থেকে ভিক্ষু সংগ্রহ করা হত, এখন বিহার থেকে ভিক্ষুরা সমাজে চলে আসছে। (হরপ্রসাদের এই সমাজবীক্ষণ ইতিহাসের দিক থেকে এখন পরিত্যক্ত)। যাই হোক সমাজের এই পরিবর্তন ভবদেব বিশ্লেষণ করলেন। এবং তিনি বৌদ্ধভিক্ষুদের সম্পর্কে একটা ব্যবস্থাও করলেন। বেণেরাও পুরস্কৃত হল। তারা মাশুলের পরিবর্তন চাইলেন। তাও গৃহীত হল। এভাবে তাঁতি, গোয়ালা, সদ্গোপ, ব্রাহ্মণ, কলু, মালাকর, নাপিত, জেলে সকলের স্থান নির্দিষ্ট করে ভবদেব সমাজের ভারসাম্য রক্ষা

করলেন। হরপ্রসাদ বহিরঙ্গ বিবরণে নয়, সমাজের বিভিন্ন জাতির সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব কোথায় কোথায় তা দেখিয়ে দিলেন। তিনি যখন উপন্যাস রচনা করেন, তখন জাতির বিন্যাসের এই ছক অবিকৃত ছিল না। না থাকবারই কথা। কিন্তু শাস্ত্রী এখানে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হয়েছেন। সেকালের সমাজবিন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি পক্ষপাত দেখাননি। একালের সমালোচনাও করেননি। তাঁর পয়েণ্ট অফ ভিউ একজন ঐতিহাসিকের এবং নিরপেক্ষ ঔপন্যাসিকের। ভবদেবের বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতি একটু নিরুত্তাপ। অভিভাবকের ভূমিকায় ভবদেবকে পাই আমরা। রাজা থেকে অন্ত্যজ পর্যন্ত সকলেই তাঁকে মান্য করেন। বস্তুত আমাদের সমাজবিন্যাসের যে একটা উত্তাপবিহীন একটানা গতি ছিল একথা তো সত্য। সামন্ততান্ত্রিক রাজত্বের চেহারাই পাই আমরা এখানে। নিশ্চয়ই তার আর একটা দিকও আছে। তার উল্লেখ এই উপন্যাসে নেই। অর্থাৎ আধুনিক গবেষণায় সাধারণ মানুষের শ্রম, উৎপাদন ব্যবস্থা, ভোগ্য পণ্যের পরিমাণ, ভোগ্য পণ্যের বণ্টন ব্যবস্থার যে জটিল প্রকরণ পদ্ধতি তার উল্লেখ এ গ্রন্থে নেই। ঐতিহাসিক আশরাফ (আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়) ভারতীয় জনজীবনের যে বৃত্তান্ত আমাদের জানিয়েছেন সে সব প্রসঙ্গ বেণের মেয়ে উপন্যাসে নেই। হরপ্রসাদ ভূমিকাতে সেকথা বলে নিয়েছেন।

'বেণের মেয়ে' উপন্যাস বাংলাদেশের ইতিহাস (এ ইতিহাসে তথ্যের ভুলভ্রান্তি, কালানৌচিত্য দোষ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা-সংগ্রহের সম্পাদক। আমার 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থেও কিছু আলোচনা আছে) হরপ্রসাদ যে কালটিকে নির্বাচন করেছিলেন তা একদিক থেকে যুগসন্ধির কাল ভারতবর্ষের তখন রাজনৈতিক পরিবর্তন আসন্ন। ইসলাম ভারতবর্ষের দ্বারে। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজারা এ বিষয়ে শঙ্কিত। শাস্ত্রী সেকথা ভোলেননি। হরিবর্মার রাজ্যকালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। তার জন্য মন্ত্রী ভারতের স্থানীয় গুণীদের আমন্ত্রণ জানাতে বাংলাদেশ ত্যাগ করলেন। উপন্যাসের পটভূমি পরিবর্তিত হল। উপন্যাসের চরিত্র পরিবর্তিত হল না বটে কিন্তু আঞ্চলিক চেহারাটা পাল্টে গেল। এইভাবেই হরপ্রসাদ ভারত পরিক্রমাকে স্থান দেন উপন্যাসে। পথে তাঁর সঙ্গী কুইন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হল ভ্রমণ পিপাসুর [illegible]। এবারে আবার ভ্রমণ [illegible] এই উপন্যাসে। ভ্রমণ কাহিনী [illegible] [illegible] হয়েছে এই উপন্যাসে। বিক্রমশীলা হয়ে [illegible] যাত্রা [illegible] বিহার অঞ্চলে। সীতাকুণ্ড ঘুরে [illegible] গেলেন। সেখান থেকে ওদন্তপুরে। এখানে হরপ্রসাদ ওদন্তপুরীর বিহারের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করলেন। বিহারের মূর্তিশিল্পে কষ্টিপাথরের ব্যবহারের কথা তিনি এক ফাঁকে তুলে ধরেন। দুহাজার বৌদ্ধভিক্ষু থাকতে পারেন এমন ব্যবস্থা আছে ওদন্তপুরীর বিহারে। এই বিহারে 'কোনো কোনো জায়গায় বা যাত্রীর সব সরঞ্জাম, কত কত আসা, কত কত সোঁটা, কত কত নিশান, কত কত খুন্তি, কত কত অর্ধচন্দ্র, রুপার

সোনার রাশি রাশি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি—কাহারো হীরার চোখ, কাহারো পান্নার চোখ, কাহারো নীলার চোখ। এই বিহারের ভাণ্ডারে রাশি রাশি তালপাতার পুঁথি ছিল, সিন্দুক-ভরা কাবচুপি করা রেশমের কাপড় ছিল। শত শত চামর ছিল, আর ধূপদান ও দানপত্র যে কত রকমের কত ছিল, তাহা ঠিক করিয়া উঠা যায় না।' উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। হরপ্রসাদ যেন গাইডের ভূমিকায়। প্রাচীন ভারতের গৌরব যাত্রীদের সামনে তুলে ধরেছেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতের শাস্ত্রচর্চার চকিত চিত্র উদ্ঘাটন করে শাস্ত্রী নিয়ে চললেন নালন্দায়, নালন্দার রাস্তা, বিহার, বিহারের পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। চলে যান তারপর তিনি সিলাওতে। এরপর চলে এলেন রাজগিরে। কিছু জৈনধর্মীরও সাক্ষাৎ পেলেন। পিশাচখণ্ডী জৈনদের সঙ্গে মিশলে বৌদ্ধরা খেপে গেলেন। পিশাচখণ্ডী গয়ায় পৌঁছলেন। গয়া থেকে পাটনায়। সেখান থেকে কাশী। কাশীর পর কনৌজ। শাস্ত্রী একের পর এক ভারতের চিত্র উদ্ঘাটন করলেন। বলা বাহুল্য বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের এবং সমারোহের ক্ষুদ্র এক পরিচয়পত্র পাই এখানে আমরা। এ ভ্রমণ বৃত্তান্তে চমকপ্রদ কিছু নেই। কিংবা প্রাচীন গৌরব-ঐশ্বর্য আস্বাদনে হরপ্রসাদ বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছেন না। অথবা উপমা অলংকারে বর্ণনায় দীপ্তি সঞ্চারের প্রয়াসও নেই। যা ছিল তারই হুবহু বর্ণনা দিতে চেয়েছেন শাস্ত্রী। অন্ধকার শিসমহলে গাইড ঝটিতি দেশলাই জেলে চকমকির প্রবাহ দেখান কৌতূহলী যাত্রীদের। যাত্রীরা দিশেহারা হন। অভিভূত হয়ে বাদশার ঐশ্বর্যের পরিমাপ করেন। শাস্ত্রী দেশলাই জ্বালেন না। হঠাৎ চমকে দেন না। একের পর এক বিবরণ দেন। ওদন্তপুরীর বিহারের উদ্ধৃত অংশটির শিল্পকৌশল আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কোনো অলংকারই ব্যবহার করেন নি শাস্ত্রী। সংবাদপত্রের ভাষার মতো তথ্যের জোগান মাত্র। রোমান্টিক কল্পনায় অসাধারণত্বের প্রকাশ ঘটাননি তিনি। বাস্তব বর্ণনার সূত্রটি তিনি হারিয়ে ফেলেন না। এখানে ইতিহাসবিদের ভূমিকাই তিনি পালন করেন। তথাপি হীরা পান্না নীলার চোখকে তিনি ভোলেন না। আর 'কত কত' 'রাশি রাশি', 'সিন্দুকভরা' শব্দপ্রয়োগে তিনিও অজস্রতার, সমারোহের ইশারা দেন। সমগ্র গ্রন্থেই শাস্ত্রী এই ভাষা ব্যবহার করেন। তিনি তো কথক। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কথকরা রামায়ণ-মহাভারতের (কৃত্তিবাস-কাশীরামদাস) স্তন্যে লালিত। অনায়াস বিশ্বাস তাঁদের। হরপ্রসাদের লেখায় সেই বিশ্বাস। যখন সে বিশ্বাস অর্জিত হয় তখন 'কথা' অনায়াসে ফুটে ওঠে। বক্তব্যকে বোঝানোর জন্য ভাষাকে উত্তেজিত করতে হয় না। শ্রোতাকে বশে আনবার জন্য বক্তাকে উচ্চকণ্ঠ হতে হয় না। ভাষার ওপর রঙ ফলাতে চান না। শাস্ত্রীর ভাষা নিরলঙ্কৃত এই কারণে। আর যখন একটু অলংকারের ছোঁয়ার প্রয়োজন হয় তখনও তিনি পরিচিত জগৎকে ভোলেন না। বালিকার মায়ার কাছে এ জন্যই সূর্যকে মনে হয়েছিল কলসের মতো। মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইল হরপ্রসাদকে প্রলুব্ধ করেছে। সেখানেও ভাষা

'অতিরিক্ত' (fine excess) কিছু বলতে কুণ্ঠ 'সকলেই সাজিতেছে, নিতান্ত শিশু ও বৃদ্ধ, নিতান্ত কানা, খোঁড়া, আতুর ও অন্ধ ছাড়া সকলেই সাজিতেছে। জাতিভেদও মানিতেছে না। ব্রাহ্মণও সাজিতেছে, ক্ষত্রিয়ও সাজিতেছে, বৈশ্যও সাজিতেছে, শূদ্রও সাজিতেছে, পাহাড়িও সাজিতেছে'। 'সাজিতেছে' ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রস্তুতির যেন সাড়া পড়ে যায় ক্রিয়াপদের এই জাতীয় ব্যবহারে। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য ভাষায় এই কৌশল খুবই লক্ষনীয়। পিশাচখণ্ডী কাশীতে থাকার সময় পাণ্ডাবের দূত সেখানে এসে পিশাচখণ্ডীকে বলল 'প্রবল শত্রু হিন্দুদিগের সীমান্তে হানা দিতেছে। পূর্বেও অনেকবার এরূপ হানা দিয়াছে। কিন্তু যাহারা দিয়াছে, তাহারা ঠাকুর মানিত, দেবতা মানিত, ব্রাহ্মণ মানিত, প্রতিমাপূজা করিত, আগুনপূজা করিত, সূর্যপূজা করিত, জলপূজা করিত, মাটিপূজা করিত, অনেক বিষয়েই আমাদের মতোই ছিল'। এই বিবরণেও 'মানিত' এবং 'করিত' ক্রিয়াপদ দুটি শাস্ত্রী ব্যবহার করেন ভারতীয় এবং অভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন দিকের সাদৃশ্য দেখাবার জন্য। এতবার 'মানিত' এবং 'করিত' বলার ফলে এই বোধই পাঠকের চিত্তে জাগতে থাকে যে বিদেশি হলেও দুই দেশির মধ্যে ঐক্যটাই বেশি।

হরপ্রসাদ জানতেন তিনি অতীতের বাংলাদেশের দেশকালপাত্রের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করছেন। এ কাহিনী যতই সে-কেলে হোক, পড়বে কিন্তু একালের পাঠকই। এখানে একটু ভাবতে হয়। আসলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজে যতই পরিবর্তন আসুক তার ভাবাকাশ বিশেষ বিশেষ ভাবনায় বিস্তৃত। সাংসারিক নিয়মে-বাঁধা বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের চৌহদ্দিতে আমরা পাব হিসেবনিকেশ, শ্রমক্লান্তি, খাওয়াদাওয়া, ছোট ছোট আমোদপ্রমোদের আয়োজন। বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামও যেমন আছে তেমনি মানিয়ে চলার আগ্রহও কম নয়। বাধ্য হয়েও অনেক সময় মানিয়ে নেওয়াটাই ধর্ম। এই মধ্যবিত্ত রবিনসন ক্রুসোর একঘেয়ে জীবনযাত্রার কাহিনী শুনে যায়। শুনে যায় এই জন্যে যে বাঁচার জন্য সেও এইভাবে সংগ্রাম করে এবং রোজই পরের দিনের ভাবনার সঞ্চয়ের জন্য অস্থির হয়। তুচ্ছতার মধ্যেই সে নিজেকে পেয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই তুচ্ছই তার কাছে আর তুচ্ছ থাকে না। এ তার জীবনের নিত্যসঙ্গী, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হরপ্রসাদ এ ব্যাপার জানতেন। সেজন্য সেকালের চণ্ডীমণ্ডপের বর্ণনায় তাঁর এত উৎসাহ। তিনি বর্ণনা করছেন এইভাবে 'চণ্ডীমণ্ডপটির দক্ষিণদিকেও দুই ধারে দুই হাত করিয়া দেওয়াল দেওয়া। মাঝে যেটুকু ফাঁক, সেটুকুতে দুইটা মোটা মোটা শালের খুঁটি, তাহার উপর বিচিত্র কাজ করা। কাঠের উপর নক্সা করিতে ভুরসুটের লোক সিদ্ধহস্ত ছিল। খুঁটি দুটির উপর দুইখানি আড়া, আর দক্ষিণের দেওয়াল দুটির উপর দুইখানি আড়া এই চারি আড়ার উপর চারি খানি প্রকাণ্ড চালা। আড়ার শাল কাঠেও কাজ করা। আড়ার ওপর তীর, তার ওপর আবার আড়া, তাহার উপর মাঝখানে একটি তীরের উপর মাথালির বাঁশ। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে, বারান্দার

দক্ষিণদিকে সব শালের খুঁটি, পূব-পশ্চিম সব খোলা। বারান্দার পূর্ব-পশ্চিম দিকের শেষে দুটি মাটির তাকিয়া করিয়া দেওয়া আছে'। পূর্ব-পশ্চিম দিক, শালের খুঁটির সংখ্যা, আড়ার উপর আড়া, কাঠির নক্সা, নক্সার কারিগর, মুথালির বাঁশ—এইসব ডিটেল চিত্র মধ্যবিত্তের বাড়ি নির্মাণের স্বপ্নকে উসকে দেয়। বাস্তবকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন সোজাসাদা চোখে। বাঙ্গালীর জীবনকে দেখার এই দৃষ্টি একটু অভিনব। পল্লীগ্রামের এই বর্ধিষ্ণুচিত্র আমাদের তৃপ্তি দেয়। রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামের (আধুনিক-পূর্ব) যে ছবি কল্পনা করতে ভালোবাসতেন হরপ্রসাদের রচনায় তারই একরকমের প্রতিফলন। বিশেষত সমাজে গুণীজনের মানসম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ভালোবাসার যে বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তায় পাই শাস্ত্রীর ভবদেব ভট্ট পরিকল্পনায় তারই বাস্তব রূপ আমরা দেখতে পাই। লক্ষনীয়, কেউ কেউ মনে করেন, যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় বাঙ্গালীর আমরা নাম করতে পারি ভবদেব ভট্ট তার মধ্যে অবশ্যই একজন। অথচ হরপ্রসাদ কোথাও ভবদেবকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেননি। এই ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া দরকার। ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রধানতঃ ঐশ্বর্য সমারোহকে (রামগতি ন্যায়রত্নের 'ইলছোবা' উপন্যাসের মতো ব্যতিক্রম বাদ দিলে) মুখ্য স্থান দিয়েছে। মোগল-পাঠান ঐশ্বর্যের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বিলাসব্যসন সে সব উপন্যাস পাঠকের চিত্তকে বিস্ময়ে হতবাক করে। সম্রাট, নবাব, মন্ত্রী, ওমরাহ, বেগম, নর্তকী, হীরামুক্তামাণিক্য ঐসব উপন্যাসে ঢল নামায়। কিন্তু হরপ্রসাদ ভবদেবের যে চিত্র পরিস্ফুট করেন তাতে এমন কিছু নেই যাতে আমরা বিস্মিত হতে পারি। তাঁর ব্যবহার, কথাবার্তা একান্তই আটপৌরে। একের পর এক কাঠিন, জটিল, সরল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কূটনীতি আলোচনা করছেন। বৌদ্ধসংস্কৃতির অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ভবদেব ভট্ট সাধারণ ভাবে। নিরুত্তাপ, নিরুত্তেজ ভাব ভবদেবের আচরণে। পিশাচখণ্ডীর উত্তর ভারত পরিক্রমায়ও আমরা সেরকম সাদামাঠা রূপই পাই। আসন্ন মুসলমান আক্রমণের উত্তেজনা প্রকাশের ভাষায় কিছু দীপ্তি সঞ্চারিত হয় বটে, সেখানেও পিশাচখণ্ডী অতি শান্তভাবে ভাবেন। 'রাজসভার পর বাংলাকেও দেশরক্ষায় মাতাইতে হইবে। হয়তো নিজেও যুদ্ধে যাইতে হইবে'। হরপ্রসাদের ভাষাও সরল হয়ে আসে। যুক্তাক্ষরকে তিনি ভেবে-চিন্তে বর্জন করেন। তিনি তো কথক। খুব সাধারণ মানুষের কাছে তিনি সেকালের ইতিহাসকে পেঁছে দিতে চাইছেন। অতএব যুক্তাক্ষর বর্জন তিনি সচেতন ভাবেই করেছেন। অন্যদিকে তিনি বর্জন করেন সমাসবদ্ধ পদ। 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে সমাসবদ্ধ পদ্ধ বিরলদৃষ্ট। ভাষার উপর দখল না থাকলে এ অসম্ভব কাজ। সাধুভাষায় এই স্যবলীল অনায়াস গতি সম্ভব হয় যুক্তাক্ষর ও সমাসবদ্ধ পদ বর্জনের ফলেই। ভাষাকে গতিসম্পন্ন করে তোলবার জন্য শাস্ত্রী মাঝে মাঝে ক্রিয়াপদ বর্জন করেন। ক্রিয়াপদের নির্দিষ্ট স্থানের অবস্থান মানেন না, অসমাপিকা ক্রিয়াকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেন। যেমন 'আবার আর-এক সারি নৌকা, আবার দুই, আবার

পাটাতন। নৌকার মাস্তুলগুলি নানা রঙের কাপড় দিয়া মোড়া। মাস্তুলের আগা হইতেও দিক্‌মালা ও কিঙ্কনীমালা। আর সব নৌকাই সাজানো-গোছানো'। আরও একদিক থেকে হরপ্রসাদ উপন্যাসের ভাষায় বাংলা গদ্যকে অভিনবত্ব দিলেন। আমাদের আটপৌরে, সর্বদা ব্যবহৃত সাধারণ মানুষের ইডিয়ম, শব্দ সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করলেন। এতে ভাষায় এলো সজীবতা এবং জনগণের কাছাকাছি। গণতান্ত্রিক ভাষাকে যেন আমরা পেয়ে যাই। কয়েকটি উদাহরণ দিই—'তাহারা পাত কুড়াইয়া লইয়া যাইত', 'এই মালায় তেল লইয়া যাও', 'রাঢ়দেশে বড়ো বড়ো মাঠ, ছোটো ছোটো গ্রাম। মাটি এঁটেলা, বর্ষায় চলাফেরা বন্ধ', 'রূপার এমনি দবদবা', 'গোছা গোছা সোলার ফাত্‌না' 'রাজার গুরু মাছের আঁতিড়ি খাইতে ভালোবাসেন, 'গণেশের কাছেই মহাকাল—বেঁটে-খেটে, গাঁটা-গোঁটা, মুখখানি মস্ত, হাঁটা খুব ডাগর, কটমট্ করিয়া তাকাইয়া আছেন'। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বাংলাভাষা ফেনানো (Synthetical)। ক্রিয়াপদের দুর্বলতা এ ভাষাকে পুরুষালি দীপ্তি থেকে মাঝে মাঝে বঞ্চিত করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এ দুর্বলতা কিভাবে কাটানো যায়। কিন্তু এ দুজনের ভাষারই আভিজাত্য ভিন্ন ধরণের। হরপ্রসাদ এ দুর্বলতাকে পরিহার করেন ক্রিয়াপদকে বর্জন করে। সমাপিকা ক্রিয়ার বারবার উপস্থিতিকে বর্জন করে ভাষাকে তিনি মাটির কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহারে অভিজাত শিল্পীর নৈপুণ্য। হরপ্রসাদও শিল্পী। কিন্তু তিনি ব্রতকথার শিল্পী, কথকতার শিল্পী। সেকালের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে তোলেন শাস্ত্রী এই ভাষার আবিষ্কারে 'রূপা মুহূর্তের মধ্যে "জাল টান" হুকুম দিয়াই অন্তর্ধান হইলেন। তখন নৌকা চলিল, সোনার ফাত্‌না চলিল, জালের দড়ি চলিল, পাড়ের অগণ্য মানুষ চলিতে লাগিল। বড়ো বড়ো মাছে ঘাই দিতে লাগিল ; এক-একটা মাছ দশ-পনেরো হাত লাফাইয়া উঠিয়া আবার জলের মধ্যে পড়িতে লাগিল। এক একটা ঘাইয়ে জল তোলপাড় হইতে লাগিল। ঘাইয়ে ঢেউগুলি গোল হইয়া ক্রমে বড়ো হইতে হইতে একটা ঢেউ, একটা গোলের পর আর-একটা গোল, কত শত যে বৃত্ত, বৃত্তার্ধ, বৃত্তখণ্ড জলের উপর দেখা গেল, তাহা জ্যামিতির রেখাগণিত ওয়ালারাই বুঝিতে পারেন'। এ বর্ণনা দৃষ্টিনন্দন। বর্ণনায় দিঘির জলের মায়া সঞ্চারিত।

'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের নামকরণে হরপ্রসাদ বিহারী দত্তের মেয়ে মায়াকে গুরুত্ব দেবেন এটাই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, গ্রন্থের আরম্ভে ও শেষে মায়ার প্রসঙ্গ আছে। বর্ণনা-বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে মায়াপ্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু মায়ার কাহিনী যেন বহিরঙ্গ ব্যাপার। তিনি বলেছিলেন বেণের মেয়ে একটা গল্প, সেই গল্পের খাতিরেই মায়া-জীবন-গুরুপুত্র উপন্যাসে জায়গা করে নেয়। মায়ার প্রতি গুরুপুত্রের আসক্তির ইঙ্গিত শাস্ত্রী দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধসঙ্ঘের কথাও কিছু এসে পড়েছে। আসলে বাংলাদেশ তথা ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তির কারণ দেখানোও হরপ্রসাদের মননে ছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের কারণ সেই ধর্মের মধ্যেই ছিল।

আবার সঙ্ঘশক্তি না থাকলে সেই ধর্মকে রক্ষা করাও কঠিন। বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পেয়েছিল। রাজশক্তিও তার অনুকূল ছিল। কালে কালে বৌদ্ধধর্মেও পরিবর্তন এসেছিল। হীনযান, মহাযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ধর্ম তারই প্রকাশ। তান্ত্রিক ধর্মের বিস্তার এর অন্যতম কারণ। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে শক্তিকল্পনা প্রবেশ করেছিল। হিন্দুধর্মের সঙ্গে এর বিরোধ খুবই সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। রাজারাও হিন্দু মন্দির এবং মন্দিরকে ঘিরে যে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন তার আনুকূল্য করেছিলেন সে সময়ে। বিহারের গুরুত্ব কমতে শুরু করেছিল। বৌদ্ধবিহার প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ সেকথা বলেছেন। হিন্দুধর্মের চাতুবর্ণের মধ্যে সকলকে গ্রহণ করা না গেলেও এই ধর্মের আওতায় সকলকে আনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ভবদেব ভট্টের বিধানে। বিহারী দত্ত বেণে। বেণের স্থান নির্নীত হচ্ছে সমাজে। একদিক থেকে বলতে পারা যায় বর্ণভেদ যতই বিরোধের বীজ বপন করুক না কেন, এই প্রথায় প্রত্যেক বর্ণের আর্থিক, সামাজিক নিরাপত্তা ছিল। হায়ারারকি মোটামুটি সামাল দিয়ে চলছিল। হরপ্রসাদ তাকেই চেয়েছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন। বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত মায়া-গুরুপুত্র প্রসঙ্গে। তিনি নিজেই চর্যাগীতির ভাষায় ব্রজবুলিভাষা মিশিয়ে গান রচনা করে দিয়েছেন। হরপ্রসাদ যেন কখনও শবরপাদ কখনও লুইপাদ। চর্যাগীতির গূঢ়তত্ত্ব যে কেবলমাত্র গুহ্যাৎ গুহ্যমু নয়, তার উপরিতলের সোজা কথার মধ্যেও যে হৃদয়ের তাপউত্তাপ নিহিত, শাস্ত্রী তার বাস্তব উদাহরণ সংকলন করেছেন এই উপন্যাসে।

আবার বলি, হরপ্রসাদ ইতিহাসকে সৃষ্টি করেছেন। তবে ঐতিহাসিকের মননে নয়, কথকের শ্রদ্ধায়, আন্তরিকতায়। এ গল্প কেমন? হরপ্রসাদের ভাষায় 'আমি আজ একটি গল্প বলিব। সেই—সেই—পুরানো গল্প। ঠানদিদিদের কাছে শোনা গল্প, তাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের ঠানদিদিদের কাছে। তাঁরা তাঁদের ঠানদিদিদের কাছে, তাঁরা তাঁদের—এই রকম করে গল্প ঠানদিদিতে ঠানদিদিতে চলিয়া আসিতেছিল। প্রথম ইংরাজির চোটে ঠানদিদিদের গল্প আর ভালো লাগে না, শোনাও যায় না। এখনকার পাড়াগাঁয়ের কাছে হইয়াছে ব্রতকথা (জাতক, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি)। এসব গল্পে প্রেমের ছড়াছড়ি নাই, প্রেমের বীজ গজায় না ও ক্রমে ফলফুল ঝাঁকড়িয়া পড়ে না। এ লেখায় কৌশল নাই, বাঁধুনি নাই, রকমারি নাই। নিভাননী, নগেন্দ্রবালা, বিদ্যুৎবরণী, তড়িৎসৌদামিনী, অমিয়ানিভা, চপলাপ্রভা প্রভৃতি একেলে বাহারে নাম নাই। চন্দ্রিমার বর্ণনা নাই, বসন্তের হাহুতাশ নাই। আছে শুদ্ধ একটা গল্প। সেকালে মিষ্ট লাগিত। লোক পড়িত, শুনিত পাঁচ ছেলের গল্প।' বেণের মেয়ে এইরকমই গল্প।

বাসন্তী মুখোপাধ্যায়

স্বর্ণকুমারী দেবী ঃ সমাজ সচেতনতায় প্রথমা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে বলেছিলেন, "যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম. সে ছিল অতি নিভৃত।… … …

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।… … …

এই নিরালায় এই পরিবারের যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মত।"[১] নির্দ্ধিধায় বলা চলে যে ঠাকুর বাড়ীর এই স্বকীয়তার মধ্য দিয়েই সেই পরিবারে সন্তানদের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা উৎসারিত হয়েছে। তাঁদেরই অন্যতমা স্বর্ণকুমারী দেবী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চ কন্যার মধ্যে চতুর্থ এবং রবীন্দ্রনাথের ন দিদি। ১৮৭৬ সালে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক রূপে বাংলা-সাহিত্যের জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ও সচেতন স্নেহাশ্রয়ে তাঁর গৃহের অন্তঃপুরিকারা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। কন্যা স্বর্ণকুমারী তাঁর 'সাহিত্য-স্রোত' গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি যে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন. সেখানে পিতা ও কন্যার মধুর সম্পর্কটি উপলব্ধি করা যায়। ভোর না হতেই বাগানের ফুলগুলিকে থালায় সাজিয়ে. উপাসনা-অন্তে যখন দেবেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতেন, তখন "তিনি সহাস্যে থালাটি গ্রহণ করিয়া ফুলগুলি আঘ্রাণ করিতেন, আমার মন ভরিয়া উঠিত! জানি না দেবতাকে অর্ঘ্য দান করিয়া কোনো সাধকের মনে এইরূপ আনন্দ হয় কি না!" পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর এই ভক্তিবিনম্র অনুভূতি তাঁর সাহিত্যচেতনাকে নানাদিক থেকে প্রভাবিত করেছিল। তবে মহর্ষির চিন্তা-ভাবনা যে শুধুমাত্র পুত্রকন্যাদের বিদ্যাচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; তাঁর জাগ্রত সত্তা সমগ্র অন্তঃপুরের আবহাওয়া একটি সুস্থ চেতনাবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিল। মহর্ষি পত্নীর কাছে চাণক্য-শ্লোক অত্যন্ত প্রিয় ছিল. দিদিমা তন্ত্রপুরাণ. সাংখ্যদর্শন চর্চা করতেন. অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা আধুনিক কাব্য-উপন্যাসের অনুরাগী ছিলেন। ফলে যে পরিমণ্ডলটি সৃষ্টি হয়েছিল, স্বর্ণকুমারীর মানসিক ক্রমপরিণতির পথে তার প্রভাব সুদূর-প্রসারী। তিনি বিদ্যাচর্চাকালে একদিকে যেমন বাংলা ও সংস্কৃতে পারদর্শীনী হয়ে উঠেছিলেন. তেমনি খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীর কাছে বাইবেল পাঠও করেছিলেন। অর্থাৎ শুধু পুরাকালের ইতিবৃত্ত নয় সেইসঙ্গে আধুনিক কালোচিত ভাবনাকে হৃদয়ে ধারণ করার মত মানসিকতা সেই পথেই গঠিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর অগ্রজদের ভূমিকাও স্মরণ করতে হয়। ভগ্নীর সাহিত্যচর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহ. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিক চিন্তাভাবনা নানাদিক থেকে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যজীবনকে প্রভাবিত করেছিল।

বিবাহ-পূর্ব যুগ থেকে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত এবং পিতা ও অগ্রজদের দ্বারা তিনি বিশেষ ভাবেই উৎসাহিত হয়েছিলেন। বিবাহের পরে দেখা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিদেশী গ্রন্থ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন ভগ্নীকে। সেইসঙ্গে তার কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে স্বর্ণকুমারীর মনে ইতিহাস সম্পর্কে এক প্রবল ঔৎসুক্য জেগে উঠেছে। সেই আগ্রহই তার ইতিহাসাশ্রয়ী রচনার পথ নির্মাণ করল। ইতিহাস অবলম্বনে তার প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ' ১৮৭৬ সালে রচিত হয়। এই প্রসঙ্গেই বলা যায় যে স্বর্ণকুমারীর মনোজীবন গঠনে তাঁর পারিবারিক সহায়তা ছিল নিঃসন্দেহে; সেইসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যে আলো নানাদিক থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল সমাজমানসের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে, স্বর্ণকুমারীর জীবনে তারও একটি স্থায়ী প্রভাব ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাহিত্য ক্ষেত্রে বহু বিধ সৃজনীচিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল। তারই স্পষ্ট সুচিহ্নিত অভিব্যক্তি ঘটল ১৮৭০ থেকে ১৮৮০র মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের লেখকদের নিজস্ব চিন্তাভাবনাসঞ্জাত সাহিত্যরচনার প্রয়াস দেখা গেল। এই সময়েই জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে নাট্যজগতে নতুন সম্ভাবনার সূত্রপাত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় উনিশ শতকের নবজাগ্রত চেতনা-বোধের মূল্যায়ন ঘটেছিল এই কালসীমায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ (১২৮৪), যার মূল লক্ষ্য ছিল সাহিত্যচর্চা সেইসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য (১৮৭৫), হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫-৭৭) এবং কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ, সেই যুগের সাহিত্য উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আরেকটি ঘটনা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু যিনি প্রথম প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে যুগের বাণীকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যম রূপে মধুসূদন গ্রহণ করেছিলেন কাব্য ও নাটক যার বিষয়বস্তু প্রাচীন পুরাণকাহিনী, কিম্বা মধ্যযুগের রাজপুত শৌর্যবীর্যের ইতিহাস। তবে তাঁর সচেতন শিল্পবোধ পুরাণ ইতিহাসকে অতিক্রম করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। মধুসূদনের কাব্য ও নাটকের আদর্শ অনুকরণ করার বহু দৃষ্টান্ত ওই যুগে পরিলক্ষিত হয়। সেই রকম উপন্যাসের আদর্শও প্রতিষ্ঠা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যে অন্যতমা স্বর্ণকুমারী দেবী। একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে রবীন্দ্রনাথও 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) উপন্যাস রচনা কালে বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছিলেন। তবে যুগপ্রচলিত সাহিত্যাদর্শকে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, তার অগ্রজারও মানসিকতা প্রথমাবধিই একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যরীতির অনুসন্ধান করেছিল। তাঁর উপন্যাসগুলির অন্তঃপ্রকৃতি এই সত্য উদ্ঘাটিত করে।

উপন্যাস ইউরোপীয় সাহিত্যের একটি রূপকর্ম। উনিশ শতকের চিন্তাভাবনার নানা উপাদান যেমন গৃহীত হয়েছিল ইউরোপ থেকে, তেমনি ঋণ ছিল শিল্প

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান মন্তব্য রয়েছে—"While English stories continued to be translated, the model of the English novel was also followed in form ..Tekchand's Alaler Gharer Dulal is a picaresque novel in the wake of Fielding's Tom Jones, leaving aside the stamp of western influence in the words and spirit; while the historical novel struck its roots deep into the soil of the Bengali literature through Bankim Chandra's Durgeshnandini and other books though the author would allow only Rajsinha of all his works to be styled Aitihāshik Nātak. He had disclaimed reading Ivanhoe before he had written Durgeshnandini, but the stamp of the form nevertheless to be seen generally speaking in all his novels"[২] আরও বলা হচ্ছে—"Bankim Chandra's associates in literature—Ramesh Chandra Datta, Chandi Charan Sen and Swarna Kumari Devi went further in assimilating the western influence specially on the historical side and the learned foot-notes, rich in antiquarian lore showed Scott's method adopted to a very great extent. Swarna Kumari's Dip Nirvan reminds one of Cymbeline of Shakespeare's influence, in the stealing royal princes from the credles in their upbringing by a man who has put on a hermit's robe in the fact of Sailabala and Parvati being disguised as men and overhearing the negotiations of the traitors Vijay Sinha and the Moslem messenger, while sheltered in a cave".[৩] এই কথাটিই এখানে স্পষ্ট যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঠন প্রকরণ, ঘটনাসংস্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বঙ্কিম এবং তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকরা পাশ্চাত্যরীতির প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক কৃতিত্ববিচারের সেটি মাপকাঠি নয় এবং সেই প্রসঙ্গে প্রথম পথপ্রদর্শকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভার প্রসঙ্গ, বহু আলোচিত হলেও বার বার এসে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবেই যেমন বহিরঙ্গরীতিতে পাশ্চাত্য পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তেমনি উপন্যাসের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতিষ্ঠায় নিজস্ব প্রবণতার দ্বারা চালিত হয়েছেন, যে প্রবণতার নাম দেশপ্রেম। লক্ষ্য করা যায়, রমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী সকলের মধ্যেই এই মনোভঙ্গী কাজ করেছে কোথাও ব্যাপক আকারে কোথাও বাঙালির স্বাদেশিক অনুভূতির অঙ্গীভূতরূপে। বঙ্কিমের জীবনদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অতীত কাহিনীর ঐতিহ্যকে স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা। বঙ্কিম সম্পর্কে হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী লিখেছেন—"কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই ত হার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। রিনাইসেন্স (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান।"[৪] সুতরাং ইতিহাসের প্রতি সহজাত আকর্ষণেই বঙ্কিমচন্দ্র অতীত কাহিনীর মধ্যে জাতীয় গৌরবকে ধরবার চেষ্টা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। সেই পথেই রমেশচন্দ্র দত্ত অগ্রসর হয়েছেন। 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতে' তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বলেছেন—"পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশের গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল ওই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না।" প্রাচীন গৌরব গাথা যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের মুখ্য প্রেরণাস্থল ছিল, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত উপন্যাসগুলি প্রমাণ করে। পূর্বসূরীরা স্বর্ণকুমারীরও দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬) অপরিণত বয়সের লেখা; শিল্পগুণ বিচারে তার মূল্য যাই হোক না কেন, তৎকালীন জীবনস্পন্দন সেখানে সহজেই অনুভূত হয়। তবে এই উপন্যাসটি তাঁর প্রথম সাহিত্য প্রচেষ্টা নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় তার কনিষ্ঠা ভগিনী বিবাহের পূর্বেই কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছিলেন এবং অগ্রজ তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। ১৮৬৭ সালে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্বে তিনি সংস্কৃত ও বাংলাভাষা শিক্ষা করেছিলেন। পরে তাঁর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের উৎসাহে ইংরাজী শিক্ষা লাভের জন্য বিলাতি আদবকায়দায় রপ্ত এবং স্ত্রীশিক্ষার অগ্রণী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে তাঁর বোম্বাই এর বাসস্থানে স্বর্ণকুমারীকে পাঠানো হয়। এর পর থেকেই আরম্ভ হয় তাঁর নিরলস সাহিত্য সাধনা।

'দীপনির্বাণ" স্বর্ণকুমারী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রের শেষাংশে তিনি লিখছেন,

> 'আর্য'-অবনতি কথা, পড়িলে পাইবে ব্যথা,
> বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার !
> কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
> ঢেকেছে ভারত ভানু ঘন মেঘজাল—
> নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল।'

এ'কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে জাতীয়তাবোধের তীব্র অনুভূতি স্বর্ণকুমারীকে ইতিহাস অবলম্বনে উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ

ঐতিহাসিক তথ্য হচ্ছে ১৮৬৭ সালে চৈত্রসংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার যে অধিবেশন হয় সেখানে 'গাও ভারতের জয়' গানটি গাওয়া হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ্যভাবে যুক্ত না হলেও তাঁর স্বদেশচিন্তা এই উদ্দীপনার অনুকূলেই ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আরেক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা 'ন্যাশনাল পেপার' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের সহিত তাহার যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা ; কারণ সেই যে বাঙ্গালীর মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।"[৭] সেই প্রেরণারই আভাস রয়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' ; বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত : সেইসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন জাতীয়তাবোধক প্রবন্ধ। টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। কারণ তুর্কী আক্রমণের সূচনাপর্ব থেকে ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত রাজস্থানের ইতিহাস রাজপুত ও মুসলমানের নানা বিরোধের কাহিনীতে পূর্ণ। সেই সঙ্গে বলা যায় জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত অনেক কবিপ্রেরণারও উৎস এই গ্রন্থটি। বাংলা উপন্যাস-সৃষ্টির প্রথম যুগে রাজস্থানের বিভিন্ন কাহিনী অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে ; তার মধ্য দিয়ে রাজপুত শৌর্যবীর্যের গৌরব গাথা তৎকালীন বঙ্গদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেই ইতিহাস-চিন্তার প্রেক্ষাপটেই স্বাদেশিকতার উপলব্ধি ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসও হিন্দুজাতির গৌরব অস্তমিত হবার কাহিনী : শিল্পসম্মতরূপে উপন্যাস সৃষ্টির সচেতন পদক্ষেপ সেখানে লক্ষিত হয় না। এই উপন্যাসটির উপক্রমণিকায় লেখিকা বলেছেন—"মুসলমানের ভারতাধিকারের অব্যবহিত পূর্বে যে সময় হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে একতার দৃঢ় বন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল এবং সর্ব্বোচ্চ পদলাভ লালসায় পরস্পর সকলেরই মধ্যে গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ের একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসের আরম্ভ—এবং গৃহবিচ্ছেদ হেতু সুযোগ বুঝিয়া যবনেরা যে সময়ে ভারতের চিরপ্রজ্বলিত দীপ নির্বাপিত করিল, সেই দীপ নির্বাণের সমাপ্তি।

* * * *

যদিও এই পুস্তক উপন্যাসমাত্র, তথাপি গ্রন্থসন্নিবিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায়ই ইতিহাসমূলক এবং তাহাদের স্বভাব ও জীবনের মূল ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক ভিত্তি রক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।"[৮]

গ্রন্থের ঐতিহাসিক উপাদানের প্রয়োগ সম্পর্কে লেখিকার প্রখর সচেতনতা ছিল। মহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের পূর্ব মহূর্তে যে তৎকালীন হিন্দুনৃপতিরা আত্মকলহে এবং হীনস্বার্থসিদ্ধির লালসায় জর্জরিত ছিলেন, সে কথা ইতিহাসের সত্য। এই ঐতিহাসিক সত্যকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে স্বর্ণকুমারী 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসের ঘটনাসংস্থাপন করেছেন। যদিও উপন্যাস মধ্যে দিল্লীই প্রধান রঙ্গভূমি'— কিন্তু তার প্রসারণ ঘটেছে চিতোর পর্যন্ত। ইতিহাসের বিচিত্র গতির মধ্য দিয়ে যে ঘটনা-সংঘাতের সৃষ্টি তারই আবর্তে বিকাশ লাভ করেছে উপন্যাসের চরিত্রগুলি। এই রীতিকে নাটকীয় রীতি বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসবিচারের মানদণ্ডে। বঙ্কিমচন্দ্রও ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাতের মধ্য দিয়ে তীব্র সংকট সৃষ্টি করে উপন্যাসের নাট্যরস ঘনীভূত করেছিলেন। রমেশচন্দ্র এবং স্বর্ণকুমারীরও সেই একই পথে বিচরণ। বঙ্কিমের মত স্বর্ণকুমারীও উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের ব্যক্তিজীবনকে ইতিহাসের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করেন নি। তাই রাণা সমরসিংহ, যুবরাজ কল্যাণসিংহের ব্যক্তিগত সংকট, পৃথ্বীরাজ, রাজমহিষী রাজকন্যার পারিবারিক জীবনসমস্যা একদিকে ইতিহাসের পটভূমিতে উজ্জ্বল হয়েছে আরেকদিকে আবার সেই সংকটই ইতিহাসের গতিকে অমোঘ পরিণামের দিকে নিয়ে গেছে। ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে 'দীপনির্বাণ' উপন্যাস রচনায় লেখিকার যে বিপুল আয়োজন করতে হয়েছে তার মধ্যে পারিবারিক জীবনরস পরিবেশনেও তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। বলাই বাহুল্য, অপরিণত বয়সে লেখা এই উপন্যাসে লেখিকা সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের আদর্শে তিনি উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস বা ঘটনাসংস্থাপন করলেও হয়ত আপন অজ্ঞাতসারেই তাঁর মন একটি নিজস্ব রীতি উদ্ভাবনের পথ খুঁজেছিল। স্বর্ণকুমারীর মূল লক্ষ্য ছিল আর্য-অবনতি কথার উপস্থাপন সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর ইতিহাস-চর্চা এবং 'দীপনির্বাণ' ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনা। কেন্দ্রে মূল ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করে চার পাঁচটি প্রণয়-উপাখ্যান রচনা করেছেন, যা কেন্দ্রগত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। এক্ষেত্রে প্লটনির্মাণে লেখিকা অনেকটাই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

ইতিহাসের অভাববোধ পূর্ণতা অর্জন করে ঐতিহাসিক উপন্যাসে। তার প্রক্রিয়াটি কী হতে পারে, তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। তবে ইতিহাস ও উপন্যাসের মর্মগত সাদৃশ্য হচ্ছে সত্যপ্রতিষ্ঠায়। উপন্যাস যদি বাস্তব থেকেই উদ্ভূত হয়, তবে নিশ্চিতই তার একটি ভৌগোলিক পরিমণ্ডল, সেই সঙ্গে দেশকালগত, সমাজগত একটি পরিবেশ আছে। অর্থাৎ উপন্যাস আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত একটি বিশেষ ইতিহাসপর্বের মধ্যেই বিধৃত। সুতরাং সত্যপ্রতিষ্ঠার বিচারে ইতিহাস ও উপন্যাস অবিচ্ছেদ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী উভয়েই ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিকায় প্রণয়-উপাখ্যান সংযোজন করেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকারের ভাষায় বলতে গেলে, 'সত্য ইতিহাসের মধ্যে কি-যেন-একটা অভাববোধ হয়; অর্থাৎ অতীত যুগের

মত নায়ক নায়িকাগণ তাঁহাদের প্রায় সব গোপনীয় ব্যাপারগুলি সঙ্গে লইয়া তিরোধান করিয়াছেন এবং আধুনিকেরা অতীত যুগকে চিরদিনই শুধু ভাঙা ভাঙা রকমে চিনিতে পারে। পাঠকহৃদয়ের এই শূণ্যস্থান ঐতিহাসিক উপন্যাস পূর্ণ করে।"[৭] বঙ্কিমের মত মহান শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব ছিল প্রেমের গাঢ় উপলব্ধিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে এক মহৎ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করা, যে রস সর্বকালেই আস্বাদমান। সেইখানেই স্বর্ণকুমারী ততটা সার্থক হতে পারেননি। উনবিংশ শতাব্দীতে দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে রোমান্সের জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন সেই জগৎ থেকে উত্তরণ ঘটেনি স্বর্ণকুমারীর 'দীপনির্বাণ' রচনাকালে। রোমান্সে বাস্তবতার দাবী তত তীব্র নয় বরং কল্পনার আবেগে তাড়িত ঔপন্যাসিক অনেকক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার করেন ঘটনার বাস্তব পরিবেশনে। সেই শিথিলতার রন্ধ্রপথে উপন্যাসের ভরাডুবি ঘটে। ঘটনাভারাক্রান্ত 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসে এই মাত্রাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যে প্রেমের পথ ধরে চরিত্রগুলি বিকাশলাভ করে তার অন্তঃস্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়, তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার মত মানসিকতা তখনও স্বর্ণকুমারী অর্জন করেননি। ফলে প্রচুর আকস্মিকতা আনতে হয়েছে ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে কিন্তু তা রক্ষিত হয়নি। রাজকীয় সমারোহের মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা যেমন শৈলবালা-প্রভাবতীর বন্ধুত্ব-পরস্পরের প্রতি মান-অভিমান, আন্তরিকতা অনেকখানি পাঠককে স্বস্তি দেয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু ঘটনা পরিবেশনের যে কুশলতা পাঠকের প্রত্যয়বোধকে প্রতিষ্ঠিত করাতে পারে সেই নৈপুণ্য তখনও লেখিকার অনায়ত্ত ছিল।

কিন্তু সকল সমালোচনা সত্ত্বেও দীপনির্বাণ সেই যুগের পাঠকের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। উপন্যাসের সংজ্ঞা যেমন কালবিবর্তনে পরিবর্তনশীল সেইরকম তার আস্বাদনপদ্ধতিও যুগধর্ম অনুসারে বিচার্য হয়। স্বর্ণকুমারীর সেইখানেই সার্থকতা যে মধ্যযুগের ইতিহাসের সঙ্গে তার সমকালীন যুগধর্মকে এমন অনায়াসে মিলিয়েছিলেন যে কাহিনীর রসপরিণতিতে পাঠকের মনে নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেরণার মহান রূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই যুগের আনুগত্যই পাঠককে তৃপ্ত করেছিল, উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ পাঠকের অভিপ্রায়ের মধ্যে ধরা পড়েনি। 'দীপনির্বাণে'র আত্মপ্রকাশ তখনকার পত্রপত্রিকাগুলিতে সম্বর্ধিত হয়েছিল। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় বলা হয়েছিল "We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has been written by a Bengali lady and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal"

'দীপনির্বাণে'র পর স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মিবাররাজ' (১৮৮৭) এবং 'বিদ্রোহ' (১৮৯০)। 'মিবাররাজ' উপন্যাসকে 'বিদ্রোহ' উপন্যাসের মুখবন্ধ বলে মনে করা হয়। সে প্রসঙ্গ অন্য আলোচনার বিষয়। তবে 'মিবাররাজ' এর কাহিনী উপন্যাস অপেক্ষা বড় গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। কারণ ইতিহাসের যে

বহুদূরবিস্তৃত ঘটনাজাল একটা সংঘাতের সৃষ্টি করে, সেই সংঘাত থেকেই অন্তরের জটিলতার প্রকাশ, আর সেই আলোকেই চরিত্রগুলি দৃপ্ত হয়ে ওঠে একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হয়; এখানে সেই গঠনপরিকল্পনা লেখিকা অনেকটাই সংকুচিত করেছেন। কারণ স্বর্ণকুমারী যুগপ্রচলিত সাহিত্যাদর্শ অনুসরণ করলেও সেই রীতি বোধহয় তাঁর প্রকৃতির অনুকূল ছিল না। বর্ণাঢ্য অতীত কাহিনীর মাধ্যমে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে পাঠককে উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট করা, এটাই ছিল সেকালের সাহিত্যরচনার পন্থা। স্বর্ণকুমারী সেই পথে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছিলেন 'দীপনির্বাণ' উপন্যাস রচনাকালে। কিন্তু মিবাররাজ' রচনার সময় থেকেই অনুভব করা যায় যে একটি স্বকীয় ভঙ্গী তিনি খুঁজে নেবার চেষ্টা করছেন। ঠাকুরবাড়ীর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তায় মনোভাবের এই পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের উপন্যাসের উল্লেখ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বঙ্কিম অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১২৮৮-৮৯) এবং 'রাজর্ষি' (১২৯২)। বঙ্কিম সম্পর্কে 'ছিন্নপত্রে' তিনি একসময়ে বলেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু বড় বড় মানুষের চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। অতীতের কাহিনীর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের শিল্পীসত্তা নিপুণভাবে মানুষকে সেই বর্ণোজ্জ্বল পটভূমিতে চিত্রিত করেছেন, যেখানে ইতিহাসের সত্য আর উপন্যাসের সত্য এক হয়ে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনা ভিন্ন পথের অভিমুখী, তাঁর অন্বেষণ নরনারীর মনের গভীরে। তাই বউ ঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্রের নিষ্ঠুর মনোভঙ্গীর পাশে বসন্তরায়ের উদার মানসিকতা, উদয়াদিত্যের অন্তররুদ্ধ জীবনের আর্তনাদ, বিভার ভাগ্যবিপর্যয়ের ম্লান বিষণ্ণতা ঔপন্যাসিকের মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহলেরই পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় যে আদর্শ ধ্রুবসত্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেই মানবপ্রেম ও বিশ্বমানবিকতা বউ ঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' রচনার কাল থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রায় কাছাকাছি সময়েই স্বর্ণকুমারীও উপন্যাস রচনা করেছেন। মিবাররাজের কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে ভীল-রাজপুত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে রাজপুতজাতির অভ্যুদয়। এখানেও লেখিকার মূল অবলম্বন টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থটি। স্কটের অনুসরণে তিনি গ্রন্থের পরিশিষ্টে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় তিনি টডের সমর্থন করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হচ্ছে যে গুহা এবং বাপ্পা, দুজনে ভিন্ন ব্যক্তি, যথাক্রমে শিলাদিত্য ও নাগাদিত্যের সন্তান, গুহাই মিবাররাজবংশের আদিপুরুষ। আবার টডের একটি মত, রাণারা খৃষ্টের বংশজাত, অপর মতে ইরানী; আবার শিলাদিত্য যে ভারতবর্ষীয়, এ'কথাও স্বীকার করেছেন। টডের লিখিত কাহিনী গ্রহণ করলেও তাঁর এই দোলাচলতাকে লেখিকা আক্রমণ করেছেন এবং তথ্য প্রমাণাদির দ্বারা মিবাররাজবংশের ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। উপসংহারে বলেছেন, 'যদি পণ্ডিতগণ পণ্ডিতপ্রবর টডের ন্যায় উপরিউক্ত

প্রমাণে আমাদের খৃষ্টান মহারাণীর সহিত সূর্যবংশের রাণাদিগের রক্তসম্পর্কের সম্ভাবনা দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কিন্তু অজ্ঞ আমাদের টডের এ আহ্লাদ দেখিয়া পিকউইকের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারটি মনে পড়ে।' সুতরাং মিবাররাজেও ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে।

স্বর্ণকুমারী 'মিবাররাজ' গ্রন্থটিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলেছেন। রাজপুত-জাতির অভ্যুদয় সম্পর্কে তাঁর তথ্যনিষ্ঠা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তনয়া ইন্দিরা দেবীর নামে। উপহার পত্রটি এইরকম ঃ

"স্নেহময়ী ইন্দিরা,
তুই স্নেহময়ী মেয়ে, বরষার ফুল—
কোমল মাধুরী মাখা বিমল বকুল।
বিকসিত অশ্রুজলে সুবাসিত শুভ্রদলে
বিধাতার দিব্যসৃষ্টি অপূর্ব অতুল।
যে তোমার কাছে আসে জড়াও মধুর বাসে
ক্ষুদ্র হৃদে উথলিত প্রণয়-আকুল।
যে যায় দলিত রেখে সেও যায় গন্ধ মেখে
স্বরগের পুণ্য তুমি ধরণীর ভুল।
এনেছি এ শোকগীতি, তোমার পরশপ্রীতি
ফুটাবে বিরাগমাঝে সুরাগমুকুল।"

এই উৎসর্গ পত্রটির অন্তরালে ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি তাঁর অপরিসীম প্রীতি উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে, আর সেই সম্পর্কই লেখিকার আত্মমগ্ন নিভৃত চিন্তার স্বরূপকে তুলে ধরেছে। তাই মিবাররাজবংশের আদিপুরুষের কাহিনী ইতিহাসনির্দেশিত পথে অগ্রসর হলেও মানবসম্পর্কের বিধ্বংসী পরিণামের মধ্য দিয়ে লেখিকার হৃদয় বিষণ্ণ বেদনার রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। অভ্যুত্থানের গৌরব শোকগাথায় রূপান্তরিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারীর অন্যান্য উপন্যাসের মত এখানে নরনারীর প্রণয়সম্পর্কিত কোনো ঘটনা নেই। কিন্তু স্নেহ, প্রীতি, ঈর্ষা, বিদ্বেষ প্রভৃতি মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। টডের প্রতি আনুগত্য থাকলেও তার সঙ্গে কিছু ঘটনা ও চরিত্রের সংযোজন ঘটিয়ে কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় পরিবেশসৃষ্টিতেও তিনি সার্থক হয়েছেন। গুহা মন্দালিক এবং তালগাছের প্রীতির সম্পর্কের মধ্যে যে সংশয় ঘনীভূত হয়ে উঠেছে সেই সংশয়ই গুহা ও তালগাছকে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন করেছে। ঘটনাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে ভীলপুত্রের আত্মগত চিন্তায়, সেখানেও লেখিকার সুনিপুণ আত্মবিশ্লেষণ—"যখন তাহার মনে হইল কেবল সামাজিক অধিকার নহে—তাহার পিতার স্নেহও যুবক

আত্মসাৎ করিতেছে তখন আর সহ্য হইল না। সে সব সহিতে পারে, পিতার স্নেহের উপেক্ষা সহিতে পারে না, ...ভীল অসভ্য; তাহার স্বাভাবিক অবিকৃত হৃদয়ে প্রেমেরই একাধিপত্য এই সে ক্ষমতাকে তাচ্ছিল্য করতে পারে—প্রেমকে পারে না।" এই অন্তরমুখী উপলব্ধি অন্যকাল থেকে উঠে এসেও আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। ইতিহাসের পটভূমি হলেও স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য প্রতিভায় যুগসীমাকে অতিক্রম করার মত উপাদান যথেষ্ট ছিল। ইতিহাস তার সাহিত্যপ্রেরণার অনুকূল হয়েছে। সেই পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সুদূর অতীতে এক অখ্যাত ভীল যুবকের অনুভূতি উপন্যাসের রসসৃষ্টির প্রেরণাকে অনেকটাই সম্ভাব্য করে তুলেছে। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর সুনিপুণ মনোবিশ্লেষণ পাঠককে মুগ্ধ করেছে এক অনাবিষ্কৃত জগতের সন্ধান দিয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লেখিকা স্বর্ণকুমারীও তাকেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন, কোনো উত্তাল সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের তাড়নায় নয় আপন সহৃদয়তার জোরে। সুতরাং উপন্যাসে এই আত্মবিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। শুধু এই সব আরণ্যক মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে তুলে ধরার জন্য তিনি নাগরিক ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। মনে হয় রাজপুত গৌরবকাহিনী তার উপন্যাসে লক্ষ্যস্থল হলেও তার পাশাপাশি সরল অতিথিবৎসল ভীলজাতির অনাড়ম্বর জীবনধারা তাদের অকপট হৃদয়ানুভূতি স্বর্ণকুমারীর দৃষ্টিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। সেই জীবনস্রোতই মূল প্রবাহরূপে পরিগণিত হয়েছে 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসের কাহিনীতে।

'বিদ্রোহ' উপন্যাসেরও উপজীব্য ভীল-রাজপুত সম্পর্ক কিন্তু আখ্যা রসপরিণতি ভিন্নধর্মী। এখানে নাগাদিত্য এবং সুহাসমতীর প্রণয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণই প্রধান লক্ষ্য। যে ভীলজাতি আরণ্যক ছিল, তারাই কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। যারা একদিন নির্দ্বিধায় অস্ত্রচালনা করত, তারাই পরে ক্ষাত্রিয়শাসকের কাছে অবনত হয়েছে। এই কাহিনীতে দাসত্ব-শৃঙ্খলের প্রতি লেখিকার প্রচ্ছন্ন বেদনা ভীলজাতির পরাধীনতার বর্ণনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। ভীলের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে মৃগয়ানন্ত ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার ভীলরমণীর প্রতি নির্যাতন প্রভৃতির বর্ণনা যেন স্বর্ণকুমারীর সমকালের চিত্রকেই পরিস্ফুট করেছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। উপন্যাসের নায়িকা সুহাসমতীর জীবনপরিচয় অস্পষ্ট। যে ঘটনা আবর্তের জটিলতায় তার ক্রমউদ্ঘাটন সেই কাহিনীর নাটকীয়তাও লক্ষ্য করার মত। ইতিহাসের সঙ্গে এমন অনেক সাধারণ জীবনের কাহিনী যুক্ত হয়েছে যা লেখিকার কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গী ইতিহাসের ঘটনার মতই বর্ণময়। ইতিহাস তো নিত্যসংশয়ের বস্তু, কিন্তু যখনই সেই ইতিহাস একটা বিশিষ্ট শিল্পরীতির আধারে পরিবেশিত তখন সেখানে এমন কিছু কল্পলোকের সৃষ্টি হয়, যা ইতিহাসের সঙ্গে নির্নিমেষে পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে অবিসংবাদিতভাবে সত্য। স্বর্ণকুমারীর ইতিহাস-আনুগত্যের কথা নানাদিক থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু

তার থেকে বড় ছিল তাঁর শিল্পসৃষ্টির সহজাত প্রেরণা। তাঁর কবিতা ও সঙ্গীত এর সব থেকে বড় প্রমাণ, উপন্যাসেও তা দুর্লভ নয়।

বিদ্রোহ' উপন্যাসে ইতিহাসের গৌরবকাহিনীর সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিজীবনের ছোট ছোট অনুভূতিগুলি। সুহারমতীর প্রতি নাগাদিত্যের প্রণয়মোহ এক অনিবার্য ট্র্যাজেডীর সংকেত দিয়েছে। এক একটি স্তরের মধ্য দিয়ে নাগাদিত্য এবং সুহারমতীর প্রেমের বিকাশের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। নাগাদিত্যের প্রতি সুহারমতীর প্রণয়ের মধ্যে আছে কুণ্ঠিত লজ্জা সে একদিকে ক্ষৌরিয়ার প্রেমনিবেদনে অতিষ্ঠ, আরেকদিকে ভীলকন্যারূপে রাজপুত রাজপরিবার সম্পর্কে তার কুণ্ঠা বা হীনমন্যতা। সহজাত নারীহৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে স্বর্ণকুমারী এই ভীলরমণীর ভালবাসার মুকুলকে উন্মোচিত করেছেন। অপরদিকে রাণী সেমন্তীর একদিকে স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম, অপরদিকে সংশয়ের দোলায় বিচলিত হৃদয়; সেইসঙ্গে নাগাদিত্যের একদিকে কর্তব্যবোধ, আরেকদিকে তীব্র রূপমোহের তাড়না—এই সব বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংঘাত স্বর্ণকুমারীর রচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহ' উপন্যাসে নারীমনের কোমল অনুভূতিকে উপলব্ধি করা এবং তাকে সহৃদয়তার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা স্বর্ণকুমারীর যুগের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই প্রশংসনীয়। ঐতিহাসিকতা বিচারে ইতিহাসের পটভূমি খুবই স্পষ্ট কিন্তু তার সঙ্গে মানবজীবনের বেদনামথিত কাহিনী সংযোজন করে নারীপুরুষের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের আত্মমগ্নভাবনাকে লেখিকা তুলে ধরেছেন। ইতিহাস ও কল্পনা এখানে অনায়াসে মিলে গেছে। উপন্যাসে সেইসঙ্গে রয়েছে রূপমোহের অশান্ত গতিপ্রবাহে নিয়তির অমোঘ প্রভাব যা বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ', কৃষ্ণকান্তের উইল' সীতারাম' উপন্যাসের কথা স্মরণ করায়।

যদিও 'মিবাররাজ' ও বিদ্রোহ'—দুটি উপন্যাসই ভীল ও রাজপুতজীবন সংগ্রামের পটভূমিতে লিখিত, তাই আলোচনার ক্ষেত্রে পটভূমির ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। তবে এই উপন্যাস দুটির কালসীমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে স্বর্ণকুমারীর আরেকটি উপন্যাস হুগলীর ইমামবাড়ী' (৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৮)। লেখিকা উপন্যাসটির উপাদান সম্পর্কে বলেছেন, "উপসংহারে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মিত্রের ইংরাজী বক্তৃতার সার অবলম্বনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহম্মদ মহসীনের যে বাংলা জীবনচরিত লিখিয়াছেন 'হুগলীর ইমামবাড়ী' লিখিবার সময় আমরা সেই বইখানি হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তবে পাঠকগণ আমাদের আখ্যায়িকার সহিত ঐ জীবন-চরিতের অনেক স্থলে অমিল দেখিতে পাইবেন।" এই গ্রন্থটিও 'ঐতিহাসিক গ্রন্থ' নামে অভিহিত। এই ঐতিহাসিকতা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। সেই বিরোধের মধ্যে না গিয়েও বলা চলে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস বললেই আমরা মনে করি, দূরত্ব দিয়ে গড়া অতীতের একটি বিশেষ ভাবমূর্তি। লোকচিত্তের এই কল্পনা আম্বস্ত হয়েছে 'দীপনির্বাণ', 'মিবাররাজ'

বিদ্রোহ' উপন্যাসে। 'হুগলীর ইমামবাড়ী'র ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দীর, সুতরাং দূরত্ব বেশি নয়। বলা যায়, জীবনসম্পর্কে মানুষের যে বলিষ্ঠ প্রত্যয়বোধ, যার মধ্য দিয়ে মানবজীবনের মূল তাৎপর্য এবং সত্য বিকশিত, সেই উপলব্ধি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যখন জন্ম নেয়, তখনই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি আসে। 'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভাগীরথী তীরবর্তী জনপদ, মুসলমান শাসনের অন্তপর্বে তার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে তার বিকাশের যে গৌরবময় কাল, তার সামাজিক পরিস্থিতি যার অভ্যন্তরে বিলাসিতা দুর্নীতি হুগলীর জীবনপ্রবাহকে ধারণ করে আছে—তারই ইতিহাস এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। কাহিনীতে মহসীন ভগ্নীর জীবনে বিপরীত-মুখী দুই স্রোতের সংঘর্ষ, এক কঠিন বেদনার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বেদনার মধ্যেই সত্যের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে তার হৃদয়ে। সেই উন্নত জীবনাদর্শকে পূর্বেই অর্জন করেছিলেন মহসীন। পরিশেষে সৎকাজই ভ্রাতাভগ্নীর জীবনের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। এই কাহিনীর মধ্যবর্তী আরও কিছু চরিত্র আছে। যেমন খাঁ জাহান খাঁ, সালাউদ্দীন প্রভৃতি। প্রবৃত্তির নানা সংঘাত তাঁদের চরিত্রে প্রকটিত হয়েছে তার বর্ণনা-বিশ্লেষণেও লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত। তাব থেকেও উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ মানুষের জীবনকে তিনি অনেক কাছের থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মহসীনের সৎ জীবনযাপনের ব্রত, সংগীতজ্ঞ আত্মভোগ ভোলানাথ, বুড়িমা ও তার পুত্র, চুড়িওয়ালা প্রভৃতি চরিত্রগুলির ভূমিকা তাঁর মানবজীবন অভিজ্ঞতারই পরিচয় দেয়।

ফুলের মালা' নামে স্বর্ণকুমারীর দুটি উপন্যাস রয়েছে। প্রথমটির পটভূমি দক্ষিণভারতের বিজয়নগর। কিন্তু ১২৮৯ থেকে ১২৯০ সালের মধ্যে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম রচনাটি অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়টি মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, ১৮৯৫ সালে। 'ফুলের মালা' তাঁর শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং বঙ্গদেশ এই কাহিনীর পটভূমি। গ্রন্থরূপে প্রকাশিত উপন্যাসটির উপকরণ মনে হয়, লেখিকা উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজের পরিচিত চার্লস ষ্টুয়ার্টের **The History of Bengal** থেকে গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ কাহিনীর ঘটনাস্থল। ঘটনাপরিকল্পনা এবং চরিত্রলক্ষণ বিচারের বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় যে 'দীপনির্বাণ' রচনাকালে লেখিকার রোমান্সপ্রিয়তার উত্তরণ ঘটেছে বাস্তবচেতনায় তাঁর পরবর্তী ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতে। এখানে ইতিহাস অনুসরণে তথ্য পরিবেশন থাকলেও, এটি যে মূলতঃ শিল্পকর্ম, সে বিষয়ে লেখিকা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। 'রোমান্সপ্রীতির বশবর্তী হয়ে তিনি কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতাকে কখনই প্রশ্রয় দেননি এই উপন্যাসে। ইতিহাসের সংশয়কে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করেছেন অবশ্যই, তবে সঙ্গতিরক্ষায় ছিলেন ততোধিক সচেতন। সেদিক থেকে 'ফুলের মালা' তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। এটি ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছিল **'The Fatal Garland'** নামে ১৯০৯ সালে ; অনুবাদিকা ছিলেন **A. Ceristiano Albers.**

হিন্দুরাজা গণেশদেবের অভ্যুত্থানের কথা 'ফুলের মালা' উপন্যাসের মূল উপজীব্য। সেই পটভূমিতে সেকেন্দর শাহের অসংযত কামনাবহ্নি, গায়সুদ্দীনের রূপমোহ, আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত গণেশদেব, একদিকে তাঁর বিবাহিতা পত্নী নিরুপমা, অপরদিকে শক্তিময়ী—উভয়ের প্রতি তাঁর মনোভাবের দোলাচলতা, সেই পরিপ্রেক্ষিকায় শক্তিময়ীর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ, আবার গণেশদেবের প্রতি স্পর্শকাতর অনুভূতি—ইতিহাসের সীমানায় প্রতিষ্ঠিত নরনারীর জীবনবাসনাকে লেখিকা মনস্তত্ত্বের জটিল পথ ধরে বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাসে রাজা গণেশ উন্নত চরিত্র নন, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর অভিপ্রায় ছিল ভিন্নমুখী। তখনকার স্বদেশীচেতনাসঞ্জাত প্রেরণা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়েছিল নিঃসন্দেহে : বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সেই লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু শুধুই বীরত্বের উন্মাদনা নয়, সেই শক্তি অনেকক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজাদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী : স্বর্ণকুমারী রাজা গণেশের চরিত্র সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখেছিলেন। রাজা গণেশ এখানে ন্যায়ের পূজারী। অপরদিকে শক্তিময়ীর গভীর প্রণয় যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তখন তার তীব্র অভিমান প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় উত্তাল হয়ে উঠেছে। জীবনের হতাশা নিয়ে শক্তিময়ীর প্রণয় আত্মধ্বংসী রূপ নিয়েছে লেখিকার সুনিপুণ বিশ্লেষণে চরিত্রের আচরণ স্বেচ্ছাচারী কল্পনাবিলাস হয়নি তা বাস্তবতার অনুগামী হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার মধ্যে মধ্যে সামাজিক উপন্যাসও লিখেছেন। দুই ধরণের উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও তিনি তার পূর্বসূরীদের অনুসরণ করেছেন। 'দীপনির্বাণে'র পরেই প্রকাশিত হয় 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯)। তাছাড়াও 'স্নেহলতা' (দুইখন্ড) ১৮৯০ এবং ১৮৯৩, 'কাহাকে' ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের গল্প এবং জাতীয়তাবোধের প্রেরণা তাঁর পূর্বে আলোচিত উপন্যাসগুলির উপজীব্য হলেও, সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমের রীতিই তিনি প্রধানতঃ গ্রহণ করেছিলেন। 'ছিন্নমুকুল' সেই যুগের পত্রপত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। উপন্যাসের নামকরণটি একটি করুণরসের ইঙ্গিত দেয়। বিশাল ঘটনাসমাবেশ, আকস্মিকতা, খলচরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি বঙ্কিম প্রবর্তিত রীতিগুলি স্বর্ণকুমারী প্রয়োগ করেছেন এই উপন্যাসে। তবে নীরজাকে বনবালা বললেও, বঙ্কিমের অরণ্যচারিনী কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনার সঙ্গে ঊনিশ শতকের পাশ্চাত্যসভতার অনুগামী কলকাতার কোন তুলনা চলে না। স্বর্ণকুমারীর 'ছিন্নমুকুলের' পরিমণ্ডল সেই বিচারে অনেকটা কৃত্রিম। তবে মানবজীবনের প্রীতিস্নিগ্ধ মধুর রূপ ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে। কনকের ভাইএর প্রতি যে অপরিসীম ভালবাসা, সেই সম্পর্কটি লেখিকার 'হুগলীর ইমামাবাড়ী' উপন্যাসে মুন্না-মহসীনের কাহিনীতেও দেখা যায়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'দিদি' এবং 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাছাড়া দুটি নারীর পরস্পর সখীত্বের চিত্রাঙ্কণেও স্বর্ণকুমারীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর 'সখিসমিতি' স্থাপন (১২৯০) অন্যান্য উদ্দেশ্যের

৭

সঙ্গে সেই কথাই প্রমাণ করে সাহিত্যেও তার প্রয়োগ করেছেন। কনক ও নীরজার সখীত্বের সম্পর্কটি 'ছিন্নমুকুলে' 'মনের কথার' মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। তবুও 'ছিন্নমুকুল' প্রধানতঃ রোমান্সরসাশ্রিত, উপন্যাসের রসপরিণাম রোমান্সের বাহুল্যে অনেক তরল হয়ে গেছে। মনে হয় 'দীপনির্বাণ' এর প্রভাব থেকে এখানে স্বর্ণকুমারী মুক্ত হতে পারেননি, সামাজিক উপন্যাস লেখা সত্ত্বেও।

'স্নেহলতা' দু'খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৯০ ও ১৮৯৩ সালে। উপন্যাস প্রকাশের বহু বৎসর পরে স্বর্ণকুমারীর একটি মন্তব্য আমরা পাই তাঁর গ্রন্থাবলীর চতুর্থভাগের নিবেদন অংশে। সেখানে লেখিকা বলছেন,—"স্নেহলতা প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ পূর্বের রচনা। দুই তিন বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে ভারতী পত্রিকার কলেবর পুষ্ট করিয়া ১২৯৯ সালে ইহা গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। অধুনা বঙ্গসমাজে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ভাব যেরূপ কার্যকলাপ শত স্রোতে প্রবাহিত – তাহারই পূর্বতন চিত্র তাহারই সূত্রপাত উক্ত সময়ে এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে। অতএব যুগান্তর ব্যবধানে বর্তমানের সহিত অতীতের যে সন্ধি নূতন চিত্রপাতে পুরাতনের যে অপূর্ব ক্রমাভিব্যক্তি স্নেহলতা পাঠে তাহা যদি নবীন পাঠক প্রত্যক্ষ করেন, তবেই লেখিকার গ্রন্থরচনা সার্থক।" উনিশ শতকের নবজাগ্রত চেতনা, ঠাকুরবাড়ীর পটভূমিকায় স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষ, সেই প্রেক্ষাপটেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঞ্জীবনী সভা প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়েছে 'স্নেহলতা'র কাহিনীতে। তার ফলে চরিত্রগুলি অনেকটাই যুগধর্ম অনুযায়ী এবং ঠাকুর পরিবারের স্বদেশসম্পর্কিত চিন্তাভাবনাগুলির প্রতিনিধিত্ব করেছে অনেক ক্ষেত্রে। সর্বোপরি লেখিকার সমাজচিন্তারও স্বাধীন মতামত প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসের নানা স্থানে, যা সেই যুগের মহিলার ক্ষেত্রে অভাবনীয় ছিল। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর উদ্দেশ্য বহুমুখী হওয়ায় কাহিনীর পরিধি অতিবিস্তৃত, ফলে ঘটনাগুলির সংগতিরক্ষায় লেখিকা অনেক স্থানেই সার্থক হননি এবং প্লট হয়েছে শিথিল, অবিন্যস্ত।

ঔপন্যাসিকের কল্পনার ব্যাপ্তি এবং রচনাশক্তির নৈপুণ্য তার সাহিত্যবিচারের অন্যতম মানদণ্ড। পরিচিত জগতের উপাদান সাহিত্যিকের কল্পনার মিশ্রণে অলৌকিক রসসৃষ্টিতে সক্ষম হয় কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করার জন্য তাকে বহিরঙ্গ-গঠনে সচেতন হতে হয়। এই অভিপ্রায় থেকেই উপন্যাসের কলাকৌশলের জন্ম। সেখানে প্রথমেই আসে প্লটের প্রসঙ্গ। প্লটনির্মাণে বঙ্কিম ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বলাবাহুল্য, সমকালীন লেখকদের অনুরূপ স্বর্ণকুমারীরও আদর্শস্থল ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সর্বসাধারণের অনুভূতি-গ্রাহ্য মানবজীবনের যে কাহিনী, সেখানে ইতিহাস বা সমাজ যাই থাকুক না কেন, বঙ্কিমের রচনায় আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত স্বাভাবিক কার্যকারণের ধারায় দ্রুতবেগে কাহিনী অগ্রসর হয়ে অনিবার্য পরিণতি অর্জন করেছে। সেখানে উপকাহিনীগুলির দ্বারা মূল কাহিনীর পরিপুষ্ট হয়েছে, পরিণতিতে সহায়তা করেছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি পৃথক পৃথক সত্তার অভিব্যক্তি

হলেও কেন্দ্রচ্যুত নয় এবং তার বর্ণনাও ঘটনা এবং চরিত্রের ওপর উজ্জ্বল আলোক-পাতের প্রয়োজনে ব্যবহৃত। আঙ্গিক প্রকরণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের অনুরূপ দৃঢ় সংসক্তি স্বর্ণকুমারীর রচনায় পরিলক্ষিত হয় না। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি দেশকালের উত্থান পতনের কাহিনীর ধারায় সংযুক্ত করেছেন জীবনের আনন্দ-দুঃখ-বেদনার ছোট ছোট অনুভূতিগুলি। ফলে উপন্যাস উপভোগ্য হয়ে উঠেছে সেই যুগের গল্পরসপিপাসু পাঠকের কাছে। কিন্তু স্বভাবতঃ উনিশ শতকের বহুমুখী নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখিকার ব্যক্তিগত ভাবনা, বিশ্বাস এবং আবেগ প্রাবল্য। দীর্ঘ বর্ণনা এবং লেখিকার ব্যক্তিত্বকে যুগকে অভিব্যক্ত করাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ফলে উপন্যাসের চরিত্রনির্মাণের দিকটি উপেক্ষিত থেকেছে। তবে স্বর্ণকুমারী উপন্যাসের আলোচনায় আরেকটু সচেতন হলেই দেখা যায় যে তিনি ক্রমশঃ স্বনির্বাচিত রীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং সেইখানেই বাংলা উপন্যাসের জগতে তিনি নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত 'কাহাকে' উপন্যাসটি স্বর্ণকুমারীর স্বকীয় ভঙ্গীর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। স্বর্ণকুমারী তাঁর বহু অধ্যয়ন এবং উপলব্ধি থেকে আঙ্গিক প্রকরণের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনটুকু অনুভব করেছিলেন যে বহির্জগৎ থেকে গল্পের বিষয়কে গ্রহণ করেও, তার মধ্য দিয়ে নরনারীর চিন্তাভাবনা, আদর্শকে রূপ দেবার জন্য স্বতন্ত্র ভঙ্গী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ অন্তর্ধর্মের তাগিদেই কাহিনীকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন।

'কাহাকে' উপন্যাসে কাহিনী বর্ণনা অপেক্ষা মনোবিশ্লেষণেই লেখিকার বেশি আগ্রহ, তবে অন্যান্য উপন্যাসেও সেই কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের শিল্প-কৌশল এবং মনোজগতের জটিল পথের অন্বেষণ উনিশ শতকে লেখা 'কাহাকে' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। আত্মকথনমূলক রীতিতে এর কাহিনী বিবৃত। বাংলা উপন্যাসের জগতে বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতি প্রয়োগ করেছিলেন 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসে। সেখানে অন্ধনারীর হৃদয়ানুভূতি তার নিজের অন্তরের আলোকে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত করার উদ্দেশ্যেই টেকনিকের দিক থেকে তিনি নতুন রীতি গ্রহণ করেছিলেন, একথা বঙ্কিম নিজেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম তিনটি উপন্যাসে নিভৃত আত্মচারিতার আভাস রয়েছে। স্বর্ণকুমারী তাকে প্রয়োগ করলেন 'কাহাকে' উপন্যাসে। যে কল্পনারীতি সেই যুগে নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের স্বাদ এনেছিল। নায়িকা মৃণালিনী উনিশ শতকের শিক্ষিতা নারী। সুতরাং তার চিন্তার জগৎও গতানুগতিকতার উর্ধ্বে। উপন্যাসটি আয়তনে ছোট, বিষয়টি বস্তুমুখী নয়, ভাবমুখী। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ থেকে স্বর্ণকুমারী নিজস্ব পথে চলে এসেছেন। 'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিম ঘটনার বিস্তারকে সংকুচিত করেননি এবং প্রত্যেকটি চরিত্র নিজের কথা বলার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিস্বরূপকে ফুটিয়েছে। সেখানে আত্মবিশ্লেষণ আছে, কিন্তু ঘটনার বিকাশ ও পরিণতির

প্রয়োজনে, ঔপন্যাসিক-নির্ধারিত পথেই তার বিচরণ। নিছক আত্মমগ্নতা কোনো জটিল মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেনি। অপর পক্ষে, স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে' উপন্যাসের ঘটনাবিরলতা, সেই যুগের সাহিত্য লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিকায় বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করার মত।

এই উপন্যাসে মূলচরিত্র একটি নারী, যে মনের গভীরে নিমগ্ন হয়ে জীবনকে নানাদিক থেকে পর্যবেক্ষণ করছে। 'স্নেহলতা'য় উনিশ শতকের কর্মচাঞ্চল্য নানা তর্কবিতর্কের চিত্রের মাধ্যমে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যুগধর্মকে বাস্তবের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করার উপলব্ধি সেখানে বহুচরিত্রের চিন্তা আচরণ কথোপকথন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 'কাহাকে' উপন্যাসের ঋজু দৃঢ়পিনদ্ধ অবয়বসংস্থানে ব্যাপ্তির সুযোগ নেই, লেখিকা যুগধর্ম দ্বারা প্রভাবিত এক নারীর স্বাধীন মনোভঙ্গিকে আত্মকথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা নায়িকার নিজের মনকে না বোঝাই প্রধান সমস্যা, যে মন সর্বদাই ভালবাসা দেবার জন্য ব্যাকুল। ভালবাসার স্বরূপ সন্ধানেই তার আত্মপর্যবেক্ষণ—"যতদূর অতীতে চলিয়া যাই, যখন হইতে জ্ঞানের বিকাশ মনে করিতে পারি তখন হইতে দেখিতে পাই—কেবল ভালবাসিয়াই আসিতেছি, ভালবাসা ও জীবন আমার পক্ষে একই কথা ; সে পদার্থটাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে—আমার আমিত্বই লোপ পাইয়া যায়। ...অনেকেরই সংস্কার আছে পিতৃমাতৃপ্রেম ও যৌবনের দাম্পত্যপ্রেমে অল্পই তফাৎ। ...সকলরূপ গভীর ভালবাসারই মূলগত ভাব একই ; একের সহিত অন্যের পার্থক্য কেবল সে ভাবের স্থায়িত্ব ও প্রবলতার তারতম্যে। ...আসলে প্রেমমাত্রেই একই বস্তু, কেবল বিকাশে ও ভিন্নাধারে ভিন্নকার।" নায়িকা মৃণালিনীর হৃদয়ের এই পথ ধরেই উপন্যাসের প্রণয়কাহিনীগুলি রূপ নিয়েছে। মৃণালিনীর প্রেমিকা অন্তরাত্মা ভালবাসা অর্পণ করার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু তার আধার নেই। সেইখানেই তার অন্তর্দ্বন্দ্ব। কোনো বহির্ঘটনার সংঘাতে এই দ্বন্দ্ব উদ্ভূত নয়, মনের গভীরেই তার উৎস। প্রেমের তীব্র পিপাসা নিয়ে তার মন কোথাও স্থিতিলাভ করেনি। নিজের জীবন মৃণালিনীর কাছে, 'একটা প্রহেলিকা'। সে নানা তর্কবিতর্কে লিপ্ত থেকেও সমাধান পায়নি। গভীর আত্মবিশ্লেষণেও একটি সুস্থির প্রত্যয়বোধে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। রমানাথের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার পর তার অশান্ত হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে—"অস্পষ্ট, অসংযত, বিশৃঙ্খল ভাবনা—মনের মধ্যে কেমন একটা অশান্ত বিদ্রোহী বাসনা, উপস্থিতের উপর বিতৃষ্ণা, অনুপস্থিতের জন্য আগ্রহ, কিন্তু সে অনুপস্থিত যে কি, তাহা সে ভাবনার মধ্যে নাই।" মৃণালিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব বঙ্কিম উপন্যাসের নায়িকাদের মত কার্যকারণসম্পর্কযুক্ত নয় ; বরং আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের শৃঙ্খলাহীন চিন্তার সংকেতবাহী। লিরিক কবিসুলভ দৃষ্টির অধিকারিণী ছিলেন স্বর্ণকুমারী। বিহারীলালের সমগোত্রীয়া না হলেও আত্মভাবাশ্রয়ী বহু কবিতা

লিখেছেন। 'কাহাকে' উপন্যাসে বিষয়কে প্রাধান্য না দিয়ে চরিত্রের আত্মমুখী ভাবনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে স্বর্ণকুমারী নিকটবর্তী করলেন।

'ত্রয়ী' অভিধায় চিহ্নিত 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১) এবং 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫) স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস রচনার শেষ প্রয়াস। তিনটি উপন্যাসের মধ্যে কাহিনীগত সংযোগসূত্র আছে। মূল কাহিনী বিষাদাত্মক, কিন্তু ঘটনাকে অতিক্রম করে একটি ভাবাদর্শ উজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করেছে 'ত্রয়ী'তে। লেখিকার সমকালীন সামাজিক উৎসব, আন্দোলন, তাঁর রাজনীতি সম্পর্কিত ধারণা এখানে স্থান পেয়েছে। সর্বোপরি স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার পথে সংবেদনশীল মনের অনুভূতিগুলি সেই বস্তুজগতের কাহিনীর সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

স্বর্ণকুমারী বাংলাসাহিত্যের জগতে যখন পদার্পণ করেছেন, তখন বঙ্কিমপ্রতিভা মধ্যাহ্ন গগনে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবও ছিল সেইরকম দুরাতিক্রম্য। নবজাগরণের আলোকে তখন অতীত ঐতিহ্যকে যেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস তারই ফলশ্রুতি। সেই পথই গ্রহণ করেছিলেন স্বর্ণকুমারীও। তাছাড়া তাঁর পরিবারের নিজস্ব চিন্তাধারা, স্বাদেশিকতার পটভূমিতে নবজাগ্রত চেতনা এবং তাঁর সাহিত্য প্রতিভা সব মিলিয়ে বাংলা উপন্যাসের জগতে স্বর্ণকুমারী দেবীকে বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাঁর উপন্যাসে বস্তুসচেতনতা, তথ্যনিষ্ঠা যুক্তি তর্কের মধ্যে চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করার যথেষ্ট প্রয়াস আছে। কিন্তু মূলতঃ তাঁর প্রতিভা গীতিকবিসুলভ। কবিতা তো বটেই, সঙ্গীত রচনাতেও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। অনুকূল পরিবেশসৃষ্টিতে উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রে তিনি সঙ্গীতকে স্থান দিয়েছেন। সেই সঙ্গীত কোথাও স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উজ্জীবিত, কোথাও বিষণ্ণ বেদনায় অনুরণিত। নরনারীর মানসিক সম্পর্কের বিভিন্ন ভাববৈচিত্র্য তাঁর গানে ব্যক্ত হয়েছে। আবার সেই কবিমনই তাকে গদ্যভাষায় রূপান্তরিত করে উপন্যাসের নরনারীর মনোবিশ্লেষণে প্রয়োগ করেছে। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যচর্চা নিছক প্রেরণাসর্বস্ব ছিল না তাঁর সুশিক্ষিত পরিশীলিত মননে সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কিত তত্ত্ব অনেকটাই অধিকার করেছিল। কাব্যের রূপ সম্পর্কে তাঁর অভিমত—"কাব্য ও উপন্যাসের বিশেষ প্রভেদ—প্রধানতঃ একের ভাষা গদ্যময়, অন্যের ভাষা ছন্দময়। কবিত্বকল্পনা ও মনুষ্যচরিত্রজ্ঞান উভয়ের মধ্যেই আছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সৃজনশক্তির রূপভেদ থাকিলেও ক্ষমতা বিকাশে কেহ হীন নহে।"* সেই যুগের ঘটনাপ্রধান বাংলা উপন্যাসে বস্তুজগতের বহু অভিজ্ঞতার আঘাতে জর্জরিত মানবচরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্বভার নিয়েছিলেন পুরুষ সাহিত্যিকরা। এদেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশেও উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম যুগে এই ঘটনাই সত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাব জীবনসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু নতুন মাত্রার সংযোজন করলেও সমাজপ্রথার দিক থেকে পুরুষপ্রাধান্যই মুখ্য ছিল। ফলে উপন্যাসের

কেন্দ্রবিন্দুতে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের যে চিত্র, সেই চিত্রাঙ্কনে ঔপন্যাসিকের নিষ্ঠার অভাব ছিল না, তবুও সমঅধিকার বোধের প্রশ্নটি নিরুত্তর থেকেছে। ইউরোপীয় উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম যুগেও একই মনোভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে নারী-মননের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ঘটেছে মহিলা-ঔপন্যাসিকদের সাহিত্য রচনায়। দেশে বিদেশে উভয়ক্ষেত্রেই আবেগতাড়িত অনুভূতিকে অতিক্রম করে নারীচরিত্রগুলি তখন বাস্তব অভিমুখী হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবী সেই বিচারে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক [illegible] নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই [illegible] সমাজসচেতনার পরিচয়বাহী। নারীর সহজাত হৃদয়ানুভূতিকে চিনতে ভুল করেনি লেখিকার নিজস্ব জীবনদৃষ্টি। একথা ঠিক যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নারীর কোন নিজস্ব বক্তব্য ছিল কিনা, তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলেছি স্বর্ণকুমারী ছিলেন সেই নারী, ঠাকুরবাড়ীর উদার জীবনপরিবেশে যার মানসিকতা গড়ে উঠেছিল এবং সেই উপলব্ধি থেকেই [illegible] অন্তর্মুখী জগৎকে তিনি অন্বেষণ করেছেন। 'কাহাকে' উপন্যাসে নায়িকার [illegible] বিশ্লেষণ, আত্মজিজ্ঞাসা, নিজের স্বাধীনসত্তা সম্পর্কে সচেতনতা—সর্বোপরি মানবমনের আলোছায়ার নিবন্ধন [illegible] সেখানে প্রকাশের ব্যাকুলতা। সেই অনুভূতির আলোকেই তার উপন্যাসে [illegible] বহির্ভূত [illegible] এসেছে, আর সেই স্বকীয়তাই [illegible] বাংলা উপন্যাসের [illegible] প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মপরিচয়—[দ্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী—১০ম খণ্ড—জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ—পৃঃ ২০৭—২০৮]

২। Priyaranjan Sen: Western Influence in Bengali Literature 2nd Ed.—P. 222—223]

৩

৪। হরপ্রসাদ রচনাবলী

৫। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ দ্বিতীয় সংস্করণ—পৃ. ১৮৯।

৬। স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ

৭। বঙ্কিমরচনাবলী ১ম খণ্ড—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃ. ২৭

৮। স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত 'পৃথিবী' (১৮৮৯) গ্রন্থের পরিশিষ্ট
[দ্রঃ—পশুপতি শাসমল : স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য, প্রথম সংস্করণ—পৃ ১৬৮

৯। রমাবাই—ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৬, পৃঃ ২৪৪
[দ্রঃ—পশুপতি শাসমল : স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য, প্রথম সংস্করণ—পৃ ৩৬২

রমেন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জননী এবং প্রিয়া—একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ

[এক]

"চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা।" উপন্যাসটির সূচনায় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ চোখের বালিতেই দেখা দিল সাহিত্যে নব পর্যায়ের পদ্ধতি—"আঁতের কথা বের করে দেখানো।" এবং "মানব বিধাতার নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ" যখন বাংলা ভাষায় প্রকাশ হতে শুরু করলো, তখন "ঐ পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ'।" ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হলো 'চোখের বালি'। তার ঊনচল্লিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন, ১৩৪৭ সালে, 'সূচনা'য় উপরোক্ত তথ্যগুলি ব্যক্ত করলেন, তখন তিনি শুধু প্রাজ্ঞ বিচারকই নন তাঁর দীর্ঘ পরিক্রমার মধ্যে ক্রম উন্মোচনের একটি ধারাবাহিকতায় তিনি নিশ্চিত। এবং একই সঙ্গে আমরা জানি যে, তাঁর সব মন্তব্য অবিচ্ছিন্ন কোনো সাধারণ উক্তি মাত্র নয়। তাঁর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ও জীবন-চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর তখনই আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার নিদারুণভাবে আহত হয় একথা ভেবে যে, 'মায়ের ঈর্ষা' সন্তান মহেন্দ্র মধ্যেকার রিপুকে ভয়ঙ্কর করে তুলে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি নরনারীর জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিল। বিস্ময় বেড়ে ওঠে, যখন দেখি যে রামায়ণ এর মতো বিমাতার ঈর্ষাপ্রসূত কোনো চক্রান্ত নয়, জন্মদাত্রী জননী রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষার কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। গভীর বেদনার সঙ্গে 'মায়ের ঈর্ষা'র এই ভয়ঙ্কর ঘোষণা আমাদের মেনে নিতে হয়।

কবির এই উক্তিকে শিরোধার্য করে যদি আমরা বিহঙ্গ দৃষ্টিতেও রবীন্দ্র উপন্যাসগুলির দিকে তাকাই, কয়েকটি আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করি। গোরা, যোগাযোগ, ঘরে বাইরে বা চার অধ্যায়-এর মতো প্রধান উপন্যাসগুলিতে মা-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে এবং মা-এর এই অস্তিত্ব ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে ভিন্নতর মাত্রা লাভ করেছে। আর একই সঙ্গে সবিস্ময় দেখি তাঁর নায়িকারা কেউই নন মা। যেখানে কোনো নায়িকা বা পার্শ্ব চরিত্রের মাতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—তাকে মেনে নিতে হয়েছে পরাভব। এরকম একজন নায়িকা ও অন্তত দুটি অপ্রধান অথচ বিশিষ্ট নারী চরিত্র আমরা তিনটি রবীন্দ্র-উপন্যাসে দেখতে পাই। কালানুক্রমিক ভাবে উপন্যাসগুলিকে বিন্যস্ত করে—সেখানে মায়ের ভূমিকা, নায়িকার মধ্যে মাতৃসত্তার অস্তিত্ব ইত্যাদি অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করবো। পরিশেষে আমরা সন্ধান করবো সেই সূত্রের যা রবীন্দ্রমানসে এই বিশিষ্ট মাতৃচেতনা সঞ্চারিত করেছে। অত্যন্ত সহজ হতো আমাদের কাজ, যদি রবীন্দ্রনাথ নির্বোধ তরল প্রণয় কাহিনী, প্রচলিত সহজ ত্রিভুজ প্রণয় আখ্যান অথবা নিছক বক্তব্যধর্মী রাজনৈতিক উপন্যাস লিখে যেতেন। কিন্তু ভোলা যায় না

যে তিনি সেই স্রষ্টা দীর্ঘ আশি বছর ব্যাপী বিচিত্র সৃষ্টি কর্মে এমন একটি কিছুও লেখেন নি যা কিনা বৃহত্তর অখণ্ড জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। নানা বিচ্যুতি মেনে নিয়েও রবীন্দ্র উপন্যাসগুলিকে সেই বৃহত্তর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা সম্ভব নয়।

[দুই]

"এ যুগের কারখানাঘরে" উপন্যাস বানানো শুরু হলো 'চোখের বালি' থেকে। এই উপন্যাসেই 'মায়ের ঈর্ষা মানুষের নিহিত পাশব সত্তাকে অসংযত, প্রকাশ্য ও হিংস্র করে তুললো। নায়ক মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। বাইশ বছর বয়সের এম. এ. পাশ—"তবু মাকে লইয়া তাহার মান-অভিমান আদর-আবদারের অন্ত ছিল না। কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।" এই শাবকটিরই জননী রাজলক্ষ্মী। এই জননীটি শুধুই একমাত্র পুত্র মহেন্দ্রকে বেঁধে রাখতে চান। নিঃসন্তান জা অন্নপূর্ণা সম্বন্ধে "রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন. পুত্রসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছেন।" আসলে রাজলক্ষ্মীর মধ্যেই ঈর্ষা ডালপালা মেলেছে —যতই তিনি পুত্রকে একান্ত করে পেতে চেয়েছেন। সন্তানহীনা অন্নপূর্ণা অনায়াসে যে আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মহেন্দ্র-বিহারী-আশার কাছে পেয়েছেন তা পাবার জন্য রাজলক্ষ্মীর মরণান্ত প্রয়াস শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল করে তোলে। 'চোখের বালি' অবশ্যই মহেন্দ্র-আশা-বিহারী-বিনোদিনীর কাহিনী। এই চারটি নরনারীর জটিল বিচিত্র মানসিক সংঘাতের পর্যায়গুলি অতিক্রম করার সময় এই দুটি একান্ত বাস্তব নারীকে আমরা প্রত্যক্ষ করি. রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। নিজের জন্মদাত্রী জননী রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ অনায়াসে উপেক্ষা করেছে মহেন্দ্র— বিনোদিনীকে বিবাহ না করে; কিন্তু অন্নপূর্ণার ভাইঝি আশাকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে চেয়েছে। অতএব "তাহার বারম্বার অনুরোধ অপেক্ষা অন্নপূর্ণার চক্রান্ত যে সফল হইল, ইহাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববিধানের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।" এবং "এইরূপে রাজলক্ষ্মী. অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্রর মধ্যে নিষ্ঠুর নিগূঢ় নীরব ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল।" এরপর মহেন্দ্র যতই নববধূ আশাকে নিয়ে মত্ত হয়েছে, জননী রাজলক্ষ্মী ততই অসহিষ্ণু হিংস্র হয়ে উঠেছেন। আশা যখন "সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায়.........স্বামীর পদপ্রান্তে অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকার" করেছে, তখন রাজলক্ষ্মী "নিজের চিত্তদাহে অন্নপূর্ণাকে দগ্ধ করিতে গেলেন।" এরপর ঘটনা যত অগ্রসর হয়েছে—মায়ের ঈর্ষাও ততই ক্রূর হয়ে উঠেছে। "রাজলক্ষ্মীর সমস্ত গর্জন এবং দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অন্নপূর্ণা। তাঁহার আহার নিদ্রা দূর হইল।" রবীন্দ্রনাথ মায়ের পাশে এক সন্তানহীনা নারী, অন্নপূর্ণাকে, স্থাপিত করেছেন। যাঁর কোনো স্বত্ব, কোনো দাবী নেই—যিনি আপন অধিকারের সীমায় বাঁধতে চান না, না চাইতেই যিনি অনায়াসে

মায়ের আসনটি অধিকার করে নেন,—সেই মাতৃমূর্তির সূচনা অন্নপূর্ণাকে দিয়ে। রাজলক্ষ্মীকে "মাতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে লাগ ফেলিয়া" দেখতে হয় ভালোবাসার গভীরতা। মনে মনে ভেবে নেন—"অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগে এবং আমার গৃহত্যাগে প্রভেদ আছে—সে হইল মন্ত্র-জানা ডাইনি : আর আমি হইলাম শুদ্ধমাত্র মা।" আসলে শুদ্ধমাত্র মা হলেই সন্তানকে পাওয়া যায় না, সন্তানও শুধুমাত্র গর্ভধারিণী মা'র মধ্যেই সম্পূর্ণ জননীকে পায় না। মন্ত্রজানা-ডাইনি, মুক্ত মাতৃসত্তার মধ্যেই সত্যিকার জননীর অবস্থান। এই মন্ত্রের সন্ধানেই আমাদের যাত্রা। একদিন, যখন আশা-মহেন্দ্র-বিহারী বৃত্ত থেকে অন্নপূর্ণা স্বেচ্ছায় অপসৃত, যখন বিনোদিনী সেই বৃত্তটিকে জটিলতর ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, তখন বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে বলেছে—"তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই।" সে আরও বলেছে যে তারা কতকটা জেনে, কতকটা না জেনে ফাঁদ পেতেছে। আসলে "আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ—আমরা মায়াবিনী।"—আমাদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। এ-কোন্ অন্তহীন অন্ধকার জগতে প্রবেশ করছি আমরা, যেখানে মা এবং ছলা-নিপুণা বিনোদিনী এক' রাজলক্ষ্মী আর বিনোদিনীর ধর্ম অভিন্ন। দুইজনেই মায়াবিনী' তবু অবশেষে সেই রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হই আমরা। বিনোদিনীর কামনা বাসনার উগ্র শিখাগুলি যেমন ক্রমেই স্তিমিত, ম্লান হয়ে আসে ; মহেন্দ্রের বুকে যেমন দেখা দেয় ক্ষত, আশাকে ফিরে পাবার ব্যাকুলতা ; তেমনই অন্নপূর্ণার ক্ষমাসুন্দর অস্তিত্বের পাশাপাশি এক পরিশুদ্ধ জননীকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। যে একান্ত বাৎসল্য একদিন রাজলক্ষ্মীকে ক্রুর হিংস্র ঈর্ষাকাতর করেছিল, অনেক দুঃখে, বেদনায়, বিচ্ছেদের তাপে সেই বাৎসল্য, মুক্তির মধ্যে ভালোবাসায় ফিরে পেলো মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনী-বিহারীর মধ্যে আসল সন্তান। যে-সন্তান গর্ভজাত নয়—তার প্রতিও জেগে উঠল অপার মমতা। এই অর্জিত মাতৃত্বে অভিষিক্ত রাজলক্ষ্মীর ছবিটি আমাদের মানস পটে উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত হয়ে যায়। তাঁর শেষ বাণীটি ভোলা যায় না—আশাকে মহেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে, অন্নপূর্ণাকে ডেকে বললেন—"মেজবউ, এসো ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো—তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হউক।" বিহারীকে অনুরোধ করলেন মহিমকে ক্ষমা করতে। আশীর্বাদ করলেন মহেন্দ্রের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব যেন চিরকালের হয়। বিনোদিনীকেও আশীর্বাদ করলেন তিনি। শেষবেলায় সমস্ত বুক তাঁর ভরে উঠলো পূর্ণতার আনন্দে। বড় দুঃখে বড় বেদনায় এই ফিরে পাওয়া। মৃত্যু তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। রয়ে গেলেন অন্নপূর্ণা। আশা মহেন্দ্রের দাম্পত্য জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, বিহারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিক্ত নিঃস্ব বিনোদিনীকে নিয়ে যাত্রা করলেন। চোখের বালিতে এভাবেই রাজলক্ষ্মী ক্রমেই ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ভেঙ্গে মা হয়ে উঠেছেন। একাকার হয়ে গেছেন অন্নপূর্ণার সঙ্গে। চারটি যুবক-যুবতীর প্রণয়লীলায় এই দুই মাতৃসত্তাকে রবীন্দ্রনাথ কেন স্থাপিত করেছেন আমরা

পরে তা বিচার করবো। কারণ মায়ের এই বিশিষ্ট ভূমিকা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—তা-ও পরবর্তী উপন্যাসগুলি উন্মোচন করলেই দেখা যাবে। সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, আশা অথবা বিনোদিনী - কেউই নন মা।

'চোখের বালি' বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, ১৩০৮ থেকে ১৩০৯, প্রায় সাত মাস ধরে। এরপর 'প্রবাসী' পত্রিকায়, ১৩১৪ থেকে ১৩১৬, প্রায় দু'বছর ধরে প্রকাশিত হয় 'গোরা'—শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, বাঙলা সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিবিধ ভারত চেতনার মহাকাব্য। তাঁর সবচেয়ে বৃহদায়তন এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, প্রেম, সংস্কার, সমকালীন বাঙলা, ভারতবর্ষ ও কলকাতা সবকিছুকে একত্রিত করেছেন। তর্কের বাহুল্য আছে। ব্রাহ্ম-হিন্দু এবং ভারতীয় ইংরেজ বিরোধ—দু'টি প্রণয় কাহিনীর ক্রমবিকাশে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। বিনয়-ললিতার প্রণয়, অথবা বিনয়ের ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ ঘটিত সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন—উপন্যাসের নায়ক নিঃসন্দেহে গোরা। উপন্যাসের প্রায় গোড়াতেই গোরার জন্মরহস্য আমরা জেনে গেছি। তার উপন্যাস যতই অগ্রসর হয়েছে—সবকিছু ছাপিয়ে যিনি একান্ত বাস্তব হয়েও দীপ্যমান হয়ে উঠেছেন, সকলকে ম্লান করে দিয়ে—তিনি আনন্দময়ী। উপন্যাসটিতে আরও একজন মা আছেন—বরদাসুন্দরী। আপন সন্তানদের গুণপনা জাহির করতে সদাই ব্যস্ত। তার নিজের কন্যাদের সঙ্গে সুচরিতাকে বিশেষ ভাবে আলাদা করে দেখেন। অথচ যে সন্তানকে তিনি আপন অধিকারে বাঁধতে চান, সেই ললিতাই বাঁধন ছিন্ন করে আশ্রয় নেয় নিঃসন্তান জননী আনন্দময়ীর কাছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দু'টি চরিত্রের বৈপরীত্য জাতীয় সস্তা চমক সৃষ্টি করেন নি। আসলে আনন্দময়ী স্বমহিমায় ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তা ও মাতৃ-ভাবনা আনন্দময়ীর মধ্যে মূর্ত। অথচ তিনি রূপক বা প্রতীক নন। একান্তই মানবী। এই কর্মময় তরঙ্গিত সংসারে দুঃখে বেদনায় সহিষ্ণুতায় তার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা। বিচিত্র তার নিজস্ব সংসার। 'গোরা আনন্দময়ীর দাম্পত্য সম্বন্ধকে বিন্ধ্যাচলের মতো বিভক্ত করিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার এক পারে অতি সতর্ক শুদ্ধাচার লইয়া কৃষ্ণদয়াল একা এবং তাহার অন্য পারে তাহার ম্লেচ্ছ গোরাকে লইয়া একাকিনী আনন্দময়ী। গোরার জীবনের ইতিহাস পৃথিবীতে যে দুজন জানে তাহাদের মাঝখানে যাতায়াতের পথ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" আর আছে সপত্নী পুত্র মহিম—নিতান্তই গৃহস্থ। বিমাতার প্রতি ভালোবাসাও নেই, বিদ্বেষও নেই। এবং অবশ্যই খৃষ্টান দাসী লছমিয়া—যার জন্যে আনন্দময়ীকে হিন্দুসমাজের নিন্দা গ্লানি সহ্য করতে হয়। তিনি তথাকথিত শিক্ষার আলোক প্রাপ্তা নন। তর্ক করে সত্যকে বাঁধার প্রয়াস তিনি করেন না। সংসার এবং সত্য—দুই-ই তাঁর কাছে সহজে উদ্ভাসিত। গোরা বিশ্বাস করেছে—"স্ত্রী জাতিকে পুজো করবার জায়গা হল মার ঘর, সতীলক্ষ্মী গৃহিণীর আসন।" আর তাই আনন্দময়ীর সংস্কারহীনতা, শাস্ত্রাচার-বিমুখতা গোরাকে যখন তর্কে নামিয়েছে, তিনি তখন

অসংকোচে জানিয়েছেন যে তাঁর চিরদিনের সংস্কার, আচার-নিষ্ঠা একদিনে ছেড়েছেন—গোরাকে কোলে নিয়ে। "জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না।"—এসব কথার নিহিত সত্য গোরা জানে না। তবু সে বলে—"আমার মার মতো মা কজনের আছে।" আর অন্যদিকে বিনয়, উপন্যাসের ৪-পরিচ্ছেদে, তার অশান্ত উদ্বেল চিত্ত নিয়ে গভীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে একটি মানসিক আশ্রয় খুঁজে নিল আনন্দময়ীর মধ্যে। তাঁর কর্মনিবিষ্ট স্তব্ধ মুখের ছবিটি কল্পনা করে সে মনে মনে বললো, "এই মুখের স্নেহদীপ্তি আমাকে আমার সমস্ত মনের বিক্ষেপ হইতে রক্ষা করুক। এই মুখই আমার মাতৃভূমির প্রতিমাস্বরূপ হউক, আমাকে কর্তব্যে প্রেরণ করুক এবং কর্তব্যে দৃঢ় রাখুক।" মনে মনে তাকে আবার মা বলে ডাকল। ঘটনার অনেক জটিল আবর্ত পার হয়ে, গোরার কারাবাসের সময় ৩৬-পরিচ্ছেদে, দুই ব্রাহ্ম আধুনিক ও শিক্ষিত পরিবেশের তরুণীকে দেখি আনন্দময়ীর মুখোমুখি। 'হিন্দুবাড়ির মেয়ে সম্পর্কে' ললিতার অভ্যস্ত ধারণা বিপর্যস্ত হয়েছে। আনন্দময়ীর মধ্যে সে অনুভব করেছে "যেমন বল তেমনি শান্তি, তেমনি আশ্চর্য সদ্‌বিবেচনা।" তাঁর "স্নেহে করুণায় শান্তিতে মণ্ডিত মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার বুকের ভিতরকার সমস্ত বিদ্রোহের তাপ যেন জুড়াইয়া গেল, চারিদিকের সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সহজ হইয়া আসিল।"

গোরার দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, বিনয়, এবং সুচরিতার সঙ্গে সম্পর্ক, সবকিছুর মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে উঠেছে তার হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার। যে লছমিয়া তার শৈশবে বসন্তরোগের সময় সেবা করে বাঁচিয়েছে—তার ছোঁওয়া খাবারও প্রত্যাখ্যান করেছে গোরা, কারণ সে খৃষ্টান। কিন্তু সর্বসংস্কারমুক্ত "মাতার অনাচারকে সে যতই নিন্দা করুক এই আচারদ্রোহিনী মাকেই গোরা তাহার জীবনের সমস্ত ভক্তি সমর্পণ করিয়া পূজা করিত।" আর সুচরিতা। তাকে ঝড়ের পর, বিনয় ললিতার বিবাহ যখন সম্পন্ন হয়ে গেল,—আমরা আনন্দময়ীর এক অনন্য রূপ প্রত্যক্ষ করলাম। উদার হৃদয় পরেশবাবুও ভেবেছেন এই বিবাহ কোন্ মতে সম্পন্ন হবে, শালগ্রাম শিলা থাকবে কিনা। এইসব আনুষ্ঠানিক সমস্যায় ব্রাহ্ম পরেশবাবুর মতো বিব্রত নন হিন্দু-গৃহিনী আনন্দময়ী। আর, সব পীড়নের পর, ৭০-পরিচ্ছেদ, "আনন্দময়ী এমনি সহজে তাহাকে এত কাছে টানিয়া লইয়াছেন যে, কোনোদিন যে তিনি তাহার অপরিচিত বা দূর ছিলেন তাহা সুচরিতা মনেও করিতে পারে না।" ললিতার জীবনে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ সহজ হয়ে গিয়েছিল তাঁর সান্নিধ্যে - আগেই ; সুচরিতার উপলব্ধি আরও গভীর। তার মনে হলো কিছু না বলেও "তিনি সুচরিতাকে যেন একটা গভীর সান্ত্বনা দান করিতেছেন। 'মা' শব্দটাকে সুচরিতা তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া এমন করিয়া আর কখনো উচ্চারণ করে নাই।" বরদাসুন্দরীর কাছে সে পালিতা, হরিমোহিনী তাকে তার মৃতা কন্যার আসনে বসাতে চেয়েছেন। কিন্তু সুচরিতা তার 'মা'-কে খুঁজে পেয়েছে সন্তানহীনা আনন্দময়ীর মধ্যেই। আর এভাবেই এক জননীর, এক মাতৃমূর্তির বিশাল রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। পরিশেষে সেই

চরম মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে আসে, গভীর বেদনা অতিক্রম করে এক অনন্ত প্রসারিত সত্তার মধ্যে আমরা অবগাহন করি। কৃষ্ণদয়ালের কাছ থেকে আপন সত্য পরিচয় জানার পর গোরা জিজ্ঞাসা করেছিল—এতদিন তিনি একথা বলেননি কেন। "আনন্দময়ী নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ লইলেন; কহিলেন, 'বাপ, তোকে পাছে হারাই এই ভয়েই আমি এত পাপ করেছি'।" গোরা তার উত্তরে শুধু 'মা' বলেছে ডেকেছে। এরপর সেই গভীর বিশাল উপলব্ধি। অনেক আগে, ৬-পরিচ্ছেদে, আমরা জেনেছি, মিউটিনির সময় এটোয়া শহরে রাত-দুপুরে এক বিদেশিনী আনন্দময়ীর বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিল। "সেই রাত্রেই ছেলেটি প্রসব করে সে তো মারা গেল।" এরপর সেই বাপ-মা-মরা ছেলেকে বুকে তুলে মানুষ করেছেন আনন্দময়ী। "এমন করে যে ছেলে পেয়েছি সে কি গর্ভে পাওয়ার চেয়ে কম?" সে ছিল শুধু আনন্দময়ীর পাওয়া। এরপর গোরা-কে অবলম্বন করে ঘটেছে তাঁর মাতৃসত্তার বিস্তার। গোরার সমস্ত কর্ম ও বাসনার প্রবণতা, তার চরিত্রের বিশালতা— সবকিছু যে প্রাচীরে প্রহত হচ্ছিল, তা হলো তার হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য অহঙ্কার। এইবার, নিজেকে আইরিশ পিতার সন্তানরূপে জানার পর তার মুক্তি ঘটেছে। এটুকু আমরা জানি। কিন্তু ভোলা যায় না— পরেশবাবুকে সে বলেছে, "আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে, এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।" বহুবার উদ্ধৃত এই উক্তিটিতেই কিন্তু উপন্যাস শেষ হয়নি। এখানে আনন্দময়ী কোথায়? সবশেষের পর তাই রবীন্দ্রনাথ একটি 'পরিশিষ্ট' সংযোজিত করেছেন। গোরা আনন্দময়ীর "দুই পা টানিয়া লইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিল।" এবং বলল, "মা, তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

আনন্দময়ীকে ভারতের রূপকে পরিণত করেননি তিনি। স্নেহে, হৃদয়ের মুক্তিতে, সংস্কারহীনতায়, অনাবিল প্রসন্নতায় তিনি গোরাকে ছাড়িয়ে—বিনয়, সুচরিতা, ললিতা - সকলের মা হয়ে উঠেছেন। অবশেষে বেদনায়, সহনশীলতায়, ত্যাগে হয়ে উঠলেন ভারতবর্ষ। দুটি পৌরাণিক চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছে—কর্ণ এবং শকুন্তলা। জন্মের পরই মাতৃক্রোড়চ্যুত এই দুই মানব-মানবী বিশাল বিশ্ব-সংসারে দুঃখ ও পরাভবের মধ্য দিয়ে অবশেষে উত্তীর্ণ হয়েছে—বীরত্বে অথবা প্রেমে। 'মুক্তধারা' নাটকে, কুড়িয়ে পাওয়া অভিজিৎ, মৃত্যুর মধ্যে মহৎ মুক্তি অর্জন করেছে। কিন্তু গোরা এতদিন ধরে যা খুঁজেছে, কৃষ্ণদয়াল-আনন্দময়ীর সন্তানরূপে অর্জিত গৌরবে অনড় থেকে যা সে পায়নি—আপন জন্ম-রহস্য উন্মোচিত হবার পর একান্ত অনাত্মীয়া এই রমনীর মধ্যেই সে সেই সত্য খুঁজে পেয়েছে। আসলে যে জননী জঠরে লালন করেন, সন্তানের প্রীতি তাঁর সহজ অধিকার। আর তাই অশোভন রূপে তা

সংকীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ। স্নেহ দাবী রূপে, অধিকার অধীনতা রূপে সত্যকে আচ্ছন্ন করে। যিনি দাবীর অধিকার থেকে মুক্ত, সহজে পাওয়া মাতৃত্ব যাঁকে অসহিষ্ণু করে না—স্বাভাবিক বাৎসল্যে, মমতায় তিনিই জননী। আপন সন্তানের প্রতি বিরূপতায় এবং অন্যের সন্তানের প্রতি স্নেহে আমাদের বাঞ্ছিত কল্পনালোকের অবাস্তব মা হয়ে ওঠেন নি তিনি। ললিতা, হরিমোহিনী, পরেশবাবু সবার প্রতিই তিনি সমান প্রসন্ন। কেউ নন তাঁর শত্রু—এমনকি সপত্নী-পুত্র মহিমও; লোকনিন্দা-গ্লানিতেও তিনি নির্বিকার। গৃহধর্ম পালনেও তিনি অকুণ্ঠচিত্ত। আমরাও ধীরে ধীরে এক পরম বোধে আক্রান্ত হই। কবি জানতেন, যা সহজে পাওয়া যায়, তা সহজেই স্খলিত হয়ে হারিয়ে যায়। দুঃখের সাধনায় সত্যকে অর্জন করতে হয়। সেই অর্জিত সম্পদই চিরকালের। তাই বরদাসুন্দরীরা যে সহজে পাওয়া জননীর সীমিত অধিকারে আবদ্ধ, আনন্দময়ীর অর্জিত মাতৃত্ব সেই সংকীর্ণতার সীমা অতিক্রম করে, সামাজিক নিন্দা, স্বামীর দেওয়া দুঃখ, সব কিছু অকাতর চিত্তে বহন করে বৃহত্তর মাতৃলোকে উত্তরিত। সংসারের সীমিত পরিসরে 'চোখের বালি'র রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার মুক্ত মাতৃসত্তায় মিলিত হয়েছিলেন। মানব-চেতনার বৃহত্তর পটে, গোরার দেশ-কাল-বিজড়িত মানসজগতে, আমাদের সংকীর্ণ-জাতীয়তার ম্লান আচ্ছন্ন ভাবলোকে আনন্দময়ীর শাশ্বত প্রতিষ্ঠা।

[তিন]

'গোরা' প্রকাশের প্রায় পাঁচ বছর পরে ১৩২১ সালে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হলো 'চতুরঙ্গ'। প্রথমে 'জ্যাঠামশায়' নামে। পরে 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' অখণ্ড রূপ নিয়ে দেখা দিল। 'চতুরঙ্গ' নিঃসন্দেহে নতুন কালের উপন্যাস। আর 'সবুজপত্র' দিয়েই তো বাংলা সাহিত্যে নবীনের প্রবেশ। চারটি নরনারীর বিচিত্র জটিল মানসিকতার ইতিহাস 'চতুরঙ্গ'। উপন্যাস হিসেবে বহু বিতর্কিত। 'চোখের বালি বা 'গোরা'-র ঘটনার জাল অপসৃত। এ-এক নতুন অপরিচিত জগৎ। আমাদের পরিচিত স্মৃতিগুলি সেখানে আশ্রয় পায় না। মনোজগতের এই প্রবল ঝড়ের মধ্যে পুরনো মায়েদের, রাজলক্ষ্মী অথবা আনন্দময়ীদের আমরা আর খুঁজে পাই না। তাঁরা সক্রিয় নন তেমনভাবে কোথাও। অথচ আশ্চর্যভাবে উপস্থিত তাঁরা। কোনো না কোনো রূপে। আর নায়িকা-প্রধান পরবর্তী উপন্যাসগুলি, 'চতুরঙ্গ' এবং 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' অথবা 'চার অধ্যায়'-এর দামিনী, বিমলা, কুমু অথবা এলা—কেউ নন সন্তানবতী। তবু কুমুর মাতৃত্বের সম্ভাবনায় উপন্যাসের সমাপ্তি। এবং বিমলার মধ্যেও এক অভাবিত মাতৃত্বের উদ্ভাস প্রত্যক্ষ করি আমরা। কুমারী এলার মধ্যেও কি জেগে ওঠে স্নেহ, বাৎসল্য!

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নায়িকা দামিনী। কিন্তু প্রথম অংশ 'জ্যাঠামশায়' যখন লেখা হয়—তখন দামিনী আসেনি। জ্যাঠামশায়, জগমোহন ও ভাইপো শচীশের

বিদ্রোহী মানসিকতার এই কাহিনীর মধ্যে একটি নারী চরিত্র আমরা পাই—ননিবালা। এই দরিদ্র কুমারী গর্ভবতী মেয়েটিকে অবলম্বন করে যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলেছিল—তা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ভূমিকা। এই ঘটনাটি আমাদের পোষিত সংস্কারকে টলিয়ে দেয়। জগমোহন শুধু তাকে আশ্রয় দেন না; পরম স্নেহে, শ্রদ্ধায় সম্মানিত করতে চান। শ্রদ্ধায়! আমাদের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন দিদিমার মুখে শোনা যায় "না বলিস কাকে রে।" জগমোহন ঘোষণা করেন, "জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণ সংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম দেন তাঁকে।" আর এভাবেই যখন সম্মান, স্নেহ স্বীকৃতি সবকিছু তার করতলগত, তখনই সৌভাগ্যের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে নীরবে নিজেকে সমর্পণ করল মৃত্যুর হাতে—স্বেচ্ছায়। সেই পুরুষের প্রতি দুর্বলতায়—যে তার মৃত অবৈধ সন্তানের পিতা। এভাবেই ননিবালার এবং একই সঙ্গে জগমোহনের ও শচীশের, বিদ্রোহের শিখাগুলি নিবিয়ে দেয় তার জননীসত্তা। আর দামিনী! "দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী"। এই অকাল বিধবা সন্তানহীনা নারীর কি অতুল চিত্তের সম্পদ! কিন্তু মৃতা ননিবালা তবু বিজড়িত হয়ে থাকে। শচীশের ডায়ারিতে আছে ঃ "ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল. যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি: সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন-রসের রসিকা· সে কিছুই ফেলিতে চায় না: সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ।" ঈশ্বর, গুরু, সমাজ সব তার কাছে তুচ্ছ। স্বামী জীবিত অবস্থায় শুরু করেছিল "ভক্তির দস্যুবৃত্তি", আর "মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত-সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষ ভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।" শচীশ আর শ্রীবিলাসের পাশাপাশি থেকেও সে গুরুর অনুরাগিনী হলো না। বেড়ে গেল জীবনের প্রতি অনুরাগ। গুরুকে অকম্পিত কণ্ঠে জানালো—'আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন" আর, এরপর অনেক দুঃখ যন্ত্রণা আঘাত বিচ্ছেদের মর্মঘাতী অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে বিধবা দামিনী শ্রীবিলাসের স্ত্রী-রূপে নারীত্বের পূর্ণতায় উত্তরিত হলো। তবু কি কিছু বাকী থাকে! "যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল. জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া উঠিতে লাগিল" দামিনী. নিতান্ত অসময়ে তার জীবনের দিগন্ত বেলায় শ্রীবিলাসের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।" শুধু কি স্বামীরূপে শ্রীবিলাসকে ফিরে পাবার অপূর্ণ বাসনা? হয়তো আরও গভীরতর কোনো ইচ্ছা—মাতৃত্বেরও হতে পারে!

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে যা বলা হয়নি. প্রায় একই সময়ে, একই 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তা বললেন। বললেন সহজ ভাবে একান্ত আধুনিক কালের ভাষায়—চলতি ভাষায় যে ভাষা তিনি এই প্রথম ব্যবহার করলেন

উপন্যাসে। এই উপন্যাসটিও নানা বিরূপ সমালোচনার শরে বিক্ষত। সন্দেহ নেই, উপন্যাস-শিল্পরূপে এটি অনেক দুর্বলতায় আক্রান্ত ; সন্দীপের, এমন কি, কখনো কখনো নিখিলেশেরও, বাস্তবতা আমাদের সংশয়িত করে। তবু বিমলার দাহ, তার জীবনে ঘর ও বাইরের সংকট, সব কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে। বিমলাকে দিয়েই উপন্যাসের শুরু ও সমাপ্তি। অতীত ও বর্তমানকে, সব বিরোধী চরিত্রগুলিকে একটি সাধারণ সূত্রে গ্রথিত করেছে সে-ই। অনায়াসে সে যা পেয়েছিল, সহজেই তা স্খলিত হয়ে গেছে। অসম্মানিত জীবনের ভার একে একে নামিয়ে, বেদনায়, অনুতাপে সে আবার প্রত্যাবৃত্ত হতে চেয়েছে,—অবশ্যই 'ঘরে'—নিখিলেশের নিশ্চিত আশ্রয়ে। কিন্তু কোন্ সত্য সে হারিয়েছে এবং কোথায় তার প্রত্যাবর্তন। 'ঘরে বাইরে' কখনোই নয় একটি প্রচলিত ত্রিভুজ-প্রণয়-উপাখ্যান। একটি নারীর, ভারতীয় নারীর, পতন ও উত্থানের ইতিবৃত্ত ; আধুনিক, পাশ্চাত্য আদর্শের নারী স্বাধীনতা, মুক্তি ও শিক্ষার সংকট—বিমলার মধ্য দিয়ে রূপায়িত। তার সঙ্গে সমকালীন স্বদেশী আন্দোলন, তার সীমাবদ্ধতা, দাম্পত্য জীবনের সংকট, পারিবারিক সমস্যা—এবং অবশ্যই নারী-পুরুষের 'বর্বর ভালোবাসা', 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসকে অন্তর গতিতে বয়ে নিয়ে চলেছে। ছড়ানো ছিটানো নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্র এবং তাদের মনোজগৎ, আদর্শ ইত্যাদি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু বিমলার যন্ত্রণার সঙ্গেই সব কিছু অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এবং বিমলা তার 'আত্মকথা' শুরু করেছে মৃত মায়ের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। আসলে, এক ভয়ংকর পরিণামের মুখোমুখি, এক সর্বনাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিমলা স্মরণ করেছে তার অস্পষ্ট ম্লান হয়ে আসা পরম উজ্জ্বল সম্পদটির কথা, যা হারিয়ে সে আজ গভীর সর্বনাশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত, যা নিজের মধ্যে অনুভব করে তার নিজেকে ফিরে পাওয়া। সেই হারানো সম্পদটির কথা বিমলা ভোলে নি। রবীন্দ্রনাথ ভুলতে দেননি। আমরাও ভুলতে পারি না।

"মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁদুর, চওড়া সেই লাল পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর।" বিমলার "চিত্তাকাশে ভোর বেলাকার অরুণরাগরেখার মতো" সেই সোনার পাথেয় নিয়ে জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। পথ ঢেকে গেল দুর্যোগের মেঘে। তবু সেই "আলোর সম্বল, জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষা-সতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?" মায়ের পুণ্যের দীপ্তি, ভক্তির সৌন্দর্য বিমলার মনের মধ্যে একটি সুর জাগিয়ে তুলেছিল। "তর্ক না, ভালো-মন্দের তত্ত্ব নির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর। সমস্ত জীবনকে যদি জীবন-বিধাতার মন্দির প্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে, তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।" সেই নারীর হৃদয়, যার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়। এরপরই এল 'আর-এক-যুগ', 'এখনকার কাল'। আর সেই নতুন কালে "যেটা নিঃশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো করে গড়ে তোলবার

উপদেশ আসছে।" সধবার পাতিব্রত্যের কথা সুর চড়িয়ে বলতে হচ্ছে বলেই বিমলা বুঝেছে—"জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।" এভাবেই 'মা' তাঁর যে সহজ সুন্দরের আসনটি বিছিয়েছিলেন বিমলার মনস-ভূমিতে, সেই "স্ত্রীলোকের ভালবাসা" যা "পূজা করেই পূজিত হয়", তা ক্রমেই হারিয়ে গেল। বিমলা সুন্দরী ছিল না, সবাই বলত, "বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।" আর "মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত।" পতনের সীমানায় দাঁড়িয়ে, অতীতকে ফিরে দেখার সময় সেই কথা. মায়ের পুণ্য-দীপ্তির কথা স্মরণ করে বিমলার মনে হয়েছে, রূপের অভিমান থাকলে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তার নিজের "অভিমান ছিল সতীত্বের।" স্বামীর ইচ্ছায় সে যখন বাইরে বের হল, বিক্ষুব্ধ রাজনীতি আর তার কেন্দ্রপুরুষ সন্দীপ যখন তাঁর ঘরকে, সেই সতীত্বের অভিমানকে, মুছে দিয়ে ক্রমেই নামিয়ে আনলো এক আশ্বাসহীন পরাভবের অন্ধকার জগতে, তখন সে মনে করলো "তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওরই হাতে বাজতে লাগল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে—কিন্তু বীণা তো বাজল।" আর এভাবেই মায়েব পুণ্য-দীপ্ত আলোয গড়ে ওঠা বিমলার সব কিছু গেল রসাতলে। মা নেই, কিন্তু যা ছিল তর রেখে যাওয়া ঐশ্বর্য, অনায়াসে পেয়ে অনায়াসেই তা হারালো বিমলা। নিখিলেশ জানে, "বিমলাকে আমার সাধনার মধ্যে পাইনি।" তাকেই সে দিনরাত সাজিয়েছে, পরিয়েছে, শিখিয়েছে, তাকেই প্রদক্ষিণ করেছে। কিন্তু মনে রাখেনি, "মানুষ যে কত বড়ো, জীবন যে কত মহৎ।" সন্দীপ তো বিমলার ভ্রান্তির অবলম্বন মাত্র। যে সত্যকে সে পেয়েছিল, সেই স্বভূমি থেকে স্খলিত হয়েই তো এই প্রকাণ্ড মিথ্যা আর ভুলকেই প্রাপণীয় বলে মনে হয়েছে। এরপর শুধু ধারাবাহিক পতন। চরম যন্ত্রণাময় সেই বিস্মৃতির মুহূর্তে এল বালক অমূল্যচরণ। সেই বালকের মুখে সন্দীপের বুলি শুনে বিমলার বুক কেঁপে উঠল। "আমার মধ্যে মা জেগে উঠল।" আর এভাবেই যে মা-এর আলোর সম্বল, উষা-সতীর দান নিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল, দুর্যোগের মেঘে যা ঢাকা পড়েছিল, অমূল্য তার উদ্ধারের শেষ সম্বল ফিরিয়ে দিল। "নারী-হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল।" এরপর যদিও "প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে", তবু এই সুপ্ত মাতৃত্বই বিমলার সব দ্বিধা আর ভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে তাকে বেদনায় অনুতাপে সত্যের ঘরে ফিরিয়ে আনলো। সেই সত্য, যার সহজ সুরটি, মা'র কাছ থেকে পাওয়া সুন্দর চেতনাটি, সে হারিয়েছিল মিথ্যার স্তবে, পূজিত হওয়ার প্রবল বাসনায়; পুরুষকে বশ করার অনায়াস দক্ষতার গর্বে। তাই শেষ 'আত্মকথা' বিমলার প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। "চলো চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো, সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগর সংগমে।" উপন্যাসের

একেবারে সূচনায় বিমলা জীবনকে জীবন-বিধাতার মন্দির প্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার মধ্যেই সার্থকতা খুঁজেছিল। নিখিলেশ "সহধর্মিনীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত" করেছে। নিজে যা হতে পারত তা নিখিলেশের "চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারেনি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ খইয়ে ফেলেছে।" আর সেই ক্ষয়-ক্ষতির পর, পরম দুঃখের বেদনায় বিমলা তার জীবন-বিধাতাকে বলেছে "আর এক দিন তুমি আমার ভোরবেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশি বাজিয়েছিলে সেই বাঁশিটি বাজাও, সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক। তোমার সেই বাঁশির সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নূতন করে সৃষ্টি করো।" সন্দেহ নেই—বিমলা সেই সুরের কথাই বলেছে—যে বাঁশি তার মায়ের মধ্যে বেজে উঠতে শুনেছে সে। আর বিমলাই তো হয়ে উঠেছে মা। গর্ভজাত সন্তানের নয়: অমূল্যচরণের। সে আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দুঃখের ভারগুলি একে একে নামিয়ে যেটুকু রইল তাই তো শাশ্বত। দুঃখের সাধনায় অর্জিত সম্পদ। আমাদের দেশও তাই। কোনো কল্পিত মাতবর নয়: দরিদ্র, ভাগ্যহত হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের মধ্যে নেমে এসে নিখিলেশ সেই মাকে চিনেছে। সন্দীপ শুধু মাতাল করে, ধ্বংস করে। আনন্দময়ীর মধ্যে গোরা যে দেশ-মাতৃকাকে দেখেছে, নিখিলেশ সেই মাকে জানে বলেই ধ্বংসের মন্ত্রটাকে অস্বীকার করে। নিন্দা অপবাদে অটল থাকে। গোরা আনন্দময়ীর শরীরী অস্তিত্বের সীমাহীন বিস্তার উপলব্ধি করেছে। তার চেতনায় ভারতবর্ষ মূর্ত হয়েছে আনন্দময়ীর মধ্যে। আর নিখিলেশ যে ভারতবর্ষকে জানবার জন্যে দুঃখের পথ স্বেচ্ছায় বরণ করে কল্পিত দেশ-মাতৃকাকে অস্বীকার করেছে; যে ভাবলোকের মা'কে ইচ্ছামত রূপ দিয়ে সন্দীপ শুধু মাতিয়ে তুলেছে—গড়ে নি, বিমলা সেই মা'কে নিজের মধ্যে জেনে সন্দীপের মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে। নারীর সত্য অবস্থান কোথায় এবং সেই ভূমি থেকে ভ্রষ্ট হলে মিথ্যার রূপে ক্ষুব্ধ হয়ে সর্বস্ব হারাতে হয়—বিমলা সেই সত্য জেনেছে, কারণ সে তো তার মায়েরই মেয়ে। এবং সে মা অমূল্যের মধ্য দিয়ে আবার ফিরে এসেছেন।

[চার]

'ঘরে বাইরে'-র (১৩২২) পর 'যোগাযোগ' (১৩৩৪—১৩৩৫),—প্রায় বারো বছরের ব্যবধান। রাজনীতির উত্তাল ঝড় আর রবীন্দ্রনাথকে তেমন করে আলোড়িত করে না। মানুষের বেঁচে থাকার, হয়ে ওঠার, নিজেকে বিকশিত করার বিচিত্র রহস্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। অখণ্ড ধারাবাহিকতায় নিরন্তর নিজেকে ভেঙ্গে যেমন গড়ে তুলতে হয়, তেমনই প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও অন্তরের শুভ-মঙ্গল ও কল্যাণ দীপটি অনির্বাণ রেখে সত্য ও সৌন্দর্যকে ফিরে পাওয়া যায়। আমাদের স্বপ্নে গড়ে তোলা কাঙ্খিত সৌন্দর্য বাস্তবে পাওয়া যায় না। তবু স্বপ্ন মিথ্যা নয়। সেই স্বপ্নকে,

সেই সৌন্দর্য চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখার দ্বন্দ্বে বিক্ষত কবি-হৃদয় একই সময় বৃত্তে সৃষ্টি করল—'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' উপন্যাস, 'মহুয়া' কাব্য এবং 'তপতী' নাটক। সর্বগ্রাসী মোহর সঙ্গে প্রেমের মুক্তির অথবা মুক্ত প্রেমের দ্বন্দ্ব, জীবন-যাপনের ও মূল্যবোধের নিয়ত পরিবর্তমানতার মধ্যে নারী-পুরুষের প্রেমের সম্পর্কের সংঘাত এই পর্বে কবিকে বিচলিত করেছে। এবং, অবশ্যই আবার তিনি উপন্যাসের জগতটিকে নামিয়ে এনেছেন কঠিন বাস্তবে, যদিও নরনারীর ভাব-জগতই তাঁর অন্বিষ্ট।

'বিচিত্রা' পত্রে ধারাবাহিক ভাবে, প্রথম দু সংখ্যায় 'তিনপুরুষ' নামে এবং তৃতীয় বারে 'যোগাযোগ' নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী 'চতুরঙ্গ' এবং 'গোরা'র অন্বর গতির কথা মনে রাখলে এই উপন্যাসটির দ্রুতি বিস্ময়কর মনে হয়। অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশতম জন্মদিনের কথা দিয়ে গল্পটার আরম্ভ। "কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।" অতএব আমরা ফিরে গেছি ঘোষাল ও চাটুজ্যে বংশের সাবেক কালের সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ততম ইতিহাসে। এরপর অবিনাশের পিতা মধুসূদন ও তস্য পিতা আনন্দ ঘোষালের কথা। অন্যদিকে বিপ্রদাস-কুমুদিনী, তাদের জনক-জননী মুকুন্দলাল-নন্দরাণীও আছে। কুমুদিনী-মধুসূদনের বিবাহ, সংঘাত ও বিচ্ছেদের গল্পই 'যোগাযোগ'। গল্প ঘুরেফিরে এসে ঠেকেছে কুমুদিনীর তরঙ্গিত মানস-তটে। আর যাকে দিয়ে গল্পের আরম্ভ—সেই অবিনাশ ঘোষালের জন্ম সম্ভাবনার উল্লেখেই গ্রন্থের সমাপ্তি। আসলে 'তিনপুরুষ'-এর গল্প হয়ে ওঠেনি বলেই কি 'যোগাযোগ'? এসব কথা মনে রেখেই শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ'-এ ক্ষোভ জানিয়েছেন, "সেইজন্যেই মুকুন্দলাল এবং নন্দরাণীর সংক্ষিপ্ত পূর্বকাহিনী-টুকুও আমাদের কাছে অনাবশ্যক বলে মনে হতে থাকে। 'তিন পুরুষে'র ইতিবৃত্ত রচনার প্রতিশ্রুতি লেখক যখন পালনই করতে পারলেন না, তখন ও অংশটুকু না থাকলেও কোনো ক্ষতি ছিল না মনে হয়।" তবু রবীন্দ্রনাথের মতো সচেতন শিল্পী কেন ঐ অংশটুকু বর্জন করলেন না! নন্দরাণী মুকুন্দলাল-সম্পর্ক কি একান্তই বিচ্ছিন্ন? প্রক্ষিপ্ত?

অনেক রচনার অনেক অংশ যিনি পরে নিষ্ঠুর ভাবে পরিত্যাগ করেছেন সেই, অবিরাম সৃজনশীল শিল্পী, রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রেখেছেন। আসলে এই উপন্যাসে 'মা'-এর ভূমিকা কোনো অংশে গোণ নয়, তার কাহিনী যতই সংক্ষিপ্ত হোক। গল্পের প্রথমে 'মা', এবং শেষেও 'মা'! বিপ্রদাস-কুমুদিনীর পিতা মুকুন্দলালের জীবন, পুরাতন কালের ধনবানদের প্রথামত দুই-মহলা। তার গার্হস্থ্য-মহলের গৃহিণী নন্দরাণী ছিলেন অভিমানিনী। "সেইজন্যেই স্বামী যখন নিজের ভালোবাসার' পরে নিজে অন্যায় করেন, তিনি সেটা সইতে পারেন না।" কারণ,জানেন যে বাইরের টান যতই সুদূর হোক—ভিতরের শক্ত টান তারই দিকে। অতএব সন্তানদের বন্ধন অনায়াসে ছিঁড়ে, স্বামীর প্রতি দুর্জয় অভিমানে তিনি চলে

গেলেন বৃন্দাবনে। ফিরেছিলেন, স্বামী মুকুন্দলালের মৃত্যুর পরে। স্বামীর মৃত্যুর পরও লোহা সিঁদুর ছাড়েননি—এমনই তাঁর সতীত্বের অহংকার। আর তারও পর সূর্য গেছেন উত্তরায়ণে, মাঘ মাস এল, শুক্ল চতুর্দশী। নন্দরাণী কপালে মোটা করে সিঁদুর পরলেন, গায়ে জড়িয়ে নিলেন লাল বেনারসী শাড়ি। সংসারের দিকে না তাকিয়ে, মুখে হাসি নিয়ে চলে গেলেন।" সেই মায়েরই মেয়ে কুমুদিনী। এই সলতে পাকানোর পর সন্ধ্যার দীপ যখন জ্বললো. দেখা গেল—কুমুও স্বামীকে ছেড়ে চলে আসে সেই অভিমানে, অহঙ্কারে। কিন্তু মধুসূদন নন মুকুন্দলাল। নন্দরাণীর বৃন্দাবন-যাত্রার পর এক দাম্ভিক, প্রভুত্বগর্বী উদ্ধত পুরুষের নির্মম পরাজয়ের যন্ত্রণা আমরা দেখি। সেই উন্মত্ত দিনে মুকুন্দলালের কাছে একমাত্র যে "আসতে পারত সে কুমুদিনী। সে এসে পাশে বসে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার মুখের দিকে মুকুন্দলাল চেয়ে দেখেন—যেন তার সঙ্গে ওর চোখে কিংবা কোথাও একটা মিল দেখতে পান।"

যে মিল পিতা মুকুন্দলাল যেন খুঁজে পেয়েছিলেন কুমুদিনীর মধ্যে, পরে অনেক পরে, মধুসূদন ঘোষালের সঙ্গে বিয়ের পরদিন কি আমরা তা-ই দেখতে পাই। "সাধ্বী নারীর আদর্শরূপে সে আপন মাকেই জানত। কী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য, কত দুঃখ, কত দেবপূজা, মঙ্গলাচরণ, অক্লান্ত সেবা।" এই মায়ের আদর্শের পাশাপাশি অবশ্যই তার বাবার "ব্যবহারের ত্রুটি চরিত্রের স্খলন" দৃষ্টি এড়ায় না। এবং মুকুন্দ-লালের মধ্যে ঔদার্যে বৃহৎ চরিত্র, পৌরুষে দৃঢ় হীনতা কপটতাহীন মর্যাদাবোধ কুমু-কে চিরকাল অভিভূত রেখেছে। মধুসূদনকে কোনোভাবেই পিতা অথবা দাদার পাশাপাশি স্থাপন করতে পারেনি সে। এরপর অশালীন রকমের উদ্ধত, ঐশ্বর্যে স্ফীত স্থূল কর্কশ স্বামী মধুসূদনকে চিরকালের জন্যে ত্যাগ করে এসেছে সে। আর তখন বেশি করে বোঝা গেল যে "কুমু তার বাবাকে খুব বেশি ভালোবাসত, জানত তার হৃদয় কত কোমল।" আসলে তিনি ছিলেন খুব বড়ো। অন্যদিকে বিপ্রদাসও বাবাকে বড়ো বলেই ভক্তি করেছে। "কিন্তু বারে বারে স্খলনের দ্বারা তার মাকে তিনি সকলের কাছে অসম্মানিত করতে বাধা পাননি এটা সে কোনোমতে ক্ষমা করতে পারলে না। তার মাও ক্ষমা করেননি বলে বিপ্রদাস মনের মধ্যে গৌরব বোধ করত।" নিজের মায়ের অপমানকে সমস্ত স্ত্রী জাতির অসম্মান বলে মনে করতো। বিপ্রদাস চেয়েছিল, কুমু ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কিন্তু তবু মায়ের প্রতি বাবার ভালোবাসা—বিপ্রদাস কুমুদিনী দুজনেই স্বীকার করেছে। আর কুমু দাঁড়িয়েছে ভালোবাসাহীন এক নিদারুণ অসম্মানের জগতে, মধুসূদনের স্থূল নির্মম অহংকারের ঘৃণ্য দূষিত পরিমণ্ডলে। বিপ্রদাস মায়ের অসম্মানকে নারীর অসম্মান জেনে. বাবার ভালোবাসা সত্ত্বেও. সেই পুরুষদের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে কুমুকে লড়াই করতে বলেছে। কুমুদিনীর বিদ্রোহী সত্তা প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে গেছে. সে কি মায়ের কথা মনে রেখে! কারণ এর কিছু পরে, সাত পরিচ্ছেদ পরে. ৫৭ পরিচ্ছেদে. যখন বিপ্রদাসও জেনে গেলেন যে কুমু সন্তান-সম্ভবা,

তখন কুমুদিনীর পরিণাম ঘনিয়ে এলো। এবার তাকে ফিরে যেতেই হবে। কারণ কুমুর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করবার স্পর্ধা বিপ্রদাসের নেই। কুমু মেনে নিয়ে বলেছে, তবু "এমন-কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।" বিপ্রদাস তখন আশংকা জানিয়েছেন যে আগে ছেলে হোক! কুমুর উত্তর—"…মার কথা মনে আছে তো ? তাঁর তো হয়েছিল ইচ্ছামৃত্যু। সেদিন সংসারে তিনি তাঁর জায়গাটি পাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন।… একদিন যেদিন বাঁধন কাটব, মা সেদিন আমাকে আশীর্বাদ করবেন, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।" সন্তানদের মায়া কাটাতে পেরেছিলেন বলেই নন্দরাণীর ব্যক্তিত্বের শিখাটি শেষ দিন পর্যন্ত ছিল নিবাত, নিষ্কম্প। তিনি ফিরেছিলেন স্বামী মুকুন্দ-লালের মৃত্যুর পর। আর স্বামীর ভালোবাসা পেয়েছিলেন বলেই, নিজের ভালোবাসার অহংকারে বাইরের বৈধব্যকে স্বীকার করেন নি আমৃত্যু। স্বামীকে তিনি ত্যাগ করেছেন বাইরে। বহন করেছেন অন্তরে। মৃত্যুকালে তাই সিঁদুর আর বেনারসী। দ্বিতীয় পুরুষে, কুমুদিনীকে ফিরে আসতে হলো সেই স্বামীর কাছে যার মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল।" আর সেই "মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে।" নিজের বিদ্রোহী সত্তার অপহ্নব ঘটিয়ে কুমুকে প্রত্যাবৃত হতে হয় সেই মধুসূদন ঘোষালেরই দম্ভের আশ্রয়ে। কারণ—সেই বন্ধন, সেই মাতৃত্ব। যে বন্ধন অনায়াসে ছিঁড়ে নন্দরাণী আপন নারীত্বের মহিমায় শেষ পর্যন্ত ভাস্বর, অনাগত সন্তানের জন্য ভাবী জননী কুমুকে বিসর্জন দিতে হলো সেই মহিমার ঔদ্ধত্য, অন্তত সাময়িকভাবে। এরপর কি ঘটেছে আমরা জানিনা। জননীর ভূমিকায় আমরা কুমুকে দেখি না। তিনপুরুষের বিবরণ অসমাপ্ত রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। গোরার মধ্যে আনন্দময়ী অথবা অমূল্যচরণের মধ্যে বিমলা এবং আনন্দময়ীর মধ্যে গোরা বা বিমলার মধ্যে অমূল্যচরণ মুক্তির স্বরূপ খুঁজে পেয়েছে। সন্তানদের বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তি নন্দরাণীর। গর্ভজাত সন্তানের জন্যই অবাঞ্ছিত বন্ধন মেনে নিতে হয় কুমুকে। একালের মা কে।

'যোগাযোগ' প্রকাশের সময়েই 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা হলো এক আশ্চর্য উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। ভাষার এমন বিস্ময়কর দ্যুতি ও দ্যাতি আর কখনও দেখা যায়নি। পরিহাসস্নিগ্ধ এই সাবলীল প্রবহমান ভাষার ঐশ্বর্য নিপুণ দক্ষতায় বিশ্লেষণ করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' বইতে। বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে একটি বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক প্রেমের কাহিনী, যেখানে কেউই নয় বিবাহিত। এবং অভাবিত এর মিলনান্ত পরিণাম—আগে পরে আর কখনও যা দেখা যায়নি। আসলে রবীন্দ্রনাথের যে প্রেম-ভাবনা অনেক আগে 'মানসী' কাব্যের 'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি' কবিতাদুটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, 'সুরদাসের প্রার্থনা' বা 'নিষ্ফল কামনা'র মধ্যে যে-সুর শোনা গিয়েছিল—তাকেই কবি রূপ দিলেন 'শেষের কবিতা'য়। বাঙলা

সাহিত্যের একটি প্রচলিত জনপ্রিয় ছক হলো প্রেয়সী নারীর মধ্যে মাতৃসত্তার আরোপ। রবীন্দ্রনাথ এ-দুটিকে পৃথক রেখেছেন। ভাবলোকর সঙ্গে বাস্তবের বিপুল ব্যবধান কবি অনুভব করেছেন বলেই 'মানসী'র নায়ক-পুরুষ নারীর অভিযোগের উত্তরে বলে "কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে. / রহিলে না ধ্যানধারণার!" অমিতের সঙ্গে কেতকীর "সম্বন্ধ ভালোবাসারই; কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। তার লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি; সে ঘরে আনবার নয়. আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" নর-নারীর প্রণয় এক অভিনব সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াল। যে নারী কল্পনালোকের মানসী তাকে বাস্তবে পাওয়া যায় না। অতএব "যে আমারে দেখিবারে পায় / অসীম ক্ষমায় / ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি." তার হাতেই নিজেকে সমর্পণ করেছে অমিতেরই কল্পনায় গড়ে ওঠা লাবণ্য। আর অমিত লাবণ্যর "রূপ চিরন্তন" ধরে রাখলো অন্তর্ধানপটে। সুরদাসেরই মতো।

'শেষের কবিতা'র চার বছর পরে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হলো পর পর 'দুইবোন' (১৩৩৯) ও 'মালঞ্চ' (১৩৪০)—দুটি ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস। এক বিবাহিত পুরুষের জীবনে দুই নারীর আবির্ভাবজনিত সংকট। 'দুইবোন'-এর সূচনা 'শর্মিলা' পর্বের এই ঘোষণা দিয়ে — 'মেয়েরা দুই জাতের.... ...এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।' রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন মা-এর সঙ্গে বর্ষাঋতুর আর প্রিয়ার সঙ্গে বসন্তঋতুর। আর এভাবে মা আর প্রিয়াকে সম্পূর্ণ আলাদা করে গড়লেন তিনি শর্মিলা ও ঊর্মিমালার মধ্য দিয়ে। শশাঙ্কমৌলীর স্ত্রী শর্মিলার "সন্তান হয় নি, হবার আশাও বোধ করি ছেড়েছে।" আর তাই স্বামী শশাঙ্কর "ঘরে আরোগ্য ও আরামের জন্যে শর্মিলার এই যেমন সস্নেহ ব্যগ্রতা, বাইরে সম্মান রক্ষার জন্যে তার সতর্কতা তেমনি সতেজ।" 'সস্নেহ ব্যগ্রতা' ছিল বলেই 'স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাত।' তার তাই, বোন ঊর্মিমালা যখন নিয়ত-ব্যস্ত-শশাঙ্কর জীবনে বসন্তের উদ্দাম হাওয়া বয়ে আনলো—তখন শর্মিলা নিজেকে বললো, "আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারি নি। ভেবেছিলুম ঊর্মিমালার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়. ও যে সম্পূর্ণ আর-এক মেয়ে।" এই 'প্রাণ পরিপূর্ণ' উচ্ছল তরুণী ঊর্মিমালার মধ্যে শশাঙ্ক তার প্রিয়াকে খুঁজে পেয়ে সব কিছু ভুলেছিল। যদিও জানত শর্মিলা "তো দেবী। তাকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করি নে।" কিন্তু ঊর্মিমালাকে জীবন-সঙ্গিনী করার বাসনা নিয়েই উপন্যাসের কাহিনী-বৃত্তের জটিলতা। নীরদের হাত থেকে ঊর্মি-র মুক্তি জটিলতাকে আরও বাড়িয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত সন্তানহীনা জননীরূপা স্ত্রী শর্মিলারই তো জয় হয়েছে। সর্বনাশ যখন তার ছায়া বিছিয়েছে শশাঙ্কর দাম্পত্য-জীবনে. ব্যবসা যখন তার উদাসীনতায়, অবহেলায় বিপর্যস্ত—অনুতপ্ত ঊর্মি এসেছে তার দিদির কাছে ক্ষমা চাইতে। বলেছে, তাকে তখনই দূর করে তাড়িয়ে দিতে। "আজ দিদি নিশ্চিত স্থির করে বসেছিল কিছুতেই ঊর্মিকে ক্ষমা করবে না। মন গেল গলে।" এভাবেই মা তার কোমল

স্নিগ্ধ ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে, ফিরে গেছে প্রিয়া—অনুতাপে, বেদনায়। ত্যাগে সার্থক হয়েছে উর্মি-র প্রেম। হয়তো লাবণ্যেরই মতো। শর্মিলা সস্নেহ ভালোবাসায় ফিরে পেয়েছে স্বামী শশাঙ্ককে। আর শশাঙ্ক, সব উদ্দামতার শেষে, সর্বনাশের ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবার প্রত্যাবৃত হয়েছে "স্ত্রীর অতিলালনের আওতায়।" শর্মিলার বিশ্বাসের, ক্ষমার আর ভালোবাসার নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু তবু দুজনের মাঝখানে রয়ে গেল তাঁরই 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের সেই মৃত বালিকার মতোই, দুর্বর্তিনী উর্মিমালা, যাকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব। মা আর প্রিয়ার সংঘাত নতুন মাত্রা পেল এইভাবে।

বিনোদিনী-দামিনীরা ব্যর্থ মাতৃত্বের হাহাকার নিয়ে, স্ত্রীর সর্বগ্রাসী অধিকারবোধ নিয়ে, ক্রূর হিংসা হয়ে দেখা দিল 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নীরজার মধ্যে। ১৩৪০-এ 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত কাহিনীটির প্রথমেই আছে—নীরজা-আদিত্যর দাম্পত্যজীবনের "প্রথম দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে।" এরপর প্রথমে 'ডলি' কুকুর ও তার মৃত্যুর পর আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে অবলম্বন করে যখন নীরজার রুদ্ধ মাতৃত্ব অশান্ত অভিঘাতে আলোড়িত, তখনই দেখা দিল তার সন্তান-সম্ভাবনা। আর, অবশেষে "অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে।" আর সেই ব্যর্থ জননীই অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখলো আদিত্য-সরলার-সম্পর্কের গড়ে ওঠা। তার জীবনের পুষ্প-পত্রহীন শুকনো বাগানে একটি মাত্র মালাকর ছিল যে সাজিয়ে দিতে পারতো মালঞ্চখানি, সে আদিত্য। আর এই আদিত্যকে সরলার হাতে সমর্পণ করে নিজেকে নিঃশেষিত ও আপনাকে, শেষবারের মত পূর্ণ করে তুলতে পারতো নীরজা। কিন্তু অনাগত সন্তান যে তাকে দেহে-মনে রিক্ত নিঃস্ব এবং পরিণামে হিংস্র করে দিয়ে গেছে। আর কোনো মার পক্ষে যেমন সহজ নয় সন্তানকে পুত্রবধূর বা প্রণয়িণীর হাতে সমর্পণ করা, নীরজার পক্ষেও সহজ নয় অমানবিক-আদিত্যকে সরলার হাতে সমর্পণ করা। তবু তার মৃত্যু হয়তো সরলা-আদিত্যকে মিলিত করবে, যার মাঝখানে নিশ্চিত থাকবে মৃত নীরজা।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' প্রকাশিত হলো ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৪১ সালে। "বই বাহির হওয়ামাত্র দেশের মধ্যে ভীষণ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল।…লোকে বলিতে আরম্ভ করিল গভর্ণমেণ্ট এই বই কিনিয়া অন্তরীণাবদ্ধদের দিতেছেন, বিপ্লব দমনের জন্য এই বই সরকারের উপযুক্ত অস্ত্র হইয়াছে।" (রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড/প্রভাত মুখোপাধ্যায়)। যদিও সেসময়ে রাজস্থানের দেউলী বন্দীনিবাসে নির্বাসিত বিপ্লবী সরোজ আচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঃ চার অধ্যায়' প্রবন্ধে স্পষ্টই জানিয়েছেন "এমন কোনো সন্দেহের ঘূণমাত্র আমাদের মনে স্থানে পায়নি", যদিও তাঁরা বিচলিত ব্যথিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, তাঁদের রবীন্দ্রনাথ "বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে, বিপ্লবী-চরিত্রকে কী করে এত লঘুভাবে প্রগল্‌ভ প্রণয় কাহিনীর সামিল করতে পারলেন?" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কথা কোবিদ রবীন্দ্রনাথ'-এ একমাত্র নাট্যিক বিন্যাস ছাড়া

'চার অধ্যায়'-এর মধ্যে কোনো গুণই খুঁজে পাননি। "ব্রতভ্রষ্ট অতীনের বেদনা এবং এলার ট্র্যাজিডী" অর্থহীন। পটভূমি, কাহিনী, চরিত্র, সবই কাল্পনিক। বুদ্ধদেব বসুর মতো সংবেদনশীল, নিরপক্ষে সমালোচক ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীও তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' বইয়ে দেখিয়েছেন, "বাংলার সন্ত্রাসবাদের রক্তবর্ণ পটভূমিকায় দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমের উন্মীলন ও আত্মঘাতী পরিণতি। এই হলো 'চার অধ্যায়ে'র বিষয়বস্তু।" এবং অতীনের স্বধর্ম-ভ্রষ্টতার ট্র্যাজেডী আর 'বর্বর ভালোবাসা'ও স্ত্রী পুরুষের ইন্দ্রিয় কামনার উজ্জ্বল রূপায়ণের জন্যই 'চার অধ্যায়' মূল্যবান। এমন একটি নির্বোধ তরল প্রণয় কাহিনী লিখলেন রবীন্দ্রনাথ তার শেষতম উপন্যাসে, যে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতের সবকটি দিগন্ত জুড়ে তাঁর অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রসারিত করে গেছেন? খুব আশ্চর্য লাগে একথা ভাবতে। বুদ্ধদেব বসুর মতে অতীন-এলার প্রেমের "মধ্যে যে বেদনা আছে সেটা বাইরে থেকে আসেনি : যুগলের উপর তৃতীয়ের কোন অভিঘাত নেই।" এবং সন্ত্রাসবাদ পটভূমি মাত্র, রাজনীতি ততখানিই প্রয়োজনীয় 'যতটুকু তা অতীনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক, তার বিভীষিকার রক্তরেখা যেখানে-যেখানে ছিটকে পড়েছে, তাও শুধু অতীনের ধ্বংসের পথটিকে লাল তীরের মতো এঁকে এঁকে দিচ্ছে।" অতএব এলা-অন্তুর মরণান্ত ভালোবাসার পেছনে, অন্তুর আত্মবিনাশের স্বপক্ষে একটি তৃতীয় পক্ষের অদৃশ্য অস্তিত্ব তাহলে আছে। এবং সেটি সন্ত্রাসবাদের 'বিভীষিকার রক্তরেখা'। এবং এই রাজনীতির বিভীষিকার ছবি কেন আঁকলেন কবি?

'চার অধ্যায়' উপন্যাসে অতীন এসেছে "দমকা হাওয়ার মতো", আর তারপরে শুধুই সে। ইন্দ্রনাথের শরীরী অস্তিত্ব সে হাওয়ায় নিরুদ্দিষ্ট। শুরু হয়েছে অনর্গল বাণীর বন্যা—প্রধানতঃ অতীন্দ্রের এবং অংশতঃ এলার। আসলে এভাবে দেখলে, অতীনকে নিয়েই বিচার-বিতর্ক আবর্তিত হবে। কারণ সে-ই সর্বব্যাপী। অথচ অতীনের প্রবেশের আগেও উপন্যাসে দু'টি পরিচ্ছেদ আছে—একটি 'ভূমিকা' অন্যটি 'প্রথম অধ্যায়'। ভূমিকা অংশে আছে এলা। প্রথম অধ্যায়ে প্রধান ভূমিকা ইন্দ্রনাথের এবং কিছুটা এলার। পরের তিনটি অধ্যায় জুড়ে অতীন্দ্র এবং এলা। যার শুরু এলাকে নিয়ে এবং শেষও, তাকে নিছক অতীন্দ্রের উপাখ্যান বলে মেনে নেওয়া একটু শক্ত।

নিজের সংসারে মা মায়াময়ীর সর্বব্যাপী প্রভুত্বের অবিচারের বিরুদ্ধে "তার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে।" অস্বাস্থ্যকর অন্ধ প্রভুত্বচর্চাই এলার মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দুর্গম করে তুলেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বাসপরায়ণ ধৈর্যশীল পিতার প্রতি সদাব্যথিত স্নেহ। সে জেনেছে "কর্তৃত্বের অহমিকার কাছে অকাট্য যুক্তিই দুঃসহ স্পর্ধা।" কোনো অবস্থাতেই আত্মসম্মানকে পঙ্গু করা, ন্যায়-অন্যায় বোধকে অসাড় করে দেওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। অতএব মায়ের শুচিবায়ু, অন্ধ কর্তৃত্ব তাকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করলো। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা তার

জীবনের আলোর সম্বল ঊষা সতীর দান' তার মায়ের পুণ্যের দীপ্তি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। পথে দুর্যোগের মেঘে তা ঢাকা পড়েছিল। 'চার অধ্যায়'-এর এলা যাত্রা শুরু করলো মায়ের অন্ধ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে। বাড়ি ছেড়ে গেল হোস্টেলে। সেখানে পড়ার পাট চুকিয়ে হারালো স্নেহময় পিতাকে। কাকার আশ্রয়ে তার জীবন সরল গতিতেই প্রবাহিত হতো যদি না কাকীমা মাধবীর অক্ষম সংগোপন ঈর্ষার জ্বালা তাকে বিদ্ধ করতো। 'ভূমিকা' অংশের সমাপ্তি-লগ্নে এলেন ইন্দ্রনাথ রাজ চক্রবর্তীর মতো। বিদ্যার খ্যাতি আর পৌরুষের দীপ্তি নিয়ে। তাঁরই হাত ধরে এলা যাত্রা করলো কলকাতায় কাজের ভার নিয়ে। ইন্দ্রনাথের চোখে সে নব-যুগের দূতী। প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, অবিচারের প্রতিবাদে, ঈর্ষার প্রতি উপেক্ষায়—এলার যাত্রা। স্বাধীনতা, সুবিচার আর ভালোবাসার সন্ধানে নিশ্চয়ই। নইলে এই 'ভূমিকা'র কী প্রয়োজন ছিল ?

এরপর পাঁচ বছরের ব্যবধান। ইন্দ্রনাথকে জানলাম আমরা প্রথম অধ্যায়ের সূচনাতেই। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো তার 'প্রভুত্বের গৌরব।' এলা আগেই নিজেকে সমর্পণ করেছে দেশের কাছে। আর এখানে দেশ মানে দল। যে দল তার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়—শুধু এই প্রয়োজনেই ইন্দ্রনাথ তাকে নিষ্কৃতি দেন না। ইন্দ্রনাথের প্রভুত্ব আর ব্যক্তিত্বের পাশে ক্রমেই ম্লান দ্যুতিহীন হয়ে আসে ভূমিকা অংশের জ্যোতির্ময়ী এলা। মায়ের বিরুদ্ধে যার বিবেক অনমনীয়—মাত্র পাঁচ বছরে তাকে মেনে নিতে হয় ইন্দ্রনাথের সব নির্দেশ। এ-ই শুরু। আর এই প্রথম অধ্যায়েই আমরা অতীনের পরিচয় পাই—যাকে স্টীমারের ফার্স্ট ক্লাস থেকে জনসাধারণের দলে নামিয়ে এনেছে এলা। ক্রমেই দুজনের ভালোবাসা হয়েছে গভীর। কিন্তু অতীনকে ভালোবেসেও এলা তার পণ ভাঙতে পারলো না। কারণ তার চাওয়া তো শুধু নিজের জন্য নয়—সকলের জন্য, দলের জন্য চাওয়া। সে যে দেশের কাছে বাগ্‌দত্তা। আর কী আশ্চর্য—অতীনও একদিন অনুভব করলো সে ভেঙেছে নিজের স্বভাবকে। হত্যা করেছে। কী নিষ্ঠুর রুদ্ধশ্বাস জগতের দিকে অনিবার্য এগিয়ে চলি আমরা। এলার জীবন থেকে একে একে অপহৃত হয়—যা ছিল তার আত্মার সম্পদ। স্বাধীনতা, আত্মসম্মান, বিচারবোধ ভালোবাসা। বিদ্রোহী দলে নাম লিখিয়ে—নিজের অন্তরের বিদ্রোহের সম্পদটি সে নীরবে তুলে দিল দলের হাতে। আর সবচেয়ে দুঃসহ পরাভব ঘটলো তখনই—যখন তারই হাত ধরে অমিত-বীর্য অতীনও, তার মৃত আত্মার কালো ভূত নিয়ে দাঁড়ালো পতনের শেষ সীমায়। নির্মল ভোরের আলোয় যে যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল—অকালে যখন দীপ নিবে গেল, ঘনিয়ে এলো জীবনের শেষ অঙ্ক—অতীন দেখলে, পাথেয় আর কিছুই বাকি নেই। এভাবেই লক্ষ্যহীন অন্ধ যাত্রা এলা অন্তু দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সব স্বাধীন ইচ্ছাগুলি, বিশ্বাসগুলি একে একে নামিয়ে রিক্ত নিঃস্ব এলা দল থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। পরিণামে দলনেতার 'হুকুম'

এসেছে তাকে হত্যা করার। অতীন খুইয়েছে তার স্বাতন্ত্র্য, দলের রঙে মন রাঙিয়ে। আত্মশক্তির বৈচিত্র্যে দীপ্যমান মানুষের মহিমার অপহ্নব ঘটিয়ে হয়েছে দলের পুতুল। আর এভাবেই 'দল' তার লক্ষ্যহীন কুটিল অভিসন্ধির পাকে পাকে হত্যা করেছে মানুষের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ—ভালোবাসা। গ্রাস করেছে মানুষের চিত্তলোক—যা বৈচিত্র্যের গরিমায় উদ্ভাসিত। এলার মা-ই কি ক্রমে হয়ে উঠেছে 'দল', যা দেশেরই অন্য রূপ! অতীন বলেছে, "দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না" কারণ "দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তোমাদের দলের বানানো" দেশ; আজও সেই দলের বানানো খাঁচাকেই দেশ বলে জানি।

এলার মধ্যেও কি জেগে উঠেছিল বাৎসল্য, স্নেহ? দ্বিতীয় অধ্যায়ে অখিলের আগমন। এরপর সে "সেইসব সোনার-টুকরো ছেলেদের" কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছে, "আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন, ওদেরই মেয়ে—এই কথা মনে করে বুক ভরে ওঠে আমার।" আর উপন্যাসের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে "এলা অখিলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেয়ে বললে, 'সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা।"

[পাঁচ]

"সুখী দাম্পত্যের চিত্র যে অনধিক, তা না হয় স্বাভাবিক।…কিন্তু শুধু কি অসুখী? অধিকাংশ নায়িকা নিঃসন্তানাও যে। ব্যতিক্রম হিসেবে বলা যায় 'রাসমণির ছেলে'।· 'রাসমণির ছেলে'র মত মাতৃমূর্তি তাঁর গল্পে যে কম সেটাও কবি নিজেই স্বীকার করেন। 'মাকে আর তেমন করে পেলুম কই?' তাঁর এই আক্ষেপ পৌনঃপুনিক। ফলে তাঁর নায়িকারা বড়জোর ভাইকে বা পরের ছেলেকে মানুষ করে। কিন্তু গর্ভধারণের গৌরবে গরীয়সীদের সাক্ষাৎ মেলে কালেভদ্রে।" কবির ছোটগল্প প্রসঙ্গে সন্তোষ কুমার ঘোষের এই মন্তব্য ('রবির কর') উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কি অনিবার্য নয়? আসলে জীবিত দুই গর্ভধারিণী মাকে আমরা দেখি—'চোখের বালি'র রাজলক্ষ্মী আর 'চার অধ্যায়ে'র এলার মা। আধুনিক রীতির প্রথম উপন্যাস ও কবির সর্বশেষ উপন্যাসের দুই মা-ই দুর্ঘটনার কারণ হয়ে ওঠেন! প্রথম জন প্রত্যাবৃত্ত হলেও দ্বিতীয় জনকে পরে আমরা আর দেখি না। দুই মৃত গর্ভধারিণী তাঁদের কন্যাদের জীবনে আদর্শের প্রতীকরূপে বিরাজ করেন।—'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলার মা আর 'যোগাযোগ'-এ কুমুর মা নন্দরাণী। আর সব মাকে অতিক্রম করে যিনি সংস্কার জননী হয়ে আশ্রয় দেন—তিনি গোরার মা আনন্দময়ী। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' সম্পর্কিত আলোচনায় কবি বলেছিলেন, "আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে

তুলি নি—একে অধিকার করতে পারি নি।" যে সন্তানকে মা পান অথবা সন্তান মাকে নিতান্তই দৈবক্রমে—সেই মা বা সন্তান সত্য হয়ে ওঠে না। আনন্দময়ী সেবা, ত্যাগ, তপস্যা, ও জানার মধ্য দিয়ে শুধু গোরাকে পান নি—বিনয়-ললিতা-সুচরিতাকেও পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন "স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই: প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।" (স্ত্রী শিক্ষা / শিক্ষা) তবু তিনি সন্তানহীনা আনন্দময়ীর মধ্যেই মাতৃমূর্তির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। এবং বিমলার অথবা কুমুর মায়ের মধ্যে পাতিব্রত্যের। এই বিমলা এবং কুমু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে স্বামীর কাছ থেকে সরে গেছে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে। আসলে কবির রাজাকে যে চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। অমলের রাজাকে তো কেউই দেখে না। সুদর্শনার রাজাকে তবু তো সুরঙ্গমা আর ঠাকুর্দা দেখতে পায়। নন্দিনী দেখে 'রক্তকরবী'র রাজাকে। সত্যকে চেনা কি এতই সহজ। নিজের স্বামীকে চেনেনা সুদর্শনা, চেনে তার দাসী। এ মোহ আবরণ যে সত্যের হিরন্ময় পাত্রের মুখ আবৃত করে রেখেছে। মাতারূপে মোহ তাই দৃষ্টিকে আবিল করে। প্রেয়সী নারীর স্বস্ত্যয়নের ঘরে তাই তালা পড়ে। ..."প্রকৃতি শুরু করলেন জীবসৃষ্টি, পৃথিবীতে এল বেদনা। প্রাণ সাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্তভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে—প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্যে।" (নারী / কালান্তর) নারীর এই কল্যাণী মূর্তি কবি দেখেছেন। আরও দেখেছেন হৃদয়বৃত্তির দাহ কি সর্বনাশই না ঘটায়। কারণ "রমণী যদি একবার বহ্নিবিপ্লবে যোগ দেয় নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূধূ করিয়া ওঠে। এই প্রলয়কারিণী কার্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এই অগ্নিতে কেবল শয়নগৃহের সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছে, শীতার্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে।" (নরনারী / পঞ্চভূত) রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে কয়েকটি বহ্নিশিখার দীপ্যমান তেজের উজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন। দেখিয়েছেন এদেশে "গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে।" এবং "সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কখনো বাহিরে গিয়া কর্তব্য খুঁজিতে হয় না, তরুশাখায় ফুলপুষ্পের মতো কর্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।" (নরনারী) ভালোবাসার মধ্যেই তার সার্থকতা—প্রিয়ারূপে অথবা জননীরূপে।

শিবেশ চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দরদী জীবনশিল্পী

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব, অপরাজেয় কথাশিল্পী আখ্যালাভ এবং তারপর এই বিগত পঞ্চাশ বছর বিশেষ করে শরৎ জন্মশতাব্দী উপলক্ষে শরৎপ্রসঙ্গে বহু আলোচনা গবেষণা যাদের অধিকাংশই চর্বিতচর্বন, প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাব শরৎচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভারই পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে ভারতসরকার প্রকাশিত 'ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফিতে' ভারতীয় ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের তালিকায় শরৎচন্দ্রের শীর্ষস্থান লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ 'বড়দিদি' উপন্যাসটি দিয়ে। 'ভারতী' মাসিকপত্রে ১৯০৭ সালে উপন্যাসটি (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯১৩ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'বড়দিদি'ই শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।) প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে বিপুল সাড়া জাগে। অনেকেই লেখকটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে ভুল করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও কাহিনীটির প্রশংসা করেন এবং রচনাটি তাঁর না হলেও সেটি যে একজন শক্তিশালী লেখকের রচনা সেকথা স্বীকার করেন। উপন্যাসটির কাহিনীর অভিনবত্ব পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল সন্দেহ নেই (তবে লেখাটি শরৎচন্দ্রের কাঁচালেখা—ভাষা আড়ষ্ট এবং গুরুচণ্ডালী দোষদুষ্ট।) শরৎচন্দ্র পরে বলেছেন "ওটা, বাল্যকালের রচনা ছাপা না হইলেই বোধকরি ভালো হইত।" রচনাভঙ্গী কাঁচা হলেও শরৎচন্দ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম প্রকাশিত রচনাটিতেই স্ফুরিত হয়েছিল। আত্মভোলা পুরুষের প্রতি নারীর মমত্ববোধ, বিধবার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার, নারীর প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয়গুলি এই বড়দিদি উপন্যাসেই স্ফুরিত হয়েছিল। সেদিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে বড়দিদির উল্লেখ অপরিহার্য বলেই মনে হয়।

'বড়দিদি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্র লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পান—এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাধারণত সাহিত্যের আঙিনায় নতুন সাহিত্যিকের প্রথম পদক্ষেপ থাকে কুণ্ঠিত, উপেক্ষা এবং অসহযোগের ভাবনায় ক্লিষ্ট। কিন্তু শরৎচন্দ্র প্রথমেই বীরোচিত সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর এই সৌভাগ্যের উল্লেখ করেছেন পরবর্তীকালে তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায়—**In Bengali perhaps I am the only fortunate writer who was not had to struggle** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শরৎচন্দ্রই সম্ভবত সমগ্র ভারতে প্রথম পেশাদার লেখক—লেখাই যাঁর একমাত্র জীবিকা।

বড়দিদির সাফল্যের পর একে একে 'বিরাজ বৌ', 'পরিণীতা', 'পল্লীসমাজ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'পণ্ডিতমশাই', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দেনা পাওনা', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' ইত্যাদি বিখ্যাত উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। জীবিতকালে অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ ভালোবাসা তিনি পেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁর যশ পৃথিবীব্যাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া সমসাময়িককালে বাংলা গল্পের জাদুকর প্রভাতকুমারও 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'সিন্দুর কৌটা', 'মনের মানুষ' ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই পটভূমিকায় পাঠক হৃদয়ে স্থান করে নিয়ে অসাধারণ এবং মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি জনপ্রিয়তার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়—"গল্প উপন্যাসে শরতের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে আমার আপত্তি থাকত যদি না আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানতুম যে কবিতায় আমারই জিৎ"। ঈষৎ কৌতুকের ছলে কথাটি বলা হলেও কৌতুকের ভিত্তিটুকু মিথ্যা নয়। এই বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা সম্পর্কে সমসাময়িককাল থেকেই বুদ্ধিজীবী মহল দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের তুলনায় তিনি অকিঞ্চিৎকর প্রতিভার অধিকারী—এবং সস্তা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে গল্প উপন্যাস রচনা করে বাঙালি পাঠকমহলে জনপ্রিয় হয়েছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের চিরন্তন মূল্য সম্পর্কে এই বুদ্ধিজীবীর দল তাই সন্দিহান। আবার শরৎচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ভক্তের দল মনে করেন বঙ্কিম-রবীন্দ্রের পরই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের চিরস্থায়ী আসন পাতা। প্রকৃতপক্ষে, যে বিষয়গুলি নিয়ে শরৎসাহিত্য গঠিত হয়েছে, যে পরিবেশ এবং পৃষ্ঠভূমিতে গল্প উপন্যাসকে দাঁড় করানো হয়েছে, সেই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক পটভূমি কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না এবং তা কারো কাম্যও হতে পারে না। বালবিধবা বা পতিতা নারীর হৃদয় ঘটিত সমস্যা, কৌলীন্যপ্রথার কুফল, একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের সুখ দুঃখ ও সমস্যা এগুলি বর্তমানকালে অতীতের বিষয়। নতুন যুগে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে উত্থাপিত সমস্যাগুলি বর্তমান পাঠকের হৃদয়ে দাগ কাটবে না সেটাই স্বাভাবিক। পুরাতন মূল্যবোধের প্রতি আজকের মানুষ আস্থাহীন, শুধু তাই নয়, আজকের সচেতন মানুষ জগৎ ও জীবনকে দেখবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এই অবক্ষয়ের সূচনা শরৎচন্দ্র দেখে গিয়েছিলেন। উঠতি লেখকদের লেখায় এই অবক্ষয়ের প্রতিফলন শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত করেছিল। তিনি নিজে আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত তার একটু নমুনা দিতে গিয়ে 'শেষপ্রশ্ন' রচনা করেছিলেন। সুতরাং একথা মনে হতে পারে যে শরৎচন্দ্র কি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করেছিলেন মাত্র" অথবা সকল কালের জন্য কি তিনি কিছুই রেখে যাননি ?

সামাজিক উপন্যাসের কাছে সর্বকালের পাঠকের দুটি বিশেষ দাবী থাকে—প্রথমতঃ সে প্রত্যাশা করে যে লেখকের রচনার মাধ্যমে সে সামাজিক চেতনার ব্যাপকতাকে অনুভব করতে পারবে, দ্বিতীয়ত বিভিন্ন চরিত্রের চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে লেখকের জীবনবোধের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারবে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রথম প্রত্যাশাটি পূরণ করে, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। সমসাময়িককালে তো বটেই, এমন কি বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও তা পাঠককে মুগ্ধ করে। কিন্তু শরৎ বিদ্বেষণের মুখ্য কারণ দ্বিতীয় প্রত্যাশাটি নিয়ে, শরৎচন্দ্র নাকি তা পূরণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। জীবনবোধের গভীরতা নাকি তার মধ্যে একেবারেই নেই! রবীন্দ্রনাথের সুগভীর জীবনদর্শন এবং জীবনবোধের গভীরতাকেই শরৎচন্দ্র সাধারণ পাঠকের গ্রহণযোগ্য করে সহজ সরল অনালংকৃত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ সংক্ষেপে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই তরলীকৃত রূপ। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব উক্তিও এই ধারণার অনুকূল। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভালো লেখেন জনৈক গুণমুগ্ধের এই উচ্ছ্বসিত প্রশস্তির উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—"তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য, আর আমি লিখি তোমাদের জন্য।" অন্যত্র শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তার সাহিত্য গুরু বলে স্বীকৃতিও জানিয়েছেন। তবে এখানে একথাও স্বীকার্য যে শরৎচন্দ্রের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠার মূলে নিছক রবীন্দ্রানুসরণ নয়—তাঁর নিজস্বতাও অবশ্যই ছিল। শরৎচন্দ্র বাঙালি জীবনের রূপকার হলেও বাঙালি জীবনের যে অংশটি ভারতীয়তার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত, শরৎচন্দ্র সেই অংশে ভারতীয়। তাছাড়া হৃদয়াবেগ এবং প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি—মানবহৃদয়ের এই সার্বজনীন কোমল বৃত্তির আলোকেই শরৎসাহিত্য বিচার্য এবং সেখানেই তিনি পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত।

শরৎচন্দ্র সামাজিক এবং পারিবারিক উপন্যাস রচয়িতা। শরৎসাহিত্যের সমাজ অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। প্রধানত জমিদার শ্রেণীই সামন্তশক্তির প্রতিভূ—তাদের সঙ্গে শনির সঙ্গে রাহুকেতুর মত এসে জুটেছে কিছু ধর্মধ্বজীর দল। 'বড়দিদি' (১৯১৩) 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬) 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) 'দেনাপাওনা' (১৯২৩) 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) ইত্যাদি উপন্যাসে শরৎচন্দ্র শোষকশ্রেণীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা যেমন ব্যাপক তেমনি নিখুঁত। জমিদার শ্রেণীর বিলোপ ঘটলেও সমাজে আজও শোষণ অব্যাহত—শরৎ উপন্যাসকে বিভিন্ন চরিত্রগুলি আজও ভিন্ন মূর্তিতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত--তাই আজকের পাঠকও শরৎসাহিত্যের মাধ্যমে এসব চিনে নিতে পারে।

শরৎচন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবনভিত্তিক যে গল্প উপন্যাসগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেইগুলির মধ্যে 'দেবদাস', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'স্বামী', 'মেজদিদি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই কাহিনীগুলিতে আমরা পাই সুপরিচিতের রস। নিত্যদিনের মানুষের সংসারে পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণ। ছোটোখাটো স্বার্থ রক্ষার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টার যে ছবিগুলি আমরা এই কাহিনী-

গল্পগুলির মধ্যে পাই. তা নিতান্তই ঘরোয়া। কিন্তু তুচ্ছ তো নয়ই বরং শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা. তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক। মানুষ নিজের চারিপাশের ঘটনাগুলো সম্বন্ধে হয়তো সচেতন থাকে না—সেই সচেতনতা কুশলী সাহিত্যিক এনে দেন। সাহিত্যের আয়নায় মানুষ নিজের আচার আচরণের প্রতিবিম্বটি দেখতে পায়। বর্তমানে আমাদের যৌথ পরিবার বিলুপ্তির পথে—একথা ঠিক, কিন্তু যে অসৎ বুদ্ধি এবং ছদ্মবেশী হিতৈষণা, কুটিলতা প্রীতির সংসারকে নষ্ট করে তা আজও বর্তমান। শরৎচন্দ্রের আবেদন তাই আজও অব্যাহত।

বহুযুগ ধরে কুসংস্কার. সামাজিক বিষমতা, ক্ষমতা মদমত্তের হাতে অসহায় মানুষের নিপীড়ন. তথাকথিত সামাজিক সতীত্ববোধের ধারণার কাছে প্রকৃত নারীত্বের মূল্যহীনতার জন্য ক্ষোভ এবং মানবতার সত্যস্বরূপ সম্পর্কে তার নিজের বিশ্বাস শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মূলত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারণাটাই শরৎচন্দ্রের এই আবেগের উৎস এবং এই শ্রেণীকে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত নিকট থেকে দেখেছিলেন এবং তাদের মনোভাবকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এগুলির যথাযথ রূপ পাঠকদের সামনে পৌঁছে দেওয়া। এর জন্য শরৎচন্দ্রকে বিশেষ কোন কৌশল গ্রহণ করতে হয়নি। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা. সমবেদনা এবং সহানুভূতিই একদিকে চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছে এবং উপযুক্ত ভাষাও গড়ে নিয়েছে। 'অরক্ষণীয়া'র কাহিনীতে রয়েছে দরিদ্র ঘরের অরক্ষণীয়া কুমারী মেয়ের বিয়ের সমস্যা। 'বামুনের মেয়ে'র কাহিনীতে পাই কৌলীন্য-প্রথার দোষে একটি মেয়ের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসার ঘটনা। বাহ্যত মনে হতে পারে যে এই সব ঘটনাও এখন অতীত হয়ে গিয়েছে—যার পুনরাবৃত্তি আর সম্ভব নয়—কিন্তু আমরা সকলেই মনে মনে জানি—এই চূড়ান্ত লাঞ্ছনা এবং অপমান এখনও সমাজের বুকে অন্যরূপে বিরাজমান। বাইরের চেহারা বদলিয়েছে কিন্তু ভেতরে শোষণ অপমানের সেই একই বীভৎস রূপ বর্তমান। শরৎচন্দ্র সমকালের কাহিনীর মধ্য দিয়ে এইভাবে একই সঙ্গে সমকাল এবং পরবর্তীকালের।

শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনার গভীরতা প্রসঙ্গে অনেক সমালোচকেই বলেন যে শরৎচন্দ্রের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সমাজের অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলেছেন—অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই ইঙ্গিতাকারে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে পাই তারই বিস্তারিত রূপ—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেন সূত্র এবং শরৎচন্দ্র যেন টীকা বা ভাষ্য। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অতি ভক্তির পরিচায়ক এবং অতি ভক্তি ব্যাপারটিই অশ্রদ্ধেয়। শরৎচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের ঋণের কথা স্বীকার করেছেন—তাঁকে সাহিত্যগুরু বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই তরলীকৃত রূপ একথা বললে শরৎচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন—একথাটি সত্যি। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জনচিত্ত জয় করেছিলেন। তাঁর 'বড়দিদি' যখন ভারতী পত্রিকায়

প্রকাশিত হয় তখন অনেকেই সেটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে ভুল করেছিলেন পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-বঙ্কিমের প্রতি কোন কোন বিষয়ে বিরূপতা প্রকাশ করলেও শরৎচন্দ্র তাঁর এই দুই অগ্রজের প্রতি কখনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে তাঁর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি—

"উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধহয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি এমন নয়। লেখার দিক থেকে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু চেষ্টার দিক থেকে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি। তারপর এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না। কোনো কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।" শরৎচন্দ্র 'চোখের বালি' বহুবার পড়েছেন। তাঁর উপন্যাসে চোখের বালির প্রভাব পড়ে থাকতেও পারে—কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র একটি নূতন পথ প্রদর্শন করেছিলেন। শরৎ পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা শরৎচন্দ্রের অনুসরণই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' যেমন শরৎমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' ও সমসাময়িক লেখকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। সমসাময়িক পাঠকও শরৎচন্দ্রের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য আবেগ উচ্ছ্বাসের বাহুল্য নেই বললেই চলে। কবিতার ক্ষেত্রে যদিও বা তাঁর কল্পনায় সমুদ্র উদ্বেলিত হয়েছে—গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সংযত। মানুষকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় তিনি আবেগের সাবথাকে অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র তাঁর চিঠিপত্রে বলার চেয়ে না বলা, লেখার চেয়ে না লেখার উপরই জোর দিয়েছেন। দিলীপ রায়কে একটি পত্রে লিখেছেন—"Dialogue ছোট হওয়া চাই—মিষ্টি হওয়া চাই—কিছুতেই না মনে হয়, এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশি বলেছে। এই হলো artistic form এর ভিতরের রহস্য। প্রথমে হয়ত মনে হবে আমার সব কথা বলা হলো না, পাঠকেরা বোধকরি ঠিক বক্তব্যটি ধরতে পারবে না। কিন্তু এখানেই হয় লেখকের মস্ত ভুল। না বোঝে সেও ভালো কিন্তু বেশী বোঝাবার গরজ না লেখকের প্রকাশ পায়।" অন্য একটি পত্রেও অনুরূপ উক্তি—"লিখতে বসে লেখার চেয়ে না লেখা ঢের শক্ত। ···বলবার বিষয়বস্তু যেন আবেগের প্রখরতায় প্রয়োজনের একপাও বেশী ঠেলে নিয়ে যেতে না পারে। বরঞ্চ এক পা পিছিয়ে থাকে সেও ভালো।" সংলাপ এবং বর্ণনার ভাষার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র নিশ্চিতরূপে সংযত। কিন্তু বাঙালীসুলভ আবেগপ্রিয়তা তাঁর মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তাই

সুখে-দুঃখে, প্রেমে-বেদনায় সংযমের বাঁধকে তিনি বার বার উপেক্ষা করে গিয়েছেন। আবার এই আবেগপ্রিয়তাই তাঁকে পাঠকের সবচেয়ে প্রিয় লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। কখন কখন এমনও মনে হয় যে তিনি ভাবপ্রবণতার ক্ষেত্রে কৈশোরের বয়ঃসন্ধি-কালকে অতিক্রম করতে পারেননি। চলনে বলনে, আহারে বিহারে, কথায় বার্তায়, আচার আচরণে তিনি একজন অতি সাধারণ বাঙালি ছিলেন—আর তাঁর হৃদয়ে ছিল আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ যা বার বার ভাবপ্রবণ হয়ে উপচে পড়েছে, অবশ্য এখানেই তাঁর জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। সম্ভবত তিনি নিজের হৃদয় দিয়েই বাঙালি হৃদয়কে ভালভাবে চিনতে পেরেছিলেন—শরৎচন্দ্রের সেই প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের কথা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে; এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকে অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি।' অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন। রবীন্দ্রনাথের এই অভিনন্দন বাণীর মধ্যেই শরৎ সাহিত্যের মূল কথাটি ধরা পড়েছে।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা সহ্য করতে না পেরে কিছু রক্ষণশীল আদর্শবাদী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসেবে শরৎচন্দ্রকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় এক সময় রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' এবং 'ঘরে বাইরে' সাধারণভাবে সমালোচিত হয়। 'স্ত্রীর পত্রে'র প্যারডিও (মৃণালের কথা) প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে হিন্দু সংস্কৃতির ক্ষতি হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের এই ছিল অভিযোগ। স্বভাবতই শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' এই মহলে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং 'স্বামী'র যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। অথচ 'স্বামী' উপন্যাস হিসেবে মোটেই উচ্চপদের রচনা নয়। কাহিনীতেও অনেক অসঙ্গতি বর্তমান। সৌদামিনীর গৃহত্যাগ অথবা ভুলভাঙ্গা কোনটারই উৎস খুব গভীর নয়। যেন কোন এক কাণ্ডজ্ঞানহীন হটকারী যুবতী বধূর নিছক গল্প এটি। স্বামীর কাছ থেকে ক্ষমা পেয়ে সৌদামিনীর আবেগ উচ্ছ্বাস অত্যন্ত তরল এবং পীড়াদায়ক।

অথচ এই উপাদানগুলিই তৎকালীন রক্ষণশীল পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে শরৎচন্দ্র সমালোচনা করেছেন কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রতি তাঁর একটা আস্থা ছিল, একথাও সত্য। সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রথার

প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না একথা মনে করার কোন কারণ নেই। 'দত্তা' উপন্যাসে দেখি বিজয়ার কাছে দেখা করতে এসেছে নরেন—তার গায়ের চাদরের তলা দিয়ে পৈতেটি দেখা যাচ্ছে। কিংবা 'বিপ্রদাস'-এ সশ্রদ্ধ নিস্তব্ধ ভঙ্গিতে পূজারত বিপ্রদাসের ছবি। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত বন্দনাকে দিয়ে লেখক যেভাবে দেব-পূজার কাজগুলো গুছিয়ে দেওয়া কিংবা সাত্ত্বিক ভঙ্গিতে খেতে দেওয়ার ব্যাপারগুলি দেখিয়েছেন, তাতে শরৎচন্দ্রের এই ব্যাপারগুলোর প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল তারই নিদর্শন পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র ছিলেন সচেতন লেখক। পাঠকহৃদয়কে জয় করার আর্ট তাঁর জানা ছিল। তাঁর জনপ্রিয়তা—তাঁর অনুজ লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। আবেগ উচ্ছ্বাস এবং রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে শরৎ সমসাময়িক এবং কিছু পরবর্তী বহু সাহিত্যযশপ্রার্থী ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যের আসরে এসেছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রকে কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। একই সঙ্গে আধুনিকতা এবং রক্ষণশীলতার চমৎকার উদাহরণ 'পথনির্দেশ' বড় গল্পটি। শরৎচন্দ্র স্বয়ং এটি লিখে বেশ তৃপ্ত এবং অহংকৃত হয়েছিলেন। বন্ধু প্রমথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন "পথনির্দেশ পড়েছ? কেমন লাগল? ·····শুনতে পাই এটা সকলেরই খুব ভালো লেগেছে। যদিও একটু শক্ত গোছের এবং একটু মন দিয়ে পড়া দরকার।" (শরৎচন্দ্র ঃ ৩য় খণ্ড, গোপাল রায়) উক্ত বন্ধুকেই আরো একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "পথনির্দেশ বুঝতে পারলে কি?"

হিন্দু বিধবার সংস্কার এবং প্রেমের দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মত এই কাহিনীটিতেও স্থান পেয়েছে। হিন্দু সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের কিছুটা টানা পোড়েনও আছে। পড়তে গেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শরৎচন্দ্র যিনি নিজেকে সামাজিক কুসংস্কার বিরোধী বলে প্রচার করতে ভালবাসতেন তিনিই যেন পরম মোহভরে সেই ব্যবস্থাকেই পক্ষপুটে রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন। হেমনলিনী গুণীকে প্রাক্‌বিবাহ জীবন থেকেই ভালবাসত। স্বয়ং গুণী উদ্যোগী হয়ে তার অন্যত্র বিবাহ দিলেও হেম স্বামীকে ভালবাসতে পারেনি, বরং স্বামীর অকাল মৃত্যু যেন তাকে পরম আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দিয়েছে। গুণীও তাকে ভালবাসে। পরস্পরের ভালবাসা পরস্পরের কাছে গোপন ত নয়ই বরং অতিমাত্রায় প্রকাশ্য। তবুও শরৎচন্দ্র এক বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব আরোপ করে তাদের মিলন হতে দেননি। একে কাব্যের ছাতার আড়াল দিয়ে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল—পাত্র পাত্রীও প্রস্তুত ছিল কিন্তু লেখক প্রাচীন সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করে জোর করে অনুকূল হাওয়াকে প্রতিকূল করে তুলে গতানুগতিকতার রাস্তায় তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ কাহিনীটি সত্যিই সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অচলাকেও শরৎচন্দ্র যেন খণ্ডিত করেই রেখেছেন। মনে হয় ব্রাহ্মসমাজের আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে হওয়াটাই তার পক্ষে দোষের ছিল। সেইজন্যই যেন সে চিত্তসংযম শেখেনি। যখন তখন অকস্মাৎ তার হৃদয় দৌর্বল্য প্রকাশ পায়—মুখ সাদা হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে দুটি ব্রাহ্ম নারীর সাক্ষাৎ পাই। দুটি চরিত্রের প্রকাশ ভিন্ন; কিন্তু অন্তরের আপন উপলব্ধিজাত সত্যের কাছে দুজনেই প্রতিশ্রুত। সেখানেই তাদের মিল—তাদের অন্তরের মিল। এই উপলব্ধিজাত সত্যে নায়ক-নায়িকাকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব লেখকের। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মত এই সত্য অকস্মাৎ এসে আবির্ভূত হলে সন্দেহ জাগে। 'পথ নির্দেশে' তাই হয়েছে। হেম-গুণীর আচার আচরণে কখনও মনে হয় না যে তাঁদের মনে ঐ বৈষ্ণবীয় প্রেমের মহৎ উপলব্ধি রূপ পেতে চলেছে। বিধবার প্রেমের সার্থকতা দেখান কিংবা ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীর মধ্যে মিলন দেখান কিংবা যা যা দেখান সাধারণ গল্পের উদ্দেশ্য হতে পারে; কালজয়ী সাহিত্য রচনার মূল উপকরণ কিন্তু তা হতে পারে না। শরৎচন্দ্র যে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না তা নয়. প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—

"·· বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্গসাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দুটি যিনি বাঙালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথাসাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে আবার 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' 'সীতারাম' লিখতে গেলেন? কোন্ প্রয়োজন তার হয়েছিল?" এই অভিযোগ বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টি থেকে উদ্দেশ্য-পরায়নতার বিরুদ্ধে। নবপর্যায়ে বঙ্কিম উপন্যাসকে ধর্মপ্রচারের কাজে, সনাতন ধর্মের মহত্ব প্রদর্শনের কাজে ব্যবহার করেছিলেন—যদিও অতি সুনিপুণ এবং মুগ্ধ করবার মতই ছিল সেই ব্যবহার। শরৎচন্দ্রের মধ্যেও হিন্দুদের মহত্ব প্রতিষ্ঠার একটা প্রয়াস দেখা যায়—তার সেই হিন্দুত্ব শরৎচন্দ্রের যুগে এবং তাঁর উপন্যাসে নেহাৎই হিন্দুয়ানীতে পরিণত হয়েছিল। ব্রাহ্মণত্ব যেমন পরিণত হয়েছিল বামনাইতে। একথা সত্য যে, শরৎচন্দ্র যে সমাজকে তাঁর কাহিনীর প্রেক্ষাপট করেছেন সেখানে অসামাজিক বিবাহের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দেখানো কিছুটা বাস্তবতাবিরোধী হত, সেইজন্যই শরৎচন্দ্র এক পক্ষের আত্মোৎসর্গ এবং পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখিয়ে পাঠকের মনে সহানুভূতি আনতে চেয়েছেন। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে তিনি সফলও হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনীকে পুনর্বিবাহিতারূপে পাই। দামিনী বা শ্রীবিলাস আমাদের পরিচিত সমাজের মানুষ হয়েও যেন ভাস্বর নক্ষত্রের মত দূর পরিমণ্ডলে অবস্থিত। সংসারের পাঁচটা মানুষের ক্লেদাক্ত সমালোচনা যেন সেখানে পেঁছায় না।—অপরপক্ষে শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিকে প্রতিনিয়ত দশজনকে নিয়ে ওঠাবসা করতে হয়—তাদের মতামত মন্তব্যের নির্দেশে জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অভয়ার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অভয়াকে শরৎচন্দ্র বিদ্রোহিনী করেছেন। সে বিদ্রোহকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছে—নিজের ভবিষ্যৎ সন্তানকে উপযুক্ত মানুষ করে গড়ে তুলবে বলে আত্মঘোষণা করেছে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছে বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে ব্রহ্মদেশের মাটিতে, যেখানে অভয়াকে তার পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে হয়নি। বাংলা-

দেশের আবহাওয়ায় অভয়ার বিদ্রোহের বারুদ নিঃসন্দেহে ভিজে যেত—বিস্ফোরণ ঘটাতে পারত না। অভয়ার স্রষ্টার পক্ষে তাই বার্মার নিরাপদ আশ্রয়ে অভয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁর চিঠিপত্রে বার বার উল্লেখ করেছেন যে তিনি চরিত্র তৈরী করে নিয়ে গল্প লেখেন। প্লটের জন্য তাঁকে ভাবতে হয় না। চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনমত প্লট আপনা আপনিই তৈরী হয়ে যায়। তবে কাহিনীর মূল ঘটনা যে অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ একথাও তিনি স্বীকার করেছেন। যেমন 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ 'ষোড়শী' রবীন্দ্রনাথকে খুশী করতে না পারায় কাহিনীটি যে বাস্তব তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—'এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি কোরে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে।"

শরৎচন্দ্র তাঁর অন্যান্য রচনাতেও নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে উপন্যাস রচনার কাজে লাগিয়েছিলেন। সমসাময়িককালে তিনি বাস্তবতার জন্যই অভিনন্দিত এবং নিন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনও ছিল কিছুটা রহস্যাবৃত। এই রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে তার নিজস্ব উক্তিতে। সত্যমিথ্যাকে সুনিপুণভাবে মিশিয়ে বলতে পারতেন তিনি এবং শ্রোতার পক্ষে মুগ্ধচিত্তে তা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় থাকত না। সম্ভবত শরৎচন্দ্র এতে কৌতুক বোধ করতেন। সমসাময়িক পাঠকদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীকেই ভিত্তি করেই উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু শরৎসাহিত্যের বাস্তবতার এই অপবাদ অথবা প্রশংসা দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকেনি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের শেষদিকে তিনি আদর্শবাদী হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছেন। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙালী জীবনের পরিবারভিত্তিক—যেমন 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'নিষ্কৃতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'চন্দ্রনাথ', 'দত্তা', 'পরিণীতা'—এই উপন্যাসগুলি কিন্তু বিরূপভাবে সমালোচিত হয়নি বরং পাঠকসমাজে বিপুলভাবে আদৃত হয়েছিল। এই কাহিনীগুলির মধ্যে জটিলতা বর্জিত প্রীতি—পাঠান্তে যা পাঠকের মনে এখনও তৃপ্তির সঞ্চার করে। উপন্যাসের কাহিনী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"গল্প পারতপক্ষে tragedy করতে নেই। ……গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয় আঃ! বেশ!' তবে আবার গল্প কি? আমি এই লাইনে চলছি। রামের সুমতি, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব এই ছাঁচে ঢালা। শেষ করে মনের মধ্যে gloomy ভাব আসে না। তোমাদের হরিদাসবাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে 'রামের সুমতির নারায়নীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে। এই সমালোচনাই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা'।

একটা শুভবুদ্ধি জাগানোর ইচ্ছা, একটা আত্মোৎসর্গের ভাব সঞ্চার করবার ইচ্ছা শরৎচন্দ্রের রচনায় উপস্থিত। এইজন্যই তিনি যতটা না বাস্তববাদী তার চেয়ে অনেক বেশি আদর্শবাদী।

শরৎচন্দ্র নিজেকে নাস্তিক বলতে ভাল বাসতেন। হিন্দুদের দেব দেবী নিয়ে তিনি ইতস্তত লঘু মন্তব্যও করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রিয় চরিত্রগুলিকে পৌরাণিক দেবদেবীর আদর্শেই যেন ঢালাই করেছেন। নিষ্কৃতির গিরিশ, বৈকুণ্ঠের উইলের বৈকুণ্ঠ, বামুনের মেয়ের প্রিয়, শ্রীকান্তের শ্রীকান্ত—এদের মধ্যে শিবের নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভাব। নিরাসক্ত নিস্পৃহ ব্রহ্ম কেন্দ্র করে যেমন শক্তির লীলা (রামকৃষ্ণের উপমা—কর্তা আলবোলার নল মুখে দিয়ে বসে আছেন—গিন্নী দৌড়াদৌড়ি করছেন আর মাঝে মাঝে এসে খবর দিয়ে যাচ্ছেন কি হচ্ছে না হচ্ছে)। তেমনি নারীচরিত্রগুলি এই নিরাসক্ত নিস্পৃহ পুরুষগুলিকে ভালোবেসে বিভিন্ন কর্মতৎপরতায় নিজেদের প্রকাশ ঘটাচ্ছে! গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদি নেশার দ্রব্যগুলি শিবের প্রিয় বস্তু। শরৎচন্দ্রের কিছু উদাসী নায়ক চরিত্রেরও এগুলিতে আসক্তি দেখা যায়, যেমন 'শুভদা'র হারাণ এবং 'বিরাজ বৌয়ে'র পীতাম্বর ইত্যাদি। তাঁরা নেশায়·আসক্ত, বহির্জগৎ সম্পর্কে উদাসীন, এমনকি অনেক সময় সাংসারিক ব্যাপারে নিতান্তই অক্ষম এবং অপটু- কিন্তু অন্তরে তাঁরা স্থিতধী, যাবৎ চাঞ্চল্যের মাঝামাঝি এক অচঞ্চল মানসিক ধৈর্যের অধিকারী। অপরপক্ষে, নায়িকাদের নিঃশেষে আত্মসমর্পণের মধ্যে যেন আভাস পাওয়া যায় বৃন্দাবনের শ্রীরাধার সমর্থা প্রেমের। 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী সতীশকে ভালবেসেও সতীশের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সে নিজের সুখ, সুনাম, সামাজিক জীবনে কিছুই চায় না। প্রেমাস্পদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া তার অন্য কোন কামনা নেই। দেবদাসের চন্দ্রমুখীর মধ্যেও এই একই ভাবের খেলা। এই নিষ্কাম প্রেমের ভাব শরৎচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন নারী চরিত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। মেসের ঝি সাবিত্রী সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু তীর্যক মন্তব্যটি--"কলকাতার কোন মেসে সাবিত্রীর মত ঝি যদি থাকতো তবে আমরা সবাই বাড়ি ভুলে মেসে পড়ে থাকতুম।"—প্রমাণ করে যে এই চরিত্রচিত্রণ বাস্তববোধকে আঘাত হয় তো করে কিন্তু এই রকমটি প্রার্থনীয়—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর সাদৃশ্য দেখিয়ে পাঠকচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। যেমন অন্নদাদিদির বর্ণনায়—'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া'···ইত্যাদি শিবের জন্য তপস্যারত উমার স্মৃতি জাগায়। অথবা চরিত্রহীনে সরোজিনীকে খালি পায়ে লালপাড় ধুতি পরে খাবার পরিবেশন করতে দেখে সতীশের লক্ষ্মীঠাকরুণের কথা মনে পড়া অথবা পথনির্দেশের শেষাংশে রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহের উল্লেখ। যশোদার পুত্রস্নেহ যেন শরৎচন্দ্রে রূপ পেয়েছে বাৎসল্যরসের তীর্যক গতিতে। কৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত নন—কিন্তু তিনি যশোদা-দুলাল। 'মেজদিদি', 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি', 'রামের সুমতি', বৈকুণ্ঠের উইল', 'বিপ্রদাস', 'পণ্ডিতমশাই' সর্বত্রই শরৎচন্দ্র সন্তানবাৎসল্যের এই তীর্যক গতি দেখিয়েছেন, কোথাও সতীনপুত্র, কোথাও দেওরের ছেলে, কোথাও পুত্রতুল্য দেওর কিন্তু স্নেহের তীব্রতা সর্বত্র এক। 'মেজদিদি'তে পাঁচুকে ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের ঘরসংসার

এমন কি ছেলেমেয়েকেও অনায়াসে ত্যাগ করে মেজদিদি চলে যান। মামলার ফলে গয়ারামের জ্যাঠাইমা নিজের সংসার ফেলে গয়ারামের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। আবার বিপ্রদাসে দ্বিজদাস ও বিপ্রদাসের পারস্পরিক ভালবাসা রাম ও লক্ষ্মণের আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেমকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুরূপ উদাহরণ শরৎসাহিত্য থেকে আরও অনেক উল্লেখ করা যেতে পারে।

নায়ক চরিত্রচিত্রণে মোহমুক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টি শরৎচন্দ্রের ছিল বলে মনে হয় না। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল—প্রসাদগুণযুক্ত সহজ সরল ভাষা ছিল তাঁর আয়ত্ত—গল্পের প্লট সৃষ্টিতে ছিলেন তিনি অনায়াস তবু তাঁর উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণে নেই কোনও বৈচিত্র্য। আবেগ উচ্ছ্বাস এবং ভাবপ্রবণতাকে মূলধন করে আপাত বাস্তবতার মাধ্যমে তিনি পাঠকহৃদয়কে জয় করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সামাজিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব অপেক্ষা আকস্মিক ঘটনাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'গৃহদাহে'র অচলা, মহিম, সতীশ, কেদারবাবু সকলেই যেন আকস্মিক ঘটনার শিকার। তাদের ব্যবহারের এবং আচরণের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন অস্বাভাবিকতা -বিশেষ করে সতীশ ও অচলা যেন আকস্মিক ভাবাবেগের মহুর্মুহু মতিপরিবর্তনের বিস্ময়কর উদাহরণ। নারীচরিত্র সম্পর্কে চরিত্রহীন উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য—এরা ভাবে এক ও করে আর এক। 'চরিত্রহীনে'র সরোজিনীই নয় অন্যান্য উপন্যাসের নারী চরিত্রের মধ্যেও শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্যের সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন যে প্লটের জন্য তাঁকে ভাবতে হয়না চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্লট আপনি এসে পড়ে। কিন্তু এই না ভাবার জন্যই অতিমাত্রায় আকস্মিকতা এবং প্রচণ্ড রকম ভাবাবেগের দ্বারা চরিত্রগুলি চালিত হয়েছে। হয়ত বাঙ্গালীর সীমাবদ্ধ জীবন ও চরিত্রকে সামনে রেখেই শরৎচন্দ্র তাঁর যাবতীয় উপন্যাস রচনা করেছেন বলেই তাঁর ছোট চরিত্রগুলোও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা ছিল এবং বিভিন্ন চরিত্রতে সেই ধারণার প্রয়োগ তিনি করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর চরিত্রগুলিকে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়নি। পুরুষচরিত্রগুলির মনুষ্যত্ববোধ নিতান্তই স্বভাবজ। নারী চরিত্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধাবোধ সর্বজনবিদিত। অবশ্য এই শ্রদ্ধাবোধ প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাসবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। নারীশক্তি পুরুষকে উজ্জীবিত করে—মাতৃরূপে, পত্নীরূপে এবং প্রেরণাদাত্রীরূপে। যেখানেই পুরুষকে আশ্রয় না দিয়ে নিজেই একক শক্তিতে উজ্জ্বল হতে চেয়েছে, সেখানেই নারীর স্বাভাবিকতা বিকৃত হয়েছে। কিরণময়ীর মত উজ্জ্বল বুদ্ধি ও বিদ্যাসম্পন্ন নারীকেও মনোবিকারের রোগিনী হতে হয়েছে। 'নববিধান', 'স্বামী', 'দর্পচূর্ণ' ইত্যাদি উপন্যাসে তথাকথিত শিক্ষিতা নারীকে আত্মমর্যাদাহীন, কিছুটা বিলাসী করেই এঁকেছেন। শরৎ সমসাময়িক কালে স্ত্রীশিক্ষা ব্রাহ্ম পরিবারেই বিশেষ করে প্রচলিত

ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিরূপতা ছিল। শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মেয়েদের প্রতিও তাঁর খুব একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। এই মনোভাবেরই সমর্থনে তিনি তাঁর প্রিয় নারী চরিত্রগুলিকে দিয়ে হিন্দুয়ানীর বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করিয়েছেন। একদিকে তথাকথিত হিন্দুয়ানীর অকুণ্ঠতা ও মনুষ্যোচিত কর্তব্য পালনের একত্র সমাবেশ অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধি বিভ্রাটের যোগাযোগ ঘটিয়ে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনের সোজা রাস্তাটিই বেছে নিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রই নিজ কর্মশক্তির উপর নয়, নারী-শক্তির উপরই নির্ভরশীল। স্ত্রীর মৃত্যুতে উপেনের মৃত্যু হয় ত্বরান্বিত। মৃত্যুকালে উপেন তার 'স্বর্গতা' স্ত্রীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে—এইরূপ এক সহজ আবেগের প্রকাশ ঘটিয়ে শরৎচন্দ্র জনদাবী পূরণ করেছেন। 'গৃহদাহের' অচলার অপরাধ সে কোন পুরুষের জীবনে মঙ্গলশক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। নিজেও আশ্রয়চ্যুত হয়েছে। দুটি পুরুষকেও ধ্বংস করেছে। আবার 'দেনাপাওনায়' দুরাচারী জীবানন্দের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে যখন সে ষোড়শীর মধ্যে স্ত্রী অলকাকে আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ স্ত্রীশক্তির স্বাভাবিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছে পুরুষের জীবনে সামঞ্জস্য। 'দেবদাস' উপন্যাসটিকে শরৎচন্দ্র নিজেই immoral বলেছিলেন। 'দেবদাস' ও 'বড়দিদি' উভয় কাহিনীতেই নায়ক ব্যর্থ প্রেমিক এবং আত্মধ্বংশের মধ্যে দিয়ে তারা যেন জীবনে মুক্তি পেতে চায়। 'দেবদাস' চরিত্রটি একসময়ে শুধু বাঙালী কেন সমগ্র ভারতের নবযুবকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। এখনও হিন্দীভাষী অঞ্চলেও দেবদাস শব্দটি ব্যর্থ প্রেমিকের সমার্থক।

রবীন্দ্রনাথ কোন এক প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে প্রেম নারীর জীবনের অস্তিত্ব কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে তার অনেক প্রবৃত্তির মধ্যে একটি। শরৎচন্দ্রের পুরুষেরা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। বরং এখানে বঙ্কিমচন্দ্রই শরৎচন্দ্রের প্রেরণা। নারী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি—রমনী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী; রমনী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া, পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া—শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত নারী চরিত্রই এই মন্তব্যের আলোকেই বিচার্য। শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রগুলি স্ত্রী-চরিত্রের আলোকেই উজ্জ্বল। দেনাপাওনার ষোড়শীর ভৈরবীত্ব ত্যাগ করে জীবনানন্দের পত্নীত্বে ফিরে যাওয়া স্মরণ করিয়ে দেয় দেবীত্ব ত্যাগ করে ব্রজেশ্বরের ঘরে ফিরে যাওয়া প্রফুল্লকে। গৃহদাহের মৃণাল যেন রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্রের মৃণালের প্রতিবাদ। স্বামীকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের মৃণাল স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদে। শরৎচন্দ্রের মৃণাল সমাজের সমস্ত অন্যায়কে মেনে নিয়েই বৃদ্ধা অসহায়া শাশুড়ির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। এই দুই মৃণালের মনোভঙ্গিই দুই মহারথীর সাহিত্যবোধকেও যেন প্রত্যক্ষ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের মৃণাল প্রতিবাদী—সে ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করে। শরৎচন্দ্রের মৃণাল সর্বংসহা ধরিত্রী—বর্তমানকে স্নেহমমতায় ভরিয়ে দিয়েই সে তৃপ্ত। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী বিপ্লবীদের হতাশাব্যঞ্জক চেহারা এঁকেছেন। বিরূপ মনোভাব গোপন করেননি লেখক। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র পথ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। সশস্ত্র বিদ্রোহকে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতেই প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ শরৎচন্দ্র ছিলেন গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা। 'পথের দাবী' রচনাকালে ঘরে বাইরের বিপরীত চিত্র আঁকার সুপ্ত চিন্তা সম্ভবত শরৎচন্দ্রের মনে ক্রিয়াশীল ছিল।

নায়কনায়িকার মনের বিভিন্ন ভাবের উত্থানপতন দেখাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র আকস্মিক ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের রচনা কৌশলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি নিজ নিজ প্রিয়পাত্রের ক্ষতিসাধন করেছে। 'পল্লীসমাজে' রমা রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে, 'পণ্ডিতমশাই'এ কুসুম বৃন্দাবনকে আঘাত করতে গিয়ে চরণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, 'দেনাপাওনা'য় ষোড়শীর হুকুমে জীবানন্দের প্রাণসংশয় হয়েছে। 'বিপ্রদাসে' বিপ্রদাসের মা নিজ পুত্রেরই চরম ক্ষতি করেছেন। 'বৈকুণ্ঠের উইলে' গোকুল যাকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করত তাকেই কটু কথায় জর্জরিত করেছে—ইত্যাদি আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এর পেছনের মূল কথাটি হল পারিপার্শ্বিক জগতের স্বার্থ-প্রচেষ্টা অহোরহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেও বিকৃত করে নিজের দলে টানতে চাইছে—মানুষের সত্যবোধকে নষ্ট করতে চাইছে। তবে প্রেমের পরাজয় শরৎচন্দ্র কোথাও ঘটতে দেননি—প্রেমাস্পদকে হয়তো দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে—তবে সেখানেও প্রকৃত প্রেমের স্বরূপই উদ্‌ঘাটিত করেছেন লেখক।

অশ্লীল লেখক হিসেবে কুখ্যাতির অনতি বিলম্বেই শরৎচন্দ্র সমসাময়িক আধুনিক লেখকদের চোখে 'পিউরিট্যান' এবং নিতান্তই আদর্শবাদীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন—ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত শরৎচন্দ্রকে সম্ভোগবিরোধী বলেছেন। কথাটি সর্বাংশে সত্য। মানুষের জৈবিক দিকটি তিনি যথাসম্ভব আড়ালে রেখেছেন।

শরৎচন্দ্রের রচনার আর একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন আবেগমণ্ডিত মন্তব্য করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কৌশলটি বঙ্কিমানুসরণজাত—তবে আবেগ বাহুল্য সম্পূর্ণত শরৎচন্দ্রীয়।

শরৎচন্দ্র সহজ সরল অনলংকৃত ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। 'অলঙ্কৃত বাক্যের বাহুল্য যে কত পীড়াদায়ক সে কথা শুধু পাঠকই বোঝে।' এবং পাঠকদের আনন্দদান এবং তাদের হৃদয় জয় করাই ছিল শরৎ-সাহিত্যের উদ্দেশ্য। তবে শরৎচন্দ্রও যে ভাষার ক্ষেত্রে অলংকার একেবারে বর্জন করেছেন তা নয়। সুপরিচিত উপমার সু প্রয়োগ. বিশেষণ ব্যবহারের নৈপুণ্য, সাধু ও চলিত ভাষার অনায়াস মিশ্রণ শরৎচন্দ্রের রচনাকে গতিবেগ দিয়েছে। সংলাপে আছে নাটকীয়তা। সংলাপগুলি অত্যন্ত বাস্তব এবং প্রচলিত বাকভঙ্গিমার যথাযথ অনুসরণ তিনি করেছেন। কাহিনীটির সুরু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকীয়—পাঠক মনে কাহিনী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বাড়াবার চেষ্টা

—যাকে শরৎচন্দ্রের নিজের ভাষায় বলা যায়—'প্রথমেই একটা 'সামথিং' (প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি—শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬১)

শরৎচন্দ্র অপরাজেয় কথাশিল্পী আখ্যা পেয়েছিলেন জীবনকালেই। আজও জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তিনি অপরাজিত। তবে তাঁর রচনা কালজয়ী হবে কিনা—এ প্রশ্ন এখনও কেউ কেউ করে থাকেন। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ আজ আর নেই—কালের সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়েছে। শরৎ-চন্দ্রের উপন্যাসের পটভূমিগত আবেদন আর নেই। কিন্তু যে হৃদয়াবেগ দিয়ে তিনি লিখেছেন—সেই হৃদয়াবেগ এখনও বর্তমান এবং তা নিত্যকালের বস্তু। দৃষ্টান্তস্বরূপ অরক্ষণীয়ার কাহিনীটি নেওয়া যাক। কাহিনীটি অতীতাশ্রয়ী। সেই গ্রামকে গ্রাম উজাড় করা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আজ আর নেই—নেই জমিদারী প্রথাও—কিন্তু নিরুপায় জ্ঞানদার মধ্যে দিয়ে শোষিতের যে ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন, তা ভবিষ্যৎ পাঠকের চোখও অশ্রুসিক্ত করবে।

কান্তি গুপ্ত

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ সমাজ সংলগ্নতাই মুখ্য

[এক]

১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ 'নবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন ; লিখেছিলেন, 'যা যুগধর্মের অতীত বা যুগোত্তর, তাই চিরকালের জিনিস। ভাব জগতে যাঁরা যুগপ্রবর্তক, যাঁরা প্রতিভাবান তাঁদের উপর যুগের প্রভাব অতি অল্প। তাঁদের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি নিজের যুগকে জাতিকে এমনকি নিজেকেও অতিক্রম করে চলে। যাঁরা পাঁচ-পাচী রকমের লেখক তাঁদের লেখাতেই যুগের কালের জগদ্দল পাথর চেপে বসে থাকে। তার কারণ তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব তেমন সুস্পষ্ট নয়। তাই যুগ ধর্মের ছাপ ও সমাজ ধর্মের ছাপ বিশেষ করে তাঁদের রচনাতেই জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে।'

সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টির স্থান নির্দেশ করেছেন। তাতে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপে 'যুগোত্তর', 'যুগন্ধর' ও 'যুগোদ্ধারণ' উল্লিখিত হয়েছে ; চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠরূপে স্থান পেয়েছে 'যুগানুগ'. 'যুগোচ্ছিষ্ট' ও 'যুগোচ্ছু'। কোন্ সাহিত্যিক প্রতিভার সহযোগে তাঁর সৃষ্টিকে কোন্ স্থানের অন্তর্ভুক্ত করবেন সৎ পাঠকের হৃদয়ে তার একটা পরিমাপ নিশ্চয়ই রয়েছে এবং লেখক ও পাঠকের অজ্ঞাতসারেই মহাকাল তাকে বহন করে চলে। কিন্তু 'নবকুমার কবিরত্ন' সে সব বিষয়ে সহিষ্ণুতার প্রশ্রয় দেননি। তাঁর লেখনীতে কর্কশ ও রৌদ্রদীপ্তির ঝাঁঝ! 'যুগানুগ'. 'যুগোচ্ছিষ্ট' ও 'যুগোচ্ছু' প্রভৃতিকে চিহ্নিত করতে তিনি লিখেছেন, 'অনুকরণে এর জন্ম, অনুসরণে এর পুষ্টি আর যুগধর্মের অনুসরণে এর মৃত্যু। ছেঁড়া মতে জোড়াতালি দেওয়া এর কাজ। আধমরা আবেগের আধকপালে রোগে এর মাথাব্যথা, মানুষের মুক্ত মূর্তি এখানে পদে পদে সংকুচিত ইত্যাদি।'

সত্যেন্দ্রনাথ যখন এরকম প্রবন্ধ লিখেছেন তখন সাহিত্যের পালে যুগধর্মের অনুসরণের হাওয়া পুরোপুরি ঠাসা। পাল নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুষ্কর। যুগ-পরিবেশের নির্মম ও অতিমাত্রিক অভিকর্ষে শুধু পাঁচ-পাচী রকমের লেখকই নয়, প্রায় সকল সাহিত্যিকেরই অভিগমন অবশ্যম্ভাবী হোয়ে উঠেছিল এবং অস্তিত্বের জন্যেই ছিল অপরিহার্য। সুতরাং আহরিত উপাদানকে, শুদ্ধ চৈতন্যের অধিগত করার সাধনায় নিযুক্ত রেখে সৃষ্টকর্মকে 'যুগোত্তর', 'যুগন্ধর' ও 'যুগোদ্ধারণের' কোঠায় স্থান দেবার বাসনায় সেদিন স্বাভাবিক শৈথিল্য অপ্রত্যাশিত ছিল না।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাস আলোচনায় এসব কথা এসে গেল। কেননা, কালের দম্‌কা হাওয়ার অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সেদিন সকল কবি, গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিককে আন্দোলিত করেছিল। নরেশচন্দ্রের পক্ষে তাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়নি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রান্তে যখন নরেশচন্দ্র বাংলা উপন্যাস প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত ; জাতীয় কংগ্রেসের

নরম-চরম পন্থীদের সুনির্দিষ্ট কোনো পথের সন্ধান নেই, সন্ত্রাসবাদের নানা প্রকল্প ধূমায়িত। এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪) শেষ হয়েছে। পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে 'বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয়'—অনুষ্ঠিত হয়েছে রুশ-বিপ্লব। রবীন্দ্রনাথের ঋষিচিত্তে এসব সুর আগেই বেজে উঠেছিল, 'এবার যে ঐ এলো সর্বনেশে গো'! এই কাল-সীমায় নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালীর মানস-গৃহে সংঘর্ষ-বিরোধ সমীকরণের প্রয়াস। প্রাচ্যের একান্ত নিবিড় ভাবনার নিশ্চিত ছায়া পাশ্চাত্যের আলোকে বিলীয়মান প্রায়। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ব্যতিব্যস্ত মধ্যবিত্তের ভাবনায় আশ্রয় পেলো কার্ল মার্কসের চিন্তার আভাস, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা দূরীকরণের অভিপ্রায়; আর সমাজ-পরিবারে ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে নবীন প্রাণ-চেতনা। রক্ষণশীলতা অপসৃত নয়, কিন্তু তখন ফ্রয়েডের Interpretation of Dream (১৯১৩) এবং হ্যাভলক্‌সের যৌন তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থের সঙ্গে লরেন্স, হাক্সলি, পুশকিন, টুর্গেনিভ বাঙালীর পাঠ্যাভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হোয়ে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে এসব কথার স্বাক্ষর রয়েছে 'সবুজপত্র' (১৩২২), 'ভারতী' (১৩২১) এবং নারায়ণ (১৩২১) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়। 'সবুজপত্র' প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাঙালী সাহিত্যিকদের আধুনিকতম হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল। 'ভারতী' গোষ্ঠীর মধ্যে এ ভাবনা ছিল প্রসার্যমান। তাঁদের প্রাগ্রসরতা, পাশ্চাত্য সাহিত্য ভাবনার সন্নিকর্ষ দানে এবং দেশের উপেক্ষিত অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি দৃষ্টি সন্নিবেশে। 'ভারতী'তেই, প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের ঊর্ধ্বে, ব্যক্তির (নবনারী নির্বিশেষে) আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থান অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতাকারে প্রকাশ পেয়েছিল।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের অন্তকাল (১৯১৯) থেকে ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্রের অবস্থান বিশ শতকের ষাটদশকের উষাকাল পর্যন্ত। প্রায় বিয়াল্লিশ বছর তিনি উপন্যাস রচনায় মগ্ন থেকেছেন। তার এই অবস্থান-সীমার মধ্যে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসেছিল বিচিত্র এবং বিপুল পরিবর্তন। আর, 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়'? সুতরাং নগরকেন্দ্রিক বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবন ভাবনায় এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার অসীম বেগ, ঔদাসীন্যে বিপন্ন হোয়ে পড়েনি। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এলো নতুন অধ্যায় সূচিত করার সংকেত। দেশের মুক্তি আন্দোলনে শরিকানা পেলো অবজ্ঞাত উপেক্ষিত লোকসাধারণ। এই সময়ের কাছাকাছি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, শ্রমজীবী মানুষকে মানুষরূপে চিহ্নিত করায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করল। কয়েক বছরের মধ্যেই জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের বাঁচার সংগ্রামকে সার্থকতায় পৌঁছে দিতে শিক্ষিত যুবকদের নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হোলো প্রাদেশিক কৃষক সভা। এই কালপর্বেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, ফ্যাসিজমের দানবীয় কর্মকাণ্ডে পৃথিবী জুড়ে দেখা দিয়েছে সর্বনাশের ইশারা। আবার এই সর্বনাশের কালেই শুরু হয়েছে 'ভারত ছাড়ো' ডাকে মৃত্যুঞ্জয়ী অভিযাত্রা। অতঃপর স্বাধীনতার স্বর্ণপ্রভা এবং একই সঙ্গে স্বার্থান্ধের নারকীয় উল্লাসে দেশবিভাগ।

যুগের অনির্দিষ্ট ক্রান্তিপর্বে যুব-প্রাণে দুঃসহ ভার : একদিকে অস্তিত্বের নিরুপায়তায় হতশ্বাস, অপরদিকে নবীন জীবন আস্বাদনের স্বপ্নে উদ্দীপনা। অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনায় বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে অপরিমেয় ঘাত-প্রতিঘাত। বাংলা সাহিত্য প্রাঙ্গণে এই ঘাত-প্রতিঘাতের চিহ্ন বহন কোরে নিয়ে সাধ ও সাধ্যের যোগে সাহিত্যিকরা উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে, বিবেচনা যেমন সংবর্ধিত হয়েছে তেমনি অবিবেচনার দৌরাত্ম্য উপেক্ষিত হয়নি। 'লাঙল', 'গণদাবী' এবং 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' পত্র-পত্রিকাকে আশ্রয় কোরে সেদিন একদিকে 'স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি' আনার জন্য ব্যাকুলিত প্রাণের সাড়া ; অপরদিকে 'বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ে অবস্থানের মোহ'। বাংলা সাহিত্যে উভয়ের স্বাক্ষর রয়েছে পাশাপশি।

যুগের বিচিত্র পট পরিবর্তন ও ভাবনার প্রভূত সংকট সম্পর্কে সচেতন থেকেই নরেশচন্দ্র তাঁর প্রতিভাকে বহতা রেখেছিলেন। সকল অকৃত্রিম সাহিত্যিকের কাছে এরকমই প্রত্যাশিত।

নরেশচন্দ্র যখন বাংলা উপন্যাসে আপনার প্রতিভা উন্মোচিত করেছেন তখন শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্র 'ভারতী'র সৃষ্টি নন। কিন্তু 'ভারতী' গোষ্ঠী যে নতুন চেতনার আগমনী সংগীত রচনা করেছিল শরৎচন্দ্র তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে যৌন-চেতনাকে স্থান দিয়েছেন। নরনারীর সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম যেমন গভীর সমবেদনায় স্বীকৃতি পেয়েছে তেমনি পতিতা নারীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশে প্রোৎসাহের অভাব ঘটেনি। অকৃত্রিম সহমর্মিতায় তিনি তাঁর লেখায় স্থান দিয়েছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বিপাকের কথা। নরেশচন্দ্র 'যুগপরিক্রমায়' শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছিলেন। এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে অগ্রজের প্রতি অনুজের শ্রদ্ধা। নরেশচন্দ্র লিখেছিলেন, 'তিনি শুধু আলো আঁকেন নাই, ছায়াও আঁকিয়াছেন, আর ছায়ার ভিতর আলোর সন্ধান দিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের শিষ্য। তিনি তাঁহাদের নিকট পাইয়াছেন, চিত্রাঙ্কনে এক কঠোর সত্যনিষ্ঠা।' কিন্তু পাশ্চাত্য শিষ্যত্বের দাবি অগ্রজ অপেক্ষা অনুজেই সমধিক পরিলক্ষিত হয়। শুধু চিত্রাঙ্কনে নয়, উপাদান সংগ্রহে পাশ্চত্যের কঠোর সত্যনিষ্ঠার পরিচয় নরেশচন্দ্রে আপক্ষাকৃত উজ্জ্বল। শরৎচন্দ্রের সকল সৃষ্টিই হৃদয়সঞ্জাত। তাঁর বস্তুপ্রীতিতে যে ঔজ্জ্বল্য তা বস্তু-ব্যবহারে অক্ষুন্ন থাকেনি। বস্তু ব্যবহারে 'রিয়েলিস্টে'র নির্মম, নিরাসক্ত দৃষ্টি সংস্থাপনায় শরৎচন্দ্রের কিঞ্চিৎ অনীহাই আমাদের কাছে বড়ো হোয়ে ওঠে। আসলে সমকালীন সংকট, বিস্ময়ের বিমূঢ়তায় শরৎচন্দ্রকে বিপন্ন করেনি। জীবন-জিজ্ঞাসার নিরন্তর বেগ থেকে তাঁর বিশ্লেষণী সত্তাকে অনাহত রাখার দিকেই তিনি যত্নবান ছিলেন। তাঁর বস্তুপ্রীতি বস্তুরস সঞ্চারে বিরোধ ঘটায়নি। নরেশচন্দ্র বাস্তব জীবন বিন্যস্ত করেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে, মানব জীবনকে বিশ্লেষণ করার

উদগ্র ইচ্ছায়। শুদ্ধ চৈতন্যের স্পর্শে মানব জীবনের শাশ্বত মূল্য অন্বেষণ অপেক্ষা তাঁর চিত্তে ছিল নির্মম জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার সূত্রেই নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে যৌন-চেতনার পরিমণ্ডলে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও অবদমিত ইচ্ছার ক্রিয়া, পতিতার কামনা বাসনা এবং নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে পরিণামহীন আকাঙ্ক্ষার অনস্বীকার্য হাতছানি। নরেশচন্দ্রের বস্তুপ্রীতি বস্তুর নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটনে। নরেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের ভাব শিষ্য নন, তিনি ভিন্ন-পথগামী। কিন্তু 'ভারতীর' ক্রমধারায় শরৎচন্দ্রের সত্য-নিষ্ঠার প্রত্যাসন্ন দিকটি ত'র মধ্যে কঠোর ও নির্মম রূপ লাভ করেছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, নরেশচন্দ্রের নিদাঘ-দীপ্তির পর্বেই 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যিকদের যৌন-ভাবনা, পাপ পুণ্য বোধের অপরিণামদর্শী অনিশ্চয়তা, পতিতা নারীর লোলুপ লালসা প্রকাশের আয়োজন দেখা গেছে। এই আয়োজনে সাহস সঞ্চার করেছিলেন নরেশচন্দ্র। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (৪র্থ খণ্ড) ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন, 'বাস্তব বিলাসিতার বা বাস্তব দৃষ্টির প্রথম উন্মোচন ভারতীর আসরে। লালন খানিকটা নারায়ণের পৃষ্ঠায়। স্পষ্ট যৌন-আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু হইলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ইনি আইন-অধ্যাপনাসূত্রে ঢাকায় গিয়া ধীরে ধীরে যে সাহিত্যিক মণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করিলেন তাহারাই গল্প-উপন্যাস-কবিতায় এই "বাস্তব" বা "আধুনিক" ভঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন।' 'ভারতীর আসর ভাঙ্গিয়া আসিলে, দলভাঙ্গা কয়েকজন তরুণ-অতরুণ লেখক ঢাকা গ্রুপের সহযোগিতায় কলিকাতায় 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করিলেন।' কিন্ত দৃষ্টি ও ধ্যানের পার্থক্যে কল্লোলগোষ্ঠী ও নরেশচন্দ্রের মধ্যে দুর্বাতিক্রম্য ব্যবধান।

নরেশচন্দ্রের কাছে সাহিত্য রচনা রোমান্টিক বিলাস নয়, নিরীক্ষাগার। বাস্তবকে তিনি গ্রহণ করেছেন বিজ্ঞান সাধকের পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে যাচাই করার উদ্দেশ্যে। অতি আধুনিক রূপে চিহ্নিত হওয়া অপেক্ষা তিনি উপন্যাসে সমকালীন সংঘটন সচেতনতার (awareness of contemporary situation' —) প্রবর্তনাকে সুরক্ষিত রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। আধুনিকতার গুণ, সর্বাভিমুখী সক্রিয়তায়। পুরোনো ধ্যান-ধারণা বিশ্বাসের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধির অবিচ্ছন্ন অনুশীলনে নরেশচন্দ্র নিরত থেকেছেন। উত্তরসূরীদের সঙ্গে নরেশচন্দ্রের ফারাক এই আধুনিকতার প্রসঙ্গেই। নরেশচন্দ্র যাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁদের ভঙ্গিতে 'আধুনিকতাগিরি' একান্ত হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'বিচিত্রা'য় (১৩৩৪) 'আধুনিকতম সাহিত্য' প্রবন্ধে নলিনীকান্ত গুপ্ত এরকম ভাবনারই আভাস দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্যয়ের ফলে, ইউরোপের চেতনার ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় যে সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই—এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোস খেয়ালের কথা, জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই দেখি

আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে।'

বাংলা উপন্যাসে নরেশচন্দ্র যে বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তন করেছিলেন জগদীশ গুপ্তের লেখায় তার অনুক্রমণ, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৩৩৪ সালে। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ক্ষীণ নয়। তথাপি জীবনকে দেখার দুর্লভ দৃষ্টিতে তিনি নরেশচন্দ্রের সন্নিহিত। জগদীশ গুপ্ত নরেশচন্দ্রের ভাবশিষ্য নন, অনুসৃতির প্রশ্নই ওঠে না। জগদীশ গুপ্ত জীবনকে দেখেছেন আপন অনন্য সাধারণ দৃষ্টিতেই। প্রকার ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল। কিন্তু মনুষ্য চরিত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তাঁর আত্মস্থতা নরেশচন্দ্রকে বেশি স্মরণ করায়।

নরেশচন্দ্রের ক্রমধারায় অপর এক বিশিষ্ট উজ্জ্বল প্রতিভা, আমাদের কালের নিকটবর্তী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু **'An Acre of Green Grass'** গ্রন্থে লিখেছেন, **'A belated Kalloleán'** ; ফুটনোটে যোগ করেছেন, **'Though of Kallol in spirit, very much so, his work by some strange chance, never appeared in its pages, and he caught up with the Kalloleans only after Kallol had stopped'** বুদ্ধদেব বসু হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি-কর্মে, নরনারীর যৌন সমস্যার জটিলতা, নরনারীর দেহজ সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা এবং গণ-সচেতনতার প্রাধান্য লক্ষ্য কোরে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এরকম সিদ্ধান্ত বহিঃরূপের দিকে চকিত দৃষ্টি-জাত। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে মার্কসীয় দর্শন মানিক বন্দোপাধ্যায়ের আরাধনার অন্তর্গত। রাজনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি মার্কসীয় চিন্তায় তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তার গণ-সচেতনতা মার্কসীয় দর্শনের ওপর প্রবল বিশ্বাসেরই ফসল। ফ্রয়েডীয় চিন্তায় যে যৌন জটিলতার ছবি, তা আসলে, বৈজ্ঞানিক চেতনায় মানব স্বরূপকে, মানব অন্তরের সত্যকে উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি অন্বেষণে এ কথা অপরিহার্য হোয়ে পড়ে যে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সৃষ্টিপথকে প্রস্তুত কোরে দিয়ে গেছেন নরেশচন্দ্র। নরেশচন্দ্রের মনোযোগের বিষয় ছিল ফ্রয়েড, হাক্সলি ইয়ং প্রমুখ। আবার পাশাপাশি কার্ল মার্কসের দর্শন বিষয়ে তার জ্ঞানভাণ্ডার ছিল পরিপূর্ণ। নরেশচন্দ্রের সাহিত্যে গণ আনুকূল্য প্রাধান্য পেয়েছে মার্কসবাদ ও রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের প্রতি গভীর আস্থা থেকেই। যৌন সমস্যার জটিলতার বিষয় তিনি সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন মানুষের কর্মধারার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাকল্পে এবং কার্যকারণ বুদ্ধিকে সজাগ কোরে তুলতে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যে তিনি উপস্থিত করেছেন সেই সমাজে আবদ্ধ মানুষকে, যেখানে ধনের অসাম্যে নিপীড়ন, নিষ্পেষণ পশুত্বকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

নরেশচন্দ্র বাংলা উপন্যাস আলোচনায় এখন বিস্মৃত অধ্যায়। পঠন-পাঠনের সীমায় আবদ্ধ পণ্ডিতগণ নরেশচন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসায় ভ্রূকুঞ্চিত কোরে ওঠেন। আর

অধুনা বাজার দরে সাহিত্যের ওঠা নামার যুগে নরেশচন্দ্রের উপন্যাস পাঠের প্রত্যাশাও বৃথা। সাহিত্যের ইতিহাসে নরেশচন্দ্র খ্যাত হোয়ে আছেন রবীন্দ্র বিরোধিতায়। অথচ ইতিহাস বলে, নরেশচন্দ্র অপেক্ষা পারিষদবর্গের অবদান তাতে প্রভূত। ইন্ধন যুগিয়েছিলেন নরেশ-বিরোধী শক্তি। নরেশচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনায় এসব প্রসঙ্গ বোধ হয় নিরর্থক সংযোজন। কিন্তু আলোচনা এসেই পড়ে, এই কারণে যে, নরেশচন্দ্র যৌন-অপরাধ তত্ত্ব বিষয়ক উপন্যাস রচনায় অপখ্যাত। পঠন-পাঠন ভুবনে এবং সাহিত্য রসিক মণ্ডলে প্রচলিত রয়েছে যে,—নরেশচন্দ্রের উপন্যাস অশ্লীল এবং অকিঞ্চিৎকরও বটে। নরেশচন্দ্র অপরাধ তত্ত্বের ধুরন্ধর এবং এই অপরাধ তত্ত্বেরই পরাকাষ্ঠা ঘটেছে তাঁর উপন্যাস ইত্যাদিতে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এরকম উক্তিই করেছেন। লিখেছেন, **'Prominent among Rabindranath's opponents was Nareshchandra Sengupta, a Doctor of law, who at that time was causing some furore with his valiant novels about criminal morbidity'.** বুদ্ধদেব 'কল্লোল' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কালে নরেশচন্দ্র সম্পর্কে উদ্ধৃত কয়টি বাক্যের অধিক মন্তব্য প্রকাশের অবকাশ পাননি। সাম্প্রতিককালে মহতী সম্প্রদায় নরেশচন্দ্র প্রসঙ্গে অপেক্ষাকৃত সহানুভূতি ও সহমর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনায়-কিঞ্চিৎ বিড়ম্বনা থেকেই যায়। নরেশচন্দ্রের গল্প উপন্যাস অধুনা দুষ্প্রাপ্য। একালের সাহিত্য রসিকের পক্ষে নরেশচন্দ্রের সৃজনী শক্তির সান্নিধ্য লাভের সুযোগও আর তেমন নেই। সুতরাং বুদ্ধদেব চিহ্নিত **'criminal morbidity'**-র লেখক রূপেই নরেশচন্দ্র, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে অবস্থান করছেন এখনো।

[দুই]

বাংলা উপন্যাস-পথে সকল ঔপন্যাসিক আপন আপন মর্জি-রুচি, অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির ভিন্নতা নিয়েই বিরামহীন পথ চলাকে সজীব রেখেছেন। অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার কাছে একটি 'প্যাটার্নের' অনুবর্তনা প্রত্যাশিত নয়। যুগ পাল্টায় মানুষের ভাবনাও স্থির থাকে না। সাহিত্য-সাধক সচেষ্ট থাকেন, নতুন ভঙ্গি, নতুন বিষয়, নতুন ভাবের অভিব্যক্তিতে যেন শৈথিল্য না ঘটে। বাংলা উপন্যাসে প্যারীচাঁদ, ভূদেবের কাল থেকে এখনো পর্যন্ত সেই ধারাই বয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ এরকম কথাই আমাদের জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই।' সুতরাং যুগের প্রতিসারী লেখকরূপে নরেশচন্দ্র নিজেকে নিশ্চল রাখেন নি। পারিপার্শ্বিক অবস্থান-ভূমিকে তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছেন যুগের দাবিকে মেনে নিয়ে।

নরেশচন্দ্র একজন আইনজীবী এবং শিক্ষাব্রতী। আপন পেশার প্রতিষ্ঠা-গৃহে তিনি আবদ্ধ থাকেন নি। আজীবন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক

কর্মে তাঁর প্রাণবেগ সক্রিয় থেকেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বলশেভিক কর্মপ্রয়াস, জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ, নারী স্বাধীনতা, সমাজের নিম্নবর্গীয় নিঃস্ব মানুষের সেবা এরকম সকল কর্মভুবনে তাঁর সযত্ন উপস্থিতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সাহিত্যিকদের ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধি সুসংহত করতে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়। নরেশচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনায় এসব প্রসঙ্গ ধান ভানতে শিবের গীত প্রায়, তথাপি উল্লেখ করতেই হয়। জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা, উপাদান রূপে ঔপন্যাসিককে সৃষ্টির সার্থক রূপদানে সাহায্য করে। আপন অভিজ্ঞতালব্ধ বহির্জগতের ঘটনার আবর্তে মানব জীবনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে ঔপন্যাসিককে সাহস যোগায়।

নরেশচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা চল্লিশের অধিক। গল্প রচনার পরিমাণও স্বল্প নয়। নরেশচন্দ্র সমস্ত উপন্যাসেই তাঁর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন কিংবা তাঁর আদর্শকে পাঠকের সমবেদনার সন্নিহিত করার আয়োজনে অটুট থেকেছেন, এমন বলা চলে না। ভাববীজ (root idea) এবং বিষয়-কাহিনী-ঘটনা বিন্যাসের ভিন্নতা ধরে নরেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির কয়েকটি বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। নিচে বিভাজনের শীর্ষনাম এবং এই বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি উপন্যাসের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হোলো।

ক. নারীর স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা এবং বিবাহ সম্পর্কে নরনারীর মিলন : শুভা (১৯২০) শাস্তি, (১৯২৩), কাঁটার ফুল (১৯২৩), দূরের আলো (১৯২৬), তৃপ্তি (১৯২৭), দুষ্টগ্রহ (১৯২৯), পিছল পথের শেষে (১৯৩৭)।

খ. যৌন চেতনা ও যৌন অপরাধের জটিলতা : রক্তের ঋণ (১৯২৩), লুপ্তশিখা (১৯৩০), পাপের ছাপ (১৯৩২), ললিতের ওকালতি (১৯৩৯)।

গ. রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক আবর্তন : রাজগী (১৯২৫), ব্রতী (১৯৩০), অন্তরায় (১৯৩১), রবীন মাষ্টার (১৯৩৬). আমি ছিলাম'(১৯৫১)।

ঘ রোমান্স সম্পৃক্ত নরনারীর প্রেম : অগ্নি সংস্কার (১৯২০), বিপর্যয় (১৯২৪), মিলন পূর্ণিমা (১৯২৬) রূপের অভিশাপ (১৯২৮), অভয়ের বিয়ে (১৯৩০), তারপর (১৯৩১)।

ঙ পারিবারিক সমস্যা : পিতাপুত্র (১৯২' , বংশধর (১৯৩৫), স্ত্রীভাগ্যে (১৯৪৯). স্বপ্নসৌধ (১৯৬১)।

নরেশচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনায় এই বিভাজনের দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক হোয়ে ওঠে তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও অকৃত্রিম বোধকে স্পর্শ করার অভিলাষে। কোনো সাহিত্য সেবকই তার প্রতিভার সচলতার বেগকে অক্ষুণ্ণ রাখার সংকল্পে একই বিষয়কে কবি কল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেন না। ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য ঔপন্যাসিকের শক্তির পরিচয়। তাঁর উপন্যাস রচনার এসব ভাবনার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

[তিন]

'নারীর স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা এবং বিবাহ সম্পর্কে নরনারীর মিলন' পর্বের আলোচনায় শুভা (১৯২০) উপন্যাসটি সর্বাগ্রে মনে পড়ে। নরেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে 'শুভা' ঘরের বাইরে এসেছে। তার একটিমাত্র ভাবনা, 'স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, জীবনটাকে সার্থক করিবার একটি অবকাশ চাই।' একাকী নিঃসঙ্গ ভুবনের শূন্যতা দূর করতে তার কাছে পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু শুভা একটা তুচ্ছ স্বৈরিণী রূপে নিজেকে বিনষ্ট করতে চায়নি। ঘৃণায় সে উচ্চারণ করেছে, 'মান বিলাইয়া দিয়া শরীর পণ্যে জীবন ধারণ করা মৃত্যুর বড়ো অপমান।' তার অকৃত্রিম আশ্রয়দাতা এবং জীবন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম সুহৃদ সুরেশবাবুকে স্পষ্টই সে জানিয়েছে, 'বিয়ে করার মানে হচ্ছে আমার শরীরটার উপর আপনার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা।' অতঃপর শুভা সিস্টার গ্রেস রূপে মানব সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ কোরে শান্তির আশ্রয় খুঁজেছে।

সমগ্র উপন্যাসে বিবাহ সম্পর্কে নর-নারীর মিলন বিষয়ে নরেশচন্দ্রের বিজ্ঞানী কৌতূহল। অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, বিবাহ-বন্ধন নারীর জীবনে একমাত্র বন্ধন নয়। আর ভালবাসাশূন্য বিবাহ-বন্ধন পাপ। উপন্যাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে, 'যেখানে ভালোবাসা নাই, সেখানে পুরুষ স্ত্রী সম্বন্ধ মাত্রই পাপ'। নারীর যৌন সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা দূষণীয় নয়, কিন্তু যৌন প্রবৃত্তির হাতছানি যেন নারীর নারীত্বকে খর্ব না করে। পাপ পুণ্যের সংস্কারকে পেছনে রেখে তাই শুভাকে নরেশচন্দ্র বিদ্রোহিণী করে তুলেছেন। বিজয়মাল্য পরিয়েছেন শাশ্বত কল্যাণ ও মঙ্গলের ধাত্রী নারীর কম-কণ্ঠে।

বাংলা সাহিত্যে শুভার উপস্থিতি আকস্মিক নয়। এই উপস্থিতির প্রস্তুতি রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রশস্ত হয়েছে। 'শুভা' উপন্যাস পাঠে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র কয়েকটি ছত্র মনে জেগে ওঠে ঃ

> 'দেবী নহি, আমি সামান্য রমনী।
> পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই ; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
> পিছে, সেও আমি নহি।'

একই সঙ্গে 'মানভঞ্জনের' 'গিরিবালা'র নাট্যমঞ্চে আবির্ভাবের দৃশ্যটিও যেন ভেসে ওঠে। এদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের পরিচয় ঘটেছে ১২৯৯ সাল থেকে। ১৩১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বর' ছোটোগল্পের 'অনিলা' এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে গেছে, 'আমি চললুম আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খোঁজ পাবে না।' 'শুভা'র মধ্য দিয়ে নরেশচন্দ্র যেন অগ্রসর হয়েছেন অনিশ্চিত অন্ধকারের পথিক 'অনিলার' সন্ধানে।

নরেশচন্দ্রের পূর্বে বা সমসাময়িক কালে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। 'দুষ্টগ্রহে' (১৯২৯) 'করুণা'র বিদ্রোহিণী সত্তার কাহিনী। নেশাগ্রস্ত লম্পট স্বামীর অত্যাচার এড়াতে করুণা সতীন কন্যাকে নিয়ে ঘর ছেড়েছে। স্বামী অবিনাশের উৎপাত, লম্পট প্রভু মন্মথের ভোগলিপ্সার অত্যাচারের মধ্যেও করুণা আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় দৃঢ়, অটল থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত আপন মনের মানুষ বেছে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছে। হিন্দু মুসলমানের বাছ বিচার করুণার কাছে বড়ো হোয়ে দাঁড়ায়নি।

বিদ্রোহী সত্তার অধিকারে শুভা ও করুণা অভিন্ন। উভয়েই পরিবেশের দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়েছে কিন্তু পরাভবকে অনিবার্য বলে গ্রহণ করেনি। সকল বিরূপতার মধ্যেও তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার চিন্তাকে জাগ্রত রেখেছে। তবে উভয়ের মধ্যে অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে। শুভা মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ কোরে বিদেশিনী রমণীর বৃহৎ আদর্শ প্রতিপালনের আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করেছে। অপরদিকে করুণা বিত্তহীন, অনাথা। কোনো উচ্চ আদর্শ নিয়ে জীবন যাপনের কথা তার ভাবনার অন্তর্গত হয়নি। শুভা জীবন প্রতিষ্ঠায় নিজেকে অসামান্য কোরে তুলেছে। করুণার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুভা পুরুষের সান্নিধ্যকে ভ্রূকুটি হেনে একক নিঃসঙ্গ সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছে। করুণা মনের মানুষকে বেছে নিয়ে সংসার জীবনের মধ্যে নারীর সুখ খুঁজেছে।

'শুভা' অপেক্ষা 'দুষ্টগ্রহে' নরেশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত বস্তুমুখী। এই বস্তুমুখিতায় কলকাতার নগর জীবনে নারীর স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রতি পুরুষের দৃষ্টির পরিবর্তন একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি 'শুভা' লিখছেন তখনো এই সমাজে আইন-সিদ্ধ বিবাহ বিচ্ছেদকারী একক স্বাধীন নারীর স্থান অনিশ্চিত। তাই শুভাকে সেবাব্রতেই আত্মনিয়োগ করতে হয়। নয় বছর পরে, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে 'দুষ্টগ্রহে'র করুণা চরিত্র অঙ্কনে নরেশচন্দ্রের আস্থা অনেক সুদৃঢ়। তাই আইনসিদ্ধ বৈধ বিবাহের নিগড় শিথিল কোরে করুণাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন করুণারই নির্বাচিত পুরুষ-সংলগ্ন প্রেমশ্রী জীবনে।

'শান্তি' (১৯২৩)-তে নারীর স্বাধীন ভূমিকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ভিন্ন রূপে। প্রাচীন বিবাহের শুষ্ক সংস্কারের বন্ধন শিথিল প্রায়, এই কথা ব্যক্ত কোরে নরেশচন্দ্র নারীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আপন স্থান খুঁজে নিতে। রিরংসা রসে আপ্লুত নর্ম লীলা প্রকোষ্ঠে নয়; ধ্যানগম্ভীর সৌন্দর্যাশ্রমে। বিবাহিত 'গোপা' আপন প্রবৃত্তির প্রদীপনে অবিবাহিত যুবক 'কমল' সম্ভোগে উন্মুখ হয়েছিল। শুদ্ধ চৈতন্যের অনুশাসনে আপনাকে সংযত রেখে সে ফিরে এসেছে স্বামী গৃহে। কিন্তু সেখানে শুধু আইনসিদ্ধ বিবাহে লব্ধ পুরুষের প্রেমহীন সহবাস। তাই গোপা. কমল ও শুভেন্দু উভয়কেই আপন আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে অধ্যাত্ম চর্চায় জীবনকে সার্থক করায় প্রচেষ্টায় মগ্ন থেকেছে। বাংলা উপন্যাসে গোপার এই পরিণতি ঐতিহ্য বলয়ের অধীন।

এই পর্বের 'কাঁটার ফুল' (১৯২৩) উপন্যাসে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিষয়টি প্রচ্ছন্ন। আইনসিদ্ধ বিবাহ ও নরনারীর মিলনের জটিলতাকে আশ্রয় কোরে উপন্যাসটির ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। আইনসিদ্ধ বিবাহ অপেক্ষা নরনারীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম মিলনকে প্রগাঢ় করে—এরকম কথাই নরেশচন্দ্র এই উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। নায়ক অবনীর মুখে উচ্চারিত হয়েছে,—ভালবাসা শূন্য বিয়ে না হওয়াই ভালো। নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি নরেশচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা এই উপন্যাসের বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। 'কাঁটার ফুলে' নায়িকা রূপে স্থান পেয়েছে 'কুতুয়া'। সে উপেক্ষিত, উপহাসিত সমাজের মেয়ে, আবার অবৈধ সন্তানও বটে। উচ্চবর্গীয় জমিদার, শিক্ষিত অবনীভূষণের তাকে বিয়ে করা, রাজবাড়ির সহিস, কুতুয়ার পূর্ব স্বামী নবীনকে শিক্ষিত খৃীস্টান মেয়ে করুণার ভালোবাসা ও বিয়ে করা—এসবই নরেশচন্দ্রের দুঃসাহসিক অভিযাত্রার স্বাক্ষর।

'দূরের আলো' (১৯২৬) উপন্যাসটির বিষয় গভীর কল্পনা জাত নয়! তথাপি দাম্পত্য জীবনে নরনারীর মিলনের বাধাটি বিচার-বিশ্লেষণ করার আয়োজন এই উপন্যাসে অব্যাহত থেকেছে। 'তৃপ্তি' (১৯২৭) উপন্যাসে শিশির ও মিনতির জটিল ঘটনার আবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবহেলার রূপটি অঙ্কিত হয়েছে। মিনতি চরিত্রের মাধ্যমে নরেশচন্দ্র নারীর সম্মান ও মর্যাদা নারীকেই রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। 'পিছল পথের শেষে' (১৯৩৭) নারীর স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে নরেশচন্দ্রের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সুস্পষ্ট। উপন্যাসটিতে শিক্ষিতা নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আনুষ্ঠানিক বিয়ের আবশ্যকতা প্রধানভাবে বিচার্য হোয়ে উঠেছে।

'যৌন চেতনা ও যৌন অপরাধের জটিলতা' পর্বের উপন্যাসে 'পাপের ছাপ' (১৯৩২) সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি করে। উপন্যাসটি ১৯২২ খৃীস্টাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মেঘনাদ' উপন্যাসেরই ভিন্ন নামকরণ।

যৌন চেতনা ও যৌন ব্যাভিচার জাত ঘটনাকে অবলম্বন কোরে 'পাপের ছাপ' উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের যথার্থ অনুসরণে নরেশচন্দ্র তাঁর দৃষ্টি স্থির রেখেছেন। মানুষের অবচেতন স্তরে যে যৌন সম্ভোগ চেতনা, সেই চেতনাই তার সকর্মক জীবনকে নির্দেশ করে। তারই নির্দেশে মানুষ আত্মসমর্পণ করে পাপের কাছে। এ যেন অমোঘ নিয়তির মতো সর্বনাশার দিকে অঙ্গুলী হেলন। সকল সচেষ্টতা শুধু মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। নিরাসক্ত নির্মম বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে নায়ক 'মেঘনাদে'র মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বের সত্যটুকু অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন নরেশচন্দ্র। এই তত্ত্বের সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অপরাধ তত্ত্বের সূত্রে সৃষ্টি করেছেন 'মনোরমা'কে। এই চরিত্রে শুধু যৌন ব্যাভিচার জাত অপরাধ। তথাপি পাপীর ভয়ঙ্কর পাপচিত্র অঙ্কনে নিরুদ্ধ কাম প্রবৃত্তির তাড়নাই নরেশচন্দ্রের একমাত্র বিষয় হোয়ে ওঠেনি। অপরাধী মনোরমা চরিত্র অঙ্কনে তিনি বিজ্ঞান বুদ্ধিকে সজাগ রেখেছেন। মানব চরিত্র গঠনে প্রতিবেশের অপরিহার্য ভূমিকার বিষয়টি প্রকাশিত

হয়েছে মনোরমার চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মনোরমা জন্ম অপরাধী নয়। সুন্দর শান্তশ্রী জীবন যাপনে কুমারী মনের আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা মনোরমাকে অপরাধী করে তুলেছে। কুমারী মনোরমাকে যুবক মেঘনাদ বিয়ে করেনি, আর অভাবগ্রস্ত পিতার পক্ষে তাকে অন্যত্র পাত্রস্থ করার সুযোগও হয়নি। মেঘনাদ শুধু ফ্রয়েডীয় চিন্তার ফসল নয়। উপন্যাসের ঘটনা ধারা অনুসরণ করলে লক্ষ্য করা যায়, নায়ক মেঘনাদেরও অবস্থানান্তর ঘটেছে প্রতিবেশের দ্বারাই। অবশ্য এই প্রতিবেশ তার অন্তরের অভ্যন্তরে অবস্থিত সহানুভূতি ও সহমর্মিতা থেকে সৃষ্ট।

'রক্তের ঋণ' (১৯২৩) ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব নিয়ে মানব চরিত্র বিশ্লেষণে নরেশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পরিচয় রেখেছে। বাংলা উপন্যাসে জননীর এক ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত মূর্তি অঙ্কনে নরেশচন্দ্র একক পথযাত্রী। জননী 'সিদ্ধেশ্বরী'র অবৈধ সম্ভোগের ফসল পুত্র 'নগানন্দ'। পুত্র নগানন্দের ভৎর্সনাতেও তার বহু পুরুষ ভোগের উদ্দাম কামনা স্তব্ধ হয়না। নগানন্দের জীবনে সংঘাত আসে, কিন্তু ধমনীতে এই রক্তের অনিবার্য বহতা ধারাকে মুছে ফেলা সম্ভব হয় না। সমগ্র উপন্যাসে সিদ্ধেশ্বরীর উপস্থিতি ঘটেছে নগানন্দের যন্ত্রণা মথিত অন্তরকে প্রকাশের নিমিত্ত। সুতরাং বিন্যস্ত ঘটনায় নগানন্দের স্থান অপেক্ষাকৃত অধিক। আর এই সূত্রেই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ অপেক্ষা কবি-কল্পনা প্রধান স্থান নিয়েছে রূঢ় বাস্তবকে প্রতিফলিত করতে।

'লুপ্তশিখা' (১৯৩০)-তে পতিতা 'মালতী'র অপরাধের চিত্র। এই উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র, ঘৃণিত অপরাধী পতিতা মালতী যেন 'পাপের ছাপের' মনোরমারই অপর এক সংস্করণ। মনোরমার অপরাধ প্রবণতা যৌন প্রবৃত্তির বিধান। মালতী চরিত্র অঙ্কনেও নরেশচন্দ্র মনোবিজ্ঞানীর এই দৃষ্টি স্থির রেখেছেন। অপরাধ তত্ত্বের আলোকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন মালতীকে। কিন্তু গভীর সহানুভূতি সহকারে জানিয়েছেন. মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য রোধের নিয়ন্তক-প্রতিবেশ। পাপী একদিনেই পাপী হয়ে ওঠে না। তার অন্তরের পাপের বীজ অঙ্কুরিত হয় পরিবেশের পরিপোষণায়। বিচারক বটুক মনোহরপুকুরের মালতীর বিচার করতে বিচারাসনে বসে ঘৃণায় কুণ্ঠিত হয়েছেন। অথচ এই মালতীর হৃদয় একদিন স্নেহ মায়ায় পরিপূর্ণ ছিল, নিরাশ্রয় বালক বটুককে স্নিগ্ধচ্ছায়া দান করেছিল। মালতীর পরিবর্তনে পরিবেশের অনিবার্য ভূমিকাটি চিহ্নিতকরণে নরেশচন্দ্র বাস্তব দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

পতিতা নারী নিয়ে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর নির্মম দৃষ্টির কথাও মনে আসে। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে রচিত 'বিচারক' গল্পে রবীন্দ্রনাথ পতিতা 'ক্ষীরোদা'কে বিচারশালায় বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন সমাজের জীবন্ত পাপ-স্রষ্টাদের সুচিহ্নিত করতে। নরেশচন্দ্রের দৃষ্টি ভিন্ন, কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের পথকেই প্রশস্ত করেছেন।

'ললিতের ওকালতি' (১৯৩৯)-তে ফ্রয়েডীয় চিন্তারই প্রাধান্য। আদর্শ ও

আদর্শহীনতার সংঘাতে যৌন চেতনার ভূমিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাসে প্রবল হোয়ে উঠেছে। কিন্তু নরেশচন্দ্র মুখ ফিরিয়েছেন সুস্থ সমাজের দিকে, উপন্যাসের নায়ক 'ললিতে'র পরিবর্তন সে কথাকে সমর্থন জানায়।

'রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক আবর্তন' পর্বের উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রাজগী' (১৯২৫)।

বাংলা সাহিত্যে এই পর্যায়ের উপন্যাস রচনায় নরেশচন্দ্র পথিকৃৎ নন। তবে নরেশচন্দ্রের পরবর্তীকালে সচেতনভাবে এ পথে আর কোনো ঔপন্যাসিক অগ্রসর হয়েছিলেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ১৮৯৭ খৃীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নবসৃষ্ট জমিদারি ব্যবস্থার উদ্ভবে বাংলার কৃষক সমাজে যে সর্বনাশ নেমে এসেছিল, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। ঐ প্রবন্ধে জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপের প্রসঙ্গও বঙ্কিমচন্দ্র উত্থাপন করেছিলেন। জমিদারদের অত্যাচার ও কৃষকদের অবস্থা নিয়ে নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ রচনা উনিশ শতক থেকেই শুরু হয়। অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, মোশাররফ হোসেনের রচনার মাধ্যমে বাঙ্গালী পাঠকদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ খৃীস্টাব্দ থেকে জমিদার ত্রাসিত বঙ্গদেশেব লোকসাধারণের অবস্থা কবিতায়, ছোটোগল্পে, নাটকে, উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন আজীবন। তার 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেও জমিদার শ্রেণী ও তাদের অমানবিক ক্রিয়াকলাপ উত্থাপিত হয়েছে তীব্র ভৎর্সনার যোগেই।

নরেশচন্দ্রের 'রাজগী' উপন্যাস পাঠে পূর্বসূরীদের অনুধ্যানের কথা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে এসে যায়। 'রাজগী' উপন্যাসটিতে নরেশচন্দ্র জমিদার ব্যবস্থা বিলোপের দাবি নিয়েই যেন সচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছেন।

'রাজগী' উপন্যাস সম্পর্কে তারাশঙ্করের মন্তব্যটি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণীয়। 'অমৃত' পত্রিকায় (১৯৭১) 'একটি নাম : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'বাংলার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কল্পনা এবং আন্দোলন যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমদের তিনি একজন। তার রাজগী এদিকে প্রথম পদরেখা অঙ্কিত করে গেছে। সেই পথে পরবর্তী কালে আমি হেঁটেছি, সে ঋণ আমার চিরস্মরণীয় ঋণ।'

'রাজগী' উপন্যাসের নায়ক 'দ্বিজেশচন্দ্রে'র কৈশোর ও প্রারম্ভ যৌবন কেটেছে জমিদার বংশের উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশে। তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছেন শিক্ষক নরেনবাবু। অতঃপর নানা সংঘটনের মধ্য দিয়ে দ্বিজেশচন্দ্র যখন জমিদারি হাতে পেলো তখন সে নরেনবাবুর শিক্ষা ও কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক চিন্তার আলোকে তার জমিদারি অংশের জমি প্রজাদের মধ্যে বণ্টন কোরে দেয়। সাধারণ কৃষকের মতোই স্ত্রী সাবিত্রী ও পুত্রকে নিয়ে জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হোয়ে দ্বিজেশচন্দ্র জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। 'রাজগী'-র মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসে নরেশচন্দ্র যুগ-ক্রান্তির পাঞ্চজন্য ঘোষণা করেছেন।

এই পর্বের 'রবীন মাষ্টার' (১৯৩৬) উপন্যাসটি 'রাজগী' উপন্যাসেরই ক্রম-পরিণতি। রবীন মাষ্টারকে ভুবন মোহন ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও বি.এ. পাশ নয় বলে থার্ড মাষ্টার হোয়ে থাকতে হোলো। তারই জীবনের ক্রমপরিণতি নিয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনী। রবীন মাষ্টার 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' পড়ে, ক্লাশে ভারতের ইতিহাসের হিন্দুযুগের materialistic বিবর্তন ব্যাখ্যা করে। মার্কসের Capital পড়ে তার মনে প্রশ্ন ওঠে, 'জিনিষের আসল দামের মান হ'ল Labour time বা সে জিনিষটা তৈরী করতে যতখানি সময় লাগে। value তো হ'ল labour time, কিন্তু কার শ্রমের সময়?' সে Co-operative Society গঠন করার কথা চিন্তা করে। তার স্কীম—'জমীদার, মহাজন, চাষী, মধ্যস্বত্ববান সবাইকে নিয়ে একটা সোসাইটি।' এই সোসাইটিতে 'জমীদার মহাজন চাষীদের মতই লাভের অংশ ডিভিডেণ্ট স্বরূপ পাবেন' ইত্যাদি। রবীন মাষ্টারের কণ্ঠে শোনা যায়, 'যে মাটি অমনি জন্মায়—জমিদার তাকে তৈরী করে না। সেই মাটি অমনি জন্মায়—সেই মাটিতে কাজ করে চাষী যে ধন উৎপন্ন করে, তাতে ভাগ বসাবার আপনারা কে? মহাজনকে সে বলে, 'আপনার হাতে যে টাকা জমেছে, এর সবটাই অন্যায়ের সঞ্চয়, পরকে খাটিয়ে তার অর্জন থেকে অন্যায় করে ভাগ নিয়ে এটা সঞ্চয় করা হয়েছে।...অন্যায়টা পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার।'

'রবীন মাষ্টার' উপন্যাসটিতে সর্বত্র পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নরেশচন্দ্রের সংগঠনমূলক প্রতিবাদ। নরেশচন্দ্র বাংলার কৃষক-সভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 'জমি যার লাঙল তার' —এই ধ্বনির সার্থক পরিণতি দানে তাঁর কর্ম-প্রয়াস স্মরণীয়। রবীন মাষ্টার উপন্যাসের বিষয় তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। দেশের লোক-সাধারণের পক্ষে কার্ল মার্কসের চিন্তার আদর্শে অর্থনীতির বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রয়োগ প্রসঙ্গ উপন্যাসের ঘটনাবেগের সঙ্গে যুক্ত কোরে দেওয়া নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক আয়োজন। এই আয়োজনের সাবিতে নরেশচন্দ্র অদ্বিতীয়।

নরনারীর মিলন-সংঘাত বিষয়টি দেশের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত হোয়ে গড়ে উঠেছে 'ব্রতী' (১৯৩০) উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক 'মৈনাক'। মার্কস, লেনিন তার আদর্শ। 'নন-কো-অপরেশন' আন্দোলনে তার আস্থা নেই। দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তার মনে প্রশ্ন জাগে, 'ভারতের পনের আনা লোককে পদানত দাস রেখে কী স্বাধীনতা দেবে তাদের'? বিপ্লব প্রসঙ্গে সে বলে, 'আমাদের প্রথম কাজ গ্রামবাসীদের প্রস্তুত করা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লোকের মধ্যে জাগাবার জন্য একটা প্রকাণ্ড mass movement করা'। নরেশচন্দ্র মৈনাকের মুখে যে কথা ধ্বনিত করেছেন, স্বাধীন ভারতে আজও সে কথা সৎ-ভাবনার অধিকারীদের বিবেচনার অধীন। মৈনাক বলে, 'ইংরাজ অধিকারের স্থলে দেশী লোকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ পড়িয়া থাকিবে তাদের চিরাভ্যস্ত অধীনতার অন্ধকারে।'

উপন্যাস তথ্য ও তত্ত্বের কারাগার নয়, জীবনের মুক্ত লাস্যময় লীলায় উপন্যাসের সার্থকতা। নরেশচন্দ্র সে বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। ফলে উপরে উল্লিখিত বিষয় গুলিই 'ব্রতী' উপন্যাসের একমাত্র হোয়ে দাঁড়ায়নি। নরেশচন্দ্র নরনারীর ঈর্ষা-দ্বেষ-হর্ষ-বেদনা অভিব্যক্ত করায় লক্ষ্য স্থির রেখেছেন। তথাপি, মনে হয়, রাজনৈতিক ভাবনাগুলি এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠক মনে সঞ্চারিত করার আয়োজনে শক্তির অপ্রতুলতাকে প্রশ্রয় দেননি।

এই পর্বের 'আমি ছিলাম' (১৯৫১) একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। নরেশচন্দ্র বলশেভিকবাদ. সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রভৃতি ভাবনার সঙ্গে আজীবন নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে লোকসাধারণের পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী আন্দোলন হয়ত তাঁর হৃদয়ে স্পন্দন তুলেছিল। 'ব্রতী' উপন্যাসে মৈনাকের মুখে উচ্চারিত হয়েছে, দেশের জনসাধারণ যদি অধীনতার অন্ধকারে পড়ে থাকে তবে 'সমস্ত জাতকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য আবার একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব করতে হবে।' এই উপন্যাসের নায়ক 'সুকুমা'র কমিউনিস্ট। তাকে কেন্দ্র কোরেই বিন্যস্ত হয়েছে আবার একটা বিপ্লবের আয়োজনে সংযুক্ত সুকুমারের নানা সংঘাতপূর্ণ ঘটনাবলী। উপন্যাসের কাহিনীকার শশাঙ্কবাবুর মধ্য দিয়ে নরেশচন্দ্র জীবনের অন্তিম পর্বে দেখতে চেয়েছেন, স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে নবীন অভ্যুদয়। হয়তো নরেশচন্দ্রের প্রত্যাশাও ছিল।

'রোমান্স সম্পৃক্ত নবনারীর প্রেম' পর্বের উপন্যাসগুলিতে নারীর স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, বিবাহ ও নরনারীর মিলন সমস্যা, যৌন চেতনা ও যৌন অপরাধের জটিলতা; রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক আবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের আনাগোনা নির্বিন্ধ হয়নি। নরেশচন্দ্রের প্রতিটি উপন্যাসেই উল্লিখিত বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত কোনো না কোনো বিষয়ের প্রবেশ প্রায় অবারিত থেকেছে। তথাপি 'রোমান্স সম্পৃক্ত নরনারীর প্রেম' পর্ব-বিভাজন স্বীকার কোরে নেওয়া হোলো এই কারণে যে, এই পর্বের উপন্যাস-গুলিতে বর্ণিত নরনারীর প্রেম বিষয়টি অপর কোনো ভাবনার আত্যন্তিক চাপে নিষ্পিষ্ট হয়নি। অর্থাৎ নরনারীর প্রেমবিষয়ক চিন্তাই এইসব উপন্যাসে একান্ত সজীব রয়েছে। এই পর্বের উপন্যাস রচনায় নরেশচন্দ্রের কবি কল্পনায় রোমান্সের হাতছানি উপেক্ষিত হয়নি। কিন্তু রোমান্সের মোহাবরণে বাস্তব সমস্যাসঙ্কুল জীবনের স্বাভাবিক রূপকে তিনি উপেক্ষা করেননি। আবেগের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও তাঁর বিশ্লেষণী প্রবণতা একই থেকেছে। 'অগ্নিসংস্কারে' (১৯২০) প্রতিবেশের বৈচিত্র্যে ইলা ও সত্যেশের বিরোধ ও মিলন কাহিনী। 'বিপর্যয়ে' (১৯২৪) বিধবা মনোরমার বিবাহ-প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিবাহিত ইন্দ্রনাথের প্রতি অনীতার প্রেম অর্ঘ। অনীতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন মিলনে নয়, প্রেম ত্যাগেই মহৎ হোয়ে ওঠে। 'মিলন পূর্ণিমা'য় (১৯২৬) স্থান পেয়েছে সৌরীন্দ্র ও রেখার বিবাহোত্তর জীবনের বিচ্ছেদ ও মিলন কাহিনী। 'অভয়ের বিয়ে (১৯৩০), 'তারপর' (১৯৩১) উপন্যাসে

প্রধান স্থান নিয়েছে রোমাণ্টিক বাতাবরণে যথাক্রমে অভয় ও মায়ার বিবাহ এবং সরমা ও অজয়ের মিলনে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন।

এই পর্বের 'রূপের অভিশাপ' (১৯২৮) অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দরিদ্র মুসলমান পাটচাষী পরিবারের কন্যা 'পরী'র অভিশপ্ত জীবন কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের পটভূমিকায় স্থান পেয়েছে পূর্ববঙ্গের অসংখ্য দীন-দরিদ্র পাটচাষীদের জীবনযাত্রা। অর্থনৈতিক বিপর্যয় মানুষের অন্তরের স্নেহ-মায়া-মমতাকে লাঞ্ছিত করে; প্রেম ভালবাসা সকলই উপেক্ষিত হয় শুধু কোনোরকমে টি'কে থাকার সংগ্রামে। পরী ভালোবেসেছে দরিদ্র মজুর লতিফকে। পরী ও লতিফ অবিচ্ছেদ্য প্রাণ। কিন্তু পরীর বিয়ে হয় অন্যত্র। দারিদ্র্যের নির্মম দুর্গ ভেঙ্গে তাদের মিলনসৌধ এই পৃথিবীতে কোনোদিনই নির্মিত হোলো না। আত্মহত্যায় অবসিত হোলো লতিফের জন্য পরীর আত্মবিস্মৃত প্রেমময় প্রাণ।

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ধ্যান ধারণার উর্ধ্বে উপহাসিত অবজ্ঞাত দরিদ্র লোক-সাধারণের প্রতি কী গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতিতে নরেশচন্দ্রের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'রূপের অভিশাপ'।

পারিবারিক চিত্র পর্বের 'পিতা পুত্র' (১৯২৫) ও 'স্বপ্ন সৌধ' (১৯৬১) উপন্যাস দুটিতে বাঙালী যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন চিত্র। উপন্যাস দুটি রচনায় কালের যথেষ্ট ব্যবধান, কিন্তু যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনে নরেশচন্দ্রের অন্তরের বেদনা প্রকাশে নিকটবর্তী। মোটামুটি একটি আদর্শের বলয়ে ঔপন্যাসিকের প্রত্যাশা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'বংশধর' (১৯৩৫) উপন্যাস।

নরেশচন্দ্রের বহুসংখ্যক উপন্যাস বর্তমান আলোচনার বাইরে থেকে গেল। অনালোচিত উপন্যাসের কোনো কোনোটিতে নরেশচন্দ্রের শক্তি ও সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত সম্প্রসারিত হয়েছে এমন দাবিকেও অযথার্থ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে নরেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির যে পাঁচটি বিভাজনের পরিকল্পনা করা গেল, তার বাইরে, ভিন্ন স্বাদের গৌরব নিয়ে আর কোনো উপন্যাস গড়ে উঠেছে, এমন মনে হয় না।

[চার]

নরেশচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে অক্লান্ত অভিযাত্রী। আরো অনেক বিচিত্র কর্মযোগের মধ্যেই তাঁর উপন্যাস লেখা চলেছে অবিশ্রান্ত বেগে। হয়তো সে কারণেই, তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসেই শ্রমযোগ ও ধ্যানযোগের আড়াআড়ি সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। শ্রমযোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে উপাদান সংগ্রহে, উপাদান ব্যবহারে ধ্যানের মহিমা বিকীর্ণ হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। সমকালীন যে সব ঘটনা ও ভাবনায় দেশের চিত্তকে উত্তরোত্তর আন্দোলিত করেছিল নরেশচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে সব কিছুরই স্পর্শ রেখেছেন। কিন্তু যে সহৃদয় প্রসন্নতা রসলোকের অভিমুখে পাঠককে পৌঁছে দেয় সেই প্রসন্নতার ন্যূনতা কিঞ্চিৎ পীড়া উদ্রেক করে বইকি!

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে 'বুলির ব্যবস্থাকেই মুখ্য' কোরে তোলার ব্যাপারে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। এর কারণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'আধুনিক কালে জীবন সমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা কবার কাজে এ যুগের মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত'। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে এ যুগের মানুষের ব্যস্ততার আত্যন্তিকতা প্রবলভাবে অনুভূত হয়। নরেশচন্দ্রের অভিজ্ঞতার সীমায় অবস্থিত সকল ঘটনা প্রবাহ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু উপলব্ধি ও অনুভূতির যোগে সেগুলি সুবিন্যস্ত হয়নি। সকল ঘটনাকেই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা দানে নরেশচন্দ্র পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। এর ফলে আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, অবাস্তব ঘটনাবলী উপস্থাপিত হয়েছে, একের পর এক, যুক্তির বেড়া ভেঙ্গে। তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানকে অভিব্যক্ত করায় নরেশচন্দ্রের আগ্রহ কখনো কখনো উৎকট হোয়ে উঠেছে। চরিত্র সৃষ্টিকে উপেক্ষা কোরেই মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বর্ণনার দ্বারা নরনারীর সংঘাতের বিষয়কে অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। অনেক উপন্যাসে নরেশচন্দ্রের আবির্ভাব 'forceful preacher'-এর মতো। উপন্যাসে নরেশচন্দ্র অর্থনীতিবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্ সমাজবেত্তা ও নীতিবেত্তা, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা নিয়েছেন। এরকম উদাহরণ ছড়িয়ে আছে প্রায় সর্বত্রই। তথ্য ও তত্ত্বের অধিক কোনো অনিবার্য সত্য প্রতিষ্ঠায় নরেশচন্দ্র গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন হোতে পারেননি।

কলাবিধির প্রতি নরেশচন্দ্র যথেষ্ট যত্নবান থাকেন নি। উপন্যাসের গঠন-প্রণালীর ক্ষেত্রে নবীনতর কোনো ধারা প্রবর্তনেও তাঁর আগ্রহ সূচিত হয়নি। গদ্যভাষায় শিল্প প্রসাধন অপেক্ষা তাঁর সযত্ন দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল সুবোধ্যতার দিকে। রবীন মাষ্টার উপন্যাস ব্যতীত সমস্ত উপন্যাসেই তিনি সাধুভাষাকে আশ্রয় করেছেন। উপন্যাসের সংলাপে চলিত ভাষা ব্যবহারে নরেশচন্দ্র স্বভাব-সরসতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন। সংলাপে সাধু-অসাধু, উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে কোনো সংস্কার তাঁর মধ্যে প্রশ্রয় পায়নি ; চরিত্রের সজীবতা ও সচলতার দাবিকে নরেশচন্দ্র মান্য করেছেন।

বাংলা উপন্যাসে নরেশচন্দ্রের স্থান নির্বাচনে একটি কৌতূহল জেগে ওঠে। গণ-পাঠকের চিত্ত-তোষণে নরেশচন্দ্র তাঁর প্রতিভা ব্যয় করেননি। যুগ সন্ধিক্ষণের পর্বে দাঁড়িয়ে নরেশচন্দ্র নবীনকালের জন্যে উপন্যাস রচনার পথ প্রস্তুত করেছেন। তাঁর উপন্যাসে সুচিহ্নিত হয়েছে সৎ ও অকৃত্রিম ঔপন্যাসিকের সমাজ সংলগ্নতার অপ্রতিহত বেগ। সহৃদয় পাঠকের কাছে নরেশচন্দ্র সমাজ অভিমুখিতার দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। নরেশচন্দ্র যুগসন্ধিক্ষণের ঔপন্যাসিক!

—

তথ্যসূত্র ঃ

১. বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), ডঃ সুকুমার সেন
৩. An Acre of Green Grass, বুদ্ধদেব বসু
৪. সাহিত্য বিচিন্তা, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র
৫ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্য, ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
৬ নরেশচন্দ্র ঃ জীবন ও সাহিত্য, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ দাস

অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরূপা ও নিরুপমাদেবী ঃ সনাতন সমাজের প্রতিচ্ছবি

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আরম্ভ থেকে পুরুষ ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব. তাঁদের চিন্তায় নরনারীর প্রেম, দ্বন্দ্ব, আশা, নিরাশার দোলা ফুটে উঠেছে। কিন্তু একজন পুরুষ ঔপন্যাসিক নরজীবনের মনোজগতের লীলা যেভাবে অনুভব করতে পারবেন, নারীর মনোরাজ্যের লীলা সেভাবে উদ্ঘাটিত করতে পারবেন না। একটি নারীর সমগ্র সত্তা, তার ধর্ম, সংস্কার, বুদ্ধি, বিচার, ভালবাসা, দ্বন্দ্ব সব কিছু মিলিয়ে নারীর জীবন। তাই মহিলা ঔপন্যাসিকের হাতে নারীর মনের সমগ্র ছবিটি ফুটে উঠবে।

অবশ্য সাহিত্যিক উৎকর্ষের মানদণ্ড স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে বিচার হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণ ও জীবন সমস্যার গভীরতা প্রকাশ করা সমস্ত উপন্যাসের সাধারণ ধর্ম। এখন অবশ্য নারী পুরুষের মনের বিভিন্নতা প্রায় সমান হয়ে গিয়েছে মনোধর্মে, তবে নারীজীবনের বিশ্বাস, সংসার দুর্বলতা তার ভাবপ্রকাশে, প্রণয় নিবেদনে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত উপন্যাসের বিচার করতে গেলে দুটি দিক থেকে বিচার করতে হবে। প্রথমতঃ তাঁদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ কতখানি ও দ্বিতীয়তঃ তাঁদের মধ্যে নারীর নিজস্ব সুরের পরিচয় কতখানি পাওয়া যায়। অবশ্য এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 'অনুরূপা দেবী' ও 'নিরুপমা দেবী'র উপন্যাসের মূল্যায়ন ভিত্তিক আঙ্গিক বিচার।

অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) এবং নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১) দুজন বেশ কিছু ছোট গল্প লিখলেও, এঁরা প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক হিসেবেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপা দেবীর প্রথম বিখ্যাত রচনা 'পোষ্যপুত্র' ভারতী পত্রিকায় (১৩১৭-১৮) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। নিরুপমা দেবীর প্রথম উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার মন্দির'ও ভারতীতে ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরেও এঁরা অজস্র উপন্যাস লিখেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা কথাসাহিত্যে যে বিপুল পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেছে—জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, মূল্যবোধের যে মৌল পরিবর্তনের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, এই দুইজন বিশিষ্ট মহিলা কথাশিল্পীর সমকালীন রচনায় তার পরিচয় পেয়েছি।

এঁরা দুজনেই প্রথম বয়সে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাগলপুরের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিসত্তার যে বেদনা ও মহিমার নিঃসংশয় প্রতিফলন হয়েছে, সমাজলাঞ্ছিত নারী ও পুরুষের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর দরদী হৃদয়ের ভেতরে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের যে বহ্নি আভাসে দেখা দিয়েছে—এই মহিলা কথাসাহিত্যিক দুজনের রচনায় সেই মনোভঙ্গীর পরিচয় মেলে না। বরং এঁরা

সমাজচেতনা ও নীতিবোধের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিকে অনুসরণ করেছেন। এ'দের লেখাতে পারিবারিক জীবনাদর্শ, দাম্পত্য সম্পর্কের নিষ্ঠা, একান্নবর্তী পরিবারের ঐক্যবন্ধন, হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক চেতনার মূল বিকাশকে উন্নত করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কারণ দেশের প্রাচীন ধর্ম, সমাজ ও পরিবার প্রথার সঙ্গে নারীর সংযোগ অনেক নিগূঢ় ও কতকটা অচ্ছেদ্য। নারী স্বভাবতই রক্ষণশীল ও একনিষ্ঠ। কোন কিছু শীঘ্র বর্জন বা গ্রহণ তার স্বভাবের অনুকূল নয়। নতুন কোন বিশ্বাস বা কর্মধারা নারী তার জীবনে হঠাৎ গ্রহণ করতে পারে না। তাই এই দুই লেখিকার রচনাতে পাশ্চাত্যপন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় সনাতন আদর্শের মূল্যবোধগুলিকে মহিমময় করে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বিভ্রান্ত যখন পুরুষের মানসিকতা, তখনই দেশের প্রকৃত সনাতন ঐতিহ্য ও আদর্শকে এই দুই মহিলা শিল্পী তাঁদের রচনায়, বিশেষ করে অনুরূপা দেবীর সাহিত্যে নারীর রূপে সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। অনুরূপা দেবী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ছিলেন। পিতামহের মত সমগ্র মনন, চিন্তা, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য জীবন-বোধের অন্ধ অভিঘাতের হাত থেকে আমাদের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার চেষ্টা লেখিকা করেছেন। তাঁর 'পোষ্যপুত্র', 'বাগদত্তা', 'মা' উপন্যাসে তার যথেষ্ট নিদর্শন মিলবে। লেখিকার লেখায় অবান্তর পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা ও সরল কাহিনীর মধ্যে অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস সৃষ্টি, বিশদ, জটিল ও আতিশয্যদুষ্ট করার চেষ্টার ফলে তাঁর কথাসাহিত্যের সৌন্দর্য ও মহিমা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

অনুরূপা দেবী শক্তিশালী কথাশিল্পী হলেও তাঁর কাছে অনেক সময় শিল্প-সৃষ্টির চেয়ে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমা প্রচার ও হিন্দু নারীর জীবনাদর্শের মহিমময় ছবি আঁকতেই তাঁর মন ব্যস্ত ছিল : এইজন্য তাঁর উপন্যাসে একধরণের প্রচার-ধর্ম ও উদ্দেশ্যপ্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলির শেষে সব সময় দেখা যায় পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনাদর্শের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার চিত্র। তাই 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসে চন্দ্রকান্তের পারিবারিক শান্তি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'মা' উপন্যাসেও তাই। সকল দ্বন্দ্ব যন্ত্রণার শেষে ব্রজরাণী, অরবিন্দ ও অজিতকে নিয়ে নতুন পারিবারিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 'মন্ত্রশক্তি'তে অম্বরও বাণীর স্বামীত্বের পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার ফলে হিন্দু পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনাদর্শের জয় ঘোষিত হয়েছে।

নিরুপমা দেবীর রচনার পটভূমিতেও সেই একই ধরণের শান্ত, সনাতন হিন্দু সমাজ ও পরিবারের আনন্দ বেদনার ছবি ফুটে উঠেছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের বালবিধবা নিরুপমা, রক্ষণশীল জীবন পরিবেশে যাঁর সত্তা লালিত হয়েছে, তাঁর রচনাতেও সমাজের যে মূল্যবোধ তাকে তিনি লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেননি। তাঁর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' (১৯১১) থেকে 'দিদি' (১৯১৫), 'বিধিলিপি' (১৯১৭),

'শ্যামলী' (১৯১৮) সব উপন্যাসেই প্রচলিত দাম্পত্য জীবনের মূল্যবোধ ও স্নেহ প্রেমের উঁচু আদর্শের ছবি দেখান হয়েছে। লেখিকা কোথায়ও সমাজ নির্বিন্ধ প্রণয় সম্পর্ক বা সমাজ বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনাকে তাঁর কাহিনীর মুখ্য অবলম্বন করে তোলেননি। তবু অনুরূপা দেবীর তুলনায় নিরুপমা দেবীর জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সহজ। কোথায়ও তত্ত্ব, আদর্শ, উদ্দেশ্য বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা পিষ্ট হয়নি। তিনি অনেক বেশি নিরুচ্ছ্বাস ও সংযত। রচনাভঙ্গীও অনেক সংহত ও সুবিন্যস্ত। সহজ, সুমধুর ভঙ্গীতে তিনি নরনারীর মনের নানান দিকের প্রবণতাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনার সংখ্যা অনুরূপা দেবীর চেয়ে অনেক কম। অনুরূপা দেবীর রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক বেশি। 'রামগড়', 'ত্রিবেনী'র মত ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'চক্রে'র মত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক কাহিনী বা 'পথহারা'র মত বিপ্লববাদের ওপর রচিত উপন্যাস নিরুপমা দেবীর কলম থেকে বেরোয়নি। তিনি তাঁর সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার জগতে বিচরণ করেছেন। তিনি নিজের ক্ষেত্রে যে বাস্তবতাবোধ, অন্তর্দৃষ্টি, হৃদয়বত্তা ও সংযত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। দুজনের রচনার মধ্যে নানা দিক থেকে নানারকম পার্থক্য আছে। কিন্তু সমাজ, পরিবার, ধর্ম—এক কথায় জীবন সম্পর্কে, নরনারীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে এঁদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ এক। এঁদের কল্পনায় নারীর যে দুটি রূপ বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে, তাদের মধ্যে নারীর আদর্শনিষ্ঠ, ত্যাগপূত মহিমময় ছবিটি ফুটে উঠেছে। সে সব নারী ধর্মনিষ্ঠ, ধৈর্য, ত্যাগ ও পাতিব্রত্যের অচঞ্চলতায় মহীয়সী। মন্ত্রশক্তির রাণী চরিত্রের পরিণামের দিকে লক্ষ্য করলেই এর সত্যতা বোঝা যাবে। রাণীর তীব্র স্বামীবিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার ভেতর থেকে যে প্রগাঢ় পতিপ্রেমের প্রকাশ দেখা গেছে তা ভারতীয় নারীর শাশ্বত সাধনার ফল। বিয়ের সমস্ত লৌকিক তুচ্ছতা লুপ্ত হয়ে ধর্মনিষ্ঠ রাণীর চেতনায় এক লোকোত্তর বোধের জন্ম হয়েছে। সে বলেছে, 'বিবাহ কি বস্তু, তা আমি বুঝেছি ! বিবাহ মন্ত্র যে পতিপত্নীকে একাত্ম হতে অনুজ্ঞা করে, সে যে শুধু মৌখিক উপদেশ মাত্র নয়, নিজেই সে যে তার মহাশক্তি দ্বারা সেই সংযোগ ক্রিয়া সাধনে সক্ষম, আমার নিকট ইহা স্থূল প্রত্যক্ষ যাবৎ বস্তুর মতই সত্য'। নারীর অপর মূর্তি জননীরূপে প্রকাশিত। অনুরূপা দেবীর মা (১৯২০) উপন্যাসে সেই মাতৃরূপের প্রশস্তি মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। ব্রজরাণী সমস্ত অশান্তি, বিক্ষোভ, বিদ্বেষ ও ঈর্ষার সংকীর্ণতা অতিক্রম করে যেদিন মাতৃহীন অজিতকে আপন সন্তান রূপে গ্রহণ করতে পেরেছে, সেদিনই সে মাতৃত্বের গৌরবের পথ ধরে তার নারীত্বের চরিতার্থতার পথ সুগম ও সুনিশ্চিত করতে পেরেছে। নারীর আর একটি রূপ এই দুই লেখিকার রচনায় প্রকাশ পেয়েছে তা নরনারীর প্রেম। সেই প্রেমের বিকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও খুঁটিনাটি বর্ণনায় অনেকটা পাশ্চাত্য বিন্যাস রীতি চোখে পড়ে। নিরুপমা দেবীর 'দিদি', 'শ্যামলী', কিংবা অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা', 'উত্তরায়ণ' এর

উদাহরণ। প্রেমের বিচিত্র লীলা মাধুরী, বেদনা, আনন্দ, বিস্ময়, গভীরতা, উচ্ছ্বাস, অন্তর্দ্বন্দ্ব সবই এঁদের সৃষ্ট নায়ক নায়িকার জীবনে বাণীরূপ লাভ করেছে। কিন্তু প্রেমের যত বিচিত্র-বর্ণ লীলারূপে এঁরা প্রকাশ করুন না কেন—প্রাক্‌বিবাহ ও বিবাহোত্তর, সব প্রেমই এঁদের আদর্শবাদী দৃষ্টিতে এক এবং অভিন্ন। নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ সতীর আত্মবিসর্জন, অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা'য় অন্ধ ধীরার ইরাবতীতে আত্মনিমজ্জন কিংবা 'বাগ্‌দত্তা'য় হতাশ প্রেমিক শচীকান্তের জীবন উৎসর্গ করা, অথবা 'উত্তরায়ণ' গ্রন্থে আরতির আদর্শ আত্মত্যাগ—এই ধরণের পরিণাম দুই লেখিকার প্রেম সম্পর্কে প্রগাঢ় আদর্শ প্রবণতারই পরিচয় দেয়। এই দুই লেখিকা কেবল যে নারীর ভারতীয় ঐতিহ্য সম্মত দীপ্ত মহিমাই প্রকাশ করেছেন তাই নয়, নবনারীকে বাস্তব পরিবেশে, পরিচিত জীবনের বাস্তব আশা আনন্দের ও বেদনার বিড়ম্বনার বিচিত্র অনুভূতির প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। এই দুই লেখিকার রচনায় হিন্দুসমাজ ও একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে নারীর স্থান, পুরুষের হাতে তার লাঞ্ছনা, দেনাপাওনার ভিত্তিতে রচিত হিন্দুবিয়ের নিষ্ঠুর রূপ, বিবাহিত নরনারীর দাম্পত্য জীবনের জটিল সমস্যার পটভূমিতে নারীমনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ যথেষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এঁদের রচনায় সমস্যার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা মিশেছে, তার সঙ্গে আছে গভীর আন্তরিকতা, নারীসুলভ স্নিগ্ধ কমনীয়তা ও সৌকুমার্য। এই কোমলতা ও আন্তরিকতা বিশেষভাবে অনুভূত হয় নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে। তার উপন্যাসের ঘটনা তেমন চমকপ্রদ নয়, ঘরোয়া জীবনের ছোটখাটো সুখ, দুঃখ, দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ, দাম্পত্যজীবনে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যের সমস্যাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। শুধু বিষয়বস্তু নয়, তার উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলিও সাধারণ; 'দিদি' উপন্যাসের অমর, সুরমা, চারুর কথা আলোচনা করলেই একথা বোঝা যাবে। 'দিদি' উপন্যাসের কাহিনী একান্ত বাস্তব, অথচ জটিল, দ্বন্দ্বমুখর। উপন্যাসের ক্ষেত্রটি পারিবারিক সীমিত সংকীর্ণতার আবেদন একান্ত বাস্তব। চরিত্রগুলি বাস্তব ও একান্ত সজীব। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ফলে ঈর্ষা, অভিমান, জেদ, ও নিগূঢ় প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট সুরমা এক আশ্চর্যরকম প্রাণবন্ত চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

মহিলা ঔপন্যাসিক দুজনের লেখায় কমনীয়তা, সৌকুমার্য পাঠককে মুগ্ধ করে। নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ সাবিত্রীর কুণ্ঠাজড়িত, কৃতজ্ঞতা মেশান পতিপ্রেম বর্ণনায়, কিংবা 'শ্যামলী'তে প্রেমের প্রভাবে মূক ও জড় প্রকৃতির শ্যামলীর হৃদয়ে সূক্ষ্মভাবের স্ফুরণের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত নারীসত্তার জাগরণ বর্ণনায়, কিংবা অনুরূপাদেবীর 'গরীবের মেয়ে' (১৯২৬) নায়িকা নীলিমার অন্তর্লোকের করুণ প্রণয়তৃষ্ণার হাহাকার বর্ণনায়—এই মহিলা কথাশিল্পীদের নারীহস্তের কোমল স্নিগ্ধ শান্ত স্পর্শ পাওয়া যায়।

নারীহৃদয়ের এই নিগূঢ় বিচিত্র বেদনা ব্যর্থতা আশা-আনন্দের রূপের ছবি আঁকার

মধ্য দিয়ে নারীর ব্যক্তি পরিচয় অনেক পরিমাণে সুচিহ্নিত হয়েছে। ওপরে আলোচিত নারী চরিত্রগুলি কেউই একে অপরের প্রতিবিম্ব মাত্র নয়। প্রত্যেকের আচরণ কথাবার্তা ও স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য উপন্যাসে খুঁটিনাটি রূপে ফুটে উঠেছে। ব্যক্তি হিসেবে এরা প্রত্যেকে উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্টরূপ লাভ করেছে বলেই সজীব ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এঁদের লেখা চরিত্র কখনই কোথায়ও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যেও সেই সব নারী বিদ্রোহের রূপ নেয়নি। নারী জীবনের বঞ্চনা ও বিড়ম্বনা সহ্য করে কেঁদেছে। লেখিকাদ্বয়ের সমবেদনার স্পর্শে সেই বঞ্চিত নারী জীবনের চিত্র কেবল মর্মান্তিক অসহায়তায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

অনুরূপা দেবীর ও নিরূপমা দেবীর কতকগুলি উপন্যাস প্রায় একই ধরণের, এঁদের আদর্শ, মনোভাব, জীবন সমালোচনার ধারা ও বিশ্লেষণের প্রণালী অনেকটা একরকমের। এঁদের মধ্যে তুলনায় কে শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয় করা খুব কঠিন। অনুরূপা দেবীর অধিকারের ক্ষেত্র বিস্তৃত, অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী। অনুশীলন প্রসারিত, ইংরাজী, সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর দখল সুবিস্তারিত, তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ও বিষয় বৈচিত্র্য নিরূপমা দেবীর চেয়ে অনেক বেশী. নিরূপমা দেবীর কলাকৌশল অধিকতর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত। অনুরূপা দেবী যে অনেক জানেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তার লেখা সব জায়গায় বুঝতে পারা কঠিন। নিরূপমা দেবীর লেখা বুঝতে পারা অনেক সহজ। তাঁর লেখা সংযত এবং বেশী লেখার প্রবণতা একেবারেই নেই। তিনি অল্পমাত্রায় বর্ণনা দিয়ে সোজাসুজি বক্তব্য বিষয়ে চলে আসেন। সৃষ্টি শক্তির দিক দিয়ে অনুরূপা দেবী শ্রেষ্ঠ, কলাকুশলতা ও চিত্ত বিশ্লেষণে নিরূপমা দেবীই বোধ হয় প্রাধান্যের দাবী করতে পারেন। নিরূপমা দেবীর সৃষ্ট 'দিদি' অনুরূপা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মন্ত্রশক্তি'র চেয়ে উচ্চতর সৃষ্টি। 'মন্ত্রশক্তি'র মধ্যে মানুষের অহংকার, শেষের দিকে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত এবং আত্মবিসর্জন ও মন্ত্রের জোরের আদর্শ প্রচারে লেখিকা ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু নিরূপমা দেবী 'দিদি' উপন্যাসে প্রথম থেকে আভিজাত্যবোধ, পত্নীত্বের অহংকার, মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রূপ দেখিয়ে নারী জীবনের চরম মুহূর্ত্তের দিকগুলি ফুটিয়ে তুলে চরিত্রসৃষ্টির উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। অবশ্য উচ্ছ্বসিত আবেগ দৃশ্য অঙ্কনে নিরূপমা দেবী অনুরূপা দেবীর সমকক্ষ নন ; 'মন্ত্রশক্তি', 'পথহারা' ও 'মহানিশা' থেকে এই রকম তীব্র অগ্নিজ্বালাময়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আলোড়নের অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো সহজ। নিরূপমা দেবীর চিত্তবিশ্লেষণ অনেক ধীর, শান্ত, সংযত ও বাইরের বিক্ষোভের চেয়েও অন্তরের গভীরতা বেশী।

নিরূপমা দেবীর উপন্যাস ও ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প, তাদের মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্যেরও অভাব আছে, কিন্তু সব কয়টিরই কলাকৌশল বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রেমের বিরোধ ও দাম্পত্য জীবনের সংঘর্ষ প্রায় সমস্ত উপন্যাসেরই বিষয় এবং এই লেখিকার বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন এই যে সংঘর্ষের উপাদান৷ আমাদের সাধারণ বৈচিত্র্যহীন

গার্হস্থ্য জীবন থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। কখনও কখনও তাঁকে রোমান্সের অসাধারণত্বের পক্ষপাতী হতে হয়েছে, কিন্তু এসব জায়গায় রোমান্স খুব স্বভাবিকভাবে দেখানো হয়েছে বলে, পাঠকের কাছে অবিশ্বাস্য বলে বোধ হয়নি। পারস্পরিক বিরোধ ঘটেছে, বেড়েছে কমেছে, এই ছবিগুলি খুব নিপুণভাবে ও খুব সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে। তাঁর স্বল্পকথার গুণে অস্বাভাবিক রূপের ঘটনাগুলি উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, সুকুমার চিন্তাশীলতা ও জীবন সমালোচনার মধ্যে একটা কোমল করুণভাব তাঁর নারী-হাতের লঘু স্পর্শটি চিনিয়ে দেয়। তিনি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্না, কোথায়ও তিনি সমাজের বিরুদ্ধে যাননি, উঁচু গলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি, নারী জাতির ওপর বহু শতাব্দীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন নি ; অথচ স্বাভাবিক মৃদু ও কোমল স্বরে এই সূক্ষ্ম মর্মভেদী সমালোচনা যে নারীর, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

নিরুপমা দেবীর সর্বপ্রথম উপন্যাস 'উচ্ছৃঙ্খল' কাঁচা হাতের লেখা। উপন্যাসের ভিতরকার রসটি ভাল ভাবে জমে ওঠেনি—ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, ভাবগত ঐক্যে গাঁথা হয়নি। তবে উপন্যাসটির মধ্যে ভাষা ও বিশ্লেষণের সংযম লেখিকার পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ (১৯২১) লেখিকার প্রকৃত শক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসখানি একটি গরীব পরিবারের করুণ কাহিনী। সেই দারিদ্র্যের কাহিনী দারুণ মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখিকা বর্ণনা করেছেন। সতী চরিত্রে দৃপ্ত তেজ, নীরব সহিষ্ণুতা সংসারের জন্য প্রাণপাত করা ভাইবোনের প্রতি স্নেহ, অনমনীয় আত্মসম্মান জ্ঞানের সমন্বয়ে অপূর্ব হয়েছে। এই সব গুণের পাশে মনের অন্তরালে একটি গভীর প্রণয়োন্মুখ মন, পাথরের মত কঠিন সতী চরিত্রকে আরও জটিল করে তুলেছে। সতীর নীরব প্রেমের প্রকাশ পাঠক দেখতে পেল আত্মহত্যার আগে বিশ্বেশ্বরকে লেখা চিঠির মধ্যে। বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান, তার বুকে বজ্রের মত বেজেছিল। তাই চিঠিখানি পড়ে মনে হয় যেন সতীর বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, জাহ্নবী চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্য নেই, এগুলি type চরিত্র। সাবিত্রীর কুণ্ঠাজড়িত মনোভাবের মধ্যেও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়েছে। সতী আত্মবিসর্জন দিয়েও উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত অমর হয়ে রয়েছে।

'বিধিলিপি' (১৯১৭) লেখিকার প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। অত্যধিক বিশ্বাস জীবনে কি ধরণের ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে পারে, বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায়গুলি কি ভাবে বিপদ ডেকে আনে এবং জ্যোতিষ গণনার সার্থকতা উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। চরিত্র সৃষ্টি হিসাবে মহেন্দ্র ও কাত্যায়নীর স্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ। এদের মধ্যে সম্পর্কের জটিল বিরোধের রূপটি আশ্চর্য সুসংগঠিত ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কামাখ্যানাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ

দেখা যায় ঐ জাতীয় চরিত্রে অতিরিক্ত আদর্শমূলক হওয়ার জন্য বাস্তবতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। কামাখ্যানাথের সমস্যা সমাধানের চেষ্টার মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাতে তাঁর বাস্তবতার তীক্ষ্ণতা কিছুই ক্ষুণ্ণ হয়নি। আদর্শবাদের মধ্যে এই বস্তুতন্ত্রতার সংরক্ষণ লেখিকার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। ঘটনা বিন্যাসে চরিত্র চিত্রণে ও ভাবের গভীরতায় উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। 'বিধিলিপি'র প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছবিগুলির মধ্যে উঁচুদরের বর্ণনার ছবি ছাড়াও ভাব সংহতি আছে। আকাশভরা তারার আলো, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাতে আলোড়িত মেঘে ঢাকা রাত্রে আকাশের পটভূমিকা, এর অন্তরে ও বাইরে—দুটি দিকেই এক রহস্যের আভাস পাওয়া যায়। এই ব্যঞ্জনাশক্তি উপন্যাসটির বিচিত্র আকর্ষণ বাড়াতে সাহায্য করেছে এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসে অতি সহজেই রোমান্স পারিবারিক জীবনের মধ্যে ঢুকেছে। 'বিধিলিপি'তে রোমান্স ও বাস্তবতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে, 'শ্যামলী'তে (১৯১৮) তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এখানে আদর্শবাদের বাড়াবাড়ি বস্তুতন্ত্রতার সীমা অতিক্রম করেছে। অনিলের বিরাট আত্মোৎসর্গ ও রেবার নীরব অবিচলিত ধৈর্য-এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা আছে। বিশেষত; রেবা উপন্যাসের মধ্যে হঠাৎ এসেছে—অনিলদের সংসারে বা উপন্যাসের মধ্যে কোথায়ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। অনিলের প্রতি রেবার ভালবাসা কি করে এত শক্ত হল, তা লেখিকা দেখাননি, রেবার নীরব সহিষ্ণুতা, জীবনব্যাপী আত্মোৎসর্গের আড়ালে, তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইনি। অনিল ও রেবা বাস্তব জগতের মানুষ বলে মনে হয় না; লেখিকা উপন্যাসের মধ্যে অর্ধজড় শ্যামলীর মধ্যে মায়া, মমতা ও ভালবাসার সূক্ষ্ম ও অনুভূতিপূর্ণ নারী হৃদয়ের স্ফুরণ দেখিয়েছেন। মূক হৃদয়ের অব্যক্ত হাহাকার, তার নিজস্ব বেদনা প্রকাশের ব্যাকুলতা শব্দময় জগৎকে চোখ দিয়ে অনুভব করবার একটা ব্যাকুল আগ্রহ, দুরন্ত আবেগ, অতি সামন্য কারণে রেগে যাওয়া, নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার বেদনায় সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া, মনের বিপ্লব, অসম্পূর্ণ প্রকৃতি জীবনের অভাব বোধের একটি চমৎকার, কবিত্বপূর্ণ অথচ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়ে নিখুঁত ছবি উপন্যাসটির গৌরব বাড়িয়েছে; লেখিকা মূক বধির সম্বন্ধে অপরিসীম অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতির অসংখ্য বানী, মানব হৃদয়ের অগণ্য ভাবের স্রোত, সমাজ জীবনের জটিল ব্যবস্থা ও কঠোর অনুশাসন কি ভাবে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ভাষাহীনতার অতলস্পর্শ গহ্বরে আলোড়ন তোলে, তার থেকে নরনারীর মনোজগতে প্রেমের আলোর স্পর্শে কি ভাবে সুপ্ত জড় প্রকৃতি জেগে উঠে, ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়ে মনের ভিতরকার অনুভূতি-গুলি পদ্মের মত বিকশিত হয়, সেটাই আমাদের কাছে লেখিকা দেখিয়ে বিস্ময় উদ্রেক করেছেন। উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র শ্যামলী চরিত্রই বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করেছে এবং পাঠকের বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। এই উপন্যাস লেখিকার অপূর্ব দক্ষতা সম্বন্ধে পাঠককে বিস্ময়াভূত করে।

'দিদি' (১৯১৫) নিরুপমা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এর বিষয়বস্তু অতি সাধারণ চির-পরিচিত ব্যাপার—দাম্পত্য মনোমালিন্য। কিন্তু এই সাধরণ বিষয়টি লেখিকা এমন সূক্ষ্ম মনস্তত্বের সঙ্গে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন যে 'দিদি' উপন্যাসটি কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল রত্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য কতকগুলি জায়গায় লেখিকা কষ্ট কল্পনা করে পাঠকের চিন্তাশক্তিকে পীড়া দিয়েছেন, যেমন দেবেনের কাছে সরমার সঙ্গে যে অমরের বিয়ে হয়েছে সেটি চেপে যাওয়া, কোন ভাবনা চিন্তা না করে অমরের চারুকে বিয়ে করা, সুরমার সঙ্গে অমরের আলাপ না হওয়া, চারুকে একা কোলকাতায় রেখে যাওয়া ইত্যাদি। এবপর থেকে লেখিকা যে শিল্প-কৌশলের স্বাক্ষর রেখেছেন তা অতুলনীয়। অমর, সুরমা ও চারু এই তিনজনের মধ্যে যে জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের জের চলেছে, তার বিশ্লেষণ সকল দিক থেকে অনবদ্য ও অতুলনীয়। এই বিরোধের পরিবর্তনের স্তরগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে মিশে গেছে। সেগুলি এমনই দৃঢ় যে প্রত্যেকটিকে ভাগ করা যায়। অমর-চারুর পুত্র অতুলের অসুখে সুরমার অক্লান্ত সেবা অমরকে তার দিকে বেশী আকৃষ্ট কবল। অমরের এই চিন্তা তার মনে দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল, সে অন্যমনা হয়ে উঠলো চারুর কাছেও তা ধরা পড়ল, সুরমার হাত এড়াবার জন্য অমর চারু ও অতুলকে নিযে মুঙ্গের চলে গেল. সেখানে গিয়ে অমর অসুস্থ হয়ে পড়ল, সুরমা দেওয়ানের সঙ্গে মুঙ্গের গেল, সেখানের সুরমার অক্লান্ত সেবা অমরকে যেমন সুস্থ করে তুললো. তেমন মনের দিক থেকে আরও দুর্বল হয়ে গেল অমর। চারুব দিকে তাকিয়ে সুরমা অমরের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেল।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগে গল্পের ঘটনাস্থল ও পাত্রপাত্রীর পরিবর্তন হল। সুরমা বাপের বাড়ী গেলে নিরানন্দ জীবনে অতুলের মা' ডাক তাকে উন্মনা করে তুললেও, তার মধ্যে চারুর চিঠি, উমা ও প্রকাশের মেলামেশা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করল। সুরমা প্রকাশের সঙ্গে চারুর পালিতাকন্যা মন্দাকিনীর বিয়ে দিল। মন্দাকিনীর নিঃস্বার্থ স্বার্থলেপশূন্য স্বামীপ্রেম দেখে স্বামী অমরের প্রতি তার ভালবাসা জন্মাল। সারাজীবন অবিশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাতে অবসন্ন সুরমা শ্রান্তি ক্লান্তি, দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়ে তার আত্মাভিমান ধূলিসাৎ করে শ্বশুর বাড়ীতে ফিরে এসে অমরের পায়ের তলায় স্ত্রীর স্থান ভিক্ষা করে নিল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আজ মিলন সম্পূর্ণ হলো।

অমর ও সুরমার ভাব বিপর্যয়ের স্তরগুলি অতি চমৎকার ভাবে দেখানো হয়েছে। তাদের কথাবর্তায় ও ব্যবহারে অতি নিপুণ ভাবে পরিবর্তনশীল সূক্ষ্ম মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতগুলি ধরা পড়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্র অত্যন্ত সজীব। অমর, চারু, সুরমা, মন্দা উমা সকলেই যেন আমাদের চির পরিচিত প্রতিবেশীর মত। সুরমার মত সূক্ষ্ম ও গম্ভীর ভাবে পরিকল্পিত, প্রতিটি পদক্ষেপে জীবন্ত প্রাণের নিগূঢ় স্পন্দনে লীলায়িত চরিত্র বোধহয় বাংলা উপন্যাসের নারী জগতে দুর্লভ। তাদের মনের প্রত্যেক অন্দর কন্দরে, পরিচয় তাদের ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মতম স্ফুরণ আমাদের মনে শিহরণ জাগায়। সুরমা চরিত্র এই সহজ, সাবলীল অঙ্গ সৌষ্ঠবে, মনোজ্ঞ, জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রাণময়।

অনুরূপা দেবীর লেখা উপন্যাস সংখ্যা নিরুপমা দেবীর চেয়েও অনেক বেশী, তবে তাঁর লেখা তিনখানি উপন্যাস প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষের দাবী করতে পারে। 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯) ও 'পথহারা' এছাড়াও 'গরীবের মেয়ে', 'মা' (১৯২০), 'বাগদত্তা' প্রভৃতির নাম করা যায় তবে এগুলি সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে। 'চক্র' ও 'হারানো খাতা'তে ঘটনা বিন্যাসের জটিলতা চরিত্র বিশ্লেষণকে অতিক্রম করে গেছে। 'পোষ্যপুত্র' (১৯১৮), 'জ্যোতিঃহারা' (১৯১৫) পুস্তকে উপন্যাসের ঘাত-প্রতিঘাত বিশেষ নেই ; চরিত্রগুলি এক একটি বিশেষ চিন্তার ধারক বা বাহক মাত্র। ঘটনার চাপে চরিত্র বিকাশের সতেজ স্ফূর্তি ঘটেনি। 'রামগড়' ও 'ত্রিবেণী' আলাদা জাতের উপন্যাস—ঐতিহাসিক উপন্যাস। লেখিকা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে পারেন নি। ঘটনার মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে। ওঁর আসল ক্ষমতা ছিল সামাজিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে।

'মন্ত্রশক্তি' একদিক দিয়ে লেখিকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'মহানিশা' ও 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসে ভাব গভীরতা কম। 'মন্ত্রশক্তি'র মধ্যে লেখিকার কতকগুলি অনন্য সাধারণ গুণ আছে। আমরা জানি লেখিকার উপন্যাসে মন্তব্য ও বিশ্লেষণের আধিক্য আছে। কিন্তু 'মন্ত্রশক্তি'তে এই আতিশয্য একেবারে নেই। মন্তব্যের সংযম ও ঘটনার পরিমিতিবোধ, ঘটনার অগ্রগতিকে বাধা দেয় নি। উপন্যাসের গতিবেগ সর্বত্র সরল, স্বচ্ছন্দ ও সব রকম বাহুল্য-বর্জিত। আর একটি বিশেষত্ব 'মন্ত্রশক্তি'র উৎকর্ষের কারণ হয়েছে। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস আমরা প্রায় সকলেই করি। বর্তমান উপন্যাসে লেখিকা নরনারীর জীবনের উপর বেদমন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে বাস্তব জীবনেব সঙ্গে রোমান্সের এক অভিনব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এটিই 'মন্ত্রশক্তি'তে লেখিকাব বিশেষ কৃতিত্ব। এই উপন্যাসে ঘটনাভিত্তিক অনেকগুলি বিশেষত্ব আছে। আগেকার কালে জমিদার পরিবারে কতকগুলি বিশেষ প্রথা ছিল যা তাদের সাধারণ জীবনযাত্রার পথে অনেক জটিলতার সৃষ্টি ক'রছে। প্রথম পুরোহিত নিয়োগ প্রথা, যার ফলে জমিদারের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে অম্বরনাথের মন্দির প্রবেশ ও বাণীর সঙ্গে সংঘর্ষ। দ্বিতীয়, বিবাহ সম্বন্ধে অনুশাসন—যা লঙ্ঘন করতে না পেরে বাণী সেই উপেক্ষিত অম্বরনাথকে পতিত্বে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই বিশেষত্বগুলিই এই উপন্যাসের কাহিনীতে অসাধারণত্বের সঞ্চার করেছে, কিন্তু এর মধ্যে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নেই। চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে একমাত্র বাণীই পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিতভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তার কঠোর, ক্ষমাহীন মনোভাব, দেবনিষ্ঠ অম্বরনাথের প্রতি তার নিষ্ঠুর অবজ্ঞা, পিতামাতার প্রতি তার অভিমানের আগুনবর্ষণ —খুব স্বাভাবিক অথচ সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। বিয়ের সময় অম্বরের ধীর ও সংযত ব্যবহার, অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মানবোধ বাণীর মনকে খানিকটা বিচলিত করেছে, কিন্তু এই সমস্ত গুণও বাণী অগ্রাহ্য করেছে ; তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে অম্বরের

দৈন্য। তারপর অম্বরের দীর্ঘ প্রবাস ও একান্ত নির্লিপ্ত উদাসীন ব্যবহার বাণীর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে, নিজের শ্রদ্ধাভক্তিকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। হঠাৎ তার মায়ের মৃত্যুতে বাণীর মনের গভীর শোকাচ্ছন্নতা, নিঃসঙ্গ একাকীত্ব, মনের শ্রদ্ধা—প্রেমাগ্নিতে জ্বলে উঠেছে। এর ওপর বৈদিক মন্ত্রের শক্তি প্রেমমন্ত্রে শক্তি জুগিয়েছে। বাণীর মনে ও দেহে প্রেমের আগুন জড়িয়ে ধরেছে, প্রেমের আগুন তার অভিমান, গর্বকে গলিয়ে দীনা হীনা কাঙ্গালিনীতে পরিণত করেছে। লেখিকার বর্ণনায় তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি ও কাব্যের মনোজ্ঞতা একত্রিত হয়েছে। বাণী চরিত্রের বিশেষত্ব, তার ধর্মভাব ও ভক্তিপ্রবণতা স্মরণ করলে, মন্ত্রের প্রভাব তার মনোভাব পরিবর্তনের একমাত্র উপায় বলে মনে হয়। কেন না কেবলমাত্র অম্বরনাথের চরিত্র-গৌরব তার অনন্য দৃঢ়তা গলাতে পারত কি না সন্দেহ। যুগ যুগান্তর ধরে প্রধাবিত বেদমন্ত্র সব সময় তার কানে ধ্বনিত হয়ে তার মনে অপরাধ সম্বন্ধে তীব্র অনুশোচনা জাগিয়ে তুলল এবং তার সব অহঙ্কার চূর্ণ করে তাকে স্বামীর পদপ্রান্তে এনে ফেলল। এই মন্ত্রশক্তির ওপর অবিচলিত বিশ্বাসে সে মৃতকল্প স্বামীর দেহ নিয়ে বসেছে এবং তার একাগ্র সাধনা দিয়ে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। শেষ পরিচ্ছদটির জ্বলন্ত আবেগময় ভাষা বাণীর বাহ্যজ্ঞানরহিত ধ্যানাবিষ্ট একাগ্রতার সঙ্গে সুন্দর সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। এই পরম তন্ময়তার মুহূর্তে সে সাধারণ রমনীর ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে উচ্চতর আদর্শলোকে উন্নীত হয়ে পৌরাণিক সতীদের সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করেছে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলিও খুব স্বাভাবিকভাবে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। বাণীর বাবা ও মা, রামবল্লভ ও কৃষ্ণপ্রিয়া, দুজনেই মেয়েকে খুব ভালবাসেন এবং এই সন্তান স্নেহই তাদের সব পুরোহিত আদ্যনাথের দৃপ্ত তেজ, অভ্রভেদী অহংকার ও পাণ্ডিত্যাভিমান, অধরের প্রতি তার বিজাতীয় বিদ্বেষ তাকে বাণীর পুরুষ সহযোগীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। উপন্যাসের এক একটি খণ্ডচিত্র আশ্চর্য কলাকৌশলের সঙ্গে লেখিকা বৃহত্তর কাহিনীর মধ্যে স্থাপিত করেছেন। মৃগাঙ্ক ও অব্জার বিচ্ছেদ মিলনের ছবিটি প্রধান উপন্যাস কাহিনীর মধ্যে সামান্য গতিবেগ সঞ্চার করেছে এবং বাণী ও অম্বরের গভীরতর ও প্রবলতর সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য বৈপরীত্য মূলক তুলনা করে লেখিকা বাণী ও অম্বরের জীবন জটিলতা স্পষ্ট করে তুলেছেন। বাণীর অহঙ্কারের পাশে অব্জার সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতা সুন্দর হয়েছে। বাণীর স্বামী বিদ্বেষ তার জীবনব্যাপী আদর্শ ও সাধনার অনিবার্য ফল এই মনোভাবের গতিবেগ অ'ত তীব্র; এর স্থায়িত্বও অতি দীর্ঘ; এবং এর পরিবর্তন ঘটল সুদীর্ঘ অনুশোচনার পর, দৈবশক্তির প্রভাবে। মৃগাঙ্ক-অব্জার ছোট্ট কাহিনীর পাশাপাশি বাণী অম্বরের সুদূর প্রসারী কাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধির পক্ষে আমাদের সাহায্য করে। কাহিনীর মধ্যে অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে গোপীনাথ জীউও একটি চরিত্র বলে মনে হয়। কারণ সকলের চেয়েও এই পাষাণ দেবতাটি ক্রিয়াশীল এবং কাহিনীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে

প্রতিষ্ঠিত। দেবমন্দিরের ধূপ, দীপ, শঙ্খ, ঘণ্টা, পূজো উপচার উপন্যাসের অধিকাংশ স্থল জুড়ে আছে। এই বিগ্রহটিই বাণীর প্রথম ভালবাসার পাত্র—তার কুমারী হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি, প্রেম এই দেবতাটি আকর্ষণ করে নিয়েছেন। উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাসের সমস্ত জটিল সূতোটি গোপীনাথের হাতে ধরা, আর এঁর মন্দির থেকেই উপন্যাসের আসল জটিলতার সূত্রপাত, ঘাত-প্রতিঘাত সব ছড়িয়ে পড়েছে। দেব চরিত্রের এই প্রাধান্য হিন্দুজীবনে মোটেই অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু লেখিকা এমন ভাবে বেদমন্ত্র ও গোপীনাথ জীউকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে একসঙ্গে বিন্যাস্ত করেছেন এবং এই বিন্যাস এত সুন্দরভাবে বিন্যস্ত যে এখানেই তাঁর গৌরব ও শিল্প সুষমার সৃষ্টিকারী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে।

'মহানিশা' (১৯১৯) উপন্যাসটি দুইটি পরিবারের ইতিহাস নিয়ে লেখা। একদিকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত লক্ষপতি ব্যবসায়ী মুরলীধর ও অন্যদিকে এক দরিদ্র পীড়িত ভাগ্যহত ব্রাহ্মণ বিধবার সুখ-দুঃখের কাহিনী একসঙ্গে গাঁথা হয়েছে। নির্মল এই অবস্থার মধ্যে দৈবের ইচ্ছায় জড়িত, অথচ দুটি পরিবারের সংযোগ সেতু হিসাবে কাজ করেছে। উপন্যাসের মধ্যে দুটি সম্পর্কের জটিলতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধীরার সঙ্গে নির্মলের, অপর্ণার সঙ্গে বিহারীর সম্পর্ক। ধীরার সঙ্গে নির্মলের সম্পর্কে খুব সূক্ষ্ম অনুভূতিময় স্তর বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ধীরার অন্ধত্ব, মাতৃহীনতা, সব সময় পিতার সাহায্যে জীবনযাপন করায় তার চারদিকে এমন একটা আড়াল সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে দিয়ে ধীরা সংসার জীবনের কোন অভিজ্ঞতা, প্রেম, প্রণয়ের জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেনি। সুতরাং বিয়ের পর নির্মলের সঙ্গে তার কিরকম সম্পর্ক হওয়া উচিত তা সে জানতো না, তার স্বভাবের ভীরুতা, নির্মলের থেকে তাকে দূরে রেখেছিল; কিন্তু তার দাসীর কাছ থেকে স্বামী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে, দাম্পত্য প্রণয়ের দুই একটি গল্প শুনে নারীসুলভ সহজ সংস্কার অতি অল্পদিনেই প্রেমের স্বরূপকে চিনিয়ে দিয়েছে। তাতেই ধীরা বুঝতে পেরেছে, নির্মলের নিখুঁত সেবাযত্ন, পরিচর্যা ঠিক প্রেম নয়. তার তীক্ষ্ম অনুভূতি নির্মলের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পাঠিয়ে বুঝতে পেরেছে তার স্বামীর ঔদাসীন্যের রহস্য। নির্মল ও ধীরার মধ্যে স্নেহ ছিল, অপর্ণার প্রতি যে প্রেম ছিল তা ধীরা অনুভব করতে পেরেছে, সে নির্মলকে অন্যাসক্ত বুঝতে পেরে স্বামীর প্রেমের উদ্যত আলিঙ্গন থেকে সরে গেছে কিন্তু তার হঠাৎ প্রেমের উৎস গোপনে হৃদয়ের মধ্যে মাথা কুটে মরেছে। নির্মল যে অসুখী, এই বোধ তাকে তার অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে তাকে অসাড় করে তুলেছে। প্রেম তার অন্ধত্বের কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করে, আলোর যে একটি রন্ধ্র পথ সৃষ্টি করেছিল, তা আবার বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধত্বের সেই অর্ধতরল আবরণ, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অশান্ত হৃদয় স্পন্দনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি—তাকে মৃত্যুর অতলে সলিল সমাধি ঘটিয়ে ধীরা শান্তি লাভ করেছে।

বিহারী অপর্ণার সম্বন্ধের মধ্যে একটা হাস্যকর অসংগতি প্রায় ট্র্যাজেডির

অস্বাভাবিক তীব্রতার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। যতদিন বিহারী অপর্ণা ও তার মায়ের অভিভাবক মাত্র ছিল, ততদিন তাদের সম্পর্ক সহজ সরল রেখা ধরেই চলছিল। কিন্তু যেদিন মৃত্যুশয্যায় সৌদামিনী কন্যা অপর্ণাকে বিহারীর হাতে তুলে দিয়ে গেল, সেদিন থেকে ওদের মধ্যে অস্বস্তিকর জটিলতার সৃষ্টি হল। বিহারীও পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, অপর্ণার মেজাজ রুক্ষ, তীব্র কথাবার্তা, সে অবিশ্রান্ত খোঁচা দেয় বিহারীকে। তাদের সেই আগেকার সহাস্য সহৃদয় হাসিঠাট্টার মধ্যে ভয়ংকর নীরবতা পাথরের মত বুকে চেপে ধরল। ভাগ্যক্রমে নির্মল এসে পড়ে এবং এই অস্বাভাবিক অবস্থার শেষ হয়। নির্মলের সঙ্গে বিয়েতে অপর্ণার কৈশোর স্বপ্ন সফল হলো বটে, কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে তার ঠিক আগের জীবনের তিক্ত, বিস্বাদ অভিজ্ঞতার পরে কতটুকু যৌবন-সরসতা, কতটুকু সহজ হৃদয় মাধুর্য বাকী ছিল? কিশোরীর সুখ, সলজ্জ প্রেম, নিদারুণ অভিজ্ঞতার পেষণে, অনাবৃত আলোচনার রূঢ় আন্দোলনে, সে তার কোমল মধুর সৌরভটুকু হারিয়ে ফেলেছে। আসলে অপর্ণা মোটেই রোমান্সের নায়িকার মত নয়। তার তীক্ষ্ন, ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্ব, তার তীব্র আত্মসম্মানবোধ অপর্ণার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কারণ। রাধিকাপ্রসন্নের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও গালাগালির যে সমানভাবে উত্তর দিয়েছে, অপমানকে কোথাও সে দীনভাবে স্বীকার করেনি। অপর্ণা চরিত্রে সৌন্দর্য্যের চেয়ে তার ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্বই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রাধিকাপ্রসন্নের বাহ্য কর্কশতা ও অন্তরের যত্ন প্রতিরুদ্ধ স্নেহশীলতার ছবিটি সুন্দর ফুটে উঠেছে। বিহারীর ভর্ৎসনা-অপমানে অবিচলিত, কর্তব্যপরায়ণতার কথা আমরা জানি—অপর্ণাকে বিয়ে করবার কথায় যে সে দারুণ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল সেটা তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে। ইরাবতীর বুকে নৌকাযাত্রার বর্ণনায় লেখিকার বর্ণনাশক্তি ও ধীরার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের স্তর বিন্যাস তাঁর বিশ্লেষণ চাতুর্যের পরিচয় দেয়। উপন্যাস সাহিত্যে 'মহানিশা'র স্থান অনেক উঁচুতে একথা ঠিক।

'পথহারা' উপন্যাসটি লেখিকার অন্যান্য উপন্যাসগুলির চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে বিপ্লববাদ অতি সুপরিচিত। তবে রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর উপন্যাস রচনা খুব ভাল হয় না, চরিত্রগুলি সমগ্র আন্দোলনের তলায় চাপা পড়ে যায়, ফুটে উঠতে পারে না। চরিত্রগুলি নিতান্ত গৌণ বা অপ্রধান হয়ে পড়ে—তাদের ভাব ও ভাষা রাজনৈতিক চিন্তাধারারই প্রতিধ্বনি মাত্র হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসে বিপ্লববাদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আন্দোলনের তলায় পিষ্ট হয়েছে। কিন্তু অনুরূপা দেবী 'পথহারা' উপন্যাসে এই বিপদ সম্পূর্ণ রূপে কাটিয়ে উঠেছেন; তাঁর চরিত্র গুলির স্বাধীন স্ফুরণ তিনি কোন বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা ব্যাহত হতে দেন নি। এখানে তিনি বিপ্লববাদের ছবি দেন নি, কেবলমাত্র কয়েকটি তরুণ জীবন খেলাচ্ছলে কেমন করে সাংঘাতিকভাবে জড়িয়ে পড়েছে, তাই বলা হয়েছে। বিমলেন্দু, অসমঞ্জ,

উৎপলা—এরা দেশের কাজে নেমে কি ভাবে ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছে, সেই দিকে পাঠকের দৃষ্টি থাকে—বিপ্লববাদের পরিবেশ সম্বন্ধে কোন কৌতূহল থাকে না। এরা যখন বিপ্লবাবাদের কথা বলেছে, রক্তলিপিতে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে, আজীবন শপথ পালন ও শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে বড় বড় কথা বলেছে, তখন বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে হেসেছেন। তারা কি ভেবেছিল, যে ছুরি তারা অন্যকে হত্যা করবার জন্য শান দিচ্ছিল, তাতে তাদের প্রিয় সহকর্মীই মরবে? যে জাল পরের জন্য বিস্তার করেছিল, সে জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়বে; এ কথা নিশ্চয়ই তারা ভাবেনি। যখন সেই ঘটনা ঘটল, উৎপলা তার নিজের প্রিয়তম ভায়ের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর করে বসল, যখন বিমলেন্দু তার অন্তরতম বন্ধুর বিরুদ্ধে সেই নিষ্ঠুর আদেশ কাজে পরিণত করার ভার পেল, যখন তারা স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিগুলির কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করেছিল, তখনই একটা প্রচণ্ড ভুলভাঙ্গার ঢেউ এসে তাদের কৃত্রিম ব্যবস্থাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এই প্রচণ্ড প্লাবনের আঘাতে উৎপলা তার পৌরুষের ছদ্মবেশের ভেতর দিয়ে তার চিরসুপ্ত, অন্তর্রুদ্ধ নারীহৃদয়ের পরিচয় পেয়ে, তার স্বভাববিরুদ্ধ বিপ্লবের পাষাণ স্তূপ ভেদ করে ভ্রাতৃস্নেহ ও প্রণয় আকাঙ্ক্ষার স্রোত দুটি ধারায় উৎসারিত হয়ে তাকে নারীর স্বাভাবিক চেতনায় ফিরিয়ে এনেছে। উৎপলার এই হঠাৎ পরিবর্তন ও তার মর্মভেদী যন্ত্রণার ছবি মনস্তত্ব বিশ্লেষণ ও তীব্র ভাবাবেগ বর্ণনার দিক দিয়ে ঔপন্যাসিক শিল্পকলার খুব উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়েছেন। বিমলেন্দুর আবিষ্কার আরও বেশি চমকপ্রদ ও তার পক্ষে খুব সাংঘাতিক হয়েছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খুন করতে গিয়ে যখন সে দেখল বন্ধু তারই একমাত্র বোনের স্বামী হয়েছে, তখন উদ্যত রক্তলোলুপ অস্ত্র আর ফিরল না, সেই অস্ত্রেই বিমলেন্দু আপন প্রাণ বলি দিয়ে নিজের জীবনব্যাপী ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। বিমলেন্দুর পূর্ব জীবন যেভাবে এগিয়েছে তার পক্ষে বিপ্লববাদের চক্রে যাওয়াটা স্বাভাবিক হয়েছে। অবশ্য তার বিপ্লববাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা আকস্মিক ঘটনার ফল, কিন্তু তার প্রকৃতি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল, যাতে সে এই দুঃসাহসিকতার আহ্বানকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। বিমলেন্দু জীবনের পথ থেকে সরে যাবার জন্যই বিপ্লবের ভরাডুবিতে নেমে পড়েছে। তার আত্মঘাতী মত্ততার যেটুকু বাকী ছিল তা উৎপলার আকর্ষণে, সম্মোহন শক্তির মত তাকে বিপ্লবের চোরাবালিতে আকণ্ঠ ডুবিয়েছে। এইভাবে তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়তির অদৃশ্যশক্তি চালিত হয়েই যেন তার সর্বনাশ সাধনের কাজে সহযোগিতা করেছে। উপন্যাসটির সমস্ত চরিত্র অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে, অসমঞ্জের নীতি পরিবর্তনের কারণ রূপে দেওয়া হয়েছে রামদয়ালের প্রভাব। কিন্তু তার বিপ্লববাদ ছেড়ে দেওয়ার কারণ রামদয়ালের তর্ককুশলতা, না তারার অপূর্ব সৌন্দর্য প্রেরণা? এটা অসমঞ্জের চরিত্রের দুর্বলতা ও দলপতি হিসাবে দারুণ কলঙ্ক! এতজন নরনারীকে মরণের পথে টেনে এনে, প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা না করে, গোপনে সরে পড়া—এটা বিমলেন্দুর কাছে কাপুরুষোচিত বলে মনে হয়েছে; তাই বিমলেন্দুর মনে তিক্ততা ও ঘৃণার সৃষ্টি

হয়েছিল। নিছক আত্মরক্ষা ও সুখলালসা ভাবলে অসমঞ্জকে ছোট করা হয়। রামদয়াল ও ইন্দ্রাণী চরিত্র আদর্শবাদ মূলক হলেও কোনরকম অবাস্তবতাগ্রস্ত হয়নি। ইন্দ্রাণীর প্রশান্ত কর্তব্যনিষ্ঠা, যার জন্য সে নিজের দাম্পত্য জীবনকে পূর্ণ বিকশিত হবার অবসর দেয়নি, সেটাই তার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। অমৃতের চরিত্রটি তার কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে ; তার চরিত্রে একটা অদম্য দৃঢ় সংকল্প বা একগুঁয়েমি ছিল, যা তাকে বিমলেন্দুর অভিভাবকত্বের যোগ্যতা দিয়েছিল। মঙ্গলা চরিত্রসৃষ্টি নারীর হাতের রচনার সাক্ষ্য দেয়। এই চরিত্র কিছুটা হাস্যরসেরও উদ্রেক করে। কিন্তু মঙ্গলার চরিত্রে কয়েকটা বিশেষত্ব আছে—সে ঠিক সাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়। প্রথমতঃ উপন্যাসের মধ্যে সে অন্যতম প্রধান চরিত্র, বিমলেন্দুর ভবিষ্যৎ পরিণামের জন্য দৈবের পরে সেই সবচেয়ে বেশি দায়ী। দ্বিতীয়তঃ বিমলের প্রতি তার স্বার্থবুদ্ধিজড়িত ভালবাসা ছিল। সে বিমলেন্দুর উপর সৎমা ইন্দ্রাণীকে তো নয়ই, বাবাকে পর্যন্ত কর্তৃত্ব করতে দেয়নি। মঙ্গলার যত দোষ থাকুক, অন্তিম দৃশ্যে কিন্তু তার প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

জ্যোতিঃহারা (১৯১৫) উপন্যাসটির পরিণাম লেখিকার এক শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়ের অনুরোধে বিয়োগান্ত থেকে মিলনান্তে পরিণত হয়েছে। উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে কোন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নেই, লেখিকার ইচ্ছামত তাদের পরিবর্তন করা যেতে পারে। এটাকে উৎকর্ষ বলা যায় না, অপকর্ষ বলা যায়, এর মধ্যে বিশুদ্ধ ঔপন্যাসিক গুণের অভাব আছে। যামিনী ও অনিমার মিলনে যে কোন এক স্বাভাবিক অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে, তা লেখিকা প্রমাণ করতে পারেন নি। অনিমা যামিনীকে প্রত্যাখ্যান করার পর হঠাৎ সে তার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, সমস্ত রুচি ও স্বাদ হারিয়ে ফেলেছে। তার গ্রন্থপাঠ, নাস্তিক্যবাদের আলোচনা, তার পরহিত ব্রত, কিছুই যেন তার অবলম্বনহীন জীবনকে খাড়া করে রাখতে পারে না। অনিমা যখন তার পরিচিত জীবন যাত্রার গণ্ডি থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে, গ্রন্থিচ্ছেদন করে এই জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ভক্তিপ্রবণ দাদামশায়ের প্রয়োজন হয়েছে। তিনি নিজে স্বাভাবিক সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির বলে সহজেই অনিমার হৃদয়ের সমস্যা বুঝেছেন ও তার সমাধান করে দিয়েছেন। দাদামশাই যখন ভ্রান্তি দূর করে দিলেন তখন অনিমার মনে আর কোন ভুল বা গ্লানি রইল না—নিষ্ফল আত্মপীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে সে তার ধৈর্যশীল, চিরসহিষ্ণু, বিড়ম্বিত জীবনকে সার্থক করে তুলেছে। যামিনী ও অনিমার মিলন একটা বহিঃশক্তির মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়েছে, সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপারে হৃদয়বৃত্তির যথেষ্ট স্ফুরণ হয়েছে বলে মনে হয় না। অনিমা-যামিনীর জীবনে এক ধরণের রিক্ত ধূসরতার সঞ্চার হয়েছে। আদর্শ বিষয়ক তর্ক ও সৎকর্মের পরিকল্পনা তাদের জীবনের উচ্ছ্বাস চপলতার ওপর যেন পাষাণ ভারের মত চেপে বসেছে। বরং দুটি অপ্রধান চরিত্রের হৃদয়ে—বরেন্দ্রকৃষ্ণ ও জ্যোৎস্নার অন্তরে প্রেমের শিখা জ্বলে উঠে তাদের প্রেমিকের প্রাপ্য অসামান্যতা এনে দেয়। তবে বরেন্দ্রকৃষ্ণের

চিত্তশুদ্ধি ও জ্যোৎস্নার আত্মবিসর্জন—এ দুটোই মেলোড্রামাটিক, আসল কথা, উপন্যাসটি যথোচিত উপন্যাসগুণে সমৃদ্ধ নয়। এর মধ্যে এমন কোন দৃশ্য নেই যা উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয়।

'চক্র' উপন্যাসটি প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কাহিনীর সংমিশ্রণ। সিভিলিয়ান তরুণ লাহা তার প্রণয়িনী কৃষ্ণা মল্লিকের মন জয় করবার জন্য বিনয় শীলকে রাজনৈতিক অপবাধে ধরিয়ে দিয়ে নিজের প্রণয় পথ সুগম করতে চেয়েছে, শেষ পর্যন্ত তার চক্রান্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তরুণের প্রণয় সাধনায় একনিষ্ঠতা, প্রেমিক হৃদয়ের চরম ক্ষমাশীলতা ও প্রেমের আত্মলোপী আতিশয্যই বিনয়ের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটিকে অনেক ক্ষমাসুন্দর করে তুলেছে। ডঃ মল্লিকের একটা করুণ দিক আছে, আগে তিনি ধনী ছিলেন এখন গরীব হয়ে গেছেন, তবু ঐশ্বর্যের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে আছেন এবং সেই জীবনযাত্রার প্রণালীর দোহাই দিয়ে কন্যার পরিবর্তিত জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে লড়েছেন। উপন্যাসের মধ্যে বিনয়-উর্মিলার শৈশব চাপল্য দুরন্তপণার আড়ালে প্রণয় লীলার ছবিটি মধুর ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বিনয় ও কৃষ্ণার একসঙ্গে কাজ কবার মাধ্যমে প্রণয়ের আকর্ষণ ও পরিণতি বেশ সুন্দর ও সুসংগত হয়েছে। এই সময় বিনয়ের স্ত্রী উর্মিলার কথা মনে পড়া উচিত ছিল বা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখালে ভাল হত। মোট কথা, বিনয় ও কৃষ্ণা রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে ঘুরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। সমগ্র উপন্যাসে অনেক ত্রুটি আছে, সেইজন্য 'চক্র'কে খুব উচ্চমানের উপন্যাস বলা যায় না।

'হারানো খাতা'কে অনেকটা 'চক্র' উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায়। এখানে সমস্ত কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হয়েছে নিরঞ্জনের আত্মগোপনের রহস্য ভেদে। নিরঞ্জনের ডায়েরী থেকে তার মস্তিষ্ক-বিকার ও বিপর্যস্ত স্মৃতিশক্তির বিশ্লেষণের কতকটা চেষ্টা থাকলেও এর প্রধান দরকাব আগেকার জীবনের ইতিহাস সংকলনে, এর প্রধান কাজ মনস্তত্ত্বমূলক নয়, ঘটনা স্মৃতিমূলক। নরেশের সঙ্গে পরিমলের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে যে ঘাত-প্রতিঘাত তা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে গভীর না হলেও নিখুঁত। এই দাম্পত্যবিরোধের বর্ণনা ও রাজবাড়ীর পরিজনের কুৎসা ও পরনিন্দা, পরচর্চা বেশ বাস্তবতার দিক দিয়ে উপভোগ্য হয়েছে। সুষমা চরিত্রের বিশ্লেষণে কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাস্তবতার পরিচয় নেই।

'বাগদত্তা'—এই উপন্যাসের কাহিনী অতি জটিল, তার ফলে উপন্যাসটি কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। কমলা ও গৌরীকে নিয়ে দৈবের যে নিত্য পরিবর্তনশীল খেলা চলেছে তাতে বাস্তবতার স্থান দেওয়া কঠিন। এই অপ্রত্যাশিতের বারবার আবির্ভাবে উপন্যাসটির স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। দৈব যেন মানুষকে নিয়ে ইচ্ছামত ছিনিমিনি খেলেছে এবং নিয়তি ক্রূর আনন্দ লাভ করেছে। নিয়তির হাতের পুতুল হওয়ার জন্য কোন চরিত্রের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়নি। উমাকান্ত ভট্টাচার্য, মনীশ একেবারে আদর্শ-লোকের অধিবাসী, মর্ত্যজীবনের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। উপন্যাসের মধ্যে

সবচেয়ে জীবন্ত ও প্রাণাবেগ সম্পন্ন চরিত্র শচীকান্তের। সে প্রেমের জন্য বন্ধুত্ব, সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মান-সম্মান. পারিবারিক শান্তি শেষে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। নৈহাটি ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সেই বিনিদ্র রজনীতে তার মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব সংগ্রামের চিত্রটি জ্বলন্ত ভাষায় লেখা আছে। শেষ পর্যন্ত কমলা যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখনও সে দৃঢ়তার সঙ্গে সেই দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করেছে তাতে তার চরিত্র গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে কতকগুলি অনুভূতিময় দৃশ্য পাওয়া যায়। শচীকান্ত ও কমলার মধ্যে বিয়ের পরের সম্পর্কের ছবিটি খুব চমৎকার হয়েছে। আগুন লাগার দৃশ্য, শচীকান্তের উন্মত্ত আবেগ ও কমলার অর্ধচেতন বিমূঢ় ভাবের বর্ণনার মধ্যে উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

'উত্তরায়ণ' উপন্যাসটি সলিল ও আরতির প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকতার কাহিনী। এই বাধা এসেছে দুইটি দিক থেকে প্রথমটি সলিলের মা মহামায়ার অটল, অনমনীয়, প্রতিজ্ঞাপালন ; দ্বিতীয়টি আরতিব তীব্র আত্মসম্মানবোধ। সলিলের আকুল প্রেম-নিবেদন সত্ত্বেও আরতি সরে গেল। লেখিকা দেখিয়েছেন এই সরে যাওয়াটা কোন আদর্শমূলক ঘটনা নয়। আরতির সন্দেহ-প্রবণতা তার চরিত্রকে অনেকটা বাস্তব গুণে সম্পন্ন করেছে। সলিলের স্ত্রী স্বর্ণলতার রোগশয্যায় অসহিষ্ণুতা ও অভিমান প্রবণতা. তার রুক্ষ মেজাজ ও অসংগত আবদার, এ সমস্তই সজীবতার উপাদান। এই চরিত্রটি ছাড়া উপন্যাসের আর কোন চরিত্র খুব উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।

'পথের সাথী' উপন্যাসটির গঠন ও ঘটনা বিন্যাস নির্দোষ বলে মনে হয় না। রুবি ও মলয়ার পরস্পরের সখিত্ব ও চরিত্র পার্থক্য বর্ণনা নিয়ে এর আরম্ভ। স্বভাবতই মনে হয়, এটাই তার কেন্দ্রস্থ বিষয়। কিন্তু উপন্যাসটির অগ্রগতির সঙ্গে দেখা যায় বসন্তবাবুর পারিবারিক জটিলতার মধ্যে কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। চরিত্র সৃষ্টি ও জীবন সমস্যার আলোচনার মধ্যে উপন্যাসটিতে গভীরতার একান্ত অভাব। লেখিকার শেষ দিকের উপন্যাসগুলিতে তার শক্তি হ্রাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসটি 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা', 'পথহারা' উপন্যাসের তুলনায় নীচুমানের। এর মধ্যে ভুবনবাবুর পরিবার সম্পর্কীয় ব্যক্তিগত—সুশীল, ভুবনবাবু, সুলেখা, বিনতা প্রভৃতি চরিত্র অনেকটা মামুলি ধরণের ; তাদের ব্যক্তিত্ব খুব উজ্জ্বল নয়। ভুবনবাবুর পিতৃত্ব গৌরব খুব উঁচু সুরে বাঁধা। তিনি সন্তানদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। উপন্যাসের প্রথমার্ধ উৎকর্ষের দাবী করতে পারে না, দ্বিতীয়ার্ধে লেখিকা তার ক্ষতি পূরণ করেছেন। নীলিমার সমস্ত দুঃখ দুর্দশার যে ছবিটি তিনি দিয়েছেন, তার মর্মস্পর্শিতা অতুলনীয়। সে তার বাবার কাছ থেকে সব থেকে বেশি দুঃখ পেয়েছে। নীলিমা ঘৃণায় ও ধিক্কারে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এই আখ্যায়িকার অংশে অতিরঞ্জন দোষ দেখা যায়। কতকটা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখিকা অবশ্য আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, এ বিবরণ সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। শেষে যে দৃশ্যে সে সুশীলের সঙ্গে অসম্পূর্ণ বিয়ে সম্পূর্ণ করে

তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়েছে, তা ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে এত উঁচু যে, তা পাঠকের হৃদয়ে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। নীলিমার চরিত্রের পরিকল্পনায় লেখিকা উচ্চাঙ্গের সৃজনীশক্তির পরিচয় দেন। উপন্যাসের মধ্যে যে কয়টি নরনারী আপন ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল, নীলিমা তাদের মধ্যে অন্যতমা, তাকে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলা যায় না। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়ে সুশীলের চরিত্র খুব সুন্দর হয়েছে। জীবন সমালোচনার গভীরতা ও ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের তীব্রতার জন্য 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাস জগতে উঁচু স্থানের দাবী করতে পারে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও অনুরূপা দেবীর অবদান ছিল। ভারতের ইতিহাসকে কল্পনার সাহায্যে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনার রন্ধ্রগুলি পূরণ করে লেখার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা খুব কঠিন কাজ। লেখিকা সে চেষ্টা করেছেন।

'রামগড়'—এই উপন্যাসটি বৌদ্ধযুগে প্রবল সার্বভৌম সম্রাট কোশলপতির সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রমূলক রাজ্যের নায়ক লিচ্ছবি ও শাক্যরাজবংশীয়দের বিরোধের ইতিহাস। এই বিরোধ সর্বক্ষেত্রেই অপাত্রে প্রদত্ত ও ব্যর্থকাম প্রণয়জ্বালা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক বিপ্লবের জ্বালার মধ্যে নিজের জ্বালাময় হৃদয়ের আগুন ছড়িয়েছে। ইন্দ্রজিৎ, পুষ্পমিত্র, বসন্তশ্রী, শুক্লা, অমিতা, সুদক্ষিণা সকলেই ব্যর্থ প্রণয় জ্বালায় জ্বলছে। এই উপন্যাসে প্রণয়ের রাজনৈতিক মর্যাদা অযথা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। ট্র্যাজেডির সমস্ত উপাদান এই জ্বলন্ত আগুনে ঠিক সাজিয়ে তোলা হয়েছে। চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা বিন্যাসের দিক দিয়ে উপন্যাসটির মধ্যে অনেক ত্রুটি, অপূর্ণতা দেখা যায়। শুক্লার চরিত্র মোটেই ফোটেনি। পুষ্পমিত্রের হঠাৎ পরিবর্তনের কোন সূত্র লেখিকা দেখান নি। সমস্ত চরিত্রই রোমান্স রাজ্যের অধিবাসী, কতকগুলি চিরপ্রথাগত একই পথ ধরে চলেছে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠেনি, লেখিকা বিশ্লেষণও করেননি কোন চরিত্রের। তবু বসন্তশ্রীর ঈর্ষাভরা বুকের জ্বালা ও অমিতার কোমল, আত্মসমর্থনে অপটু সলজ্জতার মধ্যে কতকটা বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুদক্ষিণা তিতিক্ষা ও আত্মনিগ্রহ ও অমানুষিক অবস্থা বিশ্লেষণের মানদণ্ড দিয়ে যার বিচার চলে না। উপন্যাসের প্রকৃতি বর্ণনাগুলি অত্যন্ত উচ্ছ্বাসময় ও কাব্যগন্ধী; বাস্তব পরিবেশ হিসেবে তার কোন মূল্য নেই; উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র বাস্তব ছবি কোশলরাজের রাজসভার বর্ণনা—সেখানে সভাসদগণের মধ্যে স্তাবকতার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতার ছবিটি বাস্তব রসে সমৃদ্ধ হয়েছে। যথেচ্ছাচারী ক্ষমতাদৃপ্ত রাজার সংসর্গ যে কি রকম ভয়াবহ, তার অনুগ্রহ-নিগ্রহ যে কত পরিবর্তনশীল, সভাসদদের প্রাণ ও মান কত সূক্ষ্ম সুতোর ওপর ঝুলে থাকে, এখানে তার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, বৌদ্ধ জগতের কেন্দ্রস্থল ও মধ্যমণি গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন। তবে উপন্যাসের মধ্যে তাঁর প্রভাব দেখা যায় না। তাঁর সংসার বৈরাগ্য তাঁকে রাজনৈতিক পরিবেশে উদাসীন দর্শক করে তুলেছে। রাজসভাসদ ও

সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্মালম্বী ছিলেন বলে রাজা তাঁদের মাঝে মাঝে বিদ্রূপ কটাক্ষ করেছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজশক্তির ও প্রজাসাধারণের এই মনোভাব ইতিহাস সম্মত কিনা তা ইতিহাসের বিচারের বিষয়।

'ত্রিবেণী' (১৯২৮)—এই উপন্যাসে বাঙলা ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল বিশিষ্ট অধ্যায় লেখিকা তুলে ধরেছেন। পালবংশীয় রাজা মহীপাল দেবের অত্যাচারের ও কুশাসনের বিরুদ্ধে বাঙলার প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান ও তাদের প্রতিনিধি দিব্যোক ও ভীম কৈবর্তরাজের সিংহাসনে বসা—বাঙলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। ইতিহাসের পেছনে প্রজাসাধারণের যে মনোভাব প্রচ্ছন্ন থেকে রাজনৈতিক পরিবেশের আসল প্রেরণা জোগায়, এখানে একবার মাত্র বেরিয়ে এসে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং জনসাধারণের এই বৈপ্লবিক মনোভাব ফুটিয়ে তোলাই ছিল এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য। তবে লেখিকা এই দুরূহ কাজে সফল হন নি। এর মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের দিকটি গভীর ভাবে দেখানো হয়েছে, তাতে বিপ্লবের চিত্রটি ভালভাবে ফুটে ওঠেনি। উপন্যাসে ভীমের পারিবারিক জীবনের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। প্রজা-শক্তির সংঘবদ্ধতা ও তাদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবল ইচ্ছার প্রকাশের বিশ্বাসযোগ্য বিবৃতি দেওয়া হয়নি। যে দিব্যোক ও ভীম রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করে প্রবল রাজশক্তির উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন এবং নতুন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের সাংসারিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে প্রচণ্ড বিচ্ছেদ ধরা পড়ে লেখিকা তা পূরণ করবার চেষ্টা করেননি। জনসাধারণের বৈপ্লবিক মনোভাব গঠনের কোন পরিবেশ লেখিকা রচনা করেন নি। তিনি যুগের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। লেখিকা বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের পাশাপাশি অবস্থান, সমাজ জীবনে বিলাসিতা, নারীর আধিক্য, রাজপ্রাসাদে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া, রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিবাহ, রাজশক্তির যথেচ্ছাচার, নটীর মুখে প্রাকৃত ভাষায় গান, এই সমস্ত অতীত যুগের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই বর্ণনার মধ্যে চিত্র সৌন্দর্য আছে, জীবন স্পন্দন নেই। সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে প্রাণ-শক্তির মূল যে গভীর স্তরে থাকে, লেখিকা ততদূর পৌঁছোতে পারেন নি। একের পতন অন্যের উত্থান দুটোই যেন ভোজবাজির মত আকস্মিক বলে মনে হয়। যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে লেখিকার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। চরিত্র পরিকল্পনা মোটের ওপর সুষ্ঠু হয়েছে। রামপালের অন্তর্দ্বন্দ্ব তার গোষ্ঠী পরিচয়কে অতিক্রম করে তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। দিব্যোক ও ভীমের চরিত্র বিকাশ ও পরিণতি অস্পষ্ট রয়ে গেছে। অন্তরের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোন চেষ্টা হয়নি। প্রকৃতি বর্ণনা ও ভাব গম্ভীর অন্তর্বিক্ষোভের আলোচনা বাগাড়ম্বর পূর্ণ ও পরিমিতিহীন, মন্তব্য ও বিশ্লেষণের গুরুভারে ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত হয়েছে।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী। তাঁদের উপন্যাসগুলিতে বহু নারীচিত্র উজ্জ্বল রঙে আঁকা হয়েছে। দুই লেখিকার ভাষার উপর দখল ছিল খুব বেশী। পল্লীগ্রামের বর্ণনা, প্রকৃতির বর্ণনায়

তারা রঙের পর রঙ ছড়িয়ে যেতে পারতেন। তবে অনুরূপা দেবীর লেখায় আদর্শ-বাদী চিন্তার প্রাবল্য, সে ক্ষেত্রে নিরুপমা দেবী অনেক বেশী বাস্তববাদী। দুই লেখিকা নিজেদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, প্রতিভার সঙ্গে সহৃদয়তার মিশ্রণে বহু বিচিত্র জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন, মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যথা-বেদনা, স্নেহ-প্রেম, দুর্বলতা ও কুৎসিত দিকগুলি লেখিকাদ্বয় দেখিয়ে আমাদের জীবন সম্বন্ধে সজাগ করে গেছেন। তাঁদের বাস্তব অনুভূতি চরিত্রগুলিকে যথেষ্ট জীবন্ত করে তুলেছে। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে নগরের এবং পল্লীসমাজের ভীরু স্বার্থান্ধ পৌরুষহীন পুরুষের পাপের বা লোভের অন্ধকারের দিকে আলোকপাত করে নারীদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ও চরম দিক দেখিয়েছেন।

উপন্যাস ক্ষেত্রে বিশেষতঃ মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর নাম আগেই করা হয়। তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস কালের বুকে অক্ষয় হয়ে থাকবে। নিরুপমা দেবীর কয়েকটি উপন্যাস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার উপযুক্ত। তঁদের রচনার মধ্যে নারীর হাতের স্পর্শ সর্বত্র নির্দেশ করা যায় না বরং বিশ্লেষণের গুরুত্ব পুরুষের পাণ্ডিত্য পূর্ণ আলোচনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু কতকগুলি উপন্যাসে নারীসুলভ কমনীয়তা আছে। 'মা' উপন্যাসে ব্রজরানীর নিদারুণ হিংসা ও অভিমান, 'গরীবের মেয়ে'তে নীলিমার বঞ্চিত হৃদয়ের প্রেম বুভুক্ষা, 'মন্ত্রশক্তি'তে বাণীর মনের রুদ্ধ প্রেমের উৎসরণ, 'পথহারা'তে উৎপলার হঠাৎ নারীত্বের বিকাশ, শ্যামলী'র মূক জীবনে তীক্ষ্ন ভালবাসার অনুভূত ও মানসিক জাগরণ, 'দিদি'তে সুরমার আভিজাত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে প্রেমের জাগরণে স্বামী অমরের পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করা, 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ সতীর নীরব প্রেমের আত্মাহুতি—এই সমস্ত দৃশ্যতে নারীর স্বজাতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শিতা ও সহজ সংস্কারলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবী উপন্যাসক্ষেত্রে যে বিশেষ দিকের পথ দেখিয়েছেন, সেই পথে অন্য মহিলা ঔপন্যাসিকরাও তাঁদের অনুসরণ করেছেন। এঁদের সকলেরই রচনার মৌলিকতা বা নতুনত্ব নেই। এঁরা সকলেই কম বেশি পুরাতন আদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না ও এই আদর্শের সংঘর্ষের যুগে পুরাতনেরই পোষকতা করেন। তবে এই সব লেখার মধ্যে নারীর অবদান সম্পূর্ণ নয়। পুরাণের জীবনযাত্রায় নারীর স্থান ও তাদের জীবন সমস্যা এঁদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে সত্য, কিন্তু এই সমস্যার আলোচনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ। এঁদের উপন্যাস-গুলির মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্য ও গভীরতার অভাব।

তবে অনুরূপাদেবী ও নিরুপমা দেবী তাঁদের রচনায় উপন্যাসের কাহিনী সহজ রসমধুর ভঙ্গীতে, নরনারীর মনের নানা দিকের প্রবণতাকে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁদের চারিত্রিক শুচিতা ও সংযম সাহিত্যের মধ্যেও

ফুটে উঠেছে। লেখিকাদ্বয় বঙ্গভারতীর চরণে যে ফুলচন্দন দিয়েছেন তার পবিত্র সুগন্ধ দীর্ঘকাল বাঙলা সাহিত্যের পাদপীঠকে সুরভিত করে রাখবে।

অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীর গল্প রচনার অসাধারণ শক্তি ছিল। অপূর্ব রচনা ভঙ্গীর সঙ্গে শিল্পকলার চমৎকারিত্ব ও গঠন কৌশলের অভিনবত্ব মিশে দুই লেখিকাকে সাহিত্যের জগতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করে তুলেছে। উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় ভাবের সম্ভাব্যতা. নাটকীয় গূঢ় ইঙ্গিত, ঘটনার সংস্থান. স্থানে স্থানে উপন্যাসের মধ্যে নায়ক নায়িকার মনের দ্বন্দ্ব সংঘাত পাঠককে চমকিত করে।

চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যই উপন্যাসকে সফল করে তোলে। লেখিকাদ্বয়ের এই কুশলতার অভাব ছিল না। অনেক উপন্যাসে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রেম আর প্রেমের দ্বন্দ্বই উপন্যাসের ভিত্তি।

উভয় লেখিকার উপন্যাসের আরও একটি বিশিষ্টতা—আদর্শবাদ। তাঁরা সব ক্ষেত্রেই বিশেষ একটি আদর্শকে সামনে নিয়ে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। সমাজে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ স্থাপনের জন্যই তাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন। তবে এই আদর্শবাদ বা নীতি প্রচার কিন্তু উপন্যাসের (কয়েকটি উপন্যাস বাদ দিয়ে) কোথাও রস হানি ঘটায় নি।

আজ বাঙ্লা সাহিত্যের যজ্ঞশালায় যতই নতুন নতুন চিন্তাধারায় উপন্যাস রচিত হোক না কেন, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর সনাতন সমাজ-চিন্তার প্রতিচ্ছবি বিস্তারিতভাবে ফুটে উঠে সার্থকতা লাভ করেছে। এই চিন্তাধারার পবিত্র ধারায় স্নান করে বাঙালী পাঠক চিরকাল ধন্য হবে।

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ একাধারে ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক

বাংলার ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮৫-১৯৩০) যে পরিচিতি, সে তুলনায় বাংলার উপন্যাস জগতে তাঁর নাম ডাক তেমন কিছুই নেই। তা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রাখালদাসের নাম নিঃসন্দেহে এসে যাবে। উপন্যাস রচনার সময়েও তিনি তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠ মনের উপরেই নির্ভর করেছিলেন সবচেয়ে বেশী। বিষয়বস্তুর মত উপন্যাসে আঙ্গিকের প্রতিও তাঁর নজর ছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করার আগে তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে কর্মরত থাকার সূত্রে ভারতীয় ইতিহাসের নানা অনালোকিত জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—মহেঞ্জোদাড়োর সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার। বাংলার পাল রাজাদের সম্বন্ধে অনেক প্রামাণ্য তথ্যও তাঁর কাছ থেকেই প্রথম জানা যায়। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর ঐসব চিন্তাভাবনা কাজ করেছে।

ইতিহাসকে আশ্রয় করে উনিশ শতকে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী এবং রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছিলেন। ঐতিহাসিক নাটক ও কাব্যও সে সময়ে কম লেখা হয়নি। রাখালদাসের পড়ুয়া চিত্তে সেগুলির ছাপ অবশ্যই পড়েছিল। তিনি ওয়াল্টার স্কটও পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে সূত্র রচনা করেছিলেন তাও রাখালদাসের জানা ছিল। তিনিই প্রথম বাঙালী লেখক যিনি একাধারে ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক। তার ফলে একদিকে ইতিহাস অন্যদিকে মানব জীবন—এই দুয়ের বিবাহবন্ধন সফলভাবে ঘটেছিল। তবে উপন্যাস-আঙ্গিকে তিনি যে উনিশ শতকের কোন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে স্পর্শ করতে পারেন নি, এর কারণ ইংরাজী এবং বাংলায় বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনাতেই তাঁকে অধিক সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছিল। তা না করে তিনি যদি কেবলই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত থাকতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্য একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁকে পেত।

'পাষাণের কথা' নামে রাখালদাস যে গ্রন্থটি লিখেছেন সেটিকে ঠিক উপন্যাস না বলে গল্প-কাহিনী বলাই ভাল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-কথা তারমধ্যে গল্পচ্ছলে বিবৃত করেছেন। উপন্যাসের আঙ্গিক মানা হলে এটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেত।

রাখালদাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'শশাঙ্ক'। প্রখ্যাত সংস্কৃত লেখক বানভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে এবং চীনা পরিব্রাজক ইউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে শশাঙ্ককে যে ভাবে এঁকেছেন তাতে কল্পনার অংশই ছিল বেশী।

যেহেতু ইতিহাসে শশাঙ্ক সম্পর্কে খুব বেশী কথা লিপিবদ্ধ নেই, তাই রাখালদাসের উপন্যাসেও কল্পনা ও অনুমান প্রধান হয়ে উঠেছে। ইতিহাস থেকে মোটামুটি জানা যায় গৌড়ের রাজা প্রথম শশাঙ্ক (ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ—সপ্তম শতাব্দীর প্রথম তিন দশক) মগধ এবং প্রয়াগ পর্যন্ত পশ্চিমের সমগ্র ভূভাগ জয় করে নেন। পূর্বদিকে তিনি অধিকার করেন মহেন্দ্রাগিরি নামক পর্বত পর্যন্ত অঞ্চলগুলি। মৌখরিদের বিরুদ্ধে শশাঙ্ক মালবের রাজার সঙ্গে মিতালি স্থাপন করেন। অন্যদিকে মৌখরিরা পুষ্যভূতিদের রাজার সমর্থন লাভ করেন কিন্তু যুদ্ধে বিজিত হন তাঁরা। পরে পুষ্যভূতি রাজের ছোটভাই হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসেন। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন মগধ ও বঙ্গদেশ জয় করে নেন।

এই 'Historical fact'-কে সামনে রেখে 'Historical Imagination'-এর সাহায্যে লেখা হল 'শশাঙ্ক' উপন্যাসটি। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে—এই তিন ভাগে বিভক্ত উপন্যাসটিতে শশাঙ্কের রাজ্যলাভ, যুদ্ধ জয় এবং মৃত্যু কাহিনীকে ঝরঝরে ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিরোধী মনোভাব ও তার পশ্চাদ্‌পট রাখালদাস বিভিন্ন ঘটনার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। বসুমিত্রের ভিক্ষু হবার কারণ বিবৃত করতে গিয়ে যূথিকাকে তরলা বলেছে—

'ভিক্ষু হইলে বৌদ্ধগণের বিষয়ে অধিকার থাকে না, তাহাদিগের সম্পত্তি বৌদ্ধ সংঘের হস্তে পতিত হয়। এই জন্যই চারুমিত্র একমাত্র পুত্রকে বৌদ্ধ সংঘের নিকট বলি দিতেছে'।

শশাঙ্কের এই বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠার কারণ হিসাবে তাঁর প্রতি বৌদ্ধদের বারংবার বিরোধিতার বিষয়ে রাখালদাস ইঙ্গিত করেছেন। এই অংশটি ইতিহাস-সম্মত। তবে শশাঙ্কের ছেলেবেলার জীবন-চিত্রণে তাঁকে স্বাভাবিক ভাবেই কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাঁর স্বদেশপ্রেম অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। যশোধবল-বীরেন্দ্রসিংহ-লতিকার কাহিনী-অংশ ইতিহাস-সম্মত।

'শশাঙ্ক' উপন্যাসের প্লট দুর্বল। উপন্যাসের অনেকটাই যুদ্ধ বর্ণনার জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছে। সেই কারণেই চরিত্রগুলি বলয়াকৃতি (round) হয়ে উঠতে পারে নি। শশাঙ্কের মানবিক বৃত্তিগুলিও অবিকশিত রয়ে গিয়েছে। চিত্রার মৃত্যু, লতিকার করুণ পরিণতির জন্য তাঁকে দায়ী করা হলেও তার কাম্য ব্যাখ্যা মেলে না। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ঐতিহাসিক রস' বলেছেন তা প্রবাহিত হতে পারত, যদি শশাঙ্কের পতনের জন্য কেবল তাঁর ভাগ্যকেই দায়ী করা না হত।

ইংরাজী সাহিত্যে যাকে 'Chronical Novel' বলে 'ধর্মপাল' উপন্যাসটি সেই জাতিভুক্ত। পূর্ববর্তী উপন্যাস 'শশাঙ্ক'-র সংযোজক হিসাবে 'ধর্মপাল' উপন্যাসটির গুরুত্ব রয়েছে। শশাঙ্ক-র সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যে অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। শশাঙ্ক-র পর হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল মোটামুটি তিরিশ বছর। একথা মেনে নিতেই হয় যে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীরা গুপ্ত সম্রাটদের কখনই ভাল চোখে

দেখে নি। পরবর্তীকালে তাই তারা গোপালকে রাজা করে। গোপালের পুত্র ধর্মপাল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোকর্ণ যুদ্ধে গোপাল সামন্তরাজাদের পরাজিত করে গোকর্ণ দুর্গ রক্ষা করেন। সুদীর্ঘকাল পূর্বে ধর্মপালের মাতা যে গোপালের পাশে দাঁড়িয়ে সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তা রাখালদাসের ঐতিহাসিক গবেষণারই আবিষ্কার। ধর্মপাল-জননী দেদ্দদেবী দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণীকে রক্ষা করেন এবং অরণ্যে নিয়ে আসেন। ভারতবর্ষ তখন যুদ্ধে যুদ্ধে বিপর্যস্ত। তখন গুর্জররাজ ও রাষ্ট্র কূটপতি ভারতবর্ষে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছেন। কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধ গুর্জররাজের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইন্দ্রায়ুধ ভ্রাতুষ্পুত্র চক্রায়ুধকে রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কাছে ধর্মপাল প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি চক্রায়ুধকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। ধর্মপাল যেমন বৌদ্ধ সাহায্য লাভ করলেন তেমনই বৌদ্ধদের রক্ষা করারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতোপূর্বেই ধর্মপাল ও কল্যাণীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চারিত হয়েছে। চক্রায়ুধ রাজ্য ফিরে পেলেন, কিন্তু যুদ্ধ থামল না। কল্যাণীর জীবন-মধ্যাহ্নেই মৃত্যুর অন্ধকার নেমে এল। ধর্মপালের জীবনে রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যা রন্নাদেবী পত্নী হিসাবে প্রবেশ করলেন।

'ধর্মপাল' উপন্যাসখানি শশাঙ্ক-র তুলনায় পরিণত। ইতিহাসের যুদ্ধের সঙ্গে মানবচিত্তের আলোড়ন এত সুন্দর ভাবে বিমিশ্রিত হয়েছে, যাতে এটিকে একটি সফল ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ যে স্বদেশ প্রেমের বীজ রোপিত হয়েছিল তাই-ই ফলে ফুলে একটি রমনীয় বৃক্ষে পরিণত হয়েছে 'ধর্মপাল' উপন্যাসে।

'ধর্মপাল' উপন্যাসটির গঠন আঁট সাট। ভাষাও ঝরঝরে।

'করুণা' উপন্যাসটিকে রাখালদাস নিজেই বলেছেন 'ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা'। এই উপন্যাসের নায়ক প্রথম স্কন্দগুপ্ত কুমারগুপ্তের বড় ছেলে। কুমারগুপ্ত ছিলেন শৈবধর্মাবলম্বী। তাঁর রাজত্বকালের শান্তি ভঙ্গ হয় তাঁর মৃত্যুর অল্প পরেই। পুত্র স্কন্দগুপ্তকে ওই সময়ে ভারত-আক্রমণকারী হূন ও এফ্‌থ্যালাইট উপজাতিদের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। তার পিতা কুমারগুপ্ত-র রক্তে বিলাস ব্যাসনের প্রাবল্য ছিল। রাখালদাস দেখিয়েছেন গণিকা ইন্দ্রলেখা নিজ কন্যা অনন্তা দেবীর সঙ্গে স্কন্দগুপ্তের বিবাহ দেবার চক্রান্ত করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের জায়গায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটান। এজন্য ইন্দ্রলেখা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হরিবলের সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত হল না। এদিকে স্কন্দগুপ্তের বাগ্‌দত্তা হয়ে রয়েছে তাঁর মাতা পট্টমহাদেবীর পালিতা কন্যা করুণা। বিয়ে হওয়ার আগেই পূর্বে পরাজিত হূনদের প্রতি আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য স্কন্দগুপ্তকে আবার যুদ্ধে যেতে হয়। পট্টমহাদেবীর আর এক পালিতা কন্যা ছিল করুণা। গণিকা ইন্দ্রলেখার ষড়যন্ত্রের শিকার হল অনেকেই। রাজমাতা পট্টমহাদেবীকে আত্মহত্যা করতে হল।

সন্ন্যাসীর সহায়তায় অরুণাকে পালাতে হল এবং করুণাকে বন্দী করল হূনরা। গৌড় দেশের সেনাপতি ভানুমিত্র তার পত্নী করুণার শোকে উন্মত্ত হয়ে গেল।

এই দুর্বার ট্রাজেডির স্রোতে একবিন্দু কমেডির দ্বীপ হয়ে জেগে রইল স্কন্দগুপ্ত-অরুণার মিলন। এরপর আর স্কন্দগুপ্তকে জয়ের জন্য পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাসকে পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করার রীতি প্রচলিত ছিল। করুণার কাহিনীকে রাখালদাস 'বোধিসত্তায় অগ্নি'. 'অঙ্গার', 'ভস্ম'—এই কয়েক ভাগে সাজিয়েছেন। করুণাকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র করার উদ্দেশ্য সফল হয়নি চরিত্রটির দুর্বলতার জন্য। তবে স্কন্দগুপ্ত চরিত্রে ট্রাজেডির দ্বন্দ্ব ভাল ভাবেই ফুটেছে।

করুণা উপন্যাসের ভাষায় তৎসমের প্রতি ঝোঁক থাকলেও তা বঙ্কিমী জটিলতা থেকে মুক্ত হয়েছে। বন্ধুবর্মা ও মুরারি গুপ্তের একটি কথোপকথন উদ্ধার করা যায়—

"স্কন্দ গিয়াছে, মহারাজপুত্র গিয়াছেন. বৈষ্ণব অভিজাত সম্প্রদায় গিয়াছে, আর্য-সংঘের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে সদ্ধর্ম উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক, দেশ, ধর্ম, পূর্বস্মৃতি বিসর্জন দিয়া মগধ সাম্রাজ্য অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পরিবর্তে আর্যসংঘ সদ্ধর্মের উন্নতির প্রার্থনা করিয়াছিল, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে।"

স্কন্দগুপ্তের নূতন এক পরিচয় রাখালদাস দিয়েছেন বামাকণ্ঠের ধ্বনিতে—

"কে সে মগধগণ, সে গুপ্তকুলপুত্র, আর্যাবর্তের পরিত্রাতা, রমনী ও শিশুর রক্ষাকর্তা, বক্ষু বাহলীক ও শতদ্রুর যুদ্ধজেতা। বন্ধুগণ, সে মগধ, সে পাটলি-পুত্রিক, সে আমাদিগের পরম আত্মীয়, তাহার নাম স্কন্দগুপ্ত।"

'করুণা' উপন্যাসে ঐতিহাসিক রাখালদাস যে প্রধান তথ্যটি আলোয় এনেছেন তা হল, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী বৌদ্ধ প্ররোচনা এবং ষড়যন্ত্র।

এই আলোচনায় 'ময়ূখ' উপন্যাসটিকে কিছুটা স্বতন্ত্র গোত্রের মনে করা যাবে। এই উপন্যাসটিতে ইতিহাসের হালকা হাওয়া থাকলেও, ঝড় উঠেছে নায়ক নায়িকার চিত্তে। ইতিহাসের দিক থেকে সাজাহানের রাজত্বকালে পর্তুগীজদের অত্যাচারে জর্জরিত বাংলা দেশের নিপুণ ছবি আছে। জমিদারের ছেলে 'ময়ূখ' পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের শক্তি অসীম। তার প্রেমিকা ললিতাকে হরণ করে নিলে সে লড়াই করে, আহত হয়। এই ব্যক্তিগত সমস্যার পাশাপাশি সে প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে এক বণিকের সহায়তায় পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। বাদশাহের পালিত কন্যা গুলরুখ ময়ূখের প্রতি আসক্ত হয়। সপ্তগ্রামের যুদ্ধে তারা দুজনেই বন্দী হল। এদিকে আহত হয়ে ময়ূখ স্মৃতিভ্রষ্ট। গুলরুখকে তার মনে হল ললিতা বলে। এরপর তারা বিনোদিনী বৈষ্ণবীর আশ্রয়ে সাময়িক ভাবে কাল কাটিয়ে সোজা দিল্লী পেঁছাল। বাদশাহের মনসবদার নিযুক্ত হল ময়ূখ। গুলরুখ যতই তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাক, গুলরুখের প্রেম প্রত্যাখান করতে ময়ূখ দ্বিধা করল না। তার স্মৃতিতে ললিতা ফিরে এসেছে। তার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হলেও শেষ মুহূর্তে মমতাজ তাকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। এই অংশে রোমান্সের তীব্র রস

প্রবাহিত হয়েছে ময়ূখ-ললিতার মিলনে। মমতাজের রোমাণ্টিক পরিচয়টিও সুন্দর ভাবে ধরা দিয়েছে।

'অসীম' উপন্যাসে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের রাজত্বকালের ঘটনা লেখক এনেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় এটিকে তিনি 'সত্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে চিহ্নিত করেছেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য পতনের পথে এগিয়ে যায়। এ সময় বাঙালী জীবনে নেমে আসে ঘোর বিপর্যয়। মোগল যুগে কানুনগোদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই উপন্যাসের নায়ক অসীম বাংলার কানুনগো হরনারায়ণের ভাই এবং ফারুকশিয়ারের পরিচিত। ফারুকশিয়ারের সঙ্গে তার এই যোগাযোগ গৃহ-অশান্তির কারণ হয় এবং বাধ্য হয়ে অসীম গৃহ ত্যাগ করে। ফারুকশিয়ারের সঙ্গী হয়ে সে দিল্লীর পথে পাটনায় আসে। পাটনায় মনিয়াবাঈ তার ব্যক্তিগত জীবনের ঊর্ধে উঠে অসীমের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। এই প্রশ্নে ঔপন্যাসিক অসীমের মনে এক বিস্ময়কর দোলাচলতা সৃষ্টি করেন। অসীম মনিয়াকে স্নেহ করত বটে কিন্তু প্রেমের কোন উন্মেষ তার মনে কখনও ঘটেনি। স্বাভাবিক ভাবে অসীম বিচলিত হয়। এরই মধ্যে দুটি নারী চরিত্র উপন্যাসে এসে গেছে নূতন করে—দুর্গা এবং শৈল। অসীমের নামে দুর্গাকে কেন্দ্র করে যে কুৎসা রটনা হতে দেখি তারজন্যই সমাজচ্যুত হরনারায়ণ সপরিবার পাটনা চলে আসে।

ইতোমধ্যে মনিয়া বুঝে গেছে যে তার প্রেমের পূর্ণতা অসম্ভব—অসীমকে সে পাবে না। কিন্তু তার চিত্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে শান্তরসের বৈষ্ণবধর্মে তাকে দীক্ষা নিতে দেখি। শেষ পর্যন্ত অসীমের জীবনে স্ত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিতা হল শৈল।

ফারুকশিয়ারের সঙ্গে অসীমের সম্পর্ক ইতিমধ্যে ঘনিষ্ট হয়েছিল। সম্রাটের ইচ্ছায় অসীম বাংলার রুকনপুরে মনসবদার নিযুক্ত হল। ইতিহাস থেকে জানা যায় ফারুকশিয়ারের রাজত্বকাল ১৭১৩ থেকে ১৭১৯ সাল পর্যন্ত। দিল্লীর মসনদ নিয়ে ষড়যন্ত্রেরফলে ফারুকশিয়ার চরম দুর্দশায় পড়েন এবং সেই সময় অসীম ও ভূপেন্দ্র দিল্লী পেঁছে যায়। ফারুকশিয়ার তার কাকা জাহান্দর শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন এবং কয়েদখানায় হত্যা করেছিলেন। ফারুকশিয়ারের জীবনেও একই রকম ঘটনা ঘটতে চলল। অসীমরা গিয়ে দেখল সম্রাট পরাজিত ও বন্দী। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে ভূপেন্দ্র প্রাণ হারাল, ফারুকশিয়ারের মৃত্যু ত' হলই।

নায়ক অসীমের জীবনে এবার নূতন পথের সংকেত। তার সঙ্গে মনিয়ার সাক্ষাৎ তাকে ঘনঘোর রাজনৈতিক আবর্ত থেকে বার করে এনে বৈষ্ণবের আরাধ্য 'গোপালের' উদ্দেশে টেনে নিয়ে গেল।

রাখালদাস তাঁর উপন্যাসের ধারায় 'অসীম' উপন্যাসের প্লটকে তুলনামূলকভাবে জটিল করেছেন। এই উপন্যাসের কাহিনী বিশাল, কখনও একই কথা বারংবার এসেছে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলটি জানতে হলে এই উপন্যাসটি

অবশ্য পাঠ্য। বিশেষ করে একালের পাঠকরা মোগলসম্রাট ফারুকশিয়ারের জীবন-কথাই জানেন না। আওরঙ্গজেবের সময় থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছিল। তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ ইতিহাসের পাতায় বয়স্ক, অস্থিরমতি শাসক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তবু তাঁর সময়ই প্রচণ্ড শক্তিশালী শিখ নেতা বান্দা বাহাদুর হিমালয়ের পাহাড়তলি পর্যন্ত পশ্চাদ্-অপসারণে বাধ্য হয়। তাঁর পুত্র জাহান্দার শাহ যে কয়েকমাসের মধ্যেই নিহত হন তার পিছনে ছিল তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র ফারুকশিয়ারের কূট চক্রান্ত। ফারুকশিয়ার শিখদের গড় অবরোধ করে তাদের ক্ষুধায় কাতর করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। ফারুকশিয়ারের জীবনের ভুল দুটি। এক, সৈয়দ-ভাইদের অপসারণের চেষ্টা, এবং দুই, বৃটিশদের আটত্রিশখানি গ্রাম ইজারা দান। প্রকৃতপক্ষে, বৃটিশদের পণ্য শুল্ক মুক্ত করা, তাদের মালপাত্র চলাচলে সুবিধা দেওয়া এবং বৃটিশ রপ্তানিতে বাংলার পণ্যের রপ্তানি ভাগ বেড়ে যাওয়ার পেছনে ফারুকশিয়ারের উদ্যোগ ছিল। ইতিহাসকার রাখালদাস দেখেছিলেন যে বাংলার পাঠকদের কাছে ফারুক-শিয়ারের পরিচয় প্রায় ছিলই না। সেইজন্যই তিনি উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশে এই স্বল্পকালের একটি বিচিত্র সম্রাটকে বেছে নিয়ে বাঙালী নায়কের সঙ্গে তার যোগ ঘটিয়েছেন।

বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র যথাক্রমে তাঁদের 'বিষবৃক্ষ' এবং 'শ্রীকান্ত' (চতুর্থ পর্ব) উপন্যাসে বৈষ্ণব ভাবরসকে প্রসারিত করেছেন। রাখালদাস এই দুই ঔপন্যাসিকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'অসীম' উপন্যাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্নিগ্ধ কোমল রসধারা বর্ষণ করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় রসপ্রবাহ কোন ক্ষতি করেনি—এটাই লক্ষণীয়।

'অসীম' উপন্যাসের কাহিনী ব্যাপ্তি ছিল বিশাল, পক্ষান্তরে 'লুৎফউল্লা' উপন্যাসে কাহিনীভাগ অত্যন্ত দুর্বল। যেটুকু বা কাহিনী আছে তা-ও কল্পনা নির্ভর। অথচ এই উপন্যাসের পটভূমিকায় লেখক রাখালদাস যে ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে নিয়ে এসেছেন সেই নাদির শাহ ভারতের ইতিহাসে একটি বিভীষিকার মত ব্যক্তিত্ব। মোগল আমলে প্রথম বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে (১৭২০—১৭৪০) যখন মারাঠারা দক্ষিণ থেকে দিল্লীর পথে এগিয়ে আসছিল, তখনই উত্তর দিক থেকে পারস্যরাজ নাদির শাহের সৈন্যরা দিল্লী আক্রমণ করে। মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহের সৈন্যরা এই আক্রমণ রোধে ব্যর্থ হয়। দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত নাদির শাহের সৈন্যরা প্রায় বিনা বাধায় পেঁছালে পানিপথের অদূরে যে যুদ্ধ হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে নাদির শাহ তাঁর সৈন্যদের দেশে ফেরার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মুহম্মদ শাহ সামান্য ভুল করে সে সময় শান্তির প্রস্তাব পাঠালে নাদির প্রস্তাবটি লুফে নিয়ে দিল্লীতে দুমাস ঘাটি গাড়েন, ব্যাপক হত্যা লীলা চালান, সিন্ধু নদের উত্তরে মোগল এলাকা নিজের দখলে নেওয়ার ফরমান আদায় করেন এবং মোগলদের প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে স্বদেশে রওনা হন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর বিধ্বস্ত দিল্লীতে তখন লুটেরাদের রাজত্ব, সাধারণ মানুষরা

অধিকাংশই পলাতক এবং সামন্ত নেতারা অন্য অভিজাতদের দরবারে, বিশেষতঃ অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌতে আশ্রয়প্রার্থী।

বিংশ শতাব্দীতে নাদির শাহকে নিয়ে বাংলায় ঐতিহাসিক নাটক লেখা হলেও বাংলা উপন্যাসে নাদির শাহের উপস্থিতি রাখালদাসই প্রথম ঘটিয়েছেন। তবে ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে লুৎফউল্লার কাহিনী মেশাতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের অংশ যেমন রেখেছেন, তেমনই কল্পনার রাশকেও বল্গাহীন করে দিয়েছেন। তবুও এই উপন্যাসে রাখালদাসের প্রতিভা নিঃশেষ হয়ে আসছে, এমন দ্রুত মন্তব্য করা ঠিক নয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস সমকাল, তার রাজনীতি, তার দেশাত্মবোধ—সবকিছু মিলিয়ে একটি নিটোল রূপ পায়। রাখালদাসের পূর্ববর্তী উপন্যাস 'অসীম' এবং 'করুণা'-য় দেশাত্মবোধের যে উন্মেষ ঘটেছিল, 'লুৎফউল্লা'য় তা আরও গভীর হয়েছে। এই উপন্যাসে জোর দিয়েই দেখান হয়েছে যে দিল্লীবাসী নরনারী দ্বারা হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-নির্বিশেষে যে ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তার ফলে নাদির শাহের অত্যাচার-স্পৃহা বাধা পায় এবং দিল্লীতে শান্তি ফিরে আসে।

রাখালদাস ঐতিহাসিক। কাজেই উপন্যাসের মাঝে দাঁড়িয়েও মোগল সাম্রাজ্যের বিচ্যুতি ও নাদিরের অত্যাচারের কারণটি তিনি জানাতে ভোলেন নি।

"তখনও নূরবাঈ অতিসুন্দর নাচিতেছিল, কোকীজিউ গোপনে বাদশাহকে প্রেমের গান শিখাইতেছিল, সুতরাং গোলন্দাজরা কামান ছোড়া ভুলিয়া গিয়াছিল, বারুদ তৈয়ারী করা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল, আওরঙ্গজেব আলমগীরের প্রেমের দায়ে হিন্দুরা অনেকদিন পূর্বে মোগলের রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আফগানিস্তান জয় করিতে নাদিরের বিশেষ বিলম্ব হইল না।"

'লুৎফউল্লা' উপন্যাস রচনার সময় থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, রাখালদাসের উপন্যাস রচনার উৎসাহ কমে আসছে। 'ধ্রুবা' উপন্যাসে তিনি আবার ফিরে গেলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসে। তবে এই উপন্যাসে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তিম দশার চিত্রটি তুলে ধরা হল। সমুদ্রগুপ্ত মধ্যভারত ও দক্ষিণভারতে সফল অভিযান করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত যে ভাবে নির্মাণ করেছিলেন, তার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাকে প্রসারিত করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজাদের একজন ছিলেন। কিন্তু তার পুত্র কুমারগুপ্তের সময় থেকেই সাম্রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ হতে শুরু করে। তার উত্তরাধিকারী স্কন্দগুপ্ত যতই চেষ্টা করুন না কেন গুপ্তদের প্রাধান্য কমে আসতে থাকে। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের রাজত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে একদিকে তার পুত্র রামগুপ্ত এবং অন্যদিকে তাঁর পুত্র চন্দ্রগুপ্ত—দুজনে যে স্বতন্ত্র মানসিকতার দৃষ্টান্ত, সেটা দেখাতে গিয়েই রাখালদাস 'ধ্রুবা' উপন্যাসটি লেখেন। সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকে 'ধ্রুবা' উপন্যাসটির গুরুত্ব কম নয়।

ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রামগুপ্তের পরিচয় তেমন নেই। বিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার বিশাখদত্তের লেখা। 'দেবিচন্দ্রগুপ্তম' নাটকে দেখা যায়, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ভাই রামগুপ্তের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তবেই সিংহাসনে বসতে

পেরেছিলেন। নাট্য-কাহিনী থেকে এও জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের রামগুপ্ত—বিরোধিতার পিছনে এবং সাফল্যের মূলে ছিল পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ। এতে তাঁর শক্তির বিশালতায় রামগুপ্ত আগেই হেরে বসেছিলেন। রাখালদাস সম্ভবত বিশাখদত্তের নাটক পড়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তি-জীবন থেকে দেখা যায় যে, তিনি মুদ্রাতত্ত্বে সু-পণ্ডিত ছিলেন এবং বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রা সম্বন্ধীয় বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়া প্রস্তরলিপি, পদক ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল। মুদ্রা, পদক এবং লিপির সাহায্যে তিনি যে রামগুপ্ত সম্পর্কে অধিক তথ্য যোগাড় করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। রামগুপ্ত-র ভীরু কাপুরুষতার চিত্র অংকনে তাঁর সেই ইতিহাসবোধ সক্রিয় ছিল। পাশাপাশি চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর মা দত্তাদেবীর চরিত্রের বিশালতা ও মহত্ত্বও রাখালদাস নির্ভুলভাবে এঁকেছেন। 'ধ্রুবা' চরিত্রটি যে ইতিহাস-সম্মত তাতে সন্দেহ নেই। তবে ইতিহাস বলে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রামগুপ্ত-র পত্নী 'ধ্রুবা'কে পরে বিয়ে করেছিলেন।

ধ্রুবা ইতিহাসে উপেক্ষিতা। কিন্তু রাখালদাস এই চরিত্রটিকে উপন্যাসের নায়িকার আসন দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসাবে ধ্রবার সাফল্য অস্বীকার করা যায় না। ধ্রুবার চরিত্রে একনিষ্ঠ প্রেমের যে প্রদীপশিখা জ্বলে উঠেছিল তার অগ্নিকণা হিসাবে কাজ করেছে চন্দ্রগুপ্তর প্রেমবোধ। অবশ্যই তিনি তার জীবন থেকে রামগুপ্তর ছায়া কখনও সরিয়ে দিতে পারেন নি।

রাখালদাসের উপন্যাস মোটামুটি বিবরণধর্মী। তিনি ইচ্ছা করেই উপন্যাসে নাটকীয়তার সংযোজন থেকে দূরে থাকতেন। হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের প্রভাব থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই সচেতনতা। একমাত্র 'ধ্রবা' উপন্যাসেই তিনি নাটকীয় ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত--

"পিতা, আমাদের রক্ষা কর; পাটলিপুত্র আজ অনাথ, কেবল সাম্রাজ্য নয়. আজ ভারতবর্ষে প্রতি নগর তোমার মত বৃদ্ধের আশায় পথ চাহিয়া আছে।" চলিত ভাষার মধ্য দিয়েও বক্তব্যকে কত ঋজু ও নাট্যগতিসম্পন্ন করা যায় উদ্ধৃতিটি তার প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন বাঙালী বাংলার ইতিহাস লিখুক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দুখণ্ডে বাংলার ইতিহাস লিখেছিলেন। উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার ইতিহাসও তাঁকে লিখতে দেখি। এই ইতিহাস-চর্চার পাশাপাশি তিনি যে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি লিখেছেন সেগুলিও বঙ্কিম-প্রভাবজাত। গুপ্ত যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের নানা পর্যায় ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে উপন্যাসের আঙ্গিকে তিনি বেঁধেছেন। একসময় তাঁর উপন্যাসগুলি বাঙালী পড়ত, এখন আর তেমন পড়েনা। হয়ত তাঁর আঙ্গিক-শক্তি বঙ্কিমের পর্যায়ে পোঁছতে পারেনি বলেই এই অনীহা থেকে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাংলার ইতিহাসের এবং বাঙালী জীবনের গৃহকোণের পরিচয় পেতে হলে রাখালদাসের উপন্যাসগুলি পড়া প্রয়োজন। সর্বোপরি ভারত ইতিহাসেরও নানা ঘটনাবলী তাঁর উপন্যাসকে তথ্য-কল্পনার বিচিত্র সম্পর্কে বেঁধেছে। বাঙালী পাঠকদের কাছে এটাও কম লাভের কথা নয়।

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

জগদীশ গুপ্ত : আপোষে অনাগ্রহী স্রষ্টা

[এক]

জগদীশ গুপ্তের নিষ্ঠ পাঠকের মনে হতে পারে, উপন্যাস রচনায় জগদীশ গুপ্ত খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। প্রচুর সমর্থ ছোটগল্পের তুলনায় যে সব উপন্যাস তিনি রেখে গিয়েছেন—অন্তত সার্থক উপন্যাস, তার সংখ্যা অস্বস্তিকর ভাবে কম। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস মোট আঠারোটি, যার মধ্যে 'সত্রভোগ' এবং 'কঙ্ক'-র সন্ধান সম্ভবত কেউ পাননি এখনও—যদিও 'উদয়লেখা' গ্রন্থে 'কঙ্ক'-র বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। শুধু এই সংখ্যালঘুতাই উপন্যাস রচনায় তাঁর অস্বস্তি প্রমাণ করে না, তা অনুমান করার আরো কারণ আছে।

লেখার ব্যাপারে কোন আপোষ-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন না জগদীশ গুপ্ত। 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধির অনুরোধে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, 'যে উপন্যাস যেখানে যখন সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং যে ঘটনা বিস্তারের যতটুকু ক্ষেত্র আছে, তার বেশী কোন ফরমাসী লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

অথচ উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে এই ঘটনা বার বার ঘটেছে। উপন্যাসের পরিকল্পনা নিয়েই তাতে হাত দিয়েছেন, এমন ঘটনা ঘটেনি এমন নয়—কিন্তু ছোটগল্পকে সম্প্রসারিত করে উপন্যাসে পরিণত করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও আমরা অনেকবার দেখেছি ; এবং নিরপেক্ষ বিচার করলে বলতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ছোটগল্পটিই করতে পারে, উপন্যাস নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যাক।

'শঙ্কিতা অভয়া' জগদীশ গুপ্তের একটি অসামান্য ছোটগল্প। এই ছোটগল্পকে পরিবর্ধিত করে তিনি যে-উপন্যাস রচনা করেছেন, তার নাম 'নিষেধের পটভূমিকায়'। উপন্যাসের প্রথমাংশ রীতিমতো আকর্ষণীয়, কিন্তু যে আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তায়, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে এবং নিখুঁত বৃত্ত নির্মাণে প্রথমদিকে পাঠককে তিনি আকৃষ্ট করে রাখেন, শেষাংশে তা বিস্ময়কর ভাবে অনুপস্থিত। একই কথা বলা যায় 'রতি ও বিরতি' উপন্যাস সম্পর্কে। এই উপন্যাসের কিছু বিচ্ছিন্ন বর্ণনা পাঠককে প্রায় নির্বাক করে রাখে সন্দেহ নেই, কিন্তু 'সবার শেষে গয়া' নামে যে ছোটগল্প এর উৎস, সেই ছোটগল্পটির সংহতি ও নৈর্ব্যক্তিকতা উপন্যাসে বেশ কিছু পরিমাণে হারিয়ে গেছে। 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসটির একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা দেখি 'পর্বত ও পার্বতী' নামক ছোটগল্পে। এক্ষেত্রে অবশ্য ছোটগল্পটিই পরে লেখা হয়েছে, এরকম অনুমানের কারণ আছে। 'গতিহারা জাহ্নবী' জগদীশ গুপ্তের মোটামুটি একটি সমর্থ উপন্যাস, কিন্তু যে ছোটগল্পের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তিনি এই উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছেন সেটি বাংলা সাহিত্যের এক সম্পদবিশেষ। গল্পটির নাম 'পুত্র এবং পুত্রবধূ'। 'চৌধুরাণী' নামে জগদীশ গুপ্তের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় প্রবর্তক পত্রিকার আষাঢ় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ থেকে আষাঢ় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

পর্যন্ত, গ্রন্থাকারে সম্ভবত এটি সংবদ্ধ হয়নি। এই উপন্যাসও একটি ছোটগল্পকে অবলম্বন করেই রচিত, যার নাম 'কর্ণধর পালের গমন ও আগমন'। জগদীশ গুপ্তের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাস হিসাবে দুর্বল—চারটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিতান্ত শিথিলভাবে গ্রন্থনা করে একটি উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয়েছে যার দুটি ঘটনা পূর্বেই দুটি অনবদ্য ছোটগল্পে সমর্পিত হয়েছে—'কলঙ্কিত সম্পর্ক' এবং 'নিরুপম তীর্থ' (বসুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত সংকলনে 'ত্রিলোকপতির তীর্থগমন' নামান্তর দেখা যায়)।

উপন্যাস রচনায় জগদীশ গুপ্তের অস্বস্তির আর একটি অনুমানযোগ্য কারণ দেখা যায়। বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিভঙ্গির মতোই কথাসাহিত্যের রূপরীতির আমূল পরিবর্তন করেছেন তিনি। এই পরিবর্তন সচেতন প্রয়াসের ফল নাও হতে পারে, কথাসাহিত্যের উত্তরাধিকার বর্জন কবার জন্যই হয়তো প্রথাবিরোধী আঙ্গিক তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল। এই কারণেই ছোটগল্প ও কবিতা সম্বন্ধে তাঁর অস্বস্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি। বোলপুর থেকে ৭.৮.২৭ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে 'কালি-কলম' পত্রিকাব সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লিখেছেন. "সংশয়ের কথা এই যে, আমার গল্পগুলি গল্পই হইতেছে কিনা।" 'কশ্যপ ও সুরভী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "কথা ও কাব্য-সাহিত্যে যত প্রকারের পতন ঘটিতে পারে. আমার বিশ্বাস. সমালোচকগণ অক্লেশেই বুঝিয়া ফেলিবেন যে. তাব সবগুলিই ইহাতে আছে।" এই অস্বস্তি তাঁর উপন্যাস সম্পর্কেও ছিল। 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন, "উপন্যাস বা গল্পেব সংজ্ঞাব অধীনে আনিয়া ইহাদেব বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদেব বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।" উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধা কত বেশি ছিল তার প্রমাণ কুষ্ঠিয়া থেকে ৩বা অগ্রহায়ণ '৩৩ তারিখে মুরলীধব বসুকে লেখা চিঠিব এই পংক্তিটি "উপন্যাস লেখা আমার পক্ষে দুরূহ—অসম্ভবই।"

এই দ্বিধা একেবারে অমূলক নয়। জগদীশ গুপ্ত মানুষের অন্তরেব গভীরতম প্রদেশই উন্মোচিত করতে চেয়েছেন, গল্প তৈরি করতে চাননি। বরং বলা যায় গল্প তৈরির চেয়ে গল্প ভাঙার এক নির্মম খেলাতেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। আধুনিক পাঠকের কাছে এই কারণেই তাঁর গল্পের আবেদন অতি তীব্র। এই পরীক্ষা তিনি করতে পেরেছেন এই জন্য যে, ছোটগল্প 'ঊনবিংশ শতকের বিস্ময়'—এর কোন সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ বা artform নেই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সে কথা বলা চলে না। চরিত্রের গুরুত্ব সেখানে যতো বেশিই হোক, সুশৃঙ্খল এক বৃত্ত নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সেখানে অস্বীকার করা যায় না। যায় না এই কারণেই যে. এক অখণ্ড জীবনদর্শন উপন্যাসে আমরা আশা করি। একটি নিটোল জীবনবৃত্ত আশ্রয় না করলে তা প্রকাশিত হতে পারে না। গল্প ভাঙার খেলায় যিনি বেশি উৎসাহী, চরিত্রের বিশেষ আচরণকে চকিত আলোয় ঝলসে দিয়েই যিনি কর্তব্য সমাপন করতে চান তাঁর পক্ষে দীর্ঘ মনঃসংযোগী জীবনবৃত্ত রচনা করা দুরূহ, কোন সন্দেহ নেই। যেখানে তা তিনি পারেননি, সেখানে বাস্তবতার রঞ্জনরশ্মিতে উদ্ভাসিত কিছু চরিত্র. কিছু বর্ণনা

এবং কিছু অসামান্য মুহূর্ত আমরা পেয়েছি, যেমন—'রতি ও বিরতি', 'তাতল সৈকতে'। যেখানে সেই দুরূহ কাজটি তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছেন সেখানে আমরা পেয়েছি বাংলা সাহিত্যের প্রথাবিরোধী অসাধারণ কিছু উপন্যাস—যেমন 'লঘু-গুরু', অসাধু সিদ্ধার্থ'।

[দুই]

জগদীশ গুপ্তের বিশিষ্ট মানসিকতা, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বস্তুধর্মী রচনা-রীতির জন্যই তাঁর সবকটি সাহিত্য-প্রকরণ আমাদের কাছে আকর্ষণীয়-উপন্যাসও। প্রধানত এই মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই বাংলা কথাসাহিত্যের উত্তরাধিকার তিনি বর্জন করতে পেরেছিলেন। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

বাংলা কথাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ অনুমান করতে গিয়ে 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন—'বঙ্কিমের কল্পনায় ছিল একটা বড় Ideal-এর Sentiment ; রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় Real ও Ideal-এর সমন্বয়-চেষ্টা আছে ; শরৎচন্দ্রের কল্পনায় আছে Real-এর একটা emotional প্রতিরূপ। ...অতঃপর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, সাদা চোখে Real-এর সঙ্গে বোঝাপড়া করাই হইবে তাহার একমাত্র প্রেরণা।'

এতো সহজে তিন প্রধান ঔপন্যাসিকের সম্বন্ধসূত্র নির্দেশ করা সংগত নয়, তবু মোহিতলাল স্থূল সত্য এর দ্বারা নির্ণয় করতে পেরেছেন। উপন্যাস জীবনঘনিষ্ঠ শিল্প, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের জীবনকথা শোনাতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে বাংলা উপন্যাসের পথিকৃতের সম্মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে জীবন আদর্শ নয়, তার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ঔৎসুক্য ছিল না—এবং 'ঊনবিংশ শতকের পুরুষোত্তমের' কাছে এটাই ছিল স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি, সেজন্য সৌন্দর্যের প্রশ্নই তাঁর কাছে বড়ো ছিল। মানুষের জীবন সুন্দর করে বিভিন্ন প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য। উপন্যাসে তিনি তাই সন্ধান করেছেন সেই মানুষের যিনি সামঞ্জস্যে সুন্দর। বাস্তব মানুষকে উপন্যাসে অন্ততঃ তাঁর অপরিহার্য মনে হয়নি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সংসারের মানুষগুলি আমাদের অত্যন্ত চেনা, সেইজন্য তিনি প্রথম আবির্ভাবেই বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিক হিসাবে বেশ খানিকটা সাড়া জাগিয়েছিলেন তরুণ সাহিত্যিকদের মনে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল ভাবপ্রবণ। জীবন প্রকৃতই যা এবং জীবন যেরকম হলে বেশ হতো—এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। পাঠকের চিত্ত দ্রবীভূত করবার জন্য শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ দ্বিতীয় পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছিলেন, ফলে জীবন প্রকৃতই যেরকম, মানুষ প্রকৃতই যা—বাংলা উপন্যাসে তেমন করে তা দেখা যায়নি।

যায়নি যে তার আর একটা কারণ মানুষ দর্পণে তার নগ্ন প্রতিরূপ দেখতে ভালবাসে না। যিনি তা দেখাতে চাইবেন, স্বভাবতই জনপ্রিয়তার প্রলোভন তাঁকে বর্জন করতে হবে। কথাটি বলা যতো সহজ, করা ততো সহজ নয়, কারণ লেখক কলম ধরেন মানুষকে খুশি করবার জন্যই—সত্যের কাছে দায়বদ্ধ হবার অঙ্গীকার

করে তো তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হননা। তাছাড়া তাঁর মানসিক গঠন এবং জীবনদৃষ্টিও তো এই ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী হতে হবে। জগদীশ গুপ্তের ক্ষেত্রে তা যে সম্ভব হয়েছিল, যুগপ্রভাব তার জন্য দায়ী এমন কথা কেউ কেউ বলতে পারেন। বস্তুত, এই শতকের তৃতীয় দশকে 'কল্লোল', 'কালি-কলম' প্রভৃতি পত্রিকাকে আশ্রয় করে কথাসাহিত্যের এমন এক ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল যাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে 'সাদা চোখে Real-এর সঙ্গে বোঝাপড়া'। কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর রচনার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি বাস্তব দৃষ্টি প্রমাণ করে না—এও এক ধরনের রোমাণ্টিক পন্থাবিলাস বা হুজুগ মাত্র। তা না হলে ভাদ্র. ১৩৩৩ সংখ্যার কল্লোল পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এই আক্ষেপ করতে হতো না—"আজকাল সব গল্পগুলিই প্রায় এক ধরনের আসে। কারখানা ও খনির কুলীদের লইয়া গল্প লেখা এখন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

জগদীশ গুপ্ত সেদিক থেকেও স্বতন্ত্র। 'শৌখীন মজদুরী' করবার জন্য তিনি তার অভিজ্ঞতার বাইরে কখনো যাননি. 'যৌনতা সৃষ্টির জন্যই যৌনতা সৃষ্টি'-র প্রলোভন থেকেও সর্বদা দূরে থেকেছেন। মানুষকে তিনি দেখেছেন তার অকৃত্রিম সত্তায় এবং তার সভ্যতার প্রলেপবর্জিত চেহারাটি উপস্থিত করেছেন সাহিত্যে। অবশ্যই এ দৃষ্টি বাস্তবদৃষ্টি, এবং পাশ্চাত্য সমালোচক Becker-এর ভাষায় একে বলা যায় 'Vertical extension of realism'। সংস্কারবর্জিত এক নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎকে দেখতে না শিখলে মানুষকে তার মৌল সত্তায় চেনা যায় না। জীবনের এই পাঠ জগদীশ গুপ্ত নিয়েছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে এবং সৎ সাহিত্য সাধনায় দুর্লভ একটি গুণ তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, যার নাম নৈর্ব্যক্তিকতা।

জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য-সংসারের মানুষগুলি প্রায়শই নির্মম, কদর্য, অর্থলোভী, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং বাসনাতাড়িত। নিরাসক্ত দৃষ্টিব অধিকাবী বলেই তিনি দেখতে পান মানুষ তার অন্তরে লালন করছে এক পাশব সত্তা। তাই ব্যক্তিগত কদর্যতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসংগতি, অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা—সবই ফুটে ওঠে তার রচনায়। সেই সঙ্গে আছে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব যা অধিকাংশ সময়েই মানুষের কুশ্রী প্রবৃত্তিকেই প্রতিফলিত করে। ছোটগল্পের মতোই তাঁর উপন্যাসে গল্প কম, চরিত্রের এই গভীর উন্মোচন বেশি। মোহিতলাল মন্তব্য করেছিলেন, এই দৃষ্টিকে ঠিক রসদৃষ্টি বলা চলেনা. কিন্তু উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই দেখা যাবে এ ব্যাপারে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের নায়ক গুস্তাব ফ্লবেয়রের কথাই সত্য—'Relief comes from a deep view, from penetration, from the objective'. [Louise Colet-কে লেখা চিঠির ইংরেজি অনুবাদ]।

[তিন]

"ইহাতে প্লট নাই—আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র ; গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়।"—একটি উপন্যাসের ভূমিকায় একথা বলেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। কিন্তু একটি উপন্যাস সম্পর্কে নয়, উপন্যাস রচনা সম্পর্কেই তাঁর সম্বন্ধে এটি সাধারণ সত্য।

আপাতত তাঁর পল্লীসমাজ-কেন্দ্রিক কয়েকটি উপন্যাসের পরিচয় দিলেই তা বোঝা যাবে।

জগদীশ গুপ্তের স্ত্রীর কথা অনুযায়ী ১৯২৮ সালে বোলপুর থেকে তিন-চার মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে জগদীশ গুপ্ত 'রোমন্থন' এবং 'দুলালের দোলা' উপন্যাস দুটি রচনা করেন। দুটি উপন্যাসই পল্লীসমাজের আন্তরিক পরিচয় তুলে ধরেছে। 'রোমন্থন' উপন্যাসের মূল কাহিনী, যদি এতে কোন কাহিনী থাকে, এক ধনাঢ্য পরিবারের তিন বাবুর পল্লীগ্রাম দর্শনের অভিজ্ঞতা। উপন্যাস হিসাবে এর মূল্য কতটুকু, বিচার্য বিষয় হতে পারে, কিন্তু কয়েকটি গ্রাম্য চরিত্রের যে অন্তরঙ্গ উন্মোচন এখানে ঘটেছে – শরৎচন্দ্রের নিপুণ উপস্থাপনেও তাদের কয়েকটিকে আমরা পাইনি। উদাহরণ হিসাবে গ্রামের পাটচাষী অভয়কে আমাদের মনে পড়বেই। সর্বস্বান্ত এই চাষীর জীবনে "আর সব অভিব্যক্তি নিদ্রিত ; কেবল প্রহরীর দৃষ্টির মত একটি চৈতন্য একই দিকে নিবদ্ধ হইয়া আছে – আজিকার দিনটি।" জগদীশ গুপ্তের সময়ে সত্য ছিল কিনা জানিনা, আজ যখন সংবাদপত্রে দেখি অভাবের তাড়নায় পিতার হাতে পুত্রের হত্যা—আমাদের মনে পড়ে অভয়কে, যে মুমূর্ষু কন্যাকে হত্যা করে পালিয়েছিল। তার মানসিকতার নির্মম বর্ণনায় 'রোমন্থন' এখনও সজীব হয়ে আছে।

'রোমন্থন'-এর মতোই 'দুলালের দোলা' চিত্রিত চরিত্রমালা এবং এমন অনেক চরিত্র—বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠকের সঙ্গে এর আগে যাদের পরিচয় ঘটেনি। পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের কিছু বিশিষ্ট ধারণার ও রীতিনীতির সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। জাতপাতের বিচার, ব্রাহ্মণ্য তেজের পরিণতি, উৎকট প্রমোদানুষ্ঠান প্রভৃতির যে নগ্নচিত্র 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে আছে তাতে তৎকালীন এক সমালোচক মাঘ, ১৩৩৮ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "এই বই লেখার সার্থকতা কোথায় জানিনা। প্রবাসী বাঙালীর কাছে দেশের এই চিত্র উপস্থিত করলে তারা আর দেশে ফিরবার কথা ভাবতেও ভয় পাবে।' হয়তো পাবে, কিন্তু সে দায় জগদীশ গুপ্তের নয়। আসলে নাগরিক মানসিকতা নিয়ে যে গ্রামের জীবনযাত্রাকে বোঝা যায় না, এই সত্য কথাটা তিনি এই দুই উপন্যাসে স্পষ্ট করে তুলেছেন, এবং 'যথাক্রমে' উপন্যাসে। শেষের এই উপন্যাসে দুটি কাহিনীকে তিনি অপটু হাতে জুড়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, যেরকম প্রয়াস তাঁর উপন্যাসে আমরা অনেক দেখেছি। প্রসঙ্গত 'তাতল সৈকতে' এবং আরো বেশি করে 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসের কথা আমাদের মনে পড়তে পারে। কিন্তু 'যথাক্রমে' উপন্যাসের যা প্রকৃত মূল্য তা পল্লীজীবনের সত্য ধারণা তুলে ধরার মধ্যে নিহিত। এর প্রথম গল্পে লাজুক মেয়ে সাবিত্রী শিখে গিয়েছে, সহ্য করলে শাশুড়ির অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না—"শক্ত কথার উত্তরে আরো শক্ত জবাব দিতে হইবে।" এই শিক্ষার পর 'শাশুড়ী যদি তোলে কঞ্চি, সাবিত্রী তোলে বাঁশ।'

শহর থেকে ডাক্তারী পাশ করে আসা নিত্যপদও এই ভুল প্রথমে করেছিল, কথা কম বলে কাজ বেশি করতো, বিনা পয়সায় রুগী দেখতো। পরে সে প্রাপ্য টাকা

আদায় করতে শিখলো. সে বুঝলো—"এটাই ওষুধ। মানুষের তামাসা করার প্রবৃত্তিটা থাকে না, যদি তার নগদ মূল্য দিতে হয়।"

তার আর একটি শিক্ষা, 'অত্যন্ত কলরব করে আর কথার বাজে খরচ করে, এদের বশ করতে হয়।' দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আঙুল চিবিয়ে ফেলেছে বলে গোবর্ধন যখন নিত্যপদর কাছে আসে, সে নির্বাক হয়ে অপারেশনের জন্য ছুরি কাঁচি বার করে জল গরম করতে দিয়েছিল—তাতে গোবর্ধনের মনে হয়েছে, "ডাক্তারবাবু অস্ত্রগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া যেন কোন সর্বনাশীর ধ্যান করিতেছেন।" সে পালিয়েছে গ্রামের ফণী ডাক্তারের কাছে এবং গ্রামের ডাক্তার কথার বাজে খরচের নমুনা দেখিয়েছে—"দেখা রে আঙুল। আঙুলের আধখানা মুখের ভেতর কেটে রাখতে পারত তবে বলতাম, হ্যাঁ, দাঁতাল মেয়ে মানুষ বটে।"

এই ভুল 'রোমন্থনের তিন বাবুও করেছেন। প্রতিবেশী সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকার ভদ্রতা যে গ্রামে চলে না, তারা জানতেন না। এও জানতেন না যে, গ্রামের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ কুৎসা সম্বন্ধে, খোঁজ রাখাটা প্রায় একটি কর্তব্যের মধ্যে ধরে এবং গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিও সদম্ভে সব ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে রেখেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের দুলালটিকেও দ্বারিক ঠাকুর বলেছেন—'বালক, তুমি ব্রাহ্মণকে চেন না।' দুলাল, অর্থাৎ নীরদবরণকে তিনি ব্রাহ্মণ চিনিয়েছেন বড় নির্মম ভাবে।

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে গ্রামজীবনের কথাই প্রথমে উল্লেখ করা হল, কারণ এই জীবনের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল অপেক্ষাকৃত কম। অথচ এখানেও তিনি বাস্তব দৃষ্টি, নির্মোহ মানসিকতা ও চরিত্রসৃষ্টি-ক্ষমতার নির্ভুল পরিচয় মুদ্রিত করেছেন।

[চার]

মানুষের গহনচারী কামপ্রবৃত্তি, বিবাহিত নারী-পুরুষের মৌল সম্পর্ক, নারীর ন্যায্য অধিকার হরণে সামাজিক বিধির নির্মমতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকসঞ্চারী কিছু উপন্যাস যেমন জগদীশ গুপ্ত লিখেছেন, তেমনি আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়েও তাঁর ধারণা আমরা জানতে পেরেছি। প্রত্যেক প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ নেই, সুতরাং সাধারণ ভাবেই এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা যেতে পারে।

কামতাড়িত মানুষের যৌন প্রবৃত্তি মুখরোচক করে পরিবেষণ করার একটা প্রবণতা কল্লোল যুগে দেখা যায়, কিন্তু জগদীশ গুপ্ত মানুষের এই আদিম রিপু সম্বন্ধেও আশ্চর্য সংযত—অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বৃত্তি হিসাবেই তাকে তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। 'লঘু-গুরু' উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনা করেও রবীন্দ্রনাথ জগদীশ গুপ্তের এই গুণটি স্বীকার করে নিয়েছেন—"এই উপাখ্যানে বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে তবুও কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই"।

পুরুষের কামাবেগের কথাই সাধারণ ভাবে জগদীশ গুপ্তের বর্ণনীয় এবং সামাজিক

বিধির অসংগতির জন্য এর শিকার হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী—এটাই তিনি দেখিয়েছেন। বিপরীত দৃষ্টান্তও যে নেই এমন নয়। তার কথাটাই আগে বলি।

নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসে মণীন্দ্রবাবু চরিত্রটি বিকৃত কামের এক প্রতিমূর্তি। তিনি বেছে বেছে সন্তানের গৃহশিক্ষক রাখেন নববিবাহিত যুবকদের, কারণ ঘরে যাদের যুবতী স্ত্রী আছে তাদের সান্নিধ্যেই তিনি এক ধরনের কামাবেগ অনুভব করেন। নন্দ দুদিন দুটি চাওয়ার পর তাঁদের সংলাপের একটু পরিচয় দিই :

— "যাও, কিন্তু—

— আজ্ঞে, পরশুই চলে আসব।

— দু রাত্রি পাবে ?

নন্দ জবাব দিল না।

মণীন্দ্র বলিলেন, দিনে গাড়ী কখন ?

—তিনটেয়।

—তা হলে দুপুরটাও পাচ্ছ।"

আশা করি এই কথোপকথন বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে স্বভাব-স্বৈরিণী নারী কৃষ্ণা, মৃগয়াবৃত্তি যার সহজাত। ঘটনাচক্রে নন্দ একটি বিস্ফোরক দৃশ্যের সম্মুখীন হয়েছিল -"প্রভুপত্নী, তরুণী রমণী মাত্র একখানি তোয়ালে কটি-তট হইতে বিলম্বিত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন"। এ দৃশ্য দেখে সে পালাতে পথ পায় না, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে নিভৃত অবসরে প্রভুপত্নী বলেছে—"পালাবেন না ; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখা আমার ভালো লাগে—আপনাকে আরো—আপনি নির্বোধ, তাই দিশে পাননা—পালান"।

কৃষ্ণার চরিত্র স্পষ্ট করে দিয়েছে তার গর্ভধারিণী জননী—"রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। মনে হয়, কাউকে ভালবাসে না, বাসতে পারেই না, ঈশ্বর ওকে সে ক্ষমতা দেন নাই।"

এই স্বাভাবিক বহুচারিণী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নতুন। 'ভারত প্রেমকথা'-য় সুবোধ ঘোষ এই রকম একটি পৌরাণিক নারীর পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দায়ে পড়ে রোহিণীকে উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে এই রকম একটা স্বভাবে মুড়ে দিতে চেয়েছিলেন—ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। শরৎচন্দ্রের ভাবালুতা-সম্পৃক্ত সৃষ্টি বরং এই ধারণাই সৃষ্টি করে, নারী অবস্থার চাপে পদস্খলিতা হয়। হয় না, এমন কথা নয়—কিন্তু স্বভাব-স্বৈরিণী নারীও পৃথিবীতে দুর্লভ নয়। জগদীশ গুপ্ত সেইরকম একটি নারীচরিত্রই উপহার দিয়েছেন এই উপন্যাসে।

বিবাহিত পুরুষ নারীকে চায় শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে, সহধর্মিণী রূপে নয়—সাধারণ মানুষের জীবনে এটাই সত্য এবং এই সত্যকে নির্মম ভাবে তুলে ধরেছেন জগদীশ গুপ্ত তাঁর অনেক ছোটগল্পে, কিছু উপন্যাসেও। একটি ছোটগল্পে তিনি বলেন, "সহধর্মিণী আজকাল কেউ চায়না, সুবলরা আরো চায় না"। উপন্যাসের একটি চরিত্র বলে, "ধর্মপত্নী কথার কোনো মানে নেই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল—তার দেহটাই আসল।"

পুরুষ বহুকাল থেকে এই স্বত্ব ভোগ করে আসছে, সুতরাং তার মনে এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, কিন্তু স্বামী অপদার্থ কামুক এবং লম্পট হ'লে স্ত্রীর মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়—জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে তার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিক্রিয়া আমরা পাই। 'কলঙ্কিত তীর্থে''-র প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখি এই রকমই এক লম্পট চরিত্র সাতকড়িকে। মধুডাঙ্গার মেলায় একটি বিধবা মেয়ের সতীত্বহরণের চেষ্টায় তার কারাদণ্ড হয়। ফিরে আসার সময় গৃহে সে এমন সম্বর্ধনা পায় যেন বীরোচিত কোন কর্মে সে কারারুদ্ধ হয়েছিল। স্ত্রী মাখন ঘৃণায় তার সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে শাশুড়ি তাকে বাড়ি থেকে বার কবে দেয়।

পুরুষের অপরাধে নারীর এই দণ্ডলাভ জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট জগতে নতুন নয়। মাখনকে এইভাবে বেরিয়ে আসতে হয়েছে বাইরে, 'লঘু-গুরু' উপন্যাসের টুকিকেও 'বাহিরে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে' গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের নায়িকা শরতেরও শেষ আশ্রয় তাই—''পায়ের নীচে পথের মাটি শীতল—দক্ষিণের বায়ু শীতল—

এই শীতলতার মধ্য দিয়া সম্মুখের অতি-নীরব ও অতি-বিস্তৃত অন্ধকারেব দিকে চলিতে চলিতে শরতের বুকের শিরা একটি একটি কবিয়া ছিঁড়িতে লাগিল।''

অথচ শরতের দোষের মধ্যে এই যে, বেশি রাত্রে ছেলে না ফেবায পথে তাব অন্বেষণে যেতে হয়েছিল এবং নারীমাংস-লোলুপ একটি পশুকে প্রতিহত কববাব জন্য শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। ভিটেমাটি ত্যাগ করে যখন তাকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হয় তখনই জানি, টুকির মতো 'ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী অন্ধকাব' অথবা 'আদি কথার একটি' গল্পের কাঞ্চনের মতো নির্যাতন তার বিধিলিপি হয়ে গিয়েছে। উপন্যাসেব তৃতীয় পরিচ্ছেদে রণজিতের সঙ্গে যখন শরতের দেখা হয, রণজিৎ যখন মায়ের সম্মান দিয়ে দেশের বাড়িতে তাকে নিয়ে আসে, জগদীশ গুপ্তের অপরিচিত পাঠক তখন 'তারা সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলো'—গোছের একটা সাজানো উপসংহারের কথা চিন্তা করতে পারে। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য-সংসারের মানুষগুলি এতো সদয় নয়, নিয়তিও সেখানে কুচক্রী। ফলে, প্রত্যাশিত পরিণতিই দেখা যায়—"ব্যাপার সামান্যই, একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ জলে ভাসিতেছিল। প্রভাতের প্রথম আলোকে উজ্জ্বল জলাশয়ে অচঞ্চল ভাসমান দেহটির দিকে চাহিয়া মাধব রায় বলিলেন,—জিতুর নতুন মা"।

জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যজগতের এই নির্মম সত্য আমরা জানি বলেই আমাদের মনে হয় শরৎ ও রণজিতের দুটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসে ঠিক যেন জোড় খায়নি, যদিও বিচ্ছিন্ন গল্প হিসাবে দুটিই অনবদ্য। উদ্ভিন্নযৌবনা কেতকীর দেহ-সৌন্দর্য রণজিৎকে পাগল করে দিয়েছে, অনুচ্চারিত প্রেমের অসহায় যন্ত্রণা নিয়ে সে পালিয়েছে—কেবল এই সূত্রে দুটি পলায়নের কাহিনী গেঁথে ফেলা যায় না।

স্বামীর লাম্পট্যবৃত্তি বা দেহসর্বস্ব অপদার্থতার জন্য স্ত্রী ব্যথিত হয়েছে, জগদীশ গুপ্ত এটুকু দেখিয়েছেন - কখনো বা ভেতরে ভেতরে সে প্রতিবাদও করেছে। কিন্তু অপমানের ও আহত সম্মানের সেই জ্বালাই তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, তাঁর

নারীচরিত্রকে বিদ্রোহ করতে কদাচিৎ দেখা যায়. তা স্বাভাবিক নয় বলেই। অসহযোগিতার মধ্যে যেটুকু প্রতিবাদ প্রকাশ পায় তা করেছে মাখন, করেছে জ্যোতির্ময়ী (মহিষী), এবং করেছে 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসের নায়িকা কিশোরী। শ্বশুর এবং শাশুড়ীকে নিয়ে কিশোরীর কোন সমস্যা ছিলনা, সমস্যা ছিল স্বামী অকিঞ্চনকে নিয়ে। 'আদি কথার একটি' ছোটগল্পে সুবল যেমন খুশীকে বিবাহ করে বটে, কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল খুশীর মা যৌবনময়ী কাঞ্চন, এই উপন্যাসেও অকিঞ্চন বেশি উৎসাহী কিশোরীর বন্ধু অপরা সম্পর্কে। সুতরাং পিত্রালয়ে এসে স্বামীকে ধরে রাখতে তার ভরসা হয় না, মাকে বলে—"তুমি ওঁকে আজই যেতে বলো।"

কিন্তু কেবল স্ত্রী বা স্ত্রীর বন্ধু নয়, কোন নারীতেই যার অরুচি নেই তাকে শিক্ষা দেবে কিশোরী কেমন করে! অকিঞ্চনের কাছে নীতি, আদর্শ, রুচি সবই তুচ্ছ, তার 'ভালো লাগা নিয়ে কথা।' বাগদি বউ ভুবনকে তার ভালো লাগে, সুতরাং বাগদি পাড়াতেও সে যায়। কিশোরী ফিরে এলে অকিঞ্চনের নোংরামিতে বিরক্ত হয়ে ভুবনও তাকে নালিশ জানায়। কিশোরী সহ্য করতে পারেনা, আবার পিত্রালয় চলে যায়। চিঠিতে লেখে, "তুমি ভাল না হইলে তোমার কাছে আমি যাইব না।" অকিঞ্চনের পুনর্বিবাহ নিয়ে জল্পনা কল্পনা হয়. অকিঞ্চন তাতে অরাজিও নয়—যদিও প্রতিবেশীরা এ বিবাহ হতে দেবে না ঠিক করে। কিশোরীও হয়তো তার প্রতিবাদে অটল থাকতো, কিন্তু "বাহ্যত প্রশান্তভাবে দিন চলিতে চলিতে দ্বিতীয় মাসের একটি দিনে কিশোরী অনুভব করিল, সে গর্ভবতী।" সন্তান-সম্ভাবনার আনন্দ নয়, কিশোরী অনুভব করে তীব্র যন্ত্রণা, কারণ সে বোঝে. "সর্পের যেমন বিষদাঁত থাকে, ঐ পুরুষটির অন্তরে তেমনি একটি জ্বালাময় প্রবৃত্তি আছে—এই সন্তান তার সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চিহ্ন মাত্র।"

তবু কিশোরীকে ফিরে যেতে হয়েছে স্বামীর কাছে। এখানে কিশোরীকে লেখক বিদ্রোহিনী দেখাতে পারেন নি, বোধহয় তা সম্ভবত ছিল না– কারণ 'যোগাযোগের' নায়িকা কুমুদিনীর মতো প্রাপ্তমনস্কা সে নয়। বরং নিজস্ব পদ্ধতিতে, নিজের শক্তির সীমার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য বিদ্রোহের স্পর্ধা দেখিয়েছে 'সুতিনী' উপন্যাসের নায়িকা রাজবালা।

'সুতিনী' উপন্যাসটিকে আমি জগদীশ গুপ্তের এবং বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম বিশিষ্ট উপন্যাস মনে করি। কেন, একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

অতি সাধারণ মেয়ে রাজবালার বিবাহ হয়েছিল মাসিক পঞ্চান্ন টাকা বেতনের হাইস্কুলের মাস্টার দুর্গাপদর সঙ্গে। মানুষটি ভাল. কিন্তু চেহারা খুব পাতলা। প্রথম সন্তান আঁতুরেই মারা গেল, পরের তিনটিও তাই। এ ব্যাপারে যা হয়. সকলেই দোষ দিল রাজবালার। অতি সাধারণ মেয়ে রাজবালার বেদনার বাষ্পে বিদ্রোহের একটা অস্পষ্ট বাণী ভেসে বেড়াচ্ছিল—"স্ত্রীর দোষ—তারপরেই অদৃষ্ট অর্থাৎ কেউ না—মধ্যে আর কেহ নাই।…অদৃষ্ট আর আমরা! দায়ী করা যেতে পারে মাঝখানে এমন কি কেউ নেই?"

উপন্যাসটিকে অতি সহজেই চূড়ান্ত আধুনিক প্রমাণ করা যেতো যদি রাজবালা

দ্বিচারিণী হয়ে তার মাতৃত্ব শক্তির নিদর্শন উপস্থিত করতো। জগদীশ গুপ্ত জানতেন, রাজবালার মতো মেয়েরা তা পারেনা। সেজন্য যা সে পারে তাই করেছে—নিজের বোন মধুমালার সঙ্গে নিজে উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দিল স্বামীর। সতীত্বের পরাকাষ্ঠায় এমন কাজ অনেকেই করেছে, বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠকের কাছে এ ঘটনা অভিনব নয়। কিন্তু রাজবালা সতীত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য এ কাজ করেনি, করেছে নিজের প্রতি দোষারোপ খণ্ডন করতে। পরীক্ষায় অবশ্য সে জয়ী হয়নি, রাজবালা দুর্গাপদকে সন্তান উপহার দিয়েছে। তারপর "নির্মমতায় নয়, ঈর্ষায় নয়, নির্ভরশীলতা হারাইয়া সে যেন নিজেকে বাঁচাইবার ব্যাকুলতায় ছটফট করিতে লাগিল।"

অবশেষে পঞ্চম বার সন্তানসম্ভবা হলো সে, প্রসবও নির্বিঘ্নে হল। কিন্তু রাজবালাকে বাঁচানো গেল না। উপন্যাসের উপসংহার—"সেই ছেলে, মুক্তিপদ, ধীরে ধীরে বড় হইতেছে।"

অর্থাৎ, নিজের দৈহিক সুস্থতার নিঃসংশয় শংসাপত্র পৃথিবীতে রেখে রাজবালা স্বস্তির মৃত্যু বরণ করেছে। বিদ্রোহে নয়, গণিকাবৃত্তি করেও নয়—যে মৌলিক প্রশ্ন রাজবালাকে আলোড়িত করেছে তার দ্বারাই সে উপন্যাস জগতের একটি অবিস্মরণীয় নারী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। উপন্যাসটি বিশিষ্ট এই কারণেও যে, জগদীশ গুপ্ত এখানে একটি সমগ্র জীবনবৃত্ত উপস্থাপনের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন, এবং তাঁর জীবনদৃষ্টি সম্পর্কেও। উপন্যাসটি বহু আলোচিত নয়, কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জগদীশ গুপ্তের একটি সমর্থ সৃষ্টি।

প্রেম ও স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে মৌলিক চিন্তা আছে 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসেও, কিন্তু যে পর্যন্ত গল্প তৈরি করার বাসনা জগদীশ গুপ্তের ছিলনা সে পর্যন্ত একমুখী তীব্রতায় রচনাটি অসাধারণ। শেষে সম্ভবত পরিকল্পনার অভাবেই তিনি কেন্দ্রচ্যুত হয়েছেন অথবা, আদর্শের সঙ্গে বাস্তব দারিদ্র্যের সংঘাত দেখাতে গিয়ে। অথচ স্ত্রীপুরুষের আদর্শ সম্পর্ক এবং আদর্শ বিবাহ-ব্যবস্থাও তিনি দেখিয়েছেন 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসে এবং সেজন্য তাঁর বাস্তবতাবাদী ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ ঘটেনি। উপন্যাস হিসাবে 'কলঙ্কিত তীর্থ' দুর্বল, 'চৌধুরাণী'ও তাই—কিন্তু চিন্তার মৌলিকত্বে এখানেও জগদীশ গুপ্ত বিশিষ্ট ও আকর্ষণীয়।

[পাঁচ]

সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বোধ জগদীশ গুপ্তের এক বিস্ময়কর ক্ষমতা। এর অর্থ এই নয় যে, জগদীশ গুপ্তের পূর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা কেউ দেখাতে পারেননি—সেরকম নির্বোধ মন্তব্য অবশ্যই করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করলেই মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাবে। "কিন্তু আপাত চিন্তায় মনের যে বিচিত্র গতি আমাদের তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, তাদের আশ্রয় করে সাহিত্য রচনার দুঃসাহস এবং সামর্থ্য

জগদীশ গুপ্তই দেখিয়েছেন। তাঁর বিচিত্র জগতে অনুগৃহীত মানুষ সম্পত্তি লাভ করে অবস্থা ফেরালে সে তার অনুগৃহীত থাকবে না ভেবে অনুগ্রহদাতা রেগে যায় (গুরুদয়ালের অপরাধ), গরীব বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রী হবে শুনে ক্ষুব্ধ বড়লোক বন্ধু তার স্ত্রী সত্যিই সুন্দরী নয় দেখে আশ্বস্ত হয় (আমি ও দেবরাজের স্ত্রী), অত্যন্ত মুখচোরা দুর্বল চেহারার মানুষও যখন জমিদারের পাইক হবার দায়িত্ব পেয়ে সেই পোষাক পরে লাঠি হাতে নেয় তখন তার ব্যক্তিত্বই পাল্‌টে যায় (পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক), পাকা চুল দেখেও যার মন খারাপ হয়না সে হঠাৎ রাস্তায় সুন্দরী মেয়ে যেতে দেখেও কেন ঘুরে তাকায়নি মনে করে বিমর্ষ হয়ে ভাবে সে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে (অপহৃত আকাশ-কুসুম)। এই রকম সূক্ষ্ম মনস্তত্ব জগদীশ গুপ্তের যেসব উপন্যাসে সঞ্জীবনী শক্তির কাজ করেছে সেরকম দুটি একটি উপন্যাস স্মরণ করা যাক। পূর্ব প্রসঙ্গ বজায় রাখবার জন্য স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ক-নির্ভর উপন্যাসের কথাই ভাবা যেতে পারে।

'মহিষী' উপন্যাসে আশাক এবং জ্যোতির্ময়ীর দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল। সে মেঘ ঘনীভূত হয়েছে ঘটনা পরম্পরায়। শেষ পর্যন্ত যখন বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, জ্যোতির্ময়ী নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিয়েছে. নিজে প্রচুর কাজকর্ম করেছে এবং বিবাহ সমাপ্ত হলে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়েছে। জগদীশ গুপ্তের রচনার সঙ্গে যাঁরা সবিশেষ পরিচিত নন তাঁরা শেষে একটি চমকিত পরিণতি আশা করতে পারেন. কিন্তু গল্প তৈরি করা যাঁর আদৌ উদ্দেশ্য নয় তিনি তা করবেন না—সহজেই বোঝা যায়। গোটা উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে একটি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ওপর। অশোক লম্পট নয়, কামুকও নয়—অন্ততঃ সেভাবে উপন্যাসে তাকে আঁকা হয়নি। বাবার পছন্দ করা পাত্রী জ্যোতির্ময়ীকে তার অপছন্দও হয়নি তার রং কালো হওয়া সত্বেও। বরং "বিবাহ এবং স্ত্রীলাভ এই দুটি ব্যাপারকে সে একটা দুর্লভ লাভের সমাদর এবং মূল্য দিয়াছিল।" আদর করে স্ত্রীকে সে 'নুনু' বলে ডাকতো।

কিন্তু সমস্ত শান্তির ঐক্য একটিমাত্র কথায় ছিন্ন হয়ে গেল। সেটা বুঝতে গেলে বিবাহের পূর্ব প্রসঙ্গ জানা দরকার। প্রচুর অর্থের লোভে অশোকের পিতা এখানে তার সম্বন্ধ করেন, মেয়েটি কালো জানা সত্বেও। অশোক প্রথমে গররাজি ছিল, সেজন্য তার পিতা একটি ফন্দি আঁটেন। তিনি এমন ভাব দেখান যেন সমস্ত সম্পত্তি তিনি দান করে যাবেন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে। সেক্ষেত্রে শ্বশুরের বিত্ত উপেক্ষনীয় নয়। সুতরাং অশোক এখানেই বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। দানপত্রের ব্যাপারটি যে পিতার একটি ফন্দি মাত্র এবং এখানে রাজি করাবার একটি কৌশল মাত্র—এটি জানার পরই জ্যোতির্ময়ী তার কাছে দুঃসহ হয়ে দাঁড়াল। তার মনে হলো, "লোক ঠাট্টা করিতেছে—তাহাকে ঠকাইয়া কালো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে...এই নিদারুণ পরাজয়-জ্বালা সর্বদা জাগরূক রাখিয়া দিবে ঐ কালো মেয়েটি।"

কিন্তু অশোক যে এই প্রতারণার জন্যই বিক্ষত, জ্যোতির্ময়ী তা বোঝেনি। তার মনে হয়েছে—"সে কালো বলিয়াই তাহাকে এত হেনস্তা'।...সে উপলক্ষ্য মাত্র, টাকাই

মুখ্য···সে যেন উচ্চে উঠিবার সোপান মাত্র—তাহাকে অবলম্বন করিয়া ইঁহারা আর্থিক অবস্থা খানিকটা উন্নত করিয়া লইয়াছেন।"

অর্থাৎ অশোক এবং জ্যোতির্ময়ী দুজনেই আহত সম্মানবোধের অপমানে ক্রমশঃ দুর্মোচনীয় ব্যবধান রচনা করেছে, কেউ কাউকে বুঝতে চায়নি। সামান্য মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে একটি অসামান্য উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে।

বোধহয় একই কথা বলা যায় 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাস সম্পর্কে। মল্লিকা 'একটি সুকেশিনী সুন্দরী যুবতী—দরিদ্র গৃহস্থ-বধূ।' যখন সে সন্তান-সম্ভবা হল তখন সে অত্যন্ত অসুস্থ। সাত মাসের শেষেই একটি অপুষ্ট মৃত সন্তান প্রসব করল সে। এতে শাশুড়ির অত্যাচার শুরু হল তার ওপর। ভুবনেশ্বর মল্লিকাকে ভীষণ ভালবাসতো! মাকে নিরস্ত করতে না পেরে নিজেই সে মল্লিকার মা দক্ষবালাকে জানিয়ে এলো সে কথা। দক্ষবালা মল্লিকাকে নিয়ে গেলেন এবং জানালেন, শ্বশুরবাড়ি আর তাকে পাঠানো হবে না। এতে অবশ্য ভুবনেশ্বর দুঃখিত, আরো দুঃখিত এ কথা শুনে যে শ্বশুরবাড়িতে নাকি তাকে মারধর করা হতো। ভুবনেশ্বর জানে, কথাটা একেবারেই মিথ্যা।

বাধ্য হয়ে গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা দয়ানন্দ মল্লিককে ভুবনেশ্বর জানাল কথাটা। দয়ানন্দ গেলেন দক্ষবালার কাছে, দক্ষবালা তাঁকেও অপমান করল। ভীষণ চটে গিয়ে তিনি মামলা দায়ের করলেন ভুবনেশ্বরকে দিয়ে। আদালতেও মারধরের কথা বলেছিল মল্লিকা, কিন্তু আদালতের রায়ে যখন শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো তখন সে জানাল, মারধরের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা. স্বামী তাকে খুব ভালবাসে—তবু সে সেখানে যেতে চায়না. কারণ—"অসুখের সময় ছেলে পেটে এসেছিল. মরতে বসেছিলাম। এ শরীরে আমি আর ছেলে চাইনে—ছেলে আমি পেটে ধরতে পারব না। রক্ষে করো আমাকে তোমরা।"

স্বামী মানেই সন্তান-সম্ভাবনা এবং তার অর্থই অবর্ণনীয় কষ্ট—সুতরাং মল্লিকা শ্বশুরবাড়ি যেতে চায় না। একটি সরল গ্রাম্যবধূর এই মানসিকতা যেমন বাস্তব তেমনি অকৃত্রিম—জগদীশ গুপ্ত তাঁর প্রতিভার রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করে গ্রাম্যবধূর মনের এই দুর্ভেদ্য অঞ্চল স্পষ্ট করে তুলেছেন।

[ছয়]

জগদীশ গুপ্তের সবচেয়ে সমর্থ দুটি উপন্যাসের কথা আমরা এখনো আলোচনা করিনি। এ দুটি উপন্যাস 'লঘু-গুরু' এবং 'অসাধু সিদ্ধার্থ'। দুটি উপন্যাসকেই বাংলা কথাসাহিত্যের দুটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি বলা চলে। আলোচনায় এ দুটি উপন্যাসকে অগ্রাধিকার না দেওয়ার উদ্দেশ্য, জগদীশ গুপ্ত পাঠকের নির্মম ঔদাস্যে প্রায় বিস্মৃত হয়ে এলেও যেটুকু আলোচনা এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে তা এ দুটিকে আশ্রয় করেই। 'লঘু-গুরু'-র বিরূপ সমালোচনা করে তার সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য জাগ্রত করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। উৎসাহী পাঠক 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় তা দেখে নিতে পারেন। 'অসাধু সিদ্ধার্থ'

সম্পর্কে খুব সুচিন্তিত বিশ্লেষণ করেন জগদীশ গুপ্তের প্রথম নিষ্ঠ সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'লঘু-গুরু' বা 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাস দুটিকে ঠিক কী জাতীয় উপন্যাস আখ্যা দিলে তাদের প্রতি স বিচার করা হয় জানি না. আমি মনে করি এরা জীবন-তৃষ্ণামূলক উপন্যাস ; এমন কি 'রতি ও বিরতি'-ও। একটা মানুষ আস্তে আস্তে কেমন করে ভিখারী হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যাবার পরও বাঁচবার দুরন্ত আগ্রহ কেমন করে তাকে নিরন্তর চাবুক মেরে সজাগ করে রাখে—জগদীশ গুপ্ত 'রোমন্থন' উপন্যাসে অভয়ের মধ্য দিয়ে তা দেখিয়েছেন, 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসের রাম চরিত্রের মাধ্যমে সে চিত্র আরো ভয়াবহ এবং নির্মম। বাংলা কথাসাহিত্যে এর বিশেষ তুলনা আছে বলে মনে হয় না—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' নামে একটি ছোটগল্প এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কোন সিনেমা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি উপন্যাস (প্রায় পঁচিশ বছর আগে প্রকাশিত, নাম মনে পড়ছে না) ছাড়া আর কোন গল্পের কথা মনে পড়ে না। সামাজিক অসঙ্গতির প্রতি ইঙ্গিত তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সচেতন ভাবে সেদিকে অঙ্গুলি সংকেত করেন না জগদীশ গুপ্ত—তাঁর নির্মোহ মানসিকতাই উপন্যাসটিকে আরো নির্মম করে তোলে।

'লঘু-গুরু' উপন্যাসও উত্তম নামে এক গণিকার জীবনতৃষ্ণার ইতিহাস। নিজের জীবন আবার নতুন করে সৎ ও বলিষ্ঠভাবে শুরু করা যায় না, এ বোধ তার ছিল। কিন্তু মানুষকে খেলিয়ে শয়তান করে তোলবার পরিবর্তে একটা নতুন খেলা বোধ হয় সে স্বাদ বদলের জন্যই শুরু করেছিল—"মনে মনে সে কল্পনা করিত, বিপরীত পথে চলিয়া শয়তানকে শাসন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেও না জানি কত আনন্দ।"

সেই কারণেই শয়তান বিশ্বম্ভরের সঙ্গে তার ঘরবাধা এবং কন্যা টুকীর প্রতি তার অপার স্নেহ। টুকীকে আশ্রয় করেই এক পরোক্ষ জীবনতৃষ্ণা মেটাতে চেয়েছে সে। টুকীকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, সুপাত্রস্থ করার চেষ্টা করেছে, তাকে সৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। কাজটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন। আমাদের সমাজে একটি গণিকার মেয়ের সৎ জীবনে প্রত্যাবর্তন প্রতিষ্ঠিত করার মতো শক্তির অভাব নেই। জগদীশ গুপ্তের প্রধান শক্তি এক নির্মম কুচক্রী নিয়তি, উত্তমের সব সাধনা যে ব্যর্থ করে দেয়। ভালভাবে বিবাহাদি নিষ্পন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত গণিকাবৃত্তির পথেই এগিয়ে যেতে হয় টুকীকে, অথবা 'ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে' হারিয়ে যেতে হয়।

'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের নটবরের জীবনতৃষ্ণা আরো তীব্র, আরো বিস্ফোরক। নটবর জানে, জন্মেছে যখন বেঁচে থাকার অধিকারও তার আছে সে যেমন করেই হোক। তার যুক্তি, "জীবনযুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কীট-পতঙ্গে আছে, উদ্ভিদেও আছে—সেটা বিধিদত্ত প্রেরণা। তবে আমি মানুষ হয়ে কেন টিকে থাকতে চাইব না ?"

চেয়েছে বলেই, এমন কোন কাজ নেই যাতে সে আপত্তি করেছে—মুদিখানার দোকানে ফাইফরমাস খাটা, সখের থিয়েটারে যোগদান, বৃদ্ধা বারাঙ্গনার 'শয্যাচর' হওয়া, তারই অর্থে পাপের ব্যবসা চালানো—সব কাজই সে করেছে। এমনি করেই আসল সিদ্ধার্থবাবুকে সে একদিন আর্তের রক্ষায় জীবন দিতে দেখেছে। "এখন তাহারই লাঠি আর নাম গ্রহণ করিয়া তাহারই কথা উচ্চারণ করিয়া সে বেড়াইতেছে।" এতে কোন অন্যায় সে দেখে না, কারণ "কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ রং বদলায়; আমি একটু নাম বদলেছি"; নটবরের জীবনে একটিই মন্ত্র, তাকে বাঁচতেই হবে।

নটবরের এই জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা সহসা একদিন শুদ্ধ জীবনাগ্রহে রূপান্তরিত হয়। অজয়ার প্রেমই সেই যাদু-কাঠি যার স্পর্শে সৎ জীবনাচরণে সে আগ্রহী হয়ে ওঠে, শুরু হয় তার সিদ্ধার্থ-সাধনা।

শেষ পর্যন্ত সেই সৎ জীবনে সে অবশ্য প্রবেশ করতে পারেনি, তার সিদ্ধার্থ-সাধনা সফল হয়নি। হয় না, সে কথা জগদীশ গুপ্তের পরিচিত পাঠক জানেন; এবং হয় না যে এটাই সত্য।

উপন্যাস দুটিকে উপন্যাস হিসাবেও যে মহৎ বলে স্বীকার করা যায় তার প্রধান কারণ—একটি সুক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব নয়. মানসিকতার চকিত বিশ্লেষণ নয়, বাস্তব জীবনের খণ্ডাংশের উপস্থাপনও নয়, এখানে জগদীশ গুপ্ত একটি সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, অখণ্ডভাবে তাকে অবলোকন করবার মতো মনঃসংযোগী হয়েছেন। গণিকাবৃত্তি থেকে সংসার জীবন যাপনের সংকল্প উত্তম কেন নিয়েছিল. টুকীকে একটি স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন সে কেন দেখেছিল—তার এই অখণ্ড জীবনসাধনার সামগ্রিক পরিচয় 'লঘু-গুরু' উপন্যাসে আছে। একই ভাবে জারজ সন্তান নটবরের সমগ্র জীবনবৃত্ত এবং প্রেমের মন্ত্রে তার সৎ জীবনাগ্রহ সঞ্চারের বিশ্বাসযোগ্য কারণ তিনি দেখাতে পেরেছেন। এজন্যই জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস-কর্ষণায় তারা দুই শ্রেষ্ঠ ফসল।

টুকী শুদ্ধ জীবন লাভ করেনি, উত্তমের সাধনা সফল হয়নি, অজয়ার সহানুভব সমর্থনে যে সৎজীবনে প্রবেশাধিকার পেতে পারতো তাকেও মাথা নীচু করে চলে যেতে হয়েছে অন্ধকারের পথে—যে অন্ধকার জগদীশ গুপ্তের রচনাব প্রায় প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

কেন তারা তাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেনি সে কথা ব্যাখ্যা করার দায় জগদীশ গুপ্তের নয়। "ভবিষ্যৎ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে"—এই তাঁর আবিষ্কার, এই তার অভিজ্ঞতা; এবং এটাই সরল সত্য। জীবন কেমন হওয়া উচিত ছিল, কেমন হলে সুন্দর হতো, কেমন হলে ভালো হয়—এসব কল্পনায় উৎসাহিত হননি তিনি, জীবন প্রকৃতই কী রকম সেই সরল সত্যই তিনি উপস্থাপিত করেছেন। সেই কারণেই বাংলা কথাসাহিত্যের উত্তরাধিকার তিনি বর্জন করতে পারেন অনায়াসে, পাঠকের ঔদাস্য ও বিস্মৃতি সহ্য করেও। বাস্তবতার এক তীব্র বোধ, নির্মোহ জীবনদৃষ্টি এবং অনুচ্ছ্বসিত প্রকাশরীতিই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট করে

রেখেছে। সেই কারণেই তাঁর উপন্যাস-সৃষ্টিও তাৎপর্যপূর্ণ, আংশিকতার কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও।

[সাত]

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের প্রধান আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দুলালের দোলা' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি যে কথা বলেছেন, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস সম্বন্ধেই সে কথা প্রযোজ্য—প্লট রচনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এ কথা মুখে বলা যতো সহজ কাজে করা যে ততোটাই কঠিন, তার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। আপাতত একটিই স্মরণ করা যাক। শরৎচন্দ্র তাঁর একাধিক চিঠিপত্রে লিখেছেন, তিনি কিছু চরিত্র তৈরি করে নেন—গল্প নিজে থেকেই এসে পড়ে। অথচ একমাত্র 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস ছাড়া, সর্বত্রই নিপুণ প্লট নির্মাণ তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং প্রধানত এই কারণেই তাঁর উপন্যাস আকর্ষণীয়।

জগদীশ গুপ্ত প্রকৃতই প্লট নির্মাণ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য সন্ধান করা যায় বাংলাসাহিত্যে প্রথম চৌধুরী এবং ইংরেজি সাহিত্যে চেস্টারটনের। তাঁর সমগ্র উপন্যাস-কৃতিতে সুগ্রথিত প্লটের দৃষ্টান্ত নগণ্য। 'লঘু-গুরু', 'সুতিনী' এবং 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে যেহেতু এক একটি জীবনবৃত্ত তাঁকে রচনা করতে হয়েছিল, প্লট সম্বন্ধেও তাকে যত্নবান হতে হয়েছে। তাঁর অন্যান্য অনেক উপন্যাসের প্লট বিশ্লেষণ করতে গেলে উৎসাহী সমালোচকের মনে হতে পারে, এগুলি ছোটগল্পেরই সম্প্রসারিত রূপ। চরিত্রের গূঢ় উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্ব সমাপ্ত হয়েছে মনে করেন বলেই গল্পের আকর্ষণকে তিনি নির্মম ভাবে উপেক্ষা করেন। 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসে কৃষ্ণার আহ্বানে নন্দের একটি নিষিদ্ধ প্রেমলীলার মুখরোচক কাহিনী উপভোগ করবার জন্য পাঠক যখন উন্মুখ, সেই মুহূর্তে আকস্মিক ভাবে কৃষ্ণার মায়ের আবির্ভাব ঘটে এবং তাতেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

সম্ভবত এই কারণেই, প্লট নির্মাণের যে স্থূল বিভাগগুলি করা হয়, সেই বিভাগ অনুযায়ী জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থনকে বলতে হবে সরল প্লট। কোন কোন উপন্যাসে তিনি আপাত-বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কাহিনীর সমন্বয়ে একটি উপন্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন—যথা 'যথাক্রমে', 'তাতল সৈকতে', 'কলঙ্কিত তীর্থ'। এই ধরনের প্লটকে প্রথাগত বিভাগে চিহ্নিত করতে হলে বলতে হবে তারা যৌগিক প্লটের উপন্যাস।

চকিত আরম্ভ, আকস্মিক পরিসমাপ্তি এবং সংক্ষিপ্ত কথন জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের তিনটি সাধারণ ধর্ম। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের কথাই স্মরণ করা যাক। উপন্যাসের আরম্ভ এই ভাবে—"সিদ্ধার্থ তার নামই নয়। নাম তার নটবর; নিরলঙ্কার নটবর—ঘোষ বোস গুহ মিত্তির ইত্যাদি কুলাধিকারীর পরিচয় একটিও তার নামের পশ্চাতে কখনো ছিল না।"

উপন্যাসের সমাপ্তিতে প্রেমের প্রত্যাখ্যান কিম্বা অজয়ার সঙ্গে নটবরের শেষ বিচ্ছেদের কোন রোমাণ্টিক প্রসঙ্গ নেই। আসল সিদ্ধার্থ বেঁচে আছে কিনা এই

প্রশ্নের উত্তরে—"নটবর যাইতে যাইতে মুখ না ফিরাইয়াই বলিয়া গেল—না"। এবং এতেই এই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের সমাপ্তি রেখা টানা হয়েছে। সম্ভবত এই পরিসমাপ্তি থেকেই সংক্ষিপ্ত কথনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে তবু এই প্রসঙ্গে 'লঘু-গুরু' উপন্যাস থেকে এর আর একটু পরিচয় দিই। এই উপন্যাসে টুকীর বাল্য ও কৈশোর-পর্বের বর্ণনা দীর্ঘ ছিল বলেই আমরা আশা করেছিলাম তার বিবাহ-প্রসঙ্গও বিস্তারিত হবে। কিন্তু সে ব্যাপারে জগদীশ গুপ্ত মাত্র দুটি বাক্য ব্যয় করেছেন—"এই ছেলে অর্থাৎ লোকটির সঙ্গেই টুকীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। টুকী শ্বশুর ঘরে গেল।"

জগদীশ গুপ্তের ভাষারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি, যেন অনেকটা সংবাদ পরিবেষণের ভাষা। 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই এর চারিত্র কিছুটা বোঝা যাবে ঃ

"১। গুরুদাস বাবু—উত্তর ভারতের এক প্রাদেশিক রাজধানীতে ইনি সুবৃহৎ চাকুরিয়া··· ২। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু—বড় কণ্ট্রাক্টর ; রায় বাহাদুর বলিতে সেখানে তাঁহাকেই বুঝায় ;··· ৩। মৃত্যুঞ্জয় বাবু—বড় উকিল, কলিকাতায় আইনের ব্যবসা করেন এবং ৫০১ টাকার কমে মক্কেলের দিকে চোখই মেলেন না।"

'রতি ও বিরতি' উপন্যাসের একটি বেদনার্ত প্রসঙ্গের বর্ণনাতেও আমরা পাই একই অনুচ্ছ্বসিত ভঙ্গি—"বিষহর অব্যর্থ মন্ত্র জানে বলিয়া প্রকাশ এমন লোকও একজন আসিল।···মন্ত্র প্রয়োগের মধ্যেই লব প্রাণত্যাগ করিল—লোকে অজস্র জল আনিয়া মৃত বালকের মাথায় ঢালিতে লাগিল—উঠানে জলের স্রোত বহিতে লাগিল—মানুষের পায়ে পায়ে জল কাদা হইয়া উঠিল।"

সাধারণ ভাবে জগদীশ গুপ্তের ব্যবহৃত বাক্যগুলি আকারে ছোট, কিন্তু কয়েক স্থানে তিনি জটিল ও দুরান্বয়ী—বাক্যের আশ্রয়ও নিয়েছেন। সে সব ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের নিপুণ প্রয়োগে এবং কর্মপদের সংস্থান-বৈচিত্র্যে সচেতন ভাবে এক অপরূপ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। ব্যাকরণ সম্বন্ধে তিনি সতর্ক ছিলেন খুব বেশি, কিন্তু সেই কারণেই লুপ্ত অক্ষরের স্থানে ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই দেখি। আধুনিক পাঠকের কাছে কখনো তা প্রায় মুদ্রাদোষের মতো মনে হতে পারে, যেমন—

"আমি ত' তা' বলি নি'রে। আমার ত' তোরাই সব।

অখাদ্য খেয়ে' খেয়ে' বাবার ত' বদহজমের অসুখই ধরে' গেছে।"

এই রকম মুদ্রাদোষ মনে হবে ত'র রচনায় মাঝে মাঝেই কিছু ফুটকির ( ) ব্যবহার এবং সংযোজন অব্যয় হিসাবে 'আর' শব্দের অতি প্রয়োগ।

জগদীশ গুপ্তের আঙ্গিক তাঁর বিষয়বস্তুর মতোই বিশিষ্ট, সুতরাং তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। মোটামুটিভাবে এইটুকুই বলা যায় যে, প্রথাবিরোধী বিষয় বেছে নিয়ে তিনি যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন, প্রথাবিরোধী মৌলিক ভাষায় তার সমর্থ বাক্‌ প্রতিমা নির্মাণেও তিনি সফল হয়েছেন। আমাদের বিস্মিত হতে হয় আরো এই ভেবে যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেও তিনি পরিহার করে চলেছেন। রাবীন্দ্রিক ভাষাভঙ্গি এখনও আমাদের অলিখিত আদর্শ এবং ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করা অদ্যাবধি দুঃসাধ্য, এই কথাটি স্মরণ রাখলে জগদীশ গুপ্তের এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে মূল্যবান—সাহিত্যিক কারণে তো বটেই, ঐতিহাসিক কারণেও।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মর্মে ও মায়ায়

একালের সমঝদার বলেছিলেন, মেহনতী গোলাপ নয়, তিনি রাতে ফোটা ফুল। কখন যে সুরভিতে সৌন্দর্যে এত সম্পূর্ণ হলেন বোঝা গেল না! রবীন্দ্রনাথ যেন নির্ঝরিণীর স্বপ্নভঙ্গ। নিস্ফীত থেকে নিঃসীম মোহানা। কত গিরি-কন্দর-মাঠ-উপবন-দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে অকূল পাথারে এসে পেঁাচেছেন। সে পথে শাল-পলাশে ভুবনডাঙার মাঠ আছে, পূর্ব-পশ্চিম-বেছান ডালহৌসির পর্বতরাজি আছে, শেষরাত্রির সেজহাতে উপনিষদের পথিক দেবেন্দ্রনাথ আছেন, কাশের কিনারায় সুবিপুল পদ্মা আছে। তারপর অবারিত বিশ্ব।

আর এখানে শুধু ঘেঁটু-রাঁংচিতার গুল্ম। দুহাত বাড়ালে ধরা-পড়া ইছামতী, উদাস বাউলের মত পথ।

তাই বা কতটুকু পেয়েছেন? চোদ্দ বছর থেকে তো গ্রামছাড়া। অপ্রশস্ত মফস্বল ও ভ্রূক্ষেপহীন কলকাতার মেস। শেষ জীবনে ঘাটশিলা-সারাণ্ডার বন।

কিন্তু তার আগেই তো দেখেছেন কলকাতার ক্ষত-বিক্ষত মুখ। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। মূল্যস্ফীতি-মূল্যহীনতায়, বেকারে-বঞ্চনায়, শ্রেণীতে-সংগ্রামে কলকাতার দিনরাত তো দিনের চেয়ে দহমান, রাতের চেয়ে রহস্যময়। পরিজন নেই, প্রকৃতি নেই, পাথেয় নেই। কয়লাকুটি আর নারীমেধ, মহানগর আর পাঁক, বিবাহের চেয়ে বড় আর বেদে সে সময়ের প্রগতি-শাস্ত্র, মুখপত্র।

তারই মাঝখানে সময়-সাহিত্য-সমস্যার সঙ্গে একান্তই সম্পর্কহীন সোনারপুর-হরিনাভি স্কুলের গ্রাম্যমাস্টার অনুরোধে নয়, অনুপ্রেরণায় নয়, স্রেফ মান-বাঁচানর চেষ্টায় একটি গল্প লিখলেন। কবেই বা সাহিত্য-চর্চা করেছেন, লেখার চর্চা করেছেন, পত্রিকাচর্চা করেছেন—কিছুই জানা নেই।

এমন গল্প যে লেখকের কাছে প্রত্যর্পিত হবে এতো স্বতঃসিদ্ধ; তাও প্রবাসীর মত কাগজ থেকে। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যতই অভিমানাহত হয়ে বলুন না কেন, প্রকৃষ্ট-রূপে বাসি—আসলে প্রবাসী প্রতিষ্ঠিত অভিজাত লেখকদেরই পত্রিকা। গোষ্ঠীপতি রবীন্দ্রনাথ থেকে গোষ্ঠীবিরোধী সজনীকান্ত—কে না ছিলেন সেখানে?

অঘটন বলবেন, না ন্যায্য ঘটনা বলবেন? আজও তো ঘটে। সহকারী সম্পাদকের চিঠি এল—লেখাটি মনোনীত হয়েছে, সামনের মাসে বেরবে। ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে প্রবাসীতে তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিত' বেরল। উপেক্ষিত না অপেক্ষিতা? রৈখিক না চক্রাকার? বিভূতিভূষণের সাহিত্যের শুরু না সম?

সহকারী-সম্পাদক কী দেখেছিলেন, তিনিই জানেন। বোধ হয় নিজেকে দেখে-ছিলেন। ক্ষত-বিক্ষত-নিঃস্ব-বিমূঢ় সেদিনের বাঙলাদেশের সম্ভবত একটা পথ তিনি

দেখেছিলেন এই সহজ সর্বকালের সর্বজনের গল্পে। মাটি মানুষ আর মহত্ত্ব বাদ দিয়ে কী জীবন হয় ? কবে যে সে তারই গান গলায় নিয়ে পথে বেরিয়েছিল। নিরভিমান নিখিলবাসী গ্রাম্য একটি শিক্ষকের কণ্ঠে সময়কে সচকিত করে জাতিস্মরের মত সে গান বাজল। প্রত্যুষে তখন অধিক লোক জাগেনি। তবু কারা বললেন, কে গায় ওই ?

নজরেও পড়েছিলেন। আবার পড়েনওনি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, আরও গল্প দিন। গল্পের দপ্তর বন্ধ করে তিনি তখন গোরক্ষণী সভার প্রচারক হয়ে সুদূর চট্টগ্রামে।

কিন্তু এমন মানুষের বাঙালিকে, আজ বোধ হয় আর বাঙালি না বলে বিশ্ববাসী বললে ঠিক হয়, নজরবন্দী করতে বেশি সময় লাগল না। বছর কয়েক হবে। তারপরেই ১৯২৯-এ পথের পাঁচালী বেরল।

বই হলে বোধ হয় পথের পাঁচালী পড়া শেষ হত। কিন্তু সত্যিই কি পথের পাঁচালী পড়া শেষ হয় ? গ্রন্থের শেষ হয়, হৃদয়গ্রন্থেরও কি ? জীবনে যত কাজের জনপদ থেকে মানুষ উঠে এসেছে—বিস্ময় লাগে, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরে তাঁরা একখানা বইও যদি পড়ে থাকেন, তাহলে তা বোধ হয় পথের পাঁচালী।

পথের পাঁচালী বাঙলাদেশের এক সেতুবন্ধ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর মত বাঙলাদেশের বিচিত্র কর্মরত অঞ্চলবাসীর আনাগোনা এই পথের পাঁচালীকে ঘিরে। কিশোর থেকে কৈশোরবাসী বাঙালির সঙ্গে পথের পাঁচালীর কখনও পরিচয় ঘটেনি, এমনটি বড় শোনা যায় না।

সাহিত্যের যেন শ্রীক্ষেত্র। স্বল্পাক্ষর থেকে শিক্ষিত, ব্যবসায়ী থেকে সাহিত্য-ব্যবসায়ী পথের পাঁচালীর প্রসঙ্গকে বিস্মরণের রক্তের দোলায় বহন করে বেড়ান না, এমন মানুষ আপনার চোখে পড়েছে ? সবাই এত মুগ্ধমতি, স্মৃতিসুখী, স্পর্শকাতর !

শৈশবসাথীর মত এ বই কোনদিন ছিল না, থাকবে না, ভাবতেই পারা যায় না।

অবশ্য ভাল বই কেন, ভাল লাগা মাত্রেই তাই। মানুষ-মূর্তি, গ্রন্থ-গান, নৃত্য-চিত্র, পরিবেশ-প্রহর সবই যেন 'শিশুকাল হইতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে লেহা'। ভালবাসার নিবিড় মুহূর্তে কোন নির্বাসিত হৃদয়ের না মনে হয়, অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর পুরুষটির সঙ্গে যদি একাত্ম হতে পারতাম !

পথের পাঁচালীর ক্ষেত্রে যেন একটু বেশি। তার কারণ বোধ হয়, পথের পাঁচালী একান্তই পাঁচালী—অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ওঠা অনাড়ম্বর, মেঠো সুরের গান। হৃদয় থেকে উঠে হৃদয়েই গিয়ে পৌঁছয়। অমোঘ অব্যর্থতায় বিদ্ধ, বিহ্বল, বিসর্পিত করে।

লিখেছেন, নভেলে শৈশবকালের স্মৃতির পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র। শুধুই তাঁর, না, ভুবনব্যাপী কিশোরের ? আর সেই কারণেই বোধ হয়, দেশ-বিদেশের বিচিত্র প্রান্ত থেকে উঠে আসা কিশোরকুল স্মৃতির পথ বেয়ে পথের পাঁচালীর পারাবারে

এসে মিলিত হয়। শুধু বাঙলায় কেন, ইংরেজি ভাষায় অনূদিত পথের পাঁচালী পৃথিবীর অন্যতম বেস্ট-সেলার।

অথচ কী আশঙ্কাই না ছিল অনুবাদ নিয়ে। সরস্বতী পুজোর পড়ন্ত বিকেলে স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতায় মায়াময় প্রকৃতির মাঝখানে বাবার সঙ্গে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাওয়া, কী অপরাহ্নের রোদ-পড়া প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা—ঘরে তখন ঘন আগাছা, লতাপাতার চাটাইয়ের, ছেঁড়া-খোঁড়া বই-দপ্তরের, কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়ার জটিল গন্ধের সৃষ্টি করত—মনে হয়েছিল বাঙলাদেশের হৃদয় থেকে এখন লোকায়ত গহীন গাঙের ছবি ও গান ওরা কেমন করে বুঝতে পারবে?

সব আশঙ্কা নিরসন করে সাত সাগর তের নদীর পারের মানুষ যেন বলে উঠল, কেন পারব না? জগৎ পারাবারের তীরের শিশু যে আমরা!

বুঝি না সৃষ্টির মাঝখানে শিশুর মত এত প্রাচীন সমঝদার আর কেউ আছে কিনা! মানুষের কত পরিবর্তন হয়েছে, শিশুর নয়। হৃদয়ের কথা বয়স্ককে বিস্মরণের অনেক পরত সরিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে বোঝাতে হয়। কিন্তু শিশুর বিস্মৃতি কোথায়? সবটাই তার সদ্য বিকশিত।

স্মৃতির স্বীকারোক্তিব চারপাশে কত কথা যে ভিড় করে আসে! মনে হয়, এ যেন লেখকের একটা bid-out-plot। এত দুর্নিরীক্ষ্য, দুরার্পিত, বিমিশ্র, এত গহন! অধ্যায় তো নয়, যেন অনুভবের পলকাটা কাচ, সপ্ত-আলোর বিচ্ছুরণ। রঙের রোশনিতে রঙ্গনাথের কথাটাই কখন যেন ভুলে যাই।

মনে পড়লে ভাবি, স্বীকারোক্তি যাঁর শৈশবস্মৃতির পুনরাবৃত্তি দিয়ে, উক্তি তাঁর বল্লালী-বালাইয়ে কেন? নিদেনপক্ষে উত্তর সপ্ততিবর্ষের পূর্বের কথা হবে। সময়ের যাত্রা কখন যে লেখকের মায়াবী লেখার স্পর্শে অনাদি অতীত হয়ে দাঁড়ায়! প্রহর পরিজন পরিবেশ ছাপিয়ে মনে হয়, বুঝি-বা এক পরিবর্তনমান কাল।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে! শাঁখারী পুকুরে নীল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল। কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী হাজিয়া মরিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চলস্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কাল-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জনসন্ টমসন্ সাহেব, কত মজুমদারকে ভাসাইয়া লইয়া গেল!

শুধুই ইন্দির ঠাকরুন এখনও বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু শৈশবস্মৃতির পুনরাবৃত্তির সঙ্গে, পথের পাঁচালীর মুসাফিরের সঙ্গে, অপুর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

ইন্দির ঠাকরুন অপুকে দেখেছে, কিন্তু অপু তো নয়। সাল তারিখের অস্পষ্ট রেখার পথ হাঁটতে হাঁটতে অপুর তখন বছর তিনেক বয়েস, ইন্দির ঠাকরুন যখন

মারা যায়। কিন্তু ঐ বয়সের দেখা তো অদেখাই। বইয়েতে অপুর ইন্দির ঠাকরুনের স্মৃতির কোন উল্লেখ পাই না, বরং বছর নয়েকের দুর্গার পাই। বড় মমতায়, সকরুণতায়, অশ্রুময় ইন্দির ঠাকরুন।

তাহলে কি বল্লালী-বালাই একান্তই লেখকের অপ্রয়োজনীয় উপকথন? মুগ্ধ করে, কিন্তু মৌলিক নয়। তবে কি সে অনুদ্দিষ্ট, অনঙ্গীয়, অতীর্থঙ্কর?

আসলে বল্লালী-বালাই পথের পাঁচালীর এক বিচিত্র চালচিত্র, আগত আম-আঁটির ভেঁপুর অনাদি অতীত। গ্রামসীমাবদ্ধ নিশ্চিন্দিপুরের নিঃসঙ্গ দিকচক্রবাল—উত্তরে তার নবাবগঞ্জের হাট, দক্ষিণে ধলচিতের মোহানা। দুইই যোজনব্যাপী দূরত্বে সমর্পিত।

নিশ্চিন্দিপুরের ঘন রঙের মাত্রা বল্লালী-বালাই। কপালকুণ্ডলার যেমন রাত্শেষের দিগন্তব্যাপী কুয়াশা, দুর্গেশনন্দিনীর যেমন দিনান্তের ঘনায়মান ছায়ায় চক্রবলয়িত প্রান্তর, ভার্জিনিয়া উলফের Waves-এর যেমন সীমারেখাহীন আকাশ-পাথার—পথের পাঁচালীর তেমনি অনাদ্যন্ত অতীত বল্লালী-বালাই। অতিরিক্ত নয়, সংশ্লিষ্ট, সম্বন্ধ অবিরল।

কী সুচিক্কণ, কী সুবিশাল, কী সকরুণ—সহজ এই অতীতের আনাগোনা! নিপুণ কারিগরের মত, দক্ষ সুরকারের মত, রসনাধীশ রাজকবির মত সৃজনের কী পারঙ্গমতা!

ছটি মাত্র অধ্যায়। তবু নভস্তল থেকে মানবের সুনিভৃত অন্তরেব আভাস আনে সে। রোমান্সে-রোমান্টিকতায়, মেঠো কথায়-মহত্ত্বে বল্লালী-বালাই এত বাক ও অবাকের চমক আনে! অত্যন্ত সাধারণ. অননুমিত, আবিষ্ট ও উৎক্রান্তিময়। অন্যমনস্ক সচরাচরের যেন দৈনন্দিন কাহিনী!

নিশ্চিন্দিপুরের উত্তরপ্রান্তে হরিহরের কোঠাবাড়ি। দুচার ঘর শিষ্য-সেবক, সামান্য জমিজমা—তাতে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে কোনমতে সংসার চলে। আর সেই পরিত্যক্ত ভিটের এক কোণে হরিহরের দূর সম্পর্কের অনাদৃতা ভগিনী ইন্দির ঠাকরুন। বাঁশের আলনায় থান-দুই ময়লা ছেঁড়া থান, দৃষ্টিশক্তির অভাবে গেরো দিয়ে বাঁধা, একটি ছেঁড়া মাদুর ও কতক কাঁথা। পেতলের চাদরের একটি ঘটি—রাতের আহার চালভাজার পাত্র, গোটা দুই মাটির ছোবা—কোনটাতে একটু নুন, সামান্য খেজুরের গুড়। সর্বজয়ার সংসার থেকে সময়মত অপহৃত।

দিনের আলোর ছেঁড়া কাঁথা চন্দ্রালোকে কখন লক্ষ টাকার আস্তরণ হয়ে দেখা দেয়—জ্যোৎস্নাঝরা নারকেল-শাখার মৃদু কম্পনে ঘরের দাওয়ায় ভাইঝিকে রূপকথা শোনাতে শোনাতে সুখে বুড়ির ঘুমের আমেজ আসে।

হরিহরের দুরন্ত দরিদ্র সংসারের অপ্রার্থিত অংশভাক, অনধিকারী ইন্দির ঠাকরুনকে সর্বজয়া দেখতে পারে না। আজকাল আরও মনে হয়, ঐ সাতকুলখাগী বুড়ি ডাইনিটাকে তার মেয়ে যেন বেশি ভালবাসে, তাকেই যেন পর করে দিচ্ছে। হিংসে তো

হয়ই, রাগও হয়। দুবেলা কথায় কথায় সময় থাকতে বুড়িকে সে পথ দেখবার ইঙ্গিত দেয়, যদিও সে জানে না পথ কোনদিকে—জ্ঞান হওয়া অবধি সত্তর বছরের মধ্যে ইন্দির ঠাকুরন তার সন্ধান পায়নি, এতকাল পরে কোথায় তা মিলবে তাও ভেবে স্থির করতে পারে না।

আসলে অভিমানে-আকর্ষণে সে কতবার যায় আসে। দশ-বার দিন বাদে নতুন জায়গা বাড়ির অপরিচিত লাগে, স্বস্তি পায় না। মনে হয়, এ ঠিক তার নিজের ঘর নয়।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না—তাহার নিজের এক মেয়ে ছিল. নাম ছিল বিশ্বেশ্বরী। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ বছরের নিভিয়া যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—এক মুহূর্তে সচকিত আগ্রহে শেষ হইতে চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

প্রত্যাগতা অবাঞ্ছিতাকে সর্বজয়া বলে. ঐ এলেন। যাবেন আর কোথায়? যাবার কি আর চুলো আছে এই ছাড়া?

বুড়ি একথা হজম করে। এরকম অনেক কথাই তাকে দিনের মধ্যে দশবার হজম করতে হয়। সেকালের ছড়াটা সে ভোলেনি ঃ

লাথি ঝাঁটা পায়ের তল,
ভাত পাথরটা বুকের বল—'

পড়তে পড়তে মনে হয় যেন শরৎচন্দ্রের অসংকলিত উপন্যাসের কোন অধ্যায়।

বাড়ি আসিলে খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ি হাসিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কতদিন পরে ভিটায় চাঁদ উঠিয়াছে। বুড়ি সকালে উঠিয়া মহা খুশিতে ভিতর উঠান ঝাঁট দেয়। আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করে। দুপুরে আহার করিয়া খিড়কির পিছনে বাঁশবনের পথের উপর বসিয়া কঞ্চি কাটে। দুর্গা আসিয়া কাছে বসে, সেগুলি বাছিয়া বাড়ির মধ্যে রাখিয়া আসে। কঞ্চি কাটিতে কাটিতে মধ্যাহ্নের অলস আমেজে শীতল বাঁশবনের ছায়ায় নানা কথা মনে আসে

কী মায়াস্পর্শে পঁচাত্তর বছরের গাল-তোবড়ান-বৃদ্ধা সপ্তদশী উজ্জ্বল তন্বী তরুণীতে পরিণত হয়। ভরন্ত তিরিশটি বছরের যৌবনে কৌলীন্য-প্রথা অনুমোদিত মাত্র তিনটি বারের দেখা। তারপর এক সন্ধ্যালোকে ইছামতীর জলে হাতের লোহা, রুপোর পৈছেজোড়া, সিঁথির সিঁদুর বিসর্জন দেওয়া। ইন্দির ঠাকরুনের কী সকরুণ বৈধব্য-বেশ! কিন্তু তাও কী সম্ভ্রমময়।

ঐ রায়বাড়ির মেজ বৌ জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, তেমন স্বভাব চরিত্র। নতুন যখন ইন্দির ঠাকরুন বিধবা হইল, তখন প্রতি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জল-

খাবার গোছাইয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কোথায় গেল কে ? সেকালের আর কেহ বাঁচিয়া নাই যার সঙ্গে সুখদুঃখের দুটো কথা কয়।

কখনও রোমাঞ্চকর রুদ্ধশ্বাস রোমান্সের মত গল্প। হরিহরের বংশলতিকার উজান বাইতে বাইতে বিগত শতাব্দীর বেণ্টিঙ্কের ঠগী দমনের কথা ওঠে।

বৃটিশ শাসন তখনও বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। বাঙলাদেশের বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি এই পূর্বপুরুষ সঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাহার অধীনে বেতনভোগী ঠাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুরের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা।

শোনা যায়, পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্ত্তিক মাসের শেষ। কন্যার বিবাহের অর্থসংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন. সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিশপত্র ছিল। ইচ্ছা. পাঁচ ক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রিযাপন করিবেন। কিন্তু আন্দাজ করিতে কীরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্ত্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজাবে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে সূর্যকে ডুবু ডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুরঝি পুকুবের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন. তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায় নাকি সেদিনের দলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া বৃদ্ধ অন্তত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতিমিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে. এবং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অন্যরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ এক সঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জল টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিযা বীরু রায় বাটী চলিয়া গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা না বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী ?

সহসা এমন এক শিহরণকর গল্পে লেগেছে কী মহৎ এক মর্ম্মবস্তুর ছোঁওয়া ! পড়তে পড়তে মনে হয়, এমন লেখক তো রোমান্সের রূপকার নন, মহিমান্বিত জীবনের জাতশিল্পী, গ্রেট আর্টের স্রষ্টা। যে সৃষ্টিতে Wordsworth বলেছেন, ক্ষণস্থায়ী এই কাজ, গতি, শুধু পেশীসঞ্চার, শেষ শুধু ছলনা - সহনই গহন, অতল ও অচঞ্চল, অনন্তেরই অংশভাক।

Action is transitory—a step a blow
The motion of a muscle – this way or that—
'Tis done and in the after-vacancy
We wonder at ourselves like men betrayed ;
Suffering is permanent, obscure and dark,
And shares the nature of infinity.

টলস্টয়ের War and Peace, Resurrection, 'What Men live by', 'Three Hermits' - মহনীয় উপলব্ধি। হৃদয়োত্থিত তাঁর সেই কথা, 'God comes, but comes late'। দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী বিশ্ববিধাতার সেই বিচার নিষ্পন্ন হয় কাশফুলে ভরা চরে বীরু রায়ের পুত্রের মৃত্যুতে।

গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠেকিয়া শিখিলেন, সে অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ডধ্বংকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বিভূতিভূষণ একদা লিখেছিলেন আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগ্রত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, অব্যয়-অক্ষয় তা নয়, তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেন প্রিয়জনের প্রীতির জন্যে।

বল্লালী-বালাইয়ের সেই চন্দ্রাহত রোমাণ্টিকতার রাত, যে রাত সর্বজয়ার-হরিহরের বিবাহের বাসর রাতে আসেনি, এসেছে অতিক্রান্ত, আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত দশটি বছর পরে।

নতুন পশ্চিম হইতে আসিয়া সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শ্বশুরবাড়ি স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিল। ডাকাডাকিতে একটি গৌরাঙ্গী ছিপছিপে চেহারায় তরুণী কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য বাহিরের দরজায় দাঁড়াইল এবং তাহার সহিত চোখাচোখি হওয়াতে সেখান হইতে চট করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—হরিহর ভাবিতে লাগিল মেয়েটি কে? তাহার স্ত্রী নয় তো? সে কি এত বড় হইয়াছে?

রাত্রিতে সন্ধান মিলিল। দশ বৎসর আগেকার সে বালিকা পত্নীর কিছুই আর সুন্দরী তরুণীতে নাই- কে যেন ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া সর্বজয়া খানিকটা থতমত খাইয়া গেল। নব বিবাহিতার সে লজ্জাটুকু তাহাকে যেন নতুন করিয়া পাইয়া বসিল। হরিহরই প্রথমে কথা কহিল। স্ত্রীর ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল—বসো এখানে, ভাল আছ? সর্বজয়া মৃদু হাসিল। বলিল—এতদিন পরে বুঝি মনে পড়িল?

হরিহরের মনে হইল বাঙলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাঁশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহব্যগ্র গৃহকোণ তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনা-সজ্জা সাজাইয়া বৃথা প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিসের সন্ধানেই সে তখন পশ্চিমের অনুর্বর মরু-পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের মত ঘুরিয়া মরিতে দিল।

এক হিশাবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল, সম্মুখে তাহাদের নবজীবনের যে পথ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে গেল—আজ রাতটা হইতেই তাহার শুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে?

দুইজনেরই মনে বোধ হয় অনেকটা অস্পষ্টরূপে একইভাব জাগিতেছিল। দুইজনেই চুপ করিয়া জানালার বাহিরের ফাঁকে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন কোথায় ছিল এই শিশু?

ম্লানায়মান জ্যোৎস্নায় এ কি শুধুই নীরব দুটি তরুণ-হৃদয়ের বিস্ফারিত রহস্য-বিস্ময়, না নিখিল যৌবনের স্তব্ধ অনাগত ঔৎসুক্য? বল্লাল্লী-বালাইয়ের এ ছবি কি ছবি না গানের দূরযানী রেশ? কথা? না, কথা ডুবে-যাওয়া ভাবনা? মিলন না রোদনবসন্ত?

বাঙলা সাহিত্য বললে বোধ হয় কম বলা হয় বাঙলাদেশই আগাগোড়া মাতৃস্নেহাতুর।

সব দেশেই বিদ্যমান। শিশুহারা গৃহভূমি মরুভূমি। কলধ্বনিতে, চাপল্যে, অপাপবিদ্ধ অপরাধে সংসার সম্পূর্ণ, আকুল, প্রতীক্ষমাণ। গাম্ভীর্য. জ্ঞান, সচ্ছলতা মানব-সংসারের প্রয়াস। শিশু সেই সংসার-কাননের ফুল—সিদ্ধি, স্বার্থ, সফলতা।

বিদেশি সাহিত্যও এই আনন্দ-নন্দন সংবাদে পরিপূর্ণ। বুঝি-বা সেখানে এই সংবাদের সর্বোপরি ভাষ্যকার ওয়ার্ডসওয়ার্থ, গ্রীম অ্যাণ্ডারসন, ডি লা মেয়ার।

মধুসূদন একদা লিখেছিলেন, ঘুমন্ত শিশুর প্রতি মায়ের যেমন সবচেয়ে ভালবাসা, প্রকৃতি-বালকের প্রতি নিসর্গমাতারও তেমনি সর্বাধিক স্নেহ। **'Him whom she loves loves her idiot Boy.'** কোথাও লিখেছেন জলেঘেরা ভূভাগ, ভূধর, পাহাড়ী ঝরনার গান তোমায় মুগ্ধমতি কিশোরের মর্মে কবে যে গিয়ে পৌঁচেছিল!

নয়তো সেই **Little Mermaid**-এর কুমারী জলকন্যা প্রিয়তম রাজপুত্রের আশায় অনিন্দিত অপ্সরা-কণ্ঠকে চিরমৌনে মিলিয়ে দিয়েছিল, পুচ্ছ পরিবর্তিত করেছিল পদে পদে ক্ষুরধার যাতনায়। পরিশেষে তার পরিত্যক্ততায়। তবু প্রতিদ্বন্দ্বিনী মিলিত-প্রিয়তমের বুকে রুষ্ট ভগিনীদের দেওয়া শাণিত ছুরিকাখানি সে বসিয়ে দেয়নি। নীল সাগরের জল সে নিক্ষিপ্ত নিশিতে লাল হয়ে গিয়েছিল।

জলকন্যা আজ নভোচারিণী। পরী। শুভংকর কাজে হারান মেলে তাই প্রিয়মিলনের আশায় সে এমন করে তিনশ বছর অপেক্ষা করবে।

আজগুবিতে-আদরে শিশুর প্রতি অত্যাচারে কত বই-ই না লেখা হয়েছে—**Alice in Wonderland Gulliver's Travel, Uncle Tom's Cabin, Oliver Twist**।

কিন্তু বাঙলাদেশের শিশুসাহিত্যের সঙ্গে যেন তার কোন তুলনাই হয় না। ছড়া-কবিতায়-কথায় এত মেঘক্রীড়িত, চিত্রময়, পেলব, দর্শনাভিমুখী।

আমাদের সাহিত্যে সময়হারা ছড়া থেকে আগমনী-বিজয়া-বৈষ্ণব কাব্যের সুবিস্তৃত মধ্যযুগের ভূখণ্ড মাতৃস্তনরসে সিক্ত, স্নিগ্ধ—সকরুণ, সকাতর, ঐশী। 'আমার শপথ লাগে না যাইও ধেনুর আগে'; জানি না মায়ের এমন আর্তি আর কোথায়? রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন মা যখন সন্তানের মধ্যে আনন্দের অবধি পায় না, নিরবধি শিশু তখন মাতৃহৃদয়ের উপাসনার সামগ্রী হয়ে ওঠে। ঠিক এমনিভাবে শিশুর অকৃপণ ঐশ্বর্যে, দাক্ষিণ্যে শিশুকে দেখা বাঙলা সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও হয়েছে কিনা বলা শক্ত। মাতৃ-বাৎসল্য বাঙলা সাহিত্যের মত এত সুকোমল না হলেও কোন না কোন রূপে অন্যত্র মেলে, কিন্তু সম্রাট-শিশুর মোহময় মুক্তহাতের দানের পালা অন্য সাহিত্যে মেলে কিনা জানি না—বাঙলা সাহিত্যেও দুর্লভ। এ কোন রহস্যরভসমুখর প্রাণের কলির জিজ্ঞাসা, 'এলেম আমি কোথা থেকে / কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে। / মা শুনে কয় হেসে কেঁদে / খোকারে তার বুকে বেঁধে—ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।'

বল্লালী-বালাইয়ে দারিদ্র্যানিবিষ্ট হরিহরেব ক্ষুদ্র কোঠাঘরে এই অবিরত ঐশ্বর্যে দাক্ষিণ্যরত শিশুদেবতার লীলা। দেবতা ব্যতীত দাক্ষিণ্যের অধিকার কার?

দেশি-বিদেশি শিশুসাহিত্যের সুবিস্তৃত ভূমণ্ডল এতাবৎ মাতৃসমাগমে জনাকীর্ণ। বল্লালী-বালাইয়ের লেখক এতদিনের অনতিলক্ষ শীর্ণ-শিশুভূখণ্ডটুকুকে সমারোহময়, সম্পন্ন, সমর্পণশীল এক রত্নদ্বীপে পরিণত করেছেন। এ পর্যন্ত মাতৃহৃদয়ের মমতাই অধিক ঘোষিত হয়েছে, শিশু যেন নিঃস্ব এক গ্রহীতা, বল্লালী-বালাইয়ে শিশুহৃদয়ের অপরিসীম আনুকূল্যে সংসার ভরপুর, মাতাই তার গ্রহীত্রী।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরব-গাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন কাড়িয়া লওয়া হাসি, শৈশব তারল্য, চাঁদ-ছানিয়া-গড়া মুখ, আধো-আধো আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না।

কোন শিশুসাহিত্যে শিশুর এই অনাবিষ্কৃত গৌরবটুকু আগে ধরা পড়েছে কিনা জানি না।

বল্লালী-বালাইয়ে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু শুধু এক দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট বর্ষীয়সীর মৃত্যু নয়। গভীর রসানুভবে আসন্ন মৃত্যুর গন্ধ-পাওয়া কাহিনী বাঙলায় যেন আর এক Death of Ivan Ilitch। শীর্ণ কপোলবাহিত কোটরনিঃসৃত জল শুধু নিশ্চিন্দিপুরের সেকালের অবসান রেখা নয়, পথের পাঁচালীর আলোকিত রোমাণ্টিকতার এক দূর-বিসর্পিত বিষন্ন বাষ্পবলয়।

সেই বলয়েই আম আঁটির ভেঁপু মন্দ্রিত, মণ্ডিত, মুখর। নতুবা চিহ্নহারা

নিশ্চিন্দিপুরে সে এক অরণ্যে রোদনমাত্রই হয়ে থাকত, কৈশোর-চাপল্যের নিছক এক ছবি। তাকে গহনতার মাত্রা দিয়েছে, ভরপুর করে তুলেছে। সারা পথের পাঁচালীকে দিকচক্রবালের মত জড়িয়ে আছে বল্লালী-বালাই। অনাবশ্যক নয়. আশ্লিষ্ট নয়, রোমহর্ষকর কাহিনী নয়, সমগ্র গ্রন্থের স্বাভাবিকতা সে, সংশ্লিষ্ট সে, সম্ভাবিত সে।

একদা বিভূতিভূষণ, নীরদ সি. চৌধুরীতে কী তর্কই না হত নাম নিয়ে! নীরদ সি. তো প্রথম থেকেই পথের পাঁচালী নাম বরদাস্ত করতে পারেননি। বড় সেকেলে। গেঁয়ো, অনাধুনিক। শুধু পথের পাঁচালীতেই নয়, বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে এমন কি শব্দ ব্যবহারে পর্যন্ত নীরদ সি. র কথাটা কিছুতেই বাদ দিতে পারা যায় না। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও এক অভাবনীয় ঐক্য মনকে নামকরণের-শব্দকরণের কী এক নিহিত জগতের নিভৃতে এনে দাঁড় করায়, নিয়ে যায়; সেখানে মনে হয়, এ কি শুধুই প্রথাবন্ধ পুরাতন? আকস্মিক? না, সুচিন্তিত, শিল্পিত, সনাতন? বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসের নাম কখনই অচিন্ত্য সেনগুপ্ত-বুদ্ধদেব বসুর মত কাব্যগন্ধী বা তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সামাজিক অথবা সাংকেতিক নয়। বরং একান্তই আটপৌরে। অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, অনুবর্তন, কী পাঁইমাচা, তুচ্ছ, জলসত্র - এ কি আধুনিক কোন নাম?

আসলে এ বিভূতিভূষণের এক সুপরিকল্পিত, শিল্পিত সত্তার সৃষ্টি। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যদি কোন বিমুগ্ধ বিশিষ্টতা থাকে তবে তা একান্ত সহজ, আন্তরিক অনায়াস। অথচ এই সহজ যে কী কঠিন অলক্ষ আয়াসে আকীর্ণ, সামঞ্জস্যে পারঙ্গম। তাঁর সাহিত্যে সমগ্রভাবে নগণ্যতা. তুচ্ছতা, একান্ত বৈপরীত্যের প্রকরণে পরাক্রান্ত, প্রতিষ্ঠিত

আম-আঁটির ভেঁপু এত তুচ্ছ, মূল্যহীন, গ্রাম্য কিন্তু পথের পাঁচালীতে তার সুর কী অমূল্য, দুর্লভ, মোহময়। আম-আঁটির ভেঁপু কি শুধুই নিশ্চিন্দিপুরের দুটি বালক-বালিকার হৃদয়-সমীরণে বেজেছে, না সমগ্র শিশু-সমাগমের হৃদয়-পবনে, মমতায়-উদাসীনতায়, কল্পনায়-কবিতায় তাদেরই দূরাভিসার ধ্বনিত করেছে?

আম আঁটির ভেঁপু শুধু নিশ্চিন্দিপুরের দুটি শিশুর হৃৎকমলের পাপড়ি মেলা নয়, সর্বকালের বিমুগ্ধ বিকাশ। অপু, দুর্গা, নিশ্চিন্দিপুর নেহাতেই তিনটি নাম—বিকচোন্মুখ অনাদ্যন্ত জগৎ-পারাবার-তীরবর্তী শিশুই এর একমাত্র বিষয়।

তবু এই বিকচোন্মুখ শিশু হৃদয়দুটি সজাতীয় হয়েও স্বতন্ত্র, বিচিত্র, আপন। আবার ছিদ্রে ছিদ্রে বেজে-ওঠা বেণুর মত স্বকীয় হয়েও সর্বজনের!

আম-আঁটির ভেঁপুতে সেই সর্বজনের-অপুর আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠা। পায়ে চলা পথের মত তা মানবাঙ্কুরের কোমল চরণদুটিকে ঘিরে নির্মিত, বাঁকে বাঁকে তার বিস্ময়, পায়ে পায়ে তার বিকাশ।

অপুর যাত্রাপথের অপসৃয়মান দিকচক্রবালকে নিয়ে পথের পাঁচালীর লেখক একদা আম-আঁটির ভেঁপুর ভাগ করেছিলেন। নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামরেখার শেষ দিগন্ত অবধি

তখন আম-আঁটির ভেঁপু। হরিহরের সঙ্গে গ্রামের সীমানা পেরিয়ে শিষ্যবাড়ি যাত্রার উত্তর-চরিত ছিল উড়ো পায়রা।

অনেকদিন অবধিই ছিল। তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত। পরে সম্ভবত এমন বিভাজনের অপ্রয়োজনীয়তা ভেবে সমগ্র অংশটিরই তিনি ঐ একটি নামই দিয়েছিলেন।

সত্যিই পায়ে চলা পথ। বাড়ি পেরিয়ে গ্রাম-সীমানা পেরিয়ে এই প্রথম বাইরের পথ— কুঠির মাঠের পথ। সরস্বতী পুজোর বিকেলে হরিহরের সঙ্গে অপু এই পথে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে বেরিয়েছিল।

পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখির ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ান ঐশ্বর্য, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজবার চেষ্টা নেই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নেই। বেলা শেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

যেতে যেতে বইয়ের খরগোশ বনের খরগোশ হয়ে দেখা দেয়। নিশ্চল বিবৃত ছবির একতলতা থেকে শিশুনয়নে সে সচল সঘন বিস্ময়ে ঘনীভূত। বিস্ময়ের চেয়েও কল্পনার অধিকতর আনন্দ আর কিসে হতে পারে? নিশ্চিন্দিপুরের গৃহবাসী মৃত্তিকালগ্ন অপু পুলকে রহস্যে কোন সুদূরের স্বপ্নচারী হয়ে ওঠে।

জলমাটির তৈরি নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কী করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পায় না— ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

তারই মাঝে এত ছোট কুলগাছ, কুলপাড়ায় তৎপরতা ও তিরস্কার। একদা কুলচুরি, নির্দোষ প্রমাণের সুযোগে পুত্রের নবনীগন্ধ মুখে মাতৃমুখের চুমা—কোন সুদূরকে সামীপ্যের এক সূক্ষ্ম অলঙ্কার শিঞ্জনে স্মৃতির মত অনুরণিত করেছে।

নদীর ধারে মাঠে প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুর কঙ্কালের মত নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ।—কুঠি বলছিলে, ঐ দেখ সাহেবদের কুঠি।

এর পরের দেখা আর অপুর নয়। পথের পাঁচালীর রচয়িতার।

Here lies Edwin Lermor,

The only son of John and Mrs. Lermor,

Born May 13, 1853, Died April 27, 1860.

লোকালয়-পরিত্যক্ত জঙ্গলের মাঝখানে লারমর সাহেবের একমাত্র শিশুপুত্রের সমাধি।

একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রের ছায়াবিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রবহমান হাওয়ায় নীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত শিশুর ভগ্ন-সমাধির উপর রাশি, রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছ-পালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।

সমস্ত উপন্যাসেই লিখিত চরিত্রের সঙ্গে অলিখিতভাবে লেখকের একটি স্থান আছে। তবে উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চের অলক্ষে—পাঠকের সাজঘরে। Wordsworth যেমন কবিকে প্রকৃতির পুরোহিত বলেছিলেন, জীবনের পুরোহিত তেমনি ঔপন্যাসিক, বিশেষ

করে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে তো তাঁর অবাধ সঞ্চার। পাত্রপাত্রী-কথিত উপন্যাসেও অর্থাৎ narration of direct or epic method-এও তিনি থাকেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র বা চার্লস ডিকেন্স।

অপুর দেখা কল্পচোখের বিস্ময়কে রচয়িতার মরমী দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম, সুন্দর, সকরুণ করে তুলেছে।

কল্পনাপ্রবণ শিশুর মায়ের সঙ্গে স্নানের ঘাট থেকে দেখা আবছায়াময় দূরত্বে সমর্পিত কুঠির মাঠ এতদিন ছিল স্বপ্নসীমার শেষ। সরস্বতী পুজোর অপরাহ্ণে সেই স্বপ্নসীমা অপসৃয়মান হয়েছে মাঠের ওপারে।

শ্যামলঙ্কার দেশে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে নির্বাসিত বাজপুত্র, যেখানে তলোয়ার পাশে রেখে একা শুয়ে রাত কাটায়। ও-ধাবে আর মানুষের বাস নেই। জগতের শেষ সীমাটাই এই।

সাহিত্যে যে মানুষ সহজের কথা বলেন তাঁকে আমরা সাধারণত বৈশিষ্ট্যহীন, নির্মাণে অদক্ষ ভাবি। বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও এবকম একটা অভিযোগ লেখা না-লেখায় অনেকের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। যত বড় লেখক : তত বড় কুশলী তিনি নন. craft of fiction তাঁর কিছুটা অনায়ত্ত ছিল।

পথের পাঁচালীর বুনোট দেখলে একবারও তা মনে হয়? এমন রোম্যাণ্টিক উপন্যাসের ধরতাই কত অতি-পরিচিত জীবন নিয়ে, প্রতিদিনের সামীপ্য নিয়ে।

অপুর দূরাভিসার কী ব্যবসায়িক কথার আড়ালে-আবডালে! কোথায় শ্যামলতা-বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর দেশ, নির্বাসিত রাজপুত্র আর কোথায় ভূষণ গোয়ালার দরুন কলাবাগানের ভূখণ্ড, নয়তো নবীন পালিতের সঙ্গে বয়শার বিলে মৎস্য শিকাবেব পরামর্শ।

নামকরণ থেকে বিষয়-পরিচর্যা পর্যন্ত বৈচিত্র্যে-বৈপরীত্যে ও বিভিন্নতায-বৈসাদৃশ্যের পরও কি পথেব পাঁচালীকে নির্মাণক্ষম লেখা নয় বলা চলবে?

বিভূতিভূষণের পাঠকচিত্তে কী নিপুণ বিভ্রমসৃষ্টি। নীলকুঠির মাঠে যে নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে অপুর যাওয়া তা কি মিলল? তা মিলল না, কিন্তু মিলল সুন্দরের দেখা।

শুধু শুরুতেই নয় সারা বইয়ের সুন্দরতায় চিকণ সুতোর কাজ। আবার বাস্তব-সংসারের বিরুদ্ধ-বঞ্চনায়, উৎপীড়নে-অত্যাচারে, অভাবে-অবমাননায় লেখা কত স্বাভাবিক! পথের পাঁচালী লালকমল-নীলকমলের উপকথাও নয়, Robinhood-এর Fairy Tales-ও নয়, বাস্তব-সংসারের শিশুহৃদয়ের প্রসারের প্রতিচ্ছবি। বয়স্কের আনাগোনায় তাতে কোথাও বিরাম ঘটেনি।

যে বুদ্ধিতে হরিহর-নবীন প্যালিতের ভাবী ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, সেই স্বার্থবুদ্ধি-স্নেহহীনতায় ভুবন মুখুজ্জের ধনী ভ্রাতৃবধূ সেজ ঠাকরুন-সর্বজয়ায় কলহে-ইতরতায়-গ্লানিতে-অবমাননায় বর্তমান কী তিক্ত, নীরস, পঙ্কিল হয়ে দেখা

দেয়। অবশ্য রৌদ্ররসের রূপকার সংগত শিল্পবোধে এই বিবদমান দুই নারীকে তুল্যমূল্য করে তুলেছেন। অকারণ করুণায় তিনি নির্যাতিতাকে অলীক সহানুভূতি বাষ্পে সিক্ত করেননি, অহেতুক মমতায় পাঠকচিত্তকে দ্রবীভূত করেননি।

ঝগড়াটে সে কিন্তু হটিবার পাত্র নয়, বলিল—পুঁতির মালার কথা জাতি না সেজ-খুড়ি, কিন্তু আমের গুটিগুলো, তার গায়ে তো নাম লেখা নেই—আর ছেলে-মানুষ যদি ধর এনেই থাকে—সেজ-ঠাকরুন অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন—বলি কথাগুলো তো বেশ কেটে কেটে বলছ। বলি টাকাগুলোতেও তো নাম লেখা ছিল না—তা তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলে।

অথবা সেই গ্রাম্য কাবুলি অন্নদা রায়। আফগানিস্থানের এই অধিবাসীর বুঝি বা স্নেহ ও লোভের অন্দর-বাহির মহল ছিল। কিন্তু অন্নদা রায় আগাগোড়াই অন্নদা রায়। নিষ্ঠুর নীতিহীন। গৃহের বহির্দেশে, সদ্যবিধবা তমরেজের বৌ সন্তানের জন্যে একমুষ্টি অন্নের প্রার্থনায় যেমন বঞ্চিত হয়, গৃহের অভ্যন্তরেও সেখানে স্ত্রী-লাঞ্ছনার একই ছবি।

অন্নদা রায়ের বিধবা ভগিনী সখী ঠাকরুন চিৎকার করিয়া বাড়ি ফাটাইতেছেন। তাই কি মনে একটু ভয় আছে নাকি? ঐ যমের মত সোয়ামী, রাগলে পড়ে হাড়ে মাসে এক রাখে না—তাই না হয় বাপু একটু সমঝে চলি। গেরস্ত ঘরের বৌ ধান ভানবে, কাজ করবে এই জানি—তা না রাতদিন পটের বিবি সেজে বসে আছে।

অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুল এক হাতে একখানা কাঁচা বাঁশের পাতাসুদ্ধ ডগা আর এক হাতে দা লইয়া বাড়ি ঢুকিল। স্ত্রীর কান্নার শেষ অংশ শুনিতে পাইয়া কহিল—এখনও তোমার হয় [illegible]। ধানগুলো যদি কলিয়ে যায়, তবে তোমার কোন বাবা এসে সামলাবে?

গোকুলের বৌ হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া [illegible]জের সহিত জোর গলায় বলিয়া উঠিল—তুমি আমার বাবা তুলে গালাগালি করো না বলে দিচ্ছি।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গোকুল হাতের বাঁশ নামাইয়া রাখিয়া দা হাতে এক লাফে রোয়াকের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া কহিল—তবে রে। আজ তোমার একদিন কী আমার একদিন।

কৃষাণ গিয়াই গোকুলের হাত হইতে দা [illegible] কাড়িয়া লইল।

এমন মর্মান্তিক, আসন্ন-রক্তাক্ত মুহূর্তটিকে বিভূতিভূষণ সমবেদনার সহজ পথে না এনে দক্ষ কারিগরের মত, এমন এক নাটকীয় বক্রোক্তিতে ভরে দিয়েছেন।

গোকুলের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেহ তেমন সবল নহে, বলিষ্ঠ কৃষাণের সহিত ম্যালেরিয়া-দুর্বল দেহ লইয়া হাত ছাড়ানর চেষ্টা করিতে গেলে দুর্বলতাটাই অধিকতর প্রকাশ হইয়া পড়িবে বুঝিয়া বলিতে বলিতে নামিল দেখ না বীজধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়, ও কি আর রোয়া হবে?

মাঝে মাঝে বিভ্রম হয়, আম-আঁটির ভেঁপুর বা পথের পাঁচালীর লেখক বুঝি

কোন অন্তর্যামীর মত প্রতিদিনের শিশুহৃদয়ের এ-পাত থেকে সে-পাতে যাওয়ায় গতিভঙ্গিটিকে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছেন। মমতায় মহত্ত্বে, সুদূরে-সামীপ্যে, মনের দেখায়-লেখায় সে-সব পাতার তিনি মনোযোগী পাঠক। শিশু হৃদয়-ভূকম্পনের অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্র তিনি। পথের পাঁচালীর উর্ধে-অর্ধে, অন্তরে-বাইরে শিশুচিত্ত-বিকাশের কোন কথাই বাদ দেননি তিনি।

কোথায় গৃহপ্রাঙ্গণের বহির্ভাগের কোন অশ্বত্থ গাছ অনেকদূরের দেশের বিস্ময়-মাখান আনন্দের হাতছানি বহন করে আনে, বাহিতও করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কার স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের উত্তাপ নভোচারীকে সেই স্নেহব্যগ্র বাহুকোণের জন্যে আকুল করে তোলে। সে তার মা সর্বজয়া। নির্ণিবেখ নভোবিন্দু থেকে শিল্পীর কী নিপুণ প্রত্যাবর্তন '

আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে এক দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত।

অথবা চৈত্রমাসের দুপুরে মায়ের মুখে শোনা কর্ণবধের পালা—সে এক শিশু-হৃদয়গ্রন্থের পত্রান্তরের অধ্যায়। আনন্দে-বিষাদে, সকরুণতা-সার্থকতায় ব্যথাহত মনুষ্যটির জন্য কী সম্ভাবিত বিস্তার! বুঝি এই কারুণ্যের পার্থিব জীবন-পথেই অপরাজিতের মহাজীবনের সুবিশাল আবির্ভাব।

মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখে জল পড়ার যে আনন্দ তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবনপথের যেদিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায় মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।

শিশুচিত্রের এই বিকাশ শুধু সহানুভূতিতেই শেষ নয়। বিভূতিভূষণ কী শিশু-সঙ্গীর মত তার গহন-অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন! যে সমবেদনা বয়স্কের হৃদয়ব্যাপ্তে বর্তমান সে সর্বস্বতা কি শিশুর পক্ষে সম্ভব? সে তো দুরন্ত, অভিযাত্রী, রোমাঞ্চকর জীবনযাত্রার শিশু। মহাভারতের বিরাট যুদ্ধপর্বও উদ্যত বীরত্বের সামনে স্বল্পালিখিত বলে মনে হয়। চিত্তবিকাশের নব অধ্যায়ে মনোরচনার রেখা পড়ে। অভিপ্রেত শিল্পী অপু। উত্তরকালের অপরাজিতের লেখক অপুর প্রথম মানস-পদক্ষেপ। বাড়ির পেছনে নির্জন বাঁশবাগানে ক্রমশ-প্রকাশ্য নব-মহাভারত মাসের পর মাস রচিত হতে থাকে।

গভীর গম্ভীর সঙ্কটময় এমন এক মুহূর্তকে বিভূতিভূষণ কী শিল্পীজনোচিত সহজ অনাবিল হাস্যরসে মধুর করে তুলেছেন!

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন—কপিরাজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব, চক্ষের পলক মাত্র—এমন সময়ে শেওড়া বনের ওদিকে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ও কি রে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ টানা জ্যাকে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া দেখিল তাহার দিদি তাহার দিকে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাই-এর গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল। কোথাকার একটা পাগল। কি, বকছিলি রে আপন মনে?

ঋতুতে ঋতুতে নিশ্চিন্দিপুর শিশুনেত্রে কী মোহন ও ভীতিমিশ্রিত রূপেই না দেখা দেয়! প্রকাশেও কী অনন্যত্ব!

কখনও বৈশাখ মাসে মা ও দিদির সঙ্গে অপরাহ্নে স্নান করতে গিয়ে অপুর চোখে পড়ে নদীর ওপারে বাবলা গাছে থোকা থোকা হলুদ ফুলের গুচ্ছ, রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াতে আসে, জেলে ডিঙি বেয়ে গ্রামের অক্রূর-মাঝি মাছ ধরবার দোয়াড়ি পাততে চলেছে, সোঁদালি ফুল বিকেলের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলতে থাকে—ঠিক সেই সময় এক একদিন সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশ যেখানে সবুজ বনরেখার ওপর ঝুঁকে পড়ে, সেদিকে চেয়ে তার মন কেমন হয়ে ওঠে।

শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি দিদি দেখ দেখ এদিকে—পরে সে মাঠের শেষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে? ঐ গাছটার পিছনে। কেমন অনেকদূর, না?

নিশ্চিন্দিপুরে কালবৈশাখীর ঝড় নামে। ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধে একটু পরেই মোটা ফোঁটায় গাছের পাতায় বৃষ্টির রিমঝিম।

হঠাৎ ঝটিকাবিমুগ্ধ অন্ধকার আকাশের এ প্রান্ত হইতে লকলকে আলোর জিহ্বা মেলিয়া বিদ্রূপের বিকট অট্টহাসির রোল তুলিয়া এক লহমায় ও প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাজি চিড়িয়া ফাঁড়িয়া উড়াইয়া ভৈরবী প্রকৃতির উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালক ও বালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

আম-আঁটির ভেঁপুর আর এক পরতের চড়া সুর, অপুর দূরাভিসারের এক পুরোরেখা—প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা।

পথের পাঁচালীর স্বপ্নের ফেরিওয়ালা নির্মাণের কী নিপুণ যাদুতে একই সঙ্গে পরীক্ষার্থী ও পণ্যে পাঠশালার সম্মুখভাগ সাজিয়েছেন, বিক্রীতব্যে-অধীতব্যে কী বাস্তব সহাবস্থান—যথার্থই গ্রাম্য পাঠশালার একখানি ছবি। কিন্তু যাদুকর সে ছবির কোথাও ফ্রেম দেননি। পাঠশালার চারপাশেও কোন বেষ্টন বা প্রাচীর নেই। চারিধার উন্মুক্ত। আসলে এ পাঠশালা প্রকৃতিরই পাঠশালা। নিসর্গ-নির্জনে তা দূরত্ব আনে। অপরাহ্নের বাঁকা রোদে, গুলঞ্চলতায় টুনটুনির দোলায় বনের গন্ধে,

প্রকৃতির পরিজন রাজু রায়, রাজকৃষ্ণ সান্যালের সমাগমে মুক্ত প্রকৃতির পাঠশালার ছাত্র অপু। বিচিত্র ঘটনা, অপরিচিত নাম—যেন সেই স্বপ্নরাজ্যের চাবিকাঠি। সাবিত্রী পাহাড়, দ্বারকা, চিকা মসজিদ, বুধো গাড়োয়ান সেই প্রকৃতিরাজ্যের নির্বাক নিয়ন্ত্রণ-কারী অধিবাসী। প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা নিহিত প্রসন্ন সুদূরতার হাতছানিতে অপুকে ডাকে, কল্পনার দিগন্তকে বাস্তবতার কাঠামোতে আরও মজবুত ও মাত্রাঘন করে তোলে।

বিভূতিভূষণ সেই মাত্রার একশেষ রচনা করেছেন অতিক্রান্ত-অর্থ বিমুগ্ধতার ভাবচ্ছবিতে, উপভোগে, উত্তরণে।

সে ছবি শ্রুতিলিখনের এক সংগীতবাহিত অনুচ্ছেদ।

এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত সমীর-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত।

কোথায় সেই দেশ? নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত আকাশপথ? পথের পাঁচালীর সুদূরের অভিযাত্রী লেখক, স্বপ্নের সওদাগর গহন মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিকের মত কী চমৎকৃতিতে, স্বপ্ন ও সত্যকে, মাধুর্য ও মনোবিশ্লেষণকে মিশিয়েছেন। সাত সাগর তের নদীর পারে সে লুকিয়েছিল বলে তার দেখা পাইনি তা নয়। বলতে চেয়েছেন, সে তো তোমারই কাছে। হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিল দেখতে আমি পাইনি। সুদূরতা, স্বপ্ন-কল্পনা এ কিছুকেই তো আমরা দেখি না, ভেবে দেখি।

বাল্মীকি বা ভবভূতি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোন পাখিডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি বালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব। পৃথিবীপৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশবমনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ-পর্বত তাহার সতত সঞ্চরমান মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল।

নিশ্চিন্দিপুর ক্রমশ দূরত্বে সমর্পিত হয়। শৈশবের হৃদয়গ্রন্থ পাতায় পাতায় বাড়ে। একদা মাঘ মাসের যে পড়ন্ত রোদে নিশ্চিন্দিপুরের গৃহের ও গ্রাম্য জনপদসীমানার বাইরে-দূরে শ্যামলঙ্কার, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর দেশ পর্যন্ত অপুর জগৎ বিস্তৃত হয়েছিল, এক বৃষ্টিধৌত ভাদ্রদিনে সেই জগৎ বিস্তৃততর হয়েছে নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়ে বাবার সঙ্গে শিষ্যবাড়ি যাত্রায়। ডাইনে-বাঁয়ে বিস্তৃত নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়ক, রেল-লাইন, পেরিয়ে-যাওয়া কত অচেনা গাঁ, পথের ধারের অজানা গৃহে ক্ষণিকের আতিথ্য, পরিশেষে আমডোব গ্রাম—সবই অনাবিষ্কৃত দেশ, এতদিন শুধু অপুর দেখার অপেক্ষায় ছিল। সময়ের সীমায় দূর তো কোথাও দূর নয়, বিস্ময়েই সুদূর।

তুমি চলিয়া যাইতেছ—কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কী পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিশাবে তুমি একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই।

আমি সেখানে আর কখনও যাই নাই, যে নদীর জলে স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইলাম, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে।

পথের পাঁচালীর রচয়িতার কী সমৃদ্ধ শিল্পদৃষ্টি! শ্যামলঙ্কা, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী এর কিনারায় হলেও এ দেশ রূপকথা-উপকথার নয়। শিশুর—কিন্তু মানবশিশুর। আনন্দে-অসূয়ায়, অভিমানে-আবেগে, সরলতায়-সুতীব্রতায় বয়স্ক মানুষের সঙ্গে তার মাত্রার আধিক্য থাকতে পারে, কিন্তু অনুপস্থিতি নেই। শিষ্যবাড়ির অমলাকে নিয়ে কী অমল-মালিন্যের উপভোগ্য আলোছায়া! মনোবিকলনকে যথার্থই অস্বীকার করা চলে? যে শিশু প্রভাতের মত প্রতিভাত, সত্যিই কি মধ্যাহ্নদিনের কামনার উত্তপ্ততা তাতে নিহিত নয়?

সেই সঙ্গে মৌলিক জান্তবতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে বলেছেন **elemental** সেই প্রাচীন প্রস্তরীভূত অন্ধকারের চারপাশে বিভূতিভূষণের আলোর, আনন্দের, সমবেদনার-সমর্পণের কী সূক্ষ্ম চিকারির কাজ। তারই পাশে শিষ্যগৃহের সমৃদ্ধির ও বিস্ময়ের চতুর্দিকে অপুর হৃদয়ে অভাবগ্রস্ত মা ও দিদির জন্যে সবেদন সহানুভূতির এক বিমিশ্র, বিষণ্ণ, মধুর বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

এরই মাঝখানে আশঙ্কায়-আজগুবিতে সংসারলীলার ক্ষুদ্রকায় প্রতিকৃতিতে কল্পনাবিস্তারের কত উপপথ! প্রকৃত, প্রত্যক্ষ, পরাক্রান্ত। কাল্পনিক কোন বিমিশ্রতা, বিশ্বস্ততার কোন অভাব নেই।

মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় পথভ্রান্ত অপুর ভয়ার্ত গ্রাম্যজনকথিত আতুরী ডাইনির অকস্মাৎ মুখোমুখি হওয়া রহস্যমণ্ডিত কল্পনাকে আরও অশরীরী ও শিহরিত করে তুলেছে। রোমাঞ্চ,—কল্পনার ঘনতার এক বড় উপাদান। অপরাজিতের শেষে কাজলকে সমর্পণ করে অপু বলেছিল—রানুদি. যেন ওর ভয় ভেঙে দিও না।

কখনও বাবার প্রাচীন পুস্তক-সংগ্রহ পড়ে বিশ্বস্ত স্বপ্নজগতে সরল আস্থাস্থাপন—শকুনির ডিমের সাহায্যে শূন্যমার্গে বিচরণের চেষ্টা।

কোথাও শান্তদর্শন বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে নিঃসংকোচ, বাধাহীন মিলনে নিশ্চিন্দিপুর সত্যিই নব-বৃন্দাবনে পরিণত হয়।

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতিপথ বাহিয়া এখানে যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, পাখি, গাছপালার সাহচর্যের মত অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে।

নয়তো জেলেপাড়ায় কড়িখেলাকে কেন্দ্র করে অন্যায়ভাবে অসহায় পটুকে মার খেতে দেখে অপুর সহানুভূতি ও নিজে প্রস্তুত হওয়া। কী নিপুণ শিশু-মনস্তত্ত্বে একদিকে বিজয়ী পটুর দুর্দশায় খুশি হওয়া এবং পরাজিত দুটি শিশু-সম্রাটের স্নেহ বন্ধন!—অপুদা, তোমার বেশি লাগেনি তো?

সম্ভাবিত সংসারলীলার সামান্য উদ্‌যাপনে সে কী শিশুহৃদয়ের উদারতা, প্রসারের আনন্দ !

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দমুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে দুঃখে সুখে ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নতুন !

আনন্দ ! আনন্দ ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসংকটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছ না, তাহার আনন্দ। সামান্য সামান্য ছোট খাটো তুচ্ছ জিনিশের আনন্দ।

মানুষেরই মত শিশুরও পূর্ণ বিকাশ তার আত্মপ্রকাশে, তারও কল্পনার একশেষ কল্পলোকের সৃষ্টিতে। স্বাভাবিকভাবেই মাত্রায় তার পরিমাণগত প্রভেদ আছে, প্রকৃতিতে নয়। মানুষ হয়েও সব মানুষ যেমন আত্মপ্রকাশবান নন, জীবনানন্দের কথাটাকে যেমন সদর্থে-সুবিস্তারে বলা চলে, সবাই নন, কেউ কেউ কবি, তেমনি সব শিশুই কল্পনার পুরোগামী পথিক হয়েও হয়ত কল্পলোকের স্রষ্টা হয় না। যে মানুষ হয় সে যেমন মানবজাতির পুরোহিত ও পবিত্রিত—**the consecration and the poet's dream,** কল্পনার শিশুতীর্থের শিশুও তেমনি ঐশী শিল্পী। কবিতায় সরবতা-নীরবতার কথাটা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে নিন্দা-প্রশংসার সীমারেখা বেয়ে। কিন্তু সত্যিই কি উভয়ে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে ? সমঝদারকে কি শিল্পী না হলেই চলবে না ? পার্থক্য তো আসলে স্বভাবগত নয়, প্রকাশগত। দেহাতি বাউল বলতেন, নিজেকে মারতে নরুন, অপরকে মারতে তলোয়ার লাগে। কোন বিমুখতাই তো বস্তুধর্ম নয়, মনোধর্ম। শিল্পীর মত সজনে-নির্জনে নয়, নিজের মধ্যেই না হয় সৃষ্টি করল। শিল্পিত করার, অপূর্ব-বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার, সৌর আলো জ্বালানর কারিগরি হয়ত তার জানা নেই, তবু সে যদি তার আপন সৃষ্টিতে গৃহের প্রদীপ হয়ে জ্বলে, জিজ্ঞাসিত হয়ে বলে, 'মমাত্র ভাবৈক রসং মনঃ স্থিতম্' অথবা অজিজ্ঞাসিত আত্মকথায় বলে ওঠে, **as though of Hemlock I had drunk** তাকে শিল্পী বলার বাধা কোথায় ?

অপুর ক্ষেত্রে অবশ্য তা নয়। সামনে-দূরে, স্বপ্নে-সহানুভূতিতে, ছায়ায়-কায়ায় পরত ভাঙতে ভাঙতে কল্পলোকের সৃষ্টিতে যেদিন তার হৃদয় পুরো জাগল সেদিনই তার সত্তার পূর্ণ বিকাশ। সেই বিকাশে চড়কপুজোর যাত্রায় সে তার ঠিকানা পেয়েছে। মহাভারতের মৌখিক রচনায় যার সৃজনের ভূমিকা, নব-যাত্রাপালার সৃষ্টিতে তার লিখিত রচনার আরম্ভ, সতুদের পুকুরে মাছ পাহারা দিতে গিয়ে তারই আরও অধ্যায় বিস্তার। আত্তীকরণের পুরো পদ্ধতিই লেখকের হাতে এক আত্মহারা সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। স্নেহে-সকরুণতায়, সচেতন স্বপ্নে-সাহচর্যে চোখে দেখা যাত্রা

অপুর জীবনে এক হৃদয়মঞ্চের অভিনব, অভিরাম যাত্রা হয়ে উঠেছে। মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত রাজার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বনবাস, ঘন নিবিড় বনে পিতামাতৃহারা রাজকুমার অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখার পথে পথে বেড়ান, ছোট্ট ভাইয়ের জন্যে খাদ্যান্বেষণে বোনের যাত্রা ও ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খেয়ে ইন্দুলেখার মৃত্যু, অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্ডারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী, কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে রাজার বিশ্বস্ত সেনাপতি বিচিত্রকেতুর প্রচণ্ড যুদ্ধ, রানী বসুমতী, কলিঙ্গ দেশের মহারানী—অপুব চোখে নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতেই কোন এক স্বপ্নভূমি রচনা করে সত্য হয়ে ওঠে। করুণায়-স্নেহে-মাধুরীতে শুধু দিদিকেই মনে হয়—বর্তমান রাজকন্যা ইন্দুলেখার চেয়েও বুঝি বা অধিকতর শ্রেয়সী। মায়ের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়ে, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী কল্পনার ঘোরে কার প্রাণ এই রাজকুমার অজয়কেই চেয়েছে—এই চোখ-মুখ, এই গলার স্বর। ঠিক সে যা চায় তাই। তার সঙ্গে কথা বলা, একত্র গান-গাওয়া, বাড়িতে খাওয়ান—এ যেন কোন স্বপ্নোত্থিতের অভিসার।

সেই মায়া-মমতার মাঝখানে লেখক বিচিত্র কৌতুকরসে স্বপ্ন ও সত্যের এমন মনোরম মৃত্তিকাপথ তৈরি করেছেন। সে পথে বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতির ক্রোধ মৃগী রোগগ্রস্ত রোগীরও হিংসের কারণ হয়ে ওঠে, বার্ডস-আই সিগারেটের জন্যে হাতিয়ার-বন্ধ অবস্থাতেই সে পানের দোকানে উপস্থিত হয়।

সেই সঙ্গে অপুরই সমবয়সী মাতৃহীন অজয়ের জন্যে সর্বজয়ার সমগ্র বক্ষ মাতৃত্বের স্নেহসুধারসে সিঞ্চিত হয়। বিদায়ের কী সকরুণ ছবি।

যাইবার সময় অজয় হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভাল কাপড়—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া সর্বজয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিল।

দূরপ্রস্থিত যাত্রার স্মৃতিতে নিশ্চিন্দিপুর মুগ্ধ। গাঁয়ের মালি, রাখাল সবার মুখে যাত্রার নতুন গান।

অপু খাতায় নাটক লেখে। মূলত নামগুলি ছাড়া কোন অংশই পৃথক নয়—পৃথক শুধু অপুর নিজের চোখে দেখার, নিজের মত করে লেখার স্বাতন্ত্র্যে।

যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যা—সৃষ্টি তো আদি সেই সৃষ্টিরই আদলে।

অতীতের কোন এক নিবিড় জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নির্জন বাসকক্ষের স্তিমিত দীপশয্যায় এক প্রাচীন কবির নীল মেঘের মত দৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুগ্ধ মেঘের বর্ণনে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি? সে বিস্মৃত শুভ যামিনীর বন্দনা মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

আগুন দিয়াই আগুন জ্বালান নয়, ছাইয়ের ঢিপিতে গুঁজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বালে ?

মনের জগতে যে কল্পনাপ্রসারের পূর্ণ বিকাশ স্বরচিত সৃষ্টিতে, বাইরে একাকী তারই প্রথম প্রকাশ দূরাভিসারে—গঙ্গানন্দপুরে পুজো দিতে যাওয়ায়। যে মাঘ মাসের পড়ন্ত রোদে বাবার হাত ধরে বাইরেকে সে চিনতে বেরিয়েছিল আম-আঁটির ভেঁপুর শেষে সে অজানা জগতের একলা অভিযাত্রী। সৃষ্টি ও অভিসার তো একারই।

শুধু সে পথে চেতন-অচেতন যে অলক্ষের দূত হয়ে আসে সে আমাদের মানস-সরোবরের অগম্য তীরবাসী।

গুলকীও তাই। বিভূতিসাহিত্যের এক অবিস্মরণীয়া, আকুল, উপেক্ষিতা। উত্তরজীবনে প্রায় সবাই ফিরেছে, ফেরেনি শুধু গুলকী। পথের পাঁচালী থেকে শুধু অপুর নয়, পাঠক-হৃদয়ের করুণ রক্ত পদ্মে সে সমাসীন, সকরুণ, সমুদ্ভাসিত।

সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দশী এমনি একটি তিথি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাই, কিন্তু বাল্যের এই একা প্রথম বিদেশ-গমন-সম্পর্কিত একটা ছবি অনেকদিন পর্যন্ত তাহার মনে ছিল—সোজা মাঠের পথের দূর-প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে (বা চতুর্দশীর চন্দ্র। তাহার ঠিক মনে ছিল না।) পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতা, অনাথা, অবোধ, ঝাঁকড়া চুল ছোট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

শৈশবস্মৃতির পুনরাবৃত্তি করছি বলে যিনি উল্লেখ করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় সে তো লেখকের বা অপুরই পুনরাবৃত্তি। সেখানে দুর্গা কোথায় ? দুর্গা কেন ?

সাহিত্য যদি ব্যক্তিজীবনের ছায়া-পড়া সৃষ্টি হয় তবে বিভূতিভূষণের জীবনে তো এসব কিছুই ছিল না। সবাই জানেন পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপিতেও ছিল না, ছিল ভাগলপুরের রঘুনন্দন হলের রৌদ্রোজ্জ্বল একটি মুহূর্তে এক নিমিষের মূর্তি। চেহারা ভরা চোখ। চোখ-ভরা অদ্ভুত দৃষ্টি। বিভূতিভূষণ যেন তাতে অমরত্বের সন্ধান পেলেন। নতুন করে পথের পাঁচালী লেখা শুরু হল।

দিদি পাননি, হয়ত দিদির মত কোন গ্রাম্য কিশোরীকে পেয়েছিলেন। না পেলেই বা কী এসে যায় ? যা পাইনি তাকেই তো ভেবে পাই সাহিত্যে।

খড়কুটোর কথা বলতে গিয়ে একালের এক তীর্থংকর বলেছিলেন. অমল আর ভ্রমর যেন লেখকেরই দুটি সত্তা। নিজেকে দুভাগ করে বিমল কর পিপাসার্ত চিত্তে সেই অমলের বিশুদ্ধ প্রেমে আকণ্ঠ পূর্ণ করলেন নিজে ভ্রমর হয়ে।

নিশ্চয়ই সৃষ্টির কোথায় কাছে-দূরে একটি ভিত্তিভূমি থাকে, কিন্তু সে যে কত কাছে-দূরে, উচ্চে-তুচ্ছে, স্মরণে-বিস্মরণে তা একমাত্র জীবনের অলক্ষ চিত্রকরই বোধ হয় জানেন। অচিন পাখি কমনে আসে যায়। গল্পকার কি জানতেন,

দ্যুলোক-ভূলোকের শিল্পী সাজাদপুরের কুঠিবাড়ির প্রতিদিনের দেখা পোস্টমাস্টারকে হৃদয়রক্তে এমন সকরুণ, প্রতিধ্বনিত করে তুলবেন ?

কোথায় সারা গ্রামের চক্ষুশূল কিশোর তার চোখের মাতৃমণির অন্বেষণে ছুটির জল মাপবে ? চঞ্চল, সংক্ষিপ্ত-কেশ শ্বশ্রূগৃহযাত্রিনী কিশোরী মেঘ ও রৌদ্রের নীচে এক বিষণ্ণ মেঘান্ধকারের ছায়া আনবে ?

আসলে ভাইবোন বাদ দিয়ে কখনও শৈশব সম্পূর্ণ হয় ? বোন চম্পা, কী গ্রেটেল সে তো ডাকবেই। ভাইয়ের ঘুম-ভাঙানর যাদুকাঠি তো তার হাতে।

বিভূতিভূষণ যে শৈশবকালের স্মৃতির কথা বলেছিলেন তাতে অপু-দুর্গা তো থাকবেই। জীবনে সে দুর্গা যদি রক্তের সম্পর্কে নাও থাকে, রক্তের চেয়ে গাঢ়তার স্মৃতির দুর্গা তো থাকবেই। অপুর ব্যাপাবে প্রকৃতি নিয়ে এক সমঝদার মানুষ বলেছিলেন, অর্ধেক মানব তুমি অর্ধেক প্রকৃতি। দুর্গার কথা জানতে চাইলে নিশ্চয়ই বলতেন, অপুর এই বাকি অর্ধেকই তো দুর্গা।

পথের পাঁচালীর পাতায় কতখানি জানি না, অপুর হৃদয়গ্রন্হের বাকি অর্ধেক তো তাই। সূক্ষ্মতায়-সুদূরতায়, স্বপ্নে-সৃষ্টিতে হৃদয়ের যে পদ্ম শেষ পর্যন্ত পাপড়ি মেলে ধরল সেখানে অপুর নিশ্চয়ই একটা সিংহভাগ আছে। থাকারই কথা। একটি বইয়ে একাধিক চরিত্র তো প্রাধান্য পেতে পারে না, তাই প্রসারে-প্রগাঢ়তায় বিভ্রম লাগে. পথেব পাঁচালী বুঝি অপুরই পথের পাঁচালী। আসলে কিন্তু তা নয়। পথের পাচালী শৈশব পথেরই পাঁচালী, অপু-দুর্গার জীবনবিকাশের পথের পাঁচালী

এই প্রস্ফুটিত প্রকৃত পালাগানের আদ্যোপান্ত কিশোরী দুর্গা। সত্যি বলতে কী, পথের পাঁচালীর গানের যে অ[illegible]রস্ফুট গুঞ্জরণ বল্লালী-বালাইয়ে শুরু হয়েছিল তা যথার্থত শেষ হয়েছে আম আঁটির ভেঁপুতে। পথের পাঁচালী অপবাজিতের সাঁন্ধবেলাভূমি—বল্লালী-বালাই। পরিশেষ ব প্রারম্ভ দিনের যে কোনটাতেই রাখা চলে। এই কারণেই বিকল্প বলে পথের পাঁচালীব সংকলিপত গান আম-আঁটির ভেঁপুতেই শেষ হয়েছে। সংবদ্ধতায় এটাই পূর্ণপালা। সে পালায় কিন্তু দুর্গাই আগাগোড়া, দুটি খণ্ডেই অভঙ্গ। বল্লালী-বালাইয়ে অপু আছে—নিজেব নয়, পরের আপন হয়ে। কাবণ ইন্দির ঠাকরুন যখন মারা যায় তখন অপুব বয়স বছর দুই কী আড়াই। দুর্গার স্বল্পাধিক আট।

জীবনে মানুষ যেমন করে একই অঙ্গে নির্জন ও নিখিলবাসী, মানবশিশুও তাই। একা হয়েও একাকাব। অপু-দুর্গাও তাই। শিশুর অগ্রগতি যদি জীবজগতের বিশেষ একটি প্রাণীর মত একাণ্ডক হত, শৈশবারণ্য কি এত বিচিত্র, মুখরিত, মনোরম হত ?

মমতায়-চাপল্যে, বয়ঃসন্ধিতে-বিচিত্রবোধে অপু এবং দুর্গা এত অন্যরকম এবং অঙ্গাঙ্গী! সারা পথের পাঁচালীর সে এক উজ্জ্বল, দৃষ্টিকাড়া কিশোরী।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের বৈচিত্র্য নিয়ে যাঁদের হয়ত-বা শুধু অনুক্রমের কথা মনে পড়ে বা অভিযোগ জাগে, একা দুর্গাই তার পূর্ণ ব্যতিক্রম, উত্তর।

পথের পাঁচালীতে দুর্গা আলোকিত দ্বিপ্রহর, অপু পড়ন্ত রোদের অপরাহ্ন, দুর্গা অনিবার রকমে আকর্ষণীয়, অপু অভিমত রকমে আবিষ্করণীয়।

দরদে-দৌরাত্ম্যে, অভিযানে-অভিসারে সে যেন পথের পাঁচালীর এক কোলাহল, চমক, ডাক দিয়ে যাওয়া স্বপ্ন-পশারিণী।

শিশুর অকৃপণ দারিদ্র্য-সুখে, ইন্দির ঠাকরুনের চন্দ্রাহত বিষণ্ণ অশ্রুবাষ্পের বলয়ে নিশ্চিন্দিপুরের যে ঘন রঙের মাত্রায় বল্লালী-বালাই রচিত, দুর্গা সেই রঙেরই এক রশ্মি। আদেখলাপনায়, ছড়ার টানে, রূপকথার আগ্রহে সে পিসিমার ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় সন্ধ্যালোকের শ্রোত্রী, সেই কবে চৈত্র-মধ্যাহ্নের রৌদ্রাহত অবাঞ্ছিত পিসিমার মমতার দাত্রী।

একালের এক সমালোচক অপর্ণাকে বলেছিলেন যুবতী সর্বজয়া। দুর্গার কথা জানতে চাইলে হয়ত বলতেন, বালিকা সর্বজয়া। সেদিন হয়ত সে বিড়ম্বিত সংসারের বালিকাবধূ হয়ে একমাত্র সন্তানহারা বিধবা ইন্দির ঠাকরুনকে মমতায় ভরে দিত। দীর্ঘ বছর বাদে ধনী পরিবারের রাধুনিগিরির কাজ করতে গিয়ে এমন এক বৃদ্ধাকে দেখে করুণার অশ্রুবাষ্পে অকস্মাৎ সর্বজয়ার দু-চোখ ভরে উঠেছিল।

এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এইরকম চেহারার ও এইরকম বয়সের—সেই তাহার বুড়ী-ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাকরুন, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা, দুপুরবেলায় সেই বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই মৃত্যু।

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পেঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বারবার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

পথের পাঁচালীতে দুর্গার মমতা-লতার সর্বোচ্চ সহকার-তরু অপু। কিন্তু লতাগুল্মের অজস্র পত্র সমারোহে সে তরু আচ্ছন্ন, আমোদিত, আশ্রিত। চেতনা প্রত্যুষের কোন বল্লালী-বালাইয়ে যার শুরু, প্রখর প্রকাশের মধ্যাহ্ন লোকে তার শেষ। অপুর জীবনে সে বুঝি কোন লক্ষ-অলক্ষের প্রেরণাদাত্রী। কিন্তু সে সমস্ত প্রেরণাই তিরস্কারে-পুরস্কারে মাতৃসমা।

সদ্যোজাত যে অপুকে এই বালিকা-মাতা আপন কক্ষে স্নেহ-পুত্তলির মত ধারণে বাসনারত, শ্রীনিবাস ময়রা-সংক্রান্ত ছোট্ট ভাইটির অপমান মাতৃ-আশ্বাসে সে বাস্তবিক, কালবৈশাখীর ক্রূর বিশ্বপ্রকৃতি ক্ষুদ্র দুটি বরাভয় হস্তের কাছে বুঝিবা পরাভূত, প্রত্যাহৃত হয়। অপুর সিক্ততা কুমারী মাতৃহৃদয়ের স্পর্শে কী উত্তপ্ত, নির্ভরশীল, শান্ত!

তবু দুর্গার একই অঙ্গে এত রূপ! অপুর এই মাতৃস্বভাবা স্বর্গচারিণী দিদি

যখন বনপথ কী জনপদচারিণী হয়, তখন হয় পুণ্যিপুকুরব্রতে, কালবৈশাখীর ঝড়ে, আমকুড়নতে, চড়ুইভাতিতে, চাঞ্চল্যে-চৌর্যে পথের পাঁচালী কী মুখরিত, দুর্বার অপাপবিদ্ধ হয়ে ওঠে। সর্বজয়ার প্রচণ্ড প্রহারও অভিযাত্রিণীকে আহত করলেও মনকে স্পর্শ করে না। নিশীথের অন্ধকারে দুটি ভাইবোন আসন্ন সকালের প্রত্যাশায় কামরাঙা সংগ্রহের পরিকল্পনা করে। মনে হয় না, এ গৃহবাসী শিশু—দুটি বনবাসী মানববিহঙ্গ। তবু উভয়ের মধ্যে দুর্গা যেন এক দুরন্ত ঘূর্ণিবায়ু, পক্ষ-বিধূননের জন্যে সর্বদাই অস্থির। পথের পাঁচালীতে অপু যেমন নিশ্চিন্দিপুরের অন্তঃপুর, অনুভূতিময়, নির্জন, দুর্গা তেমনি প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা, সদাব্যস্ত বহিঃপুর। তাকে বাদ দিলে পথের পাচালী ম্রিয়মাণ, নিরুত্তাপ, গুরুভার শৈশবকাহিনী।

সেই চঞ্চল প্রাণের কিশোরী প্রাগৈতিহাসিক কোন মাধ্বীরসে মুকুলিত এক বয়ঃসন্ধিলগ্নে উপস্থিত হয়। সুচিক্কণ, শঙ্কিত, বিহ্বল। কী সূক্ষ্ম, স্পর্শ-উতলা, পলাতকা। নীরেনের আবির্ভাবে এ কোন যৌবনোদ্যত বিকশিত রমণী! সতৃষ্ণ কিন্তু ভনিতাময়ী। বনপথে যাত্রারত নীরেনকে আভাসে-আছিলায় একটু দেখার প্রয়াস। শ্বেতরক্ত চন্দনের ছিটে-লাগা দেবতা সুদর্শন পোকার কাছে নির্জন হৃদয় নিবেদন—নীরেনবাবুকে ভাল রেখ, আমার বিয়ে যেন ঐখানেই হয়।

সেদিন সদ্য উপনীত আসন্ন যুবতীর কাজে মন লাগে না, হাওয়ায় মিষ্টি লেবু-ফুলের গন্ধ ভাসে, সে জানে না, কী জানি পরাণ কী যে চায়। যে বালিকাকণ্ঠে একদিন উন্মুখ আগ্রহে পিসিমার কাছে চুল বাঁধা মিনসের ছড়ায় দোলনটুকু দেখানর জন্যে ব্যস্ততা জেগেছিল—আজ সেই সদ্যোদ্ভিন্না রমণীর হৃদয়ে আর এক স্পন্দন. কণ্ঠে বালুচরী শাড়ির ছড়া।

খুশিতে তাহার ইচ্ছা হইল. সে মাঠের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত বেড়ায়। একবার সে হাত দুটা ছড়াইয়া ডানার মত লম্বা করিয়া দিয়া খানিকটা ঘুরপাক খাইয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল। সে উড়িতে চায়। হাত ছড়াইয়া ডানার মত বাতাস কাটিতে কাটিতে যদি যাওয়া যাইত।

তবু এত আসন্ন আনন্দের মধ্যেও কী এক নিহিত অবয়বহীন আশঙ্কা তাকে গাঢ়রকমে শিহরিত করে। সে কি শুধুই এতদিনের নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করে স্বামীগৃহে যাওয়ার বিচ্ছেদ-বেদনা? নাকি এই পার্থিব নিশ্চিন্দিপুর থেকে কোন অজানা রাজ্যে বধূবেশে চিরযাত্রার আশঙ্কা? সর্বজয়া-হরিহর-অপুর সংসার ছাড়ার জন্যে বেদনা, না জীবনবৃন্ত থেকে চিরকালের জন্যে চ্যুত-মুহূর্তে গৃহ পথ পথ-ঘাট, সর্বোপরি মৃত্তিকা-মাতার জন্য নাড়ির টান? কী সে জানে না, তবু মনে হয় সে ভ্রূক্ষেপহীন পদপাতে আসে, প্রতিদিন আসে।

দুর্গা আজকাল যেন ঐ গাছপালা, পথঘাট অতিপরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধি-সন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি. ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়া-ভরা

নদীর গাছটি ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু—তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে।

ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে, দরকার নাই। কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনো আসে নাই। দিন রাতে, খেলাধূলার, কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে একথা তাহার প্রায়ই মনে হয়……ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কী। যেমন করিয়া সেটা আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে—আসিতেছে……শীঘ্রই আসিতেছে ……।

এ কি ইন্দির ঠাকরুন অথবা Ivan Ilyich-এর প্রত্যাবৃত্ত কৈশোরের মৃত্যুসুরভি ?

হরিহরের অনুপস্থিতিতে বিরামহীন বর্ষার ঘন অন্ধকারে, ক্রূর ঝড়ের রাতে, নিদারুণ দারিদ্র্যে অথবা রেলগাড়ি দেখানর এক সকরুণ মিনতি-মাখা সুরে সে আসে। উদাসীন, অনিবার্য, মর্মভেদী।

পথের পাঁচালীর রূপকার এই বিবাহ ও মৃত্যুবাসরকে আভাসিত দূরাগত অবশ্যম্ভাবিতায়, বয়ঃসন্ধির সুখস্বপ্নে ও বয়োঃশেষের দুঃখ-যাতনার একই পরতে নিবিষ্ট করেছেন। সে নিবেশে স্তম্ভিত শোকের গাম্ভীর্য আছে, হৃদয়বিদায়ী আর্তনাদ নেই। নীরবতা বুঝি বা অশ্রুবাষ্পের চেয়েও অধিকতর গভীর।

আগমনীর গানে, আসন্ন হেমন্তের স্নেহ-অভ্যর্থনায়, নবীন ধান্যপুষ্পের সবুজ হিল্লোলে, হিমালয়ের পার থেকে উড়ে-আসা পথিক-পাখির ডাকে গাঙুলিদের পুজো-বাড়ির নিমন্ত্রণে পুত্রসহ হরিহরের যাত্রাপথে একখানি অগোছাল চুলে-ভরা ছোট্ট মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দরজার পাশে ভেসে বেড়ায়। হরিহর অন্যমনস্ক হয়।
—চলো বাবা, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।

ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুতে বল্লালী-বালাইয়ের অবসান। দুর্গার মৃত্যুতে আম আঁটির ভেঁপু্র।

এরপর দূরপ্রসারী মাঠের ওপর তিসি ফুলের রংয়ের গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হয়ে পড়ে, দৃষ্টি কোথাও বাধা মানে না, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটি গৃহত্যাগী উদাসী বাউলের মত দূর থেকে কোন দূরান্তরে মিলিয়ে যায়।

সেই পথে চড়কপুজোর পর এক বৈশাখী মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে নিশ্চিন্দিপুরের বাস উঠিয়ে হরিহরের স্ত্রীপুত্র নিয়ে কাশীযাত্রা।

নিশ্চিন্দিপুরের শৈশবলীলার অবসিত গানের রেশ তখনও বাতাসে ফেরে।—অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি ?

মাঝেরপাড়ার ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল অস্পষ্ট হয়ে আসে। সামনে অক্রূরসংবাদ। পথের পাঁচালীর শেষ। অপরাজিতের আসন্ন স্টেশন।

বিচিত্র আনন্দ-বেদনায় আম আঁটির ভেঁপুতে দুর্গার বয়ঃসন্ধি। আধ সুধা-বিষে অপুর বয়ঃসন্ধি অক্রুর-সংবাদে। প্রথম বয়ঃসন্ধিতে আপন অধিকাররত সর্বজয়া-হরিহরের আগল ছিল। পরিবর্তমান দুর্গার আনন্দ-বেদনা সবটাই ছিল সুরক্ষিত এবং নিজস্ব, নিভৃত ও নিহিত। এ বয়ঃসন্ধিতে কোন বেষ্টন নেই, অসহায় রাঁধুনির অধিকার অধিকারের পরিহাস।

অক্রুর-সংবাদের মাটি-মানুষ-মেঘ বড় সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ, সিক্ত। তবু সেই পথই স্বপ্ন থেকে সত্যের, শৈশব থেকে মনুষ্যত্বের, কল্পনা থেকে জীবনের পথ। সংকোচে-বিহ্বলতায়, হর্ষে-বিষাদে বড় বিচিত্র, বলীয়ান, বিবশ।

তবু ধাবমান রাত-জাগা রেলপথে, বেলা পড়ে আসা দশাশ্বমেধের ঘাটে হরিহরের কথকতায়, যৌবন-মধ্যাহ্ন পেরন কথকঠাকুরের জীবনারম্ভের সংসারকামনায় তখনও নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্ন মেশান থাকে। কিন্তু সে স্বপ্ন-কৌমার্য-সরলতা বিমুগ্ধতায় ও মিথ্যায়, বেদনায় ও বাস্তবতায়, প্রহারে ও প্রেমে অভঙ্গ অখণ্ড সত্তাকে কোন শাপভ্রষ্ট দেবশিশু করে তোলে। সেই শাপভ্রষ্ট অপুর একদিকে হরিহরের কথকতায় স্বর্গীয় সুখ, আর একদিকে অভিজাত বন্ধুমহলের কাছে সামান্য কথকপিতাকে স্বীকৃতির আত্ম-প্রবঞ্চনা, একদিকে পিতৃব্য কথকঠাকুরের সঙ্গে কোন রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে চরম উপেক্ষা, অপরদিকে তারই মধ্যে হৃদয়-নির্যাসিত করুণা। একদিকে নিষ্পাপ প্রহারে জীবনের কৌমার্যভঙ্গ, অপরদিকে বুঝি কোন করুণাময়ী কন্যাকুমারীর প্রেমে-পরিচর্যায় যৌবন-দেহলিতে পদার্পণ। তবু এ পথ জীবন-পাঠশালার শ্রেণী-উত্তরণের পথ। কণ্টক কুসুমে সুধাবিষসিক্ত।

পথের পাঁচালী থেকে অপবাজিত। নইলে কোন দরকারই থাকত না।

ডাক-দিয়ে-যাওয়া পথের দেবতার কণ্ঠস্বর। স্বরে অনেকদিন আগেই কোলাহল উঠেছিল। বিচিত্র, বিরোধী। একই সঙ্গে কেউ বললেন, অনাসক্তির গান, বললেন, পথের পাঁচালীর দুর্বলতম স্থান।

সত্যিই কি তাই? অনাসক্তির গান? অপু তো তখন কাঁচা কয়লার ধোঁয়া-মলিন বিকেলে, পোড়ো ভিটের মিষ্টি লেবুফুলের সুবাসে, ইছামতীর ঢল-নামা জলের গন্ধে, ঠাকুরঝি পুকুরের দিগন্তের কোলে আগুনের ফেনার মত সূর্যাস্তের ছবিতে, নিশ্চিন্দি-পুরের মায়াময় মুগ্ধ প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্যে উদ্যত, আকুল, উদ্গত-অশ্রু। আসক্তি তো অঙ্গে অঙ্গে। নিঠুর পীড়নে দলিত দ্রাক্ষারসের পাত্র পাওয়া? সে তো কত দীর্ঘ পথ, কত চড়াই-উৎড়াইয়ের বাকি। পথের পাঁচালী তো শুধুই উপভোগ। দুর্যোগ, দুর্ভোগ, দুরাপিত উত্তরণ কোথায়, যে অনাসক্তি, আসীনতা, অনুত্তরঙ্গতা আসবে?

দুর্বলতম স্থানের অভিযোগ বোধ হয় দার্শনিকতার অনুচ্ছেদটি ভেবে। কিন্তু তাও কি ঠিক? ভেবেছিল কি অপু? না, পথের পাঁচালীর রচয়িতা? অধিকার থাকবে না তাঁর? শৈশবস্মৃতির পুনরাবৃত্তি করছি বলেই কি একথা ভাবতে হবে, কই

তাঁর জীবনস্মৃতি ? যাঁরা তাঁর স্বীকারোক্তির কথা পড়েছেন, তাঁরা তাঁর অস্বীকারের কথাও জানেন। নিজেই বলেছেন, কতকটা আমার জীবনের সঙ্গে সংযোগ আছে, কিন্তু সে যোগ খুব ভাসাভাসা। সেটাই তো নির্মাণের গোড়ার কথা।

তাঁর দার্শনিকতায় কোথাও তো তিনি অপুকে অতিক্রম করেননি, বৃন্তচ্যুত করেননি।

তবে এই মোহময় রোম্যাণ্টিক দার্শনিকতা তিনি এনেছেন কেন ?

পথের পাঁচালীর পথের দেবতা বুঝি অনন্তকাল অনন্ত-আকাশতলে দ্যুলোক-ভূলোকের স্বাগতভাষণরত পথের দেবতারই সম্মুখার্পিত পুরোহিত। অনপেক্ষ নয়, আত্মকথনের অধিকারেই তিনি আপন সৃষ্টির সমীপতম শ্রেয় ভাষ্যকার।

সেই ভাষ্যেই অক্রুর-সংবাদ সন্নিকটের সেতুবন্ধ, সম্ভাবিত, সমাকৃষ্ট। স্বরূপে যে পাপড়ি-মেলা পদ্ম, রূপে সেই গুচ্ছবন্ধ রজনীগন্ধা। Pickwick paper, Vanity Fair, Pendennis বা Remembrance of Thing Past-এর মত শিথিলবন্ধ উপন্যাস। অবশ্য Picaresque-বা Biographical উপন্যাসেরই ধর্ম—সহজ, সর্বাঙ্গীণ, শ্লথচারী। শুধু পথের পাঁচালী নয়, আরণ্যকও এমন মেঘক্রীড়িত স্বয়ম্ভব সমবেত-রচনা।

আসলে বিভূতিভূষণের স্বভাবের মধ্যেই এমন এক নির্জনচারী ভ্রাম্যমাণ সংসার-বাউল আসীন, যার ফলে তাঁর রচনারীতিও সাধারণভাবে অনঙ্গীয়, আভাসিত কিন্তু একান্তই অভিভবময়। অপরাজিত, ইছামতীও মূলত অসংলগ্ন এবং চরিতার্থ লেখা তবু বাস্তব-উপন্যাস যাকে আমরা novel of action বলি তার অনেকখানি ছায়া ঘটনায়-নাটকীয়তায়, সংলাপে-চরিত্রে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পথের পাঁচালী, আরণ্যক এত বৃন্তহীন, স্বপ্নমূর্তিময়, নভোচারী যে এর শিথিলবন্ধতা পাঠকের চোখে না পড়ে পারে না।

তবু এই দুটি বইয়ের নির্বাধ নির্মাণশিল্পে এক নিহিত দক্ষতা ও দ্রঢ়িষ্ঠতা আছে। সে সঙ্গীত ঋতুর মাত্রায় গাঁথা, অধরা মাধুরীর সে ছন্দোবন্ধন, অবয়বের সে অবলম্বন, কল্পনার সে কায়া। নতুবা সমস্ত প্রকৃতি এক নিরাকার বস্তুপুঞ্জে, মানবসমাজ এক মৌলিকতাহীন মনুষ্যপিণ্ডে, ভুবনভরা মোহময়তা এক নিছক ভাবাবেশে পরিণত হত। পথের পাঁচালীর রচয়িতা অপুকে যত বোহেমিয়ান করে তৈরি করেছেন, কোন নিভৃত অন্তঃপুরে নিজেকে তিনি তত নিপুণতার নিয়মের পিউরিট্যানিজমে বেঁধেছেন।

আরণ্যকেও তাই। শহরের এক বিবর্ণ ফাল্গুন কবে অরণ্যের দোলপূর্ণিমায় ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নার রঙ ধরে। গ্রীষ্ম আসে তারই হস্তবন্ধনে দুরন্ত দাবানলের অগ্নিবর্ণে, ফুলকিয়া বইহারে রাজসমাগমে বর্ষা নামে, ঝুলন-পূর্ণিমা আসে ভানুমতীর কিশোরী শরীরের কোলাহলে—আজু কী আনন্দ, ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।

Green Mansions-এর দক্ষিণ আমেরিকার ট্রপিকাল অরণ্য গল্পের নায়ক Abel-এর চোখে ঋতুর মালায় গাথা হতে পারত, হয়নি তার কারণ গহন-অরণ্যের বিহঙ্গী-বালিকার জীবনকথায়।

পথের পাঁচালীতেও কোন এক মাঘ মাসের পড়ন্ত বিকেলে কুঠির মাঠ ধরে অপুর যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ঋতুচক্রের রঙ্গশালায় সেই পথে গ্রীষ্ম এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়ে প্রকৃতির উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্যে আম কুড়নর পালা নিয়ে, নয়ত এক মধ্যদিনে আশাহত কর্ণের ব্যর্থতায়, মমতায়। অশ্রুময়, রোদনভরারভসে।

জীবনের পাতা বাড়ে। ঋতুর মাত্রায় আস্থায়ী অন্তরায় এসে পেঁছয়। শীত আসে প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় অপরাহ্নের বাঁকা রোদে, গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনির দুলুনিতে, বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, বইপত্তর, পাঠশালার মাটির মেঝের, দা-কাটা তামাকের জটিল গন্ধে ভবঘুরে রাজকৃষ্ণ সান্যালের পথের গল্পে, শ্রুতিলিখনের স্বপ্নরাজ্যে।

পায়ে-পায়ে ঋতুর ভুবনে উদাসীন শরৎ নামে কাশের বনে, সকালের শিউলিতে, রেল-লাইনের দক্ষিণে বামে দিগন্তবিস্তৃত নীলিমায়। বুঝি নিহিত শরতের নিভৃত প্রকোষ্ঠে বয়ঃসন্ধির সূক্ষ্ম-সুদূর প্রণয়ের পালাবদল হয়। দুরন্ত দুর্গার দেহ-মনের দ্বারে উদ্যত যৌবন-বসন্ত কখন ভিড় করে। কিন্তু এ কোন শরতের আনন্দে টান ধরে অশ্রুজলের জোয়ারের। সোঁদালির নতুন-ওঠা সবুজ পাতায়, শুভ্র লেবু ফুলে চরণ মেলে সে আসে। কী এক বিচ্ছেদ-বেদনায় গ্রামের প্রতি অন্ধিসন্ধি, অপুকে হৃদয়ালিঙ্গনে বন্ধ করার জন্যে ব্যাকুল হয় দুর্গা।

আবার আষাঢ় ফেরে। যে নিয়তিকঠিন প্রকৃতি বালিকামাতার অসহায়, ভঙ্গুর নরম দুটি হাতের প্রতিবোধে একদা পরাজিত, সে আজ ক্রুর, হিংস্র ঝটিকাময়ী রজনীতে অমোঘ, অব্যর্থ, অজেয়। বাতাসের একটি ঘূর্ণি ফুৎকার প্রাণকণিকাটিকে নির্বাপিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

সূক্ষ্ম স্থূল লেখায় জীবনগ্রন্থের আয়তন স্ফীত হয়। আকাশে-বাতাসে তখন ভ্রূক্ষেপহারা শরৎ। শুধু অগোছাল চুলে ভরা একটি ছোট্ট মুখের সনির্বন্ধ অনুরোধ দরজার কোণে কোণে বাতাসে মিশে থাকে। অন্যমনস্ক হরিহরের চলা কখন শ্লথ হয়।

ঋতুর নিরবধি লেখা নিশ্চিন্দিপুরের সীমানায় সাময়িকতার বিরতি টানে। বৈশাখী মধ্যাহ্নে গাঢ় নীল আকাশ মাঠের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে—সামনে কাঁচা মাটির পথ উদাসী বাউলের মত দূর থেকে দূরে এবং উধাও।

সেই পথের শেষে মাঝেরপাড়ার ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল। নিশ্চিন্দিপুরের শেষ চিহ্ন। প্রাসাদে-অট্টালিকায়, গলিতে-গলিতে, ধূলিতে-ধোঁয়ায় আকাশ-ঋতু-অরণ্য আর চোখে পড়ে না। এখন কাশীর বাঁশফটকা গলি।

এবার একটি পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবন এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে আর ছবির মতো করিয়া

হালকা করিয়া আর দেখা চলে না। এখন কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত জীবনদেবতা একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন।

সে পথের শুরু অক্রুর সংবাদে, অভিসার ও মিলন অপরাজিতে। বাইরের ঋতুর মাত্রায় আর তাকে বাঁধা চলে না, পরিবেশে-পরিজনে তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির লাভ-ক্ষতিতে তার হিশেব মেলে না। এখন সবটাই পরাগত, প্রতীকী, পরিসীমাহীন।

বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বিতর্কিত বই অপরাজিত। সেকালে প্রশংসা করে কেউ বলেছিলেন great book, কেউ বলেছিলেন অপরিণতে উপন্যাস।

পথের পাঁচালীতে অপু যখন লাঞ্ছনা-অবমাননায় নিশ্চিন্দিপুরের আশ্রয়ের জন্য কাতর, পথের দেবতা তখন তাকে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়ে দিয়ে পূর্ব জীবনের পুনরাবৃত্তি করাননি। নিয়ে এসেছেন বিস্ময়াহত এক মনসাপোতা গ্রামে। কাছের উলা স্টেশন থেকেও ক্রোশ দুই দূরে।

বন্দী জীবনের সিংহদ্বার থেকে মেঠো গ্রামের মুক্তির পথ কী বিষণ্ণ, বাস্তবায়িত, সহসা। মনে হয় বুঝি কোন জীবনের মহাজন অপু-সর্বজয়াকে অনায়াসে কী নিহিত বাসনায় নবীন এক উন্মুখ চিত্রকরের হস্তে অর্পণ করলেন।

বিবাদে-বিশ্বাসে, কৌমার্যহর আত্মসমর্পণে-অপমানে পথের পাঁচালীর রেশ তখনও মেলায়নি।

এই সুবিশাল প্রাসাদেব উষ্ণতার দাহিকারা তখনও দাহের সিংহভাগ নিয়ে ভস্মাবশেষ সর্বজয়ার দিবসের প্রাযান্ধকার ঘরে মোক্ষদা বামনী ও সদু ঝি হয়ে লড়াই করে। আর তারই মাঝখানে কখন বাৎসল্যের ফসলবিলাসী হাওয়ায় অনবগুণ্ঠিত মাতৃহৃদয়ের রক্ত গোলাপটি সর্বজয়ার হৃদয়ে ফুটে ওঠে।

বন্দীগৃহ নীল আকাশের নীচে এক সীমানাহারা নীড় হয়ে দেখা দেয়। রাঁধুনি পুত্র যশোদার এক হৃদয়ের নিছনি হয়ে আসে—অপরাহ্নের অবহেলিত শুষ্ক তণ্ডুলকণা অপুর উদ্দেশে সুধার নৈবেদ্যে আয়োজিত হয়। বিবাদে হার মানায় যশোদা ও নন্দ-নন্দনের পালা-অভিনয় আপাতত শেষ হয়।

নিপুণ গায়কের মত সুরকারের কণ্ঠে বিবাদী বাস্তবের সুরও একান্ত বন্দী, বস্তুগত, বিত্তহীন জনচিত্তের কল্পলোকের মত লাগে।

সর্বজয়া খাইতে বসিলে অপু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সুর নীচু করিয়া বলিল, আজ এক জায়গায় একটা চাকরির কথা বলেছে মা একজন। লোকেদের কাছে নতুন পাঁজি বিক্রী করতে হবে। পাঁচ টাকা মাইনে আর জলখাবার।

দিন দশেক কাটিয়া গেল। একদিন আসিয়া হাসিমুখে বলিল মা, একটা ঘুড়ির দোকানে বলেছে যদি আমি ঘুড়ি জুড়ে দি, সাত টাকা করে মাইনে আর রোজ রোজ দুখানা ঘুড়ি দেবে।

মুহূর্তের মধ্যে মনে হয় ফিরে আসা কিশোর হরিহর—তার মুখে শোনা কতবার এমনতর স্বপ্ন।

এ আশার দৃষ্টি এ হাসি এ সব জিনিশ সর্বজয়ার অপরিচিত নয়। নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে থাকিতে কতদিন স্বামীর মুখে এই ধরনের কথা সে শুনিয়াছে। এই সুর, এই কথার ভঙ্গি সে চেনে।

শুধু অপুর বা তার পিতৃপুরুষের অসংশোধ্য স্বপ্ননেশা কেন, এত নিদারুণ দারিদ্র্যে-নিষ্ঠুরতায় সর্বজয়ার দুর্বর নারী হৃদয়ের নীড়বাঁধার স্বপ্ন-মমতাই বা কম কীসে?

চারি বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, এই দশা ইহার মধ্যে। কিন্তু সর্বজয়া চিনিয়াও চিনিল না। আজ বহুদিন ধরিয়া তাহার নিজের গৃহ বলিয়া কিছু নাই। অথচ নারীর অন্তর্নিহিত নীড় বাঁধিবার পিপাসাটুকু ভিতরে ভিতরে তাহাকে বড় পীড়া দেয়। তাহা ছাড়া পুত্রের অনভিজ্ঞ মনের তরুণ উল্লাসকে পরিণত-বয়সের অভিজ্ঞতার চাপে শ্বাসরোধ করিয়া মারিতে মায়াও হয়।

এত বিষাদপূর্ণ জীবনেও সুধা আসে। একি শুধুই বিভূতিভূষণের ভাবনা-কল্পনায়? পৃথিবীর পুরোহিতের মত দূরে না অন্তঃপুরে একদিন বলে উঠেছিলেন, জীবনের বাঁকে বাঁকে তোমার জন্যে কত বিস্ময় যে অপেক্ষা করছে। মনে হয় এ কোন অবগুণ্ঠিত অপরিসীম রূপকারের হাতের কাজ। গদ্যে লেখা যেন জীবনানন্দেরই কথা, ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ।

সে ভোরে কত আসন্ন আলোর আশ্বাস। কত রাত্রিশেষের ভাঙা উৎসবের সীমারেখা।

সে আলোয় দেবতার নির্মাল্যের মত কোন এক দূরাপির্ত আত্মীয় ভবতারণ চক্রবর্তীর হাত ধরে সর্বজয়া মনসাপোতায় আবার নীড় বাঁধে, স্বপ্নের চেয়ে সুদূর কৈশোরের আর একটি করুণার নীড় ভাঙে। সে নীড় অপু ও লীলার। এত প্রায়-অদেখা, অকথিত, অপ্রকাশিত, এত অনপনেয়, এত অমোঘ। এত হৃদয়াশ্রুকাতর। যে দুর্গার মৃত্যুকে পথের পাঁচালীর কবি সহজপ্রতিম দুস্তর শোক সায়রে আভাসিত করেছিলেন, অপরাজিতের লেখক এই বৃন্তচ্যুত দুটি কিশোর কিশোরীর সুধাকে কী অনায়াস অন্যমনস্কতায় সায়াহ্নাকাশের নীচে বিষণ্ণ রক্তিম করে তুলেছেন।

লীলা! পরক্ষণেই লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল। কিন্তু অপুর দিকে চাহিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। অপুকে যেন আর চেনা যায় না। সে তো দেখিতে খুবই সুন্দর, কিন্তু এই দেড় বৎসরে কী হইয়া উঠিয়াছে সে? লীলার যেন একটু লজ্জা হইল। বলিল ওঃ আগের চেয়ে মাথাতে কত বড় হয়ে গিয়েছ। লীলার সম্বন্ধেও অপুর সেই কথাই মনে হইল। এ যেন সে লীলা নয়। যাহার সঙ্গে সে দেড় বৎসর পূর্বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত গল্প ও খেলা করিয়াছে। দুজনেই যেন একটু সংকোচ বোধ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর লীলার কেমন

একটা অপূর্ব মনের ভাব হইল—সে ধরনের অনুভূতি লীলার জীবনে এই প্রথম, আর কাহারও সম্পর্কে সে ধরনের কিছু তো হয় নাই ; লীলা বলিয়া উঠিল, চলে যাবে ? হয়তো সে কী আপত্তি করিতে যাইতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, যাওয়া না-যাওয়ার উপর অপুর তো কোন হাত নাই। খানিকক্ষণ কেহই কথা বলিল না।

কোথাও ভালবাসার কোন কথা নেই, তবু সব কথাই ভালবাসার। গল্পকার যেন কী নিশ্চিন্ততায় সকালের রোদে উলা স্টেশনে রক্তাক্ত রেঙ্গের কামরাটি দাঁড় করিয়েছেন। সেখান থেকে মনসাপোতা গ্রাম। অপুর পৃথিবীর একান্ত ওপারে। স্মৃতিহীন, লীলাহীন, পরিচয়হীন।

এই মনসাপোতাতে সর্বজয়া তার এতদিনের স্বপ্নকে বাস্তব করে পেয়েছে। আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। আবার এই মনসাপোতাতেই ষষ্ঠী মাকালপুজোয় পুরুতগিরি করে জীবন কাটাতে হবে একথা ভেবে অপু অস্বস্তিবোধ করেছে। তাই অপুর নিশ্চিন্দিপুর থেকে মনসাপোতা আসা শুধু গ্রামান্তরে আসা নয়, অপু যদি কাশী থেকে আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসত তাহলে নিশ্চিন্দিপুরের সর্বব্যাপী প্রভাবের মাঝখানে আজকের এই অস্বস্তির, এই মহৎ অতৃপ্তির সে সন্ধান পেত কিনা কে জানে।

মনসাপোতাতে প্রকৃতির স্নেহস্পর্শ অপুর প্রকৃতিপিপাসু অন্তরকে খুশি করেছে সত্য, কিন্তু তা তার সমগ্র মনকে আগের মত আবিষ্ট করতে পারেনি। বৃহত্তর জীবনের হাতছানিতে সে দৈনিক চারক্রোশ পথ হেঁটে আড়বোয়ালের স্কুলে যাতায়াত করছে। এই পথ অপুর কাছে নিশ্চিন্দিপুরের পথের মত প্রকৃতিতে নিবিড়, আবার অজানা পথের আনাগোনায় আকর্ষণীয়।

ক্রোশ দুই পথ পথ। দুধারে বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ, মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ। স্কুলে বসিয়া অপুর মনে হইত সে যেন একা কতদূরে বিদেশে আসিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত—ছুটির পরে নির্জন পথে বাহির হইয়া পড়িত—বৈকালের ছায়ায় ঢ্যাঙা তাল খেজুর গাছগুলো যেন দিগন্তের আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে—পিড়িং পিড়িং পাখীর ডাক—হু হু মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ আনিতেছে-সর্বত্র একটা মুক্তি, একটা আনন্দের বার্তা।...কিন্তু সর্বাপেক্ষা সে আনন্দ পাইত পথচলতি লোকজনের সঙ্গে কথা কহিয়া। কত ধরনের লোকের সঙ্গে পথে দেখা হইত—কত দূর গ্রামের লোক পথ দিয়া হাঁটিত, কত দেশের লোক কত দেশে যাইত। অপু সবেমাত্র একা পথে বাহির হইয়াছে বাহিরের পৃথিবীটার সহিত নতুন ভাবে পরিচয় হইতেছে, পথে ঘাটে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের কথা জানিতে তাহার প্রবল আগ্রহ।

পথের পাঁচালীতে হরিহরের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়ে সে যখন পথে বেরিয়েছিল তখন সে পথে অজানা পথিকের ভিড় এবং তাদের জীবন-কাহিনী শোনার আগ্রহ কিছুই ছিল না। তার কারণ পথের পাঁচালীতে ছিল অপুর কল্পলোকের সীমা

বিস্তারের আয়োজন, অপরাজিততে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার পরিচয়ের আয়োজন। যে বৃহত্তর জীবনের হাতছানিতে অপু একদিন মনসাপোতার যজমানী কাজ ছেড়ে আড়বোয়ালের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। সেই বৃহত্তর জীবনের ডাকেই সে দেওয়ানপুরের স্কুলে এসে পৌঁচেছে। এই ডাক মানুষকে ঘরছাড়া করে, অপুকেও সর্বজয়া-ছাড়া করেছে। তবু সর্বজয়ার জন্য তার মমতার অন্ত নেই। কুলুইচণ্ডী পুজো করার জন্য মায়ের অনুবোধ ঠেলে যেদিন সে না খেয়ে স্কুলে উপস্থিত হয়েছিল সে দিনটি তার কাছে আনন্দে ও বেদনায় স্মরণীয়। আনন্দ তার পরীক্ষার সাফল্যে ও হাইস্কুলে পড়তে যাওয়ার সুযোগে ; বেদনা তার মায়ের করুণ মুখচ্ছবিতে।

মায়ের করুণ মুখচ্ছবি বারবার তাহার মনে আসিতে লাগিল। পথের পাশে দুপুরের শ্যামল মাঠ, প্রাচীন তুঁত-বট গাছের ছায়া, ঘনশাখা পত্রের অন্তরালে ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ, সব যেন করুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই অপূর্ব করুণ ভাবটি বড় গভীব ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল।

দেওয়ানপুরের স্কুলজীবনে অপুর যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতা জীবন আরম্ভের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা নিশ্চিন্দিপুরের মত শৈশবস্বপ্নে আচ্ছন্ন নয়, কৈশোর-চেতনায় জাগ্রত। যে বৃহত্তর জীবন ঘেড়ে তার স্কুল সেই জীবনের সবটাই তার কাছে এখন অভিনব। স্কুল বোর্ডিং-এ থাকতে থাকতে জীবনের বিচিত্র অনুভূতির সঙ্গে অপুর পরিচয়ের শুরু। এখানে থেকেই সে নিজের সম্পর্কে গর্ববোধ করতে, বঞ্চিত হবার অভিজ্ঞতা পেতে, বাউণ্ডুলে হতে—এক কথায় বাস্তব মানুষ হতে শিখেছে। অপুর এই পরিবর্তিত রূপের কথায় পটু বলেছে তুই আর সেই নিশ্চিন্দিপুরের পাড়া গেয়ে ছেলে নেই। সর্বজয়ারও মনে হয়েছে, পুরাতন অপু যেন আর নাই। অপু তো এরকম মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া কথা বলিত না। সে তো পকেটে হাত পুরিয়া এভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইত না। গাছের ছায়ায় বসে সে যখন পড়ে—

For my home is in distant Bingen.
Fair Bingen on the Rhine !

তখন তার মনে পড়ে মাকে আর নিশ্চিন্দিপুরকে। মাজোয়ানের মেলায় পটুর অনুসঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরকে আরও বেশি মনে পড়ে—মমতায় ও মহত্ত্বে এমনি করেই অপুর সঙ্গে বৃহত্তর জীবনের পরিচয় হয়।

শুধুই কি অপুর? এই পাঁচ মাসেই স্মৃতিতে আকীর্ণ অপুহারা দুপুর সর্বজয়ার কী একাকী লাগে! শূন্য ঘরে অপুর মুখচ্ছবির নির্মাত্রীর কাছে ঠোঁটের সে ভঙ্গি, চোখের সে চঞ্চল চাউনি যত মনে পড়ে না, তত সে পাগলের মত হয়ে ওঠে।

কোন কোনদিন নির্বাধ বেদনায় সর্বজয়ার নীরব চোখের জল কল্পনায় পরিণত হয়। কতদিনের কত পুরন কথা মনে পড়ে। অপু কবে দিদিকে কাঁঠালের ভক্ত না বলে প্রভু বলেছিল, কবে সেই সাড়ে তিন বছরের বালক খেলতে খেলতে কোন নিহিত উদাসীর মত বিরাট সোনাডাঙার পথ হাঁটতে শুরু করেছিল। পাঠকচিত্তে গল্পকারের

কী মায়াময় অসপত্ন একাধিপত্য! যে নিশ্চিন্দিপুর এতদিন দারিদ্র্যে-দমনে মাটির চেয়েও কঠিন ও একরকম মনে হয়েছিল আজ মনে হয় সবটাই আলাদা।

এখন তাহাই যেন রূপকথার রাজ্যের মত সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারকার ধরাছোঁয়ার বাইরের জিনিশ। ভাবিতে ভাবিতে প্রথম বসন্তের পুষ্পসুবাস-মধুর বৈকাল বহিয়া যায়। তখন অস্ত আকাশে কত রং ফুটিয়া আবার মিলাইয়া যায়, গাছপালায় পাখি ডাকে। এরকম একদিন নয়, কতদিন হইয়াছে।

এমনই এক কান্না-আতুর সর্বজয়ার দিনগুলিতে অবিশ্রান্ত বর্ষাদিনে পৃথিবী-ভরা আকস্মিক সকালের রোদের মত মাথাভর্তি ঢেউখেলান চুল নিয়ে দূর থেকে অপু আসে।

পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া সর্বজয়া ছেলেকে জড়াইয়া ধরে।

তারপর সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরে শুধু সর্বজয়া আর অপু। হাসিতে ঘাড়ের দুলুনিতে মনে হয় আবার সেই পুরন অপু ফিরে এসেছে। বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছা করে।

—হাতে পায়ে বল পেলাম মা. এক এক সময় মনে হত—অপু বলে কেউ ছিল না। ও যেন স্বপ্ন দেখিছি। আবার ভাবতাম—না, সেই চোখ, টুকটুক ঠোঁট. মুখের তিল—স্বপ্নই নয়, সত্যিই তো রাঁধতে বসেও কেবল মনে হয়, মা, অপুর আসা স্বপ্ন হয় তো—সব মিথ্যে—তাই কেবল ওর মুখ চেয়েই ঠাউরে দেখি—সর্বজয়া তেলিগিন্নির কাছে গল্প করে। মাতৃহৃদয়ের কূলহারা সব ডোবান স্নেহে মনে হয় অপুর ছেলেমানুষির জন্য তার মন কী তৃষিত!

অপু না বাড়ুক সব সময়ে তাহার উপরে একান্ত নির্ভরশীল ছোট খোকাটি হইয়া থাকুক—কিন্তু তাহার অপু যে একেবারে বদলাইয়া যাইতেছে।

দেওয়ানপুর স্কুলে পড়তে পড়তে যে দুটি বিষয়চর্চার ফলে অপুর মনে সীমাহীনতার স্বপ্ন জেগেছে, বিভূতিভূষণ যাকে বলেছেন, **vastness of space and passing time**—সে দুটি বিষয় জ্যোতির্বিদ্যা ও ইতিহাস। জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতে করতে তার মনে হয়েছে, এতবড় বিশাল কোন জিনিশের ধারণাও কখনো করে নাই—নক্ষত্রের সম্বন্ধেও কিছু জানা ছিল না। শরতের আকাশ রাত্রে মেঘমুক্ত—বোর্ডিং-এর পিছনে খেলার কম্পাউণ্ডে রাত্রে দাঁড়াইয়া ছায়াপথটা প্রথম দেখিয়া সে কী আনন্দ। জ্বলজ্বলে সাদা ছায়াপথটা কালো আকাশের বুক চিরিয়া কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে—শুধু নক্ষত্রে ভরা।

ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তার মনে হয়—কোথায় এই হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন সমাধি……পিরামিডের অন্ধকার গর্ভগৃহে বহু হাজার বৎসরের সুপ্তি ভাঙিয়া সম্রাট মেংকাউরা গ্রানাইট পাথরের সমাধিসিন্দুকে যখন রোষে পার্শ্ব পরিবর্তন করেন—মনুষ্যসৃষ্টির পূর্বেকার জনহীন. আদিম পৃথিবীর নীরবতার মধ্যে শুধু সিহোর নদীর লিবীয় মরুভূমির বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়—অপূর্ব রহস্যে ভরা মিশর।

পথের পাঁচালীতে ইছামতীর ওপার অপুকে যে দূর জগতের হাতছানিতে ডেকেছে অথবা মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত-রাজপুত জীবনসন্ধ্যা তাকে যে অতীত কালের কথা শুনিয়েছে, ভূগোল পড়ার পর দূর বিশ্বের নক্ষত্রলোক তার মনে যে রহস্যের সৃষ্টি করেছে সে সবই প্রধানত তার কল্পজগতে। অপরাজিততে অন্তহীন স্থানকালের চেতনা বিজ্ঞানে-ইতিহাসে প্রমাণিত হয়ে অপুকে বৃহত্তর জীবনের বিশ্বাসে আরও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দেওয়ানপুর স্কুলের পড়া শেষ করে এই বৃহত্তর জীবনের আকর্ষণে সে কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়েছে। কলকাতায় পড়ার ব্যাপারে দেওয়ানপুরের প্রধান শিক্ষক তাকে বলেছিলেন, কোন কোন পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না। আমি কলকাতাকেই ভাল বলি। অপু বৃহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল বলেই তার শিক্ষকের নির্দেশকে সে মেনেছিল।

তবু সে স্বপ্ন শিশিরের শব্দের মতন সত্যিই কত রক্তঝরা। মায়ের রন্ধনবৃত্তির দাসীজীবনে যে লীলা মুক্তির সহসা নীলাকাশের মত অপুর জীবনে বিচ্ছেদের নিবিড় ব্যথায় স্মৃতির ছায়া হয়ে গিয়েছিল, সেখানেই একদিন এল নির্মলা।

নতুন ডেপুটিবাবুর বাড়িতে গার্জেন-টিউটরের যে চাকরি সে যেন অপুরই অভিজ্ঞতার আর এক পরত। সেই পরতে দুটি হৃদয়েব কী অলক্ষ লেনদেন—স্বর্গের মত আভাসিত, স্বর্গেরই মত অরক্ষিত। সূক্ষ্ম অথচ সুকঠিন। লীলা, নির্মলা সবাই যেন অপুর পূর্ণপ্রেমের সহচরী। বিভূতিভূষণ একদা বলেছিলেন, মেয়েরা আগে মা, তারপর অন্য কিছু। দুজনেই কিশোরী, কিন্তু অসহায় অপুর মুখচ্ছবিতে মাতৃহৃদয়ের সুধা কি কিছু কম বর্ষিত হয়? প্রথম প্রেমে যা ছিল এক রুদ্ধশ্বাস মিনতি, নির্মলার তাই এক দুর্মর প্রত্যাশা। নিষ্ঠুর পীড়নে অপু কেন তার হৃদয়-স্নেহের দ্রাক্ষারস নিঙড়ে নেয় না? বিদায়ের রক্তরেখা বৃহত্তর জীবনে শুধু একটি সঙ্গীতের স্মৃতির মত লেগে থাকে। অশ্রুসজল লগ্নটুকু নির্মলার অনুপস্থিতিতে অগোচর এক কান্নায় স্তম্ভিত। কিন্তু যাত্রার বন্দরে তখন জোয়ারের জলের টান লেগেছে।

প্রথম যৌবনের শুরু, বয়ঃসন্ধিকালে বুপ ফাটিয়া গাড়তেছে—এই ছায়া, বকুলের গন্ধ, বনান্তরের অবসন্ন ফাল্গুন দিনে পাখির ডাক। ময়ূরকণ্ঠী রং-এর আকাশটা রক্তে যেন এদের নেশা লাগে—গর্ব, উৎসাহ, নবীন জীবনের আনন্দভরা প্রথম পদক্ষেপ।

নির্মলা তুচ্ছ। আর এক দিক হইতে ডাক আসে—অপু আশায় আশায় থাকে। নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির এ আহ্বান, রোমান্সের আহবান তার রক্তে মেশা, এ আসিয়াছে তাহার বাবার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে—বন্ধনমুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হওয়া, মন কি চায় না বুঝিয়াই তাহার পিছু পিছু দৌড়ান, এ তাহার নিরীহ শান্ত প্রকৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পিতামহ রামহরি তর্কালংকারের দান নয়। যদিও সে তার নিস্পৃহ

জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়নপ্রিয়তাকে লাভ করিয়াছে বটে। কে জানে পূর্বপুরুষ ঠাঙাড়ে বীরু রায়ের উচ্ছৃংখল রক্তে আছে কিনা—তাই তাহার মনে হয়, কী যেন একটা ঘটিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় থাকে। অপূর্ব গন্ধে ভরা বাতাসে, নবীন বসন্তের শ্যামশ্রীতে, অস্ত সূর্যের রক্ত আভায় সে রোমান্সের বার্তা যেন লেখা থাকে।

দেওয়ানপুর স্কুলে পড়ার সময় যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে অপুর পরিচয় সেই বাস্তব জীবনের বৃত্ত কলকাতায় আরও বৃহত্তর হয়েছে। এই জীবনে তার দৈনন্দিন দুঃখকষ্ট যত প্রচণ্ড, অভিজ্ঞতাও তত গভীর। কখনও অখিলবাবুর বা সুরেশ্বরের দাক্ষিণ্যে কখনও সহপাঠী জানকীর সাহায্যে ঠাকুরবাড়িতে বদলি ভোগ খেয়ে তার দিন কাটে।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া বৈকালে তাহার এত ক্ষুধা পায়, যে গা ঝিম ঝিম করে, পেটে যেন এক ঝাঁক বোলতা হুল ফুটাইতেছে…পয়সা জুটাইতে পারিলে অপু এ সময়টা পথের ধারের দোকান হইতে এক পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া খায়।

অনাহার ও দুঃখ দারিদ্র্যের এই দিনগুলিতে সে আত্মীয় সুরেশদার ও তার মার কাছে অবজ্ঞার, ছাত্রী প্রীতির কাছে অবমাননার, হোটেলের ঠাকুরের কাছে অপমানের— এককথায় নিঃস্বতার মর্মান্তিক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। এবং এত দুঃসহ দুঃখ সত্ত্বেও মনসাপোতায় ফিরে গিয়ে গৃহস্থ পুরোহিত হয়ে থাকার কথা সে ভাবতেই পারে না।

সে ভাবে, কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাপোতা ফিরিবে। প্রত্যেক রক্তবিন্দু বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

এখানে জীবন আলো পুষ্টি প্রসারতা—সেখানে অন্ধকার, দৈন্য নিভিয়া যাওয়া। কলকাতার নিষ্ঠুর পীড়ন সত্ত্বেও যে কারণে সে কলকাতা ছাড়তে পারে না সে তার এই বৃহত্তর জীবনকে জানার আগ্রহ। এত দুঃখের পাশেই এই কলকাতাতেই প্রণব-অনিলের মত সহপাঠীর বন্ধুত্ব, দারোয়ানের স্ত্রীর মায়ের মত স্নেহ, কলেজ লাইব্রেরির বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হবার আনন্দ সে পেয়েছে, তার মনে হয়েছে, শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবন ধারা প্রতি পলের রস পাত্র পূর্ণ করিয়া তোমায় অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে।… …সে যে করিয়া হউক বাঁচিবে।

এই কলকাতাতেই অপুর তরুণ প্রাণের বিচিত্র রূপ, উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস, অনভিজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা—প্রকাশিত হয়েছে। কলেজ ইউনিয়নে প্রবন্ধ পড়ার ব্যাপারকে উপলক্ষ করে সে তার প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, তার সুখ দুঃখ আশা নিরাশা ভরা উনিশটি বছর যে বৃথা যায়নি—একথা সে বিশ্বাস করেছে। পথের পাঁচালীতে পটুর সঙ্গে ইছামতীতে নৌকো ভ্রমণ করতে করতে যে আরব সমুদ্রের স্বপ্ন সে দেখেছিল—এই কলকাতাতেই অনিলের সঙ্গে জাহাজে চাকরির চেষ্টায় সেই স্বপ্নকে সে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছে। অক্রূর-সংবাদে যে অপু নিজের অবস্থা সম্বন্ধে লজ্জাবোধ ও তাকে গোপন করতে শিখেছিল, এই কলকাতাতেই নাগরিকতার

অনিবার্য প্রভাবে সেই শিক্ষাকে সে আরও রপ্ত করেছে। এমনি করে সাধারণত্ব-অসাধারণত্বের, মহত্ত্ব-দীনতার আলো-আঁধারি রঙে অপু যেমন জীবন্ত তেমনি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

জ্যোতির্বিদ্যা-ইতিহাসের যে রাস্তায় অপুর সঙ্গে অন্তহীন দেশকালের পরিচয় সে রাস্তা অপরাজিততে অনিলের মৃত্যুতে আধ্যাত্মিকতার জগতে এসে পৌঁছেছে। এই আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে অপুর পরিচয় অবশ্য আরও আগে দুর্গার মৃত্যুতে। অপু তখন শিশু বলে সে মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া তার অবচেতন মনে, কিন্তু অনিলের মৃত্যু তার চিন্তিত সচেতনতায়। মৃত্যু সর্বজয়ার আরও কত মোহনবেশেই না দেখা দেয়! জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদ ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে? ···ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু···এতটুকু অপু··নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র জ্যোৎস্নারাতে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া আলো আসিয়া পড়িত যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মত কচিমুখে··সেই অপু···।

অপুর জীবনে সর্বজয়ার মৃত্যু এক মিশ্র মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। যে বৃহত্তর জীবনের ডাকে সাড়া দেবার জন্য অপু অস্থির সেই জীবনের পথে অপুর একমাত্র বন্ধন মা। মায়ের মৃত্যুতে তাই প্রথমে তার বাঁধন ছেঁড়ার উল্লাস, মুক্তির আনন্দবোধ। ঠিক তারই পাশে মায়ের প্রতি মমতায় দশপিণ্ড দানের দিন সে কী তীব্র বেদনা।

পুরোহিত বলিতেছেন—প্রেতা শ্রীসর্বজয়া দেবী—অপু ভাবে কাহাকে প্রেত বলিতেছে? সর্বজয়া দেবী প্রেত! তাহার মা প্রীতি, আনন্দ ও দুঃখ মুহূর্তের সঙ্গিনী, এত আশাময়ী, হাস্যময়ী এত জীবন্ত যে ছিল কিছুদিন আগেও, সে প্রেত?

তারপরই মধুর আশার বাণী—হে আকাশের দেবতা, বাতাসের দেবতা, তাই কর, মা আমার অনেক কষ্ট করে গিয়েছেন, তাঁর প্রাণে তোমাদের উদার আশীর্বাদের অমৃত-ধারা বর্ষণ কর।

কলকাতার সমস্যা অপুর কাছে দুঃখকষ্টে ও মানুষের প্রবঞ্চনায় যত নিবিড়, তার সমাধান ও সীমাহীন দেশকাল ও মানুষের অনুরাগের মাঝখানে তত বিরাট। লোহার ব্যবসা করতে গিয়ে আটটি টাকা চুরি যাওয়ার দুঃখ অপুর সেই অবস্থায় যত দুঃসহ আবার এই ধারণাতীত বিরাট অস্তিত্বের পাশে তার অকিঞ্চিৎকরতাও তত সামান্য।

তবু প্রতিদিনের দিনযাপনের সঞ্চয়হারা আশঙ্কায় এই আটটি টাকা তো সর্বস্বহারা হওয়া। আটটি টাকা তার জীবনযাপনের সদ্য সোপান। সে সোপান যখন ভাঙে তখন সে তো অস্তিত্বকে কূলহীন সাগরের এক চূর্ণ নায়ে পরিণত করে। মরণ সাগরে পারি কি আর সম্ভব? আর এই অসম্ভবের চেয়ে অবশ্যম্ভাবী এক দিগন্তহারা আকাশ জীর্ণ নৌকাযাত্রীকে দিকচক্রবলয়িত বিরাটত্বে নভোচারী করে তোলে।

ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দুপুর, বেলা দেড়টা আন্দাজ, কেহ কোনদিকে নাই। আকাশ মেঘমুক্ত। দূরপ্রসারী নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত চিল উড়িয়া চলিয়াছে

....দূর হইতে দূরে• সেই ছেলেবেলার মত—ছোট হইতে ক্রমে মিলাইয়া চলিয়াছে। একজন ঘেসেড়া লম্বা লম্বা ঘাস কাটিতেছে। ছোট্ট একটি খোট্টাদের মেয়ে ঝুড়িতে ঘুঁটে কুড়াইতেছে। দূরে খিদিরপুরে ট্রাম যাইতেছে। তাহার দিকে বড় একটা জাহাজের চোঙ—ফোর্টের বেতারের মাস্তুল—আকাশ কী ঘন নীল। এই তো চারিধারের মুক্ত সৌন্দর্য, এই কম্পমান শ্রাবণ দুপুরের খর রৌদ্র....বিদ্যুৎ, সূর্য. রাত্রির তারা ·প্রেম···মা···দিদি···অনিল মাথার উপরে নিঃসীম নীল আকাশ মৃত্যু-পারের দেশ···চিররাত্রির অন্ধকার সেখানে সাঁই সাঁই রবে ধূমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ দুলাইয়া উড়িয়া চলে—গ্রহ ছোটে, চন্দ্র সূর্য লাটিমের মত আপনার বেগে আপনি ঘুরিয়া বেড়ায়···তুহিন শীতল ব্যোমকেশ দূরে দূরে দেবলোকের মেরু পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে তারারা মিট মিট করে, এই পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে জন্ম লইয়া আটটা টাকা ·· তুচ্ছ আটটা টাকা···এ কোন বিচিত্র !

কলকাতার এই নিদারুণ দারিদ্র্যের সুধাই বা কম কীসে ? ছায়াহীন. ভবিষ্যহীন জীবনে হোক না উন্মাদ, তবু তো অপুর বাসস্থানের পাশের বাড়িব ঝরোখার একটি কাষ্ঠপাতে তরুর মত তরুণীর একটি চকখড়ির লেখা থাকে. হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে। কৌতুকে-বিশ্রম্ভালাপে কী ক্ষমতার বিষণ্ণ মধু যে অপুর বুকের মধ্যে জমে। মধু কী কিছু কম তার কারখানার আবাসস্থানের নিম্নতলবাসিনী তেওয়ারি-বৌয়ের হৃদয়ে ?

কাপড় ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারীর স্ত্রী একদিন সোডা সাবান দিয়া নিজেদেব কাপড সিদ্ধ করিতে বসিয়াছে, অপু নিজের ময়লা শার্ট ও ধুতি খানা লইয়া গিয়া বলিল, বহু তোমার সাবানের একটু দেবে। তেওয়ারি বধূ বলিল, দিজিয়ে না বাবুজি, হাম হাঁড়ি মে ডাল দেগা।

মধ্যাহ্ন নিদাঘে নির্মম কালের উধাও রথে যখন লীলার একটু মমতার ক্ষণস্থায়ী ছায়া পড়ে তা কি অপুর জীবনে কম সুনিবিড় ছায়া দেয় ? চরণ কি চলনের মধুবর্ষণ করে না ? দুঃখ কি বিচিত্র আনন্দ বেদনায় আস্বাদ্য হয় না ?

ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ডালহৌসি স্কোয়ারের মোড়ে সে রাস্তা পার হইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। সামনে একখানা গাড়ি ট্রাফিক পুলিশে দাড় করাইয়া রাখিয়াছিল—হঠাৎ গাড়িখানার দিক হইতে কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে গাড়ির কাছে গিয়া দেখিল লীলা ও আরও দুই-তিনটি অপরিচিত মেয়ে। অপুর আকৃতিতে একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনার কী হয়েছে ? মাথাব চুল অমন ছোট।—মা কেমন আছেন ?—মা ? মা তো নেই। কথা শেষ করিয়া অপু একদফা পাগলের মত হাসিল। অপুর মুখের হাসিটা যেন একখানা তীক্ষ্ণ ছুরির মত তাহার মনের কোন মণিমঞ্জুষার ফাঁকটাতে সজোরে চাড়া দিল. এক মুহূর্তে অপুর সমস্ত ছবিটা তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল—সহায়হীন. মাতৃহীন, আশ্রয়হীন, পথে পথে সে বেড়াইতেছে—কে মুখের দিকে চাহিবার আছে ? লীলার

গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমাদের ওখানে কবে আসছেন বলুন।

ব্যর্থ বিবাহিত যৌবনের বেদনা নিয়েও তার মন অপুর করুণ মুখচ্ছবির চারপাশে ফেরে। অপূর্ব, অনেকদিন তোমার খবর পাইনি—তুমি কোথায় আছ, আজকাল কী কর, জানবার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার, কিন্তু কে বলবে, কার কাছেই বা খবর পাব ? সেবার কলকাতায় গিয়ে বিনুকে একদিন তোমার পুরন ঠিকানায় পাঠিয়েছিলাম—সে বাড়িতে অন্যলোক আজকাল থাকে, তোমার সন্ধান দিতে পারে নি, কিন্তু আমি বড় অশান্তিতে আছি এখানে কখনও ভাবিনি এমন আমার হবে। এই সব অশান্তির মধ্যে যখন আবার মনে হয় তুমি হয়ত মলিন মুখে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ তখন মনের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু সে তো অন্তিম অপরাজিতের।

কলকাতায় দৈনন্দিন জীবন যুদ্ধের মাঝখানে অপুর আত্মপরিচয় ও প্রাণবত্তার প্রকাশ। কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ-করার পর কাগজের অফিসে সামান্য বেতনের একটা চাকরিতে তার যোগদান এবং এই সময় সহপাঠী প্রণবের সঙ্গে তার দেখা। কর্ণয়ালিস স্কোয়ারে শেষ রাত পর্যন্ত বন্ধুর সঙ্গে প্রাণখোলা আলাপ, পাহারাওলাকে দেখে **Hail holy light ! Heaven's first born** বলে চিৎকার ও পলায়ন সবই তার তার প্রাণধর্মে পরিপূর্ণ। কলকাতার কর্মব্যস্ত ও প্রকৃতির স্পর্শমুক্ত জীবন থেকে মুক্তির জন্য খুলনার এক অখ্যাত গ্রাম গঙ্গানন্দকাটিতে প্রণবের সঙ্গে তার যাত্রা এবং সেখানে অপর্ণার সঙ্গে তার পরিচয় ও পরিণয়। অপর্ণার সঙ্গে পরিণয় অপুর কথায় জীবনের জগতের সঙ্গে একী অপূর্ব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ! এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় একদিকে যেমন মায়ের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত, অপরদিকে তেমনি অসাংসারিক।

অপু ভাবে মা ঠিক এই ধরনের কথা বলিত—এই ধরনেরই স্নেহ-প্রীতি-ঝরা চোখে। সে দেখিয়াছে, কী দিদি, কী রানুদি, কী লীলা, কী অপর্ণা—এদের সকলেরই মধ্যে মা যেন অল্পবিস্তর মিশাইয়া আছেন—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায় ইহারা একই ধরনের কথা বলে, চোখে মুখে একই ধরনের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।

এই বিশ্ব পারাবারের তীরে অপুর সংসার তার অনভিজ্ঞতায় ও ছেলেমানুষিতে সংসার-লীলায় পরিণত হয়। ফুলশয্যার রাতে অনাত্মীয় এত বড় একটি মেয়ের পাশে এক বিছানায় শুতে তার যেমন বাধো বাধো ঠেকে, তেমনি বিয়ের সময় সিল্কের পাঞ্জাবির অভাবে তার মন খুঁত খুঁত করে। অপুর এই যৌবনলীলা যেমন অমলিন, তেমনি নিবিড়। এই পালায় বিভূতিভূষণ যদি তার যৌবনধর্মের যোগ ঘটাতেন, সাধারণের আবেগ উত্তেজনাটুকুকে রেখে দিতেন, তাহলে অপুর সামগ্রিকতা নিয়ে আর হয়ত কোন তর্ক উঠত না। ভৈরব নদীর ধারে খড়ের ঘরে গৃহস্থালী পাতার দিনটি থেকে শুরু করে প্রথমে মনসাপোতায়, পরে কলকাতায় বাসা করা পর্যন্ত এই স্বল্পস্থায়ী কালটুকু নিয়ে অপু-অপর্ণার দাম্পত্য-জীবন। ভৈরব

নদীর ধার, মনসাপোতার খোড়ো ঘর, কলকাতার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, অপর্ণার মত সঙ্গিনীর সাহচর্য ও আশ্রয়ে অপুর কাছে মায়াময় হয়ে দেখা দিয়েছে। অপুর মনে হয়েছে তার দুঃখিনী মা এই স্নেহশীলা সেবাপরায়ণা নারীর মধ্যে আবার ফিরে এসেছে। অপুর কাছে তার সংসার পার্থিবতা-অপার্থিবতার এক বিচিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তা যেমন ঘনিষ্ঠ তেমনি সর্বাতিশায়ী। মনসাপোতার বর্ষণমুখর রাতে অপর্ণার সঙ্গে যেমন তার মিলনের গাঢ় সুখ, অপর দিকে সেই মিলনের পথে মৃত্যুপারের মায়ের অস্তিত্বে তার অধ্যাত্মসচেতনতা। সংসারের লীলা যে সীমাহীনতার ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে—মনসাপোতার বাড়িতে, মায়ের স্বপ্নে, কলকাতার ছাত্রী প্রীতির পরিবর্তনশীলতায়—অপুর কাছে তা ধরা পড়ে। তার মনে হয়, কাল মহাকাল, সবারই মধ্যে পরিবর্তন এনে দেবে ··তোমার বিচারের অধিকার কি ?

অপর্ণাকে নিয়ে অপুর সংসার—সুখ উপভোগের নিবিড় মুহূর্তে অপর্ণার মৃত্যু। অপুর মনে হয় কী বিরাট শূন্যতা · কি যেন একটা বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে···কখনও না, কাহারও দ্বারা না · সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই,—শুধু এক রুক্ষ ধূসর, বালুকাময় বহু বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এই দুরপনেয় শূন্যতাবোধ নিয়ে অপুর কলকাতা ত্যাগ এবং চাঁপদানিতে ইতরভাবে জীবন-যাপন। তারই মাঝখানে উদ্যত তিক্ত বারিধিরাশির সামনে স্নেহ ও সেবার এক টুকরো সবুজ দ্বীপ পটেশ্বরী। ভালবাসাও নয় কৃতজ্ঞতার একফোঁটা জীবনরস।

মেয়েটির নাম পটেশ্বরী, সুন্দরী বলিয়া কোনদিন মনে হয় নাই অপুর। তবে এটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে তাহার সুবিধা অসুবিধার দিকে বাড়ির এই মেয়েটি বেশি লক্ষ্য রাখে। তাহার ময়লা রুমাল নিজে চাহিয়া লইয়া সাবান দিয়া রাখে···এ সবের জন্য সে মনে মনে মেয়েটির উপর কৃতজ্ঞ—কিন্তু এ সব জিনিস বাহিরের দিক হইতে যে এভাবে দেখা যাইতে পারে, সে জানেই না, এ ধরনের সন্দিগ্ধ ও অশুচি মনের খবর।

এই পটেশ্বরীকে কেন্দ্র করেই প্রাণের শেষ ফুলিঙ্গে অপুকে যেন এখনও চেনা যায়। মাঘী পূর্ণিমার দিন। কত রাত্রে জানে না, তক্তাপোশের কাছের জানালাতে কাহার মৃদু করাঘাতের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে যেন বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া। তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া অবাক হইয়া গেল—পটেশ্বরী। পটেশ্বরী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, অপু চাহিয়া দেখিল তাহার পায়ের কাছে একটা ছোট পুঁটুলি পড়িয়া আছে।—অনেক রাত্রে বেরিয়েছি আমি, আর সেখানে যাব না—মাস্টার মশাই আপনি একটু বলবেন বাবাকে মাকে বুঝিয়ে। ভাগ্যে রাত। পথে কেহ দেখে নাই। বাড়ির মধ্যে গিয়া পটেশ্বরী কাঁদিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল—পটেশ্বরীর হাতে পিঠে ঘাড়ের কাছে প্রহারের কাল শিরার দাগ। মাঘী পূর্ণিমার দিন পাঁচেক পরে শুনিল পটেশ্বরীর স্বামী আসিয়া পুনরায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে আরও বেশি আশ্চর্য হইতে হইল, সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপারে, একদিন

সে ছুটির পরে বাহিরে আসিতেছে স্কুলের বেহারা তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল—স্কুলের সেক্রেটারি লিখিতেছেন, তাহাকে আর বর্তমানে আবশ্যক নাই— একমাসের মধ্যে সে যেন অন্যত্র চাকুরি দেখিয়া লয়।

সীমাহীন দেশকালের স্বপ্নে যে অপু এতদিন বিভোর ছিল. অপর্ণার মৃত্যুতে সেই অপু অবসন্ন ও স্বধর্মচ্যুত ; প্রণবের কাছে এই অপু নিজের অবস্থার প্রাধান্য প্রমাণের জন্য ওকালতি করেছে। প্রণবের সঙ্গে সঙ্গে অপুর সম্বন্ধে আমাদেরও মনে হয়েছে—সে অপু যেন আর নাই - প্রাণশক্তির প্রাচুর্য একদিন যাহার মধ্যে উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছি, সে যেন প্রাণহীন নিষ্প্রভ। এমনতর স্থূল তৃপ্তি বা সন্তোষবোধ, এ ধরনের আশ্রয় আঁকড়াইয়া ধরিবার কাঙালপনা কই অপুর প্রকৃতিতে তো ছিল না কখনও।

ছেলেবয়েসে দিদিকে, পরে অনিল সর্বজয়াকে হারিয়ে অপু যে মৃত্যুপারের দেশের অস্পষ্ট তালীবনরেখা দেখতে পেয়েছিল, সেই অপুর আজ মনে হয় এই দেখতে চাওয়া এবং পাওয়া দুই-ই মিথ্যা—মৃত্যুতেই জীবনের শেষ। সুদূরের পিপাসাও যেমন মিথ্যা অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমন মিথ্যা।·· মৃত্যুপারে কিছুই নাই. সর্বশেষ। মা গিয়াছেন - অপর্ণা গিয়াছে - সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে - পূর্ণচ্ছেদ।

তবুও অপুর নিস্তেজতা ও স্বধর্মত্যাগ একান্তই সাময়িক, চাঁপদানিতে থাকার সময় বিশু স্যাকরার দোকানে তাসের আড্ডায় পোস্ট অফিসে প্রতিদিন ডাক খোলার স্থূল আনন্দে সে দিন কাটিয়েছে। একথা যেমন সত্য আবার এও সত্য সহপাঠী জানকীর বিলেত যাওয়ার খবরে সে নিজের এই সংকীর্ণ অবস্থায় বিষণ্ণ ও অতৃপ্তবোধ করেছে। কিসের জন্য একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা। এই ক্ষুধা তার সেই বৃহত্তর জীবনের। এই বৃহত্তর জীবনে পুনরায় এনে ফেলার জন্য বাইরের যে আঘাতের প্রয়োজন ছিল সে আঘাত এসেছে চাঁপদানি স্কুলের তরফ থেকে এবং ভেতরে-বাইরের দুই আঘাতে অপুর নিরুদ্দেশ যাত্রা। তবু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার সীমাঞ্চলে মমতার রুপোলি রেখাটুকু লেগে থাকে। পথের মতই দুর্মর দুরপনের এই স্নেহ সুধারস! সে সুধারস অপুর তিন বছরের শিশুর নবনীমুখ থেকে চুরি করা। যাত্রারম্ভের ঠিক মুহূর্তটিতে মনে হয় মাতৃহারা অসহায় শিশুটির নরম হাতের স্পর্শ, অস্ফুট কলকণ্ঠের অর্ধোচ্চারিত গান, কাজল 'পকে কচি ঠোঁটের কী কৌশলে 'ফ' উচ্চারণ করে। মায়ের বাড়ির চাঁদের চেয়ে মাসির চাঁদ কেন ছোট? কলকাতায় ফিরিবার সময়ে অপর্ণার মা বলিলেন, বাবা, আমার মেয়ে গিয়েছে. যাক্—কিন্তু তোমার কষ্টই হয়েছে আমার বেশি। তোমাকে যে কী চোখে দেখেছিলাম বলতে পারিনে, তুমি যে এরকম পথে পথে বেড়াচ্ছ, এতে আমার বুক ফেটে যায়। অবসিত বাৎসল্যের সুধাপানে বিভূতিভূষণের অন্য-মনস্কতার সেই bid-out-plot। নিঃশব্দে নৌকা পীরপুরের ঘাটে এগয়।

লেগে থাকে দরিদ্র কবিরাজ-সখা—পত্নীর রাজরাজেশ্বরীর মত অকৃপণ প্রীতি। অভাবে-তাড়নায়, প্রত্যাশায়-প্রতীক্ষায় কী নিবিড়!

বেলা বেশি ছিল না। খাওয়া দাওয়ার পর গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। অপু বলিল, আচ্ছা আজ উঠি ভাই। ওগো অপূর্বকে আলোটা ধরে নালির মুখটা পার করে দাও। একটা ছোট কেরোসিনের টেমি হাতে বৌটি অপুর পেছনে পেছনে চলিল। কেরোসিনের আলো? না কোন স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবীর হাতের তারার আলো?

এই নিরুদ্দেশের পথে সীমাহীন দেশকালের সঙ্গে অপুর প্রত্যক্ষ পরিচয়, কৈশোরে এ প্রথম যৌবনে কখনও আভাসে ইঙ্গিতে, কখনও পুঁথিপত্রের পরোক্ষতায় অপুর মনে যে সীমাহীনতার স্বপ্ন জেগেছিল, উত্তর ভারতের পরিত্যক্ত রাজধানী, মিনার-মসজিদ-কবর, মধ্যপ্রদেশের অরণ্যের মাথার ওপরে নিঃসীম নক্ষত্র খচিত আকাশ দেখতে দেখতে সে স্বপ্ন স্থানে ও কালে আরও প্রত্যক্ষ হয়েছে। পুরন দিল্লি দেখতে দেখতে সে অবাক হল? অভিভূত হল, নীরব হয়ে গেল, গাইড বুক উল্টেতে ভুলে গেল, ম্যাপের নম্বর মিলতে ভুলে গেল—মহাকালের এই এক বিরাট শোভাযাত্রা একটার পর একটা বায়োস্কোপের ছবির মত দৃশ্যে সে যেন সম্বিতহারা হয়ে পড়ল।

মধ্য প্রদেশের ঘন অরণ্যে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে থাকতে থাকতে শান্ত সনাতন বিশ্বের আড়ালে এক প্রচণ্ড গতিবেগ তার চোখে পড়েছে।

রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলি কী অদ্ভুত ভাবে স্থান পরিবর্তন করে। আবলুস ডালের ফাঁকের তারাগুলি ক্রমশ নীচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পর্বতসানুর দিক হইতে মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশালকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়। বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে। রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত সনাতন জগৎটা কী যে ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল—অদ্ভুতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল। জীবনে কখনও তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই বিশাল নক্ষত্র জগৎটার সঙ্গে, এভাবে হইবার আশা কখনও কি ছিল?

অমরকণ্টকের নির্জন পথে অপুর জীবনে সীমাহীনতার চরম উপলব্ধি ও পরম অভিব্যক্তি। বড় বিস্ময় শহর থেকে বেশ কয়েক যোজন দূরে নিবিড় বনস্পতি ও বন্য শ্বাপদ-অধ্যুষিত বিন্ধ্যারণ্যের মাঝখানে শ্যাম-ঘন অরণ্যের এক প্রতিমূর্তি আজবলাল। পেটে ভাত জোটে না, তবু কী শান্ত সন্তোষে আগ্রহ-ভরা সৌন্দর্য প্রীতিতে অনর্গল তুলসীদাসের কাব্য পড়ে সে, সংস্কৃতে সুরচিত কবিতা লেখে। মনে হয় এ কোন সুপ্রাচীন সভ্য এক জাতির অতীত সংস্কৃতির মাঝখানে আলাদিনের প্রদীপের আলোয় আসীন হওয়া! আর সেই মুহূর্তে আজবলালের মূর্তি ভেঙে আর এক ব্যর্থ গ্রাম্য কথাকোবিদ অপুর অশ্রুসজল চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। সে কথাকোবিদ অপুর বাবা হরিহর। এ রাত্রির অভিজ্ঞতা ভারি অদ্ভুত ও বিচিত্র। বাংলোতে অপুরা একটি লোক পাইল, সে ইহারই মধ্যে ঘরে খিল দিয়া বসিয়া কী পড়িতেছিল।

ডাকাডাকিতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল লোকটা মৈথিলী ব্রাহ্মণ—নাম আজবলাল ঝা। অতিথি সৎকার সারিয়া সে ঘরের মধ্যে বসিয়া সুস্বরে সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিল। কাব্যচর্চায় অসাধারণ উৎসাহ, তুলসীদাসী রামায়ণ হইতেই অনর্গল দোহা আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল। অপুর এত সুন্দর লাগিল এই নিরীহ অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্তা এবং আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি। এই নির্জন বনবাসে একটা শান্ত সন্তোষ।—আচ্ছা পণ্ডিতজী, এ বন কি অমরকণ্টক পর্যন্ত এমনি ঘন ?—বাবুজী, এই হচ্ছে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যারণ্য। চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্য এই বনের পশ্চিম দিকে। ওঝাজী সুস্বরে রামায়ণের বনবর্ণনা পড়িতেছিল। চারিপাশের দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খায়। নির্জন শালবনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। কোথায় রেল মোটর এরোপ্লেন, ট্রেড-ইউনিয়ন ' ওঝাজীর মুখে অরণ্যকাণ্ডের শ্লোক শুনিতে শুনিতে সে যেন অনেক দূরের এক সুপ্রাচীন জাতির অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে গিয়া পড়িল একেবারে। অতীতের গিরিতরঙ্গিণী তীরবর্তী তপোবন হোমধূমপবিত্র গোধূলির আকাশতলে বিস্তৃত অগ্নিশাল, শ্রুগভাণ্ড, কুশ, সমিধ, জলকলস, চীরকৃষ্ণাজিন পরিহিত সজপা মুনিগণের বেদপাঠধ্বনি ··শান্ত গিরিসানু···বনজ কুসুমের সুগন্ধ···গোদাবরী···তটে পুন্নাগ নাগকেশরের বনে পুষ্প আহরণরতা সুমুখী আশ্রমবালাগণ···কৃষ্ণাঙ্গী রাজবধূগণ···ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় নদীজল আলো হইয়া উঠিয়াছে, তীরে স্থলবেতসের বনে ময়ূর ডাকিতেছে।···তারপর তিনি অনেকগুলি কবিতা শুনাইলেন। বিভিন্ন ছন্দের সৌন্দর্য ও তাহাতে তাঁহার রচিত শ্লোকের কৃতিত্ব সকল উৎসাহে বর্ণনা করিলেন। একটি অদ্ভুত ধরণের দুঃখ বিষাদ অপুর হৃদয় অধিকার করিল। কত কথা মনে আসিল, তাহার বাবা এই রকম গান ও পাঁচালি লিখিতেন তাহার ছেলেবেলায়। কোথায় গেল সে সব ? অথচ কত ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহাদের পিছনে আছে। চাঁপদানির পোস্ট অফিসে কুড়াইয়া পাওয়া সেই ছোট মেয়েটির নাম ঠিকানা ভুল পত্রখানার মতই তাহা ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া যাইবে।

এই মাহেন্দ্রমুহূর্তে অপুর কাছে প্রিয়জন বিরহের বেদনা, হারানর কষ্ট এক গহন অর্থে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে অর্থে দুঃখ হয় অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রু হয় অনন্ত জীবনের উৎসধারা। দুর্গার মৃত্যু থেকে শুরু করে অপর্ণার মৃত্যু পর্যন্ত এই অপূরণীয় শূন্যতা অমরকণ্টকের নির্জন অরণ্যভূমিতে অপুর কাছে এক মূল্যাতীত পূর্ণতায় উপস্থিত হয়। অপুর মনে হয়, এই শান্ত নির্জন আরণ্যভূমিতে বনের ডালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নব জগতের জন্ম হয়—ঐ দূর ছায়াপথের মত তাহা দূর বিসর্পিত, এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—তাহাকে ধরা যায় না অথচ এই সব নীরব জীবন মুহূর্তে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত তাহার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়। এই এক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছে—এই

অদৃশ্য জগৎটার মোহস্পর্শ মাঝে মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জরীর উন্মাদ সুবাসে, সন্ধ্যাধূসর অনতি স্পষ্ট গিরিমালার সীমারেখায়, নেকড়েবাঘের ডাকে ভরা জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র জনহীন আরণ্যভূমির গাম্ভীর্যে অগণিত তারাখচিত নিঃসীম শূন্যের ছবিতে। বৈকালে ঘোড়াটি বাঁধিয়া যখনই বক্রতোয়া নদীর ধারে বসিয়াছে, যখনই অপর্ণার মুখ মনে পড়িয়াছে কতকাল ভুলিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন শৈশব মধ্যাহ্নে মায়ের মুখে শোনা মহাভারতের দিনগুলির কথা মনে পড়িয়াছে—তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইয়াছে যে জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ আনন্দভরা সৌম্য জীবন লুকান আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন মন্দাকিনী। তাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে, দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয় অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা।

উপলব্ধির এই পূর্ণ মুহূর্তগুলিতে অপুর মনে সৃজনের অশান্তি জেগেছে—আর্টের জন্ম হয়েছে। তার মনে হয়েছে জীবনের এই গভীর রহস্যকে যতদিন দশজনের চোখের সামনে না ফোটাতে পারবে ততদিন সে কিছুতেই শান্ত হতে পারবে না। সে কি ঐ সামান্য বনঝোপের তেলাকুচার লতাটার চেয়েও হীন?

তাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নাই, সে জগতে কি কিছু দিবে না?…দুঃখের নিশীথে তাহার প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে—সে কি তাহা লিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে না? জীবনকে সে কীভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে না?

দীর্ঘ ছ বছর ধরে সৃষ্টির এই তাগিদ বহন করে অপুর কলকাতা প্রত্যাবর্তন ও সাহিত্যরচনা। এই প্রত্যাবর্তনের পথের শেষে লীলার মৃত্যু এবং কাজলের সংস্পর্শ। কাজলের জন্ম বেশ কিছুদিন আগে হলেও এতদিন অপুর সঙ্গে কাজলের কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। ফিরে এসে কাজলের জীবনকে কেন্দ্র করে অপু এক নতুন রসের সন্ধান পেয়েছে—সে রস বাৎসল্যরস।

কাজলকে সে এতদিন ভুলিয়াছিল, কিন্তু আজ এইমাত্র হঠাৎ দেখিবামাত্রই অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহ সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য এই ক্ষুদ্র বালকটি। তাহারই ছেলে, নিতান্ত অসহায়, অবোধ। জগতে সে ছাড়া তাহার আর কেহই নাই। কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়াছিল?…বাৎসল্যরসের এমন গভীর অনুভূতি জীবনে তাহার এই প্রথম।

বিভূতিভূষণ কাজলকে কেন্দ্র করে অপরাজিত জীবনচক্রের পরিধি রচনা করেছেন। এই জীবনচক্রে শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে পরিণতিতে —পরিণতি থেকে কাজলের মাধ্যমে আবার দ্বিতীয় শৈশবে ফিরে আসা। একেই বিভূতিভূষণ বলেছেন life force—অপরাজিত জীবনরহস্য। যে পথের দেবতা অপুকে নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়ে দেশান্তরের পথে বার করেছিলেন, সেই পথের দেবতা

অপুকে কাজল করে নিশ্চিন্দিপুরে ফেরৎ দিয়েছেন। চব্বিশ বছর আগে অপু যেদিন গ্রাম ছেড়েছিল সেদিনটি ছিল চড়কের পরদিন। চব্বিশ বছর বাদে অপু যেদিন গ্রামে ফিরেছে সেদিনটিও আবার সেই চড়কের পুজোরই দিন। অপুর মনে হয়েছে এই চব্বিশ বছরের মাঝখানে জীবনের কোথাও ফাঁক নেই।

চব্বিশ বছর আগে যাহারা ছিল ছোট, এই রকম মেলা দেখিয়া ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে তেলেভাজা, জিবেগজা হাতে ফিরিয়া গিয়াছিল তাহারা অনেকদিন বড় হইয়া নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—কেউ বা মারা গিয়াছে, আজ তাদের ছেলে-মেয়েদের দল ঠিক আবার তাহাই করিতেছে।

ইছামতীর ধারে সন্ধ্যার অন্ধকারে জন্ম-জন্মান্তরের এই অপরাজিত ও অশেষ জীবন তার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার মনে হয়েছে, এই সবটা নিয়ে আসল বৃহত্তর জীবন—পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। সে দিন নয়, তুচ্ছ নয়—এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়।

নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নবরূপ সে দেখিতে পাইল। মনে হইল যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন বিশাল-আত্ম দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হইতেছে—তিনি জানেন কোন জীবনের পর কোন অবস্থার জীবনে আসিতে হয়, কখনও বা সঙ্গীত কখনও বা বৈষম্য—সবটা মিলিয়া অপূর্ব রসসৃষ্টি—বৃহত্তর জীবন সৃষ্টির আর্ট।

ছ হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ঈজিপ্টে—সেখানে নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে, নীলনদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা বোন বাপ ভাই বন্ধু বান্ধবের দলে কবে সে এক মধুর শৈশব কাটাইয়া গিয়াছে—আবার হয়ত জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে কর্ক-ওক, বার্চ ও বীচ্ বনের শ্যামল ছায়ায় বনেদী ঘরের প্রাচীন প্রাসাদে, মধ্যযুগের আড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায়, সুন্দরমুখ সখীদের দলে। হাজার বছর পর আবার হয়ত সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে—তখন কি মনে পড়িবে এবারকারের এই জীবনটা?—কিংবা কে জানে আর হয়ত এ পৃথিবীতে আসিবে না—ওই যে বটগাছের সারির মাথায় ক্ষীণ প্রথম তারাটি—ঐ জগতে অজানা জীবন ধারার মধ্যে হয়ত এবার নবজন্ম! কতবার যেন সে আসিয়াছে—জন্ম হইতে জন্মান্তরে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া—বহু, বহু দূরে অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল—কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি জীবনের ও জন্ম মৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কী অপরূপ অভিযান··· শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে পুণ্যে ও দুঃখে শোকে ও শান্তিতে।···এই সবটা লইয়া আসল বৃহত্তর জীবন—পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র— তার স্বপ্ন যে শুধুই কল্পনা বিলাস, এ যে হয় না তা কে জানে, বৃহত্তর জীবনচক্র কোন দেবতার হাতে আবর্তিত হয় কে জানে?—হয়ত এমন সব প্রাণী আছেন যাঁরা মানুষের মত ছবিতে, উপন্যাসে, কবিতায় নিজেদের শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না—

তাঁহারা এক এক বিশ্ব সৃষ্টি করেন—মানুষের সুখে দুঃখে উত্থানে পতনে আত্ম-প্রকাশ করাই তাঁহাদের পদ্ধতি—কোন মহান বিবর্তনের জীব তাঁহার অচিন্তনীয় কলাকুশলতাকে গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে এ রকম রূপ দিয়াছেন কে তাহাকে জানে—

একটি অবর্ণনীয় আনন্দে, আশায় অনুভূতিতে রহস্যে মন ভরিয়া উঠিল। প্রাণবন্ত তাহার আশা, সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখা-পত্রের তিক্ত গন্ধ আনে—নীল শূন্যে বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রবে শোনায়। সে জীবনের অধিকার হইতে তাহাকে কাহারও বঞ্চনা করিবার শক্তি নাই—তাহার মনে হইল সে দিন নয় তুচ্ছ নয়—এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তাহার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বর্হিষদ পিতৃলোক-এই শত, সহস্র শতাব্দী তাহার পায়ে চলার পথ—তাহার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত পুরোভাগে অক্ষুণ্ণভাবে বর্তমান। সে জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা।

অপুর মনের এই বৃহত্তর জীবনবোধের ক্রমবিকাশ, অপরাজিত জীবন-রহস্যের উপলব্ধি নিয়ে পথের পাঁচালী—অপরাজিতের সম্পূর্ণতা।

বিভূতিভূষণেরও কী শিল্পিত অভিব্যক্তি! চব্বিশ বছর আগের চড়কপুজোর দিন, চব্বিশ বছর বাদে যেন অনন্তেরই একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত হয়ে দেখা দেয়। খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন নগণ্য নিশ্চিন্দিপুর সেই অনন্তেরই যেন একটি স্টেশন।

মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিত পক্ক জম্বু ফলের গন্ধে গোদাবরী তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রান্তর ছিল, এখনও আছে।

চিঠিতে লিখেছিলেন, আমি বোধ হয় জন্মেছিলাম উষ্ণকটিবন্ধের অরণ্য প্রদেশে ম্যাকাও পাখি হয়ে। সেই অরণ্যেরই বনবিহঙ্গ সত্যচরণ। কী বিচিত্র, বিবর্তমান, ব্যাপৃত! অস্তিত্বেরই এক সঙ্গম। সেখানে মিশেছে পরিজন, প্রকৃতি-উদ্ভাসিত এক অপরিসীম মহাকালের দিগন্তপটে। নিহিত কোন বিশ্বকর্মশালায় নিরন্তর নিরত বিধাতার সৃষ্টির অসতর্ক মুহূর্তে আরণ্যকের বিধাতা সৃজনের সূত্রটিকে মর্মে গেঁথে ফিরেছেন। দেহে দুকূলের মত, চন্দ্র কিরণের মত, অনুভবে আত্মপ্রকাশের মত এ সৃষ্টি শায়িত, সম্পূরিত, শিল্পিত।

শরীরের বয়ঃসন্ধির মত, সহৃদয়ের অভিজ্ঞতার মত এত সহজ তার বিকাশ! মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেখা উপন্যাস হলে যা হয় অধিবাস্তব, অর্থহারা, অণোরণীয়ান, মর্ম নিয়ে লেখা তাই হয়েছে মরমী, মগ্ন, মহতোমহীয়ান।

বিস্ময় লাগে, পুতুলনাচের শশী ডাক্তার কখন যে নদীর শশী থেকে নিয়তির ক্রীতদাস হয়ে ওঠে, আশা কোন নিগূঢ় ভবিতব্যের হাতে স্বামীর উৎসঙ্গ থেকে প্রণয়ীর

মোহময়তায় উৎক্ষিপ্ত হয়, নাগরিক সত্যচরণ শ্যামাঙ্গী বনদেবীর কী সুধারসে আরণ্যক হয়ে ওঠে!

বুঝি গ্রীষ্মের সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে গড়ের মাঠে বাদাম গাছের নীচে সময় কখন পনেরটি বছরের উজান বেয়ে এক বসন্তে সত্যচরণকে সদ্য বি. এ. পাশ করা অতিক্রান্ত যৌবনে ফিরিয়ে আনে। কর্মহীন সে-সব দিনের কী উদ্বেগ, উন্দামতা! স্কুলের চাকরি ছাড়া, মেসে দু মাসের টাকা বাকি পড়া, অপারগতায় অন্যত্র ব্যবস্থার নোটিশ। তারই মাঝখানে কলকাতার মাদকতা, পাড়ায় পাড়ায় সরস্বতী পুজোর বাজনা, কোলাহলরত ছেলেমেয়ের দল, হিন্দু হস্টেলের পুরন বন্ধু সতীশের সঙ্গে দেখা, মধ্যরাত পর্যন্ত ছাত্র-জীবনের দিনগুলির মত জলসায় মাতা এবং অনাহারের পরিবর্তে চর্চচুষ্যে ভোজনপর্ব সমাধা করে মেসে ফেরা।

আরও বিস্ময়, আলাদীনের প্রদীপের মত নীরন্ধ্র বেকার জীবন থেকে জলসার রাতে একদা সহপাঠী জমিদার-বন্ধু অবিনাশের সনির্বন্ধ অনুরোধে পূর্ণিয়ার জঙ্গল-মহালের অসপত্ন ম্যানেজার পদ পাওয়া!

বি. এন. ডবলু. রেলওয়ের ছোট্ট একটি স্টেশন। বসন্ত তখনও অরণ্যের শীতের কিনারায়, কিনারায়।

অপরাহ্নের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভিড় করা ঘন ছায়া। বনশ্রেণীর মাথায় অল্প অল্প কুয়াশা। রেল লাইনের দু ধারে তাজা মটর শাকের গন্ধ। ঠাণ্ডা সান্ধ্যবাতাসে সত্যচরণের কেমন মনে হয়, আরভ্যমাণ জীবন সন্ধ্যার মত, নীলবর্ণ বনশ্রেণীর মত বড় নির্জন হবে। শুধুই কি কলকাতা—বিকল একটি মানুষের অনাবিল চিত্তের অনাগত দিনকে দেখা, না কোন নিহিত ভুবনের প্রত্যুষের প্রথম আভাকে উপলব্ধি করা? ভুবনব্যাপী হিমবর্ষী অন্ধকারে সারারাত্রি গোযান চলে, গাঢ় গোপন মুরতিচারী প্রভাতের কিনারায় কখন প্রকৃতির মাটির রঙ বদলায়।

ক্ষেতখামার নেই, বস্তি লোকালয়ও বড় একটা দেখা যায় না—ছোট বড় বন, কোথাও ঘন কোথাও পাতলা, মাঝে মাঝে মুক্তপ্রান্তর। ফসলের আবাদ নেই। জঙ্গলমহালের কাছারি। বনের মধ্যে প্রায় দশ পনের বিঘা জমি পরিষ্কার করে কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি—শুকন ঘাস ও বন ঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া, তার ওপর মাটি দিয়ে লেপা কাছাড়ি বাড়ি।

সঙ্গ-নিঃসঙ্গতায় সত্যচরণের জীবনের টানাপোড়েন শুরু হয়। প্রত্যাশিত, বাস্তবিকই। কলকাতার প্রাণময় চাঞ্চল্যের মাঝখানে সমধিক অতিবাহিত সত্যচরণের জীবনে এমন শব্দহীন জনপদহীন নির্জনতা কল্পনারও অতীত।

দিনের পর দিন এখানে অরণ্যে পর্বতে সূর্যোদয় হয়। আবার সন্ধ্যায় বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ রাঙা করে সূর্য অস্ত যায়। শীতের এগারঘণ্টা ব্যাপী দিন খাঁ খাঁ করে। কর্মহীন কথাহীন কোন অভিনিবেশে উপায়হীন জীবন বদুঃসহ লাগে।

এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কী ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ-জীবন আমার জন্য নয়।

রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সব ভাবিতেছি, এমন সময় কাছারির বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন, এখানে আছেন সতের-আঠার বছর।

গোষ্ঠবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।—ম্যানেজারবাবু কিছুদিন এখানে থাকুন—তারপর দেখবেন, জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। গোলমাল কী লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভাল লাগবে না।

মনে মনে ভাবিলাম ভগবান সে দুরবস্থার হাত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। তাহার আগে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কোনকালে কলকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি।

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে ঘরের জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান পটভূমিতে আঁকাবাঁকা একটা বন ঝাউয়ের ডাল, ঠিক হেন জাপানি চিত্রকর হকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।

দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

শুধু প্রকৃতি নয়, অরণ্যের পরিজনও কী অমলিন মোহনবেশে সত্যচরণকে মুগ্ধ করার জন্যই না দেখা দেয়। অথচ নিপুণ সুরকারের হাতে স্বপ্নাচ্ছন্ন আরণ্যকের বাঁশিতে বাস্তব উপন্যাসের কী বিবাদী-বিরোধী-বিব্রত সুরই না বাজে! কী নিপুণতায় মোহ আসে মোহভঙ্গের কণ্টকময়, শঙ্কাতুর দোলাচলতার পথ পেরিয়ে।

সৃজনের দ্বিতীয় বিধাতা বুঝি-বা বড় স্বার্থহীন চতুর ব্যবসায়ী। পণ্যের প্রলেপে তিনি একান্তই পারঙ্গম। কবিতা থেকে রোমাণ্টিক, কী-মনোবিকলনের উপন্যাসে, গল্পের কী গানের বিচিত্র গতিপথে—মার্গ কী মেঠো সঙ্গীতে তাঁর মৌলিক রসসৃষ্টির কাজ সমান ভাবেই চলে।

সত্যচরণের পরিবর্তমান রূপ এমন একশেষভাবে সত্যচরণেরই পথ ধরে। কোথাও অবিশ্বাস বোধ হয় না, সংশয় লাগে না, সমর্পণে বাধা জাগে না। স্রষ্টার পরিবর্ত-মানতার এ এক যাদুকরী কাজ। উপলব্ধির শানিত শায়কগুলি এত পুষ্পশায়িত! হৃদয়কে কখন যে তা বিদ্ধ করে, বিধ্বস্ত করে, রসাবেশে আপ্লুত করে, বোঝা দুরূহ।

প্রত্যাবর্তনের যে ব্যাকুলতর বেদনা চন্দ্রকিরণে স্নিগ্ধ হয়, টিলার উপর এক আসন্ন সন্ধ্যায় তাই আবার মায়াবী অতীতের সিংহাবলোকনে শতগুণে প্রত্যাবৃত্ত, বর্ধিত হয়।

কতদূর পর্যন্ত এক চমকে দেখিতে পাইলাম—কলুটোলার মেস, গোলদিঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চখানি, কলেজ স্ট্রীটের বিরামহীন জনস্রোত। হঠাৎ যেন কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহারা। মন হু হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! এই দূর বিসর্পী দিগন্তব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া মন উদাস হইয়া গেল, কেমন ভয়ও হইল। তখনই সংকল্প করিলাম, সামনের মাসটা কোনরূপে কাটাইব তারপর চাকুরিতে

ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া মানুষের আনন্দ উল্লাস ভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

মানুষের কণ্ঠস্বরেই সত্যচরণ আর এক নবীন জীবনানভূতির সন্ধান পেয়েছে। সে কণ্ঠস্বর সভ্য শহরবাসী বহুজনের নয়, সিপাহী দীন একাকী মুনেশ্বর সিংয়ের। এত স্বল্প, সাশ্রু। বিহ্বল কোলাহল যেন একটি কাকলিতে ঢাকা পড়ে।

—হুজুর একখানা লোহার কড়া কিনে দেবার যদি হুকুম দেন মুহুরী বাবুকে। ভাত রাঁধা যায়, জিনিশপত্র রাখা যায়, ভাত খাওয়া যায়।

একখানা লোহার কড়াই যে এতগুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোকে স্বপ্ন দেখে, এ ধরনের কথা আমি প্রথম শুনিলাম। বড় মায়া হইল। পরের দিন আমার সই করা চিরকুটের জোরে কড়াই কিনিয়া দিলাম।

তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার এই একমাসের মধ্যে সর্বপ্রথম আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলা।

তবু বিবর্তনের বুনোটে কোথাও ফাঁক পড়ে না, আরণ্যকের অন্তর্যামী সাধারণ মর্তবাসীর মতই বেদনার ও বাসনার জাল বোনেন। অভিপ্রায়কে কোথাও আরোপিত করেন না। পরিণতিকে কোথাও প্রক্ষিপ্ত করেন না।

কলকাতার মুগ্ধতার হাতছানি গৃহবাসীর মতই আরণ্যক সত্যচরণের কাছে বারবার দেখা দেয়। রহস্যাতুর মানুষে-মাটিতে সে ঘোর যেন কাটে না।

কিছুতেই কিন্তু এখানকার এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে আমি খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। এই আরণ্যভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া থাকে।

বিভূতিভূষণ কী দক্ষতায় কোলাহলমুখর নাগরিকতার উত্তাপকে এই বিজন বিভুঁই একাকিত্বের হিমশীতল বৈপরীত্যে রক্তিম করেন। অথচ সবই আরও এক রক্তিমতার অপেক্ষায়।

কাছারির ঘরগুলা যেমন দীর্ঘ বনঝাউ ও বাঁশের আড়ালে পড়ে তখন মনে হয় সমস্ত পৃথিবীতে আমি একাকী। গাছের ও ঝোপের মাথায় মাথার অস্তোন্মুখ সূর্য সিঁদুর ছড়াইয়া দিয়াছে। সন্ধ্যার বাতাসে বন্য ও তৃণগুল্মের সুঘ্রাণ। প্রান্তর ও শ্যামল বনভূমির সম্মুখে অবারিত।

আরণ্যক স্রষ্টা সত্যচরণের হৃদয়ের পালাবদলেরই যেন অপেক্ষায় ছিলেন। এত ওতপ্রোত, অভিক্ষেপহীন, আরোহণ-উদ্যত।

এইসময় মাঝে মাঝে মনে হইতে, এখানে প্রকৃতির যে রূপ দেখিতেছি, এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। যত দূর চোখ যায়, এসব যেন আমার, আমি এখানে একমাত্র মানুষ, আমার নির্জনতা ভঙ্গ করিতে আসিবে না কেউ।

তবু নির্জনতা ভঙ্গ হয় অবধারিত কাজেরই দায়িত্বে। আরণ্যকের মরমী লেখক কী সহজ স্বাভাবিকতায় বাস্তবতার দাবিকে অনুগত অধিকর্তার মত কড়ায় গণ্ডায়

পরিশোধ করেন। সত্যানুবোধের লেখা সত্যিকে নিয়ে লেখা উপন্যাসের এক বৈচিত্র্যের মাত্রা পায়।

তিরিশ বছর আগে নদীগর্ভে বিলীন জমি জেগে-ওঠা চর হয়ে প্রজাবিলির এক জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। সে সমস্যা অতীত প্রজার সঙ্গে আহূত প্রজার জমি-স্বত্ব নিয়ে।

আরও সমস্যা লবটুলিয়ায় বাথান এবং লাক্ষাকীট চাষের জন্যে কুলবন ইজারা দেওয়া।

অতিক্ষুদ্র এক খড়ের ঘরে শুকন কাশ ও বনঝাউয়ের বেড়ায়-বাঁধা লবটুলিয়ার কাছারি।

বাস্তবতাকে আর দেখা যায় না, এ যেন আর এক গ্রহ। নিবিড় অরণ্যের হিমঝরা রাতে আগুনের চারপাশে ভিড় করা অবহেলিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গনোরী তেওয়ারী, অন্ত্যজ আদিবাসীর দল।

অথচ কী বিধুরতায় এত আকর্ষণীয়! মাতাপিতৃহীন গনোরী তেওয়ারী পাঁচ বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে বার হয়। গৃহস্থের ঘরে ঠাকুর পুজোয়, ছাত্র পড়িয়ে, ছাতু ও চীনা বাদামের দানায় এতদিন জীবন কাটে। আজ দুমাস যাবৎ তাও বন্ধ। পায়ে পায়ে পেছনে এগলে এই গনোরীই একদিন পাঠশালা খুলেছিল। গ্রামের এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে বিবাহেরৎ সব ঠিকঠাক। মুঙ্গের থেকে একটা ভাল মেরজাইও কিনেছিল। কিন্তু গরীব স্কুলমাস্টার বলে গ্রামের লোকের উসকানিতে সে বিবাহ ভেঙে যায়। তবু বিস্ময় লাগে এই গনোরী তেওয়ারী, গনু মাহাতো, জয়পাল কুমার, অরণ্যের কী সুধারসে এত শান্ত, সম্পূর্ণ, সমর্পিত।

সত্যচরণের প্রজাবিলির প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে একমুঠো অন্নলোভীর দল শ্বাপদ-সঙ্কুল যোজনমাইল পথ পেরিয়ে এখানে উপস্থিত হয়। জানি না বাস্তব উপন্যাস এর অধিক বেদনাদায়ক সত্য আর কী হতে পারে? সত্যচরণের হৃদয়ে কিন্তু এরই সঙ্গে আরও এক গভীর অনুভূতি, বিস্ময়, সমবেদনা যুক্ত হয়। অরণ্যের মুগ্ধতারই যেন আর এক আয়োজন।

কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবন সংগ্রামে যুঝিবার ক্ষমতা কোমল পুষ্পাস্তীর্ণ পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, সত্যকার মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু কঠিন বিস্ময়ে নয় রোমাঞ্চিত পরিবেশেও অরণ্য আরও এক ভয়মিশ্রিত মুগ্ধতার আয়োজন করে।

অনেক রাত্রে কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিসের যেন সম্মিলিত পদধ্বনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছে। গনোরী একটু কান পাতিয়া বলিল, নীলগাইয়ের দল। হয়তো কোন জানোয়ার—শের কী ভালু তাড়া করে থাকবে হুজুর। নিজের

অজ্ঞাতসারে সামান্য কাশ-ডাঁটায় বাঁধা ঘরের আগড়ের দিকে নজর পড়িল। বাহির হইতে একটা কুকুরেও ঠেলা মারিলে উল্টাইয়া পড়িবে।

শুধু বন্য জন্তুর রূপে নয়- প্রখর গ্রীষ্মে, নিদারুণ শুষ্কতায় নিসর্গ শ্বাপদও আসে অভাবিত দাবাগ্নির বেশে।

কী অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়াইতেছে। বন্য শূকর ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়া ছুটিয়া গেল। অর্ধ শুষ্ক কুণ্ডীতে নিঃশব্দে জল খাইতেছে একদিকে দুটি নীলগাই, অন্যদিকে দুটি হায়েনা—দুয়ের মাঝখানে একটি ছোট নীলগাইয়ের বাচ্ছা। বাঙলা দেশের দুপুর দেখিয়াছি—কিন্তু এ রুদ্রমূর্তি কখনও দেখি নাই। ভীম ভৈরবরূপে তাহা আমাকে মুগ্ধ করিল।

তবু এই দিগন্তহারা প্রকৃতি অন্তর-বাইরের জারক রসে সত্যচরণকে কখন বিস্মরণের বিমুগ্ধ চরণে অরণ্যের মর্মস্থলে আনয়নের জন্য আয়োজন করে। সঙ্গ-মুখরিত যে শহরবাসী সত্যচরণ অরণ্যের এই নির্জনতায় একদা অস্থির রুদ্ধশ্বাস, পলায়ন-চিন্তায় কাতর, সেই সত্যচরণের অশান্ত হৃদয়ে শ্যামাঙ্গী বনদেবী পরাহ্নে পূর্ণিমায় নিকটে-দূরে কোথায় মুগ্ধতার প্রলেপ লেপন করে।

যতদিন যাইতে লাগিল জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী নিসর্গ বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, এই স্বাধীনতা এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতায় গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।

একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। মনে আছে সেদিন দোল-পূর্ণিমার রাত। দরজা খুলিয়া বাইরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, সেরকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে কখনও দেখি নাই। চকচকে সাদা বালি-মিশান জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। যেন কেমন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব। মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, মানুষের নিয়ম এখানে খাটিবে না। এইসব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরীদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়। আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

আরণ্যকের লেখক কী সমুদ্ভাসিত শিল্পবোধে এমন সুদূর ও সনাতনের উপন্যাসে শুধু যে সন্নিকটের বাস্তবতার নতুন মাত্রা যুক্ত করেন তা নয়, অরণ্যের নিজস্ব বাস্তবতাকেও বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ ও সত্য করে তোলেন। আরণ্যক শুধু অরণ্যের সুরভি নয়, সত্তাও; শুধু নির্যাস নয়, অস্তিত্বও। ভাবিত কোন দৃষ্টিতে নয়, অভাবিত অরণ্যই তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত, প্রকাশিত; অবশ্যই তা শিল্পীর অলোক-আলোকে।

এই অরণ্যের কিনারায়ই শুধু জান্তব নয়, মনুষ্য শ্বাপদও আসে সম্পূর্ণতার সত্যকে ঘিরে। আসে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা, রাসবিহারী সিং, ছটু সিং।

বন কেটে বসত শুরু হয়। বসতের সীমানা কেটে শুরু হয় দুর্দান্ত মহাজনদের সঙ্গে নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজাদের দ্বন্দ্ব। জমিদার ও পুলিশের উপস্থিতিতে দাঙ্গা বন্ধ হয় বটে, কিন্তু গোপনে চলে খুন-জখমের ঘটনা।

নাঢ়া বইহারের শান্তি চিরদিনের মত ঘোচে।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মত একই নিসর্গ হৃদয়ের দুই বিবদমান সত্তা। দীনতায়-দয়ায় নিষ্ঠুরতায়-নিবেদনে গোচরে-গহনে আরণ্যক আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তবু সমুন্নত শিল্পীর কী পারদর্শিতা যে সুর ও সংগীতের মত মাটি মানুষ ও মহাপৃথিবী স্বতন্ত্র ও সমগ্র।

বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের মত দারিদ্র্য এত অনামনস্ক, উদাসীন ও মর্মস্পর্শী! সম্ভ্রম জাগে, এ শিল্পীরই হাতের এক কারুকাজ। তিনি জানেন কতদূর নিষ্ঠুরতা কী অবধি মধুর হয়ে ওঠে।

অরণ্যে আষাঢ় নামে, কাছারির পুণ্যাহ উৎসব। পূর্বদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিয়াছিল। পুণ্যাহের দিন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এত গরিব দেশ যে থাকিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। দুপুর হইতে না হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারি পৌঁছিতে লাগিল। অনেক মেয়ে ছেলেপুলে লইয়া খাইতে আসিযাছে। কাছারির দপ্তরখানায় তাহাদের বসিবার বন্দোবস্ত করিলাম। পুরুষরা যে যেখানে পারে আশ্রয় লইল। ইহারা এই মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করিয়া খাইতে আসিয়াছে চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু।

বৈকালের দিকে দেখি ঘোর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে তিনটি স্ত্রীলোক উঠানে পাতা পাতিয়া বসিয়া ভিজিয়া ঝুপসি হইতেছে—সঙ্গে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েও। তাহাদের পাতে চীনার দানা আছে কিন্তু গুড় কেহ দিয়া যায় নাই। পাটোয়ারীকে ডাকিয়া বলিলাম—এদের কে দিচ্ছে? আর এদের এই বৃষ্টির মধ্যে উঠানে বসিয়েছেই বা কে? পাটোয়ারী বলিল, হুজুর, ওরা াতে দোষাদ। ওদের ঘরের দাওয়ায় তুললে কোন ব্রাহ্মণ ছত্রী কী গাঙ্গোতা খাবে না। ওই গরিব দোষাদদের মেয়ে-কয়টির সামনে আমি গিয়া নিজে বৃষ্টিতে ভিজিয়া দাঁড়াইতে লোকজনেরা ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল।

নির্ধনের মত ধনীও আসে আপন মহার্ঘতা নিয়ে। সে যে ছোটর কাছে এত ছোট হয়ে আসে, ধাওতাল সাহুকে না দেখলে বোঝা যায় না। কাশ ঘাসের ঝোপের মাঝখানে ময়লা কাপড়ের প্রান্তে যে ছাতু মেখে খায় সেই ব্যক্তিটিই লক্ষপতি ধাওতাল সাহু।

একদিন ধাওতাল সাহু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। উড়ানিতে বাঁধা এক বাণ্ডিল পুরানো দলিল পত্র।—হুজুর মেহেরবানি করে একটু দেখবেন? পরীক্ষা করিয়া দেখি আট দশ হাজার টাকার দলিল তামাদি হইয়া গিয়াছে। বলিলাম সাহুজী, এ অঞ্চলে মহাজনী করতে পারবে রাসবিহারী সিং-রাজপুতের মত লাঠিয়াল মোতায়েন করে। তোমার মত লোকের টাকা শোধ করবে না কেউ। ধাওতালকে বুঝাইতে

পারিলাম না। সে বলিল, সবাই ফাঁকি দেয় না হুজুর, এখনও চন্দ্র-সূর্য উঠছে, মাথার উপর দীন দুনিয়ার মালিক আছেন। আমার সামনেই সে অম্লান বদনে পনের ষোল হাজার টাকার তামাদি দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল—যেন সেগুলি বাজে কাগজ।

ধাওতাল সাহুর কাছে একবার আমার হাত পাতিতে হইল। আদায় সেবার কম। অথচ দশ হাজার টাকার রেভিনিউ দাখিল করিতেই হইবে।

সেদিন যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা শোধ দিতে ছ-মাস দেরি হইয়া গেল—এই ছ মাসেব মধ্যে সে ইসমাইলপুর মহালের ত্রিসীমানায় একবারও পা দেয় নাই।

বিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করিবার ক্ষমতা যদি দার্শনিকতা হয়, তবে ধাওতাল সাহুর মত দার্শনিক আমি অন্তত দেখি নাই।

অরণ্য কী সংকল্পে বেদনায় ও বীরত্বে নগরবাসিনী মুসম্মত কুন্তাকে আপন জারকরসে বন্যতরুর মত সহিষ্ণু নির্ভীক মহিমময়ী করে তোলে। সম্মানিত অতিথির মত অরণ্য তার বৈচিত্র্যকে অপহরণ করে না। উদ্যানলতার মত বনের মাঝখানেও সে ব্যক্তিত্বময়ী, বিদগ্ধ, বিনয়ী।

অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী রাজপুত দেবী সিংয়ের বিধবা পত্নী সে। হাড় কাঁপন পৌষের রাতে লবটুলিয়ার বন্যপশু-অধ্যুষিত দীর্ঘ পথ পার হয়ে সে দিনের পর দিন আপন পুত্রকন্যার জন্য সত্যচরণের ভুক্তাবশিষ্টের অপেক্ষায় প্রতীক্ষায় থাকে। হাত পেতে কেউ কোনদিন তাকে ভিক্ষা করতে দেখেনি। রাসবিহারী সিংয়ের আশ্রয়কে একদা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত জেনে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও সে তাকে ত্যাগ করে।

কুন্তা সত্যই এখনও দেখিতে বেশ, ওর মুখে অসহায় জীবনের দুঃখকষ্ট যেমন ছাপ মারিয়া দিয়াছে—সাহস ও পবিত্রতাও তেমনি জয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা দশ বিঘে জমি যদি তোমায় বিনা সেলামিতে দেওয়া যায়, তুমি ঠিকমত চাষ করে কাছারির খাজনা শোধ করতে পারবে? কুন্তা দিশাহারা হইয়া বলিল জমি। দশ বিঘে। তারপরে হঠাৎ বালিকার মত কাঁদিয়া ফেলিল।

সত্যচরণের গৃহে ফেরার প্রভাতের আকাশে তারই অশ্রুময় বেদনা।

আমার বিদায় লইবার সময় সকাল হইতে সে কাছারির উঠানে দাঁড়াইয়াছিল—পাল্কী যখন তোলা হইল তখন চাহিয়া দেখি সে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে।

কী রাজসমারোহেই না প্রকৃতি সত্যচরণের কাছে উপস্থিত হয়! ইসমাইলপুরের কাছারি থেকে চোদ্দ-পনের ক্রোশ দূরে মৈষণ্ডির প্রসিদ্ধ হোলির মেলা। ছায়াহীন মধ্যাহ্নের খররৌদ্র, পূর্ণিমার মায়াময় জ্যোৎস্না রাত বুঝি কোন গ্রহান্তরের অপরূপতায় সত্যচরণের চোখে ধরা দেয়।

কাছারি ছাড়িয়া পর্যন্ত আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি, এখানে চাকুরি লইয়া আসার দিনটি হইতে এদেশের এই ধু ধু মুক্ত প্রান্তর ও বনভূমি আমাকে ক্রমশ দেশ ভুলাইয়া দিতেছে। সভ্য জগতের অভ্যাস ভুলাইয়া দিতেছে, বন্ধু বান্ধব পর্যন্ত ভুলাইবার জোগাড় করিয়া তুলিয়াছে।

নদী ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়া পথের দৃশ্য কী চমৎকার। দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে বাঁ দিকে বনাবৃত শৈলমালা, দক্ষিণে উঁচুনীচু জমিতে শুভ্রকাণ্ড গোলাগোলি

ফুলের গাছ ও রাঙা ধাতুপ ফুলের জঙ্গল। মাথার উপরে আকাশ ঘননীল। কোথাও একটি পাখি নাই, মাটিতে বন্য প্রকৃতির বুকে একটা মানুষ বা জীবজন্তু নাই, চারিদিক নিঃশব্দ নিরালা। চাহিয়া এই বিজন রূপালীলা-মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। এ যেন আরিজোনা বা নাভোজা মরুভূমি কিংবা হাডসনের পুস্তকে বর্ণিত গিলানদীর অববাহিকা। মেলায় পৌঁছাইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। বেলা শেষে কাছারি প্রত্যাবর্তনের পথ।

সকলেব সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া রওনা হইলুম, কারো নদীতে পৌঁছিবার কিছু পূর্বেই সুবৃহৎ সূর্যটা পশ্চিম দিক চক্রবালে একটা অনুচ্চ শৈলমালার পিছনে অস্ত গেল। বালির পথে নদীগর্ভে নামি হঠাৎ একদিকে সূর্যাস্তের দৃশ্য, অপরদিকে বহুদূরে কৃষ্ণরেখার মত পরিদৃশ্যমান মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মাথায় পূর্ণচন্দ্রের দৃশ্য অবাস্তব ব্যাপারের মত লাগে।

এমন চাঁদের আলোয় গাছের ছায়া হ্রস্বতম হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম।

তবু এই অপরূপের রূপসৃষ্টির মাঝখানে আরণ্যকের পথ-পরিবর্তনের দিকগুলি আকস্মিকতায় কী নাটকীয়! গভীরতার কী কাব্যময়! পলকাটা কাচের মত উপন্যাসেরই বিচিত্র মাত্রা, সে মাত্রায় কোন জনপদকন্যার সাক্ষাৎ হলে বধূকে আর্তস্বরে ক্রন্দন করতে হয়। আসলে এ আদর আপ্যায়নের একটি অঙ্গ। না কাঁদলে নিন্দা হবে। বাপের বাড়ির মানুষ দেখে কাঁদেনি অর্থাৎ স্বামীগৃহে সুখে আছে—মেয়েমানুষের পক্ষে নাকি বড়ই লজ্জার কথা।

কোথাও একটি মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথের অনাথ শিশু। মেলার ইজারাদারের কর্মচারী গিরিধারীলালের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী চোখের ও মুখের অসাধারণ দীন নম্র ভাব।

বার বার আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। **Blessed are the meek, for their's is the kingdom of heaven**। এমনধারা দীন বিনম্র মুখ কখনও আমি দেখি নাই।

বিচিত্র জটিল ঘটনাব মত অরণ্যও কত কাহিনী বোনে, সেই গিরিধারীলাল শরীরের গভীর ক্ষতে গ্রামবাসীর কাছে পাপীর মত শাস্তি পায়। আহার-জল সব বন্ধ। মেলে শুধু আঘাত, জীবিত থাকার বিপুল আকাঙ্ক্ষায় সে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী পূর্ণিয়া হাসপাতালের এই বন্যজন্তু-অধ্যুষিত পথ রাতের অন্ধকারে হাটে। বুঝি কোন যোগক্ষেম বহনকারী এই অপাপবিদ্ধ পুণ্যবানকে সত্যচরণের দযায়, রাজু পাড়ের চিকিৎসায়, কুন্তার সেবায় শুধু প্রাণ নয়, বসতের ভূমিও দেন।

অরণ্য শুধু শাখায় প্রশাখায় আপন আনন্দে নৃত্য বা মর্মর সঙ্গীত রচনা করে না, নৃত্যরসে কৈশোর বার্ধক্য নির্বিশেষে অরণ্য-সন্তান ধাতুরিয়া ও ননীচোর নাটুয়াকেও সৃষ্টি করে। কাছারির সামনে উন্মুখ জ্যোৎস্নালোকে অরণ্যের মাহাফিল বনদেবীরই

এক আয়োজন বলে মনে হয়। **The sweetest that ever grew beside a human door**। একটি গানের অর্থ এইরূপ।

শিশুকালে বেশ ছিলাম।

আমাদের গ্রামের পিছনে যে পাহাড়, তার মাথায় কেঁদবন, সেই বনে কুড়িয়ে বেড়াতাম পাকা ফল, গাঁথতাম পিয়াল ফুলে মালা।

দিন খুব সুখেই কাটত, ভালবাসা কাকে বলে তা কখনও জানতাম না।

পাঁচলহরী ঝরনার ধারে সেদিন কররা পাখি মারতে গিয়েছি। হাতে আমার বাঁশের নল ও আঠা-কাঠি।

তুমি কুসুম রঙে ছোপান শাড়ি পরে এসেছিলে জল ভরতে।

দেখে বললে ছিঃ পুরুষমানুষ কি সাত-নলি দিয়ে বনের পাখি মারে!

আমি লজ্জায় ফেলে দিলাম বাঁশের নল, ফেলে দিলাম আঠা-কাঠির তাড়া। বনের পাখি উড়ে গেল, কিন্তু আমার মনের পাখি তোমার প্রেমের ফাঁদে চিরদিনের মত ধরা পড়ল। আমার সাতনলি চেলে পাখি মারতে বারণ করে একি করলে তুমি আমার।

নৃত্যসভায় কী অপূর্ব লাগে যখন বার তের বছরের ছেলে ধাতুরিয়া সুন্দর ভঙ্গিতে মিষ্টি সুরে গায়।

সেই নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া অনাহারে-অধ্যবসায় হো-হো. ছক্করবাজির মত দুরূহ নাচ শিখে অরণ্যসভায় একদিন যথার্থ নৃত্যশিল্পী হয়ে ওঠে। সত্যচরণের স্বেচ্ছায় দেওয়া ভূমিদানে এই কপর্দক-শূন্য কিশোরের মন নেই। তার মন শুধু নাচে। যে লোহচক্রে অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়. বুঝি তারই আসন্ন ইঙ্গিতের মত একদিন বি এন. ডবলু রেল লাইনের ধারে ধাতুরিয়ার মৃতদেহ মেলে।

আত্মহত্যা কী দুর্ঘটনা তাহা বলিতে পারিব না।

প্রকৃতির রহস্যময়তার মাত্রা বিভূতিভূষণ শুধু নির্জন গহন অরণ্যেই রচনা করেন না, এই সুবিশাল অরণ্যের আড়ালে-আবডালের অন্ধকারেও সৃষ্টি করেন। ভয়াল অলৌকিকতায় বনভূমির রহস্যময়তা আবও এক বৈচিত্র্যে ঘননিবিষ্ট হয়। প্রকৃতির মর্মমূলযাত্রী সত্যচরণের হৃদয়কে এত চকিত এবং প্রতিহত করে তোলে। বোমাইবুরুর জনহীন জঙ্গলে ডামাবাণুর মায়াবী হাতছানিতে আসীন রামচন্দ্র সিংয়ের উন্মত্ততা, বৃদ্ধ ইজাবাদারের যুবক-সন্তানের মৃত্যু আতঙ্কে-অস্থিরতায় এবং সত্যচরণের প্রস্থান —ব্যস্ততায় অরণ্যের রহস্যেকেই দ্বিগুণতর করে তোলে। গল্পে লাগে **Wessex** নভেলের টান। কোন উদাসীন. প্রতিহিংসা পরায়ণ **President of Immortals** যেন এই সব অঞ্চলের অধিদেবতা।

দিনকতক এমন হইল যে বাহিরের ধপধপে সাদা, ছায়াহীন, উদাস নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া কেমন একটা অজানা আতঙ্কে, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। মনে হইত কলিকাতায় পালাই. এ সব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশপ্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত বেঘোরে লইয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এসব স্থান মানুষের বাসভূমি নয়, ভিন্ন লোকের রহস্যময়। অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল

ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই। সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।

মায়াবিনী কী মায়া জ্ঞানে-মমতায় নিকটে-দূরে সত্যচরণকে আবার সুধাসিক্ত, স্বপ্নময় ও সম্মোহিত করে।

প্রকৃতি তাহার নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য। তাঁহার সর্ববিধ আনন্দ সৌন্দর্য ও শান্তির বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন. মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করিবেন।

সে মায়া নামে শরতের এক নিস্তব্ধ দুপুরে দিকচক্রবালে নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান বনে পাহাড়ে, মহাকালের পাথুরে প্রমাণের মত মহালিখারূপের পাহাড়। সে-ই আর্য আগমন থেকে আধুনিক কালের ইংরেজ আগমনের সাক্ষী। শুধু পাহাড় নয়, এ বনের পরিজনও পাহাড়েরই মত প্রাচীন। প্রথম সৃষ্টির আরও কাছাকাছি দিনগুলিতে, পুরা যত্রঃ স্রোতঃ পুলিন-মধুনা তত্র সরিতাম—তখন এখানে পাহাড় নয়, ছিল মহাসমুদ্র।

প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। তখন মানুষ ছিল না. এ ধরনের গাছপালাও ছিল না, যে ধবনের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তাহারা তাহাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে।

অথবা আরণ্যকের সৌন্দর্য-উদ্যান সরস্বতী-কুণ্ডী। তিনমাইল ব্যাপী এই হ্রদের চারিদিকে সে এক বিচিত্র বনস্পতির বাগান। যেমন বিভিন্ন ধরনের ফুল, তেমনি কত রং-বেরং-এর পাখি। জলাশয় বর্জিত অরণ্য যেন কোমল পর্দাবিহীন খাড়ব সুর, মালকোশ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ— মানুষকে তার বিরাটত্বে ও রুক্ষতায় অভিভূত করে। সরস্বতী কুণ্ডী কেবলই কোমল পর্দার সুমিষ্ট সুর—ঠুংরির মত সূক্ষ্মতায় মাধুর্যে মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করে তোলে।

লোকে বলে সবস্বতী কুণ্ডীর জঙ্গলে বাঘ আছে। রাসপূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় এখানে আসিয়াছি।

বাঘ দেখি নাই বটে, কিন্তু সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নারাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারিধার নীরব নিস্তব্ধ।—দূরের শৈলমালা ও বনশীর্ষ অস্পষ্ট দেখাইতেছে। আমার সামনে বন ও পাহাড়বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হ্রদের বুকে হৈমন্তী পূর্ণিমার থৈ থৈ জ্যোৎস্না। ছায়াহীন জলের উপর পড়া অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না। সাদা ফুলে ছাওয়া বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে।

আর এই মালঞ্চের মালাকার শিল্পী যুগলপ্রসাদ. অরণ্যের মধ্যে আর এক বনশ্রী সৃষ্টিই তার নেশা। সরস্বতী কুণ্ডীর বনশোভা তারই হাতের দশ বার বছরের

সৃষ্টি। ফুলকে সে শুধু চেনে না, জানেও। যেখানেই ফুলের দল তার মনোহরণ করে, যুগলপ্রসাদ সেখান থেকে বীজ এনে শুধু লবটুলিয়ার বনভূমিতে নয়, মহালিখারূপের বসতিহীন জঙ্গলেও রোপণ করে। অরণ্যের শোভাসৃষ্টিতে সে জানে সে একান্তই একা।

যুগলপ্রসাদকে বলিলাম—এ জঙ্গলে কিছু গাছপালা লাগাও নূতন ধরনের। পাহাড়ের বন কেউ কখনও কাটবে না। লবটুলিয়া তো গেল, সরস্বতী কুণ্ডীর ভরসাও ছাড়।

যুগলপ্রসাদ বলিল—আপনি তো আসছেন না. আমাকে একাই করতে হবে।

এই অরণ্যসভারই কবি বেকটেশ্বরপ্রসাদ। আরণ্যকেরই আর এক মাত্রা, দরিদ্র অশিক্ষিত আদিবাসীর মাঝখানেও মর্যাদাসম্পন্ন বিনয়ী শিল্পপ্রাণ।

অরণ্যের এমনই এক বিচিত্র মাত্রা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মটুকনাথ পাড়ে। যেখানে এই অরণ্য জনপদবাসী সন্তানদের দুমুষ্টি অন্ন দূরের কথা চীনামাসের দানাও জোটে না, সেখানে মটুকনাথ টোল খোলার স্বপ্ন দেখে। পড়ুয়ার অভাবেও সে পাঠদানে ভ্রূক্ষেপহীন সাহিত্যপ্রেমিক। পৃথিবীতে এমন সব মানুষও থাকে। সকালে স্নান আহ্নিক সারিয়া সে টোলঘরে একখানা বন্য খেজুরপাতায় বোনা আসনের উপর গিয়া বসে এবং সম্মুখে মুগ্ধবোধ খুলিয়া সূত্র আবৃত্তি করে. ঠিক যেন কাহাকে পড়াইতেছে।

আরণ্যকের অরণ্য-রসরসায়িত বালক যেমন নৃত্যপাগল ধাতুরিয়া. তেমনি মুগ্ধ অপাপবিদ্ধ বালিকা মঞ্চী। সভ্য স্ত্রী-সমাজের সে যেন এক অরণ্য-ভগিনী। অমনই কুতূহলী. সাজসজ্জা লোলুপ, অনায়াস-প্রতারিতা।

কথা শেষ করিয়া মঞ্চী খুপরীর দিকে ছুটিল এবং একটি ঝাঁপি হাতে করিয়া ফিরিল। তারপর সে ডালা খুলিয়া জিনিশগুলি একে একে আমার সামনে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

এই দেখুন কত বড় কাঁকই, পাঁচসের সরসের কমে এমনিতরো কাঁকই হয়? এই দেখুন একখানা সাবান এও নিয়েছে পাঁচসের সরসে। সস্তা কিনা বলুন বাবুজী।

সস্তা মনে করিতে পারিলাম না, এমন একখানা বাজে সাবানের দাম কলিকাতার বাজারে এক আনার বেশি নয়, পাঁচসের সরসের দাম নয়ালির মুখেও অন্তত সাড়ে সাত আনা। মঞ্চী আরও অনেক জিনিশ দেখাইল—মাথার কাঁটা, ঝুটা পাথরের আংটি, চীনা মাটির পুতুল, এনামেলের ছোট ডিস, খানিকটা চওড়া লাল ফিতে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল জিনিশটি মঞ্চী সর্বশেষে দেখাইবে বলিয়া রাখিয়া দিয়াছে তাহা কি তখন জানি। এইবার সে গর্ব মিশ্রিত আনন্দে ও আগ্রহের সহিত বাহির করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিল। এক ছড়া নীল ও হিংলাজের মালা।

কলিকাতায় হিংলাজের মালা কেহই পরে না, তবু মনে হইল ইহার দাম খুব বেশি হইলেও ছ আনার বেশি নয়।

—কত নিয়েছে বল না?

—সাতের সের সরসে নিয়েছে। জিতিনি?

বলিয়া লাভ কী যে সে ভীষণ ঠকিয়াছে ?

শুধু মঞ্চী নয়, ধাতুরিয়া নয়, অরণ্যের এই স্বাস্থ্য সরলতা ও আনন্দ সভ্য-সমাজের শানিত কুঠারের কাছে আজ উন্মূলিত হওয়ার অপেক্ষায়। তারই বিসর্জনের দূরাগত বিষণ্ন বলি ধাতুরিয়া ও মঞ্চী। বি· এন· ডবলু· রেলওয়ের যে লৌহবর্ম ধাতুরিয়ার ছিন্নদেহ প্রাণকে নিয়ে গেছে, সেই সভ্যজগতের লৌহহস্তই ছিন্নবৃন্ত মঞ্চীকে একদিন হরণ করেছে। লোভী রাবণের হাতে অরণ্য-সীতাহরণেরই এক পূর্বাভাষ। কবির হাতে একালেরই এক রামায়ণ রচনা।

বিভূতিভূষণের হাতের কাজও কত সূক্ষ্ম, স্মৃতিভারাতুর, স্নিগ্ধ। কোথাও মঞ্চীর মুখে দক্ষিণ ছিকাছিছি বুলি, বেঙ্কটেশ্বরের কবিপত্নীর মুখে মিষ্টি মেয়েলি ঠোঁটি হিন্দির টান—ভাঙা ভাঙা ক্রিয়াপদযুক্ত এক ধরনের ভাষা-শহুবে—সত্যচরণের মর্মে বড় মধুর হয়ে বাজে।

অরণ্য যে আপন জঠররসে প্রবাসীকেও নিজ পরিজন করে তোলে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাখালবাবুর মত বাঙালি পরিবার। জবানে-জীবনযাপনে, এমনকি কখনও নামেও বোঝা যায় না তারা বহিরাগত বাঙালি। বসবার ঘরের দড়ির চারপাই থেকে উঠানের হনুমান ধ্বজাটি পর্যন্ত এদেশী।

একবার এমন একটি পরিবারের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—বাঙলা দেশে যেতে ইচ্ছে করে না ? জবাবে বলিয়াছিল—

নেই ভেইয়া উহাকো পানি বড্ডি নরম ছে।

তবু এই সমস্ত উদ্‌বাস্তু পরিবারে মেয়েদের জীবন যে কী দুঃখময় ! অরণ্যমাতা এইসব মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সরলতা দিয়েছে। কিন্তু সম্পর্কহীন সুদূর বাঙালি সমাজ তার বিষাক্ত নখরাঘাতে কোথাও কুণ্ঠিত হয়নি। ঐতিহ্য-সংস্কৃতিহারা এই বঙ্গললনারা শুধু রাতের অন্ধকারে গাঙ্গোতা মেয়েদের মত খেতের পরিত্যক্ত শস্য কুড়োয় না, উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সন্তানের অভাবে উপায়হীন চিরকুমারী থেকে যায়।

শান্ত মুক্ত প্রান্তরে যখন সন্ধ্যা নামে, দূর পাহাড়ে গা বাহিয়া পথটি দেখা যায়, সে পথে ঘনবনের মধ্যে চেরা সিঁথির মত ব্যর্থযৌবনা দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও শুকনো কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া পাহাড় হইতে নামে—এ ছবি কতবার কল্পনা নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার দিদি, রাখালবাবুর স্ত্রী হয়তো আজও বৃদ্ধা গাঙ্গোতীনদের মত গভীর রাত্রে ক্ষেতে খামারে শুকনা ভুট্টা ঝাড়ি করিয়া কুড়াইয়া ফেরেন।

আরণ্যক যে পাঠকের এত প্রিয়তম তার কারণ শুধু অরণ্যই এই উপন্যাসের অধীতব্য, অন্বিষ্ট এবং অপ্রতিহত চরিত্র নয়, মানুষও। বুঝি কোন নিহিত মর্মরসে অস্তিত্বের একই বৃন্তের ফোটা ফুল অরণ্যের এই মানুষ ও মাটি। সত্যচরণের জীবনে এক নদী ও মনোহর দুই তীর। প্রতি বঙ্কিমতায় অজস্র তার রূপভঙ্গ।

এমনই এক রূপের সৃষ্টি ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে। ধরমপুর পরগণা থেকে দূরাগত প্রৌঢ় যুবার ললাটে তিলক। গায়ে শুভ্র একখানা উত্তরীয়, হাতে

একটি ছোট পুঁটুলি। লবটুলিয়া বইহারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে চাষের জন্যে এক টুকরো জমির প্রার্থী।

কী গহন রস রভসে আরণ্যকের নিসর্গ ও নরনারী এত অনন্য, আকর্ষণীয় ও আপনাতে আপনি পূর্ণ। বিচিত্র এই মানুষটির কীভাবে যে অবসরহীন দিন যায়। পুজায় পাঠে চাষে বাসে সৃষ্টিতে সেবায় তার একটুও ফুরসৎ মেলে না। তারই জীবনে মিলন বিরহের মেঘে ঢাকা মধ্যাহ্ন আছে। আঠারো বছরের যুবক কবে উত্তর-ধরমপুরে সরযুর বাবার টোলে ব্যাকরণ পড়তে যায়—সেখানেই চতুর্দশী সরযুর সঙ্গে তার প্রণয় ও পরিণয়। সে পরিণয়ও আজ বিগত সতের আঠার বছরের কথা। তবু স্মৃতিতে মনে হয় সেদিনের।

জীবনের বহু পশ্চাতে প্রথম যৌবনের পুণ্য দিনগুলিতে যে কন্যাটি তরুণী ছিল চতুর্দশবর্ষী তাকেই আজও খুঁজে ফেরে তার সঙ্গীহারা প্রৌঢ় প্রাণ। তবু সে আনন্দেই আছে। দশটা অবধি পুজা পাঠ চলে, তারপর চাষবাস। অবসর সময়ে লেখে বা পড়ে নয়তো হরীতকী গাছের ছায়ায় দূরের আকাশ ও পাহাড়ের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে থাকে। জমিচাষ খুব বেশি আর হয় না। সত্যচরণ প্রশ্ন করে, কিন্তু দু বিঘে জমির ফসলে তোমার অতবড় একটা সংসার চলবে? আর তাই বা তুমি উঠে পড়ে চেষ্টা করছ কই?

রাজু কথার জবাবে বলিল—জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে ফুলের দল কতকাল থেকে ফুটছে, পাখি ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন। চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয় সম্পত্তি থেকে অনেক দূরে চলে যায়।

দেখিলাম রাজু কবি বটে, দার্শনিকও বটে। ইহাদের মধ্যে একটি নূতন জগৎ আছে। সে জগত আমার পরিচিত নয়।

যে শ্যামরসে এই বিজন বিশাল বনাঞ্চলে ধাতুরিয়া অরণ্যের বালকমূর্তিতে, মঞ্চী কিশোরীতে দেখা দেয় সেই প্রকৃতি রসের অরণ্যরমণী ভানুমতী। সরল, ললনাসুলভ, সম্ভ্রমময়ী।

শুধু অরণ্যের সৃষ্টি নয়, আরণ্যকের মধুর রসেরও সৃষ্টি সে। প্রকৃতির মায়ারাজ্যে ঔপন্যাসিকের আর এক মায়াস্বপ্ন। যে উদার উদয়াস্তে, বিশাল অরণ্য-আকাশের হরিতে-নীলে প্রেমে-প্রতিহিংসায় বনান্ত বুঝি কার অপেক্ষায় ছিল—সেই শ্রীময়ী সম্পূর্ণতাই ভানুমতী। ফুলকিয়া-লবটুলিয়া বইহারে যুগলপ্রসাদে-রাসবিহারী সিং যে অরণ্যানী এত আয়োজনেও পাঠকের কাছে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, অসমাপ্ত লাগে ভানুমতীর প্রেমের-এ স্পর্শে সে বনান্ত এক বৃহত্তর অভঙ্গ, মনোরম অরণ্যসমাজের পূর্ণতা পেয়েছে। সারা আরণ্যকে যত মানুষের আনাগোনা ভানুমতীতেই তা সর্বাধিক, অখ্যান পর্যাপ্তব্যাপ্ত, পরিণত। অন্তহীন বনানীর সে এক সান্ত নীড়—স্বর্গোদ্যত, দৈবী, রমণীসুলভ।

আরও দেখিয়াছি, এ দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী যেমন মুক্ত ও দূর—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সংকোচহীন, সরল, বাধাহীন। এমন পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে, বেঙ্কটেশ্বরপ্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত উদার। কিন্তু ভানুমতীর হাতে তুলিয়া দেওয়া খাওয়ারের তুলনা হয় না। জীবনে সেদিন সর্বপ্রথম অনুভব করিলাম নারীর নিংসকোচ ব্যবহারের মাধুর্য। সে যখন স্নেহ করে তখন সে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দেয় পৃথিবীতে।

আরণ্যকের কাহিনী অংশের উপসংহার ভানুমতী। সত্যচরণের জীবনে কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনের উপলক্ষে এই সুবিশাল অরণ্যানীর মাঝখানে নিহিত এক প্রাচীন রাজবংশের ও রাজকুমারী ভানুমতীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। বৈভবে-দীনতায় কী মর্মস্পর্শী! বিংশ শতাব্দীর একদা বেকার সত্যচরণ ইতিহাসের যে নায়কের সম্মুখে আসীন তিনি ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা বীরবর্দী দোবরু পান্না। হিমালয় থেকে ছোটনাগপুর, কুশী থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত এই সমগ্র ভুভাগের একদা একচ্ছত্র অধিপতি তিনি। কী নিপুণ শিল্পিত বিরোধাভাসে বিভূতিভূষণ কৌতুকের কোলে অশ্রু ও আভিজাত্যকে একত্র করেছেন।

—জ্যাঠামশায়? ঐ গাছতলায় গরু চরাচ্ছেন। প্রায় চমকিয়া উঠিয়া ছিলাম। এই সমগ্র অঞ্চলের রাজা সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী গরু চরাইতেছেন?

বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াই আমাব মন কিন্তু সমভ্রমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রাজা দোবরু পান্না অত্যন্ত দরিদ্র, দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে গরু চরাইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য হইয়াছিলাম বটে কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দোবরু পান্না অপেক্ষা অনেক বড় বড় রাজা অবস্থা বৈগুণ্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সেদিনের এমনই পড়ন্ত বেলায় এই প্রাচীন রাজবংশের সমাধিহল দেখার উপলক্ষে দিগন্তবিস্তৃত সুবিশাল শৈলমালার প্রেক্ষাপটে সত্যচরণের মনে ইতিহাসের বিরাট ট্র্যাজেডির উপলব্ধি। সে ট্র্যাজেডি পৌরাণিক ও বৈদিক যুগের চেয়েও সর্বব্যাপী শাশ্বতকালের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি প্রাচীন এই সভ্যতার অবমূল্যায়নে।

তারপর শ্রাবণ-আশ্বিনে রাজবাড়ির নিমন্ত্রণে-আহ্বানে ভানুমতীকে দেখা। ঝুলন-পূর্ণিমার পূর্বরাত্রে সারারাত্রি ব্যাপী মেয়েদের গানের মহড়া, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্নাত বনস্থলীতে তরুণীকুলের মাদলের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য।

সব মিলিয়া বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মত মনে হয়—অবলুপ্ত মহৎ কোন সঙ্গীতের মত আকুল তার আবেদন। মনে পড়ে দূর ইতিহাসের সোলাঙ্কি রাজকন্যা ও তার সহচরিগণের এমনি ঝুলন নাচ ও গানের কথা। মনে পড়ে রাখাল বালক বাপ্পাদিত্যকে খেলার ছলে মাল্যদানের কথা। আজু কি আনন্দ, ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ। তার চেয়েও বহু দূরের অতীতে প্রাচীন প্রস্তর যুগে ভারতের রহস্যাচ্ছন্ন ইতিহাসের সকল ঘটনা যেন আবার সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলাম—হাজার হাজার

বৎসর পূর্বে এমনি কত বন-শৈলমালা, এমনিতর কত জ্যোৎস্নারাত্রি, ভানুমতীর মত কত নৃত্যচপল চরণের ছন্দে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মুখের সে হাসি আজও মরে নাই,—সেই অরণ্য ও শৈলমালার আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহারা তাহাদের বর্তমান বংশধরগণের রক্তে আজও আনন্দের ও উৎসবের বাণী পাঠাইয়া দিতেছে।

সেই নিষ্পাপ রমণীত্বেই একটি চাওয়া—

—বাবুজী, কলকাতা থেকে আমার জন্য একখানা আশনা এনে দেবেন ?

সত্যচরণের মনে হয়েছে ষোল বছর বয়সের সুশ্রী নবযৌবনা কিশোরীর আয়নার অভাব ? তবে আয়নার সৃষ্টি কাদের জন্য ?

এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণিয়া হইতে একখানা ভাল আয়না আনাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

ছটি বছরের দীর্ঘ বনবাস সাঙ্গের উপান্তে ভানুমতীর সঙ্গে শেষ দেখা লেখকের হাতে স্তম্ভিত বেদনায় ও সংযমে কী সকাতর ও শিল্পোচিত হয়ে দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর মত বিচ্ছেদের এই নিপুণ পরিচর্যা আর এক পরিচর্যার স্মৃতি আনে। সে স্মৃতি দুর্গার মৃত্যুর। অন্যমনস্ক-প্রায়, অল্পনমিত, অশ্রুকিনার।

পরদিন আসিবার সময় ভানুমতী এক কাণ্ড করিল। হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল—আজ যেতে দেব না বাবুজী। আমি অবাক হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কষ্ট হইল। উহার অনুরোধে সকালে রওনা হইতে পারিলাম না, দুপুরের আহারাদির পরে বিদায় লইলাম।

পনের ষোল বছর আগে যে বিজন এক বৈকালে আরণ্যকের কাহিনীর শুরু, জনারণ্যের আর এক বৈকালে সে কাহিনীর শেষ। কুশলী শিল্পীর হাতে সৃষ্টির কী সার্থক সম।

বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাড়া ও লবটুলিয়ার অরণ্যপ্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সেই অপূর্ব বনানী তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। হে অরণ্যানীর আদিম দেবতা, আমায় ক্ষমা করিও। তবু আরণ্যক থেকে পাঠকের কোনদিন বিদায় নেওয়া হয় না। ভানুমতী, মঞ্চী, রাজু পাড়ে, কুন্তা, কুশীনদীর অপর পারে দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যানী—কারও কাছ থেকেই নয়।

সারা আরণ্যক আসলে বসন্তেরই এক আগমন। বিরাটত্বে-বিশালত্বে, মমতায়-সহনীয়তায় জীবনে কোন পথে সে যে আসে। কিন্তু যখন আসে তখন হৃদয়কে সে শুধু এক কূলপ্লাবী আনন্দে আচ্ছন্ন করে না, উদাসীন, আস্থিত ও মরমী করে তোলে। তখন শুধু সাহিত্যই নয় জীবনও এক উচ্চগ্রামে গভীর সুরে বাঁধা হয়। সেই সুরেই গীতাঞ্জলি ও শান্তিনিকেতন, এবং আরণ্যক ও বিভূতিভূষণের দিনলিপি।

আরণ্যকে এ ডাক এসেছে সুবিশাল মহালিখারূপের ও ধনঝরি পাহাড়ের পথ পেরিয়ে, ফুলকিয়া লবটুলিয়া বইহারের প্রান্ত দিয়ে, গিরিধারীলাল, রাজু পাঁড়ের দৈন্যদীনতার হাতে হাত ধরে, কুন্তা-ভানুমতীর সুধাস্বর্গের কিনারায়। এমনই থমকান

সন্ধ্যার অন্ধকারে সত্যচরণের হৃদয় এক কেন্দ্রপ্লাবী সীমাহীন দেবতার স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়েছে।

এই মুক্ত প্রান্তরে সীমাহীনতার মধ্যে কোন দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা এই বন, এই কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজপুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাড়ে, ভানুমতী, সেই দরিদ্র গোঁড় পরিবার, আকাশ ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীল-নীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তারই বাণী। অন্তরের অন্তরে সে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই—ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ—তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা, আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র নীহারিকার সৃষ্টি করেন।

উপসংহারে-উত্তরণে এর পরও কি আরণ্যক ভ্রমণের বিভ্রম জাগায় না, বাস্তবতায় বিস্ময়ে প্রেমে-প্রতিহিংসায় নিসর্গে-নিঃসীমতায় এক মরমী উপন্যাসের আভাস আনে? দুজনেই তার বন্ধু। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বনগাঁর, অপরজন বিহারের। শুধু এক নাম নয় বিভূতিভূষণের সমপ্রাণ, সমঝদার। বনগাঁর মানুষটিকে যেখানে যেতেন কুক্ষিগত করে নিয়ে যেতেন, বিহারের মানুষটিকে হৃদয়ে বহন করতেন। শেষ জীবনের কথায় কত সশ্রদ্ধভাবে যে তাঁর কথাসাহিত্যের উল্লেখ করেছেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও কিছু কম করেননি। করা মানে, বিভূতিভূষণের সাহিত্যের বিস্ময়ের চাবিকাঠিটি পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। এত বিস্ময়কর অথচ অত্যন্ত প্রত্যাশিত, এত অভাবনীয় অথচ এত স্বাভাবিক। জানি না এমন করে আগে-পরে কেউ বলেছেন কিনা।

বলেছিলেন বিস্ময় নিয়েই বিভূতিভূষণ এসেছিলেন, বিস্ময় সৃষ্টি করেই বাঙলা সাহিত্য থেকে চলে গেলেন। তৃতীয় দশকের দাবদাহে সারা বাঙলাদেশ যখন আকুল তখন একজন শুধু ভাবছেন নয় দেখছেন, ধু ধু করা পোড়ো জমিতে দূরপ্রসারী মাঠের ওপরে তিসি ফুলের মত নীল আকাশ উপুড় হয়ে পড়ছে আর কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাসী বাউলের মত কোন দূর থেকে দূরান্তরে বেঁকে গেছে।

লিখলেন, পথের পাঁচালীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এল অপরাজিত। কিন্তু এইবার মনে হল তারপর কী? বিস্ময় নিয়েই এল আরণ্যক। এল অনুবর্ত্তন। দস্তুর মত এক দলছুট রচনা। এল একেবারে আলাদা রকমের লেখা দেবযান। প্রকৃতি, পরিজন, পরলোক সব নিয়েই তো লেখা হল। আর বাকি কী? এবার কী নিয়ে লিখবেন?

ঠিক সেই সময়ে প্রকাশিত হল ইছামতী। ত্রিধারার এক অপরূপ যুক্তবেণীও বলতে পারেন। অথবা মুক্তবেণীর নতুন পলিপড়া বিচিত্র এক ভূখণ্ডও বলতে পারেন।

প্রয়োজনের পৃথিবীতে দূরে দূরান্তে যান না হলে চলে না, কিন্তু যে দূরান্ত থেকে প্রিয় পথিক আর ফেরে না সেই দূরযানী দেবযানকে নিয়ে কী হবে? কুতূহলী বা কিছু পারত্রিক সন্ধানীর অনুসন্ধিৎসা থাকতে পারে—বড় জোর রহস্যের খেলাঘর ভাবা যায়। কিন্তু কিছু কিছু সুধা বিষগুণ আধা মর্তবাসীর তাতে এমন কী আসে যায়?

ইছামতীও অনেকখানিই অধ্যাত্মজীবনের কথা, কিন্তু ইছামতী দেবযান নয়। কেন মনে হয়, কোন বড় কথা নয়, বড় ব্যথা নয়। সুচিরকালের সহজ সকরুণ জীবনযাত্রার কাহিনীই দূরাগত বংশীধ্বনির মত এ গ্রন্থে গুঞ্জরিত? পায়ে পায়ে কতবার যে এল-গেল।

ইছামতী দৃষ্টিপ্রদীপের কল্পলোকও নয়, দেবযানের স্বর্গলোকও নয়, এই পার্থিব লোকেরই কথা—দূরার্পিত, অপরিচিত, গভীর রহস্যময়।

ভবানী বাঁড়ুজ্যে অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকান। কোথায় ছিল এই শিশু? বহু দূরের ও কোন অতীতের মোহ তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। যে পৃথিবী অতি পরিচিত, প্রতিদিন দৃষ্ট—যেখানে বসে ফণি চক্কত্তি সুদ কষে, চন্দ্র চাটুজ্যের ছেলে জীবন চাটুজ্যে সমাজপতিত্ব পাবার জন্যে দলাদলি করে—অজস্র পাপ ক্ষুদ্রতা ও লোভে যে পৃথিবী ক্লেদাক্ত—এ যেন সে পৃথিবী নয়। অত্যন্ত পরিচিত মনে হোলেও এ অত্যন্ত অপরিচিত, গভীর, রহস্যময়। বিরাট বিশ্বযন্ত্রের লয়-সঙ্গীতের একটা মনোমুগ্ধকর তান।

অথচ সময়ের মাত্রায় কতই বা হবে? বড় জোর তিন দশক।

১২৭০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েছে সবে। পথঘাটে তখনও কাদা, মাঠে মাঠে জল জমে আছে। বিকেলবেলা ফিঙে পাখি বসে আছে বাবলা গাছের ফুলে ভর্তি ডালে। ১২৭০ অর্থাৎ ইংরেজির ১৮৬৩ সাল। ১৮৬০-এ নীলবিদ্রোহ হয়ে গেছে। ১৮৯২-এ জার্মানি থেকে রাসায়নিক নীল আসার ফলে ব্যবসায় আর লাভ না হওয়ায় বরাবরের জন্য নীলচাষ বন্ধ। নীলকররা মেমসাহেবদের নিয়ে দেশে ফিরেছে, নীলকুঠি আজ ব্যবসায়ীর আড়তে পরিণত হয়েছে।

অথচ তিরিশটি বছরের শেষ যেন মনে হয় ইতিহাসের যুগান্ত। তারই কিনারায় বিস্ফারিত বিস্ময়ে পাঠকের চোখে পড়ছে, কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল। যে কত আশা করে কলাবাগান করেছিল উত্তর মাঠে, তারই দেহের অস্থি রোদবৃষ্টিতে পড়ে রইল ইছামতীতে। কত তরুণী বধূর পায়ের চিহ্ন পড়ে, প্রৌঢ়ার পায়ের দাগ মিলিয়ে যায়।

ইছামতীর চঞ্চলধারা বয়ে চলে বড় লোনা গাঙের দিকে। সেখান থেকে মোহানা পেরিয়ে রায়মঙ্গল পেরিয়ে গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে।

সাধারণ সব সাহিত্যের একটা উৎকর্ষ বা যাকে বলি climax থাকে, কিন্তু বিভূতি-ভূষণের লেখায় তেমন করে কোন স্বতন্ত্র উৎকর্ষের মুহূর্ত নেই। গন্ধের মত তা

সারা গল্পের গায়েই যেন লেগে থাকে। মোপাসাঁ, প্রভাতকুমারের গল্পে অবিস্মরণীয় স্মৃতির মিনার আছে। যার জন্যে ফ্লবেয়ার মোপাসাঁকে দিয়ে কম শিক্ষানবিশির কাজ করিয়ে নেননি, প্রভাতকুমারকে গল্পের এত সহজ আবেদনের জন্যেও কম প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়নি। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে দিনের পর দিন কাশ্মীর সম্বন্ধে পড়ার চেয়ে ভূস্বর্গকে প্রত্যক্ষ করা অনেক সহজ কাজ ছিল। ফ্লবেয়ারের মত তিনিও লেখায় সরলতার জন্যে বলতে পারতেন, পরিশ্রম গোপন করতে কী পরিশ্রমই না করতে হয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের লেখা, তাঁর পথের পাঁচালী, আরণ্যক, ইছামতী একান্তই অন্যজাতের লেখা। রবীন্দ্রনাথের বা টুর্গেনিভের গল্পের মত উৎকর্ষ কোন বিশেষ মুহূর্তে নেই, সারা মুহূর্তগুলোই গানের মত আগাগোড়া ওতপ্রোত, ছবির রঙের মত অবিরত, উজ্জ্বল দিনের মত আতপ্ত। কোথাও উচ্চকিত নয়, একান্ত নয়, সর্বস্ব নয়।

বিবাহিত দিনের সংজ্ঞাপিকার মত, কবিতার মিলের মত, কিংবদন্তীর মত কিছুই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, বরং স্বচ্ছন্দ বা উপলব্যথিত নদীর মত, সময়ের পায়ে পায়ে সকাল-সন্ধ্যার মত, অমোঘ সুখ দুঃখের মত কতদিন ধরে তাবা চলে আসে। কিছুই অসামান্য নয়, অভূতপূর্ব নয়, উচ্চ-তুচ্ছ নয়।

একশটি বছর আগের একটি বাঙলা দেশের গ্রাম। পাঁচপোতা। নীলকর আর কর্মকারীদের দাপটে, নীলচাষের উন্নতিতে তখন বাড-বাড়ন্ত। তারই পাশে তেঘরা-সেখহাটি, রসুলপুর-রাহাতুনপুরি, হিংলাড়া-কানসোনার ভয়াত, মূক অসংখ্য গ্রামবাসী।

পাঁচপোতা গ্রামের একদিকে দেওয়ান রাজারাম রায়ের কুলীনগৃহে অতিক্রান্ত-যৌবন অনাঘ্রাত তিনটি কুমারী-কুসুম, আর এক প্রান্তে সদ্য যৌবন-পদার্পিত আশা-আতুর পানের ব্যবসায়ী নালু পাল। সবারই নিদ্রাহারা দৃষ্টির সামনে শুধু স্বপ্নময় জ্যোৎস্না-বেছান রাত। তিলু-বিলু-নীলুর জীবনে অনাগত সংসার সুখের, নীলুর জীবনে ভাবী ব্যবসায়ে উন্নতি-সুখের-স্বপ্ন। বিবাহের আয়োজন স্বহস্তে তিন কন্যাকেই করতে হয়। সখী-বিরহিত বাসর-রাত্রি শ্যালিকা-বধূর কণ্ঠস্বরেই অগত্যা মুখরিত হয়, তিলুর ব্যগ্র হৃদয়কে পঞ্চাশোর্ধ্ব পরিব্রাজক ভবানী বাঁড়ুজ্যেকেই স্বামী হিশেবে গ্রহণে পরিতৃপ্ত হতে হয়। কী মায়াময়তায় সময়ও স্তম্ভিত হয়, সংসারে সন্তান আসে। সেই পিতৃত্বসুখ, বাল্যকণ্ঠের মধুর কাকলি, সপত্নী-ভগিনীকুলের সহজ ঈর্ষা-অভিমান-ভালবাসা সব কিছু নিয়েই সংসার চলে।

ভবানীচরণের গৃহের অভ্যন্তরে যখন অনির্নীত আরম্ভ সংসার-লীলা চলে, গ্রামের বহিঃপ্রাঙ্গণে তখন নীলবিদ্রোহের মুখরিত হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, নীলকর ও অনুগত কর্মচারীদের গোপন অগ্নিসংযোগে আদিগন্ত আকাশে শুধু আগুনের আভা। নীচে নিহত বিদ্রোহী-চাষী রামু সর্দার, আততায়ীর গোপন আঘাতে নিষ্প্রাণ অত্যাচারী দেওয়ান রাজারাম রায়।[1]

জীবন তেমনই চলে। বরং পাঁচপোতার আকাশের নীচে দূরবিস্তৃত সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতে, ইছামতীর ওপারে কাশফুলের শান্ত পরিবেশে বিদ্রোহ-গুপ্তহত্যা সবই যেন স্বল্পস্থায়ী এক চাঞ্চল্য। দারিদ্র্যে-দয়ায়, সংস্কারে-স্বপ্নে কোথাও যেন স্থায়ী ছায়া ফেলে না।

পানের বোঝা মাথায় নীলকরের ভয়ে সন্ত্রস্ত যে নালু পাল পালিয়েছিল, সে আজ ব্যবসায়ী লালমোহন পাল। শিপটন সাহেব কুঠি বন্ধক রাখার জন্যে তার কাছে প্রস্তাব পাঠান।

যে বাংলোর সামনে সাহেবরা ছোটো হাজরি খেতো, আজ সেখানে লালমোহন পালের ধানের খামার। যেখানে সাধারণ মানুষের ঢোকবার হুকুম ছিল না, আজ সেখানে রজবালি বসে দাদ চুলকোয়। সময়ের কি বিরাট পরিবর্তন ' বিভূতিভূষণের কী দেহাতি দুনিয়াদারী।

পাঁচপোতার শতপাকে পাশবন্ধ মানুষের জীবনে কখন বৃহতের ডাক এসে পেঁছয়।

তীর্থযাত্রা সেরে সবাই ফিরল. ফিরল না শুধু বুপচাঁদ—কাশীতেই তার দেহান্তর। ফণি চক্রবর্তি ঘন আওটান দুধের সঙ্গে মুড়কি মাখতে মাখতে বলেন—আমার কেমন মনে হচ্ছে সেই পাহাড়ের তলাডা, ঝর্না বয়ে যাচ্ছে, বড় বড় গাছের ছায়া। রূপচাঁদ কাকা সেখানে দেহ রাখলে। অমন জায়গাডা বড় ভালবাসত। আমাকে কেবলই বলে—এ যেন সেই বাল্মীকি মুনির আশ্রম।

কত শ্যামচাঁদের আঘাত, কুসংস্কারের আবর্জনা, গ্রাম্য সীমাবদ্ধতা, লোভ—সময়ের মত সেকেলে সেই গ্রামগুলিতে। তবুই মাঝখানে কুলটা একটি কন্যার চোখে সুদূর ওয়েস্টল্যাণ্ডের একটি চাষীর ঘরের ছেলে শিপটনের জন্যে জল জমে, আঁজলা-ভরা ফুলে সাহেবের সমাধি দেবতার চরণে কোন দেবীর হাতের অর্ঘ্য হয়ে দেখা দেয়।

ঘোড়াটা হঠাৎ যেন থমকে গেল, মনে ছিল না. এইখানেই আছে শিপটন সাহেবের কবরটা। কিন্তু ওটা কি নড়ছে সাদা মতন? শিপটনের কবরখানায় লম্বা লম্বা উলুখড়ের সাদা ফুলগুলোর আড়ালে চাঁদের আলোয় নীচে নির্জন কুঠির পরিত্যক্ত কবরখানা। উলুখড়ের সাদা ফুলের রাশির আড়াল থেকে একটি নারীমূর্তি চকিত ও ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়াল অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় পাথরের মূর্তির মত। জ্যোৎস্নায় প্রসন্ন দেখলে গয়ার চোখের কোণে জলের রেখা। শিপটনের সমাধির ওপর টাটকা সন্ধ্যামালতী ছড়ান।—দ্যান ছাড়িয়ে দ্যান। আজ মরবার তারিখ সাহেবের।

তারপর দুজনে কবরখানার ঝোপজঙ্গল থেকে বার হয়ে গিয়ে বসল। খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। কত যুগ আগেকার পাষাণপুরীর ভিত্তির গাত্রে উৎকীর্ণ কোন অতীতকালের দুটি নায়ক নায়িকা যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে এই সন্ধ্যারাত্রে নীলকুঠির জুনিপার গাছটার তলায়।

ষষ্ঠীর চাঁদ নদীর মড়িঘাটার বাঁওড়ের দিকে হেলে পড়ে। বিভ্রম লাগে, ও কি জলের প্রবাহ না মহাকালের চলা? অপূর্বও হয়েছিল।

কবিতারই মত বাঁধন বিভূতিভূষণের উপন্যাসের। বাস্তব বা অধিবাস্তব উপন্যাসের অমোঘ অনুক্রমণিকায় শৃঙ্খলিত নয়, প্রতীয়মান নিরুদ্দেশ পথিক-চরণের পদক্ষেপের মত শিথিল। গুম্ফিত নয়, গোষ্ঠীবন্ধ। চলোর্মিতাড়িত নয়, চঞ্চল চলোর্মিই।

পথের পাঁচালী থেকে শুরু করে ইছামতী পর্যন্ত কোন উপন্যাসই পুতুল নাচের ইতিকথা বা একদার মত বন্ধকায় বা বহমান নয়। গুচ্ছবন্ধ রজনীশীর্ষ, গ্রথিত রজনীগন্ধার মালা নয়। প্রথমটি থেকে দু একটি শীর্ষ স্থানান্তরিত হলে তার কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু মালা থেকে একটি ফুলও নিলে তা অপূরণীয় ক্ষতির সামিল হয়।

তবু গুচ্ছ হোক, গ্রন্থন হোক সব উপন্যাসেই সামগ্রিকতার চাহিদা তো আর্টের থেকে যায়। বিভূতিভূষণ সে দাবিকে উপেক্ষা করবেন কী করে?

উপেক্ষা তিনি করেনওনি। কোথাও সতীর্থ নদীর মত, কোথাও ঋতুমণ্ডলীর অলক্ষ সুতোর মত, কোথাও পিকারেস্ক ন্যারেশানের শিথিল চরণের মত স্ফীত, স্ফুরিত। সুগভীর রোমাণ্টিক উপন্যাসেরই গড়ন।

তবু তাঁর উপন্যাসের গড়নে একটা স্বগত ভেদও চোখে পড়ে। মর্ম-মাধুর্য যেখানে উপন্যাসের সামগ্রী ঋতুর মাত্রা তাকে মাত্রাবৃত্ত করেছে। যেমন হয়েছে পথের পাঁচালীতে বা আরণ্যকে। আম-আঁটির ভেঁপু মাঘ-ফাগুনের পালা, চোত-বোশেখের কালবৈশাখী সুতোয় গ্রথিত হতে হতে উদাসীন শরতের পায়ে পায়ে আবার গ্রীষ্মের কিনারায় এসে পেঁচেছে—পথের পাঁচালীর অভীষ্ট মালা বিভূতিভূষণের গাঁথা হয়েছে। বল্লালী-বালাইয়ে স্মৃতিরও যেমন সময় নেই, অক্রুর সংবাদে তেমনি আধসুধাবিষে জীবন আর বিশেষ কোন ঋতুর বন্ধনের অপেক্ষা রাখে না।

আরণ্যকেও তাই। বি. এন. ডবল্‌. রেলওয়ের স্টেশন। তাজা মটর শাকের গন্ধে, সান্ধ্যবাতাসে তখন শীতে অবনমিত বসন্ত। হে অরণ্যানীর আদিম দেবতা আমায় ক্ষমা করিও—সেও এই আসন্ন শীতেরই কিনারায়। চিকারির কাজের মত, সবুজ পাতার সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার মত, চকিত-উচ্চকিত কথার মত, অপরাহ্ণ, অন্ধকার, ছায়াবিহীন ধু ধু জ্যোৎস্নায় কী ক্ষণিকের রেশের কাজ!

আবার অপেক্ষাকৃত কাহিনী-প্রধান যে সমস্ত উপন্যাস তার—অপরাজিত, অনুবর্ত্তন, ইছামতী—সেখানেও ঋতুর আনাগোনা কিছু কম নয়, কিন্তু গল্পের টানে তারা বাধা, পরিমণ্ডলিত, পরিণতিময়। ভাষাতেও কোথাও লেগেছে বাস্তবের বিভ্রম জাগান পার্থিবতার সুর—রোমাণ্টিকতার কারিগরেরই আর এক হাতের কারুকাজ।

জল মুখের মধ্যে গেল না, শুধু কোটরগত অনেকখানি অশ্রু শীর্ণ গাল দুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।

কোথাও লেগেছে রোম্যাণ্টিকতার হৃদয়-মধ্যের অবারিত, অনবগুণ্ঠিত সুর।

সে রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। চকচকে সাদা বালি ও অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মনে কেমন যেন উদাস বাধাহীন মুক্তভাব—মন হু হু করিয়া উঠে। সেই নীরব নিশীথ রাত্রে আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

সঞ্জীব ঘোষ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ মননধর্মে উজ্জ্বল

[এক]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৬১) অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত এবং আলোড়িত একটি নাম। প্রথম জীবনে ধূর্জটিপ্রসাদ 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর লেখক হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি একান্তভাবে ঐ গোষ্ঠীর লেখক নন। জীবনের কাছ থেকে অনেক গভীরতর ও সূক্ষ্মতর পাঠ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, জীবনবোধকে করে তুলেছিলেন অনেক রসসমৃদ্ধ। তাঁর দৃষ্টি জীবনের মর্মভেদ করতে গভীর আগ্রহ বোধ করেছে।

বিশ শতকী বাংলা কথাসাহিত্যের মনন প্রধান দৃষ্টিভংগীর পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, জগৎ ও জীবনের ক্ষেত্রে নির্মোহ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের ব্যাপারে এই শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রমথ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিক জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম পুরোধা স্রষ্টা বলা গেলেও বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আধুনিক কালের মননদীপ্ত উদার দৃষ্টিভংগীর প্রথম স্বাক্ষর পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য মননাশ্রিত হলেও এর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের হতাশা, দ্বন্দ্ব, জটিলতা, মানস বিপর্যয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ছবি তেমনভাবে পরিস্ফুট হয়নি। চতুর্থ দশকে এসে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার বিভিন্ন রচনায় তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান-ভিত্তিক মননধর্মের এক নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হলো। সমকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার সংগে সমসূত্রে বাংলাসাহিত্য ও বাঙালীর মনীষাকে গ্রথিত করে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে এক নতুন মূল্য ও মর্যাদা দিতে সচেষ্ট হলেন 'পরিচয়' গোষ্ঠী। প্রমথ চৌধুরীর 'শিষ্য' ধূর্জটিপ্রসাদ এই পরিচয়'-এর সমকালেই সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

"তিনজন মনীষীর কাছে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ঋণ স্বীকার করে গেছেন। প্রমথ চৌধুরীর কাছে ভাবতে শেখেন, চিন্তার সূত্রগুলিকে বিন্যস্ত করে লিখতে শেখেন।··· রামেন্দ্রসুন্দরের কাছ থেকে অধীত বিদ্যাকে হজম করা, শুদ্ধ স্বচ্ছ ভাষায় কঠিন বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখতে চেষ্টা করেন। আর রবীন্দ্র-নাথের কাছে আপন ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, আত্মশক্তি চর্চা, ভারতীয় সমাজসত্তার মৌলিক বোধ, সংযম ও ধৈর্য প্রয়োগে ব্যক্তিগত দুঃখ-মনস্তাপের উপরে উঠে সৃষ্টিধর্মী কাজে নিজেকে নিযুক্ত করার প্রয়াস--এরকম অনেক কিছুই"।

ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলিই লিখেছেন ১৯৩০-এর দশকের শুরু থেকে ১৯৫০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধের দু'তিন বছরের সময় সীমায়। আন্তর্জাতিক

. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মানুষ ধূর্জটিপ্রসাদ : ঘরে ও বাইরে, প্রসঙ্গ : ধূর্জটিপ্রসাদ,- জলার্ক প্রকাশন।

কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে শেষ দু'তিন বছর বাদ দিলে পুরোপুরি স্তালিনের যুগ। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সমাজ-ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা করেছেন মার্কসীয় বীক্ষার জীবন দর্শনের কাঠামোয়। তাঁর মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সারা জীবনের নানান লেখায় ছড়িয়ে আছে এবং এই বিশ্ববীক্ষা তিনি ধীরে ধীরে অর্জন করেছেন, সংগঠিত করেছেন খানিকটা দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাবলম্বীভাবেই। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর জীবনে মার্কসিজম্-এর প্রভাব বেশী। তাঁর সমাজতত্ত্বে ও ইতিহাসে মার্কসিজম তো আছেই, উপন্যাসেও আছে। নিজেকে তিনি 'মার্কসোলজিস্ট' বা মার্কস্‌তত্ত্ববিদ্ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, মার্কস্‌বাদী হিসাবে নয়।

ধূর্জটিপ্রসাদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা প্রধানত বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং বুদ্ধিজীবী রূপেই। মনন ও বৈদগ্ধের নিদর্শন, তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী মনের পরিচয় তাঁর নানান রচনায় স্বপ্রকাশ। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নিছক বুদ্ধির চর্চায় মানুষ বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে, জীবন-সমীক্ষায় ও জীবন-উপলব্ধিতে বুদ্ধিবৃত্তি শ্রেষ্ঠ সম্বল নয়। যে বুদ্ধিজীবী নিছক বুদ্ধি-তর্ক-বিচারের গণ্ডীবদ্ধ জগতে বন্দী হয়ে পড়ে, সে ক্রমশ মুক্তিপিপাসু হয়ে উঠবেই মনে মনে। নানান জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন এদের জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। একালের বুদ্ধিজীবীদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণাকে ধূর্জটিপ্রসাদ সামগ্রিক জীবন-তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আর সেই উপলব্ধির সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর উপন্যাস।

'অন্তঃশীলা,' 'আবর্ত' এবং মোহানা'—মাত্র এই তিনটিই ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদের বাংলা উপন্যাসে অবদান। অন্তঃশীলা, আবর্ত এবং মোহানা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৩৫, ১৯৩৭ এবং ১৯৪৩-এ। বাংলা উপন্যাসের সাধারণ পাঠকবর্গের কাছে উক্ত ত্রয়ী উপন্যাস আজ বিস্মৃতপ্রায়। তাঁর জীবিতকালে ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে কেবলমাত্র অন্তঃশীলারই নতুন সংস্করণ[২] হয়েছিল, কিন্তু অন্য দুটি উপন্যাসের কোন নতুন সংস্করণ হয়নি। ফলে, অন্তঃশীলার সংস্করণগুলি মাঝে মাঝে ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদকে স্মরণ করিয়ে দিলেও আবর্ত এবং মোহানা স্মরণ করতে গেলে সাধারণ বাঙালী পাঠকদের, এমন কি বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যসেবী এবং বাংলা সাহিত্যের অনেক অধ্যাপকেরই চোখে-মুখে একটা অসহায়-ভাব দেখা দেয়। আমরা যদি ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসগুলির বিস্মৃতির ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ অনুসন্ধান করি, তাহলে এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, তাঁর উপন্যাসের সংখ্যার স্বল্পতা এই বিস্মৃতির কারণ হতে পারে না। এর অন্য কারণ নিশ্চিত আছে। সম্ভাব্য কয়েকটি কারণের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে ঃ

১. প্রাক্-ধূর্জটি পর্বে বাঙালী পাঠকবর্গ সম্ভবত একই ধাঁচের উপন্যাস পাঠে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদের বহুমুখী প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোর বর্ণচ্ছটায় তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তাঁর উপন্যাসের রচনারীতি,

২. প্রথম সংস্করণ ১৯৩৫ (ভারতীভবন), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬১ (বাক্) এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮২ (পূর্বাশা)।

ভাষা, বিষয়বস্তু এবং নতুন আঙ্গিক লক্ষ্য করে পাঠকবর্গ সম্ভবত খুব একটা স্বস্তি পাননি। ফলে তারা এই নূতন ধাঁচের উপন্যাস থেকে দূরে সরে রইলেন।

২. বিগত পঁচিশ বছরে অনেক তথাকথিত সাহিত্যিকই বাংলা সাহিত্যকে নিজেদের স্বার্থে 'পণ্যে' পরিণত করেছেন। বাজারি ব্যবসায় ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস খুব লাভজনক পণ্য নয়। তাই পাঠকবর্গের কাছে ধূর্জটিপ্রসাদকে লোভনীয় 'পণ্য' করে তোলা হয়নি।

৩. রাজনৈতিক সচেতনতা মারফৎ যেটুকু সমাজ-বাস্তবতাকে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকবর্গের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল থেকে সযত্ন-লালিত কৌশলে তাকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো। বলা হলো, ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে রয়েছে প্রখর বুদ্ধি-চর্চার পরিচয়, এ উপন্যাস পড়তে গেলে মাথা খাটাতে হয়। ফলে "উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্-চল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তর-চল্লিশ পৌর স্ত্রী"[৩] সংগত কারণেই ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসের কাছ থেকে দূরে সরে রইলেন। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পাঠকবর্গের কাছে ধূর্জটিপ্রসাদ বিস্মৃত হয়ে গেলেন।

যাই হোক্, বিস্মৃতপ্রায় ঐ ত্রয়ী উপন্যাসেব দিকে এবার ফিরে তাকানো যাক্।

[দুই]

ধূর্জটিপ্রসাদের প্রথম উপন্যাস 'অন্তঃশীলা'। ১৩৪০-এর মাঘ সংখ্যার 'পরিচয়'-এ যুধিষ্ঠির দাস ছদ্মনামে 'এই জীবন' গল্পটি প্রকাশিত হবার পর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ বন্ধুরা গল্পটির সম্ভাব্যতা লক্ষ্য করে তাকে পূর্ণায়তন উপন্যাসের আকার দিতে ধূর্জটিপ্রসাদকে অনুরোধ জানান। তারই পরিণতিতে 'অন্তঃশীলা' রচিত হয়।

নিছক বুদ্ধিসচেতন দৃষ্টি গ্রহণের ফলে গল্পের মধ্যেকার জীবন-সমস্যার যে গভীর তাৎপর্য গল্পকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, পরে 'অন্তঃশীলা'য় সেই তাৎপর্য দানের প্রয়াস পেলেন ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'অন্তঃশীলা'-র যে সমস্যা, যে-ধরণের বিষয়বস্তু, তাকে ছোটগল্পের সীমায় আবদ্ধ রাখলে তার প্রতি সুবিচার হয়না। এই উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু নিছক পরকীয় প্রেম নয়, কাম নয়, এক জেদি ও ঈর্ষাকাতর স্ত্রীর অন্তর্জালার ঘটনাবলীও নয়। এই উপন্যাস রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা মতের বিরুদ্ধাচরণ করে স্বয়ং ধূর্জটিপ্রসাদ নিজ মত ব্যক্ত করতে গিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন : "একজন তথাকথিত ইণ্টেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ এবং ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই নায়ক খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। নিজের অজ্ঞাতে স্ত্রীর বান্ধবী রমলার প্রতি খগেনবাবুর আকর্ষণ হলো 'অন্তঃশীলা'র বিষয়। খগেনবাবুর ক্রমবিকাশ এইখানেই শেষ হয়নি, 'আবর্ত' এবং 'মোহানা'য় সেই ধারা চলেছে।[৪]

৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কুলায় ও কালপুরুষ।

৪. ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১/ দে'জ পাবলিশিং, অন্তঃশীলার ভূমিকা।

খগেনবাবু অন্তর্মুখী বুদ্ধিজীবী। তিনি সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্তের নীতিহীনতা ও ভণ্ডামীর পরিবেশে একাত্মতা খুঁজে পাননা। জীবনের সংকট তাঁর তীব্রতর হয় যখন তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। তিনি আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। স্ত্রী সাবিত্রীর স্থূলে সৌখিনতা, সন্দেহ প্রবণতা, অভিমান ও জেদের আতিশয্য অন্তর্মুখী খগেনবাবুর অন্তর্জীবনে নানান জটিলতার সৃষ্টি করেছে। স্ত্রীর আত্মহত্যা খগেনবাবুর জীবনের এক অধ্যায়ের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছে। এটুকু 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের ভূমিকাপর্ব। উপন্যাসের যথার্থ সূচনা এর পর থেকেই।

স্ত্রীর অবর্তমানে তাঁর বান্ধবী রমলাদেবীব সঙ্গে খগেনবাবুর পরিচয় নিবিড় হতে থাকে। এক সময় স্ত্রী সাবিত্রীর চেয়েও বমলাদেবী খগেনবাবাবুর চিন্তায় অনেক উঁচু আসন পেয়ে যান। রমলার সঙ্গে এক সূক্ষ্ম জটিল ও বিচিত্র হৃদয়ানুভূতির টানাপেড়েনের আলেখ্যই উপন্যাসে বর্ণিত খগেনবাবুর জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বুদ্ধিজীবীর মতো জীবনকে বুঝতে গিয়ে খগেনবাবু যখন ক্লান্ত, অবসন্ন, নানা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, মনন ও চিন্তার মাপকাঠিতে জীবন যখন তাঁর কাছে নিরাসক্ত হয়ে উঠেছে, তখনই আমরা দেখতে পাই তার জীবনে প্রেমের নিঃশব্দ আগমন। 'প্রেম জীবনেব বিবোধ ঘুচিয়ে সামঞ্জস্য আনে' —এই ভাবনায় তাঁর চিত্ত হয়েছে আন্দোলিত। এর মধ্যে আমরা সাক্ষাৎ পাই সুজন ও বিজন নামক দুই পুরুষের। প্রথমজন খগেনবাবুব মতোই বইপত্র ভালোবাসে। তার ভাবনা ও আচার-আচরণে খগেনবাবুর মূল্যবোধ অনেকটা যেন প্রশ্রয় পায়। অন্যদিকে অন্যজন উচ্চ মধ্যবিত্ত সন্তান। টেনিসের র‍্যাকেট আর এইচ. জি. ওয়েল্‌সের উপন্যাস নিয়েই সে সময় কাটায়।

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে সাবিত্রী ও রমলার পাশাপাশি বয়েছে আব একটি নারীচরিত্র। তিনি খগেনবাবুর মাসীমা। অধুনা কাশীবাসী। সাবিত্রী আর আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের বিপবীত মেরুতে মাসীমাব অবস্থান। অন্তঃশীলায় সাবিত্রী, এক সময়ের রমলা আর বিজনের জগৎ ছেড়ে খগেনবাবু এখনকার রমলা, মাসীমা ও সুজনের জগতে নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমবা দেখি বমলার আকর্ষণকে সহজ মনে স্বীকার করে নিয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি তব অন্তর্দ্বন্দ্ব-পীড়িত অন্তর্মুখী মন। আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাপোড়েনে এখনও খগেনবাবু অস্থির, দ্বিধাগ্রস্ত। এবকম দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে তিনি আত্মসমীক্ষা ও আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় পরিচিত সমাজ-সংসার ফেলে বেখে কাশীতে মাসীমার কাছে চলে যান। সঙ্গে সুজন ও রমলা। এখানেই প্রকৃতপক্ষে 'অন্তঃশীলা'-র শেষ, আর 'আবর্ত'-এব শুরু।

'আবর্ত' ধারাবাহিকভাবে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ এর মাঘ থেকে ১৩৪৪-এর শ্রাবণ, এই সাতটি সংখ্যায়। 'আবর্ত' বস্তুতঃ 'অন্তঃশীলা'-ব দ্বিতীয় ভাগ। এর সমস্যা আলাদা। তাই এটি পৃথকভাবে উপভোগ্য। 'অন্তঃশীলা'-য় খগেনবাবুর জীবনস্রোত অন্তর্মুখী, কিন্তু সেই স্রোত নানা কারণে একসময় আবর্তের সৃষ্টি করেছে। 'আবর্ত'-এ সুজন-রমলা আখ্যানই প্রধান। 'অন্তঃশীলা'-য় যে সুজন খগেনবাবুর সহানুভূতি পেয়ে এসেছে সেই সুজনই 'আবর্ত'-এ রমলাদেবীর প্রেমিক হিসাবে খগেনবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী। যে সুজনকে আমরা পেয়েছি রমলাদেবীর

ছোট ভাই-এর মতো সেই সুজনের এরকমের হৃদয়-পরিবর্তনের মানসিক ছবি লেখক অনবদ্য রচনাশৈলীতে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'আবর্ত'-এ সুজন বিশৃঙ্খলার ঝড় বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু রমলাদেবী সুজনকে ছেড়ে খগেনবাবুরই কাছাকাছি চলে আসেন। অথচ আমরা দেখি খগেনবাবুর উদ্দেশ্যহীন এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল চিন্তা-চেতনায় রমলাদেবীর স্থান খানিকটা অনিশ্চিত।

'আবর্ত'-এ 'অন্তঃশীলা'র কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র প্রাধান্য লাভ করেছে এবং তাদের জীবনাদর্শ ও সমস্যাবলী স্পষ্টীকৃত হয়েছে। এই উপন্যাসে আমরা দেখি রমলাদেবী সমস্ত সংযমের বাঁধন ভেঙ্গে নিজ কামনা-বাসনার নগ্নরূপ প্রকট করে তুলেছেন। খগেনবাবুর প্রতি তাঁর লোলুপতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সুজনেরও হৃদয়-উন্মোচনের পালা। সুজন 'ছোটভাই' এবং 'প্রেমিক' এর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। রমলাদেবীর ব্যবহারেই সুজনের মনে কামনার বীজ অংকুরিত হয়েছে। অন্যদিকে, খগেনবাবুর প্রতি রমলাদেবীর নিঃসংকোচ প্রেম এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। সুজনের মধ্যে বঞ্চিত প্রেমিকের ক্ষোভ এবং খগেনবাবুর প্রতি তার উচ্চধারণার বিপর্যয়ে আদর্শবাদের মোহভঙ্গ এখানে মিশ্রিত হয়েছে। "সে বিজনকে আনিয়ে বালির বঁধের দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গ রোধের হাস্যকর চেষ্টা করেছে, মাসীমার সংস্কারকে উত্তেজিত করে রমলার তীব্র কামনার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরাশ্রয়ী জীবনের বুকজোড়া ক্লান্তি ও আশালেশহীন উদাসীনতা নিয়ে সে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে।"[৫]

'আবর্ত'-এ বিজন সুস্থ, স্বাভাবিক ও তারুণ্যের প্রতীক। সে সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং নিতান্তই অবিমিশ্র 'ছোট ভাই'। যে জটিল চিন্তাধারার আবর্তে খগেনবাবু হাবুডুবু খেয়েছেন, সেই সাংঘাতিক পরিণতির দিকে নিয়তির বিধানে সুজন এগিয়ে চলেছে, খানিকটা দূর থেকে বিজন তাদের দুর্দশা লক্ষ্য করেছে। রমলাদেবী ও সুজনের মধ্যে যে সম্পর্কের শীতলতা নেমে আসছে তার স্পর্শ সে অনুভব করতে পেরেছে। কাশীতে মাসীমার কাছে চলে এলেও কাশীর ধর্মীয় আবহাওয়া এবং নিজের অবরুদ্ধ বাসনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় খগেনবাবুর মনে আবার কামনার স্রোত দ্বিগুণ তেজে প্রবাহিত হতে শুরু করে। তাতে খগেনবাবুর সমগ্র সত্তা দুঃসহ এক আবেগে বারবার আপ্লুত হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, নিছক বুদ্ধি-মনন-চিন্তার আলোকে জীবনকে খুঁজতে চাওয়া মূঢ়তা। অথচ হৃদয়াবেগকে স্বীকৃতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি বাস্তব জীবনের সহজ সত্যকে গ্রহণ করতে পারলেন না। দ্বিধা আর কুণ্ঠা তাঁর সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রইল। আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের দ্বিধাবিভক্ত সত্তার এই করুণ চেহারার ছবি নিপুণ হাতে এঁকেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'আবর্ত' উপন্যাসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'আবর্ত'-কে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং ধূর্জটিপ্রসাদকে এই পত্রিকার প্রথম ঔপন্যাসিক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

---

৫ ঐ, প্রসঙ্গ ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [সাধু ভাষার পরিবর্তে চলতি ভাষা লেখকের]।

মাসীমার মৃত্যুর পর 'মোহানার'-র শুরু। ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম দুই খণ্ড 'অন্তঃশীলা' ও 'আবর্ত'-এর পর তৃতীয় খণ্ডটির প্রয়োজনীয়তা ধূর্জটিপ্রসাদ উপলব্ধি করেছিলেন, কারণ প্রধান দুটি চরিত্র তখনও পরিণত হয়নি। তিনি নিজেই বলেছেন যে, বইটি ভেবেচিন্তে লেখা।

'অন্তঃশীলা' থেকে কাশীর অভিজ্ঞতা পর্যন্ত খগেনবাবুর জীবনের সার সংকলন করে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "সাবিত্রীর আত্মহত্যা, দেশভ্রমণ, বুদ্ধির চর্চা এবং মাসীমার মৃত্যুকে তিনি মুক্তির এক একটি স্তর ভেবেছেন, পেঁয়াজের খোসা খুলতে খুলতে অন্তস্থ সারবস্তুর সাক্ষাৎ পাবেন প্রত্যাশা করেছেন, কিন্তু আজ মনে হয় স্তর সেটা কেবল সাপ-মই খেলার ধাপ, পেঁয়াজের কুটে সেই খোসা ছাড়া আর কিছুই নেই।"[৬] কাশীর পাট চুকিয়ে দিয়ে খগেনবাবু ও রমলাদেবী দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। অপ্রত্যাশিতভাবেই একসময় এসে উপস্থিত হন কানপুরে। উপন্যাসে এখানে এক নতুন দিক সংযোজিত হয়েছে। খগেনবাবু অধুনা সাম্যবাদী বিজনের সাহায্যে কানপুরে শ্রমিক ধর্মঘটে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। শ্রমিক নেতা সফীক এবং মহবুব ও করীম প্রমুখ সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে খগেনবাবু পরিচিত হন। যতোই খগেনবাবু শ্রমিক আন্দোলনে বেশী করে জড়িয়ে পড়েছেন, রমলাদেবীও খগেনবাবুর কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। সাবিত্রীর আত্মহত্যার পূর্বের জীবনে রমলাদেবী যেন মুক্তি খুঁজে পান। কানপুরে শ্রমিক ধর্মঘটের ব্যর্থতায় সাম্যবাদী বিজন হতাশ হয়ে টেনিসের আর ক্লাবের মোহময় জীবনে ফিরে যায়। খগেনবাবু মিথ্যা খুনের দায়ে আটক সফীককে মুক্ত করার কাজে ব্রতী হন। জীবনে একটা আশ্রয়ের জন্য খগেনবাবু তখন একান্ত উদ্‌গ্রীব। একটা বলিষ্ঠ প্রত্যয় খুঁজে মরছে তাঁর বুদ্ধিক্লান্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট মন। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি খগেনবাবুর আশ্রয় মিলেছে মানুষের জন্য বেঁচে থাকার মধ্যে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমাজতন্ত্র এবং শ্রমিক আন্দোলন খগেনবাবুর জীবনে ব্যাপক জনজীবনের এবং বৃহৎ কর্ম-প্রবাহের বার্তা নিয়ে এসেছে। তিনি বুঝেছেন যে, এর মধ্যেই বুদ্ধিক্লান্ত জটিল জীবনের আবর্ত থেকে, নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এই তাৎপর্যটুকু 'মোহানা'র একান্ত সম্পদ।

খগেনবাবুর জীবনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি ভালোবাসা কখনও তিনি হারাননি। স্ত্রী সাবিত্রীর সঙ্গে তাঁর সত্তার প্রয়োজন ও সঙ্গতি হয়ত হয়নি, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নারীর প্রেমের কোন আবেদন তাঁর কাছে ছিল না। "বরং বলা যায় সাবিত্রীর মৃত্যুর ফলে সমাজ-অনুমোদিত 'বাধ্যতামূলক' প্রেমের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে খগেনবাবুর 'স্বাধীন' ব্যক্তিসত্তা প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির অবকাশ পেয়েছে। রমলার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্ক হয়ত শিথিল হয়েছে, কিন্তু তবু রমলার সংস্পর্শে ও প্রেমের প্রভাবে তাঁর বুদ্ধি-বিভ্রান্ত জীবনে আস্থা ও সামঞ্জস্য এসেছে অনেকখানি॥"[৭] বুদ্ধিবাদী,

---

৬. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মোহানা, ভারতী ভবন, ১ম সংস্করণ ১৯৪৩।

৭. ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য।

বিচারপ্রবণ, সংশয়বাদী খগেনবাবু আত্মার দুঃসহ যন্ত্রণাক্লিষ্ট পথ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত জীবন-প্রত্যয় খুঁজে পেয়েছেন মানুষের প্রতি সুগভীর ভালোবাসার মধ্যে। এখানেই 'মোহানা'র সমাপ্তি।

[তিন]

অন্তঃশীলা. আবর্ত এবং মোহানা—এই উপন্যাসত্রয়ে প্রধানতঃ নায়ক খগেনবাবুর অন্তর্মুখী জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব, এবং আত্মজিজ্ঞাসার বিভিন্ন স্তর-পরম্পরাই মুখ্য বর্ণনার বিষয়। জীবনের নানান অবস্থা এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ব্যক্তিসত্তার মানস-প্রতিক্রিয়া এবং এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অন্তর্জীবনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের সন্ধানই সমগ্র আখ্যায়িকার লক্ষ্য বস্তু। আত্মানুসন্ধানী নায়কের চিন্তা 'অন্তঃশীলা' পেরিয়ে 'আবর্ত'-এর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত জনজীবনের 'মোহানা'য় গিয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করার মধ্যেই বেঁচে থাকার সার্থকতা—এই চূড়ান্ত উপলব্ধিই হয়েছে নায়ক খগেনবাবুর।

ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাস আদৌ ঘটনাপ্রধান নয়। চিন্তা ও চেতনার সূক্ষ্ম প্রবাহ উপন্যাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। আত্মজিজ্ঞাসু বুদ্ধিজীবীর জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণই এখানে কাহিনী-রসের চেয়ে অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। নায়ক খগেনবাবুর ব্যক্তিস্বরূপ, তাঁর মানসকূট. আত্মবিশ্লেষণের প্রচেষ্টা, আত্মানুসন্ধানের প্রবণতাও শেষ পর্যন্ত 'মোহানা'য় পৌঁছে জীবনের সার্থকতার একটা উত্তর খুঁজে পাওয়া—এ সমস্তই উপন্যাসটিকে এক স্বতন্ত্র ও ভিন্ন স্বাদমণ্ডিত করে তুলেছে।

'অন্তঃশীলা' ও 'মোহানা'য় খগেনবাবুর ক্রমপরিণামী চেতনাজগৎ মুখ্য বিষয়, আর 'আবর্ত'-এর মুখ্য বিষয় রমলাদেবীর সতত প্রতিহত বস্তুজগৎ। স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী দুই নারী-পুরুষের চেতনলোক এখানে উদ্‌ঘাটিত। খগেনবাবু-রমলাদেবীর পত্রাবলীর প্রতিটি পত্র দুজনের মানসলোকের ছবিই শুধু নয়, দুজনের মনের গহনরহস্যের ঠিকানা খুঁজে পাবার ইতিবৃত্তও বটে। মাসীমা, সুজন এবং বিজনও মানুষের অন্তর্লোকের বিচিত্র রহস্যকে পুষ্টি জুগিয়েছে। অন্তর্মন বিশ্লেষণে ধূর্জটিপ্রসাদ সিদ্ধহস্ত। তাঁর উপন্যাসত্রয়ে ঘটনা-বৈচিত্র্য গৌণ, চরিত্র-সমাবেশও সেখানে প্রাধান্য পায়নি. এর অমূল্য সম্পদ চিন্তা-সমাবেশ। চিন্তা-বৈচিত্র্য এবং চৈতন্যের সংঘাত এখানে এক অপূর্ব ভঙ্গিমায় পরিবেশিত। আলোচ্য ত্রয়ী উপন্যাসে ঘটনার পরিবর্তে চিন্তা ও চেতনার স্রোতের ক্রমবর্ধমান তাৎপর্য সম্পর্কে লেখকের সুস্পষ্ট মত প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত লেখক নিজে 'চিন্তাস্রোত' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কেবল চেতন-চিন্তা নয়, অবচেতন এবং নির্জ্ঞান চিন্তাস্রোতের প্রতিও তিনি বারবার ইংগিত করেছেন। উপন্যাসত্রয়ের নামকরণেও 'স্রোত' কথাটির তাৎপর্য লক্ষনীয়।

সাহিত্যে এই 'চেতনার স্রোত বা প্রবাহ' রীতির প্রয়োগ প্রথম পাশ্চাত্যেই দেখা যায়। ফ্রয়েড এবং ইয়ুং-এর মনোবিজ্ঞানের পটভূমিতে এই রীতির উদ্ভব। 'চেতনার প্রবাহ' বা 'চিন্তার প্রবাহ' তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা উইলিয়ম জেম্‌সের রচনায় চেতনার এই স্রোত রূপটি প্রথম ধরা পড়ে। উইলিয়ম জেম্‌সের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি-চেতনায়

চিন্তা অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক। কোন না কোন প্রকার চিন্তা আমাদের মনোজগতে সর্বসময়ই চলছে। মনোবিজ্ঞানে মনের অন্তস্থ আলোচনার প্রথম স্বীকৃত তথ্যই হলো চিন্তার অবিরাম প্রবাহ। বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হলেও চিন্তায় কোন ছেদ ঘটেনা। নদীর স্রোতের মতোই চিন্তা অবিরাম গতিতে আমাদের মনোজগতে আসা-যাওয়া করে। চেতনার প্রত্যেক আকারের ক্ষেত্রেই জেম্‌স্‌ 'চিন্তা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করেছেন, যেমন—

(১) প্রতিটি চিন্তা একটি ব্যক্তি-চেতনার অংশ, অর্থাৎ চিন্তা সবসময়ই ব্যক্তিগত আকার নেয়।
(২) প্রতিটি ব্যক্তি-চেতনার চিন্তা পরিবর্তনশীল।
(৩) প্রতিটি ব্যক্তি-চেতনার মধ্যে চিন্তা সদাই প্রবহমান।
(৪) চিন্তা স্ব-নিরপেক্ষ বিষয়সমূহ নিয়েই আলোচনা করে।
(৫) ঐ বিষয়সমূহের একাংশকে চিন্তা নির্বাচন করে এবং অন্য অংশকে বর্জন করে।

জেম্‌স্‌ এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "চেতনা নিজের কাছে কখনই বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে উপস্থিত হয় না। চেতনা তার বিভিন্ন অংশের সংযুক্তি নয়, এটা একটা প্রবাহ। চেতনাকে স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করতে গেলে 'নদী' কিংবা 'ঝরণা'র উপমা দিয়েই করা সবচেয়ে ভালো।"[৮] তিনি সেজন্যই চেতনার বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে 'চিন্তার স্রোত', 'চিন্তার প্রবাহ', কিংবা 'বিষয়ীগত জীবন' বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় দর্শনে যোগাচার বৌদ্ধগণও 'বিজ্ঞান-সন্তান বা চেতনার প্রবাহের বা ধারার কথা বলেছেন। গতানুগতিক চরিত্র-প্রধান উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের সাধারণ সূত্রগুলির প্রয়োগ হতে দেখা যায়। সেখানে লেখক চরিত্রগুলির মনের বিভিন্ন স্তরের লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করে থাকেন। বাইরে থেকেই সাধারণতঃ চরিত্রগুলিকে এসব ক্ষেত্রে দেখা হয়। কিন্তু চেতনার প্রবাহধর্মী উপন্যাসে মনের কেবল সচেতন স্তর নয়, নিভৃত অবচেতন ও নির্জ্ঞান স্তরের লীলাবৈচিত্র্যকেও ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের দেখা পাশ্চাত্যে পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষায় এ জাতীয় উপন্যাস সবচেয়ে নিষ্ঠাভরে প্রথম লেখার চেষ্টা করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদই। 'চেতনাপ্রবাহ'-এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত ধূর্জটিপ্রসাদের লেখা থেকে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মৃতা স্ত্রী সাবিত্রীর প্রজ্জ্বলিত চিতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নায়ক খগেনবাবুর নিভৃত মানসকূট :

'কাঠ ক্রমে ধরে উঠল প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ, যেন উনুনে ফেন পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের উপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল। তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন—যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না। সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেয়—এখান থেকে চলে যাও। চলে

৮ উইলিয়ম জেমস্‌, দ্য প্রিন্সিপল্‌স্‌ অব্‌ সাইকোলজি।

আসেন নাকে কাপড় দিয়ে।…প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট্ পুট্ করে শব্দ হতে লাগল। গা ফেটে জল বেরুচ্ছে…।"[৯]

মৃতা স্ত্রীর আগুনে ঝলসে-যাওয়া মৃতদেহের গন্ধের প্রত্যক্ষ বর্তমান থেকে অতীতের স্মৃতিরাজ্যে চলে যাওয়ার এবং সেখানে স্ত্রীর জীবিতকালের একটি ঘটনাকে ছুঁয়ে আবার বর্তমানের অবস্থায় ফিরে আসা—সমস্তটাই নিভৃত চেতনার প্রবাহের মতো খগেনবাবুর মনে আসা-যাওয়া করেছে।

ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদের প্রচেষ্টার মূল কথা চেতনাকে প্রসারিত করা। চেতনাই তাঁর উপন্যাসে প্রধান, চেতনার সমগ্রতাই তাঁর অভীষ্ট। "এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের ক্রান্তিকাল থেকে ব্যক্তিমানসের গহনকূট বাংলা গল্পে উপন্যাসে বিষয় হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে। সেটা বেশীরভাগ সময়ে লেখকের মানবজ্ঞানে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সাক্ষ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যক্তির সমগ্র চেতনলোকই যে লেখকের একাগ্র বিষয় হতে চলেছে, রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের উপন্যাসে, প্রমথ চৌধুরীর গল্পে তার ইঙ্গিত রয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ সেই ধারাকে মাত্র অনুসরণ করেছেন, একথা বললে তাঁর যথার্থ পরিচয় দেওয়া হবেনা। বলতে হয়, তিনি ক্রমবর্ধমান চেতনাকেই করেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু।"[১০] ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর উপন্যাসত্রয়ে এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তির পরিচয় তার চিন্তাস্রোতে, তার চেতনাপ্রবাহে। নায়ক খগেনবাবুর মাধ্যমে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, প্রুস্ত, ডরোথি রিচার্ডসন প্রমুখ অন্তর্মুখীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত। তা সত্ত্বেও তার উপন্যাসত্রয় বাংলায় লেখা এবং "বাঙালীদের মধ্যে একা ধূর্জটিপ্রসাদই বোধহয় এ ধরণের উপন্যাস প্রণয়নে সক্ষম।"[১১]

। চার ।

ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা প্রথমেই লক্ষ্য করি যে, বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে উপন্যাসের সাধারণ ধারা থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ সরে এসেছিলেন। এটা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় তাঁর মননশীলতায়, ভাবাবেগ পরিহারে, আধুনিক মনস্তত্ত্বের স্বীকৃতিতে, চেতনা-প্রবাহের সাহায্যে চরিত্রের বিচিত্র রূপটি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসে, সমাজ-বাস্তবতার উপলব্ধিতে এবং উপন্যাসের জন্য নতুন ভাষা সৃষ্টিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন এবং এর পরবর্তী পর্যায়ের মানস বিপর্যয়, নানান বিকৃতি এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়-জনিত আত্মিক যন্ত্রণাকে যথাযথভাবে রূপায়িত করার পক্ষে আখ্যান-চরিত্র-পরিবেশ-বর্ণনা এবং সংলাপ-প্রধান বহির্মুখী উপন্যাস রীতি একালের অন্তর্মুখী লেখকদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাই পাশ্চাত্যে তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন নতুন রীতির উপন্যাস। "এই নতুন ধারার সূচনার ঢেউ ক্রমে বিশ্বের বুদ্ধিজীবী লেখকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করল। প্রথম যুদ্ধোত্তর আমাদের বাংলা উপন্যাসেও ক্রমশ এই রীতির

৯. ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১/, অন্তঃশীলা।
১০. ঐ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা।
১১. ঐ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত / পরিশিষ্ট।

প্রয়োগ সুরু হলো।"[১১] ধূর্জটিপ্রসাদ বাংলা উপন্যাসে নতুন ধারা প্রবর্তনে ছিলেন অন্যতম পূর্বসূরী। বিষয়বস্তুর আপেক্ষিক নতুনত্ব ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাভঙ্গীকে যে নিয়ন্ত্রিত করেছে তা আমরা স্বয়ং লেখকের কাছ থেকেই[১৩] জানতে পারি। বীরবলের শিষ্য হলেও ধূর্জটিপ্রসাদ বীরবলী ভাষা তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেননি এজন্য যে, ঐ ভাষা বড়োই সচেতন, আর সেই সচেতন ভাষা দিয়ে নায়ক-নায়িকার মনের নিভৃত খবরাখবর দেওয়া খুবই কঠিন বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে। সেজন্যই ভাষা খানিকটা অদল-বদল করে নিয়েছেন। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, আঙ্গিকের নতুনত্বে এবং সর্বোপরি ভাষা ও রচনাশৈলীর চমৎকারিত্বে ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসের বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য। "ধূর্জটিপ্রসাদ উপন্যাস রচনাকালে প্রুস্ত. জয়েস. ভার্জিনিয়া উলফের দ্বারা প্রভাবিত হলেও কোথাও তাঁদের অনুকরণ করেননি। ধূর্জটিপ্রসাদকে নিজস্ব একটি রচনারীতি তৈরী করে নিতে হয়েছে—নায়ক খগেনবাবুর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই নতুন ভাষা ও ভঙ্গী নির্মিত হয়েছে।"[১৪] বাংলা উপন্যাসে যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তবতার লক্ষণ সুস্পষ্ট, তখন সমগ্রতার সন্ধানে উপন্যাসকে কাজে লাগানোর যে প্রয়াস ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে দেখা যায়, তা তার উপন্যাস রচনারীতিতে এক ভিন্নতর ও নতুনতর স্বাদ এনে দিয়েছে, আর এই নতুনত্বের রসাস্বাদনে আপ্লুত হয়ে যথার্থ সাহিত্য-রসিকজন ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদকে সহর্ষচিত্তে সাধুবাদ জানাবেন নিঃসন্দেহে। রচনার মৌলিকতায় এবং সাহিত্যসাধনার আভিজাত্যে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর উপন্যাসে যে সৃষ্টিনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন পরবর্তীকালে তার সার্থক উত্তর-সূরীদের আমরা খুঁজে পেতে পারি অন্নদাশংকর, গোপাল হালদার প্রমুখ মননশীল ও আত্মসচেতন লেখকদের মধ্যে।

১১. ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য।
১৩. ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১/, অন্তঃশীলার ভূমিকা।
১৪. অলোক রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ।

তথ্যসূত্র :

১। ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১ / দে'জ পাবলিশিং
২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা / শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর / শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য / ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
৫। ধূর্জটিপ্রসাদ / শ্রী অলোক রায়
৬। কুলায় ও কালপুরুষ / শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
৭। অন্তঃশীলা / শ্রী গিরিজাপতি ভট্টাচার্য / পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪২ ও মে-জুলাই '৮১
৮। আবর্ত / শ্রী বিষ্ণু দে / পরিচয়, কার্তিক ১৩৪৪ ও মে-জুলাই '৮১
৯। সাহিত্য কোষ : কথাসাহিত্য / সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অলোক রায়
১০। প্রসংগ : ধূর্জটিপ্রসাদ / জলার্ক প্রকাশন
১১। দ্য প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ সাইকোলজি / উইলিয়ম জেম্‌স্

[উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি থেকে এই প্রবন্ধ রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছি। লেখকগণের কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্বীকার করছি।]

সরোজ দত্ত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ অভ্রান্ত পরিচিতির নেপথ্যে

[এক]

অনেকদিন বেঁচেছিলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ৯২ বছর ৯ মাস জীবনের মধ্যে শুধু লিখেই গিয়েছেন প্রায় একটানা ৭৩ বছর—কখনো একটু যেন মন্থর, তবে কোনো বিরতি না দিয়েই একরকম। তাঁর প্রথম গল্প 'অবিচার' প্রকাশিত হয়েছিল আষাঢ় ১৩২২-এর প্রবাসীতে। আর তাঁর সর্বশেষ রচনার নিদর্শন "লক্ষ্মী" নামীয় একটি কাব্যোপন্যাস (শারদ-আনন্দমেলা ১৩৯৫) এবং "অযাচি সন্ধানে" নামীয় একটি ছোটো মাপের উপন্যাস (শারদ-দেশ ১৩৯৫)। এদের মধ্যে "লক্ষ্মী"র রচনাকাল সম্ভবত ১৩৯৩-এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে; তারপরই তিনি লিখতে শুরু করেন "অযাচি সন্ধানে"। "লক্ষ্মী" এখনও পত্রিকার পাতায় থেকে গেলেও "অযাচি সন্ধানে" ইতিমধ্যেই গ্রন্থরূপ পেয়ে গিয়েছে।

বিভূতিভূষণের যে-উপন্যাসগুলি তাঁর জীবিতকালেই গ্রন্থরূপ পেয়েছিল তাদের সংখ্যা ২৪। "স্বর্গাদপি গরীয়সী"র ৩টি খণ্ড এবং "নব সন্ন্যাস"-এর ২টি খণ্ডকে আলাদাভাবে ধরা হ'লে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ২৭। তাঁর বিপুলসংখ্যক গল্পের (সাতশ'রও বেশি) পাশে উপন্যাসের সংখ্যা বেশ কম। আবার এ-ও দেখা যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস "নীলাঙ্গুরীয়" (১৩৪৯) প্রকাশের আগেই ৫ বছরে তাঁর সাতটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এই প্রতিপত্তিশালী গল্পকার যেমন লিখেছেন, (১·৬·১৯৭৯-র ব্যক্তিগত চিঠি), তা থেকে মনে হয়, প্রথমদিকে উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে তাঁর যেন দ্বিধা ছিল খানিকটা। যদিও দেখা গিয়েছে "নীলাঙ্গুরীয়" গল্পকার বিভূতিভূষণের জনপ্রিয়তাকে আদৌ ক্ষুণ্ণ করেনি।

এরপর থেকে, বিভূতিভূষণ নিজে উপন্যাস রচনায় আগ্রহী বা অনাগ্রহী যা-ই হোন না কেন কয়েকটি উপন্যাস তাঁকে লিখতে হয়েছে বা তিনি লিখেছেন। আর গল্পকার বিভূতিভূষণের মতো ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও যে পাঠকেরা সমান আগ্রহী ছিলেন তারও কিছু প্রমাণ দেওয়া যায়। তাঁর ঐ ২৪ (বা ২৭) টি উপন্যাসের অনেকগুলিই কোনো না কোনো পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং অবিলম্বে বা অনতিবিলম্বেই সেগুলি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে। স্পষ্ট একটা ধারণা পাবার জন্যে নিচের তালিকাটি সহায়ক হ'তে পারে ঃ—

উপন্যাস	পত্রিকা ও প্রকাশকাল	গ্রন্থরূপ লাভ
নীলাঙ্গুরীয়	প্রবাসী / আশ্বিন ১৩৪৭— আষাঢ় ১৩৪৯	ভাদ্র ১৩৪৯
স্বর্গাদপি গরীয়সী—১		শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ১৩৫১
স্বর্গাদপি গরীয়সী—২		রথযাত্রা ১৩৫২

উপন্যাস	পত্রিকা ও প্রকাশকাল	গ্রন্থরূপ লাভ
স্বর্গাদপি গরীয়সী—৩	মা. বসুমতী / কার্তিক ১৩৫২—বৈশাখ+জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪	ভাদ্র ১৩৫৪
নব সন্ন্যাস—১	প্রবাসী / বৈশাখ ১৩৫৩—শ্রাবণ ১৩৫৪	আষাঢ় ১৩৫৫
নব সন্ন্যাস—২		আশ্বিন ১৩৫৫
তোমরাই ভরসা		বৈশাখ ১৩৫৭
উত্তরায়ণ	ভারতবর্ষ / জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮—অগ্রহায়ণ ১৩৫৯	চৈত্র ১৩৫৯
কাঞ্চনমূল্য		৭ই বৈশাখ ১৩৬৩
কদম	উল্টোরথ / কার্তিক ১৩৬৩	চৈত্র ১৩৬৩
নয়ান বৌ	কথাসাহিত্য / আষাঢ় ১৩৬০—কার্তিক ১৩৬৩	১৯৫৭
রিকশার গান	বসুধারা / কার্তিক ১৩৬৪—চৈত্র ১৩৬৫	৭ কার্তিক ১৩৬৬
মিলনান্তক	কথাসাহিত্য / পৌষ ১৩৬৪—আষাঢ় ১৩৬৬	পৌষ ১৩৬৬
রূপ হল অভিশাপ		ফাল্গুন ১৩৬৭
পরিশোধ	অমৃত / ২২ আষাঢ় ১৩৬৮—১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮	বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৬৯
পঙ্কপল্বল		বৈশাখ ১৩৭১
দোলগোবিন্দের কড়চা	কথাসাহিত্য / বৈশাখ ১৩৭০ পৌষ ১৩৭১	মাঘ ১৩৭১
ঊর্মি আহ্বান		আষাঢ় ১৩৭২
এবার প্রিয়ংবদা	মা. বসুমতী / জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২—অগ্রহায়ণ ১৩৭৩	শ্রাবণ ১৩৭৪
আধুনিক	অমৃত / ১ আষাঢ় ১৩৭৪—১৯ আশ্বিন ১৩৭৪	ফাল্গুন ১৩৭৪
দুই কন্যা		১ বৈশাখ ১৩৭৭
তাঞ্জাম	অমৃত / ১৯ ভাদ্র ১৩৭৬—১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬	বৈশাখ ১৩৭৭
ফেরারী ফিরে এল	অমৃত / ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০—৭ ভাদ্র ১৩৮০	বৈশাখ ১৩৮১
বিশেষজ্ঞ	শার. বেতার জগৎ ১৩৮১	বৈশাখ ১৩৮৩
পুটুরাণী	শার. অমৃত / ১৩৮৭	নববর্ষ ১৩৮৮
একটি যুগের জন্মকথা		অগ্রহায়ণ ১৩৮৮
সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে		জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩

পরিমল গোস্বামী তাঁর কোনো স্মৃতিচারণামূলক লেখায় লিখেছিলেন যে তিনি যখন যুগান্তর-এর রবিবারের সাময়িকী বিভাগ দেখাশোনা করতেন তখন বিভূতিভূষণের একটি পারিবারিক উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সেখানে। হ'তে পারে উপন্যাসটি "স্বর্গাদপি গরীয়সী"র প্রথম একটি বা দুটি খণ্ড। আর "নব সন্ন্যাস" সম্পর্কে জেনে রাখা ভালো যে, উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড 'প্রবাসী'-তে শেষ হয় শ্রাবণ ১৩৫৪-তে। প্রায় একবছর পরে আষাঢ় ১৩৫৫-তে যেমন এই প্রথম খণ্ড গ্রন্থরূপ লাভ করে, তেমনি 'নব সন্ন্যাস"-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মিলিয়ে একটি অখণ্ড সংস্করণও প্রকাশিত হয় ঐ আষাঢ় ১৩৫৫-তেই; দ্বিতীয় খণ্ডের স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপ পাওয়া যায় এই অখণ্ড সংস্করণের পরে, আশ্বিন ১৩৫৫-তে। সচরাচর এমন ঘটতে দেখা যায় না। কি কারণে এটা ঘটতে পারল গভীরতর প্রয়োজনেই আমাদের তা খুঁজে দেখতে হবে। বাকি উপন্যাসগুলির মধ্যে "বিশেষজ্ঞ" ব্যতীত আর কোনোটিই গ্রন্থরূপ লাভ করতে 'নব সন্ন্যাস" প্রথম খণ্ডের মতো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেনি।

বিভূতিভূষণ নিজে এবং তার বক্তব্য অনুযায়ী কিছু বিবেচক পাঠক "স্বর্গাদপি গরীয়সী"কেই তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ব'লে মনে করেন। হ'তে পারে উপন্যাসটির স্থান ও কালগত ব্যাপ্তি, সেইসঙ্গে পারিবারিক জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রণের মধ্য দিয়ে একটি দেশের প্রায় শতাব্দীব্যাপী জীবনযাত্রার প্রাণস্পন্দনকে ধরবার প্রয়াস, সেইসঙ্গে এক মহত্তর আদর্শে উত্তরণের চিত্র এইসব মিলিয়েই উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্বের দাবি। এটা মেনে নিলেও "নীলাঙ্গুরীয়" যে বিভূতিভূষণের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার প্রত্যক্ষ কারণ মীরা-শৈলেনের রোম্যান্টিক বৃত্তান্ত। এর সমান্তরাল রোম্যান্টিক আখ্যান, আবেগ, উচ্ছ্বাস হয়তো পাওয়া যাবে "রনলা', "জীবনায়ন' বা "পথিক"-এর মধ্যে। কিন্তু ঐ "নীলাঙ্গুরীয়'-তেই সৌদামিনী-জীবনকথাকে উপজীব্য ক'রে বিভূতিভূষণ যে সামাজিক সমস্যাটিকে ধরতে চেয়েছিলেন, দায়িত্বশীল কথাশিল্পী হিসেবে "রক্তবীজ-রক্তবান" যে থীমটিকে আমাদের ভাবনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন, বারম্বার তার সেই পীড়িত প্রার্থনা পাঠকের কাছে উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে। না হ'লে হয়তো বোঝা যেত, পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে কেন আসছে চম্পা ("নব সন্ন্যাস"), ডোরা-জাহ্নবী ("তোমরাই ভরসা"), সরমা ("উত্তরারণ"), হেনা ("দুই কন্যা")-র মতো চরিত্রগুলি। বিষয়গত দিক থেকে 'পঙ্কপল্বল", "ঊর্মি আহ্বান" এমন কি "ফেরারী ফিরে এল"-র মতো রচনাও এই ধারারই অনুসারী। রাজনীতিগত আবহের সূত্রে "সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে" "নব সন্ন্যাস"-এর খুব কাছাকাছি। আপাততঃ দোসরহীন মনে হয় "স্বর্গাদপি গরীয়সী" এবং "নয়ান বৌ"-কে। স্বরূপ মণ্ডলের কথকতার মধ্য দিয়ে পাওয়া "কাঞ্চনমূল্য" এবং "তাঞ্জাম"-এ তৈরি হয়েছে রূপকথার পরিবেশ। "এবার প্রিয়ংবদা" বা "পরিশোধ"-এ তেমন ঢেউ নেই। বৈচিত্র্যের যত রূপই দেখা যাক না এই উপন্যাসগুলির শিল্পরূপে, শেষপর্যন্ত এদের প্রায় সবগুলিই বিভূতিভূষণ-অনুভূত এক মূল সত্যকে ছুঁয়ে আছে।

১৩৫০ সালে "কেন লিখি" নামে এক প্রবন্ধে বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যপ্রয়াসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল লেখা-র মধ্য দিয়ে বহুজনের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলা ; আর বলেছিলেন—"বড় অপরূপ এই জীবন—ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া বিরাট এখানে ক্রমাগতই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে ; পৃথিবী আজ হয়তো ছোট. কিন্তু এর destiny বা চরম ভাগ্য যে ছোট নয় তার ইঙ্গিত এর মধ্যেই আছে এই বলার আকুতি আমার স্বধর্ম।" প্রায় ৩৫ বছর পরে, এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে (২৮·১০ ১৯৭৮) এই বক্তব্যই তিনি একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলেন যে, অন্তরঙ্গতা স্থাপনের সূত্র হিসেবে তিনি অবলম্বন করেছেন হাস্যরসকে আর পৃথিবীর চরম ভাগ্য যে ছোট নয় সেটা দেখাতে গিয়ে তিনি অবলম্বন করেছেন বিভিন্ন সমস্যা,—কখনো তা রাজনৈতিক, কখনো বা সামাজিক। ১৯৭৮-এর আগে এবং পরে আরও অনেকগুলি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে বিভূতিভূষণের· সেগুলি নিয়েছেন ভবানী মুখোপাধ্যায় (অমৃত / ১৭ ভাদ্র ১৩৭২), শচীন দাশ (অমৃত / ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪), জনাব ঘটক (ধ্বনি [নবপর্যায়] / ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫), অভীক রায় (ধনধান্যে / ১৬-৩১ মার্চ ১৯৮২ ও শিলাদিত্য / ১৬-৩১ মার্চ ১৯৮৪), অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (আকর্ষণ / শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৯০), শঙ্কর ভট্টাচার্য ও সমরজিৎ· বিশ্বাস (সৌরভ / ১৩৯২) ও শঙ্কর ভট্টাচার্য (চতুরঙ্গ / আগস্ট ১৯৮৭) প্রমুখরা। এইসব সাক্ষাৎকারে বিবিধ এবং বিচিত্র সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিভূতিভূষণের মূল বক্তব্য কিন্তু অভিন্নই থেকেছে। অর্থাৎ চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তিনি যে এই প্রসারিত সময়ে তার 'স্বধর্ম' থেকে কখনো ভ্রষ্ট হন নি তার প্রমাণ এবং পরিচয় ঐ সাক্ষাৎকার গুলি। লেখক হিসেবে ঐ স্বধর্ম নিষ্ঠার কি মূল্য তিনি দিয়েছেন আমরা তা যাচাই ক'রে দেখবার সুযোগ পাব তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্যে, বর্তমান আলোচনায় প্রধানতঃ তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে।

[দুই]

একান্ত আলাপচারিতায় কিম্বা মাঝেমাঝেই সাক্ষাৎকারে এবং সেইসঙ্গে তার গল্প-উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বারবার জানিয়েছেন যে পরাধীন ভারতের মুক্তিপ্রয়াসে অহিংসা-অসহযোগকে নীতি হিসেবে তিনি কখনো মেনে নিতে পারেন নি বরং নিজে কখনো সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত না থাকলেও বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের প্রতিই ছিল তাঁর মানসিক প্রশ্রয়। তবে, এটাও তাঁর মনে হয়েছিল যে এই সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতির মধ্যে কোথাও যেন অভাব ছিল একটা গঠনমূলক ভাবাদর্শের—তাই তিনি চেয়েছিলেন এই বিপ্লবী ভাবাদর্শের একটা মার্জিত রূপ। দু'খণ্ডে সমাপ্ত "নব সন্ন্যাস" তাঁর এই ভাবনা এবং বাসনার সম্প্রসারণ। অন্ততঃ উপন্যাসের আখ্যায়িকার প্রাথমিক আবেদন তাই। প্রথম খণ্ডের কাহিনীর শেষে দেখা যায় নায়ক টুলু সশস্ত্র বিপ্লববাদে আস্থাশীল হ'য়ে উঠে অগ্নিদীক্ষা নিয়েছে তার

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ গুরু মাষ্টারমশাইয়ের কাছে। আর দ্বিতীয়খণ্ডে দেখা যায় গঠনমূলক সেবাধর্ম অবলম্বন ক'রেও শেষপর্যন্ত প্রাণ দেবার প্রস্তুতি নিতে হয়েছে টুলুকে—প্রেক্ষাপট ১৯৪২-এর আন্দোলনের মেদিনীপুর।

প্রথম খণ্ডে টুলুর এই দীক্ষা একদিনে সম্পন্ন হয় নি। সিন্ধবাবার অনুকম্পায় মোক্ষীপিপাসু টুলুকে মাস্টারমশাই—যিনি এ কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং যথার্থ নায়ক, অবশ্য অনেকটা নেপথ্যনায়ক—নিয়ে গিয়েছেন খনিগর্ভে, পাঠিয়েছেন খনিশ্রমিকদের বস্তিতে। সঙ্গে সঙ্গে, কখনো কথাবার্তার ফাঁকে, কখনো চিঠিপত্রে এই ভাবালু তরুণটিকে তিনি অংশ দিয়েছেন তাঁর সমাজবীক্ষণ অভিজ্ঞতার। বলেছেন, "বস্তির দিকে চেয়ে দেখো—রোগ, দারিদ্র্য, দুর্নীতি—মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে ফেলতে যা কিছু দরকার সে-সবের এক জায়গায় অমন সমাবেশ আর দেখতে পাবে না টুলু। সর্বনাশের কথা এই যে ওরা যে কত নেমে গেছে, উঠতে পারলে মানুষ হিসাবে তাদের যে কত ওঠবার ছিল—সেটা পর্যন্ত ওরা আর টের পায়না।…চারিদিকের অর্থগত বিলাসের মধ্যে, চারিদিকের ভূরিভোজের ঢেকুরের মধ্যে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঐ যে তিলে তিলে মরা, তারপর এই তারতম্যের—অর্থাৎ এই বোধটুকুও আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যাওয়া—একে একে যতরকম পাপ সবকে পাথেয় করে নিয়ে—অমৃতের পুত্র বলে যাদের নিয়ে বড়াই করি, তাদের এই নরকের দিকে তীর্থযাত্রা—এ দারিদ্র্য আমি বুঝি না টুলু।" বিচলিত টুলুর ভাবপ্রবণ কারণানুসন্ধানের বাসনাকে ধিক্কার দিয়ে তিনি শোনাতে থাকেন—"তোমার কথাগুলো রাতারাতি আমাদের বিলিতি কর্তাদের মতন কি করে হয়ে উঠল ভেবে সারা হচ্ছি…অভাব অভিযোগ, তারপর কমিশন, তারপর রিপোর্ট, তারপর অর্থাভাব সবশেষে সেই ফক্কিকার—আবার যথাপূর্বং তথা পরম্—দেড়শো বছরের এই ইতিহাস। অভাব অভিযোগের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলে—সমুদ্রকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কোনখানটা তার নোনা তো কি ও-া উত্তর হবে…"? এই নোনাধরা জীবন, এই দারিদ্র্য, এই নরকাভিমুখী তীর্থযাত্রা—এর মূলে আমাদের পরাধীনতা, এক সময় এটাই স্থির বিশ্বাস ছিল মাস্টারমশাই এবং তাঁর সহযোগীদের। শক্তিমান, অত্যাচারী বিদেশী শাসক এবং শোষককে আবেদন নিবেদনে বশ করা অসম্ভব, এটাও মনে করতেন এই সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীরা। ঠিক সেইজন্যেই কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের প্রয়াস তাঁদের পরিহাসের বিষয় ছিল। মাস্টারমশাই জানাচ্ছেন—"তাই থেকে আমাদের উদ্ভবও। আজ ক্লীড হয়েছে—পড়ে মার খেয়ে ওদের দয়ার উদ্রেক কর বলে।" তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী নন, বরং অত্যাচারীকে হনন করার জন্য গীতার উপদেশ তিনি আক্ষরিকভাবে মানেন। তবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর বা তাদের লক্ষ্য গিয়েছে বদলে।—"বদলে যাওয়াও ঠিক নয়, এক লক্ষ্য ছিল, এখন হয়েছে অগণিত, মূলের সে এক তো আছেই।…অন্যায়ের বিরুদ্ধেই আগুন জ্বালানো, কিন্তু অন্যায় তো ঐ বিদেশীর অত্যাচারের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি…ওটা [বিদেশী শাসন]

আমাদের দুঃখের মূল, জাতি হিসাবে একটা সুসঙ্গত পরিণতির অন্তরায়······কিন্তু অন্যায় তো ঐখানেই শেষ হয়ে গেল না। স্বার্থের আকারে, লোভের আকারে, সে তো জীবনকে প্রতিনিয়তই নিষ্পিষ্ট করে চলেছে—হেথায়, হোথায়, সর্বত্রই। অন্যায়ের তো স্বাধীনতা-পরাধীনতা নেই। সমাজে অন্যায়—নিচে থেকে যারা তোমার জীবনকে সুন্দর, সহনীয় করে তুলছে, ওপর থেকে তুমি তাদের পশুর চেয়েও নীচ করে রাখছ, ধর্মে অন্যায়, উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রবল অন্যায়······মানুষের দুটো বড় বিভাগ স্বাধীন আর পরাধীন নয়—অত্যাচারী প্রবঞ্চক আর অত্যাচারিত প্রবঞ্চিত।" টুলু-কে সামনে রেখে মাস্টারমশাই এবং হয়তো বিভূতিভূষণও নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় পৌঁছুতে চাইছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের কালেকালেই বিভূতিভূষণেরও ধারণায় এসে থাকবে যে "অত্যাচারী প্রবঞ্চক আর অত্যাচারিত প্রবঞ্চিত"-র প্রভেদ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে না—তার জন্যেও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে।

মাস্টারমশাইয়ের সাহচর্যে এসে টুলু-ও এখন এ-সত্যে অনেকটা আস্থাশীল। সেইজন্য সে খনি-ম্যানেজারের উদ্ধত আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে সাহসী হয়—"আপনি মজুরদের যা দেন তার বদলে খানিকটা শরীরের শক্তি পাবার অধিকারী আপনি ; নিচ্ছেন কিন্তু তার স্বাস্থ্য, তার প্রাণ, তার নীতিজ্ঞান, তার ধর্ম—মানে মনুষ্যত্ব বলতে যা বোঝায় তার সবটুকুই।" এর অভাবে, অর্থাৎ ঐ মনুষ্যত্ব হারিয়ে এই শ্রমিকেরা অধঃপতনের কোন্ স্তরে নেমে যায়, চম্পা-র বাবা চরণদাসকে সামনে রেখে সেদিকেও টুলু-র চোখ খুলে দিতে চেয়েছেন মাষ্টারমশাই ; একই সঙ্গে টুলু-কে দেখিয়েছেন ধর্মের নামে সামাজিক তামসিকতার একটি চিত্র—"তুমি আবেগের মাথায় চরণদাস আর তোমার সিদ্ধবাবার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলেছে—সেগুলো যদি আমি পাশাপাশি লিখে রাখতে পারতাম তো দেখতে, বিষয়ের দিক দিয়ে একটুও তফাৎ নেই। সেই নর্দমা, সেই পাঁকে ল্যাপটানো মাথার চুল, পরিধেয়, সেই তীব্র নেশায় অচেতন অবস্থা, সেই রক্তচক্ষু—একটুও কি তফাৎ আছে? ভেবে দেখ, এমন কি চরণদাসও তোমায় যে 'নেকালো' বলে তেড়েফুঁড়ে উঠল, তোমার সিদ্ধবাবাও ঠিক সেই নেকালো' বলেই তোমায় অভিনন্দিত করলেন। কিন্তু বিষয়ের দিক দিয়ে, ঘটনার দিক দিয়ে এক হলেও, ভাবের দিক, আর সেইজন্যেই ভাষায় দিক দিয়ে, কত প্রভেদ হ'য়ে গেছে দেখো। তোমার বর্ণনাটা চরণদাসের বেলায় হ'ল নেশায় বেহুঁশ ; সিদ্ধবাবার বেলায় হ'ল —সমাধি, অর্থাৎ যোগের চরম সিদ্ধি—সাজুয্য। চরণদাসের চোখ হল নেশায় টকটকে লাল, গর্তের মধ্যে একজোড়া চোখ ভাটার মত জ্বলছে ; সিদ্ধবাবার বেলায় হল—আকর্ণবিস্তৃত চোখে করুণার ঢলঢল চাহনি। চরণদাসের বেলায় হল—বিকৃতস্বরে তিরস্কার ; আবার ঠিক সেই তিরস্কারটাই তোমার সিদ্ধবাবার বেলায় হল পরীক্ষা, দয়ার রহস্য। বিচারশক্তি যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত নাই হয়ে থাকে তো এমন ওলট পালট আর কি করে হয় টুলু?" এমন ছিল না চরণদাস। চরণদাসের বাবা বনমালী টুলু-কে জানায় এই বিপর্যস্ত ইতিবৃত্ত—

"উ এমনটি ছিলোক নাই। ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া হাতের কব্জ—আমি চরণদাসের মাকে বুলতাম—তুর ছাত্তয়াল সিংগীর বাচ্চা বটে গো।…সিটি যত্তোদিন বেঁচে ছিলোক চরণকে খনির মধ্যে ঢুকতে দিলেক নাই। আমায় বুলত—তু এ দুশমনের চাকরি থেকে খালাস হ. আমি আমার চরণকে ফিরিয়ে লিয়ে গিয়ে আবার রাইগাঁয়ে সংসারটি পাতবোক।…টিপসই করা কাজ কি না বাবুমশায়!…উর মা যেতে আমারও মাজা ভেঙ্গে গেলোক, উকে দিয়ে টিপসই করালোক। উর চেহারার উপর বরাবর লজোর ছিলোক আজ্ঞে, উকে লোতুন সুড়ঙ্গে দিতে লাগলোক। চন্দনের বিটি নক্ষীর সঙ্গে উর বিয়া দিলাল।…লোতুন সুড়ঙ্গের কাজ কঠিন মেহনতের কাজ, নেশা করিয়ে ছাড়েক আজ্ঞে। তা নক্ষী যত্তোদিন বেঁচে ছিলোক নেশাটি করে ঘরে ঢুকতে দিলেক নাই. নামে নক্ষী. কাজেও নক্ষী বটে।…দু'কম বিশবছর বেঁচে ছিলোক নক্ষীটি,…" এরপর কে-ই বা বনমালীকে জীবনের মন্ত্রণা দেবে, চরণদাসকে প্রশমিতই বা করবে কে? বনমালী-চরণদাসের গার্হস্থ্যজীবনে লক্ষ্মীর অন্তর্ধান ঘটে গিয়েছে।

মাস্টারমশাইয়ের আক্ষেপ. ধর্মীয় বিকৃতি সামাজিক অধোগতির পথটিকে অধিকতর পিচ্ছিল করেছে। তিনি তার নবীন শিষ্যটিকে শুনিয়ে চলেন—"আমাদের ধর্ম থেকে অভিসার কথাটা যদি তুলে দেওয়া যায় তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঁকা মেরুদণ্ড অন্ততঃ আধাআধি সোজা হয়ে ওঠে।" নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাস্টারমশাই টুলুকে বোঝান—"চৈতন্যের ধর্মই দেখোনা - অন্তত আচণ্ডাল সবাইকে কোল দিতে বলেছিলেন তো? ও-যুগে যা একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার মুসলমানকে পর্যন্ত তিনি ধর্মে গ্রহণ করেছিলেন। লোকে পারলে রাখতে? সেই জাতপাত সবই রয়ে গেল—বাড়তির মধ্যে এল অভিসারের জয়জয়কার আর পুরুষের কণ্ঠে মেয়েদের বিরহের নাকি কান্না।…এতবড় মুক্তির মন্ত্র যে দিলেন. তার সঙ্গে শৌর্যের মন্ত্র দেওয়া উচিত ছিল. কেন না শৌর্যই মুক্তিকে রক্ষা করতে পারে।" এই শৌর্যের অভাবে. মাস্টার-মশাই বলতেই থাকেন—"স্বাধীনতার সাধনা চলল, কিন্তু যে ধর্মকে আমরা বরাবর ভয় করতাম. তাই ঢুকে সাধনার ধারা দিল বদলে। আমাদের ছিল গীতার ধর্ম—অন্যায়কারীকে করতে হবে হনন; তার জায়গায় যা এসে দাঁড়াল তা সেই একই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে থাকলেও একেবারে উল্টো প্রকৃতির—হনন বা হিংসার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।…আমরা যে আগুন জেলেছিলাম সে তো বুভুক্ষুই রয়ে গেল ঐ দিক দিয়ে,…আমিও দগ্ধ, তবে নিঃশেষ হইনি, বুকের আগুন ছড়িয়ে বেড়াবার নেশা নিয়ে আছি বেঁচে।" সমগ্র উপন্যাসের কাহিনী থেকে বোঝা যায় এ আগুন তাঁর "প্রাণের প্রাণ"।

অচিরেই জানা যায়, মাস্টারমশাই সশস্ত্র বিপ্লবীদেরই একজন। শেষ সাক্ষাৎকারে তিনি টুলুকে জানিয়েছেন ১৯২০ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে-সব ডাকাতি হয়, তার গোটাচারেকের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। বিবেচক এই বিপ্লবী মানুষটি বোঝেন প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলায় টুলুকে নিয়োজিত করা ঠিক নয়, তার

মানসিক কাঠামো একাজের অনুপযুক্ত। সুতরাং টুলু-কে সেবা অঙ্গের তিনটি কাজ দিয়ে তিনি লিখেছিলেন—"তোমার কাজ তিনটি বিষয় নিয়ে হবে—বস্তিতে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান, শিশুমঙ্গল আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। সেই অদৃশ্য শক্তি তিনটিই তোমার সামনে ধরে দিয়েছেন—চরণদাস, হীরক। তৃতীয়টির নাম না করলেও বুঝতে তোমার দেরী হবে না। একটা মেয়ে শুধরে গেলে একটা জাতি শুধরে যেতে পারে।" এইভাবে যে-মেয়েটির উদ্ধারের দায় টুলু-র উপর ন্যস্ত হ'ল সেই মেয়েটির নাম চম্পা; এবং মাস্টারমশাইয়ের নির্দেশ আসবার আগেই টুলু এগিয়ে গিয়েছে নবকের দরজা থেকে চম্পা-কে ফেরাতে। ঘটনাপরম্পরা থেকে দেখা যায় মাস্টারমশাইয়ের নির্দেশিত সেবাঅঙ্গের তিনটি কাজে ব্রতী হবার সূত্রে খনি-ম্যানেজারের সঙ্গে টুলু-র বিরোধের সূত্রপাত, যার পরিণামে টুলুকে কারাবরণ করতে হয়েছে ম্যানেজাবের চক্রান্তে এবং উপন্যাসের প্রথম খণ্ড—ঝরিয়া-বরাকর পর্ব—এখানেই শেষ হয়েছে।

এটা খুব সহজেই চোখে পড়ে "নব সন্ন্যাস" প্রথম খণ্ডের কাহিনীতে রাজনৈতিক আদর্শগত একটা তাপ সঞ্চারিত করতে পারলেও কাহিনীকার এখানে কোনো নির্ভরযোগ্য বা ইতিহাসসম্মত সশস্ত্র আন্দোলনের বাস্তব ভিত্তি উপস্থিত করেন নি। অথচ, রাজনীতি বা ইতিহাসভিত্তিক কাহিনীতে তার একটা উপযোগিতা আছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাস্টারমশাই প্রায় এক কল্পপুরুষ, যাঁর সক্রিয়তা বিগতদিনের অনির্দেশ্য ইতিহাসের অস্পষ্ট বিবরণীর মধ্যে এবং তাঁর বর্তমানের যা কিছু তৎপরতা তার সবটুকুই লোকচক্ষুর আড়ালে। টুলু-কে লেখা তাঁর শেষ চিঠি থেকে বোঝা যায় প্রথম অংশ লেখার সময়ে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন দরজায় আঘাত করছে, আর দ্বিতীয় অংশে আছে আন্দোলনের সেই অবিশ্রান্ত দিনে কোনো এক সংঘর্ষ-ভূমিতে মাস্টারমশাইয়ের নিহত হবার কথা। এই শেষ চিঠিও টুলু-র হাতে এসেছে, আটবছর পর টুলু-র কারামুক্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীর যেখানে সূত্রপাত। এখনও পর্যন্ত উপন্যাসে রাজনৈতিক কোনো ঘটনার বাস্তব আলেখ্য অনুপস্থিত।

এরপর থেকে, উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ডে—মেদিনীপুর পর্বে—রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিভূতিভূষণ ঐতিহাসিকের সততায় বিবৃত করেছেন। ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাতের পরে, আগস্টের শেষ দিকে টুলু কারাগার থেকে বাইরে এসেছে; ততদিনে আন্দোলন বিশেষ তীব্র হ'য়ে উঠেছে মেদিনীপুর অঞ্চলে। বাইরে আসবার পরই আকস্মিকভাবে টুলু-র সাক্ষাৎ হয় হীরকের সঙ্গে, সেইসূত্রে চম্পার সঙ্গেও। ৪২-এর এই আন্দোলনের বিবরণ দিতে গিয়ে সামান্য স্বাধীনতা নিয়েছেন লেখক। শেষ চিঠির প্রথম অংশে মাস্টারমশাই লিখেছেন—"একটা বিজয় পূর্ণ—কংগ্রেসকে আমাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছি—সেটা রূপ নিয়েছে 'কুইট ইণ্ডিয়া'য়। সপ্তাক্ষর মহামন্ত্র, কংগ্রেস জানে এ অহিংসা মন্ত্র নয়…।" কার্যত এ আন্দোলনের চরিত্র অহিংস থাকেনি ঠিকই কিন্তু প্রস্তাবে সেদিন হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের

কথা কংগ্রেস স্বীকার করেনি। ৭ আগস্ট গান্ধীজী বলেছিলেন ববং—"Nevertheless you should not resort to violence and put non-violence to shame." ৮ আগস্টের প্রস্তাবে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল—"They must remember that non-violence is the basis of the movement." এটুকু বৈষম্য ব্যতীত মেদিনীপুর অঞ্চলে আন্দোলনের তীব্রতার যে-বিবরণ লেখক দিয়েছেন উপন্যাসের 'মেদিনীপুর' পর্বে, ঐতিহাসিকের বিবরণের সঙ্গে তা প্রায় আক্ষরিকভাবে মিলে যায়। সম্প্রতি এই আন্দোলন সম্পর্কে অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন—"মেদিনীপুরের কথাই ধরা যাক। ২৪শে সেপ্টেম্বর স্থির হয় থানা ও সরকারী ভবনগুলির উপর যুগপৎ আক্রমণ করা হবে। এ কাজের জন্য মহিষাদল, তমলুক, সুতাহাটা, নন্দীগ্রামে 'বিদ্যুৎবাহিনী' নামে স্বেচ্ছাবাহিনী গঠিত হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা হয়, ২৯শে ছটি থানা দখল ও পোড়াবার চেষ্টা চলে। সুতাহাটা, খেজুরী ও পটাশপুর দখল হল কিন্তু মহিষাদল ও তমলুক থানায় বিদ্রোহীরা হার মানে। তমলুক থানা আক্রমণে অসীম বীরত্ব দেখান মাতঙ্গিনী হাজরা, ওখানে সেনা না থাকলে কি হত বলা যায় না।...ডাক বাংলো, স্কুল, ডাকঘর, রেজিষ্ট্রি অফিস, খাসমহল অফিস পোড়ানো হয় বেশ কিছু।...মোটের উপর ১৯৪২ সালের অক্টোবরের মধ্যে পটাশপুর, খেজুরী ও সুতাহাটা বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়।...১৬ই অক্টোবরের প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি এই পর্বে ছেদ টানে। তবু ২৫শে অজয় মুখার্জী বলেন—সংগ্রাম স্তিমিত হতে দেওয়া হবে না। ১৭ই ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ঘোষিত হয়। তার সর্বাধিনায়ক হন সতীশ সামন্ত, অর্থসচিব অজয়বাবু, সমর ও স্বরাষ্ট্রসচিব সুশীল ধাড়া।...গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হচ্ছে ১৯৪৩-এর মার্চে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।...মে মাসে সতীশ সামন্ত বন্দী হলে অজয়বাবু হন দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক। তিনি বন্দী হন সেপ্টেম্বরে। এরপর আরেক পর্ব শুরু হয় সুশীল ধাড়ার অধীনে!...১৯৪৪-এর আগস্টে ছোটলাট কেসি জানাচ্ছেন, তমলুকের অবস্থা 'তখনও বিপজ্জনক' এমন কি 'clearly intolerable'. ঐ বছর ১লা সেপ্টেম্বর গান্ধীর আহ্বানে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অবসান ঘোষণা করে।" (দেশ /২৯ অক্টোবর ১৯৮৮ / পৃ. ২৪-২৫)।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্বিগ্ন এই সময়ের টুকরো টুকরো সংবাদে বিভূতিভূষণ গ'ড়ে তুলেছেন তাঁর "নবসন্ন্যাস" উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের চালচিত্র। তিনি জানাচ্ছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের কথা, ১৯৪১-এ দেশে ফসল ঘাটতির কথা, ঐ বছরেরই শেষে জাপানের যুদ্ধে যোগদানের খবর, সরকারের পোড়ামাটি নীতি ও ডিনায়াল পলিসি অনুসরণ, এমন কি জানাচ্ছেন মেদিনীপুরে 'বিদ্যুৎবাহিনী' গঠনের কথাও আর সঙ্গে সঙ্গে বিবৃত করছেন আন্দোলনের ইতিহাস—"২৯শে সেপ্টেম্বর বিভিন্ন স্থানে জনতা একজোট হইয়া থানা, রেজিষ্ট্রি অফিস, ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, পঞ্চায়েৎ অফিস প্রভৃতি যেখানেই গভর্ণমেণ্টের কেন্দ্র বা

গভর্ণমেণ্টের সংস্রব সমস্ত আক্রমণ করিল : রাস্তা কাটিয়া পুল ভাঙ্গিয়া সাহায্যের সম্ভাবনা নষ্ট করিল, টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তার ছিঁড়িয়া তছনছ করিয়া দিল।··· সত্তর বছরের নারী বিদ্রোহিনী দক্ষিণহস্তে দৃঢ়বন্ধ জাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া সরকারী সৈনিকের গুলিতে প্রাণ দিল।···এর গায়ে গায়েই আসিল ১৬ই অক্টোবরের ঝড়।" সরকারী দমন নীতি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়গত কারণে মেদিনীপুরবাসীদের দুর্ভোগের খবর যে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখা হয়েছিল নরোত্তমের মুখে তারও উল্লেখ আছে। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথাও টুল নিজেই জানিয়েছে চম্পা-কে। এই সংবাদ পাবার পরপরই চম্পার আত্মহত্যা এবং টুল-র আত্মনাশা অভিযানের প্রস্তুতি ; "নব সন্ন্যাস" দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তিও এখানে। ঘটনাকাল মোট চারমাসের মতো- ১৯৪২-এর আগস্টের শেষ থেকে ১৭ই ডিসেম্বরের আগে-পরে কোনো একদিন পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিবাদে-বিরোধে আলোড়িত সমকালীন দেশীয় রাজনীতি সম্পর্কেও তিনি যে একেবারেই অনবহিত ছিলেন এমন নয়, "নব সন্ন্যাস" উপন্যাসটি পড়বার পর তেমন ধারণাই হয়। "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া আক্রান্ত হবার সূত্রে ইংরেজের প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নে এখানকার কমিউনিস্টদের মধ্যেই যে একটা দ্বিধা ছিল, মণিকুন্তলা সেন-এর "সেদিনের কথা" (১৯৮২) নামক আত্মজীবনীতে তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন "১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করে বসল। ···'৪১ সনের শেষদিকে এল পার্টির নতুন লাইন। এ যুদ্ধ জনতার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর যুদ্ধ। সুতরাং এ-যুদ্ধে যে ভাবে আমরা ইংরেজকে আক্রমণ করতাম—এখন আর তা করা চলবে না। পার্টি লাইনের পুরো আলোচনা-সমালোচনা করতে আমি সক্ষম নই, কিন্তু নিজের মনের মধ্যে এ-লাইন আমি সর্বতোভাবে সঠিক মনে গ্রহণ করতে পারিনি। পার্টি নেতারা ছাড়া পাবার পর পার্টি লাইন বোঝানোর জন্যে তাঁরা আমাদের নিয়ে আলোচনায় বসতে লাগলেন। প্রথমে একজন জিলা নেতা এলেন। আমরা অনেকেই তার কথা মানতে পারিনি। এরপর বঙ্কিমবাবু এলেন।···অনেক তর্ক করলাম, সোভিয়েট আক্রান্ত হয়েছে বলে আমরা ইংরেজের যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যাব না, কার্যত এ কথার মানে তো এই যে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে এখন আর আমরা নেই।" (পৃ ৫৮-৬২)। '৪২-এর আন্দোলনে কমিউনিস্টদের যোগদানের প্রশ্নটি এই নতুন 'পার্টি' লাইনে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। 'Communism in India"-র দ্বিতীয় খণ্ডে (ডিসেম্বর ১৯৮৫), ৪১৩ পৃষ্ঠায় সম্পাদক সুবোধ রায় ভারত সরকারের তৎকালীন সচিব স্যার রিচার্ড টটেনহ্যাম-এর প্রাদেশিক সরকারগুলিকে পাঠানো, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩-এর সার্কুলারটি প্রকাশ করেছেন। ঐ সার্কুলারে আছে "There seems no doubt that the communists continue to oppose any

interruption of war production including strikes,…" আবার ২৯শে অক্টোবর ১৯৮৮-র দেশ পত্রিকায় একটি গোয়েন্দা রিপোর্টের উল্লেখ ক'রে অমলেশ ত্রিপাঠী লিখছেন—"গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হচ্ছে ১৯৪৩-এর মার্চে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।…সামরিক বাহিনীর মর্মন্তুদ অত্যাচারের বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে না। তবে সরকারকে কমিউনিস্টরা যে ভালোভাবে সাহায্য করেছিল তার বিবরণ পাওয়া যাবে।" ঐ সার্কুলার বা গোয়েন্দা রিপোর্ট নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে কিন্তু দলীয় নীতি নিয়ে দ্বিধা এবং বাধ্যবাধকতার প্রশ্নটি থেকেই যায়। এই মতপার্থক্যের বা সেই সূত্রে দলীয় কার্যকলাপের খুঁটিনাটি বিবরণ 'নব সন্ন্যাসে' নেই কিন্তু পরিস্থিতিটা তিনি জানতেন এবং এর একটি প্রতিক্রিয়াও যে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল সেটা বোঝা যায়, যখন তিনি লেখেন—"দেখলাম মতবাদে জড়িয়ে থাকলে তার মধ্যেকার গলদগুলোকেও জড়িয়ে থাকতে হয়! আজ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কয়েকটা কারণে খনিগত অভ্যাসের সামনে এসে পড়েছি বলে, কোন 'ইজমে'র দাসত্ব করছি না।" উক্তিটি উপন্যাসে যেখানে, যেভাবে আছে তাকে 'অ্যানাক্রনিজম' বা কালাতিক্রমণ সহজেই বলা যায় কিন্তু তাঁর পারিপার্শ্বিক সচেতনতাকে উপেক্ষা করা যায় না।

এর সবকিছুই উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস ব'লে চিহ্নিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত উপকরণ। কিন্তু উপন্যাসটি যে ভাবে শেষ হয়েছে তার মধ্যে কোনো রাজনীতিগত তাৎপর্য ধরা পড়েনি। এমন কি উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র—মাস্টারমশাই ও টুলু—এই দ্বিতীয় খণ্ডে কোনো নতুন ঐশ্বর্যে দেখা দেয়নি। মাস্টারমশাই তো দ্বিতীয় খণ্ডে পুরোপুরি অনুপস্থিত। তাঁর আদর্শবোধ এবং সেই আদর্শবোধে টুলু-র প্রত্যয়সিদ্ধি প্রথম খণ্ডেই নিষ্পন্ন। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথমাবধি টুলু শান্তি আশ্রমের শান্ত পরিচালক। উপলব্ধিগত দিক থেকে প্রথম খণ্ডে যা কিছু অর্জন করেছে তার এমন কোনো সম্প্রসারণ বা পরীক্ষা দ্বিতীয় খণ্ডে নেই যাতে টুলু-কে বলবত্তর বা বীর্যবান ব'লে মনে হয়। তবে কেন কাহিনীর এই বিস্তার? বরং দেখা যায় দ্বিতীয় খণ্ডে অসাধারণ গরিমায় চিত্রিত হয়েছে চম্পা-র চরিত্র। এবং বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলিকে পূর্বাপর সঙ্গতিতে স্থাপন করতে গেলেই বোঝা যায় যে চম্পা-র এই গরীয়সী চিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক এমন একটা জীবনবোধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চান যা তার অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও গূঢ়ভাবে সঞ্চারিত হ'য়ে আছে। "নব সন্ন্যাস" সূত্রপাতের সময়ে এটা না-ও ভেবে থাকতে পারেন কথাশিল্পী। হয়তো প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক আদর্শবোধে উত্তরণের কথাশরীর গ'ড়ে তুলতে। প্রথম খণ্ড শেষ হবার পরপরই চম্পা-র মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করলেন এমন একটি সম্ভাবনাময় আধার যেখানে তিনি ফিরে পেতে পারেন তাঁর ফেলে আসা দিনের ছিন্নসূত্রটিকে। এই হঠাৎ পাওয়া ঐশ্বর্য থেকেই "নব সন্ন্যাস" দ্বিতীয় খণ্ড সম্ভব হয়েছে।

[তিন]

"নব সন্ন্যাস" প্রথম খণ্ড 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে পত্রস্থ হয় বৈশাখ ১৩৫৩ থেকে শ্রাবণ ১৩৫৪-র মধ্যে। এবং আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই এই অঘটন যে, ধারাবাহিকভাবে পত্রস্থ অংশটুকু গ্রন্থরূপ লাভ করছে ১১ মাস পরে, আষাঢ় ১৩৫৫-তে, "নব সন্ন্যাস" ১ম খণ্ড নামে। বিভূতিভূষণের বেলায় সচরাচর এমন ঘটে না, বিশেষতঃ বিভূতিভূষণের লেখক জীবনের প্রথম দিকে এ প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের তালিকা থেকে খুব সহজেই জানা যাবে পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের পর দু' মাসের মধ্যেই গ্রন্থরূপ লাভ করেছে "নীলাঙ্গুরীয়", এবং তিনমাসের মধ্যে গ্রন্থরূপ পেয়েছে "স্বর্গাদপি গরীয়সী"র ৩য় খণ্ড। "নব সন্ন্যাস" তার তৃতীয় উপন্যাস। এটা ভেবে নেওয়া যেত যে পত্রিকায় প্রকাশের কালে উপন্যাসটি পাঠকের মনে খুব একটা আগ্রহ তৈরি করতে পারেনি ব'লেই গ্রন্থরূপ প্রকাশে খানিকটা দেরি হয়েছে। কিন্তু সেভাবে ভাবলেও ভুল হবে। কারণ আষাঢ় ১৩৫৫-তে প্রথম খণ্ড গ্রন্থরূপ পাবার সময়ে একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের অখড সংস্কবণ দ্বিতীয় খণ্ড স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপ পায় মাস তিনেক পরে আশ্বিন ১৩৫৫-তে। পাঠক বিমুখ হ'লে এই অভাবনীয় ব্যাপারটা বোধহয় ঘটা সম্ভব ছিল না।

আরো একটি ব্যাপারকে উপেক্ষা করাও অনুচিত হবে। সেটা এই যে আলোচ্য উপন্যাসটির খণ্ড খণ্ড এবং অখণ্ড সংস্করণে আমরা পর্ব বিভাগ পাই— প্রথম খণ্ড, 'ঝরিয়া-বরাকর পর্ব' এবং দ্বিতীয় খণ্ড, 'মেদিনীপুর পর্ব'। কিন্তু প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত অংশটুকু যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তখন সূচনায় যেমন 'ঝরিয়া-বরাকর পর্ব'-এর কোনো উল্লেখ ছিল না, তেমনি কাহিনীর শেষে প্রথম খণ্ড সমাপ্তির আভাসও লেখক দেননি। যদি প্রথম থেকে এই খড এবং পর্ববিভাগ লেখকের পরিকল্পনায় থেকে থাকে তা হ'লে প্রথম খণ্ডের সূচনা এবং সমাপ্তিতে তার উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল। তাই মনে হয়, "নব সন্ন্যাস" দ্বিতীয় খণ্ড ঔপন্যাসিকের উত্তরভাবনার ফলশ্রুতি।

পত্রিকায় প্রকাশকালে পর্ববিভাগ বা খণ্ডবিভাগের উল্লেখ না থাকলেও সময়কে বোঝবার পক্ষে একটি প্রশস্ত উক্তি ছিল প্রথমাংশের একেবারে শেষে। শ্রাবণ ১৩৫৪-র 'প্রবাসী'তে আমরা পেয়েছিলাম—"উনিশ শ পঁয়ত্রিশ সালের ঘটনা সবটুকু।" অথচ, ১৩৫৫-র আষাঢ় মাসে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের শেষে এটা পরিবর্তিত হ'য়ে ছাপা হ'ল—"উনিশ শ' চৌত্রিশ সালের ঘটনা সবটুকু।" এবং এই-ই এখন গৃহীত পাঠ। ১৩৫৫-য় প্রকাশিত এই সংস্করণের প্রায় ত্রিশ বছর পরে এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'লে বিভূতিভূষণ বলেছিলেন এই পরিবর্তন তিনি করেন নি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেছিলেন যে, পত্রিকায় নির্দেশিত

ঐ ১৯৩৫ সালকেই পাঠকের গ্রাহ্য করা উচিত। (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ঃ ২৮.১০.১৯৭৮) বাঙ্গলার সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের অন্তিম সময় বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ-এর দশকের মধ্যভাগ। সেদিক থেকে ঐ একবছরের তারতম্যে তেমন একটা কিছু এসে যায় না, বিশেষতঃ উপন্যাসটি যখন মূলতঃ ভাবাদর্শ প্রধান। কিন্তু বিভূতিভূষণের ইচ্ছা বা নির্দেশের মূল্য দিতে গেলে আরেক ধরনের বিপত্তি দেখা দিতে পারে। ১৯৩৫ সালের ঘটনার আবর্তে যদি টুলু-কে কারান্তরালে যেতে হয়, তা হ'লে আট বছর কারাবাসের পর টুলু-র মুক্তির বছর হবে ১৯৪৩। অথচ, টুলু মুক্তি পেয়েছে '৪২-এর আগস্টের শেষে আর দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী শেষ হয়েছে "দক্ষিণে জাতীয় সরকার স্থাপনার" (১৭ ডিসেম্বর ১৯৪২) পর চম্পা-র আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গেই একরকম। সুতরাং এ-অনুমান খুব স্বাভাবিক যে দু'টি খণ্ডের মধ্যে কালগত ঐক্যরক্ষার খাতিরে এই পরিবর্তন লেখক নিজেই করেছিলেন। ত্রিশ বছর পরে—যখন তাঁর নিজেরই বয়স চুরাশি-পঁচাশি বছর—সেটা বিস্মৃত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এর পর বোধহয় ভাবতে পারা যায়, পত্রিকায় প্রকাশের পর থেকে গ্রন্থরূপের জন্য প্রথম খণ্ডকে যে এগারো মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল সে-ও প্রয়োজনীয় সঙ্গতিবিধানের জন্যই। আর পারিপার্শ্বিক তথ্যাবলীর সঙ্গে এভাবে ঘনিষ্ঠ হবার ফলে আমাদের আবারও একবার ভেবে নিতে হয় "নব সন্ন্যাস" দ্বিতীয় খণ্ড রচনার কোনো প্রাথমিক পরিকল্পনা ঔপন্যাসিকের ছিল না। 'প্রবাসী'তে পত্রস্থ অংশ—যা এখন প্রথম খণ্ড ব'লে পরিচিত—সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চম্পা চরিত্রটি স্রষ্টার বিশেষ মনোযোগ পেয়ে থাকবে। হয়তো তাঁর মনে হয়েছে, প্রথমাংশে অর্ধস্ফুট এই চরিত্রটিকেই তিনি ব্যবহার করতে পারেন "উঠতে পারলে মানুষ হিসাবে" কতটা ওঠা যায় সেটা দেখাবার জন্য; সেই সুযোগে তিনি আরও দেখাতে পারেন—"ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া বিরাট এখানে [পৃথিবীতে] ক্রমাগতই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে।" আর এটুকু ধরিয়ে দিতে পারলেই তিনি ফিরে যেতে পারেন তার বিশ্বাসের মধ্যে ঃ পৃথিবীর destiny বা চরমভাগ্য ছোট নয়—তাতেই তার স্বধর্ম রক্ষা। এই স্বধর্মরক্ষার তাগিদে, সামান্য বিলম্বে, কথাকার "নব সন্ন্যাস"-এর দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন ব'লেই উপন্যাসটির পর্ববিভাগ, খণ্ডনির্দেশ, সময়ের সংশোধন, এমনকি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থরূপ লাভ—এ-সবই বিলম্বিত।

অনুভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে অপসরণ এর আগেও বিভূতিভূষণ করেছেন, তার প্রথম উপন্যাস "নীলাঙ্গুরীয়"-তেই তা ঘটেছে। "নীলাঙ্গুরীয়"-র খসড়া এবং গ্রন্থবন্ধ আখ্যায়িকার মধ্যে অনেকটাই প্রভেদ। খসড়াতে প্রতিনায়িকা সৌদামিনীর (খসড়াতে চরিত্রটি কমলী বা কমলমণি নামে উপস্থিত) জন্য যেটুকু স্থান সঙ্কুলান করেছেন বিভূতিভূষণ, মুদ্রিত পাঠে তার থেকে অনেক বেশি জায়গা পেয়েছে সৌদামিনী। (দ্র. উৎস—সৌদামিনী / কথাসাহিত্য / ভাদ্র ১৩৯১)। শুধু জায়গা পাওয়াই নয়, এই চরিত্রটির প্রভাবে পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছে অন্যান্য চরিত্র যেমন,

কাহিনীর আবেদনও পরিবর্তিত হয়েছে, মূল খসড়াতে যা ছিল না। "নীলাঙ্গুরীয়"-তে অনিলই প্রধানতঃ সৌদামিনীর পরিত্রাণের ভাবনা ভেবেছে কিন্তু সৌদামিনীর উদ্ধার তার সাধ্যের মধ্যে ছিল না। এই ব্যর্থতার গ্লানিও হয়তো বিভূতিভূষণের মনে ছিল। সুতরাং সৌদামিনী বা কমলীর পারিপার্শ্বিক বা চারিত্র্যধর্মে যা সম্ভব ছিল না, চম্পা-র মধ্যে সে সুযোগ পাবার সঙ্গেসঙ্গেই বিভূতিভূষণ চরিত্রটিতে নতুন মর্যাদা দিয়েছেন। আর যেহেতু চম্পা-র অস্তিত্ব প্রায় সবটাই টুলু-র উপরই নির্ভরশীল সেইজন্যেই লেখক আটবছর পরে টুলু-র কারামুক্তি ঘটিয়ে চম্পা-র সান্নিধ্যে তাকে শান্তি আশ্রমে পুনর্বাসন দিয়েছেন।

চম্পা খনি-শ্রমিক চরণদাসের মেয়ে, নিজেও খনিতে কাজ করে। নিজের সামান্য শিক্ষা আর অসামান্য বুদ্ধি নিয়ে চম্পা যে অন্যান্যদের থেকে আলাদা সেটুকু বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এদের কোনোটাই তাকে খনি-জীবনের গ্লানি থেকে বাচাতে পারেনি। তার যৌবন আছে তাই শ্রমের বিনিময়ে মজুরী ছাড়াও সে উপরি হিসেবে পায় ম্যানেজারের স্থূল রসিকতা আর সহকারী ম্যানেজারের লালসাসিক্ত আবেদন। সিদ্ধবাবার মতো সাধু পুরুষেরাও তাকে কখনো কখনো স্মরণ করেন, তখন অন্ধকারের দূতী এসে তাকে নরকের পথ দেখায়। এই অভ্যস্ত জীবনে একদিন বিঘ্নের মতো এসে দাঁড়ায় টুলু। জাগরণের সেই বেপথু মুহূর্তে চম্পা-র বিভ্রান্ত প্রশ্ন—স্বর্গ সে কোথায় পাবে? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর তাকে খুঁজে পেতে হয় নিজের মধ্যেই। তাই প্রথম খণ্ডের শেষে নিঃসম্পর্কীয়া জননীরূপে তাকে দেখা যায়, দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায় সে নিঃসম্পর্কিতা পত্নী। এইভাবে পাবার গৌরব তার পক্ষে কখনোই প্রকাশ্য নয় বরং এমনই গোপন যে চম্পা নিজেও তাকে পূর্ণ আলোকে দেখতে ভয় পায়। এরপর থেকে তার যে শমিত এবং সন্ত্রস্ত জীবনযাপন সেটা তার পক্ষে একই সঙ্গে গৌরবের এবং বেদনার। নিজের সন্ধানে ফেরা এবং নিজেকে এড়িয়ে চলা—এই বিপর্যাসে দিন কাটে তার। এই অংশে তটিনীর উপস্থিতি চম্পার পক্ষে মর্মান্তিক। টুলু-র সান্নিধ্যে আসবার পর থেকে, খুব স্পষ্টভাবে না হ'লেও চম্পা বুঝে গিয়েছিল আদর্শগত দিক থেকে সারাজীবন টুলু-র সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার মতো শক্তি তার নেই; আবার ঐ নিঃসম্পর্কিতকে সম্পর্কে আবদ্ধ করা তার পক্ষে অকল্পনীয়। '৪২-এর আন্দোলন এবং তটিনীর উপস্থিতি তার এই দৈন্যকে এমনভাবে অনাবৃত ক'রে দিয়েছে যে নিজেরই কাছে নিজের লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া তার পক্ষে দায় হ'য়ে ওঠে। সুতরাং তাকে খুঁজে নিতে হয় জীবনের পরপারের ঠিকানা, যাত্রার আগে অবশ্য সে দিয়ে যায় তার গোপন উপলব্ধির সংবাদ—"এই গভীর স্তব্ধ রাত্রে [চম্পা-র] চিন্তা আবার হঠাৎ এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল,—এই মৃত্যুকল্প রজনীর মধ্যে জীবনটাকে যেন নূতন অর্থে অর্থবান মনে হইল। চারিদিকের স্তব্ধ সমাহিত ভাবে মনে হইল জীবন বড় পবিত্র, বড় বিরাট—ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র জন্মমৃত্যুর অতীত যেন একটা কিছু—অনন্তকাল ধরিয়া অমরত্বের পথে তাহার যাত্রা।" চম্পা-র এই উপলব্ধির

অর্থ পাঠক একভাবে বুঝে নেয় বটে, কিন্তু যার অনুধাবন করাটা মৃত্যুর পরও চম্পার স্মৃতির প্রতি একটা শ্রদ্ধেয় উপচার হ'তে পারত সেই টুলু তেমন ক'রে বোঝেনি। সেইজন্য টুলু চম্পা-র মৃত্যুর রূঢ় অর্থ খুঁজেছে স্বগত চিন্তার মধ্যে—"কেন গেল চম্পা?···ওকি নিতান্তই সামান্যা রমণীর মতো ঈর্ষার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিল না? কিম্বা একটু অসাধারণ হইয়া বঞ্চনার সিঁদুর লইয়া টুলুর সুখের পথ থেকে সরিয়া দাঁড়াইল ওটিনীকে নীরব আহ্বান দিয়া? কিম্বা সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে, সব সুখ-লালসার মধ্যে চম্পা স্থির নিষ্ঠায় নিজের অন্তরে অন্তরে মাস্টারমশাইয়ের মহামন্ত্রটি ধরিয়া রাখিয়াছিল—একটা নারী যদি শুধরাইয়া যায় একটা জাতি শুধরাইয়া যাইতে পারে।···তাই, যখন বুঝিল নিজের ভালবাসার করাল ক্ষুধা লইয়া ও টুলুর এই জাতিসাধনার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে শুধু শুধরানো নয়, ওকি নিজেকে এইভাবে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লইল?" বুঝতে চাইলে টুলু-র পক্ষে বোঝা অসম্ভব ছিল না মৃত্যুই চম্পা-র জীবনকে স্পর্শ ক'রে নিজেকে শুদ্ধ ক'রে নিয়েছে। পৃথিবীর চরম ভাগ্য সত্যিই ছোট নয়।

[চার]

মাস্টারমশাইয়ের 'মহামন্ত্রটি'কে বিভূতিভূষণ অন্ততঃ কখনো ভোলেন নি। তাঁর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-সাক্ষাৎকারগুলির মধ্যে তার ছড়ানো পরিচয় আছে। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্তে পুরুষের অংশভাগ বিষয়ে তার একটা ধারণা গ'ড়ে উঠেছিল এবং পুরুষ হিসেবে সেই দায়ভাগ স্বীকার ক'রে নিয়ে তিনি নারী জাগরণ তথা নারীর মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন এবং বলেছেনও সেকথা বারম্বার। এদিক থেকে তার চেতনার ব্যাখ্যামূলক প্রথম রচনা ১৯ বৈশাখ ১৩৫৪-তে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর শক্তির সাহিত্যিক উৎস' নামীয় প্রবন্ধটি। দীর্ঘ জীবনের শেষে, মৃত্যুর সামান্য আগে সেই একই ধারণাই স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বললেন—"নারীদের আমরা বিশেষ করে হিন্দু-সমাজে যেভাবে চেপে রেখেছি তাতে তার সুস্থ অথচ অবারিত প্রগতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। সেদিক থেকে নারীর আত্মপ্রচেষ্টার প্রয়াসের জন্য আমাদের যুগটি বিশিষ্ট কিন্তু বহুদিন বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে থাকায় প্রগতির গতিবেগটা সবক্ষেত্রে বেশ সুসংযত নয় এবং তার জন্য পরিণাম সবক্ষেত্রে শুভ হচ্ছে না।" (নারী প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ [সাক্ষাৎকার]—শঙ্কর ভট্টাচার্য / সৌরভ / ১৩৯২)। পরিবর্তনের মুখে আতিশয্য নিয়ে তাঁর সামান্য উদ্বেগ ছিল ঠিকই কিন্তু নারীর এই অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী পুরুষ এ-কথা মেনে নিয়ে, একজন পুরুষ হিসেবেই আত্মসমালোচনায় তিনি বেশ অকপট। "নারীর অদৃষ্ট, বিশেষ করে তাতে পুরুষের যা অংশ" সেটা একসময় বিভূতিভূষণকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল এবং সেইজন্য, স্বীকার করেছেন তিনি, "তোমরাই ভরসা" (বৈশাখ ১৩৫৭) উপন্যাসটি

লেখবার সময় 'একদিক দিয়ে নিজেদের অর্থাৎ পুরুষজাতির উপর মনটা খুবই বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল…'' ('স্রষ্টার চোখে সৃষ্টি' / কথা সাহিত্য / শ্রাবণ ১৩৬৬)। বিদ্বেষটা যে কত তীব্র সেটা বোঝা যায় যখন "ঊর্মি আহ্বান"-এ তিনি লেখেন—"পশু! পশু!—কেউ শুনবে না, কেউ দেখবে না…মানুষই জন্মাল না তো পশুদের দাবিয়ে রাখবে কে?" অতঃপর সমস্ত পুরুষজাতির পক্ষে দাঁড়িয়ে নিপীড়িতা নারীর কাছে তাই বিভূতিভূষণ অনুনয় জানান "তোমরাই ভরসা"-র উৎসর্গে—"তোমাদের উদ্দেশ্যে যারা বুঝবে, তোমাদের বিদ্বেষে, তোমাদেব ভ্রান্তিতে সৃষ্টির সঙ্কট, আর সেইজন্যই যারা ক্ষমার তপস্যাকে নেবে বরণ করে।"

খুবই সচেতন ছিলেন বিভূতিভূষণ তার সামর্থ্যের সীমানা সম্পর্কে। ১.৫৭. ১৯৮১ তারিখে এক সাক্ষাৎকারে তিনি সমরজিৎ বিশ্বাসকে বলেছিলেন, তাঁর শক্তির সীমানার মধ্যেই তিনি তার কর্মের অধিকারটুকু প্রয়োগ করতে চান। (দ্র• বিভূতিভূষণের সঙ্গে কিছুক্ষণ [সাক্ষাৎকার]—সমরজিৎ বিশ্বাস / সৌরভ / ১৩৯২)। চোখে পড়ার মতো কোনো বৃহৎ আন্দোলনে, বিশেষতঃ নারীমুক্তি বা নারী প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে তার নাম জড়িযে নেই। অথচ তাঁর উপন্যাসগুলিতে তিনি অবিরত লিখে গিয়েছেন নারী নিগ্রহ আব দুর্গতা নারীর উদ্ধাবপ্রয়াসের কাহিনী। সরমা-সৌদামিনী ("নীলাঙ্গুরীয়"), চম্পা ("নব সন্ন্যাস"), সবমা ("উত্তরায়ণ"), স্বাতী ("পরিশোধ"), বেলা ("পঙ্কপল্বল"), সুবদনী ("এবার প্রিয়ংবদা"), হেনা ("দুই কন্যা"), থাকোমণি ("ফেরারী ফিরে এল")—এই যে একের পর চরিত্রের উপস্থাপনা ঘটেছেবিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলিতে, শুধুই গল্প বলাব বিলাসকলাকুতূহলের জন্যেই তা ঘটেনি। এইসব বিড়ম্বিতা বমণী চরিতাবলীর মধ্যে স্বাতী বা সুবদনীর মতো মেয়েদের উদ্ধার হয়তো তুলনায় সহজ,—ব্যক্তি বিশেষের স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-সহৃদয়তাই তাদের জীবনে আলো জেবলে দিতে পারে কিন্তু সবমা ("উত্তরায়ণ") বা হেনা-র মতো মেয়েদের উঠে আসা অনেক বেশি কঠিন। সামান্য ভুল বা অনভিপ্রেত স্খলনের জন্য—এখনকার দিনে হয়তো একে তেমন গ্রাহ্যই করা হবে না—'উত্তরায়ণ"-এ সরমা-কে আক্ষেপ করতে হয়েছে—"কিন্তু মানুষের তো মানুষের দুঃখ বোঝা উচিত—একটা ভুল করেছি বলে, একটু কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে না যে উঠে আসি"; কিম্বা "দুই কন্যা" উপন্যাসে হেনা-কে বলতে হয়েছে—"ভগবানের নাম নিয়ে বলছি অনুপমদা—চেষ্টা করছি—সত্যিই চেষ্টা করছি অনুপমদা—যদি পারেন বাঁচিয়ে তুলতে তুলুন ছোট বোন ভেবে।" মানুষ মানুষের দুঃখ বুঝলে নিশ্চয়ই এই হতাশার আক্ষেপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ত না। এই সত্যকে সামনে রেখে সৌদামিনী বা চম্পা-র সামাজিক পুনর্বাসন যে কতটা অসঙ্গত হ'ত বিভূতিভূষণ তা ভালোই জানতেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণ এ-ও জানতেন বহু বহু আড়ম্বর সত্ত্বেও আমাদের দেশে ন্যরী সম্পর্কে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বিশেষ ক'রে নারীর শুচিতা সম্পর্কে পুরুষের দৃষ্টি ও ধারণা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কারেই

আবন্ধ। এই সমাজে নারীর পদস্খলনের সম্ভাবনার পথ পুরুষই খুলে দেয় এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে পুরুষই প্রধান অন্তরায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে নারী মুক্তির চূড়ান্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্ভবতঃ বিভূতিভূষণের সংশয় ছিল। পরিবর্তে বরং তিনি চেয়েছিলেন নারীর মধ্যে এমন একটি শক্তির উন্মেষ এবং বিকাশ, যেমনটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি ভ্রমর ("কৃষ্ণকান্তের উইল")-এর মধ্যে। বিভূতিভূষণ তাকে সতীত্বই বলেছেন কিন্তু এই সতীত্ব বা শুচিতার ধারণা একেবারেই পৃথক। পুরুষের কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা. শারীরিক শুচিতা এবং নিষ্কলুষতা প্রমাণের দায়ে নারী এই সতীত্বকে মেনে নেবে না, এ সতীত্ব হবে তার ধর্ম, কর্ম, জীবন-সাধনার অঙ্গ। এ শুধু নারীকে রক্ষা-ই করবে না, ভ্রষ্টাচারী পুরুষকে শাসন ক'রে তাকে প্রকৃতিস্থ করবে। শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য-র প্রশ্নের উত্তরে এইরকম একটি ধারণাই প্রকাশ করেছিলেন তিনি। (দ্র· সৌরভ / ১৩৯২)। আমাদের সমাজভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁকে আর একটু এগিয়ে ভাবতে হয়েছিল স্খলন থেকে উঠে এসে এই সতীত্ব অর্জন করার চেয়ে একে কলঙ্কশূন্য রাখবার প্রয়াসটাই শ্রেয়। তা না হ'লে "কাঞ্চনমূল্য"-র মতো হাস্যমুখর উপন্যাসেও নত্যকালীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে তার মাতৃস্বসাকে ছোটো তরফের জমিদার দেবনারায়ণের গৃহে অমন তুখোড় অভিযানে পাঠাবার কথা ভাবতেন না। প্রশ্নটা অবশ্য থেকেই যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষনির্ভর নারীর পক্ষে এই আত্মবিকাশের সুযোগ সত্যিই কতোটা আছে ?

বিভূতিভূষণের সামাজিক দৃষ্টি বা সমাজবোধ দৃশ্যতঃ খুব উত্তেজনাপ্রবণ বা চাঞ্চল্যকর নয়। সংঘাতের প্রত্যক্ষ আবেদনের বদলে তার অন্তস্তল অনুভবগম্যতাই তাঁকে বেশি আন্দোলিত করে। সেই সংঘাতের নিবিড়তর স্পর্শকাতরতায় তাঁরও অংশভাগ আছে। খুব সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায় তিনি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন গূঢ় অথচ তুচ্ছাতিতুচ্ছ রূপান্তর বা তার সম্ভাবনাকে। এই রূপান্তর কৃষিভিত্তিক সমাজে খুব দ্রুত ঘটেনা। আমাদের এই ঘনবন্ধ পরিবা' জীবনও কৃষিসভ্যতার প্রভাবেই গ'ড়ে উঠেছে। এমন কি নারীর ঐ শুচিতা সংক্রান্ত প্রশ্নটিও কৃষিসভ্যতারই পরিণামী মূল্যবোধের চিহ্ন। সেই পরিণতিকেই মহার্ঘ ক'রে তুলেছেন বিভূতিভূষণ নারীকে ক্ষমার তপস্যায় রত ক'রে। এই আদর্শবোধের তাগিদ থেকেই বিভূতিভূষণ আমাদের সামাজিক সম্বন্ধ বিধানে পারিবারিক সংযোগ সূত্রটিকে ছিন্ন করতে চান নি। এটা নিশ্চিত যে সময় নিয়তই অপসৃয়মান সুতরাং অস্থির জীবনও তাই প্রতিমুহূর্তে জায়মান, নিরন্তর তার বিকাশশীলতা। অথচ সমাজগঠনের সঙ্গে স্থিতিশীলতার একটা সম্পর্ক আছে, বিশেষতঃ কৃষিভিত্তিক সমাজজীবন একটু বেশি স্থিতিশীল তার পরিবর্তনও অনেক বেশি মন্থর! গতির সঙ্গে স্থিতির এই মন্থর সামঞ্জস্যে ধৃত আমাদের সমাজে তাই পারিবারিক জীবন এবং পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কগুলিকে একটু বেশি মূল্য দেওয়া হয়। এই সম্পর্কগুলিকে বিভূতিভূষণ পরম মমতায় রক্ষা করতে চান এবং তার দায়িত্ব তিনি দিতে চেয়েছেন নারীর উপরেই। সামাজিক জীবনের

কেন্দ্রে পরিবার এবং পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রে নারীকে স্থাপন ক'রে "স্বর্গাদপি গরীয়সী"তে তিনি নারীজীবনের সার্থকতার আদর্শগত একটি রূপে আঁকতে চেয়েছেন। এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হওয়াতেই "নয়ান বৌ"-এর অন্তর্জলী যাত্রা।

"নরনারী" প্রবন্ধে সমীরের মুখ দিয়ে কথাটা বলিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ "ইংরাজী সাহিত্যে গদ্য এবং পদ্যকাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হতে দেখা যায়।...কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য।" বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলি সম্পর্কেও উক্তিটি বেশ যথাযথ এবং বলা যায়, এদিক থেকে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের মূল প্রবাহের অনুসারী। এই প্রবাহ তাঁর জীবনপ্রবাহ, এই ঐতিহ্যের উপাদানেই তার উপন্যাসের পরিপোষণ। স্বভাবতঃই দেখা যায়, তাঁর উপন্যাসে, চিন্তায়-কর্মে-তৎপরতায় নারী চরিত্রগুলি অনেক বেশি সক্রিয়। কোথাও যেন একটা স্বতোবিরোধ আছে এখানে। একদিকে সামাজিক জীবনে নারীর এই গুরুত্ব অথচ সামাজিক কাঠামো একেবারে পিতৃতান্ত্রিক। শুধু তাই নয়, পুরুষ-শাসনে নারীলাঞ্ছনা নিয়মিতই ঘটে এখানে। খুবই ত্রস্ত বোধ করেন বিভূতিভূষণ—সমাজ এবং পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর আদর্শবোধের আশ্রয়, নারীরূপিনী আধারটিকে কি ভাবে তিনি রক্ষা করবেন? হয়তো সেইজন্যই তাঁর উপন্যাসে প্রায়ই কোনো পরিত্রাণকর্তার আবির্ভাব ঘটে। তবে তারা আসে সাধারণতঃ একা, কখনো কখনো দোসরও থাকে, সে দোসর এমন হবে অনুভবে-উপলব্ধিতে যারা বিভূতিভূষণের সমমর্মী, তবেই তারা পাবে এই উদ্ধারব্রতের ছাড়পত্র। আসলে এরা বাইরে থেকে আসেনা, এরা উঠে আসে বিভূতিভূষণের জীবনবোধ থেকেই। এভাবে যে উদ্ধারব্রতীকে উপস্থিত করেন তিনি তার কারণ সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন মূল্য-বোধগুলি সত্য হ'য়ে ওঠে ব্যক্তির উপলব্ধির মধ্যে। শ্রেয় বিবেচনা করলে সমষ্টি তাকে আচরণ করতে পারে—তবে তার সত্যতা ঐ আচরণগত সঙ্কীর্ণতাতে সীমাবদ্ধ। এইভাবে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকে শেষ উপন্যাসটি পর্যন্ত তাঁর 'মিশন'কে রক্ষা করেছেন। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই তিনি কখনো কখনো তাঁর উপন্যাসের স্বাভাবিক পরিণতির গোত্রান্তরও ঘটিয়েছেন, না হ'লে "নবসন্ন্যাস" তো বটেই, হয়তো "সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে"ও রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে পরিগণিত হ'তে পারত। তার বদলে প্রথমটি হ'য়ে দাঁড়াল চম্পা'র জীবনকথা আর দ্বিতীয়টি শেষ হ'ল সন্ধ্যা-র প্রতি অবিচারের প্রতিশোধমূলক কাহিনী হিসাবে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের মূল প্রবাহের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ আমাদের কাছে অনেকটাই দূরের মানুষ। কারণ কি এটাই যে, যেখানে তিনি আশ্বস্ত হ'তে পারেন এখনকার সময়ের কাছে তা নিতান্তই ভঙ্গুর। কালপ্রবাহে ভাসমান আমরাও প্রশ্নে প্রশ্নে শুধুই পাক খাই। নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, আমাদের বর্তমান পারিবারিক জীবন এবং সেই জীবনের কেন্দ্রে নারীর গরীয়সী অধিষ্ঠান—এ-সবের কোনো কিছুই তত ধ্রুব নয় আমাদের কাছে। বরং মনে হয় এক

চাতুর্যের থাবা লুকিয়ে আছে নারীর ঐ কল্যাণী মূর্তির ধারণার আড়ালে। এখান থেকে মুক্ত হওয়াই নারীর যথার্থ মুক্তি—"Emancipation of Women". এই মুক্তিতত্ত্বে বিশ্বাস রাখলে নারীকে দিতে হবে বা তাকে অর্জন করতে হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এর অনিবার্য পরিণাম হিসেবে পরিবর্তিত হবে অথবা একেবারেই ভেঙ্গে যাবে এখনকার পারিবারিক কাঠামো। সেই মুক্তির দিনে নারী নতুনভাবে নির্ণয় করে নেবে পুরুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কি হবে তার রূপ? খুব নিশ্চিত নয় তা আমাদের ধারণায়। এর উত্তরে সমাজবিজ্ঞানীও বড় বেশি দূর আমাদের নিয়ে যেতে পারেন না; তাঁকেও বলতে হয় পরিবর্তনটা হবে "in the main, of a negative character limited mostly to what will vanish. But what will be added? That will be setlled after a new generation has grown up". সরে যাওয়ার এই পিছল পথ থেকে বিভূতিভূষণকে স্পর্শ করাটা কঠিন। অথচ নিজস্ব ধ্রুব বিশ্বাসের জগৎ থেকে বিভূতিভূষণও এগিয়ে আসেন না; আসতে গেলেই তাঁর নিজের মধ্যেই একটা বিরোধ দাঁড়িয়ে যায়। নারী-মুক্তি, নারীপ্রগতি, নারীলাঞ্ছনার অবসান—এ-সবই বিভূতিভূষণের কাম্য, অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত—এমন কি সংসারের হিরন্ময়ী প্রতিমা স্বরূপিনীর গৌরবও নারীকে দিতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু সবটুকুই সাধিত হবে পারিবারিক জীবনের শর্তে; বিভূতিভূষণের অবিচল প্রত্যাশা ঐটুকুই। অতএব, 'প্রাচীনপন্থী' বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমাদের কেমন একটা গরমিলের সম্পর্ক গ'ড়ে গিয়েছে। বর্তমান কাল থেকে 'দূরবর্তী' বিভূতিভূষণের কথা তাই আমাদের অনেক সময় মনেই পড়ে না।

একটা অস্বচ্ছতাও বোধহয় যুক্ত আছে আমাদের নিজেদের সঙ্গেই আমাদের এই ধাবমান 'কাল'-এর যোগ-সংযোগের ধারণার মধ্যে। বুদ্ধির বলে যাকে আমরা অমোঘ ব'লে মনে করি, আমাদের হৃদয়গত সমর্থন তার দিকে সত্যিই আছে কিনা এ প্রশ্নের ষোলো আনা বিচার এখনও বাকি আছে। ঘূর্ণির আবর্তে বসবাস ক'রেও, চলমানতাকে নিশ্চিত ব'লে স্বীকার ক'রেও প্রাক্তনের আকর্ষণ থেকে আমরাও সম্পূর্ণ মুক্ত নই; আমাদের বুদ্ধিবিবেচনা সামান্যই সমর্থ হয়েছে প্রাক্তনের বিধানকে ছিন্ন করতে। তাই দেখা যায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারেরর প্রশ্নে তুমুলসওয়াল-জবাব করতে করতে দৈনন্দিন জীবনে আমরা পুরুষ প্রধান বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতেই সচেষ্ট। এখনও নারীর সতীত্বের প্রশ্ন প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিতেই বিচার্য আমাদের কাছে। ব্যক্তিগত সম্পদের মোহ প্রগাঢ় পিতামহের কালে যেমন ছিল, আজও প্রায় তারই অবিকল অনুসরণ করি আমরা। 'কমিউন' জীবনযাত্রার তত্ত্বে আমাদের যতখানি অনুরাগ প্রাত্যহিক জীবনে তাকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে আমরা ততটাই বিমুখ। দুর্নিরীক্ষ্য পরিণাম, ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা আশঙ্কাবোধও আমাদের মধ্যে আছে। সুতরাং অনিশ্চয়তাব সত্যে আমরা সন্ত্রস্ত বোধ করি এবং অবিলম্বে রুদ্ধ করি উত্তরের জানালা। না হ'লে এতদিনে নিশ্চয়ই আমরা জানতে এবং বুঝতে চাইতাম, ভাঙ্গনের প্রাথমিক সত্যটিকে ধরিয়ে দিয়েও "পুতুলনাচের ইতিকথা"-য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন মতি-কুমুদের পরবর্তী জীবনচর্যার ছবি আঁকা

থেকে বিরত হলেন? গ্রন্থের মধ্যেই তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন আভাস দিয়েছিলেন। সন্তানের প্রয়োজনে নীড় তারা না-ও বাঁধতে পারে, কিন্তু যাযাবর হিসেবেও তো তাদের একটা দাম্পত্যজীবন থাকবে। প্রাত্যহিকতার মধ্যে কেমন হবে তার বর্ণবিন্যাস? অন্ততঃ কেমন হওয়াটা যুক্তিসিদ্ধ? আপাততঃ না হয় এ-সব প্রশ্ন তোলা থাক, নিজেদের মুখের হাসি ফুটিয়ে রাখতে ভেবে নেওয়া যাক, ভাবীকাল নিয়ে এখনই এসব প্রশ্নে মুখর হওয়াটাই এক ধরনের অবিবেচনা। তবে, এই দুই বিপরীত টানে আমাদের অশান্ত অস্তিত্বের পাশে, নিজস্ব সত্যে বিভূতিভূষণের অবিচলিত থাকবার শক্তি,—যা তাঁর সত্যনিষ্ঠা—একটা সম্ভ্রম জাগায়। আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হয় ঐ শক্তি এবং সত্যনিষ্ঠা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব অর্জন।

[পচ]

একজন ঔপন্যাসিক কি বলেছেন সেটা বুঝতে গিয়ে কেমনভাবে বলেছেন সেটাও বোঝবার চেষ্টা করা হয়, কারণ ঐ কি ভাবে বলেছেন সেটাই পাঠকের সঙ্গে তার যোগ সূত্র, তার সৃষ্টির যোগসূত্র।—এই বলা-র পদ্ধতি ঔপন্যাসিককে বেছে নিতে হয়, কখনো বা একেবারে নতুন ভাবে তৈরি করে নিতে হয় প্রধানতঃ দু'দিকে লক্ষ্য রেখে। প্রথমত ঔপন্যাসিককে দেখতে হয় কোন্‌ভাবে প্রকাশ করলে তার বক্তব্য অভীষ্ট তল খুঁজে পাবে, আর দ্বিতীয়তঃ তিনি দেখবেন সেই মেনে-নেওয়া পদ্ধতি পাঠককে কতটা কাছাকাছি নিয়ে আসছে। তুলনামূলকভাবে অবশ্য প্রথম প্রশ্নটিই বেশি গুরুত্ব পায়। শেষ পর্যন্ত লেখক যে-পদ্ধতি স্বীকার করলেন, পরে পরে পাঠকও বুঝে নিতে চান ঐ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের যৌক্তিকতা। আবার নিজেদের কথা লেখককেও কোনো কোনো সময়ে ব্যাখ্যা ক'রে বলতে হয়। এইভাবেই তৈরি হয় আঙ্গিক, প্রথা-প্রকরণ বিশ্লেষণের একটা ধারা।

এভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা হয়েছে নিজের অভীষ্ট সাধনের জন্য লেখক শুধু ঘটনা পরম্পরাকে সাজিয়ে দিচ্ছেন কি না, অথবা তার ফাঁকে ফাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছেন কার্য-কারণ সম্পর্কের সূত্রগুলি। অথবা 'স্টোরি'-র বদলে 'প্লট' পাওয়া যাচ্ছে কি না। 'প্লট' তৈরি করা যদি আবার নেহাৎই অভ্যাসের দাসত্ব থেকে আসে তখন তার আবেদন হ'য়ে আসে ক্ষীণ, উপন্যাসে তাই থীম-এর সন্ধানও খুব প্রয়োজনীয়। ক্রমশঃ জটিলতর হয় জিজ্ঞাসা—উপন্যাসের কাহিনীতে কি ঘটনার প্রাধান্য না চরিত্রের? ঘটনার প্রাধান্য হ'লেও সেগুলি কি গায়ে গায়ে সংলগ্ন অথবা একটু ছড়িয়ে যায় শৈথিল্যভরে—অর্থাৎ 'লুজ' অথবা 'অর্গ্যানিক'? আর চরিত্র যদি ঘটনার উপরে মাথা তুলে দাড়ায় তবে কেমন সে চরিত্র? ফ্ল্যাট বা ডিক্ক বা টাইপ? না চরিত্রটি একেবারেই বিশিষ্ট বা ইণ্ডিভিজুয়াল? কাহিনীতে লেখকের ভূমিকাই বা কি? তিনি কি নিজেই কাহিনীর অন্তর্গত? উত্তম পুরুষে বর্ণনা ক'রে চলেছেন, বা অংশ নিয়ে চলেছেন, অথবা প্রথম পুরুষে অবস্থান করে সর্বজ্ঞের মতো দিয়ে চলেছেন বিবরণী? কি ভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন ঔপন্যাসিক, বস্তুগত সম্পূর্ণতাকে স্বীকার ক'রে অথবা পথের অবাধ বিস্তারের

মধ্যে ? আবার লেখক একটা সৌধ-এর মতো গ'ড়ে নিতে পারেন তাঁর কাহিনী। তা হ'লে সে সৌধ-এর গঠনই বা কেমন ? তাজমহল অথবা পিরামিডের মতো ? উঠতেই থাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

কিন্তু ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ এসব নিয়ে বড় বেশি কিছু ভাবেন নি। সেই কথাই তিনি বলেছিলেন ধ্বনি (নবপর্যায়) পত্রিকার প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে— 'রস-ও ভাববস্তু সব থেকে বড় জিনিষ সাহিত্যে। সেগুলিকে পূর্ণতা দেবার জন্যেই স্টাইল, টেকনিক ইত্যাদি। এগুলিকে আলাদা করে কিছু ভাবিনি।" (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫) তবে, লেখবার আগে একটা 'প্লট' যে ভেবে নিতে হয় এবং তার রূপনির্মাণের জন্য উপন্যাসে যে খানিকটা সময় দিতে হয়, ২৩.৯.১৯৭৬-এ এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে সেটুকু তিনি বলেছিলেন। তা ছাড়া, সমালোচক বিভূতিভূষণও এ-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন, যদিও খুবই সামান্য তার পরিমাণ। বিভূতিভূষণের পঞ্চাশটির মতো প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সমালোচনার মধ্যে উপন্যাসের আঙ্গিক বা শিল্প প্রকরণ নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নেই। কিন্তু কোনো কোনো লেখায়—গ্রন্থ সমালোচনা সেগুলি—এমন কিছু মন্তব্য আছে যা থেকে বোঝা যায়, আলাদা ক'রে না ভাবলেও বিষয়টি তাঁর ভাবনায় দু'একবার এসে গিয়েছিল। যেমন, মনীন্দ্রলাল বসুর "জীবনায়ন" পড়তে গিয়ে তাঁর ক্লান্তি এসেছে বর্ণনা ও রিফ্লেকশনের মাত্রাধিক্যের জন্য (প্রবাসী / আষাঢ় / ১৩৪৪), পশুপতি ভট্টাচার্য-র "ঘূর্ণাবর্ত" উপন্যাসটি পাঠের ফলশ্রুতি তাঁর পক্ষে ক্লান্তির সঙ্গে ধৈর্যচ্যুতিও, কারণ—"একে এই উপন্যাসের গতি ঘটনা বা সংলাপের মধ্য দিয়া নয়, বর্ণনার মধ্য দিয়া, তার উপর বর্ণনাও অযথা এত দীর্ঘ" (প্রবাসী / শ্রাবণ / ১৩৫৫) ; কিন্তু জগদীশ ঘোষ-এর "প্রশ্ন" উপন্যাসটির আলোচনায় তিনি লিখেছেন—"যেমন গল্পের আয়োজন তাহাতে আরও কিছু জায়গা পাইলে ভাল হইত।" (প্রবাসী / ফাল্গুন / ১৩৫৩)। এ সব থেকে আঙ্গিক সম্পর্কে বিভূতিভূষণের একটি প্রাথমিক নির্বিশেষ ধারণা ছাড়া প্রায় কিছুই পাওয়া গেল না। এর মধ্যে এইটুকুই শুধু বোঝা গেল, একটি নিটোল গল্পে তাঁর আকর্ষণ, গল্পটি অগ্রসর হবে ঘটনা বা সংলাপের মধ্য দিয়ে, প্রয়োজনে সামান্য বর্ণনার আশ্রয় নিতে তাঁর আপত্তি নেই ; আবার রিফ্লেকশনের আতিশয্যেও তাঁর রুচি নেই। অর্থাৎ একটি ঘটনাপ্রধান পূর্ণবৃত্ত কাহিনীর দিকেই যেন তাঁর পক্ষপাতিত্ব ! খুব বিচ্ছিন্নভাবে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে থাকলেও তার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে যে-সংঘাতের মুখে দাঁড়াতে হয়, সেটা মূলতঃ বাইরের জীবনে—পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। তাই চরিত্রপ্রধান উপন্যাস বিভূতিভূষণের হাত থেকে আমরা পাই নি বলা-ই ভালো। নিজেদের নিয়ে ভাঙ্গাগড়া বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্রে খুব বিরল ঘটনা।

বিভূতিভূষণ নারী এবং পুরুষ চরিত্রগুলি যে-ভাবে তাঁর উপন্যাসগুলিতে উপস্থিত করেছেন তা থেকে কয়েকটি ছক তৈরি ক'রে নেওয়া যায়। প্রথম ছক তৈরি হয়েছে কয়েকজন শিক্ষক বা শিক্ষক-প্রতিম চরিত্র অবলম্বন করে ; যেমন—মাস্টারমশাই ("নবসন্ন্যাস"), মাস্টারমশাই ("উত্তরায়ণ"), ডি. এন. লাহিড়ী ("পরিশোধ"), অনাদি

আচার্য ("কাঞ্চনমূল্য"), অচলনাথ ("মিলনান্তক"), কৃপাশঙ্কর আচার্য ("কিশোর গান"), মুরারি আচার্য ("পঙ্কজল্বল"), যদুনাথ ("উর্মি আহ্বান") প্রমুখরা। চরিত্রগুলি প্রবীণ, অনেকটা বিভূতিভূষণের আদর্শের তাত্ত্বিক প্রতিনিধি। দ্বিতীয় ছকটি দ্বৈত-চরিত্র নিয়ে—অনিল-শৈলেন ("নীলাঙ্গুরীয়"), অনঙ্গভূষণ ("নয়ান বৌ"), রজত-প্রশান্ত ("পরিশোধ"), লোকেশ-নিশানাথ ("এবার প্রিয়ংবদা"), অমিতাভ-অনুপম ("দুইকন্যা"), তার উদাহরণ। চরিত্রগুলি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একে অন্যের পরিপূরক, নিজেদের সামান্য যা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে তার জট খোলবার জন্যেই যেন ঔপন্যাসিক একটি চরিত্রকে ভেঙ্গে দিয়েছেন এই দুইয়ের মধ্যে। প্রথম ছকটির মতো এরাও বিভূতিভূষণের আদর্শ বহন ক'রেই চলে। শুধু প্রথম ছকটির চরিত্রগুলির মতো বয়স্ক নয় ব'লে এরা যৌবনধর্মে ঈষৎ আতপ্ত। বিভূতিভূষণের নারী চরিত্রসৃষ্টির বেগবতী ধারাটা বিড়ম্বিতা-নিগৃহীতা-লাঞ্ছিতাদের নিয়ে—সৌদামিনী ("নীলাঙ্গুরীয়"), চম্পা ("নবসন্ন্যাস"), সরমা ("উত্তরায়ণ"), বেলা ("পঙ্কপল্বল"), হেনা ("দুইকন্যা"), সুবদনী ("এবার প্রিয়ংবদা"), প্রসাদী ("ফেরারী ফিরে এল").—এদের নিয়েই বিভূতিভূষণের সহানুভূতি সবচেয়ে গাঢ়ভাবে স্ফূর্ত হয়, এদের সঙ্গে যোগ করা যায় "নীলাঙ্গুরীয়"-র মীরা বা "সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে"-র সন্ধ্যা-র নামও। আর বিভূতিভূষণ যে মুক্তমনা নারীর কথা ভাবেন, তাদের পাওয়া যায় সরমা ("নীলাঙ্গুরীয়"), স্বাতী ("পরিশোধ"), তটিনী ("নব সন্ন্যাস") ও সাগরিকা ("দুই কন্যা") এবং হয়তো জাহ্নবী ("তোমরাই ভরসা")-র মধ্যেও। এরা মুক্তমনা সেই সঙ্গে আত্মস্থ। অর্থাৎ বিভূতিভূষণের 'মিশন'টিকে রক্ষা-র দায়িত্ব কোনো-না-কোনোভাবে এদেরই। সেই সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা দেয় একধরণের ন্যূনতা। ডিকেন্স-এর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মত এরাও—"**Fixed from the start in attitudes which do not vary.**"

'থীম' রক্তবীজ রক্তবান -একই 'থীম' তাই বিভিন্ন 'প্লট' তৈরী ক'রে দিতে পারে। কিন্তু 'থীম'-এর সম্ভাবনা যতই অসীম হোক না কেন, অসীমেরও সীমা থাকে। এই সীমানাকে লঙ্ঘন করার জন্যেই লেখককে অন্যের অগোচরে নিজের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করতে হয় বারবার। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সেই সীমানা-লঙ্ঘনের স্পর্ধা যদি তেমনভাবে পাওয়া যেত! তার বদলে আমাদের প্রায়ই খুশি হ'তে হয় আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত কাহিনীবৃত্তে একটি ভরাট গল্পে। গল্প বলতে গিয়ে স্বয়ং লেখকই এসে দাঁড়ান মাঝে মাঝে : কখনো উত্তমপুরুষে, কখনও প্রথম পুরুষে ব্যাখ্যা ক'রে চলেন ঘটনার যোগসূত্র, তার তাৎপর্য। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা বড় বেশি স্রষ্টার অনুগত। আর একটু স্বাধীনতা যদি তাদের থাকত, তখন বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে তাদের দেখা-র বদলে, তাদের মধ্য দিয়েই আমরা বিভূতিভূষণকে দেখতাম। তার মধ্যে আমাদের একটা আবিষ্কারের আনন্দও থাকত। বিভূতিভূষণ আমাদের শক্তির পরীক্ষাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট করতে দিলেন না ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণকে নিয়ে আমাদের ঐটুকুই আক্ষেপ।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসে ও উপকথায় অকৃত্রিম

[এক]

প্রথমেই বলে রাখি, সেই সময়ে বাংলা উপন্যাসের রক্তাল্পতা নিরাময়ে তারাশংকরের আসবার হয়ত প্রয়োজন ছিল।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের উপন্যাস কলকাতা-কেন্দ্রিক : এমন কি, ছোটোগল্পের ছোট্ট পরিসর পর্যন্ত কলকাতা দখল করে নিয়েছে। শরৎচন্দ্র পর্যন্ত 'শেষ প্রশ্নে', 'পথের দাবী'তে, 'বিপ্রদাসে' গ্রাম-বহির্ভূত অঞ্চলে চলে গেলেন, কোথাও কোথাও বঙ্গ ভারত-বহির্ভূত ভূভাগে পাত্র-পাত্রীদের বিচরণ করতে পাঠালেন। গ্রাম-বাংলার গল্প দিয়ে একদা যিনি বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের মন জয় করেছিলেন, তাঁর এই পরিবর্তন কেন ? গ্রাম-বাংলার জীবন রস কি এর মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছিল ?

ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের সন্তানেরা সবাই কলকাতা-নাগরিক - অমিত রায়, অতীন্দ্র, আদিত্য, লাবণ্য, এলা, নীরজা এবং অভীক ও বিভাস। এই ভূগোল-পরিবর্তনের মধ্যে কি হাওয়া-পরিবর্তনের মত কোন স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় নিদান আছে ?

শুধু মেয়েদের লেখায় গ্রাম-বাংলার চিত্র আছে—মানুষ ও প্রকৃতি। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী দেবীসরস্বতী প্রমুখের লেখায় গ্রাম-বাংলাকে নিয়ে নতুন—ওঠা বাঙালীর কথাও আছে। তবে জন্মমুহূর্তে আধুনিক, মানসিকতায় সাবেকী।

'কল্লোল', 'কালিকলম' পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন, তাদের কেউ-কেউ ছোটগল্পে অন্তত গ্রামীণ জীবন এনেছেন। এবার আবার বিপদ এলো অন্যদিক থেকে। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ লেখক ছিলেন উগ্রমাত্রায় রোম্যান্টিক। মণীন্দ্রলাল বসু বা বুদ্ধদেব বসুর কথাই ধরা যাক। তাদের লেখা 'রডোডেনড্রনগুচ্ছ', 'যেদিন ফুটলো কমল' 'বাসরঘর', 'রমলা', আদৌ বাস্তব সংসারে গল্প কি ? কল্পজগৎ নিয়ে সাহিত্য হবে না, এমন কোন অনুশাসন নেই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'বেদে' লিখে এক রাশ প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন, সেই প্রত্যাশার পরিমাণ দ্বিগুণ হোল যখন তিনি 'ডবলডেকার' লিখলেন, কিন্তু মফঃস্বলের আড়ষ্ট জীবন নিয়ে ছোটো গল্পই লিখলেন, কোন উপন্যাস লিখলেন না। 'কাকজ্যোৎস্না'র কুশলী লেখক অধিকতর কুশলতা দেখালেন পরম পুরুষের উপকথা লিখে। বাস্তব নয়, পরাবাস্তব তাঁরা সামর্থ্য টেনে নিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম : তাঁরা গ্রাম-বাংলার তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সাহিত্য করলেন এবং লিখলেনও অতীব শান্ত নিরুত্তাপ গলায়। অন্য শিল্প-মাধ্যম তাঁদের ভুলিয়ে নিয়ে গেল।

জগদীশ গুপ্ত, অমলাদেবী ও মনোজ বসু গ্রামের কথাই বললেন।। জগদীশ বললেন পৃথক পরিভাষায়। অমলাদেবীর (ইনি ভদ্রমহিলা নন, বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের বিজ্ঞানের শিক্ষক) 'সরোজিনী' ভালো বই। মনোজ বসুর 'নরবাঁধ', 'বনমর্মর' গ্রাম-কথাও স্নেহ-সিক্ত ভাষায় পরিবেশিত। আর একজন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক একখানি বই লিখে ডুব দিলেন—'চরকাশেম' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অদ্বৈত মল্লবর্মনের অনেক আগে অন্ত্যজ বাংলার আবরণ উন্মোচন করেছে। অমরেন্দ্র ঘোষ পঁচিশ বছর পরে ফিরে এসেছিলেন।

নতুন ধারায় মেয়েরাও কিছু বই লিখলেন। গিরিবালা দেবী উত্তরবঙ্গের জমিদার বাড়ির গল্প বলেছেন। তত উচ্চকণ্ঠে নয়। বহু পরে ঐ উত্তরবঙ্গের গ্রাম নিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার কয়েকখানি উপন্যাস লিখলেন। আঞ্চলিকতা না ফুটলেও অঞ্চলের গল্প বলা হয়েছে। আশালতা সিংহ এবং জ্যোতির্ময়ী দেবীর কলমে ধার ছিল। তবে তাঁরা বহির্বঙ্গের গল্পই ভালো বলতে পারেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এক নাটকে জনৈক রাগী ব্রাহ্মণ কর্তব্যবিমুখ বা দ্বিধাগ্রস্ত এক যুবককে ধমকে বলেছিলেন 'মূর্খ, তুই মা চিনলি নে।'

তারাশংকর অতটা না হলেও বাঙালী পাঠককে গ্রামের দিকে চোখ ফেরাতে বললেন।

ত্রিশের দশকে কোন কোন নবীন লেখক দুম্ করে একখানা ভালো বই লিখে ফেলতেন, যেমন 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস'। তারপর শৈলজানন্দ লিখলেন 'নারীমেধ', 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী'র মত সাধারণ গ্রন্থ।

প্রবোধকুমার সান্যালও হঠাৎ লিখেছিলেন 'কলরবে'র মত এক ছোট্ট অসাধারণ উপন্যাস।

স্কুলের গণ্ডী পেরুব-পেরুব করছি, তখন পড়েছিলাম ঐ দুটি দল-ছাড়া বই। যুদ্ধ নেই, অথচ হয়ে পড়ল মহাযুদ্ধের গল্প। চার্চিল, হিটলার, নেপোলিয়ন বা তোজো—কেউ নেই। 'কলরব' পড়লাম। না প্রেমের আখ্যান, না মধ্যবিত্ত পরিবারের বিবাহ-মৃত্যুর উপাখ্যান। কখন যে আরম্ভ, আর কখন যে শেষ, তার হদিশ মিলল না। তবু চমকে ছিলাম। বিদেশী দৃষ্টান্ত নেই, অথচ যুবকেরা সাহসী হচ্ছেন, আমাদের তখনকার বেপরোয়া যৌবনের প্রশ্রয় পেলেন এই লেখকদ্বয়। কিন্তু এই সব স্পর্ধা বেশি দিন টেকে নি।

গড্ডালিকার অতি আপ্যায়ন দেখে বিভ্রান্ত হয় না কে? এই রকম একটা অবস্থায় তারাশংকরের মত লেখকের আসবার প্রয়োজন ছিল, যিনি বসলে আর উঠবেন না সেই আসন ছেড়ে। সবাই যে তথাগত বুদ্ধদেব হবেন, তা নয়। কিন্তু ঘনঘন আসন পরিবর্তনে কোন সাধনাতে সিদ্ধি নেই। তারাশংকরের অনন্য মনস্কতা বাংলা সাহিত্যকে রক্তাল্পতা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

তারাশংকরের সঙ্গে আর একজন লেখককে কেবল তুলনা করা যেতে পারে, তিনি

হলেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী। উভয়ের জন্মস্থান কাছাকাছি, ময়ূরাক্ষীর দুই তীরে দুই জনের বাসস্থান। সরোজকুমার প্রথম পর্যায়ে 'পান্থনিবাসে'র মত বই লিখে-ছিলেন। কৈশোরে সে বই পড়ে খুব কেঁদেছি।

শরৎচন্দ্রের বই সাঙ্গ করে যখন সবে চোখ মুছেছি, তখন আবার কাঁদতে বসেছি। সরোজকুমার এই চোখের জলের অনিবার্যতা কাটিয়ে উঠলেন—'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী', 'সোমলতা' লিখে। বৈষ্ণবীয় কথা পরিবেশন করলেন রাঢ়ের পরিমণ্ডলে এবং ময়ূরাক্ষীকে বুকে নিয়ে। আখড়া সাধারণ ভুবন নয়।

সরোজকুমারের ব্যক্তিগত জীবনও তারাশংকরের অনুরূপ। দুই জনেই ১৯২০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে সাহিত্য করলেন। তবে সরোজকুমার সাংবাদিকতা করেছেন। দীর্ঘকাল একটি দৈনিক পত্রিকায় সহ সম্পাদক ছিলেন।

তারাশংকর সাহিত্য ছাড়া আর কিছু করেন নি।

[দুই]

তারাশংকর বাংলা সাহিত্যে এযুগে সব থেকে অনন্যমনা সাহিত্যসেবী। একান্ত নিবেদিত। সেই নিবেদন কালে-কালে সুনিশ্চিত হয়েছে।

তান্ত্রিক কুলাচার ও পারিবারিক ধর্মবিশ্বাস তারাশংকরকে গড়ে তোলেনি। তান্ত্রিক মতাচারীর সংখ্যা গণনা নাই বা করলাম, বীরভূমের এত সাধনপীঠ—তারাপীঠ, নলহাটী, ফুল্লরার স্থান, বক্রেশ্বর, কংকালীতলা, কীর্ণাহার—এত পীঠে কজন সাহিত্যিক জন্মেছেন? লাভপুর একটাই, তারাশংকর নিজেকেই নিজে গড়ে তুলেছেন, গড়ে তুলেছেন বাস্তব ক্ষেত্রে। তবে এক্ষেত্রেও পথ-পরিদর্শকের প্রয়োজন ছিল। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্রের দুটি ছোট্ট লেখা তাঁর লেখার বিষয় ও রীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। তারাশংকর প্রথম যে লেখা নিয়ে সাহিত্য জগতে ঢুকলেন, তা হোল বৈষ্ণবী ভাবরসের সাহিত্য। শরৎচন্দ্রের কমললতা ও কুসুমের হাতছানি ছিল, একথা বলা যাবে না। কারণ কুসুমের সঙ্গে আছে বৃন্দাবন, সে বৈষ্ণব পরিবেশে ঠিক খাপে খাপে মানায় না, আর কমললতার গহর বা নতুন গোঁসাই কেউ বোষ্টম নয়। তারাশংকর চণ্ডীদাসের বীরভূম থেকে এটি কুড়িয়ে পেলেন। তবে তারাশংকরের প্রধান সাহিত্য এই ধরণের নিয়ন্ত্রিত জগৎ নয়। বৈষ্ণব আখড়া অনেকটা কল্প জগৎ—নামজপ, তুলসীমঞ্চ, বিগ্রহসেবা, তিলকসেবা, মাধবীকুঞ্জ, খঞ্জনী, খোল, একতারা, গুপীযন্ত্র—সব মিলিয়ে এক পৃথক ভুবন। অনেকটাই কল্পভুবন বলা যায়।

তারাশংকর কল্পভুবনে থেকে-থেকে পদচারণা করেছেন, হয়ত ভালো বাসতেন। তবে তাঁর প্রধান আসক্তি খোলামেলা বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলা। তাঁর অভিজ্ঞতায় দেশের মাটি, মানুষ ও আকাশ সমানভাবে ধরা পড়েছে। সারাজীবন ধরে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেও তাঁর ক্লান্তি নেই, পুঁজি ফুরোয় নি। এত তাঁর সঞ্চয়, এবং বলায়

এত তাঁর আনন্দ। রাঢ়ের অকৃত্রিম একনিষ্ঠ শিল্পী; চন্ডীদাসের পর বাংলা সাহিত্যে রাঢ়ের এত বড় নাগরিক দেখা দেন নি। রাঢ়-ই—তাঁর পৃথিবী, বসুন্ধরা।

[তিন]

যখন সত্যিকারের সাহিত্য করতে এলেন, তখন প্রথম থেকেই বাস্তবের একেবারে মুখোমুখি। ভয়ডর নেই। কাটছাঁট করে যাতে সহজে কব্জা করা যায়, এমনভাবে তাকে ধরতে উৎসুক হলেন না। আঁকাড়া রাশীকৃত বাস্তব নিয়ে তিনি সারা জীবন খেলা করে গেলেন। 'নীলকণ্ঠ' জেল খানায় বসে লেখা কি লেখা নয়, এটি অনর্থক প্রশ্ন। কিন্তু নীলকণ্ঠের এই বর্ণনা একবিন্দু বানানো নয়।

> দেহখানার ধূলিমালিন্য উত্তমরূপে মার্জনা করিয়া কাপড় কাচিয়া ঘাটে উঠিল। হেঁট হইয়া সে কাপড় নিঙড়াইতেছে বক্ষবাস সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়া সম্মুখ পানে. নিবিড় কুয়াশার মধ্য দিয়াও একটা মানুষের অংশ দেখা যায়, আর দেখা যায় একটা চোখ। অতি নিকটেই লোকটা দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টির লোলুপতা দিয়া সে তাহার অঙ্গ যেন লেহন করিতেছে। শ্মশানচারী শকুন যেন সদ্য পরিত্যক্ত শবের পানে বৃক্ষশীর্ষ হইতে চাহিয়া আছে। দারুণ উত্তেজনায় গিরি যেন কেমন হইয়া গেল। সে সেই অনাবৃত অঙ্গেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাতছানিতে ওই লোকটিকে ডাকিয়া ত্বরিত পদে আপন ঘরে আসিয়া উঠিল। (নীলকণ্ঠ, রচনাবলী. ৩য় খণ্ড. পৃ-৬৫

'রসকলি' ও রাইকমলে'র সাজানো পরিবেশ থেকে বিদায় নিয়েছেন। উপন্যাসে তিনি কালের দাস নন, কাল-অনুগত। যেখানে সময় স্তব্ধ, গতিহীন সে সময় নিয়ে ঔপন্যাসিকের মাথাব্যথা নেই। যেমন তিনি সমাজছুট মনুষ্য নন, তেমনি নন কালের তোয়াক্কা-না-করা কালভৈরব।

ত্রিশের দশকে একে একে 'নীলকণ্ঠ', 'পাষণপুরী', 'চৈতালী ঘূর্ণি' ও 'আগুন' প্রকাশ পেলে বাঙালী পাঠক-সমাজ বিস্মিত হোল। বিষয়ের অপরিমেয়তা ও লেখকের শক্তির বহুমুখীনতা দেখে।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখায় বৈধ বা অবৈধ প্রেম ব্যতীত আর কোন বিষয় থাকত না। তারাশংকর কাম প্রসঙ্গ বাতিল করেন নি, তবে জীবনের অন্যপ্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে তার মূল্য বিবেচনা করেছেন। তার সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীরা খেত-খামার থেকে উঠে এলো, হাতে পায়ে ধুলো, ভালো করে তাকালে ভ্রূযুগলেও ধূলিকণা চোখে পড়বে, মাঠের কাজ শেষ না করেই যেন হাজির হয়েছে। তার লেখা মাটির গল্প; মাটির গন্ধে ভরা, মাটির রঙে মাখামাখি।

তাঁর 'পাষাণপুরী' অভিনব বিষয়বস্তু নিয়ে আসেনি। এই সময়ে শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত পরিবারের এমন একটি উদাহরণ ছিল না যেখানে কেউ না কেউ কারাজীবন ভোগ করেছে। যেটা বিস্ময় জাগিয়েছিল, তা হোল লেখক পাঠক-তোষণে কোন মজাদার কাহিনী আনেন নি ; জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' লেখেন নি। সতীনাথ ভাদ্বড়ীর 'জাগরী' আরও বড়ো মাপের কাহিনী।

জেলখানায় স্বদেশী বাব্বরা যেমন আছেন, তেমনি আছে যারা পকেট মেরেছে, ছিনতাই করেছে, জখম করেছে কাউকে। খ্বন করেছে এমন লোকও আছে। উত্তেজনার ম্বহ্বর্তে কত বড় অন্যায় করে ফেলেছে, উত্তেজনা সরে গেলে আবার স্বাভাবিক লোক। তারাশংকর এই সব চোর ডাকাত বদমাইস লোকদের পাশে ভদ্রলোকদের বসিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন মন্বষ্যত্ব কি। সাইদ, গৌর, কেষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি বীরভূমের হাজার মান্বষের প্রতিনিধি। কৃষক ও মেহনতী মান্বষের অংশ। ভদ্র চরিত্রের জন্য আছে স্বরেশ, অমর, চ্যাটুজ্জে মশাই। এঁরা মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। সবাই গড়পড়তা মান্বষ।

'পাষাণপ্বরী' এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত মহলের গল্প। তবে লোকগ্বলি ছকে বাঁধা নয়। যেমন কালী বাগদি ও কামিনী। এরা বীজ চরিত্র। নানা উপন্যাসে তারা ঘ্বরে ফিরে আসবে।

'চৈতালী ঘ্বর্ণি' ও 'নীলকণ্ঠ' খোলামেলা গল্প : বীরভূমের মাঠ নদী গাছ-গাছালির সঙ্গে তার প্রাকৃতজ সম্বন্ধ।

আবার এই পর্বেই বীরভূম বহির্ভূত অঞ্চলের গল্প বললেন। 'আগ্বন' মানভূমের গল্প। সেখানে মাটিতে আকরিক লোহা বেশি, যে দেশে বসবাসকারী হোল ম্বণ্ডা। জমি ও মান্বষ দ্বই-ই আলাদা হিসাবের।

'আগ্বনের' নায়ক শিল্প-কলকারখানা গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছে। গল্পের নায়ক জমিদার নয়, কারখানার মালিক। এমনভাবে নবা জীবনকে স্বীকৃতি দিতে তারাশংকরের আর কোন নায়ককে দেখিনি। কলকারখানার মালিক, অথচ নিন্দনীয় ব্যক্তি নয়, আমাদের এই জমিদার-প্রেমিক সাহিত্য-জগতে সচরাচর এমন বিবেচনাবোধ দেখা যায় না। আকরিক লোহা গালিয়ে লোহার পিণ্ড তৈরি হচ্ছে, আবার তারই উত্তাপে নতুন মান্বষ জন্মাচ্ছে। নায়ক চন্দ্রনাথ তারাশংকরের অগণিত সন্তানসন্ততির ভিড়ে হারিয়ে যায় না। শক্তির এমন উদগ্র-প্রকাশ বাংলা উপন্যাসে খ্বব বেশি নায়কের মধ্য দেখি না। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র সব্যসাচী শক্তিমান সন্দেহ নেই, তবে যতটা বচনে ততটা কর্মে নয়। গোরা ছিল শক্তিমান, তার শক্তিও যত তর্কে, তত বহ্ববিধ কর্মে নয়। 'আগ্বন'-এ তারাশংকর এক স্বতন্ত্র সাহিত্য তুলে ধরলেন। চন্দ্রনাথ বিয়ে করেছিল এক পাঞ্জাবী মেয়েকে : পঞ্চনদ তীরবাসিনী এই রমণীও চন্দ্রনাথের কাছে খ্বব নিরীহ বলে প্রতিভাত হয়।

'ধাত্রী দেবতা'য় রামেশ্বর পত্নীহত্যার মত অসীম সাহসিকতার কাজ করা ছাড়া আর কিছ্ব করেনি, বরং বাকি জীবন নিজের হাতের চেটো দেখে কাটিয়ে ছিল। সামন্ততন্ত্র

যখন ডুবছে, তখন তার শক্তিমত্তার এমন হাস্যকর প্রকাশই ঘটে। রাবণেশ্বর রায় বণিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে শেষ মোহরটি বাইজীর চরণে অর্পণ করল। আহাম্মুকির আর কতটা ওজন হবে।

'নীলকণ্ঠ', 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী' ও 'আগুন'—কোনটিই তেমন শিল্প সফল রচনা নয়। না হোক, কিন্তু এইখান থেকেই তারাশংকর তাঁর ভবিষ্যত সৃষ্টির বহু উপকরণ সংগ্রহ করবেন। সেগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হবে তার কলা কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। যা বলা যেতে পারে এখানে রয়েছে তাঁর অস্ত্রাগার। ভবিষ্যতে এখান থেকে হাতিয়ার তুলে নিয়ে তিনি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস রাজ্যে প্রবেশ করবেন এবং লড়বেন।

শৈশবে শিবনাথ একবার হেড়েলের বাচ্চা ধরে এনেছিল। এই ছেলেমানুষি কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে একটি প্রতীকী তাৎপর্য আছে। শক্তিমানের খেলাও বিপদসংকুল।

[চার]

মাঠের ফসল শ্মশানের প্রান্ত পর্যন্ত জাগিয়া উঠে, কিন্তু নীচে শুষ্ক নদীর টানে মাঠের রসটুকু চোঁয়াইয়া ওই রাক্ষসী বালুকা প্রবাহের বুকে মিশিয়া যায়। কঠিন রসলেশহীন মাটির বুকে শীর্ণ পাশুটে গাছগুলি তবু অতি কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, যেন শুষ্কবক্ষা কংকালাবশেষা কংকালা নারীর সন্তান সব, মরণের শোষণে রসময়ী ধরনী মা, সেও বুঝি সন্ধ্যার মত, শুষ্কবক্ষা হইয়া উঠিল। বাতাস বয় সঙ্গে সঙ্গে চিতার ছাই উড়ে ; ও দিকে গাছগুলো দোলে, উহাদের পাতায় ছাইগুলো জড়াইয়া যায় : যেন মুমূর্ষু জীবন মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শ্মশানটাকে অগ্রগমনে বাধা দেয়। (চৈতালী ঘূর্ণি, পৃ-১ রচনাবলী-১ম খণ্ড)।

এই বর্ণনায় রাঢ়ের ভূপ্রকৃতির চেহারা মোটামুটি চেনা যাচ্ছে ; 'ধাত্রীদেবতা'য় এসে বর্ণনা আরও পেশীবহুল হয়েছে, তবে অলংকরণ ছেঁটে।

বাংলা দেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমি-প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিকবর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গীতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বনফুল, আর খৈরিকাঁটার গুল্ম ; বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণবাহুর মত উর্ধ্বলোকে প্রসারিত। (ধাত্রী দেবতা, পৃষ্ঠা—১, ৩য় খণ্ড রচনাবলী)।

অলংকার আছে, সে অলংকার মূর্তির দেহ সুষমা ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত, জাঁক দেখানো লক্ষ নয়। বহুকথা এতকাল অর্ধব্যক্ত ছিল, 'ধাত্রীদেবতা'য় এসে পুরোপুরি ব্যক্ত হোল। 'চৈতালি ঘূর্ণি'তে ও 'নীলকণ্ঠ' গল্পের রেখাচিত্র আছে, পুরো গল্প নেই। 'চৈতালি ঘূর্ণি'তে নায়ক গোষ্ঠ গুলি খেয়ে মরেছে, পুলিশ এসে এই তুচ্ছ কর্মটি করেছে।

হাসপাতালে গোষ্ঠ মরিতে যায়, পাশে শিবকালী দাঁড়াইয়া গোষ্ঠ অতি যাতনায় গোঙায়, তবু মাঝে মাঝে পেটের জ্বালায় আক্রোশে চীৎকার করে, জান দেগা, লেকেন নেহি যায়ে গা। বলিয়া প্রলাপের ঘোরে উঠিতে গিয়া সহসা বিছানায় লুটাইয়া পড়ে।

ঠিক শ্রমিক আন্দোলনের ছবি এটি নয়, মফঃস্বল শহরের আধা-বিকশিত কারখানা জীবনের ছবি। বলার বিষয় আর বলার রীতির মধ্যে এখনও সামঞ্জস্য হয় নি।

'ধাত্রীদেবতা'য় এই রকম শিল্প অঞ্চলের গল্প বলার চেষ্টা করেননি; তাঁর গল্প গ্রাম-জীবনের গল্প, জমিদার গৃহের নব্য শিক্ষিত তরুণের গল্প। তারাশংকর তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিটি বুঝে নিয়েছেন।

'ধাত্রীদেবতা'র রচনারীতি হোল বঙ্কিমী রীতি: ব্যক্তিকে ধরে গল্পের বিস্তার। গল্প যেমন এগোয়, নায়ক ও অন্য চরিত্রও তেমন ফুটে ওঠে। তবে কালানুক্রমিতা মেনে চলা হয়। ঘটনা ঘটল অথচ চরিত্র বদলাল না, এমন ব্যাপার থাকবে না।

গল্পের নায়ক শিবনাথ কোথায় জন্মেছে, কোন গৃহে, তার পরিবারে কে কে আছে, এসব খবর উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে। শিবনাথ চরিত্র গড়ে তোলার পিছনে প্রত্যক্ষ প্রভাব পিসীমার, তবে নিঃশব্দ একটি প্রভাবও আছে, সে প্রভাব মা জ্যোতির্ময়ী দেবীর। তৃতীয় আর এক ব্যক্তির প্রভাব আছে, তিনি হলেন গৃহশিক্ষক রামরতন বাবু। তিনি শিবকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়েছেন। শুধু পিসীমা ও মায়ের প্রভাব থাকলে শিবনাথ হোত এক দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার বা ভদ্র জমিদার। কিন্তু রামরতন বাবু জমিদার হওয়া থেকে অন্য কিছু হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। দেশকে ভালবাসতে শিখে জমিদারের ছক-বাঁধা জীবন থেকে শিবনাথকে সরে যেতে হয়েছে। মাস্টারমশাই অনেক কিছু রোধ করতে পারেন নি, যেমন কিশোর বয়সে বিয়ে। বধূও তখন নাস্তি মাত্র, গৌরী হতে সময়ের প্রয়োজন। গৌরী ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা, অর্থপ্রাচুর্য আছে, আর আছে ভিন্ন রুচিবোধ। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের ছেলে দেশকে ভালোবাসতে শিখল, অথচ উঠতি শিল্পপতির গৃহে বন্দেমাতরম ধ্বনি উপহাস কুড়ুচ্ছে।

গৌরী 'money-economy'-র জয়ধ্বনি দিয়েছে। শিবনাথ এর জন্য প্রস্তুত ছিলনা। বিমূঢ় হোল, পরে এই বিমূঢ়তা থেকে এল শীতলতা।

গৌরী পিসীমার আধিপত্য বরদাস্ত করতে পারে না। সে অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। পিসীমা থাকলে এ বাড়িতে সে থাকবে না।

এই উপন্যাসের প্রধান বিরোধ শিবনাথ ও গৌরীকে নিয়ে। এই বিরোধের ছায়াতলে আর একটি বিরোধ—পিসীমার সঙ্গে গৌরীর বিরোধ। এই একটি বিরোধ নিয়ে যদি উপন্যাস রচিত হোত, তাহলে অনুরূপা দেবীর লেখার মত হোত। পরিবারের কলহ পরিবারের মধ্যে আটকে থাকতো। অনুরূপা দেবীর 'মা' বা

'মহানিশা' ভালো উপন্যাস, কি মন্দ উপন্যাস, এখানে সে প্রশ্ন অনাবশ্যক। 'ধাত্রীদেবতা' ঐ শ্রেণীর উপন্যাস নয়, এ কথা জানতে হবে। গৌরী ও শিবনাথের বিরোধ এক সময় সাধারণ দাম্পত্য কলহের সীমানা পার হয়ে গেল। 'ধাত্রীদেবতা' তাই 'ক্লিনিকল'-ধর্মিতা পেল।

'ধাত্রীদেবতা'-পূর্ব রচনায় ঘটনার ঘনঘটা আছে, কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট শাসিত নয়। ঘটা আছে, ঘনত্ব নেই। "যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই ক্ষুধাতুরের দল শুধু যে স্বার্থেই বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহা তো নয় : যে বিশ্বাস মানুষের জীবনের একটা পরম আশ্বাস—শান্তি, সেটুকুতেও দুনিয়া এদের নিঃস্ব করিয়া তুলিয়াছে।" (চৈতালী ঘূর্ণি, পৃ—৬০)

ঘটনার ঘনঘটার সঙ্গে আদর্শবাদের উচ্চনাদও আছে। কিন্তু উপন্যাসে সেগুলি তেমন আদায় হয়নি।

'ধাত্রীদেবতা'র রঙ্গমঞ্চ জনতার জীবন থেকে পরিবারের জীবনে নেমে আসায় এই সাফল্য সম্ভবপর হয়েছে।

'ধাত্রীদেবতা'য় বহু ঘটনা (event) আছে। তাদের কোনটিই বাতিলযোগ্য নয়। ধরুন শিবনাথের ঘোড়া কেনা। এই ঘটনা শিবনাথকে বুঝতে যত দরকারী, তার থেকে ঢের ঢের বেশি দরকারী পিসীমাকে বুঝতে। নইলে পিসীমা কতবার ঝি-চাকরদের ধমকালেন, বা নায়েব গোমস্তাদের কাজের হিসাব নিকাশ নিলেন—এসব দিয়ে তাঁর অন্তরের ভিতরটা বুঝা যেত না। পিসীমা তার কষ্ট সঞ্চিত অনেকগুলি মুদ্রা ভাইপোর খেয়াল মেটাতে খরচ করলেন, এই পর্যন্ত ভাবলে ভুল হবে। এর মধ্যে জমিদারী দর্প কতখানি চরিতার্থ হোল, তার পরিমাপ করলে পিসীমাকে বোঝা যাবে। বোঝা যাবে বিশ্বম্ভর রায় কেন তার জ্ঞাতি ?

গৌরীর "তোমার জমিদারীর পায়ে প্রণাম"—এই উক্তিটি প্রত্যাবাস্তবে সামন্ততন্ত্রের সমালোচনা। গৌরী ব্যবসায়ী পরিবারের দুলালী, সে আভিজাত্য থেকে অর্থ কৌলীন্যকে শ্রদ্ধা করে। শিবনাথের জমিদারী খুব বড় নয়, কিন্তু তার ঠাটের বহর কম নয়। গৃহশিক্ষক, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, ঝি, চাকর, পাল্কী, বেহারা, কাচারী-বাড়ি, ঠাকুরদালান—সবই আছে।

তারাশংকর জমিদারীকে একটা 'ইনস্টিটিউশন' হিসাবে ঘনিষ্টভাবে চিনিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসে অন্য কাউকে এমন দেখিনা। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র জমিদারী তদারক কখন করত, আমরা জানি না। বরং যখন অমনোযোগী হলেন, তখন কিছু কিছু খবর লভ্য হোল। শ্রীশবাবু নামী কোম্পানীর মুৎসুদ্দি, তার কখন তিসি কেনার মরশুম, লেখক আমাদের শুনিয়েছেন। আরও দুই জমিদার আছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কৃষ্ণকান্ত, 'দেবী চৌধুরাণী'র হরলাল রায়। কৃষ্ণকান্ত যখন উইল করলেন, তখন জমিদারী ভাগ-বাঁটোয়ারার কিছু খবর পাই; জমিদারী পরিচালনার খবর পাই গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরের কাছ থেকে পালিয়ে বন্দর খালি

নামে এক মহলে গিয়েছিল। হরলাল রায়ের জমিদারীর খবর শুধু খাজনা বাকি পড়লে জানা গেল। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' আর 'যোগাযোগে' জমিদার চরিত্র আছে, কিন্তু জমিদারীর গল্প নেই। আর নিখিলেশ কেমন জমিদার, তার তুলনা চলে 'শারদোৎসবে'র বিজয়াদিত্যের সঙ্গে। 'যোগাযোগে' কুমুর দাদা জমিদার ; সে যে জমিদার, তার সেই পরিচয় পকেটে গুঁজে রেখেছে। বরং রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে জমিদারীর খবর বেশি পাই। তারাশংকর এক্ষেত্রে অনন্য।

'ধাত্রীদেবতা'র কাহিনী এগিয়েছে গৌরী-শিবনাথের সম্পর্কের টানাপোড়েনে। দুজনা দুই জগতের লোক, কিন্তু তাদের গড়তে হবে একটি সংসার।

এই বিরোধ মেটাবার সহজ কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। যে আকর্ষণে শিবনাথকে জেলে যেতে হোল, সেই আকর্ষণেই গৌরীকে শিবনাথের কাছে যেতে হোল। সন্তান সম্ভাবনাও বিরোধ মেটায়নি। শ্বশুর গৃহ থেকে সে চলে গেল। পিতৃগৃহে সে সন্তান প্রসব করল। সেই সন্তান ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠছে।

শিবনাথ ১৯২০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করল। আত্মীয়রা এগিয়ে এল জামিনের ব্যবস্থা করতে, মুচেলকা আদায় করতে। কিন্তু শিবনাথ এই সব ব্যবস্থার সঙ্গে সন্ধি করল না। গৌরীর সঙ্গে সম্বন্ধ আরও জটিল হোল। ছেলে বড়ো হচ্ছে।

সারা দেশ তখন বন্দেমাতরম ধ্বনিতে মুখরিত।

> গৌরীর আড়াই বছরের শিশুটি অপটু জিহবায় বলে, 'বণ্ডে মাটরম'। মাঝে মাঝে শব্দটা সে ভুলিয়া যায়, তখন সে ছুটিয়া মায়ের কাছে আসিয়া বলে, বন্ডে বল।
>
> গৌরী বলে, বলতে নেই।
>
> ছেলে কাঁদে, বলে, না বল।
>
> অগত্যা গৌরী বলে, বন্দেমাতরম।

শিবনাথের কারাদণ্ড হয়ে গেছে।

গৌরী ছেলে কোলে করে শিবনাথের গৃহে চলে এল। বন্দী শিবনাথের সঙ্গে গৌরী দেখা করতে এল, সঙ্গে পিসীমা।

শিবনাথ কোন অভিমান না রেখেই গৌরীর দিকে হাসিভরা মুখে তাকিয়েছিল। গৌরীর মুখের ঘোমটা সরে গেছে। অনাবৃত মুখে এবং পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শিবনাথের প্রতি তাকাল। শিবনাথ দেখল।

> তাহার মুখে হাসি চোখে জল। ইঙ্গিতে—ভঙ্গিতে সারাটি মুখ ভরিয়া কত ভাষা, কত কথা সোনার অক্ষরে লেখা কোন মহাকবির কাব্যের মত ঝলমল

করিতেছে। শিবনাথের মুখেও বোধ করি অনুরূপ লেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দুই জনে মুগ্ধ হইয়া গেল, কত কথার বিনিময় হইয়া গেল। তাহাদের তৃপ্তির সীমা রহিল না। যে কথা যে বোঝাপড়া এই ক্ষণিকের দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে হইল, সে কথা, সে বোঝাপড়া দিনের পর দিন একত্রে কাটাইয়াও হইত না।

পারিবারিক গল্প অন্য মহলে ঢুকে পড়েছে, অথচ পরিবারকে সঙ্গে নিয়েই। সাদা-মাঠা জন্মস্থান বা গ্রাম হয়ে উঠল 'ধাত্রীদেবতা'। তারাশংকর সমকালকে শুধু ধরলেন না। সমকালের সব থেকে বড়ো চৈতন্য, তাকেও ধরলেন। বাংলা উপন্যাস খাটো 'রিয়ালিটি'র অঙ্গন থেকে বড়ো 'রিয়ালিটি'র অঙ্গনে ঢুকে পড়ল। তখনকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পাঠক-সমাজ, অথচ নতুন উপন্যাসে পিপাসায় উৎকণ্ঠিত, তারা তৃপ্তি পেল। বাংলা উপন্যাস 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়ে'র হারানো সূত্রটি আবার খুঁজে পেল।

'কালিন্দী' হোল পরবর্তী রচনা; রচনা রীতিও একই এবং পরিবেশ-পরিকল্পনারও কোন ভিন্নতা নেই।

তবু 'কালিন্দী' বিষয়-পরিকল্পনায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল: ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উদ্ভব দেখাতে চেয়েছেন। 'ডেকাডেণ্ট' সামান্ততন্ত্রের বিরোধী, পুঁজিবাদের পদধ্বনি থেকে তার প্রতিষ্ঠা-পর্ব পর্যন্ত এই উপন্যাসে স্থান পেল। কালিন্দীর নায়ক অহীন্দ্র, কিন্তু ঘটনার মধ্যে যে বিরোধ তা হোল রামেশ্বর বনাম ইন্দ্র রায়। অর্থাৎ সামন্তপতিদের পারস্পরিক কোন্দল। অহীন্দ্র এই অন্ধ গলিতে আবদ্ধ গল্পকে মুক্ত করতে চেয়েছে।

'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথ প্রুধোকে জানতে পেরেছে, জেনেছে ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষা। আর কালিন্দীর অহীন্দ্র কার্ল মার্কস পড়েছে, নলিনী বাগচীর ধুলিয়ানের মাধবীতলা থেকে সুদূর মীরাটে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে যোগ বেঁধেছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনের ছবি দ্রুত পালটে যাচ্ছে—রামেশ্বর ইন্দ্র রায়ের জীবন পরিধি ওরা ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্র রায়ের কন্যা উমা আর সদ্য-পরিণীত স্বামীর গ্রেপ্তারী বরণে উষ্মা বোধ করছেনা, পরিবর্তন পরিবারের বন্ধনকে মানছে না। 'আইডিয়া' বা ভাব-চেতনার এমনই শক্তি গৌরী ও উমা দুই কালের কন্যা!

এমন কি, মহীন্দ্র যে বিমাতার সম্পর্কে কুৎসা শুনে গুলি ছুঁড়েছিল, সেও নতুন জীবনের শরিক। গুলি করে মেরে সে নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। রামেশ্বরের মত স্ত্রীর লাশ গায়েব করেনি। ইন্দ্র রায় আর অহীন্দ্রের মাঝখানে মহীন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে। একজন সচেতনভাবে সমাজ-পরিবর্তন সাধনে আসেনি, অন্যজন সচেতনভাবেই এসেছে। অহীন্দ্র এসেছে বলে এগল্প রামেশ্বরের ক্লেদাক্ত জীবনকথা হয় নি, বা ইন্দ্র রায়ের দর্পমুখর পাঁচালী হয় নি।

'কালিন্দী' অপসৃয়মান জমিদারতন্ত্রের গল্প ; কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। কালিন্দীর বুকে জেগেছে নতুন চর। সেই চরে নতুন মানুষ এল, জন্ম নিল আর এক জীবন। মিঃ মুখার্জি কারখানা স্থাপন করলেন এবং নতুন জীবন পত্তন করলেন। চিনির স্বাদ মিষ্টি, কিন্তু এই চিনির কলকে কেন্দ্র করে যে মানুষজন সমবেত হোল, তোদের জীবন-কাহিনী শর্করা-মিশ্রিত নয়।

মিঃ মুখার্জি নিজেও ভদ্র জীবন বহন করেন না ; আর প্রকৃতির কন্যা সারী, সে-ও নষ্ট হয়ে গেল। শিল্প কল-কারখানার প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে মনুষ্য চরিত্রের অধোগতি ঘটে, এইরকম একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কি ?

তারাশংকর সমাজ বিকাশের মূল ধারাটি জানতেন, কিন্তু তাকে খুসি মনে মেনে নিতে পারেন না। মিঃ মুখার্জির পরিবর্তে যদি চন্দ্রনাথ চিনির কলের মালিক রূপে হাজির হোত, উপন্যাসের 'টেনশনে'র রূপ বদলে যেত। 'আগুন' উপন্যাসেই চন্দ্রনাথেরা বসে থাকবে. এটা ভালো কথা নয়। রবীন্দ্রনাথও 'যোগাযোগে' অন্য সমাজেব মানুষকে সমাদর করেন নি ; বিয়ে করেও কুমু আত্মসমর্পণ করেনি। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, এই বিরোধের নিরসন হবে এক লেডি ডাক্তারের অভিজ্ঞতে, তা কে জানত ? শিবনাথের ক্ষেত্রে এই ধরনের সহজ চিকিৎসা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই মানসিকতা থেকে শেষ জীবনে মুক্ত হয়েছিলেন।

এই উপন্যাসে দুই জোড়া নারী চরিত্র আছে—সুনীতি ও হেমাঙ্গিনী, উমা ও সারী। সুনীতি হেমাঙ্গিনী একই নারীর দুইটি নাম। আর উমা ও সারীর মধ্যে বিরোধের সুযোগ ছিল—কিন্তু রাঙাবাবু সারীর 'এ্যাপ্রিশিয়েশনে' তেমন সাড়া দেয়নি, সে কি বর্ণহিন্দুর আভিজাত্য ? কিন্তু 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রামে' মুচির ঘরের মেয়ে দুর্গার প্রসাদভিক্ষু ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপের সন্তানবর্গ। নীচ জাতের মেয়ের সঙ্গে দুষ্টুমি করা যায়, তাকে ভালোবাসা যায় না। কালিন্দীর 'টেনশন' জমির সঙ্গে যন্ত্রের, কৃষকের সঙ্গে কারখানার হলে অন্য অর্থ হোত। কিন্তু মানবিক পটভূমি ঘন না হওয়ায় সব বিরোধ পুথির বিরোধ হয়েছে। খুব যান্ত্রিক।

কালিন্দীর তটে বহু জমি ভেঙ্গে গেল. বুকের মধ্যে বৃহৎ চর জেগেছে। বৃহৎ জনবসতি হোল। কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ নাটকটি মঞ্চস্থ হোল না।

প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজজীবনের উদ্ভব ঘটায়। তারাশংকর নিজেকে যথেষ্ট প্রস্তুত না করেই এমন একটা বিষয়ে হাত দিয়েছিলেন! কিন্তু শিথিল মুঠিতে এত ভারী বিষয় ধরা গেল না।

তারাশংকর তাই পথ বদলালেন, বা পুরানো পথেই সরে এলেন।

[পাঁচ]

তারাশংকর গ্রামীন জীবন ভালো বোঝেন ; কৃষি-ভিত্তিক সমাজ তাঁর মানসলোক দখল করে রেখেছে। তাদের গল্পই তিনি বলতে এলেন। 'ধাত্রীদেবতা'র যে গল্প

একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে বলেছিলেন—এবার সেই গল্পই বহু পরিবারকে জড়িয়ে ধরে ব লেন। সম্ভবত 'ধাত্রীদেবতা'র সাফল্য এবং 'কালিন্দী'র অসম্পূর্ণতা তাঁকে আরও শিক্ষিত করেছিল ও সাহসী করেছিল।

'গণদেবতা' বহু পরিবারের শুধু নয়, বহু গ্রামের গল্প। ফলে এই উপন্যাসে নায়ক-কেন্দ্রিকতা উঠে গেল। নায়ক-কেন্দ্রিকতা প্রত্যাহৃত হওয়ায় এই উপন্যাসের গল্পের শাখা-প্রশাখা নায়কের ওপর ভর করে বিস্তৃত হোল না। সব আখ্যান গ্রাম—কেন্দ্রিক। উপন্যাস একতন্ত্রী নয়, বহু তন্ত্র বিশিষ্ট (multilinear)।

এবার 'ক্রনিকল'-ধর্মিতা আরও ব্যাপক অর্থে সত্য হোল, যেমন সত্য হয়েছিল 'ফরসাইট সাগা' বা 'ওয়ার এণ্ড পীস'-এ। শিল্প-সার্থকতার জন্য একথা উচ্চারিত হয় নি, স্বভাব ধর্মের জন্য হোল।

'গণদেবতা'র কাহিনী ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী। কারণ তখন ইউনিয়ন বোর্ড গ্রামে গ্রামে চালু হয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলনও থেমে গেছে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—১৯২০ সালে ২০শে ও ২১শে আগষ্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় 'Beware of Union Board' নাম দিয়ে এক নিবন্ধ লেখন। তাঁর জন্মস্থান কাঁথিতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। পরে এই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। এবং ইউনিয়ন বোর্ড চালু হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড চালু হলে গ্রামে জমিদারদের অধিকার বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই উপন্যাসের ঘটনা কাল ১৯২০—৩০ মধ্যবর্তী সময়। স্বদেশী করার অপরাধে যারা গ্রেপ্তার হোত, গ্রেপ্তারী মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তাদের আবার কোন পল্লী বিশেষে অন্তরীণ করে রাখা হোত। অন্তরীণ অবস্থায় (intern) তাদের অনেক বিধিনিষেধ মানতে হোত। ৩০ সালে আবার এক জোয়ার আসবে, সে হোল লবণ আইন অমান্য আন্দোলন।

এই সময়কার গ্রাম-জীবন হোল 'গণদেবতা'র উপজীব্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "উপন্যাসের মধ্যে নায়কের অংশ গ্রহণ করিবার উপযোগী কেহ নাই। কর্ণধারহীন নৌকায় মত স্বার্থ-সংঘাতে ক্ষুব্ধ, অনিয়ন্ত্রিত, দ্রুত রসাতলগামী পল্লী গ্রামের চিত্র খুব বাস্তবানুযায়ী হইয়াছে।"

(বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—পৃ—৫৫৭, ২য় সংস্করণ) নায়ক-হীনতার ফলে উপন্যাসের শিল্প-মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা শ্রীকুমার তা বললেন না।

এই উপন্যাসের নায়ক হোল গ্রাম-বাংলা, অবশ্য রাঢ়ীয়। কাহিনীর সংকট সূচনাতেই দেখতে পাই—গ্রামীন ও পুরনো অর্থনীতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে বা আর চলতে পারছে না।

অনিরুদ্ধ কামার ও গিরীশ সূত্রধর গ্রামীন অর্থনীতির সার্থকতা নিয়ে সর্ব প্রথম প্রশ্ন তুলেছে :

> কারণ সামান্যই। সামান্য কারণেই গ্রামে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। এখানকার কামার অনিরুদ্ধ কর্মকার ও ছুতার গিরীশ সূত্রধর নদীর ওপারে বাজারে—শহরটায় গিয়া একটা করিয়া দোকান ফাঁদিয়াছে।

> কত ঘরে হাল উঠে গিয়েছে তাও দেখুন। এই ধরুণ গদাই, শ্রীনিবাস, মহেন্দ্র—আমি হিসেব করে দেখেছি আমার চোখের ওপর এগারটি ঘরের হাল উঠে গেছে। জমি গিয়ে ঢুকেছে কঙ্কনার ভদ্রলোকদের ঘরে। কঙ্কনায় কামার আলাদা। আমাদের এগারো খানা হালের ধান কমে গিয়েছে। তারপরে ধরুণ—আমরা চাষের সময় কাজ করতাম লাঙ্গলের—গাড়ীর, অন্য সময়ে গঁয়ের ঘর-দোর হত। আমরা পেরেক গজাল হাতা খুন্তি গড়ে দিতাম—বটি কুড়ুল, কোদাল গড়তাম—গাঁয়ের লোকে কিনত। এখন গাঁয়ের লোক সে সব কিনছেন বাজার থেকে। সস্তায় পাচ্ছেন তাই কিনছেন। আমাদের গিরীশ গাড়ী গড়ত, দরজা তৈরী করত ; ঘরের চাল কাঠামো করতে গিরীশকেই লোকে ডাকত। এখন অন্য জায়গা থেকে সস্তায় মিস্ত্রী এনে কাজ হচ্ছে। (গণদেবতা, পৃ—১১০, ৩য় খণ্ড, রচনাবলী)

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে মজলিশ বসেছে। সেই মজলিশে ছিরুপাল, দ্বারিক চৌধুরী, দেবনাথ ঘোষ—সব নেতা-ই হাজির।

এই উপন্যাসের পূর্বে নাম ছিল 'চণ্ডীমণ্ডপ', পরে 'গণদেবতা'য় পরিবর্তিত করা হয়েছে। চণ্ডী-মণ্ডপ যেমন বারোয়ারী তলা, গণদেবতাও তেমনি একনায়কত্ব অমান্য করেছে।

অনিরুদ্ধ কামার, গিরীশ সূত্রধর, পড়ন্ত জমিদার দ্বারিক চৌধুরী, উঠতি জমিদার শ্রীহরি পাল আর গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত দেবু ঘোষ—সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোল। আঠাশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসের কলেবর সবটুকু গল্পকে ফুটিয়ে তুলতে পারল না। তার জন্য প্রয়োজন হোল 'পঞ্চগ্রাম' নামে দ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র একখানি উপন্যাস রচনার। 'গণদেবতা'র কাহিনীর অগ্রগমন ঘটেছে বাইরের চাপে।

> দ্বারিক চৌধুরী দেউলে জমিদার, তবে মর্যাদা সম্পন্ন। শ্রীহরি পাল কিন্তু সংগ্রহে ব্যস্ত, জমিদার হতে চায়, গ্রামের নেতৃপদ-ও তার আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সেই সম্মান সে পায় না। মহাগ্রামের ন্যায়রত্নমশাই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ; তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ দেবু ঘোষের সহপাঠী। সে নতুন আদর্শবাদে দীক্ষিত হবে।

দেবনাথ ঘোষ স্বদেশী করতে-করতে পল্লীসেবায় আত্মনিয়োগ করেনি। পল্লী সেবা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দেবু ঘোষের মত আর একটি মানুষ এই গাঁয়ে আছে—সে হোল ডেটিনিউ যতীন। যতীন ব্যাপক পরিবেশে দেশসেবার সুযোগ পেয়েছে ; দেবু ঘোষ গ্রাম জীবনের ছোটো খাটো বিবাদ-বিসম্বাদ নিয়ে চলছিল, তবে দেবু ঘোষ থমকে থাকে নি।

শ্রীহরি পাল, কঙ্কনার জমিদার, থানার দারোগা জমাদার সকলের "রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করিয়া উঠিয়া দাড়াইয়াছে, মহামারীর আক্রমনকে সে রোধ করিয়াছে। দেবুর বুকে বুক রাখিয়া আলিঙ্গনের সময় সে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে, অভয়ের বাণী তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইত।" যতীনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেবু ঘোষের একটি স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হোল। এই ছবিটার সঙ্গে 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের বেশ মিল আছে।

লেখক বলেছেন, মন্থরগতি উত্তেজনাহীন পল্লীজীবন। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর গ্রাম্য দলাদলি কেবল উত্তেজনা ছড়ায়।

পুরুষ চরিত্রগুলি নানা মডেলের : অনেকটা পেশা বা জীবিকা নিয়ন্ত্রিত। চাষী, কারিগর, জনমজুর এই নিয়ে গ্রামের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী গঠিত।

নারী চরিত্রগুলির মধ্যে বিলু হোল দেবু ঘোষের স্ত্রী ; স্ত্রী হলে মেয়েদের যেমন হওয়া উচিত তেমন। অনিরুদ্ধ কামারের স্ত্রী হোল পদ্মবউ। পদ্মবউ জটিল চরিত্র নয়, সন্তান হয়নি বলে তার আচরণ বিলুর মত নয়। 'গণদেবতা'য় সে অসমাপ্ত মানুষ।

দুর্গা হোল সব থেকে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সে দেহোপজীবিনী, কিন্তু তার পরোপকার প্রবণতা তাকে সাধারণ স্বৈরিনী চরিত্র করেনি।

> দুর্গা বেশ সুশ্রী সুগঠন মেয়ে। তাহার দেহবর্ণ পর্যন্ত গৌর যাহা তাহাদের স্বজাতির পক্ষে যেমন দুর্লভ তেমনি আকস্মিক। ইহার উপর দুর্গার রূপের মধ্যে এমন একটা বিস্ময়কর মাদকতা, যাহা সাধারণ মানুষের মনকে মুগ্ধ করে মত্ত করে, দুর্নিবারভাবে কাছে টানে। শুধু রূপ নয়, তার মনও আছে এবং যে মন ছেলেখেলা করার সামগ্রী নয়। কত বিপদের সময় তার শুধু দেহ নয়, মনও মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে।

দুর্গার প্রকৃতি বর্ণনায় লেখক যেমন যত্ন নিয়েছেন, দেবু ঘোষের প্রকৃতি বর্ণনায় তেমনই যত্ন নিয়েছেন।

> গ্রামখানির যাবতীয় অভাব অভিযোগ, ত্রুটি বিশৃঙ্খলা তাহার নখদর্পণে। গ্রামের সামাজিক ইতিহাস সে আবিষ্কারকের মত খুঁজিয়া খুঁজিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। গ্রামের কামার, ছুতার, নাপিত, পুরোহিত, দাই, চৌকিদার, ধোপা প্রভৃতির কাহার কি কাজ, কি বৃত্তি, কোথায় ছিল বাহাদের চাকরাণ জমি সমস্তই সে যেমন

জানিয়াছে, এমনটি আর কেহ জানে না। বিগত পাঁচ পুরুষের কাজের মধ্যে গ্রামের পঞ্চায়েত মণ্ডলীর কীর্তি অপকীর্তির ইতিহাসও আমূল তাহার কণ্ঠস্থ। (পৃষ্ঠা-১৭২, ৩য় খণ্ড)।

গণদেবতায় কোন নায়ক নেই, কিন্তু দেবু ঘোষ আছে। লেখক নায়কহীন উপন্যাস লিখতে চাইছেন, তবে মুখ্য চরিত্ররূপে কাউকে গড়ে তোলায় বাধা নেই। মুখ্য চরিত্র আর নায়ক এক নয়।

দুর্গাও তেমনি নায়িকা নয়। কারণ উপন্যাসের গতি নির্ণয় হয়েছে কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনেব 'টেনশান' দিয়ে নয়। সামাজিক বিরোধ এখানে উপন্যাসের চালিকা শক্তি। বন্যা মহামারী এই সব বিঘ্নবিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই পল্লীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে দেবু ঘোষ ও ডেটিনিউ যতীন বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। যতীনকে এই গ্রাম ছাড়তে হোল, কামার বউ তার 'সন্তান' হারাল, দেবু সহকর্মী হারাল। যতীন চলে গেল। "দেবুর নিকট প্রশ্ন কেমন করিয়া দিন কাটিবে তাহার ?"

সেদিনটা ছিল রথযাত্রার দিন। মহাগ্রামে ন্যায়রত্নের গৃহে রথযাত্রা।

দেবুর কাছে প্রশ্ন জাগল, "রথ কোথায় গিয়া থামিবে—কে জানে ?"

'পঞ্চগ্রাম' 'গণদেবতা'র আখ্যানভাগকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। 'গণদেবতা'য় মুখ্যত ছিল একটি গ্রামের গল্প, এখানে পাঁচটি। তবে 'গণদেবতা'র গ্রামটি এই পঞ্চগ্রাম সমাজের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে চরিত্রের সংখ্যাও বেড়েছে। 'গণদেবতা'য় বর্ণ হিন্দু আর নিচু সমাজের মানুষের কথা ছিল, এবার মুসলমান এসেছে। বাঙলার জনজীবনের একটা ভরাট মানচিত্র পাওয়া গেল। অনিরুদ্ধ কামার, ন্যায়রত্ন প্রভৃতির পাশে ইরসাদ, রহম শেখ, দৌলত শেখ প্রভৃতি দেখা দিয়েছে। অবশ্য নারী চরিত্রের মধ্যে কোন মুসলমান নেই। তারাশংকরের অভিজ্ঞতার সীমানা পরিমাপ করা গেল। মহাগ্রাম একদা রেশম চাষের সুবাদে সমৃদ্ধ হয়েছিল। রেশম চাষ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও সমৃদ্ধির রথ স্তব্ধ হয়ে থাকল। শিবকালীপুরে শ্রীহরি পাল সামান্য অবস্থা থেকে আজ মাতব্বর হয়েছে, 'গণদেবতা' থেকে তার উত্থান। দেখুড়িয়ায় চাষীগৃহস্থ এক সময়ে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল। আজও তারা পুরানো স্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। বালিয়াড়াও চাষী-প্রধান গ্রাম। আর আছে মুসলমান-চাষী-প্রধান কুসুমপুর। এখানকার মিঞারা ছিলেন এক সময়ে জমিদার। আজ জমিদারী নেই, তবে তাঁদের আচরণ সম্ভ্রম জাগায়। তবে এখন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হোল দৌলত শেখ। সে চামড়ার ব্যবসায়ী।

এই উপন্যাসের সব থেকে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হোল ইরসাদ, সে দেবু ঘোষের পাশে স্থান পেতে পারে।

রহম শেখকে জমিদার কাচারীতে ধরে নিয়ে গেছে, ইরসাদ গেল ছাড়াতে। গ্রাম-জীবনে এ এক নতুন অবস্থার উদ্ভব। যেটুকু বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হোল দেবু ঘোষের আগমনে। চাষীর সম্মান ও অধিকার রক্ষার প্রশ্নে হিন্দু মুসলমানের যৌথ আন্দোলন বাঙলার রাজনৈতিক গগনে এক নতুন ইশারা।

ধর্মঘটের জল্পনা-কল্পনা দিয়ে উপন্যাস শুরু। বন্যার প্রতিকারে লোকে সঙ্ঘবন্ধ হয়েছে। তারপর এসেছে কলেরা মহামারী। দেবু এর প্রতিরোধেও ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মানুষের সেবায় এগিয়ে এসে তার পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হোল, তার স্ত্রী ও শিশুপুত্র কলেরায় মারা পড়ল। লেখক দুঃখ দিয়ে বেদনা দিয়ে দেবু ঘোষকে গড়ে তুলছেন গ্রামজীবনের নেতা রূপে।

পদ্মবউ তার আশ্রয়ে ছিল, কিন্তু প্রশ্রয়ে নয়। তাই বন্যার মধ্যে সে গিয়ে দাঁড়াল শ্রীহরি পালের গৃহে। তারপর নিরুদ্দিষ্টা। দেবু ঘোষ ৩০-এর আন্দোলনে কারাদণ্ডিত হয়। মুক্তি পেয়ে যখন সে গাঁয়ে ফিরছে, তখন দৈবাৎ জংশন স্টেশনে পদ্মবউ এর সঙ্গে সাক্ষাত হোল। এক খৃস্টান ভদ্রলোককে সে বিবাহ করেছে, তার একটি সন্তান হয়েছে। পদ্মবউ তার জীবনে সার্থকতার সন্ধান পেল।

দেবু গৃহে ফিরে এল, সে গৃহ শূন্য। ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ মারা গেছে। এই শূন্য আসরে দেবু ঘোষ যাকে বাল্য বয়স থেকে লালন করেছে. সেই স্বর্ণ তরুণীর মূর্তি নিয়ে আজ হাজির হোল, এবং দেবু ঘোষের গ্রাম-সেবার কাজে যোগ দিল। হোল জীবনেরও সহযোগিনী, শুধু কর্মের নয়।

'পঞ্চগ্রাম' পাঁচটি গাঁয়ের গল্প। নানা মানুষের গল্প। নায়ক, নায়িকা নেই। তবু দেবু ঘোষ যেন নায়ক হয়ে উঠেছে—লেখক তার জীবনে ক্রমপরিণতি দেখাতে বড় ব্যস্ত। এই ব্যস্ততা নায়ক-ভিত্তিক উপন্যাস-লেখকদের সাধারণ ধর্ম।

দুর্গা একটি মুখ্য চরিত্র; পদ্মবউ-এর মত সংসার পেতে স্বামী-সন্তান নিয়ে যে সুখী হতে পারে নি। লেখক তার জন্য স্বপ্ন দেখবার অবকাশ রেখেছেন।

মনে মনেই সে কথাগুলি বলেছে। তার সেই কথা থেকে তার পরম ইচ্ছার খবর আমরা পেলাম।

'—আমার জন্যে একটি জন্মের জন্য তুমি এস।'

জাতপাতের বিচার তখন থাকবে কিনা, তারাশংকর তা বলেন নি। ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে এত বড় একটা বিষয়কে স্বপ্নে দেখাও একটি সাহসেব ব্যাপাব।

'পঞ্চগ্রাম' নায়ক হীন, নায়িকাও নেই। তবে তারা আভাসে আছে। তারাশংকরের পরবর্তী উপন্যাসে আবার নায়ক ফিরে আসবে, প্রতি-নায়কও আসবে। গল্পের বিষয় আরও মাটি-ছোঁয়া এবং জীবন-বিধৃত।

ময়ূরাক্ষীর তীরে দুটি উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা ঘোরাফেরা করল। নদীও একটি চরিত্র হয়েছে। ময়ূরাক্ষীর রূপ তারাশংকর বানান নি, তবে বর্ণনা করেছেন। তুলি ব্যবহার করলে এর থেকে সে সুন্দর হোত কিনা তা বলতে পারব না। তবে ময়ূরাক্ষীর নানা রূপই ত 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে' দেখলাম। চণ্ডীমণ্ডপ অংশ থেকে পঞ্চগ্রাম অংশে নদীর উপস্থিতি প্রখরতর। বন্যার পূর্বে এবং বন্যার পরে তার রূপের কী ভীষণ ভিন্নতা, তা তারাশংকর শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

পরবর্তী উপন্যাসের নাম নদী-লাঞ্ছিত। অথচ সেই উপন্যাস যে অধিকতর নদীমাতৃক ভূখণ্ডের গল্প বলছে, তা নয়। হাসুলী বাঁক শিল্পী তারাশংকর নিজের হাতে সৃজিত নদীর বাঁক নয়। এ বাঁকে অভিনব কোন বক্রতা নয়, একই রকম বাঁক পঞ্চগ্রামেও ছিল। কিন্তু তারাশংকর তেমন অবহিত ছিলেন না, এ সম্পর্কে ; অথচ এক বার উল্লেখ করেছেন ময়ূরাক্ষীর ঐ চলন ছন্দটি, বা রেখাটি।

হাসুলী বাঁকের ধারে কাহার পল্লী ও সদগোপচাষীদের বাসভূমি ; তাদেরই হাসিকান্না-ভরা দৈনন্দিন জীবনের গল্প শুনিয়েছেন লেখক। অথচ লেখক এমন গল্পকে উপকথা বললেন কেন? তিনি তবে বানানো গল্প বলছেন? হাসুলী বাঁকের মেজাজে কোন কল্পকথার স্পর্শ লাগে নি? 'কবি' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে বাস্তবের চাপ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; তারা যাতে উপকথার পড়শী হতে পারে।

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' শেষ করেলেখক ভালো রকমে প্রথানুগত উপন্যাস লিখতে বসেছেন। তাই নায়ক আছে, প্রতিনায়ক আছে। গল্পের কেন্দ্রীয় ঘটনাও আছে। আর চরিত্র গুলির বিকাশের স্তর ধরে কাহিনীও এগিয়েছে। পাখীকে গাঁ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়াটাই এই উপন্যাসের চরম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ঘটনা। করালী লাল ঝাণ্ডা উড়িয়েছে, এটা তত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, দুই-একটি সাকরেদ বা সমর্থক সংগ্রহ করেছে, এটাও তেমন তারিফ করার মত কাজ নয়। কিন্তু সে যখন গাঁয়ের মেয়েকে শহরে নিয়ে গেল, সে কাজটা কাহার জীবনে অত্যাশ্চর্য ঘটনা। কৌলিক আচার ভাঙ্গলো সে। হাসুলী বাঁকের উপকথা অচেনা এক মানবগোষ্ঠীর গল্প। অন্য উপন্যাসে তাদের কেউ কেউ প্রবেশ করেছে, নিচু জাতের লোক যেমন মাথা নিচু করে দাঁড়ায়, তেমন। সেখানে তারা পার্শ্ব চরিত্র। এখানে তারই উপন্যাস জুড়ে আছে। তারাই কেউ নায়ক, কেউ প্রতিনায়ক।

বনওয়ারী চরিত্রটি লেখকের একটি পূর্ণ বিকশিত চরিত্র। বনওয়ারী করালীর স্পর্ধাকে সহ্য করেনি, ব্যক্তিগত ঈর্ষার জন্য নয়, তার বিরোধ গাঁ ও জাতের কল্যাণ ভেবে। লেখক তাকে নানা মর্যাদার অধিকারী করেছেন—যে অংশ অকথিত ছিল, তা-ও কথিত হোল।

তার অন্তিম সময়ে সবাই এসেছে ; গোটা কাহার পাড়াকে নয়ন ভরে দেখে হাসতে হাসতে দেহ রেখেছে সে। শুধু দেখা হোল না করালীকে। ডাকাবুকো করালী এসে পৌঁছায় নি।

না, লেখক বনওয়ারীর সে সাধও অপূর্ণ রাখলেন না। দাহ হবার মুহূর্তে করালী এসে দাঁড়াল। সঙ্গে নিয়ে এসেছে পাকা শাল কাঠ আর ঘি। সেই কাঠে চিতা সাজিয়ে ঘি ঢেলে বনওয়ারীর দেহ চাপিয়ে দিল। অগ্নিসংযোগের পূর্বক্ষণে তার পায়ের পরশ নিল, বুক ভরে বলে উঠল, যাও, চলে যায় সগ্গে।

তারাশংকর এই উপন্যাসে কেন যেন বেশ ভাবালু হয়েছেন। তাই উপন্যাসের

প্রধান দুটি সংকট তেমন সুবিচার পেল না। বনওয়ারী-করালীর কলহ জড়োসড়ো হয়ে থাকল। গল্পের ভিতরে জমিয়ে বসল না। যদি প্রবেশাধিকার পেত, তবে পরস্পরকে বদলে দিত। দুই পরস্পর বিরোধী চরিত্র একে অপরকে পরিবর্তিত করে ; গোরা ও পানুবাবু শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। চরিত্র ও আখ্যান যে অন্য পরিণতি পেল, তাতে তাদের বিরোধের ভূমিকা আছে। 'দত্তা'য় বিজয়ার মনের জাগরণে বিলাসবিহারীরও একটা ভূমিকা আছে, শুধু মাইক্রোসকোপ-বিক্রয়েচ্ছু ভালো মানুষ নরেন্দ্রের নয়।

কাহার পল্লীর সঙ্গে চন্দন পুরের আড়া-আড়ির কথা লেখক বলেছিলেন। সেটা আভাষিত হোল, প্রকাশিত হোল না।

হাসুলী বাঁক যুগকে ধরতে সর্বতোভাবে মনোযোগী হয় নি। হাসুলী বাঁক তাই উপন্যাসের তালিকায় ব'সে উপকথার ধর্ম সাধিত করেছে।

[ছয়]

'রাধা' 'গন্নাবেগম' ও 'অরণ্যবহ্নি' ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট হিসাবে গণ্য করেছে। তাঁর 'অরণবহ্নি' ব্যতীত অপর দুইটি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। 'অরণ্যবহ্নি'র গল্পাংশ ইতিহাস সম্মত আর দুটি উপন্যাসে লেখক ইতিহাসের সম্মতির অপেক্ষা করেন নি। একটি কালখণ্ডে ইতিহাস বানিয়েছেন, অঠারো শতকের তৃতীয় দশক শেষ হতে চলেছে। তখন এই গল্প। রাধা' বাংলা দেশের আঠারো শতকী ইতিবৃত্তে মুর্শিদকুলী খাঁর নবাবী ধারার অনুসরণ। ইতিহাস পিছনে আছে, যারা সম্মুখে আছে, তারাশংকরের মৌলিক সৃষ্টি তারা। জাফর খা জামাতা সুজাউদ্দীনের তক্তে বসার দিন থেকে পলাশীর আম্রবাগানের প্রহসন পর্যন্ত ইতিহাস গুটিগুটি এই গল্পের পিছনে-পিছনে চলেছে।

অষ্টাদশ শতকে সব ধর্মমতের চেহারা পালটে গেছে—বৈষ্ণব শাক্ত শৈব মত—সব কাছাকাছি এসে গেছে, বাউল ও সহজিয়া মত সব ধর্মমতের পাঁজরভেদ করেছে। ধর্ম আর নৈষ্ঠিক কর্মকাণ্ড নেই।

অষ্টাদশ শতকে বিদেশী বণিক বীরভূমে রেশম ও লাক্ষা ব্যবসায়ী হিসাবে হাজির হয়েছে—পলাশীর অনুমতিপত্র পাবার পূর্বেই। রেশম ও লাক্ষা শিল্পে কোন কোন হাট ফেঁপে উঠে গঞ্জের চেহারা নিয়েছে। এমন এক গঞ্জ হোল ইলামবাজার।

সেই ইলামবাজার জয়দেব স্মৃতি-পূত কেঁদুলির পাশে. বৈষ্ণবদের আনাগোনার অঞ্চল।

এই বৈষ্ণবী সাধন-ভজনের ওয়াদা নিয়ে কৃষ্ণদাসী হাজির। কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী সাধিকা থেকে কবে দেহ-পসারিণী হয়েছে সেদিনটির কথা তার নিজেরই কি মনে আছে ? কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী সহজিয়া মতের তরলতর প্রতিনিধি। এত তরল বলেই সব পাত্রেই সমানভাবে ঠাঁই পায়।

তারই কন্যা মোহিনী ; তখনই কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে উঠেছে। তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের অকুণ্ঠতা কারও মনোযোগ আকর্ষণ না করুক, তার প্রস্ফুটিত দেহবল্লরী অনেকেরই নজর কেড়েছে। তখন কৃষ্ণদাসীর উৎকণ্ঠা হোল একে সামলে-নিয়ে, বেড়ানো এবং যোগ্য হাতে সঁপে দেওয়া। তাই রাত্রির আঁধার মাথায় করে সে কেঁদুলির অজয়ের বুকে একটা ডুব দিতে চলেছিল। পৌষ সংক্রান্তিতে নাকি মকর বাহিনী উজান বেয়ে কেঁদুলীর ঘাট পর্যন্ত আসেন। তখন অজয় স্নানে গঙ্গার স্নানের পুণ্য হয়। অষ্টাদশ শতকে সারা ইউরোপে বন্দিধর মুক্তি ঘটে গেছে। আর আমরা তখনও পুরানো শাস্ত্রাচারের অলীক বাক্যের চর্বিত চর্বণ করছি।

এই দিন কেঁদুলির ঘাটে এসে ভিড়লেন মাধবানন্দ, তিনিও বৈষ্ণব গুরু, কিন্তু বংশীধারী কৃষ্ণের উপাসক নন, অসিধারী কৃষ্ণ তাঁর উপাস্য।

কৃষ্ণদাসী মোহিনীকে তার শয্যার প্রভু রাধারমন সরকারের পুত্রের হাতে সঁপে দিতে রাজী নয়। এই মাধবানন্দ তাকে বুকে তুলে নিলে তার কোন আপশোষ থাকেনা। একদিন মোহিনী তার পায়ে মাথা ঠেকাল ; মাধবানন্দ পা সরাতে গিয়ে গুতো লেগে মোহিনীর ঠোঁট কেটে গেল। মাধবানন্দ রমনীর রমনীয় স্পর্শে বিচলিত হোল না। তারপর কত ঘটনা ঘটল, কত নাটক অভিনীত হোল। বর্গীরা দফায় দফায় এল। বাঙলার জনপদ শ্মশান হোল।

এত বৎসর পরে মোহিনী ফিরে এল ; সে তখন বাঁশরীওয়ালী প্যাবেজী, বৃন্দাবন থেকে এসেছে, তারাশংকর বহু গোলা-বারুদ খরচ করে দুইটি নরনারীকে পাশাপাশি শোয়াতে পারলেন। মাধবানন্দের দেহ তখন দলিত পিষ্ট মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। সেই মাংসের পিণ্ডের যদি কোন বুক থেকে থাকে, তবে তার ওপর পড়ে আছে মোহিনী তার নতুন পরিচয়ে। বাঁশরীওয়ালী রাধা আর অসিধারী কৃষ্ণের মিলন হয়ে গেল। তারাশংকর নতুন দেবালয় তৈরি করতে চেয়েছেন—অবশ্য বঙ্কিমের 'কৃষ্ণ চরিত্র' তার জগমোহন তৈরি করেছে।

অবক্ষয়ের যুগে নতুন পুরাণ রচনা প্রয়াসও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

'গন্নাবেগমে' পুরাণ তৈরির প্রয়াস নেই, তবে আছে লায়লা-মজনু, শিরীফরহাদ, লোর-চন্দ্রানীর গল্পের স্বাদ। সুফী অধ্যাত্মচিন্তার এক বিশৃঙ্খল উত্থাপন এই উপন্যাসে। মির্জা গালিব এই সময় গান গেয়েছেন ; তেমন স্পষ্টতা গন্নাবেগম দেহস্থ করতে পারে নি।

নাদির শাহ আহমদ শাহ আবদালী প্রভৃতি বিদেশী হামলাবাজেরা ভারতের ব্যাকরণহীন রাজনীতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। সেখানে আত্মরক্ষার অস্ত্র গজল বা ঠুংরি গীতিগুচ্ছ হয়, এ আত্মসমর্পণ ও পলায়ন-ইচ্ছু মনোভাবকে তোষণ করে মাত্র। খাস ইরান থেকে এসেছে আলী কুইলী খান ; সে বিপত্নীক। এখানে এসে পেল সুরাইয়াকে। তাদেরই কন্যা গন্না বেগম।

আদিল শাহ মুঘল বাদশাহী বংশের একজন। অন্ধ বলে সে রেহাই পেল এবং ফকির হতে পারল। পানিপথে সেও কয়েদ হয়, কিন্তু তল্লাস করে তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল কয়েকখানা তশবীর। তার মধ্যে এক খানা গন্নাবেগমের।

এই বিচিত্র ধ্বংসের চালচিত্রে তারাশংকর বলেই কিছু সুস্থতার কথা বলেছেন ; লুণ্ঠন-রাহাজানি আছে, কিন্তু তাই প্রধান হয়ে ওঠেনি।

রাধা ও গন্নাবেগম অন্ধকার যুগে আলোর জন্য উৎকণ্ঠিত ; লেখকের শত প্রয়াস সত্ত্বেও জ্বলন্ত আলো সামরিক ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে নিভে গেছে।

মধ্যযুগীয় ধর্মবুদ্ধি দিয়ে এই অন্ধকারের মোকাবিলা করা যায় না। ভোঁতা অস্ত্রে শত্রুর কেন, বন্ধুরও গলা কাটা যায় না। তৃতীয় উপন্যাস 'অরণ্যবহ্নি' একশত বৎসর পরবর্তী ইতিহাসেব দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৭৯০ সালে জঙ্গলমহলে চুয়াড় বিদ্রোহ হয়েছিল। সে জব্বর লড়াই। যিনি বিদ্রোহ দমন করে দেশীয় উচ্ছিষ্ট-ভোজীদের বাহবা পেয়েছিলেন, তাঁকেও বিদ্রোহীদের নিক্ষিপ্ত শরাঘতে তনু ত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই অগাস্ট ক্লীভল্যাণ্ডের মূর্তি স্থাপন করেছিল দিকুরা। এবার সাঁওতাল বিদ্রোহ ; সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র-পাঁচ সত বৎসর পূর্বে ঘটেছে।

তারাশংকরেব পূর্বপুরুষরা এই বিদ্রোহের সঙ্গে প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত জড়িয়ে ছিলেন। বীরভুম, ব কুড়া, রাজমহল ও স ওতাল পরগণার দুমকা, দেওঘর জুড়ে এই হাংগামা ছড়িয়ে পড়ে। বহু লোক সংগীত, লোকচিত্র বা পট এই ঘটনা নিয়ে রচিত বা চিত্রিত হয়েছে। সিধু কানু এই অঞ্চলেব জাতীয় বীবেব পর্যায়ে উঠে এসেছিলেন। তারাশংকর এমন এক চিত্রকরের সাক্ষাত পেয়েছেন, যিনি ছবি দেখান আর পাচালী বলেন। এই উপন্যাস এক ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা। লৌকিক রীতি।

ভুবন পালিনী যিনি ভিখারী ঘরণী তিনি
মহিষমর্দিনী জগমাতা—
অবধান অবধান—শোন তার কথা।

দেবী প্রণাম সেরে পাচালী শুরু হয়ে থাকে। এখানেও তাই হোল।

তারপর আমরা জানলাম দেনার দায়ে মানুষ, কি ভাবে হোল কেনা মুনিষ। এবং যারা মানুষ কিনত, তাদের নিবাস কোথায়, সে খবরও পাচালীকার দিয়েছেন—

কেনারাম এক নয় প্রতি গাঁয়ে গাঁয়ে রয়
জুড়ে সারা দেশময় ঐ এক হাল
বামুন কায়েত বদ্যি ধনে মানে যার বৃদ্ধি
সব এক কাল ॥

লোকসাহিত্যের উত্তরাধিকার নিয়ে তারাশংকর ভদ্র সাহিত্য রচনায় উদ্যোগ নিয়েছেন। লোক-বিশ্বাস ও লোক আচার-অনুষ্ঠান কত অনায়াসে ব্যবহৃত হয়েছে। এক ধর্মনিষ্ঠ বিধবার চরম লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পর্দা উঠেছে। তিনিই চারণীর ভূমিকা নিয়েছেন। জঙ্গল-দুনিয়ার ঘুম ও জড়তা বিনাশ করেছেন।

দুর্গতি সর্বত্র, শুধু জাগ্রত মানুষ ছিল না। এমন সময় সিধু কানু নেতৃত্ব দিলেন। কিন্তু তেমন প্রস্তুতি ছিলনা। আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত শত্রুর মোকাবিলা করার মত আয়োজন ছিল না। শুধু ঘৃণা বা স্পর্ধা দিয়ে ত যুদ্ধ জয় করা যায় না। রণক্ষেত্রে কানু শহীদ হলেন; সিধু ধরা পড়ল। তাঁর ফাঁসি হোল। অরণ্যচারীরা সিধুকে আজও দেখতে পায়। কারণ "সিধু আজও মুক্তি পাননি, ইতিহাস ওকে মুক্তি দেয়নি। আজও তিনি বুকে হাত দিয়ে ছায়ায় মিশে সেই ফাঁসি-যাওয়া মহুয়া গাছটায় ঠেস দিয়ে ভাবেন।"

সাঁওতালদের ধ্রুব বিশ্বাস 'শুভোবাবু'র মৃত্যু নেই, তাঁর মৃত্যু হয় না।

গন্নাবেগম বা বাধা লিখতে যত আয়াস স্বীকার করেছিলেন, এখানে তেমন শ্রমের চিহ্ন নেই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'র মত এটি কিশোর-ভজানো উপন্যাস হয়ে রইল। অরণ্যের বহ্নি হঠাৎ জ্বলে, হঠাৎ নিভে গেল। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' আরও উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে লেখা।

[সাত]

উপন্যাস যাতে 'ক্লাসিকল'-ধর্মিতা পায়, তার জন্য তৎপর ছিলেন। 'ধাত্রীদেবতা,' 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'—সবই বহির্জীবনের গল্প। দেশ ও জাতির জীবন-ইতিহাস বিশেষ কাল-পর্বে কি তাৎপর্য গ্রহণ করে, সে গল্প তিনি ক্লান্তিহীন ভাবে বলেছেন। রজনীকান্ত সেনের লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাইরের কথা অনেক হোল, এবার ভিতরের কথা বলুন। তারাশংকরকে এমন নির্দেশ কেউ দেন নি। তিনি নিজেই পথ বদলালেন। 'সপ্তপদী' ও 'আরোগ্য নিকেতন' তাঁর দুটি ব্যক্তিকেন্দ্রধর্মী উপন্যাস। রিনা ব্রাউন আর কালাচাঁদ সহস্র পদ চললেও তাদের সপ্তপদ গমন হোল না। ভালোবাসার অর্থ যে কেবল প্রেম, তা কে বলেছে? আকর্ষণ শুধু অনুরাগে প্রকাশ পায় না, বিতৃষ্ণাতেও প্রকাশ পেতে পারে। পরম ঘৃণা পরম প্রেমের ছদ্মরূপও হয়।

'আরোগ্য নিকেতন' একটা ঔষধালয়ের নাম। কিন্তু ঐ বইয়ে জীবনের কথা যেমন, মরণের কথাও তেমনি। কোনটির পাল্লা ভারী, পাঠককে তা বুঝে নিতে হবে।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রজীবনে খেলাধুলো ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একটি প্রেম জন্মাল বা জাগল। কালাচাঁদের অনুরাগ শ্বেতাঙ্গিনী রিনা প্রত্যাখ্যান করল। আর এমন ঘটনা ত ঘটতেই পারে। এটা উপন্যাসের গল্প নয়। অকস্মাৎ রিনার সঙ্গে কালাচাঁদের সাক্ষাত হোল মত্ত অবস্থায়; তখন যুদ্ধের চাকরী সে নিয়েছে—চাকরী হোল আসলে সৈনিক মনোরঞ্জন। আর নিজেকে অপব্যয় করা। কৃষ্ণস্বামী রিনার এই দুঃসহ রূপ দেখে ঘৃণা করেনি। সমবেদনা জানিয়েছে, ঈশ্বরের কাছে তার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে। রিনার অপমান ও ঘৃণাকে সে ফিরিয়ে

দিল, করুণা ও প্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করে। তার এই ভূমিকা রিনাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। সে দ্বিগুণ ঘৃণায় কৃষ্ণস্বামীকে লাঞ্ছিত করেছে, আবার নিরুদ্দিষ্টা হয়েছে। উপন্যাসের তৃতীয় অংশে সে আর একবার কৃষ্ণস্বামীর সান্নিধ্যে আসবে। তার বিয়ে-করা পতি পরমগুরুকে নিয়ে আসবে। কুষ্ঠ আশ্রমের সেবক কৃষ্ণস্বামী নিজেই তখন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত। রিনা কোথায় গিয়ে থামবে, লেখক তা বলে দেন নি; তার পদচারণার কখন হবে বিরাম? কৃষ্ণস্বামীর জীবনে বিনার প্রয়োজন ছিল। প্রেম শুধু প্রাপ্তিতে নেই, বঞ্চনাতেও আছে। আছে লোভে, প্রতারণায়, ভর্ৎসনায়, দংশনে ও দহনে। শত বিরোধী অনুভবে প্রেম ফুটে ওঠে।

স্বভাবতই অনুরূপা দেবীর একদা বহু-পঠিত উপন্যাস 'মন্ত্রশক্তি'র পাশে বসিয়ে সপ্তপদী পড়তে ইচ্ছা করে। সময় হোল হরিণীর মত ত্বরিতগামিনী, এবং তরঙ্গেতে "ঘুর নদীসঅ"। সময় চলে কখনও সামনে, কখনও পিছনে। কৃষ্ণস্বামী যেকালে জন্মেছে ও পৃথিবীতে যে অঞ্চলে চলাফেরা করছে, তখনই আর এক কবি লিখেছিলেন, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাটিতেছি পৃথিবীর পথে।' কৃষ্ণস্বামীর সমস্যা ত মাত্র সপ্তপদ গমন।

আরোগ্য নিকেতন—এ গল্পের টান এত তীব্র বিরোধের ভিতর দিয়ে চলে নি 'সপ্তপদী'র নামকরণে বর্ণনাত্মক ভঙ্গি গ্রহণ করেন নি; 'আরোগ্য নিকেতন' নামকরণেও স্বতন্ত্র রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে ইঙ্গিতময়তা এসেছে। ভিতরের কথা বলেছেন। তাই ঔষধালয়ের নাম তো 'আরোগ্য নিকেতন' হতে-ই পারে, কিন্তু লেখক সহজ সুরে সহজ কথা বললেন না। এই গল্পের নায়িকা আতর বউ রিনা ব্রাউনের মত প্রখরা নয়। রিনা যে দীপ্তিময়ী, তার কারণ তার গাত্র বর্ণ নয়, তার এ্যাংলো-মুণ্ডা-রক্ত সংমিশ্রণও নয়। সে দীপ্তিময়ী; কারণ তার মধ্যে আছে অতলস্পর্শী জীবনতৃষা।

আতর-বউ-এর গায়ের রঙ রিনা ব্রাউনের গাত্রবর্ণ থেকেও গৌর। কিন্তু সে বেঁচে থেকেছে জীবন দত্ত মশাই-এর ছোট্ট গৃহাঙ্গ-টুকুতে। জীবন মশাই সবাইকে তাঁর কাঁদীর জীবন-বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। সবাই যখন শুনেছে, তখন আতর বউ শুনে থাকবে। আতর বউ নিতান্ত অন্তঃপুরচারিকা।

গতিবিধির অঞ্চল ক্ষুদ্র বলে তার নায়িকা সৌভাগ্য থেকে কেউ কেউ তাকে বঞ্চিত করেছেন।

'এই নিগূঢ় অন্তর্লোক বিহারী উপন্যাসের নায়ক জীবন মশায় ও নায়িকা পিঙ্গল কেশিনী, মানব জীবনের রন্ধ্র সঞ্চারিনী, প্রাণের গভীরে রহস্যকেন্দ্রে বীজরূপে অধিষ্ঠিতা মৃত্যুদেবী।"

(বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—৫৭৩)

আতর বউ-এর প্রতি এমন অবিচার আর কি হতে পারে? উপন্যাসের প্রথম পর্বে মুখ্য নারী হোল মঞ্জরী। সে ছাত্রজীবন দত্তকে প্রলুব্ধ করে। প্রতারিত

করে। সে যে গোপী বসুকে বিবাহ করেছে, এটা অভিনব কিছু নয়, অজস্র এমন ঘটে। গোপী বসুর মত কাপ্তেন জাতীয় পুরুষ, আর মঞ্জরীর মত প্রেম বিলাসিনীর পাশে আতর-বউকে বসানো হয়েছে। বিনা মতলবে কি এই কাজ করেছেন লেখক ?

পুরোনো অচরিতার্থ প্রেমের হলাহল বুকে বয়ে বেড়ায় এবং অভিভাবক-নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করে, এমন পুরুষ বিবাহিত স্ত্রীকে কতটুকু দিতে পারে ? এই ছলনা আতর-বউ বুঝেছে, এবং দীর্ঘকাল বহন করেছে। জীবন মশাই-এর ডাক্তারী পড়া হোলনা, তাতে তার জীবনে তেমন কিছু উনিশ-বিশ হয় নি। জীবন মশাই চিকিৎসাকে জীবিকার অধিক হিসাবে গ্রহণ করলেন।

আরোগ্য নিকেতনে প্লট-গঠনে লেখক সময়ের ক্রম অনুসরণ করছেন না। এটা তাঁর নতুন রীতি।

পিছনের গল্প জীবন মশাই পিছন ফিরে বলেন না ; পরিবারে সমাজে বাস করেও তিনি একা। তার মধ্যে এই একাকীত্ব বোধ অনেকটা alienation-এর পর্যায়ে পড়ে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তখন কার্যকরী হচ্ছে। জীবন মশাইদের আশপাশের জনবসতির চেহারা পাল্‌টে যাচ্ছে। এই পাল্টানোর ইতিহাসে তিনি অংশ নেন না। সরে থাকেন। তবে প্রদ্যোৎ ডাক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বকে সমীহ করে না বলে তিনি সরে থাকেন না।

জীবন মশাই-এর একাকীত্ব জীবন মশাই-এর অর্জন, সামাজিক দান নয়। কাঁদীর জীবন তাঁকে সহজ হতে দেয় নি। তাই উপন্যাসে মঞ্জরীর উপাখ্যানের খোঁজ বারবার নেওয়া হোল। আতর বউ নিগৃহীত নারী নয়, তবে অভাবী মেয়ে। ফুলশয্যার রাত্রি কেটেছিল একটি প্রচ্ছন্ন উদাসীনতার মধ্যে। জীবন দত্ত কিন্তু হেসেছিল, ঠাকুমা- বউদিদিদের পরিহাস রঙ্গরসেও যোগ দিয়েছিল। সে সব পুতুল খেলা, লোক-দেখানো। আজ এই প্রবীণ বয়সে মনে পড়ছে শোধ নেওয়ার আনন্দ কেমন যেন নেভানো-প্রদীপের মতো কালো হয়ে গিয়েছিল। গোপন একটি বেদনা তাকে যেন অভিভূত করতে চেয়েছিল।

বিবাহ করেছিলেন তিনি অপমানের প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু বিবাহ করে বুঝলেন, অপমানের শোধ নেওয়া হয়নি, শুধু বিবাহ করাই হয়েছে।

ফুলশয্যায় রাতে জীবন বধূকে আকর্ষণ করেছিল—বুকের কাছে বধূটি তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল।

— আঃ ছাড়ো।

—কেন, কী—হল ?

—কী হবে ভালো লাগে না।

—ভালো লাগে না ?

—না, ছেড়ে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। ছেড়ে দাও।

—কী হল ?

—কী হবে ? আমাকে দয়া করে বিয়ে করেছ, উদ্ধার করেছ। আতর বউ আজ আগ্নেয়গিরি ; অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হলে থামে না।

*　　　　*　　　　*

আর একটি ছবি।

উনি গিয়ে কী করবেন বাবা ? পাশ করা ডাক্তার ও নয়, আজ গেলে তোমাদের নতুন ডাক্তার যদি বলে হাত ধরব না, দেখব না। মধুর অথচ তীক্ষ্নকণ্ঠে কথাগুলি বলতে বলতেই বেরিয়ে এলেন আতর বউ। তার ওপর তোমার জামাই হোল ফ্যাশানে লেখাপড়া জানা ছেলে।

—চুপ কর আতর বউ ছিঃ। চলো আমি যাই অহীন।

চুপ কর, ছিঃ—আতর-বউ বিস্মিত হয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে।

—হ্যাঁ, চুপ করবে বই কি।

*　　　　*　　　　*

মশায়ের মনের মধ্যে ঘুরছিল সেই পিঙ্গল বন্যা কন্যার কথা. পিঙ্গল বর্ণা, পিঙ্গল কেশিনী, পিঙ্গলা চক্ষু কোষেয় বাসিনী ; সর্বাঙ্গে পদ্মবীজের ভূষণ। অন্ধ বধিব।

*　　　　*　　　　*

সেই মুহূর্তেই আতর-বউ মশায়ের মুখখানি ধরে বললেন, ধ্যান সাঙ্গ হোল ? মাধবের চরণাশ্রয়ে শান্তি পেলে ? আমি ? আমাকে ? আমাকে সঙ্গে নাও।

আতর-বউয়ের আত্মসমর্পণে কেবল একটি নারীর আত্ম-উৎগতি বুঝিয়েছে, বলা যাবে না। এমন পূর্ণ বিকশিত নারীচরিত্র তারাশংকরের গোটা সাহিত্য আর নেই। এত কম কথা বলেছেন, এবং এত সম্পূর্ণ হয়েছেন।

এতটা জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে আর কোন্ নারী বিচরণ করেছে ? গৌরী, উমা, দুর্গা, পদ্মবউ বা মোহিনী ? না, তারা আতর বউ-এর জীবন-নাটকের কোন কোন অঙ্কে দাঁড়িয়ে থেকেছে। পাঁচটি অঙ্কে তারা নেই। একমাত্র কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েছে রিনা ব্রাউন। এবং জীবন মশাইও কৃষ্ণস্বামীর জীবনের আধখানা কেবল কবুল করেছেন। কুষ্ঠব্যাধি ভোগই তার জীবনের চরম দণ্ড নয়। মুণ্ডা রমনী ও শ্বেতকার পিতার সন্তান রিণা।

পিঙ্গল কেশিনী পিঙ্গল চক্ষু, পিঙ্গল বর্ণা এই রমনী কি তবে মৃত্যু স্বরূপা ? কালাচাঁদ মৃত্যুকে কি এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে ? রিনাও বহুকাল বধির ছিল। জন্ম বধির নয়। রিনা মৃত্যুস্বরূপা অংশত, জীবন মশাই-এর আতর বউ তাঁর মৃত্যু চিন্তার কোন অংশই আত্মস্থ করেনি। আতর বউ জীবনের সৌগন্ধ্যে ভরা। সে সার্থক নামা। জীবন মশাই-এর একাকীত্বই তাঁর মৃত্যু ভাবনার হেতু। যতবার নিদান

হে'কেছেন ততবার জীবনের জয় ঘোষণা করেছেন। মৃত্যুর সময় আতর বউ বলেছিলেন, মাধবের চরণাশ্রয়ে শান্তি। এতো মৃত্যুর প্রতিবাদ।

তারাশংকর জীবনকে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখেছেন, মৃত্যুকেও প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন : 'ক্লনিকল'-উপন্যাসের সীমান্ত পার হয়ে তিনি এখানে এলেন।

[আট]

তারাশংকর জীবন-বীক্ষার শেষ পর্বে এসে পে'ীছেছেন। তবে শিল্পী ত থামতে চান না।

কীর্তিহাটের মত সুবিপুল গ্রন্থ সত্তর বছর বয়স অতিক্রম করে লিখতে বসলেন। তাঁর যেমন প্রবীন বয়স, উপন্যাসের কালসীমাও তদধিক দীর্ঘতর। প্রায় দুইশত বৎসরের বাঙালী জমিদারশ্রেণীর ইতিহাস তিনি ধরতে চেয়েছেন। বিদেশী সাহিত্যে এমন উদাহরণ বিরল ; তাঁরা দু-এক পুরুষের গল্প বলেছেন, পাঁচ-ছয় পুরুষের গল্প নয়।

আখ্যান-অংশ যাত্রা শুরু করেছে ওয়ারেন হেস্টিংসের পালকীর পিছন-পিছন, আর থেমেছে বিধানচন্দ্র রায়ের ফোর্ড গাড়ির পিছনে। এত বড় গ্রন্থ এত দীর্ঘকালের বিবরণ শুরু করার মধ্যে সাহসিকতা আছে ; সব দুঃসাহসিকতা সব সময় কলম্বাসের সাফল্য আনে না।

এই উপন্যাসে এত গল্প আছে, যার যে কোন একটিকে নিয়ে একখানা সুসংবদ্ধ উপন্যাস লেখা সম্ভব ছিল। কিন্তু সব ইচ্ছাকে একটি কক্ষে আটক করে কোন ইচ্ছাই ফুটতে পারল না। আর এই রকম বহু প্রবণতার বইকে কতবার লেখকের ঘষামাজার প্রয়োজন ছিল? 'ওয়ার এণ্ড পীসে'র লেখক তাঁর বৃহৎ গ্রন্থকে সাতবার সংশোধন করেছেন, আর তাঁর স্ত্রী সাতবার সেই গ্রন্থ 'কপি' করেছেন।

তারাশংকরের সর্বশেষ গল্পটি সুরেশ্বর আর কুইনীকে নিয়ে। কুইনী একটি গোয়ানীজ খৃস্টান মেয়ে। সুরেশ্বর একটু-একটু করে কুইনির দিকে এগিয়েছে। তারাশংকর সে বিবরণ মমতার সঙ্গে দিয়েছেন। রিনা ব্রাউনের মত দীপ্তিময়ী সে নয়, সে শান্ত ভদ্র ও বিবেচক। সুরেশ্বর তার দেহ দেখে আকৃষ্ট হোল, না তার মনের শ্রী দেখে বিমুগ্ধ হোল, লেখক তা স্পষ্ট করে বলেন নি। নরনারীর ভাব-ভালোবাসায় দেহের সীমানা অলক্ষে মনের ভূগোলে পে'ীছে যায়। তার হিসাব করা কঠিন নয়।

খৃস্টান মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে বাধা নেই, বিবাহও হোল চার্চে গিয়ে। তারপর তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হোল, শুদ্ধিকরণের পর তার নাম পর্যন্ত বদলে গেল। নাম হোল সাবিত্রী রায়।

'গোরা' উপন্যাসে বিনয় ও ললিতার বিবাহ হোল, কেউ কারো ধর্মমত থেকে সরে না এসে। ধর্মপত্নী হৃদয়ের ধর্ম মেনেই নিজের পরিচয় দেবে।

শরৎচন্দ্র 'দত্তা' উপন্যাসে বিজয়া ও নরেন্দ্রের বিবাহ দেন হিন্দুধর্মমতে। রাস-বিহারীর মানুষটা কেমন এ তর্ক অনাবশ্যক, কিন্তু বিজয়ার হিন্দুমতে বিবাহ দেওয়ার

যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিল, তাতে দয়াল বলেছিলেন সব বিবাহ-ই এক। ঐ প্রশ্নের এটা কোন জবাব হোল না। তারাশংকর শুদ্ধিকরণ পছন্দ করতেন বলে শুনিনি; কিন্তু কার্যত তাঁর পথ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পথে গিয়ে মিশে গেল।

ব্রাহ্মণ তারাশংকর তাঁর ব্রাহ্মণত্বের গর্ব ছাড়তে পারেননি, মানবধর্ম কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকেও বড়ো।

অথচ তারাশংকর এই রকম মতে খুবই নিষ্ঠাপূর্ণ, তা মনে হয় নয়। মঞ্জরী অপেরা'য় গোরাবাবু অনেক ওঠানামা করে শেষ পর্যন্ত প্রোপ্রাইট্রেসের গৃহে এসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। লেখক এখানে ব্রাহ্মণত্বের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিষয়টাকে দেখেন নি।

গোরাবাবু মঞ্জরীর পরম আনুগত্যকে বিদ্রূপ করেছেন, শুধু এই কারণে মঞ্জরী যদি তার শেষ কৃত্য না করত, তাহলে এই উপন্যাস এত বড়ো জায়গায় গিয়ে পেঁছাতে পারত না। গোরাবাবুর বিবাহিত স্ত্রী তখনও বেঁচে আছে, তাকে খবর দেওয়া হোল। শেষ কাজ করার অধিকার তার। মঞ্জরী সরে দাঁড়াল ও অনুষ্ঠানে তার স্থান থাকল না। কিন্তু তার স্থান কে কেড়ে নেবে?

[নয়]

তারাশংকর অজস্র মানুষ তৈরি করেছেন। সাহিত্য জীবনের সূচনা থেকেই তাঁর সৃষ্টির অজস্রতা আমাদের বিস্মিত করে।

পিসীমা, জ্যোতির্ময়ী, গৌরী, দুর্গা মুচিনী, পদ্মবউ, রিনা ব্রাউন, আতর-বউ, মঞ্জরী কত জন কত বিচিত্র পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে। এই নারী বাহিনীর পাশাপাশি এক পুরুষ বাহিনী চলেছে—চন্দ্রনাথ, শিবনাথ, মহীন্দ্র, দেবু ঘোষ, ন্যায়রত্ন, ইরসাদ, অনিরুদ্ধ কামার, কৃষ্ণেন্দু, মোহনানন্দ, জীবন মশাই। এরা জাত-পাতের কথা ভুলে এক পংক্তিভোজনে বসেছে। নিষ্ঠার অপর নাম তারাশংকর। যত মাটি আজীবন তিনি ছেনেছেন, তা স্তূপীকৃত করলে মাটির পাহাড় হয়ে যেত। পাহাড় তিনি করেন নি। মাটি ছেনে অজস্র পুতুল তিনি তৈরি করেছেন। শিল্পীর হাতের পুতুলই শিশুর কাছে খেলনা, ভক্তের চোখে প্রতিমা, পাঠকের কাছে শিল্পময় উপঢৌকন। আমরা তাঁর সাধনার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি, এমন দু'হাতে মাটি ছেনতে, মাটি চটকাতে আমরা কুমোরকেও দেখি না। বসুন্ধরার শিল্পী।

এত পুতুল এ যুগে আর আমরা পাইনি। লোক সংস্কৃতি মানব-সংস্কৃতির ধারা কত বিচিত্র গতিতে না এগিয়ে চলে। ময়ূরাক্ষী, অজয় প্রভৃতি নদীর নিয়ত সঞ্চরণশীলতা থেকে তার অভিনবতা কম নয়। তারাশংকর রাঢ়ের আদিম প্রকৃতির আধুনিক প্রতিভূ। মৃত্যুহীন কলাকার।

শিবচন্দ্র লাহিড়ী

জীবনানন্দ দাশ : সময় চেতনা ও অধিবাস্তবতা

জীবনানন্দ দাশের সাতখানি উপন্যাস নিয়ে আমাদের এ আলোচনা। আলাদা কালের দুটি ঝোঁকে উপন্যাসগুলি লেখা। ১৯৩৩-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে তিনখানি উপন্যাস—'কারুবাসনা', 'জীবনপ্রণালী', 'প্রেতিনীর রূপকথা'। ১৯৪৮-এ চারখানি—'মাল্যবান সুতীর্থ', 'জলপাইহাটি', 'বাগমতীর উপাখ্যান'। এ ছাড়াও তাঁর উপন্যাস আছে, আরো থাকা সম্ভব. হয়ত ইতিমধ্যেই আরো এক-আধটি প্রকাশিত হয়েছে, অথবা হতে চলেছে। আমাদের হাতে এসেছে, অনেক চেষ্টায়, ওই সাতখানি মাত্র। এর মধ্যে একটি বই, প্রেতিনীর রূপকথা', শারদীয় 'প্রতিক্ষণ' (১৩৯০) পত্রিকায় প্রকাশিত। অন্যটি 'জলপাইহাটি', ১৯৮১-৮২তে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় সতেরো কিস্তিতে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, পরে 'গ্রন্থাকারে' প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ দ্রুতই লিখতেন বলা যায়, তাঁর খাতা-পাণ্ডুলিপি এ কথার প্রমাণ। ১৯৩৩-এ আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দুমাসে তিনখানা মাঝারি আয়তনের এবং ১৯৪৮-এ মোটামুটি বড়ো চারখানা উপন্যাস লিখে শেষ করেছিলেন তিনি। তার লেখা কিছু বড় গল্প, গল্পও আছে। এ আলোচনায় সেগুলি ধরিনি।

জীবনানন্দের উপন্যাস পড়ে গল্পখোর পাঠকের কোনো তৃপ্তি নেই। তাঁর এসব লেখায় সেই অর্থে কোনো গল্পই নেই। প্রথাবদ্ধ গল্পে ঘটনায় যে আঁট বেঁধে থাকা, কিংবা পরের সঙ্গে নিজের অথবা নিজের সঙ্গে নিজের জটিল সংঘাতে উপন্যাসের 'প্লট' ব্যাপারটির ইমারতী নিয়মে যে গড়ে ওঠা, এখানে তার ছিটে ফোঁটাও নেই। মানুষে মানুষে সম্পর্কের স্বার্থের সুবিধের টানে বিসংবাদ কিংবা সখ্যের দৃশ্যস্থলগুলিতেও আঁটোসাঁটো ঐহিক সিদ্ধির কোনো তাগিদ নেই। যন্ত্রণা আছে যে মানুষের, বোঝা যাচ্ছে, সেও যেন অপরের থেকে কোনো অলৌকিক কারণে আলগা। উদাস নয়, যেন অন্যমনস্ক। দুভাগ অথবা বহুভাগ ব্যক্তিত্বের টানাপোড়েনে দিশে-না-পাওয়া মানুষও যেন নয়। সৃষ্টি ও 'সময়'-রহস্যে বিভোর হয়ে গেলে মানুষের অস্তিত্বের আবিষ্ট ভূমিকা হঠাৎই খুলে যায়। সেই ভূমিকা থেকে দেখতে পাওয়া যায়, অস্মিতায় নিগৃহীত ঐ একই মানুষের করুণ সংসারী ছবি। কেবল তখনই জীবনের অন্তর্মগ্ন সংঘাতের পরিচয় পাওয়া যাবে জীবনানন্দের উপন্যাসে।

সাধারণ উপন্যাসের ঘটনায় নিহিত থাকে পরের ঘটনার বীজ। জীবনানন্দের উপন্যাসে তা নেই। তাঁর উপন্যাস ছবি. ছবির পর ছবি, প্রত্যেকটা ফ্রেম দিয়ে বাঁধা, অথচ পাশাপাশি সারি দিয়ে বসানো। একটার সঙ্গে পাশেরটার রূপের সংলগ্নতা আছে, আবার স্বাতন্ত্র্যও আছে। কোথাও বা পাশাপাশি বসানো কয়েকটা ছবির ঢিলেঢালা ফ্রেম, একের থেকে অন্যের বিষয়বস্তুর খানিক মাখামাখি সেখানে। ধরা যাক

লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির 'দা লাস্ট্ সাপার্' বিখ্যাত ছবিটা। শেষ ভোজনে যীশু তাঁর বারোজন শিষ্য নিয়ে একটা লম্বা টেবিলে বসে আছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে'। আমরা জানি, সে বিশ্বাসঘাতক জুডস্ ইস্ক্যারিয়ট্। এই তীক্ষ্ম মুহূর্ত কল্পনা করে ছবিটা আঁকা। সন্দেহ, বেদনা, বিবেকদংশন, ভয়, আতংকের নানা মনোভাবের, নানা চাউনির বিচিত্র ভঙ্গির এক আশ্চর্য প্রকাশ এ ছবিতে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে আঁকা শিল্পীর এই ছবিটাকে সাব্জেক্ট্ করে উনিশ-বিশ শতকের ইম্প্রেসনিস্ট্ স্কুলের ক্লোদ মোনে নিজের নিয়মে আবার তা আঁকতে বসলেন। আমরা শুধু কল্পনা করছি। এক ঝলকে দেখা চোখের ছাপ ধরে মুখ্যত নানা ছায়ার আলোর রঙ-ফেরাফেরি আঁকতে বসে মোনে, প্রথম সূর্যের আলো থেকে শেষ সূর্যের আলো দুলিয়ে, যে একই ছবি একাধিকবার আঁকবেন, তাদের পাঠোদ্ধারের পদ্ধতি হবে ছায়ার আলোর মাত্রাগুলো অনুভব করতে করতে সাব্জেক্টের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা। জীবনানন্দের উপন্যাস পাঠের ব্যাপার অনেকটা এই রকম। এ সব উপন্যাসে অনেক মানুষ আছে, এদের ভূমিকার মুখ্য-গৌণত্বও, তবু এদের স্থান-কালবদ্ধ অবস্থান, আচরণ, মনোভাব এ সব কাহিনীতে কোনো সংসারের কথাকে জোরালো করে নি। তার বদলে পরিবেশ-পট থেকে কোন্ আলো কোন্ ছায়া এসে একটা জনপদের গোটা জীবন যাপন আলাদা আলাদা আভায় রাঙিয়ে তুলছে, তারই উৎসুক পর্যবেক্ষণের সুযোগ এখানে বেশি উন্মুক্ত। উপন্যাস রচনায় জীবনানন্দ যতটা স্থপিত তার চেয়ে অনেক বেশি চিত্রী।

আমাদের সাহিত্যশিল্পে এই আধুনিকতার যে লক্ষণ জেগেছিল চলতি শতাব্দের কুড়ির দশকের শেষদিক বরাবর, তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে, মুক্ত হাওয়ার শিল্পী সংঘের উদ্যোগে ১৮৭৪ এর চিত্রকলা প্রদর্শনীতে। ইম্প্রেসনিস্ট্ এবং পোস্ট্-ইম্প্রেসনিস্ট্ পদ্ধতিতে ছবি আঁকার জয়যাত্রা সেই সময় থেকে। এঁদের নেতা ক্লোদ্ মোনে! তার সমসাময়িক শিল্পী দেগা, মানে, রেনোয়ার্, সিস্লি, পল্‌সেজান্, আঁরি মাতিস্। প্রকৃতির দৃশ্যকে বিষয়বস্তু করে আলোর খেলা আঁকার শিল্পী তাঁরা। প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ আর গড়ন বর্জন করে তার জ্যামিতিক রূপ আর গড়নের ছবি আঁকতে বসে সেজান্ তাঁর দৃশ্যের ভেতর অসংখ্য স্তর বা প্লেন সৃষ্টি করলেন। দৈর্ঘ্য প্রস্থের ওপরে গভীরতার আর এক নতুন মাত্রা যোগ করতে প্রাণপাত করলেন। তাঁর হাতেই পোস্ট্-ইম্প্রেসনের ছবি খুলল। শিশুর স্বাধীন অবোধ মনে ছবি আঁকার ব্রত নিয়েছিলেন আঁরি মাতিস্। চোখে দেখার আকৃতি আঁকা নয়, কিংবা চোখে যা দেখছেন তা-ও আঁকা নয়, তাঁর ছবি এককথায় Coloured shapes, রঙিন আকার। এর পর সেকালের ছবির অসংখ্য জ্যামিতিক সমতল বা স্তরের পরীক্ষা নিয়ে পাবলো পিকাসো-র কাজের সুরু। মানুষের মাথা আঁকতে গিয়ে তার নাকটা বদ্‌লে করলেন প্রিজম্, চোখদুটোকে ত্রিকোণ। গাল দুটো হল দুটি রঙের তাল, তাতে ছোট ছোট অনেক সমতল। মানুষের মাথা বলে কোনো

মতে চেনা গেলেও আসলে সেটা হল নানা জ্যামিতিক আকারের সমন্বয়। আরো অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল ছবিটাতে, যখন মাথাটা কয়েকটা সেক্‌শনে ফালি-ফালি করে চিরে ফেলে ভাগগুলো উল্টে-পাল্টে বসালেন। এখানে একটা চোখ, সেখানে নাক, ছবির কোথায় কোণ্ ঘেঁসে মুখ, আর রইল কেবল কতগুলি স্তর আর রঙের টুকরো। সেকালের চিত্ররীতির জড় ধরে পিকাসোর হাত দিয়ে কিউব বা ঘনকের গড়নে এল কিউবিজ্‌ম্। এর থেকেই অ্যাবস্ট্রাক্‌ট্ আর্টের সূত্রপাত। আবার এই রীতির সূত্রেই সুর্‌রিয়ালিজ্‌মের আবির্ভাব। সুর্‌রিয়ালিজ্‌মের প্রবর্তক সুইস্ চিত্রশিল্পী পল্ ক্লে (১৮৭৯-১৯৪০)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চিত্রে অবচেতন মনের ছবি তুলে ধরা। এই সময়েই ফ্রয়েড, ইউঙ, অ্যাড্‌লারের যুগান্তকারী আবিষ্কার। তখন থেকেই চিত্রকরদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হল, স্বপ্নে আর দুঃস্বপ্নে দেখা ঘুমের ছবি ক্যান্‌ভাসে ফুটিয়ে তোলা।

জীবনানন্দের উপন্যাস প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের আন্দোলন আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা ছবির জগতের এই ইম্‌প্রেশনিস্ট্ এবং পরবর্তী রীতিপদ্ধতি ক্রমে সাহিত্যভাবকদের আকৃষ্ট করেছিল। কবিতায় এবং কথাসাহিত্যে তার দ্রুত সংক্রমণ। মার্শেল প্রুস্ত, জেম্‌স্ জয়েস্, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্-এর উপন্যাস তার বড়ো দৃষ্টান্ত। বাংলা কথাসাহিত্যে শুধু জীবনানন্দ নয়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ সাহিত্যিক মনন কল্পনা প্রকাশের এক এক পথ দিয়ে নতুন সৃজনকর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯২১-এ লেখা 'The Metaphysical Poets' প্রবন্ধে টি. এস এলিয়ট্ সতেরো শতকের কয়েকজন দার্শনিক কবি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'Our civilization comprehends great varitey and complexity, and this variety and complexity, playing upon a refind sensibility, must produce various and complex results. The poet must become more and more comprehensive more allusive, more indirect, in order to force, to dislocate if necessary, language into his meaning এলিয়ট্ বলেছিলেন, জন্‌সন্ বা চ্যাপ্‌ম্যানের মতো কবির কবিতায় তাদের পাণ্ডিত্য অনুভূতিতে পুনর্জন্ম নিত। চ্যাপ্‌ম্যান্ চিন্তাকে যেন অনুভব করতেন, চিন্তাকে ভাব আবেগ অনুভূতিতে দেহান্তর করাতেন। 'A thought to Donne was an experience ; it modified his sensibility. When a poet s mind is perfectly equipped for its work, it is constantly amalgamating disparate experience ; the ordinary man s experience is chaotic, irregular, fragmentary....in the mind of the poet these experiences are always ferming new wholes.' তাঁরা কাব্যে দু-তিনটি পরস্পরবিরোধী ছবি একের মধ্যে অন্যটি ঢুকিয়ে নানাভাবে একসঙ্গে বেঁধে, খুব জোরালো আভাসের সৃষ্টি করতেন। আর এই রীতিই ছিল তাঁদের ভাষার প্রাণশক্তির

উৎস। 'The poets ··possessed a mechanism of sensibility which could devour any kind of experience.' কাব্য দুরূহ হয়ে গেলে অনেকে উপদেশ দেন-'look into our hearts and write' জটিল আধুনিক সভ্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেরকম দেখাও কিন্তু যথেষ্ট গভীরভাবে দেখা নয়। 'Racine or Donne looked into a good deal more than the heart. One must look into the cerebral cortex, the nervous system, and the digestive tracts.' ১৯২১-এ টি. এস. এলিয়টের এই যে সাবধানী সচেতনতা, তা তাঁর সমকালের কবিদের ওপর চোখ রেখেই সতেরো শতকের দার্শনিক কবিদের সম্বন্ধে মূল্যায়ন। শুধু হৃদয়ের ভিতরে তাকিয়ে নয়, সামগ্রিক বোধের কেন্দ্রে সংহত হয়ে মগজের সেরিব্রাল্ কর্টেক্স্, শরীরের স্নায়ুপ্রণালী, পেটের পরিপাক-প্রণালীও ভালো করে বুঝে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করে গেছেন জীবনানন্দ। তাঁর উপন্যাস তাঁর কবিতারই সম্প্রসারিত রূপায়ণ। কবিতার মতোই তাঁর উপন্যাসের অন্তর্মগ্নতা, স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে দেখা ঘুমের ছবি, সময় ও ইতিহাসের অনিঃশেষ চেতনা-পটে খণ্ডিত অস্তিত্বের যন্ত্রণা।

[দুই]

'কারুবাসনা' উপন্যাসের কথাবস্তু সামান্যই। চৌত্রিশ বছরের কাব্যপ্রেমিক বেকার হেম স্ত্রী ও কন্যার দায়িত্ব নিতে অপারগ। দেশের বাড়িতে এসেই আছে। স্ত্রী আর আড়াই বছরের মেয়ে দুজনেরই একটানা রোগভোগান্তি। স্কুল শিক্ষক বাবার সামান্য আয়ে গোটা সংসার চলে। বাবা মা-র মধ্যে সুখের সম্পর্ক নেই। হেমের সঙ্গে স্ত্রী কল্যাণীরও তাই। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা, একলা, যেন যে-যার দ্বীপের বাসিন্দা। অভাবের দুঃখ সইতে সইতে একটা শীতল ঔদাসীন্য কমবেশি সকলের ভিতরেই। এই অবস্থার মধ্যে আত্মসুখী বিলাসী মেজোকাকার থাকতে আসা। ঋণ করে এই ছোটোভাইটির ষোড়শ উপচারে ভোগ-নৈবেদ্য জুগিয়ে চলেছেন হেমের বাবা। হেমের পিসি এ সংসারে অন্য স্বার্থপর মহিলা। শীঘ্রই কলকাতা যাবে হেম, চাকরির চেষ্টায়। যাই-যাই করেও তবু তার যাওয়া হয়ে উঠছে না। পল্লীগ্রাম তাকে বড়ো বেশি টানে। দেশ-গাঁ'র মাঠে-বনে সবুজের বিস্তার, গাছে গাছে পাখ-পাখালির ওড়াউড়ি ডাকাডাকি, আকাশের রঙ-রূপ যেন তার জন্মান্তরের স্বপ্নে মেলানো। সে স্বপ্ন কঠোর সংসারের ঘায়ে খান খান হলে তার বেদনা। এই স্বপ্নবেদনার দ্বৈরথ হেমের জীবন।

গ্রন্থনাম লেখকের দেওয়া নয়। উপন্যাস থেকে 'একটি পদ নিয়ে' গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীদেবেশ রায় এর নামকরণ করেছেন। 'কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ,···কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে।' নায়ক হেমের উক্তিতে

'কারুবাসনা' শব্দটি তৈরি করে বসিয়ে জীবনানন্দ ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের পক্ষে মানানসই এ নাম। লেখাটির ভাববস্তু (theme) ব্যাখ্যার কাজে জীবনানন্দ ঐ 'পদ'টির সদ্ব্যবহারও করেছেন। প্রধান চরিত্র উত্তম পুরুষেই ('আমি' উচ্চারণে) কথা বলেছে। তবে 'কারুবাসনা' প্রসঙ্গ চিন্তার ভিতরে উপন্যাসের নায়ক কখনো প্রথম পুরুষে ('সে' সম্বোধনে) নির্দেশিত, কখনো তার সঙ্গে জীবনানন্দের ব্যক্তি হিসেবে পার্থক্য চোখে পড়ে, যখন 'হেম' এর ব্যক্তি-খোলসের বাইরে এসে মানুষটি সাধারণ শিল্পযাত্রীর দলে গিয়ে দাঁড়ায়। উপন্যাসের শেষে পাঁচ পংক্তির বন্ধনীঘেরা কবিতাংশে লেখক 'কারুবাসনা'র চিন্তা আবার প্রকাশ করেছেন।

'পুরো উপন্যাসটিই প্রধান চরিত্রের সঙ্গে তার বাবা মা মেয়ে স্ত্রী কাকা বন্ধু ও গ্রামবাসীর সংলাপে সংলাপে গড়ে ওঠা···।' প্রথম সংলাপ স্ত্রী কল্যাণীর সঙ্গে। দ্বিতীয় মেজকাকার সঙ্গে। এ যেন সংলাপের টানেই সাক্ষাৎকার। ঘটনার কোনো অনিবার্যতা নেই। পর পর দুটো সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়ে, সব সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়েই, হাতে আসে গল্পের মোড়কে মোড়কে ভরা জীবনভাবনার পুরটুকু। ভাবুকের আত্ম-পর্যবেক্ষণ যেন ভর খুঁজছে সংলাপ থেকে সংলাপে, মানুষের চেনা অভিজ্ঞতার ভিতের উপর। উপন্যাস লেখার সচেতন উৎসাহ তবু কোনো কাহিনীতে ধারাবাহী হতে পারে নি। পরিবর্তে জীবনের একটা অচল অবস্থার ভার গুরু হয়ে নেমে এসেছে লেখকের মনন-কল্পনার লক্ষ্যে।

'কারুবাসনা' উপন্যাসে এমন একটা সংসারের ছবি এঁকেছেন জীবনানন্দ, যেখানে পরিজনদের ভিতরে কেউ কারুর সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবেগবন্ধ নয়। আবেগবন্ধ থাকার একটা কমবেশি সুখী অতীত নিশ্চয়ই ছিল, অভাবের আঁচে তা এখন ঝলসানো স্মৃতি, সেই স্মৃতি নাড়াচাড়া করার উপায় এই সব সংলাপ। তবু এসব সংলাপে বর্তমানের প্রসঙ্গও আছে। কিন্তু সেগুলি এঁটো-কাঁটা কুটুনো-বাটনার মতো সংসারের নিরীখেই এত তুচ্ছ যে তা দিয়ে একটা জুৎসই গল্প গড়ে ওঠে না। বস্তুত গল্প গড়বার ইচ্ছেটাকে সরিয়ে রেখেই জীবনানন্দের এ উপন্যাস লিখতে বসা। এ লেখার নানা সংলাপে নিযুক্ত সব মানুষ নিজের নিজের অবস্থা সম্বন্ধে বেশ সচেতন, বরং সুস্থ, তা সে দারিদ্র্যেরই হোক কিংবা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের। এখানে পাত্রপাত্রীদের কেউ কারুর ধার ধারে না যেন। কাহিনী গড়তে সাংসারিক মানুষের মোটা দাগের পরিচয় টানার বদলে জীবন নিয়ে কল্পনা চিন্তার অবাধ সুযোগ তৈরি করাই এসব সংলাপের লক্ষ্য। ফলে বিচক্ষণ পাঠকের তৃপ্তি এসব সংলাপে যত, সাধারণ পাঠকের ক্লান্তি কিন্তু ততটাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ছেলে হেম আর তার মা'র কথাবার্তা :

হেম—গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয় মা ?

মা—কেন ? সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা কেন ?

হেম—কিংবা, খুন করে জেলে গেলে ?

মা—স্ত্রী-সন্তান আছে, মিছিমিছি জেলে গিয়ে কী লাভ ?

…এখন থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে (সংসারকে) পূজো কর।

হেম—চেষ্টা করছি। অন্তত সন্তান সৃষ্টি করব না আর।

মা—বেশ, তা না-করাই ভাল।

উত্তর-প্রত্যুত্তরে কী আশ্চর্য কৃত্রিমতা। এরা যেন রক্তে মাংসে-গড়া সংসারের মা-ছেলে নয়। হলে পরস্পরের জন্য রাগ-বিরাগের আঁচটুকু থাকত। এই সংলাপেরই আগের একটু অংশ :

হেম—কিন্তু তবুও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

মা—কার ? তোমার ? কেন ?

হেম—চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সে রকম মৃত্যু নয়। আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে, মনে হয় আর যেন পৃথিবীতে ফিরে না আসি।

মা—ও, এই রকম ? কিন্তু এ তো কোনো সম্ভবপর কিছু কথা নয়। আউটরাম ঘাট কোথায় ?

আত্মহত্যা করতে চাওয়া মানুষের ঐ উপায়-নির্দেশটি যথার্থ কাব্যিক, বাস্তব-সম্মত নয় একটুও। ঠিক কথা। কিন্তু ছেলের আত্মহত্যার চিন্তায় মায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এমন হলে, তাকে স্বাভাবিক বলা যাবে না। বিশেষত যে মা একটানা গ্রামের মানুষ, কলকাতার আউটরাম ঘাট জানেন না, নগর জীবনের যান্ত্রিকতায় অনভ্যস্ত, তিনি কেমন করে বসার ঘরে বসে অমন পৃথিবীর মতো পরিপাটি সৌজন্যে ছেলের দুঃখ-সুখের বিষয়ে এমন ধরনের প্রত্যুত্তর করতে পারেন ?

প্রধান চরিত্র ছাড়া নানা সংলাপের অন্য সব মানুষের মুখের ভাষা আসলে নায়কেরই বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে এক একটি বিবাধী অস্তিত্বের মতো বেরিয়ে আসা। 'বাসবাসনা' পড়তে পড়তে বারবার মনে হবে, নায়কের জীবন চিন্তার এক একটি ছটা এক একটি মূর্তি ধরে তার জীবনের চারপাশে নানা ব্যক্তিরূপে উপস্থিত। প্রতিবাদে প্রতিরোধে বিরুদ্ধতায় এরাই যেন সংসার সমাজের মায়ামণ্ডল গড়ে তুলেছে।

এমন সাজানো কথার আয়োজন সব সংলাপের ভিতরে। শব্দ দিয়ে সাজানো কথা কবিতায় এবং মানায়, পড়তে পড়তে পাঠকও অভ্যস্ত হয় ক্রমশ। কবিতায় সুরের গীতল দোলা পাঠকের বোধের অনেক তল খুলে দিতে পারে। কিন্তু উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতার দাবির মুখে কবিতার এই গীতল অবকাশ কতটুকু ঠাঁই পাবে ?

সংলাপে যে কৃত্রিমতার কথা বলেছি (লেখকের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ রীতিটাই এই), তার লক্ষণ আরো বেড়েছে, কথার গায়ে গায়ে জীবনানন্দের উপমা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। বাপ ও নায়কের দুটি সাক্ষাৎকার থেকে অংশ উদ্ধৃত করছি।

১· চাকরির পাওয়ার আশায় কলকাতায় যেতে ইচ্ছুক ছেলেকে বাবার পরামর্শ : 'পনের টাকার টিউশনের জন্য, টিউশনের টাকার প্রতিটি কাণাকড়িও বাঁচাবার জন্য হ্যারিসন্ রোড থেকে চেতলায় হেঁটে যাওয়া—আসা জীবনের এত বড় শকুন কোনোদিন সাজতে যেও না তুমি'।

২· বর্ষার গভীর রাতে পাড়াগাঁ'র বৃষ্টিভেজা বনপ্রান্তরের দিকে চেয়ে বাবার স্বগতোক্তি : 'আহা, অনেক বিরহের পরে যেন এই মাঠঘাট, আমকাঁঠালের জঙ্গল, এই করুণার সমুদ্রকে পেয়েছে।'

গদ্যের উপমা, বিশেষ উপন্যাসের ক্ষেত্রে, কবিতার উপমা থেকে আলাদা হলে, গল্পের মূল প্রবণতাকে নিজের ভিতর টেনে নিয়ে ছবি ফোটালে তবে তার ঠিক প্রয়োগটা হয়। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, জীবনানন্দের কবিতার উপমারাই তাঁর উপন্যাসে, তব সব উপন্যাসেই, অসংকোচে স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও কবিতার উপমা কোথাও কোথাও এসেছে। হিসেব নিলে তবু দেখা যাবে, এর পরেও রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যের লাগসই উপমা বেশ ভাবতে পারতেন। মনে পড়ছে, 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে মহিমের বৈশিষ্ট্য চেনাতে কাঙারু-মাতা এবং কাঙারু-শাবকের উপমাটি। উপন্যাসে হাত দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের, সামান্য হলেও, উপমা নিয়ে যেটুকু পরোয়া ছিল, কবি জীবনানন্দের সে পরোয়া নেই।

এবার দুটি দৃষ্টান্ত। উপন্যাসের প্রথম সংলাপ। হেম এবং কল্যাণী। অভাবের সংসারে দোকান থেকে কিনে আনা একটু দুধ খাওয়া খাওয়ানোর প্রসঙ্গ।—

'আমার দিকে তাকিয়ে কল্যাণী একটু লজ্জিত হয়ে—'ছি, খেতে চেয়েছিলে—বাধা দিতাম, এই নাও—'

'ফিরে চেয়ে দেখলাম সে দুধের দিকে সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে আমার দিকে গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে, হাতভরা তার অনিচ্ছা ও অনুৎসবের অসাড়তা, মুখখানা হেমন্তের সন্ধ্যার মত হিম, বেদনাতুর, মৃত সন্তানের মুখের উপর নিবদ্ধ মৃতবৎসা হরিণীর মত বিহ্বল বিষণ্ণ চোখ।

'উটের লোম দিয়ে যে-ব্রাশ্ তৈরি হয়, যার সঙ্গে রং মাখিয়ে মানুষ ছবি আঁকে, সেই ব্রাশ্টি-বা কোথায়, রংই বা কোথায়? ছবি আঁকবার শক্তিই বা কোথায়? [রং তুলি] দিয়ে একবার যে ছবি এঁকেছিল আজ এই কল্যাণীর ছবি এঁকে যাক্—'

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। কল্যাণী ও হেমের সংলাপ।—

'এবার কলকাতায় গিয়ে যা হয় একটা কিছু করব'

কল্যাণী চুপ করে রইল।

কী করব জানো?

কোনো সাড়া নেই।

হেমন্তের বিকেলের নিস্তব্ধ ম্লানতার ভিতর একটা রুগ্ন হাঁসের মত শুকনো পাতার ওড়াউড়ির মধ্যে হংসগামিনীর গতিতে একা-একা অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। গলা খাক্রে—কী করব, জানো কল্যাণী?'

সংলাপের টানে ছবি, আবার ছবির ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়ে সংলাপের মানুষগুলি এই প্রস্তাবিত সংসারের থেকে ক্রমশ নিঃসম্পর্ক হতে হতে একটা বাড়তি মাত্রায় ভাবের নতুন কোনো রূপ ধরতে থাকে। চিরকালের যে চিত্রী একদা এ রূপকে রমনীয় করেছিল, তখন তার খোঁজ পড়ে যায় প্রাণের ভিতরে। জীবনানন্দের সব উপন্যাসের সব কথা-বলাবলির ভেতরে নিয়ত এই অন্বেষণ। এই অন্বেষণের আর্তি ঐকান্তিকতা সংলাপের ছেঁদো দিকটাকে চোখে পড়তে দেয় না। জীবনানন্দের উপন্যাসের সংলাপ তাই আলাদা করে বিচারের বস্তু নয়। ছবির বোধের লাগোয়া হয়ে এদের উপস্থাপন, উত্তরণ।

'কারুবাসনা' উপন্যাসে, জীবনানন্দের সব উপন্যাসেই, পাড়াগাঁর মাটি-জল-গাছপালা-পশুপাখি-আকাশ-বাতাসের জন্য আশ্চর্য একটা নাড়ির টান। অনুভবীর প্রতিটি জীবকোষে উন্মুখ পথ চাওয়া ফুটে আছে। একে দেশপ্রেম বলে আদর্শের কোনো রঙ মাখানো যাবে না। পাড়ার যদুনাথ বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে নাড়ির টান দপ্‌দপিয়ে ওঠে হেমের মনে,—'কিন্তু সেই সময় থেকে—তারও ঢের আগের থেকে এই ধানখেতগুলোর রহস্য ও বিচিত্রতা কী যে গভীর হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তো জন্ম-জন্ম এগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি'। সৃষ্টি জুড়ে চিরকালের এই বিস্ময়কর উদ্ভিজ্জমানতার সম্মোহ (trance) যখনই হেমকে পেয়ে বসে, খণ্ডকালে ধরা সমাজ সংসারে লাভ-লোভ-প্রতিষ্ঠার লাফালাফিটা তার কাছে মেকি, মিথ্যে হয়ে যায়। পৃথিবীটাকে লুঠ করে ভোগ করতে চেয়ে, যদুনাথ বাবুর পরামর্শ মত, 'সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত স বিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতাকে মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে' শেখার পাঠ নেওয়াটা তার আর হয়ে ওঠে না। কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সংসারের ছককাটা উন্নতির পথে পরিপূর্ণ অন্তর্দান করবার মতো স্বাভাবিকতা কোনোদিনই সে অর্জন করতে পারে না। কারুতান্ত্রিকের এই নিদারুণ ভবিতব্যতা সংসারের যক্ষের শান্তিনিকেতনে তাকে পালিয়ে যেতে দেবে না। দেয়নি যাদের, তাদের ভিতর 'চণ্ডীদাস একজন, ভিলোঁ আর-একজন, হাইনে একজন, আর-একজন ভারতচন্দ্র'!

উপন্যাসের শেষদিকে মা-র সঙ্গে কল্প-সংলাপে হেমকে যেন একলা একলা কথা বলায় পেয়ে বসেছে দেখা যায়। অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে 'মা' উচ্চারণটিকে অনেকটা সংযোজকের মতো কাজে লাগিয়ে নায়ক তার নিঃসঙ্গ আবেগ প্রকাশ করে গেছে উপন্যাসের কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে। এ যেন মা-র সঙ্গে ছেলের সংলাপের একটা হেঁয়ালি-পরিমণ্ডল তৈরি করে নিজের মনেই নিজের সঙ্গে কথা বলে যাওয়া : 'ভিজে ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে একজন রোগীর ছিটনো থুথু আর একটু হলেই গায়ে লাগছিল, একটা দোকানের মস্ত বড় পা-পোষ আমার মুখের সামনে ঝেড়ে নিল। একটা মহিষের লেজের বাড়ি খেলাম।···ভিজে ফুটপাথের উপর একপাশে কাদা-জলের মধ্যে আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে একটি নারী পড়ে রয়েছে—দেবদারু

গাছের ছায়ায় নয়, মেঘের সোনায় নয়, কিন্তু এই পথে ঘাটে রাস্তায় পৃথিবীর আদি অসীম স্থির রূপ আবিষ্কার করি আমি। নিজের জীবনের বেদনাকে মুকুটের মত মনে হয়। বাদলের বাতাসে, আবছায়ায়, জনমানব, ট্রামবাস, গাছের পাতাপল্লব, পাখ পাখালির কলরবে এক একটা সন্ধ্যা বড় চমৎকার কেটে যায় আমার। মা...'

খণ্ড কালের সংসারে বাস করার অকৃতার্থতা ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর আদি অসীম স্থির রূপের আবিষ্কার। নিজের জীবনের বেদনা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অনিঃশেষকে পাওয়ার অভাবিত আনন্দ মুকুটের মতো গৌরবের মনে হয়। একদিকে শিল্পীর আত্মায় নিত্যের, অনন্তের টান, অন্যদিকে খণ্ড স্থানেকালে সংসারের প্রতিযোগিতায় পরাজিতের গ্লানিবোধ—চেতনার এই দ্বৈরথ হেমকে প্রতি মুহূর্তে বিমূঢ় করে। 'কাজেই এম্-এ ডিগ্রি ও স্ত্রী সন্তান সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়সে আজও আমি সংসারী হয়ে উঠতে পারলাম না আক্ষেপের কথা হয়ত।' তবু খণ্ডতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া অনন্ত যখন প্রাণের ভিতর উঁকি দিয়ে যায়, 'এক মুহূর্তের ভিতরেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতের প্রেম, স্বপ্ন ও সফলতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পাই আমি, এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো-অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছে করে'। তাই কবিতা শিল্পের মুক্তভূমিতে বনলতার স্মৃতিসঙ্গ কাহিনীর মতো সত্য হয়ে ওঠে, লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকা মানুষটির যে ভাবনা একদা কবিতা হয়েছিল, তারই বৃত্তান্ত ঘেঁসা আত্মবিচারণা চিন্তা-কল্পনাকে কোনো বোধে উত্তীর্ণ করে দেয়।

আমরা আগে বলেছি, জীবনানন্দের উপন্যাস তাঁর কবিতারই সম্প্রসারিত সৃজন-ভূমি। Objective sequence নয়, lyrical sequence ধরে তাঁর উপন্যাসের অগ্রগতি। বাঙলার পাড়াগাঁ জীবনানন্দের উপন্যাসের বৃত্তান্ত প্রকাশের স্থল। সংলাপ স্থলগুলো এক একটা বাঁধাই করা পটের মতো, পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চলাচল কখনো বাড়ি চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে যাচ্ছে না। পল্লী আর তার শ্যামল লাবণ্য নায়কের এবং তার বাবার স্মৃতিবাসনার সূত্রে টেনে আনা। নায়ক বা অন্যান্য ব্যক্তির মানসিকতার ভিতর কোথাও সামাজিকভাবে পাড়াগাঁ'র মেজাজ নেই। এখানকার প্রত্যেক মানুষ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন যেন— রুচিতে বুদ্ধিতে আবেগে। সত্তর বছরের বৃদ্ধ স্কুলশিক্ষক বাবা এ সংসারে অনেকটাই অলিপ্ত, সব দায় দুর্ভোগ প্রসন্নমনে সহ্য করার একটা আধ্যাত্মিক সহিষ্ণুতা তাঁর। মাঝে মাঝে উপনিষদের শ্লোক উচ্চারণ তার অভ্যাস। মনে হয়, তিনি যেন নিষ্ঠাবান কোনো ব্রাহ্ম। সব ব্যক্তিরই একাকীত্বের যন্ত্রণা আছে কমবেশি, তারা কম কথা বলে, যেন প্রশ্নের উত্তরটুকু যথাসংক্ষেপে দেবার জন্যই তাদের উপস্থিতি। পংক্তিতে পংক্তিতে সাজিয়ে দিলে উপন্যাসের বহু স্থানই ছোটো মাঝারি বড়ো কবিতা হয়ে যেতে পারে। 'কারুবাসনা' জীবনানন্দের গীতিধর্মী উপন্যাস। 'A novel' নামে লেখক নিজে চিহ্নিত না করে দিলে এ লেখাকে তাঁর ডায়েরি বলা যেত অনায়াসে।

'জীবনপ্রণালী' উপন্যাসের নাম গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীদেবেশ রায়ের দেওয়া। গ্রন্থের শেষদিকে অমলের দীর্ঘ চিঠির অংশ থেকে 'পদ' তুলে এই নামকরণ। 'সংসারের মানুষদের আগাগোড়া ইতিহাস যদি বিচার করে দেখি সেই আদিম কাল থেকে, বুঝব একটা কুৎসিত মাকড়সার মত শূন্যের ভিতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের জীবন-প্রণালী ভেসে চলেছে। এ জীবনপ্রণালীকে আমি কোনোদিনও শ্রদ্ধা করি না যদিও ব্যক্তিগত মানুষের বেদনা ও ক্ষতির কথা কী করে লঘু করা যায়, অনেক সময়ই নিঃসহায়ের মত ভাবি তাই।'

শচীনের স্ত্রী অঞ্জলির সিনেমা দেখতে যাওয়া না যাওয়ার ইচ্ছেবদল দিয়ে জীবন-প্রণালীর কথাবস্তু অনেকটা এগিয়েছে। রজনীকান্ত খাসনবীশের পাঠানো 'দশখানা দশ টাকার নোট' প্রসঙ্গ উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত টানা। এর মাঝে অমলের সঙ্গে অঞ্জলির সিনেমায় যাওয়া, এই গ্রামের এবং এই গ্রামে বেড়াতে আসা পুরনো প্রবাসী কয়েকজন পরিচিত ও বন্ধুর সঙ্গে ঘরে বাইরে নায়কের সাক্ষাৎকার, তাদের সম্পর্কে শচীনের প্রতিক্রিয়া, আর তাদের কথা শুনে অঞ্জলির জীবনবাসনা। অঞ্জলি একে অসুস্থ, তার অভাবের সংসারে ভালো করে খেতে-না-পাওয়া বউ। বেকার স্বামী শচীনের প্রতি তার প্রচণ্ড অভিমান। 'কারুবাসনা' বা 'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসেও কাহিনীর মোটা বিষয়টা এমনই।

জীবনানন্দের উপন্যাসে কাহিনীর সম্মুখগতি প্রায়ই থাকে না। 'জীবনপ্রণালী'তে তবু কিছু ঘটনা এসে গিয়ে কাহিনীকে খানিক এগিয়ে দিয়েছে। সামান্য এ-ঘর ও-ঘর নড়াচড়ায় যে সময় কাটে, সেটা কাহিনীর খাতিরে একেবারে অস্বীকার করতে না পারার ফল। কিংবা পাড়াগাঁ'র এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাবার দায়ে যে নানামুখী অভিজ্ঞতা মেলে, তারই আহরণের টানে। উপন্যাস বোঝার প্রচলিত ধারণায় এসব কাহিনীর বিশেষ কোনো মূল্য কেবল একলা লেখকের নিঃসঙ্গ বোধের ভিতর। সে বোধ কালকে খণ্ড করে না, ধারাবাহীও করে না। কালের স্থির অবস্থানের মধ্যে মানুষের বাঁচার স্বার্থ সুবিধা খণ্ড সময়ের বিভ্রম বানিয়ে তোলে। এই পরিণামী মায়া আঁকড়ে সংসারের মানুষ পরিপাটি হতে চায়, মিথ্যা হলেও তার ভেতরেই বিন্যস্ত থাকতে চায়। এই ভ্রান্তিই মানুষের আশ্রয়। জীবনানন্দের নায়করা এই ভ্রান্তি সম্বন্ধে সজাগ। এর বাইরে থাকতে তারা সংকল্পবদ্ধ। এদের দুর্দশা চিনিয়ে দিতে শ্রীবিলাসের মতো, প্রতিমার মতো সামাজিকভাবে সফল মানুষেরা আশেপাশেই থাকে। তবু নিজের বোধে-বিশ্বাসে স্থির নায়ক শচীন বলে—'এক নিশ্বাসে কুড়িটা বছর কেটে গেল যেন—আবার একটা যদি নিশ্বাস ফেলি তাহলে বিশ বছর আগের পৃথিবীতে চলে যাওয়া যাবে?···চোখ বুজে আমিও অনেক সময় এই কথাই ভাবি। হৃদয়ের এই অনুসন্ধান নিয়েই জীবনের যা একটু আনন্দ জমে ওঠে যা একটু ঐকান্তিক বেদনা।'

উপন্যাসের নায়করা লেখক জীবনানন্দের মানসপুত্র। বরং তারা জীবনানন্দই স্বয়ং। নায়ক ছাড়া উপন্যাসের অন্যান্য মানুষের জীবনবাসনা নিয়ে তাঁর কোনো

মোহ নেই। কিন্তু একটা করুণ বাধ্যতা আছে। কেননা সংসারের কাঁটাপথ মাড়িয়েই এসব নায়কের চলার নিয়তি। আর সংসারে আছে অগুনতি সেই সব মানুষ, যাদের বৈষয়িক উন্নতির দৌড় আছে, স্বার্থ সুবিধে নিয়ে ছোটো বড়ো আপোষের দায় আছে, অপরকে দুয়ো দিয়ে ছোটো করার লোভ আছে। এদের নিয়েই জীবনের দৃশ্য পরিবেশ। এদের মানলে তবে উপন্যাস দাঁড়ায়।

জীবনানন্দের উপন্যাসের ভর সমস্যাপীড়িত সামাজিক বাস্তবতার উগ্র কোলাহলের উপরে নয়। ওই রূঢ় বাস্তবতাকে সইতে সইতে ক্রমশ থিতিয়ে এনে তারই ভেতরকার অস্তিত্বটাকে অনিচ্ছায় বিষণ্ণতায় স্বীকার করলে যে ধরনের অসহায় অবস্থা তৈরি হয়ে ওঠে—মূল ভরটা যেন সেইখানে। দেখা যাচ্ছে, নায়কের জীবনে সমস্যার মতো যে-সব অবস্থা, তাদের প্রকৃতি কখনই উগ্র বা তীব্র নয়। তাছাড়া নায়কের অন্তর্মনে তাদের প্রতি কোনো সম্মতিও বিশেষ নেই। বিরোধী বাসনার পাত্র পাত্রী পরিবৃত হওয়ার ফলেই নায়কের আত্মজিজ্ঞাসা অনেকটা মনন-বিচারের প্রশস্ত ক্ষেত্র পেয়ে গেছে। তার এই মনন-বিচার, তাছাড়া তার নিজস্ব ধ্যান-কল্পনা জীবনানন্দের উপন্যাসের সব কথা।

শচীনের চিন্তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি :

'যেদিন থেকে মানুষ আনন্দ, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি, মমতা, প্রেম কল্যাণ সমস্তই টাকার বিনিময়ে কিনতে শিখল, বিক্রি করতে শিখল সেদিন থেকেই মানবের হৃদয়ের ঐকান্তিক শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে গেছে। কবি নষ্ট হয়ে গেছে, প্রেমিক নষ্ট হয়ে গেছে—প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন ভালবাসা পেতে হলে তাই সভ্যতার বাইরে বহুদূরে গিয়ে কোনো বনের বালিকাকে খুঁজে পেতে নিতে হয় কিংবা চিতা বাঘিনীকে; কিংবা নিঃসংকোচ সম্পূর্ণতার জীবনের পথে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা এদের আছে তাই। এরা টাকার মানে জানে না। আমাদের অভিসারিকারা, নারীরা, কবিরা, প্রেমিকরা সকলেই জানে।...সরল সাধু বিশ্বাসের জীবন অনেক দিন হয় হারিয়ে ফেলেছি কি না। বাংলার রূপকেও সব সময় সবচেয়ে গভীর ও সুখের বলে মনে হয় না। আমরা অত্যন্ত চালাক হয়ে পৃথিবীর পথে ফিরছি।...আমার অনেক সময় কিন্তু মনে হয় একটা শালিখ বা চড়াইও অনেক মানুষের চেয়ে ঢের বড়—'

সংসারের মানুষকে অনেক আপোষ করে চলতে হয়। মানিয়ে নিতে হয় নিজেকে অনেক মিথ্যের সঙ্গে। তাতে তার মনুষ্যত্বের মাপটা খাটো হয়, বেঁকে চুরে যায়। জীবনের 'ঐকান্তিক শুদ্ধতা' যার সব কিছু, সে বিপরীত দিগন্তের মানুষ। সংসারে সে আপন নয়, নিকট নয়, বিশ্বাস করার মতো বাস্তবও যেন নয়। অথচ তাকে কেন্দ্র করেই জীবনের যন্ত্রণা। জীবনানন্দের উপন্যাসে যে সংকট জেগেছে, তা অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা সুরের বাস্তব। তার সংঘাতে বাইরের আলোড়ন নেই, তা অন্তর্লীন গানের মতো, নিহিত বেদনার মতো হৃদয়-আশ্রয়ী।

অভয় চলে গেলে শচীন ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে গিয়ে সে মিশরের প্রাসাদের স্বপ্ন দেখছে। অন্ধকার 'নীল বাতাস ভেসে আসছে', একসারি খেজুর গাছ, বালির উপর দিয়ে এক পাল উটের চলে যাওয়া। হঠাৎ অঞ্জলি এসে দাঁড়াল কোনো এক বিস্মৃত যুগের রাণীর বেশে। রাণীর বেশে অঞ্জলি মামলুকের (একটা সিংহ) কাছে চলে গেল। নারীর অনুরক্ত সিংহ। একটা বর্শা নিয়ে শচীন গেল। গিয়ে দেখল শচীন, মামলুকের স্ত্রী সেজে বসেছে অঞ্জলি। শচীন অঞ্জলিকে চলে আসতে বলল। অঞ্জলি এল না। মামলুক অঞ্জলিকে নিয়ে ঘুমোতে চলে গেল। 'একটা গভীর ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল।' পীটর্‌পল্‌ রুবেন্সের আঁকা সিংহ শিকারের ছবি যেন। শচীনের ঘুম ভেঙে গেল। অঞ্জলি বায়োস্কোপ দেখে আমলের সঙ্গে ফিরে এল।

স্বপ্ন প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে, সব উপন্যাসেই। ঘুমিয়ে স্বপ্ন, জেগে থেকে স্বপ্নের ঘোর লাগা হামেশাই, জীবনানন্দের সব লেখায়। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দূর অতীতে যাত্রা, মনের মত জগতে-জীবনে জেগে উঠতে পাওয়ার সুখ, মনের অবচেতন তল আলোড়িত করে যে-সব ছবি মেলে, তার সঙ্গে চলতি বাস্তবের সংযোগ উদ্ধার করে জীবনের বহুমুখ পরিচয় নেওয়া জীবনানন্দের শিল্পীস্বভাবে। Surrealist শিল্পী স্বপ্নের মধ্য দিয়ে জাগ্রৎ বর্তমানের পরিপূরক হারিয়ে যাওয়া কোনো জীবনতল উদ্ধার করেন। চেতন অবচেতনের মিলন বিরোধের ভিতর দিয়ে মানুষের পার্থিব অস্তিত্বটার আরো সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনানন্দের কবিতায়, উপন্যাসেও আত্ম-অন্বেষণের এমন একাধিক পথ-পদ্ধতির দিশা মেলে। 'সুতীর্থ' (১৯৪৮) উপন্যাসে অতীত বর্তমান ওলট-পালট-করা একটানা কালের যে মুহূর্তবৎ বিভ্রম, সেই বিভ্রমের ভূমিতে লেখকের মতো পাঠকেরও বারবার মনে হওয়া স্বাভাবিক, গত 'তিন হাজার বছর আগের আজকের দিন' যেন ভবিষ্যতেও কখনো ফুরিয়ে যাবার নয়। অতীতে উপস্থিতে একাকার কালের এই টানা অবস্থাটাকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত বেঁচে থাকার ক্ষম বুদ্ধি দিয়ে মাপতে যাই বলেই তাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলি। কালের এই একতানতা চেতনার নিবিড় টানে বোধে পৌঁছে যায়। তখন 'আমি'—সুতীর্থ অথবা শচীন মিশরের তিন হাজার বছর আগেকার আজকের আমি হয়ে বর্শা হাতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে একাদশী চাঁদের রাতে, 'মামলুক'কে হত্যা করে এই কালের অঞ্জলিকে শায়েস্তা করতে, অথবা মকবুল ইয়াসিন হামিদ বঙ্কু বিশ্বম্ভরদের কারখানায় ধর্মঘটী সংগঠনটা একালের জেহাদী জনসাধারণের প্রেক্ষণ বদলে কাল-কালান্তরের 'মহা সাধারণ' হয়ে যায়। নানা উপন্যাসে জীবনানন্দের এই চাওয়া তাঁর লেখাকে চেতনা প্রবাহধর্মী করেছে। এই চেতনা-প্রবাহের সঙ্গেই উপন্যাসের নায়কদের (সেই সঙ্গে লেখকেরও) মুহুর্মুহু স্বপ্নদেখা অধিবাস্তব বোধের (Surrealist feeling) সম্পর্ক।

এ পর্যন্ত 'জীবন প্রণালী'র আলোচনায় যে-কয়টি উদ্ধৃতি গ্রন্থ থেকে ব্যবহার করেছি, তাদের প্রত্যেকটির পদবন্ধন ও শব্দান্বয়ের ভিতর পদ্যছন্দের লয় টের পাওয়া যাবে। এ ভাষাকে সামান্য মেজে-ঘসে পংক্তিতে পংক্তিতে সাজিয়ে দিলে তা সহজেই জীবনানন্দী-রীতির কবিতা হয়ে উঠতে পারে যেন। দৃষ্টান্ত পরীক্ষার লোভে উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করি : 'ধীরে-ধীরে জ্যোৎস্নার পথের মধ্যে বেরিয়ে গেলাম। এ-রকম চিরকাল চলতে পারা যায় না কি? মাঠ-প্রান্তর ভেঙে, জানা-অজানার ওপারে, জ্যোৎস্নার আকাশে-বাতাসে বুনো হাঁসের মতন, যে-পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত শেষ গুলি এসে বুকের ভিতর না লাগে!' এ অংশকে কবিতার মতো করে সাজালে দাঁড়াবে—

ধীরে ধীরে / জ্যোৎস্নার পথের মধ্যে / বেরিয়ে গেলাম।
এ-রকম চিরকাল / চলতে পারা যায়।
মাঠ প্রান্তর ভেঙে, / জানা-অজানার ওপারে,
জ্যোৎস্নার আকাশে-বাতাসে, / বুনো হাঁসের মতন, / যে পর্যন্ত—
যে-পর্যন্ত শেষ গুলি এসে / বুকের ভিত / রে না লাগে।

লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, প্রতি পংক্তির পর্বাঙ্গগুলো যেন কবিতা হবার জন্য আগে থেকে ভেতরে ভেতরে একটা গড়ন নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে।

১৯৩৩-এ লেখা সব উপন্যাসের কাহিনীর ধরণ প্রায় এক। 'প্রেতিনীর রূপকথা'য় নায়কের বেকার জীবন ইংরিজিতে এম. এ পাশ, সাহিত্য-শিল্পে সমর্পিত প্রাণ, পাড়াগাঁ নিয়ে অনেক স্বপ্নবাসনা। তার পারিবারিক জীবন অসফল। কলকাতার সস্তা মেসে গিয়ে থাকে। রোজগারের সুবিধে না দেখলেই দেশে ফিরে আসে। দেশে মা বাবা আছেন: 'কারুবাসনা' উপন্যাসে মা-বাবার আদলের তাঁরা। নায়ক বিবাহিত, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়, হেম-কল্যাণীদের মতোই নিঃসক্ত। স্ত্রী মালতী, ঝোঁকে পড়ে খুব পান খায়, কল্যাণীরই মতো। এই সময়ের তিনখানি উপন্যাসের নায়করাই (পরের চারখানিতেও) ধূমপানে চুরুটের ভক্ত। অর্থভাগ্যে পরাজিত নায়ক স্মৃতি-স্বপ্ন-কল্পনার জগতে স্বরাট।

উপন্যাসে চরিত্রের নাম ইংরিজি আদ্যাক্ষরে লেখা। যেমন, সুকুমার S, মালতী M, রাজমোহন R, আবার রামধন (কুলি) R, বিনতা B, বনবিহারী B। কখনো আবার চরিত্রের পুরো নাম ভাষায় বানান করে লেখাও আছে। ভাষায় লেখা নামের গোটা উপস্থাপনায় মানুষের রক্তমাংসের, কখনো তার স্বভাবেরও আভাস পাওয়া যায়। এখানে প্রক্রিয়াটা ভিন্ন। মানুষ যারা এ উপন্যাসে এসেছে, তারা যেন জীবনের ক্ষেত্রে এমন প্রয়োজনীয় নয় যে তাদের নাম ভাষায় বানান করে সব সময় পাঠককে জানাতে হবে। তাদের অস্তিত্বের একটা কোনোরকমে স্বীকৃতি অথবা ইশারা দিতে পারলেই লেখকের ঐ তুচ্ছ দায়টা চুকে যায়। লেখকের বক্তব্যের মূল যেন অন্য কিছু। আলাদা আলাদা ব্যক্তিমানুষ নয়, তাদের সবাইকে ধরে জীবনের মূঢ়তাকে

উজ্জ্বল করে তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য। রাজমোহন বাড়ির বয়স্ক পরিজন, সে R। আবার কুলি রামধনও R। ছেলের কলকাতা রওনা দেওয়ার সময় মা বলেছিলেন—'রাজমোহনের ডাঁট-ভাঙা ছাতাটা নিয়ে যেয়ো···সেটা R-র ঘরেই পাবে···'। আবার স্টিমারে উঠে নায়ক রামধন কুলিকে সতর্ক করতে গিয়ে বলেছে—'দেখ R, তুমি বড় আহাম্মক,—খবরদার বাড়িতে যদি এসব কথা নিয়ে বল'। রাজমোহন রামধনের তফাৎটা তাদের আলাদা Situation ধরে জেনে নিতে হবে। নায়ক ছাড়া এ উপন্যাসের সবাই একসঙ্গে জীবনের পরম অমর্যাদার মতো যেন। কানাকড়ি পার্থিবতার এ ইমেজটাকেও জীবনানন্দ উজ্জ্বল করতে চান। বিষয়ী পৃথিবীর কোলাহল নিয়ে উপন্যাস লেখা তো জীবনানন্দের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের লোভের দাপাদাপিটাকে নায়কের চেতনার ভিতরে নিহিত রেখে তারই সূত্রে জীবনের সত্যার্থ উদ্‌ঘাটন ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য।

অবশ্য আর একটা কথাও এখানে মনে রাখতে হবে। ইংরিজি উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে লেখার চল্‌ আছে। এখনই মনে পড়ছে, Jane Austen এর উপন্যাসের কথা। জীবনানন্দ দ্রুতই উপন্যাস লিখতেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি বই শেষ করার ব্যস্ততা তার লেখক-স্বভাব হলে আমাদের সাতখানা উপন্যাসের আরো কোথাও তা দেখা যেত। উপন্যাসের ভাষায় যতিচিহ্নের ব্যবহারে ড্যাস্‌, সেমিকোলন, কোলন, ইংরিজি উপন্যাসে যতিচিহ্নের ধরন মনে পড়িয়ে দেয়। আমাদের আগের কথার সমর্থনে দুটি ছবির দৃষ্টান্ত ঃ

এক· স্টেশনের দিকে হাটতে হাটতে শেষ পর্যন্ত এই বাড়ির দুটি মানুষের কথাই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে আমার, তাদের জন্য বেদনাও বোধ করি আমি,— এমন গভীর বেদনা। একটা জীর্ণ শীর্ণ দাড়কাক অমাবস্যার অন্ধ স্রোতের মধ্যে তার অনেক দূরের নিঃসহায় শিশুদের জন্য যেমন অনুভব করে আমিও কি তেমন অনুভব করি না মা—তোমার জন্য, তোমার জন্য মালতী!

দুই· স্টিমারে উঠে দেখলাম শ্রাবণের মেঘের সঙ্গে রাতের অন্ধকার এসে হাহাকার করে মিশছে। মাথা হেঁট করে ভাবলাম ঃ আবার ভোর হবে—হবে না কি?

শূন্যতা মৃত্যু নিষ্ফলতা অন্ধকার, আবার কখনো এই জীবনটার কাছেই ভীরু প্রত্যাশার একটু হাত বাড়ানো উপন্যাসে এ সবেরই ইমেজ গড়েছেন জীবনানন্দ ছবির পর ছবিতে। এ সব ছবির যোজক সংলাপগুলি দিয়ে মানুষের গল্পকে, জীবনের বৃত্তান্তকে অতি সংকুচিত ক্ষেত্রফলে ধরেছেন লেখক। আর তারই নিরীখে কবির অন্তর্বেদনা প্রকাশ পেয়েছে এ উপন্যাসে।

গ্রন্থ-সম্পাদক বলেছেন—১৯৩৩-এ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাংলায় 'বেস্ট্‌ সেলার্‌'। 'কল্লোল' 'কালিকলমে'র লেখকরা উপন্যাসে আনছেন উদ্ভট এক ইউরোপীয়ান বাংলা, ভাষার আধুনিকতার ভিতর দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ গল্প-উপন্যাসে নতুন করে হাত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও কল্লোলিতদের বাইরে এক স্বাতন্ত্র্যে জগদীশগুপ্ত

নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' বেরিয়েছে। মানিক তারাশংকর তখনও অপ্রকাশিত। জীবনানন্দের উপন্যাস এ সব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ উপন্যাস যেন এই ঔপন্যাসিকেরই কবিতার সগোত্র। উপমায় প্রতিমায়, এমনকি চরণ, দু-এক ক্ষেত্রে স্তবক পর্যন্ত চিনে নেওয়া যায়। সোনালি চিল, নগ্ন নির্জন হাত, ভূমধ্যসাগরের অবলুপ্ত নগরী, কোনো প্রেতিনী নারীর আবছায়া, স্মৃতির নির্বাহই আক্রমণ, বাংলার মুথা ঘাস, রূপকথা—এ উপন্যাসে ছড়ানো-ছিটানো। সম্ভবত, কবিতাতেও রূপান্তরিত হবার আগে ('কারুবাসনা' উপন্যাসে বনলতা সেনের উৎস যেমন), এ উপন্যাসেই এই সব গোপন কল্পনা প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল।

'কারুবাসনা' বা 'জীবনপ্রণালী'র গৃহবন্দী বৃত্তান্তের মতো 'প্রেতিনীর রূপকথা'র বৃত্তান্ত নয়। চাকরির আশায় স্টিমারে ট্রেনে কলকাতা রওনা দেবার উদ্যোগ থেকে যাত্রার অভিজ্ঞতা এ উপন্যাস। যাত্রাপথে শুধু বনবিহারীর সঙ্গে দেখা হওয়া, আর তার কথার ভিতর দিয়ে নায়কের একদা প্রেমিক-জীবন প্রত্যক্ষ বর্তমানের মতো জীবন্ত হয়ে ওঠা। সারারাতের স্টিমার যাত্রা আর তারপরে ট্রেনে উঠে গাড়ি-ছাড়ার দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকা পর্যন্তই এ উপন্যাসে যথা সম্ভব ঘটনার নড়াচড়া। নায়কের স্মৃতির চলাচলটাই এ আখ্যানের আসল ভাগ। বিনতা আর তার দিদি, এই দুই ধনীকন্যাকে পড়ুয়া বয়সে কয়েকবার কলকাতায় সঙ্গে করে আনা, আবার তাদের গ্রামের বাড়ির কতকদূর পথে ফিরিয়ে দেবার কয়েকটি ঘটনার ভিতর বিনতার সঙ্গে তার অস্পষ্ট রোমাণ্টিক সম্পর্ক হওয়ার মনগড়া বাসনায় অনেক কল্পনা-বেদনার ছবি জমে থাকে মনে। কলকাতা রওনা দেওয়ার মুখে স্টিমার থেকে দেখা বিকেলের পশ্চিম আকাশে মেঘের পাহাড় দেখে নায়কের মনে হয় 'রেনেসাঁসের ইটালীর শিল্পীরা নারীপ্রেমে ব্যর্থ হয়ে যে স্বপ্নের দূর বিচ্ছেদের দেশের কথা ভাবত এই মেঘগুলোর ভিতরেই কি লুকিয়ে আছে সেই জায়গা?' এই ভাবনার সূত্রেই তার মনে আসে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পুরাণ বৃত্তান্তে দেশপ্রেমিক ও বীরদের শান্তিতে রাখার জন্য ভাল্‌হাল্লার (Valhalla) বিশাল দরদালানের ছবি, স্মৃতিতে ভাসে রোমান উপকথার ডিডোর (Dido) কথা, কার্থেজের রাণী ডিডোর ব্যাকুল ভালোবাসার কথা, আর ইনিয়াসে (Aeneas) বিরহে তার আত্মহত্যার কথা। সেই সঙ্গে পুরুরবা-উর্বশীর পৌরাণিক প্রেমের আদর্শও উঁকি দেয়। নায়কের কল্পনায় ভাসে স্বর্গদূতের মতো ভাই ফ্লরেন্সের সন্ন্যাসী-শিল্পী ফ্রা আঞ্জেলিকো আর তার আঁকা মাদোনার (my ladv) ঐশী মহিমা। লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা 'লা জাকোন্দা' (কৌতুকময়ী) 'মোনা লিসা', অপার্থিব আলোয় ভরা তার রহস্যের হাসি। মনে পড়ে গরীব শিল্পী মুরীল্লোকে আর তার আঁকা বিখ্যাত ছবি 'তরমুজ খাওয়া'। অভাবের সঙ্গে যুদ্ধে জয় করা জীবনটাকে কী বিপুল আগ্রহে উপভোগ করছে দুটি অল্পবয়সী। ছবি পাগল মিকেলাঞ্জেলো রোমে সিস্টিন গীর্জার ছাদ ভরে ছবি আঁকছেন। ছবি আঁকার জন্যে, মূর্তি গড়ার জন্যে, রাতের পর রাত মোম জ্বালিয়ে

লুকিয়ে লুকিয়ে শবদেহ কিনে, তাই নিয়ে কাটাকুটি করে, প্রত্যেকটি পেশী প্রত্যেকটি হাড় কিভাবে থাকে, কিভাবে কাজ করে লক্ষ্য করে করে অগুনতি স্কেচ্ এঁকে চলেছেন। সিস্টিন চ্যাপেলে তার আঁকা ছবি 'সৃষ্টির প্রথম ছ'দিন' 'নোয়ার নৌকা' 'মহাপ্লাবন' 'প্রথম মানবসৃষ্টি' 'শেষ বিচার' 'জেরিমায়া' অথবা 'নরকস্থ আত্মার মাথা' —এসব ভাবোদ্রেককারী ছবি ভাবলে সৃষ্টির যন্ত্রণা, আদি মানুষের ভোগের আবেগ আর দুঃখের উৎপত্তি, প্রেম রিরংসা সংসার লহমায় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ভাবুকের মনে। এই পাগল মিকেলাঞ্জেলোই আশ্চর্য সুন্দর একশো প্রেমের (চতুর্দশপদী) কবিতা লিখে গেছেন! বদ্‌রাগী খিট্‌খিটে স্বভাবের এই মানুষটির ফল্গ হৃদয়াবেগের কথা ভেবে, প্রতিভা ভেবে অবাক হয়ে যায় উপন্যাসের নায়ক। সতেরো-আঠারো শতকের ফরাসী চিত্রশিল্পী আঁতোয়ান ওয়াতো-র আঁকা 'এম্‌বার্‌কেশন্ ফর্ সিথিয়রা' ছবিতে প্রেমিক-প্রেমিকারা স্বপ্নের জাহাজে চড়ে প্রেমদ্বীপে যাবার জন্য তৈরি—দূরে সোনালি কুয়াশার মধ্য দিয়ে প্রেমদ্বীপ দেখা যাচ্ছে। স্টিমার যাত্রী নায়ক পশ্চিম আকাশে শেষ বিকেলের আলোয় মেঘের পাহাড় দেখতে দেখতে ক্রমে প্রেমদ্বীপের নতুন কোনো বিরহী ভূখণ্ডে পেঁাছে যায়।

'পশ্চিম আকাশের······সন্ধ্যার ছবি মিলিয়ে গেছে—সেই মেঘের পাহাড় নেই আর—চারিদিকে সাদাসিধে বাংলার পাড়াগাঁ—···মনে হয় যেন স্পেন ও গ্রীস, রেনেসাঁস—এন্‌জেলো-মুরিলো—সমস্তই সবে গেল—···খোড়ো বনের ভিতর থেকে পাড়াগাঁর দুঃখিনী রূপমতীর উনুনের ধোঁয়া—···কালো তারবেল ও বাঁশের জঙ্গলের ভিতর থেকে ধূ ধূ মাঠের আনাচে কানাচে যুগান্তের প্রেতিনীদের নিরবচ্ছিন্ন রূপকথা —···বাংলার মাঠঘাটের পথ দিয়ে অনেক শতাব্দী ঘুরিয়ে আনে আমাকে –'

রেনেসাঁসের চিত্রজগতে এই মানস ভ্রমণ নায়কের জীবনে সৌন্দর্যশিল্পের নতুন তল খুলে দেয়। অনেক শতাব্দীর বাংলার পাড়াগাঁ রূপকথার প্রেতিনীর মতো তাকে কাছে টেনে নেয়। তারই সূত্রে বহুকাল আগে থেকে বহুবার এই চেনা ট্রেনযাত্রায় বিনতার স্মৃতি প্রত্যক্ষ হয়। 'জীবনের বিগত ষোল বছর ধরে শেষরাতের নিশুতিতে যখনই এই স্টেশনে এসে পেঁাছেছি, ট্রেনে উঠে জানলার ভিতর দিয়ে মাঠ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে···অবাক হয়ে ভেবেছি, এতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে যা দেখছি, তা কি অতীত জন্মে হয়ে গেছে কোনোদিন? না ভবিষ্যতে হবে?···ঐ সব দিগন্ত নিশুতির বুকের ভিতরেই সে (বিনতা) যেন শরীরী হয়ে ওঠে ঃ'। নায়কের স্বপ্ন-কল্পনার টানে অতীত নিত্য বর্তমান হয়, তার পরে পুরাবৃত্ত ভবিষ্যৎ।

অতীতে-উপস্থিতে-ভবিষ্যতে একাকার করা কালে নায়কের মহিমা অধীশ্বরের মতো। খণ্ডকালে স্থানবদ্ধ জীবনের গ্লানি তখন একেবারেই সরে যায়। বিনতাদের উপস্থিতিতে এই স্টেশনের যে জৌলুষ ফুটতো একদিন নায়কের চেতনায়; তারই স্মৃতিকে জীবন্ত করে তুলে নায়ক ভেবেছে—'এদের কথাবার্তা কাজকর্ম সমস্ত কিছুকে ঘিরে গোপনচারিণী নারীর বর্তমানতা ছিল সেদিন—নারীর জন্য পুরুষের হৃদয়ে

ভালোবাসা ছিল ; গুদামের একটা সামান্য কেরোসিন কাঠের বাক্সও জোনাকির ক্ষেতের সহজ রূপ পেয়েছিল। তাই সেই বিভবময়ী রাত্রির স্রোতের ভিতরে এসে এই স্টেশন মাস্টার, টেলিগ্রাফ্ কেরাণি, সিগ্‌নাল্‌ম্যান্, স্টেশনের ডাক্তার নক্ষত্রের মত অভিনবত্ব যদি পেয়ে থাকে তো পেয়ে থাকবে সেদিন ; কিন্তু আজ এরা গুদামের বাক্স মাত্র — সংসারের বারোয়ারিতলার ভিখিরির দল সব -'।

কালের নিত্যতা আর ক্ষণত্ব -এ দুয়েরই ছবি আছে, তাৎপর্য আছে, নায়কের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে তাদের প্রিয়-অপ্রিয় প্রতিধ্বনিগুলি আছে 'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসে। আলোচ্য উপন্যাসে কালের যাত্রায় জেগে ওঠা এই লোকের যথাসাধ্য স্পষ্ট রূপাঙ্কন লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণের 'দেবযান' ভারতীয় পুরাণ-সংস্কারের পথ ধরে এক রকমের যাত্রা। জীবনানন্দের 'প্রেতিনীর রূপকথা' পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁস্-আশ্রয়ী চিত্রকলা-সংস্কৃতির পথে আর এক রকমের।

[তিন]

১৯৪৮-এ লেখা জীবনানন্দের চারখানি উপন্যাসের ভিতর মাল্যবান' আমাদের প্রথম আলোচ্য। প্রথম এই কারণে যে, ১৯৩৩-এর ঝোঁকে লেখা আগের তিনখানি উপন্যাসে নায়কদের দাম্পত্য 'মাল্যবান'-এ এসে একপক্ষের অত্যাচারে এবং অন্যপক্ষের সহিষ্ণুতা-উপেক্ষায় পাঠকের ধৈর্যের চূড়া ছুঁয়েছে। নায়কের স্ত্রী উৎপলা (সংক্ষেপে পলা) এই বইতে সবচেয়ে বেশি সরব এবং সক্রিয়। নায়ক মাল্যবান তার দাম্পত্যের সূত্রে এখানেই নির্যাতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। বই পড়তে পড়তে পাঠকের বারে বারে মনে হবে, আগের উপন্যাসগুলোতে স্ত্রীদের দিক থেকে গঞ্জনা-অভিমান আর উদাস বিরক্তিগুলো এখানে যেন দাম্পত্যের শেষ বোঝাপড়ার মুখে দাঁড় করানো। আরো মনে হওয়া স্বাভাবিক, মাল্যবান কি পুরুষের ন্যূনতম ব্যক্তিত্বে কখনো পৌঁছতে পেরেছে কিংবা পারবে। অবশ্য এই উপন্যাসেই নায়ককে তার নিজস্ব চিন্তা-কল্পনার শামুক-খোলে পরিপাটি আশ্রয় পাবার স্থান করে দিয়েছে। ভাড়াটে বাড়ির একতলায় ঠাণ্ডা নোংরা অন্ধকার কুঠরি-ঘর মাল্যবানের সাংসারিক দিনযাপনের সিম্বল। ওপরতলার বড়ো পরিচ্ছন্ন আলো বাতাসের ঘরখানা মেয়ে মনুকে নিয়ে উৎপলার ভোগবিলাসের একান্ত ভদ্রাসন। ভাড়াকরা বসতবাড়ির এই তলা-ভাগের বিচ্ছেদ অনেক বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মেনে চলেছে। মাল্যবানের পক্ষে, ইচ্ছে হলেই ওপরের ঘরে যাওয়া, নিষিদ্ধ। উৎপলার পক্ষে একতলার কুঠরি ঘরে যাওয়া যেমন তীব্র বিতৃষ্ণার। এই দুটো সিম্বল উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেছে। এমন বিরলদৃশ্য দাম্পত্য দেখতে দেখতে প্রায়ই বোধ হবে, ঘটনার মতো করে দেখানো এখানকার ছবিগুলো কতটা অতিরঞ্জনের ফলে স্বভাবের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে।

মাল্যবান আর উৎপলা স্বামী-স্ত্রী। বারো বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। বালিকা মনু একমাত্র সন্তান। উপন্যাসে মনুকে নিয়ে কোনো ঘটনা নেই। সে শুধু আছে, জীবনানন্দের অন্যান্য উপন্যাসের কন্যাসন্তানদের মতো, পটের স্থির রূপের মতো, এক একটা ফ্রেমে বাঁধাই করা। আরো টাকা খরচ করে ওপর তলার ঘর

গোছানোর দফায় দফায় দাবী উৎপলার একমাত্র স্বামী-সম্পর্ক। মাল্যবান আড়াই শো টাকা মাস-মাইনের কেরানি। এর পরে ঘটনার সম্ভাব্যতা ফুটছে পলার মেজদার সপরিবারে এখানে এসে থাকার খবরে। এর মাঝে একদিন চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া অথবা সিনেমা দেখতে যাওয়ার আউটিং-এ কোনো ফলপ্রসূ ঘটনা নেই, দাম্পত্যের অনড় অবস্থাটাকে একটু নাড়া দেওয়া ছাড়া। প্রতিবেশী ভাড়াটেদের মেয়ে এসে পলার সেলাইকল চাইল, কি বেহালাবাদক শ্রীবঙ্গ মাঝে মধ্যে এসে দুটো গৎ বাজাল—এ সবেও এই সংসারের অবস্থার কিছু হেরফের হয়নি। এর পর মেজদার সপরিবারে এসে যাওয়া—ফলে ছোট ফ্ল্যাট বাড়িতে স্থানের অকুলানে মাল্যবানকে মেসে গিয়ে থাকতে হল। মেসবাড়ির দৈনিক জীবন যাত্রা, আমোদ ফুর্তির আয়োজন রুচিকে পীড়িত করলেও নির্বিরোধ মাল্যবানকে শেষ পর্যন্ত মেসেই দীর্ঘদিন কাটাতে হল। মেজদারা চলে গেলে মাল্যবান আবার সেই স্যাঁৎসেতে নোংরা এক তলার কুঠরি-ঘরে ফিরে এল। পলার কাছে এবারের আগন্তুক অমরেশ, ঐ সাজানো দোতলার ঘরে, প্রতি রাত্রে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। নিচের কুঠরি-ঘর থেকে (মনু এখন এ ঘরেই শোয়) অরুচি-আপোশে-ভোগা মাল্যবান ওপর তলার হাসি-হল্লা, গানের কলি শুনে শুনে অথবা না শুনে রাত কাটায়। কখনো মাল্যবানের দাম্পত্য-প্রত্যাশা স্বপ্ন হয়ে যায়, সুখের স্বপ্ন। স্বপ্ন ভেঙে গেলে আবার সে যে তিমিরে সেই তিমিরে।

'মাল্যবান' উপন্যাসে এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের প্রায়ই কোনো সংঘাত নেই। এটা জীবনানন্দের অন্য উপন্যাসেরও কমবেশি সত্য। এমনকি এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মাল্যবানের সঙ্গে নায়িকা (স্ত্রী) পলারও কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দীর্ঘ এক যুগের নিরর্থক দাম্পত্যে সে ব্যাপার দুজনের মধ্যে একরকম সাব্যস্ত হয়ে গেছে। পলা বুঝে নিয়েছে তার 'বেকুব' স্বামীটি কি দামের। তাই সে মাল্যবানকে অনায়াসে বলতে পারে ঃ এত বড় পৃথিবীতে একজন মেয়েলোকও তোমার সঙ্গে খাতির করা দরকার মনে করল না, না ভালবাসা, না স্নেহশ্রদ্ধা না মমতা-সহানুভূতি কোনো কিছু কেরানি বাবুটিকে দেবার মত নেই কারো।...এক জন বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমান ভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তা হলে এতটা দম আটকে আসত না আমার'। মাল্যবানও জানে পলার নিহিত অপ্রেম কোনো আবদলে টলবার নয়। 'সে রকম ভাবে উৎপলা আসবে না কোনোদিন। বারোটা বছর তো দেখা গেল। এই স্ত্রীলোকটি মিষ্টি হোক, বিষ হোক, ঠাণ্ডা হোক, আমার জীবনের রাখা ঢাকা সবুজ বনে আত্মার ক্ষীরের মত কথাগুলো শুনতে আসবে, সে পাখি ও নয়। ওর চেহারা যদি কাল, খারাপ হত, তা হলে তো চামারের মেয়েরও অযোগ্য হত। একটা মোদ্দা-ফরাসকে নিয়ে ঘর করছি আত্মবনের পাখির মত—নেই-সেই-পাখিনীকে চেয়ে আমি—'।

প্রথাবদ্ধ দৃষ্টিতে যেখানে যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চিন্তার বিরোধ থেকে সংঘাতের অবস্থা ফুটছে বলে মনে হচ্ছে, আসলে তা বিভ্রম মাত্র। কারণ, সংঘাত আত্যন্তিক হলে তাদের মনে বা আচরণে প্রতিক্রিয়া জনিত অন্য প্রকাশ দেখা যেত, যা আর পাঁচটা উপন্যাসে সচরাচর হয়ে থাকে। এখানে এসব দৃশ্য স্বামী-স্ত্রীর চলতি সম্পর্কের শুধু ছবি। মাল্যবানের জীবনে এ ছবিগুলি একটার পাশে একটা টাঙিয়ে দিয়ে

লেখক তার বোধকে আরো শাণিত, আরো স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। তবু এ কথা কিছুতেই বলা যাবে না, 'মাল্যবান'-এ কোনো সংঘাত নেই। সে সংঘাত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অমিল থেকে আসছে না। মাল্যবান' উপন্যাসে, অন্যান্য উপন্যাসেও প্রায় দেখা যাচ্ছে, বৃত্তান্তের কেন্দ্রীয় মানুষটিই কেবল একা ভোগে। এই মানুষের বাইরে, সম্পর্কিত আর পাঁচজন, কোনো মানসিক ভোগ-ভোগান্তির দায়ে বদ্ধ নয়। তাদেরও হয়ত কষ্ট আছে, বঞ্চনা আছে, কিন্তু নিজের নিজের ভেতরকার বিরোধে তারা কখনই ক্ষত-বিক্ষত হয় না। তারা যে যার অভিলষিত কক্ষপথে, নিয়তির সঙ্গে খানিক আপোষ করে যেন, অবাধে চলে।

সংঘাত শুধু একলা মাল্যবানের জীবনে। বিয়ের আগে পর্যন্ত, আজন্ম মাল্যবান গড়ে উঠেছিল নিজস্ব একটা জীবন-সংস্কারের মধ্য দিয়ে। সেখানে মা-ঠাকুমার, পাড়াগাঁর জীবনযাপনের দান-প্রতিদান ঘটিত আবেগের, অভ্যাস-বিশ্বাসের একটা স্থায়ী রূপ তার মনের একাংশে ছিল। বিয়ের পর দাম্পত্যের নবাস্বাদমুহূর্ত থেকে ক্রমশ তাকে বুঝতে হল—তার সাবেক সংস্কার আর তার নতুন জীবনে ফারাক অনেক। তবুও এটাই কিন্তু তার অন্তঃসংঘাতের মূল রহস্য নয়। তা যদি হত, তাহলে এ ব্যাপারকেও সাধারণ উপন্যাসের প্রথাবদ্ধ দ্বন্দ্বই বলা যেতে পারত।

মাল্যবানের সংঘাত তার অন্তর্মনে, আপন অন্তর্মগ্নতায়। এইখানেই 'সময়' নামক একটি বিশেষ ব্যাপারের কর্তৃত্ব। অনন্ত সময়ধারায় কোনো ক্ষণায়ু মনুষ্যকীটরূপে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একদিকে তার অভিভূত বিস্ময়ের অমেয় চেতনা, অন্যদিকে খণ্ডিত কালে নিজের ব্যক্তি 'আমি'র নিয়ত লাঞ্ছিত মূর্তিকে সহ্য করার সৌজন্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। এই দু-ভাগ চেতনার দ্বৈরথই এ উপন্যাসে, জীবনানন্দের সব উপন্যাসেই, যথার্থ দ্বন্দ্বস্থল। পৌষের শেষাশেষি মেজদার পরিবার এসে পড়ার আগে একতলার ঠাণ্ডা ঘরের রাতে শুয়ে মাল্যবান ভাবছে :

> 'বিছানায় শুয়ে পড়ে, 'কেই বা এখন শুতে যেত' ভাবছিল মাল্যবান ; বসে বসে কথাবার্তা, গল্প—তারপর শীতের রাতে – তারপর সারাটা শীতের রাত : এমন স্ত্রী কি আমি পেতে পারতাম না। হড়পা বানের ঠাণ্ডা স্রোতে যেন মুর্গি আমি, হাঁসের মত সাঁতার কাটতে চাচ্ছি, বাজপাখির মত উড়ে যেতে চাচ্ছি। আমার জীবনের বানচালের ব্যাপারটা এই রকম। কিন্তু বড় বেশি আত্মপ্রেম হয়ে পড়েছে তো আমার : যেন একটি ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবীতে আর-কেউ নেই, যেন ব্যক্তি-সমুদ্র নিয়ে যে-মানুষের ও সময়ের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে সেটা কিছু নয়। লেপ মুড়ি দিয়ে শীতের খুব গভীর রাতে আজকের আবহমানের ও ব্যক্তি-সমুদ্রের রোল—যা নৈর্ব্যক্তিত্বে বিশোধিত হয়ে ফেণার কণার মত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অন্ধকারের থেকে খুব সম্ভব আরো ব্যাপক অন্ধকারের ভেতর—সেই সুর শুনতে পেল সে ; অতএব আলোকিত হয়ে উঠল তার মন ; আস্তে আস্তে সময়ের সমগ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করে স্থির হয়ে উঠতে থাকল তার মন।... এত বেশি স্থির হল যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।'

'মাল্যবান' থেকে আর একটি অংশ। পলার মেজদা বৌঠান সপরিবারে এসে

গেলে এ বাড়িব কর্তা, তদ্‌পলক্ষে মেসে নির্বাসিত মাল্যবান নিজের বাড়ি গিয়ে এঁদের তত্ত্বতলব করার সময়ে—

'মেজদা ও বৌঠানের···যৌন সম্বন্ধেব মিছরি মাখানো ভালবাসার মর্ম···দেখে মাল্যবানের···খাবাপ লাগে, কেমন বিশ্রী লাগে যেন ঃ ব্যক্তিজলরাশি ভুলে গিয়ে ব্যক্তিকে, নিজেব কী হল না-হল, সেটাকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় ব'লে।

এ জিনিসটা উপলব্ধি করে ব্যক্তিজলরাশির নিশ্চিহ্ন রৌদ্রজলরাশির ভেতব মিলিয়ে যেতে চেয়ে ঈষৎ ভাঙ খেয়ে কেমন ভাল লেগেছে যেন তার, এমনই একটা আস্বাদে, মিষ্টি গলায় মাল্যবান বলে, 'মেজদা, আপনাদের শুতে তো কোনো কষ্ট হয় না?'

নিজের বাড়ি থেকে মেসে ফিরে আসার মুখে হঠাৎ একতলার ঠাণ্ডা ঘরটাতে ঢুকে নিজের মেয়ে 'খণ্ড কাঠির মত' 'সিটে' 'মরুণ্ডে' মনুকে দেখতে পেল মাল্যবান।

'ঘুমুচ্ছে। মশায় খাচ্ছে; বাতাস করে মশারিটা ফেলে দিল মাল্যবান। মনুর বুকের ওপর কম্বলটা টেনে দিল। মাল্যবানের মন শুকিয়ে যেতে যেতে ভরে উঠল—ক। জিনিসে? তা কামনা নয়—স্ত্রীলোকের জন্যে পুরুষের ভালবাসাও নয়, মনুর জন্যেও তার একমাত্র সন্তানটির জন্যেই একটা নির্বিশেষ পিতৃস্নেহ শুধু নয়, কেমন একটা সর্বাত্মক করুণা এসেছে—মনুর জন্যে, যে সব ছেলে মেয়েরা এখানে ঘুমিয়ে আছে···এমন কি নিজেব স্ত্রীর জন্যেও। এ মুহূর্তে কোনো তিক্ততা বিরসতা বোধ করল না সে, কোনো যৌবন আকর্ষণ বা যৌনাতীত গভীর ভালবাসা—নারীকে ভালবাসা—এ-সব স্তব ও ফাদ উৎরে গিয়ে একটা নির্জন অন্তর্ভেদী সর্মভিব্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন অতিমানুষের মত হয়ে উঠল মাল্যবান।'

খণ্ড স্থান-কালে বিশেষ ব্যক্তির থেকে জেগে উঠে নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিত্বের পরমতায় পৌঁছে যায় মাল্যবান; প্রেমিকের, স্বামীর, পিতার, সন্তানের অভূতপূর্ব পরিচয়ে। সংসার-ফাঁদের বন্ধতা থেকে এই উত্তরণগুলোই তাকে জিইয়ে রাখে, আনন্দে রাখে। নিরবধি সময়ের ভিতর নিজেব অস্তিত্বের বিশ্বরূপ দর্শন করে পৃথিবীর দিনযাপনের গ্লানি-লাঞ্ছনা মুছে ফেলে মাল্যবান। আত্মছলনার কোনো শিল্পিত বিকল্প বলা যাবে না একে। মাল্যবান'-এ, জীবনানন্দের অন্য উপন্যাসে বাববার এই উত্তবণের অমৃত উঠেছে তার যন্ত্রণার জীবনসাগরের মধু-বিষ মন্থন করে। 'মাল্যবান' থেকে আর একটু অংশ ঃ

'সে দরজা বন্ধ করে···অনেকক্ষণ ধরে হড়্‌-হড়্‌ করে বমি করল, অনেক বমি।

মাকে মনে পড়ছিল শুধু তার। অবাক হয়ে ভাবছিল ঃ এই ঘরেই আছেন তিনি—এই অন্ধকারের ভেতরেই দাঁড়িয়ে···গায়ে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন;···

মাল্যবানের মনে হল ঃ উৎপলাও তো মনুর মা—মা তো সে;···নিজের মায়ের সঙ্গে এই মাকে মিলিয়ে ফেলে বৃষ্টির ছিপ্‌ছিপে ছট্‌ফটে জল যেমন পুকুরের সমাহিত সঞ্চিত জলের শান্ত স্বরূপের ভেতর মিশে যায়, তেমনি একটা

অব্যাহত মাতৃত্বের সদাত্মাকে চাচ্ছিল যেন সে।...মাল্যবানের সেই মৃত মা ও জীবিত উৎপলা—এই দুই নারীকে একজনের মতন—মায়ের মতন—তার ঘরের ভেতর খুঁজে পাবার জন্যে কেমন অদ্ভুত বিশালাক্ষ অস্বস্তিতে সে চারিদিকে তাকাতে লাগল ; [এর পর উৎপলা এসে বাতাস করতে থাকলে মাল্যবান খানিক সুস্থ হল।]

যে মা হয়েছে, মাল্যবান বললে, সে মানুষের শিয়রে না এসে পারে না। তুমি মনুর মা বটে, আমার স্ত্রী। কিন্তু সময়ের কোনো শেষ নেই তো, সেই সময়ের ভেতর আমাদের বাস।...মানুষের স্ত্রী তুমি ; নিজেও তো মানুষের মা, মানুষ ; সময়ের নিরবচ্ছিন্ন বহতার ভেতর তোমার মা-রূপ ফুটে উঠল তো ; সময়ের দু-একটা ঘূর্ণিকে কেমন অভিরাম গ্রন্থির বলয়ে নিয়ে এসে গড়ে তুললে, দেখছি তো। এই তো নিচে নেমে এলে হাড়-কালিয়ে শীতের রাতে, সিঁড়ি বেয়ে। না এলেও তো পারতে।...কিন্তু তবুও তো এলে—'

'মাল্যবান', ১৯৪৮-এর সব উপন্যাসই, জীবনানন্দের শিল্পবাসনার আরো পরিণত রূপায়ণ। ১৯৩৩-এর ঝোঁকের উপন্যাসে তাঁর ব্যবহৃত শিল্প উপাদানের যা-কিছু, কাঁচা হাতের কারিগরি বলে কখনো মনে হয়, এ পর্বে এসে তাতে বেশ পাক ধরেছে। স্বপ্ন, মৃত্যুর ঘটনা বা তার চেতনা, অধিবাস্তবের বোধ অথবা চেতনা-প্রবাহের বিষয়গুলি, আগের ঝোঁকের উপন্যাসে গোটা লেখার থেকে খানিক খাপছাড়া ভাবে যা জোড়া ছিল মাত্র, শেষের ঝোঁকের উপন্যাসে সেই সব জোড়ের দাগ অনেকটা মুছে গেছে। এগুলোকে পরিমার্জনা করার সময় যদি লেখকের হাতে থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে এ লেখার শিল্পগুণ আরো অনেক বেশি করে বুঝতে পারতাম আমরা। অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু বসু 'মাল্যবান' উপন্যাসের একটি মনোজ্ঞ 'ভূমিকা' লিখেছিলেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি উপন্যাস-গল্প লেখায় জীবনানন্দের আগ্রহের রহস্য বিচার ঐ ভূমিকা'য় বিস্তৃত ভাবে করা আছে। 'ভূমিকা'টি প্রতিক্ষণ পাব্লিকেশনের 'জীবনানন্দ সমগ্র'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে মিলবে।

নায়কের নামেই উপন্যাসের নাম 'সুতীর্থ', 'মাল্যবান'-এর মতো। জীবনানন্দের শিল্পী-মেজাজের অধিবাস্তব-বোধ, চেতনা-প্রবাহের সূত্রে অতীতের স্মৃতি-রোমন্থন ইত্যাদি কলা-প্রকরণ এ গ্রন্থের সমগ্রতায় মিশে খেয়েছে। বস্তুত, আটচল্লিশের সব উপন্যাসেই শিল্প-পরিণতির লক্ষণগুলো বেশ স্পষ্ট।

নায়ক সুতীর্থ লেখাপড়া-জানা মানুষ, কলকাতাবাসী সাহিত্যিক। জীবিকায় কোনো বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মচারী। দক্ষিণ কলকাতায় মণিকা-অংশুদের বাড়ির ভাড়াটে। ভাড়াটে হলেও মণিকার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একমাত্র কন্যা সন্তান নিয়ে হাঁফানির রুগী অংশু দোতলার ঘরে শয্যাশায়ী। এ দুটি প্রাণীর বিশেষ কোনো ভূমিকা উপন্যাসে নেই। অবশ্য এদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ মণিকাকে বাইরের লোকজনের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার অনেক সময় দিয়েছে। বাড়িতে থেকেই মণিকা চালে চলনে কতকটা হাফ্-গেরস্থ 'বাড়িউলি'র মতো। অফিস যাওয়া ছাড়া সুতীর্থের জীবনে বিরূপাক্ষের আড্ডা আছে, মণিকার নিবিড় সঙ্গ আছে,

হঠাৎ পথে-দেখা-হয়ে-যাওয়া কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আছে। এ সব থেকেও আলাদা কথা হল, সুতীর্থের আশ্চর্য খেয়ালি মন। এই খেয়ালই তাকে নিয়ে যায় রাস্তার পকেটমার হারানের না-জানা জীবনের চিন্তায়, কলেজের বন্ধু ভবতোষের স্বভাব বিশ্লেষণে, বালক বয়সের বন্ধু মধুমঙ্গলের হেয়ার কাটিং সেলুনে, কারখানার ধর্মঘটী আন্দোলনের মাঠে-মঞ্চে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু ক্ষেমেশ চৌধুরীর বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে। বিরূপাক্ষের স্ত্রী জয়তীর সঙ্গে, ভবতোষের সঙ্গে, ক্ষেমেশের সঙ্গে বহুকাল পরে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়।

প্রধান চরিত্র সুতীর্থের মূল কাহিনীর লাগোয়া দু তিনটি উপকাহিনীও এ উপন্যাসে আছে। বিরূপাক্ষ-জয়তীর উপকাহিনীটা এদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট। মণিকা-অংশুর উপকাহিনী নেপথ্যচারী। উপন্যাসের শেষদিকে জয়তী-ক্ষেমেশের উপকাহিনী দানা বাঁধেনি।

এ উপন্যাসে সুতীর্থ পুরোপুরি স্বনির্ভর মানুষ। আগে আলোচিত উপন্যাস-গুলিতে নায়কদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের ঘরপোষা কপালের ফেরে পড়ে খানিক আবছা। বিফল গার্হস্থ্যের মাঝখানে স্বামী এবং পিতারূপে সংসারে কর্তা সেজে থাকার দায় তাদের আত্মচালনার স্বাধীনতা অনেকটাই কেড়ে নিয়েছিল। পাশগাঁয়ে স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে থাকার গল্প মণিকার কাছে বহুবার বলার পরও তা শেষ পর্যন্ত গল্পই থেকে গেছে। এই বানানো বিবরণ দিয়ে হয়ত মণিকাদের বাড়িতে ভাড়াটে হওয়ার উপায়টা সহজ করতে পেরেছিল সুতীর্থ। এ উপন্যাসের সুতীর্থ, বিশেষ করে 'বাসমতীর উপাখ্যান' এর সিদ্ধার্থ (যেহেতু স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে সিদ্ধার্থ পাকাপাকি গৃহস্থ) তাদের অটল স্বনির্ভরতা দিয়ে জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের বৃত্তান্তে নতুন একটা চেতনার মাত্রা যোগ করতে পেরেছে। লোকভয় এবং নির্বিরোধ সহ্যশক্তি কিভাবে সামর্থ্যের শক্ত দেয়ালে গোপন ক্ষয়ের সিঁধ কাটে, আগের উপন্যাস-গুলিতে আমরা দেখেছি।

জীবনানন্দের উপন্যাসগুলির ভিতর একমাত্র 'সুতীর্থ'ই স্পষ্টভাবে সংখ্যাচিহ্নিত পরিচ্ছেদে ভাগ করা। উপন্যাসটি ছত্রিশ পরিচ্ছেদে শেষ হয়েছে। 'শিলাদিত্য' পত্রিকার ধারাবাহিক সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত 'জলপাইহাটি' সতেরো কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল। ঐ সতেরো কিস্তিকে সতেরো পরিচ্ছেদ ধরলে এ বইতেও পরিচ্ছেদ-বিভাজন মানতে হয়।

'সুতীর্থ' উপন্যাসে পাত্রপাত্রীদের ভাবনাচিন্তার বাহুল্য (এটা এখানকার বৈশিষ্ট্যও) চোখে পড়ার মতো। বাহুল্য, কেননা কোনো চরিত্রের কোনো কথা বলবার সামান্য মানসিক উদ্যোগের মুখে অথবা কোনো একটা তুচ্ছ শারীরিক আচরণের (একতলার ঘর থেকে দোতলায় চলে যাওয়া) ইচ্ছে ফোটাতে লেখক এত বেশি রকমে চিন্তাভাবনাকে বিনিয়েছেন, যা পাঠককে সহজেই উপন্যাস পাঠে নারাজ করে তুলবে। আর এই রচনারীতিটা 'সুতীর্থ'-এর আগাগোড়া জুড়ে। একটি দৃষ্টান্ত :

'ওপরে গিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল তার (মণিকার)। শীত বেড়েছে—ঘুমও পেয়েছে। ঘুমের ভিতরে চিন্তার কোনো স্থান নেই—কোনো বিক্ষোভ নেই—মণিকা

নেই, মণিকা পীঠে নেই, পীঠে এসে যে তান্ত্রিক সেবক নিজের মূঢ়তার জন্যে দেবীকে তৃপ্ত করতে পারলো না সেই অপরিতৃপ্তির কোনো তিতকুট নেই। শীতের রাতের সমস্ত বর্ণালির শেষে এক, নিঃশব্দ অন্ধকার বর্ণের ঘুমের ভেতর। মণিকা এখন হাত ঝেড়ে বাতাসে হাত ধুয়ে ওপরে চলে যাবেন ভাবছিলেন। পা বাড়াচ্ছিলেন প্রায় যাবার জন্যে ; বিরূপাক্ষকে কিছু না বলে, নাক উঁচু করে ওপরে চলে যাওয়াটা হয়ত অভদ্রতা হয় ; অনেকে ঐরকম সটান চলে যায়—ভদ্রতার বালাই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, কিন্তু তবুও চলে যাওয়ার ওরকম ঢঙটা পছন্দ করেন না মণিকা। বিরূপাক্ষ অপরাধ নেবে কি না নেবে—মণিকা শালীন ঘরের মেয়ে না অন্য রকম ঘরের—এ সব কারণে নয়, এমনিই বিরূপাক্ষের মত একজন আল্‌পাটকা (?) আপাতভদ্র মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে শিষ্টাচারে সুস্থতায় কথা বলে বিদায় হওয়ার রকমটা ঠিক : এটাই ঠিক মনে হয় তার। মুখে হেসে ভদ্রতা করে মণিকা বললেন—'আচ্ছা, উঠি আমি—' (১৭ পরিচ্ছেদ)

এক একটা অনুচ্ছেদ যেন এক একটা বাক্য। কমায় কোলনে সেমিকোলনে একটু একটু দম নিতে থামিয়ে আবার দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ ক্লান্তিকর বাক্য। চিন্তার বিপুলায়ত ভাষা-বয়ান টেনে টেনে লেখক সম্ভবতঃ তার উপন্যাসের ক্লান্তি-মর্মটি পাঠকেরও মেজাজে ঢুকিয়ে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। হয়ত এ তাঁর উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

'ঘরের ভেতরে কেমন একটা গ্রহণ তিথি-উত্তীর্ণ গ্রাসমুক্ত চাদের মত হেঁটে বেড়াচ্ছিল মণিকা :···মণিকার সাধ, মনের সত্যার্থে আশ্বাস—আরো খানিকটা আশ্বাস বেড়ে কোন অংশ বাবুর ? না তা একই জায়গায় রয়েছে, তার কোনো বাড়া কমা নেই ? গান্ধীর কাছে মণিকা হয়ত সাধু ও তার স্রষ্টার কাছে সত্য : কিন্তু ওরকম প্রেম ও ক্ষমায় জ্ঞানী হলে মানুষের ক্লান্তির অতীত হতে পারত অংশুবাবু ; তা হতে পারে নি। তবু খানিকটা ভালো লাগছিল, কেমন বিষণ্নতা বিলাসে নিজেকে ছেড়ে দিল সে, মণিকার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রইল।

প্রকৃতি সময় ও নারী যদি এ সবের প্রতীক হয়—সকলেরই অন্তর্ভেদী এই মূর্তি। কিন্তু এ সব দেখে অভ্রান্ত বলেই হোক,···মণিকা অংশুবাবুর বিছানার পাশে বসে ··পিঠের আড়ালে মুখ নুইয়ে রেখে উপলব্ধির নদীর ভেতর ছিটেফেটা ঢিল ছুঁড়তে লাগল —হাসির, পরিহাসের, নৈরাজ্যের, সহানুভূতির সংকল্পের, ব্যথা মহত্ত্ব ও ক্ষমার কেমন একটা যোগনিদ্রার যেন - সমস্ত পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে যেন।' (১৯ পরিচ্ছেদ)

আগে আলোচিত উপন্যাসগুলোতো Stream of consciousness বা চৈতন্য-প্রবাহের উপলব্ধির ব্যাপারটা কেবল প্রধান চরিত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'সুতীর্থ' উপন্যাসে ঐ বোধ নায়ক ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রেও ছড়ানো। ফলে এই শিল্প প্রকরণের অনুভবটা 'সুতীর্থ'-এ সর্বাত্মক হতে পেরেছে। ভবতোষের সঙ্গে হঠাৎ দেখায়—

'ত্রিশটা বছর কেটে গেছে, একটি মুহূর্তও কেটে যায়নি। আমরা এই ছিলাম ডাণ্ডাজ্ হস্টেলে, অগিল্‌ভিতে, ওয়ানে—চোখের পলক না পড়তেই ফুটপাতে

দাঁড়িয়ে কথা বলছি রাসবিহারী এভেন্যুতে। একই তো সময়, একই প্রবাহ ঃ রয়ে গেছে, রইছে : আমরাও আছি সমস্ত সময়ের সঙ্গে চিৎ হয়ে, কাৎ হয়ে, তেরছা কান্নিক মেরে। (ভবতোষের বোধ / ৩ পরিচ্ছেদ)

সুতীর্থের গ্রামের স্কুলের বন্ধু, এখন নাপিত মধুমঙ্গল, দেখা হল সেলুনে ঢুকে—

'মধুমঙ্গলকে চিনছে না সে, কিন্তু তবুও সেই ইস্কুলের কবেকার সূর্য বাতাস আসা ভালোবাসা শয়তানী চিপ্‌টৌনির নিদেন মানুষটা তো কাছেই বসে আছে ; —সুতীর্থ এল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘুমের ভেতর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, আজকের দিনগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে, যা অনেক আগে ছিল এখন নেই, সে সবের চমৎকার আখ্‌খুটে কোলাহলে উনিশ শো এগারো উনিশ শো বারো উনিশ শো তেরো-কেই পৃথিবীর শেষ সত্য বলে প্রবাহিত করে। একটা দুটো তিনটে অভিভূত নিঃশ্বাসে মধুমঙ্গল যা গ্রহণ করল তা মাটি ঘাস রৌদ্র মাস্টার লক্ষ্মীছেলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের সুরভিত এক পঁয়ত্রিশ বছর আগের পৃথিবী, পঁয়ত্রিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলেও উজ্জ্বলভাবে সমসাময়িক হয়ে থাকবে যার সঙ্গে মধুমঙ্গলের মন।' (মধুমঙ্গলকে নিয়ে লেখকের ভাবনা / ৫ পরিচ্ছেদ)

সুতীর্থের কথাতেও সময় চেতনার সেই বিস্ময়, অথচ বিশ্বাস—

'এতদিন পরে তোমার কাছে চুল ছেঁটে আমার পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ল। সেখানে ছিল আমাদের উমাচরণ নাপিত। তার হাত, চিরুনির আশ্চর্য যাদু— সে জিনিস উনিশ শো দশ সালেই নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের পৃথিবীর থেকে- এখনো যেন আমার চুলে লেগে আছে। ওস্তাদের পো-কে খুঁজে না পেয়ে ঘুমিয়েছিল যাদুটা—পঁয়ত্রিশ বছর, তুমি এসে তাকে উমাচরণের মত জাগিয়ে দিয়েছে আবার। তোমার হাতে আমার রগের চুল আর চাঁদির চুল, আমার আজিডাঙার চুল কাজিডাঙার চুল কথা বলে উঠছে মধুমঙ্গল—'(৫ পরিচ্ছেদ)

বিরূপাক্ষের কাছে সুতীর্থের কথা শুনে জয়তী ভাবছে—

'আমি তো ইউনিভার্সিটির ছেলেদের সঙ্গেই মিশতুম,···কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগত সুতীর্থের কাছে বসে থাকতে, কথা বলা হত, চুপচাপ বসে থাকা হত, সত্যি সে-সব নিস্তব্ধতার ভেতর ওর মাতৃ আর আমার পিতৃগ্রন্থি আর সব নীড়, নক্ষত্র কথা বলে উঠত যেন—সে সব অভিজিৎ চিত্রা সপ্তর্ষির ভাষা এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে আজ।' (১৩ পরিচ্ছেদ)

মণিকার সামনে বসে সুতীর্থ নিজের বাসাতেই, কোনো রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ভাবছে—

'প্রাচীন মিশরীয় মেয়েদের কথা মনে পড়ছে আমার। এও যেন সেই মিশরের নীলিমা। নীল নদের পারে শেষ শীতের রৌদ্রে বসে আছি আমি···তুমিও বসে আছো, সেই গীজের মূর্তির কাছে যেন···কোন এক ভোরের, কোন নীলের বাতাস পাচ্ছি আমি ঃ তিন হাজার বছর যে পাটে চলে গিয়েছিল সেই সূর্য আবার ফিরে এলে যে রকম বাতাস ভেসে আসে,···তরতর করে জল চলে যাচ্ছে চারদিকে— তিন হাজার বছর আগের রোদের সঙ্গে হুড়হুড় করে ছুটে চলেছে আজকের দিনের ভেতর—।' 'তিন হাজার বছর আগের আজকের দিন' মণিকা বললে,

'সময় বলে কেউ যে নেই আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।' সুতীর্থ—'না না, আমার মনে হয় সেকালের একালের সব সময়ের সমস্ত ইতিহাসই এক সাময়িক।'
(২০ পরিচ্ছেদ)

'সুতীর্থ' উপন্যাসের শেষদিকে দেশের আসন্ন স্বাধীনতার চিন্তা, পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলোর বিধ্বংসী মারণাস্ত্র বানানোর ষড়যন্ত্র ও তজ্জনিত ভয়, মোহন দাস করমচাঁদজীর নেতৃত্বে সংশয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে দেশের মানুষের শুভ কর্মচেষ্টা সম্বন্ধে অবিশ্বাস—এই সব বিশ্ব-রাজনীতির বর্তমান নিয়ে সুতীর্থ-জয়তী-ক্ষেমেশের আলোচনা। কারখানার ধর্মঘট, মজুরদের আরো দুর্গতি এবং মালিকদের অসাধু তৎপরতার অভিজ্ঞতায় সুতীর্থ বুঝেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে—'এখন বছর খানেকের জন্যে, তোমাকে বলছিলুম জয়তী, গ্রামে চলে যাব আমি। ভেবে দেখব সব। অভিজ্ঞতা থেকে কি বেরুবে আমার? বিশ্বাস না অবিশ্বাস? দেখব, বুঝব, এর পরে কি করতে হবে ঠিক করব'। (৩৪ পরিচ্ছেদ)

'সুতীর্থ' উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য উপন্যাসের নায়কদের মতো সুতীর্থ সাংসারিক স্থিতির পাকেচক্রে মার খাওয়া মানুষ নয়। শুদ্ধ প্রাণশক্তি, অবর্জিত সংকল্প আর নির্ভুল নেতৃত্বের পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে সুতীর্থের কল্পনা-ভ্রমণের দেশ হঠাৎ হঠাৎই তার বোধের ভিতরে জেগে ওঠে। 'সুতীর্থ উপলব্ধি করল যে আবার যেন সে ধুলোর পৃথিবীতে এসে পড়েছে; ধুলো কাদা রক্ত পৃথিবীকে জয় করে, আলোর পৃথিবী বার করবার জন্যে কে তাকে বাছের বাছ মর্দ চিনে এনেছে। কেঁৎকা গাছে হেলান দিয়ে এই তালপাতার সেপাইগিরিই ভাল লাগছে তার, এই একটু আগের আশ্চর্য হিরণ মেঘগুলোক উড়িয়ে দিয়ে মাটি পৃথিবীতে নেমে তিতুমীরের তাড়স লাভ করতে লাগল আস্তে আস্তে সে'; (৩০ পরিচ্ছেদ)

১৯৪৮ এ লেখা 'জলপাইহাটি' উপন্যাস ১৯৮১—৮২ তে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় সতেরো কিস্তিতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে পরে প্রকাশ পায়। আকস্মিক মৃত্যুর জন্য জীবনানন্দ বইটি পরিমার্জনা করে যেতে পারেন নি। সুতরাং পত্রিকার সতেরো কিস্তিকে উপন্যাসের সতেরো পরিচ্ছেদ ধরে নিচ্ছি আপাতত। গ্রন্থাকারে 'জলপাইহাটি' উপন্যাসটি দেখার সুযোগ আমরা পাই নি।

পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এই সতেরো কিস্তির উপন্যাসে প্রথম বারো কিস্তি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আগের কিস্তির শেষ অনুচ্ছেদ অথবা তার অংশ পরের কিস্তির সূচনা রূপে ছাপা। ঐ সব শেষ অনুচ্ছেদ বা তার অংশের আয়তন কখনো তিন বাক্যের, সাত বাক্যের, কখনো বা আরো বেশি বাক্যে দীর্ঘ। শেষের পাঁচ কিস্তিতে এই পুনরাবৃত্তি নেই। এই গ্রন্থ-বিন্যাসই হয়ত জীবনানন্দের খাতা-পাণ্ডুলিপিতে ছিল। 'শিলাদিত্য'-এর সম্পাদক-প্রকাশক 'জলপাইহাটি' ছাপার সময় হয়ত ঐ বিন্যাসই হুবহু বজায় রেখেছেন। উপন্যাসে পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে লেখকের অভিপ্রেত পুনরাবৃত্তির একটা মানে এই হতে পারে—অন্তর্মনের বোধ আগের

পরিচ্ছেদ থেকে পরের পরিচ্ছেদে অবাধে সমান তীব্রতায় সঞ্চারী হয়ে থাক। কেননা, 'সুতীর্থ' ছাড়া তাঁর অন্য উপন্যাসেও পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে বিভাজনের বালাইটাই তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। জীবনানন্দের অধিকাংশ উপন্যাসে ছাপার নিয়মে দু-তিন লাইনের একটু Space দিয়ে পরের পরিচ্ছেদ সুরু করা।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিশীথ সেন ছাপোষা মধ্যবিত্ত, দুটি মেয়ে একটি ছেলে সস্ত্রীক জীবন কাটায় জলপাইহাটি গ্রামে। সর্বাত্মক মৃত্যু চেতনায় এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু আচ্ছন্ন। স্ত্রী সুমনা মরণাপন্ন, বৃত্তান্তের শেষে মৃত। ছোটো মেয়ে ভানু কাঁচড়াপাড়ার যক্ষ্মা হাসপাতালে বেঁচে থাকার দিন গুনছে। বড় মেয়ে রাণু সমাজ বিরোধীদের কবলে পড়ে অপহৃত, নিরুদ্দিষ্ট, উপন্যাসের আগাগোড়াই। একমাত্র ছেলে হারীত রাজনীতির বেনো জলের টানে ঘরছাড়া। জলপাইহাটির পাড়াগেঁয়ে কলেজে চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞ ইংরিজির অধ্যাপক নিশীথ সেন এই রকম এক ভাঙা সংসারের কর্তা, সম্প্রতি চাকরি ছাঁটাইয়ের নিয়তি নিয়ে, আর ক্যাক্টিনা পিলের ভরসায় হার্টের অসুখ সামাল দিতে, অপারগ এক অভিভাবক।

'প্রতিক্ষণ'-সম্পাদক শ্রীদেবেশ রায়ের কিছু মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। আখ্যানের সময় পরিবেশের দিক থেকে 'জলপাইহাটি' আর 'বাসমতীর উপাখ্যান' উপন্যাস দুটির সম্পর্ক নিবিড়। দেশ ভাগ হচ্ছে : অখণ্ড বাংলাদেশের দুই স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনা ইংরেজ শাসনাবসানের বাস্তবতাকে অপ্রত্যাশিত এক নতুন মাত্রা দিচ্ছে ; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে ; গ্রামের পরিবেশ, তার সম্ভাব্য রাষ্ট্রভুক্তির পরিবেশে পরিবর্তিত হচ্ছে, এক একটি পরিবারে আভ্যন্তরীণ সংগঠন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। দুটি উপন্যাসেই জীবনানন্দ তাঁর আখ্যান গড়ে তুলেছেন এই ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সময়কে ভিত্তি করে। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রগুলি কলকাতা ও জলপাইহাটি এই দুই জায়গার মধ্যেই চলাফেরা করেছে, আর তাতেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের ইতিহাস।

'জলপাইহাটি' উপন্যাসের নায়ক কলকাতায় ঘুরে বেড়ায় চাকরির খোঁজে। এই দিয়েই উপন্যাসের সুরু। আর চাকরির খোঁজার সুবাদে দেশভাগের নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি কলকাতার কয়েকজন পুরনো বন্ধু ও পরিচিতের মনের চমৎকার হদিশ মিলে যায় নিশীথ সেনের। মফস্বল কলেজের পুরনো চাকরি এবার নিশীথকে বিল্বপত্র শোঁকাবে, সে পাকা ধারনা নিয়েই নিশীথ মঞ্জুর হোক না-হোক লম্বা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে কলকাতায় গেছে ভাগ্যের সন্ধানে। কেননা গভর্নিং বডির জমায়েতে প্রিন্সিপালের ঘোষিত অভিমত হল, 'একশো সোয়াশো টাকায় খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, কলেজ গুঁতোচ্ছেন হাঁড়িচাচা পাখির মতো চেঁচিয়ে। বেশ, বেশ আছেন। কেন মাইনে বাড়িয়ে আমড়াগাছি শিখিয়ে মাথা খারাপ করে দেবেন তাঁদের ?' সেদিনের সামাজিক প্রতিষ্ঠাপট থেকে প্রায় মুছে-যাওয়া বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক সেন তাঁর আত্মচিন্তার মধ্যে পরিষ্কার বুঝে নিয়েছেন,—'ছেলে, অধ্যাপক বা গভর্নিং

বাড়িগুলোকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। দোষ বাংলা-দেশের বিশ শতকের ভেতরে যে ধ্বংসের কীট রয়েছে—দিনের পর দিন তার শ্রীবৃদ্ধির।···দেশের ভিতর মাস্টারির চিতা জ্বলছে আজ দিকে দিকে। মাস্টারদের কোনো বন্ধু নেই আজ। ছেলেরা গ্রাহ্য করে না মাস্টারদের : খুব সম্ভব কম মাইনে পায় বলে, গভর্নিং বডি চোখ উল্টে কথা বলে : খুব সম্ভব কম মাইনে দিয়ে এইসব নিরীহ তালকানাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এত সহজ এত চমৎকার বলে।···একজন ওস্তাদ বাবুর্চি বা মোটর ড্রাইভার যে টাকা পায় ইউনিভার্সিটির একজন লেকচারার যদি তার চেয়ে কম পায় তাহলে সাধারণ স্কুল কলেজের মাস্টাররা কি পায় কি খায় সেদিকে কি নজর পড়বে না মার্কসিস্ট বা কংগ্রেসী বিপ্লবীদের ?' স্বাধীনতার সমসাময়িক সমাজ-পরিবেশের চেহারা নিশীথের চোখে আজ আর কোনো প্রত্যাশার ধোঁয়ায় ঝাপসা নয়, জলের মতো পরিষ্কার। নায়কের স্পষ্ট ঘোষণা—'সব নেতাদের সব কথা শোনা হয়ে গেছে। এখন নমুনা চাই'। নিশীথের হতাশাকে, তার নিরুপায়ত্বকে জীবনানন্দ ভাষা দিয়েছেন—'মাস্টারি করবার শক্তি ছাড়া কিছু নেই এখন আর নিশীথদের, অন্য কোনো দিকে রুচি নেই। এজন্যেই কি টাকার বেকায়দায় ফেলে মাস্টারদের পথে দাঁড় করিয়ে দিতে হয় ?···যারা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তারাও যেন কেউ নয়, শূন্যের ভিতর শূন্য। যে-সব ছেলেদের চব্বিশ বছর ধরে পড়িয়েছে সেই সব শূন্য।' তবু তার ভিতরকার জীবনাদর্শ এবং ঐকান্তিক শুদ্ধতা বোধ তাকে মুখ থুবড়ে পড়তে দেয় নি। একদিকে ছেড়ে-আসা জলপাইহাটির মায়া, অন্যদিকে কলকাতায় পুনর্বাসিত হবার আপ্রাণ সংগ্রাম—এই দুটো বিপরীতে নিহিত 'ক্ষেম-সূর্যের মুখ' কখনো তার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায় নি। 'অবক্ষয় উত্তীর্ণ করে ক্ষেম-সূর্যের মুখ দেখাকে অপর যুগের সত্য বলে গ্রহণ করা চলতে পারে। কিন্তু সেই অপর যুগ কি এমনি এমনি আসবে ?' তার সংকল্পের ভিতরে সংশয় জেগেছে কখনো। 'নিজে নিশীথ এদের মতন অচেতন থাকলেই তো পারত। কেন দেখতে বুঝতে অনুভব করে নিতে গেল। সময়ের আঙুলের নির্দেশে সেই বিম্বিসারের থেকে আজকের স্ট্যালিন-ট্রুম্যানের কবলিত মানুষদের (জন্যে) যত পথ থেকে পথান্তরে স্ফুরিত বিবর্তিত নীত নিহত হতে রাজি হয়ে গেল সে ···অচেতন অন্ধকার সময়কে মর্যাদা দেবার জন্যে।'

কলকাতায় জিতেন-অমিতাদের বাড়ি থাকতে গিয়ে তাদের বৈভব বিলাস, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাঁচার অন্তঃসার ফুরিয়ে-যাওয়া-রূপ দেখেছে নিশীথ। স্কটিশের সহপাঠী রবিশংকর মজুমদারের সঙ্গে পথে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা বলেছে। প্রফেসার ঘোষের বাড়ি ধর্না দিয়েছে চাকরির আশায়। মোহিতা তাকে নিষ্প্রাণ সৌজন্যে আপ্যায়িত করেছে। প্রফেসার ঘোষের দৌবারিক রিপেনের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তায় এ উপন্যাসে আশ্চর্য গল্পহীনতা ফুটে আছে লেখার অনেকটা অংশ জুড়ে। মোহিতার সঙ্গে আলাপেও 'জলপাইহাটি'র গল্প কোনো গতি পায় নি। একটা নতুন পরিস্থিতির আলাদা আলোয় নিজেকে উদ্ঘাটন, অথবা নিজেকে আর নতুন

পরিস্থিতিটাকে জড়িয়ে ব্যক্তিসীমা অতিক্রম-করা অচেনা কোনো জীবনবৃত্তকে ছুঁয়ে নেওয়া—এ সব দৃশ্য উপস্থাপনের মূল্য হতে পারে। কলকাতার কলেজের প্রিন্সিপাল ভাইস-প্রিন্সিপাল পদের একদা-সহপাঠী কুলদা বা জয়নাথের কাছে গিয়েও নিশীথ নিজের জন্য মাস্টারি চাকরির কোনো ব্যবস্থা করতে পারে নি। জলপাইহাটির পাড়াগাঁর স্মৃতি নিয়ে স্বপ্ন, আর কলকাতাকে ধরে চাকরির চেষ্টার সংকল্প—এ দুয়ের টানাপোড়েনে নিঃস্ব নিশীথ ফিরে এল গ্রামের বাড়িতে। তখন সুমনা সংসার ছেড়ে চলে গেছে।

'এ সব জিন পরীদের ব্যাপার দেখবার জন্য ঘরানা মেয়ে সুমনা কোথাও নেই—নিশীথ নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল। খুবই নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল তাকিয়ে দেখল ওয়াজেদ আলি সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিশীথের ; সারারাতই থাকবে হয়তো ; দরকার হলে চিররাত। কে কার জন্যে থেকে যাচ্ছে সেটা বলা কঠিন, কিন্তু এরা সকলেই যেন সময়ের শেষ হিরণ্যগর্ভ রাত অব্দি রয়ে যেতে পারে এ ঘরে জীবনের মানে নিয়ে।...যেন চেনা সময়ের মৃত্যু হচ্ছে অন্ধকার পৃথিবীতে ; কিন্তু তবুও রাতের বাতাসে সারাৎসার, তারার আলো উজ্জ্বল, চোখ বুঁজে মহিমান্বিত দার্শনিকের মত ওয়াজেদ আলি সাহেব দাঁড়িয়ে।'

পৃথিবীতে চেনা সময়ের মৃত্যুর অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়েও নিশীথ, জীবনানন্দের সব উপন্যাসের নায়কেরা, উজ্জ্বল তারার আলো, রাতের বাতাসের সারাৎসার নির্ভুলভাবে চিনে নিতে পারে। প্রেরণার এই অন্তর্মগ্ন দীপ্তি ক্ষণকালের শূন্যতা বোধকে সরিয়ে দেয়। জীবনানন্দের কবিতায় যেমন, উপন্যাসগুলিতেও সেই 'ক্ষেম-সূর্যের মুখ'-দেখার নিত্যতা অবিরল।

'বাসমতীর উপাখ্যান' আমাদের আলোচনার শেষ উপন্যাস। এখানে সিদ্ধার্থের ভূমিকাকে প্রধান মনে রেখেও বলা যাবে, এ বই কোনো নায়কের মুখ-চাওয়া নয়, একটা গোটা জনপদের জীবন-সমস্যা, বরং জীবনের একটা চলাচলের বৃত্তান্ত সমানুপাতে বলা। এখানে সিদ্ধার্থ আর তার সংসার আছে। হুঁপানির রুগী সুনীতি সিদ্ধার্থের স্ত্রী। দপ্তরী আর কুড়ানি ছেলেমেয়ে। গ্রামের ইস্কুলে তাদের হেলাফেলার লেখাপড়া। নিজের ভাবনা কল্পনা, বাসমতী কলেজের অধ্যাপনা আর সমাজ-কল্যাণের জোটানো কাজে জড়িয়ে গিয়ে সংসার কিংবা ছেলেমেয়ের পড়াশুনো দেখা হয়ে ওঠে না সিদ্ধার্থের। পোস্ট অফিসের ইন্‌স্পেক্টর প্রভাসবাবুর ট্যুরের চাকরি, সুন্দরী মেয়ে রমার জীবন ও কলেজ, কলেজ-প্রিন্সিপ্যালের অশালীন ধূর্ত ব্যবহারে তার ক্ষোভ। বাসমতী কলেজ এবং অঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষা সংক্রান্ত একটা পরিমণ্ডল। বিদেশী মিশন ও মিশনারীদের তৎপরতার ভিতর দিয়ে এ জনপদের চলাচলে সম্ভাব্য কোনো নতুনের ইশারা। প্রায় লুপ্ত ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠানগত অবমূল্যের স্মৃতি-পীড়া আর স্বপ্ন-প্রত্যাশা। আসন্ন স্বাধীনতা নিয়ে হিন্দু মুসলমানের দেশ-ভাগাভাগির দুর্ভাবনা। জিরেনডাঙার মুসলমান পল্লীতে কলেরার মহামারী, কলেজের ছাত্রশিক্ষকের দল নিয়ে

সিদ্ধার্থের সেবামূলক কর্মোদ্যোগ। এ অঞ্চলে উন্নত মানের একটি হাসপাতাল খোলা গেলে মানুষের যথার্থ উপকার-সিদ্ধার্থ ভাবে। আর সবার উপরে গঞ্জ-গ্রাম (গণ্ডগ্রাম নয়) বাসমতীর (চমৎকার ফলনের বাসমতী ধানের মতোই) মায়াধরানো প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতি অবোধ অভিভূত নাড়ির টান।

'বাসমতীর উপাখ্যান'-এর কাহিনী কখনো এ অঞ্চলের চৌহুদ্দি পেরোয় নি। 'জলপাইহাটি'র নায়ক নিশীথ সেন পাড়াগাঁ ছেড়ে কলকাতার কলেজে কলেজে চাকরি খোঁজে। 'বাসমতীর উপাখ্যান'-এর সিদ্ধার্থ সেন বলে 'বাসমতীতে টিঁকে থাকা সম্ভব হলে বেঁচে যেতে পারি, কিন্তু কলকাতায় গেলে তলিয়ে যাব'। আসন্ন স্বাধীনতার অনিশ্চিত পরিবেশে বাঙালী মানসের বিকাশের একটা চেহারা এ উপন্যাসে ধরা পড়েছে। বাসমতী-জলপাইহাটির দুটি পল্লী-পরিমণ্ডলেই দেশের ইতিহাসের বিপন্ন মুহূর্তগুলি রূপবন্ধ হয়েছে জীবনানন্দের কলমে। 'মাল্যবান'-এর উপসংহারের মতো নয়, 'বাসমতীর উপাখ্যান'-এর সমাপ্তি 'সুতীর্থ'-এর মতোই সুনিশ্চিত। যেমন সুতীর্থের মতো স্বয়ম্ভর মানুষের তুলনা কেবল এখানকার সিদ্ধার্থের সঙ্গেই।

জীবনানন্দের অন্যান্য উপন্যাসে সাধারণত একজনই 'বোধ'-সম্পন্ন মানুষ। আর সেই 'বোধ' জনিত যন্ত্রণা সইবার দায় একাই তার। বাসমতী উপন্যাসে সে বোধের দায়-বিবেক অনেকের চেতনায় ছড়ানো। স্থানিক সমস্যা, আত্মপরায়ণতার ছোট্ট গণ্ডীতে একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ সুবিধা, ক্যালেণ্ডার-নির্ভর খণ্ড সময়ের সুযোগ-দুর্ভোগ—এ সবের নিরেট ঘটনায় মথিত হতে হতেও কোনো কোনো ব্যক্তির আত্মায় কখনো ঝিকিয়ে উঠছে অনিমেষ সময়ের পটে নিত্যের স্থির আভা। জীবনানন্দের অন্য উপন্যাসে এই আত্মা-মুক্তির অবকাশগুলো নায়কের চিন্তায় দ্বন্দ্বের সূচিমুখ যন্ত্রণার মতো। 'বাসমতীর উপাখ্যান'এ এই অবকাশ মানুষের অস্তিত্বের তুচ্ছতা চিনিয়ে দিয়েও চিরন্তনের অনির্বচনীয় আলো এনে দিচ্ছে।

এ উপন্যাসে শুধু সংলাপই (dialogue) নেই, তাছাড়াও আছে দুয়ের বেশি মানুষের আড্ডা মজলিশ আলাপ। সম্ভবত এই উপন্যাসেই কেবল বাংলার পাড়াগাঁ অধিকাংশ মানুষের আবেগে মননে কল্পনায় পর্যাপ্তভাবে মাখামাখি হয়ে আছে।

'কলকাতায় গেলে তলিয়ে যাব'—সিদ্ধার্থের এই ভাবনাটা অবস্থা আর মানসিকতার এক এক ধরণে এক এক জনের অন্তর থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। পোস্ট অফিসের ইন্‌স্‌পেক্টর, রমার বাবা প্রভাসবাবু যে পরিভাষায় এই ইচ্ছে প্রকাশ করেন, ব্রাহ্ম সমাজের বড় কমলবাবুর ছেলে নীরেন (ডাক নাম ফাটা) কলকাতা বাসে বিপুল অর্থাগমের সুযোগ আছে জেনেও বাসমতীর জন্য একই আবেগ অন্য ভাষাভঙ্গিতে প্রকাশ করে। বস্তুত জীবনানন্দের সব উপন্যাসেই পাড়াগাঁর জন্য একটা সহজ অনায়াস প্রাণের টান। হয়ত কোথাও তা বিরহ কাতরতার মতো, কোথাও বা রুদ্ধশ্বাস নাগরিকতার থেকে অব্যাহতি খোঁজার সূত্রে, আবার কখনো তা অস্তিত্বেরই স্বতঃস্ফূর্ত তাড়নায়।

এবার বই থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করব :

১. 'রমার বয়স উনিশ—বাসমতী কলেজে বি. এ. পড়ছে। খুব চমৎকার ধানকেই বাসমতী বলা হয়—রমার চেহারা ও ফলন্ত মন এই গভীর নিবিড় ধানের মতন—এই চালের মতন। এর চেয়ে বেশি সুন্দর কী থাকতে পারে পৃথিবীতে? কলকাতা গেলে রমা শিরোপা পেতে পারে অনায়াসেই মহারাণী হিসেবে, কিন্তু বাসমতীতে থাকাই তার ভাল। নগর তাকে নষ্ট করে ফেলবে, বিকাশের বিশুদ্ধি—ক্রমেই আরো বিশুদ্ধি, শেষ পর্যন্ত একটা ঐশী সার্থকতা, বাসমতীতেই সম্ভব হবে। রমার কথা মাঝে-মাঝে মনে হলে এ-রকম ভাবে মন নাড়া খেয়ে যেত সিদ্ধার্থের, ।'

সিদ্ধার্থের অনুভবে রমা যেন সুফলা পল্লীপ্রকৃতির তুলনা। তার 'বিকাশের বিশুদ্ধি' চমৎকার বাসমতী ধানের মতোই আপন মনে। 'কলকাতা গেলে…নগর তাকে নষ্ট করে ফেলবে'—এই ভয়-ভিত্ সিদ্ধার্থের মনে, ভাষায় উচ্চারিত না হলেও অন্যান্য নারী পুরুষের মনে। বাসমতী ধানের 'চেয়ে বেশি সুন্দর কী থাকতে পারে পৃথিবীতে'? বাংলার পাড়াগাঁকে কোলে তুলে নিয়ে এমন আদর-করা ভাষা জীবনানন্দের কবিতায়, উপন্যাসে।

২. স্টিমারের ডেকে বসেছিলেন (প্রভাসবাবু) সকালবেলার রোদে—চারদিকে পূব বাংলার সরু-সরু উঁচু-উঁচু অগাধ সুপুরিগ্রীব নীলচে বনানী। আরো গাছ আছে ঢের : জারুল, জামরুল, শিশু, শিরিষ আম, মহানিম, ঝাউ—প্রকৃতির বিরাট পরিভাষা, শক্তির মত! রোদের ভেতরে আলোকিত হয়ে কথা বলছে নদীগুলো—ঘুরে চলেছে নদীদের শাখা। কিন্তু কথা কার সঙ্গে? যারা স্টিমারে চলেছে তাদের ভেতর এক-আধজন মানুষের সঙ্গে খুব সম্ভব। আরো ঢের মহত্তর মন আছে—পৃথিবীতে, অদৃশ্য শূন্যেও হয়ত, তাদের সঙ্গে।

বিষয়-বুঝিয়ে-লেখা গদ্যভাষা জীবনানন্দ লেখেন নি। বিষয়-সংক্রান্ত ভাবনায় বোধ উস্কে দেওয়ার কাব্যঘেঁসা ভাষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করে তিনি তাঁর কথাসাহিত্য গড়েছিলেন। এ ভাষা বয়ানে বর্ণনা করার সামগ্রীগুলি ঠিকঠাক আছে স্টিমার, ডেক-চেয়ার, সকালবেলার রোদ, দূর পাড়ে সার বাঁধা সুপুরি গাছের সবুজ, আরো অন্য অন্য চেনা-নামের গাছ, নদীর প্রবাহ ইত্যাদি। ভাষার সেই-সব উপাদান-সামগ্রী লেখকের শিল্পচেতনায় পেঁৗছে অর্ধ-পরিচিত কোনো পরিভাষায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। লেখকের কথায় তা 'প্রকৃতির বিরাট পরিভাষা'। এই পরিভাষার বয়ান বোঝবার জন্যে 'আরো ঢের মহত্তর মন আছে—পৃথিবীতে, অদৃশ্য শূন্যেও হয়ত'। সংসার চালানো যে ভাষা নিয়ে সচরাচর আমরা ঘর করি, ঘর ভাঙি, জীবনানন্দের উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার ভর কেবল সেখানেই নয়। প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে মানুষ যেখানে আরো পূর্ণ, আরো সমগ্র, জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের ভাষা জীবনের সেই উঁচু তল থেকে আহরণ করা।

অধ্যাপক রজনী নান-এর হারানো গোরু খুঁজতে জিরেনডাঙার কশাই পাড়ায় গিয়ে সিদ্ধার্থের দৃষ্টিতে হঠাৎ কেমন এক আশ্চর্য পটভূমি খুলে গেল। 'দা নিয়ে তেড়ে এসেছিল। ওদের মাতব্বররা মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দিল। তারপর একটা কিছু ঘটল, ওদের মনে। চারদিককার আবহাওয়ার ভেতরেও, মানুষের ইতিহাসের ভেতরেও যেন, যার পরে ওরা আর-এক রকমের জিনিশ হয়ে গেল। ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে তামাক খেতে বসল তারপর,...।' যেন এই দেখার তাৎপর্য খানিক বুঝেছে, এমন ভেবে রমা বলল, 'তুমি রক্তমাংসের মানুষগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে টের পেয়েছিলে চারদিককার চৈতন্য বিশুদ্ধ হয়ে যেন ছবিতে ফলে উঠেছে। প্রথমে আত্মঘাতের ছবি, তারপরে আত্মরক্ষার, তারপরে ভবিতব্যতার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর অতীত পর্যন্ত খোঁজার ইহলোক বা পরলোক নয়, অন্য কোথাও, ঠাণ্ডা হয়ে বসে তামাক খাবার। এটা কশাইপাড়ার ছবি শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবীরই।' প্রভাসবাবু এ প্রসঙ্গে ভূত-দেখার কথা তুললে সিদ্ধার্থ তাব মনের কথাটা তখন বলল। 'ভূত দেখা, তাসের খেলা, ও-সব মোটা কথা। আমি যা দেখবার কথা বললাম সেটা আমার মনে হয় সময় সম্বন্ধে একটা নতুন জ্ঞান, জীবনের মানে সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অর্থ, প্রতিদিনে দেখা জিনিশকে অন্য জিনিশে দাঁড় করিয়ে স্বরূপের ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ সত্যস্বরূপকে দেখা। ধ্যান করে স্থির করতে যাওয়া এক জিনিশ, চোখ মেলে স্পষ্ট দেখে ফেলা অন্যরকম। আমি সাধারণ জিনিশকে পাঁচজনের মত চোখ মেলে কিরকম অসাধারণ হয়ে উঠল দেখলাম আজ।'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে আত্ম-উদ্ভাসনের (revelation) একাধিক মুহূর্ত এসেছিল। দশ নম্বর সদর স্ট্রীটের বাড়ির কোনো সকালে রবীন্দ্রনাথেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হওয়ার কথা আমরা জানি। F. C. Happold-এর লেখা 'Mysticism, A study and an anthology' বইখানা পড়লে আরো অনেক Nature-mystic এর এই উদ্ভাসনধর্মী অভিজ্ঞতার কথা জানা যাবে। আসলে, বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিত্বে চলে যাওয়ার অনায়াস প্রবণতা যে-সব মানুষের ভিতর থাকে, এই প্রক্রিয়াটা তাদের অন্তরে হঠাৎই স্বয়ংক্রিয় ভাবে জেগে ওঠে। জীবনানন্দের সব উপন্যাসেই প্রায় এই ধরনের আত্ম-উদ্ভাসন চোখে পড়বে।

বাসমতী গ্রামের চাঁদ কখনো কোনো 'প্রয়োজনে স্বাগত কেমন যেন সত্য পারমিতা দেবীর মত', কখনো 'সিদ্ধার্থের পেছনে আকাশে মিশরের দেবীর আধুনিক রেডক্রশ সংস্করণের মত চাঁদ'। এমন অজস্র প্রতীকে জীবনানন্দের উপন্যাস লেখা। দৃশ্যের স্বাভাবিক রূপের বদলে জ্যামিতিক রূপের প্রসঙ্গ এনে কখনো অন্ধকারকে বর্ণনা করতে, কখনো মানুষের সম্পর্কগুলোকে জটমুক্ত করতে জীবনানন্দ পশ্চিমী শিল্পী সেজান্-পিকাসোর মতো রূপের বহুস্তরিত বিস্ময় সৃষ্টি করে গেছেন। বনচ্ছবি একটু এগিয়ে গিয়ে ফাটার পায়ের সমান্তরাল অসংখ্য পায়ের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে...। কিন্তু পা নয় ওগুলো—অন্ধকার; কোনো জ্যামিতিক রেখার মত নয়—বিভোল বিন্যাসে রাশিরাশি হয়ে দেখা দিচ্ছে যেন এখন।' বনচ্ছবি আর

নীরেনের সংলাপে : 'কিন্তু সেন সম্বন্ধে এটা যা ভেবে রেখেছ তুমি—তা খুব ভুল হল। সেন সুনীতিদি আর আমাকে নিয়ে…ত্রিভুজ সৃষ্টি হয় না।…আমি আবার এদিকে একটা অক্টোগন এঁকে বসেছি। কারো জীবনে ত্রিভুজের চেয়ে অক্টোগনই সত্য? তিনটে বিন্দুর জায়গায় আটটা বিন্দু বসাতে হবে। আমি এও দেখছিলাম গণিত সংক্ষেপে কত কথা বলতে পারে।'

মানুষের চেতন-অবচেতন কখনো একাকার হয়ে গেলে সময়ের নতুন জ্ঞানে জীবন জগৎ কত অমেয় হয়ে ফোটে, বাসমতীতে—জীবনানন্দের অন্য উপন্যাসেও আমরা দেখেছি। কিছু দৃষ্টান্ত : 'অনেক লেখাপড়া শিখেছে সে (নীরেন) তারপর, যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে কেটে ফেলেছে সে—কিন্তু বাসমতীর সেই বিশ্বাসের পাত্রদের কাটতে পারে নি। ঈশ্বর নেই—কিন্তু বাসমতীর সেই মাঘোৎসবের রাতের ঈশ্বর বেঁচে রয়েছে আজও। ধর্ম বিশেষ কোনো ভাব জাগায় না এখন আর তার মনে, কিন্তু তার বাবা, অবিনাশবাবু, দেববাবু, নিশিকান্ত চক্রবর্তী শীতে অন্ধকারে দরিদ্রতায় যে-ধর্মকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন অবচেতনার ভেতরে চেতনায় রয়েছে সব—মিথ্যা হয়ে নয় সত্য হয়ে নয় কিন্তু তর্কোত্তর এক অপরিমেয় অস্তিত্ব হিসেবে'।

রাত সাড়ে আটটা বেজে যাবার পরেও দপ্তরী কুড়ুনি বাড়ি ফিরে না এলে— 'সুনীতি তার চোখের আংটির মত বৃত্ত যেখানে ভূমার পরিধির ভেতর মিশে গেছে সেই গাছগাছালি ও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললে,—আমি ওদের ঠিক মা হতে পারিনি। সিদ্ধার্থ বললে—আমাদের চেতনা পাঁচ সাত রকম ভাবে—আমাদের অবচেতনাও; সব মিলে কে কী ভাবে বলা কঠিন। আমার বাবা হ্যারিকেন নিয়ে শীতে বেঘোরে বেরিয়ে পড়তেন মনে আছে আমার, পারলে মা ছাড়িয়ে যেতেন বাবাকে, কিন্তু আমি চুরুট টানছি, হাঁটছি, তুমি বসে আছ। কিন্তু তারা যে বোধ করতেন, আর আমরা যা বোধ করি, তার ভেতর খুব বেশি উনিশ-বিশ আছে বলে মনে হয় না আমার।'

'বনচ্ছবি গুটি গুটি চলে যেতে যেতে ভাবছিল—…সেনের সঙ্গে আজ রাতে দেখা না হলে কিছুতেই চলবে না।…সেনের তো অনেক ঘাটি; কোন ঘাটিতে পাওয়া যায় দেখা যাক। কোথাও না পাওয়া গেলে বাসমতীর মাঠে আজকাল অনেক রাতে সেনকে দেখা যায় নাকি—তা কেউ কেউ বলাবলি করে চিরদিন ধরে শুনছিল বনচ্ছবি। সেখানেও যেতে হতে পারে।' 'আজকাল দেখা যায়, চিরদিন ধরে শুনছিল'—কথা দুটোর ওজনে আয়তনে অনেক ফারাক। কিন্তু 'চোখের আংটির মত বৃত্ত যেখানে ভূমার পরিধির ভেতর মিশে গেছে', সেখানে এই ফারাক আর নেই। সময় নিয়ে ক্ষণত্ব-চিরত্বের 'শুক-সারী' কলহের কৌতুক চুকে গেলে 'তর্কোত্তর এক অপরিমেয় অস্তিত্ব' জীবনবোধের ভিতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানেও 'যেতে হতে পারে'—বনচ্ছবির এই উক্তির অর্থের দুটো তল। প্রথম তলটি উপন্যাসের ঘটনা-সম্বন্ধী। দ্বিতীয়টি জীবনানন্দের কাব্যভাবনার। সময় ধরে স্মৃতি-সম্প্রীতির এই গাঁটছড়া জীবনানন্দের 'বাসমতীর উপাখ্যানে', তাঁর অন্য উপন্যাসে।

এ আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দের একটি প্রবন্ধ ('কবিতা ও কঙ্কাবতী') স্মরণ

করি। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা নিয়ে এই প্রবন্ধ। এ লেখায় তিনি বলেছেন 'আজকালকার দিনে কোনো কোনো পাঠক বা সমালোচক, এমন-কি কবিও, অনুপ্রেরণাকে স্বীকার করতে চান না ; তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্যের থেকে ভাবাবেগের জন্ম হয় শিল্পীর। (তাঁদের মত হল) কবির হৃদয়ে ভাব আবেগের জন্ম যা হয় বরং হোক, কিন্তু তাঁর কবিতা নতুন সৃষ্টি জারিত হলেই হবে না, হবে সামাজিক সমস্যা জারিত···। (তাঁর মতে) কবি তো সেই মানুষই যিনি সত্যকে অনুভব করতে পারেন এবং ভাষার আবেগ প্রদীপ্তির সাহায্যে আমাদের হৃদয়ের ভিতর পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। আমার মনে কেমন একটা অস্বস্তিকর ধারণা জন্মেছে যে আমাদের দেশে আধুনিক কোনো-কোনো সমালোচক কবিকে ছোটখাট বিবেকানন্দ, কিংবা ঠিক বলতে গেলে, পূর্ণাবয়ব শিবনাথ বাড়ুয্যে হবার উপদেশ দিচ্ছেন।···কবি নিজের চিত্তের আবেগেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। তার কাব্যের ভিতর গৌণভাবে নানা রকম সংস্কারের বীজ অনেক সময় প্রকাশিত হয় যদিও।'

জীবনানন্দের উপন্যাসে গদ্যভাষার দুটো তল। ভাষার উপরিতল এক নজরে (সাধারণ পাঠকের চোখে) অগোছালো, খাস্ না হলেও ব্যাকরণের আম-আইনটাও যেন মানতে না চাওয়া। ভাষার অন্য তলের গড়নটা এইরকম—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বললে একজন বক্তার উচ্চার্য শব্দরা যেমন সহজে আগে-পরে এখানে-ওখানে অনায়াসে বসে যায়, জেগে-থাকা মানুষের সচেতন কথা-বলায় যা সচরাচর দেখা যায় না, জীবনানন্দের উপন্যাসের গদ্যভাষা যেন সেইভাবে বলা। 'বলা' বলছি, 'লেখা' বলিনি' কেননা কাগজে কলমে নিজেকে কোনো একটা প্রকাশ্যে পৌঁছে দেবার যে জরুরী সতর্কতা একজন লিখিয়ের থাকে, কথার গোছটা এসেই যায়, জীবনানন্দের লিখিত রচনায় সে ব্যাপার জোরালো নয়। অথচ লিখিয়ে জীবনানন্দের কলম থেকে মুখে-মুখে কথা বলার, অনেক সময় আধো-জাগা / ঘুম-পাওয়া মুখের উচ্চার্য ভাষা এক অদৃষ্টপূর্ব পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধই হয়ে আছে তাঁর নিজস্ব বাক্‌শৈলী জুড়ে। কমায় কোলনে সেমিকোলনে ঠেকানো এক একটি বৃত্তচাপের মতো কথার ভাগ দিয়ে আগের বাক্য-অংশকে পরের বাক্য-অংশের দিকে ঠেলে দেওয়া। যতিচিহ্নগুলো তার প্রয়োগে সতত বিরামের অবকাশ আনছে না। ভাবে নয়, শ্বাসেও যেন নয়। ওগুলো spiral রীতিতে লেখকের ভাবনাকে বাহির থেকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার শক্তিগ্রন্থি যেন। সংলাপ অংশগুলোতে নয়, তারই আগে-পরে লাগোয়া ভাবনা-অংশগুলোতে (আর সেটাই উপন্যাসের অধিকাংশ) এই রকমের চিন্তা-আবর্ত, আবর্তের পর আরো গুরু আবর্ত তৈরি হয়ে গেছে এ সব উপন্যাসের ভাষায়। আমাদের উদ্ধৃত উদাহরণগুলো তার খানিক প্রমাণ দেবে। সবটা বোঝা যাবে অন্বিষ্ট পাঠে।

তাঁর উপন্যাসে নায়ক তো বটেই, প্রত্যেক ব্যক্তিই আশ্চর্যভাবে এক্‌লা। এক্‌লা হওয়ার, নিরালা হওয়ার সুযোগও মিলেছে লেখকের রচনা-রুচি থেকে। আর তাদের প্রত্যেকের গুণ্‌গুণ্ ভাবনা মৌচাকের প্রতি মৌমাছির দুলেদুলে ওড়ার মতো আলাদা আলাদা হয়েও চূড়ান্ত কোনো ছন্দের ঐক্যে গাঁথা পড়ে গেছে। জীবনানন্দের কবিতায়

যেমন 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা' বলা, গদ্যেও তেমনই। থীম্-এর সঙ্গে চমৎকার মানানসই ভাষার এ চাল।

সংলাপ অংশের ভাষাস্থানগুলি আবেদনে অন্য স্বাদের। সে ভাষা কাটা-ছাঁটা। প্রশ্ন করা আর তাব সোজা জবাব দেওয়ার মতো। যে প্রশ্ন করছে সে যেন প্রশ্ন করতে আদৌ চায় নি। যে জবাব দিচ্ছে, সে দায়ে পড়ে দিচ্ছে। এই প্রশ্নোত্তর-ক্ষেত্র থেকেই কিন্তু পরের নির্জন চিন্তাক্ষেত্রে সরে যাওয়ার রসদ পাচ্ছে ভাষা, গড়ন নিচ্ছে। এ যেন সাপলুডোর মতো, ঘুঁটির মুখে সাপও আছে, সিঁড়িও আছে। এর চলনের তল-বদল-করা উত্থান-পতনগুলো আগে থেকে যেন ভাবা নয়। উপন্যাসের ভাবে যেমন মুহুর্মুহু ঘুমিয়ে পড়ার এবং স্বপ্নে জেগে ওঠার ইশারা আছে, ভাষাতেও ঠিক তদনুযায়ী মুন্শিয়ানা প্রস্তুত পাঠকের চোখ এড়াবে না।

আমাদের কথা হল, শিল্পসৃজনের এই ভাবনা মেনেই জীবনানন্দ কবিতা লিখেছিলেন, উপন্যাস লিখেছিলেন।

জীবনানন্দের উপন্যাসকে lyrical novel বললে ভুল হয় না হয়ত। গীতিকবিতার 'আমি' এবং গীতিকাব্যধর্মী উপন্যাসের 'আমি'তে তাদের অবস্থানের মাত্রাগত কিছু ভেদ থাকে। প্রথম ক্ষেত্রের 'আমি'তে কর্মত্বের কোনো ভাগাভাগি নেই। যেন, মানুষের অহংকার পটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প। কিন্তু গীতিকাব্যধর্মী উপন্যাসে এই অস্মিতার দুটো ভাগ। এক ভাগে শুদ্ধ নিরঙ্কুশ আমিত্ব। অন্য ভাগে উপন্যাসের ঘটনা-পরিস্থিতিতে চরিত্র (কখনো প্রধান চরিত্র) হয়ে সমগ্র জীবন বিষয়কে সকলে মিলে একটা ভাব-অথবা বস্তু-পরিণামে ঠেলে তোলার যৌথ চেষ্টা। প্রধান চরিত্র হয়েও এই ভাগের 'আমি' উপস্থাপ্য বিষয়ের জটে যতটা নিষ্ক্রিয়, চালিত থাকে, ততটাই নৈর্ব্যক্তিক গীতিভাবনা তার চেতনার সত্য হয়ে প্রকাশ পায়। 'The world he (the lyrical novelist) creates from the materials given to him in experience becomes a 'picture'—a disposition of images and motifs—of relations which in the ordinary novel are produced by social circumstance, cause and effect, the schemes fashioned by chronology. The lyrical process expands because the lyrical 'I' is also an experiencing protagonist. The poet s stance is turned into an epistemological act.'

তথ্যসূত্র :

১. জীবনানন্দ সমগ্র, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম খণ্ড, / প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স

২. প্রতিক্ষণ শারদীয় (১৯০) পত্রিকা

৩. শিলাদিত্য (১৯৮১-৮২) পত্রিকা

৪. পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা / অশোক মিত্র

৫. Selected Prose / T. S. Eliot / Penguin Books.

৬. The Lyrical Novel / Ralph Freedman / Princeton University Press (3rd Printing 1966)

৭. Axel's Castle / Edmund Wilson / The Fontana Library.

অরুণকুমার ভট্টাচার্য

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : রোমান্টিক অতীতচারিতার মগ্ন

অনেক সময় লেখকের সৃষ্ট কোন এক চরিত্রের অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা লেখকের সঠিক মূল্যায়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই একজন ঔপন্যাসিক। তিনি যতটা সত্যান্বেষী গোয়েন্দা ব্যোমকেশ-এর স্রষ্টা বলে পরিচিত, ততটা ঔপন্যাসিক রূপে নন। অথচ ত্রিশের দশকে বাংলা উপন্যাসে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং জীবন-দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণ লেখক গোষ্ঠী যে মুক্তির আনন্দে মেতে উঠেছিলেন পরবর্তীকালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বহু অনুসৃত ধারায় অবগাহন না করে নৈর্ব্যক্তিক স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে গেছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে যেমন 'কল্লোলের' কোলাহল শোনা যায় না, তেমনি ত্রিশের দশকের গ্রাম বাংলার রূপকার বিভূতিভূষণ, তারাশংকর কিংবা সরোজ রায়চৌধুরী প্রমুখদের উপন্যাসের মত বাংলাদেশের কোন সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের সীমারেখাও পাওয়া যায় না। তিনি জগদীশ গুপ্ত কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গভীর জীবন জটিলতার মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেন নি, তাঁর উপন্যাসগুলি মনন প্রধানও নয়; কিন্তু তিনি সুসংবদ্ধ, সুপরিমিত ও চিত্তাকর্ষক আখ্যানবস্তুর সাহায্যে সবক্ষেত্রেই তাঁর রচনাগুলিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে অতীতচারিতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তার রচনাগুলি প্রচলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ মোঘল যুগের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে যাঁরা ইতিহাস থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই আমাদের পরিচিত ইতিহাসকেই কাহিনী বিন্যাসের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সুদূর অতীতে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই অনালোকিত স্বপ্নময় অতীতকে সুললিত ভাষার মায়াজালে আবদ্ধ করে ইতিহাস এবং কল্পনার সংমিশ্রণে এক রোমান্টিক জগৎ তৈরী করেছেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই অতীত যুগের পটভূমিকায় বিধৃত। এর মধ্যে 'কালের মন্দিরা' (১৩৫৮), 'গৌড়মল্লার' (১৩৬১), 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' (১৩৬৫), 'কুমার সম্ভবের কবি' (১৩৭০), 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে' (১৩৭৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাস্তবধর্মী জীবনবাদী ঔপন্যাসিক রূপে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন নি। বিশেষ করে যে সময়ে বাংলা উপন্যাসে পাশ্চাত্যের নতুন নতুন জীবন দর্শনের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল, সেই সময়ে তিনি নিজস্ব রীতিতে এবং ঐতিহাসিক কল্পনার সাহায্যে অতীত যুগের অজানা জীবনধারার রূপরেখা অংকনে ব্যস্ত ছিলেন। কেবল উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেই নন; তিনি অধিকাংশ ছোটগল্পের

মধ্যেও আমাদের অতীতকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক কল্পনার সুসম এবং সার্থক প্রয়োগের মধ্যেই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়েছে। তিনি অতীত পটভূমিতে বর্তমানকে যেমন নতুন করে নিতে পেরেছিলেন; সমকালের প্রেক্ষাপটে বর্তমানের সমাজকে ততটা বাস্তবানুগ করে চিত্রিত করেন নি; এমনকি তিনি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মত মনোবিশ্লেষণের রীতিটিকেও গ্রহণ করেন নি। তিনি অতীতের মধ্যে যে স্বপ্ন সৌধ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন তারই মধ্যে জীবনের সত্যটি খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস করেছেন। তবে অতীতের প্রতি তাঁর আন্তরিক মোহ থাকলেও তিনি রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করেন নি। তিনি প্রাচীন ভারতের প্রায়ান্ধকার সমাজ-জীবন এবং নরনারীর প্রতি আলোকপাত করে 'বহু যুগের ওপার হতে' জীবনের রূপরেখা অঙ্কণ করেছেন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অতিবাস্তবতার শ্যেন দৃষ্টি তাঁর সাহিত্যে এসে পড়েনি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা-রীতির বিশেষ ভঙ্গীটির মত তাঁর সাহিত্যও বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারাটি থেকে সর্বদাই এক নির্মোহ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে চলেছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি সাধারণভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সমকালীন বাস্তবধর্মী রোমাণ্টিক উপন্যাস এবং অতীত যুগের পটভূমিতে বিধৃত উপন্যাস। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে :—'বিষের ধোয়া', 'ছায়া পথিক', 'রিমঝিম', 'দাদার কীর্তি' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অতীত যুগের পটভূমির উপর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কালের মন্দিরা', 'গৌড়মল্লার', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', 'কুমার সম্ভবের কবি', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'বহ যুগের ওপার হতে' প্রভৃতি উপন্যাস-গুলিই বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

'বিষের ধোয়া' (১৩৪৫) সুখপাঠ্য হলেও এই গ্রন্থটির মধ্যে লেখকের অন্তর্ভেদী জীবন বিশ্লেষণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এখানে লেখক একটি সাধারণ মিলনান্তক প্রেমের কাহিনী লিখেছেন। কাহিনার নায়ক কিশোর এবং তীর্থনাথ ছাত্রাবস্থায় হোস্টেলের একই ঘরে তিন বছর কাটিয়েছিল। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও স্বভাবে এবং চরিত্রে দুজন ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। কিশোর দিলখোলা আমুদে, প্রাণচঞ্চল যুবক আর তীর্থনাথ ঘরকুনো গ্রন্থকীট এবং চাপা প্রকৃতির। কিশোর অবস্থাপন্ন বাপের ছেলে এবং তীর্থনাথ সহায় সম্বলহীন। কর্মজীবনে দুই-বন্ধুর মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না, মাঝে অবশ্য তীর্থনাথের বিয়ের সংবাদ কিশোর জানতে পেরেছিলেন কিন্তু নানা ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর পক্ষে আর বিয়েতে যাওয়া হয়ে উঠেনি, অবশেষে বন্ধুর জীবনের শেষ সময়ে গিয়ে উপস্থিত হন। তীর্থনাথ তার সুন্দরী পত্নী বিমলার সকল ভার সেই সঙ্গে তাঁর যাবতীয় সঞ্চয় বন্ধু কিশোরের নামে উইল করে দিয়ে যান। কিশোর সহায় সম্বলহীন বন্ধু পত্নীকে নিয়ে কলকাতা চলে আসেন এবং দুজনে একত্রে বসবাস করতে থাকেন। কিশোরের পিতা পশুপতিবাবু পুত্রের এই আচরণকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি পুত্রের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ

করেন। লেখক বিধবা যুবতী বন্ধুপত্নী বিমলা এবং তরুণ যুবক কিশোরের সম্পর্কের মধ্যে কোন জটিলতা আনেন নি. তাঁদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সংঘাতও দেখাননি। ফলে তাঁদের সম্পর্ক সর্বকলুষমুক্ত ও উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ব্যাপারে লেখক কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও করেন নি। এরপর কাহিনী সম্পূর্ণ নতুন দিকে বাঁক নেয়। ঘটনাচক্রে প্রতিবেশী বিনয়বাবু ও তাঁর কন্যা সুহাসিনীর সঙ্গে কিশোরের পরিচয় হয়। বিমলাও সুহাসিনীকে কিশোরের উপযুক্ত সহধর্মিনী হওয়ার যোগ্য বলে মনোনীত করেন। কিন্তু মধুর সম্পর্কের মাঝখানে সুহাসিনীর পাণিপ্রার্থী অনুপম এবং [illegible] মা হেমাঙ্গিনীদেবীর আবির্ভাব ঘটে। তঁদের ষড়যন্ত্রে বিনয়বাবু ও সুহাসিনী [illegible]। কিশোরের প্রতি কুটিল সন্দেহে [illegible] যায়। অবশেষে কিশোরের ভূতপূর্ব শিক্ষক এবং বর্তমান সহকর্মী (ইতিমধ্যে কিশোর অধ্যাপনার চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন) দীনবন্ধু বাবুর আন্তরিক আগ্রহে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসানে কিশোর ও সুহাসিনীর মিলন হয়। এই জটিলতাবিহীন কাহিনীর মধ্যে একাধিক চরিত্রের টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। গল্পের নায়ক কিশোর আদর্শবান সবল শরীর ও মনের যুবক। সুহাসিনী সংযত সহিষ্ণু [illegible] স্বাবলীল যুবতী। বিমলার স্বামী-প্রেম নিখাদ। অল্প বয়সে বিধবা হওয়া সত্ত্বেও [illegible] শরীর ও মন গ্লানিমুক্ত পবিত্র ছিল। কিশোরের প্রতি তার [illegible] ও গভীর স্নেহ ছিল। অনুপম ঈর্ষাকাতর এবং [illegible] কার্যাবলী এতই [illegible] সহজেই চরিত্র [illegible] চিহ্নিত [illegible]। একমাত্র দাঙ্গার উল্লেখ [illegible] ও সমাজের নিবিড় [illegible] পাওয়া যায় না। পাত্র পাত্রীরা [illegible] মনোজগতের সমস্যা [illegible] জটিল ছিল [illegible] বাইরে কোন বৃহৎ সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আন্দোলিত হয়নি।

ছায়া [illegible] (১৩৫৬) সম্পূর্ণ ভিন্নস্বাদের উপন্যাস। [illegible] ভিন্ন শিরোনামে [illegible] বিচ্ছিন্ন গল্পকে একত্রিত করে 'ছায়াপথিক' নামে উপন্যাসের আকার দেওয়া হয়েছে। 'ছায়াপথিক' [illegible] চলচ্চিত্র জগতের [illegible] কাহিনী। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] দীর্ঘ [illegible] বোম্বাই এর চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিনেমা শিল্পের [illegible] দিয়ে [illegible] সটিকে সাজিয়েছেন। ছায়াচিত্র জগতের বাইরের মানুষের কাছে গ্রন্থটি তাই রূপকথার আমেজ সৃষ্টি করে। এখানেও কাহিনী কিংবা চরিত্রের কোন জটিলতা পাওয়া যায় না। একজন সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সোমনাথ কিভাবে সিনেমার নায়ক হলেন তারই সরল কাহিনী। সফল চলচ্চিত্রাভিনেত্রী চন্দনা দেবীর দাম্পত্য জীবনের নিষ্ফলা অধ্যায়টির মধ্যে লেখক কিছুটা ট্রাজিডির রস আনতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সোমনাথের প্রতি অকপট প্রেম নিবেদনের মধ্যে চন্দনাদেবীর অন্তরের বেদনা অপেক্ষা চতুর অভিনেত্রীর ছলাকলাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই বিষয়টি কাহিনীতে যে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারতো লেখক তা এড়িয়ে গেছেন। যেভাবে সোমনাথ চন্দনাদেবীর ছলনাময়ী

বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেলেন তা অত্যন্ত সরলীকৃত। অবশ্য এই ঘটনার জের হিসেবে সোমনাথকে কর্মচ্যুত হতে হল। পরে তিনি কিছুটা ভাগ্যবলে এবং অনেকখানি প্রতিভা, অধ্যবসায়ের এবং ঈশ্বর দত্ত রূপের সহায়তায় চলচ্চিত্র জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। এক সময় তিনি নিজেই পরিচালক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তারপর তিনি খ্যাতির শীর্ষে বিরাজমান অবস্থাতেই চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর ধান জমি ও লঞ্চ কিনে একটি শান্ত সমাহিত শান্তির নীড় গড়ে তোলেন। এই নীড়ের শান্তি স্বরূপিনী গৃহলক্ষ্মী রত্না, সম্পর্কে সোমনাথের দিদির ননদ। এই সুশ্রী আত্মস্থ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মেয়েটির প্রতি সোমনাথের আকর্ষণ ও কৌতূহল প্রথমাবধিই ছিল। কিন্তু রত্না কোনদিন তাঁর মনোভাব বাইরে প্রকাশ করেন নি। এমন কি একবার সোমনাথের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু শৈশবাবধি সোমনাথের প্রতি যে গভীর গোপন ভালবাসা তিনি আপন অন্তরে নিরুদ্ধ রেখেছিলেন তারই ফলশ্রুতিতে কাহিনীর শেষে তাঁর নিঃশর্ত আত্মনিবেদন দেখা যায়। এই উপন্যাসে রত্নাই একমাত্র চরিত্র যাঁর অন্তর্জগতের টানাপোড়েনে কিছুটা নাটকীয় দ্বন্দ্বের আভাস মেলে। সোমনাথ ও রত্নার মিলন সাধিত হয়েছে চলচ্চিত্র জগতের আলো কোলাহলের থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির কাছাকাছি। রত্নার মনের অবগুণ্ঠন মোচনের জন্য বোধহয় প্রকৃতিদেবীর এই আচ্ছাদনটুকুর প্রয়োজন হয়েছিল।

'রিমঝিম' (১৩৬৭) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর উপন্যাস। এটি একটি প্রেমের উপন্যাস। দাম্পত্যজীবনে অসুখী একজন কৃতবিদ্য ডাক্তার এবং পত্নী প্রেমে বঞ্চিত একজন সফল ব্যবসায়ীর জীবনে দুজন নার্স কী ভাবে শুচিশুভ্র প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তারই রোমাণ্টিক কাহিনী। উপন্যাসটি প্রেমের হলেও প্রেমের অতিরিক্ত অন্য স্বাদও পাওয়া যায়। বিশ্বাস, সেবা, মমতা, মাধুর্যের সমন্বয়ে গঠিত শুক্লা এবং প্রিয়ংবদার চরিত্র। ডঃ নিরঞ্জন দাস একজন কৃতি এবং প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সুখী ছিলেন না। ডাক্তারের জীবনের এই বেদনার দিকটিকে শুক্লার ভালোবাসা আনন্দময় করে তুলেছিল। কিন্তু শুক্লা বিনিময়ে কিছু পাবার প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর সেবাই ভালোবাসার আদর্শ ছিল। এই উপন্যাসের কাহিনী নার্স প্রিয়ংবদা ভৌমিকের দিনলিপির আকারে লিখিত হয়েছে। তাই প্রিয়ংবদার চোখে বিভিন্ন চরিত্র যেভাবে ধরা পড়েছে সেইভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জীবনে পিতার ভূমিকা এবং পরবর্তী জীবনে বিবাহিত ব্যবসায়ী শঙ্খনাথবাবুর প্রতি অনুরাগের পালাটি অতি অনায়াস ভঙ্গীতে লিখিত হয়েছে। ডায়েরী লেখার সময় কুমারী মনের সলজ্জ অনুভূতি লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে গতানুগতিক ভাবে গল্প বলেননি, আঙ্গিক নিয়ে তিনি নতুন পরীক্ষা করেছেন এবং এখানে তিনি সার্থক হয়েছেন। প্রিয়ংবদা

এবং শঙ্খনাথবাবুর অনুচ্চারিত প্রেমের আখ্যান অংশটুকু পরিকল্পনায় লেখক যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। প্রিয়ংবদাকে—প্রিয়দম্বা নামকরণের মধ্যে কিংবা অপরিচিত নানা মহিলাকে প্রথম আলাপেই তুমি বলে সম্ভাষণের মধ্যে একদিকে শঙ্খনাথবাবুর অশিক্ষা এবং অমার্জিত রুচির পরিচয় পাই, অপরদিকে তেমনি অর্থ কৌলীন্যের জন্য অনুচ্চারিত দম্ভেরও স্বরূপটি প্রকাশ পায়। লেখক সহজ সরল অর্থবান, আধুনিক সমাজে বেমানান ; শঙ্খনাথবাবুর চরিত্রটির মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ এনেছেন। যদিও জীবনের দ্বন্দ্ব সর্বত্র পরিস্ফুট হয়নি তবুও এই উপন্যাসটির চরিত্র-গুলি অনেকাংশেই স্বাভাবিক আচরণ করেছে। প্রাইভেট নার্সদের জীবন নিয়ে এ জাতীয় উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিশেষ নেই। লেখক একটি অনালোচিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

'দাদার কীর্তি' (১৩৮৪) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর বয়সের রচনা। কিন্তু গ্রন্থাকারে দীর্ঘদিন পর প্রকাশিত হয়। প্রথম যৌবনের সলজ্জ প্রেমের উন্মেষকে নিয়ে রচিত এই কাহিনীটির মধ্যে উপন্যাসের দৃঢ় বাঁধন আছে এবং চরিত্র চিত্রণের পারিপাট্য লক্ষ্য করা যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক রূপে অধিক খ্যাতিলাভ করলেও যথার্থ ঔপন্যাসিকের গুণগুলিও তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। সামাজিক অবস্থার বর্ণনায় কিংবা মনুষ্য চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করার দুর্লভ ক্ষমতাও তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। কৌতুক রসস্নিগ্ধ এই নাতিদীর্ঘ উপন্যাসটির মধ্যে লেখক পরিণত মনস্কতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সামাজিক উপন্যাসগুলির আলোচনা কালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনি বাস্তব জীবনের বর্ণনার ক্ষেত্রে কিংবা সমকালীন জীবনের রূপরেখার মধ্যেও সর্বত্রই কল্পনার উপর বেশী নির্ভর করেছিলেন। এই কারণে তাঁর বাস্তবজীবনমুখী সমকালীন পটভূমিতে রচিত উপন্যাসগুলিতেও যুগ এবং সমাজকে সঠিকভাবে ধরা যায় না, চরিত্রগুলির আচার-আচরণে কিছুটা রক্তমাংসের আস্বাদ থাকলেও তারা উচ্চ আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ সমস্যায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জর্জরিত নয়। কিন্তু তিনি যে সময়ে উপন্যাসগুলি রচনা করেছিলেন সে সময়ে বাংলা কথাসাহিত্য সুশোভিত রাজপথ পরিত্যাগ করে অন্ধকারের কাণা গলিতে প্রবেশ করেছিল। তিনি দীর্ঘকাল বোম্বের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং সিনেমার উপযোগী কাহিনী রচনা করেছিলেন. এই কারণে কাহিনীতে নাটকীয়তা ছিল কিন্তু চরিত্রগুলি যথেষ্ট বাস্তবানুগ হয়নি। সাহিত্য পাঠক এবং সিনেমা দর্শকের মধ্যে কেবল সংখ্যারই পার্থক্য নেই, রসবোধেরও পার্থক্য আছে ; অধিকাংশ দর্শকই তাৎক্ষণিক আনন্দ লাভে ইচ্ছুক। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনী বর্ণনায় অসাধারণ পটুত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গল্প

বলার রীতিটি অননুকরণীয়। সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডে তাঁর এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলির স্থান যেখানেই হোক না কেন, আশুতোষ পাঠকের কাছে সেগুলি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল।

যে উপন্যাসগুলির মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি তাঁর ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তথ্যের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেই থাকে এবং লেখক মাত্রই কল্পনার স্বপ্নজালে অতীতের কোন অধ্যায়কে তুলে ধরতে চান। কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সুদূর অতীতের ভারতবর্ষের কেবল রাজ কাহিনীকেই উদ্ধার করেন নি সেই সঙ্গে প্রচুর গবেষণা এবং নিষ্ঠা সহকারে ভারতবর্ষের অতীত সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবিও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বৌদ্ধযুগ ও হূণ আক্রমণের সময়কালীন ভারতবর্ষ তাঁর মনোজগতকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছিল এবং এই দুটি সময়কেই তিনি আশ্চর্য মুন্সীয়ানায় বিধৃত করেছেন। অতীতে অবগাহনের পূর্বে বিশেষ প্রস্তুতি হিসেবে তিনি নিজেকে সেই যুগের রীতি-নীতি, প্রথা, গৃহস্থালী কর্মাদি, যানবাহনের প্রক্রিয়া ইত্যাদি সব খুঁটিনাটি বিষয়ে অবহিত হয়েছিলেন। সেইজন্য পথঘাটের বর্ণনায় তৈজসপত্রাদির উল্লেখ এবং ভাববিনিময়ের বিশিষ্ট ভাষাকে যুগোপযোগী করে সযত্নে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই শ্রেণীর উপন্যাসে ভাষার ব্যবহার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ ভাষা ভাবের বাহন। ভাবানুযায়ী ভাষা না হলে রসভঙ্গ সুনিশ্চিত। তাই অনেক ক্ষেত্রে তাঁর তৎসম শব্দ বহুল ভাষা একালের কানে অপরিচিত মনে হলেও বিষয়বস্তুর বিচারে যথাযথ ও সুচিন্তিত। এই ভাষা তিনি শুধুমাত্র কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেননি; অপরিচিত অথচ তৎকালীন প্রচলিত শব্দগুলি জীবনযাত্রার ক্ষেত্র অনুযায়ী সুপ্রয়োগ করেছেন। এর ফলে এমন একটি সুন্দর পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে যা সহৃদয় পাঠকের কাছে অভিযাত্রার মত আস্বাদনীয় আবার বিশেষজ্ঞ গবেষকের কাছেও আদরনীয় হতে পেরেছে। একটি যুগকে তার নিজস্ব আবহে প্রতিস্থাপিত করতে গিয়ে তিনি সচেতন থেকেছেন সম্ভাব্য সকল কৌনিক বিন্দুর দিকে। তাই যানবাহন থেকে মনের গহন পর্যন্ত পথটিকে তিনি বিশিষ্ট পরিমণ্ডলে সুন্দর করে রচনা করেছেন। এই শ্রেণীর উপন্যাসে তিনি যে অনেক বেশী মনস্ক ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। তবে এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে যে, তথ্যানুসন্ধান ও সময়ের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষার তাগিদে কাহিনীর রসমাধুর্য একালের পাঠকের কাছে পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি কিম্বা অতীতচারিতায় বর্ণনাভঙ্গী শিথিল হয়ে গেছে। কারণ যতই গবেষণাধর্মী হোন না কেন শরদিন্দু সেই লেখক যিনি ব্যোমকেশের মতন জনগণমন আলোড়নকারী চরিত্র ও জনপ্রিয় চিত্রনাট্যের স্রষ্টা ছিলেন। পাঠকের হৃদয় হরণের কৌশল তিনি জানতেন কিম্বা বলা যেতে পারে এ সম্পর্কে খানিকটা সচেতন দায়িত্বভারই তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাই যা হতে পারত একটি বিশেষ দেশের বিশেষ সময়ের প্রামাণ্য দলিল তাই মনোগ্রাহী কথায় বিদগ্ধ পাঠকের মন কেড়েছে। এ সাফল্য

নিঃসন্দেহে অনায়াস নয় কিন্তু মানতেই হবে এ ক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

'কালের মন্দিরা' (১৩৫৮) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমনই একটি উপন্যাস। ভারতবর্ষের হূণ শক্তির অপরাহ্ণ বেলার পটভূমিতে এর কাহিনী বিধৃত। এই কাহিনীতে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের একটি প্রধান ভূমিকা আছে। তিনি দীর্ঘকাল হূণদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর সময়েই হূণরাজারা হীনবল হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বৌদ্ধ দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে বর্বরতা পরিত্যাগ করে আর্য সভ্যতায় স্নাত হন। মহারাজ রোট্ট এমনই একজন হূণ রাজা ছিলেন। তিনি বিটঙ্ক নামে এক ক্ষুদ্র গিরিরাজ্য দখল করে নেন এবং রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ধারা দেবীকে বিবাহ করে নূতন রাজবংশের সূচনা করেন। ধারা দেবীর কোমল প্রকৃতির জন্য মহারাজ রোট্টেরও অন্তরের পরিবর্তন হয় এবং ধারা দেবী এই দুর্ধর্ষ বর্বরকে সম্পূর্ণ বশীভূত করেন ও তিনি মহারাজ বুদ্ধের করুণাবাণীর শরণাপন্ন হন। তাঁর নামের সঙ্গে ধর্মাদিত্য উপাধি যোজিত হয়। এই উপন্যাসে হূণ শক্তির সঙ্গে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের সংঘর্ষের উল্লেখ থাকলেও লেখক একটি মধুর প্রেমের উপাখ্যান কাহিনীতে সংযোজিত করেছেন। মধ্যবয়সী সম্রাট স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে সৈনিক শিবিরে রাজকুমারী রট্টার কথোপকথনের মাধ্যমে বীরযোদ্ধা সম্রাট স্কন্দগুপ্তের প্রণয়ের আকুলতা লেখক কাব্যময় করে বর্ণনা করেছেন। এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নির্মলকুমারীর প্রতি আওরঙ্গজেবের দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রূপকথার আদলে লেখক গল্প বর্ণনা করেছেন। রোট্ট ধর্মাদিত্যের রাজকর্মচারীর শ্যালক শশিশেখর রাজার দূত হয়ে হূণ অধিকৃত অঞ্চলে রাজ সংবাদ পরিবেশন করতে যান। নির্জন বন মধ্যে চিত্রক (রাজপুত্র. ভাগ্যচক্রে নামগোত্রহীন একজন সৈনিক) দ্বারা পাশা-খেলায় সর্বস্বান্ত হন। চিত্রক শশিশেখরের বস্ত্রাদি অপহরণ করে ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করেন। মহারাজ রোট্ট ধর্মাদিত্যের সহকারী যোদ্ধা তুষফান। তুষফানের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ তাঁকে সীমান্তস্থিত চষ্টন গিরি দুর্গ অর্পন করেন। তাঁর পুত্র কিরাত বর্তমান দুর্গাধিপতি। বিটঙ্ক রাজ্য হূণ অধিকৃত। রাজা রোট্ট ধর্মাদিত্য সামন্ত-রাজ কিরাতের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না। কিন্তু কিরাত রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী। তিনি রাজকন্যার দর্শন লাভের জন্য এবং তাঁর প্রতি প্রেম নিবেদন করার জন্য নানা ছলে রাজপুরীতে থাকতে চান। কিন্তু মহারাজ একথা জানতে পেরে কিরাতকে নিজরাজ্যে পাঠিয়ে দেন এবং কন্যার বিবাহের জন্য গুর্জর রাজ্যের দ্বিতীয় পুত্রকে মনোনীত করেন। রাজকুমারীর রট্টা গুর্জর রাজকুমারকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। চিত্রকবর্মার সঙ্গে রাজকুমারী রট্টা যশোধরার প্রিয়সখী সুগোপার নির্জন জলসত্রে দেখা হয়। চিত্রকবর্মাই তিলকবর্মা অর্থাৎ রাজকুমারীর সখী সুগোপার ভাই। হূণদের আক্রমণের সময় কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। রাজকুমারী রট্টার পিতাই চিত্রকের পিতাকে হত্যা করে রাজসিংহাসন দখল করেছিলেন। রাজকুমারী

রট্টা হূণ দুহিতা। চিত্রক এবং রট্টা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন কিন্তু চিত্রক পরে জানতে পারেন। তাঁর পিতার হত্যাকারী আসলে রাজকুমারী রট্টার পিতা ধর্মাদিত্য। একদিকে প্রেম এবং অপরদিকে পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা এই দ্বন্দ্বের অবসানে প্রেমেরই জয় হয়। বিটঙ্ক রাজ্য হূণদের অধিকারে থাকলেও রাজকুমারীকে লাভ করতে না পেরে কিরাত কৌশলে বৃদ্ধ রাজাকে বন্দী করে রাখেন। চিত্রক একথা জানতে পারেন। তিনি রাজকুমারী রট্টাকে নিয়ে সাহায্যের জন্যে ছদ্মনামে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের শিবিরে প্রবেশ করেন। উত্তর-যৌবন সম্রাট রাজকুমারী রট্টার রূপে মোহিত হয়ে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন কিন্তু রাজকুমারী রট্টা পূর্বেই জেনেছিলেন চিত্রকই বিটঙ্ক রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং তিনি তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। দুর্গ অধিকারের পর প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। চিত্রকের হাতে দেশদ্রোহী কিরাতের মৃত্যু ঘটে এবং চিত্রক রাজ্যলাভ করে এবং রাজকুমারী রট্টা যশোধরার সঙ্গে বিবাহ হয়।

এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্কন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক।' আখ্যায়িকা কাল্পনিক হলেও লেখক যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা সৃষ্টি করেছেন তা লেখকের বর্ণনা কৌশলে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। রাজকুমারী রট্টা যশোধরার কোমলে কঠিনে গড়া চরিত্রটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখক প্রেমের দৃশ্য বর্ণনায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'কালের মন্দিরা' উপন্যাসটির নামকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

গৌড়মল্লার' (১৩৬২) এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, 'প্রাচীন বাংলা দেশ লইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে ছিল; কিন্তু বাংলা দেশের বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার মত মালমশলা কোথাও পাই নাই। নীহাররঞ্জনের বইখানি পড়িয়া যে অপূর্ব উপাদান পাইয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙালীর জীবনে ইহা এক ক্রান্তি কাল। আধুনিক বাঙালীর জন্ম এই সময় (ডায়েরী ২৭শে জুলাই, ১৯৫০)' অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসকারদের তুলনায় শরদিন্দুর স্বতন্ত্রতা আমরা তাঁর ডায়েরীর পাতা থেকে কিছুটা অনুমান করতে পারি। শরদিন্দু ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রী অথবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমির কালসীমার সংস্কৃতি, যুগাচার, সামাজিক মূল্যবোধ অর্থাৎ দেশের এবং জাতির সামগ্রিক রূপদানে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। এই কারণে পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে তিনি সব সময় উপন্যাসের সাধারণ ধর্ম মেনে চলতে পারেন নি। 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসের পটভূমি বিশ্লেষণে তিনি এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন "আমার কাহিনী শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আরম্ভ হইয়া তাহার বিংশ বৎসর পরে শেষ হইয়াছে। এই সময়ে বাঙ্গালীর

চরিত্র সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবন নাগরিক জীবন কিরূপ ছিল তাহা অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।" সাধারণভাবে উপন্যাসে লেখক কল্পিত কাহিনীর মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে যথাসম্ভব বাস্তবানুগ করে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন, এই কারণে কল্পিত কাহিনীর মধ্যেও পাঠক নিজেকে আবিষ্কার করার তৃপ্তি লাভ করে থাকে কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সামগ্রিকভাবে একটা জাতির অবক্ষয়ের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি তার সৃষ্ট চরিত্রের রহস্য সন্ধানে অতল-গহ্বরে প্রবেশ করার অবকাশ পান নি। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মধ্যেও মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে অপরিচিত পাত্র-পাত্রীদের যেমন আমাদের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে স্থাপন করেছিলেন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সে পথে যান নি। এই অভাব তার সবকটি উপন্যাসের মধ্যেই অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অপরিচিত অতীত যুগের জীবনযাত্রার সুসংগঠিত বর্ণনায় ঐতিহাসিক কল্পনার সুনিপুণ রূপায়ণে তিনি এই অভাব অনেকাংশেই পূরণ করেছেন। বৌদ্ধ-যুগের সমাজ জীবনের চিত্রণে এবং প্রাচীন হিন্দু রাজার সময়কালের বর্ণনায় তিনি সামাহীন কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। টান টান কাহিনী রচনা করে তিনি যেমন পাঠককে আকৃষ্ট করেছেন, তেমনি প্রাচীন সমাজ-জীবনের গভীরে প্রবেশ করে নিষ্ঠাবান ইতিহাসবিদের মত সামগ্রিক ভাবে যুগ মানসিকতাকেও নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। 'গৌড়মল্লার' লেখকের এমনই একটি উপন্যাস। এখানেও লেখক অতীতযুগের জীবনচিত্র রূপায়ণে যে পরিমাণ কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন বস্তুনিষ্ঠ জীবনসত্য উদ্‌ঘাটনে তিনি সে পরিমাণ মনোযোগ দিতে পারেন নি। তার এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলির মধ্যে ইতিহাসানুমোদিত বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েও উপন্যাসে যথার্থ প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় না।

গৌড়ের রাজা শশাঙ্কদেবের পৌত্র বজ্রদেবের জন্ম বৃত্তান্ত দিয়ে এই কাহিনীর আরম্ভ। গৌড়রাজ শশাঙ্ক যখন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় কপিলদেব নামে এক রাজপুরুষ সৈন্য সংগ্রহের সুবাদে বেতসগ্রামে আসেন। সেখানে গোপা নামে এক গ্রাম্য যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হন, গোপার স্বামী সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার জন্য বেতসগ্রাম ত্যাগ করে। এরপর নিঃসন্তান গোপার গৃহে এক পরম সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। গ্রামের মানুষেরা সহজেই অনুমান করতে পারে যে রঙ্গনা রাজপুরুষ কপিলদেবেরই সন্তান। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর তার পুত্র মানবদেব গৌড়ের রাজা হন। তিনিও যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন কালে আহত অবস্থায় বেতসগ্রামে উপস্থিত হন এবং গোপনে রঙ্গনাকে বিবাহ করেন। কিছুদিন সেখানে থাকার পর তিনি রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে অভিজ্ঞান স্বরূপ নিজ বাহুর একটি স্বর্ণালঙ্কার রঙ্গনাকে উপহার দিয়ে যুদ্ধ শেষে পুনরায় এসে রঙ্গনাকে রাজধানী নিয়ে যাবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্থান করেন। বর্তমান কাহিনীর নায়ক বজ্রদেব, মানবদেবেরই পুত্র অর্থাৎ গৌড়রাজ শশাঙ্কদেবের পৌত্র।

এরপর বজ্রদেব কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনপ্রাপ্ত হলে পিতার সন্ধানে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। এই পর্যন্ত কাহিনী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়েছে। লেখক অনেকটা নেপথ্য ভাষ্যকারের মত কাহিনী বলে গেছেন। কোথাও কোন চরিত্র দানা বাঁধতে পারেনি; বেতসগ্রামের প্রাকৃতিক বর্ণনার সঙ্গে তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানকার ইক্ষুক্ষেত থেকে ইক্ষু এনে কি ভাবে গুড় তৈরী হত তার বিশদ বর্ণনা লেখক দিয়েছেন; এই গুড় বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হত, আর তাই থেকেই দেশের নাম গৌড় হয়েছে। কিন্তু লেখকের চোখে গ্রাম-বাংলার কোথাও কোন মালিন্য ধরা পড়েনি। বাস্তবজীবনের অনেক দূরে রূপকথার রঙ্গীন পরিমণ্ডলে কাহিনীর সকল চরিত্র ঘোরা ফেরা করেছে।

এরপর বজ্রদেব রাজধানীর পথে বৌদ্ধ-পণ্ডিত ইতিহাসখ্যাত শীলভদ্রের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারেন বাংলাদেশের এখন খুব সংকট কাল। তাঁর পিতা মানবদেব ভাস্করবর্মার সঙ্গে দ্বিতীয় বার যুদ্ধকালে পরাজিত এবং বন্দী হন। জনশ্রুতি এই যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বন্দী হয়েছিলেন এবং সেই রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর মৃতদেহ রাজধানীর প্রাকার থেকে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়। বর্তমানে ভাস্কর বর্মার পুত্র অগ্নিবর্মা রাজা। তিনি পিতার মত সজ্জন এবং বিদ্যানুরাগী নন। "অগ্নিবর্মা ইন্দ্রিয়াসক্ত কুকর্মনিরত, রাজকার্য দেখে না।" এখন জয়নাগ গৌড়দেশ অধিকার করার চক্রান্ত করছে। এ সব তথ্য বজ্রদেব শীলভদ্রের নিকট থেকে জানতে পারেন। শীলভদ্র বজ্রদেবকে তার পিতামহ গৌড়রাজ শশাঙ্কদেবের সচিব কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ-পণ্ডিত শীলভদ্রকে লেখক এখানে সুচতুর রাজনীতিবিদ রূপে অঙ্কিত করেছেন। তিনি এর পরবর্তী অংশের কাহিনীতে সম্পূর্ণ রোমান্সের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কল্পনা প্রায় রূপকথায় রূপান্তরিত হয়েছে। বজ্রদেবের ছদ্মবেশে রাজধানী কর্ণসুবর্ণে গমন, রাজা অগ্নিবর্মার ব্যাভিচারিনী পত্নী শিখরিনীর পরিচারিকা কুহুর সাহায্যে রাজমহলে প্রবেশ : পিতামহ শশাঙ্কদেবের সচিব কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে যোগাযোগ, রাজার বিশ্বাসভাজন অর্জুন সেন কর্তৃক অগ্নিবর্মাকে হত্যা ইত্যাদি ঘটনা লেখক অনায়াস ভঙ্গীতে বর্ণনা করে গেছেন। রুদ্ধশ্বাস কাহিনীর গতি কোথাও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। অগ্নিবর্মার মৃত্যুর পর শশাঙ্কের উত্তরাধিকারীরূপে বজ্রদেবের সামান্য সময়ের জন্য সিংহাসনে আরোহন এবং চতুর নাগরাজের কাছে যুদ্ধে পরাজয় প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। মানবদেব ভাস্কর বর্মার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হলেও ভাস্করবর্মা তাঁকে হত্যা করেন নি, অন্ধ করে ভাগীরথীতে রাজপুরীর প্রাকার থেকে নিক্ষেপ করেছিলেন। দীর্ঘ বিশ বৎসর যত্রতত্র পরিভ্রমণের পর মানবদেব বেতসগ্রামে ফিরে এসেছিলেন এবং স্ত্রী পুত্রকে ফিরে পেয়েছিলেন। এইভাবেই কাহিনীর মিলনাত্মক পরিণতি ঘটে। 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসটিকে ঔপন্যাসিক শরদিন্দু

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা বলা যায় না। প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র বিপর্যয়ের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে লেখক কবিত্বময় ভাষায় একটি প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসকার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হিন্দু বৌদ্ধ-যুগের পটভূমিতে কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এঁরা ছাড়া হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও উল্লেখযোগ্য ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স রচনা করেন। দীর্ঘকাল পূর্বে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় ঐতিহাসিক উপন্যাস বিষয়ক একটি প্রবন্ধে লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন "তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও পরবর্তীকালের মধ্যে সংযোগ সেতু"। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমের মত মহাকাব্যিক কল্পনাশক্তি না থাকার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস কোন সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান পায় নাই। উপন্যাসকারেরা, ব্যাপকভাবে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। রাখালদাস রচিত 'শশাঙ্ক' ও 'ধর্মপাল' কিংবা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত 'কাঞ্চনমালা' ও 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে তাঁদের ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেলেও জীবনরসের সন্ধান পাওয়া যায় না।"

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের ধারার লেখক নন, বরং তাঁর রচনায় হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় উপন্যাসকার হিসেবে বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় হলেও তিনি তাঁর সমকালে একজন জনসমাদৃত কাহিনীকার ছিলেন। তাঁর খ্যাতি মূলত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। মগধের রাণী মুরলার কঙ্কন চুরির ঘটনা নিয়ে রচিত 'কঙ্কন চোর' সম্পূর্ণ ইতিহাসাশ্রিত। 'চারুদত্ত' এবং আরও কয়েকটি উপন্যাসও সেই শ্রেণীর। কিন্তু মুঘল রাজত্বের হারেমের যে সব রোমাঞ্চকর রোমান্সধর্মী উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন 'রঙ্গমহল' 'শীষমহল' 'নূরমহল' 'শাহাজাদা খসরু' প্রভৃতি কল্পনাপ্রসূত হলেও সেইকালে এই ধরণের কাহিনীতে এমন অনবদ্য আঙ্গিক বিশেষতঃ ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর অভিনব চাতুর্য, বিস্ময়কর ছিল। প্রকৃতপক্ষে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কল্পনাশ্রিত উজ্জয়িনী বা নর্মদাতীরের বিক্রমাদিত্যের যুগের কাহিনী রচনা করেছেন তা এই ধারা ও আঙ্গিকের অনুবর্তী। বাংলা সাহিত্য যখন অতি বাস্তবতার আবর্তে নিমজ্জিত সেই সময় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতের সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি করে কাহিনীরস সন্ধানী পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন।

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' (১৯৫৮): শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে এই উপন্যাসটি নানা কারণে বিশিষ্টতার দাবী রাখে। এই উপন্যাসটিকে লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা বলা যেতে পারে।

অধিকাংশ উপন্যাসেই লেখক ব্যক্তি বিশেষের ঐতিহাসিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সামগ্রিকভাবে একটি যুগকে চিহ্নিত করেছেন। এই উপন্যাসে লেখক বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের অর্থাৎ বাংলাদেশ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির অধিকারভুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। সেই সময়কার ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাতাবরণ কেমন ছিল, অকিঞ্চিৎকর কারণে পাশাপাশি অবস্থিত রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তো তাই চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের ব্যঞ্জনাময় নামকরণের মধ্যে দিয়ে লেখক বহিরাগত শক্তির কাছে ভারতবর্ষের আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু উপন্যাসের পটভূমি সৃষ্টি করতে তিনি যে উপকরণে আয়োজন করেছিলেন কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। উপন্যাসটির আসল বিষয় মগধ রাজকুমার বিগ্রহপালের সঙ্গে চেদিরাজ-কুমারী যৌবনশ্রীর প্রণয়। এই প্রণয় নির্বিঘ্নে সংঘটিত হয়নি। উভয়ের মিলনের প্রচণ্ড বাধা ছিল। মগধ রাজ-পরিবারের প্রতি চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের তীব্র বিদ্বেষ ছিল। এই কাহিনীতে মহাচার্য দীপঙ্করকে তৎকালীন ভারতবর্ষের একজন যুগ-পুরুষ রূপে অঙ্কিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কিন্তু কাহিনীতে তাঁর যে ভূমিকা লেখক দেখিয়েছেন কাহিনীর সঙ্কটকালে তার অকস্মাৎ তিব্বত গমনে সেই ভূমিকা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা তাঁকে কিছু বিস্ফোরক অগ্নিগোলক উপহার দেন এবং তারই সাহায্যে মগধরাজকুমার বিগ্রহপাল চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পান। এই আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার চীনদেশে হয়েছিল। লেখক এ বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে এর সত্যতা বা বাস্তবতা সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করেন নি উপরন্তু সমস্ত বিষয়টিকে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের রহস্যালোকে ঢেকে রেখেছেন। কাহিনী এই অলৌকিক আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মগধ আক্রমণ করলে প্রতাপশালী চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের আনীত অপরিমেয় ক্ষমতাসম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্রে পরাজিত হলে তার কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে মগধ রাজকুমার বিগ্রহপালের বিবাহ দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশে ফিরে যান। কিন্তু রাজধানীতে ফিরে পরাজয়ের গ্লানি তাকে নতুন করে হিংস্র করে তোলে। তিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে মগধ রাজকুমারকে চূড়ান্ত অপমান করার ষড়যন্ত্র করেন। কন্যার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করে সভার মধ্যে মগধ রাজকুমারের একটি মূর্তি স্থাপন করে অপমানিত করতে চান। এদিকে বিগ্রহপাল তার বন্ধু অনঙ্গকে নিয়ে ছদ্মবেশে স্বয়ংবরের পূর্বেই চেদিরাজ্যে এসে উপস্থিত হন। চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতার সাহায্যে যৌবনশ্রীর সঙ্গে গোপনে আলাপ করেন এবং স্বয়ংবরের দিন রাজকন্যাকে নিয়ে পলায়ন করার সমস্ত আয়োজন করেন। কিন্তু পলায়নের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যৌবনশ্রীর ক্ষাত্রধর্ম জাগ্রত হয়; তিনি তস্করের মত সকলের অলক্ষ্যে পলায়নে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাজকুমারকে আবার নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। অলৌলিক ক্ষমতা সম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে

তিনি কার্যোদ্ধার করবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু তাঁর বন্ধু অনঙ্গ রাজকুমারীর সখীকে নিয়ে চম্পট দিতে সক্ষম হলেও রাজকুমার বিগ্রহপাল ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এরপর আবার উভয় পক্ষে রণসজ্জা হয়েছে। কিন্তু এবার লক্ষ্মীকর্ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা বীরশ্রী ভগ্নিকে পিতার শিবির থেকে উদ্ধার করে কুমার বিগ্রহপালের শিবিরে পৌঁছে দিয়েছে। লক্ষ্মীকর্ণ হঠাৎ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে কন্যা জামাতাকে কাঁধে নিয়ে রণক্ষেত্রেই নৃত্য আরম্ভ করেছে। উভয় পক্ষের সেনারাই এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছে। মুহূর্তকাল পূর্বে যা ছিল ভয়াবহ রণক্ষেত্র তাই উৎসব প্রাঙ্গণে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। উপন্যাসের প্রারম্ভে সন্ধ্যার মেঘের যে রক্তিম আভা দেখা গিয়েছিল কাহিনীর শেষে তাই পূর্ণিমার রাতের মত ঝল্‌মল করে উঠেছে।

অতীত যুগ অঙ্কণে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

"অতীত যুগের জীবন চিত্র সংবলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে পরিমাণ লঘু খেয়ালী কল্পনা আছে, সে পরিমাণ উদ্দেশ্যের স্থিরতা বা বস্তুনিষ্ঠ জীবনসত্য দ্যোতনা নাই। সমস্ত যুগই যেন বিলাস ব্যসনে মাতিয়া উঠিয়াছিল।" কেবল সমাজজীবনের বর্ণনাতেই নয়, চরিত্র চিত্রণেও লেখক লঘু, খেয়ালী কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন, কোন চরিত্রেরই গভীরে প্রবেশ করেন নি। অধিকাংশ নরনারী শ্রেণী-প্রতিনিধি হয়েছে, স্বকীয় মহিমায় কেউই পৃথক সত্তার অধিকারী হয় নি। চরিত্রের হঠাৎ পরিবর্তনের কোন ব্যাখ্যা লেখক কোথাও দেন নি। যৌবনশ্রীর ক্ষাত্রধর্মের আদর্শের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনেকাংশেই কৃত্রিম বলে মনে হয়। বীরশ্রী এবং তাঁর স্বামীর আচরণ কোনক্রমেই রাজকীয় হয়ে উঠেনি। একমাত্র লক্ষ্মীকর্ণের গুপ্তচর লম্বোধরের চরিত্রটি অনেকাংশে জীবন্ত বলে মনে হয়। রুগ্না স্ত্রীর পরিবর্তে যৌবনবতী শ্যালিকার প্রতি আকর্ষণ বোধ করা পরে সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবতী হয়ে স্ত্রীর প্রতি পুনরায় আকর্ষণবোধ করার মধ্য দিয়ে লেখক লম্বোধরের লোভী রূপটি বাস্তবতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির সঙ্গে 'তুঙ্গভদ্রার-তীরে' (১৩৭২) গ্রন্থটির পার্থক্য আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন ঃ "আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক : ঘটনাকাল ১৪৯০ এর আশেপাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।" এক সময় বিজয়নগর সমগ্র দাক্ষিণাত্যের উপর অধিকার বিস্তার করেছিল, লেখক বিজয়নগরের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে কাল্পনিক কাহিনীর সাহায্যে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। হিন্দুদের বাহুবল প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন, এখানেও শরদিন্দু

মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে এক হিন্দুরাজার পরাক্রমের কথাই প্রকারান্তরে প্রচার করতে চেয়েছেন। মধ্যযুগে মুসলমান শক্তির কাছে হিন্দু রাজশক্তির পরাজয়েরও এক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শরদিন্দু মূলতঃ গল্পলেখক ছিলেন, তিনি কাহিনীর মায়াজালে এমনভাবে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে আবন্ধ করে রেখেছিলেন যে কারণে উপন্যাসটি কোথায়ও প্রচারমুখী হয়ে উঠেনি।

বর্তমান কাহিনীর নায়ক দেবরায় যখন বিজয়নগরের শাসনভার গ্রহণ করেন সে সময় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে মুসলমান রাজশক্তির সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়ে গেছে। রাজ্য শাসন আরম্ভ করে তিনি উপলব্ধি করলেন কেবল বিদেশী মুসলমানেরাই দেশের স্বাধীনতার রক্ষার পক্ষে বিপদজনক নয়, সেই সঙ্গে হিন্দুরাজারাও পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে ক্রমাগত শক্তি ক্ষয় করে চলেছেন; তিনি আরও অনুভব করলেন নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতা এবং একতা না আনতে পারলে বিদেশী শক্তির গতিরোধ করা সম্ভব নয়। এই বিদেশী শক্তির গতিরোধ করার জন্য নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে দেবরায় এক একটি করে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ কন্যাদের বিবাহ করতে আরম্ভ করলেন। "ইষ্টবন্ধের দ্বারা যদি ঐক্যসাধন না হয় কুটুম্বিতার দ্বারা হইতে পারে। সেকালে রাজন্যবর্গের মধ্যে এই জাতীয় বিবাহ মোটেই বিরল ছিল না বরং রাজনৈতিক কূটকৌশল রূপে প্রশংসার কার্য বিবেচিত হইত।" কাহিনীর প্রারম্ভে ঐতিহাসিক বিবরণ এবং বিশ্লেষণ থাকলেও পরবর্তী কাহিনী লেখকের কল্পিত। এ প্রসঙ্গে লেখক নিজে বলেছেন। "আমার কাহিনী Fictionised history নয়, Historical fiction."

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটিও ইতিহাসের মোড়কে একটি রোমান্টিক প্রেমগাথা। বিজয়নগরের তরুণ রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে বিবাহ করবার জন্য কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যা কুমারী ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা তার বৈমাত্রেয় ভগিনী মনিকঙ্কণার সঙ্গে নৌকাযোগে বিজয়নগর যাত্রা করেছিলেন। সাধারণতঃ রাজকুমারীদের বিবাহ উপলক্ষে রাজপুত্রেরাই তাঁদের রাজ্যে আসতেন কিন্তু এক্ষেত্রে তার বিপরীত ঘটেছিল। রাজকুমারীই রাজকীয় আড়ম্বর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বিবাহ করতে চলেছিলেন। লেখক প্রাচীন ভারতের জলযানের এবং দীর্ঘ জলপথের ঐতিহাসিক নানা বিবরণ দিয়েছেন। শরদিন্দু কাহিনীতে চমক সৃষ্টি করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; এই উপন্যাসেও তিনি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনীতে তীব্র গতির সঞ্চার করেছেন। বিজয়নগরে পেঁছোবার কিছু আগে রাজকুমারী এক যুবককে দেখতে পান। যুবকের নাম অর্জুনবর্মা, জাতিতে ক্ষত্রিয়, নিজ দেশ মুসলমান রাজা দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি কোন হিন্দু রাজ্যে বসবাসের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। সে সময় বিজয়নগর হিন্দু রাজ্যগুলির তুলনায় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল; অর্জুনেরও উদ্দেশ্য ছিল বিজয়নগরের রাজার সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। রাজকুমারীদের নৌকায় নীতে হলে প্রথমে নৌকার রাজকর্মচারীরা গুপ্তচর বলে সন্দেহ করলেও পরে তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকেও

সঙ্গে নিয়ে নেয়। কিন্তু বিজয়নগরের উপকূলে পৌঁছোলে হঠাৎ ঝড়ে নৌকাগুলি উলটে যায়। রাজকুমারীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা নদীঘাটে এসেছিলেন তারাও ঝড়ের তাণ্ডবে বিভিন্ন দিকে ছিটকে যায় ; রাজকুমারী এবং নৌকার অন্যান্য আরোহীরাও অনেকেই ঝড়ের ঝাপটায় জলে পড়ে যায়। অর্জুনবর্মা রাজকুমারীকে জল থেকে উদ্ধার করে সেই রাত্রে এক নির্জন চরে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকেন। রাজকন্যার জ্ঞান ফিরে এলে নিদ্রিত অর্জুনবর্মার পৌরুষদীপ্ত চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মনে মনে তাঁকেই ভালোবাসেন। মহারাজ দেবরায় তাঁর ভাই কুমার কম্পনদেবকে রাজকুমারীদের আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কম্পনদেবের রাজ-সিংহাসনের প্রতি লোভ ছিল। তিনি নির্জন চরে রাজকুমারী বিদ্যুন্মালা এবং অর্জুনবর্মাকে আবিষ্কার করেন। তিনি রাজাকে সকল কথা জানাল। ভাবী রাজবধূ অপিরিচিত কোন পুরুষের স্পর্শলাভ করেছে সুতরাং তার সঙ্গে রাজার বিবাহ হতে পারে না ; কুমার কম্পনদেবের এই ধারণাই ছিল। ভবিষ্যতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করে রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা এবং রাজসিংহাসন উভয় লাভ করার গোপন ইচ্ছা কুমার কম্পনের ছিল। কিন্তু রাজপুরোহিতের পরামর্শে বিদ্যুন্মালার বিবাহ তিন মাসের জন্য পিছিয়ে যায় এবং এই সময় তাঁকে প্রতিদিন দেবীর কাছে পূজো দিয়ে অপরাধ স্খালনে ব্রতী হতে হয়। বিদ্যুন্মালার বৈমাত্রেয় ভগিনী মনিকঙ্কণা রাজার প্রতি অনুরক্ত হলেও বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। রাজার বিশ্বাসভাজন অর্জুনবর্মা কুমার কম্পনদেবকে হত্যা করে রাজার প্রাণ রক্ষা করে। রাজা খুশী হয়ে অর্জুনবর্মাকে তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী করে নেন. কিন্তু বিদ্যুন্মালার সঙ্গে অর্জুনের গোপন প্রণয়ের কথা জানতে পেরে বিদ্যুন্মালাকে গৃহবন্দী করেন এবং অর্জুনকে দেশত্যাগের আদেশ দেন। অর্জুন তাঁর বন্ধু বলরামের সঙ্গে দেশত্যাগ করেন কিন্তু তারা জানতে পারেন যে বিদেশী মুসলমানেরা দেশ আক্রমণের গোপন ষড়যন্ত্র করেছে। অর্জুন নিজের জীবন বিপন্ন করে রাজাকে এই সংবাদ দেন, তাঁর এবং বলরামের আবিষ্কৃত কামানের সাহায্যে বিদেশী আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন। মহারাজ দেবরায় খুশী হয়ে বিদ্যুন্মালার সঙ্গে অর্জুনবর্মার বিবাহ দেন এবং নিজে রাজকুমারীর বৈমাত্রেয় ভগিনী মনিকঙ্কণাকে বিবাহ করেন কিন্তু রাজ সম্মান রক্ষার্থে মনিকঙ্কণাই বিদ্যুন্মালা বলে প্রজা-সমাজে পরিচিতি পান। শরদিন্দু কাহিনীর রোমাণ্টিক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে এটাই মগ্ন ছিলেন যে তিনি চরিত্রায়ণে স্বাভাবিকতাকে উল্লঙ্ঘন করেছেন। বিদ্যুন্মালার দ্বন্দ্ব কিংবা মহারাজ দেবরায়ের রাজকীয় আচার-আচরণ কোথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। অধিকাংশ নরনারীই শ্রেণী-প্রতিনিধি, কোথাও রক্ত মাংসের হয়ে উঠেনি। বিশেষতঃ কুমার কম্পনদেবের ভাতৃ হত্যার পরিকল্পনা এবং সাম্রাজ্য লাভের চেষ্টার মধ্যে কোথাও পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি ; মনে হয় অর্জুনবর্মাকে রাজার বিশ্বাসভাজন করানোর জন্যই কুমার কম্পনদেবের চরিত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে। লেখকের বর্ণনা কৌশল প্রশংসনীয় ; প্রাচীন ভারতের

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার মধ্যে লেখক তাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছায়াময় অতীতের রূপ বর্ণনার মধ্যে বাস্তবের অস্তিত্ব বেমানান মনে করেই লেখক তাঁর এই জাতীয় উপন্যাসগুলিকে যতটা কাব্য করে তুলেছেন ততটা গদ্য করে তোলেন নি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বহুপ্রসূ লেখক ছিলেন। তাঁর গল্প, উপন্যাস এবং গোয়েন্দাকাহিনীর সংখ্যা নেহাৎ অল্প নয়। এ ছাড়া চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য তিনি বহু কাহিনীর চিত্রনাট্যও রচনা করেছিলেন। তিনিই বাংলা ভাষার সার্থক গোয়েন্দা গল্প লেখক, যিনি গোয়েন্দাকাহিনীকেও সাহিত্যরসসিক্ত করে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। শরদিন্দু বহুপ্রসূ লেখক হলেও আঙ্গিক (Form) সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা লক্ষ্য করার মত। তিনি মূলতঃ বর্ণনাত্মক রীতিতে মাঝে মাঝে মূল কাহিনী থামিয়ে উপকাহিনীর সংযোজন করেছেন। কিন্তু কাহিনীর কোথাও গতি রুদ্ধ হয়নি। বিশেষতঃ অতীতের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসগুলিতে তিনি ইতিহাসের সন তারিখ এমন কি ইতিহাসবিদদের মত দেশকালেরও বিবরণ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—"আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ—কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না— কিন্তু আপনার বই পড়িবে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়ে Three Musketeers প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" (চিঠি ঃ ২৬শে নভেম্বর, ১৯৬৫) শ্রীমজুমদারের এই উক্তি শরদিন্দুর সবকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

যদিও মানব জীবনের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বোধই কথাসাহিত্যের প্রধান অভীপ্সিত বিষয় তবু মূলতঃ এর কাহিনীর আকর্ষণই পাঠককুলকে আকৃষ্ট করে থাকে। তাই কথাসাহিত্যে, বিশেষতঃ উপন্যাসে কাহিনী রচনার একটি বিশিষ্ট শিল্প-মূল্য আছে। তাই বিষয় ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক রচনায় ঔপন্যাসিককে যত্নবান হতে হয়।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনা পরম্পরার বিবরণের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে বিকশিত করে তুলতেন নিটোল কাহিনীর সুগঠিত ভঙ্গিমাকে প্রায় নিখুঁত রেখে। যদিও তিনি নিজে বলেছেন—'ঔপন্যাসিক অন্তর্বিষয়ের প্রস্ফুটনে যত্নবান হইবেন' তবুও চরিত্রের অন্তর্জগত বহির্জাগতিক ছন্দকে বিঘ্নিত করেনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। সবুজপত্রের যুগে আসার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও ছিলেন বঙ্কিমী প্লট-নির্ভর উপন্যাসের উত্তরাধিকারী। পরে কিন্তু একসময় তিনি তন্ময় হয়েছেন এবং ক্রমশঃ মনস্তত্ত্ব, কবিত্ব ও জীবনদর্শন কাহিনীতে চাতুর্যের সঙ্গে মিলতে শুরু করেছে।

পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসের রসজ্ঞ পাঠক আরও অন্তর্লীন হবার অবকাশ পেয়েছে। বাংলা উপন্যাস ক্রমশই কাহিনী সর্বস্বতা ছেড়ে চরিত্রের মনোজগতের গভীরে ডুব দিয়েছে; বাংলা উপন্যাসে এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে মন্তব্য করেছেন বুদ্ধদেব বসু কারণ "বাঙ্গালীর জীবনে ঘটনার ক্ষেত্র অনধিক, বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, সেইজন্যই আমাদের উপন্যাসের ঝোঁক প্রথম থেকেই হওয়া উচিত ছিলো মনস্তত্ত্বের দিকে। কেননা জীবনের পারিপার্শ্বিক যতই সংকীর্ণ হোক, মানুষের মনের রহস্যের কোনদিন কোনখানে সীমারেখা নেই।"

তাই ঘটনা আবর্তের মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ঝিলিক পার হয়ে ক্রমশঃ বাংলা উপন্যাস চেতনাপ্রবাহের রীতির দিকে স্বভাবতই অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এতে উপন্যাসের মনস্বিতা বৃদ্ধি পেলেও কাহিনী মাধুর্যের অমোঘ আকর্ষণ যে শিথিল হয়েছে এ কথা বোধহয় একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাই একদিকে চেতনাপ্রবাহের পথ বেয়ে একদল কথাসাহিত্যিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জয়যাত্রা শুরু করলেও গল্প বলার ও শোনার চিরাচরিত পথটিও কিন্তু জনশূন্য রইল না। একদল রহস্যপ্রিয় মনোমুগ্ধকারী যাদুকর পথিক সেই পুরানো পথেই মোহবিস্তার করে চললেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই চির চেনা পথটিকেই এমন এক আবেগময় অচেনা রূপে তুলে ধরলেন যে মুগ্ধতা লাভে দেরী হল না।

বাঙ্গালীর জীবনে ঘটনার প্রাচুর্য নেই বলেই তিনি কাহিনীর সন্ধানে অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু উপন্যাসের শিল্পী রূপে তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এইখানেই যে, ঐতিহাসিক কল্পনার সার্থক প্রয়োগে নিটোল কাহিনী গ্রন্থনায় তিনি অসামান্য পটুত্ব দেখিয়েছেন। কল্পনার জগতকে পুনর্গঠিত করার সময় তিনি বিশেষ সচেতন থেকেছেন সেই যুগের জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত রূপায়নে। ব্যবহার করেছেন বিশেষ পরিভাষা, যত্নবান হয়েছেন পথঘাটের খুঁটিনাটি বর্ণনায়। ফলে পরিচিত অভ্যস্ত গল্প বলার ভঙ্গীটিও অচেনা রহস্যময়তায় নিবিড় হয়েছে। এ কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, শুধু তাঁর গল্প বলার রীতিটিই প্রথাসিদ্ধ নয়, কাহিনীও জটিলতামুক্ত। ইতিহাস ও মানবজীবন, মূলকাহিনী ও উপকাহিনী, বহির্জগত ও মানসজগত ইত্যাদি টানা-পোড়েনে বিঘ্নিত হয়নি তাঁর মোহচাতুর্য। ফলে আবিষ্ট হয়েছে পাঠক। সু-সংযত ভাষা ব্যবহার, অমিত লাবণ্যময় সুসংবদ্ধ আখ্যানভাগ সর্বোপরি চিত্তাকর্ষক প্যানোরোমিক পরিমণ্ডল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের গঠন কৌশলের বিশিষ্টতার পরিচায়ক। শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতেই নয়, সামাজিক উপন্যাসেও তিনি এই মোহাবেশ ধরে রাখতে পেরেছেন। সমসাময়িক কোন জীবন সমস্যায় আকীর্ণ নয় তাঁর উপন্যাস। মনের গভীরেও নেই কোন দ্বন্দ্ব। ইতিহাস বা সমসাময়িক পটভূমি যাই হোক না কেন 'হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালা'র মত এক যাদুময় বাঁশী ছিল শরদিন্দুর হাতে, যা কোন জিজ্ঞাসাকেই দানা বাঁধতে দেয় না, শুধু মাদকতায় মুগ্ধ হতে হয়। তাই বিষয় গৌরবের চেয়ে অনেক নিশ্চিত ছিল

শরদিন্দুর রচনা কৌশল। এই রচনা চাতুর্যে তাঁর অধিকার যে কত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় ছিল তা গোয়েন্দাকাহিনীর ক্ষেত্রে আরও বেশী করে অনুভূত হয়। কারণ বাংলা সাহিত্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক যিনি কাহিনীর শিল্পমূল্যের গুণেই কথাসাহিত্যের সাধারণ বিচারেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তীব্র উত্তেজনামূলক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত ঘটনা-নির্ভর কাহিনী শরদিন্দুর গ্রন্থন নৈপুণ্যে শুধু সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেনি বিপুল জনসমাদরে সম্বর্ধিত হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিবিড় ও গভীর বোধযুক্ত জীবনশিল্পী হয়ত ছিলেন না কিন্তু লীলাময় রহস্য তৎপর ভাষা-শিল্পী ছিলেন—এ কথা স্বীকারে দ্বিধা করবেন না এমন বাঙ্গালী পাঠকের সংখ্যা অপ্রতুল নয়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল উপন্যাস রচনার মধ্যেই যে বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন তা নয়, তিনি তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতে এক অভিনবত্বের স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন। বাঙ্গালীর ঘটনাবিহীন জীবনে রহস্যের পরিবেশ সৃষ্টি করা এক কঠিন কাজ। শরদিন্দুর পূর্বে আমরা যে ধরণের বাংলা রহস্য কাহিনী পাঠে অভ্যস্থ ছিলাম সেগুলির মধ্যে বাস্তব জীবন রসের সন্ধান বড় একটা পাওয়া যেত না; কিন্তু শরদিন্দু তার সৃষ্ট ব্যোমকেশ, সত্যবতী এবং অজিতকে নিয়ে এমন এক ঘরোয়া পরিবেশের অবতারণা করেছিলেন যার মধ্যে আমরা উপন্যাসেরই চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। আসলে কথাশিল্পীর সবকটি গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন—অতীতচারিতায় মগ্ন থেকে এক বর্ণময় প্রাচীন ভারতকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন. অপর পক্ষে, গোয়েন্দা কাহিনী রচনায় তিনি আটপৌরে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে উপন্যাসের বাস্তবতার স্বক্ষেত্রে কল্পনার আমেজ নিয়ে এসে যেমন স্বাদ-বৈচিত্র্য ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছেন অপরদিকে তেমনই রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীকে বাস্তবতার সুদৃঢ় ভূমিতে গ্রোথিত করে অতি তরলায়িত হওয়ার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। এই ভাবে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে তার স্বতন্ত্র অবস্থানটি নিশ্চিত করে রেখেছেন।

অরুণ সান্যাল

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ অপরিচিতির বিস্ময়

[এক]

কাজী নজরুল ইসলাম—কাব্যের ক্ষেত্রে যদি অনন্য-সাধারণ হন, তবে গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি নিতান্ত সাধারণ নন। কবিতা ও সঙ্গীত সৃষ্টিতে তিনি নিঃসন্দেহে ঐশ্বর্যবান ; উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি সন্দেহাতীত ভাবে শক্তিমান।

বাংলা সাহিত্যাকাশে যিনি ধূমকেতুর মত আকস্মিক ভাবে আবির্ভূত হয়ে দিক্ দিগন্তকে আলোকিত করে তুলেছিলেন, সেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র তিনটি উপন্যাস উপহার দিয়ে বাঙ্গালী পাঠকের অন্তর আলোড়িত করে, এক অনন্ত কৌতূহল জাগিয়ে তুললেন। তিনি তিনটি উপন্যাস রচনা করেই প্রমাণ করলেন যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে আরো কর্ষণার কাজ করলে তিনি হতে পারতেন এক সম্পূর্ণ সফল শিল্পী। ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়, কেন সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি আরো উপন্যাস রচনা না করে তাঁর অসংখ্য অনুরাগীকে বঞ্চিত করলেন।

মুখর কবি মূক হওয়ার পূর্বে মাত্র বাইশ বছর সৃষ্টিশীল ছিলেন ; তার মধ্যে মাত্র আটটি বছর তিনি উপন্যাস রচনায় ছিলেন ব্রতী। ফলে আমরা পাই ত্রয়ী উপন্যাসের এক স্বল্প সম্ভার।

আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সব ধারাকে স্পর্শ করেও যেমন নিজেকে প্রকাশ করার জন্য শেষ পর্যন্ত চিত্রাঙ্কনে রত হয়েছিলেন, তেমনি নজরুল তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার যে অংশকে কাব্যে বা সঙ্গীতে প্রকাশ করতে পারেননি, সেই অপ্রকাশিত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতেই উপন্যাস রচনায় প্রাণিত হয়েছিলেন।

[দুই]

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী যে সময়টি নানামুখী তরঙ্গসঙ্কুলতা নিয়ে ক্রমেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছিল, ঠিক সেই সময়ই আত্মপ্রকাশ করে 'কল্লোল'। কথাশিল্পী শৈলজানন্দের ভাষায় ঃ "সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, প্রাণের কল্লোল।" তাই কালটি 'কল্লোলের কাল' রূপেই পরিচিত। এই কালেই একদল লেখক কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশনার (১৯২৩) মাধ্যমে এক অভিনব সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যা কিছু পুরাতন, যা কিছু স্থবির, যা কিছু সংকীর্ণ—সব কিছু পরিত্যাগ করে এক পরিবর্তনের ধারা প্রবর্তনের প্রত্যাশা নিয়েই এই সময়ে এই নবীন কথাশিল্পীর দল উপস্থিত হয়েছিলেন সাহিত্যের আঙ্গিনায়। আধুনিকতা সৃষ্টির অঙ্গীকার নিয়েই

তাঁরা রবীন্দ্রদ্রোহিতায় অবতীর্ণ হন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনাতেই আধুনিকতার উৎস আবিষ্কার করে হন অভিভূত। তা সত্ত্বেও এই সময়ে এই তরুণ কথাশিল্পীর দল যাঁরা আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরাই রবীন্দ্রোত্তর কালের পুরোধা, নিঃসন্দেহে প্রগতিপন্থীও।

এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী, আধুনিকতা প্রত্যাশী শিল্পীর দল রোমাণ্টিক মন ও মেজাজের অধিকারী হয়েও বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্রণে আগ্রহী। মহাযুদ্ধের প্রভাব-সঞ্জাত মূল্যবোধের পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন এ'রা শহরমুখী হয়েও অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষের জীবনকথা বর্ণনায় আকাঙ্ক্ষী। এ'রা তৎকালীন বিশেষ মার্ক্সীয় বস্তুতন্ত্রবাদ ও ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ সম্পর্কে শুধু সচেতনই নন, তার তাৎপর্য গ্রহণেও ছিলেন তৎপর। এক কথায়, সমকালীন জীবন-জটিলতার ও জীবন-যন্ত্রণার এক সম্ভাবনাময় রূপকার। এ'দের মধ্যে অগ্রণী হিসেবে স্মরণে আসেন গোকুল নাগ, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের নাম। কিন্তু এ'দের সমকালীন হয়েও, এমনকি এ'দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সূত্রে, বিশেষভাবে শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও যিনি 'আপন খেয়ালে' উপন্যাস সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করে নিজস্ব স্বতন্ত্র পথ নির্ধারণ করতে হয়েছিলেন সচেষ্ট, তিনি বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়—কাজী নজরুল ইসলাম।

কুড়ি থেকে তিরিশের দশক কল্লোলের 'বৃত্তরেখা' রূপেই নির্দিষ্ট, তবুও সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে এই সময়েই 'ধূমকেতু'-র আবির্ভাব ঘটে। এই উপলক্ষে নজরুল কল্লোলের শরিক নৃপেন চট্টোপাধ্যায়কে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন :

"…ধূমকেতু নামে একটা সাপ্তাহিক বের করছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমি মহাকালের তৃতীয় নয়ন। আপনি ত্রিশূল…।" সুতরাং এই কাল 'ধূমকেতু'র আবির্ভাব কালও বটে। 'মহাকালের তৃতীয় নয়ন নজরুলের বিদ্রোহ, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, আত্মভোলা বন্ধুত্বের উষ্ণতা, দারিদ্র্যজয়ী মুক্ত প্রাণের আনন্দ, বিরতিহীন সংগ্রাম, ও দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজম-এর মধ্যে কল্লোল যুগের কয়েকটি লক্ষণ ফুটে উঠলেও, কল্লোলের কথাশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর মানসিকতার সম্ভবত কিছু মৌলিক পার্থক্য ছিল। কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা বিদেশী সাহিত্যের শুধু অনুরাগী পাঠকই ছিলেন না, সেই সাহিত্য চর্চায় ছিলেন গভীরনিষ্ঠ ; কারণ এ'রা জানতেন 'বুদ্ধির দীপায়নের জন্য চাই কিছু পড়াশোনা, অনুভূতির সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ'। এই পরিবেশেই সকলে পেতে চেয়েছিলেন স্রষ্টা নজরুলকে। তাঁরা তাকে শেলি, কীটস্, বায়রণ, ব্রাউনিং পড়াতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা তাঁকে 'কল্পনার সোনার সঙ্গে চিন্তার সোহাগ' মেলাতে অনুরোধ করেছিলেন, বলেছিলেন 'নিজেই নিজের সমালোচক হতে'। তাঁরা আরো চেয়েছিলেন তাঁরা যেমন ফ্রয়েড, হ্যাবলক এলিস্, ইয়ুং প্রমুখদের চিন্তাধারা যা এদেশে এসে পৌঁছেছে এবং তাঁদের প্রভাবিত করেছে তার সঙ্গেও কাজী পরিচিত হোন : কিন্তু 'নজরুল থোড়াই কেয়ার' করেন লেখাপড়া'র। তিনি মনের

আনন্দে লিখে যাবেন অনর্গল, পড়বার বা বিচার করার স্থৈর্য বা সময় তাঁর নেই। তাই অচিন্ত্যকুমার মন্তব্য করলেন :

"খেয়ালী সৃষ্টিকর্তা মনের আনন্দে তৈরি করে ছেড়ে দিয়েছে গ্রহনক্ষত্রকে, পড়ুয়া জ্যোতিষিরা তার পর্যালোচনা করুক। সেও সৃষ্টিকর্তা।" এই সৃষ্টিকর্তা নজরুলই এই সময় কাব্যসৃষ্টির পাশাপাশি তাঁর উপন্যাস ত্রয়ী নিয়ে আকস্মিক ভাবে আবির্ভূত হলেন সাহিত্যবাসরে ; একে একে প্রকাশিত হল—'বাঁধন হারা' (১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০), আর 'কুহেলিকা' (১৯৩১)

[তিন]

কল্লোল সংহিত-কালিকলম—এই কালের সঙ্গে পাংক্তেয় হওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতার দাবী নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কবি ঔপন্যাসিক কাজী নজরুল, যিনি মাত্র তিনটি উপন্যাস উপহার দিয়ে হয়েছেন স্থায়ী কৃতিত্বের কিছুটা অধিকারী। তবে স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি গদ্যসৃষ্টিতে বুদ্ধি ও মননশীলতার চেয়ে আবেগের প্রাধান্যই প্রবল।

যে কৃতিত্বের উল্লেখ করেছি, সেই কৃতিত্বের অধিকারী হতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানামুখী বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অনেকখানি পরিমাণে প্রযুক্ত হয়েছিল, তা সন্দেহাতীত। বর্ধমান জেলার এক দরিদ্র মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করায়, জন্মমুহূর্ত থেকেই তাঁকে দারিদ্রের সম্মুখীন হতে হয় : এরপর বাল্য ও কৈশোর কাটে এই অন্তহীন দারিদ্রের দরিয়ায়। 'কৈশোরে বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সময়েই তাঁকে আমরা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে দেখি। কখনও পূর্ববঙ্গে কখনও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর বাস ও নানান মানুষের সঙ্গ লাভ তাকে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার অধিকারী করে। এই সময়েই শিয়ারসোলে স্কুলে পড়ার সময় তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে রাজনৈতিক ভাবনায় ভাবিত হন, যে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই আমরা তার পরবর্তী জীবনে সৃষ্ট উপন্যাসের মাধ্যমে। আর কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পৌছে তাঁর জীবনে যে প্রেমের সঞ্চার হয়, তারও প্রকাশ আছে তাঁর উপন্যাসগুলির নানা পর্বে। তারপর এক সময় 'বাঙ্গালী পল্টন'-এ যোগদান তাঁকে এক প্রতিকূল পরিবেশে এনে ফেলে। এই ধরণের অভিজ্ঞতার অজস্রতা নিয়েই তিনি উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন, যে ব্রতের ফসল হয় তিনটি উল্লেখ্য উপন্যাস। এই উপন্যাস তিনটির মাধ্যমে নাগরিক চেতনা নিয়েই ঔপন্যাসিক নজরুল ধরতে চেয়েছেন সমকালীন মুসলিম সমাজের আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, স্বপ্ন-সংগ্রাম, ও সংশয়-সংকটের আলেখ্য ও অন্তত এব্যাপারে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়, যদিও তাঁর সামর্থ ছিল সীমায়িত।

প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ্য—শিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে স্রষ্টা নজরুলের জীবনধারার এমন একটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে যা দুজনের সাহিত্য সৃষ্টিতেও একটি যোগসূত্র স্থাপন

করেছে। শরৎচন্দ্রের শৈশব কৈশোর ও যৌবন কাল কেটেছিল স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াত করে, নজরুলের জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে এমনি ভাবেই : বাল্যকাল থেকে দুজনেই প্রায় ছিন্নমূল। দারিদ্র ও অন্যান্য কারণে প্রায় পরানুগ্রহে প্রতিপালিত। তারা যখন স্থিতু হয়েছেন তখন একজন ফিরেছেন সুদূর ব্রহ্মদেশ বসবাসের পর, অন্যজন ফিরলেন করাচির সৈন্যাবাস থেকে। এই পরিস্থিতি তাঁদের অভিজ্ঞতার ঝুলি যেমন সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনি তাঁদের দুজনকেই করেছিল 'অভিজ্ঞতা-নির্ভর শিল্পী'। এতেই অবশ্য দুজনকেই বস্তুবাদী বলা সঙ্গত হবে না। এঁদের উপন্যাসে বাস্তব চিত্র ও চরিত্র অবশ্যই আছে, কিন্তু কথাশিল্পী হিসেবে দুজনেই রোমাণ্টিক। এঁদের দুজনেরই উপন্যাসে গভীর মনীষার অনুসন্ধান করা অযৌক্তিক কেননা এঁরা দুজন কখনই 'অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত' ও 'মনন-সমৃদ্ধ' কল্পনা—যা মহৎ উপন্যাসের আদর্শ ভিত্তি—তার অধিকারী ছিলেন না। অর্থাৎ এঁরা অভিজ্ঞতা, তথ্য ও কল্পনাকে গূঢ় মননের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিস্তৃত জীবনধারণার রেখাঙ্কন করতে সমর্থ হননি। তাই এঁরা দুজন উপন্যাস-শিল্পী হিসেবে ছিলেন 'মধ্যবর্তী' স্তর সম্ভূত। এঁদের জন্ম, শিক্ষা, সংস্কার, পারিবারিক পরিবেশ, কর্ম সমস্তই মধ্যবিত্ত সুলভ বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। মধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়ে এঁরা মধ্যবিত্তদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় শিল্পী রূপেই পেয়েছেন প্রতিষ্ঠা। মনে রাখতে হবে, নানা ঘটনার ঘোড়ায় চেপেই নজরুলের নায়ক নায়িকারা কাহিনীর কাঠামোয় প্রবেশ করেছে, তারা বহিরঙ্গ ঘাত-প্রতিঘাত প্রভাবিত হয়েছে ও প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। মনের জগতের গভীরতর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সন্ধান এখানে আমরা পাই না। প্রকৃত পক্ষে কথাশিল্পী নজরুলের উপন্যাসে সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক ক্রিয়াকলাপ বা মননশীলতার সন্ধান কোন ক্রমেই যৌক্তিক নয়—সে কথা আমরা আগেই বলেছি।

যাই হোক, শরৎ উপন্যাসাবলী যেভাবে সাধারণ পাঠকের দরবারে প্রচারিত হয়েছে সেই তুলনায় নজরুল উপন্যাসাবলীর প্রচারের পরিধি ছিল বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত। তবে নজরুল উপন্যাসাবলী যদি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মত প্রচারিত হত তবে তা যে ভাবপ্রবণ সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের অন্তর জয় করতই, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই তাঁর সেই প্রায় অপরিচিত উপন্যাসগুলি উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে রেখে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

[চার]

কোন আখ্যান ব্যতীত উপন্যাস সৃষ্টি সম্ভব নয়, অথচ শুধুমাত্র আখ্যানই উপন্যাস নয়। ঘটনা ও চরিত্রাবলীর সহায়তায় যে আখ্যান গড়ে ওঠে তা সাধারণত লেখকের সমকালীন রূপান্তরশীল সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজ-সচেতন কথা-শিল্পী যখন কোন পট-বিধৃত ব্যক্তির যন্ত্রণাদীর্ণ কর্মমুখর বা অনুভূতিময়, সংবেদনশীল সত্তাকে রূপদান করেন তখনই তা হয় উপন্যাস। ব্যক্তি ও সমাজ এবং

সভ্যতার বিশিষ্ট সম্পর্কের প্রশ্নটিই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই কথাগুলিই স্মরণে রেখেই আমি এখানে কাজী নজরুলের উপন্যাস ত্রয়ীর কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার উপস্থিত করছি, যেখানে আমরা দেখব লেখক অঙ্কিত গতিময় রূপান্তরশীল জীবনেরই রূপ দেশকালের কঠিন মৃত্তিকা থেকেই জীবনরস সংগ্রহ করে সঞ্জীবিত হয়েছে। বিশেষতঃ তৎকালীন মুসলিম সমাজের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সব কাহিনী।

কাজী নজরুলের প্রথম উপন্যাস—একটি পত্রোপন্যাস, নাম 'বাঁধন হারা।' এই উপন্যাসটি সতেরোটি ['নজরুল উপন্যাস সমগ্র' গ্রন্থানুসারে] পত্রের সমাহার। এই উপন্যাসের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে স্বভাবে কবি কিন্তু কর্মে সৈনিক এক দুঃখবাদী তরুণ— নুরুল হুদা। এই তরুণের সহপাঠী মনুয়র মাতৃপিতৃহীন। সে তার দিদি রাবেয়া ও তার স্বামী রবিয়লের আশ্রয়েই আশ্রিত। বন্ধু মনুয়রের সুবাদেই রবিয়লের মা ও তার স্ত্রী রাবেয়া যথাক্রমে নরুলেরও মা ও ভাবী সাহেবা।

এই সৈনিক-কবি তরুণ নুরুলের সঙ্গে পত্রবিনিময়ে ও নিজেদের মধ্যেও পত্র বিনিময়ে যাঁরা জড়িত তাঁরা হলেন ভাবী সাহেবা রাবেয়া, তার ননদিনী সোফিয়া, সোফিয়ার বান্ধবী মাহবুবা ও রাবেয়ার সহপাঠিনী সাহসিকা যিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

পত্র সূত্রে প্রমাণ, সোফিয়ার বান্ধবী মাহবুবার সঙ্গে এক স্বপ্নরঙ্গিন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নুরুল হুদার, কিন্তু বন্ধন-অসহিষ্ণু, দুঃখবাদী তরুণ বন্ধনের ভয়েই একদিন আকস্মিক ভাবে দেশত্যাগ করে যোগ দিল সৈন্যদলে—'বাঙ্গালী পল্টনে'। এই দুজনের এই বিশেষ সম্পর্কের কথা জানা ছিল সোফিয়ার আর ঘটনাচক্রে মাহবুবার একটি চিঠি পড়ে তা জানতে পেরেছিলেন রাবেয়া—নরুলের ভাবী সাহেবা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতার মৃত্যুর ফলে মাহবুবাকে মায়ের সঙ্গে চলে যেতে হয় মামার বাড়ীতে, যেখানে মাহবুবার মা ও মামারা তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেন এক বয়স্ক, বিপত্নীক ধনী জমিদারের সঙ্গে। কিন্তু সাহসিকাদিকে লেখা মাহবুবার শেষ চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে আজও সুদূর করাচির সৈন্যাবাসে বসবাসকারী নুরুলের জন্য সমর্পিত-প্রাণ। তাই সে লেখে : "মন আমার আরব সাগরের উপকূলে তরঙ্গের মত মাথা খুঁড়ে মরতে চায়। আশীর্বাদ করো দিদি, এই মাথাটা যেন কল্যাণের চরণতলে এইবার নোয়াতে পারি।"

বলা বাহুল্য, পত্রাদির মাধ্যমে দুই তরুণ-তরুণীর নিষ্ফল প্রেমের এক কাহিনীর কিছুটা শিথিলবন্ধ রূপ আমরা পাই তাঁর প্রথম 'পত্রোপন্যাসে', যা বাংলা সাহিত্য-ধারায় প্রায় নতুন সংযোজন।

প্রথম উপন্যাসে কাহিনীটা কিছুটা শিথিলবন্ধ হলেও দ্বিতীয় ও শেষ উপন্যাসের কাহিনী দুটির গঠন তুলনায় দৃঢ়; স্পষ্টও বটে।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা'-র নায়ক আনসার, যে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে খেলাফতী ভলেণ্টিয়ারের পোষাক পরে একদিন আকস্মিক ভাবে এসে পেঁছিল তার

খালেরা রহিন অর্থাৎ মাসতুতো বোন, বিবাহিত জীতফার গ্রামের বাড়ীতে। উদ্দেশ্য, শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তোলা। এককালে চড়কার শক্তিতে তার বিশ্বাস থাকলেও এখন আর তার সেই রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। আজ সে শ্রমিক মজদুরদের সংগঠনে বিশ্বাসী এক কম্যুনিস্ট তরুণ। এই তরুণের কাছ থেকেই জানা যা' এককালে তার সঙ্গে মধুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ম্যাজিস্ট্রেট হামিদের শিক্ষিতা কন্যা রুবির : কিন্তু সে সম্পর্ক স্থায়িত্ব লাভ করেনি ; ফলে রুবির বিয়ে হয়েছে অন্যত্র তবে সে বিবাহও স্থায়ী হয়নি। রুবি বৈধব্য বরণ করেছে। কিন্তু আনসার তার বোহেমিয়ান জীবনে সেই রুবিকে যেমন ভুলতে পারেনি, তেমনি বিধবা রুবিও পারেনি ভুলতে আনসারকে। নানা ঘটনার মাধ্যমে আনসারের মৃত্যুর মুহূর্তে এদের দুজনের মিলনের মাধ্যমেই কাহিনীর সমাপ্তি। বলা বাহুল্য, এ কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী হিসেবে জড়িত আছে কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী গোয়ারীর চাদ সড়কের বসবাসকারী নিম্নবিত্ত, দরিদ্র কাজীর মা, তার ছোট ছেলে প্যাকালে, গাজীর মার তিন ছেলের বৌ ও খৃস্টান পাড়ার দুই একজন বিশেষত মিস্ জোন্সের কাহিনী।

তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস—'কুহেলিকা'-য় আমরা একটা মোটামুটি সংবদ্ধ কাহিনী পাই, যা গড়ে উঠেছে অভিজাত মুসলমান পরিবারের সন্তান যুবক জাহাঙ্গীরকে নিয়ে।

জাহঙ্গীর যখন জননী ও জন্মভূমিকে সবেমাত্র স্বর্গাদপী গরীয়সী বলে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, সেইসময় একদিন আকস্মিক ভাবেই সে আবিষ্কার করল যে সে তার ধনী বিলাসী পিতা, চিরকুমার ফাররোখ সাহেব ও প্রখ্যাত বাইজী ফরদৌসী বেগমের কামজ সন্তান। সেইদিন থেকেই তার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রঙ বদলে গেল। এই ঘৃণ্য পরিচয় প্রতি মুহূর্তে তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। তাই সন্ত্রাসবাদের আগুনে আত্মশুদ্ধি করার জন্যই সে দীক্ষিত হল বিপ্লববাদে। সে তার জীবনের পথ পরিবর্তন করে হল বিপ্লবী। এই বিপ্লব মন্ত্রে তাকে দীক্ষা দিলেন তারই স্কুলের শিক্ষক প্রমত্ত।

সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ও বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত, ধনীর সন্তান জাহঙ্গীর মৃত পিতার সমস্ত সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিকানা পরিত্যাগ করে হয়ে উঠল মনে মনে নিরাসক্ত, হয়ে উঠল সংসার-বিমুখ।

এই সংসার-বিমুখ, সন্ন্যাসী-মন নিয়েই সে পৌঁছেছিল দরিদ্র বন্ধু ও সহপাঠী হারুণের সঙ্গে বীরভূমের এক গ্রামে। সেইখানেই গরীব কিন্তু বংশমর্যাদার গৌরবে গরবিনী হারুণের রূপসী বোন ভূণী ওরফে তহমিনা নাড়া দিল সন্ন্যাসী-মনে।

এক আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতে এ কাহিনীধারায় শুধু পরিবর্তন এল না, পরিবর্তন এল এই দুই জীবনে। জাহঙ্গীর আর তহমিনা—উন্মাদিনী মায়ের এক মুহূর্তের অস্বাভাবিক আচরণে এক অদৃশ্য বন্ধনে যেন আবদ্ধ হয়ে পড়ল। তহমিনা সেই বন্ধনকেই তার অনিবার্য নিয়তি বলে মেনে নিল।

জাহঙ্গীর বিপ্লবী, সে এই বন্ধনে বাঁধা পড়তে নারাজ বলেই গ্রাম ছাড়ল, ফিরল কলকাতায়। কিন্তু জাহঙ্গীরের মা যখন সব জানতে পারলেন জাহঙ্গীরের পকেটে

পাওয়া তহমিনার এক চিঠি পড়ে, তখন তিনি ভূণীকেই পুত্রবধূ করে আনার সঙ্কল্প করলেন। যার আবেদনে সাড়া দিয়ে জাহঙ্গীর ফিরে এসেছিল সেই গ্রামে তহমিনাকে বধূ করে নিয়ে কলকাতায় ফেরার জন্য। এই দ্বিতীয়বার আসার পর ঘটল আর এক আকস্মিক ঘটনা। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী জাহঙ্গীর ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। হল কারাবন্দী—উপন্যাসের সমাপ্তি এখানেই।

[পাঁচ]

নজরুল উপন্যাসত্রয়ের পটভূমি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম উপন্যাস মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত. কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাসটি সম্পূর্ণভাবেই নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মুসলমান সমাজের প্রেক্ষাপটে পরিস্থাপিত। আর তৃতীয় উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে তৎকালীন বাংলার বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে অভিজাত মুসলমান তরুণের কাহিনী নিয়ে।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা'-র কাহিনীর সূচনা হয়েছে গোয়াড়ীর খৃস্টান পাড়ার পাশাপাশি মুসলমান পাড়ায়। তথাকথিত নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমান আর 'কনর্ভার্ট' খৃস্টান মিলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করে এখানে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এদের পুরুষেরা জনমজুর খাটে—অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি খানসামা, বাবর্চিগিরি বা ঐ ধরণের একটা কিছু করে, রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখ-ধান্দা করে।

"এরা যেন মৃত্যুর মালগুদাম। অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই। আমদানি হতে যতক্ষণ, রপ্তানি হতেও ততক্ষণ।"

এই পাড়ারই রাজমিস্ত্রি প্যাঁকালের পরিবারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের উপকাহিনী। ঔপন্যাসিক নজরুল এই পরিবারকে কেন্দ্র করেই চিত্রিত করেছেন নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মুসলমান সমাজের এক মর্মস্পর্শী বাস্তব চিত্র। শক্তিশালী শিল্পীর বাস্তবদৃষ্টির গভীরতা নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফসল। না হলে তিনি প্যাঁকালে. গজালের মা. বড়বৌ, মেজবৌ, সেজোবৌ. কুর্শি. রেতো কম্বার, নাজির সাহেব, আনসার, রুবি আর মিস্ জোন্সের মতো বিচিত্রধর্মী পুরুষ ও স্ত্রী-চরিত্র গুলো এমন অনায়াস ভঙ্গীতে এমন প্রাণবন্ত করে তুলতে পারতেন না। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক নজরুল যে কবি নজরুল থেকে স্বতন্ত্র পথের পথিক, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত এই সব চরিত্র সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

'বাঁধনহারা'—তাঁর প্রথম উপন্যাস, যার পটভূমি রচিত হয়েছে মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ নিয়ে, যে সমাজের প্রতিনিধি ঔপন্যাসিক নিজে। এই পত্রোপন্যাসখানির কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরুল হুদা নিঃসন্দেহে কবি-ঔপন্যাসিক কাজী নজরুলেরই প্রতিমূর্তি। প্রসঙ্গত এ আলোচনায় পরে আসব। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে যে

চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে তাঁরা হলেন নুরুলের বাঁকুড়া কালিজিয়েট স্কুলের সহপাঠী মনুয়রের ভগ্নিপতি রবিয়ল—যিনি নুরুলের ঘনিষ্ঠ। তাঁর স্ত্রী রাবেয়া, যিনি মনুয়রের দিদি আর নুরুলের ভাবী সাহেবা; রবিয়লের মা যিনি নুরুলকে মাতৃ স্নেহে আবদ্ধ করেছেন; রাবেয়ার ননদিনী সোফিয়া আর তার বান্ধবী মাহবুবা, নুরুলের প্রতি যার গোপন আকর্ষণ প্রায় নিরুচ্চারই রয়ে গেল। এই সঙ্গে উল্লেখ্য ভাবী সাহেবার বাল্যবান্ধবী সাহসিকার কথা, যিনি ধর্মে ব্রাহ্ম। মধ্যবিত্ত সমাজের এই চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের যে উষ্ণতা, সেই উষ্ণতাই এঁদের পত্রাবলীর মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠায় 'বাঁধনহারা' উপন্যাসটি একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। বাংলা উপন্যাসের ধারায় এটি একটি বিশেষ সংযোজন।

তৃতীয় ও শেষ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহঙ্গীর মূলত পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) ধনী বিলাসী জমিদার ফাররোখ সাহেবের রক্ষিতা বাইজী ফিরদৌসী বেগমের কানজ পুত্র। ফলে এ কাহিনী ধনী মুসলমান সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তাই বলতে অসুবিধে নেই যে কাজী নজরুল ইসলাম ঔপন্যাসিকের কলম হাতে মুসলমান সমাজের বিস্তর রূপ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। আমরা পেয়েছি নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মুসলমান সমাজের এক অন্তরঙ্গ পরিচিতি। ঔপন্যাসিক কাজী নজরুলের পূর্বে, হিন্দু কিম্বা মুসলমান কোন ঔপন্যাসিকের কাছে থেকেই মুসলমান সমাজের এমন অন্তরঙ্গ ও বাস্তবভিত্তিক সামগ্রিক পরিচয় পাওয়ার সুযোগ আমাদের হয়নি। সুতরাং দ্বিধাহীন ভাবেই বলা যায় যে, কাব্য ও গীত সৃষ্টিতে যে কবি কল্পনার আকাশে পক্ষ সঞ্চালনে ছিলেন সতত স্বচ্ছন্দ, সেই কবিই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বাস্তবের বন্ধুরতায় পদচারণায় ছিলেন ততোধিক তৎপর। বললে অত্যুক্তি হবে না যে কাজীর রোমান্টিক মনোলোক অটুট থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ জীবনবর্ণনে অভিলাষিত। কল্লোলীয় যুগের এ বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় লক্ষনীয়। তাই তাঁর উপন্যাসাবলী রোমান্সের রঙ্গিন আবেশে জড়িত হলেও সম্পূর্ণ ভাবে কল্পনাশ্রয়ী নয়, বরং মুসলমান সমাজ ও তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত বলেই খানিকটা পরিমাণে বাস্তবাশ্রয়ী।

[ছয়]

একজন বিদগ্ধ ও প্রাজ্ঞ সমালোচক উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

"সকল প্রেমে, সকল মানুষ তার স্বরূপকে খুঁজছে। ব্যক্তি-মানুষের এই সন্ধানী যাত্রায় ঘন ঘন করাঘাত সমাজ পরিবেশের বুকের ওপরেই বাজতে থাকে। তাতে যে সুরতরঙ্গ সৃষ্টি হয় উপন্যাসের পূর্ণ রূপ নির্মাণে তার ভূমিকা অন্যতম। সে কারণে বলা যায় যে, যন্ত্রণাই সমস্ত উপন্যাসের বিষয়—যে যন্ত্রণা অস্তিত্বের যন্ত্রণা।"

কাজী নজরুল তাই সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়েই উপন্যাস ত্রয়ের মধ্যে প্রেমের বিশিষ্ট রূপেই চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। নজরুল চিত্রিত এই প্রেম তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের চোখে নিষিদ্ধ বলেই তা গভীরতা পেয়েছে। তাই বলতে অসুবিধে নেই, নজরুল উপন্যাসাবলীর অন্যতম প্রধান বিষয় প্রেম, যা মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়েই এই রচনাবলীতে রূপ লাভ করেছে। এর কারণ হিসেবে একথাও মনে রাখতে হবে যে কবির ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের অধ্যায়টির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং তা তাঁর উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে আনসার ও রুবির প্রেম, 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে নুরুল হুদা ও মাহবুবার প্রেম ও 'কুহেলিকা' উপন্যাসে জাহাঙ্গীর ও তহমিনার প্রেম— তিনটি পৃথক পরিণতি নিয়ে চিত্রিত হয়ে প্রেমের যে পরিচয় প্রকাশ করেছে তা ঔপন্যাসিক নজরুলের প্রেম চেতনার পরিচয় সুচিহ্নিত করে তুলতে হয়েছে সক্ষম।

নজরুল মানসে প্রেমের যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, তার স্বরূপ বর্ণনা করে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন :

"কবিতা, গান, সাহিত্য শিল্পের কোন মূল্যবোধ তার ছিল কিনা কে জানে? নজরুল প্রেমে নিজেকে দিওয়ানা করে দিয়েছিলেন ভোগের জন্য নয়, মহান সৃষ্টির পরম প্রেরণার জন্য। তাই তার প্রেমের পারে সুর, সঙ্গীত সৃষ্টির ফসলের সমারোহে জমজমাট হয়ে উঠেছে, প্রেমে সম্ভোগ বৃত্তিকে পরিহার করে ত্যাগে কবি মনুষ্য জাতিকে মহিমামণ্ডিত করে, নিজে হয়েছেন নমস্য।"

এই উক্তির আলোকে বিচার করলে বলা যায় যে প্রেমের সম্পর্ক চিত্রণের ক্ষেত্রে এই উপন্যাস ত্রয় হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট সাহিত্য ফসল।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে ম্যাজিস্ট্রেট হামিদের শিক্ষিতা মেয়ে কবি ভালবেসেছিল কাম্যুনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী, সাংসারিক বন্ধনবিহীন মুসলিম যুবক আনসারকে। রুবির এ প্রেম কোনদিন সোচ্চার হয়ে প্রকাশ পায়নি। তাই মা-বাবার ইচ্ছার বলি হতে হয়েছিল রুবিকে। আনসারের সহপাঠী আই. সি. এস পরীক্ষার্থী মোয়াজ্জেম-এর সঙ্গে রুবির বিয়ে হলেও মাত্র এক মাসের মধ্যে তাকে বৈধব্য বরণ করতে হয়েছিল। আনসার তার সম্পর্কিত বোন লতিফার কাছে রুবির কথা বলতে বসে বলল :

"রুবির অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানেন, তবে এই বৈধব্য তাকে বড় বেদনা দিতে পারেনি, এটা বেশ বোঝা গেল। স্বামীকে সে চেনেনি। আমার যেন মনে হল, তাকে সে চেনবার চেষ্টাও করেনি।"

না পারাই স্বাভাবিক, কারণ রুবির অন্তর জুড়ে প্রেমের যে আসন পাতা সেখানে বসার মত যোগ্যতা মোয়াজ্জেমের ছিল না, ছিল আনসারের। তাই এই বৈধব্যের বেশেই তার রূপ হয়ে উঠেছিল অপরূপ। শিক্ষিতা রুবি ছিল আপন দীপ্তিতে উজ্জ্বল এক নারী, যার 'রূপকে ভক্তি করা যায়, ভালোবাসা যায় না।'— বলেছিল আনসার।

কিন্তু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আপাত কঠোরতার মধ্যেও যে নীরব প্রেম তাকে বিচলিত করত, তাই বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস নিয়ে ভেঙ্গে পড়ল সেইদিন যেদিন লতিফার কাছে আনসারের চিঠি পড়ার সুযোগ এল।

সুদূর রেঙ্গুনের সেণ্ট্রাল জেল থেকে লতিফা ওরফে স্নেহের বুঁচিকে চিঠি লিখতে বসে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, জীর্ণশরীর, কারাবন্দী আনসার জানিয়েছে যে অসুস্থ বন্দীকে ইংরেজ সরকার ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই ছাড়া পেলেই সে সোজা চলে আসবে ওয়াল্‌টেয়ারে, তা হবে বন্ধনের পর অসীম মুক্তি। সে তাই লিখেছে :

> "মাথায় অনাবৃত আকাশ চোখের সামনে কূলহারা জলধি মনের সামনে নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত একা, একা আমি।
>
> মাঝে মাঝে মনে হয়—মনে হয় ঠিক নয়, লোভ হয়—যাবার আগে এই অদ্বিতীয় মনের দ্বিতীয় জনকে দেখে যাই, জেনে যাই।"

বিদায় লগ্নে আনসারের এই শেষ কথাগুলো রুবির অন্তরের অন্তর্লীন প্রেমকে নতুন করে উস্কে দেওয়ার পক্ষে ছিল যথেষ্ট; তাই সে বলে উঠল

> "আমি ঠিক করেছি বুঁচি, আমি ওয়াল্‌টেয়ারে যাব। মা বলেন আমায় উল্কা। উল্কাই যদি হই, তাহলে শূন্যে আর ঘুরতে পারিনে। ধরায় যে মানুষ আমায় নিরন্তর টানছে, মুখ থুবড়ে তার দেশেই গিয়ে পড়ব। হয়ত আর আমি উঠতে পারব না, আমার সব আগুনও যাবে নিভে, তবুও ঐ আমার মহান মৃত্যু।

প্রেমের পরম পরিণতি এই মহান মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্যই রুবি ওয়াল্‌টেয়ারে গিয়েছিল অভিসারে তার রাজপুত্রকে বরণ করতে, যার কপালে রাজার লাঞ্ছনা-তিলক আর যার হাতে শ্যামসমান 'মরণের বাঁশী'।

স্রোতস্বিনী রুবি ছুটে এসেছিল সমুদ্রের উদ্দেশে। সে সেই নাগাল পেয়েছে। তাই লতিফাকে লিখে জানিয়েছে :

> "আজ আমার মনে হচ্ছে, এই আমার শেষ, এই আমার পরিণতি। এই আমার সার্থকতা।" সে আরো লিখেছে :
>
> "আমাদের শুভদৃষ্টি হল, সকলের অন্তরালে, মৃত্যু আর সমুদ্রকে সাক্ষী করে। আমাদের বাসর সাজাচ্ছে মৃত্যু তার অন্ধকারের নীল পুরীতে।"

যৌবনে বিধবা রুবি প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে গিয়েও বাঁচাতে পারল না আনসারকে। তাকে দেহদান করে সে নিজেও আক্রান্ত হল যক্ষ্মারোগে। বুঁচিকে লেখা তার যে চিঠি দিয়ে এ গ্রন্থের শেষ তাতে সে স্পষ্ট লিখেছে :

> "আমি জানি আমারও দিন শেষ হয়ে এল। আমিও বেলা শেষের পুরবীর কথা শুনছি। আমার বুকে তার বুকের মৃত্যুবীজানু নীড় রচনা করেছে। আমার যে টুকু জীবন বাকি আছে তা খেতে তাদের আর বেশী দিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চিরমিলন—নতুন জীবন—নতুন তারায়—নতুন দেশে—নতুন প্রেমে।"

প্রসঙ্গত মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীতে পাওয়া কয়েকটি পংক্তি—'যথার্থ

ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষদের অপেক্ষা ঢের বেশী। কোন কিছু তাহারা গ্রাহ্য করে না। পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধা করে না।' বিধবা রুবি সম্পর্কে এই উক্তি নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য।

এমনি ভাবেই এক রোমান্টিক বাতাবরণে উপস্থাপিত হলেও ব্যতিক্রমী উজ্জ্বলতা নিয়ে রুবির প্রেম আত্ম-বলিদানের মাধ্যমে এক চিরন্তন আসন লাভ করার সার্থকতা অর্জন করেছে।

'বাঁধনহারা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ বন্ধন-অসহিষ্ণু, কবি-সৈনিক নুরুল হুদা। একদিন আকস্মিক ভাবেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে যোগদান করল 'বাঙ্গালী পল্টনে' সৈনিক রূপে। করাচির সেনানিবাস হল তার আপন আবাস। এর প্রতি সোফিয়ার বান্ধবী মাহবুবার গোপন আকর্ষণের কথা জানত শুধু সোফিয়া। আর ভাবী সাহেবা যেদিন সোফিয়ার বাক্স থেকে মাহবুবার চিঠিটি লুকিয়ে পড়ে ফেললেন, সেদিন তার জানা কথা আরো গভীর প্রত্যয়ে পরিণত হল। মাহবুবাকে সোফিয়ার সঙ্গে পড়িয়ে মানুষ করেছিলেন এই ভাবী সাহেবা। তাই তাঁর বলার অধিকার ছিল অর্জিত। তিনি কোনরকম সঙ্কোচ না রেখেই লিখলেন :

"জানিনা বোন, তোদের এই বেহেশতের ফুল দুটির পবিত্র ভালবাসায় কার অভিশাপ ছিল? তোরা যে উভয়ে উভয়কে হৃদয়ের নিভৃততম মহান আসনে বসিয়ে বুকের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে অর্ঘ্য বিনিময় করতিস্, তা আমার চোখ কোন দিনই এড়ায়নি…পুরুষের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু এ জিনিসগুলো মেয়েদের চোখ এড়ায় না, তা তারা যতই ভাল ভাল ভাব দেখাক্।"

দীর্ঘ পত্রের আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

"মানবপ্রাণে এই যে বাবা আদমের কাল থেকে সৌন্দর্যের প্রতি, প্রাণের প্রতি মানুষের এত টান, এত গোপন পূজা—একে মানুষ কখনও ঘৃণা করতে পারে না।"

এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ভাবী সাহেবা এরপর শিশুর মত সরল, পবিত্রতার প্রতীক, স্নেহহারা, বাঁধনহারা নুরুর ভবিষ্যতের কল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করেন :

"আমরা তোদের এই পূর্বরাগকে কেন প্রশ্রয় দিতাম জানিস? হাজার অন্দর মহলের আড়ালে আবডালে চাপা থাকলেও আমাদের অনেকের জীবনেই এমন একটা দিনক্ষণ আসে, যখন একজনকে দেখেই প্রাণের নিভৃতপুরে অনুরাগের গোলাবী ছোপের দাগ লেগে যায়। এ অনুরাগ আবার অনেক সময়ে ভালবাসাতেও পরিণত হতে দেখা যায়, আর সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। অবশ্য তা কারুর হয়ত সফল হয়, কারুর বা সে আশামুকুল ঝড়ে পড়ে। আবার কেউ হয়ত সাপের মাণিকের মতন মর্মের মর্মে তাকে আমরণ লুকিয়ে রাখে,—তা অন্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারে না।"

মাহবুবা এমনি করেই 'সাপের মাথার মাণিকের' মতই তার পূর্বরাগকে গোপনে অন্তরের অন্তঃস্থলে আমরণ লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু মাহবুবার অবুঝ মায়ের জন্য তার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। বৃদ্ধ বিপত্নীক স্বামীর ঘরে যেতে হল, কিন্তু সে যাওয়া তো মৃত্যুর সামিল। 'জমিদারীর পক্ষীরাজে চড়েও তার দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আর জাগিলো না।' 'অনেক অলঙ্কারে তার রূপ খুলল, কিন্তু মন কিছুতেই খুলল না।' তাই এখনও সে মনে মনে প্রত্যাশা করে একদিন তার সারা জীবনের ক্ষতি এক মুহূর্তের কল্যাণে পুষ্পিত হয়ে উঠবে। তার মন কেবলই বলে ওঠে, 'আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।' তাই শ্রদ্ধেয়া সাহসিকাদিকে সে লেখে :

"যাকে আমি বাম হস্তের বারন দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি, দক্ষিণ হস্তের বরণ মালা দিয়ে যদি তার প্রায়শ্চিত্ত না করি তাহলে আমার আর মুক্তি নেই ইহকালে।"

তাই আজও খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ে মন তার আরব সাগরের উপকূলে তরঙ্গের মত মাথা খুঁড়ে মরতে চায়।

এমনি ভাবেই মাহবুবার পূর্বরাগ মনের গভীর গহনে থেকে অপূর্ণতার বেদনায় চিরকালের জন্য ব্যথার বিন্দু হয়ে রয়ে গেল। এ প্রেম 'নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়।' একেই কি হুইটম্যানের 'Sexless love' বলে।

সাহসিকাদি মাহবুবার এই বিশিষ্ট সহজিয়া প্রেম' সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করে লিখেছেন :

"সে (মাহবুবা) সহজিয়া। সহজেই এই ক্ষ্যাপাটাকে ভালবেসেছিল, আর এমনি সহজ হয়েই সে তাকে চির-জনম বাসবে। তার বুকে যদি কখনো যৌবনের জলতরঙ্গ ওঠে তবে সে খুব ক্ষণস্থায়ী। এই সহজ আনন্দে তার সমস্ত কিছু দিতে পেরেছে বলেই তো মাহবুবা আজ ছোট্ট মেয়ে হয়েও নিখিল সন্ন্যাসিনীর চেয়েও বড়। তাই সে বৈরাগিনীও হল না, সন্ন্যাসিনীও হল না; ক্রুদ্ধা জননী যখন তাকে এক বুড়ো বরের হাতে সঁপে দিল, তখনো সে সহজেই তাতে সম্মতি দিল। এই সহজিয়ার কিন্তু এতে কোন দুঃখ নেই, সে যে জানে যে, তার যা দেবার তা অনেক আগেই যে নিবেদিত হয়ে গিয়েছে। অর্ঘ্য নিবেদিত হয়ে যাওয়ার পর শূন্য সাজি বা থালাটা যে ইচ্ছে নিয়ে যাক, তাতে আর আসে যায় না।"

এখন প্রশ্ন হল—প্রেমের এই সহজিয়া তত্ত্ব কি সাধ্যাতীত? আপাতদৃষ্টিতে এ প্রেম অসাধ্য মনে করেই একজন আলোচক মন্তব্য করেছেন : "...বস্তুত মনটা দেহ থেকে আলাদা করে নেওয়া অসম্ভব, কেননা এই মনের বাস্তব মূর্তি দেহ। মন একজনকে দিয়ে দেহ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাওয়া প্রেমের ক্ষেত্রে অসম্ভব? কারণ মনের আস্বাদন হয় দেহের ভিতর দিয়ে।" একথা স্বীকার করেও বলতেই হয় যে নজরুল উপন্যাসের এই 'সহজিয়া প্রেম' এক বিশেষ রোমান্টিক সৌন্দর্যে বিভূষিত হয়ে পাঠক মনকে প্লাবিত করেছে।

কিন্তু তৃতীয় উপন্যাস 'কুহেলিকা'-য় জাহঙ্গীর ও তহমিনার প্রেম শেষ পর্যন্ত 'কামগন্ধহীন' থাকেনি। সেখানে আমরা প্রেমের পরিণতি দেখেছি দেহের দহনে।

জাহঙ্গীর ব্যক্তিগত জীবনে যখন দুঃসহ ব্যথা বহন করে চলেছে, তখনই ঘটনাচক্রে পৌঁছেছিল বন্ধু হারুণের বীরভূম জেলার গ্রামের বাড়ীতে। এখানেই বিত্তে বিত্তবান কিন্তু অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ জাহঙ্গীরের চোখাচোখি হল দরিদ্র সহপাঠী হারুণের রূপসী বোন তহমিনা ওরফে ভূণীর সঙ্গে, যে সবে কৈশোর অতিক্রম করেছে। 'চমৎকার জ্বলজ্বলে চোখমুখ, সমস্ত শরীরে বুদ্ধির প্রখর দীপ্ত জ্যোতি।' এককথায় 'ষোল কলায় পূর্ণ"।

সুন্দরী ভূণীর সঙ্গে যখন জাহঙ্গীরের চোখাচোখি হয় তখন 'ভূণীকে কে যেন মন্ত্র দিয়া বশ করিয়াছে। মন্ত্রাহতা সাপিনীর মত সে না পারিল পলাইতে, না পারিল ফণা তুলিতে।' এমনি ভাবেই দুটি মনে লেগেছিল অনুরাগের আবির 'কিন্তু সেই অনুরাগ এক আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতে এক বিশেষ অনুভূতিতে পরিণত হল। জাহঙ্গীরের আনা নতুন শাড়ীতে সজ্জিত হয়ে ভূণী যখন তাকে প্রণাম করতে গেল, ভূণীর উন্মাদিনী মা তখনই মেয়ের হাতটিকে হারুণের বন্ধু জাহঙ্গীরের হাতে সঁপে দিয়ে বলে উঠলেন :

> "বাবা ওপরে আল্লা, নিচে তুমি। 'আমার তহমিনাকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। দেখো বাবা ও যেন কষ্ট না পায়।"

এই ঘটনার আকস্মিকতায় দুটি মন ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কিন্তু আকস্মিকতার অভিঘাত কাটিয়ে উঠে সদ্য যুবতী তহমিনা এই ঘটনাকেই তার জীবনের অনিবার্য নিয়তি বলে গ্রহণ করল।

জাহঙ্গীর অভিভূতের মত তমমিনাকে গ্রহণ করতে গিয়েও নিজের স্বরূপটি উপলব্ধি করে পেছিয়ে গেল, কেননা সে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী এবং বিপ্লবী ; সে নিজে 'প্রেমে অবিশ্বাসী'। আমাদের মনে পড়ে যায় সমসাময়িক সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বিপ্লবী সব্যসাচীকে। যার পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতীকে সুমিত্রা বলেছিল, '...দয়া নেই, মায়া নেই, ধর্ম নেই।' তাই বিপ্লবী জাহঙ্গীর স্পষ্ট ভাবেই বলল :

> "আমায় নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না, আমিও তোমায় নিয়ে—শধু তোমায় বলে নয়—কোন নারীকে নিয়েই সুখী হতে পারব না।"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করেই জাহঙ্গীর বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। ভূণী যখন তারই দেওয়া কাপড়গুলো ফেরৎ নিয়ে যেতে অনুরোধ করল, তখন জাহঙ্গীর তারই উত্তরে জানাল :

> "আমি তো তোমায় নির্বাসনই দিলাম, ঐ শাড়ী তোমার জেলের পোষাক।"

এই কঠিন কথাগুলোর তীব্র আঘাতে ভূণী ভেঙ্গে পড়ল কান্নায়, কান্না ধরা গলায় বলে উঠল :

"আমি পারব না, পারব না এই শাস্তি সইতে। নিষ্ঠুর আমায় তুমি প্রাণদণ্ড দিয়ে যাও, এ নির্বাসন দিয়ো না. দিয়ো না।"

এমনি ভাবেই দুটি প্রাণে প্রেমের যে ছোঁয়া লাগে তা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বার আসতে হয়েছিল জাহঙ্গীরকে তারই মায়ের আত্যন্তিক আগ্রহে। কারণ জাহঙ্গীরের পকেটে পাওয়া তহমিনার চিঠি পড়ে সব জানতে পেরে জাহঙ্গীর-জননী এই মেয়েটিকেই পুত্রবধূ রূপে বরণ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠলেন।

এই দ্বিতীয় বারও এক উত্তেজনার মুহূর্তে সংঘঠিত আকস্মিক ঘটনায় দুজনে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ল যা থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হল না। 'দেবকুমার এক মুহূর্তে রক্ত লোলুপ পশু হইয়া উঠিল।'

দেহদানে বিপ্লবী জাহঙ্গীর চরিত্রের এই যে অসংযম, সেকি অসংযত উচ্ছৃঙ্খল খান বাহাদুরের রক্তের উত্তরাধিকারের ফল?

এই উপন্যাসে আমরা অনুরাগের পরিণতি দৈহিক মিলনে পর্যবসিত হতে দেখলাম. যা শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিবাহের রূপ নিয়ে পবিশুদ্ধতা অর্জনের সম্ভাবনাময়।

স্পষ্টতই ঔপন্যাসিক নজরুলের উপন্যাস ত্রয়ীতে প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় রোমান্টিকতার স্পর্শে রঙ্গিন হলেও অন্তত এক্ষেত্রে বাস্তবের সম্পর্ক বিহীন অতীন্দ্রিয় প্রেমের রূপ নেয়নি। এইখানেই ঔপন্যাসিকের মুন্সীয়ানা।

[সাত]

কাজী নজরুলের উপন্যাসাবলী পড়লে যে ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে ওঠে তা হল নজরুলের দৃষ্টিতে নারীর এক মর্যাদাময় স্থান। ঔপন্যাসিক কাজীসাহেব যে নারী চরিত্রগুলি তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন, বিশেষ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলেই তারা কেউ কেউ পাঠক অন্তরে সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই অধিকার চরিত্র-গুলি নিজেরাই অর্জন করেছে। ঔপন্যাসিককে অনেক আয়োজন করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হয়নি। এইখানেই আলোচ্য ঔপন্যাসিকের সাফল্য। আরো বিস্ময় বোধ হয়, যখন দেখি রক্ষণশীল পর্দানসীন মুসলমান মহিলা সমাজের পর্দার অন্তরাল থেকে এই সব ব্যক্তিত্বময়ী নারীকে তুলে এনে তিনি সাহিত্যের আঙ্গিনায় অসংখ্য পাঠক দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলেন। কথাশিল্পী নজরুলের পূর্ববর্তী আর কোন ঔপন্যাসিক এই দুঃসাহসিক দায়িত্ব পালন করেন নি, করার প্রচেষ্টাও করেন নি। প্রাসঙ্গিক ভাবে আরো একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে জাতপাতের উর্ধ্বে উত্তীর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনের অধিকারী নজরুলের পক্ষে হিন্দুনারীর মর্যাদাপূর্ণ চরিত্রাঙ্কনেও সফলতা ছিল অনায়াস-লব্ধ। 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রী সাহসিকার নাম কিংবা 'কুহেলিকা' উপন্যাসের জয়তী ও তার মেয়ে চম্পার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

'কুহেলিকা' উপন্যাসটির সূচনা কলকাতার একটি মেসে বসবাসকরী কয়েকজন যুবকের বিচিত্র বিতর্কের মাধ্যমে। প্রথম পংক্তিটি ছিল —'নারী লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।' আসল বিতর্কের বিষয় ছিল ঃ 'নারীর প্রকৃত পরিচয় কি ?'

যুবক কবি হারুণ বলে ঃ 'নারী কুহেলিকা।'

ওকালতি পড়া আমজাদের মতে ঃ 'নারী প্রহেলিকা।'

নববিবাহিত আশরাফের মন্তব্য ঃ 'নারী অহমিকা।'

উল্‌ঝলুল ওরফে জাহঙ্গীর জানায় ঃ নারী 'নায়িকা।'

এরপর সকলেই এই সব বিভিন্নধর্মী ব্যক্তকের বিশেষ প্রয়োগের বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবনে আগ্রহী হয়ে হারুণকেই তার বক্তব্য বিশ্লেষণে আমন্ত্রণ জানাল।

হারুণ প্রিয়দর্শন, হারুণ কবি। এই কবির বক্তব্যের আড়ালে আমরা ঔপন্যাসিক-কবি নজরুলের 'নারী' সম্পর্কে ধারণাটির সম্যক পরিচয়ের আংশিক ঝলক যেন পেয়ে যাই।

হারুণ বলে চলে, 'নারী শুধু ইঙ্গিত, সে প্রকাশ নয়। নারীকে আমরা দেখি বেলাভূমে দাঁড়িয়ে মহাসিন্ধু দেখার মত। তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের যতটুকু দেখা যায় আমরা নারীকে দেখি ততটুকু। সে সর্বদা রহস্যের পর রহস্য জাল দিয়ে নিজেকে গোপন করছে, এই তার স্বভাব।'

এখানেই শেষ নয়, কবি হারুণ আরও বলে ঃ

'কি গভীর রহস্য ওদের চোখে-মুখে। ওরা চাঁদের মত মায়াবী, তারার মত সুদূর, ছায়াপথের মত রহস্য। শুধু আবছায়া, শুধু গোপন! ওরা যেন পৃথিবী হতে কোটী কোটী মাইল দূরে। গ্রহ-লোক ওদের চোখ চেয়ে আছে অবাক হয়ে —খুকী যেমন করে সন্ধ্যাতারা দেখে। ওদের হয়ত শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। রাখা যায়, ছোঁয়া যায় না। ওরা যেন চাঁদের শোভা, চোখের জলের বাদ্‌লা রাতে চাঁদ আশের বিষাদ-ঘন মেঘে ইন্দ্রধনুর বর্ণ রচনা করে। দু দণ্ডের তরে, তারপর মিলিয়ে যায়। ওরা যেন জলের ঢেউ, ফুলের গন্ধ, পাতার শ্যামলিমা। ওদের অনুভব কর, দেখ, কিন্তু ধরতে যেয়ো না।'

এই কথাগুলির সঙ্গে সুর মিলিযে জাহঙ্গীর যে কথাগুলি বলে তাতে কাজী নজরুলের ব্যক্তিজীবনের প্রেমের যে ব্যর্থতা তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা অসঙ্গত নয়।

'ঢেউ ধরতে গেলেই জলে ডুববে, গন্ধ ধরতে গেলেই বিঁধবে কাটা, শ্যামলিমা ধরতে গেলেই বাজবে শাখা। নারী দেবী। ওঁকে ছুঁতে নেই, পায়ের নীচে গড় করতে হয়। কিন্তু কবি, নারী নায়িকা। ও ছাড়া নারীর আর কোন সংজ্ঞাই নেই।'

বুঝতে অসুবিধে হয় না, স্রষ্টা নজরুলের চিন্তা-জগতে নারী শুধুমাত্র একটি মাত্র রক্ত মাংসে গড়া প্রাণী রূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বরং বিচিত্র পরিচয় নিয়ে নারী যে রহস্যময়ী—সেই প্রত্যয়ই ছিল প্রবল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, নারীর এক চিরন্তন রূপও তিনি দেখেছেন।

'বাঁধনহারা' উপন্যাসে ব্রাহ্ম-শিক্ষয়িত্রী সাহসিকাতার বান্ধবী রেবাকে (রাবেয়া) চিঠি লিখতে বসে নারীত্ব নিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তা নজরুলের নারী চিন্তার উল্লেখ-যোগ্য প্রতিফলন রূপেই গ্রহণযোগ্য। সাহসিকা লিখেছেন ঃ

> 'আমি বলছিলাম যে নারীর নারীত্ব কিছুতেই মরবার নয়। সত্যি সত্যিই বোধহয় অহল্যা নারী চিরকাল পাষাণী থাকতে পারে না। নারীই যদি পাষাণী হয়ে যায়, আর বিশ্ব সংসার থেকে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তিই উবে যায়, আর বিশ্বও তখন কল্যাণ-হারা হয়ে তৈলহীন প্রদীপের মতই এক নিমেষে নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে যায়। এই কল্যাণী নারীই বিশ্বের প্রাণ। এ নারী হিম হয়ে গেলে বিশ্ব-প্রাণের স্পন্দনও একমুহূর্তে থেমে যাবে !'

নারীর নানান মূর্তি নজরুল শুধু দেখেছেন তাই নয়, তিনি সেই বিচিত্র রূপে তাদের চিত্রিতও করেছেন ; কিন্তু নারী সম্পর্কে যে প্রত্যয় তাঁর অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করেছিল, তা হল নারী—কল্যাণী। এই কল্যাণী নারীর প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসায় অভিষিক্ত হয়ে আছে বলেই মানুষের সংসার, সমাজ বাসযোগ্য হয়ে আছে —নইলে তা-হত বাসের অযোগ্য।

তাই তো দেখি 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে সংসারের বন্ধনবিহীন আনসারের জীবনের শেষ মুহূর্তে কল্যাণী নারীর রূপ নিয়ে ফিরে এল রুবি। বাড়িয়ে দেওয়া তার মমতাময়ী হাতের স্পর্শ পেল আনসার তার অশান্ত জীবনে। সে তাই বিদায়ের শেষ লগ্নে বলে উঠল ঃ

> 'রুবি চিরদিন বিষ খেয়ে বড় হয়েছি, আজ মৃত্যু ক্ষণে তুমি অমৃত পরিবেশন কর। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হই।'

এই ভাবনারই যেন প্রতিধ্বনি শুনি অচিন্ত্যকুমারের নীচের পংক্তিগুলিতে ঃ 'মানুষ দেহের আনন্দ খুঁজতে খুঁজতে আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে , সেদিন যেখানে গিয়ে পৌঁছাবে তার আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আছে সৃষ্টির অন্তরে অনন্ত অমৃতের পথ—তার কোথায় আজ আমরা ? চাই অমৃতের জন্য তপস্যা ভেতরের সাধনা তার অমৃতের জন্য।'

সাধারণভাবে নারীরা চিরকাল এই বিষবাষ্পে বাষ্পাকুল বিশ্বের বুকে অমৃত পরিবেশন করে চলছে —ঔপন্যাসিক নজরুল সম্ভবত এই বিশ্বাসেই বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, এই নারীই নরের জীবনে বহু প্রেরণার উৎসমুখ এই সত্যেরও সন্ধান পাই নজরুলের কবিতা 'নারী'তে —

> 'নারীর বিরহে নারীর মিলনে নর পেল কবিপ্রাণ
> যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।'

কি কবিতা, কি উপন্যাস —সর্বত্রই স্রষ্টা নজরুল নারীর এক শাশ্বত মূর্তিই প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী।

[আট]

কবি ও গীতিকার নজরুল তাঁর অসংখ্য অবিস্মরণীয় কবিতায় ও গীতে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের যে রূপকীর্ত্তন করেছেন তাতে কেউ কেউ তাঁকে প্রকৃতির কবি বলতেও দ্বিধা করেন নি। বলা বাহুল্য, এর অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে কোন অসুবিধে নেই। তাঁর কবিতাগুলি থেকে কবির প্রকৃতি-প্রেম ও প্রকৃতি-প্রীতির অনেক উল্লেখ্য উদাহরণ দিয়ে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনাও খুব কষ্টসাধ্য কর্ম নয়। অথচ সেই প্রকৃতি প্রেমিক কবিই যখন ঔপন্যাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন কিন্তু তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে কোথাও প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেন নি, তাই বলে প্রকৃতির দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন নি এমন মন্তব্য করাও অসঙ্গত। তবুও একথা স্মরণে রাখতে হবে যে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ যে অর্থে প্রকৃতিকে তাঁর উপন্যাসাবলীতে উপস্থাপিত করেছেন, সেই অর্থে নজরুল প্রকৃতিকে তাঁর উপন্যাসে উপস্থিত করেননি বটে; তবে প্রকৃতির মধ্যে মানবিক গুণ ঋদ্ধতা দুজনের রচনাতেই পরিস্ফুট।

কাজীর উপন্যাসত্রয়কে 'চরিত্রপ্রধান' বলে চিহ্নিত করেও বলা যায় যে এমন কোন কোন প্রসঙ্গ এসেছে যেখানে কবি-দৃষ্টি দিয়েই ঔপন্যাসিক নজরুল প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত তা হল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির জীবন পথের নানান মুহূর্তের বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ করতে গিয়ে প্রকৃতির নানা রূপের দৃষ্টান্ত বার বার উপস্থাপিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মানবমনের নানান অনুভূতি, নানান ভাবনা, নানান রূপে প্রকৃতির নানা রূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। তিনটি উপন্যাস প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য কম বেশী সত্য।

'বাঁধনহারা উপন্যাসে কবি-সৈনিক নুরুল হুদা তার পরম বন্ধু মনুকে চিঠি লিখতে ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ ও তার পরবর্তী সময়ের করাচির যে রূপ বর্ণনা করেন, তাতে ঔপন্যাসিকের প্রকৃতিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখার পরিচয়টুকু আমরা পেয়ে যাই। প্রকৃতিতে প্রাণের আরোপ করার প্রবণতা সেখানে সুস্পষ্ট। কয়েকটি বিশেষ অংশোদ্ধার অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বলা বাহুল্য, এসব বর্ণনা এক আবেগমথিত রোমান্টিক মনের ছোঁয়ায় আবিষ্ট।

করাচির সেনানিবাস থেকে লেখা নূরুল হুদার চিঠির শুরু ঃ

"মনু,

আজ করাচিটা এত সুন্দর বোধ হচ্ছে, সে আর কি বলব। কি হয়েছে জানিস?

কাল সমস্ত রাত্তির ধরে ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি সুন্দর শান্ত স্থির বেশে যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মত ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে বসে আছে। এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মূর্তিতে সৃষ্টি ওলট্-পালট্ করবার জোগার করেছিল, তা তার এখনকার সরল শান্ত মুখশ্রী দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না ঃ এখন সে দিব্যি তার আশমানী রঙের ঢলঢলে চোখ দুটি গোলাবী নীল আকাশের পানে তুলে দিয়ে গভীর উদাস চাউনিতে চেয়ে আছে। আর আদ্র চুল

গুলি বেয়ে এখনো দুই-এক ফোঁটা করে জল ঝরে পড়ছে। আর নবোদিত অরুণের রক্তরাগ ছোঁয়ায় সেগুলি সুন্দরীর গালে অশ্রুবিন্দুর মত ঝিলমিল করে উঠছে। কিন্তু যতই সুন্দর দেখাক্ ভাই, এত গম্ভীর সারল্য আর নিশ্চেষ্ট ঔদাস্য আমার কাছে এতই খাপছাড়া ঠেকছে যে আমি আর কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারছি না। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা—মেঘে মেঘে জটলা, তার ওপর হাড় কাঁপনো কনকনে বাতাস, কবাচি বুড়ি সমস্ত রাত্তির এই সমুদ্দুরের ধারে গাছপালা শূন্য ফাকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে থুরু থুরু করে কেঁপেছে, আর এখানকার এই শান্ত শিষ্ট মেয়েটি তার মাথার উপর বৃষ্টির পর বৃষ্টি ঢেলেছে। বজ্রের হুঙ্কার তুলে বেচারীকে আরও শঙ্কিত করে তুলছে, বিজুরীর তড়িতালোকে চোখে ধাঁদা লাগিয়ে দিয়েছে, আর সঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝঞ্ঝার সঙ্গে হো হো করে হেসেছে। তারপর সকালে উঠেই এই দিব্যি শান্ত শিষ্ট মূর্তি, যেন কিছুই জানেন না আর কি।"

বলা বাহুল্য, প্রকৃতিতে প্রাণের আরোপের ফলে বৃষ্টিস্নাত করাচির মানবীয় রূপটুকু অসাধারণ মুন্সীয়ানায় ঔপন্যাসিক অঙ্কিত করেছেন যা রোমান্টিক কবির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার এই ঔপন্যাসিক যখন তার 'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক জাহঙ্গীরের দৃষ্টিতে বীরভূমের রূপাঙ্কন করেন, তখন সহজেই আমাদের মন বীরভূমের রাঙ্গা মাটিতে রাঙ্গিয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় ঃ

> 'ধূলি ধূসরিত জনবিরল গ্রাম্য পথ। দুই পাশে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে যেন উদাসিনী বিরহিনী। দূরে ছায়া নিবিড় পল্লী ঝিল্লির ঘুম পাড়ানিয়া গানে যেন মায়ের কোলে শিশুর মত ঘুমাইতেছে। জাহঙ্গীরের মন কেমন যেন উদাস হইয়া গেল। পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, সে যেন উদাস বাউল, না জানার সন্ধানে এই পথে পথে গান গাহিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহারা তাহার অভিসারের পথে আসিতেছে পরিচিতের রূপে তাহারা তাহার কেহ নয়। যে উন্মাদিনীর অভিসারে সে চলিযাছে সে এই পল্লীঘাটের না জানা উন্মাদিনী। তাহাকে অনুভব করা যায়, রূপের সীমার সে অসীমা ধরা দেয় না।'

আরো লিখেছেন ঃ

> 'একটু পরে পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, কেন এদেশে এত বাউল, এত চারণ, এত কবির সৃষ্টি হইল। এত উদাস তপস্বীর ধ্যানলোকের মত শান্ত নির্জন মাঠঘাট যেন মানুষকে কেবলই তাহার আপন অতলতার মাঝে ডুব দিতে ইঙ্গিত করে। এ তেপান্তরের পথের মায়া যেন কেবলই ঘর ভুলায়, একটানা পূরবী সুরের মত করুণ বিচ্ছেদব্যথায় মনকে ভরিযে তোলে, গৃহীর উত্তরীয় বাউলের গৈরিকে রাঙ্গিয়ে ওঠে।'

এখানেও প্রকৃতি-চিন্তা ও মানব-ভাবনা একাকার হয়ে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

কিংবা 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে যেখানে ঔপন্যাসিক কাজী 'বরিশালের বর্ণনা

দিতে বসেছেন, সেখানেও তাঁর কলম প্রকৃতির প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছে।

> 'বরিশাল! বাংলার ভেনিস।
> আঁকা-বাঁকা লাল রাস্তা শহরটিকে জড়িয়ে ধরে আছে ভুজ বন্ধের মত করে। রাস্তার দুধারে ঝাউগাছের সারি। তারই পাশে নদী। টলমল টলমল করছে বোম্বাই শাড়ী পরা ভরা যৌবনবধূর পথ চলার মত। যত না চলে, অঙ্গ দোলে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি।
> নদীর ওধারে ধানের ক্ষেত। আরও ওপারে নারিকেল সুপারি কুঞ্জ-ঘেরা সবুজ গ্রাম, শান্ত সবুজ ক্ষেত সবুজ শাড়ী পরা বাসর ঘরের ভয় পাওয়া ছোট্ট কনে বৌটি।
> এক আকাশ হতে আর এক আকাশে কার অনুনয় সঞ্চরণ করে ফিরছে, বৌ কথা কও, বৌ কথা কও।
> আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে তখনো রাত্রি অভিসারের বেরোয় নি। তখনও বুঝি তার সন্ধ্যা প্রসাধন শেষ হয়নি। শঙ্কায় হাতের আলতার শিশি সাঁঝের আকাশে গড়িয়েছে। পায়ের চেয়ে আকাশটাই রেঙ্গে উঠেছে বেশি। মেঘের খোঁপায় তৃতীয়ার চাঁদের গোরের মালাটা জড়াতে গিয়ে বেকে গেছে। উঠানময় তারার ফুল ছড়ান।'

বিচিত্র সুন্দর বর্ণনায় আমরা বিমুগ্ধ। লক্ষণীয় যে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মতোই প্রকৃতি ও মানুষ - উভয়ের সজীব সত্তার উপস্থিতিতে এক থেকে অপরকে বিছিন্ন করা বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ 'প্রকৃতি এখানে মানবিক গুণঋদ্ধতায় আত্মস্থ হয়েছে।' ঔপন্যাসিক নজরুল উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়ে যেন প্রকৃতিতে মানবানুভূতির সন্ধান পেয়ে সম্মুগ্ধ।

[নয়]

'বিদ্রোহী' কবিতার স্রষ্টা কাজী নজরুল যে রাজনীতি-সচেতন ছিলেন, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এই রাজনীতি-সচেতনতার সৃষ্টি তাঁর জীবনে ঘটে অতি অল্পবয়সেই যখন তিনি শিয়ারসোল স্কুলের ছাত্র।

কাজীর জীবনেতিহাস অনুসন্ধানকালে আমরা দেখি প্রথমদিকে তিনি 'খিলাফৎ' ও 'অসহযোগ' আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু ক্রমেই তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি সন্ত্রাসবাদী-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিতমানস' গ্রন্থে জানিয়েছেন ঃ

> 'নজরুলের জীবনী থেকে জানতে পারি যে নজরুল প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষতা করতেন। পরে এই আন্দোলনের বিফলতা দেখে সন্ত্রাসবাদকেই তিনি বিশেষ ভাবে আঁকড়ে ধরেন।'

সন্ত্রাসবাদের এই দীক্ষা যাঁর কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন তিনি শিয়ারসোল স্কুলের অন্যতম শিক্ষক—শ্রী নিবারণ ঘটক। এই প্রসঙ্গে শ্রী প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> '১৯১২ সালে দারোগা রফিকউদ্দীন সাহেব নজরুলকে আসানসোলের রুটির কারখানা থেকে উদ্ধার করে তাঁর দেশ মৈমনসিংহে নিয়ে গিয়ে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। (তিনি) মৈমনসিংহ থেকে চলে এসে শিয়ারসোলের উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯১৪ সালে ভর্ত্তি হন।"

এই স্কুলে তখন 'যুগান্তর' দলের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রী নিবারণচন্দ্র ঘটক ছিলেন শিক্ষক। তিনিই তাঁকে রাজনীতির মন্ত্র পাঠ করান।

আরো একজন রাজনীতিকের বক্তব্য উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি হলেন ভারতের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা মুজফ্ফর আমেদ। তিনি 'নজরুল ইসলাম' ঃ 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> 'শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের আরও একটি কথা এখানে বলে রাখি। শ্রী নিবারণ চন্দ্র ঘটক এই স্কুলে নজরুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়িও ছিল শিয়ারসোলেই। তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী-দলের পশ্চিমবঙ্গীয় দলের অর্থাৎ যুগান্তর দলের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। পলটন হতে ফেরার পর নজরুল নিজেই আমার নিকট স্বীকার করেছিল যে সে শ্রী ঘটকের দ্বারা তাঁর মতবাদের দিকে আকর্ষিত হয়েছিল।'

এই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র 'জাহাঙ্গীর' যে 'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক। উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান 'জাহাঙ্গীর' সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত হয়েই জীবনের পথপরিক্রমা শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত কারাবন্দী হয়। এই পথে যিনি তাকে দীক্ষিত করেন তিনি তার শিক্ষক প্রমত্ত। 'উচুঁক্লাসের ছেলেরা তাঁকে 'প্রমত্দা' বলেই ডাকত।'

এখানে ঔপন্যাসিক নজরুলের ব্যাক্তিগত জীবনের ছায়াপাত লক্ষ্য করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। খুব সহজেই পাঠকদের স্মরণে আসবে কাজীর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী নিবারণ ঘটকের কথা; কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদের সাফল্য সম্পর্কে তিনি যে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ এই উপন্যাস – 'কুহেলিকা'। এই প্রসঙ্গে আরো একটা বিষয়ে দৃকপাত করা বাঞ্ছনীয়। সেটা ইতিহাসের এক উল্লেক্ষ্য অধ্যায়। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের নভেম্বের মাসে ঘটেছিল রুশ বিপ্লব। এই বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে রাশিয়ায় গঠিত হয়েছিল 'লাল ফৌজ' যারা সোভিয়েত ভূমিকে সুরক্ষিত করেছিল। কাজী নজরুল এই বিপ্লবের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন তার আভাস আমার পাই তাঁর গল্পে, যেখানে 'গল্পের নায়ক পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে গিয়ে লাল ফৌজে যোগ দিয়েছেন'। আর পরিচয় পাই তাঁর উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা'-য় যেখানে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনসার এই রুশ বিপ্লবে বিশ্বাসী এক কমিউনিস্ট শ্রমিকদের সংঘটিত করার জন্যই ব্যাক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, সংসার ত্যাগ করে সংগঠন

গড়ার এক ব্রত গ্রহণ করেছিল। এই উপন্যাসের নায়ক আনসার একদিন আকস্মিক ভাবেই তার 'খালেরা বহিন' বা মাসতুতো বোন বুঁচি ওরফে লতিফার বাড়ীতে এসে হাজির হল। সেখানেই কথা প্রসঙ্গে সে জানায় :

> 'আমি এখানে কেন এসেছি জানিস ? জেল থেকে ফিরে এসে অবধি আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে। এখন আমার মত শুনলে তুই হয়ত আকাশ থেকে পড়বি। বাঁক বোঝাই করে করে চরকা বয়ে বয়ে যার কাঁধে ঘাটা পড়ে গেছে, তোর সেই চরকাদাদু আনসারের মত কি শুনবি ? সে বলে, সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।' এরপর আনসার আরো বলে – 'আমি চিরকালই ঠিক আছি, একেবারে বিনা কাজে আসিনি আগেই বলেছি। এখানে একটা শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলতে এসেছি। প্রত্যেক জেলায় আমাদের শ্রমিক সঙ্ঘের একটা করে শাখা থাকবে।'

আনসারের কার্য কলাপ দেখে শহরময় গুজব রটে গেল, 'যে রাশিয়ার বলসেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক খ্যাপাতে।' রুশ বিপ্লবের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত না হলে ঔপন্যাসিক নজরুল তার 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের নায়ককে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করে আমাদের সামনে উপস্থিত করতেন না।

লক্ষ্য করার বিষয়' কাজীর জীবনে রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্ভবত স্থায়ী আসন লাভ করেনি জীবন-ঘনিষ্ঠ উপন্যাসগুলি বোধ হয় সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

[দশ]

নজরুল উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার করতে বসে প্রথমেই যে বিষয়টি বিবেচ্য হয়ে ওঠে তা হল তার 'পত্রোপন্যাস'। ইংরাজী সাহিত্যে রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১ খৃঃ) প্রথম এই ধরণের উপন্যাস সৃষ্টি করেন, ইংরাজীতে একেই 'Epistolary novel' বলা হয়। স্যার আইফর ইভানস্ তাঁর 'The History of English Literature' গ্রন্থে রিচার্ডসনের উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে তাঁর উপন্যাসের বিশেষ ধরণের আঙ্গিকটি এসেছিল আকস্মিক ভাবেই। তিনি লিখেছেন :

> "Richardson would not stand high, but as has already been suggested, the novel is a story told in a special way that declares his genius. The novelty of form, by which he revealed his narrative through letters, came by accident, but though never self-conscious in his art, he must have realized that this was his ideal method."

তবে তাঁর পত্রোপন্যাস রচনার কালে নজরুল রিচার্ডসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—এমন ভাবনার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। রিচার্ডসনের মতই তিনিও আকস্মিক ভাবেই পত্রোপন্যাস রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। পরবর্তীকালে ইউরোপে কোন কোন ঔপন্যাসিক এই আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায় সফল হয়েছিলেন। আর আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায় কারুর কারুর উদ্যোগ অনুল্লেখ্য নয়।

ঔপন্যাসিক নজরুলের পূর্বে যে বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক বাংলা উপন্যাস রচনায় এই আঙ্গিক অবলম্বন করেছিলেন তিনি নটেন্দ্রলাল টাকুর। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁর 'বসন্তকুমারের পত্র'—পত্রোপন্যাসটি রচনা করেন। তবে কাজী নজরুল 'বসন্তকুমারের পত্র' উপন্যাসটি পাঠ করেছেন —এখন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে এমন মনে হয় না। সেদিকে থেকে 'বাধনহারা' পত্রোপন্যাস বাংলা কথা সাহিত্যের দ্বিতীয় পত্রোপন্যাস বলেই চিহ্নিত হওয়ার দাবী রাখে। সতেরটি পত্রের সমাহারে উপস্থাপিত এই উপন্যাসটি একটি কাহিনীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে ওঠায় চেষ্টিত। বন্ধনবিহীন, দুঃখবাদী নুরুল হুদার চরিত্রটি কেন্দ্রে রেখেই অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্রটি বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক, তবুও সুসংবদ্ধ একটি নিটোল কাহিনী বলতে যা আমাদের প্রত্যাশিত তা এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। বৃত্ত-বন্ধনটি এই উপন্যাসে যে যথেষ্ট পরিমাণে শিথিলবদ্ধ, তা সন্দেহাতীত। ডঃ সুশীল গুপ্ত এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ '(এই) উপন্যাসের আখ্যান ভাগ বা প্লটটি শিথিল ও সংগতিহীন।' এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে নায়ক চরিত্রটির ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে যে ভাবে বহির্ঘটনাদি সন্নিবেশিত হওয়া প্রযোজন ছিল তা সম্পন্ন করা হয়নি।

এই উপন্যাসের তুলনায় ঔপন্যাসিক নজরুলের অন্য দুটি উপন্যাসের বস্তু রচনায় কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয় যায়। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের সূচনা গোয়ারীর চাঁদ সড়কের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষদের নিয়ে হলেও, এই উপন্যাসের মূল কাহিনী আনসার চরিত্রটিকে কেন্দ্রে করেই আবর্তিত। সেখানে গাজীর মা, তাব তিন ছেলের বৌ ও তার ছোট ছেলে প্যাকালে ও অন্যান্য সব পার্শ্ব চরিত্র সম্বলিত যে উপকাহিনী গড়ে উঠেছে তা মূল কাহিনীর সঙ্গে পুরোপুরি দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হযে ওঠেনি। অথচ ঔপন্যাসিক যখন মূল কাহিনীকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য মূল কাহিনীর পাশাপাশি উপকাহিনীর উপস্থাপনা করেন তখন দুই কাহিনীর এক সুদৃঢ বন্ধনই থাকে প্রত্যাশিত, এই ত্রুটি সত্ত্বেও 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে আমরা একটা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী পেয়ে যাই। এটি খুব কম প্রাপ্তি নয়! এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে আরো একটি কথা প্রাসঙ্গিক – সেটি হল, এই উপন্যাসে এমন কোন কোন ঘটনা চিত্রিত হয়েছে যার মূল—চরিত্রের মধ্যেই নিহিত, যা চরিত্র পরিস্ফুটনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। প্রখ্যাত সমালোচক হেনরি হাডসনের ভাষায় ঃ **'Incident is…rooted in character and is to be explained in terms of it.'** এই আলোকে বিচার করলে নজরুলের শেষ দুটি উপন্যাসের আখ্যানভাগ বা প্লট সম্পূর্ণ সংগতিবিহীন নয়।

শেষ উপন্যাস 'কুহেলিকা'র পটভূমিকায় রয়েছে তৎকালীন বাংলাদেশের স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। প্রাসঙ্গিক ভাবেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়' উপন্যাসের কথা। ঔপন্যাসিক নজরুল এই সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছেন অভিজাত বংশের এক ধনী মুসলমান যুবক জাহঙ্গীরকে। এই দেশপ্রেমী যুবকের ব্যক্তিগত জীবনস্রোত দরিদ্র বন্ধু হারুণের পরিবারের সঙ্গে ঘটনাচক্রে যুক্ত হয়ে যে কাহিনীর রূপ লাভ করেছে তা অন্য দুটি উপন্যাসের কাহিনীর তুলনায় যথেষ্ট দৃঢ়-পিনদ্ধ, একথা বলা অযৌক্তিক নয়। মনে হয়, ঔপন্যাসিক নজরুল প্লট বা বস্তু রচনায় ক্রমশই মনোযোগী হয়ে উঠছিলেন। তিনি যদি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে আরো অগ্রসর হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করতেন, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, একজন সফল উপন্যাসকার রূপে তাঁর স্থায়ী আসন লাভের পক্ষে কোন বাধা থাকত না।

কাহিনী বা বস্তু আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই চরিত্র সৃজনের কথাটি আসাই প্রাসঙ্গিক। আমরা কাজী নজরুলের উপন্যাস সমগ্রের বিশ্লেষণে ব্রতী হলে দেখতে পাই যে শরৎচন্দ্রের মত তিনি আগে চরিত্র সৃষ্টি করে পরে বস্তু গঠনে মনোযোগী হননি। শরৎচন্দ্র মনে করতেন চরিত্র সৃষ্টিই প্রাধান্য পাওয়ার পক্ষে জরুরী, প্লট নয়; কিন্তু কাজীর পত্রোপন্যাসটি সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রযুক্ত হওয়ার কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও, তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস সম্পর্কে এ বক্তব্য বিবেচ্য নয়। কেননা, অন্য দুটি উপন্যাসে চরিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গড়ে উঠেছে কাহিনী বা প্লট। এই দুই উপন্যাসে চরিত্রগুলি পরিস্ফুটনে কাহিনীধৃত ঘটনাবলী ও পরিবেশ যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এক কথায়, উপন্যাসে বস্তু ও চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লাভ করার প্রবণতা এখানে প্রবল। মনে রাখতে হবে শিল্পীর অক্লান্ত অধ্যাবসায়ের মধ্যেই, জীবনের অভিজ্ঞতার ধারায় ও শিল্পীর নির্বাচন-চেতনার গুণেই উপন্যাসের নানামুখী চরিত্র সম্বলিত কাহিনী বা প্লট গড়ে ওঠে এবং সঙ্গত ভ ষা প্রকরণের মধ্যে তা বাস্তবানুগ রূপ পায়। কাজী নজরুলের উপন্যাস সম্পর্কে সাধারণ ভাবে এই মন্তব্য বোধহয় অত্যুক্তি নয়।

। এগারো ।

ঔপন্যাসিক নজরুলের উপন্যাসত্রয় নানাচরিত্রের চিত্রশলা। আপন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার উজার করে তিনি এই তিনটি ঔপন্যাসে মুসলমান সমাজের, বিশেষত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজের বেশ কিছু সংখ্যক চরিত্রকে বাস্তব সম্মত ভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। চরিত্রাবলী এমন আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি অংকিত করেছেন যাতে এই সব চরিত্রে আমরা রক্তমাংসের কিছুট উষ্ণতা অনুভব করতে পারি।

প্রথম পত্রোপন্যাস 'বাধনহারা'-য় যে চরিত্রটি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

সেটি হল কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরুল হুদার। এই চরিত্রটি কবি কাজী নজরুলের 'আত্মপ্রতিকৃতি' তাতে সন্দেহ নেই। নুরুল হুদা স্বভাবে আবেগতাড়িত এক যুবক-কবি। এ সংসারে কোন বন্ধন স্বীকার করতে সে স্বীকৃত নয়, তাই যখনই সংসারের বন্ধনের সামান্যতম ইঙ্গিত সে পেল, সেই মুহূর্তেই সে নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে গেল বহুদূরে। যোগ দিল সে পল্টনে। বন্ধুকে চিঠি লিখতে বসে নিজেকে সে শুধু 'গোঁয়ার গোবিন্দ' বলেই উল্লেখ করেনি, 'কাঠ-খোট্টা লড়ুয়ে দোস্ত' বলেও নিজেকে সম্ভাষণ করেছে। অথচ এই কাঠখোট্টা মানুষটির অন্তরে সুপ্ত হয়ে ছিল বাদলরাগিনীর সুর যা বেদনায় বিগলিত হতে সদাই উন্মুখ।

এক ধরণের দুঃখবাদেও বিশ্বাসী ছিল এই চরিত্রটি। সে তার বন্ধু মনুয়রকে চিঠিতে এক জায়গায় লিখেছে ঃ

> 'যদি দুঃখই না পাওয়া গেল জীবনে তবে সে জীবন যে বেনিমক, বিষাদ! এই বেদনার আনন্দই আমাকে পাগল করলে, ঘরের বাহির করলে, বন্ধনমুক্ত রিক্ত করে ছাড়লে, আর আজো সে ছুটছে আমার পিছু পিছু উল্কার মত উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে। দুঃখও আমায় ছাড়বে না, আমিও তাকে ছাড়ব না। সে যে আমার বন্ধু, প্রাণপ্রিয়তম সখা, আমার ঝড় বাদলের মাঝখানে নিবিড় করে পাওয়া সাথী।'

লক্ষনীয়, নুরুল হুদার জীবনে দুঃখই সত্য, সুখ মিথ্যা। দুঃখকে পাওয়ার জন্যই সে বন্ধনবিহীন-ঘরছাড়া, কিন্তু তার চরিত্রের আর একটা দিকও লক্ষ্য করার মত তা হল বিশ্ব স্রষ্টার প্রতি তার বিদ্রোহ। একজন আলোচক প্রশ্ন তুলেছেন ঃ

'এই বিদ্রোহ কি নাস্তিকতার নামান্তর?' এর উত্তর আমরা খুঁজে পাই যেখানে সাহসিকা বন্ধু রাবেয়াকে চিঠিতে এই বিদ্রোহের স্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়েছে। সে লিখেছে ঃ

> ' বিদ্রোহী হবার যেমন শক্তি থাকা চাই, তেমনি অধিকার থাকা চাই। বিদ্রোহটা তো অভিমান আর ক্রোধেরই রূপান্তর।'

প্রকৃতপক্ষে, জীবন ও প্রেমের ক্ষেত্রে দুঃখের রূপেই যে স্রষ্টা নজরুলকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত তার নিদর্শন আছে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। এখানে যে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল নুরুল হুদার এই চরিত্রচিত্রণ নজরুল-কবি-মানসের প্রতিনিধি রূপে নিশ্চয়ই সার্থক কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে সম্পূর্ণ সার্থক নয়, কেননা চরিত্রটি মূলত একমুখী একরৈখিক। সাধারণতঃ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের অভিঘাতে চরিত্রের যে প্রত্যাশিত বিবর্তন ও বিকাশ তা এই চরিত্রে নেই। তাই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষনীয় হলেও পূর্ণতার বিচারে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নায়ক চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা পায়নি।

এই চরিত্রের তুলনায় দ্বিতীয় উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা'র আনসার চরিত্রটিতে আমরা কিছুটা দ্বন্দ্বের আভাস পাই, যখন দেখি এককালে অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী একটি চরিত্র নানা আদর্শগত পরিবর্তনের পথ পরিক্রমা করে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট

আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে—এর নেপথ্যে রুবিকে না পাওয়ার ব্যর্থতা যে পরোক্ষে কাজ করেনি সে কথাও জোরের সঙ্গে বলা কঠিন। কারণ একদিন সে নিজেই অনুভব করল যে সে সত্যই দুঃখী। তার বিশেষ ভাবে মনে হল ঃ

> 'মানুষের শুধু পরাধীনতারই দুঃখ নাই, অন্য রকম দুঃখও আছে—যা অতি গভীর ; অতলস্পর্শ। নিখিল মানবের দুঃখ কেবলই মনকে পীড়িত, বিদ্রোহী করে তোলে, কিন্তু নিজের বেদনা, সে যেন মানুষকে ধেয়ানী স্বচ্ছ করে তোলে। বড় মধুর বড় প্রিয় সে দুঃখ।'

এই আদর্শবাদী নায়ককে আমরা দেখলাম জীবনের শেষ মুহূর্তে বিদায়ের ক্ষণে রুবিকে একবার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠতে। নায়ক আনসারের চরিত্রটির এই আদর্শায়িত রূপ কিছুটা পরিমাণে বাস্তব সম্মত হলেও শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারেনি। চরিত্রটিতে সমাজ-সচেতনতা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ থাকলেও তা এক ধরণের রোমান্টিকতার ছোয়ায় আবিষ্ট।

কাজী নজরুলের শেষ উপন্যাস 'কুহেলিকা'-র নায়ক চরিত্রটি—জাহাঙ্গীর, উল্লিখিত এই দুই নায়কের তুলনায় অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত একটি চরিত্র। অভিজাত ঘরের সন্তান জাহাঙ্গীর যে দিন আবিষ্কার করল যে সে একজন চিরযুবক জমিদার ও এক বারবণিতা বাঈজীর কামজ সন্তান, সেইদিন তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে এই পৃথিবীর রঙের পরিবর্তন হয়ে গেল। ব্যক্তি জীবনের মূল্য হয়ে পড়ল অকিঞ্চিৎকর। ঔপন্যাসিক লিখেছেন ঃ

> 'কিন্তু আজ সে উদ্যত দন্ড বিচারকের মত নির্মম, সে এই পৃথিবীর বিচার করিবে। সে আজ সৃষ্টিকে তাহার এই বারবিলাসিনীর মত ব্যবসাদারী সাজসজ্জার ভন্ডামীর জন্য শাস্তি দিবে।
>
> নিষ্ঠুর বজ্রালোকে আজ সত্যের সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয় হইয়া গিয়াছে। আজ সে কঠোর বাস্তবব্রতী।'

বাস্তবব্রতী হয়েই তো সে এই জীবনটাকেই দেশের কাজে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যেই স্বন্ত্রাসবাদে হল দীক্ষিত। এইখানেই অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিঘাতে চঞ্চল একটি যুবকের বাস্তবসম্মত রূপাঙ্কন দেখি, যা ঔপন্যাসিক নজরুলের চরিত্র সৃষ্টির শক্তির সাক্ষ্য বহন করছে। তবুও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় উপস্থাপিত এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্রটি নিজেও 'ব্যক্তিগত প্রেমের ঘটনাবর্তে এমন ভাবেই আবর্তিত হল যে তার বিপ্লবী জীবনের ব্যর্থতাও পাঠকের অন্তরে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হল না। তাই অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত এক নায়কের আত্মত্যাগ কোন মহৎ আদর্শের নির্দেশ দিতে সম্ভবত সফল হল না।

সমগ্র নজরুল উপন্যাসের এই তিনটি উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্রের তুলনায় কয়েকটি নারী চরিত্র সময়স্রোতে ও ঘটনাবর্তে বিবর্তিত হয়ে বিকশিত হওয়ায় চরিত্রগুলি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও প্রাণতপ্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে 'মৃত্যুক্ষুধা'

উপন্যাসের মেজবৌ ও 'কুহেলিকা' উপন্যাসের ভূণী ওরফে তহমিনা আর কিছুটা পরিমাণে 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের ভাবী সাহেবা চরিত্রত্রয় উল্লেখ্য।

ভাবীসাহেবা স্নেহ-প্রীতি-মমতার প্রতিমূর্তি। পিতৃমাতৃহীন ছোট ভাই মনুয়র তার কাছে পায় আশ্রয় ও প্রশ্রয়, সেইসঙ্গে প্রশ্রয় পায় মনুয়রের ছন্নছাড়া, বাঁধনহারা বন্ধু নুরুল হুদা। এই নুরুল হুদার সঙ্গে মাহবুবার নিরুচ্চার প্রেমের সম্পর্কটি যেদিন নুরুলের আকস্মিক অস্বাভাবিক আচরণে ভেঙ্গে গেল সেদিন এই মমতাময়ী নারীর অন্তরে যে বেদনা জাগ্রত হল তাই তার চরিত্রটিকে সজীবতার স্পর্শ দিয়েছে। সে যখন দুঃখে বেদনায় ব্যথিত তখনই সে চেয়েছে তার বন্ধু সাহসিকার সান্নিধ্য, যাতে এই হঠাৎ পাওয়া নিবিড় বেদনার অতলতা থেকে উদ্ধার পেতে পারে। সে আরো লিখেছে ঃ

'আমার এই সাজানো ঘর যেন আজ আমাকেই মুখ ভ্যাঙাচ্ছে।'

এই চরিত্রের তুলনায় 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে 'মেজবৌ' চরিত্রটির সৃষ্টি ঔপন্যাসিক নজরুলের চরিত্র-চিত্রণ ক্ষমতার এক বিশেষ পরিচয় বহন করছে।

গাজীর মার মেজ ছেলের বৌ, ছোট ছেলে প্যাঁকালের মেজ বৌদির জীবন এক দুঃখের ইতিবৃত্ত। নানা সংঘাতের মধ্য দিয়েই এই চরিত্রটির অভিযাত্রা। সমাজের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ, আনসারের সংস্পর্শে এসে মুক্ত জীবনের আশ্বাস লাভ, নিজের সন্তান খোকাকে হারিয়ে মুসলমান ধর্মে প্রত্যাবর্তন, দেশের দরিদ্র ক্ষুধাতুর শিশুদের মধ্যে নিজের খোকাকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দময় অনুভূতি এবং পরিশেষে ছোট ছোট শিশুদের জন্য পাঠশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ—পাঠকদের একটি দীপ্ত, সজীব ও জীবন্ত চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সংসার ও সমাজের নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশশীল বিবর্তনের মাধ্যমে এই চরিত্রটির ক্রমবিকাশ স্বভাবতই আমাদের আকর্ষণ করে। বলাবাহুল্য, এই চরিত্রটি নিঃসন্দেহে শিল্পী নজরুলের অন্যতম সার্থক সৃষ্টি।

প্রাসঙ্গিক ভাবেই স্মরণে আসে 'কুহেলিকা' উপন্যাসের সদ্যোদ্ভিন্না যুবতী চরিত্র তহমিনার কথা। সমগ্র কাহিনীর ঘটনাবর্তের সঙ্গে সঙ্গে নানা সংঘাতের মধ্য দিয়েই এই চরিত্রটি অভিব্যক্তি লাভ করেছে। প্রথম সাক্ষাতেই ভ্রাতৃবন্ধু জাহঙ্গীরের সঙ্গে তহমিনার কথাবার্তায় সে একটু বেশী বাক্‌পটু ও কিছুটা প্রগল্‌ভ বলে মনে হলেও চরিত্রটি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। চরিত্রটিতে কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার, আত্মনিবেদনের সঙ্গে আত্মমর্যাদা বোধের এমন সমন্বয় সাধিত হয়েছে, যা পাঠকচিত্তকে সহজেই প্রভাবিত করে। বলা অসঙ্গত নয় যে এই চরিত্র চিত্রণে কথাশিল্পী নজরুল যথেষ্ট মুন্সীয়ানার দাবী করতে পারেন।

দুই-একটি ছোট রেখার টানে আরো যে সব পার্শ্বচরিত্র সৃষ্ট হয়ে উঠেছে তা প্রমাণ করে উপন্যাস সৃষ্টির শক্তি শিল্পী নজরুলের ছিল, যা কর্ষণার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত রূপলাভে ছিল সক্ষম।

[বারো]

যে কোন উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য : এ দুটির পৃথকীকরণ অকল্পনীয়। তাই উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গে দুই একটি কথা সঙ্গতভাবেই স্মরণে আসে।

প্রত্যেক ঔপন্যাসিকেরই ভাষা প্রয়োগে ভিন্নতা আছে : তবুও তাঁরা এক জায়গায় মিলিত হন তা উপন্যাসে ভাষার ভূমিকার ক্ষেত্রে। উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতা আর জীবনের কাব্য দুই-ই ধারণ করে। উপন্যাসে যেহেতু বাস্তবতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা থাকে, তাই তাকে হতে হয় সর্বত্রচারী। তাই গদ্যের স্থল আর কাব্যের জল -উভয় ক্ষেত্রেই তার বিচরণ অবাধ। এই জন্যই একই উপন্যাসে বর্ণনায়, সংলাপে, মন্তব্যে একাধিক ভাষারীতি ব্যবহারে ভাষার বহুমুখী বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয় ও উপন্যাসকে তা বিশিষ্ট করে তোলে।

ঔপন্যাসিক নজরুলের ভাষারও বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি মূলত কবি, তাই তাঁর উপন্যাসগুলির ভাষা কোথাও কোথাও বর্ণনাধর্মী ও কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে, বিশেষত চরিত্রগুলির কথোপকথনে কোথাও কোথাও কিছুটা বাস্তবতার বলিষ্ঠতা থাকলেও কোন কোন অংশে তা কাব্যিক হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখিয়েছে যা তাঁর উপন্যাসের বাস্তবতাকে কিছুটা পরিমাণে ব্যাহত করেছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ সঙ্গত।

> 'জাহঙ্গীর একটু চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল আমার শেষ কথা শুনে যাও তহমিনা, নইলে আমায় নিয়ে সব চেয়ে বড় দুঃখ পোহাতে হবে তোমায়।
>
> ভূণী ভিতর হইতে বলিল -আমি এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি, বলুন।
>
> জাহঙ্গীর সহসা এই ব্যাঙ্গোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার অপূর্ব আত্মসংযমের বলে যথাসম্ভব কণ্ঠ শান্ত রাখিয়া বলিল -আমি প্রেমেও বিশ্বাস করিনে, কোন নারীকেও বিশ্বাস করিনে। মনে হচ্ছে তোমার সব কথাই আর কারুর শেখানো, অথবা ওগুলি নভেল পড়ার বদহজম। তোমাদের জাতটারই নির্বাসন হওয়া উচিত একেবারে কালাপানি।
>
> ভূণী রেকাবিতে এক রেকাবি সন্দেশ ও এক গ্লাস পানি লইয়া জাহঙ্গীরের সামনে রাখিতে রাখিতে সহজ কণ্ঠেই বলিল -আপনি বড্ডো দুর্মুখ! যাবেনই ত, যাবার সময় একটু মিষ্টি মুখ করে যান। বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল --মাপ করবেন, আপনার দেওয়া মিষ্টি দিয়েই আপনার তেঁতো মুখ মিষ্টি করতে হচ্ছে। জানেনই তো, আমরা কত গরীব, তাতে আবার পাড়াগেঁয়ে। একটা ঘরের মিষ্টি দিয়েও আপনার জমিদারী মুখের ঝাল মিটাতে পারলাম না ।'

বলা বাহুল্য, এই কথোপকথনে যতটা নাটকীয়তা আছে, ততটা বাস্তবতা নেই।

ছোট ছোট উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট যে গতিশীলতা উপন্যাসের অলংকার হয়ে ওঠে, এখানে তার অভাব লক্ষণীয়। কিন্তু কাজী নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের কোথাও কোথাও তিনি সংক্ষিপ্ত সংলাপের মাধ্যমে উপন্যাসের আকর্ষণকে অনেকখানি অগ্রসর করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি

> 'পরদিন সকালে চা খেতে খেতে নাজির সাহেব আনসারকে বললেন, 'কি হে, আজ নাকি শিকারে বেরুচ্ছ? দেখো দাদা, নাগিনীর কাছে যাচ্ছ মনে রেখো।' আনসার হেসে বললে, 'আমি শিকার করতে যাচ্ছিনে বেবুফ, আমি যাচ্ছি সুন্দরবনের বাঘকে সুন্দরবনে ফিরিয়ে আনতে, সভ্য শিকারীর ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে। নাজির সাহেব হেসে বললেন, 'অন্য শিকারীর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনে শেষে নিজেই যেন বান হেনে বসো না। দেখো, ও বড় শক্ত বাঘিনী হে, শেষে বাঘিনীই তোমায় শিকার করে না ফেলে।' আনসার লতিফার দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু গলা খাটো করে বললে, 'রক্ষে কর ভাই বাঘের বাচ্চা পুষবার সখ এখনো হয়নি আমার। এ আমার বাঘ শিকার নয়, এ আমার কষ্ট স্বীকার।'

এখানে সংলাপের সংক্ষিপ্ততা বক্তব্যকে বাস্তবতায় ধারালো, জোড়ালো ও গতিশীল করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে : এমনি ভাবেই বাস্তবতা ও নাটকীয়তার সংমিশ্রণে এবং কোথাও কোথাও কাব্যিক ব্যঞ্জনায় তঁর উপন্যাসের রূপ পাঠক-মনে স্থায়ী স্থান লাভে ব্যর্থ হয়নি।

তথ্যসূত্র :

১। নজরুল উপন্যাস সমগ্র / সম্পাদনা কাজী সব্যসাচী, কল্যাণী কাজী ও বিশ্বনাথ দে ; ১৩৮৪

২। নজরুল চরিত মানস / ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭

৩। কাজী নজরুল / প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭

৪। কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা / মুজফ্ফর আহমেদ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৯

৫। কল্লোল যুগ / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৭২

৬। The History of English Literature / Sir Ifor Evans.

মিহির দেববর্মন

বনফুল : বৈচিত্র্য-তৃষিত সদা সন্ধিৎসু শিল্পী

[এক]

মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের তুলনা সমালোচকেরা করেন। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি প্রকরণের মধ্যে সদৃশতা খোঁজার পেছনে প্রধানতঃ রয়েছে কাহিনীর বিস্তার ও বৈচিত্র্যগত মিল। বস্তুত সেকালে জীবনের সর্ববৃহৎ রূপ প্রতিবিম্বিত হওয়ার বিশালতম দর্পণ ছিলো মহাকাব্য। তেমনি একালের দ্রুত-বহমান জীবনস্রোতের চলচ্চঞ্চল ও পূর্ণায়ত প্রতিফলন ফুটতে পারে কেবল উপন্যাসেরই প্রসারিত পটে।

কিন্তু পূর্ণায়ত জীবনস্রোত বলতে যা বুঝি আমরা, যথার্থ বিচারে তাও তো আংশিক। কেননা বিশ্বময় ছড়ানো জীবনের কতোটুকুই-বা একজন শিল্পীর চেতনায় ধরা পড়ে। যতোটুকু ধরা পড়ে তার সবটুকুই-কী তিনি ঢেলে দিতে পারেন তার উপন্যাসে

না, পারেন না। কেননা নির্বিচার গ্রহণ কোনো শিল্পেরই ধর্ম নয়। উপন্যাসে বা যে-কোন শিল্পেই বাস্তবের পুনর্নির্মাণ ঘটে। আর নির্মাণ যেখানে, সেখানে অবধারিত হয়ে ওঠে উপকরণ বাছাইয়ের প্রশ্নটি। অপরিমেয় জীবনের ভাণ্ডার থেকে, সঞ্চিত অভিজ্ঞতার খনি থেকে শিল্পী কিছু নেন, কিছু বাদ দেন। এই গ্রহণ-বর্জনের ধরণ ঔপন্যাসিকের চরিত্র চিনিয়ে দেয়। শিল্পশ্রী-মণ্ডিত করার জন্য কেউ-কেউ বেছে নেন আটপৌরে জীবন। অনাটকীয় ঘটনাবলী ও সমতলস্বভাবী মানুষ এঁদের শিল্পে অপরূপ স্বাভাবিকতায় দীপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনা ও চরিত্রের নিজস্ব অসামান্যতা এঁদের কাছে গুরুত্বহীন। বস্তুরূপের চেয়ে বস্তুধর্ম উদ্ঘাটনে, চরিত্রের নাটকীয় আচরণের তুলনায় তার ধর্মগত বৈশিষ্ট্য সন্ধানেই এজাতীয় ঔপন্যাসিকদের সমধিক আগ্রহ।

এঁদের বাইরে আছেন আরেক ধরনের ঔপন্যাসিক। বনফুলের মতো। চরিত্রমর্মের অন্তর্গূঢ় জটিলতার দিকে যাঁদের তেমন টান নেই। বরং মানুষের আচরণগত নাটকীয়না ও ঘটনাগত অসামান্যতাকে ব্যবহার করাই তাঁদের অভিপ্রায়। তাও-কী খুব কম কিছু? জীবনমর্মে পৌঁছুতে পারেন কজন? কিন্তু জীবনপরিধির নানা ঘটনায় যাঁদের সৃষ্টিপ্রতিভা সাড়া দেয় তাঁরা কি অগ্রাহ্য করার মতো? বনফুলের মতো বৈচিত্র্যতৃষিত সদাকৌতূহলী কথাকারও সুলভ নয়। তাঁর স্বভাব ভ্রমণকারীর মতো। বনফুলের বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর উপন্যাস সমগ্রে পাই একজন সন্ধিৎসু পর্যটককে, নানা অনাবিষ্কৃত অঞ্চল খোঁজাতেই যাঁর আনন্দ।

[দুই]

বনফুলের বেশ কয়েকটি উপন্যাসের নায়ক একজন কবিমনোভাবাপন্ন ডাক্তার। চিকিৎসককে নায়ক ক'রে তারাশংকরও উপন্যাস লিখেছেন। 'আরোগ্যনিকেতন'। তবে সে প্রবীণ চিকিৎসক ডাক্তার নন, কবিরাজ। বরং 'আরোগ্যনিকেতনে'র জীবনমশাইয়ের চেয়ে মানিকের শশী-ডাক্তার বনফুলের নায়ক-চিকিৎসকদের বেশী সমীপবর্তী। গাওদিয়ার ছেলে শশীর মতোই 'নির্মোক' উপন্যাসের বিমল। শশীর মতো তারও অন্তরে আছে আদর্শবাদের প্রেরণা। 'তৃণখণ্ডে' ডাক্তার নায়ক চিকিৎসাসূত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং নিজমুখে তার বিবরণ শুনিয়েছে। 'বৈতরণী তীরে' উপন্যাসটিতেও গল্পবাহক একজন ডাক্তার, সরকারী চাকুরে।

কিন্তু 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের স্বাদ থেকে বনফুলের 'তৃণখণ্ড' 'বৈতরণীতীরে' 'নির্মোক' 'অগ্নীশ্বর' 'উদয় অস্ত' উপন্যাসগুলির স্বাদ আলাদা। কেননা ডাক্তার শশীর চিকিৎসক সত্তা এই উপন্যাসের মধ্যে প্রবল নয়। কুসুমের প্রেম শশীকে বৃত্তির বাইরে টেনে নিয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কিন্তু 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসের প্রতিটি কাহিনীর মূলে চিকিৎসা করার অথবা চিকিৎসিত হবার ইচ্ছে। রোগ নিরাময়ের আশা নিয়ে পাঁচুগোপাল-প্রাণকৃষ্ণ-হরিশ এসেছে ডাক্তারের কাছে। গণোরিয়ার কারণে পিতৃত্বের ক্ষমতা-হারানো স্বামীর সূত্রে এসেছে সন্তান কামনায় উন্মাদিনী স্ত্রীর গল্প। এমনিভাবেই আসে প্রৌঢ় পাঁচুগোপাল, মৃতা স্ত্রীর শোক পুরনো হবার আগেই এক কিশোরীকে যে বিয়ে করে বসে। ভাগ্নেকে চিকিৎসা করাতে আসে মামা। ডাক্তার দেখেন মামাও মানসিক রোগী। তরুণী পরস্ত্রী তার প্রতি আসক্ত এই কল্পনা অহর্নিশ তার মাথায় ঘোরে। অনটনগ্রস্ত হরিশেরও প্রবৃত্তির ক্ষুধা প্রবল। বয়স গেছে, স্বাস্থ্য গেছে, যৌনক্ষমতা গেছে, শুধু তৃষ্ণা বেড়েছে উত্তরোত্তর।

'তৃণখণ্ড' বেশ কিছুদিনের কাহিনী। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস 'বৈতরণীতীরে' (১৯৩৬) রচনায় একটি মাত্র রাতের ভাবনা পুঞ্জিত হয়েছে। এখানে ডাক্তার নিজেই ইনসমুনিয়ার রোগী। বইহাতে সে বিনিদ্র। তার স্মৃতিপুঞ্জ জীবিত মানুষদের নিয়ে নয়। আত্মহত্যা ক'রে যেসব মানবমানবী নিজেদের জীবনাবসান ঘটিয়েছে, তারা মেঘমন্দ্রিত বর্ষণবধির রাতে ডাক্তারের চেতনায় এসে আত্মকথা শুনিয়েছে। 'পশ্চাৎপট' গ্রন্থে বনফুল নিজেই জানিয়েছেন বীভৎসরসের উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে তেমন না থাকায় তিনি নিজেই উদ্যোগী হন। তারই ফল 'বৈতরণীতীরে'। ইহলোকে বনফুল প্রেতলোকের প্রাদুর্ভাব ঘটানোর কতোখানি সফল সেকথা বলা কঠিন। কিন্তু এতে বাংলা উপন্যাসের জগতে রসবৈচিত্র্য এসেছে এবং তার পরিধি-বিস্তার ঘটেছে সেকথা মানতেই হয়।

'নির্মোক (১৯৪০) উপন্যাসের কাহিনীকেন্দ্রে রয়েছে বিমল ডাক্তার। বিমল এবং 'হাটেবাজারে' উপন্যাসের সদাশিব ডাক্তার বলাইচাঁদের আত্মপ্রতিকৃতির আদলে গড়া। এরা আদর্শবাদী, সমাজকল্যাণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। এদের মধ্যে বিমল আদর্শের পথে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিল, পরে তার উত্তরণ ঘটে। সাধারণ

মানুষের মধ্যে সে খুঁজে পায় বিশ্বাসের ভিত্তি, পায় আশাবাদী হওয়ার অফুরন্ত উপাদান। বিমলের সাময়িক অর্থলোভে জীবনানুগত বাস্তবতাই স্বীকৃত হয়েছে, নইলে সে হয়ে উঠত আদর্শের রোবট।

ডাক্তার-কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে বিষয়ের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও চরিত্র ও ঘটনাসমূহের কয়েকটি নির্দিষ্ট ছক লক্ষ্য করা যায়। বনফুলের চিকিৎসকেরা অনেকেই আদর্শবাদী। এঁদের কাছে রোগীর চিকিৎসা জীবিকা নয়, ব্রত। অর্থলোলুপ চিকিৎসকদের এঁরা ঘৃণা করেন। এঁদের জীবনেও আছে স্খলন, পতন। সেজন্য তাঁদের অন্তহীন অনুশোচনা। 'হাটে বাজারে'র সদাশিব, 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসের নায়ক অগ্নীশ্বর, 'উদয়-অস্ত'-র সূর্যসুন্দর এবং 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসের সুঠাম ডাক্তার সকলেই এই প্যাটার্ণের মানুষ। সুদৃঢ় নীতিবোধ ও সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে এই চিকিৎসকগণ পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। 'হাটে বাজারে' উপন্যাসে নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ডাক্তারের রুখে দাঁড়ানো, 'উদয় অস্ত'-তে গ্রামীন মানুষের উন্নতি বিধানে সূর্যসুন্দরের ঐকান্তিক চেষ্টা, 'মানসপুর' উপন্যাসে নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয়দানের ব্যাকুলতা, 'ত্রিবর্ণ'-এর কাহিনীতে ধর্ষিতা রমনীকে সুঠাম ডাক্তারের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের ঘটনাগুলি চরিত্রসমূহের আচরণগত বৈচিত্র্যকে যেমন, তেমনি প্যাটার্ণগত অভিন্নতাকেও নির্দেশ করে।

বনফুলের 'কিছুক্ষণ' উপন্যাসটিকে কেউ-কেউ লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা বলেছেন। মাত্র একান্ন পৃষ্ঠার বইটি অনেকের নজর কেড়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটিতে সরসতা এবং নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষায় বনফুলের মনোযোগ লক্ষ্য করেছিলেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের চোখে পড়েছিল যে, বইটির চরিত্রগুলি সচল ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

পূর্বে আলোচিত উপন্যাসগুলির তুলনায় এ রচনাটির বিষয় স্বতন্ত্র। দুদিকে অনন্ত পথ। মাঝখানে একটি ছোট স্টেশন। কাহিনী-কথক 'আমি' একজন ছাত্র। ট্রেন ধরবে বলে সে এসেছে ঐ অখ্যাত রেলস্টেশনে। সেখানে তখন দুর্ঘটনার ফলে আটকে পড়া প্রতীক্ষমান বেশকিছু মানুষ। এই কাহিনীর উৎসে আছে বনফুলের নিজেরই জীবনের একটি ঘটনা। 'পশ্চাৎপট' বইটিতে আত্মবিবৃত সেই ঘটনাটি এরকম ঃ "একবার খবর পাইয়া সজনীকে স্টেশনে আনিতে গিয়াছি. শুনিলাম ট্রেন লেট আছে। আর আমি সাড়ে তিনটায় স্টেশনে পৌঁছিয়াছিলাম। ট্রেন লেট শুনিয়া ওভারব্রীজের উপর উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিলাম। দেখিলাম প্ল্যাটফর্মে নানা জাতের প্যাসেঞ্জারেরা ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। অনেকে অনেকের ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, অনেকে আবার ঝগড়াও করিতেছে। হঠাৎ 'কিছুক্ষণ' গল্পের আভাসটি আমার মনে যেন বিদ্যুৎ চমকের মত খেলিয়া গেল। আমি ওভারব্রীজের উপর পায়চারী করিতে করিতেই এই পরিকল্পনাটির উপর তা দিতে লাগিলাম। অনেকদিন তা দিতে হইয়াছিল। তাহার পর গল্পের শাবকটি অন্ড হইতে বাহির হইয়া পড়িল" (বনফুল রচনাবলী -- ষোড়শ খন্ড ১৯৭৯ সং, পৃ --১৯৭)। ত্রস্ত স্টেশন মাস্টার, ভাগ্যবিড়ম্বিতা তরুণী, শক্তিধর কাবুলি, লম্পট-স্বভাব তরুণ, এমনকি দুর্ঘটনার ফাঁকতালে

মুনাফা শিকারে ব্যস্ত মাড়োয়ারি পর্যন্ত এই ছোটো উপন্যাসটির দুই মলাটের মাঝখানে ঠাঁই পেয়েছে। অবশ্য শেষ দিকে দ্রষ্টা তরুণের শ্মশানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে লেখকের রূপক আরোপের চেষ্টা প্রবল। তবু এই ছোটো-ছোটো ছবিতে গড়া কয়েক ঘণ্টার দৃশ্যাবলী সত্যিই মনোরম।

[তিন]

অধিকাংশ উপন্যাসেই পাই সাধারণ মানুষ, যে পটে ফুটিয়ে তোলা হয় চরিত্রদের তারও বিস্তার বেশি নয়। হয়তো কোনো ছোটো অথবা বড়ো শহর, হয়তো কোনো শহরতলী অথবা কোনো গ্রাম সে-সব উপন্যাসের ভূগোল। 'তৃণখণ্ডে' গ্রাম, 'বৈতরণী তীরে' ঘর, 'কিছুক্ষণ' উপন্যাসে ছোটো স্টেশন – এজাতীয় পটভূমি। কিন্তু এমন উপন্যাসও সম্ভব যার ভূগোল আরো প্রসারিত, এমন উপন্যাসও সম্ভব যার কথাবস্তু সমগ্র মানব-সভ্যতা। এজাতীয় আস্তপট মনে আনে বিপুলতার অনুভব। আর এই বিপুল পটভূমিতে অগণন চরিত্রের সমারোহময় উপস্থাপন দেখে পাঠকমনও বিস্ফারিত হয়। বিশালতার এ অনুভূতি জাগায় যে দীর্ঘায়তকাহিনী তাকেই কোনো-কোনো সমালোচক মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস নামে অভিহিত করেছেন।

বিশাল জীবনপটে মানবসমাজের চিত্র বনফুলও এঁকেছেন। তাঁর সর্ববৃহৎ উপন্যাস 'জঙ্গম' সেদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক ভারতবর্ষ শহর ও গ্রামে বিভক্ত, দুইয়ের চরিত্র আলাদা। একদিকে তিরিশের কল্লোলিনী কলকাতা, চটুল নাগরিক কলকাতা ; অন্যদিকে দূর বিহারের শান্ত এবং সংস্কাররুদ্ধ গ্রামজীবন। শঙ্করের, কলেজি বিদ্যায় শিক্ষিত শঙ্করের চরিত্র রূপায়ণের সূত্রে এই দুই পৃথক ভূগোল এ উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাস নির্মাণ করছে। শঙ্কর নগরে শিক্ষাপ্রাপ্ত, অথচ আদর্শের প্রেরণায় গ্রামকেই সে কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। বন্ধু উৎপলের জমিদারী পরিচালনার ভার নিয়ে গ্রামের ভেতরে এসে বুঝেছে কাজ কতো কঠিন। আদর্শের স্বপ্নলোক গ্রামীন মানুষের নিত্যদিনের অবিশ্বাস ও বিরূপতায় একটু-একটু করে চূর্ণ হয়েছে। নিরক্ষরতা অবিশ্বাস ও কুসংস্কারগ্রস্ততা শান্ত গ্রামজীবনকে আমূল ছেয়ে আছে। শঙ্করের পরহিতব্রতের শক্তিও সেখানে যথেষ্ট নয়। 'জঙ্গম' সে দিক থেকে শঙ্করের জীবনচরিত। সমস্ত উপন্যাসে তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে আত্মসমীক্ষার সচেতন প্রয়াস বর্ণিত।

তবু, এই তিনখণ্ডে প্রকাশিত বৃহৎ রচনাটিকে ডঃ সুকুমার সেন উপন্যাস বলতে রাজি নন ঃ "বইটিকে উপন্যাস বলা চলে না। বলতে গেলে মানুষের এক বিশেষ সমষ্টির চিত্রপট, এক আধ দিনের নয়। অনেক বছর ধরে"। ঠিক।-বইটিতে ঘনবুনোটের কোনো জমাট কাহিনীবৃত্ত নেই। শঙ্করের জীবনকে ক্ষীণ সূত্র হিসেবে ব্যবহার করে অসংখ্য চরিত্রের মালা বনফুল রচনা করেছেন। সেখানে মিণ্টি দিদি থেকে ভন্টুর বৌদি, মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী থেকে করালীচরণ বক্সী —কে নেই ? 'প্রবাসী' এবং 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির সঙ্গে এসব চরিত্রের অনেকেরই মিল।

ইতিহাসের বয়স খুব বেশি নয়। মানুষ নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক মানবজীবন, মানবাস্তিত্বের প্রথম অধ্যায় আজও অজানার অন্ধকারে ঢাকা। অধ্যয়ন ও কল্পনাযোগে কেউ-কেউ সেই প্রিমিটিভ যুগে পৌঁছুতে চেষ্টা করেছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমিই সে' এবং বনফুলের 'স্থাবর' (১৯৫১) এজাতীয় প্রচেষ্টার উদাহরণ। নৃবিদ্যা, ভূবিজ্ঞান, প্রত্ন-ইতিহাস জানার ঝোঁক ছিলো বনফুলের। কিন্তু 'স্থাবর' উপন্যাসটিতে অধ্যয়নের ভার নেই। লেখক নৃবিদ্যার (ethnology) অল্প সাহায্য নিয়েছেন, প্রধানত কল্পনা-পথেই পৌঁছেছেন প্রিমিটিভ মানুষের মনে।

এই উপন্যাসের নায়ক চিরন্তন মানব। সে নির্দিষ্ট স্থানকালের ঊর্ধ্বে। কেননা চিরন্তন মানুষের আদি কাহিনী এখনও অজানার অন্ধকারে রয়ে গেছে। "যিনি এই উপন্যাসের বক্তা, বিশেষ কোন স্থান, কাল বা পাত্রে তিনি আবদ্ধ নহেন। যুগযুগান্তর বহু খণ্ডজীবনের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন। তাহারই স্মৃতিকথা এই উপন্যাস।" এদিক থেকে দেখতে গেলে সমগ্র বিশ্বের আদি মানবজীবন 'স্থাবর' উপন্যাসের যুগপৎ পটভূমি ও কথাবস্তু। বনফুলের উপন্যাসমালার এই উপন্যাসের পটই সর্বাধিক বিস্তৃত।

প্রবৃত্তিনির্ভর আদিমানবের বাস্তব জীবন এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। খিদে মেটানো ও কাম চরিতার্থ করা ভিন্ন যখন মানবাস্তিত্বের অন্য তাৎপর্য অকল্পনীয় ছিলো, যখন নিজে বাঁচার অর্থ ছিলো অন্যকে হত্যা করা, তখনকার স্থূল প্রবৃত্তিচালিত জীবন এ বইটিতে যথোচিত গুরুত্ব পেয়েছে। অভিব্যক্তির নিয়মে পরবর্তী যুগে মানবমনে সুকুমার বৃত্তিসমূহের উদ্ভব। পশুপালন ও যাযাবরজীবন থেকে মানুষের কৃষিজীবী হওয়া, অনুদ্‌ঘাটিতরহস্য প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভয়জনিত ভক্তি, মৃত্যুভীত মানুষের পরলোকগত আত্মায় বিশ্বাস, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ—লক্ষ হাজার বর্ষব্যাপী ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলি এ উপন্যাসে চিরন্তন-মানবের আত্মকথাসূত্রে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

'ডানা' (১৯৪৮-৫৫) উপন্যাসের পট পৃথিবীজোড়া নয়, তবে বিষয়বস্তু অনন্যসাধারণ। নৃতত্ত্ব যেমন তেমনি পক্ষিবিদ্যার প্রতিও বনফুলের গভীর আকর্ষণ ছিলো। প্রচুর অধ্যয়ন এবং পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তিনি পক্ষিবিদ্যা (ornithology) আয়ত্ত করেছিলেন। যাঁকে 'ডানা' বইটি উৎসর্গ করেছেন, সেই প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তই ছিলেন এ বিষয়ে বনফুলের উপদেষ্টা এবং সহায়ক।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বর্মা থেকে যুবতী মেয়ে ডানা পালিয়ে আসে। আশ্রয় পায় বিবাহিত পক্ষি-বিদ্যার্থী অমরেশবাবুর কাছে। অন্য দুজন বিবাহিত মানুষ কবি আনন্দমোহন এবং রূপচাঁদও ডানার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখনো ডানার মনে পূর্ব-পরিচিত ভাস্করের ছবি উজ্জ্বল। ইতিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়েটির আলাপ হয়। তাঁর উদাসীনতা ও বৈরাগ্য মেয়েটির মনে ছাপ ফেলে। এর পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভাস্করের সঙ্গে তার আবার দেখা। পুরনো ভাস্কর আর নেই, এখনকার

ভাস্কর অবিবাহিত কিন্তু মদ্যাসক্ত, প্রবৃত্তিচালিত। অথচ বিগতস্পৃহ সন্ন্যাসী তাঁর অঢেল সম্পদ ডানার নামে লিখে দিয়ে নিরুদ্দেশে চলে যান। অমরেশবাবুর পক্ষিশালা, আনন্দমোহনের কবিতা, রূপচাঁদের দেহপ্রেম কোনকিছুই ডানাকে ধরে রাখতে পারল না। সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল পথে, বৈরাগ্যসাধনে।

উপন্যাসটিতে মানব-মানবীর কাহিনীপট রচনা করেছে পক্ষিজগৎ। কেননা ডানার আশ্রয়দাতার পক্ষিশালার দায়িত্ব পেয়েছিল ডানা। কবি আনন্দমোহনের যে কবিতায় আকর্ষণের ইঙ্গিত থাকত তাও পক্ষিবিষয়ক। বসন্তবৌরি, মিনিভেট, ছাতারে, বউ-কথা-কও, দোয়েল, রেডস্টার্ট, সিলহী, ডাক, পানকৌড়ি প্রভৃতি অজস্র পাখির ভিড় উপন্যাসটিতে। এমনকি উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে আনন্দমোহনের কবিতায় যে পরম সত্তার ইঙ্গিত বেজেছে সেখানেও আছে পাখিরা ঃ

"বৈশাখেতে দোয়েল শ্যামা
বনে বনে যে সুর সেধেছিল
টুনটুনি আর বুলবুলিরা
যে নীড় বেঁধেছিল
চাতক পাখীর কণ্ঠে ওগো
তাই কি আজি জলতরঙ্গ বাজে
ছায়ায় ঢাকা মেঘলা দিনের
নিবিড়তার মাঝে।"

ডঃ সুকুমার সেন 'ডানা' কে রোমান্টিক কাহিনী বলেছেন। ডানা, তাঁর মতে, "পক্ষিবিদ্যাকীর্ণ চিত্রপটে একটি যেন পথভ্রষ্ট যাযাবর পাখির প্রতীক।' বইটিতে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের প্রত্যক্ষ বস্তুকণা আবেগমিশ্রিত চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

[চার]

রাজনৈতিক ঘটনা ও অবস্থা নিয়ে লেখা বনফুলের উপন্যাসগুলিতে এককাল-সচেতন লেখককে পাই। রাজনীতি ঔপন্যাসিক বনফুলের সচ্ছন্দ বিচরণক্ষেত্র নয়। সতীনাথ ভাদুড়ির মতো তিনি ভিতরে থেকে রাজনীতিকে কখনো দেখেন নি। তরুণ তারাশঙ্করের মতো রাজনীতি বনফুলের মনকে কখনো আকর্ষণও করেনি। ছাত্রাবস্থায় উত্তাল দেশমুক্তির আন্দোলনকে তিনি দেখেছেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে, নিস্পৃহ দর্শকের মতো। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি কংগ্রেসের রাজনীতিকে সমর্থন করেছেন এবং তাঁর কমিউনিজম-বিরোধিতাও ছিলো গান্ধীবাদী রাজনীতিরই অংশ : তবু, রাজনীতির গভীরে প্রবেশ না করেও, বেশ কয়েকটি উপন্যাসের জন্য রাজনৈতিক বিষয় তিনি বেছে নিয়েছেন। কোথাও সুভাষপন্থীদের সঙ্গে গান্ধীবাদীদের অনৈক্য, কোথাও-বা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা, আবার-কোথাও বিয়াল্লিশের

আন্দোলন অথবা রুশীয় সাম্যবাদের দুর্বলতা তিনি এঁকেছেন। 'সপ্তর্ষি', 'স্বপ্নসম্ভব', 'অগ্নি', 'মানদণ্ড' উপন্যাসগুলিতে বনফুলের রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় মেলে।

১৯৪৬-এ হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গা সব মানুষকেই ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কেন এত রক্তপাত? কেনই-বা মানুষের এই ভ্রাতৃঘাতী মানসিকতা? এ-প্রশ্ন, এ-দুঃখ 'স্বপ্নসম্ভব'-এর নায়ক যতীনের। দাঙ্গাকলুষিত সময়ে সে নিজের ঘরে বসে হানাহানির খবর পড়ে উদ্‌ভ্রান্ত। এই সূত্রেই তার চেতনাধারায় অতীত ও বর্তমানের গতায়াত। দাঙ্গাকবলিত কলকাতাকে পটভূমি রেখে নীতিনির্ভর আদর্শবাদী যতীনের মনে দেখিয়েছেন রক্তপাতের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো আর্থ-রাজনৈতিক সমাধান-চিন্তার দিকে যতীনকে লেখক এগিয়ে দেন নি। তাই এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্ভাব্য নিরসন সুলভ আপ্ত বাক্যে: "ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, ভালবাসাই মুক্তির পথ, দেশের সম্মিলিত শক্তিই তোমার শক্তি"।

'অগ্নি' উপন্যাসের বিষয়পট আগস্ট আন্দোলনের। নায়ক অংশুমান, 'জাগরী' উপন্যাসের বিলুর মতোই, জেলে বন্দী। কিন্তু বিলুর মৃত্যুশঙ্কিত চিত্তপটে রাজনীতিমগ্ন ভাবনাজগৎটি যে স্বাভাবিকতায় সতীনাথ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, বনফুলের পক্ষে তা সম্ভব ছিলো না। অতএব সময় কাটানোর জন্য অংশুমানের হাতে বিজ্ঞানের বই লেখককে তুলে দিতে হয়েছে। এ যুবক আগস্ট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। আবার একই সঙ্গে বিবেকানন্দ ও কল্কি অবতারে বিশ্বাস করে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ানো অংশুমানের সত্যভাষণ দৃপ্ত সাহসের প্রকাশ হলেও, উপন্যাসের বাস্তবতায় মণ্ডিত কিনা সে প্রশ্ন কেউ-কেউ করতে পারেন। এই সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ সমর্থনের একটা অংশ কমিউনিজম বিরোধিতা। কমিউনিস্ট পার্টি আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। পার্টির এ ভূমিকা দেশের অনেকেই অপছন্দ করেছিলেন। বনফুলও বন্দিনী অন্তরা সেনের মনে কমিউনিজম সম্বন্ধে স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছেন। দেখিয়েছেন যে, পরশ্রীকাতর প্রবণতা থেকে মানুষ ঝোঁকে সাম্যবাদের দিকে। 'মানদণ্ড' উপন্যাসে এজাতীয় মনোভাব আরো বিস্তৃতি পেয়েছে। মার্কসীয় সাম্যবাদ গান্ধীবাদের তুলনায় কতো অপকৃষ্ট এবং অনুপযোগী তা তিনি উপন্যাসটিতে দেখানোয় কসুর করেন নি। 'পঞ্চপর্ব' এবং 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসদ্বয়ের কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিকতা নেই, উপন্যাসদুটি উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে লেখা। 'পঞ্চপর্বে' দেশভাগজনিত বিপর্যস্ত সামাজিক কাঠামোর নানা ছবিই প্রধান। 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসে দেশবিভাগের পটে আদর্শ নারীপুরুষের চিত্র তিনি এঁকেছেন। এঁদের উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু কার্যক্রম অবাস্তব। 'ভীম পলশ্রী' উপন্যাসেও বনফুলের সাম্যবাদবিরূপতা স্পষ্ট। তাই অনীতা কমরেড হবার পরেও সন্দেহ-বাতিকে ভোগে।

[পাঁচ]

বনফুলের উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্যের যেন শেষ নেই। কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করার পরেও বেশ কয়েকটি অনন্য উপন্যাসের উল্লেখ বাকি থেকে গিয়েছে। যেমন 'মৃগয়া' (১৯৪০)। এমনিতে মনে হয় কাহিনীটি শিকারের। এক জমিদার বাড়ীর শিকার

যাত্রা-কাহিনী। আসলে মদির জ্যোৎস্নারাতে নির্বাধ মনের আত্মহারা মানবমানবীর গল্প এটি।

বৈপিত্র্য ভাইবোনের প্রেম নিয়ে একটি উপন্যাস বনফুল লিখেছেন। 'রাত্রি' (১৩৬৮)। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন 'কিছুক্ষণ' বনফুলের শ্রেষ্ঠ রচনা। আর দ্বিতীয় স্থানে আছে 'রাত্রি'। নায়িকা 'রাত্রি'-র গায়ের রঙ্ কালো। কিন্তু অসামান্যা সুন্দরী সে। বাংলা উপন্যাসে নায়িকারা বড়ো জোর শ্যামলী। কৃষ্ণা তেমন কেউ আছে কি? 'রাত্রি' কিন্তু রাতের মতোই কালো। যাকে সে ভালোবাসে, যার সন্তান তার গর্ভে, সেই জ্যোতির্ময় আসলে তার ভাই। এ কাহিনীতে বনফুলের বিজ্ঞানদৃষ্টি আদ্যন্ত অম্লান। এ বিস্ফোরক কাহিনীটি বনফুলের হাতে বর্ণময় রূপ ধারণ করেছে। নইলে মোহিতলালের প্রশংসা পেত না।

কোনো-কোনো উপন্যাসে বনফুল বাস্তবের পাশে অবাস্তব, পার্থিবতার ভেতরে অলৌকিক ঘটনাকে স্থাপন করেছেন। পাঠকের যুক্তিবোধের কোনো পরোয়া না করেই। 'রূপকথা এবং তারপর', 'মানসপুর' এ-জাতীয় রচনার উদাহরণ। 'মানসপুর' উপন্যাসে ধানগাছ পর্যন্ত মানুষের ভাষায় কথা বলেছে ঃ "আমাদের মাড়িয়ে দিচ্ছেন যে। আলের উপর দিয়ে যান না।" 'মহারাণী' উপন্যাসটি দূর ইতিহাসের পটে স্থাপিত। এটিও নানা অবাস্তব ঘটনায় উচ্চাবচ।

'কষ্টিপাথর' পত্রোপন্যাস। ১৩৫৮-য় প্রকাশিত। অধিকাংশ চিঠিই নায়ক লিখেছে সদ্যোবিবাহিত পত্নী হাসিকে। এ উপন্যাসে বিবাহবিদ্বেষিনী অথচ সন্তানার্থিনী নারীর গর্ভে টেস্টটিউব বেবির জন্ম হয়েছে।

মৃত্তিকালগ্ন মানুষের বিপরীতধর্মী ছবিও বনফুলের উপন্যাসে কম নেই। বিহারের গ্রামজীবনপট এবং দরিদ্র মানুষ অনেক উপন্যাসে তিনি এঁকেছেন। কিন্তু একজন নীচুতলার মানুষের বিস্তারিত জীবন নিয়ে লেখা 'অধিকলাল' (১৯৬৯) উপন্যাসটি তার রচনামালায় আনুপূর্বিকতার স্বাদ দেয়। দোসাদ কিশোর অধিকলালের 'লিখাপড়ি', তারপর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য একদিকে, অন্যদিকে উচ্চবর্ণাভিমানী ছাত্র ও সহকর্মীদের বিরূপতা এবং মা সমুন্দরি ও স্ত্রী ফুলেশ্বরীর পিছিয়ে-পড়া মন - বনফুলের হাতে দুটি দিকই চমৎকার রূপায়িত হয়েছে। অপদস্থ হয়ে অধিকলাল শেষে চাকরি ছেড়ে দেয়। গাঁয়ের পাঠশালায় 'পণ্ডিতজি' হয়ে বসে। কেননা বনফুল অধিকলালকে ত্যাগের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। জটিল জীবন সমস্যার এক আদর্শায়িত সুলভ সমাধানে উপন্যাসটির উপসংহার।

[ছয়]

বনফুলের উপন্যাসগুলির গঠনকৌশল আলোচনার সূচনায় মনে রাখা দরকার যে আধুনিক সাহিত্যপ্রকরণগুলির মধ্যে উপন্যাস সবচেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক (elastic)। আকারে সে কখনো ছোটোগল্পের মতো, কখনো বা হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী

তার বিস্তার। সে শুষে নেয় নাটকের ধর্ম, কখনো লিরিক কবিতার তীব্র আবেগ চারিয়ে যায় তার ভাষায়, আবার কখনো দার্শনিক জিজ্ঞাসায় গম্ভীর হয়ে ওঠে তার আবহ। আধুনিক জীবনপ্রসূত যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই অঙ্গে ধারণ করার সামর্থ্য রাখে এই বিশিষ্ট প্রকরণটি।

বনফুলের উপন্যাসগুলির গঠন লক্ষ্য করলে প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে তা হল এগুলির আকারগত বৈচিত্র্য। খুব ছোটো, মাঝারি এবং বিপুলায়তন সব ধরনেরই উপন্যাস বনফুল লিখেছেন। তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিকদের অধিকাংশ উপন্যাসই মাঝারি আকারের। কিন্তু বনফুলের ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাসের সংখ্যা অনেক। 'নভেলেট' লেখার এতো প্রবণতা অন্য বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আর দেখা যায় না। এজন্যই তেত্রিশ পৃষ্ঠার ছোটো-গল্প 'বিজয়িনী'-তে তিনি অল্প একটু রদবদল এনে, নতুন কয়েকটি ঘটনা যোগ ক'রে ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার এক নভেলেট তৈরি করতে দ্বিধা করেন নি। নামটাও বদলে দিয়েছিলেন 'ওরা সব পারে'। শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে তব শ্রেষ্ঠ রচনামালা এই ছোটো উপন্যাসগুলি। 'কিছুক্ষণ' মাত্র একান্ন পৃষ্ঠার বই। যে 'তৃণখণ্ড'কে ডঃ সুকুমার সেন বলেন বনফুলেব পরবর্তী জীবনে সৃষ্ট তুঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টির বীজ, সেটিও মাত্র বাষট্টি পৃষ্ঠার রচনা। এছাড়া 'বৈতরণী তীরে', 'মৃগয়া', 'সে ও আমি', 'হাটে বাজারে' ছোটো উপন্যাসই।

আবার অতিকায় উপন্যাস রচনায়ও তিনি পথিকৃৎ। অজস্র অধ্যায়ে বিলম্বিত, খণ্ডের পর খণ্ড জুড়ে কাহিনীর বনস্পতি নির্মাণ তিনি করেছেন। বাংলাসাহিত্যে বিশালায়তন উপন্যাসের সূচনা 'জঙ্গম' উপন্যাসে। তিন খণ্ডে বিস্তারিত এ উপন্যাসে তিনি প্রায় সাতশো সত্তর পৃষ্ঠা জুড়ে শঙ্করেব জীবন ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়ক-জীবনের মূল স্রোতে অজস্র উপনদীর মতো অসংখ্য চরিত্র এসে মিশেছে। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের আগে এত বড়ো উপন্যাস লেখার দুঃসাহস কারো হয় নি।

উপন্যাসে গল্পবলার কৌশলেও বনফুলের বৈচিত্র্যচঞ্চল মানসিকতা খুবই স্পষ্ট। ঔপন্যাসিক নিজেকে আড়ালে রেখে বিধাতাপুরুষের মতো গল্প বলে যান। তিনি নিজে কোনো চরিত্র নন, উপন্যাসের সব চরিত্র এবং ঘটনা তাঁর সৃষ্টি। কাহিনী-নির্মাণে এ-জাতীয় রীতির অনুকরণ বাংলা উপন্যাসে বেশি। অবশ্য ভিন্নভাবে গল্প রচনার চেষ্টাও বাংলা উপন্যাসে প্রথম থেকেই হয়েছে। সেখানে ঔপন্যাসিক কথক নন। উপন্যাসের এক বা একাধিক চরিত্রের মুখে আত্মকথাসূত্রে কাহিনীর উন্মোচন দেখতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই অভ্যস্ত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' এবং 'ঘরে বাইরে'র চরিত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিস্পৃহভাবে কখনো-নারী কখনো-পুরুষ হয়ে উঠেছেন। তার সাফল্যে আমরা চমৎকৃত হই। উপন্যাসে নাট্য-চরিত্রের মনোলোগ-ধর্মের ব্যবহার তাই নতুন কিছু নয়। বনফুলের বহু উপন্যাসে এ পদ্ধতির ব্যবহার আছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড'। তেরোটি অধ্যায়ে সমাপ্ত উপন্যাসটির সমগ্র কাহিনীটি কবিমনোভাবাপন্ন ডাক্তারের মুখে শুনতে পাই। কোনো

মানুষ নিজের অথবা আত্মীয় পরিজনের রোগমুক্তির কামনায় ডাক্তারের কাছে আসে। কল পেয়ে ডাক্তার নিজেও কোনো বাড়িতে যান রোগী দেখতে। তাই জীবিকাসূত্রে পরিচিত মানুষ, নিসর্গ এবং ঘটনার ধারাবিবরণ শুনতে পাই ডাক্তারের মুখে। শুধু অন্যকে দেখানো নয়, কথক এ উপন্যাসে নিজেকেও উদ্ঘাটিত করেছে।

'বৈতরণী তীরে'-র কথকও সরকারি ডাক্তার। কিন্তু কাহিনী-গ্রন্থনে লেখক 'তৃণখন্ড' থেকে পৃথক কৌশল গ্রহণ করেছেন। 'তৃণখণ্ডে' পাই ডাক্তারের বেশ কিছুদিনের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে ডাক্তার সেগুলির সমান্তরালে আত্মকথা বিবৃত করেছেন। আর 'বৈতরণী তীরে' মাত্র একটি রাতের গল্প। সে রাত বজ্রমুখর, বর্ষণাক্ত। আত্মহত্যায় মৃত আত্মারা সে-রাতে ভর করেছে ডাক্তারের চেতনায়। নিজেদের মৃত্যুর কারণ তারা নিজেরাই ডাক্তারকে জানিয়েছে। আফিংগ্রস্ত কমলাকান্তের মতোই ইনসমনিয়ার রোগী আবিষ্ট চিত্তে তাদের কথা শুনেছে। ঘরের টেবিললাম্প, কম্পিত আলোক-শিখা, জানালা-পথে আকাশের তারাটি এবং দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডার মাঝে-মধ্যে শ্রোতা ডাক্তারকে প্রেতজগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছে। এ উপন্যাসে মৃতদের কাহিনী চলেছে একটানা। 'তৃণখণ্ডে'র মতো অধ্যায় বিভাগ নেই।

'বৈতরণী তীরে'-র একেবারে শেষ অংশে বর্ণিত হয়েছে গল্পকথক ডাক্তারের নিজের জীবন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়ো উপন্যাস 'নির্মোক'-এ বিমলডাক্তার আছে কাহিনীর শুরু থেকেই। মেডিকেল কলেজে তার ভর্তি হওয়ার প্রসঙ্গে এ কাহিনীর সূচনা। ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তারপরে এসেছে ডাক্তারি জীবনের ঘটনা-পরম্পরা।

গল্পকথনের জন্য আশ্চর্য সব টেকনিক ব্যবহার করেছেন বনফুল। কখনো-কখনো এক ব্যক্তিসত্তাকে দু-টুকরো করে উভয়ের মুখে উক্তি-প্রত্যুক্তি স্থাপন করেছেন। 'সে ও আমি'-উপন্যাসের গল্পরূপটি এভাবেই নির্মিত হয়েছে। উপন্যাস-সূচনায় অনেকটা ভৌতিক ও রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে 'আমি'-র বিবেককে লেখক নারী-মূর্তি দান করেছেন। 'সে' 'আমি'রই অন্তরশায়ী রূপ। 'আমি' এ-উপন্যাসের নায়ক। আর 'সে' নায়কের সকল অপকর্মের তীব্র সমালোচক। এই নারীমূর্তিকে নায়ক পরিচয় জিজ্ঞেস করায় তার উত্তর ঃ

'তুমি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে
আমারে করেছ রচনা।'

এই উপন্যাসের সংলাপ প্রাধান্য প্রায় নাটকেরই মতো। তবুতো এ উপন্যাসে সামান্য বর্ণনা আছে। কিন্তু 'পঞ্চপর্ব' উপন্যাসের প্রথম পর্বটি যেন উপন্যাস নয়, নাটক। কেননা এ উপন্যাসের প্রথম পর্বটিতে সবকিছুই বলা হয়েছে টেলিফোনে। পর্বটির নামও তাই 'টেলিফোন পর্ব'। ভূপেশ, বরেন, বিশাখা এবং বিষ্ণুচরণ দূরভাষ যন্ত্রে নিজের-নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছে। সংলাপ দিয়েই কাজ সারতে হয়েছে বনফুলকে।

বনফুলের প্লট বৃত্তধর্মী নয়। আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত একটি মাত্র গল্পকে

নিটোল ক'রে গড়ে তুলতে তিনি অনিচ্ছুক। বরং তাঁর উপন্যাসগুলি অনেকটা পথের মতন। গল্প এগিয়ে চলার সময় সাক্ষাৎ ঘটে নতুন মানুষের সঙ্গে, দেখা দেয় নতুন নিসর্গপট। পেছনে পড়ে থাকে পুরনো জগৎ। অনন্ত সামনের দিকে তার গতি। 'স্থাবর' উপন্যাসটি এ-জাতীয় গঠনের এক চূড়ান্ত উদাহরণ। 'স্থাবরের' চেয়ে 'জঙ্গম' অনেক বড়ো উপন্যাস। কিন্তু 'স্থাবর' উপন্যাসে যে চিরন্তন মানবের জীবনকথা বনফুল রচনা করেছেন তা হাজার-হাজার বছরজোড়া। আদিম কেভম্যানে যে-মানুষের সূচনা এবং সভ্য-মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সে-মানুষেরই বিকাশ। এই দুই সীমালগ্ন মানবসত্তা 'স্থাবরে'র নায়ক।

চরিত্র এবং ঘটনার কার্যকারণসম্মত যোগে নিখুঁত প্লট গড়ে ওঠে। আত্মব্যক্তিত্ব অনুযায়ী লেখক বাস্তব ঘটনা ও বাস্তবচরিত্র বাছাই করেন। এই নির্বাচনেও বিভূতি অথবা মানিক থেকে বনফুল পৃথক। বিভূতিভূষণের মতো দৈনন্দিনতাময়, অপরূপ তুচ্ছতামণ্ডিত ঘটনা-চরিত্র আঁকার দিকে বনফুলের ঝোঁক নেই। বরং যে-সব চরিত্রের ঝোঁক একটু বিকৃতি বা আদর্শের দিকে উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে তারাই বনফুলের প্রিয়। এজন্যই তার উপন্যাসগুলির একটিতেও একটানা সমতলতার শ্রী নেই। সেগুলি চরিত্র ও ঘটনাব নাটকীয় বন্ধুরতায় অমসৃণ।

ঘটনাগত নাটকীয়তার প্রতি অতিমাত্রায় ঝোঁক কখনো-কখনো বনফুলকে বাস্তব জগতের বাইরে নিয়ে গেছে। 'বৈতরণী তীরে' উপন্যাসে তিনি ঘরের মধ্যে মৃত আত্মাদের নামিয়ে এনেছেন। 'স্বপ্নসম্ভব'-এ নায়ক যতীনের সঙ্গে ভ্রমর, টিকটিকি এবং প্রস্তর তরুণীকে কথা বলিয়ে তবে ছেড়েছেন। এ-উপন্যাসেই অশরীরী সীতা-অহল্যা-দ্রৌপদী এসে সংলাপ ব'লে চলে যায়। কেউ-কেউ বলেন এই অতিলৌকিকতা বাংলা উপন্যাসের বিষয় পরিধিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। অতিলৌকিক ঘটনার শিল্পসম্মত প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। কিন্তু বনফুলের উপন্যাসে এ-জাতীয় ঘটনা প্রায়ই ঘটে প্রস্তুতিহীন পটভূমিতে। অতিলৌকিকতার আচমকা আমদানি ঘটলে পাঠকের চেতনায় প্রত্যাখ্যান জাগা অস্বাভাবিক নয়। সাহিত্য-প্রকরণ হিসেবে উপন্যাস সবচেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক সন্দেহ নেই। এ প্রকরণটির ধারণ ক্ষমতায় দু-চারটে অলৌকিক ঘটনাও বেমানান কিছু নয়। কিন্তু তার জন্য চাই উপযুক্ত পটভূমি ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অনুকূল ইন্ধন। বনফুলের উপন্যাসগুলিতে, অন্ততঃ স্বপ্নসম্ভব'-এ তা হয় নি বলেই, অলৌকিকতাময় ঘটনাগুলিকে আজগুবি মনে হয়।

উপন্যাসগুলির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা শেষ করার আগে বনফুলের ভাষারীতি সম্বন্ধে দু-চার কথা না বললেই নয়। কেননা এ-বিষয়েও তাঁর পরীক্ষা-প্রবণ মানসিকতার পরিচয় বারে-বারে পাওয়া গেছে।

উপন্যাস আধুনিক জীবনের গল্প। গদ্যই তার একমাত্র মাধ্যম। তবে সব গদ্য নয়। প্রবন্ধ-গদ্যের মন্থর চাল নয়, মুখের ভাষার কাছাকাছি যে গদ্যরূপ তা দিয়েই ঔপন্যাসিক লক্ষ্যভেদ করেন। আবার স্বভাবে যিনি কবি উপন্যাস লেখার

সময় এই কথাটি তিনিও মনে রাখেন। কেননা কবিতার ভাষা থেকে উপন্যাসের ভাষা সাধারণভাবে পৃথক। উপন্যাসের কোনো-কোনো অংশ কাব্যগুণসমৃদ্ধ হতে বাধা নেই, যেমন 'কপালকুণ্ডলা' বা 'চতুরঙ্গে'র বর্ণনা, তবু কবিতার সংকেতধর্মী আবেগগর্ভ বাণী থেকে উপন্যাসের একার্থপ্রধান যুক্তিচালিত ভাষা অনেকখানি দূরে।

গদ্যপদ্যের এই ব্যবধান ঘোচানোর জন্য বনফুল যেন প্রথম থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসেই তার পরিচয় পাই। 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার অপিচ কবি। এ উপন্যাসে নায়ক-কবির অনেক কবিতাই ঠাই পেয়েছে। কখনো নিসর্গরূপে মুগ্ধ হয়ে নায়ক কবিতা লেখে, কখনো অন্য কারণে। অতএব তার চরিত্র ফোটানোর জন্য বনফুল দু-চার পংক্তি কবিতা তুলে দিতেই পারেন। কিন্তু ছোটো উপন্যাসটিতে পংক্তির পরিমাণ এতো বেশি যে এর ফলে গল্পরসের স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। সমালোচক মোহিতলাল এ উপন্যাসে রচয়িতার 'আত্মপরিচয়' পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। বনফুল নিজে ছিলেন কবিও, উপন্যাসের নায়ক-চরিত্র রচনাকালে বনফুল কবিই থেকে গিয়েছেন।

তার দ্বিতীয় উপন্যাস 'বৈতরণী তীরে'। এখানে নায়ক অতো কবিত্বভাবাপন্ন নন। কিন্তু প্রেতলোকের চরিত্রগুলি বাস্তব জীবনের নয়। তাদের রহস্যময় আবির্ভাবের মধ্যে সুদূরতা আছে। মোহিতলাল এই উপন্যাসে অসামান্য ভাববস্তুর উপযোগী কথাবস্তু নেই বলে আক্ষেপ করেছেন। অনুভব করেছেন ঃ 'রচনাটি যদি গদ্যে না হইয়া পদ্যে (dramatic poetry) হইত, তবে বোধ হয় আরও গাঢ় হইতে পারিত, এত sentimental হইত না' (মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ —পৃঃ ২৮)। পাঠক মোহিতলালের সঙ্গে আমরা একমত। বিষয় ও ভাষা পরস্পরের পরিপূরক না-হলে এজাতীয় স্খলন অনিবার্য।

বনফুল ভাষা ব্যবহারে সাহিত্যপ্রকরণগুলির সীমা মুছে দিতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি বিশ্বাস করতেন কবিতা-নাটক-উপন্যাসের এ-বিভাগগুলি কৃত্রিম। তাই গল্পের ভাষায় কখনো আনতে চেয়েছেন কবিতার আবেগ, কখনো-বা সংলাপের প্রত্যক্ষতা। নইলে 'মৃগয়া' ওভাবে লিখতে যাবেনই-বা কেন। তিন অধ্যায়ে বিভক্ত উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায় ঃ 'গ্রামে' ; জমিদারদের শিকারে যাবার প্রস্তুতি-বর্ণনা। সবটাই গদ্যকবিতায়। পরের অধ্যায় ঃ 'পথে' ; কলমিপুর মাঠে যাবার কাহিনী, সবটুকুই গদ্যে লেখা। শেষ অধ্যায় ঃ 'প্রান্তরে' ; শিকার কাহিনী। ঘটনাবহুল এ অংশটুকুতে নাটকীয় সংঘাত ও প্রত্যক্ষতা আনার জন্য, বনফুল গদ্যপদ্য নয়, সাহায্য নিয়েছেন পাঁচটি নাট্যদৃশ্যের। এ-থেকে বোঝা যায় সাধারণ গদ্যে উপন্যাস লিখে তৃপ্ত ছিলেন না বনফুল। প্লট নির্মাণেও যেমন তিনি ছিলেন নিয়ত পরীক্ষারত, তেমনি কোন এক-ধরনের ভাষারীতিতে অবিচল থাকার গোঁড়ামী তার ছিলো না।

তার গল্প-উপন্যাসের ভাষা ঋজু এবং স্পষ্ট। এ উপন্যাসে ঋজুতা এবং স্পষ্টতা ঔপন্যাসিকের নিজেরই চরিত্রধর্ম। বনফুলের ভালো এবং মন্দের বোধ উভয়ই ছিল চড়া সুরের। ব্যক্তিজীবনে মতামত প্রকাশে তিনি রাখঢাক পছন্দ করতেন না। এই

অনমনীয় প্রত্যক্ষতায় তার গল্পভাষা টান্-টান্। তাছাড়া ছিলো বিদ্রুপ করার সহজাত দক্ষতা। কোনো চরিত্রের নীচতা বা ভাণ দেখলেই তার মনের মধ্যে, বিষণ্ণতার পরিবর্তে, জেগে উঠত প্রখর ব্যঙ্গ। সে উত্তাপ ধরা পড়ে বিশেষণ ব্যবহারে। শরৎচন্দ্রের গল্পভাষার মোহময় প্রসাদগুণ বনফুলের নেই, মানিকের নিরাবেগ তীক্ষ্ণতাও বনফুলের ভাষাব্যবহারে মেলে না। কিন্তু কাটা-ছাটা বাক্য ব্যবহারে, যুক্তির সরাসরি প্রকাশে শব্দের পরিমিত প্রয়োগে তার উপন্যাসের ভাষা নিজস্বতা পেয়েছে। এজন্যই পরিমল গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে ঘটনাকে বনফুল অনায়াসেই ভাষায় বেঁধে ফেলতে পেরেছেন। তার দ্রুতগামী গল্প ভাষা যেন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপর তড়িৎগতিতে প্রতিফলিত ছবি। সংক্ষিপ্ত এবং সবল।

[সাত]

গল্প এবং উপন্যাস দুটি শাখাতেই বনফুলের সৃষ্টিসম্ভার বিপুল। তার অজস্র গল্প বিষয়বৈচিত্রতার এবং প্রকরণগত অভিনবত্বের জন্য রসজ্ঞ সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে কালান্তর গ্রন্থে নির্মল নাটকীয় ব্যঙ্গদৃষ্টিপ্রবণ বনফুলকে বলেছেন অজস্র উত্তম ছোটোগল্পের স্রষ্টা। কিন্তু এই সমালোচকই বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণকুশলতা থাকা সত্ত্বেও বনফুলের উপন্যাসগুলিকে অতো উন্নত সৃষ্টি বলতে রাজি হনান। অন্যদিকে আবার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার ঝোঁক অন্যদিকে। তিনি স্বীকার করেছেন যে বনফুলের বৈচিত্র্যপ্রবণ হওয়ার একটা বড়ো কারণ—ব্যক্তিসত্তার গভীরে ঢুকতে পারার অসামর্থ্য। এ অন্বেষণ শিল্পী বনফুলের চঞ্চল বস্তুবিলাসী মনের প্রকাশ। তবু বিভূতি-মানিক-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে বনফুলের তুলনায় কম জায়গা পেয়েছেন। এই সমালোচকের আলোচনার ধরন দেখে মনে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে বনফুলকে তিনি কম শক্তিধর কথাসাহিত্যিক বলে মনে করতেন না।

খুব স্বাভাবিক এই মতান্তর। একটা সময় ছিলো যখন ঔপন্যাসিক বনফুলকে খুবই উচুমানের শিল্পী বলে ভাবা হত। ... হত প্রতিভায় তিনি তারাশংকর এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমান মাপের। নইলে শ্রীশচন্দ্র দাস কেন সাহিত্য সন্দর্শন বইয়ে 'পথের পাঁচালি', 'কবি' এবং বনফুলের রাত্রি-কে এক নিশ্বাসে 'প্রায় মহৎ সৃষ্টি' বলে দিলেন? তারাশংকর মানিক বিভূতিভূষণের সঙ্গে ঔপন্যাসিক বনফুলকে যে একাসনে বসানো উচিত নয় সেকথা পরে বুঝেছিলেন মোহিতলাল। বনফুল সম্বন্ধে প্রথম দিকের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস পরে তাকে অনুতপ্ত করেছে। অবশ্য উত্তরকালের তীব্র নেতিবাচক মনোভাবও মোহিতলালের নিরপেক্ষ বিচারবোধের প্রমাণ নয়।

উপন্যাসে আমরা চাই বৈচিত্র্য, চাই প্রকরণের অভিনবতা। কিন্তু এ-চাওয়াই সব নয়, এ-চাওয়াই চূড়ান্ত চাওয়া নয়। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ তো কথাবস্তু একই। দুটি উপন্যাসেরই বিষয় বিবাহিত পুরুষের বিধবা নারীর প্রতি আকর্ষণ, বিধবা নারীর জীবনতৃষ্ণা, স্বামীর অন্যগামিতায় দুঃখিতচিত্ত নারীর সংকট। তাই বলে পরবর্তীকালের রচনা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-কে কি বিষয়ের পুনরাবৃত্তির কারণে নিকৃষ্ট উপন্যাস বলা যাবে? 'পথের পাঁচালি'-তে 'রাত্রি' উপন্যাসের পরিকল্পনার মৌলিকতাই নেই। আখ্যানবস্তু সমাবেশের বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তিতেও 'পথের পাঁচালি'-র স্রষ্টা বনফুলের তুলনায় ক্ষীণ। এই কারণে একালের কোন পাঠক কি 'রাত্রি'কে 'পথের পাঁচালি'র চেয়ে উৎকৃষ্ট বা সমান মানের উপন্যাস বলবেন, যেমন বলেছেন শ্রীশ চন্দ্র দাস?

এই প্রশ্ন তোলার মানে এই নয় যে, বনফুলের উপন্যাসগুলি নিকৃষ্ট মানের। কিন্তু একথা তো মানতেই হবে যে, তারাশংকর-মানিক-বিভূতিভূষণ-সতীনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি যে কাম্য সামগ্রিকতার বোধ পাঠকচিত্তে জাগায়, বনফুলের উপন্যাসগুলি অতো বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তা জাগাতে অসমর্থ। এঁদের প্রতিভায় আছে যে সূচীমুখ তীক্ষ্ণতা, মানবচরিত্রের গভীরতলশায়ী বৈশিষ্ট্যকে তা বিদ্ধ করতে সমর্থ। এই শক্তির পরিচয় বনফুলের রচনায় কম। তবু বিষয় ও প্রকরণগত অনুকরণে ভারাক্রান্ত বাংলা উপন্যাসের ধারায়, ঝুঁকি-নিতে-কুণ্ঠিত এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বীতরাগ কথাকারদের ভিড়ে, বনফুল নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২। বনফুলের ফুলবন—সুকুমার সেন
৩। মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ—সম্পাদনা ঃ আজহারউদ্দীন খান
৪। সাহিত্য সন্দর্শন—শ্রীশ চন্দ্র দাস ও ভবতোষ দত্ত
৫। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : অক্লান্ত সৃষ্টি, অ-প্রতিষ্ঠিত স্রষ্টা

[এক]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছোট গল্পকার হিসেবে যতটা খ্যাত ঔপন্যাসিক হিসেবে মোটেই তা নন। তাঁর মোট উপন্যাসের সংখ্যা কত তা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে। কিন্তু সংখ্যাটি যে প্রচুর তা বিতর্কাতীত। তাঁর মৃত্যুর পর 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত শোক সংবাদে বলা হয়েছিল যে তিনি প্রায় ২০০টি উপন্যাস লিখেছেন (যুগান্তর, ৩. ১ ৭৬)। সংখ্যাটি যে এর কাছাকাছি যেতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। এই উপন্যাসগুলির অধিকাংশই গুরুত্বহীন। এর বেশীর ভাগটাই লেখা হয়েছিল চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে। ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দকে এগুলির রচয়িতা না বলে চলচ্চিত্র পরিচালক শৈলজানন্দকেই এদের রচয়িতা বলা শ্রেয়। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়েই এই উপন্যাসগুলি বিদায় নিয়েছে, এখন আর এদের অনেকেরই কথা আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকের মনে নেই। কিন্তু শৈলজানন্দের জীবিতকালেও তাঁর উপন্যাসগুলিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক তাঁকে সজনীকান্ত দাস ও প্রফুল্লকুমার সরকারের সঙ্গে স্থান দিয়েছেন। কেবল রচনার প্রাচুর্য ও অজস্রতার দিক দিয়ে শৈলজানন্দ সম্মানজনক উল্লেখের অধিকারী বলে তাঁর মনে হয়েছিল। নির্দ্বিধায় তিনি এমন মতামতও প্রকাশ করেছেন, "তাহার বড় উপন্যাসের মধ্যে কোনটি উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করে নাই।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)।

অবশ্য সবাই শৈলজানন্দের প্রতি এতটা নিষ্করুণ নন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে শৈলজানন্দের মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে : "শৈলজানন্দের গল্পে কাহিনী আপনার বেগেই পথ করিয়া চলিয়াছে। লেখক সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছেন, কখনও তিনি নিজের হৃদয়াংশ অথবা বুদ্ধি যোগ করিয়া গল্পে গভীরতা অথবা দীপ্তি আনিতে চেষ্টা করেন নাই। স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশের সৌষ্ঠব যাহাকে ইংরাজীতে বলে 'লোকাল কালার', তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণ ভাবে দেখা গেল। অথচ কাহিনী অত্যন্ত জৈবিক, মানুষগুলি স্থান-কাল-পরিবেশের মধ্যে খর্ব হইয়া হারাইয়া যায় নাই। বিষয় সর্বদা জীবন্ত, অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত। ইহাও বাংলা সাহিত্যে নতুন।" এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসা বাক্য, কিন্তু এখানেও শৈলজানন্দের উপন্যাস সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয় নি। তাঁর ছোটগল্পগুলি 'বাংলা সাহিত্যে নতুন পথের দিশারী' বলে সমালোচকের মনে হয়েছে, কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে তিনিও অনাগ্রহী। বাংলা সাহিত্যে এইরকম আর দু'একজন ঔপন্যাসিকেরও সন্ধান পাওয়া যাবে না যার উপন্যাসের সংখ্যা দ্বিশতাধিক অথচ সেগুলির একেবারেই স্বীকৃতি নেই। এই লেখকই কিন্তু আবার বিশেষ পটভূমিকায় রচিত তাঁর ছোট-গল্পগুলির জন্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শৈলজানন্দের ছোটগল্প সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। তৎকালীন আধুনিক সাহিত্যিকদের অনেকের লেখায় বাস্তবের নামে কৃত্রিম ভঙ্গির প্রাধান্য কবিকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল যে "দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্য সাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মশলার মতো ব্যবহার

করেন। এই ভাবুকতার কারি পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।" (সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে)। কিন্তু শৈলজানন্দের ছোটগল্পে তিনি এই 'নূতনত্বের ঝাঁজ' বা 'ভাবুকতার কারি পাউডারের' মিশ্রণ খুঁজে পান নি। বরং তাঁর মনে হয়েছে, 'দারিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেইসঙ্গে লেখবার শক্তি তার আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য-ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তার বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রা-পালায় এসে ঠেকে নি। তাঁর কলমে গ্রামের যে সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার ক্যারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তার মধ্যে দেখা দেয় নি।" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)।

শৈলজানন্দের সঠিক মূল্যায়ন যে এখানে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও সমস্যা এক। এই প্রশস্তিবাক্য শৈলজানন্দের ছোটগল্পের উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত, উপন্যাসের উদ্দেশ্যে নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্যে আধুনিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে শৈলজানন্দের ছোটগল্পের কথাই মনে পড়ে, তার উপন্যাসগুলিকে তিনিও তেমন গুরুত্ব দেন না। এই সমস্ত কারণেই শৈলজানন্দের উপন্যাস-সম্পর্কিত আলোচনায় প্রাথমিক ভাবে কিছুটা অসুবিধে বা অস্বস্তি হতেই পারে। অসুবিধের আর একটি কারণও আছে। উপন্যাসগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে পাঠকদের অনাগ্রহ এদের পুনর্মুদ্রণের সহায়ক হয় নি। তাই বেশিরভাগ উপন্যাসেরই এখন আর বাজারে সন্ধান পাওয়া যাবে না। সবগুলিই যে আলোচনার যোগ্য তাও নয়। আগেই বলা হয়েছে যে কতকগুলি উপন্যাস তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই রচিত। সেগুলির তেমন সাহিত্যিক-আবেদন আছে বলে মনেও হয় না। তাই মোটামুটিভাবে যেগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং যেগুলির মধ্যে অন্তত লেখককে কিছুটা খুঁজে পাওয়া গেছে সেগুলিই এই আলোচনার মুখ্য অবলম্বন।

[দুই]

শৈলজানন্দ 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখক বলেই সাধারণত পরিচিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মন্তব্য এইরকম ঃ "কল্লোলে আসব না?' শৈলজার দৃষ্টি উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঃ কল্লোলে না এসে পারি? আজকের দিনে যত নতুন লেখক আছে স্তব্ধ হয়ে, সবায়ের ভাষাই ঐ কল্লোল। সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, প্রাণের কল্লোল। বিধাতার আশীর্বাদে তাই সবাই একত্র হয়েছি। মিলেছি এক মানসতীর্থে। শুধু আমরা ক'জন নয়, আরো অনেক তীর্থংকর" (কল্লোল যুগ ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ই কল্লোলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের পরোক্ষ কারণ। তাঁরই আগ্রহে তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'র জন্য লেখা গল্প শৈলজানন্দ 'কল্লোলে' দিয়ে আসেন। কল্লোলের প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর সেই 'মা' গল্প বের হল। আর এর দৌলতেই তিনি 'কল্লোলে'র লেখক হয়ে গেলেন।

কল্লোলের আয়ু প্রায় সাত বছর। তার প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৩৩০ সালের বৈশাখে, আর শেষ সংখ্যার প্রকাশ ১৩৩৬ সালের পৌষে। সাত বছরে কল্লোলের মোট ৮১টি সংখ্যা বের হয়েছিল। এর মধ্যে শৈলজানন্দের লেখার সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়। তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস এখানে বের হয়েছে মাত্র দুটি ঃ 'পান্থবীণা'

এবং 'ডাকপিওন'। এর মধ্যে আবার 'ডাকপিওন'কে প্রথমে বড় গল্প বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, দু'তিন সংখ্যা বাদে এর পরিচয় দেওয়া হল উপন্যাস বলে। 'কল্লোলে' শৈলজানন্দ সাত বছরে গল্প লিখেছিলেন মোট পাঁচটি—মা, নারীর মন, মরণ-বরণ, শশীপণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী এবং অতসী। কোন হিসেবেই একাশিটি সংখ্যার পক্ষে এই লেখা খুব বেশি নয়। আসলে 'কল্লোলে'র সঙ্গে শেষ পর্যন্ত শৈলজানন্দের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসে 'কালিকলম' পত্রিকা বের হয়। এর সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং মুরলীধর বসু। শুধু তাই নয়, 'কালিকলমে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই শৈলজানন্দের উপন্যাস 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। উপন্যাসের পাশাপাশি প্রকাশিত হতে থাকে গল্প। যেমন প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় 'জোহানের বিহা' এবং দ্বিতীয় সংখ্যা বাদ দিয়ে তৃতীয় সংখ্যাতেই আবার 'সেয়ানে সেয়ানে'। একসঙ্গে এতো লেখা তার 'কল্লোলে'ও বের হয় নি।

'কল্লোলে'র প্রতি বিরূপ হয়ে শৈলজানন্দ এই পত্রিকা ত্যাগ করেছিলেন একথা বোধ হয় বলা ঠিক হবে না। অর্থের প্রয়োজনটাও বড় হয়ে উঠেছিল ঃ "কিন্তু প্রেমেন শৈলজার অর্থের প্রয়োজন তখন অত্যন্ত। তাই তারা ঠিক করলে আলাদা একটা কাগজ বের করবে। সেই কাগজে ব্যবস্থা করবে অর্থনাগমের। সঙ্গে সুমন্ত্র মুরলীধর বসু।" (কল্লোল যুগ) শৈলজানন্দ 'কালিকলমে' চলে যাবার পর মন কষাকষিও যে কিছুটা হয় নি তা নয়। 'কল্লোল যুগে' তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্যও আছে। 'কল্লোল' থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেন 'কালিকলম' বের করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাবে সেখানে, "কালিকলম বেরুবার পর বাইরে থেকে দেখতে গেলে, 'কল্লোলে'র সংহতিতে যেন চিড় খেল। প্রথমটা লেগেছিল তাই প্রায় প্রিয়-বিচ্ছেদের মত। একটু ভুল বোঝার ভেলকিও যে না ছিল তা নয়। কেউ কেউ এমন মনে করেছিল যে 'কল্লোলে'র রীতিমত লাভ হচ্ছে, দীনেশদা ইচ্ছে করেই মুনাফার ভাগ-বাঁটোয়ারা করছেন না।" তবে 'কালিকলম'ও বেশিদিন চলে নি। তাই শৈলজানন্দও শেষ পর্যন্ত তাঁর পুরনো পত্রিকাতেই ফিরে এসেছিলেন এবং আবার নতুন করে বেশ কিছু গল্প উপন্যাসও সেখানে লিখেছিলেন। এবং "একজন যথার্থ কল্লোলীয় হয়ে উঠেছেন। তিনি কল্লোলকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, কল্লোলও তাকে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা।" (কল্লোলের কাল, জীবেন্দ্র সিংহ রায়)।

কিন্তু সত্যই কি শৈলজানন্দ 'যথার্থ কল্লোলীয়' হয়ে উঠেছিলেন ? 'যথার্থ কল্লোলীয়' বলতে কি বোঝায় ? 'কল্লোল' বললেই বুঝতে পারি সেটা কি ? "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন", অথবা, "দারিদ্র্যজয়ী মুক্ত প্রাণের আনন্দ, বিরতিহীন সংগ্রাম ও দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজম্। সবই সেই কল্লোল যুগের লক্ষণ।" (কল্লোল যুগ)। এই সমস্ত বক্তব্য কল্লোলেরই প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকের। কিন্তু এখানে যত লক্ষণের কথাই বলা হোক না কেন ওই 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা' এবং 'দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজম্' এই দুটোই আসল কথা। কল্লোলের কয়েকজন বড়োমাপের লেখকের যে সমস্ত চিঠি বা মন্তব্যের অংশ

'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার প্রকাশ করেছেন তাতেও এই বক্তব্য সমর্থিত হয়। 'কালিকলম' পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার অভিযান সমর্থন করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি!" আর এই চিঠি পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা বিস্মিত হয়েই ভেবেছিলেন, 'হামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে?' কারণ, 'ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যা' কখনো এক হতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী কথাকারের তাই সুস্পষ্ট মন্তব্য, প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালিকলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।" (লেখকের কথা)।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে প্রকৃতই যিনি 'ভাবের আকাশের ঝড়'কে অস্বীকার করে 'মাটির পৃথিবীর জীবনের বন্যা'কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি শৈলজানন্দ, মধ্যবিত্তের যে রোমান্টিক ভাবাবেগ কল্লোলের অন্যতম প্রাণধর্ম তিনি তার থেকে সব সময়ই বহুদূরে। 'কয়লা কুঠি'র রচয়িতার পক্ষে-যে দায়িত্বহীন বোহিমিয়া-নিজ্‌ম্‌-এর স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় এটা জানা কথা। তাঁর মতো অভিজ্ঞতাই বা কজনের ছিল? "কয়লাকুঠির দেশে। কয়লা ভর্তি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সাইডিং-লাইনের ওপর। সেগুলো টেনে এনে জুড়তে হবে গাড়ির সঙ্গে। তারপর গাড়ি ছাড়বে। লাইনের ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা আম-কাঁঠালের বাগান। সেই বাগানেই একটা গাছের নিচে চট বিছিয়ে কতকগুলো লোক গানের আসর জমিয়েছে। হারমোনিয়াম বাজছে, ঢোল বাজছে, ঝুমুরের সুরে কবিগান হচ্ছে', অথবা, "সেই যে কবে কখন দেখেছি জোড়া তালগাছের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছিল, কুয়াশার মত জ্যোৎস্না নেমেছিল শালবনের পথের বাঁকে, সেই কোন্‌ শেয়াল-ডাকা প্রান্তর থেকে শুনেছিলাম সাওতালদের মাদলের আওয়াজ, আর পেয়েছিলাম মহুয়া ফুলের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ—যার কথা আমি আজও ভুলিনি।" (কেউ ভোলে না কেউ ভোলে)। এই দেখার চোখ আলাদা। এ বাইরে থেকে দেখা নয়, এ একেবারে গভীরে প্রবেশ করার অসাধারণ ক্ষমতা। আবাল্য-পরিচিত এই দেশ, এখানকার প্রকৃতি ও মানুষ বারবার তাঁর বিভিন্ন রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে।

[তিন]

আগেই বলা হয়েছে যে শৈলজানন্দের উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর অথচ তার অনেকগুলিই দুষ্প্রাপ্য। তাছাড়া এর বেশীর ভাগেরই তেমন গুরুত্ব নেই। বড় জোর এদের সুখপাঠ্য রচনা বলা চলে। তবে এদের মধ্যে যেগুলিকে কিছুটা উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় তাদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আর এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ সম্পর্কে একটা ধারণা মোটামুটি গড়ে নেওয়া সম্ভবপর। এর প্রায় সবগুলির মধ্যেই রাঢ় অঞ্চলের বিশেষ করে বর্ধমান জেলার রুখা অনুর্বর খনি অঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত বা দরিদ্র মানুষ এবং সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের জীবনচর্যার চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁর 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসটির আলোচনা করা যেতে পারে। এটি তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস নয়। বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে ১৩৬৫

বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই উপন্যাসটির মধ্যে ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। নামকরণের মধ্যেই উপন্যাসটির পটভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি এমন এক জায়গার কাহিনী যেখানে 'দূর থেকে দেখা যায়—মাঠের মাঝে যেখানে-সেখানে চিম্‌নির মাথায় কালো ধোঁয়া উঠছে, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লোহার তৈরি প্রকাণ্ড হেড্-গিয়ার। খাদের মুখ থেকে ডিপো পর্যন্ত ইস্পাতের লাইন পাতা। তারই ওপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে কয়লা-বোঝাই টব গাড়ী। শুধু পরিবেশ বর্ণনাতেই লেখক থেমে থাকেন নি। তিনি কয়লাশিল্প নির্ভর স্থানীয় অর্থনীতির সার্থক চিত্রটিও তুলে ধরেছেন, 'কিন্তু এখানকার সব-কিছুই যেন ওই কয়লার বাজারের সঙ্গে সমসূত্রে গাঁথা। কয়লার দাম যখন চড়ে, সকলের মুখে হাসি ফোটে। আবার দাম যখন পড়ে, চারিদিক মনে হয় যেন অন্ধকার।'

অবশ্য শেষপর্যন্ত উপন্যাস আর কয়লাকুঠি-নির্ভর থাকে না। শৈলজানন্দের উপন্যাস রচনার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে। কাহিনী অগ্রসর হতে হতে ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে অনেক চরিত্র ও ঘটনা উপন্যাসের মাঝামাঝি পর্বে ঢুকে পড়তে দেখা যায়। আলোচ্য উপন্যাসটিতেও ঠিক তাই ঘটেছে। প্রথমে কয়লাকুঠির দেশের বিস্তৃত বর্ণনা, তারপর কয়লার অর্থনীতি, তারপর সুলতানপুরের বনেদী মুখুয্যে বংশ এবং সবশেষে কয়লা-ব্যবসায়ে হঠাৎ-ধনী রাখাল চাটুয্যের ছেলে দেবু চাটুয্যের জীবন কাহিনীর অবতারণা। এই প্রসঙ্গেই উপন্যাসে মুখুয্যে বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী সীতারামের পরমাসুন্দরী কন্যা মালা এবং দেবু চাটুয্যের পুত্র রঞ্জনের কথা উপন্যাসে এসে পড়ে। আর শেষপর্যন্ত রঞ্জন এবং মালাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। উপন্যাসের কাহিনীর এই বুনোটের ফাঁকে ফাঁকে একসময় ভবঘুরে ইরানীদের মেয়ে চুমকিও এসে যায়। আর এই উপন্যাসে তাকে প্রতিনায়িকার ভূমিকাতেই দেখা যায়। তবে তার জীবনের ভালবাসার বা ঘরবাঁধার স্বপ্ন শেষপর্যন্ত সফল হয় না। ট্রেনের তলায় বোধহয় ইচ্ছে করেই সে কাটা পড়ে। তাই রঞ্জন এবং মালার মিলনের মধ্যেও যেন একটা দুঃখের ছোঁয়াচ থেকে যায়। উপন্যাসের কাহিনী বা এর পরিণতির মধ্যে কোথাও অভিনবত্ব নেই, চমকও নেই। কাহিনী ধরাবাঁধা পথ ধরেই এগোয়। তাছাড়া শৈলজানন্দের উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয় না। প্লটকে চালিত করবার তেমন শক্তি তাদের নেই, বরং প্লটই তাদের চালিত করে নিয়ে যায়। তাই বলা যায় এখানে কয়লাকুঠির পটভূমিকা নতুন ধরণের উপন্যাস রচনার যে সুযোগ এনে দিয়েছিল সম্ভবত লেখক তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি।

শুধু এই উপন্যাসেই নয়, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শৈলজানন্দের একেবারে প্রথমদিকে উপন্যাস 'হাসি'। এটি এতই প্রথমদিকের যে তখন তিনি শৈলজা মুখোপাধ্যায় নামেই লিখতেন, তখনও শৈলজানন্দ নামটি ব্যবহার করেন নি। এখানে কেবল একটি সহজ সরল কাহিনী রয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্রকর হিসেবে শৈলজানন্দের যে খ্যাতি এখানে তার কোন পরিচয় পাওয়া যাবে না। প্রশান্তর মা নিরাশ্রয় হয়ে একবছরের শিশুসন্তানকে নিয়ে ভ্রাতা অবিনাশ-বাবুর গৃহে আশ্রয় নেন। তারপর তার মৃত্যু হয়। অবিনাশবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা

ছিলেন নিঃসন্তান। প্রশান্ত ক্রমশ তার কাছে সন্তানের চেয়েও বেশী হয়ে ওঠে। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রশান্তর কলকাতা নিবাসী ধনী কাকা বিপিনবাবু তাকে পড়াশুনোর জন্য কলকাতায় নিয়ে যেতে চান। প্রশান্ত প্রথমে যেতে চায় না, অন্নপূর্ণাও প্রশান্তকে বিদায় দিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রশান্তেরই স্বার্থে তাকে কলকাতায় যেতে দিতে হয়। সেখানেও একই অবস্থা। বিপিনবাবুর স্ত্রী মনোরমাও নিঃসন্তান। তাঁর একটি কলঙ্কময় অতীত আছে। কিন্তু তিনি তা এখন ভুলে থাকতে চান। প্রশান্তের সামনে বিপিনবাবুর মদ খাওয়াতেও তাঁর ঘোরতর আপত্তি। প্রশান্তকে নিয়ে মনোরমা ও বিপিনবাবুর কলহ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁৗছোয় তখন অতিষ্ঠ হয়ে সে অন্নপূর্ণার কাছে চলে যেতে চায়। এই যাওয়ার পথেই বালিকা হাসির সঙ্গে তাব আলাপ। হাসির মা সরযূও তিনবছরের হাসিকে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। প্রথম দর্শনেই হাসি এবং তার মা দুজনেরই প্রশান্তকে ভালো লেগে যায়। তাদের অনুরোধে প্রশান্ত বেশ কিছুদিনের জন্য সেখানে থেকেও যায়।

এদিকে প্রশান্তর জন্য তার মামী অন্নপূর্ণা এবং কাকী মনোরমা উভয়েই ব্যাকুল। অবিনাশবাবু যখন ভাগ্নের সন্ধানে কলকাতায় আসেন তখন মনোরমা তাকে মিথ্যে করে বলেন যে প্রশান্ত বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে অবিনাশবাবু এবং অন্নপূর্ণা উভয়েই কাশী চলে যান। মনোরমার মানসিক অবস্থাও খারাপ হয়ে ওঠে। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের ভালোবেসেই তিনি প্রশান্তর অভাব ভুলতে চান। কাহিনীর আর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। তা অপ্রয়োজনীয়ও বটে। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে শেষপর্যন্ত অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে প্রশান্ত-হাসির মিলন ঘটে। মনোরমা এবং অন্নপূর্ণা দুজনই এই মিলনে সুখী হন। উপন্যাসটির এই ধরণের মিলনান্তক পরিণতি হল বটে কিন্তু পাঠকমনে এর কোন গভীব আবেদন আছে বলে মনে হয় না। এ যেন কেবল গতানুগতিক ভাবে পরপর অনেকগুলি ঘটনার বিবরণ দিযে যাওয়া। শৈলজানন্দেব উপন্যাস রচনার ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূল প্লটটি তিনি ধরে রাখতে পারেন না, মাঝে মাঝে এত বড় বড় সাব-প্লট উপন্যাসে জুড়ে দেন যার ফলে মূল প্লটটি ঢাকা পড়ে যায়। কাহিনীর মধ্যে তেমন প্রাসঙ্গিকতাও থাকে না। কোনো ঘটনা কেন ঘটছে, বা কোনো চরিত্রের কেন অবতারণা করা হল তাও সবসময় বোঝা যায় না। তাছাড়া চরিত্রগুলি সবই ফ্ল্যাট ধরণের চরিত্র, এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতও নেই। এই উপন্যাসে লেখক যদি কোন চরিত্রের ওপর বেশী জোর দিতে চেয়ে থাকেন সে হল মনোরমা। হাসির তেমন কোন ভূমিকা নেই। অথচ লেখক নামকরণ করে বসে আছেন 'হাসি'। উপন্যাসের শিল্পমূল্যের সার্থকতাও নেই, আবার এর নামকরণও অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়।

শৈলজানন্দের অধিকাংশ উপন্যাসেবই কাহিনী এই ধরণের। কাহিনীগুলি খুবই সাধারণ, চরিত্রগুলিও তাই। তবে তারা আমাদের অতিপরিচিত, তাদের সমস্যাগুলিও আমাদের জানা। চরিত্রগুলি বড়োমাপের না হওয়ায় তাদের সমস্যা বা সংকটও তেমন তীব্র হয় নি। এগুলি সত্যিই যেন 'ছোট প্রাণ ছোট কথা, ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা'-র সার্থক প্রকাশ। এর ফলেই আবার একটা প্রশংসার ব্যাপারও ঘটে। কোন চরিত্রকেই কৃত্রিম বা বানানো বলে মনে হয় না। যেমন ঘটেছে 'নন্দিনী' উপন্যাসে। এই বইতে

আবার দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাস রয়েছে 'নন্দিনী' ও 'জননী'। এক ধনী জমিদারের নন্দিনী মল্লিকাকে নিয়ে প্রথম উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। মল্লিকার বিয়ে হয়েছিল অতি সাধারণ ঘরে। তার স্বামী যোগীন যাত্রা করে বেড়ায়। তার একমাত্র লক্ষ্য হল স্ত্রীকে চাপ দিয়ে শ্বশুরের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব টাকা আদায় করা। টাকা না পেলেই অশান্তি। ইতিমধ্যে মল্লিকার একমাত্র ভাই মারা গেলে এই ভেবে যোগীন আরও উৎফুল্ল হয় যে এবার স্ত্রীর বকলমে সেই সমস্ত জমিদারীর মালিক হবে। কিন্তু মল্লিকার আবার একটি ভাই হয় আর যোগীনের ক্ষোভ আরও বাড়ে। সে মল্লিকাকে এমন প্রস্তাবও দেয় যে তার কাছে শিশুটিকে নিয়ে এলে তার টুঁটি টিপে মেরে সে নিজের পথ পরিষ্কার করে নেবে। তার মা সৌদামিনী আড়াল থেকে এই কথা শুনে ফেলে। মায়ের ভুল ধারণা হয় যে মেয়েও বোধ হয় এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মা ও মেয়ের মানসিক ব্যবধান ক্রমশই বাড়তে থাকে। মল্লিকাও কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে। এই ঘটনার প্রায় কুড়ি বছর পরে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে এক ঠাকুরবাড়ীতে বিধবা মল্লিকার সঙ্গে তার ছোট ভাইয়ের দেখা। জমিদারবাড়ির ছেলে সেই অঞ্চলে শিকার করতে এসেছে। সে তার দিদিকে চেনে না, দিদি তাকে চিনতে পারলেও পরিচয় দিতে চায় না। তার জীবনে এইভাবেই ব্যর্থতা নেমে আসে।

'জননী'র কাহিনীও এইরকমেরই সাদামাটা। এর ওপরে আবার কাহিনী সেখানে শৈলজানন্দীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে নানা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে। এমনভাবেই ছড়িয়েছে যে মূল কাহিনীটিকে শেষপর্যন্ত খুঁজে পাওয়াই ভার। এই উপন্যাসের নায়িকা শঙ্করী বাল্যকালেই মাতৃহারা, ধনী পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ার জন্য সে ছোটবেলা থেকেই আদরে ও প্রশ্রয়ে লালিত হয়েছে। তাতে সে হয়েছে যেমন অবাধ্য তেমনি দুরন্ত। ফলে ইচ্ছে না থাকলেও বাবা কেদারবাবুকে মাঝে মাঝে শাস্তিও দিতে হয়। মেয়ে বড় হওয়ায় কেদারবাবু তার বিয়ে দেন বটে কিন্তু শঙ্করী শ্বশুর বাড়ীতে মানিয়ে নিতে পারে না। আর কেদারবাবুও একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে থাকতে চায় না। শেষপর্যন্ত শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাই বিরক্ত হয়ে শঙ্করীকে চিরকালের মতো বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। তখন সে সন্তান-সম্ভবা। তার স্বামী অন্যত্র বিবাহ করেছে, কিন্তু তাতে তাকে বিচলিত হতে দেখা যায় নি। ইতিমধ্যে তার একটি মেয়ে হয়, তার নাম দেওয়া হয় অপর্ণা। যথারীতি এরপর উপন্যাসে শঙ্করী অপ্রধান হয়ে পড়ে, মেয়ে অপর্ণাই হয় প্রধান। প্রথমদিকে মায়ের মতোই তারও স্বামী বা শ্বশুর-বাড়ীর সঙ্গে তেমন বনিবনা হয় না। শঙ্করী নিজের জীবনের কথা ভেবে ভয় পায়, অবাধ্য মেয়েকে শাসন করবার চেষ্টা করে। শেষপর্যন্ত তার চেষ্টা সফল হয়। সে নিজের জীবনে যা পায় নি মেয়ে সেই ঘর ও সংসার পেল। শঙ্করীর জননী-সত্তাই শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে তাই উপন্যাসের নাম 'জননী'।

ইচ্ছে করেই শৈলজানন্দের কয়েকটি টিপিক্যাল উপন্যাসের বিষয়বস্তুর একটু বিশদ বর্ণনা দেওয়া হল। সতর্ক পাঠক এর মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দের সীমাবদ্ধতা খুঁজে পাবেন। জগৎ ও জীবনের বৃহৎ কোন সমস্যা তুলে ধরায় তিনি আগ্রহী নন। তাঁর চরিত্রেরা কোন অস্তিত্বের সংকটে ভোগে না অথবা কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক

সংঘাতেও তারা লিপ্ত নয়। তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্রেরা কেউ বিদ্রোহিনীও নয়। বরং নীরবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা বেদনা সহ্য করে যায়। এমনকি প্রায়ই তারা এমন সব সংকট বা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ায় যেগুলি তাদেরই সৃষ্টি। আবার তাঁর কোন কোন নায়িকা শরৎচন্দ্রের কথাই মনে করিয়ে দেবে। 'গঙ্গা-যমুনা' উপন্যাসে দুই সতীনের জীবনের সমস্যার যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাও শরৎচন্দ্রের কথাই মনে করিয়ে দেবে। এই উপন্যাসের পটভূমি, নারীচরিত্র বা তাদের সমস্যা সবই শরৎচন্দ্রীয়। সুদখোর মহাজন শ্রীপতি তার আগের স্ত্রী কুমুদিনী থাকা সত্ত্বেও কেবল পয়সার লোভে চারুকে বিয়ে করে আনে। প্রথমে চারুকে সে এড়িয়ে যেতে চায়, কিন্তু পরে কুমুদিনীকে বাদ দিয়ে চারুর প্রতিই সে মনোযোগ দিতে থাকে। কুমুদিনী এই অবহেলা যে কেবল নীরবে সহ্য করে তাই নয় চারুকে শ্রীপতির ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে কৃতার্থও বোধ করে। অপরদিকে চারুরও সতীনের প্রতি কোন ঈর্ষা নেই, কুমুদিনীর বেদনা সে হৃদয় দিয়েই উপলব্ধি করে আর কুমুদিনীকে সুখী করবার জন্যই যেন সে আত্মহত্যা করে। যে অকৃত্রিম বস্তুনিষ্ঠা ও জীবনবোধ শৈলজানন্দের ছোটগল্পগুলির সম্পদ এই ধরণের কোন উপন্যাসেই তা নেই। কুমুদিনী বা চারুর মতো নারীচরিত্র সস্তা ভাবালু রোমান্টিকতাকেই প্রশ্রয় দেয়, তাদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এই শৈলজানন্দই তাঁর অনেকগুলি ছোটগল্পে এমন কিছু বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী চরিত্র অঙ্কন করেছেন যারা জীবনরসে পরিপূর্ণ।

শৈলজানন্দের অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে আরো একটি সত্য পাঠকের চোখে ধরা পড়বে। বেশীরভাগ উপন্যাসেই জমিদারবাড়ীর অন্তঃপুরের সমস্যাকেই প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। অতি দরিদ্র কোন পরিবারের জীবন-কাহিনী সেখানে নেই বললেই চলে। অথচ শৈলজানন্দের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতটাই সত্য। এর সঠিক কারণটি ব্যাখ্যা করা না গেলেও কিছুটা অনুমানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। উপন্যাস তার স্বক্ষেত্র নয়, ছোটগল্পই স্বক্ষেত্র এমন কথা আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণটিকেও উপেক্ষা করা চলে না। শৈলজানন্দের কোন ধরা-বাঁধা চাকরি ছিল না। জীবিকার জন্য তিনি অনেক কিছুই করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ। তিনি কেবল কাহিনী এবং চিত্রনাট্য রচয়িতাই ছিলেন না, ছিলেন সফল চিত্র পরিচালক। 'শহর থেকে দূরে', 'নন্দিনী', 'অভিনয় নয়', 'মানে না মানা', প্রভৃতি সেই সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা ছবি। এই সমস্ত ছবির স্রষ্টা শৈলজানন্দের বাঙ্গালী দর্শক তথা পাঠকের চাহিদা এবং রুচির কথা জানা ছিল। অধিকাংশ উপন্যাসই তিনি রচনা করেছেন চলচ্চিত্রের কথা ভেবে, চিত্রনাট্যের ভঙ্গীতে। শৈলজানন্দের অধিকাংশ উপন্যাসের রচনাভঙ্গীই যে চিত্রনাট্য ধরণের এটাই তার অন্যতম কারণ। এই কারণেই সেখানে জটিলতা বা সংঘাতের কোন আভাস নেই। সমস্তটাই বর্ণনাধর্মী, সহজ সরল ভাষায় প্রতিটি চরিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা। বাঙ্গালী দর্শক ভাবপ্রবণ, মানবচরিত্রের আবেগ বা উচ্ছ্বাসের প্রকাশ তাদের তৃপ্ত করে। তাই শৈলজানন্দও সরল বর্ণনা ও আবেগের পথই গ্রহণ করেছেন। সামাজিক সংঘাত বা অর্থনৈতিক সমস্যার ছবি আঁকার দিকে পা বাড়ান নি। তাই তাঁর উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য ঠিকই, তবে তাদের বোধহয় সূক্ষ্মপাঠ্য বলা চলে না।

সমরেশ মজুমদার

মনোজ বসু : বৈচিত্র্যানুসন্ধানে মনোযোগী

'কল্লোল'-বৃত্তের অধিকাংশ লেখকের মতোই মনোজ বসুর লেখনী (১৯০১-৮৭) বহু রচনা প্রসবিণী। যদিও বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান তাঁর মধ্যে লভ্য। তাহলেও তাঁর রচনার মৌলভূমি গ্রামীণ বঙ্গপ্রকৃতি। সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, 'গতানুগতিক বিষয় নিয়ে লিখতে পারিনি। নতুন জিনিস ভাবতে চাই, নতুন পথে চলতে চাই'। তথাপি 'কল্লোলে'র লেখকগোষ্ঠীর শহুরে জীবন-ব্যাখ্যানের কালে তাঁর দৃষ্টি সীমায়িত থেকে ছিল গ্রাম্যজীবনেই। দীর্ঘকাল দক্ষিণ কোলকাতায় এক পরিচিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেও শহরকে নানান রূপে, রসে দেখবার ইচ্ছায় উদগ্র হয়ে ওঠেন নি। অচিন্ত্যকুমারের অভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন না জানিয়ে উপায় থাকে না, '... 'কল্লোল' যে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছে শহরের ইঁট-কাঠ লোহা-লক্কড়ের মধ্যে, মনোজ তাই খুঁজে পেয়েছে বনে-বাদায়, খালে-বিলে, পতিত-আবাদে। সভ্যতার কৃত্রিমতায় 'কল্লোল' দেখেছে মানুষের ট্রাজেডি, প্রকৃতির পরিবেশে মনোজ দেখেছে মানুষের স্বাভাবিকতা'। 'কল্লোল'-সমকালীন কল্লোলীয় নৈকট্যে থেকেও যাঁরা নিজেদের সৃষ্ট পথ কেটে চলেছেন, সেই তারাশংকর, বিভূতিভূষণ অথবা সরোজকুমার খুব বেশি করে জেনেছিলেন প্রকৃত ভারতবর্ষের আসল চেহারার গ্রাম্যভূমিকে, মনোজ বসু তাঁদেরই সগোত্র হয়ে তিল তিল করে বর্ণনা করেছেন বঙ্গভূমির প্রাচীন জীবনধারাকে। তথাপি তারাশঙ্করের নির্মম-জীবনদৃষ্টি, বিভূতিভূষণের অতিপরিচিত সহজ-সারল্যে আবৃত প্রাত্যহিকতা বা সরোজকুমারের তৃণাদপি সুনীচেন উদাস-করা বাউল-মন মনোজ বসুর মধ্যে অন্বেষণ বৃথা। বীরভূমের রুদ্র-ভৈরবের মধ্যে বৈষ্ণবীয় আখড়ার রস-আপ্লুত মানসিকতা যেমন তারাশঙ্করের মধ্যে যুক্ত বেণীর বন্ধন এনে দিয়েছিল, অপর পক্ষে 'নতুন-ফসলে'র স্নিগ্ধ মোহাঞ্জনের মধ্যে 'কালোঘোড়া'র দ্রুতগামী দুর্বার স্রোতোধারা যেমন বৈচিত্র্যের সাক্ষ্যবহনকারী, সেইরকম ভাবেই হয়তো বা মনোজ বসু বন-বাদার মধ্যে, 'জলজঙ্গলে' 'বন কেটে বসত' বানাবার উদ্দামতার মধ্যে 'নিশিকুটুম্ব'-দের ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন, 'রূপবতী'দের করুণ-ভবিষ্যতের জন্য অধীর বেদনার অশ্রু বিসর্জন করেছেন, 'মানুষ নামক জন্তু'র পাশাপাশি 'মানুষ গড়ার কারিগরদের হীন-দারিদ্র্যবেষ্টিত জীবনস্রোতের উৎসমুখ খুলে দিয়েছেন অগণন পাঠকের কাছে। এই ভিন্ন খাতে অগ্রসর হবার কথা মনে রেখেও নিশ্চিত এই প্রতীতিতে পৌঁছন যায় যে মনোজ বসু তাঁর রচনায় যত স্বস্তি, যত নিশ্চিতি পেয়েছেন বনজঙ্গলে, অতখানি অন্যত্র নয়। সুন্দরবন বা দক্ষিণবঙ্গ বা বঙ্গসাহিত্যের রথী-মহারথীদের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল, তার অপরূপ স্রষ্টা বা রূপকারের ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। সিদ্ধি ও সার্থকতার মুখ যে দেখেছিলেন তার তুলনা আজকের বঙ্গসাহিত্যেও দুর্লভ। রাঢ় বা উত্তরবঙ্গ কিংবা পূর্ববঙ্গের জীবনের বর্ণনায় পারদর্শী ব্যক্তিত্বের অভাব বাংলাসাহিত্যে

ঘটেনি, কিন্তু প্রায় অচেনা দক্ষিণবঙ্গকে একান্ত ভাবে চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবাসীমাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তিনি।

বীরভূমে পল্লী-সম্পদ রক্ষা সমিতি গঠিত হলে গুরুসদয় দত্ত তার সভাপতি হলেন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হলেন মনোজ বসু জসীমউদ্দিনের সঙ্গে। কেবলমাত্র এই সংগঠনের জন্যেই নয়, গ্রাম-বাংলার পরিবেশ তাঁকে গভীর ভাবে অভিভূত করে রেখেছিল, বাংলার পথ ঘাটে, ইট-পাথরের শুকনো ডাঙা থেকে ডুব-সাঁতারে চলে যেতেন জীবনের রস-প্রাচুর্যের অসীম পারাপারে। মাটি মানুষের কাছাকাছি এলে শহুরে জীবনের ক্লেদ মুছে যেত তাঁর। তাই তো অকপটে জানিয়েছেন '··· গ্রামকে আগে চেনা দরকার, আমাদের দেশের মানুষ গ্রামে গ্রামে ছড়ানো। তাদের বাদ দিয়ে কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না'। তাঁর স্বীকারোক্তি মনে রাখলে তাঁর সাহিত্যিক ভূ-মণ্ডলটি দৃষ্টির বাইরে থাকে না, 'পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বাড়ির সামনে বিল। ছেলে বয়স থেকে ঋতুতে ঋতুতে বিলের রূপ বদলানো দেখেছি। চৈত্র-বৈশাখে ক্রোশের পর ক্রোশ ধু-ধু করে। রাত্রিবেলা বাইরের উঠানে দাঁড়িয়ে দেখতাম, দূরে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। ··· এই ভয়ঙ্কর বিল বর্ষায় সহজ সজল-স্নিগ্ধ। দিগন্তব্যাপ্ত ধানক্ষেত আলের প্রান্ত শ্যাপলা আর কলমিফুলে আলো হয়ে যায়। আল পেরিয়ে জলস্রোত বয়ে চলে, নৌকা-ডোঙা অবিরাম ছুটোছুটি করে। আবার প্রথম শীতে পাকা ধানে বিলের গেরুয়া রং। বাঁক বোঝাই ভারে ভারে ধান নিয়ে আসছে, ঘরে ঘরে পাল-পার্বন ভাসান-কবি-যাত্রাগান·'। এই বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষদের নিয়েই মনোজ বসুর সাহিত্যের সংসার। বস্তুত একই বিষয় ও পরিবেশ বারংবার চিত্রিত করতে এক জাতীয় একঘেয়েমি ও পুনরুক্তি এসে যেতে বাধ্য—একই বৃত্তে পাক খেতে অনীহা আসাও স্বাভাবিক। কারণ যা-ই হোক্ বিষয়ের অভিনবত্বে মনোযোগী হয়েছেন লেখক, তবু 'নিশিকুটুম্ব', 'রূপবতী', 'আমি সম্রাট', 'নবীনযাত্রা' 'সাজ বদল' প্রভৃতি ভিন্ন স্বাদের রচনায় হস্তক্ষেপ করেও তাঁর প্রিয় চরিত্রসমূহকে দাঁড় করিয়েছেন গ্রাম্য-পটভূমিকায়। 'নবীনযাত্রা'-র অমূল্য বা নির্মল, 'রূপবতী'-র মনোরমা-রাধারাণী, 'সাজবদলে'র কাঞ্চন-নিরঞ্জন, 'নিশিকুটুম্বে'র সাহেব-পচা বাইটা-নফরকেষ্ট এসকলের জীবনাচরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও এসে দাঁড়ায় উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে। কোলকাতায় বসবাসকারী মামা জগন্নাথের আশ্রম থেকে কাঞ্চন আসে দুধসর গ্রামে, কালিঘাটের ইতর-পাড়া থেকে নানান গ্রামগঞ্জে সাহেব, ইন্দ্রাণী বা অশোক শ্রীপঞ্চমীর উৎসবোপলক্ষে এসে জোটেন গাছ-মাটির শ্যামলিমায় ঘেরা পল্লী প্রকৃতিতে। 'সেতুবন্ধ' উপন্যাসের অনীতা শহরের এবং পিতার অগাধ প্রাচুর্যের হাতছানি সামান্য মেনে হাঁসপুকুর জঙ্গিপাড়া বা সোনারপুরে মিহিরের বাড়ি বা আস্তানায় নিজেকে সমর্পণের তাগিদেই আসতে বাধ্য হয়। মনোজ বসুর সৃষ্ট চরিত্রের অমোঘ নিয়তি গ্রাম্য-সমাজেই সমবেত হতে সাহায্য করে।

মনোজ বসুর সাহিত্যিক জীবনের ঈপ্সিত সাধনা—মাটি-প্রকৃতি-মানুষের, সেই মানুষেরা যারা মাটির বড়ো কাছাকাছি, যারা দেশমাতৃকার শৃংখলমোচনের জন্য

অঙ্গীকারবন্ধ—প্রথম শ্রেণীভুক্ত মানুষেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—বনে-বাদায় —সুন্দরবনের মাটির মধ্যে যারা আত্মলীন। এক অর্থে এ-সকল মানুষেরা অঞ্চল-কেন্দ্রিক, সেই সূত্রে মনোজ বসুর রচনার বৃহত্তর অংশ আঞ্চলিকতা-কেন্দ্রিক। শৈলজানন্দ যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, যাকে বাড়িয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর, যে কারণে পৃথিবীর যে কোনো আঞ্চলিক লেখকদের একই পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য তিনি, অঞ্চল তার নানাবিধ আঙ্গিক প্রবণতা নিয়ে উপস্থিত থেকেও তারাশঙ্কর অঞ্চলের ঊর্ধ্বে চিরন্তনকালের অমর সৃষ্টির মহিমায় সমুজ্জ্বল থেকেছেন, শৈলজানন্দ তার উদ্বোধক হলেও সেই উচ্চতায় উঠতে পারেন নি—লক্ষণীয়, এই উভয়েই বীরভূম নামক একটি ভূখণ্ডের আঞ্চলিকতায় নিজেদের উজার করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত মনোজ বসু একেবারেই নোতুন দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলেছেন, এ অর্থে তিনি এ যাবৎ একক ও অদ্বিতীয়। সিদ্ধি কতখানি এসেছে, সেটা প্রশ্নাতীত না হলেও একক পথযাত্রী হিসেবে তিনি স্মর্তব্য। লেখকের জীবনে একটি বিস্তৃত অধ্যায় কেটেছে এতদঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ থাকার মধ্য দিয়ে। নিজের জীবনকথা বিবৃত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয় কাঠ কাটতে মধু ভাঙতে জীবিকার শতবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায়। বাঘ-কুমির-সাপের কবলে পড়ে—তার মধ্যে কত জনে আর ফেরে না। জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, বনবিবি ও বাঘের সওয়ার গাদিকালুর রাজ্য রহস্যময় সুন্দরবন ছোটবেলা থেকে আকর্ষণ করত'। সুন্দরবন নিয়ে লেখা দুটি উপন্যাস 'জলজঙ্গল' ও 'বন কেটে বসত' ও অনেকগুলো গল্প লেখবার সময় তার কোনো কোনো অংশ খালের ওপর নৌকোয় বসে লিখেছেন। মানুষের জীবিকার অন্বেষণে শুধু 'বন কেটে বসত' নয়, দুর্গম, নানান হিংস্র জন্তুর উদ্যত নখর উপেক্ষা করে যেতে হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়, লবণাক্ত ভূমিতে আবাদের সূচনা, মৎস্যজীবীদের অনিকেত জীবন ও কঠিন জীবন-সংগ্রাম নিপুণ ও বাস্তবসম্মত লেখনীতে ধরা পড়েছে। তাই মানুষকে লেখক দেখেছেন বিশাল উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে, মাথার ওপরে আকাশের বিস্তার, নিচে বনবাদা শ্যামল শস্যের আবাদের অপেক্ষার ভূমি—মানুষের বেঁচে থাকবার রসদ। উদ্বেগপূর্ণ অনিশ্চিত জীবন তবু প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের অন্বেষণে মানুষের চলার শেষ নেই। 'কল্লোল' যে অপজাতদের পিছু ধাওয়া করবার শপথ নিয়েছিল, তার অনেকটাই স্বাভাবিক কারণে মনোজ বসুর সাহিত্যিক জীবন অন্বেষণ করলে অনুভব করা যায়। জীবনের বহুকাল শহরে বসবাস করেও সেই কারণে শহুরে জীবনের প্রতি লেখকের বীতরাগের অভাব ঘটেনি। 'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসের চিরকাল শহরে বসবাসকারী নায়ক বিরাটগড়ে কিছুকাল বাস করবার পর বলে : 'পুজোর সময় কলতাকায় কাটিয়ে এলাম কয়েকটা দিন। কী আশ্চর্য, এ আমার কেমন হল, এত পেয়ারের শহর এখন যে একটা দিনেই হাঁফ ধরে আসে। সারবন্দি যত ইঁটের খাঁচা, পোকা-মাকড়ের মত মানুষ তার মধ্যে কিলবিল করে। খটখটে বাঁধা রাস্তাগুলো জুতোর তলায় যেন মুগুর মারছে প্রতি পদে। বিশ্রী, বিশ্রী।' 'গল্প লেখার গল্প' সিরিজে তিনি লিখছেন, 'কলকাতায় থাকি, কলেজের পড়া সমাধা

হয়ে এসেছে। শহুর-রাজ্যের ভিতর অহরহ গ্রাম আমাকে আবিষ্ট করে রাখত। ছেলেবেলা বয়স থেকে ঋতুতে ঋতুতে বিলের রূপ বদলানো দেখেছি, চৈত্র-বৈশাখে ক্রোশের পর ক্রোশ ধূ-ধূ করে। আলেয়া নাকি ওগুলো। কল্পনা করতাম, কালো কালো জন্তু অতিকায় জীব বিলের অন্ধকারে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে শিকার ধরবার আশায়।' এর বর্ষার নয়নাভিরাম রূপ, প্রথম শীতে পাকা ধানে বিলের গেরুয়া রং-ও তাঁকে আবিষ্ট করত। তাই 'বন কেটে বসত' উপন্যাসে মনোহর ডাক্তার প্রশ্ন করেছেন, 'বলি আছে কি শহরে ? গাদা গাদা পোড়া ইট —রসকষ যা কিছু হাজার লক্ষ মানুষ আগেভাগে শুষে মেরে দিয়েছে'। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসটি ভিন্ন স্বাদের—সামন্ততান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় মনুষ্যত্ব কীভাবে ভেঙে চুরে যায় তারই আখ্যান সেটি। তবু এ উপন্যাসের শুরুতে লেখকের প্রকৃতি প্রেমের আরেক সুন্দর নিদর্শন ধরা পড়েছে, ' জনহীন ছায়াহীন দিগন্তবিসারী এক বালুক্ষেত। তারই কিনারে উন্মুক্ত আকাশের নিচে না জানি এতক্ষণ মালঞ্চ নদীর খেলাই জমিয়া আসিল !··· বাঁধের খোলে মাছের আবাদ, জলের তুফান। মানুষজন নাই একটা, টিলার উপর কেবল অনেকগুলো ভিটা —'। 'বন কেটে বসত' উপন্যাসের এক জায়গায় 'ভাঁটার টান শেষ হইয়া ঘোলা জল থমকিয়া দাঁড়ায়, জেলেরা জাল তুলিয়া লণ্ঠনের আলোয় বাঁধের পথে ঘরে ফিরে, আবছা অন্ধকারে আকাশভরা তারা ঝিকমিক করে। ওপারে নির্জন নিঃশব্দ দিগন্ত-বিসারী মাঠ, এপারে ঢালি পাড়ার শত শত খেলোয়াড় বাবলা-বন। ঠিক এই সময়টা শান্ত অবসন্ন নদী শিথিল দেহ এলাইয়া যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। খড়ের নৌকা, ধানের নৌকা পূবদেশি ব্যাপারিরা লঙ্কা-হলুদের নৌকা সমস্ত সারি সারি নোঙর ফেলিয়া বালুতটে মাথা রাখিয়া ঘুমায়। দিনের আলোয় যে মরদগুলোর লম্বা পাকা লাঠি মাটির দাওয়ায় কাঠির মাদুরের উপর অসহায়ের মতো তারাও পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। হয়তো হঠাৎ অনেক দূরে হইতে অস্পষ্ট একটা কুকুরের ডাক আসে, বোঁ করিয়া আকাশে একটা উল্কা ছুটিয়া যায়, এক ঝলক শীতল নৈশ বাতাস ঘুমের মধ্যে একেবারে পাশমোড়া দিয়া জাগিয়া উঠে'।

সুন্দরবনের প্রকৃতির মধ্যে স্থাপিত উপন্যাসসমূহের অন্তর্গত 'জলজঙ্গল' উপন্যাসটি মনোজ-সাহিত্যে নানা কারণে বিশিষ্ট। এ-উপন্যাসের 'বাদাবনের বাঘ হল কেতুচরণ'। অন্য এক কেতুচরণকে দেখতে পাওয়া যায় 'বন কেটে বসত' উপন্যাসে, সে হলো জগন্নাথ। সে-ও বাদাবনের প্রকৃতির মধ্য থেকে যেন আবির্ভূত হয়েছে, প্রকৃতি মানবে মিলিত না হলে যে পরিপূর্ণতার সাক্ষাৎ মেলে না, জগন্নাথকে দেখলে সে কথা মনে হয়। 'জলজঙ্গল' প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'জলজঙ্গলে এই সুন্দরবনের বাদাবনের হাসি-কান্না আর সংগ্রামের কাহিনী লিখেছি। মাটি জল আর মানুষ সব একাকার। এই উপন্যাসটিতে জল ও জঙ্গল আর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী একাত্ম হয়ে গেছে'। পরিবেশের অমোঘত্ব স্বীকার করে নিয়েও মানুষকে কেবলমাত্র প্রকৃতির দাসে পরিণত করা হয় নি, মানবজীবন যে বহুতর বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে আপন মহিমা প্রকাশে পারঙ্গম একথা লেখক কখনো ভুলে যান নি। বর্নাবিলাস

অধিষ্ঠান যত বড়ো হয়েই দেখা দিক না কেন, মানুষের জীবনসংগ্রামের বিচিত্র স্রোতোধারা অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। দুর্জয়, মধুসূদন, উমেশ, কেতুচরণ, এলোকেশী সব-সব ভূমিকায় যথার্থরূপেই চিত্রিত। মধুসূদনের দম্ভ ভেঙে প্রকৃতি নির্বিকার আপন স্বভাব প্রদর্শনেও একধরনের নির্বিকারত্ব প্রদর্শন করিয়েছেন উপন্যাসকার। 'সেই তিনি (মধুসূদন) সংকল্প করেছিলেন, বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত অবধি গাছের একটি সবুজ রেখা খাড়া থাকতে দেবেন না —কিন্তু মানুষের ইচ্ছার সর্বময়ত্ব কোথায়? নদী-সমুদ্র কবে অবহেলায় উচ্ছিষ্ট ত্যাগ করে যাবে, সেই দিন অবধি অপেক্ষা না করে উপায় নেই। পোকামাকড়ের বাড়বৃদ্ধি হয় উচ্ছিষ্ট আবর্জনায় —মানুষের বেলাতেও তাই। এতেই অসহায় ও অকর্মন্য তাঁরা জল-জঙ্গলের কাছে'। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপলব্ধি যথার্থ বলেই মনে হয়, 'মধুসূদন অরণ্যরাজের মানব-প্রতিযোগীরূপে প্রকাশিত—তাহার মধ্যে এক প্রকারের স্বভাব, মহিমা, দৃপ্ত মর্যাদাবোধ ও অন্তঃপ্রকৃতির দুর্নিবার আকর্ষণ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত দুর্জয় সংকল্পের মর্মান্তিক পরিণতি, তাহার কল্প-সৌধের ভূমি-সমাধি তাহাকে ট্রাজিক চরিত্রের গৌরব মণ্ডিত করিয়াছে'। এলোকেশীর জীবনের দুর্মর ইচ্ছা ও অভিলাষ কীভাবে প্রতিহত হচ্ছে তা নিপুণ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন মনোজ বসু। কেতুকে মাঝখানে রেখে তার প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি রেখে মধুসূদনের কাছে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে 'বাদাবনের বাঘ' সেই কেতুচরণের কাছেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। প্রকৃতির অমোঘ রূপের পাশাপাশি মানুষের জীবনের অনিবার্য নিয়তি অনায়াস-পটুত্বে দেখিয়ে লেখক পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদকের সমালোচনা ভবানী মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকেই উদ্ধৃতি যোগ্য: **'The story is laid in Sunderbans—that one hundred fifty mile stretch of swampy forest where the Ganges and the Brahmaputra meet the sea—an area of treacherous bears, storms, forest wild-life, and simple village folk such as these. Excellent story telling with religious and comual subtleties'**—সামগ্রিক বিচারের পক্ষে সমালোচিত অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মনোজ বসুর রচনায় মানুষ ও প্রকৃতি সহবস্থানের সঙ্গে বিভূতিভূষণের বহু উপন্যাস, বিশেষত 'আরণ্যকে'র নৈকট্য অনুভব করা যায়। 'আরণ্যক' এক কথায় **'A novel on forests'**; 'জলজঙ্গল' বা 'বন কেটে বসত' 'সেই গ্রাম সেই সব মানুষ' উভয়ের নৈকট্যের সংবাদও বহন করে। 'আরণ্যকে' নানা কারণেই বিভূতিভূষণকে ফতোয়া জারি করতে হয়েছে, 'ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে, উপন্যাস'। 'আরণ্যক' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক আদিম ও বিশাল আরণ্যক প্রকৃতি'—তবে মনোজ বসুর রচনায় বনবাদায় মানুষের যে দুঃসহ সংগ্রাম, বেঁচে থাকবার যে শ্রম ও প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার যে প্রচেষ্টা, তা বিভূতিভূষণের রচনায় নেই। মনোজ বসুর দক্ষিণ বঙ্গের আরণ্যক পরিবেশ কোমল,

সেক্সপীয়র-কথিত শত্রুবিহীন শুধু শৈত্যের তীব্রতা একমাত্র হয়ে দেখা দেয়নি। নিয়ত উদ্বেগপূর্ণ নিত্যদিনের গ্লানিমাখা সংগ্রামের শপথে জলজঙ্গলের মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। নিজের জীবনের কথা প্রসঙ্গে লেখকের কথাগুলি এ-ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিবৃতি বলেই মনে করা যায়, 'বরাবর আমি অবিচার দেখে বিচলিত হয়ে উঠেছি। প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছি, যদি সৈনিক হতাম তালে মেসিনগান নিয়ে ছুটতাম, চাষী-মজুর হলে ঘরে ফিরে এসে নিষ্ফল আক্রোশে নিরীহ বউকে ধরে ঠেঙাতাম, আর অসহায় অজ্ঞান শিশু হলে হয়ত কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম'। এক্ষেত্রে প্রকৃতির একাধিপত্যের মধ্যে মানুষের একান্ত নিশ্চিতি না দেখে নিরন্তন টিঁকে থাকবার যন্ত্রণার ধ্বনি মনোজ বসুর রসনায় অহরহ শুনতে পাওয়া যায়। এই প্রকৃতি যে কঠোর, তেমনি সেখানে বেঁচে থাকাও কষ্টকর, মধু সংগ্রহের কারণেই হোক্, বন কেটে বসত বানাবার প্রচেষ্টার মধ্যেই হোক্, দূর সমুদ্রের কাছাকাছি মৎস্য-সংগ্রহের দুরপনেয় অভিযানের মধ্য দিয়েই হোক্, প্রতিমুহূর্তের নির্মম শ্রমের বিনিময়ে যে বেঁচে থাকতে হয়, এই দিকটিই স্পষ্ট ও একমাত্র হয়ে উঠেছে।

মনোজ বসুর উপন্যাসের দীর্ঘতর অধ্যায় এ-দেশে মাটি মানুষের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষায় অধীর দিনগুলিতে পরিপূর্ণ। নিজ জবানীতে যদিচ তিনি জানিয়েছেন দেশ-স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নিজেকে আর সংযোজিত করেন নি, তথাপি দেশপ্রেমিক ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদের অভাবে বিচলিত হয়েছেন, নিঃশেষে প্রাণ যাঁরা দান করে গেছেন স্বাধীনতার জন্যে, স্বাধীনতার ফল-ভোগীরা সেই স্বাধীনতাকে যে জায়গায় এনে উপস্থাপিত করেছে, তা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। ইংরেজ আমলের শেষ প্রহরে ছিল দ্বি-জাতিত্বের অভিশাপ, পরবর্তীকালে তা ক্ষমতালোভীদের উদ্গত নখরে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। আজীবন দেশপ্রেমী মনোজ বসু স্বল্পকালের জন্যে কাছে পাওয়া বাবা রামলাল বসুর কাছ থেকে মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের বৃহত্তর উৎসবে অংশগ্রহণকারী পিতার উত্তরাধিকার বহন করেছেন। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে গুরুসদয় দত্ত ও জসীমউদ্দিনের সহযোগে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কথা। অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকেই গান্ধীজির ডাকে ছাত্রাবস্থায় দেশপ্রেমের জোয়ারে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তথাপি সশস্ত্র বিপ্লবী, গুপ্তসমিতি —এদের থেকে নিজেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন রাখেন নি। 'ভুলি নাই', 'সৈনিক', 'বাঁশের কেল্লা', 'পথ কে রুখবে' সরাসরি তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফসলে ভরপুর, কিন্তু এর বাইরেও অপরাপর অনেক উপন্যাসে প্রসঙ্গত দেশপ্রেমের প্রভাব ও স্বাধীনতার পরম সিদ্ধি কী হতে পারে তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 'সেতুবন্ধ' উপন্যাসে শিশিরের মামা অবিনাশ মজুমদারের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায় স্বাধীনতা-উত্তরকালে কী দুর্দশা ঘটেছে এতো কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতার। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় যেমন অনুপমের ('সৈনিক') মতো চরিত্রের অভাব ছিল না, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর কত শত অনুপমের সৃষ্টি হয়েছে। অবিনাশ মজুমদারের মতো নির্লোভ স্বদেশপ্রেমী দেখছেন,

'স্বাধীনতার মজা লুটছে ধূর্ত শয়তান হাজার-কয়েক মানুষ, শ' কয়েক পরিবার। মচ্ছবে আমরা সব বাদ। উল্টে ঘরবাড়ি মান ইজ্জত কেড়ে নিয়ে ভিখারি বানিয়ে পথে তুলে দিয়েছে আমাদের'। এক সময় স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্যে আমরণ তপস্যা করেছেন, আজ তাঁর উপলব্ধি, 'স্বাধীনতা লোভে একদিন ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে ফেরারি জন্তু জানোয়ারের জীবন নিয়েছিলাম, এবারে কোন দিন শুনবেন সেই মানুষ স্বাধীনতার ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিয়ে মবে আছে'। স্বাধীনতা-প্রত্যাশী তরুণ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি তাঁকেই আজ বিব্রত করে, 'হেরোডোটাস্ ফিনিক্স পাখির কথা লিখে গেছেন। পাঁচশ বছর অন্তর আগুনে পুড়িয়ে ফেলে ছাইয়ের মধ্য থেকে উজ্জ্বল নতুন দেহে বেরিয়ে আসে। সে বুঝি তারাই'। প্রথম পর্বের দেশপ্রেমমূলক উপন্যাসের মধ্যে উজ্জ্বলতম চরিত্র পান্নালাল, কুন্তলদের মনে পড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে জেলবাস, তারপর ফিরে এসে শত-সহস্র বিজয়দের দেখে তার প্রশ্ন তীব্র আঘাত হানে, ' কি শহর দেখে গেছলাম, আর ফিরে এলাম এ কোথায় ? কর্তাদের বলতে ইচ্ছে করে, যেখানে গ্রেপ্তার করেছিলে, সেইখানে পেঁছে দাও আমায়'।

মনোজ বসুর প্রার্থিত চরিত্র এ-জাতীয় আকাঙ্ক্ষার কথা উচ্চারণ করতেই পারে। বাবার কাছে পাওয়া দীক্ষা তাঁর সমগ্র ছাত্র-জীবন পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল। তাঁর উক্তি তুলে ধরা যায়, 'ছাত্র-জীবনে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলেজ ছেড়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়েছি। দোরে দোরে খদ্দর ফিরি করে বেড়িয়েছি কতদিন। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে কিছু কিছু সক্রিয় কাজকর্ম করেছি । সেইকালে যে কিভাবে দিন কেটেছে, সে কথা ভাবলেও বিস্ময় জাগে। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হল, দেশের শাসনভার হাতে এল রাজনৈতিক নেতাদের, সেই সময় থেকেই রাজনীতির সংস্পর্শ একেবারে ছেড়েছি'। সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি এক ধরণের গভীর আনুগত্য থেকেও মহাত্মাজির প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা, মহাত্মাজি দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় কংগ্রেসের কাজ সমাপ্ত হল বলে স্বীকার করে নিতে বলেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরবার আগেকার কংগ্রেসী গঠনতন্ত্র ও ইতিহাস তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি জানতেন যে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল এক অর্থে ইংরেজের মিত্র রূপে, তাই একসময় ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে হয় মৃত্যু, নয় স্বাধীনতার শপথবাক্যে পরিণত হবে। থোরোর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন গান্ধিজি, তার প্রয়োগ অনেকখানি সাফল্যও এনেছিল এ-দেশে, কিন্তু একদিকে সন্ত্রাসবাদ, অন্যদিকে ইংরেজের দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতি সেই সমবেত প্রচেষ্টাকে খন্ড বিখন্ড করে তুলেছিল। এই দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে মনে পড়তে বাধ্য মনোজ বসুর আরেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মানুষ নামক জন্তু'র কাহিনীর একাংশ, তারার বিয়ে, বাঁশবাগানটা ছাড়িয়ে জবেদের বাড়ির কাঁটালতলায় আমিনুর ঠোঁট ফুলিয়ে আছে : 'তারার সাদি হচ্ছে, এতো আলো আজ তারাদের বাড়ি, এত মানুষের আনাগোনা —আমায় একটি বার যেতে বললে না। আর কথা বলব তারার সঙ্গে, কোন দিনও না।

অবোধ বলে, আমাদের দাওয়াত করবে? আমরা মোছলমান। আর কল্লোই বা হিঁদুর বাড়ি যাব কেন!

অবোধ চোখ দুটি মেলে নূর বলে, মোছলমান কি আব্বা?

জাত।

আর হিঁদু

সে-ও জাত

জাতের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে না ছেলের।

মনোজ বসুর স্বাধীনতা প্রেমের কোনো দল-মতের মধ্যেকার প্রেরণা নেই, পরাধীনতার জ্বালাই সেখানে বড়ো। বস্তুত তখনকার কংগ্রেস তো কোনো দল নয়, একটি মঞ্চ, আর গান্ধিজি? স্বীকার করায় কোনো কুণ্ঠার কারণ থাকতে পারে না, আসমুদ্রহিমাচলে জনগণেশের এক অবিসংবাদিত অথবা চিরকালের সর্বজনগ্রাহ্য একক সেনানী, কোনো ডাক শোনার অপেক্ষা না করে একা চলেছেন, একাই বা কেন, রাজনৈতিক নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও অগণন জনতা তাঁর সঙ্গী হয়েছেন, সেই মহাযজ্ঞে দেশপ্রেমিক মনোজ বসুই বা বিচ্ছিন্ন থাকেন কী করে? তাঁর কলেজেব অধ্যক্ষ দৌলতপুরে বিপ্লবী সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, সেই সূত্রে বিপ্লবীরাও তাঁর নিকট আত্মীয়। 'ভুলি নাই' উপন্যাসের জন্মের পেছনে এই বিপ্লবী সংগঠনের অবদান কোন অংশ কম ছিল না। তবে ভারতবর্ষের মুখ্যত শ্যামল-সতেজ নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় অহিংস সত্যাদর্শ বেশি আকর্ষণের বিষয় ছিল। আবার গান্ধিজির আন্দোলনের পেছনে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা প্রেরণার উৎস হয়ে থেকেছে। 'The South African experience (1893-1914) contributed in a number of different ways to the foundations of Gandhi's ideology and methods, as well as to his later achievements in India'। বিদ্রোহের নোতুন দিগন্তের সূচনা হলো। সমগ্র দেশ হলো তাতে মাতোয়ারা, সেই মহাযজ্ঞের অন্যতম যাজ্ঞিক হিসেবে মনোজ বসু তিল তিল করে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। সাহিত্য রচনার প্রথম পর্বেই স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বেল মানুষের জীবন কথা রচনা করলেন। এতে স্থান পেল অহিংস-সহিংস উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাই—স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ই যেখানে লক্ষ্য, মত ও পথের পার্থক্য সেখানে লেখকের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয় নি। স্বরাজের স্বপ্নসাধ বাল্যজীবন থেকে তঁকে অহরহ ঘিরে রেখেছিল। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের আত্মোৎসর্গকৃত প্রাণের মানুষদের দেশেব মাটি থেকে উপন্যাসের পাতায় এনে হাজির করেছেন। পান্নালাল-কুন্তল কিংবা সরোজ পাকড়াশির আনাগোনা সেকারণেই। চন্দ্রা-শিশিরদের জীবনের মধ্যে মাতৃমুক্তিপণে আবদ্ধ দম্পতিকে খুঁজে পাওয়া যায়। সোমনাথ দত্ত তাঁর পুত্রকে উদ্দেশে যা বলেছেন তাতেই প্রকাশিত দেশের নারী সমাজের পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধে বলিদানের প্রতিজ্ঞা। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেকারণেই লেখকের সহমত —

> 'না জাগিলে ভারতললনা
> এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।'

'ভুলি নাই' উপন্যাস নানা কারণেই মনোজ-উপন্যাস-সাহিত্যে স্মরণযোগ্য। উপন্যাসের শুরু এবং মাটি-মানুষের সঙ্গে যথার্থ স্বাধীন চিত্তে বেঁচে থাকবার অনুপ্রেরণার উদ্গম। এ উপন্যাসের শেষাংশে নবীন প্রত্যাশায় ভরপুর জীবনের ইঙ্গিত রয়েছে, 'যেন বাতাসে শোনা যাচ্ছে, দিন আসছে ঐ। সব সমান ·· আলো হাওয়া, পৃথিবীর বুকের রসে সিঞ্চিত শস্য-শ্যামল, গোপন মণিকোঠায় রেখে-দেওয়া কয়লা-ইস্পাত একলা কারো নয়। বিরোধ অপ্রীতি দূর হয়ে যাবে। শান্তি আসবে, শ্রী ফিরবে। বিবাদের মধ্যে কত অন্যায় করেছি। রক্তপাত হয়েছে, আপন-পর কত লোকের চোখের জল ঝরছে! নতুন দিনে কারও এসব কথা মনে থাকবে না। প্রভাতের আলোয় রাত্রির দুঃস্বপ্ন ভুলে যাব ভাই –' এবং 'বাঁশের কেল্লা'র প্রথমেই রক্তক্ষরা সংগ্রাম অন্তে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরম নিশ্চিতি প্রকাশিত হয়েছে ' ঢোল বাজাচ্ছে প্রফুল্লের লোক, জানিয়ে দিচ্ছে, ইতিহাসে জ্বল জ্বল করবে আজকের তারিখ —১৫ই আগস্ট ১৯৪৭। কত সংগ্রামের পর এই দিনে পৌঁছলাম। পথের শেষ নয় —নতুন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে আরও দুস্তর পথে যাত্রা'।

মনোজ বসুর সাহিত্যিক জীবনে স্বদেশ চিন্তা স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করে নি। স্বাধীনতা-উত্তর জাতীয় জীবনে বহু ক্লেদ এসে জমেছিল, তার বেদনায় দীর্ণ হয়েছে লেখকের চিত্ত। সক্রিয় রাজনীতি পরিত্যাগ করলেও দেশের মঙ্গল-অমঙ্গল তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। পূর্বোক্ত 'সেতুবন্ধ' উপন্যাসের অবিনাশ মজুমদারের চোখে পড়ে, 'দেয়ালে ক্যালেন্ডারের দিকে অবিনাশের নজর পড়ে গেল —লাস্যময়ী নারী। কাগজের বিজ্ঞাপনে, রাস্তার পোস্টারে, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে যেখানে তাকাবেন এই বস্তু। নানান ধাঁচের পোষাক পরেও নগ্ন অথবা নগ্নতার ইঙ্গিতে দেহ-কাঠামোর কুৎসিত হাতছানি কেবল। যেন মেয়ে ছাড়া পুরুষ নেই এদেশে, যেন মেয়ের সমাজ থেকে কন্যারা জননীরা সম্পূর্ণ খারিজ হয়ে গেছে। অত্যাচারীর সামনে রিভালভার ধরা শান্তি-সুনীতি-বীণাদাস অথবা সৈনিকবেশিনী প্রীতিলতা এদের ছবি দিলে বুঝি জাতিপাত ঘটে —আমাদের মেয়ে নয় বুঝি এরা. যুবতী মেয়ে নয়? যুবতী হলে দেহভোগ ছাড়া অন্য কিছুই বুঝি জানতে নেই'। এই অধঃপতিত স্বাধীনতা-উত্তর জীবনধারায় প্রকৃত অর্থে স্বদেশপ্রেমীর বেদনার অন্ত নেই। যে সততা স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষিতদের আয়ুধ ছিল, তা পরিমাপের যোগ্যতা প্রাপ্তি খুঁজে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য একথা তো মেনে নিতেই হয়, 'No one has yet devised an instrument to measure or determine justice, equality or liberty'। তাছাড়া সত্যের খাতিরেই স্বীকার করে নিতে হয় যাঁদের হাতে (সে অহিংস-সহিংস যাঁরাই হোন) দেশোদ্ধারের দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাঁদের উচ্চতার মানুষ দুর্লভ হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। সত্য-ন্যায়ের প্রতিভূ অবিনাশের মতো মানুষদের মর্মপীড়া সত্যসন্ধানী সত্যাগ্রহী মনোজ বসুর পক্ষে প্রকৃতই পীড়াদায়ক, বেদনাদায়কও বটে, সেই বেদনার অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়েছে অবিনাশের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে।

'আমার ফাঁসি হল' মনোজ বসুর উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে। বস্তুজগৎ ও অতিপ্রাকৃত জগতের মধ্যে অপূর্ব এক মিলনবন্ধন উপন্যাসটিতে অভিনবত্ব দান করেছে। মরমী জীবনের আস্বাদেই আমাদের মন আতুর, এর বাইরে সমস্তটাই শূন্য, জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু, কিন্তু মরণের পরপারে কী আছে? সেই অলৌকিক জীবন নিয়ে মিষ্টি-মধুর উপন্যাস রচনা করেছিলেন বিভূতিভূষণ তাঁর 'দেবযানে'। একালের জীবন যেন অপর এক জগতের জীবনে পরিণত হয়েছিল। লেখক একে এক আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তুলেছিলেন, তার প্রমাণ রচনাটির পূর্বে ভগবদ্‌গীতা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, হের্নরি বার্গসঁ, শ্রীঅরবিন্দ-র উল্লেখ করেছেন। এই ব্যঞ্জনা মনোজ বসুর রচনায় নেই। স্ত্রীর মৃত্যুর মধ্য থেকে নোতুনতর জীবন প্রত্যাশা এবং সেই জীবনে মিলিত ভালোবাসার অক্ষয়স্বর্গলোক রচনার প্রয়াস বিভূতিভূষণের মধ্যে লভ্য। বিপরীত পক্ষে বস্তুজাগতিক অপমান ও বঞ্চনার, বলা ভালো, কৃতকর্মের অনুশোচনা থেকে ক্ষত-আরোগ্যলোক প্রার্থিত হয়ে পড়েছিল মনোজ বসুর ক্ষেত্রে। আত্মার ঋষি-উক্ত নববেশ ধারণের মতো কল্পনাটি অক্ষত বিভূতিভূষণের রচনায়, কিন্তু মনোজ বসু – অসংখ্য যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন কী মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক নয়?—এই প্রশ্ন তুলতে পেরেছেন। আত্মার অনন্তত্বে বিলীন হওয়া কী একান্তভাবেই সম্ভব, এই মায়া-মোহময় জীবন, এই সত্যবন্ধন, একটু একটু প্রাণের রসে গড়ে তোলা প্রাণের সংসার, এখান থেকে কত ঊর্ধ্বগামী হবে আত্মা! বিশেষত অপ্রাপ্তির চরম বেদনা যে ফুল না ফুটতে ধরণীতে ঝরে পড়ে গেল, তার মুক্তির সত্যিই কী কোনো পথ আছে? কোনো কোনো জীবন তো মৃত্যুর চেয়ে মর্মান্তিক, অনেক বেশি কণ্টকাকীর্ণ, যন্ত্রণাময়। বিপরীত পক্ষে, এমন মৃত্যু আছে যা জীবনের চেয়ে বেশি লোভাতুর। অনুক্ষণ বেঁচে থাকবার মধ্য থেকে বারংবার পরম লক্ষ্য, নিশ্চিন্ত নির্ভর সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার সাধ জাগে। বিরাটগড়ে আসবার পর 'আমার ফাঁসি হল'-র নায়ক চম্পা নাম্নী এক অশরীরী নায়িকার দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে কাছে' তার মদির আকর্ষণ অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত মর্তলোকে গঠন কল্পনাপ্রবণ, রোমান্টিক লেখকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই মোহডোর ছিন্ন করতে পারেন নি লেখক, হয়ত বা চান নি। প্র. না. বি. 'দেবযান' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'তাঁহার দেবযান একটি রহস্যময় খেলাঘর। রহস্যময় এইজন্য বলিলাম যে, খেলাঘরের মত রহস্যময় আর কি হইতে পারে?...পরলোককেও তিনি একটি খেলাঘর রূপে রচনা করিয়াছেন, বড় জোর সে যেন ও বাড়ির খেলাঘর, বড় জোর তাহার খেলুড়িয়া যেন আর এক জন্মের লোক। ....দেবযান পরলোকতত্ত্ব নয়, পরলোকের উপন্যাস'। উপন্যাস বলতে এখানে জীবন-ঘনিষ্ঠতার কথাই বোধ করি বলতে চেয়েছেন অধ্যাপক বিশী।

মনোজ বসুর উপন্যাসে আত্মকথনের প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন, '...জন্মের পর থেকে বেঁচেছিলাম, অথবা ফাঁসির পরেই বেঁচে উঠলাম—কার কাছে খাঁটি জবাব পাই?' এই জীবনের কথা ভাবলে মায়া না মতিভ্রম—কোনোটি সম্পর্কে নিশ্চিত প্রতীতিতে

পৌঁছতে পারা যায় না। যারা জীবন্তকালে প্রবাহিত হয়ে চলেছেন, তাদের পক্ষে এই অলৌকিক জীবনের স্বাদ অনুভব করা প্রায় অসম্ভব। অথচ এই 'অসম্ভবের ছন্দে' মেতে ওঠায় অনেক বেশি আনন্দ উপন্যাসের নায়কের। এই অজানা, অদেখা, স্পর্শাতীত জীবনের কাছে পৌঁছবার একটি ব্যতিক্রমী কৌশল নিয়েছেন লেখক নায়কের অসুখের মধ্য থেকে, তন্দ্রাতুর, অবসন্ন, প্রায় অবচেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌঁছে লৌকিক-অলৌকিকের প্রান্তবর্তী সময়ে পৌঁছে যায়। এর জন্য অপেক্ষা করে আছে না-মেটা-সাধের আরেক যৌবনবতী চম্পা। প্রবল তার জীবনতৃষ্ণা, তীব্র থেকে তীব্রতর আকাঙ্ক্ষার তীরভূমিতে 'আমি' চরিত্রটি উপনীত হয়, বিদেহীর ভালোবাসা, অপূর্ণ স্বাদের কল্পলোকটি আকস্মিকভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়। এখান থেকে যাত্রা শুরু অতিপ্রাকৃতিকতার। প্রেতলোকের মতো আঁকড়ে আছে চম্পা গোল ঘরটি, এখানেই বাসনার দাহে জ্বলে উঠেছিল সে, কিন্তু তৃপ্তি তার জন্য অপেক্ষা করে নি। কিন্তু মর্ত্যপ্রীতি, ভোগাকাঙ্ক্ষা তো মেটেনি, সে-ও কী শূন্যমার্গে গিয়ে অবস্থান করবে? তাই চম্পা বেছে নিয়েছিল এমন নারীকে পরিতৃপ্ততার জন্যে, যার অবয়বে সৌন্দর্যের কোনো চিহ্ন নেই। সেই কুৎসিৎ রূপের মধ্যে ক্ষুধিত বাসনার শিখা জ্বলে উঠেছিল, ফাঁদ পেতেছিল প্রলুব্ধ করবার জন্যে কোনো সংবেদনশীল প্রেমিক হৃদয়কে। উপন্যাসের নায়ক যখন ঘোর তন্দ্রায় এক পা মৃত্যুর কাছে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই সুযোগের ব্যবহার করতে পেছপা হয়নি চম্পা। সে বলে ওঠে, 'মাংস চাই, রক্ত চাই, মাটির উপর পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতে চাই। বাতাস হয়ে ভেসে ভেসে আর পারি নে'। তারই জন্যে তার অপর উক্তি, 'কুৎসিৎ লাবণ্যের গায়ে কতদিন ছায়া হয়ে ঘুরেছি। ওই মেয়ে যা নয়, তাই সাজিয়ে দেখিয়েছি। লোভে পড়ে করেছি যদি দুটো ভালবাসার কথা বল, দি একটু ছোঁয়া দাও, একবার যদি আলিঙ্গনে বাঁধ। আমার ছায়ায় লাবণ্যের তুমি ওই রূপ দেখেছিলে'। এ আকাঙ্ক্ষা প্রভাসের মধ্যে নেই। তবু প্রিয়বন্ধুর আচ্ছন্ন অবস্থার সুযোগে সে-ও এসে হাজির হয়। 'স্পষ্ট গলায় এবার জবাব এল, দিব্যি আছি, বড্ড স্ফূর্তিতে রয়েছি। সব ভারবোঝা মাথা থেকে নেমে গেছে। শরীর হাল্‌কা, মনও তাই। এত সোয়াস্তি আমার জীবনে পাই নি। এস, চলে এস বাবাজী। খাসা থাকবে। আমি মিথ্যে বলছি নে'। এক গভীরতর যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে প্রভাস নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল এ জীবন থেকে। আর তার বন্ধু চেয়েছিল প্রতারিত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে প্রতারকের কাছেই যেতে লাবণ্যের লাবণ্যহীন শরীর থেকে অশরীরী অন্যতর লাবণ্যিতে পৌঁছে যেতে। উভয়ের মৃত্যুই এসেছে প্রার্থিতের মতো। চম্পার সমীপবর্তী হবার তাগিদে ফাঁসির নারকীয় ঘটনাটি সংঘটিত হবার পর সে বলে উঠেছে, '...হাড়ের ফ্রেমের গায়ে শিরা-উপশিরা আর মাংস · নিতান্ত কুদর্শন বলেই উপরে একটা চামড়া। ময়লা তোষক আর ছেঁড়া-কাঁথার উপর চাদর ঢাকা দেয় যেমন। থুতু ফেলেছি : থুঃ, থুঃ! থুতু পড়ে না তো মুখ দিয়ে! লাথি মারব ওই কুৎসিৎ দেহটার উপর, পায়ের ধাক্কায় দৃষ্টির আড়ালে সরাব। ছুটতে পারি নে, পায়ে স্পর্শ পাই নে। বায়ুভূত

হয়ে গেছি'। মিলনের তীব্রতর আকাঙ্ক্ষায় যখন সে অধীর, যার জন্যে মিছে এ জীবনের কলরব, তবু মর্ত্যপ্রীতির প্রসঙ্গটি মনে না এসে উপায় থাকে না উপন্যাসের শেষ বাক্যে।

বিভূতিভূষণ এ জীবনকেই বয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন পরপারের আঙিনায়। মনোজ বসু বর্তমানের প্রাপ্য অসন্তোষের জন্য অশরীরীর কাছাকাছি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তাঁর নায়ককে। মাটির মায়া কারো কম নয়, কতুত উভয়েই প্রকৃতির পূজারী, মানুষ-মাটি-বিটপী উভয়কেই তীব্রভাবে আকর্ষণ করে, যশোহর কিংবা দক্ষিণবঙ্গ আসলে এই বৃহত্তর বঙ্গভূমিরই অংশমাত্র। তাঁরা এ বঙ্গদেশ দেখেছেন বলে অন্য কোনো রূপের মোহে ততখানি মুগ্ধ হতে পারেন নি, অনুরূপভাবে এ জীবনকে ভালোবেসে, মোহে পড়ে প্রীতির রসে বেঁধে অপ্রাপণীয়ার প্রতি ধাবিত হয়েছেন। 'যতীন' কিংবা 'আমি' একই আকাঙ্ক্ষার দোসর। এক অমোঘ নিয়তি মনোজ বসুর নায়ককে কোলকাতার জীবন থেকে নিয়ে এসেছিল বিরাটগড়ে, সেখানে তার নিয়তি অপেক্ষা করছিল চম্পার ছায়াময় জীবন নিয়ে, তারই মোহে টুনুর ভালোবাসা, বৌদির স্নেহ অগ্রাহ্য করে চলে যেতে হচ্ছে অজানা, অননুভূত কল্পলোকে। নিয়তি-তাড়িত হয়েই এ জীবনের সব লেন-দেন চুকিয়ে চলে যেতে হচ্ছে তাকে। ইহজীবনে চম্পাকে দস্যুর হাতে নিপতিত হতে হয়েছে, শরীরই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, জীবন-তৃষ্ণা অপূর্ণ রয়ে গেছে, তাকে দস্যু দলন করে যেতে পারে নি। ভোগের আকাংক্ষা বহন করে যে গেছে, বাসনার নোতুন কল্পলোকের ইচ্ছাও তার সঙ্গে সঙ্গে গেছে। এতদিন ক্ষুধিত যৌবন-ঈপ্সা গুমরে গুমরে কেঁদে মরেছে, 'আমি'-র সান্নিধ্যে এসে বাসনার পীঠস্থান খুঁজে পেয়েছে, তাই আচ্ছন্ন নায়কের কাছে কোমল কাতর আবেদন ধ্বনিত হয়েছে, ঘটনাচক্রে তাকেও অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই ফাসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে। এবার মিলনের বাধা নেই, যেহেতু লাবণ্যের কুৎসিৎ দেহের ওপর আবিষ্ট চম্পাকে সমস্ত হৃদয়-মন জুড়ে পেতে চেয়েছে সে। এই পরিণতির সম্ভাবনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের যতীনের মনোজগতের নৈকট্য আছে।

মনোজ বসু জীবনের শেষপ্রান্তে পরিসমাপ্তির রেখা টানতে চান নি, আরো কিছুদূর পর্যন্ত একটি মিলনপর্ব দেখাতে চেয়ে মৃত্যুর পরের অবলম্বন-আকাঙ্ক্ষী একটি জগতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন পাঠককুলকে। তাই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও রূপে নির্মিতি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মনোজ বসুর স্কুলে শিক্ষকতার জীবনের আলেখ্য 'মানুষ গড়ার কারিগরে' এবং শিক্ষক হিসেবেও গান্ধিজির শিক্ষাদর্শের প্রতি অকৃতিম অনুরাগের পটচিত্রের দলিল স্বরূপ 'নবীন যাত্রা' লিখিত হয়েছে। জীবনের দীর্ঘ সময় শিক্ষকতা করে অতিবাহিত করেন, অমূল্য সময়ের অপচয় হয়েছে বলে পরবর্তীকালে মনে করেছেন। আমাদের দেশে ইংরেজ আমল থেকে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চলে আসছে তাকে 'temple of learning' বলে ভাবার কোনো কারণ আছে বলে লেখকের মনে হয় নি। দারিদ্র্য, অবমাননা, উন্নাসিকের অবজ্ঞা দৃষ্টি ও সর্বজনের উপেক্ষা ছাড়া শিক্ষক জীবনে পাবার

কিছু ছিল না। 'মানুষ গড়ার কারিগর' প্রসঙ্গে তাই তাঁর অকপট উক্তি, 'ইস্কুল নিয়ে লিখতে চেয়েছিলাম, খানিকটা আক্রোশ নিয়েই হয়ত। আমার যৌবনের অনেকগুলি দিনের অপমৃত্যু ঘটেছে এক ইস্কুলবাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে। বিদ্যাগার বলব না, মানুষ গড়ার কারখানা। নিচের ক্লাসে মেসিনের ভেতর ছেলেগুলোকে ফেলে ধাপে ধাপে নানান ক্লাস ঘুরিয়ে একদিন তেরী ফল বাজারে ছেড়ে দেওয়া, আমি জনৈক কারিগর ছিলাম সে কারখানার'। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি ইস্কুল ও শিক্ষক জীবনের বিচিত্রতা লক্ষ্য করেছেন। মহিমের মতো আদর্শ শিক্ষক যেমন এঁকেছেন, তার আদর্শ সূর্যকান্ত মাস্টারমশাইকে চিত্রিত করেছেন কিংবা এ-উভয়কে দেখবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটেছিল। গণনাতীত হীনমন শিক্ষকও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি, ঈর্ষাপরায়ণ, শিক্ষক নামের অযোগ্য, কর্মবিমুখ রামকিঙ্করের কথা অপকটে ব্যক্ত করেছেন, ট্যুইশানি নামক বস্তুকে গুপ্ত অধ্যাপনা নাম দিয়েছেন, কোনদিন না-খোলা একটি স্কুল গ্রন্থাগারের কথা বলেছেন —আবার আর্থিক দৈন্যে নিমজ্জিত শিক্ষকদের নিয়ে সাধারণ মানুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কথা জানিয়েছেন। সেক্রেটারী নামক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কতকগুলি মূর্খের খবরদারীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যাঁদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ সমর্পিত তাঁদের বুভুক্ষাটাই একমাত্র প্রাপ্য বলেই সরকার সমাজ সবাই মেনে নিয়েছেন, তার প্রতি ক্ষোভও সংগুপ্ত থাকে নি। আদর্শবাদী শিক্ষক মহিম যে যুগের পক্ষে একেবারেই বেমানান তা চিত্রিত করতে গিয়ে শিক্ষক ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে বেদনাও কম অনুভব করেন নি। সাতু ঘোষের অসততায় নিজের দীর্ঘদিনের তেরী আদর্শকে ভেঙে চুরমার হতে দেখেছেন মহিম। কাহিনীর শেষাংশে ছাত্রদের মুখে ছড়া কাটা শুনেছেন 'মহিম সেনের চোখ কানা / পকেটে তার বিড়াল ছানা'। তাই বটে। আমি মহিমরঞ্জন সেন বি. এ. লেখাপড়ায় আলস্য করি নি, ফার্স্ট হয়েছি বরাবর। চিরদিন সত্য পথে চলেছি, দৈনিক জমাখরচে একটিবার নজর দিয়েই যে-কেউ বুঝবে। দুনিয়ার ভালবাসা তাই আমার উপরে —থার্ড-বি'র বেড়াল-ডাকা ছেলে থেকে নিজের আত্মজা দীপালির'। সাতু ঘোষকে মহিম বলেছেন, 'দেখুন, অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি –সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সাচ্চা পথে কাজ করে যান, আপনার উন্নতি হবে'। মহিম তার শিক্ষক সূর্যকান্তকে বলেছেন, 'টুইশানি মেলে, সেকথা ঠিক। সাত আটটা টুইশানিও করেন কেউ কেউ। তাঁরা পুষিয়ে নেয় এই দিক দিয়ে। কিন্তু আমি পারিনে মাস্টারমশায়। দুটো করতে হাঁপিয়ে উঠি, ছাড়তে পারলে বেঁচে যাই। আমার প্রবৃত্তি হয় না'। মধ্যে মধ্যে ভাবেন পাকা হয়ে গিয়ে খরচপত্র চলার মতো মাইনে কিছু বাড়লে ছেড়ে দেবেন টুইশানি। গান্ধিজি বলেছেন, ' শিক্ষক হবেন চুম্বকের মত, ছেলেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। তিনি এমন হবেন যাতে ছেলেরা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে চায় না।··ছেলেদের মা-বাবা এরকম শিক্ষককে উপেক্ষা করতে পারবেন না '। কিন্তু এ জাতীয় শিক্ষকই বা কোথায় এবং তাকে গড়ে তোলবার মতো সমাজ-ব্যবস্থাই বা কোথায়, অন্তত এ-দেশে। কারো কারো তো পুরনো ধারণা রয়েই গেছে, 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি', 'স্পেয়ার দ্য রড এন্ড

স্পয়েল দ্য চাইল্ড'। অবশ্য সে ব্যবস্থা উঠে গেছে, আলোচ্য গ্রন্থের কালেই তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

শিক্ষক জীবনের দারিদ্র্য, নিষ্পেষণ, অবহেলা ও বঞ্চনার পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক গ্রন্থটিতে। যেমন 'কালীপদ বলেন, বোনাসের কথাবার্তা হয়ে গেছে, সকলেই সই দিয়ে দরখাস্ত পাঠান। হেডমাস্টারের পঞ্চাশ টাকা, চিত্তবাবুর চল্লিশ আর সকলের পঁচিশ করে নিজ দায়িত্বে দিয়ে দেবেন সেক্রেটারি'। এ হীনতার পাশে শিক্ষককৃত হীনতাও দৃষ্টিগোচর হয়।

'কি আছে রে ?

অঙ্ক—

খিঁচিয়ে উঠলেন রামকিঙ্কর : সবে এই ছুটোছুটি করে এলাম, অঙ্ক এখন কি রে ? অঙ্ক হবে বিকেল বেলা।

রুটিনে আছে সার।

থাকবে না কেন। চিত্তবাবুর রুটিন তো, নিজে কস্মিন কালে ক্লাসে যাবেন না, একে তাকে পাঠিয়ে কাজ সারেন ...... '।

বাইরে থেকে অঙ্ক কষিয়ে এনে যে ছেলে পরীক্ষার খাতা জমা দিচ্ছে, পতাকীবাবু মহিমের অজ্ঞাতে তাকে দিয়ে করিয়ে ছাত্রটিকে চালান দিয়েছেন। আবার শিক্ষক বনোয়ারি বলছেন, 'পঁচিশের কমে পড়াই নে আমি। সস্তায় মাস্টার আছে বই কি ! সে কিন্তু বনোয়ারি রক্ষিত নয়। বিদ্যে সাধ্যি আর পড়ানো দেখেই লোকে বেশি পয়সা দিয়ে রাখে'। পড়ানোর সময় বাড়ালেন এইভাবে যে দুঘণ্টার পড়ানোর সময় তার মধ্যে ট্রামে করে ছাত্রের বাড়ি আসা যাওয়ার সময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা তাঁর সময় নেই।

স্কুলে বই পাঠ্যের ব্যাপারে শিক্ষকেরা উপযুক্ত বলে যা বিবেচনা করেন, তা লিস্টে ছাপা হয় না, প্রেসের লোক সেক্রেটারির দোহাই দেয়। এক কথায় এক চরম বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের পীঠস্থান ইস্কুলগুলো।

'মানুষ গড়া কারিগরে'র পরিপূরক গ্রন্থ 'নবীন যাত্রা'—কলে তৈরী চার দেয়ালে আবদ্ধ ছাত্র তৈরীর প্রতি যে তীব্র অসন্তোষ আলোচিত গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন তার পরিপূর্ণ বিকাশ যেভাবে সম্ভব তাই প্রকাশ করেছেন 'নবীন যাত্রা'য়। নিজের যোগ্যতায়, কায়িক পরিশ্রমে, নির্দ্বিধায়, মনের আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন সম্ভব করে লেখকের ধারণা তাতেই যথার্থ শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এই শিক্ষার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণের কথা তিনি বারংবার জানাতে চেয়েছেন। স্বাধীন শিক্ষা ভিন্ন শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভে সক্ষম নয় অও রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের মূল কথা। মহাত্মাজির নঈ-তালিমের প্রতি যে লেখকের আনুগত্য রয়েছে 'নবীন যাত্রা' উপন্যাসের মূল আদর্শ লক্ষ্য করলেই তা ধরা পড়ে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে শিক্ষা সংস্কারের এক নোতুন খসড়া তৈরি করেন এবং ১৯৩৮-এ তাঁর প্রবর্তনায় বুনিয়াদি

শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হয়। 'ওয়ার্ধা' পরিকল্পনায় সাত থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের সাত বছরের জন্য আবশ্যিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। বুনিয়াদি শিক্ষা-দর্শনের গোড়াকার কথা, জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-নীতির পরিবর্তে সহযোগিতা-নীতির প্রবর্তন এবং সহযোগের ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। গান্ধিজি মনে করেছিলেন, কর্ম ও চিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষে মিলন হতে পারে, কিন্তু মানসিক জগতের স্তরে কর্মের ক্ষেত্রে মিলন সহজ। সেকারণে বিদ্যালয়কে কর্মের ক্ষেত্রে পরিণত করে গড়ে নিতে হবে। শুধু পুঁথিকে আশ্রয় করে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো সম্ভবপর নয়, নিজের হাতে কাজ করে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাবার উপযোগী করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই শিক্ষাকে কোনো না কোনো শিল্পের মাধ্যমে দেওয়ার উপযোগিতার কথা তিনি মনে রেখেছেন। ছাত্র নিজ হাতে উৎপাদন করবে, সেই উৎপন্ন দ্রব্যও নিজ পরিশ্রমের সাহায্যে নিজ শিক্ষার ব্যয় উপার্জন করবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সে-সব শিল্প দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ মানুষের উপযুক্ত গুণের সমন্বয়ে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

উপরি-উক্ত বক্তব্যসমূহের সম্যক্ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'নবীন যাত্রা' উপন্যাসে। অমূল্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে না পেরে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষায় তাকে অমানুষেই পরিণত করে তুলতে যাচ্ছিলেন ইন্দ্রাণী। হয় পরিপূর্ণ অমানুষ নতুবা পুরনো যাত্রাদলের গঠন হতো হরিপদর সহযোগিতায় – তারই নাম হত 'নবীন যাত্রা', কিন্তু নির্মলের মতো গান্ধিভাবধারায় বিশ্বাসী শিক্ষক অপরূপ এক যাত্রায় তাকে নিয়ে গেছে, সে যাত্রা মনুষ্যত্বের অভিমুখে যাত্রা। নির্মলের সাফল্য নিশ্চিত প্রমাণিত করে দিয়েছে বসন্ত রোগগ্রস্ত প্রফুল্ল মাস্টারমশাইকে শুশ্রূষায়, অসুস্থ শিক্ষককে বাঁচাতে গিয়ে আত্ম বলিদানে এবং মলয়কে আড়াল করে তাব মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে। যে যাতাকলে ছাত্রদের বলি হতে দেখেছেন মনোজ বসু, ইন্দ্রাণী তাতেই হাসি গাঙ্গুলিকে এনে পিষতে যাচ্ছিলেন অমূল্যকে, তাকে উদ্ধার করে স্বার্থবোধহীন মানুষে পরিণত করেছে নির্মল। ডঃ দত্তের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের যে পুরস্কার প্রাপ্য ছিল বলে অশোক মনে করেছিল, নির্মল তা পেয়েও তাতে প্রলুব্ধ হয় নি, প্রকৃত অর্থে মানুষ গড়ার কারিগর সে, যন্ত্র তৈরি না করে হৃদয় ও বিবেকবোধ বাড়িয়ে তোলবার দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছে। ইন্দ্রাণী কথার পৃষ্ঠে বলেন নির্মলকে, ' ভাবো দিকি কতবড় সম্ভাবনা ছিল কাজে, বৃহৎ দেশ উপকৃত হত'।

'তার জন্য ঢের লোক আছে' জানিয়ে 'বলতে বলতে নির্মলের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। বলে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—খবরের কাগজে লিখেছে বটে। স্বাধীনতা তাঁতিহাট অবধি পৌঁছয় নি।···ইস্কুল চালান মানে স্বাধীনতা পৌঁছে দেবার চেষ্টা গ্রামের মানুষের মধ্যে। আমার সেই চিরকালের কাজ'। নির্মলের কুঠির বিদ্যালয় যথার্থ অর্থে ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশের বিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধিজি এই তো চেয়েছিলেন। এত ঢাক ঢোল পিটিয়ে কোলকাতা থেকে হেড-মিসট্রেস আনিয়েও দুটি বই ছাত্র জোগাড় করতে পারেন নি ইন্দ্রাণী। এদিকে নির্মলের বিদ্যালয়ে ছাত্রের

সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। পাঠ্যপুস্তকের চাপ নেই, চাপিয়ে দেওয়া বিদ্যাও নেই আছে মুক্ত শিক্ষার স্বাধীনতা। সেখানেই তো মুক্তি শিক্ষা ও শিশুমনের। এর সঙ্গে নির্মলের অপরিসীম ভালোবাসা। নির্মলের জবাবীর উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে. 'ওরা বড় ভাল। আমি ভালবাসি ওদের। যা সৎ যা শ্রেষ্ঠ তার উপর ভালবাসা ক্রমশই জন্মাবে'। '…ওরা নিষ্প্রাণ। একটু আধটু হয়তো ভুল পথে যায়, কিন্তু পুণ্যের দিকেই ওদের স্বাভাবিক গতি'। যে শিক্ষক এতটা বিশ্বাস করেন এবং জীবনে পালন করেন গান্ধিজি কথিত সর্বক্ষণের সঙ্গী হবার উপযুক্ত তো সেই শিক্ষকই। মনোজ বসু তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে কোনো মহিম আব বিশেষ কবে নির্মলেব মুখ চেয়ে ছিলেন।' 'নবীন যাত্রা' লিখে তাঁর অতৃপ্ত বাসনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে উপন্যাস হিসেবে তো বটেই, শিক্ষার সঠিক বিকাশ তাতে লক্ষণীয় হয়। অথচ কোনো তত্ত্ব বা ইজমে ভরে তুলতে চান নি লেখক তাব উপন্যাসটিকে। স্বতঃ উৎসারিত বলেই বোধহয় এর সার্থকতা বিষয়ে সন্দেহের প্রশ্ন ওঠে না। 'নবীন যাত্রা' কেবল মনোজ-সাহিত্যে নয়, বঙ্গসাহিত্য অনন্য। 'মানুষ গড়া কারিগরে' তিনি এবং 'অনুবর্তনে' বিভূতিভূষণের মনের তৃপ্ত হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

অভিনবত্ব অভিলাষী লেখক বাংলা উপন্যাসে নোতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। ইতোপূর্বে এ পথের পথিকের দেখা মেলে নি। মানুষের আদিম পাপের একটি চৌর্যবৃত্তি নিয়ে শুরু করেছেন 'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসটি। চোর সমাজের অন্দরমহলের সংবাদ প্রেরণ করেছেন লেখক উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে। উপন্যাস রচনার প্রেরণা আসতেই এ-সমাজের অভিজ্ঞ মানুষদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের অন্ধকার পথেব নানা অলিগলির সুলুক-সন্ধান জেনেছেন, তৃতীয় প্রহর তস্করের আবির্ভাবের সংবাদ আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তাদের সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পদ্ধতিগুলির বিষয়ে নানা তথ্যে ভরিয়ে তুলেছেন লেখাটিকে। অবশ্য তৎসহ অপর আদিম পাপের আরেকটি—গণিকা বৃত্তির প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র সাহেবের আবির্ভাব সূত্রে—দুই বৃত্তির মিলনে নিষিদ্ধ সমাজের ঘটনানিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখক নিজেই এসম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন; 'আমি চোরেদের কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু উপন্যাস গড়ে উঠেছে আপন খেয়ালে। তাব মধ্যে জীবনের জটিল আবর্তের ছবি যেভাবে এসেছে তা একরকম স্বতোৎসারিত ভঙ্গীতেই এসেছে'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসটির প্রথম পর্বে 'এক' অধ্যায় মাসিকপত্রে প্রকাশের সময় নিশিকুটুম্ব শব্দের অর্থ অন্যরূপ বলে মনে হয়েছিল, অশালীন রচনা বলে মনে হতে হতেই তার জাত চিনিয়ে দেয় অত্যল্পকালের মধ্যে। স্বতোৎসারণের প্রসঙ্গ লেখকের উল্লেখের কারণ একান্তভাবেই সত্য বলে মনে হয়। লেখক এক অজ্ঞাত জগতের বার্তা বহন করে এনেছেন। উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক না কেন, কাহিনী কিন্তু খরস্রোতা নদীর মতোই বয়ে চলেছে। অতিকথনের প্রাবল্য উচ্ছ্বাসপ্রবণ লেখকের প্রায় অধিকাংশ রচনাতেই আছে। এখানেও তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। লেখক যে এ শাস্ত্র সম্পর্কে পড়াশুনো করেছেন তার প্রমাণ গ্রন্থটির অনেকাংশে মেলে। চোর-চক্রবর্তী পুঁথির কালীবন্দনাও বাদ যায় নি—

'নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম—
চরণে পড়িলাম মাতা, আইস এই ধাম'।

উল্লেখ করেছেন প্রাচীন চৌরশাস্ত্র থেকে যেখানে এমন পাতার সন্ধান মেলে যা ছুঁয়ে চোর অনায়াসে দোর খুলতে পারে। মায়াযন্ত্রও আছে, তাতেও অনুরূপ কাজ দেয়। বলাধিকারী জানায়—'ভাল সিঁদ হল রীতিমত শিল্পকর্ম'। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে হয়। বস্তুটা আজকের নয়। হাজার দুয়েক বছর আগেও সাত রকম উৎকৃষ্ট সিঁদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পদ্মব্যাকোশ অর্থাৎ ফুটন্ত পদ্মফুলের মতো সিঁধখানা'। আবার জায়গা বিশেষে সিঁধ কাটার কায়দা আলাদা। কার্তিক ঠাকুর নিজেই তার হদিশ দিয়েছেন। পাকা ইটের গাঁথনি হলে একখানা করে ইট খসাবে। আর ইট হলে কাটবে। দেওয়াল যদি মাটির হয়, জলে ভিজিয়ে নরম করে নেবে। কাঠের দেওয়াল হলে উপড়াবে। আজামোজা সিঁধ হলে হবে না, কাটবার আগে দেওয়ালের উপর মাপজোক করে নেবে যে দেহখানা ঢুকবে তার অনুপাতে'।

চৌরকর্মের কাহিনী বিবৃত করলেও আদ্যন্ত একটি নিটোল কাহিনী আছে উপন্যাসটিতে। শুরু যদিও যুবক চৌযকর্মের সূত্রে, কিন্তু ধীরে ধীরে সাহেবের জন্ম-বৃত্তান্ত, তার বেড়ে ওঠা, নফরকেষ্টের সাকরেদি, গৃহস্থের বাড়ির খবর সংগ্রহকারী ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য পচা বাইটার উপযুক্ত শিষ্য বলাধিকারীর চৌর্যবিদ্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং সেই পন্থা ব্যবহারের সহায়তায় চুরিকর্ম ধারাবাহিক ভাবে কাহিনীর বৃত্তটি সম্পূর্ণ করেছে। নারীরা-ও দুর্বর্তিনী নয়—সুধামুখী, পারুল, রাণী, আশালতা, নমিতা কেবলমাত্র জনতা বৃদ্ধি করেনি, কাহিনীর প্রয়োজনকে সিদ্ধ করেছে। এদের মধ্যে প্রথমাবস্থায় সুধামুখী ও রাণী সাহেবের জীবনে অচ্ছেদ বন্ধনে যুক্ত হয়েছে। সুধামুখী তার নিচ জীবিকাকে বিস্মৃত হয়ে পরম স্নেহে অপরের অবজাত সদ্যোজাত শিশুকে মায়ের স্নেহে বড় করে তুলেছে, রাণী এসেছে সখী-প্রেয়সীর ভূমিকায়। এসকল আবেষ্টনীর মধ্য থেকে বড় হওয়ায় এবং জন্মসূত্রে বোধ করি কোনো উচ্চ বংশজাত মৌহূর্তিক পাপে সৃষ্ট হলেও মনোজগতটি তার নিম্নাভিমুখী নয়, অর্থাৎ পৈশাচিক কোনো উল্লাস তার মধ্যে নেই। না হলে নফরকেষ্টের আওতায় এসেও সে নিছক নির্মম হয়ে ওঠে নি। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। ক্ষুদিরামের সাধারণ সমাজে যে ভূমিকাই থাক না কেন, তার মধ্যকার নিচতা কিন্তু সাহেবকে স্পর্শ করে নি। তার চেহারা যেমন এই পাপকর্মে সহায়তা করেছে, তেমনি তাকে দাগী করে দেয় তার বড় ও সুন্দর মুখশ্রী। যে কারণে কালীমাতার কাছে কাতর প্রার্থনা করে তাকে মন্দ করে দেবার জন্যে যাতে তার মনে কোনো দ্বিধা স্থান না পায়।

নিশিকুটুম্বের একদিকে আছে সুধামুখীর বাৎসল্য, রাণীর সাহেবের প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে চৌর্যবৃত্তির নানান কলাবিদ্যা, নানান শাস্ত্র ও বাস্তব পদ্ধতি সমূহ। নফরকেষ্টের বাবুয়ানি, সকল সময়ে প্রতারণার প্রচেষ্টা, পচা বাইটার অত্যদ্ভুত উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া, বলাধিকারীর পন্থা নির্ধারণ, সাহেবের অসীম সাহস সমস্ত মিলিয়ে

আসরটি জমজমাট হয়ে উঠেছে। লেখকের অধ্যাবসায়, বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহের নিরন্তর প্রয়াস উপন্যাসের অভিনবত্বকে টিঁকিয়ে রেখেছে। কোনো একটি খণ্ড চুরির কাহিনী নিয়ে রচিত বাংলা গল্পের পরিমাণে যথেষ্টই। কিন্তু দু' খণ্ডের সুবৃহৎ উপন্যাস তার কাহিনী-উপকাহিনীর শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত করে বিচিত্র খবরের বাহনে পরিণত করবার দুঃসাহস অন্য কোনো লেখক দেখান নি। এই কৃতিত্বকে খাটো করা যায় না। বহু রচনার স্রষ্টা হলেও খুব উঁচু মাপের লেখক মনোজ বসু নন, কিন্তু বিচিত্রতার সন্ধান, তথ্য সংগ্রাহক ও খুঁটিনাটি বর্ণনার বিষয়টি মনে রাখলে লেখক সম্পর্কে শ্রদ্ধার অন্ত থাকে না।

মনোজ বসু সমাজ-সচেতন শিল্পী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, মধ্যে রোমান্টিকতা হয়তো আছে, তবু বাস্তব জীবনে প্রতিনিয়ত যে বিচিত্র জীবন-রহস্যের লীলাখেলা চলছে তার সম্পর্কে তিনি সচেতন। তিনি দেখেছেন বিধি নির্দিষ্ট অদৃষ্টবাদে রাধারাণীর মতো নারীর জীবন কী ভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে, সমস্ত সংসারের দায়ভাগ কাঁধে বহন করে পূর্ণিমা একক বিহঙ্গীতে পরিণত হচ্ছে, অনিতার মতোই শৈলধরের কন্যা কাঞ্চন মায়ের মৃত্যুর পর দুধসর পরিত্যাগ করে কলকাতাবাসী হয়, পরে মামার চাকুরী নিয়ে টানাটানি হলে ফেরে সেই গ্রামে, বৈভবের সাজ বদল করে ফেলে নিরঞ্জনের জন্য গ্রামের উন্নতির সুবাদে, তবু নিরঞ্জন তাকে বিশ্বাস করতে না পেরে কানা শত্রুপক্ষের গ্রামের মেয়েটিকে বিবাহ করে বসে—ইস্কুলটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো। এমনি ধারার বিচিত্র সংবাদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর, চিরকালীন শত্রুতায় বিয়ে করে আনা শত্রুপক্ষের মেয়েটি অর্থাৎ সুবর্ণলতা প্রসঙ্গে নরহরি সৌদামিনীকে বললেন, 'অনুমতি দিন—কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে আপনার পাদপদ্মে এনে রেখে যাই'—তথাপি শত্রুপক্ষের মেয়েটিকে একান্ত বিশ্বাসের আলিঙ্গনে বন্ধ করা সম্ভপব হচ্ছে না।

'রূপবতী' উপন্যাসটি সমাজ-জীবনের নিষ্পেষণে রাধারাণীর মতো অপাপবিদ্ধার জীবনের ট্রাজেডিকে বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। তার সৌন্দর্যময়, শরীরটাই হলো তার শত্রু। অকালে পিতাকে হারিয়ে মামা হারানের আশ্রয়ে এসে সৌন্দর্যের খাতিরেই তার বিবাহ হয়ে যায়, অথচ পাত্রপক্ষ এসেছেন মামাতো বোনকে দেখতে। পাত্রপক্ষের কর্তার চোখ ঘুরে যায়, তার হাতেই রাধার সতীত্বের বিনাশ ঘটে—এখান থেকে তার ট্রাজেডির শুরু। এরপর কাপাসদা গ্রামে ফিরে এলে তার পেছনে কামাতুর মানুষের ভিড় লেগেই থাকে, এ এমন এক সমাজ যেখানে নিজেকে সুস্থ-স্বাভাবিক ও সৎ রাখতে চাইলেই একজনের পক্ষে তা সম্ভবপর হয় না, বিশেষত যদি সে হয় নারী এবং রূপবতী। কডওয়েল যথার্থই বলেছেন, '**If what is derived from a thing but that thing, we should not say that social relations are nothing but sexual relations ; we should say that sexual love is nothing but social relations**'। রাধারাণী ক্ষেত্রে অন্তত এই নিয়ম বিধি প্রযোজ্য। লেখকের চরিত্রটি পরিকল্পনার পেছনে আবেগ হয়তো কাজ করেছে, কিন্তু এর বাস্তবতা

সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। এ একেবারে চোখে দেখা ঘটনা, তাঁর সাক্ষ্য উদ্ধৃতিযোগ্য, '… 'রূপবতী' একজন জানা মহিলার জীবনের ছায়া নিয়ে লেখা। বরাবর তাকে ছোটবেলা থেকে ঘৃণা করে এসেছি, প্রচণ্ড ঘৃণা। এখন কিন্তু তাঁর ওপর দরদ এসেছে, অবিচার করেছি এতকাল, তার জীবনের ইতিহাস জানতে পেরে বেদনায় আকুল হয়েছি…। মমতাময় লেখক রাধারাণীর জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে তার প্রতি যে গভীর সহানুভূতিশীল, তা বুঝতে দেরি হয় না। অপর দিকে নিষ্পাপ একটি নারীকে সমাজের তথাকথিত 'ভদ্রলোকে'রা পতিতায় পরিণত করছে, নিজেদের লোভে কতো রাধির জীবন ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে কে তার হিসেব রাখে? মুরারী উকিলের লাম্পট্য সেই স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পটিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে পথের ধুলোয়। 'কাশীতে খোকার মাস্টার মাইনে শোধ নিয়েছে, বাড়ীওয়ালা বাড়ীভাড়া আদায় করেছে, হীরক নিয়েছে ডাক্তারির ফি। একটা ভাণ্ডার থেকে সমস্ত'। নিজের তথাকথিত ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়েছে, অবিবাহিতা কন্যার সন্তানের আবির্ভাব, পরিচিত ডাক্তার অর্থের লোভেও দুষ্কর্মে হাত বাড়ায় নি, তখন মামাকে রাধির শরণাপন্ন হতে হয়েছে, তীব্র বেদনায় মামাকে সে বলেছে, 'মন্দ মেয়েরও দরকার পড়ে তোমাদের'। যৌবন ভিক্ষুকে সে বলতে বাধ্য হয়েছে, ' আমি তো নষ্ট মেয়েমানুষ, নিজের ঘরে দোর দিয়ে ঘুমোচ্ছি। তোরা সব দিনমানের ঋষিপুত্তুর; রাতে এসে ভূতের উৎপাত লাগাস। গোবর-জল ছিটিয়ে যে কূল পাইনে সকাল বেলা'। এমন যে শ্রদ্ধার যোগ্য ডাক্তার হীরক, তার চাঁপাফুলের স্বামী, সেই 'হীরকের দিকে চেয়ে বলে, এই নালিশটাই তোমার কাছে জানাতে চেয়েছিলাম। কেন আমায় ভাল থাকতে দেবে না? কলকাতায় কত ভাল ভাল লোকের সঙ্গে তোমার মেলামেশা·— ভেবেছিলাম এদের নোংরামির বাইরে তুমি। কিন্তু আমার একটা কথাও কানে নিলে না '। মামাকেও তার গভীরতর বেদনার সঙ্গে ব্যক্ত করতে হয়েছে যে ভালো থাকবার ইচ্ছে থাকলেই কী সে ভালো হয়ে বাঁচতে পারবে? মামার 'হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাধারাণী বলে, নষ্ট মেয়েমানুষ আমি, আনুষাঙ্গক সকল কাজে ওস্তাদ। তাই ভেবে দরদ হল বুঝি আজ ভাগনীকে দেখতে আসবার'। চাঁপাফুলকে পরম দুঃখেই তাকে বলতে হয়েছে এ সমাজের হৃদয়হীনতার কথা, ও শরীর তার শত্রু 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী' - 'রাধারাণী কাতর চোখে তাকাল ঃ 'আমার দোষ নয় চাঁপাফুল —বিধাতা-পুরুষের। হাড়-মাস-চামড়ার উপরটা এমন ক'রে সাজাল। এর উপরে কোনদিন তো আমি এক টুকরো সাবানও ঘষি নে। ধুলো-মাটি কালিঝুলি মেখে বেড়াই। পোড়া রূপ তবু যায় না। জীবন-ভোর এর জন্য আমার হেনস্থা। এঁটোপাতার মতো কুকুরে এসে চাটে'। হীরকও যেদিন তার রূপে মজে যায় তখন তার দুঃখের অবধি থাকেনা, বোঝাতে চায় হীরককে ' নিজের চেয়ে বেশি কাউকে তো মানুষ ভালবাসে না —আমিই ঘেন্না করি নিজেকে। নিজের এই দেহকে। এই মুখ এই ঠোঁট যত মানুষের থুতু মেখে নোংরা হয়ে গেছে। ধারালো ছুরি দিয়ে এক পর্দা যদি তুলে ফেলতে পারতাম, তবে শান্তি'। তবু কী রক্ষা আছে কামুকের হিংস্র নখরের হাত

থেকে ? 'দীঘির ঘাটে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে, মা গঙ্গা, পতিতপাবণী সনাতনী, গা জ্বালা করছে, জুড়িয়ে দাও। পাপের পুঁজরক্ত থিক থিক করছে সর্বদেহ, সাফসাফাই করে দাও'। শেষ পর্যন্ত বনের শেয়ালেই তাকে ধরে টানে একসময়, প্রকৃতির নিয়মেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'আগস্ট ১৯৪২, গ্রন্থ থেকে দাম্পত্য প্রেমের চিত্র এঁকে চলছেন মনোজ বসু, পূর্বোক্ত 'এক বিহঙ্গী', উপন্যাসে এডভোকেট হিমাংশু রায়ের কন্যা অনীতার জীবনেব ভালোবাসা প্রমাণ করে এমন ভালোবাসা আছে যা ঐশ্বর্যকে তৃণ জ্ঞান করতে পারে। তার প্রণয়-প্রার্থী অলকের ঐশ্বর্য পিতার বৈভব কোনকিছুই তাকে টলাতে পারেনি, তবু প্রকৃত ভালোবাসা জগতে চিরকালই দুর্লভ, এতো প্রলোভন দূরে সরিয়ে অঙ্কের শিক্ষক মিহিরকে সে তার 'হৃদয় পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী দান' করতে চেয়েছে, অলকেব সঙ্গে হিমাংশু রায়ের নিঃস্ব ভগ্নী কমলবাসিনীব কন্যা সীতার বিবাহে উদ্যোগ নিয়েছে। তবু বীরেশ্বব মোক্তারের কাছে থাকা, পরে তার বাবার আশ্রমের আরেক নিঃস্ব মিহিবকে একান্ত করে নিতে গিয়ে 'করুণ কাঁপা-গলায় অনীতা বলে উঠল 'পাষাণ আপনি মানুষ তো নন, —এব সঙ্গে সঙ্গতি সাধন কবে 'ভুলি নাই' উপন্যাসে সন্ধ্যা বলছে,

আপনি তো মানুষ নন। .

কুন্তলদা, আমি জানোয়ার ?

না পাথর '। ইত্যাদি অংশগুলি।

আবার 'সেতুবন্ধ' উপন্যাস নিম্নধৃত অংশটি পাঠ করলে অপরাজিতেব অপর্ণার অপুর প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে স্নেহসঞ্জাত মমতা সাযুজ্য রচনা কবে : শিশিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অকস্মাৎ মমতার বন্যা এসে যায় পূববীর মনে। সে-ও এই মুহূর্তে আর --এক মানুষ —শুধুমাত্র স্ত্রী নয়, ঘুমন্ত অসহায় বয়স্ক-শিশুটিব পাশে ও যেন মা। পাশ ফিরে আলগোছে এলোমেলো কয়েকটা চুল শিশিবেব কপাল থেকে সরিয়ে দেয়, হাত বুলিযে দেয় কপালের উপর। তাবপবে ছোট একটা চুম্বন. — অপর্ণা ঘুমন্ত অপুর দিকে তাকিয়ে আত্মমগ্ন হয়. 'এমন একটা মায়া হয ওব ওপবে'।

মনোজ বসু গ্রাম্যজীবনের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ বোধ করেও গ্রামীণ-জীবনের সমস্যাকেই একমাত্র বলে মনে করেন নি। তাব পরিচয় ইতোপূর্বে পেয়েছি। আর প্রকৃতি তো মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। অজস্র বন্ধনময জীবনে নিত্যসঙ্গী দুর্যোগ-দুর্ঘটনা, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে সমাজের সঙ্গে মানুষের, সর্বোপরি মানুষের নিজের ভেতরকার দ্বন্দ্ব। জটিল হয়ে এসেছে জীবন-যাপনের পদ্ধতি। জট প্রবেশ করেছে জীবনের গভীরতর লোকে। মনোজ বসুর উপন্যাস রচনার কালের মধ্যে প্রথম এসেছে দুর্ভিক্ষের বছর, তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, তারপর স্বাধীনতার কাল। সময়টি ভারতবর্ষের জীবনের পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভেঙে এসেছে একান্নবর্তী পরিবার, খণ্ডিত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধ, বিশ্বাসের মূলে ফাটল ধরেছে, এতো দুঃখ, এতো যন্ত্রণা, এতো দ্বন্দ্ব —তবু জীবন তো সর্বত্র নন্দিত, বরণীয়। সেই জীবনে আছে আনন্দ-উল্লাস, ভালো-লাগা, ভালোবাসা, গৃহের একটি নিশ্চিত কোণ, স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ

সংসার। দেশমাতৃকার বন্দনাগানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু হলেও, বনবাদায় নিজেকে দীর্ঘ সময় বেঁধে রাখলেও লেখক জানেন উপন্যাসের আদিম শর্ত বাসনাময় জীবন, নৈকট্যের বিমল সুরভি। 'এক বিহঙ্গী', 'সেতুবন্ধ', 'নবীন যাত্রা', 'সাজবদল' ইত্যাকার উপন্যাসে বাসনার বিচিত্র রঙে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন পটভূমিকাকে। 'এক বিহঙ্গী'র প্রাচুর্যের অনীতার সঙ্গে ইতোমধ্যে পরিচয় ঘটেছে ; বৈভবের মাঝখান থেকে আবেগ-তাড়িত হয়ে মিহিরকে বিবাহ করেছে, কিন্তু গ্রাম্য জীবনের প্রতি লেখকের যত আসক্তিই থাকুক না কেন, অনীতার থাকবার কথা নয়, মোহের কাজল অল্প সময়েই গেছে মুছে, বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এতোকাল কেটেছে শহরে পড়াশুনোয়, নাচে-গানে-সাঁতারে, তার আকর্ষণ ছেড়ে শুধু উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে কাল কাটানো বাস্তবিক কষ্টসাধ্য। তবু মিহিরের মা ফিরে এলে তাকে অভিনয় করতে হয়েছে, এ পর্ব শেষ হলো, অতঃ কিম্ ? এদিকে অন্তরে একটা সুপ্ত বাসনা বাসা বেঁধেই ছিল, নারীর গৃহাকাঙ্ক্ষা, কোন্ ছিদ্র পথ দিয়ে তা বাইরে বেরিয়ে এলো। অনীতা তা টেরই পায় নি। সোনাবপুরে মিহিরের মায়ের কাছে সময়টুকুই হয়তো বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। তাই তার মুখে শেষ পর্যন্ত শোনা গেছে, 'আজকে নতুন করে ভাবছি। আমার পড়াশুনো, নাচ, গান, অভিনয় দৌড়ঝাঁপ, সাঁতারের যশ কিন্তু চারিদিকে ছড়ানো এলোমেলো যশে কেমন যেন মন ভরে না'। লেখক কামুর মতো মনে করেছেন 'We refuse to despair of mankind without having unreasonable ambition to save men, we still want to serve them'।

'সেতুবন্ধ' উপন্যাসের প্রথম পর্বে শিশির-পূরবীর এক ঘনিষ্ঠ আন্তরিক সুখী গৃহকোণ লক্ষ্য করা গেছে। গ্রাম থেকে শহরে এসে নোতুন আলোয় বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই ফলবতী হল না পূরবীর, গ্রামে কেন, এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তাকে চলে যেতে হল। এবার কৃচ্ছ্র সাধনার শুরু শিশিরের, মামা অবিনাশ মজুমদারের আশ্রয়ের জন্য ছোটাই সার হলো। বিবাহের প্রলোভনে কন্যাকে অন্য কোনো গ্রাম্য-পরিবারে রেখে আসতেও মন চাইলো না। শেষে পরিচয় হলো পূর্ণিমার সঙ্গে, সে-ও এক বিচিত্র পথে। বাপের সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে ভেতরকার নারী-চেতনা, সংসার-স্বামী এ সমস্ত বস্তু যেন পৃথিবী-লোকের বাইরে চলে গেল। বাড়ির পুরুষের চেয়ে অধিক গুরুত্ব যে মেয়ের, কর্তৃত্ব করতে যার প্রাণ নিঃশেষিত, তারও যে দয়া-মায়া-ভালোবাসা পাবার একটা আদিম ইচ্ছে থাকতে পারে, তা বাবা তারাবৃক্ষ সরকার, তস্য বন্ধু পূর্ণ মুখুজ্জে, বোন অনিমা, ডাক্তার হয়ে ওঠা ভাই তাপস তো ভুলেই ছিল, পূর্ণিমার নিজের অন্তর থেকে যেন তা দূরবর্তী হয়ে পড়েছিল। শিশির কী আশ্চর্যভাবে কর্তব্যের পাহাড় সরিয়ে তার কোমল হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিল তা গবেষণার বিষয়। একসময় কন্যা কুমকুমের অস্তিত্ব জানায় নি। শিশির পূর্ণিমার গৃহে বসবাস করেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুমকুমকে অন্যত্র রাখা গেল না। এই 'কুমকুমকে নিয়ে পূর্ণিমা ও শিশিরের দাম্পত্যে ফাটল

ধরেছে। অথচ কাজের লোক ভানুমতীর কাছে খোকার টাটি বজায় রাখতে হবে। নিদ্রাহীন একরাশ কালোমেঘ ভেঙে পড়া মুখে অন্যত্র বিছানা থেকে ভানুমতীর ডাক শুনে 'যাচ্ছি রে দাঁড়া'—বলে হাসিমুখে দোর খুলতে গেল পূর্ণিমা। কে বলবে কাল রাত্রে মহাঝড় বয়ে গেছে এদের দাম্পত্য জীবনে—রাতের বিধ্বস্ত চেহারা পাঁচটা মিনিট আগেও মুখের উপর সুস্পষ্ট ছিল। জাত-অভিনেত্রী এই পূর্ণিমা—একলা পূর্ণিমা কেন, মেয়ে জাত ধরেই, অনভিজ্ঞ গ্রামবধূ পুরবীই বা কোন্ অংশে কম ছিল ? মনের যা আসল মতলব তার উল্টোটাই বুঝিয়ে এসেছে শাশুড়িকে'। শেষ পর্যন্ত কুমকুমকে নিয়ে কথা ওঠায় অর্থাৎ অজাত-কুজাত কিনা শুনে ভানুমতী বলেছে, 'বাচ্চার কি জাত থাকে দিদিমণি' ? শেষ পর্যন্ত বাচ্চার জাত থাকে নি। শিশিরের অসাক্ষাতে বুকে টেনে নিয়েছে কুমকুমকে। কর্তব্য ভারে জর্জরিতা, সকলের চাহিদার ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল ; রূঢ়তা, কাঠিন্য তার অঙ্গের ভূষণে পরিণত হয়েছিল। কুমকুম সব কিছুর বাঁধ ভেঙে স্নেহের বন্যাধারাই বয়ে আনল না, নোতুন করে পূর্ণিমাকে কাছে এনে দিল শিশিরের। লেখক বিশ্বাস করেন নারী মনের কোমল স্বরূপকে, এই স্নেহ-প্রেমের উৎসকে শরৎচন্দ্রই প্রথম চিনিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্ণিমা অন্তরলোকে এতদিন যার জন্যে অপেক্ষায় ছিল, অথচ যা বোঝাবার কোনো সুযোগ তার জীবনে আসে নি, তাতে পেল পার্থিব পরম তৃপ্তি। তার মতো নারীদের অন্তরলোকে স্বাভাবিক অর্থেই নারী-জীবনের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। দাম্পত্যের মধ্যে স্নিগ্ধতার প্রবলতম বাতাস রমণীয় করে তুলতে পারে, কাহিনীর শেষাংশে এসে না পৌঁছালে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া যেত না।

'নবীন- যাত্রা' উপন্যাসে নারীচরিত্রের আরেক দিক অংকিত হয়েছে। নিশ্চিত ভাগ্য অপেক্ষা শ্রদ্ধাযুক্ত ভালোবাসা শ্রেয়স্কর লেখক তা প্রকাশে দ্বিধান্বিত নন। ছোট একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক্ —অমলার প্রশ্ন অশোককে ঃ

'কখন এলে ? দেখতে পাই নি তো !

দূরে নজর আপনার। কাছের জিনিষ কি দেখতে পান' ? 'এক বিহঙ্গী'র অনীতার কথা মনে আসতে বাধ্য।

'সাজ বদল' উপন্যাসের কাঞ্চনের ক্ষেত্রে ভালোবাসা উপলব্ধি এলো অনেক পরে, নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। একসময় নিরঞ্জনের কাছে উপযাচক না হয়ে কারো মাধ্যম গ্রহণের সংবাদটি দিলে সে ধন্য হত, নিয়তির পরিহাসে তা সম্ভব হল না, অথচ নিজেকে চিনতে কাঞ্চনের সময় লেগে গেল বিস্তর। মানুষ নিজেকেই বা কতটুকু চেনে ? বাসনার স্তর হৃদয়ের বোধকরি বহু দূর অন্তঃপুরে, সুপ্তি থেকে জাগ্রত হতে সময়েরও প্রয়োজন। তার খেসারত দিতে হল, কোনো সন্তানের মা না হয়েও শেষ পর্যন্ত দুধসরে ফিরে এলো তার স্কুলে অজস্র সন্তানের ভালোবাসার কথা ভেবে। নারীমনের সার্থকতার এ-ও আরেক দিক। শেষ পর্যন্ত দুধসর গ্রামে ফিরে আসার পেছনে সেই ব্যক্তিত্ব, কর্মনিষ্ঠার প্রতি কতখানি আকর্ষণে তার হিসেব কাঞ্চনও

রাখে না। কী প্রত্যাশা তার? প্রেম শুধু বিয়ের সুখে নিবন্ধ, একথা মুড়ের মুখেই শোভা পায়। দুখসরে প্রত্যাবর্তনের সূত্রে নিজেকে চিনেছে সে, রাণী শঙ্করী লেনের সমর গুহের আস্তানা আর তাকে আকর্ষণ করে না। মামলায় জিতে মামা জগন্নাথ চৌধুরী আবার তাকে কোলকাতায় টেনে আনলেন, কিন্তু এতদিনে নিরঞ্জনের প্রতি অনুরাগ, দুখসরের স্কুলের প্রতি টান অনুভব করতে শিখে গেছে সে। নোতুন করে তাকে সাজানো হলো শাড়ি-গহনায় -কিন্তু এখন আর সেগুলি পরতে চায় না সে, গা নাকি কুটকুট করে। পঞ্চাশ জন ছাত্রী ফেলে এসেছে। ফিরে এলো শেষপর্যন্ত, সঙ্গে শাদা শাড়ি ও টিনের সুটকেস।

লেখক জানেন প্রেম, সে তো নারীরই সম্পদ, গার্হস্থ্য-বাসনা, তা-ও নারীরই একান্ত। তাই নারী চরিত্রসমূহের মধ্যদিয়ে নীড় গড়ার সংবাদটি আমাদের দিয়েছেন। শিল্পের উদ্দেশ্য তার অজ্ঞাত নয়, তিনি জানেন **'The greatest style in art is expression of most passionate rebellion ···We have art in order not to die from truth'** এই শিল্প প্রকরণের অন্তর্নিহিত আবেগ দিয়ে চরিত্রসমূহকে সৃষ্টি করেছেন বলে মাটির মায়া, দেশের মুক্তির মায়ার পাশাপাশি জীবনের অন্দরমহলের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আমাদের সামনে। 'রূপবতী'র প্রতি লেখকেব মমত্ব, দেহ-পসারিণীদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহসজলতার পাশে গৃহ-অভ্যন্তরস্থ নারীদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি।

একজন ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য যেমন বিষয়বস্তু, তার জট কিংতার চরিত্রের মধ্য দিয়ে বর্ণিতব্য বস্তু স্পষ্ট করে তোলা, তেমনি প্রযোগ নৈপুণ্য রচনাকে একদিকে মনোরম, অন্যদিকে দৃঢ়পিনদ্ধ করা। সকল লেখক দুটি দিকে সমান মনোযোগী হন না, ইচ্ছাকৃত গঠনের মধ্যে একটা কৃত্রিমতা অবশ্যই থাকে, তবে ছন্দের অন্তর্মাধুর্যে যেমন কবিতার অভিনবত্ব, বিষয়ের ধারা অনুসারী ছন্দ বক্তব্য বিষয়টি স্ফুটতর করে, ঔপন্যাসিকের সিদ্ধি তারও চেয়ে কষ্টসাধ্য। শৃঙ্খলাবোধটাই সেখানে বড়ো কথা, বিশৃঙ্খল জীবন যেমন সুফল প্রসবে অক্ষম, তেমনি গঠনের পারিপাট্যবিহীনতার কারণে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য কেন্দ্রচ্যুত হতে বাধ্য। সাহিত্য তো শুধু মানবজীবনের দর্পণ নয়, তার শৈল্পিক নিপুণতাও সাহিত্যের অঙ্গীভূত। **'The novelist's problem is to evolve an orderly composition which is also a convincing picture of life'.** শৃঙ্খলাব মধ্য থেকে জীবনের প্রকৃত চিত্র গড়ে ওঠা সম্ভব। বর্তমানকালে গঠনের প্রয়োগ কৌশলের পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে নোতুনতর মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে। যে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' লেখেন, 'গোরা' রচনার সময় কিন্তু ভিন্ন পথের রূপ অন্বেষণে ব্যস্ত হন। আসলে বাংলা উপন্যাসের কালজয়ী ঔপন্যাসিকেরাও খুব আঙ্গিক সচেতন নন। জনচিত্তজয়ী শরৎচন্দ্রের রচনায় শৃঙ্খলার অভাব, শিথিল প্লট, আবেগ নামক বস্তুটি নির্মিতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলত 'দেনা-পাওনা' ভিন্ন অন্যত্র শিথিলতাব হাত থেকে রেহাই পান নি তিনি। মেরিডিথের **'The Egoist'** উপন্যাসের গঠন-বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া ভার। লুজ প্লট থেকেও

যেমন লেখকের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব, তেমনি অরগানিক প্লটও লক্ষ্যচ্যুত হতে পারে। আসলে লক্ষণীয় এই যে আঙ্গিক এমন সূত্রে উপস্থিত হবে যা মুখ্য উদ্দেশ্যের উপযোগী হয়। ভাষা ও বর্ণনা--এ দুটিও আঙ্গিকে অন্তর্ভুক্তি দাবী করে। ভাষা বর্ণনীয় বস্তুকে নয়ন সম্মুখে দীপ্যমান করে তুলতে সক্ষম। রস-সঞ্চারে তার ভূমিকা গুরুতর। স্থান, কাল, পাত্র উজ্জ্বলতর হতে পারে ভাষার ঐশ্বর্যে, তবে চেষ্টাকৃত ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টি লক্ষ্যহীন করেও তুলতে পারে। উপন্যাসকারকে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাষা বিষয় ও চরিত্রের মধ্যে এমন বাতাবরণ সৃষ্টি করবে যা ধীরে ধীরে লেখককে সিদ্ধির অভিমুখী করে তুলতে সাহায্য করবে। আসলে ঔপন্যাসিক হবেন প্রকৃত জহুরী, নির্বাচনের সুষ্ঠুতাই তাঁকে দেবে সাফল্য। তাতেই তাঁর বর্ণনা-শক্তির প্রমাণ মিলবে। রবীন্দ্রনাথ যদি কাব্যের ভাষায়কথা বলেন, তবে তাঁর বর্ণনাও কবিত্বরসে আপ্লুত হবে। 'শেষের কবিতা' একারণে 'চতুরঙ্গে'র যোগ্যতার পরিপন্থী। একদিক দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অনেকের চেয়ে বেশি। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র প্রথমাংশ, 'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবেরের গৃহের নিখুঁত বর্ণনা লেখকের সাধনার পরিণতি নির্দেশ করে।

আঞ্চলিকতার মতো বিষয় বর্ণনা নিখুঁত রূপের অপেক্ষা করে। তারাশংকরের কালজয়ী হবার পেছনে এই গুণটি বিদ্যমান, যদিও আবেগ কস্তুটি তারাশংকরের রচনার অচ্ছেদ্য অংশ, তাহলেও তারাশংকরের সাফল্য ঈর্ষণীয়। স্থান, কাল ও ব্যক্তির সহযোগে আঞ্চলিকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। তিনি আঞ্চলিকতার প্রকৃত অর্থ জেনেছেন, **'As people feel life, so they will feel the art what is most closely related to it. This closeness of relation is what we should never forget in talking of the effort of the novel'**। মনোজ বসুর উপন্যাসের দীর্ঘতম অধ্যায় দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিকতায় ঋদ্ধ। 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত' প্রভৃতি রচনায় এই আঞ্চলিকতা সম্পূর্ণ রূপে উপস্থিত থেকে ভাষা, আচরণ, জীবনযাপনের পদ্ধতি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত সফলতা পেয়েছে এই শ্রেণীর উপন্যাস-সমূহ। কাহিনীও প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে দীর্ঘ, আঞ্চলিক উপাদানের সামঞ্জস্য বিধান আঙ্গিকে দৃঢ়তা এনেছে সত্য কথা, দীর্ঘতা অনেক সময় ক্লান্তিকর করেও তুলেছে।

এই ক্লান্তির ছাপ অবশ্যই লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য বিষয়সম্বৃত উপন্যাসসমূহে। প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো প্লটের শিথিলতা মনোজ বসুর সমগ্র উপন্যাস সাহিত্য ব্যেপে আছে। বিষয়ের বৈচিত্র্যের সঙ্গে অবশ্যই সাযুজ্য রক্ষা করা দরকার ছিল কাহিনীর প্লটের, বর্ণনার। নাটকীয় চমক সৃষ্টি নোতুন মাত্রা সংযোজন করতে সক্ষম, দুঃখের বিষয় সেই নাটকীয়তাও তাঁর মধ্যে অলভ্য। কয়েকটি উপন্যাস দু'খণ্ডে বিভক্ত, খণ্ডের প্রয়োজন দীর্ঘতাকে খণ্ডন করার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তার মূল্য কতখানি? সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত, গণিকা জীবন—'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসের দুটি দিক। একাংশে সাহেবের বড়ো হয়ে ওঠা, নফরকেষ্টর সঙ্গে কোলকাতা ত্যাগ এবং পচা বাইটার চৌর্যবিদ্যার আগারে কর্মশিক্ষা এবং নফরকেষ্টর গুরুগিরি একটি অংশে ধৃত

হলে এবং অপরাংশ গণিকাজীবনের দুঃখ-লাঞ্ছনা, অনিশ্চিত বৃত্তি, সর্বোপরি নারী হিসেবে কারো কারো জননীরূপে প্রতিষ্ঠার বাসনা—দুই খণ্ডে ঐক্য সাধন করতে সক্ষম হতো। উপন্যাসটির দুটি বৃত্তি দুটিই আদিম পাপের যুগ্মবেণী যুক্ত করেছে, এক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যকার সঙ্গতি সাধন সম্ভব হলে বিষয় ও আঙ্গিক উভয়ক্ষেত্রের মিলনে চিরকালীন একটি উপন্যাসে তা পরিণত হত, কেবলমাত্র বিষয়ের অভিনবত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হত না। 'সেতুবন্ধ' ও 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' এ দুটি উপন্যাসের আঙ্গিক অনেকাংশে দৃঢ়নিবদ্ধ। এজন্য উভয়ের আকর্ষণও যথেষ্ট। আবার শিক্ষাকে বিষয়বস্তু করে দুটি উপন্যাস লিখেছেন, তার একটি 'মানুষ গড়া কারিগরে' পূর্বোক্ত শিথিল প্লট ও বিষয়ের একঘেয়েমি ঈপ্সিত লক্ষ্য থেকে কেন্দ্রচ্যুত করেছে। সে তুলনায় 'নবীন যাত্রা'র সাফল্য অনেক বেশি, সেখানে লেখকের দুর্বলতা বহুকথন ও বর্ণনার বাহুল্য উপস্থাপিত হয় নি। স্থির লক্ষ্যেই চলেছেন তিনি। নির্মল যেমন স্বল্পভাষী, তার শিক্ষাদর্শের স্বরূপ নির্ণয়েও সেই স্বল্প বা সীমায়িত গতিতে বৃহত্তর জীবনবোধ উৎকীর্ণ হয়েছে। স্বদেশ-ভাবনা নিয়ে পাচটি উপন্যাস আছে এগুলির মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তরকালের 'পথ কে রুখবে' আকারে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্তির অপেক্ষা রাখে। প্রথম পর্বে ছিল লেখকের উচ্ছ্বাসের কাল, বয়সও তদনুযায়ী, সেখানে কিন্তু আবেগ বিষয়কে আচ্ছন্ন করে নি, বিশেষত 'সৈনিক' উপন্যাসে পান্নালাল তার গান্ধিবাদী ভাবধারা নিয়ে আবেগ নিষিক্ত হয়েছে, আত্মকথনের সূত্রে লিখে যাচ্ছে পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ঘটনাবলী, তবু ভারসাম্য সেখানে ব্যাহত হয় নি, 'আগস্ট ১৯৪২' ও 'ভুলি নাই' খণ্ডচিত্রের সমবায়ে গঠিত। এক্ষেত্রে একের সঙ্গে অন্যের সামঞ্জস্যহীনতা উপন্যাসের কায়াকে খণ্ডকৃত করে তুলতে পারত, কিন্তু বস্তুত তা হয় নি। আসলে দ্বিজাতিত্বের সমস্যা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছে বলে 'পথ কে রুখবে' প্রার্থিত উচ্চতায় উঠতে পারে নি।

মনোজ বসু লিখেছেন অজস্র, তাই সর্বক্ষেত্রে আঙ্গিক সচেতনতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হন নি। তাছাড়া বলতে দ্বিধা নেই, আঙ্গিক শিল্পকর্মের একটি অত্যন্ত মূল্যবান অধ্যায় —এ তথ্যটি তিনি মাথায় রাখেন নি, ভাবের ও আবেগের বশে লিখে গেছেন। মনোজ বসু মুখ্যত রোমান্টিক, রোমান্টিক লেখকের একটি দুর্বলতা হলো দৃঢ়পিনদ্ধতার প্রতি আসক্তিহীনতা। এ দোষে দুষ্ট তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস। চেষ্টাকৃত আঙ্গিক সচেতনতা অবশ্য দাবী করব না, কিন্তু আঙ্গিকের সুষ্ঠু প্রয়োগ রচনাকে আস্বাদ্য, অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও উচ্চাঙ্গের করে তুলতে সক্ষম —এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো কারণ নেই। মনোজ বসু এদিকে সচেতন হলে নিজেকে বেশি পরিমাণে উচ্চতায় এনে পৌঁছে দিতে পারতেন তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য আঙ্গিকই প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম নয়, বিষয়ের নিজস্ব গুণবত্তা বা লেখকের সৃজনশীলতা গভীরতা সঞ্জাত হলে উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচিত হতে পারে। **Percy Lubbock.** টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস প্রসঙ্গে লিখেছেন, **'The business of the novelist is to create life, and here is life created indeed ; the satisfaction**

of a clean, coherent form is wanting, and it would be well to have it, but that is all. We have a magnificent novel without it'। মহত্তর জীবনের প্রকাশের ক্ষেত্রেই এ-জাতীয় আঙ্গিক নির্ভরতাবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা সম্ভব। Epic-novel বলেই তার সার্বজনীন আবেদন, চিরকালীন রসাবেদন থাকে। আঙ্গিকের বা সৌষ্ঠবের প্রসঙ্গ সেখানে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত হয়। মনোজ বসুর উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-সব উল্লেখ করার অর্থ না থাকতে পারে, কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত আছে বলেই সাধারণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কথাগুলি মনে আসে, এতে কোনো সাধারণ ঔপন্যাসিকের কৃতিত্বকে খাটো করবার প্রশ্ন ওঠে না। মনোজ বসুর উপন্যাসে এক জাতীয় শৈথিল্য আছে; ভ্রমণবৃত্তান্তের ঢঙে তিনি কিছু উপন্যাস লিখেছেন, বিশেষত অঞ্চল-ভিত্তিক উপন্যাসগুলি, তার রেশ রয়ে গেছে অপরাপর উপন্যাসে। শিল্পের কাঠামোর প্রশ্নটি উপেক্ষণীয় নয়, এর ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে বর্ণিতব্য বিষয়, বিষয়বস্তু যতই আকর্ষণীয় হোক্, তাকে নিপুণভাবে পরিবেশন করতে না পারলে, তা থেকে রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়। রস যেখানে প্রধান, সেখানে তা পৌঁছে দেবার মাধ্যমটি অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়। মনোজ বসু পটভূমি ও কাহিনীর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন বলেই সৌষ্ঠবের দিকে তেমন করে তাকাবার অবকাশ পান নি, এ সত্য মেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। কাছে বসে শোনা, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অমৃত, ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৭২
২। কল্লোল যুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পঞ্চম সংস্করণ
৩। গল্প লেখার গল্প, জ্যোতিপ্রকাশ বসু, প্রথম সংস্করণ
৪। মনোজ বসু, শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার, সুবর্ণ ও হীরক খণ্ড, প্রথম সংস্করণ
৫। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম পরিবর্তিত সংস্করণ
৬। Modern India (1885—1947) Sumit Sarkar, Re-Printed 1984 edition
৭। Studis in a Dying culture, C. Codwell, Reprinted 1957.
৮। বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প, ভূমিকা
৯। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, অনাথনাথ বসু, ১৩৫৩ সংস্করণ
১০। অপরাজিত, বিভূতি রচনাবলী, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড
১১। The Great Tradition, F. R. Leavis, 3rd Impression.
১২। Art of fiction, Henry games.
১৩। The Craft of Fiction, Percy Lubbock, First Indian Edition.

অশোক কুণ্ডু

প্রমথনাথ বিশী : সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথের পথিক

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ও শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্র প্রমথনাথ বিশী আজীবন রবীন্দ্রভক্ত। কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রভক্তি রবীন্দ্রানুকরণের পথ বেয়ে সাহিত্যসৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়নি। ছাত্রজীবনে তাঁর লেখা যাত্রাপালা রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন 'রথের রশি' / 'কালের যাত্রা'-র রূপ পেল তখন প্রমথনাথ সেই নূতন সৃষ্টিকে নিজ নামে চিহ্নিত করতে চাননি, গুরুপ্রণামী হিসেবেই নিবেদন করেছেন। প্রমথনাথ রসিকতা ক'রে বলতেন—গুরুদেব যখন যাত্রাপালা লিখবেন ব'লে মনস্থ করেন, তখন তিনি নাকি বলেছিলেন —সাহিত্যের এই শাখাটুকু অন্ততঃ আমাদের জন্য খালি রাখুন। কিন্তু প্রমথনাথ তাঁর গুরুর মতই সাহিত্যের সব শাখাতেই বিচরণ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা।

প্রমথনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দেশের শত্রু'কে পরবর্তীকালে কেন আর স্বীকার করতে চাননি তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে দেবেশচন্দ্র রায়ের 'রাজসাহীতে প্রথম দু'বছর' নামক প্রবন্ধে (কথাসাহিত্য : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সংবর্ধনা সংখ্যা)। সেইসংগে বোঝা যাবে প্রমথনাথ গতানুগতিক ধারা থেকে নিজেকে বরাবরই সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথই তাঁর কাছে ছিলেন আদর্শস্থানীয়। তাই দীর্ঘ হলেও স্মৃতিচারণটি এখানে প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধৃত করছি :

"তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, মিতাহারী, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন। ঘনিষ্ঠ পরিধির ভিতর ভিন্ন আড্ডা দেওয়া, গল্প করা বড় একটা করতেন না। অবসর সময়ে খালি পায়ে বারান্দায় পায়চারি করতেন অথবা বিছানায় শুয়ে পা দোলাতেন আর সব সময়ই থাকত হাতে বই। তার বেশীর ভাগই ছিল ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচনা —বিশেষ করে সেক্সপীয়রের।

এত অল্প সময়ের মধ্যে কলেজে এত সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে খুব জনপ্রিয় ছিলেন সেকথা বলা যায় না। কারণ তিনি popular sentiment-এর বিরোধিতা করতেন। এ অভ্যাস তিনি পরবর্তী জীবনেও সযত্নে লালন করে চলেছেন।

আমার সাথে আলাপের পর তিনি আমাকে তাঁর লেখা তিনটি বই পড়তে দিলেন। তার মধ্যে দুটি ছিল কবিতার বই 'দেয়ালী' ও 'বসন্তসেনা' অন্যটি উপন্যাস —দেশের শত্রু। কবিতা আমি কোনকালেই বুঝতাম না, কেবল পাঠ্য বই-তেই কবিতাই পড়েছি আর দূরে থেকে শ্রদ্ধা করেছি, তাই উপন্যাসটাই পড়লাম।

তখন দেশপ্রেমের বন্যা এসেছে, আমাদের মত তরুণ ছাত্রদের কাছে দেশের কাজ করা, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই সবচেয়ে বড় আদর্শ ছিল। আমরা স্বদেশী কাপড় ব্যবহার করে বিলিতি কাগজ (Statesman) না পড়ে এবং দেশ-নেতাদের বক্তৃতা শুনে ভাবতুম দেশের কাজ করছি এবং নিজেদের স্বদেশপ্রেমে নিজেরাই গৌরব বোধ করতুম। 'দেশের শত্রু' পড়ে আমি খুব মর্মাহত হলুম, কারণ তাতে ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও তাতে অংশগ্রহণকারী তথাকথিত স্বদেশ-প্রেমিক এবং স্বদেশী

কবিদের সম্বন্ধে কিছু ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ছিল। আমার বইখানা পড়া হয়ে যাবার পর হোস্টেলের অনেকেই আমার কাছ থেকে বইখানা নিয়ে পড়েছিল। বইখানা যখন আমার কাছে ফিরে এল তখন দেখি বই-এর ভেতরের পাতায় যেখানে বই-এর নাম এবং গ্রন্থকারের নাম লেখা থাকে সেখানে বই-এর নামটা কাটা এবং গ্রন্থকারের নামের পাশে হাইফেন দিয়ে বড় করে লেখা 'দেশের শত্রু'। এরপর আমি তাঁকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি, দেশের কাজ করা কি খারাপ, না দেশপ্রেমের কবিতা লেখা অন্যায়! তার উত্তরে তিনি বলেছেন – 'প্রথমটার কথা বলতে পারি না তবে কবিতাতো আমিও লিখি --আমার দেশের কবিতা আসে না আর দেশাত্মবোধক কবিতা কেবল রবিবাবুই লিখেছেন বাকীগুলো কবিতাই নয়।' উনি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন দত্ত ছাড়া আর কারুর কবিতা গ্রাহ্য করতেন না। আমি একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম আপনি যদি 'দেশের শত্রু' না লিখে 'দেশের বন্ধু' লিখতেন তবে খুব বিক্রি এবং অনেক টাকাও পাওয়া যেত। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, টাকা রোজগারই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হত তাহলে আমি কবিতা না লিখে পাটের ব্যবসা করতাম।

উনি সাধারণতঃ স্বদেশী মিটিং-এ যেতেন না এবং আমাদের যেতে নিরুৎসাহ করতেন, কোন কোন দিন অবশ্য তিনি আমাদের সাথে সভায় যেতেন কিন্তু বক্তার উত্তেজনাময় বক্তৃতা শুনে যখন সবাই হাততালি দিত, তখন তাঁর ভাবলেশহীনতা দেখে আমরা ক্ষুব্ধ হতাম।

তবে যেহেতু তাঁর পড়াশুনা আমার চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তর্ক তিনি ভাল করতেন, জীবনের অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী ছিল এবং তাঁর মত খণ্ডাবার মত যুক্তি খুঁজে পেতুম না—অগত্যা সেগুলো জেনে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না। সেই সময় আমি কিছুসংখ্যক বিপ্লবীর ঘনিষ্ঠ সংসর্গে এসেছিলাম এবং তাঁদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। তিনি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং আমাকে পরোক্ষভাবে এর থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন : তাছাড়া তিনি অনেক সময় প্রকাশ্য ভাবে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কটূক্তি এবং ব্যঙ্গোক্তি করতেন। আমার মনে আছে একদিন গভীর রাতে একটা গোপন জায়গায় বসে আমার সাথে একজন বিপ্লবী নেতার আলোচনা হচ্ছিল, তখন কথা প্রসঙ্গে প্রমথবাবুর কথা উঠল, সেই নেতা তখন আমায় বলেছিলেন, 'প্রমথবাবু যেভাবে চলছেন তাতে যে কোন দিন আমাদের ওঁকে সরিয়ে ফেলতে হবে।' সে কথা আমি বিশীদাকে বলেছিলাম কিন্তু উনি তাতে মোটেও বিচলিত হন নি।

কলেজের বা হোস্টেলের politics-এ তিনি বড় একটা যেতেন না তবে কোন পরিস্থিতি নিয়ে কোন সংকট উপস্থিত হলে তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর বক্তব্য সজোরে পেশ করতেন এবং সেটা প্রায়ই popular sentiment-এর বিরুদ্ধে যেত। কোন তোয়াক্কা না করে নিজের বক্তব্য সরবে বলার অভ্যাস তাঁর এখনও রয়েছে--সেটা সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা কিংবা যে কোন বিষয়েই হোক্, এই কারণে তিনি কিছু লোকের কাছে বরাবরই অপ্রিয় থেকে গেলেন।

জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কথা বলায় তাঁর অকুতোভয়তা—যার কথা আগে বলেছি, তার দুই একটি ঘটনা মনে পড়ছে। সেটা বোধহয় ১৯৩৯ সাল। তখন

বিদেশী কাপড় বর্জনের হিড়িক চলছে। আমরা হোস্টেলের দোতালার বারান্দায় রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ; আমাদের স্নান করে মেলে দেওয়া কাপড়গুলো বারান্দা থেকে ঝুলছে, নীচে কয়েকজন স্বদেশ প্রেমিক জড়ো হয়েছেন, তাঁদের লীডার সিগারেট মুখে কাপড়গুলো পর্যবেক্ষণ করছেন এবং যেগুলো একটু সূক্ষ্ম মনে হচ্ছে সেগুলো দেশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। একটি ক'রে কাপড় পুড়ছে আর ছেলেরা বাহবা দিচ্ছে, যার কাপড় পুড়ছে সে কেবল একটু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এমন সময় বিশীদা দোতালা থেকে চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'বিলিতী সিগারেট মুখে দিয়ে অন্যের কাপড় পোড়াতে লজ্জা করছে না -' আমরা সবাই একটু অপ্রতিভ হলাম এবং লীডার আমতা আমতা করে একটা explanation দিতে চেষ্টা করলেন, যাক্, সেদিনকার মত কাপড় পোড়ান বন্ধ হল, পরদিন থেকে সেই ভদ্রলোক সিগারেট ছেড়ে চুরুট ধরলেন।

আর একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের হোস্টেলের quadrangle থেকে একটা চিৎকার শুনে আমরা সবাই ছুটে গেলাম। দেখলাম একজন জোয়ান senior ছাত্র, তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, চেঁচাচ্ছে কারা নাকি অন্ধকারে তাকে মেরে পালিয়ে গেছে। কারণ খোঁজ করতে কে একজন বলল, 'ঐ লোকটা ইংরেজের স্পাই, ওকে মারাই উচিত।' আমরা মনে মনে সাব্যস্ত করে নিলাম ওর মার খাওয়া ঠিক হয়েছে, এবং তক্ষুনি মিটিং করে স্থির হল, ওকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হবে এবং পরদিন সকালে ওর মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে, গাধায় চড়িয়ে রাস্তায় বের করা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের প্রস্তাব গ্রহণের পর প্রমথবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই লোকটা যে স্পাই সেটা কোন কোন লোকের সন্দেহ মাত্র, এর কোন প্রমাণ নেই, শুধু একটা অমূলক সন্দেহের উপরে একটা লোককে যন্ত্রণা দেওয়া অন্যায়।' ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ল, কিন্তু এ নিয়ে হোস্টেলে তিন-চার দিন খুব গোলমাল চলেছিল।"

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে প্রমথনাথের দেশপ্রেমের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ যে-কারণে 'ঘরে-বাইরে'-তে প্রচলিত উচ্ছ্বাস প্রবণতাকে গ্রহণ করতে পারেন নি, প্রমথনাথও উপযুক্ত শিষ্য হিসাবে সেই পথের পথিক হয়েছেন। শুধু দেশপ্রেমের ধারণাতেই নয়, উপন্যাসের নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি স্বতন্ত্র পথের পথিক হতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কাব্যধর্মিতা, বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠনরীতিকে মেনে নিয়েও তিনি চেয়েছিলেন বাংলা উপন্যাসে ভিন্নতর স্বাদের আমদানি করতে।

'বিপুল সুদূর তুমি যে' (১৩৭৫) গ্রন্থটির সূচনায় লেখক জানিয়েছেন "আদিম মানুষ ছিল যাযাবর। সেই আদিম জগতের প্রান্তে কোথায় কিভাবে দেখা দিল একটুখানি শস্য। সেই শস্যের টানে ভ্রাম্যমান মানুষ মাটির সঙ্গে আবদ্ধ হল, যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করলো। যাযাবর মানুষ শত্রু বলে গণ্য করলো কৃষিজীবীকে তখন দুই জনে আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ। তারপর প্রেমের সূত্রে এই দুইজনে যোগাযোগ ঘটলো। সে আজ কতদিনের কথা।"

এই সূত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় লেখক তাঁর কল্পনায় এক আদিম মানুষের ইতিহাসের কাহিনী পরিবেশন করতে চেয়েছেন। প্রথম অধ্যায়ের সূচনায় তিনি জানিয়েছেন —"সিরদরিয়া নদী যেখানে আরল সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে সেই অঞ্চলের কাহিনী বলিতেছি ; অনেককাল আগের কাহিনীও বটে।"

যাযাবর সম্প্রদায়ের একদল মানুষ শিবির ভেঙে অন্যত্র যাবার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় খোঁজ পড়ল—সর্দারের দ্রুতগামী অশ্ব ঈগলের দেখা মিলছে না। দলের সর্দার, পুত্র হরিণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, সে ঈগলের সন্ধান জানে কিনা। সে জানাল, সকালে, সে ঈগলকে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখেছে। সর্দার জানালো, তাদের পূর্বপুরুষের মতে দক্ষিণ দিকটা বিপজ্জনক। এমন সময় ছুটে এল ঈগল, তার গায়ে ক্ষত, মুখে তৃণগুচ্ছ। তারা জল্পনা করতে লাগাল, এই তৃণগুচ্ছ তো সাধারণ নয়, এ যে দানাযুক্ত কিছু একটা জিনিষ। এর সংগে নিশ্চয়ই অশ্বের ক্ষতের যোগ আছে। ঠিক হল – হরিণ, ছোট ভাল্লুক, আর দ্বীপী এবং ঈগলকে সংগে নিয়ে, দক্ষিণ দিকে এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে যাবে। অনেক পথ অতিক্রম ক'রে তারা শেষ পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের প্রান্তে এসে উপনীত হল। তার অপর পারে যাদের বাস তারা স্বগোত্র নয়, কৃষিজীবী। অতএব শত্রু। হরিণ রইল একা, অন্য দু'জন ফিরে গেল তাদের আক্রমণ করার জন্য নিজেদের শিবিরে খবর দিতে।

অপেক্ষারত হরিণ দেখল—একটি মেয়ে ঝরণায় জল আনতে আসছে। উভয়ের পরিচয় হল, মেয়েটির নাম শাপলা। প্রথম পরিচয়েই প্রণয়। পরেরদিন সকালে হরিণ যখন শত্রুর এলাকায় ইতঃস্তত ঘুরছিল তখন সে ধরা প'ড়ে গেল। তাকে মৃত্তিকাদেবীর কাছে বলি দেবার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু কৌশলে শাপলা হরিণকে আপাততঃ বলি না দিয়ে নিজের গৃহে বন্দী করার কথা বলল। শাপলার বান্ধবী কলমীর দৃষ্টি কিন্তু সবসময় তাদের অনুসরণ করছে। রাতের অন্ধকারে সে হরিণের কাছে যায়। হরিণ তাকে শাপলা ভেবে আনন্দিত হয়। কিন্তু পরে এ ঘটনা শাপলা জানতে পেরে আসল রহস্য বুঝতে পারে।

এদিকে হরিণের দল এসে আক্রমণ সুরু করেছে। বলে শত্রুরাও তাড়াতাড়ি হরিণকে বলি দিতে চায়। শাপলা তাকে মুক্ত ক'রে দিল। কিন্তু সে নিষ্কৃতি পেল না। তাকে ধরিয়ে দিল কলমী। শাপলাকে বলি দেবার জন্য, মৃত্তিকা দেবীর কাছে, একটি গাছে শক্ত ক'রে বাঁধা হল।

কিন্তু ইতিমধ্যে শত্রুর আক্রমণে সবাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। হরিণও শাপলার খোঁজ করতে করতে তাকে দেখতে পেয়ে মুক্ত করল। দু'জনে ঠিক করল—পালাবে। ঈগলের পিঠে চেপে শাপলাকে নিয়ে হরিণ যখন পালাতে যাবে, তখন কলমীর নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শর এসে বিঁধল শাপলার দেহে। তখন ঘোড়া ছুটে চলেছে তীব্রবেগে দক্ষিণে।

এইখানেই কাহিনীর প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়েছে কলমী ও হরিণের এক নতুন জনপদে নতুন জীবন যাপন করার কাহিনী দিয়ে। এখানে হরিণ যখন প্রথম আসে, তখন সে আবিষ্কার করল শাপলার দেহে প্রাণ নেই। একটি গুহায় শাপলার মৃতদেহ রেখে সে নিঃসঙ্গ দুঃখময় জীবন যাপন করতে লাগল। তারপর একদিন কলমীও ঘুরতে ঘুরতে এখানে হরিণের সাক্ষাৎ পেল। দু'জনে একত্রে বসবাস করতে লাগল। হরিণ জানে না, যে কলমীই শাপলাকে ঈর্ষাবশতঃ শর নিক্ষেপ ক'রে হত্যা করেছে। বরং সে তাকে শাপলার সখী ভেবে, তার মধ্যেই শাপলার স্মৃতি অনুভব করে। কিন্তু কলমী মনে মনে তাতে আরো ক্ষুব্ধ হয়। সে চায় হরিণের জীবন থেকে শাপলার সব স্মৃতি দূর করতে। তাই সে শাপলার মৃতদেহটাও গুহা থেকে সরিয়ে ফেলে।

হরিণ কলমীর কাছ থেকে চাষের নিয়ম-কানুন শিখে নিতে চায়। কারণ শাপলা কিছু বীজ সংগে নিয়ে এসেছিল, সেগুলি এখনো হরিণ সযত্নে গুহায় লুকিয়ে রেখেছে। সে চায় সেই বীজ বপন ক'রে শাপলার স্মৃতিকে অক্ষয় করবে। ইতিমধ্যে কলমীদের পত্তনের একজন পুন্নাগ এসে তাদের সংগে যোগ দেয়। পুন্নাগ, হরিণ ও কলমীর মেলামেশায় বাদ সাধতে চায়। কিন্তু কলমী পুন্নাগ-কে ফিরিয়ে দেয়। পুন্নাগ জানত যে কলমী শাপলাকে হত্যা করেছে। তাই সে ঠিক করে হরিণকে সেইকথা ব'লে দিয়ে প্রতিশোধ নেবে।

হরিণ ও কলমীর এক কন্যাসন্তান জন্মাল। কিন্তু মেয়েটি যতই বড় হয়, তাকে দেখতে হুবহু শাপলার মত হ'তে লাগল। এতে হরিণ খুশী হলেও, কলমী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

বন্যার জলে নদীর চরে পলি পড়ায় সেখানে হরিণ গোপনে সযত্ন-রক্ষিত বীজগুলো ছড়িয়ে দেয়। একদিন তা' থেকে ফসলের ক্ষেত ভ'রে ওঠে। পুন্নাগকে মারার জন্য কলমী নানারকম তুক-তাক করে। ভয়ে পুন্নাগ তাদের ছেড়ে চলে যায়, যাবার আগে সে হরিণকে ব'লে যায়—কলমীই শাপলাকে হত্যা করেছে। হরিণ ঠিক করে, সে কলমীকে হত্যা ক'রে এর প্রতিশোধ নেবে।

এমন সময় দেখা যায়, একদল যাযাবর তাদেব সন্ধান পেয়ে আক্রমণ করছে। হরিণ সেই দলের দলপতির সংগে যুদ্ধ করতে চায়। যুদ্ধের সময় সে জানতে পারল সেই দলপতি তার পিতা। কিন্তু হরিণের হাতেই তার পিতার মৃত্যু হল। হরিণ কলমীকেও ছেড়ে দিল না, শাপলার হত্যার সেই তীর দিয়েই সে কলমীকে হত্যা করল। তারপর হরিণ উধাও হয়ে গেল। একাকী প'ড়ে রইল শিশুকন্যা।

এখানেই 'শাপলা ও হরিণ পর্ব' শেষ হয়েছে। এ থেকে মনে হয় লেখক আরো কয়েকটি পর্ব লেখার চিন্তা ক'রেছিলেন।

আসলে প্রমথনাথ মানব-সমাজের আদিমকাল থেকে ইতিহাসের রূপটিকে উপন্যাসে আনার চেষ্টা করেছেন। এই কাহিনী ইতিহাসনির্ভর নয়, সম্পূর্ণই কাল্পনিক। কিন্তু তিনি মানব সমাজের পরিবর্তনে যাযাবর ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কৃষিনির্ভর সমাজেরই জয় হয়েছে।

কাহিনীতে যে রোমান্টিকতা সঞ্চার করা হয়েছে, তা প্রমথনাথের কল্পনাশক্তির চূড়ান্ত। শাপলা - হরিণ —কলমী বৃত্তান্তটিতে সেই আদিমযুগেও নরনারীর যে মানসিক সংঘাত ছিল তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। কৃষিজীবী সমাজ ও যাযাবর সমাজ —এই দুই জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্বে কাহিনীর সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। তার সংগে যুক্ত হয়েছে প্রেমের বিচিত্র রহস্যজাল। চরিত্রের নামাকরণে তিনি আদিম প্রকৃতির প্রচলিত নামগুলিকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। চরিত্রগুলিও হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

'পদ্মা' (১৯৪৩) কে প্রমথনাথ তাঁর 'প্রথম উপন্যাস লিখবার চেষ্টা' ব'লে অভিহিত করেছেন। এখানে লক্ষণীয় এই 'চেষ্টা' কথাটি। যেহেতু এই মন্তব্যটি অনেক পরিণত কালের (১৩৭৮), তাই লেখক নিজের সৃষ্টিকেই সমালোচকের ছাড়পত্র দিতে দ্বিধা করেছেন।

শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা শেষে প্রমথনাথ যখন রাজসাহীতে থাকতেন, তখন সেই

পদ্মাতীরের 'শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ' তাঁর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বিনয় নামক যে যুবকটি কলেজের ছাত্র, তার সংগে প্রমথনাথের একাত্মতা সহজেই মনে পড়বে। কঙ্কণ নামক মেয়েটির সংগে বিনয়ের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তারপর বিনয়ের কলকাতায় পড়তে আসা, কলকাতার জীবন, কঙ্কণ-এর সাংসারিক জীবনের ঘটনা সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে পদ্মার ভাঙনে কঙ্কণের ভেসে যাওয়া, 'কপালকুণ্ডলা'র পরিণতিকে স্মরণ করায়। কিন্তু এখানে নায়ক কঙ্কণের শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। "তাহার মনের দুর্যোগের কাছে প্রকৃতির দুর্যোগ তুচ্ছ হইয়া গেল। পদ্মা মানুষের সুখ-দুঃখের কোনো সন্ধান করিল না সে আপন মনে আপন সত্তায় সঞ্জীবিত হইয়া বহিয়া চলিল, সে তো মানুষের নদী নয়, সে বিরাট কালনাগিনী প্রলয়ের সহোদরা।

রবীন্দ্রনাথের পদ্মাবাসের চিত্র যেমন 'ছিন্নপত্রে' সজীব হয়ে উঠেছে, প্রমথনাথের উপন্যাসে প্রকৃতি সেরকম কোন নতুন উপলব্ধিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠতে পারেনি। প্রকৃতির বহিরঙ্গে মানবজীবনের কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে।

'কোপবতী' (১৯৪১) তেও একটি নদী, শান্তিনিকেতনের 'কোপাই' স্থানলাভ করেছে। বিমল ও ফুল্লরার কাহিনীর মধ্য দিয়ে বোলপুর—শান্তিনিকেতন অঞ্চলের পটভূমিকে লেখক পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। কোপাই নদীর উৎস সন্ধানে বিমলের যাত্রা, কোপাই-এর প্রকৃতির অনুধ্যান কিন্তু বিমলকে শান্তি দিতে পারেনি 'সে প্রকৃতিকে পাইল না, মানুষকেও হারাইল'। ফলে বিমল ও ফুল্লরার জীবনে ঘটেছে সংঘাত—কিন্তু লেখক সেই সংঘাত যতটা তাত্ত্বিক বিবরণে প্রকাশ করেছেন, ততটা ঘটনা-বিন্যাসে সক্রিয় ক'রে তোলেননি।

শেষপর্যন্ত বিমলকে প্রাণ দিতে হল কোপবতীর মায়াবী আকর্ষণে। এই ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার জন্য লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাকে মানসিক রোগ ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া যাবে না। নিঃস্ব-রিক্ত ফুল্লরার বাপের বাড়ী চলে যাওয়ার পরও তাদের বিশ্বাসী অনুচর মিলনের অনন্ত অপেক্ষার মধ্য দিয়ে লেখক কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

এই উপন্যাসে বিমল ও ফুল্লরার দ্বন্দ্ব লেখক প্রধানতঃ প্রকাশ করেছেন তাঁর তাত্ত্বিক বর্ণনার মাধ্যমে; চরিত্রের অন্তর্নিহিত গভীরে সেই দ্বন্দ্বের মূল সঞ্চারিত করতে পারেননি।

'নীলমণির স্বর্গ'-এ একটি নদীর কথা আছে—ঘাটশিলার সুবর্ণরেখা। নীলমণি কোন মানুষের নাম নয়, একটি ভালুকের নাম। সেই পোষা ভালুকটি খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। মনুষ্যেতর প্রাণীসমাজের প্রতি লেখক-শিল্পীদের যে দরদী মন বাংলা সাহিত্যের অনেক উল্লেখযোগ্য রচনার জন্ম দিয়েছে, এটিও তার মধ্যে অন্যতম। পশুর স্বাধীনতাহরণ, তাকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার যে নির্যাতনের নামান্তরমাত্র লেখক যেন তা বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই কাহিনীর শেষে নীলমণি যখন নদীর উচ্ছল স্রোতে ভাসমান—তখন তার অবচেতন মনে স্বর্গের পাশাপাশি মর্তের মনিবের ডাক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। লেখকও যেন দ্বিধান্বিত—পশু ও মানবসমাজের প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই কি সত্যিকারের স্বর্গ রচিত হবে!

'পদ্মা', 'কোপবতী' ও 'নীলমণির স্বর্গ' —এই তিনটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসকে একত্র ক'রে প্রমথনাথ ১৩৭৮ সালে 'মুক্তবেণী' নামে প্রকাশ করেন। এই ত্রয়ী উপন্যাস কিন্তু কোনক্রমেই কাহিনীর যোগসূত্রে সমন্বিত নয়। তাই তিনি নিজেই ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন

"এই গ্রন্থ সমন্বয়ের 'মুক্তবেণী' নামকরণের হেতুটা দুর্বোধ্য নয়। পদ্মা, কোপাই ও সুবর্ণরেখায় কোন যোগাযোগ নেই, না উৎসের, না সংগমের। এ তিন একেবারেই মুক্ত, পরস্পর সম্বন্ধরহিত অথচ তিনই সুদূর রহস্যময় তাৎপর্যপূর্ণ।"

প্রমথনাথ নিজেই এই সময়টিকে তাঁর 'সাহিত্যজীবনের Water-shed' বলেছেন। জলরঙের অস্পষ্টতা এই পর্বে উপন্যাসে চিত্রধর্মীই থেকে গেছে।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' (১৯৩৫) উত্তরবঙ্গের পটভূমিকায় এক জমিদার পরিবারের কাহিনী। এই পরিবারের কাহিনীকে প্রমথনাথ ইতিহাসের পটভূমিতে স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি এই বংশের ঐতিহাসিক বিবরণ সুরু করেছেন মোগল সম্রাট আকবরের সভাপণ্ডিত নীলকণ্ঠ ওঝা থেকে। এই বংশের উদয়নারায়ণের সময় থেকেই 'জমিদারী বুদ্ধির সূত্রপাত হয়।' একদিকে বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ ও অন্যদিকে পৌত্র দর্পনারায়ণের কাহিনী। পলাশীর যুদ্ধের আগেকার মানুষ উদয়নারায়ণ, আর দর্পনারায়ণ পরবর্তীকালের। জোড়াদীঘির সংগে রক্তদহের যে চিরকালীন বিবাদ তাকে কেন্দ্র ক'রেই কাহিনীর বহিরঙ্গের সংঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সংঘাতে শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ বিধ্বস্ত। তখন দর্পনারায়ণ কারাগারে। একটি ক্ষমতাশালী প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের হাহাকারের মধ্য দিয়ে যেন একটি যুগের অবসান ঘোষণা করা হয়েছে। এরই মধ্যে রয়েছে দর্পনারায়ণ-বনমালার প্রেম ও বিবাহের কাহিনী, রক্তদহের কর্ত্রী ইন্দ্রাণীর ব্যক্তিত্বময় ভূমিকা প্রভৃতি। পলাশীর যুদ্ধের ঘটনা, ইংরাজ চরিত্রের উপস্থাপনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কাহিনীর ঐতিহাসিক কালপরিধিটিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন লেখক। তবুও এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, একটি পারিবারিক উপন্যাস।

এই উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের জনজীবন, তাদের আচার-আচরণ, সংস্কার-এর বিস্তারিত পরিচয় যেমন নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি জমিদারী প্রথার দম্ভ, আস্ফালন, তৎকালীন জমিদারদের অত্যাচার, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র সার্থক পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু দর্পনারায়ণ-ইন্দ্রাণীর মধ্যে সার্থক নাটকীয় সংঘাতের যে সম্ভাবনা ছিল, প্রমথনাথ তা গ্রহণ করেননি।

বঙ্কিমী-রীতিতে প্রমথনাথ মাঝে মাঝে পাঠকের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন -

"পাঠক, তুমি ভাবিতেছ এ কি হইল! তোমার গল্পপাঠের আগ্রহের পারদ দেখিতে দেখিতে নামিয়া একেবারে নৈরাশ্যের কোঠায় গিয়া ঠেকিয়াছে। তুমি ভাবিয়াছিলে, বালিগঞ্জ-বিলাসী এক জোড়া রুগ্ন যুবক-যুবতীর গল্প শুনিবে। তাদের বৈকালিক চায়ের পেয়ালার অবকাশে সুদীর্ঘ 'ফ্রয়েডিয়ান' তত্ত্বের আলোচনায় তোমার যৌন ক্ষুধা মিটিবে; প্রক্ষিপ্ত দুচারটা কাঁতিনাঁতাল নাম তোমার বান্ধবীসভায় আলাপের মূলধন-রূপে পাইবে।" ইত্যাদি।

'চলনবিল', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে'র পরবর্তী অংশ। 'চলনবিল'

উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। একদিন এই বিল ছিল প্রতাপশালী ডাকাত-জমিদারদের ডাকাতির কেন্দ্র। চলনবিলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে এক-এক জমিদারের প্রভাব প্রতিপত্তি। তাদের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত।

কালের প্রবাহে এই চলনবিলের নাব্যতা কমে আসে। নানা জায়গায় চাষ-আবাদের জন্য জমি তৈরী হয়। সেই জমি দখল নিয়েও সংঘাত সৃষ্টি হয়।

চলনবিলের ইতিহাস, সেই সংগে নদীমাতৃক বাংলাদেশের সামগ্রিক চিত্র লেখক সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন এই কাহিনীর মধ্যে।

এই চলনবিলের ধারে ধুলোউড়ির কুঠিতে আশ্রয় নিয়েছিল জোড়াদীঘি থেকে দর্পনারায়ণ, পুত্র দীপ্তিনারায়ণকে নিয়ে। দীপ্তিনারায়ণের কাছে গল্প করেন অতীতের। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দীপ্তিনারায়ণের তৎপরতা প্রকাশিত হয়। শেষ পর্যন্ত বন্যার জলে ভেঙে পড়া চলনবিলের বাঁধে তলিয়ে যান দর্পনারায়ণ। এই কাহিনীর পাশাপাশি মোহনলাল-কুসমি-ডাকুরায়ের সমৃদ্ধ কাহিনী এবং পরন্তপ-চাঁপা-ইন্দ্রাণীর কাহিনী আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। লেখক কাহিনীকে অত্যন্ত কৌশলে রহস্যের মোড়কে আবৃত করেছেন।

'অশ্বত্থের অভিশাপ'-এর কাহিনী সুরু হয়েছে—জোড়াদীঘির প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষটিকে কেন্দ্র ক'রে—"এই অশ্বত্থ একাধারে প্রবীণ ও নবীন।"

জোড়াদীঘির ছ'আনির জমিদার নবীননারায়ণ এই কাহিনীর নায়ক। তার নামের মতই সে নবযুগের মানুষ, কলকাতার আধুনিক জীবনের সংগে পরিচিত। তার স্ত্রী মুক্তমালাও শহরের মেয়ে। এই নবীননারায়ণের আধুনিক সংস্কারপ্রিয় চিন্তা ও মুক্তমালার জোড়াদীঘির জীবনের সংগে জড়িয়ে পড়ার কাহিনী ঘটনার অনেকাংশ জুড়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত জোড়াদীঘির বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কালের গতিকে মেনে নিয়ে লেখক অতীতের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। সেই সংগে বুনেছেন ভবিষ্যতের বীজ। পুরাতন জীর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষের গোড়ায় গজিয়ে উঠেছে নতুন চারা।

"জোড়াদীঘির নবতম জীবনযাত্রা আবার আরম্ভ হইবে কতকাল পরে ?"

প্রমথনাথের বাসনা---জোড়াদীঘিকে কেন্দ্র ক'রে আরও অগ্রসর হওয়া, তার ইঙ্গিত রয়েছে উপরোক্ত মন্তব্যে। শেষপর্যন্ত ১৩৯২ সালে প্রকাশিত হল 'ধুলোউড়ির কুঠি'। এই কাহিনীর নায়ক দীপ্তিনারায়ণ। কাহিনীর সূচনা হয়েছে ঝড়ের তাণ্ডবে একটি নৌকার বিপর্যয় হওয়ার ঘটনা দিয়ে। দীপ্তি মোহনের সাহায্যে সেই নৌকার যাত্রীদের উদ্ধার ক'রে আশ্রয় দেন। সেই নৌকার কর্ত্রী আর কেউ নন —রক্তদহের ব্যক্তিত্বময়ী ইন্দ্রাণী।

এই গল্পেও প্রমথনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে কাহিনীর জাল বিস্তার ও তা গুটিয়ে এনে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন।

জোড়াদীঘিকে কেন্দ্র ক'রে প্রমথনাথের উপন্যাস চেতনা এক মহাকাব্যিক আস্বাদ দিতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জীবন, ইতিহাস, উত্থান-পতনের কাহিনী অজস্র চরিত্রের সমারোহ গড়ে তুলেছে এক বিশাল জগৎ। সে জগতের আকর্ষণ পাঠকের কাছে চিরন্তন।

এই উপন্যাসমালার শতাধিক চরিত্র আপন-আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে লেখক বিশেষত্ব আরোপে সমর্থ হয়েছেন। মূল চরিত্রগুলি যেমন একদিকে যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছে, তেমনি অন্যদিকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথ নারী চরিত্রগুলিকে রহস্যময়ী ক'রে গড়ে তুলেছেন। সেই চরিত্রের রহস্যজাল উন্মোচনেই কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'লালকেল্লা' গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৭০ সালে। লেখক নিজেই এটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস ব'লে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বলেছেন—"এক অর্থে সমস্ত প্রাচীন ঘটনার কাহিনীকেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। লালকেল্লার ঘটনা সিপাহী-বিদ্রোহকে কেন্দ্র ক'রে। ইংরাজ শক্তির সংগে শেষ মুঘলশক্তির অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা। ব্যক্তি অপেক্ষা কালকেই প্রমথনাথ প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন বলে—"এই উপন্যাসের যথার্থ নায়ক শাহজানাবাদ ও লালকেল্লা।" সিপাহী বিদ্রোহকে কেউ কেউ 'নব্যযুগের প্রথম সিংহনাদ' আবার কেউ কেউ 'মধ্যযুগের অন্তিম আর্তনাদ' রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। লেখক কোন মতবাদকে প্রাধান্য না দিয়ে ঘটনার শৈল্পিক বিবরণই দিয়েছেন।

'লালকেল্লা'র কাহিনীকে প্রধানতঃ জীবনলালের দৃষ্টিতেই বর্ণনা করা হয়েছে। ইংরাজ কোম্পানীর বিশ্বাসভাজন যুবক জীবনলাল লক্ষ্ণৌ ছেড়ে দিল্লীর পথে রওনা দিয়েছে। তার দৃষ্টিতে সিপাহী বিদ্রোহোত্তর এই অঞ্চলের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কোম্পানীর বিশ্বাসভাজন হয়েও জীবনলালকে প্রাণ দিতে হয়েছে ইংরাজের গুলিতে। লেখক জানিয়েছেন—এই জীবনলাল একটি কাল্পনিক চরিত্র। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে ডায়ারী লেখক মুন্সী জীবনলালের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। জীবনলাল চরিত্রকে কেন্দ্র ক'রে লেখক সার্থকভাবে কোম্পানীর মানসিকতা, দিল্লীর সম্রাটের অসহায়তা ফুটিয়ে তুলেছেন সেইসঙ্গে জীবনলালকে করা হয়েছে পান্না, তুলসী, রূমালী প্রভৃতি রোমাণ্টিক নারীচরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে একদিকে বিপ্লবের বীভৎস রসের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে রোমান্স রসের।

পাছে কেউ এই রোমান্স রসকে ভুল বোঝেন সে জন্য লেখক সতর্ক ক'রে দিয়েছেন—"ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সংক্ষেপে রোমান্স বলে লঘু করে দেওয়ার প্রবণতা কোন কোন মহলে আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'লেই যে রোমান্স হবে এমন কথা নেই। দুর্গেশনন্দিনী রোমান্স হ'তে পারে, তাই বলে চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ এবং ওয়ার এন্ড পীস নিশ্চয় রোমান্স নয়। এসব উপন্যাসে জীবনের একটি সম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের চেষ্টা আছে। ঐ জীবন-ধারণার অস্তিত্বের ফলেই এসব উপন্যাস রোমান্সের চেয়ে মহার্ঘতার পদবীতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান উপন্যাস সম্বন্ধে কোন মহার্ঘতার দাবী লেখকের মনে নেই, তৎসত্ত্বেও খুব সম্ভব একটি জীবন-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে কাহিনীটিতে।"

এই জীবনবোধ ইতিহাসের তথ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য প্রয়োজন ছিল। এই প্রাণসঞ্চার দু'ভাবে হ'তে পারে—একটি হল তৎকালীন জনজীবনের ব্যাপক চিত্র প্রকাশে, অন্যটি হল প্রেমকাহিনীর বিস্তারে। প্রথমটির উপাদান যোগাড় ক'রে তাকে যথাযথ রূপায়িত করা শক্ত। তাই প্রমথনাথ দ্বিতীয় পথটিই গ্রহণ করেছেন। প্রেমকাহিনীর বৃত্ত রচনায় প্রমথনাথ সিদ্ধহস্ত। সেদিক থেকে পান্নাবাঈ, তুলসী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে লেখক সযত্নে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। বাহাদুর শা, বেগম জিনৎমহল, জেনারেল আর্চডেল উইলসন, জেনারেল নিকলসন প্রভৃতি অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইতিহাসের কাঠামোর উপর রং চড়িয়ে তিনি এদের প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন। লেখক স্বীকার করেছেন— বঙ্কিমের সময়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহে যে অসুবিধা ছিল, বর্তমান কালে তা দূরীভূত হয়েছে। প্রমথনাথ নিষ্ঠা সহকারে ঐতিহাসের সেই উপাদানকে কাজে লাগিয়েছেন। 'লালকেল্লা'-- এই উপন্যাসে প্রতীক হয়ে উঠেছে। মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের একমাত্র সাক্ষী এই লালকেল্লা। তার অন্দরমহলে আলোড়িত হচ্ছে- ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ। তাই লেখক সার্থকভাবেই এই নামটিকে গ্রহণ করেছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় প্রমথনাথের আদর্শ যে বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন প্রমথনাথ। তিনি যথার্থই গুরু ধরেছেন, কারণ বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাহিক উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু শুধু গুরুবরণ নয়, গুরুর মর্যাদা রক্ষা করতেও তিনি সমর্থ হয়েছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদের নামকরণে তিনি যেমন 'রাজসিংহ'র রীতি রক্ষা করেছেন, তেমনি ইতিহাসের বর্ণনায় বঙ্কিম-রীতিকেই গ্রহণ করেছেন। তাই বাংলাসাহিত্যে 'লালকেল্লা' আর এক সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী'' (আশ্বিন ১৩৬৫) কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত বাংলা উপন্যাসের মধ্যে যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি প্রমথনাথের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার একটি পর্যায় এতে প্রকাশিত। "১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ সালের ইতিহাস এর কাঠামো।' লেখক ইতিহাসের সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে চেয়েও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বয়স বাড়িয়ে তাঁকে কাহিনীর মধ্যে আনার লোভ সম্বরণ করতে না পারার কথা স্বীকার করেছেন।

"দুই শ্রেণীর নরনারীর চরিত্র আছে উপন্যাসখানায়, ঐতিহাসিক আর ইতিহাসের সম্ভাবনা-সঞ্জাত। কেরী, রামরাম, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, টমাস, রামমোহন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। রেশমী, টুশকি, ফুলকি, জন স্মিথ, লিজা, মোতি রায় প্রভৃতি ইহিহাসের সম্ভাবনা-সঞ্জাত অর্থাৎ এসব নবনারী তৎকালে এই রকমটি হত ব'লে বিশ্বাস।"

এই দুই ধরণের চরিত্রের সমাবেশে ইতিহাস হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত।

কলকাতা শহরকে প্রমথনাথ একটি বিশেষ মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। কারণ-- "ভারতের প্রাচীন ও নবীন যুগের সীমান্তে অবস্থিত এই শহর।" লেখক গবেষকের চোখ দিয়ে সেই কলকাতার জন্মের ইতিহাস যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি সেই সময়কার কলকাতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন।

কেরী সাহেবের মুন্সী হলেন রামরাম বসু। এই রামরাম বসুর তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিতে লেখক কার্পণ্য করেননি। "রাম বসুর জন্ম খুব সম্ভব ১৭৫৭ সালে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভূমিকায় সে লিখেছে —'আমি তঁহারদিগের (প্রতাপাদিত্যের) স্বশ্রেণী একই জাতি', কাজেই তাকে বঙ্গজ কায়স্থ গণ্য করা যায়। 'তাছাড়া প্রচলিত

জীবনকাহিনীতে তার জন্ম স্থান চুঁচুড়া ও শিক্ষাস্থল ২৪-পরগণার নিমতা গ্রাম বলে উল্লিখিত আছে।" ইত্যাদি।

কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে কেরীসাহেবের মুন্সীকে আনা হলেও, লক্ষ্য হল সমসাময়িক যুগ ও সমাজ। তাই লেখক যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সমসাময়িক কালের খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সামগ্রিকভাবে এই উপন্যাসের আকর্ষণ অনবদ্য।

'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরই আগস্ট' বিংশশতাব্দীর ৪৭ বছরের ইতিহাস। কেরী সাহেবের মুন্সী শেষ হয়েছে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে। ১৮২০ খ্রীঃ থেকে ১৯০০ খ্রীঃ —এই ৮০ বছরের ইতিহাস লেখার ইচ্ছাও প্রমথনাথ পোষণ করেছেন, কারণ —"ঊনবিংশ শতক বাঙালী জীবনের অফুরন্ত সোনার খনি।"

'পনেরই আগস্ট', ভাদ্র ১৩৮৫-তে প্রকাশিত হয়, রচনা শেষ হয়েছে ১৯৭৭ সালে। "এই উপন্যাসের সূচনাকাল বঙ্গভঙ্গের অবসানে, আর সমাপ্তি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।"

দিনাজপুর ও রাজশাহীর সমন্বয়ে দিনাজশাহীর (স্রষ্টা ঔপন্যাসিক প্রভাত মুখোপাধ্যায়) কয়েকটি মধ্যবিত্ত পরিবার এই কাহিনীর পাত্রপাত্রী। "মূল চরিত্রগুলি অনৈতিহাসিক হলেও সমসাময়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও চরিত্র উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছেন। লেখক তাঁর বিশ্লেষণে যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা দেখাতে পেরেছেন এমন কথা তিনি নিজেও দাবী করেননি। তবে তাঁর মত হল তিনি এই যুগকে তাঁর নিজের মত ক'রে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এত নিকটবর্তী কালের ইতিহাস রচনার যে ঝুঁকি আছে তা তিনি মেনে নিয়েছেন।

'সিন্ধুনদের প্রহরী', 'শাহী শিরোপা', 'হিন্দী উইদাউট টিয়ার্স', 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস ও উপন্যাসোপম গল্পে প্রমথনাথ বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেছেন।

প্রমথনাথের উপন্যাসগুলিকে প্রধানতঃ দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায় —ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে কেন্দ্র ক'রে একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চেয়েছেন। ফলে কখনো কখনো তাঁকে কাল্পনিক কাহিনীকেও অবলম্বন করতে হয়েছে (বিপুল সুদূর তুমি যে)।

সামাজিক উপন্যাসে তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতার এক বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে আছে উত্তরবঙ্গের স্থান-কাল-পাত্র। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও অনেকক্ষেত্রে যেখানে কাল্পনিক চরিত্র এনেছেন, সেখানেও এই অঞ্চলের পাত্র-পাত্রী প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক প্রমথনাথের সঠিক স্থান নির্ণয়ে সবচেয়ে বড়ো বাধা তাঁর লেখনীর বহুমুখীনতা। কবি, নাট্যকার, গল্পকার, প্রবন্ধকার প্রমথনাথের বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে একমুখীনতা দিতে পারেনি। তাঁর উপন্যাসে রোমান্টিক মেজাজ তাঁর কবিধর্মেরই অন্যতর দিক। নাট্যকার প্রমথনাথ যেখানে তীক্ষ্ন ও ব্যঙ্গপ্রবণ, সেখানে তিনি জি. বি. এস. কেই আদর্শ করেছেন. উপন্যাসে অবশ্য কিছু কথোপকথন ও চরিত্রে এই শাণিত তরবারির ঝিলিক দেখা গেলেও শেষপর্যন্ত রক্তপাত ঘটায় নি। গল্পকার ও ঔপন্যাসিক প্রমথনাথ একই সত্তা।

তবুও গল্পকার হিসাবে তিনি যতখানি সার্থক, ঔপন্যাসিক হিসাবে ততখানি নন। তার প্রধান কারণ প্রমথনাথের বৈঠকী মন ও হাল্কা মেজাজ —ছোটগল্পের বাতায়নে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, উপন্যাসের প্রাসাদে সেরকম স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেনি।

প্রথমদিকের উপন্যাসগুলির দুর্বলতা লক্ষ্য করেই তাই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন —

"প্রমথনাথ বিশীর রচনায় প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের অনেক উপাদান বর্তমান। প্রকৃতি বর্ণনায় অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি ও রহস্যবোধ তাহার বাহিরের রূপও অন্তরের আবেদনের সুকুমার, কবিত্বপূর্ণ উপলব্ধি, ভাষার ইন্দ্রজালিক সম্পদ, অর্থগৌরবপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত রেখাবিন্যাসে বৃহৎ পটভূমিকার মর্মোদ্‌ঘাটন, স্থানে স্থানে মন্তব্যের গভীরতা ও চিত্তবিশ্লেষণকুশলতা —এই সমস্ত গুণই উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের ভিত্তিভূমি। কিন্তু তাঁহার রচিত, তিনখানি উপন্যাসে —'পদ্মা' (১৯৫৩) 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' (১৯৩৮), ও 'কোপবতী' (১৯৪১), এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা চরিতার্থ হয় নাই। লেখকের সমস্ত মানস ঐশ্বর্যের কেন্দ্রস্থলে ব্যর্থতার গূঢ় বীজ নিহিত আছে। তাঁহার প্রকৃতি-প্রতিবেশের সহিত তুলনায় তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি রিক্ত ও নির্জীব। কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির ও গভীর চিন্তাশীল মন্তব্যের সংমিশ্রণে ও ভাষাপ্রয়োগের অদ্ভুত নিপুণতায় তিনি যে বিচিত্র, কারুকার্য খচিত রাজপরিচ্ছদ বয়ন করিয়াছেন, তাঁহার স্বভাবদরিদ্র নর-নারীর অঙ্গে তাহা মোটেই শোভন হয় নাই।" (বঙ্গসাহিত্যে উপনাসের ধারা)।

আসলে প্রমথনাথ তাঁর উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের কালপ্রবাহকে ধরতে চেয়েছেন। আদিযুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রসারিত মানবসংস্কৃতি, তথা ভারতীয়, তথা বাঙালী জীবনবোধই তাঁর উপন্যাসের মূল সুর। সেই সুরটিকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি আদিম কাহিনীতে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, পরবর্তীকালে ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন এবং আধুনিক যুগে আধা কল্পনা ও আধা ঐতিহাসিক কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজের জটিলতা, সমস্যা তাঁর উপন্যাসে অনুপস্থিত।

আমাদের মনে হয়, সমালোচক প্রমথনাথ ঔপন্যাসিক প্রমথনাথের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত করেছে। উপন্যাস রচনার মধ্যে সাবলীলতা থাকা প্রয়োজন, প্রমথনাথের সমালোচক মন তাকে বারবার বাধা দিয়েছে। তিনি পারেননি কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে যেতে, তিনি পারেননি আধুনিক জীবন-জটিলতাকে খোলামেলাভাবে প্রকাশ করতে। তাই তিনি অতীতের মধ্যেই তাঁর পথ খুঁজতে চেয়েছেন। সেখানেও রয়েছে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী। কোথায় রয়েছে সেই অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের জগৎ যেখানে পাঠকের মন সহজে আকৃষ্ট হবে। সেদিক থেকে 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে তিনি অনেক বেশি সুযোগ পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের এই অনাবিষ্কৃত দিকটিতে তিনি সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। তবুও উপন্যাস রচনায় প্রমথনাথের কৃতিত্ব ও উৎকর্ষ আরও বেশি আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

নিখিলকুমার নন্দী

সরোজকুমার রায়চৌধুরী : মনুষ্য-সত্তার নিরপেক্ষ দ্রষ্টা

"একটি জীবন কখনই একক নয়। তার ওপর অনেক কিছুর প্রভাব পড়ে। পথ-পরিক্রমা সে একা করে না। মানুষকে জানতে গেলে, তার সেই পরিবেশকে ···সেই যুগকে ···আর যে-মাটিতে সে মানুষ হয়েছে, সেই মাটিকে জানতে হবে।" জীবনের প্রান্তে এসে সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২) তাঁর 'স্মৃতিকথা'র প্রারম্ভেই, আকস্মিক মৃত্যুতে যা দুর্ভাগ্যত অসমাপ্ত রয়ে গেছে, ঐ বাক্য-ক'টি লিখেছিলেন। খুব ভেবেচিন্তে নয়, স্বতঃস্ফূর্ত সত্যস্ফূর্ততায় লেখা ; কেননা তাঁকে যাঁরা কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা জানেন, সরোজকুমার কত আন্তরিক সততায় ঐ বক্তব্যের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসের এক প্রাণবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। আর তাই তাঁর সমগ্র কথা-সাহিত্য, সবিশেষ এখানকার আলোচ্য উপন্যাসগুলি, অন্তরের তাগিদে লেখা বলেই (অন্য কোন স্থূলপ্রয়োজনে নয়) তারা সংখ্যায় অল্প হলেও কিন্তু প্রভাবে-প্রতিনিধিত্বে-আবেদনে প্রবল ও গভীর। নিছক মানুষের জীবন তাঁর দেখার ও দর্শনযোগ্য বিষয় ছিল, যুগ-দেশ-দশক-মাটি-পরিবেশ-পটভূমি-সংলগ্ন যে-মানুষ তার ও তাদের ভালোয়-মন্দ, আলোয়-আঁধার-মেশা সম্পর্কের নানাবিধ দ্বিধা-বহুধা-বিরোধের দ্বান্দ্বিকতায় স্থূল-সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতে যুগপৎ চঞ্চল ও প্রচণ্ড এবং সময়বিশেষের নাতিতীব্র ঘটনাস্রোতে আনুপাতিক শান্ত-স্তিমিত। কারণ অন্তরতম মানুষ বা মনুষ্যত্ব সম্পর্কে সরোজ-কুমারের দৃঢ় ও গাঢ় প্রত্যয় ছিল ; তাঁর 'উত্তরতোরণ' উপন্যাসের 'পজিটিভ' নায়ক সুপ্রকাশের এই স্থির চিন্তা ও সিদ্ধান্তের অনুরূপ : "মানুষ অনেকগুলি সত্তার সমষ্টি। সে উদার, সে সংকীর্ণ, সে দাতা, সে কৃপণ। সে সবই। বিশেষ বিশেষ আবেষ্টনে বিশেষ সত্তা প্রাধান্য লাভ করে।" ফলে বিশেষ আবেষ্টন-গত মানুষের বিশেষ সত্তা-প্রাধান্যের স্বতঃস্ফূর্ত সত্যস্ফূর্ত অঙ্কন-মূর্তনই রূপস্রষ্টা। সরোজকুমারের ঔপন্যাসিক সাফল্য-সার্থকতার প্রথম ও শেষ কথা। অন্যভাবে বললে : **Objective reality** বা **conditions**-এর বিবর্তনে-পরিবর্তনে **Subjective reality**-র রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। তাই তাঁর 'কালোঘোড়া'র চূড়ান্ত 'ইভিল' শ্রীমন্ত কিন্তু 'ডেভিল' বা 'ভিলেন' নয়, অথচ এরকম 'ইভিল'-এর সত্যকার জলজ্যান্ত সৃজন বাংলা কথাসাহিত্যে একটি দুর্মূল্য দৃষ্টান্ত ; পরবর্তী কথাশিল্পী বিমল কর সম্পর্কেও যাকে দুরূহ চরিত্রের দুর্লভতা বলেছেন, সেই শ্রীমন্ত স্বয়ং তার স্রষ্টা যে কত ভারসাম্যযুক্ত সতর্ক-সচেতন ছিলেন তা তাঁর এই প্রাসঙ্গিক উক্তিতেই প্রতিফলিত হই : "আমি (তথাকথিত) ভিলেন এঁকেছি এভাবে, আমার মতে কোন মানুষই নিখুঁত ভালো নয়, নিখুঁত খারাপও নয়। শ্রীমন্তের ভেতরেও মানুষ জেগে ছিল।"—আপাত-অমানুষের মধ্যেও বিশেষভাবে এই মানুষ-জেগে-থাকাটার আবিষ্কারও সরোজকুমারের উপন্যাসে মর্মজ্ঞের এক বড় প্রাপ্তি। কোন অতিনাটকীয়তা দূরে কথা, নাটকীয় গতি-মতি রঞ্জনের ধারপাশ ঘেঁষেও তিনি কখনো বিচরণ করেননি : এত সহজ-স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ, সাবলীল প্রসাদগুণ বা 'grace' ও 'poise'-এ ভরা

মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পশৈলী তাঁর প্রধান কৃতিত্ব যে, মূল্যবুদ্ধিদীপ্ত সর্বদিক-খোলা, চারদিক-দেখা চোখ-মন-বোধ ও বোধির বিচক্ষণতায় তিনি সেকালের-একালের একপেশে সিকিসত্য-'অর্ধসত্যে'র 'কামাচ্ছন্ন'তা সাধ্যমতো পরিহার করে অলডুস হাকস্‌লি-কথিত 'whole truth'-এর সন্ধান-সাধনা-সিদ্ধির পথ্যাতিবাহনে যেন বহুলাংশেই সফল হয়েছিলেন। 'মানুষ'-নামক বিষয় তাঁর যাই হোক, যে-স্তরের হোক, ছোট-বড়-মাঝারি যাকেই তিনি ধরেছেন, একাগ্র-একান্ত-নিশ্চিত করে, তার গভীরে গেছেন এবং বিচিত্র বিপরীতে গড়া তার সম্পর্কে মৌন মূল্যবোধের যথাযথ পরিচয়দানে একটুও পিছিয়ে থাকেননি। সেই তাঁর সক্ষমতা-সুদক্ষতায় প্রধান সহায়ক হয়েছে তাঁর প্রকৃষ্ট নাট্যোকারোচিত জীবন্মুক্তি ও নিরাসক্তি, যুগপৎ গৃহী-পথিক, সংসারী-সন্ন্যাসী 'জীবনরসিক' মুক্তপুরুষের মন-মানসিকতা, যাকে ঘিরে নিত্য বিরাজ করত "জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা নির্লিপ্ত অথচ সহৃদয় মনোভাব," সমুন্নতা হিউমার-এর যা 'মূল উৎস'।

"জ্বালা, মর্মপীড়া বা ন্যায় অন্যায়বোধের আক্রোশ ত নহেই —কোন উচ্ছ্বাস বা অবসাদের অভিব্যক্তি যা পরিপাটি লক্ষণ নয়", তা তাঁর আদ্যন্ত-প্রমাণিত পরিহাস-প্রবণতার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাই "মানুষের সর্ববিধ নির্বুদ্ধিতা,—তাহার অহংকার, স্বার্থপরতা, এবং বিশেষ করিয়া ভাগ্যের পরিহাস-নিষ্ঠুর পীড়নে মানুষের যে চিরন্তন অসহায় অবস্থা—তাহার সম্বন্ধে অতিশয় ধীর বুদ্ধি ও আক্ষেপহীন মনোভাব রক্ষা করিয়া, সেই সকলের উপরে একটি লঘু-হাস্যের আলোকপাত করার যে প্রতিভা বা রসবোধ", তাই যেহেতু খাঁটি 'হিউমার'-এর উৎপত্তির উৎস, সরোজকুমারকে উক্ত শ্রেণীর পরিপাটি লেখকরূপে "সাধারণ মানবীয় (পূর্ব) সংস্কারের কিছু ঊর্ধ্বে" সদাজাগ্রত দেখা যায়। "যে-সহৃদয়তার অভাবই 'অরসিকতা'র কারণ -তাহার মূলে এই 'sense of humour'-এর অনটন লক্ষ্য করা যাইবে। সাধারণ কথাবার্তার ভাষায় 'sense of humour' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাকেই আরেকটু সূক্ষ্ম ও গভীর করিয়া লইলে এই রসিকতার লক্ষণ মিলিবে। স্থান-কাল-পাত্রোচিত সামঞ্জস্যবোধ বা 'sense of proportion' না থাকিলে আমরা যেমন মানুষকে হীনবুদ্ধি বলিয়া নিন্দা করি, তেমনই, মানুষের জীবন, তাহার চরিত্র ও ভাগ্য সম্বন্ধে যাহার মনের মধ্যে একটি ভারসাম্য বা স্থিরবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে নাই " সেই অর্থে যে-'অরসজ্ঞ' বোঝায়, সরোজকুমারের সাহিত্যিক অবস্থান তেমন ব্যক্তির থেকে শতহস্তেন দূরে। এই যে প্রসন্নতাযুক্ত ভারসাম্য (মূর্তন) শান্তির মনোভাব বা 'stoic' বলিষ্ঠতা, তাতে "কোন তত্ত্ব সন্ধান বা সত্যজিজ্ঞাসার তেমন কোন উৎকট বাধ্যবাধকতা বা প্রবৃত্তি নাই, একটা সামঞ্জস্যবোধের রসকল্পনাই আছে" —যেজন্য আমরা এই 'মানবধর্ম'কে জীবনরসিক বুদ্ধি (Poetic Reason) বলিতে পারি'। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাপ-পুণ্য -মানুষের শক্তির অহংকার ও অশক্তির দৈন্য —এই রসকল্পনায় একটি সমান ভাবরসে অভিষিক্ত হইয়া যে-রূপ ধারণ করে তাহাতে (বক্রোক্তি বা শ্লেষ-ব্যাঙ্গাত্মক) হাস্যরসের কোন জ্বালা বা আক্রোশ থাকে না; ইহাতে করুণরসের মধ্যেও একটা উদাসীন নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা নিহিত থাকে।"

আর এই সুনিহিত 'sense of humour'-এর স্বর্বিশিষ্ট রসবীর্যেই যেন সরোজকুমার ক্রমাগত তাঁর নিকট-দূর অভিজ্ঞতালব্ধ সংসার-সমাজের চালচিত্র-'আবেষ্টন'-সহ চরিত্র-মূর্তনের 'সত্তা'-স্বতন্ত্র মৌল মানবমূল্যবোধের আনুপাতিক মনুষ্যত্ব-সত্যে পৌঁছতে চেয়েছিলেন, পেরেছিলেন।

তাই ত্রিশের দশকী তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বন্ধনী'র ঔপনিবেশিক বন্দীত্বমোচনের একটি বিশেষ সাহসিক প্রযত্ন-প্রয়াসের পাশেই পরের বছর অনায়াসেই ফুটে বেরয় দ্বিতীয় বই 'শৃঙ্খলের' অরাজনৈতিক ও অমানবিক এক কারাজীবন, ব্যক্তির স্বাধিকার-প্রমত্ত 'উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা'র বিচিত্র নৈরাজ্য। অতঃপর গ্রাম-ভেঙ্গে-আসা জীবিকার্জনী কার্যকারণে মাত্র, গড়ে ওঠা কলকাতা মহানাগরিক মেসজীবন মধুচক্রের কটি টিপিক্যাল জটিল কৃত্রিম নিম্নবিত্ত বিড়ম্বিতদের বাতিক বেকারের স্কেচ রচনার সঙ্গেই 'পান্থনিবাসে'র পাতায় পাতায় ঐ নিম্ন-মধ্যবিত্তদেরই সঙ্কীর্ণ চিত্ত দিনগত পাপক্ষয়ের সংকীর্ণ-চিত্ত নানা বাধ্যতা-বশ্যতা-দাসত্বের জটিলতর জীবনযন্ত্রণা 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' আবদ্ধ কিছু অসহায়-নিরুপায়ের দুর্লভ আলেখ্যবৎ বিচিত্রিত হয়ে ওঠে। এর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই 'মধ্যবিত্ত-মদির-জগতে'র অন্ধকারে 'মহানগরীর মৃগনাভি'-ভালবাসার সাময়িক অবসান সুযোগে সরোজকুমারের বিশ্রুততম কীর্তি 'নূতন ফসল' ট্রিলজি যথাক্রমে ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোত-সোমলতায় ফ'লে ওঠে। সেকাল পর্যন্ত অল্প-অধিগত পল্লীবাংলার সহজ-স্বভাবী চাষী বাউলদের আশ্চর্যজনক বিস্ফুত জীবনায়ন —তৃণমূলে জড়িত সেই সাধারণ লোকজগতেও অসাধারণ সব দ্বিধা স্ববিরোধ ঘটিত আত্মবিরোধ ও তার থেকে মুক্তিলাভের যথাসম্ভব চেষ্টা নদী-নারী-নরের মাঠভাঙ্গা 'মাটি মাখা' জীবন-জীবিকার অন্তর্গত পাশ টানাপোড়েন, কায়ক্লেশ, মনঃকষ্ট সবই ব্যষ্টি-সমষ্টি-দর্শনী এমন এক চিরকালজয়ী অপূর্ব 'দর্শন' হয়ে উঠেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়'-এ 'সোমলতা' অংশ পড়েই বিস্ময় প্রকাশ করে পরোক্ষ স্বীকৃতি ও স্বাগত জানিয়েছিলেন ; সঙ্গে অবশ্যপ্রাপ্য ছিল সমকালীনদের সমাদর — 'মোহিতলাল শ্রীকুমার থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তেমন অনেকের না হোক, কয়েকজনের থেকে তা কম-বেশি মিলেছেও। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাঙ্কেতিক সমুল্লেখটি এ প্রসঙ্গে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। 'বাংলা সাহিত্যে কল্লোল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ' বলে তার ইতিবাচক ভূমিকার যে-অংশে সমধিক অভিনিবেশ তিনি দিয়েছিলেন, তথা এই যে বাক্যকটি : "কল্লোলের মাধ্যমে যে নতুন জীবনচেতনা, যে নতুন সাহিত্যাদর্শ জন্মলাভ করেছিল, আজকের প্রগতিবাদী সাহিত্য তো সেই নতুন পথেরই অনুসারী। প্রাক্‌কল্লোল কালে বাংলাসাহিত্য ছিল বিদগ্ধজনের সাহিত্য। কিন্তু কল্লোলের তারুণ্য এক মুষ্টিবদ্ধ 'চ্যালেঞ্জ' নিয়ে। গ্রামের কৃষাণী এসে নায়িকা হল সাহিত্যের, ক্ষেতখামারের চাষী সম্মানিত নায়কের আসন পেল গল্প-উপন্যাসের।" বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'কল্লোল' নয়, 'কল্লোলের কুলবর্ধনে'রাই কৃষাণীকে সাহিত্যের নায়িকা করলেন প্রথম, বা ক্ষেতখামারের চাষীকে 'সম্মানিত নায়ক' —তার প্রথম গৌরবজনক ও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তটি সরোজকুমারের পূর্বোক্ত ট্রিলজির 'কৃষাণী' নায়িকা বিনোদিনী এবং নায়ক তার 'চাষী' স্বামী হারান, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যের দিক থেকে আমরা নিঃসন্দেহ। সুতরাং মানিক

নির্দেশকে প্রসঙ্গত সবচেয়ে শিরোধার্য করে তারাশংকরেরও প্রায়ানুরূপ একটি সূত্রকে উল্লেখ করব—কতকটা সমতুল্য বলে। তিনি তাঁর 'লেখার কথা' রচনায় তাঁর আবির্ভাব সময়টিকে এভাবে দেখেছেন, সমকালীন সত্য হিসেবে অপরিহার্যতাবশতঃ "প্রথম যখন সাহিত্য সাধনার পথ বেছে নিই তখন ১৯১৯-৩০ সাল·· তখন বাংলা সাহিত্যের আসর জমজমাট। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র আছেন, নতুন একাদশ আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের হাতে নবীন ভাবনার এক অস্পষ্ট-রঙা ঝাণ্ডা। কিন্তু তাঁরা নির্ভীক এবং হয়ত কিছু বেশী দৃপ্ত।· যুগধর্মে বিপ্লবের অগ্রগামী বিদ্রোহের কাল। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, প্রবোধ, বুদ্ধদেব, সরোজকুমার প্রতিষ্ঠার আসরে সীমান্তভূমে হাজির হয়েছেন। বিভূতিভূষণও একটি স্বতন্ত্র পায়ে চলা পথ ধরে· " ইত্যাদি। তালিকায় নামকটির যথাস্থানটিই বিশেষত লক্ষণীয়। প্রথম পাঁচজন কল্লোলের নিশ্চিত প্রতিভূ। সেরকম কল্লোল প্রতিনিধিরূপে সরোজকুমার কখনই গণ্য হবেন না. তিনি বরং একলা মানিক নন, বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ীর মতোই 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। তাই প্রথম পাঁচজন 'কল্লোলে'র ঘনিষ্ঠের পরই ষষ্ঠ-স্বতন্ত্র হিসেবে সরোজকুমার সঠিক সীমানায় উপস্থাপিত রয়েছেন এবং পথের পাঁচালী-সহ 'বিচিত্রা'য় মাথা-তোলা বিভূতিভূষণও যথাযথ সপ্তমে উপনীত। সরোজকুমারের কাছে তারাশংকরের ব্যক্তিগত ঋণ বা কৃতজ্ঞতার কথা তাঁরই 'সাহিত্যজীবন' থেকে প্রাসঙ্গিক ক্রমে আরো উদ্ধৃত করা সম্ভব ; এখানে সরোজকুমারকে উৎসর্গিত তারাশংকরের স্বনামধন্য গ্রন্থটি 'গণদেবতা' উল্লেখ করি সবিশেষ এইজন্য যে, 'নূতন ফসল'-এর লেখককে উপযুক্ততম উৎসর্গযোগ্য হিসেবে তারাশংকর-পক্ষে 'গণদেবতা' যেন অনিবার্যতই সুসঙ্গত।

তাঁর আত্মস্মৃতিতেই প্রমাণ, সরোজকুমার নিজের বিষয়ে কথা বলায় কত সংকুচিত ও বাক্য-ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন, যার ফলে 'অনুক্তে' প্রকাশিত সেই অসমাপ্ত 'আত্মকথা'র দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অপরের কথা—পূর্বোদ্ধৃতে এই লেখকেরই বলা 'সেই অন্য অনেক কিছুর প্রভাব'-'পরিবেশ'-'যুগ' ও 'মাটি'র কথাতেই তা পূর্ণ, তাঁর 'মানুষ'-হওয়ার সেই বৃত্তান্তে তিনি নিজে নগণ্য নন, তবে গৌণ—অন্যান্য আত্মকথায় যেখানে অহং-স্বয়ংমুখ্যতাই প্রবলভাবে ব্যক্ত, সেখানে সরোজকুমার নিজে অত্যন্ত আত্মসংবৃত ও স্বল্পভাষিত। অথচ এই একই ব্যক্তি তাঁর 'কাছে বসে শোনা' কথায় তাঁর সমকালীন অনুজপ্রতিম সাহিত্যিককে অমোঘ আত্মপ্রত্যয়েই বলেছিলেন : 'যা দেখিনি তা লিখিনি এবং যেটুকু করেছি অন্তরের তাগিদে করেছি, অন্য প্রয়োজনে নয়।'—তখন তাঁর তুলনামূলক রচনা-সংখ্যাল্পতা এবং প্রায় সব রচনাতেই তাঁর সেই বিশেষ নিজে-দেখার 'personal experience'-এর ঘনিষ্ঠতায় পাত্রপাত্রীদের অবস্থা বা 'আবেষ্টন'-সাপেক্ষ স্বাভাবিক-সঙ্গত আচার-আচরণ ও স্বচ্ছন্দ-সাবলীল সংলাপেই এত যথেষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, প্রত্যক্ষবৎ সেই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সত্যস্ফূর্ত প্রাণবন্ততায় তিনি আর তাই আদৌ উপযাচক হয়ে তাদের স্ব স্ব সুখ-দুঃখে স্বেচ্ছারোপিত হন না ; নিরপেক্ষ দর্শক ও দ্রষ্টা হয়ে থাকাতেই যেন তাঁর স্রষ্টা ও সৃজনগত সার্থকতা সম্যক বৃদ্ধি বা সমৃদ্ধি পায়। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর সেই কবেকার সোনার মত মূল্যবান পুরোনো উক্তিটি সরোজকুমারের

এই বড় ব্যতিক্রমী নিরপেক্ষ-সক্ষম ভূমিকাটির ক্ষেত্রে তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয় : **"There are many truths of which the full meaning can not be realised until personal experience has brought at home."** মনে রাখতে হবে 'personal experience', 'personal presence' নয়—তা-ই brought it (full meaning-এর realisation) home'—ওপাড়া-এপাড়া গ্রাম-নগর নির্বিশেষ যেটুকু বিচিত্রচারী হয়েছেন তিনি, এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্বোপার্জনেই হয়েছেন—'বাহিরের প্রাঙ্গণের ধার' থেকে অনায়াসে 'দুয়ারটুকু' পেরিয়ে মৌল 'সত্তা'র ভিতরে বা অন্তরে প্রবেশ করেছেন। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইতিপূর্বে কিছু দিয়েছি, অতঃপর আর একটু বিশদ করে কটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে দেব।

বস্তুতপক্ষে দুই বিশ্বযুদ্ধমধ্যবর্তী বিশ্বমন্দা ও পরাধীন ভারতসংকট-এর বহুধাব্যাপ্ত বিশত্রিশদশকী সন্ধিলগ্ন থেকে ষাটের দশকী ক্রমান্বিত-জটিলকুটিলতার কালপর্ব পর্যন্ত এদেশী মানুষদের (গ্রামীণ-নাগরিক দুইই, সমমূল্যে সমমর্যাদায়), জয়-পরাজয়, ক্ষয়-অবক্ষয় মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন উপযুক্তপটভূমিসমেত যেমন বিশ্বাস্য দলিল ও আলেখ্য হয়ে তাঁর প্রতিনিধি সৃষ্টিকর্মে যুগপৎ ফুটে উঠেছে, তা অন্তত এহেন সুস্পষ্ট ভাবে-ভাষায় অকপট 'সত্যচিত্রণে' অন্যত্র দুর্লভ। যেন ধারাবাহিক মহিমাচ্যুত তাদের ক্রমাবনত মুখশ্রী-মুখোসের গ্লানি ও শ্লানিমা (অখণ্ড ও খণ্ডিত ভারতের আর্থ-রাজনীতিক বাতাবরণে) বিংশশতকী বাংলা ও বাঙালির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জটকূট-ব্যাধিত দেশ-দশক-পরিবেশ-পরিস্থিতির যথাযোগ্য বাধ্য-ব্যাহত জনক-জাতক তারা !—শিকার ? বহুলাংশে তাও। স্বয়ং লেখকের কথায় তাই : "বিচিত্র ঘটনার সংঘাতে অথবা একটা বিশেষ পটভূমিকার সামনে (তাদের) মানব-মনের যে অপরূপ প্রকাশ" অপরূপ ?—অপূর্ব-সুন্দর ও অপহৃতরূপ হতশ্রী উভয়ার্থে -তা-ই তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির আয়তক্ষেত্রে স্বোপার্জিত বা কর্ষিত নতুন ফসল। আজন্ম গ্রামের মাটি ও আযৌবন শহুরে অ্যাসফল্ট-কংক্রিটের 'কাছাকাছি'-থাকা উভচরতায় পারঙ্গম এই লেখকটির মূল পুঁজি ও পাথেয় তাই তাঁর সুস্বায়ত্ত অভিজ্ঞতার সুনিয়ন্ত্রিত নিবেদন এবং সেই 'সহানুভূতি', যাকে তিনি পক্ষপাতী সমর্থন হয়ে উঠতে কখনই দেননি, কারণ তাঁর 'শৃঙ্খল' উপন্যাসের বিশ্বেশ্বর চরিত্রটির চেয়েও তিনি বেশি জানতেন যে, কার্য-কারণ-পারম্পর্য-শৃঙ্খলে জড়িত মানুষ সমবেদনা অর্থে সত্যকার 'বিচার'-'সুবিচার'টুকুই চায় : লেখক সরোজকুমার সর্বত্র তাই যেন প্রকৃষ্ট নাট্যকার সুলভ তাঁর 'নিরপেক্ষ সক্ষমতা'র 'পোয়েটিক জাস্টিস'কেই তাই স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে দিয়েছেন ; কোথায়ও নির্লিপ্ত বিষয়-বিশ্লেষণের স্বতঃস্রোতে স্বকণ্ঠকে আরোপ করেননি, পটভূমি সমেত পাত্রপাত্রীদের পরস্পর-সাপেক্ষ রূপে প্রতিভাত আচার-আচরণগত স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতাই যেজন্য তাদের প্রকৃত প্রাণের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সহজ সাবলীলতম সংলাপগুলিতে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি সত্যস্ফূর্ত, মূর্ত। তাই তাঁর উপন্যাসে পাত্রপাত্রী সম্পর্কিত নিজ মতামত-মন্তব্যের প্রকাশ তথা 'অনুপ্রবেশ' —একরকম নেই বললেই চলে, তাঁর পূর্বজদের পাশে তো বটেই, সমকালীন সহগামীদের সঙ্গেও এখানে সরোজকুমারের বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান চিহ্নিত। এখানে বলা আবশ্যক যে, আবঙ্কিম তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ত্রয়ী-প্রেমেন্দ্র পর্যন্ত লেখকদের মন্তব্য-

মতামত-মুখাপেক্ষিতা অধিকাংশ অলস বাঙালি পাঠক-প্রকাশকেরই এক অদ্ভুত মানসিক জড়ত্ব, লেখকের পক্ষপাতী মনোভাব-মন্তব্যপ্রিয়তায় চির-অভ্যাস যেন তাদের জন্মদোষ। তাই বিষয়বস্তু যাই হোক, ভাবে-ভাষায়-মনোভাবে পাঠকদের কাছে সেরকম সুলভগ্রাহ্য ও মনোহারী হওয়ার গোলামি থেকে দূরস্থিত থাকার খেসারত সরোজকুমারকে গুণতে হয়েছে। মমজ্ঞতায় শূন্যেগর্ভদের 'অহং'-আহত উপেক্ষা-ঔদাসীন্যে এবং তৎপ্রভাবিত সচরাচরদের অজনাদরে. এ যেন 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল (অ) বিদ্যার বিদ্যায়'। (আজ তো অবস্হা আরও শোচনীয় গিমিক-প্রবল 'চুটকি'-স্বভাবী 'রম্য' কথা-সাহিত্যিকদের প্রতি অতি মোহগ্রস্ততার সঙ্গে 'চলতি হাওয়ার পন্থী'দের বেজায় জয়বাদ্য. করতালি ও নগদ লাভের রমরমা বেড়েছে। পক্ষান্তরে কতকটা সরোজপন্থী নরেন্দ্রনাথ মিত্র-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-ননী ভৌমিকরা ইতিমধ্যেই প্রায়-বিস্মৃত। শচীন্দ্র-ননী ভৌমিক অবশ্য সম্প্রতি পুরস্কৃত হওয়ার দৌলতেই যেন আবার কিছুদিনের জন্যে বইয়ের 'বড়বাজারে' ফিরে এসেছেন।)

খ্যাতির প্রতি সরোজকুমারের ব্যক্তিগত বিখ্যাত ঔদাসীন্য ও নির্বিকার প্রচার-বিমুখতা ছাড়াও তাঁর একালের এহেন পাঠকহীনতার আর ক'টি সুযৌক্তিক হেতু-নির্ণয় করেছেন বাংলা উপন্যাস ও সরোজ-বিশেষজ্ঞ এক বিশিষ্ট গুণগ্রাহী : 'বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে যাঁরা বাংলা কথাসাহিত্যে নতুনত্ব এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর নাম নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়া উচিত। কিন্তু কোনদিন যিনি (স্নাতক-স্নাতকোত্তর) পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি এবং বনেদী প্রকাশকদের দোর-ধরা লেখক হতেও অরাজী বাংলা ছোটগল্প এবং উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁর স্থান (কিন্তু) সুচিহ্নিত, অথচ তিনি আধুনিক পাঠকদের কাছে প্রায়-অপরিচিত। তাঁর অন্যতম কারণ—সরোজকুমারের অধিকাংশ গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, ছাপা নেই।' এই অসহায়-নিরুপায়বৎ-বলা 'ছাপা নেই'-এর দৌরাত্ম্যে চাপা-পড়া একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ লেখকের বিশেষ মৌলিকতা মণ্ডিত রচনা-মাহাত্ম্য-মূল্য থেকে প্রকাশক-পাঠকদের এই বঞ্চনা-তঞ্চকতা এক রকম ক্ষমার অযোগ্য আত্মপ্রতারণারই সামিল। অবশ্য অস্কার ওয়াইল্ড্ তো কবেই বলে গেছেন (সেই 'yellow nineties' আবার পরশতকে ঘুরে এল) ঃ অধুনা আমরা দরদাম বা 'price'-এরই কদর করি, মূল্য বা 'value'-র সমাদর তো করিনে! সুতরাং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক 'valuable'-এরও নয়। এই কি 'সবশেষ' সান্ত্বনা হবে?

এখন দেখা যাক 'কল্লোল' 'কালিকলম'-এর লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন প্রকৃত কল্লোলীয় ছিলেন না! প্রেমেন্দ্র তাঁকে 'কল্লোল'-এর আপিসে প্রথম নিয়ে যান বটে, সরোজকুমার কিন্তু 'ফেরি-আর্টস্ ক্লাব'-জাত কল্লোল-কলা-কোলাহল থেকে স্বতঃস্বাতন্ত্র্যে দূরবর্তীই থেকেছেন, মৌল কল্লোলীয়দের 'কলাকৈবল্যবাদ' 'রবিদ্রোহিতা' ইত্যাদির 'রাজবেশ-পরা' 'নাট্য-ভঙ্গি', আত্যন্তিক পাশ্চাত্য-প্রবণতা তথা অসেতু-সম্ভব 'প্যান'-এর হামসুন ও সোস্যালিস্ট রিয়ালিজ্ম্-এর গোর্কিকে অপ্রস্তুত দেশ-কালে মেলাবার অহেতুকতায় আদৌ আগ্রহ দেখান নি ; বরং

তাঁর অতি-নিজস্ব খাঁটি অভিজ্ঞতার দৌলতে তিনি সহজেই 'রূপস্রষ্টা'র ভূমিকাসহ 'প্রবক্তা'রও সোদর হয়েছেন স্বচ্ছন্দে এবং মধ্যাত্রিশ দশক থেকে মধ্যচল্লিশ দশকে এমন সহজাত গতি-পরিণতির প্রতিষ্ঠায় পৌঁছে গিয়েছেন যে, 'কল্লোলের কুলবর্ধন' বলে অভিহিত মানিক ও অন্য দুই বন্দ্যোপাধ্যায় —এই ত্রয়ীরই তিনি সগোত্রীয় বলে উল্লিখিত হচ্ছেন এবং সমতুল্য বলে সুবিবেচিত হয়েছেন। সঠিকতম স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে। কেউ কেউ তাঁকে একালের দশজন প্রধান (major) ঔপন্যাসিকের একজন বলে যে অগ্রগণ্যতা দিয়েছেন, তার মূলেও সরোজকুমার সম্পর্কে সত্যোপলব্ধি ও যথামূল্যবোধ কাজ করেছে। এজন্য আদ্যন্ত সরোজকুমারের 'বিষয়ী-প্রাধান্য' নয়, 'বিষয়-প্রাধান্যই' (রবীন্দ্রাথের ভাষায় যা বিশশতকী আধুনিকতার মূলমন্ত্র হওয়ার কথা) প্রধানত দায়া বলে আমাদের সবিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। তিনি ১৯২৮-এ যে-'বন্ধনী' উপন্যাসের সূচনা করেন 'কল্লোল'-এর 'সোদর-সুহৃদ' রূপে বিশদ-বর্ণিত হলেও অনেক বেশি স্বদেশের শিকড়ে জড়িত ও ইতিবাচক 'উত্তরা'য় (স্বনামধন্য সুরেশ চক্রবর্তীর অনুরোধে) —অতুলপ্রসাদ সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ; কিন্তু 'বন্ধনী'র কারণেই নাকি ইউ. পি. পুলিশের ঘন ঘন উৎপাতে সরে দাঁড়ান তাঁরা এবং যেটি ১৯৩১-এ ত র প্রথমা রূপে গ্রন্থাকৃতি নিয়ে প্রকাশ পায়, সেটি তৎকালীন বঙ্গদেশীয়-ভারতবর্ষীয় একটি প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী তরুণ-তরুণীদেরই (কোন বড় নেতা-নেত্রীর উল্লেখহীন) অনেকান্ত-একান্ত অগ্নিবলয়ী কাহিনী, যুগপৎ দলিল ও আলেখ্য। এর পরেই রাজনৈতিক রচনা সম্পাদনার অপরাধে সরোজকুমার কারাদণ্ডিত হয়ে জেলজীবনের যে 'personal experience' সংগ্রহ করে আনেন, তারই যথাসাধ্য অশিল্প-অকপট-চিত্রচরিত্রশালার রূপাঙ্কন হিসেবে প্রকাশিত হলো তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'শৃঙ্খল'। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম কারা-কাহিনী। এ উপন্যাসটির অন্যতম বড় ভূমিকা এজ ্য অবশ্যগণ্য যে, রাজবন্দীদের অর্থাৎ 'কংগ্রেসী বাবুদের' (কোন চরিত্রের উক্তি মতো) কথা এতে যৎসামান্য উল্লেখিত ; বরং তাঁদের 'ফালতু' বলে উক্ত কোন রাজবন্দীরই সোনার বোতাম-চোর মহিম ও তার গুরুস্থানীয় সাইকোপ্যাথিক খুনে ব্যাভিচারী 'জেলবার্ড' বেস্টো প্রভৃতি (ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে) জাঁহাবাজ-জোচ্চোর-তহবিল-তছরূপকারীদেরই (এর কেন্দ্রে রয়েছে খুন-না-ক'রেও খুনী হিসেবে স্বেচ্ছা শাস্তিপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত সমাজ-হিতৈষী সৎকর্মী বলে পরিচিত বিশ্বেশ্বরের এক বিচিত্র গূঢ়ৈষাজাত মনস্তত্ত্ব') বিস্ময়কর সব ক্রিয়াকলাপ ও অস্তিত্বগত যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন আর্তনাদে-অবসাদে ক্ষিপ্ত-ক্ষুব্ধ এক (সেকালের পক্ষে) অত্যাশ্চর্য চরিত্র বিশ্বেশ্বরের বিকল-বিফল ইতিবৃত্ত।

সরোজকুমারের সংক্ষেপিত জীবনকথার (বর্তমান রচনাটির পরবর্তী অংশে যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক) একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, তিনি কলকাতায় এসে ন্যাশনাল কলেজে পড়া ও তৎপরবর্তী দীর্ঘকালীন সাংবাদিকতা-জীবিকায় সম্পৃক্ত থাকা-কালপর্বের বহুলাংশে এই মহানাগরিক 'টিপিক্যাল' মেসজীবনের বিচিত্র বাতিক-বিকারগ্রস্ত আরেক অবরুদ্ধ 'মানবমাত্রা'র জলজ্যান্ত সব অভিজ্ঞতায় একটানা অনেকদিন

ধরে সুসমৃদ্ধ হয়েছিলেন ; আর তারই বিশ্বস্ততম পরিক্রমা-পরিবেশন ঘটেছিল তাঁর অতঃপরবর্তী দুই পথিকৃৎ উপন্যাস 'পান্হনিবাস' ও 'মধুচক্র'-তে। বাংলা কথাসাহিত্যে এ-দুটির আর কোন (মেসজীবনেরই চারদেয়াল-জোড়া চারদিক দেখা) জুড়ি আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। শরৎচন্দ্র বসু-সুভাষচন্দ্রের 'ফরোয়াড'' পত্রিকা মধ্য ত্রিশদশকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য-সমুজ্জ্বল সাংবাদিকতার দীপস্তম্ভ হয়েও (এখানে কবি-প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথ দত্তও প্রথমদিকে একজন স্বেচ্ছাব্রতী সাংবাদিক শিক্ষানবিশ ছিলেন) নানা কারণে হঠাৎ নিবাপিত হলে সরোজকুমারও বেকার হয়ে যান এবং মুর্শিদাবাদের স্বগ্রামে ফিরে গিয়ে তাঁর ত্রিশের দশকী মহোপন্যাস 'নূতন ফসল', বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম 'ট্রিলজি' 'ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী-সোমলতা' রচনা করার সুযোগ পান ও তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ চাষী-বাউলদের জীবনসত্য ও দর্শনকে বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রে সঙ্গততম একীকরণে তুলে আনেন। 'সোমলতা' পর্বটি (বিশেষভাবে লক্ষণীয়) ঐ সুধীন্দ্রনাথেরই সম্পাদিত শ্রুতকীর্তি 'পরিচয়'-এর (কল্লোলে'র চেয়ে অনেক বেশি উন্নত-পরিণত) প্রকাশন ও পৃষ্ঠপোষকতা পায় এবং রবীন্দ্রপাঠে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অজ্ঞাতপূর্ব ও অভিনব বলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে।

'প্লেন লিভিং হাই থিঙ্কিং'-এর অন্যতম একালীন বিগ্রহ সরোজকুমারের পক্ষে ময়ূরাক্ষী-বিধৌত সহজিয়া-বৈষ্ণব-বাউল-প্রধান অঞ্চলের চাষী-বাউল-পরস্পর-পরিপূরক জীবনযাপন-পরম্পরাটিকে আত্মার আত্মীয়বৎ পর্যবেক্ষণে ও পরিস্ফুটনে যে বিরলদৃষ্ট গুণপনা-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, তার কোন সমকক্ষতা এ পর্যন্ত আর কেউ দাবি করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। 'জীবনযাত্রার বেড়া'-'বাধা'-পার হয়ে তিনি শুধু ওপাড়ার প্রাঙ্গণেই নয়, অন্তরে অন্তরে অনায়াসে প্রবেশ করেন এবং 'অন্তরে মিশালে যে অন্তরের পরিচয়' তার পরিব্যাপ্ত ও প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতার সম্যক উন্মোচন যেরূপ 'অবৈকল্যে' ও 'অকপটে' সম্ভব করেন, উত্তম শিল্পীজনোচিত নির্লিপ্ত রক্ষা করে অবশ্য, তার স্বরূপও সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত একটি অনন্যসাধারণ চাষী-বাউল সম্মিলিত সাধারণ 'মানবজমিন-আবাদের' সুমহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই উপন্যাসটির চিরকালীন আবেদন ছাড়াও একটি সমসাময়িক গুরুত্ব ছিল, আছে। সে প্রসঙ্গের প্রয়োজনে সেকালীন প্রগতিলেখক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে পূর্বোক্ত 'পরিচয়'-এর সম্পাদক ও 'Elitist' কবি-প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য পেশ করেন তাতে যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' উক্তিটিকে তাঁর তখনকার উপলব্ধিগত নিরীক্ষায় টেনে এনেছিলেন তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। এবং তিনি বলেছিলেন : " The problems of human relationship is the theme of all his poetry and the refrain of almost all his songs is the difficulty imposed by dead custom on the intercourse of individuals who, without this necessary union, remain unfulfilled and imperfect." মৃত হয়েও জীবিত প্রথাগত কুসংস্কারের বহুবিধ দাসত্ব-শৃঙ্খলের মানুষে-মানুষে আত্মসম্বন্ধের যে মিলন

(necessary union), বহুদিন যাবৎ অসম্পন্ন, যার ক্রমিক বিড়ম্বনা ও ধারাবাহিক বিপর্যয় বৃহত্তর বঙ্গীয় জাতীয় জীবনে কঠিন থেকে 'কঠিনতর অসুখ'-এর সঞ্চার-সংক্রমণে দুশ্চিকিৎস্য সব ক্ষত-ক্ষতিসৃষ্টি করে চলেছে, ইহলৌকিক মনুষ্যজন্ম-কর্ম-জীবনকে অপরিপূর্ণ ও অচরিতার্থ করে রাখছে সেই ব্যাধিবিকারগ্রস্ত অসহজ-অসরল সমাজ-সংস্পৃষ্ট ও আত্ম-অহমিকা-সৃষ্ট (সুধীন্দ্রনাথেরই সেকালীন স্বীকৃতি : 'আমাদের সংস্কৃতি-সঙ্কট মূলত শ্রেণীগত' আর তারই ফল স্বরূপ 'inevitable alienation of the (common man) reader from the most advanced writers of today'র দুর্গতি ও দুর্ভাগ্য) সেই নানা নিবর্ট-দূর অবরোধের থেকে মুক্তিসমস্যাই ছিল যেমন মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস চৈতন্যের স্বরূপ, তেমনি আধুনিক বিশশতকী সমধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-পীড়িত-বিস্তৃত জটিল মানব পরিবেশ-দূষণের মহামারী থেকে অব্যাহতি লাভের ভাবনাই হলো সরোজকুমারের মতো সাহিত্যিক সন্ধিৎসার আদত আবর্তকেন্দ্র। আর তারই পরিধিবিস্তার লেখক যেমন তাঁর স্বদেশ স্বভূমির প্রান্তে গিয়ে সম্পন্ন করেন 'তৃণমূল' জড়িত মানুষে-মানুষে সত্যকার সম্বন্ধ বন্ধনের গভীরে, সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রতিবাদী ভূমিকার সংলগ্ন করে যেমন দেখেন আমাদের চিরচেনা কৃষাণ-কৃষাণী সমাজের আপাত সহিষ্ণুতার অন্তরালবর্তী মগ্ন মনুষ্য 'সত্তার' গভীর অজ্ঞাত কলংক মহিমার সারবত্তাকে, তার যুগপৎ 'বিদ্রোহ' ও 'আত্মসমর্পণ'-এর 'আশ্চর্য দৃষ্টি', 'ক্রোধ' ও 'হতাশা'য় কৃষাণী বিনোদিনীর চোখে যা জ্বলে ওঠে স্থির অকম্পনে, তার আবাল্য সখি দুঃসাহসিক বাউলানী ললিতারই সঙ্গে অন্তরঙ্গতম ভাববিনিময়ের এক তুঙ্গ মুহূর্তে। আর তা মুহূর্তমাত্রকে পার করে মুহূর্তরাশির আলিঙ্গনে সত্যস্ফূর্ত স্বতঃস্ফূর্ততায় মূর্ত হতে চায়। সেই চাওয়াটাই বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এবং না-পাওয়াটা যে প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির অনিবার্য-অপরিহার্য জাতক কেন এবং কতখানি, তাও গভীর বিচার-বিবেচনাবোধে নাড়া দিয়ে উসকে দেয়, আর বলাবাহুল্য, আদৌ কোন উত্তর সমাধানে নিশ্চিত নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। এমনকি গ্রাম্য বাউল-বোষ্টমদের 'সহজ' জীবনের সাবলীলতাকে আধুনিক নগর-সভ্যতার নয়নভুলানো চটক ও চমক নানারকম অন্ধিসন্ধি করে ফাঁদ পেতে বন-হরিণীকে ব্যাধের নির্মম চাতুর্য কীভাবে ক্রমে ক্রমে প্রলুব্ধ, বশীভূত ও পরাস্ত করে এবং শেষ অব্দি গ্রাস করে নিতে চায় এই লেখকেরই পঞ্চাশদশকী 'তিমিরবলয়' দুখণ্ডে প্রেমদাস-বিচ্ছিন্ন রাধারাণীর দীর্ঘ পরাভবের বিশদ বিশ্লেষণে তা নিপুণভাবে ধরা পড়ে। আর ইতিমধ্যে চল্লিশ দশকের উৎকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের ব্যাধি 'বিবৃত ক্ষুধার ফাঁদে' বিসর্পিত বহু অভিনবচিত্র-চরিত্রের অভিশাপ-অপচয়-অবক্ষয় নানাবিধ মর্মান্তিক দৃশ্যে ও ভাষ্যে বাস্তব ঘটনাবলীর নিকট বিকট সাদৃশ্যে সার্থক রঞ্জনরশ্মি-পাতী অবলোকনে লক্ষ্যাবিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। একটার পর একটা যুগমনমানসিকতার ভূকম্পন যেমন নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে কোন নির্ভুল সিসমোগ্রাফের রেখাঙ্কিত সরণিতে—সে সব সাক্ষ্যগুলি তেমনি আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক নীতিবোধবুদ্ধির ক্রমবিবর্জিত মূল্যবোধের ধূলিধূম্রজালে কলঙ্কিত আমাদের জাতীয় জীবনের

সাংঘাতিক অধঃপতিত দিনরাতগুলির ভয়াবহ উৎপাতেরই ইতিবৃত্ত।—মহাযুদ্ধের ইতিহাসের চেয়েও কোন অংশে কি কম গুরুত্বপূর্ণ তার প্রত্যক্ষ আঘাতের বাইরে থেকেও যারা পরোক্ষভাবে আরও আক্রান্ত, রক্তাক্ত ও নিঃস্ব-রিক্ত-সর্বস্বান্ত? দুর্নীতির অন্ধকারে শ্বাপদসঞ্চারী মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশভাগ-এর মতো তথাকথিত 'মানুষ' নির্মিত বীভৎস উপদ্রবগুলি শ্রীমন্তরূপী 'কালোঘোড়া'র উন্মত্তপ্রায় ক্ষুরে ক্ষুরে বিভীষণ হয়ে ওঠে; 'prophetic novel' 'কৃশাণু'-তে শ্রীমন্তেরই যেন পরিণততর অনুরূপে নৃপেন স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েক বছরেই অসৎপথে আহৃত অর্থে-সামর্থ্যে প্রবল ক্ষমতাবান হয়ে কী ভাবে বহুকে বঞ্চিত ক'রে অনির্বচনীয় 'হুণ্ডি হাতে এমনকী নারীকেও নিয়ে যায়' এবং 'নীল আগুনে' (ষাটের দশকী) তাদেরই নব সংস্করণ উদ্বাস্তু বঙ্গবালাদের ধর্ষণ করে রিরংসার বিবস্ত্র নির্লজ্জ দুর্বিষহণ যে একালের আরেক বিকিকিনির বাজারে অম্লান বদনে ঠেলে দেয়। এই ক্রমপাতালগামী 'দ্বেষ'-এর নৈরাজ্য-নৈরাশ্যেও 'প্রেমের মণিকা আলো' (অনুষ্টুপ ছন্দের) সুচরিতাদের হাতে ক্ষণিক জ্বলে ওঠে এবং অভিনব 'নচিকেতা' বা অকস্মাৎ অনুকম্পীয় যমদ্বারে জীবনবৎ কুরূপা মেয়ের স্বরূপ-সৎগুণের মহত্ত্ব-মাহাত্ম্য সন্ধিৎসায় যেন উৎসাহ দেখায়। 'অতি সাময়িক' আশাবাদী লেখক এদেরও যথাযথ উপস্থিত উপনীত করেন। আর 'কালোঘোড়া'র আগেই আরেক যুগলক্ষণ বিশেষ অভিনিবেশ দাবি ক'রে যায় 'শতাব্দীর অভিশাপে', প্রজন্ম-ব্যবধান বা 'জেনারেশন গ্যাপ' তার অপ্রতিহত অবশ্যম্ভাবিতার সেই প্রথম মর্মস্পর্শী বিবরণ; 'মহাকালে'র পৃষ্ঠায় একদিকে বর্ণিত হয়ে ওঠে, ঘোর সামন্ততান্ত্রিক পিতার এক সমধিক অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল পুত্র ও তার সত্যকার প্রগতিশীল ভ্রাতার নিভৃত-বিপরীত ব্যক্তি-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ১৯৪৬-এর আর এক পাশবিক মনুষ্য কীর্তির প্রকাশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কীভাবে কোথায় আঘাত করে কতখানি সর্বনাশা হয়ে ওঠে, তার মূলে যার যার ভূমিকা যথাযথভাবে নির্ণীত হয় এবং জাতীয় দুর্দিনের দারুণ ঝড়-ঝাপ্টার ধাক্কায় গ্রাম্য সরল নারীরও একবগ্গা মন কখন অভিমানী বৃথাপচয়ের চেয়েও প্রকৃত প্রণয়ীর 'পজিটিভ' অভিপ্রায়ের প্রতিফলিত সংসক্রিয়কর্মে তৎক্ষণাৎ অনুকূল সাড়া দিয়ে বাঞ্ছনীয় আত্মরক্ষায় উৎসুক হয়ে ওঠে, তারও অনাড়ম্বর সত্যচিত্র আমাদের আজও বুঝিয়ে দেয় – বাঙালির জীবন ক্রমে ক্রমে দশকের বাঁকে বাঁকে এক আঘাটা থেকে আরেক আঘাটায় কী খামোকা বিড়ম্বনায় নিত্য-বিপর্যয়ে নিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিক সরোজকুমারের গভীরতাগামী বিচিত্র বিস্তার সৃজনক্ষেত্রগত এই যে 'এক নয় অনেকে'র 'পথ-পরিক্রমা', সংক্ষেপে তাঁর কথাসাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয়দের কতকটা উল্লেখ্যতার মুখ-পরিচয়টা সারা গেল। অতঃপর অনতি বিশদ রূপে দেখা দরকার, লেখকের পশ্চাদপটে ও অন্তর্মননে বিকাশবান তাঁর নিজ জীবনকথার ভূমিকা এবং অজ্ঞাত জগৎ-জীবনকে দেখা-দেখানোর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তথা 'দর্শন' শক্তির সদাজাগ্রত অভিব্যক্তির স্বরূপ। সেই অত্যাবশ্যককে মাত্র সারাংসারে তাঁর ক্রমজায়মানতায় একটু বুঝে নেওয়া যাক।

'এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ' : গান্ধী-দেশবন্ধুর এই প্রতিশ্রুতি-আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ (তথাকথিত 'গোলামখানা'র একটি) থেকে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীর ৩য় বর্ষ পাঠ ছেড়ে-ছুড়ে ক'বন্ধু মিলে প্রথম বহরমপুর স্টেশনে গিয়ে কুলিগিরি ক'রে যে অর্থ পেলেন তার প্রায় সবটাই স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে জমা দিতে-দিতে বুঝলেন, আইনসম্মত 'নিয়মিত' কুলিদের এতে বঞ্চনা করা হচ্ছে। বরং মুর্শিদাবাদী সিল্ক ('স্বদেশী' দ্রব্য)-এর প্যাঁটরা কাঁধে নাগপুর, পাটনায় পসরা করতে যাওয়াই দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর শ্রেয়তর বোধ হল। সেই কাজ করে কিছু বিচিত্র বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে স্বগ্রাম মালিহাটিতে ফিরে ক্রমেই সরোজকুমার নিঃসন্দেহ হলেন যে দুবেলা দুমুঠো আহার দেওয়া ছাড়া তাঁর বাড়ির আর কোন সঙ্গতি বা সম্বল তাঁর জন্যে অবশিষ্ট নেই। সুতরাং কলকাতায় গিয়ে সেকালের নিম্নমধ্যবিত্তদের দুটি মাত্র ভরসা 'টুইশন' ও 'মেস' জীবনের ধারা ধরলেন। আর সরাসরি ন্যাশনাল কলেজের কিরণশংকর রায়ের কাছে গিয়ে ৪র্থ বর্ষ স্নাতক শ্রেণীতে পড়ার সুযোগলাভ করলেন। প্রারব্ধ হলো তখনকার বঙ্গীয় 'মুকুটহীন রাজা' দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তাঁর দুই প্রধান সেনাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের স্নেহসান্নিধ্যে উন্নত মন ও মানের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবন-জীবিকাগত শুভ সংযোগ। সাম্মানিক বিষয় হিসেবে নেওয়া ইংরেজি পঠন-পাঠন উপলক্ষে 'সবুজপত্র' ও প্রমথ চৌধুরীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ-ধন্য কিরণশঙ্করের কাছে 'ম্যাকবেথ' অধ্যয়ন হলো সেই সঙ্গে তাঁর এক অবিস্মরণীয় উপরিলাভ। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র যত্নে পড়াতেন রাষ্ট্রনীতি-দর্শন। অংকও ছিল সরোজকুমারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এ সবই তাঁর পরবর্তী সর্বাঙ্গীন পরিমিতি ও ভারসাম্যমণ্ডিত সাহিত্য রচনার রীতি-নীতি নির্ধারণের প্রধান প্রাথমিক প্রস্তুতি। স্নাতকোত্তর জীবনে তাঁর সুযোগ পেলেই গ্রামমুখী হওয়ার প্রবণতা ও পুনরায় নগরে ফিরেও প্রাথমিক ইতঃস্তত ভাব কাটাতে সুভাষচন্দ্র-কিরণশঙ্করেরাই তাঁর দিশারী ও সহায়ক হলেন। ধরা-বাঁধার জীবনযাত্রায় অসহিষ্ণু সরোজকুমারকে সুভাষের জ্ঞাতার্থে 'পিছল ছেলে' বলে অভিহিত করলেন কিরণশঙ্কর এবং তাঁর সস্নেহ আগ্রহ বুঝে সুভাষচন্দ্র একরকম হাত ধরেই সেকালীন সুখ্যাত সাময়িকপত্র 'আত্মশক্তি'র দপ্তরে বসিয়ে দিয়ে এলেন তাঁকে। সরোজকুমার সুভাষবাবুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেই 'আত্মশক্তি' পত্রকে তাঁর সাংবাদিকতার প্রথম সোপান হিসেবে নিলেন বটে এবং সেখানকার যথাকর্তব্য সম্পাদনে কিছুদিন ব্রতী থেকে অতঃপর উত্তীর্ণ হলেন 'বৈকালী'-'প্রহরী'-'নায়ক'-'নবশক্তি'-'অভ্যুদয়' 'বাংলার কথা'-'ফরোয়ার্ড' পরম্পরায় প্রফুল্লকুমার সরকার-কালীন বহুল প্রচারিত 'আনন্দবাজারে'। সেখানে একটানা অনেকদিন অতিক্রম করলেন। ১৯৪৪-এ প্রফুল্লকুমারের পরলোকগমনের পরেও রইলেন কিছুদিন, তারপর মতাদর্শের কারণেই নতুন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবনিবনায় স্বাধীনচিত্ত, আপোষ-বিমুখ এই মানুষটি পরিবর্তিত প্রশাসনিক পরিস্থিতিকে মেনে নিতে অপারগ হন ও 'লুক্রেটিভ' আনন্দবাজারের পদস্থতায় একবাক্যে ইস্তফা দেন এবং কিরণশঙ্কর রায়-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চাশদশকী 'বর্তমান' সম্পাদনায় (সাহিত্য-

সাধনামাত্রের সাময়িক সান্ত্বনায়) ও পুরোসময়ের লেখক জীবনকেই 'শেষ পারানির কড়ি' হিসেবে সাব্যস্ত করেন। দত্তাপহরক একে একে তাঁর সব কেড়ে নেন — দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত। এমতাবস্থায় তার আকস্মিক প্রয়াণ ঘটে একটি বিরল নিঃসঙ্গ সচ্চরিত্রতার মহাবসানে।

এখানে একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয়। 'ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদী' কল্লোলীয়রা নাকি সমকালীন রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদেরই আর এক পিঠ। ওদিকে এসে যে তরুণ-সম্প্রদায় পিস্তল উঁচিয়ে ইংরেজদের শাসন-শোষণ-পীড়নের মোকাবিলা করতে পারেননি, তারাই নাকি কলমকে অস্ত্র করে তুলে কর্তা না হোক, কর্তাভজাদের বাসি-পচা-মরা সমাজব্যবস্থাকে আঘাতে আঘাতে উৎখাত করেছেন! নজরুলের 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ হওয়ার প্রাক্কালীন প্রসঙ্গে গোকুলচন্দ্র নাগের এই চিঠি অচিন্ত্যকে : ' পুলিশের কৃপাদৃষ্টি আমাদেব উপর পড়েছে আপিস দোকান সব খানাতল্লাস হয়ে গেছে, আমরা সবাই এখন কতকটা নজরবন্দী -1818 Act 3-তে।' আর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত পত্রসূত্রে : 'কাজীর বিষের বাঁশী নিষিদ্ধ হয়েছে। কল্লোলের আপিস ও দোকান খানাতল্লাসী হয়েছে। সকলের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড আশঙ্কাভীতি ···সি আই ডি-র উপদ্রবও কলকাতা শহরটাই তোলপাড় যারা ভুলেও কখনো রাজনীতি চিন্তা মনে আনেনি তাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেছে ' অচিন্ত্যকুমার লিখছেন : 'সেই সাড়াটা 'কল্লোলের লেখকদের মধ্যেও এসে গেল। চিন্তায় ও প্রকাশে এল এক নতুন বিরুদ্ধবাদ। নতুন দ্রোহবাণী। সত্য ভাষণের তীব্র প্রয়োজন ছিল যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনি ছিল অচলপ্রতিষ্ঠ স্থবির সমাজের বিপক্ষে'। এতে এক ধরণের আত্মতৃপ্তি মেলে বৈকি! প্রত্যক্ষ-বাস্তব নিকট-সম্মুখীন নানাবিধ সমস্যা-সঙ্কট ছেড়ে জল্পিত-কল্পিত বিরোধী শক্তির নামে উক্ত অদৃশ্য 'অচলপ্রতিষ্ঠ' স্থবির সমাজের বিপক্ষে তথাকথিত 'সত্যভাষণে'র সেই তীব্র প্রয়োজনবোধে বহু বিকৃত বানানো-ফেনানো দুঃখ বা ক্লেশের 'শৌখিন মজদুরি'-বৃত 'খ্যাতি করা চুরির' সেকালীন কিছু বিচিত্রিত নমুনা 'কল্লোল'-পরবর্তীদের তো মনে পড়বেই; কল্লোলীয় এক প্রধান ঋত্বিক স্বয়ং গোকুলচন্দ্রেরও, মনে বয়ঃবুদ্ধিতে তিনি অচিন্ত্যকুমারদের তুলনায় অনেক পরিণত ছিলেন বলেই, সে সম্পর্কে তার মনে বেশ সংশয় জমা হয়েছিল তখনই। পূর্বোল্লেখিত পত্রে তাই বুঝি তিনি অচিন্ত্যের দুঃখ বিলাস নিয়ে এমন একটা অব্যর্থ ঋতভাষণ করেছিলেন, বিশেষ বিশ্লেষণসহ আপাতকটু কথাক'টি লিখেছিলেন : (চিঠির দৃষ্টান্তে বলছি এজন্য যে, ওতেই লেখক-মনের অন্তঃপুর বেশি ধরা পড়ে) "তোমার প্রথমকার লেখা চিঠিগুলো থেকে যেকথা আমার মনে হয়েছিল তোমার পবিত্রকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে ঠিক সেই সুরটি পেলাম না। কোথায় যেন একটু গোল আছে। প্রথমে পেয়েছিলাম তোমার জীবনের পূর্ণ বিকাশের আভাস, কিন্তু দ্বিতীয়টা অত্যন্ত melodramatic। দেখ অচিন্ত্য, যে

বলে 'দুঃখকে চিনি', সে ভারী ভুল করে। 'অনেক দুঃখ পেয়েছি জীবনে' কথাটার সুর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। মনের যে কোন বাসনা, ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অতৃপ্ত থাকলেই যে অশান্তি আমরা ভোগ করি তাকেই বলি 'দুঃখ', কিন্তু বাস্তবিক ও দুঃখ নয়। যে বুকে দুঃখের বাসা সে বুক পাথরের চেয়েও কঠিন, সে বুক ভাঙ্গে না টলে না। দুঃখের বিষদাঁত ভেঙে তাকে নির্বিষ করে যে বুকে রাখতে পারে সেই যথার্থ দুঃখী।" সুতরাং তথাকথিত 'দুঃখ'-কে তুচ্ছ করে 'যথার্থ দুঃখী'র কথা বলাই তো যথাকর্তব্য। "অত্যন্ত promising হয়েও melodramatic monologue-এর সীমা এড়িয়ে যেতে" তাই তাঁর নির্দেশ : "প্রত্যেক ব্যক্তিগত অতৃপ্তি ও অশান্তির ফর্দ করে" সেই সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব —কেননা "সেটাকে মানুষ বলে সখের দুঃখ।" সুতরাং 'ব্যক্তিগত অতৃপ্তি'র বাইরে দাঁড়িয়ে 'সখের দুঃখ'-অতীত-উত্তীর্ণ হওয়ার দুরূহ সাধনাই প্রকৃত সাহিত্যিকের কর্ম ও ধর্ম বলে বিবেচ্য। সরোজকুমার ও বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যে সেটাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাধন করতে যথাযথ সক্ষমতা ও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। এবং কতকাংশে কল্লোলেরই শৈলজানন্দ, বহুলাংশে প্রেমেন্দ্রও। সরোজকুমারের আরও স্বাতন্ত্র্য এজন্য যে, সেকালের সচ্চরিত্র সাংবাদিকতায় ও আদর্শ বাস্তববাদী বিশিষ্ট মানুষদের কাছে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁর সাহিত্য-দর্শন-অঙ্ক পড়া ভারসাম্য-মণ্ডিত কাণ্ডজ্ঞানী যুক্তিবাদী মন তাঁর স্বায়ত্ত অভিজ্ঞতার সবকিছুকেই উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে বুঝতে চেয়েছে এবং কখনোই কোন প্রসঙ্গে একপেশে দৃষ্টি ও একঝোঁকা প্রবৃত্তি-প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তিনি নিজেই তাঁর সাংবাদিক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পরম লাভ বলে যে 'প্রকোষ্ঠ-বিভক্ত মনে'র অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তারই দৌলতে দেখা যায় মাত্র পাঁচসাত বছরের ব্যবধানে সব স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতাকে তিনি পক্ষ-প্রতিপক্ষ-ক্রমে ন্যায় ও যুক্তির বিন্যাসে সজ্জিত করে তুলেছেন এবং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনায়াসে সরে যাচ্ছেন। আর দশক-ওয়ারি বিচারে তাঁর উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে পরিণত থেকে পরিণততর সময়-সমাজ-স্বভাব-চেতনার ধারাবাহিক ক্রমাভিব্যক্তি : একটুও পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি তাঁর ক্রমবিকাশের পথচলাকে আচ্ছন্ন করছে না। বরং নানাবিধ অবরোধ-স্ববিরোধ ও মোহ থেকে তাঁর মন যথাসাধ্য মুক্তিলাভ ক'রে একটি স্থির-স্থিরতর প্রেমের প্রত্যয়ে দৃঢ়তর নির্লিপ্ততায় যেন ধ্রুবতারার মতো ধরতে চাইছে ; সব সত্ত্বেও খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন মানুষের এই প্রয়াসের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও যতদূর যাওয়ার চেষ্টা কোন যান্ত্রিকতায় নয়, আন্তরিকভাবে সম্ভব, তা নিয়ে একটির পর একটি তাৎপর্যপূর্ণ 'বিষয়' অবলম্বনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। আর সার্থক 'প্রাগমেটিকে'র মতো, প্রকৃষ্ট কোন নাট্যকারের মতো, সেই 'নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি' বা 'নিরপেক্ষ সক্ষমতা'কে আয়ত্ত করে ফেলছেন যাতে পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবন থেকেই উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, প্রশ্নে-পরিপ্রশ্নে, যুক্তি-প্রযুক্তিতে 'সত্যে'র দ্বিস্তর বহুস্তর মাত্রা পারিপার্শ্বিক বিষয়বস্তুগত সাপেক্ষতায় (objective co-relative)-এ ও ব্যক্তিবাদের আপেক্ষিকতায় (relativity) ক্রমাগত দিক-নির্ণয়ী আত্মপ্রকাশ করছে। মোহমুক্তি বা

জীবনমুক্তির (detachment) সতর্ক চিন্তায়-চেতনায় সে সবকে তিনি একটি সৌম্য বোধি-বুদ্ধির আলোয় যথাসম্ভব সৌষম্য দিচ্ছেন। ফলে কোন পূর্বনির্ধারিত bias (বা tabo বা prejudice বা dogma) তাঁর পক্ষে প্রায় কখনোই বাধা হচ্ছে না।

আর এজন্যই একদিকে তারাশংকরের খুব কাছাকাছি-পাশাপাশি বিচরণ করেও, কোন কোন 'বিষয়-স্বীকরণ-বিন্যাসে তাঁদের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও তিনি অনন্য হয়ে উঠেছেন তাঁর খোলামেলা চোখ-কানের দৌলতে এবং নির্মোহ যুক্তিবাদী মুক্তমনা অনুপ্রেরণার সৌজন্যে। আদি-মধ্য-অন্ত্য তারাশংকরে উৎকৃষ্ট প্রতিভার প্রমাণ যথেষ্ট মেলে, তবু তাঁর মধ্যে কিছু স্পষ্ট মতাদর্শগত একঝোঁকা রোখ ছিল, কিছু ভয়ানক পিছুটান ও রক্ষণশীলতা, ফলে শেষের দিকে তাঁর বহু সৃজনকর্মেই ফুটে উঠেছে কোন না কোন bias বা prejudice-জনিত পশ্চাদপদরণের চিহ্ন, সরোজকুমারে যা আদৌ অলক্ষণীয়, এমনকি অকল্পনীয়ও। মানিকের দ্বিজত্ব সবাই জানেন। ফ্রয়েড থেকে মার্ক্স-এ যাতায়াতে তাঁর তেজী প্রতিভা পর্যাপ্ত সাহস ও সৌকর্য দেখিয়েছে ; সঙ্গে কিছু বিশিষ্ট 'মুষ্টিযোগ' ও মৌল শল্য-চিকিৎসার ভঙ্গিমা, যাকে কখনো কখনো মুদ্রাদোষেও গড়াতে দেখা যায়। নির্মম ইতি-নেতির পক্ষপাত, দুশ্চিন্তিত চিরে চিরে বিচার-বিশ্লেষণের তির্যকভাষী তিক্ততা ও বিস্বাদ তাঁর উভয় পর্যায়েরই সামান্য লক্ষণ—'যেমন মেরুবিপরীত বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্ত প্রশান্তি তথা তাঁর নির্বিচার আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে ও প্রেমে প্রকৃতি আশ্রয়ের একমুখিনতা। এই ত্রিধারা থেকেই দূরস্থিত সরোজকুমারের সবিশেষ পাকাপোক্ত নৈর্ব্যক্তিক অথচ সমুদার বাস্তববাদিতা তাই যেন অনেকটাই সুধীন্দ্রনাথের 'অবৈকল্য'-'অকাপট্য' শব্দ ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে সর্বাধিক ভাবে, তাঁরই এই 'Liberal Retrospect'-এর আলোচনাংশ : "A true liberal is a confirmed realist who, realizing that instructive behaviour is impersonal, bases his individuality on the integral logic he has taught himself. He is, therefore, unafraid of opposition which he welcomes, as a corrective to his possible dogmatism." সরোজকুমারের উপন্যাস তাই তাঁর নির্মোহ জীবনমুক্ত দৃষ্টি ও দর্শন-প্রসন্ন বা প্রসাদগুণান্বিত রচনা মনোভঙ্গির যুগপৎ প্রকাশের নিশ্চিত দর্পণ, প্রতিকূল জগৎ-জীবনের অকুতোভয় মোকাবিলায় সবাস্তিবাদিতার নির্ভুল স্বাক্ষর। ফলে তাঁর মধ্যে পূর্বোক্ত অধুনা-দুর্লভ সহজাত প্রসন্নতা বা 'grace' তথা 'sense of humour' ও শুদ্ধ-গভীর জীবনরসরসিকতার স্বচ্ছ সাবলীল স্বতঃপ্রবাহ নীতিগত-রীতিগত উভয়তই তাঁকে একেবারেই অন্য-নিরপেক্ষ মতি-গতি-পরিণতি দিয়েছে, দিতে পেরেছে। নিবৃত্তিমার্গী বিরক্ত উদাসীনতা নয়, 'নূতন ফসল'-এর গৃহী-বৈরাগী-রসময়-সুলভ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির হাস্য-ঔদাস্য সমন্বয়িত সদসৎ-ঊর্ধ্বচারী সহজ অথচ দুরূহ দুরাবগহ মনুষ্য-রহস্য উন্মোচনী জীবনদর্শনেই যুক্তিযুক্ত জীবনানুগত তাঁর স্বপ্রকাশ।

সরোজকুমার উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে যে খুব বিশেষ পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, তা নয় - কিন্তু তাঁর প্রথম দিককার 'বন্ধনী' থেকে ষাট দশকী 'নীল আগুন' ও 'নচিকেতা' পর্যন্ত একটা জিনিস খুব স্পষ্ট যে, তিনি মুখ্যত ক্ল্যাসিকাল রীতিরই সর্বাধিক পক্ষপাতী, 'টপ্পা-ঠুংরী' বা 'খেয়ালে'র চেয়েও 'ধ্রুপদে'ই তাঁর ধ্রুবপদ বাঁধা। তার কারণও তাঁর নিটোল-নিখুঁত প্লটগঠনের প্রতি মনোযোগ, সংযত-সংহত সাবলীল সংলাপের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বতঃস্বভাবী মিতভাষণের পারিপাট্য, ততখানি স্যাটায়ার নয়, যতখানি 'উইট' ও 'হিউমার' বা 'কৌতুক-কুতূহলে, 'গ্রেস' বা প্রসন্নতা এবং 'পয়েজ' বা ভারসাম্যে যা গভীর মূল্যবোধপূর্ণ। এবং একই কারণে সরোজকুমারে পাত্রপাত্রী-পরিবেশ-পরিস্থিতি-সাপেক্ষতা আছে, বিশিষ্ট ভাবেই আছে, কিন্তু লেখক হিসেবে তিনি 'নির্মম' নন, অথচ আশ্চর্যরকম নিরপেক্ষ।

এজন্যই Edwin Muir তাঁর 'The structure of Novel'-এ যে Dramatic বা নাট্যধর্মী এবং 'character-novel' বা চরিত্র প্রধান-দ্বয়ের বিভাগ করেছিলেন, তাঁর অনুসরণে সরোজকুমারকে উভচরই বলতে হয়। অবশ্য অতিনাটকীয়তা দূর করা এমন কি নাটকীয়তারও প্রবল প্রবণতা না দেখিয়ে তিনি 'Dramatic', যেমন 'বন্ধনী'র বহুলাংশ, 'শতাব্দীর অভিশাপ'-এ নিকুঞ্জবিহারী বা হালদার সাহেবের অনেকাংশ, 'কালোঘোড়া'র প্রায় আদ্যন্ত অথচ উক্ত অসামান্য 'কালোঘোড়া'ই তাঁর এমন একটি character-novel, যার জুড়ি বাংলা সাহিত্যে নেই বললেই চলে। উত্তরসূরী কথাশিল্পী বিমল কর 'কালোঘোড়া'র অনন্যতা ও প্রতিভূস্থানীয়ত্বকে তাই দুটি জায়গায় স্বতঃ-উৎসারিতভাবে এবং যৌক্তিকতায় স্বসম্ভ্রম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। যেমন : 'যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ কলকাতা শহরের পটভূমিতে সে-সময় অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু সরোজকুমারের মতো এমন বিশ্বস্ত সম্মুখ কাহিনী বোধ হয় অন্য কেউ লিখতে পারেন নি।… এক এক সময় মনে হয়, যথার্থ 'ঈভিল'-এর ছবি বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ একটা আঁকা হয় না, আমাদের ক্ষমতায় কুলোয় না। সরোজকুমার সেদিক থেকে আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে সেই ছবিকে প্রায় নিখুঁত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যের ভালো লেখার মধ্যে কালোঘোড়ার স্থান হওয়া উচিত।' এ কেবল শ্রীমন্তের মতো সেই আপস্টার্ট চোরা-কালোবাজারীদের সেকালীন সাংঘাতিক উত্থান ও আজ পর্যন্ত অবাধ রাজত্বের বিষয় 'মাহাত্ম্যে' নয়, বিশিষ্ট শাণিত বাক্য সমাবেশে, টানটান স্টিল, কংক্রীট ও আলকাৎরার মতো 'ব্লাক আউট' কঠিন-কঠোরতা ভেদ ক'রে শ্রীমন্তের কালোগাড়ি উন্মাদ বেগে ছুটে চলেছে তার কালো, বাণিজ্য ব্যসনে —কারণ সে পরগাছা হয়ে বড় হয়ে উঠে এখন নিজেই বড়গাছ হতে চায়। 'নীল রক্তে'র আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে নয় শুধু, সেই বনেদী পরিবারের শান্তসৌম্যাস্নিগ্ধ অথচ অহংকারী (সদর্থে) মেয়ে হৈমন্তীর আন্তরিকতম প্রেম পেয়েও শ্রীমন্ত তাকে শুধু তার অর্থযোগানের কাজে লাগিয়ে লাগিয়ে অবশেষে তাদের 'দেবধাম'কে গ্রাস করে, আপিসের বন্ধনী সুমিত্রাকে 'প্রমোশনে' ও ব্যবসার প্রয়োজনে নখদন্তহীন কামার্তের হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধ মধ্যে বেনারসী দিয়ে সাজায়, যুদ্ধশেষে হীরের মুড়ে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। কথা সে

রাখে, কিন্তু সেসব প্রেমমায়ামমতার কথা নয়, চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার কথা। সুমিত্রা তা বোঝে এবং 'সিভিল সাপ্লাই'-এর আধুনিক বিচক্ষণ মেয়ে তাকে 'দোহন'ও করে। কেন করবে না? যুগ যে 'cash and carry'-র —লোভী ও ক্ষমতামোহগ্রস্ত মানুষের মন-মানসিকতা ক্রমেই তাই 'devaluation of values'-এর দিকে অক্লেশে ঝুঁকে পড়েছে। আর সেই প্রাথমিক ঝোঁক যুদ্ধপরবর্তীকালে প্রবল প্রচণ্ড উদ্দাম প্রবৃত্তি হয়ে গোটা 'তথাকথিত' স্বাধীন খণ্ডিত জাতি ও দেশকে অধঃপাতে নয় শুধু, চরম নৈরাজ্য-নৈরাশ্য ও দুঃসহ দারিদ্র্যের রসাতলে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

আর তারই একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সরোজকুমারের 'মহাকাল'—'কালোঘোড়া'র এক বছর পরে লেখা : কালাপানি-পার নেতাজীর আই, এন, এর মেডিকেল অফিসার আধুনিক খোলা মনের মহেন্দ্র তার সামন্ততান্ত্রিক দাদার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে না পেরে এবং কৈশোর-প্রণয়িনী অকালবিধবা (তাদের বিয়ে হয় নি বাবাসামন্ত বাবা ও দাদার কারণে এবং তার নিজের সামান্য ইতঃস্তত ভুলে ও অল্পবয়সী ভীরুতায়) অভিমানিনী আত্মসম্মানে অটুট গায়ত্রীর কাছে দেশে ফিরে কোন অনুকূল সাড়া দূরে কথা, বরং নানা বিরক্তিকর প্রতিকূলতা পেয়ে (সে সব যতই গায়ত্রীর প্রচ্ছন্ন প্রেমাভিমান হোক) মহেন্দ্র তার বন্ধু বসন্তর সঙ্গে কলকাতায় স্থায়ী-'অস্থায়ী' ভাবে নার্সিং হোম খুলে, বসন্তরই সাগরপারের প্রণয়িনী-গ্রীক-স্ত্রী পেনিলোপির বিরল বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় যেভাবে ১৯৪৬-র সেই মারাত্মক দাঙ্গাবিধ্বস্ত দুর্গতি ও দুর্যোগ থেকে গায়ত্রীদের উদ্ধার করে আনল, তার বিশ্বাস্যতা ও বাস্তবতা বিস্ময়কর। দাঙ্গার সুযোগে প্রবীণ মুসলমানদের অগ্রাহ্য করে তরুণ তুর্কীরা হিন্দুপুরুষদের কলমা পড়িয়ে নাম পাল্টাল (যেমন আমাদের একটি প্রিয় চরিত্র, গায়ত্রীর সুখদুঃখভাগী গোলক বাগ্দী হলো আব্বাস), তেমন গায়ত্রীর মতো মেয়েদের 'শাদি' করে ঘরে এনে তুলল। শতে শতে হাজারে হাজারে নয়, প্রায় লক্ষে লক্ষে —পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গ মিলে ; কেননা তখনও গান্ধী-সুরাবর্দীর কল্যাণে দেশ 'অবিভক্ত'। তারপর নিদারুণ ছুরির চলল। ইতিমধ্যেই সরোজকুমারের অনতম, সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম 'পজিটিভ' নায়ক মহেন্দ্র পেনিলোপিদের সক্রিয় সহায়তায় গায়ত্রীদের (ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর পত্নী বিশেষ কারণে সাহায্য করেছিলেন বলেই) সেই মহাবিপর্যয় থেকে উদ্ধার নয় শুধু, জীবনের মতো সঙ্গিনী ক'রে আনল কোথায় গেল বৈধব্য, কোথায় গেল প্রথানুগতা, কোথায় গেল অভিমান! অর্থাৎ লেখক সৎসাহসী মুন্সিয়ানায় দেখালেন, ঝড়ঝাপ্টা ও প্রলয়মধ্যে তুচ্ছ প্রথা-পুঁথির দাসত্ব কোথায় এক ফুঁয়ে উড়ে যায়। বরং লেখকের ভাষায় : 'বসন্ত দেখলে বাংলার পণ্ডিতসমাজ পাঁতি দিয়েছেন, জোর করে যাদের ধর্মান্তরিত করা অথবা বিবাহ দেওয়া হয়েছে তাদের হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন বাধা তো নেইই, বরং নেওয়াই কর্তব্য। বিনা প্রায়শ্চিত্তেই তাদের গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ মহেন্দ্রর মতে "যে ধাক্কা আজ হিন্দুসমাজ পেলে তা যত বড় মর্মান্তিক হোক না কেন, তারও প্রয়োজন ছিল।

নইলে বিধিনিষেধের এই জগদ্দল পাথর কিছুতেই ঠেলা যেত না। এর বিনিময়ে হিন্দুসমাজ কত বড় জীবন পাবে! ধর্মটা যে খাওয়া-ছোঁয়া, আচার-নিয়মের ঊর্ধ্বেকার একটা বস্তু এই বোধটা জাগছে দেখছ না?" এই উপন্যাসটিই নাট্যধর্মী। একটি ঘনসংবদ্ধকাহিনী। ঘটনাগুলিকে বলা যায় ঘটনা-প্রসবী ঘটনা। প্রতিটি ঘটনা কার্যকারণসূত্রধৃত। পূর্ববর্তী পরবর্তীর জনক, পূর্ববর্তীও তার পূর্ববর্তী কোন ঘটনার জাতক। এই ঘটনার উদ্বর্তনে ও স্তরপারম্পর্যে কটি চরিত্র বিকশিত হয়ে পরিণতিতে এসে পৌঁছয়। এই সুশৃঙ্খল পরিণতি সুপ্রত্যাশিত। কাহিনী ও চরিত্র এখানে পরস্পরবিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়, বরং পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সুগ্রথিত। একের পুষ্টি ও পরিণতি অন্যকে পুষ্ট ও পরিণত করে। ঘটনা যেমন বিকশিত করে চরিত্রকে চরিত্রও তেমনি বিবর্তিত করে ঘটনাধারা। তবে একথা না মেনে উপায় নেই যে, মূলত নাট্যধর্মী মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি'র তুলনায় বা সরল বৃত্তে গড়ে তোলা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা 'দিবারাত্রির কাব্যের' দৃঢ়বন্ধ জ্যামিতিক ছকের তুলনায় এবং তারাশঙ্করের প্রধানত ও প্রবলত ক্ল্যাসিক্যাল-রোমান্টিক বিশিষ্ট রীতির তুলনায় সরোজকুমার অনেক বেশি নি-'ছক', এবং কখনও কখনও জ্যামিতিক হলেও অপূর্ব ধরণের সার্থকসমন্বয়ী। বঙ্কিমের ঋজুতা (rigidity), রবীন্দ্রের নমনীয়তা (flexibility)--রমনীয়তা নয়, এবং শরৎচন্দ্রের কমনীয় স্নিগ্ধতার একটি উপযুক্ততম উত্তরসাধক নন; 'বন্ধনী' থেকে 'নচিকেতা' পর্যন্ত তিনি অনেক বড় লেখকের চেয়েই আশ্চর্য পরিমিত, সুসংহত এবং গভীর-গম্ভীর পরিণত। নইলে বন্ধনীর 'বনকুয়াশা' অংশে বিমলের বেপরোয়া ও মরীয়া আত্মত্যাগ (প্রায় আত্মহত্যার মুহূর্তে) মক্ষিরাণীকে সে যে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন, আশ্চর্য ও পাষাণপ্রতিমা ক'রে দিয়ে যায়, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে কটি? তাছাড়া ঔপনিবেশিক ভারতের ইংরেজ শত্রুদের মাথায় পিস্তল-উঁচনো মক্ষিরাণী যখন তার বিপ্লবীদল ও আস্তানা থেকে বাধ্যবিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত হয়ে সমীরণের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের একটি আধাশহরে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে আত্মগোপনে একেবারে বিপরীত সাধারণ ঘরোয়া জীবন যাপন করছে, পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সত্যকার শ্রদ্ধাবশত সহাবস্থানই করছে, সহবাস করছে না, তখনও লেখক সেই আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাফিস - লুট করা পুরুষদের সঙ্গে গদাঘুরনো লাঠিখেলা রপ্ত মেয়ের পরিণতি দেখাচ্ছেন মাত্র তিনটি মোক্ষম ক্রিয়াপদের সহায়তায়ঃ সে এখন 'রাঁধে, বাড়ে খায়'। এই সংযম-সংহতি-প্রশিসন-পরিমিতিবোধের আরেক অদ্ভুত প্রকাশ 'শৃঙ্খল' উপন্যাসের একেবারে শেষে, যেখানে একদা গ্রাম ও লোকহিতৈষী বিশ্বেশ্বর তার তরুণী স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু উপলক্ষে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে স্বেচ্ছাদণ্ড ভোগে কারাগারের শেকল স্বীকার করে নিল। এক বিচিত্র তারিফযোগ্য গূঢ়ৈষা নিঃসন্দেহ। তারপর ভদ্রেতর নানা নিকৃষ্ট অপরাধী বন্দীদের (কংগ্রেসীবাবু রাজবন্দীদের নয়) সঙ্গে সেকালের পক্ষে প্রথম কারাজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একদিন (প্রায় সাত বছর পর) বাইরের মুক্তিতে এল (এখানে উল্লেখযোগ্যঃ 'শৃঙ্খল' বাংলার প্রথম কারাকাহিনী, তারাশঙ্করের 'পাষাণপুরী' পরের বছর ছাপা হয়, সরোজকুমারের

সাগ্রহ সম্পাদনায় 'নবশক্তি'তে প্রকাশিত হয়)—তখন সে যেন বিংশ শতাব্দীর একজন ভূভারগ্রস্ত 'নেগেটিভ' নায়ক —কী মানুষের কী পরিণতি সে ! তার গুণমুগ্ধ সাগরেদ গুণেন্দ্রদের অভ্যর্থনাকে তুচ্ছ করে বলছে, তার বয়স এ ক'বছরে তরুণ ত্রিশ থেকে পৌঢ় পঞ্চাশে পৌঁছে গেছে —বিয়ের কথা কেন, কোনরকম নব্যজীবনারম্ভেরই যেন আর তার সম্ভাবনা নেই —এজনাই গুণেন্দ্রদের বিস্মিত-স্তম্ভিত করে সে কারামুক্ত হয়ে নিরেট পাথুরে পথের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বলে : 'একটু বসি'। যেন 'স্বপ্নহর'র প্রতি সেই স্মরণীয় কবিতাটি মনে পড়ে. চলে না চরণযুগল, দাঁড়াইলে তোরণের তলে : যেতে মন নাহি সরে জীবন যে মরণ-অধির ! / মিটে না পিপাসা আর ধরনীর তিক্ত হলাহলে !' এবং যেন 'যুগ-যুগান্তর ভ্রমি' ক্লিষ্ট জানু, দেহ পরিক্ষীণ (হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে'-চলার আরেক অবিস্মরণীয় পথিক যেন) ' সংসারের পুরীপ্রান্তে নামাইলে বাসনার ভার ; / মালসার স্থলপদ্ম মুঠিতলে বিবর্ণ মলিন যেন আরেক ট্যাণ্টেলাস আরেক সিসিফাস. যেন বোদলেয়ারের ভাষায় একাই যুগপৎ 'ঘাতক' এবং 'হত'। ত্রিশের যুগের প্রথমে মানব-অস্তিত্ব যন্ত্রণার এমন চিত্র-চরিত্র 'শৃংখলিত' বিশ্বেশ্বর একটি অভিনব অভিজ্ঞতা। সরোজকুমার এর কাহিনীটিকে লিখেছেনও তেমনি পরমতম সংযম পরিমিততম ভারসাম্যে। একালের যে কোন বড় লেখকেরই ঈর্ষাযোগ্য হতে পারে।

অন্যদিকে স্বোপার্জিত মেসজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় স্কেচধর্মী 'মধুচক্র' ও যুগপৎ দলিল ও আলেখ্য 'পান্থনিবাস' লিখে প্রমাণ করে দিলেন, এ-ধরণ-ধারণার রচনায় তিনি কেবল পথিকৃৎ নন. একলা-পথিক। উনিশ শতকী শিবনাথ শাস্ত্রী থেকে বিশশতকী শিব্রাম চক্রবর্তীর 'মুক্তারামের তক্তারাম' এবং আরও কতজন সত্ত্বেও মেসজীবনের বিবিধ বিকার-ব্যাধি ও বাতিকের যে চালচিত্র-চলচ্চিত্র তিনি অনায়াস সাবলীলতায় অথচ আশ্চর্য বিশদ বিশ্বস্ততায় দিয়ে গেলেন, সঙ্গে জানিয়ে গেলেন নিম্নমধ্যবিত্তদের ক্রমাগত declassed হওয়ার ঐতিহাসিক অনিবার্যতা, তার কোন নিকট তুলনা বাংলা কথাসাহিত্যে আর আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

আর মধ্যত্রিশে 'নূতন ফসল' নামের প্রথম ট্রিলজি তো বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। পর পর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা'য় সরোজকুমার বাংলা পল্লীগ্রামের রস নিংড়ে মাটি ছেনে যে তৃণমূল-জীবনবিন্যাসের প্রথম সার্থক প্রবর্তনা করলেন, তাতে সচালচিত্র 'বিনোদিনী প্রতিমা'-নির্মাণের ক্ষমতা-দক্ষতা-গুণ ও নৈপুণ্য সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের এতকাল পর্যন্ত একটি শূন্যতা-রিক্ততার অবসানে। বাংলার পল্লীতে চাষী বাউলকে ধান যোগায়, বাউল চাষীকে গান শোনায়— এই বহিরঙ্গ সম্পর্কের অন্তঃকরণে আছে আরেক নিবিড় ঘনিষ্টতা ও অন্তরঙ্গতার সম্বন্ধ-বন্ধন, উভয়েই উভয়ের দোসর-সোদর, নানাবিধ স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্যায়-সমাধানে, যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ঘাত-প্রতিঘাত-জয়ে-পরাজয়ে তাদের সেই একাত্ম অঙ্গাঙ্গী অন্তঃস্রোত নিত্যবহমান, সেই এক-অন্তরাত্মার অন্তরালবর্তী ধ্যান, জ্ঞান. গান. এক অখণ্ড 'মানবজমিনে'র সোনা-ফলানো আবাদ-আয়োজন। তাই কৃষাণী বিনোদিনীর পূর্ব-

প্রেমিক গৌরহরি, এখনও 'কিশোরী' বিনোদিনীর ধ্যানে ও স্বপ্ন-কল্পনায় বিভোর, 'ভিক্ষা' উপলক্ষে 'রাইজাগো' গান গেয়ে ময়রাক্ষী পর্যায়ে কৃষাণ-স্বামী হারানের ঘরে-প্রাঙ্গণে যাতায়াতও আছে ; আর গৌরের বোন ললিতা সুকণ্ঠী সাহসিকা অনুচিত স্বামীকে ত্যাগ করে অনায়াসে প্রণয়ী রসময়কে জীবনসঙ্গী করে তার 'প্রতিবাদী' ভূমিকায় দিব্যি আছে—এমন কি সে চায় হাবলমেনীর মা হওয়া সত্ত্বেও হারানকে ভালোবাসায় অনিশ্চিত বিনোদিনী তার দাদা গৌরকেই কণ্ঠিবদলে বরণ করুক —তাতে ধুলোয় ধুলোয় ধূসর উদাসীন গৌরেরও একটা সদ্‌গতি হয়, বিনোদিনীরও অবদমিত প্রেমের সত্যকার মূল্য-মাহাত্ম্য স্বীকৃতি পায় - কিন্তু 'গৃহকপোতী'র দ্বন্দ্বে বিরোধে জর্জরিত বিনোদিনী কঁদুলে গ্রামবাসিনীদের অপকলঙ্কে গোঁয়ারগোবিন্দ (অথচ অত্যন্ত সরল ও উদার) স্বামী হারান কর্তৃক গ্রাম ও গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়—তারপরের গৌরহরি-তমাললতা বিনোদিনীর অতিস্বাভাবিক অথচ রক্তাক্ত নাটকীয়তা 'নাটক' সোমলতায় এসে যে-পরিণতি লাভ করে. সেখানে বিনোদিনীর বসুন্ধরাবৎ কলঙ্কে মহিমায় অপরূপ মূর্তি একমাত্র কোন অসাধারণ মৃৎ বা প্রস্তরশিল্পীরই নিখুঁত শিল্পকর্ম, যদিও তার মধ্যে আনন্দবেদনা-মথিত অর্থে প্রাণবন্তিতায় থই থই করছে। বলা বাহুল্য এই বিনোদিনীদের প্রত্যেককে নিটোল-নিখুঁত করতে আঁকতে (দোষে-গুণে, 'কলঙ্কে-মহিমায়') সরোজকুমার তাঁর যেন সব শক্তি ব্যয় করেছেন। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। সরোজকুমার তাঁর সমকালীনদের তুলনায় গ্রামীন ও নাগরিকরূপে উভ-পারঙ্গম। ফলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সঠিক লিখেছিলেন ঃ 'সরোজকুমার নায়িকা বিনোদিনীকে (সৎ, অসৎ, সহজ) তিনটি পথ ঘুরিয়েছেন (বাঁকে বাঁকে তার নিত্যনবীনা রূপ ও স্বরূপ) এবং লেখক হিসেবে তিনি নিজে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন 'সহজ' পথের প্রতি। এখানে ষোল-আনা কাঙালিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন কথাশিল্পী। ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এ-যুগের বাংলা কথাসাহিত্যকে।' বস্তুতপক্ষে চাষী ও বাউলদের সম্মিলিত সমন্বয়ী বাঙালী জীবনযাত্রার এখন জলজ্যান্ত ছবি কি আর একটিও আছে ? যেজন্যে সঞ্জয়বাবু সত্যের মুখ চেয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'চাষীসংলাপে তিনি (সরোজ) শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের চাইতে (তাঁদের অন্য অনেক কৃতিত্ব সত্ত্বেও) অধিকতর দক্ষ এবং সে-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতর বলেই মনে হয়। তাছাড়া চাষীদের জীবনদর্শন সম্পর্কেও সরোজকুমার পূর্বসূরীর চাইতে বেশি ওয়াকিবহাল।' এবং বাউলদের সম্পর্কেও সমালোচক শ্রীকুমারবাবুর মতে অবিস্মরণীয় 'সত্যচিত্রবান', শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্করের মত 'রোমান্সের শেষ আশ্রয়স্থল' ব্যবহারী নন। এই সঙ্গে স্বয়ং সারাজকুমারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে বাধ্য যে, সেই স্ক্যান্দিনেভিয়ান শৌখিন 'বেদে'-'যাযাবর'দের হৈচৈ-যুগে সরোজকুমারই আমাদের প্রথম খাঁটি বোহেমিয়ানদের উপহার দিলেন, 'গৃহী' বা 'পথিক' সহজিয়া বাউলদের মতো তেমন আর কারা ? তেমনি 'ফল্গুলাভ'-এর ক্ষেত্রেও তারা ! ললিতা-রসময়, তারাপদ ও সোমলতার, বিনোদিনী-গৌরহরি তার প্রকৃষ্ঠতম প্রমাণ ! কিংবা বিষয়বস্তুতে, কিংবা আঙ্গিকে—গুরুত্বপূর্ণ অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে। আর এই ট্রিলজির গঠনে-অবয়বে-

সংলাপে-সৌজন্যে সরোজকুমার কিছুটা 'লিরিক্যাল', কিছুটা 'এপিক্যাল'—অন্তত ভাবে দুই বিপরীতকে তিনি মিলিয়েছেন। আর শুধু তাই নয়, 'ন্যারেটিভ'-এর ওপর তিনি সর্বাধিক নির্ভর করেছেন তাঁর অসামান্য স্বাভাবিক-সাবলীল সংলাপ-প্রয়োগের দুর্লভ দক্ষতায়। শরৎচন্দ্রের পরে এই সাফল্য আর ক'জন কথাশিল্পীর, আমার ঠিক জানা নেই। তবু সত্যের খাতিরে বলতে হবে, দেশকাল, পরিবেশ-পরিস্থিতি-সাপেক্ষ পাত্রপাত্রীর আচার-আচরণ কথোপকথনে মুখ্যত সাপেক্ষ থেকে নিজে উৎকৃষ্ট নাট্যকারের মত নিরপেক্ষ। এমনি ভাবেই বিষয়-ব্যাপ্তিতে, শিল্পশ্রী-প্রকরণে, সর্বাঙ্গীণ উপকরণে সমৃদ্ধ হয়েই সরোজকুমারের সৃষ্টিগুলি বাংলা কথা-সাহিত্যের অমর সম্পদ হয়ে আছে, থাকবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ভেসে যাই,—ভাসে স্মৃতি / সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অনুক্ত, নবপর্যায়—সুনীলকুমার নন্দী সম্পাদিত।
২। কাছে বসে শোনা—ভবানী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।
৩। সাহিত্য বিতান / মোহিতলাল মজুমদার।
৪। অপরাজিত, শারদীয় ১৯৯০, তারাশঙ্কর বিশেষ সংখ্যা।
৫। ত্রয়ীর ভূমিকা / ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত।
৬। স্বগত / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।
৭। কল্লোল যুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
৮। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—জীবন ও সাহিত্য / ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়।

আশিসকুমার দে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : বিস্মৃতপ্রায় কথাশিল্পী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ঔপন্যাসিক প্রতিভা আলোচনায় দেখা যায়, কতকগুলি প্রাথমিক সমস্যা হাজির হয়েছে। এদের চেহারা অনেকটা এইরকম :

১. অচিন্ত্যের পরিচিতি এখনকার পাঠকদের কাছে চার রকম। একদল জানেন, তিনি 'হাড়', 'কাঠ', 'সিঁড়ি'র মতো অসাধারণ ছোটগল্প লিখেছেন। দ্বিতীয় দলের কাছে তিনি অসফল ঔপন্যাসিক। আর দলে-ভারিদের কাছে তিনি পরমপুরুষ জাতীয় জীবনীকার, তাঁর অন্য পরিচয় এঁদের জানা নেই। আর চতুর্থ দল (যাঁদের সংখ্যা বেশ কম) জানেন যে তিনি কবিও ছিলেন আমৃত্যু।

২. সাহিত্য-পাঠকদের এই চার দল ছাড়া সাহিত্য-ইতিহাসকারেরাও আছেন। এ দের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র অচিন্ত্যের উপন্যাস-বিশ্লেষণে মনোযোগী ; বাকিরা সকলেই ভাসা-ভাসা আলোচনা করেছেন। একজন আবার বেদে-লেখকের রামকৃষ্ণভক্ত হওয়া নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন।[১]

৩. এই রকম ঘটে গেছে উপন্যাসের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ অচিন্ত্য-আলোচনা করলেও বাকিরা প্রায় নীরব।

৪. কবি, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং জীবনীকার রূপে তিনি বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয় হন। শেষ কালে রামকৃষ্ণকাহিনী-লেখক হিসাবে তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। কেননা, চোখ বন্ধ করে ভক্তি করার সাধনা প্রবল হয়ে উঠেছে, ফলে অন্য পরিচয়গুলি হারানোর মুখে।

৫. আমরা এটা জানি যে উপন্যাসে তিনি কোনো মোড়-ফেরানো লেখক নন। 'বেদে' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রেও সজাগ সমালোচনা আছে। বিশ থেকে চল্লিশের দশক অবধি তাঁর উপন্যাস নানা বিষয়মুখী হয়েও ঔপন্যাসিক শিল্প-কুশলতার সিদ্ধিকে ছুঁতে পারেন নি। একটা তিক্ততা, কখনও মিলনান্ত করার নাটকীয় প্রয়াস এদেরকে সামান্য করে তুলেছে।

৬. সচেতনভাবে না হলেও অচেতনে এইসব সমস্যা ছিল বলে অচিন্ত্যের উপন্যাস একালীন পাঠকের ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য নয়। প্রকাশক মহল তাঁকে বিক্রয়যোগ্য উপন্যাসকার রূপে দেখেন না। এমনকি বুদ্ধিজীবীরাও অচিন্ত্যের উপন্যাস সংগ্রহে রেখেছেন, এটা দুর্ঘটনার সামিল।[২] কয়েক দশকের কষ্টিপাথরে অচিন্ত্যের এই অবহেলা বিস্ময় জাগায়।

৭. ফলে এই লেখার সময় কতকগুলি প্রশ্ন জমেছিল। যেমন,

(ক) অচিন্ত্যের মতো জনপ্রিয় ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক কি জনপ্রিয়তার নূতন পণ্য হিসাবে রামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তজনের জীবন-কাহিনী লিখলেন ?

(খ) এ-কি বয়সোচিত ধর্মের দিকে, ভক্তির দিকে আকর্ষণ অনুভবের ফলাফল ?

(গ) ছোটগল্প-উপন্যাসে একটা অন্তর্মুখিনতার বীজ ছিল যা ভক্তজীবনীতে পরিস্ফুট আকারে আত্মপ্রকাশ করল ?

(ঘ) কোনো কোনো লেখকের বেলায় রচনাস্রোতে একটা খাপছাড়া ভাব লক্ষ্য করি : অচিন্ত্যের ব্যাপারটা কি এমনই বিষমতার শিকার ?

আমাদের মনে হয় একটা অন্বেষণবৃত্তি তাকে বাস্তব ঘটনার জগৎ থেকে ক্রমশ অধ্যাত্ম জগতে পৌঁছে দিয়েছে। এটা জীবনদর্শন, এমন বললে হিসাবী সমালোচকেরা ক্ষিপ্ত হবেন। কিন্তু লেখক জীবনের একটা মানে খুঁজতে খুঁজতে কোথায় পৌঁছবেন, তার সীমানা আগে থেকে টানা কঠিন। তবে পৌঁছনোর একটা গতিপথ ধীরে ধীরে তার রচনায় ফুটে ওঠে সমকালে নয়, পরবর্তীকালের দর্পণে।

॥ আমাদের ভাবনাপথ ॥

এই প্রবন্ধে অচিন্ত্যের সেই অন্বেষণের অভিজ্ঞতা, তার প্রকাশসামর্থ দশকওয়ারি ভাবে উপন্যাসে কিভাবে বিন্যস্ত, তার হদিশ থাকবে। সেই সঙ্গে সেই ধ্যানের জগৎ, খোজার জগৎ আর প্রকাশের কৌশল কতটা মানানসই, তাও স্থান পাবে। অর্থাৎ বিষয় ও প্রকাশের মিল-অমিল আমরা বুঝতে চাই। কিন্তু উপন্যাসে সেকালে অচিন্ত্যকুমার অনন্য, এমন মূর্খ চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আমরা এখানে অচিন্ত্যের সবকটি উপন্যাসের আলোচনা করব না। তা অসম্ভব এবং অপ্রয়োজনীয়। বরং প্রথম উল্লেখ্য উপন্যাস 'বেদে' থেকে 'দুই পাখি এক নীড়' পর্যন্ত প্রায় বিশ বছরের ঔপন্যাসিক প্রহর থেকে কয়েকটি উপন্যাস-মুহূর্তের বিচার করব। অচিন্ত্যের জীবন-অন্বেষায় 'পরমপুরুষ' পর্ব যে অনেকটা সমাধানের মতো, এমন ভাবনা এখানে সক্রিয় থাকবে। বেদে বা ভবঘুরে মানুষের জীবন পথে অনেক দেখা, অনেক জানা আবার খোঁজার পালা আসে। জীবনতৃষ্ণার অমোঘতা, মানব হৃদয় অলচতলচ করার আনন্দ ও ব্যথা এক সময়ে অবসিত হয়। কেননা তখন সেখানে মহাজীবনের শান্তির কোমল আশ্বাস ধ্রুবপদ বেঁধেছে। কিন্তু এই সংহতিতে চলে আসা হঠাৎ নয়। জীবনকে চিরে চিরে আনন্দ ব্যথার উৎস খুঁজতে গিয়ে এই জানা-বোঝা ঘটে যায়। এর মধ্যে একটা আত্ম-আবিষ্কারের প্রক্রিয়া আছে। বিশের দশকের সংশয়, পাশ্চাত্যের অমূল (রুটলেস) দর্শন, কবিমনের দায়, চেতনা-প্রবাহের অতিরেক অথচ একটা সন্ধান কামনা তাঁর অজস্র উপন্যাসে নানাভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে। অনেক সময় সামান্য কাহিনী ঔপন্যাসিক স্পর্শে ছোটগল্পের সীমানা ছাড়িয়ে উপন্যাসের বিশালতায় পৌঁছেছে। বাস্তব জগৎ নিয়ে একটা তিক্ত, বিষণ্ণ বেদনাবোধ (যা তার ছোটগল্পের অসামান্যতার মূলে) এই অন্বেষণের প্রাণান্ত প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত কিনা, এও ভাবতে হবে।

॥ অচিন্ত্যের উপন্যাস-চিন্তা ॥

ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে নিজস্ব ঔপন্যাসিক বোধকে আলাদা করে প্রকাশ করবেন, এটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রচল উপন্যাসের থেকে নিজের ভিন্নতা বোঝাতে গিয়ে

অনেক সময় এমনটি ঘটে যায়। অচিন্ত্যকুমারের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' পড়তে গিয়ে এই ঘটনা লক্ষ্য করি। সমাজ-জীবন নিয়ে অজস্র মতের তীক্ষ্ণ সমালোচনাস্রোতে উপন্যাস নিয়ে তার বক্তব্য জানা গেছে ঃ

১. উপন্যাস লেখার সার্বেক নিয়ম হল ; 'একটা সুসম্পূর্ণ প্লট, কথোপকথনের প্যাঁচ, একটি অতি-প্রত্যাশিত আকস্মিকতা। তৃতীয় সূত্রের উদাহরণ হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং 'শেষের কবিতা'র দুর্ঘটনা দৃশ্যের দ্বারা সূচনার মামুলিয়ানা লক্ষ্য করেছেন।

২. 'ছাঁচে ফেলে চরিত্রকে একটা নমুনায় রূপান্তরিত করতে হবে, স্বপ্রধান এবং সীমাবদ্ধ একটা ব্যক্তি করতে নয়।'

৩. 'হুবহু বলতে গিয়ে বহু বর্ণনাতেই ব্যক্তির সত্য পরিচয় ধরা পড়ে না, তাহলে 'পথের পাঁচালি'ও একটা উঁচু দরের নভেল হত।'

৪. 'আগে নিয়ম ছিলো ঃ বিষয় ও ব্যক্তি নির্বাচন করো ; এখন নিয়ম হোক ঃ কিছুই অনির্বাচিত রেখো না।'

৫. উপন্যাসে নায়ককে 'ব্যবহারিক জীবনের একটা প্রতিফলন করে' তাতে অতিরঞ্জন করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন উপন্যাসে নেই।

৬. উপেনকে মেরুদণ্ডহীন মূর্খ বলে সতীশের আরেক চরিত্র (পরিপূরক) করা, কিরণময়ীকে ব্যাধি-বিজ্ঞানের একটা খেলো নিদর্শন করা, অচলার স্বামী ত্যাগের ঘটনা, অন্নদাদিদির স্বামীভক্তি, জীবানন্দের ভৈরবী সম্ভোগ-কামনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের সাহসিকতা অথচ সমাজ-বশ্যতা অচিন্ত্যের কাছে 'সাহিত্য রচনার সস্তা কৌশল'মনে হয়েছে।

৭. 'অন্য যে-কারণে লণ্ডনে ও নিউইয়র্কে Ulysses-এর লাঞ্ছনা হয়েছে সে কারণটাকে উপহাস করতে পারলে মানুষের উপকারই হতো। মানুষের হৃদয় আছে আত্মা আছে বলতে পারো, কিন্তু শরীর আছে বলতে 'মানুষের অন্তরের পরিচয় পেতে হলে গুপ্তচরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে আত্মার অনুধাবন করতে হয়....একটা সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি না আসতে পারলে মনের অসাম্য অবস্থাটা আমাদের পীড়া দেয়। তাই ...আমাদের দেশের বেশির ভাগ বাংলা নভেলই এই ভুল বোঝাকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছে। ওটা নেহাৎই একটা সস্তা চালাকি।'

৮. 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' উপন্যাসে দুটি নরনারীর অবিবাহিত যৌথ জীবনযাপনের চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত বিতর্ক বেশি স্থান পেয়েছে। বাংলা উপন্যাসের আবহাওয়া অচিন্ত্যকে তৃপ্ত করে নি। বিবাহিত জীবনের সামান্যতা ও সমস্যাহীনতা, যৌনতা, অশ্লীলতা, প্রথামুক্ত জীবন, বাংলা উপন্যাসের প্লট-নির্ভরতা, অস্বাভাবিক সংলাপ, অতি-নাটকীয়তা, চরিত্রের ব্যক্তিরূপহীনতা, বিষয় ও ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট নির্বাচনভঙ্গি, নায়কের অতি-বাস্তবতার ফলে অতি-নায়করূপ, শরৎচন্দ্রের সমাজ-বশ্যতার ফাঁকি, মনোবিশ্লেষণের নামে প্রথানুগত্য আলোচিত হয়েছে কখনও সংলাপে, কখনও ডায়েরির পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্র উপন্যাসের সূচনার অতি নাটুকেপনা, ব্রাহ্মশুচিদৃষ্টি,

শরৎচন্দ্রের আপোষকামিতা উল্লিখিত হলেও বঙ্কিম এখানে অনুপস্থিত। কামনার তীব্র সংরাগ বঙ্কিমে আছে বলেই কি তা অনুল্লেখিত ? বাস্তবের যথাযথ বর্ণনা বা তথ্যসংকলন 'পথের পাঁচালী'তে থাকলেও তা অসামান্য উপন্যাসে রূপান্তরিত হয় নি।

অচিন্ত্য চেয়েছিলেন এ থেকে বেরিয়ে মানুষের শরীর ও মনের সম্পর্ক সন্ধান, সামাজিক কাঠামোর নিষিদ্ধ বিষয়ের অবতারণা অথচ আত্মার নানা রূপ নানা দিকে আবিষ্কার করতে। অচিন্ত্যের উপন্যাস-ধারণা তাঁর উপন্যাসে কতটা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা আলোচনা করা দরকার।

॥ কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে ॥

প্রথম উপন্যাস 'বেদে' ধারাবাহিকভাবে 'কল্লোলে' বেরিয়ে গ্রন্থরূপে লাভ করে (১৯২৮)। উপন্যাসটির গঠন, ভাবনা এবং প্রকাশভঙ্গি বাংলা উপন্যাসে নূতন বলে সমালোচনা ও আলোচনা হয়েছিল বিস্তর।

উপন্যাসটিতে একটি বালকের যুবক হয়ে ওঠা পর্যন্ত নানা বিচিত্র কাহিনী ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। ছটি অধ্যায়ের মধ্যে আদতে মিল নেই। শুধু নায়কের জীবনযাপন, ভবঘুরে বৃত্তি এবং প্রেমিক মনের প্রকাশভঙ্গি একটি মিল রচনা করেছে। একটি মানুষের জীবনই এই উপন্যাসের কালপরিধি। জীবননদীর বিভিন্ন বাঁক তাকে কিভাবে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে, তারই কাহিনী হল বেদে। কিন্তু নায়ক জানে পথ চলাতেই আনন্দ। যে প্রেম, ভালোবাসা, মানবিক স্নেহ সে পায়, তাতে সে তৃপ্তিহীন অপ্রাপ্তি অনুভব করে। জীবন নিয়ে সে কি করবে, এই ভাবনা তাকে পীড়িত করেছে। এই পীড়ন তাকে জীবন অন্বেষণে প্রবৃত্ত করেছে বয়েসকালে। শরীর ও মন, অভিজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির বোধ মিলিয়ে একটি চরিত্রে লেখক অন্বেষণকামী হয়ে উঠেছেন। শুরু হল জীবনের মানে খোঁজা একটি চরিত্রকে নানা পরিবেশে, নানা চরিত্র ঘটনায় আন্দোলিত করে।

বেদের প্রথম অধ্যায় হল 'আহ্লাদী'। আত্মীয়-পরিত্যক্ত ন বছরের এক বালকের কিশোর হওয়ার কাহিনী এটি। একটি অনাথাশ্রমের রূঢ় পরিবেশে মটরু, কাঁচা এবং আহ্লাদীর কাহিনী স্বল্পপরিসরে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আহ্লাদীর প্রতি কাঞ্চনের বাল্যপ্রেম একটা সুষ্ঠুরূপ পেল না ঐ অমানবিক পরিবেশে। আহ্লাদী মাস্টারেরই পাপের ফসল। আবার তাকে গর্ভিনী করে হত্যার মধ্যে মাস্টারের দাগী অপরাধী মনোভাবই লক্ষ্য করি। বছর তিনেক জোড়া এই গল্পে কালের বিন্যাস, প্লটের অগ্রগতি সংহত হয়েছে। মেলা থেকে আহ্লাদীর জন্য আনা পুতুল যেমন মাস্টারের পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, তেমনি এক কিশোরীর জীবনও লালসার চাপে বিনষ্ট হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আশমানি' 'কাঞ্চন হয় সেলুনের সহকারী কর্মচারী মকবুল। মাঝে সে আবার ঘাটপাণ্ডার জীবন কাটায়। আমিনাকে সে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু প্রেমের সমাপ্তি এখানেও করুণ। আমিনা মকবুলের জমানো টাকা নিয়ে পালায়। এর মধ্যে কর্মবদল ঘটে—চায়ের দোকান, বাবুদের বাড়িতে। আশমানিকে সে সাহায্য

করেছিল। কিন্তু বদলে পেল লাঞ্ছনা। এরপর আসে হোস্টেলজীবন, মুঙ্গের যাত্রা, সহপাঠী বিকাশের সঙ্গে পাঁচ বছরের মেসজীবন, বি. এ. ডিগ্রি লাভ। তারপর এল চাষার বাড়িতে আশ্রয়লাভ। এরই মধ্যে আশ্রয়দাতা দাদাবাবুর চরিত্রটি সবচেয়ে উজ্জ্বল রোমান্টিক।

তৃতীয় অধ্যায় হল 'বাতাসি'। এখানে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দাদাবাবু চরিত্রচিত্র প্রসঙ্গত এসেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রাম ভেসে যায়। বন্যার জলের মধ্যে বাতাসির নিবিড় চুম্বন পেলেও তাকে হারাতে হয়। নায়ক বোঝে না কাকে সে জড়িয়ে ধরেছিল বাতাসি না গাছের গুঁড়িকে। নুলো আর কাঞ্চনের মধ্যে বাতাসির টানাপোড়েন খানিকটা প্রথম অধ্যায়ের আদলে গড়া।

চতুর্থ অধ্যায় হল 'মুক্তা'। গ্রাম থেকে শহর কলকাতায় পা ফেলা। বৃত্তি হয় ট্রাম থেকে পয়সা কুড়ানো। প্রথমেই দীনবন্ধুর শোচনীয় আত্মহত্যা আমাদের মনে আঘাত করে। দুর্ঘটনায় মৃত ছেলের জন্যই মানুষটি আত্মহনন করেছিল। ট্রামের সেই যাত্রিনী মুক্তা আর নিম্নস্তরের পুতলি দুজগতের পরিচয় জানায়। মুক্তা যে অন্য কারোর, এটা জেনে মোহভঙ্গ ঘটে। পুতলিকে সে নিজেই ছেড়ে দেয়। ড্রাইভারী করা, বেকার বন্ধুর সঙ্গে দেখা, পাঞ্জাব যাত্রা ও মুক্তার বাড়িতে চাকরের কাজ। শেষ অবধি গাড়োয়ানি বইলম্যান। অরুণ মুক্তাকে ছেড়ে যায়। মুক্তাকে নিয়ে কাঞ্চন পালায়। কিন্তু পূর্ব নায়িকার মত মুক্তাও হারিয়ে যায়।

পঞ্চম অধ্যায় 'বনজ্যোৎস্না'। মেসের জীবন (আবার বিকাশ), বিনোদ-অখিলবাবুর কাহিনী শুরু হল। প্রবোধের স্ত্রীর নামে এই অধ্যায়ের নামকরণ। প্রবোধের ছেলের নাম লেনিন, ম্যাকসুইনি এবং মুসোলিনি রাখার মধ্যে শ্লেষ আছে। বনজ্যোৎস্না চিঠি লেখে হ্যামলেট, ফ্যানি ব্রন, ডন জুয়ানকে। বিনোদের ভেকবদল একটা যাযাবরবৃত্তির প্রতীক। চরিত্রের সংখ্যা কম কিন্তু একটা নাগরিক বিদগ্ধতা ক্রমে উপন্যাসে স্থান করে নিল। উপন্যাসটির পালাবদল শুরু, এমনকি নায়কেরও।

শেষ অধ্যায় 'মৈত্রেয়ী'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন এবং বুদ্ধির জগৎ সর্বস্ব হল এই উপন্যাস। এখানেও দুজন পুরুষ, একজন নারী। সৌম্য কাঞ্চনের প্রাপ্তির প্রশ্নকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছে –

—তবু পেলেন না তো তাকে ?

—কাকে ?

—নোফালিসের নীল ফুল, বোয়ার-এর শ্বেতহংস।

সৌম্যের কাছে কাঞ্চন তার অতীত পাঁচটি অধ্যায় নির্যাস রূপে জানিয়েছে। তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, গর্কি, হামসুন, বোয়ার, আনাতোল ফ্রাঁ, ব্রাউনিং দম্পতির একটি বাক্যে উল্লেখের মধ্যে অচিন্ত্যের প্রিয় লেখকরা স্থান পেয়েছে। পুতলি, বনজ্যোৎস্না এখানেও নানা ভাবে হাজির হয়েছে। সৌম্যের জীবন-ট্র্যাজেডি আমাদের ছুঁয়ে যায়। মৈত্রেয়ীর প্রেমনিবেদন ও বিবাহ-কল্পনার মধ্যে অতিনাটকীয়তার বীজ উপ্ত হয়েছে। সৌম্যের মৃত্যু, গোবিন্দ-মৈত্রেয়ীর বিবাহে কাহিনী শেষ হয়েছে।

'বেদে' অচিন্ত্যকুমারের প্রথম উপন্যাস বলে পরের উপন্যাস রচনার কিছু কিছু উপাদান এখানেও ছড়িয়ে আছে। সেগুলি হল :

১. মুক্ত জীবনের সন্ধান ;

২. বিচিত্র জীবনযাত্রা এবং নানান মানুষ ;

৩. জীবনের মানে খোঁজা ;

৪. এক তীব্র রোমান্টিক আকূতি এবং যন্ত্রণা ;

৫. পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রসঙ্গ ;

৬. সমাজবন্ধনহীন, প্রথামুক্ত জীবনের প্রতি আকর্ষণ।

'বেদে' সেকালে নিন্দা কুড়িয়েছিল অনেক কারণে। একালে উপন্যাসটির সমালোচনা হতে পারে এভাবে ঃ

১. শিথিল আঙ্গিক ;

২. একটি চরিত্রের চোখে সমাজের বিস্তৃত রূপের চেয়ে ব্যক্তি-অনুভূতি বড়ো। একে আত্মকেন্দ্রিক বলা যায়। অতিরিক্ত পরিকল্পনাজাত রচনা।

৩. জীবন অন্বেষার শুরুর অস্পষ্টতা। কি এবং কাকে খোঁজা—এর কারণ স্পষ্ট নয়।

৪. কাব্যিকতা, নির্বিচার উপমা প্রয়োগ, কাহিনীকে রোমান্স-প্রবণ করলেও জীবনের তিক্ততা এবং বাস্তবতার স্বাদ বেশ কম।

৫. নায়ক গ্রামে পলাতক, পরে আশ্রিত. কখনও বা বিচিত্র কর্মজীবী। কিন্তু শেষ অধ্যায়ে তাকে শহুরে মধ্যবিত্তের আদলে গড়া হল।

৬. লেখক নায়কের ছটি রূপে জীবনের নানা কথাকে যেভাবে গাঁথতে চেয়েছিলেন, তা ছিন্নকথামালার মতো।

৭. ধরা বাঁধা বাংলা উপন্যাসের গড়ন এখানে নেই। নানান অভিজ্ঞতায় লেখক আত্মপ্রক্ষেপ করে আত্ম উচ্চারণের যে অবকাশ নিতে চেয়েছিলেন, তা নূতন। হামসুনীয় ছন্নছাড়া মহাপ্রাণের এইসব প্রান্তিক বিন্দুতে জীবনযাপন একটু অসম্ভবের বিন্দুতে পৌঁছে গেছে।

অচিন্ত্যকুমার প্রথানুগ ঔপন্যাসিক নন, কথাটা আবার বোঝা গেছে 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' (১৯৩১) উপন্যাসের মধ্যেও। এখানে সমস্যা নূতন, বিষয়েও নবীনতা এসেছে। 'স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতা—একসঙ্গে সংসার না করেও বন্ধুতা। সজ্ঞান, সক্রিয়, সংযত বন্ধুতা। বিয়ে করে উদয়াস্ত একসঙ্গে থেকে তো পরস্পরকে ক্ষয় করে ফেলা'—এভাবে বিবাহহীন, মুক্ত প্রেমের ছবি, সমস্যা ও সমাধান আঁকায় অচিন্ত্যের সাধ হয়েছিল। বেদের মতো এখানেও সমালোচনার ঝড়ই ওঠে নি, রাজদ্বারের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বাঙালী সমাজে এই 'লিভিং টুগেদার' ভয়ানক নিন্দার ব্যাপার হতেই পারে। কিন্তু সমস্যাটিকে যেভাবে রাখলে বাস্তবতা রক্ষা পায়, তা করতে অচিন্ত্য ব্যর্থ হয়েছেন।

ট্রেনের সহযাত্রিনীর মর্মের গেহিনী হয়ে ওঠা, ধনী কন্যার সঙ্গে কেরাণী পুরুষের

নির্জন দুপুর কাটানো, অশ্রুর সঙ্গে সহবাস—সব মিলিয়ে অতি-নাটকীয়তার ঢেউ উঠেছে। একটা তত্ত্বের কথা লেখক ভেবেছিলেন, তার পটরেখার কৃত্রিমতা একালে বড়ো চোখে লাগে। চিঠি, নাটকীয় সংলাপ, ডায়ারির আঙ্গিক উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের শিকলভাঙা জীবনযাপন, বাংলা সাহিত্যে দেহ বনাম প্রেমের অসার্থক চিত্রের কথাও এসেছে। কিন্তু একটি কাহিনী গড়ে-পিটে (স্কিমেটিক) নেওয়ায় শিল্প-শৈথিল্য আছে। বেদের কাব্যময়তা এখানেও আরও প্রবল। তবু জীবনে (ও সাহিত্যে) বিবাহ ও বিবাহবন্ধনহীন সহবাসের প্রশ্নটি পাঠকের সামনে প্রবলভাবে হাজির হল।

আজকে পাঁচ দশক পরে 'বিবাহের চেয়ে বেড়ো' বিষয়ের গুণে টানে। অচিন্ত্য কেন এই বিষয়ে মনোযোগী হলেন, সে কথা এভাবে ভাবা যায় —

১ বাংলা উপন্যাসে বিবাহিত প্রেমের সামান্যতা, অবৈধ প্রেমের শাস্তিকল্পনায় সমাজের রক্তচক্ষুনির্দেশ তাঁকে এই ধরনের বিষয় গ্রহণে আগ্রহী করেছিল।

২ য়ুরোপীয় জীবনে ও সাহিত্যে মুক্ত প্রেমের বিস্তৃত পরিচয়দানের উদারতা এবং অভিনবত্ব তাঁকে বিষয় ভঙ্গে উৎসাহিত করে।

৩. সংসারজীবনে প্রেমের বিকাশ ঘটে, জেগে থাকে অভ্যাস, –এমন কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন 'শেষের কবিতায়', এমনকি কবিতায়ও। আদর্শ প্রেমে সমাজ-সংসারের বন্ধন থাকে না। রবীন্দ্রনাথের ধারণাকে একটু প্রসারিত করে অশ্রু-প্রভাতের জীবন আঁকা হল। কিন্তু পরিণামে অশ্রুর চলে যাওয়া শেষ অবধি এই 'মুক্ত সহবাসের' তত্ত্বকে ধূলিসাৎ করেছে। এমনকি স্থান, পরিবেশ, কালনির্বাচনে যেভাবে ঔপন্যাসিক সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মধ্যে বাস্তবতার দায় ছিল না। একটি তত্ত্বকে মানতে গিয়ে উপন্যাস—শিল্পের ব্যর্থতায় জ়ি.য়ে পড়ল।

৪ অচিন্ত্য বিষয় নির্বাচনে দুঃসাহসী হয়েছেন। প্রচলিত সমালোচনার রাজ্যে সাহিত্য-জীবনের যেসব ভাবনার কোণ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে মনস্কতা আছে। এটিকে তত্ত্বমূলক বিতর্ক-উপন্যাস ভাবা যেতে পারে।

'প্রচ্ছদপট' (১৯৩৫) উপন্যাসে আবার সমস্যার জাত আলাদা। একটি নারীর কাছে সন্তান না প্রেমিক, কে বড়ো —এমন বিষয় হাজির করা হয়েছে বাঙালী পাঠকের কাছে। কিশোরীর বিবাহ, বিধবাবস্থায় বৈধ সন্তানের জন্ম, নিজস্ব চাকুরি জীবন, নিরঞ্জনের সঙ্গে প্রেম, পুত্র আদিত্যকে নিয়ে নিরঞ্জনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, শেষে নিরঞ্জনের সঙ্গত্যাগে নারীর মাতৃমূর্তিই বড়ো হল। প্রথম স্বামীর সন্তানের চেয়ে দ্বিতীয় স্বামীর সংসারের তুচ্ছতা এখানে প্রতিপাদ্য।

শ্রীপর্ণা এখানে দয়িতাই নয়, জননীও। এই জননীত্বকে না মেনে শুধু তার ভালবাসা নিরঞ্জন চেয়েছে। নিরঞ্জনের ভালবাসা, শ্রীপর্ণার মাতৃত্ব, নিরঞ্জনের ঈর্ষাবোধ দ্বন্দ্বকে বিস্তৃত করেছে। উপন্যাসের অন্তিমে নিরঞ্জন শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্রীপর্ণা মাতৃত্বের অপার সৌন্দর্যে আদিত্যকে সঙ্গী করে জীবনের পথিকবৃত্তি বেছে নেয়।

উপন্যাসটির বিষয়ভূমির পরিকল্পনা অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং বাস্তবায়িত। মনের অলি-গলি খোঁজার ব্যাপার 'বিবাহের চেয়ে বড়ো'তে তাত্ত্বিক কটতায় হারিয়ে গিয়েছিল। এখানে সেই ঘাটতি নেই।

উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে কতকগুলি সহ-প্রশ্ন (সাব কোয়েশ্চেনস) মনে জাগে—

১. নিরঞ্জন পুরুষের প্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে শ্রীপর্ণার আদিত্যের সম্পর্ককে দেখবে, এটা বাঙালী সমাজে স্বাভাবিক। শ্রীপর্ণার মাতৃমূর্তিকে মহিমাময় করে তোলার মধ্যে সনাতনী আদর্শবোধ কি অচিন্ত্যকে উদ্দীপ্ত করে নি ?

২. বিধবার বেশে শ্রীপর্ণার তৃপ্তি কি সামাজিক দায় মেটানো না পুত্রের চোখে নিজের ভাবমূর্তিকে সঠিক তারে বাঁধার চেষ্টা ?

৩. নিরঞ্জনের বিক্ষত মনের যন্ত্রণাকে মাঝে মাঝে মনে পড়লেও শ্রীপর্ণার মা হওয়ার প্রবল বাসনা তাকে নিরঞ্জন সম্পর্কে উদাসীন করেছে।

৪. বাঙালী পাঠকের মনে এখানে একটা আপোষের ঘটনা অস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। শ্রীপর্ণাকে মা দেখলে আমাদের সমালোচনার সুর বন্ধ হয়। নিরঞ্জনেরা কি অপরাধী অথবা একটি নারীর সাময়িক নির্জনতার সঙ্গী মাত্র, এমন প্রশ্নে কেউ পীড়িত হন না।

৫. একটি নারী কাকে বেশি বড়ো করে —নিজের মনের অতৃপ্ত কামনাকে অথবা সমাজদত্ত রক্তের শরিককে ? অথবা নারীর নিজেকে খোজার মধ্যে কোথাও ভ্রান্তির বীজ আছে, যেখানে সে অনেক পথ হেঁটে শান্তি পায় ? নিরঞ্জনের প্রেমকে ফিরিয়ে সে নিজের প্রেমের বিসর্জন ঘটাল, না বাৎসল্যরসে প্রেমের নিমজ্জনে পরমতা খুঁজে পেল ?

এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর খোজার দায় কারোরই নেই। তবু এইসব প্রশ্নগুলি 'প্রচ্ছদপট' পড়ার পর মনে জাগরূক থাকে। সমাজকে না-মানার ভাবনা ধীরে ধীরে অচিন্ত্যকেও প্রথার পক্ষে, মান্য ধারণার পথে নিয়ে গেছে। প্রিয়া ও জননীর মধ্যে বিরোধ ঘটে। সে জননীত্ব নূতন বিবাহজাত বা প্রাক্তনের ফলস্বরূপ, যেমনই হোক না কেন। নারীর স্বাধীন হওয়ার স্বপ্নের ক্ষেত্রে আর্থিক রোজগার জড়িত এ কথা 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' উপন্যাসে এবং এখানেও আছে। তাই অশ্রু বা শ্রীপর্ণারা যে চাকুরিজীবী রমণী বলে একটা বিদ্রোহের কিংবা নিজেদের অনুভূতির মূল্য দিতে পেরেছে।

একটি 'গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী' (১৯৪৮) উপন্যাসে বেদের সূচনাংশের মতো লোকজীবন ফিরে আসে উপন্যাসের পটভূমিতে। শুধু লোকজীবন নয়, একটি গ্রামের মানুষজন, তাদের মুখের ভাষা, গ্রাম্য প্রেম, প্রেমের অবৈধতা, দেহ-মনের সম্পর্ক সবই। উপন্যাসটি কেন জানি না অচিন্ত্যের ছোটগল্পের অসামান্য বিষয় এবং ভাষার তীক্ষ্ণাগ্রতার কথা মনে করায়। অথচ বাইরের দিকে উপভাষার একটা স্থির আবরণ শহুরে পাঠককে এটি পড়ার ব্যাপারে অনুৎসাহী করে।

এখানে হোরাংয়ের স্ত্রী কুড়ানি, বাগালি কিশোরের সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের কথা আছে। শুরু হাটের পথে, শেষ পাথর কলের বাস ধরতে যাওয়ার পথে। মাঝখানে

বাইশটি পরিচ্ছেদ দুজনের লাজবিধুর, কখনও উদ্দাম প্রেমকাহিনীকে মেলে ধরেছে। কুড়ানি একবার বিবাহ সম্পর্ক ভেঙে হোরাংয়ের হাত ধরেছিল। কিশোরকে সে ভালবাসে। কিন্তু ঘর-পালানি বৌয়ের জন্য সে সমস্ত রাত বিনিদ্র কাটাবে, এটা বোঝে। কিশোরের উন্মাদনা পরে শান্ত হয়েছে, যখন মাকালীর থানে শোনে, 'চোখের জলে তোর আঙা পা দুটি ধুয়ে দেব জীবন ভোর'। কিন্তু এর আগেই সে প্রেমিকার আর্তি শুনেছে : 'তোমাকে আমি আমার মন দিচ্ছি, সোনার মত খাঁটি, সোনার মত সুন্দর। তুমিও আমাকে তোমার মন দাও।' কুড়ানি এও জানিয়েছে যে 'গায়ের বস্ত্র' সে দিতে পারে না। এই গায়ের বস্ত্র কি শরীর যা ইতিপূর্বে পুরুষের স্পর্শে নোংরা হয়ে গেছে! সে ঠিক জীবনানন্দের 'নোনা মেয়েমানুষ' নয়। মিলমালিক সন্নিৎবাবুর কামনার ডাক সে ফিরিয়ে দিয়েছে। আসলে কুড়ানি জীবনের প্রেমকে আলাদা করে রাখে, যেখানে কিশোর চিরকালই তার প্রেমিক। হোরাংকে নিয়ে যখন সে গ্রাম ছেড়ে অপমানের পাথরকলে শ্রমিক হবার সঙ্গী হয়, তখন নারীর দুজ্ঞেয় রহস্য অনেকটাই উন্মোচিত হয়েছে।

উপন্যাসটি বিশাল নয়। এক অসামান্য দ্রুতগতি, লোকভাষার প্রবাদ-প্রবচন-ছড়ার প্রয়োগ, চরিত্রের স্বল্পতা, সর্বোপরি একটি প্রেমের সফলতা-বিফলতার রোমান্টিক আবহ খুব সহজে ভোলার নয়। আবার অচিন্ত্যের পূর্ব-উপন্যাসে অনুসন্ধেয় শরীর-মন, দাম্পত্য-অবৈধ সম্পর্কের তত্ত্বটি সদাজাগ্রত। কল্লোল পর্বের দুর্মর রোমান্টিকতা এখানে একটা সামান্যতার (শিল্প বিষয়ের প্রকাশের) আভাস আনলেও অন্তরঙ্গে এটিও জীবনের স্বরূপ সন্ধান। অবৈধ গ্রাম্য প্রেমিকার মন আছে। সেও শরীর-মনের টানাপোড়েন নিয়ে ভাবে। শুচিতার বোধ তাকে পীড়িত করে। কামনা ভালবাসার টানে সে ঘর ছাড়ে না। বরং সে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে নতুন জীবনপথে যাত্রা করে, সেখানে আশ্বাস নেই, আছে জীবনের কদর্যতা। কিন্তু প্রেমিকের নাগপাশ অথবা নিজের মনের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনো পথ সে জানে না। উপন্যাসে ক্ষুধা তৃপ্তির দ্বৈরথ দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত শান্তির সমে পৌঁছায়। তারাশংকরের রাঢ়-উপন্যাসগুলির কথা মনে রেখেও বলা যায়, অচিন্ত্যের এক এক নূতন অধ্যায় —সেখানে তিক্ততা নেই, জীবনের অতৃপ্তি আছে। আবার অতৃপ্তিকে ব্যাখ্যা করার মতো শক্তি দুটি মূল চরিত্রে শান্তি এনেছে।

'যায় যদি যাক' (১৯৬২) উপন্যাসটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা। প্রথম পরিচ্ছেদে কলকাতার মানুষের কলকাতা ছাড়ার দীর্ঘ বাস্তব বর্ণনা আছে। বাইশটি পরিচ্ছেদ জুড়ে বিয়াল্লিশের মন্বন্তর, কলকাতা ত্যাগ, মহানগরীর দুর্দশা-চিত্র সবিস্তার এসেছে। এরই এক ইভ্যাক্যুয়ী সেবা —আশ্রয়ের বদলে এসে পড়ে বারিধিবাবুর আশ্রয়ে। একসময় সে ফেরে বটে তার প্রেমিক স্কুলমাস্টার সুজনের কাছে, কিন্তু তাদের বাঁচার লড়াই ক্রুর চক্রান্তে শেষ হয়ে যায়। বারিধি একবার বোধ হয় মনের ভুলে সেবার কাছে হৃদয় দুয়ার খুলেছিল, কিন্তু তার পূর্ব পরিচয়ের জঘন্যতায় সেবা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

সুজন মানুষের মতো লড়াই করেছে, মহাজনের কেরাণীগিরি এমনকি সাবানওয়ালার কাজও। কিন্তু 'পাথরে-মোড়ানো হৃদয়-নগর / এখানে মেলে না অন্ন।' বারিধির কিংবা সামন্ত-ধনীর কালো হাত ক্রমশ তার সংসার ভেঙেছে। সেবাকে সন্তানসহ বারিধির লোকেদের নিয়ে যাওয়ায় কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। বারিধি এবং স্কুল সেক্রেটারীর মেয়ে পুরশ্রীর রিলিফের কাজে তাকে ভিখিরি বানানো হল। বারিধি নরকের শয়তানের মতো সেবার পরিচয় এড়াতে বলেছে ঃ 'এদের মধ্যে এত রিলিফের কাজ করছি, আর আমার নামটা জানবে না?'

সুজন-সেবার পুনর্মিলন যেমন পাঠককে স্বস্তি দিয়েছিল, তেমনি বারিধির চরিত্রের একমুখী খলতা তাকে বিমূঢ় করে। আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি এই উপন্যাসের সামাজিক পরিবেশ চিত্র এবং তার বলি হিসেবে কিছু অসহায় মানুষ। নীতি, মূল্যবোধ, সতীত্ব, বাৎসল্য কিভাবে স্রোতের শেওলার মতো মহাযুদ্ধের নোংরা আবর্তে গুলিয়ে যাচ্ছে, তার অসামান্য রূপরেখা এখানে আছে। সুজনের প্রতিবাদী স্বর কিভাবে সমাজের নিষ্ঠুরতার চাপে, ধনিকের কড়া হাতের মুঠোয় চুরমার হল, তা ভেবে পাঠক-মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। তার সমাজব্যবচ্ছেদের জন্য দরকার যে শাণিত ভাষার, তা অচিন্ত্য এখানেও সমানভাবে ব্যবহার করেছেন। একটা পরিকল্পনা আছে লেখকের, যেটা অদৃশ্য নয়। কিন্তু বিষয়ের উৎসারে এমন একটা সদর্থক অভীপ্সা কাজ করেছে যা একজন সমাজ-সচেতন লেখকের কাজেই আশা করা যায়। অচিন্ত্যের সিঁড়ি, হাড়, গল্পে মধ্য-মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের সব হারানোর কথা ছিল। ছোটগল্পে মহাযুদ্ধের কুটিল ক্যানভাস অংশত ক্ষুদ্র। এখানে সেই পটচিত্রের বিশালতা, নির্মমতার অমোঘ আঘাত আমাদের বিপন্ন করে।

অচিন্ত্যের সমগ্র উপন্যাস আমরা ধরতে চাইছি না, এমন কথা পূর্বেও বলেছি। এই পঞ্চ উপন্যাসের মধ্যে তাঁর উপন্যাসের বিষয় ভাবনার, পরিকল্পনার সফলতা-বিফলতা মনে হয় চিহ্নিত হয়েছে। বাকিদের আলোচনায় দেখা যাবে যে একই চক্রে পরিবর্তমান তথ্যাবলী। এবার দেখা যাক, অচিন্ত্যের ভাষাকোণ। বিষয়ানুসারিণী ভাষা অথবা নিজস্ব ভাষার মুদ্রাদোষে তাঁর বিজড়িত হওয়ার যে জটিলতা—সেই কোণগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়।

॥ অচিন্ত্যের উপন্যাস-ভাষা নিয়ে ॥

অচিন্ত্যের উপন্যাসের ভাষা নিয়ে দুয়েক কথা বলার দায় থেকেই যায়। উপন্যাসের বিষয়কমল ভাষাবৃন্তেই ফুটে ওঠে। তাই ভাষা ছাড়া সাহিত্য-আলোচনা ঠিক হতে পারে না।

১. বর্ণনামূলক গদ্য অচিন্ত্য লেখেন না এমন নয়। কিন্তু বর্ণনামূলক গদ্যের মন্থরতা বোধ হয় তাঁর পছন্দ ছিল না। তাই এর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংলাপ, নির্দেশমূলক বাক্য, কখনও অসমাপ্ত বাক্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। একান্ত বস্তু বর্ণনার ধীরতার মধ্যেও একটা বক্রতা, নাটকীয়তা তিনি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চারিত করে ভাষাকে গতিময় করে তোলেন। যেমন ঃ

ক নদীর বর্ণনা ঃ

মাঝে মাঝে ভর-দুপুরে জোয়ার আসে ও তখন যেন কৈশোর পেরিয়েছে মনে হয় — ওর সর্বাঙ্গ তখন উৎসুক লুব্ধ হয়ে ওঠে। তারপর ঝড়ের রাতে মা-হারা দুষ্টু খুকির মতো সে কি গোঙানি যেন মাথা কুটছে। (বেদে)

খ বিয়েবাড়ির বর্ণনা ঃ

ফুলের আর এসেন্সের গন্ধে ঘর আর মেয়েদের শাড়ি ভুরভুর করছে। টিমুদার গরদের পাঞ্জাবীটাও। কত রকমের গান, কত রকমের বাজনা, কত রকমের হাসি। কোনো মেয়ে টিমুদার পাঞ্জাবীর বোতামের গর্তে ফুল গোঁজে, ফেরাফিরতি ধূপের কাঠি জ্বালিয়ে টিমুদা মেয়েদের চুলের মধ্যে গুঁজে দেয়। (বেদে)

গ. মহানগরীর বর্ণনা ঃ

সে ঘরে আলোকের পলকটিও পড়ে না। জমিদার-বাড়ির উঁচু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে আসতে-আসতেই রোদের হাপ ধরে যেন, ঝিমোয। তারপর মাড়োয়ারিদের বেঢপ ভুঁড়িরই মতো হাসপাতালের মোটা গম্বুজটা রোদকে শুধু আড়াল করে আটকেই রাখে না, চেপটে ওর টুঁটিটা যেন চেপে ধরে। ওটাব কবল এড়িযে এসেই ও একেবারে ভীতু রোগা ছেলের মতো সন্ধ্যার বুকে মুখ রেখে জিরোয় অন্ধকারের চোখের জলে গলে-গলে পড়ে তারপর। (বেদে)

ঘ. বৈঠকখানাব বর্ণনা ঃ

ফরাস-পাতা, নিচু জোড়া তক্তপোষে তেমনি সেই বৈঠকখানা, রবিবর্মার পুরোনো সেই ছবিগুলি তেমনি দেওয়ালে আজো ঝুলছে, দরজার উপরে উঁচু তাকের থেকে সিন্দুরচর্চিত চীনেমাটির সেই গণেশ ঠাকুরটি আজো ভ্রষ্ট হয নি। (প্রচ্ছদপট)

২. অচিন্ত্যের ভাষাভঙ্গিতে যেমন গতিশীল সপ্রতিভতা আছে, তেমনি কবি অচিন্ত্য বারবারই বর্ণনায়, উপমায ছায়া ফেলেছে। যেমন ঃ

ক. শরীর বেযে কৃশতার ধারাটি বালির বিছানায় পাহাড়ি নদীর মতো আঁকাবাঁকা রেখায় পিরপির করে বয়ে চলেছে। ঘুঘুর পাখার মতো লঘু, পরম দুখানি পায়ে সব সময়ই সে উড়ে বেড়াচ্ছে। খুশিতে তখন সে প্রায একটি ঝিঁঝিঁ পোকা, অকারণ খুশিতে। (প্রচ্ছদপট)

চোদ্দ বছরের মেয়ের কৃশতা, চঞ্চলতা, আনন্দময়ী রূপ বোঝাতে শেষ পর্যন্ত অযথার্থ উপমা এসেছে।

খ. প্রভাত। পুরুষ ছাড়া তোমাদের জন্ম আকাশকুসুম, যৌবন পঙ্গু, প্রৌঢ়তা দুর্বল, মৃত্যু বিষাক্ত।

অশ্রু। মেয়েদের দুই হাতে অজস্র সেবা, অকৃপণ তিতিক্ষা, অপূর্ব আত্মনিবেদন। দুঃখ-দুর্দিনে মেয়েরা সান্ত্বনার দীপশিখা। (বিবাহের চেয়ে বড়ো)

প্রভাত নিজেই অশ্রুর কথা শুনে কবিত্ব করার কথা বলেছে। কিন্তু প্রভাতের প্রথম উক্তি কি কবিতার বা চেষ্টিত কাব্যিক গদ্যের বাইরে পড়ে?

গ একেক করে গায়ে সে সব গয়না পরলে। যেন শীত-শীর্ণ অরণ্যে লেগেছে চৈত্রের আগুন। ··পাথরের ঠাণ্ডা একটি বাটি দেখতে দেখতে সুরার একটা ভৃঙ্গার হয়ে উঠলো, উচ্ছল ফেনা পড়তে লাগলো গড়িয়ে। (প্রচ্ছদপট)

—উপমার অতিরেক এখানেও ঘটেছে।

৩. অচিন্ত্যের গদ্যে কাব্যিকতার পাশে পরুষ কিংবা তিক্ত গদ্যের পরিচয়ও আমরা পাই। যেমন ঃ

ক. মানুষের এইটুকুন শরীরে ছশ ছাপান্নটা ব্যাধি। তবু তাকে চোখ লাল করে তম্বি করা হল কিনা —ভালো হও। শরীরে রক্ত দিয়ে বললে কি না —সচ্চরিত্র হও ; মহুয়ার বন তৈরী করে বলা হল —ওখান দিয়ে হেঁটো না, গড়িয়ে পড়বে।

(বিবাহের চেয়ে বড়ো)

খ কাচের বাসনের মধ্যে ভাসমান কতোগুলি মাছ, কাগজের কতোগুলি ফুল। বেড়াল চুরি করবে না বিশ্বাস করা যায়, প্রেমে পড়বে না বলে যাদের বিশ্বাস করা যায় না। যারা হাসতে হবে বলে হাসে, কী কায়দায় কখন কাঁধ নাড়তে হবে জেনে কাঁধ নাড়ে, ঠোঁট কুঁচকানোটাকে যারা একটা মুখের কারুকার্য হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছে। (প্রচ্ছদপট)

গ. সতীত্ব হচ্ছে পুঁজিবাদীর উত্তরফল। সিন্দুকে গচ্ছিত সোনা, অন্তঃপুরে আবদ্ধ স্ত্রী। স্ত্রীত্ব হচ্ছে বিজ্ঞাপনের ফলক আর সতীত্ব হচ্ছে তার উজ্জ্বল বর্ণমালা। ফ্যাসিজমের নির্দয় নিদর্শন স্বামীত্বের, প্রভুত্বের ফ্যাসিজম। (যায় যদি যাক)

৪ প্রয়োজনমাফিক বহু ইতর-দেশী কিংবা বিদেশী শব্দ কিংবা প্রবাদের ব্যবহার তিনি করেছেন। 'বেদে' কিংবা 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী' আবার উপভাষায় তাঁর দখল প্রমাণ করেছে। অচিন্ত্যের ছোট গল্পে যে গ্রামীণ সংস্কৃতির ছবি দেখি, এখানেও সেসব সক্রিয় হয়েছে। দুয়েকটি প্রবাদ বা ইতর বাক্যমালা অচিন্ত্যের শুচিবায়ুহীনতার চিহ্ন রূপে দেখানো হল।

ক দিনে বউ কুযো দেখে ডরায়, রেতে বউ গাছে গাছে বেড়ায়।

খ. আন-চিত্ত রাঁধায় মন, শাকে বালি পায়েসে নুন।

গ. ছুঁচ চলে না বেঁটু চালায়।

ঘ অগামারা বাপ, ঘুঘু মেয়ে, লটাপাটি ধুতি, সাকবেদ, চেকনাই, ছিটেন, ঠনঠনে কাশি, পেটে দ, ত্যাড়াব্যাকা, ডিমে রোগা, পেঁয়াজ-পয়জার, টেমি।

৫ উপন্যাসকারের বিশেষ ভাষাবোধ যেমন ফুটে উঠেছে ওপরের চারটি অনুচ্ছেদে, তেমনি তর জীবনদর্শনের নির্মাণমূলক বাক্যমালায়। এগুলোকে এপিগ্রাম বলতে পারি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যমালায় অচিন্ত্যের ভাষাবয়ন একাগ্র রূপ পেয়েছে। যেমন ঃ

ক খিদের কান্নাটা মুখর, কাপড়ের কান্নাটা নির্বাক।

খ. পৃথিবীতে তিনটে সুন্দর অশ্লীলতা আছে—জন্ম, প্রেম আর ভগবান।

গ পুরুষে যদি দেখতে হয় শক্তির বিস্ফার, নারীর বেলায় এই আত্মার পরিচ্ছায়া।

ঘ নারীর জীবনে প্রেমই মহত্তম নয়, মহত্তম হচ্ছে সন্তান।

ঙ স্বপ্নই তো একমাত্র সৌভাগ্য।

চ. রহস্য উন্মোচনে নয়, রহস্য আবরণে।

ছ. সময় তো শোককে অস্পষ্ট করে কিন্তু ভালবাসাকে উজ্জ্বল করে রাখে।

জ. মানুষ আরেকটু কুঁড়ে হতে শিখলে আরো খানিকটা সভ্য হতে পারতো।

ঝ. প্রেমিকার অন্তর্ধান না ঘটলে প্রেমের কবিতায় প্রাণ আসে না।

ঞ. প্রেমে আমাদের আনন্দ যতো, অহংকার তার চেয়ে ঢের বেশি।... তাই প্রেম যখন মরে, বেদনার চেয়ে অপমান এই জন্যেই বেশি লাগে যে, অহংকার যায় ধূলিসাৎ হয়ে।

॥ ভাবনার শেষ প্রান্তে ॥

অচিন্ত্যের কয়েকটি উপন্যাসের বিষয়-ভাষারীতি আলোচনা করে তাঁর ঔপন্যাসিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে নিশ্চয়ই কতগুলি ধারণায় পৌঁছাই। সেগুলি এরকম ঃ

১. উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষকে তিনি রূপ দিতে চান। সমাজকে খুশি না করে স্পষ্টবাক হতে চান। এ ব্যাপারে আপোষকামিতা তাঁর চরিত্রে নেই। এই আত্মকেন্দ্রিক ভাবনার জন্য কেউ কেউ নিন্দা করতে পারেন অচিন্ত্যকে।

২. একটা যাযাবরবৃত্তি, প্রচলিত সমাজসম্পর্করেখার বাইরে জীবন-কল্পনা, অস্তিত্বের একাকীত্ব, যন্ত্রণা তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তিনি কখনই মধুর উপন্যাসের লেখক নন। জীবন নিয়ে একটা নিরীক্ষা, অতৃপ্তিবোধে একটা তিক্ত বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে তাঁর উপন্যাসে। কখনই তিনি একেবারে অন্তর্মুখ হন না। আবার নিজের বিশ্লেষণের খাতিরে প্রবন্ধ সুলভ বহু পাতা লিখে ফেলেন। এগুলি একজন অনুপযুক্ত ঔপন্যাসিকের চেষ্টিত প্রয়াস নয়। সকলে উপন্যাসে একই ভাবভাবার গড়নে বলবো, এমন কথা বলা যায় কি ?

৩ ব্যক্তিচরিত্রের ক্ষেত্রের পর তাঁর সমস্যা উঠেছে সামাজিক আইনকানুন নিয়ে। দেহ-মনের অস্থির দ্বন্দ্বকে তিনি সব উপন্যাসে ভেদ করতে চেয়েছেন। আত্মার অস্তিত্বও উপেক্ষিত নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি বলি কল্লোলীয়দের মত অচিন্ত্য দেহবাদী, তাহলে ভুল হবে। রবীন্দ্র উপন্যাসের কামনার তপ্তশ্বাস মাঝে মাঝে থাকলেও তাকে নানাভাবে বিপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সামাজিক ধূলি হেলনে। অথচ বাংলা উপন্যাসের এই সমস্যাটি অচিন্ত্য বুঝেছিলেন। হয়তো এই সমস্যার মূল আরও গভীরে, সেখানে সমাজই এর কারণ। দেহক্ষুধা ও মানসিক ক্ষুধার অতৃপ্তিবোধের চিত্র শুধু না এঁকে একে অস্তিত্বের সংকট রূপে হাজির করেছেন। এই হাজির করার মধ্যে সর্বোত্তম ঔপন্যাসিক শিল্পপ্রতিভা সব সময় সক্রিয়তা দেখিয়েছে, এমন নয়। কিন্তু নিজের বক্তব্য সপ্রমাণে তিনি ঘটনা-চরিত্র-নাটকীয়তার মাঝখানে একটি ভাবনার জাল তৈরি করেন। সেখানে তিনি একক নন, কিন্তু স্বতন্ত্রচারী ভাবুক।

৪. 'বেদে' উপন্যাসে প্রবল উপন্যাস-অবয়ব ভাঙলেন। বাকি কটি উপন্যাসে

ঘটনার চরিত্রের প্রগতিতে শুধু একালীন উপন্যাসরূপ নয়, কাহিনীবিন্যাসে যুক্তির ক্রমে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, কখনও চেতনা-প্রবাহের বীজ বুনেছেন। সব সময় আয়োজন যে যথাযথ হয় নি, তার প্রমাণ তার একালীন অনাদর। ত্রিশ-চল্লিশের দশকে আঙ্গিকের নিরীক্ষাকর্মে যে কজন ঔপন্যাসিক ব্রতী হয়েছিলেন, অচিন্ত্য তাঁদেরই একজন।

৫. ছোটগল্পের কারুকর্মে অসামান্য দক্ষতা তাঁকে উপন্যাসের সফল তীরে পেঁছে দেয় নি। কিন্তু আত্মার আবিষ্কারের দেহ-মনের সম্পর্কবিচারে তিনি শেষ পর্যন্ত কোথায় পেঁছবেন, এর গতিপথ চিহ্নিত হয়ে গেছে। আসলে একটা নঞর্থক জটিল তত্ত্বের বারংবার বিশ্লেষণে একসময় লেখক পেঁছে যান সদর্থক কোনো অস্তিত্বের ধারণায়। অচিন্ত্যের রচনায় পঞ্চাশের দশক সেইভাবে ব্যাখ্যা করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র ঃ

১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় —বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

২। গ্রন্থের সম্পাদকের নির্দেশে এই প্রবন্ধ রচনার সময় এই ঘটনাটি খুব ভালোভাবে প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে। 'গ্রন্থালয়ে'র প্রকাশিত অচিন্ত্য গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তব্য খণ্ডে সাড়া-জাগানো উপন্যাসগুলি পাই নি। লেখাটি সম্পূর্ণ হবার জন্য সবচেয়ে সক্রিয় সাহায্য করেছেন অচিন্ত্যকুমারের পরিজনেরা, বিশেষত অধ্যাপক কুশল সেনগুপ্ত। তিনি দুষ্প্রাপ্য বইগুলি দিয়ে এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করে প্রবন্ধ লেখকের মূল আলোচনাকে পরিপূর্ণ করেছেন।

৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯৬১), অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড), আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা। বেদে, প্রচ্ছদপট, বিবাহের চেয়ে বড়ো· একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী এতে সংকলিত।

৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯৬২), দুই পাখি এক নীড়, জ্ঞানতীর্থ, কলকাতা। যার যাদ যাক এবং একটি গ্রাম্যপ্রেমের কাহিনী একত্রে সংকলিত।

অসিত মুখোপাধ্যায়

সৈয়দ মুজতবা আলী : মানবিকতায় মুক্ত

আধুনিক কালে যে সব সাহিত্যিক জগৎ ও জীবনের অনেক অনাবিষ্কৃত দিক ও মানব মনের অনেক নতুন ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সন্ধান দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কথা-সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানবিকতা আর রবীন্দ্রানুগত্য —দুয়ে মিলে সৈয়দ মুজতবা আলী ; তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন — 'তার জীবনরসিকতা ও সদাজাগ্রত কৌতূহল-সাম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদার মনোভাব ও বৈদগ্ধ, মানসিক আভিজাত্য ও নির্মলতা, গদ্যভাষার দীপ্তি ও শব্দচেতনা, বৈষ্ণব-পদাবলী-প্রীতি ও সহজ-মানুষ-প্রীতি, লঘুরসিকতা-প্রবণতা আর হৃদয়গভীরস্পর্শী অশ্রুমিশ্রিত হাসি —সব কিছুরই হদিস পাওয়া যায় ঐ দুটি বৈশিষ্ট্যে। তিনি আড্ডাবাজ, মজলিশী মানুষ —একথা যেমন সত্য, হৃদয়ের গভীরে ডুবুরি, একথা তেমনি সত্য।" তাঁর রম্য-রচনায় হয়ত সব সময় আসল মানুষটি ধরা পড়ে নি, কিন্তু উপন্যাসে তা ধরা পড়েছে। জীবনসমুদ্রের গভীরে ডুব মেরে তিনি দু-একটি রত্ন তুলে আনেন, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রে সেই রত্নগুলিকান্না মেশানো। 'শবনম্,' 'অবিশ্বাস্য', 'শহর-ইয়ার', 'তুলনাহীনা' তার পরিচয় স্থল।

শিল্পী সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ১৯০৪ সালের শেষের দিকে করিমগঞ্জে (বাংলাদেশ)। ছাত্রজীবনে তার সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ ঘটে। তখন ছিলেন ওমর খোয়ামের 'রুবাইয়াতের' উৎসাহী পাঠক। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখনী সাহিত্যের বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলেও তাঁর রচনার মধ্যে কবি মনের বিশেষ পরিচয় পেয়ে থাকি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোমান্টিক মনের সঙ্গে ক্ল্যাসিক মন মিশে গেছে। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর রচনা, বিশেষ করে উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে হয়ত আমরা ভুল করব। সাম্প্রতিক বলতে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী পঁচিশ বছরকেই ধরছি, যখন দেশবিভাগ ঘটে গেছে। দেশ বিভাগের ফল যে কত ব্যাপক ও দূরবিস্তারী হয়েছে সেদিনকার রাজনৈতিক নেতাগণ কল্পনা করতে না পারলেও তার ফলাফল পরবর্তী কালের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ঔপন্যাসিকেরা এই সব জীবন-চিত্রকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেছেন। সবটা না হলেও এই সব উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের জীবনের মূল্যবোধ ও সামাজিক শুভবুদ্ধির শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ফেলে আসা জন্মভূমির জন্য ব্যাকুলতা, স্মৃতির সরণি বেয়ে সুখী শৈশবে ফিরে যাওয়ার বেদনা, আনুষঙ্গিক যন্ত্রণার উপলব্ধি —আমরা ঔপন্যাসিকদের রচনায় উপলব্ধি করে থাকি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম উপন্যাস 'অবিশ্বাস্য' [১৯৫৩] স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকাশিত হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের কোন ছবি এর মধ্যে

লক্ষ্য করা যায় না। বরং বলা যেতে পারে এই উপন্যাসের মধ্যে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের স্পষ্ট ছবি বর্তমান। দ্বিতীয় উপন্যাস 'শবনম্' এর প্রকাশকাল ১৯৬০ সাল। তৃতীয় ও চতুর্থ উপন্যাসের প্রকাশকাল যথাক্রমে-'শহর-ইয়ার' [১৯৬৯], 'তুলনাহীনা' [১৯৭৪] সাল। চারটি উপন্যাসের মধ্যে কোনটিতেই স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষ বা তাঁদের জীবন-চিত্র চিত্রিত হয় নি। সেদিক থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস নয়। 'না' হওয়ার কারণটাই স্বাভাবিক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি—মানবিকতা আর রবীন্দ্রানুগত্য—এই দুয়ে মিলে সৈয়দ মুজতবা আলী। তিনি ছিলেন জীবনরসরসিক। তাঁর উপন্যাসে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের বা বাংলাদেশের সমাজজীবনের সার্থক চিত্র দেখতে পাওয়া যায় না বলে তাঁকে আমরা রোমান্টিক লেখক বলব তা নয়। তাঁর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, তিনি তাঁর উপন্যাসে বাস্তব তথ্যের সঙ্গে জীবনরসের, সাহিত্যিক সত্যের সঙ্গে জীবন সত্যের এক অপূর্ব সমীকরণ ঘটিয়েছেন। আমাদের চারপাশের অতি পরিচিত সমাজটা, মানুষ এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার বাণীকে তিনি উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। বস্তুরাশি ও বাস্তবজীবনকে তিনি যে দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন সে দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো অসঙ্গতি নেই। উদযান ও অম্লজান এই উভয় মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে যখন জলের উৎপত্তি হয়, তখন যেমন এই উভয় পদার্থই তাদের নিজ নিজ ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে একটি সাধারণ ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাসে তেমনি বস্তুধর্ম, রসধর্ম এবং তার সঙ্গে আদর্শবাদ একসঙ্গে মিশে গিয়ে এক বিশেষ জীবন-সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

'অবিশ্বাস্য'— সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এই রচনাটি ২১ শে কার্তিক ১৩৬০ থেকে ২০ শে চৈত্র ১৩৬০ সাল পর্যন্ত 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই উপন্যাসের কোন কোন চরিত্রের সঙ্গে লেখকের 'টুনিমেম' গল্পের কোন কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। এজন্য পরে লেখা হলেও অনেকে 'টুনিমেম' গল্পটিকে 'অবিশ্বাস্যের' বীজকাহিনী বলে মনে করেন। এই উপন্যাসের ঘটনা কাহিনী মধুগঞ্জের অ্যাসিসটেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট আইরিশম্যান ডেভিড ও-রেলিকে নিয়ে। ও-রেলি সত্যিই সুপুরুষ ইংরাজ; বাঙ্গালীর তুলনায় অনেক বেশী ঢ্যাঙা। 'তিনি রাজপুত্র না হলেও অন্তত কোটালপুত্তুর' —তাঁর সম্পর্কে লেখকের এই অভিমত। বয়স তাঁর একুশ কি বাইশ। সাহেবদের ফরসা রঙতো আছেই কিন্তু তাঁর চুল খাঁটি বাঙ্গালীর মতো মিশকালো আর তারসঙ্গে ঘন নীল চোখ। এ জিনিসটা এনেছে অসাধারণত্ব। চেহারার মধ্যে আছে এক অদ্ভূত ঔজ্জ্বল্য, আর তার কালো চুল ও নীল চোখ এক বিশেষ আকর্ষণী শক্তি ধরে।

ও-রেলি ভালবেসে তথা প্রেম করেই বিয়ে করেছিল মেব্‌ল্‌কে। মেব্‌ল্ মেয়েটি শুধু দেখতে সুন্দরী নয়, বেশ নম্রও। উভয়ে নিশ্চিত সুখী সংসার বাঁধতে

কৃচ্ছসংকল্প। কিন্তু দেহছাড়া প্রেম, এবোধ হয় মানুষের ক্ষেত্রে ভাবা শক্ত। তাই মেব্‌ল্‌ তাঁর অনৈসর্গিক যৌনক্ষুধাকে অদ্ভুত বিভ্রমেও চেপে রেখে শেষ পর্যন্ত অক্ষম ও-রেলির এক সামান্যতম কর্মচারী বাটলার জয়সূর্যের কাছে সঁপে দিলেন তাঁর যৌবন। ঐ মিশকালো, অষ্টপ্রহর মদে-মাতাল-রাঙা-চোখওয়ালা ভোঁতকা লোকটার প্রতি মেব্‌ল্‌ অনুরক্ত, একথা কে বিশ্বাস করবে? একমাত্র 'স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও জানে না' তত্ত্ব মানলে সব কিছুই বিশ্বাস করা যায়। একজন ক্লীব স্বামীর পক্ষে এ ঘটনা কতটা বেদনাদায়ক ও-রেলির কথাতেই তার পরিচয় পেয়ে থাকি। "মেব্‌ল্‌ যদি মরে যেত, তবে কি এর চেয়ে বেশী কষ্ট হত? বলতে পারব না। হঠাৎ যদি আমি অন্ধ হয়ে যেতুম, তাহলে কি বেশী কষ্ট পেতুম? বলতে পারব না।"

জয়সূর্যের ঔরসে জন্মাল মেব্‌ল্‌-এর এক শিশুপুত্র, নাম রাখা হলো পেট্রিক। ও-রেলি বড়ই অসহায়। চোখের সামনে তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেখেন। মাতৃত্বের ছোঁয়ায় তাঁর দেহখানির প্রতিটি অঙ্গ কী অপরূপ পরিপূর্ণতায় সৌন্দর্য্য পেয়েছে, যেন বাংলাদেশে বর্ষায় ভরা পুকুর। অঙ্গের সৌন্দর্যের পরশ পাওয়ার এবং তাকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করার বাসনা মনে জাগে, কিন্তু তাঁর যে সাধ্য নেই। তাই তিনি পরক্ষণেই মনে করেন কেন মেব্‌ল্‌কে খুন করলেন না প্রথম দিনেই? কিন্তু মেব্‌লের দোষ কী? জয়সূর্যের থাকার মতো কিছুই নেই সত্য, কিন্তু তার যে অমূল্য যৌবন রয়েছে -যা ও-রেলির নেই। যৌবনই তো মানুষের তথা পুরুষের মূল্যবান সম্পদ। অন্য সম্পদ এর কাছে নিতান্ত তুচ্ছ। যে সম্পদ কুকুর ও বেড়ালের থাকে তা তাঁর নেই। এর থেকে বড় ট্রাজেডি কী হতে পারে! মেব্‌ল্‌ ঐশ্বর্য-সম্পদ কিছুই নেয়নি, নিয়েছে নারীর আকাঙ্ক্ষিত সম্পদটুকু। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ ডাস্টবিন থেকে ভাত খুঁটে খায়, তাকে কি আমরা দোষ দি? মেব্‌ল্‌ দিনের পর দিন অভুক্ত থেকে তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছে। প্রথম প্রথম আচ্ছন্নের মতো বসে চিন্তা করেছিলেন ও-রেলি। কিন্তু এই চিন্তাগুলো ছিল সব ছেঁড়া-ছেঁড়া। কোনো বিশেষ চিন্তা বা যুক্তি দিয়ে সেটাকে যে চরম ফয়সালায় ফেলে গ্রহণ বা বর্জন করবেন --সে শক্তি তাঁর ছিল না। ফড়িঙের মত মন এ ঘাস থেকে ওঘাসে লাফ দিত। কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারত না।

এতদিন ও-রেলি তাঁর অসংযত মনকে বশে রেখেছিলেন কিন্তু বোধহয় আর পারবেন না। ছেলের শরীর এদেশের আবহাওয়ায় স্পষ্ট ভাল যাচ্ছেনা বলে মেব্‌ল্‌ ও-রিলকে বিদেশে তার পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালেন। ও-রেলি কথাটা সহজেই মেনে নিলেন। মেব্‌লের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেন। কারণ এতদিন তাঁর ভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি দিন-রাত তাঁকে নির্মম ভাবে এদিক ওদিক টানা হ্যাঁচড়া করেছে। একটা মড়াকে যেন দশটা শকুন ছিঁড়ে খেয়েছে। জেগে থাকাটা তাঁর কাছে ভয়াবহ, আবার ঘুমোতে গেলেও নানা দুঃস্বপ্নে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। মেব্‌ল্‌ যেন তাঁর থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। মেব্‌ল্‌ও তাঁর সন্তান বেঁচে থাকতে তাঁর দ্বন্দ্ব ঘুচবে না। তাই যে তিনটি প্রাণীকে নিয়ে তাঁর জীবনের

যোগসূত্র বা যে তিনটি প্রাণী আর তাঁকে নিয়ে তাঁর জীবন, তাঁরাই তাঁর জীবনকে অসহ্য করে তুলেছে পলে পলে ; প্রতিক্ষণে তারা তাঁর আয়ুকে ক্ষীণ করে নিয়ে এসেছে, তিনদিক থেকে তিন বাহু তাঁর জীবনকে গ্রাস করছে। এ সংসারে তাঁরা বাঁচবে না, তিনি বেঁচে থাকবেন? ও-রেলির নিজের কথাতে,—এরা পাপী, মরা উচিত এদেরই, মেব্‌ল্‌ পাপী, জয়সূর্য পাপী আর পেট্রিক ওদের পাপ-জাত সন্তান। আমি নির্দোষী, আমি কোনো পাপ করিনি। এরাই দিয়েছে আমাকে ফাঁকি, এরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমাকে দেবে শুধু ফাঁকি। এরা মরে গেলে শান্তি পাব। আমার দ্বন্দ্বের সমাধান হবে।" এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে ও-রেলি বিশেষ ফন্দি এঁটেছেন। বাটলার জয়সূর্যকে তাঁদের সঙ্গে ডিনারে খাবার অনুরোধ জানিয়ে জয়সূর্য, মেব্‌ল্‌ ও পেট্রিকের পুডিঙে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়ে তিনজনের মৃত্যু ঘটিয়ে মৃতদেহ তিনটি বাগান বাড়িতে গোর দিয়েছেন। কাজটা এমন নিখুঁত ভাবে করেছেন যে তাতে সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না। যদিও দীর্ঘদিন পরে ও-রেলি এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তিনটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই কঙ্কাল যে জয়সূর্য, মেব্‌ল্‌ ও পেট্রিকের কঙ্কাল তা আমরা জেনেছি সোমকে লেখা ও-রেলির পত্রের মাধ্যমে। তাই এই বিশেষ পত্রগুলিতে বিবেকের প্রতিচ্ছবি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রের পত্রগুলি যেমন তাঁর দ্বন্দ্বদীর্ণ মনের প্রতিচ্ছবি, ও-রেলির সোমকে লেখা পত্রগুলিও সেরকম। পত্রগুলিতে একদিকে প্রিয়ার প্রতি গভীর প্রেম, অন্যদিকে নিজের অক্ষমতার জন্য হৃদয়ের জ্বালা, সেইসঙ্গে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ সমভাবেই ব্যক্ত।

এখানে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দেয়, কেন ও-রেলি তাঁর খুনের কথা তাঁর নিম্নতম সহকর্মীকে জানালেন? আমাদের মনে হয় ও-রেলি নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছেন বা নিজের আত্মগ্লানিকে হাল্কা করতেই তাঁর অপরাধের ঘটনা সোমকে জানিয়েছেন। মনে হয় অ্যারিস্টটল কথিত গ্রীক ট্রাজেডির নায়কের মত তিনি ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছেন—এ ঘটনা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে শক্ত। বিশেষ ভাবে তাঁর চোখের সামনে অবৈধ পুত্রের ঘোরাফেরা —তাঁর পৌরুষত্বহীনতাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বাটলার জয়সূর্যের অধিকার আরোপিত হবে তাঁর স্ত্রী পুত্রের ওপর ! এটা ছিল তাঁর কাছে অসহ্য।

প্রকৃতপক্ষে ও-রেলি তাঁর পত্নীকে গভীর ভাবে ভালবাসেন। নিজের অক্ষমতার জন্য তাঁর প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল। স্ত্রীর অবৈধ যৌন লিপ্সার কাজে নিজের অক্ষমতার যুক্তি খাড়া করলেও তৃতীয়পক্ষের অবস্থান (বিশেষ করে জয়সূর্যের), কিছুতেই স্বীকার করতে পারছেন না। যদি জন্মান্তর থাকে, তাহলে ইহ জন্মে যাঁকে পেলেন না, পরজন্মে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পাবেন—এই বিশ্বাসে তিনি তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন। ও-রিলের ক্ষেত্রে তাঁর কাজ আমরা সমর্থন করি আর না করি নিজের বিবেকের ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ করেছেন, এই বিশ্বাস বলেই তিনি জবাবদিহি দিয়েছেন সোমকে। ও-রেলি সব পেয়ে সব হারিয়েছেন, এটাই তাঁর জীবনের ট্রাজেডি। যে

বস্তুটির জন্য তাঁর জীবনের এই পরিণতি, সেই বস্তুটি এমন কিছু মহামূল্য নয়, যার অবস্থান জগতের ক্ষুদ্র জীবজন্তুর মধ্যেও বর্তমান, সেই বস্তুর অভাবে তাঁর জীবনের এই পরিণতি।—"আমি দেখতে ভাল, সৌন্দর্যবোধ আমার আছে, আমি প্রাণবান পুরুষ, আমার স্বাস্থ্য ভালো, আবার জোর দিয়ে বলছি সোম, আমার মতো স্বাস্থ্য পৃথিবীর কম লোকই পেয়েছে, আমার অর্থের অভাব নেই, বিলাসেও আমার ঝোঁক নেই, পাঁচজনের তুলনায় আমাকে বোকা বলা যেতে পারে না, এবং সব চেয়ে বড় কথা মেবলের মতো, সুন্দরী, প্রেমময়ী রমণী আমি পেয়েছি প্রিয়ারূপে পত্নীরূপে, সে আমাকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসে, আমাকে সে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিয়েছে —এই পরিপাটি প্যাটার্নটি বোনার পর ভগবানের একি নিষ্ঠুর ঠাট্টা, না শয়তানের অট্টহাসি! এই পার্ফেক্ট প্যাটার্নটির উপর কে যেন ছড়িয়ে দিলে নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে তার তাজা রক্ত। তোমাদের ভাষায় বলতে হলে, সুন্দর দুর্গাপ্রতিমা বহু যত্নে তৈরী করার পর তার উপর কে যেন ছিটিয়ে দিলে গোবর। মর্মর মসজিদের মেহরাবে না-পাক শুয়োরের খুন। কেন, কেন, কেন?" দীর্ঘ আট বছর ধরে ভেবেছেন ও-রেলি। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় মাঝে মাঝে এই সমস্যার কথা ভুলে যেতেন কিন্তু কাজের পরেই দ্বন্দ্ব তার মনকে ক্ষতবিক্ষত করত। মেবলকে হত্যা করে তার যে দ্বন্দ্বের শেষ হয়েছে, তা নয়। এখানো তাকে ভাবায়, তার জীবন চেতন্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে তার মন ভাবাবে। তিনি শেষ দিন পর্যন্ত ইডিয়ট ইস্বেসাইলের মতো খাদ্য শুধু চিবিয়ে যাবেন, কখনো গিলতে পারবেন না। তাই ট্র্যাজেডির নায়ক হিসাবে তিনি অবশ্যই আমাদের সহানুভূতি আদায় করতে পারেন।

ও-রেলি পাঁচটা ইংরেজের মতো নন। দর্শন পড়ে তার মনের একটা পরিবর্তন এসেছিল। জন্মান্তর সম্পর্কেও তার এক দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল। তাই এজন্মে যাকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া গেল না, পরজন্মে তাকে পেতেই তার হত্যা। কেন শুধু মেবলকে নয়? পেট্রিক ও জয়সূর্যকে কেন? এরা যে মেবল-এর সঙ্গে জড়িত। এদের স্মৃতি বা অস্তিত্ব কোনো মতেই এ পৃথিবীতে থাকা উচিত নয়। তাই এই হত্যা। যৌবন ক্ষুধার তাড়নায় মেবল তার সতীত্ব বিসর্জন দিয়েছেন একজন সামান্য ব্যক্তির পদতলে। এ নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং যুক্তি আমরা হাজির করতে পারি। কিন্তু ও-রেলি পত্নীহত্যাকে কখনই অস্বাভাবিক মনে করতে পারি না। মেবলের অবৈধ কাজে পলে পলে তিলেতিলে দগ্ধ হয়েছেন তিনি। এই দগ্ধের জ্বালা তিনি ছাড়া আর কেউ কি বুঝবে? জ্বালা ভোলার জন্য তিনি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছেন, কিন্তু জ্বালা দূর হয়নি, পরে আস্তে আস্তে হ্যামলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করলেন। তার আত্মার মৃত্যু হলো। আর আত্মা যখন মরে যায় তখন মানুষ হয়ে যায় পশু। নির্মম, জিঘাংসু এবং মারাত্মক পশু। ও-রেলি তাই হয়েছিলেন।

'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসে যে কয়েকটি নারী চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে মেবল অবশ্যই উল্লেখ্য। ও-রেলি যদি এই কাহিনীর নায়ক হন তাহলে তিনি অবশ্যই নায়িকা। তবে লেখক ও-রেলিকে যতটা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন তাঁকে কিন্তু

করেন নি। মেব্‌ল্‌ ও-রেলির প্রেমিকা পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী তথা গৃহিণী। ও-রেলিকে নিয়ে তাঁর এক রাশ কল্পনা। বিধাতা তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিলেও একটি বিষয়ে আঘাত দিলেন। মেব্‌লের এমন দুর্ভাগ্য যে তাঁর স্বামী ও-রেলির পুরুষত্ব অর্থাৎ সঙ্গমের ক্ষমতা নেই। বিবাহিত নারীর পক্ষে এটি ভয়ংকর ট্র্যাজিক।

মেব্‌ল্‌ মেয়েটি বেশ দেখতে শুধু নয়, বেশ নম্র। ও-রেলিকে ভালবেসে তিনি বিয়ে করেছিলেন। উভয়ে নিশ্চিত সুখী সংসার বাঁধতে কৃতসংকল্প। কিন্তু বিধাতা যে সকলকে সব কিছুই দেন না তার প্রমাণ আছে এই পরিবারেরক্ষেত্রে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা ছাড়া যে একটা দৈহিক সম্পর্ক রয়েছে, মেব্‌ল্‌ সেই স্বাদে বঞ্চিত। তিনি প্রথম প্রথম অনেক ভেবেছেন, চিন্তা করেছেন, মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর যৌবন ক্ষুধাকে প্রশমিত করতে পারেন নি। এ ক্ষেত্রে তাঁর সচেতন মন বা পরিস্থিতি পরিবেশ কতটা কাজ করেছিল সেটা বিবেচনা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

মেব্‌ল্‌ যৌবন ক্ষুধা স্বামী-দ্বারা নিবৃত্ত না করতে পেরে বাটলার জয়সূর্যের শয্যা সঙ্গিনী হয়েছেন। কিন্তু বাটলার জয়সূর্য কেন? তাঁর রূপ-গুণ বা অর্থ-কৌলিন্য —কিছুই নেই। তবুও বাটলার জয়সূর্যকে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে মেব্‌লের বিশেষ কতগুলো মানসিকতা কাজ করেছিল। প্রথমত– জয়সূর্য সব থেকে কাছের লোক। তার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হলে লোকের সন্দেহটা না হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত —জয়সূর্যকে বার বার দেখে সুপ্ত যৌন-ক্ষুধা তাঁর জাগরিত হতো। এই ক্ষুধাকে একদিন সংযত করতে না পেরেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসলেন। মন আর দেহকে একাসনে না বসিয়ে দেহকে আলাদা করে ফেললেন। স্বামী আর স্ত্রীর মাঝখানে জয়সূর্যকে গ্রহণ করলেও মনের দিক থেকে তিনি তাঁর কাজকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাই বিবেকের জ্বালা দংশন করেছে বার বার। নিজের অপরাধবোধের জন্যই স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছেন। এ কান্না নিজের যৌবনকে সংযত করতে না পারার বেদনা। এটাই অপরাধ-জনিত ব্যথা। তৃতীয়ত –নারী মাত্রই মা হতে চান। মেব্‌ল্‌ নারী। মা হতে চাওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফসল –সন্তান। এই সন্তানের মধ্যেই নিজেদের অস্তিত্ব বিরাজ করে। মেব্‌ল্‌ চেয়েছিলেন সেই সন্তান। কিন্তু এই সন্তান উপহার দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর স্বামীর নেই। দিনে দিনে উপেক্ষিত থাকতে থাকতে মেব্‌ল্‌ একদিন তাঁর যৌবনের ডালি অর্পণ করেছেন জয়সূর্যকে; যে গ্রহণ করতে আপত্তি করবে না, আবার জোর করে অধিকার জানাবে না।

মেব্‌ল্‌ তাঁর স্বামী ও-রেলিকে যথার্থই ভালবাসতেন। ও-রেলিও তাঁর স্ত্রীকেও ততোধিক ভালবাসতেন। তাহলে উভয়ে জীবনে এ ভুল করলেন কেন? মেব্‌লের জীবন-সাধনা নিষ্কাম প্রেমের নয়। তাই রক্ত-মাংস দেহী মেব্‌ল্‌ তাঁর যৌন-ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করেছেন জয়সূর্যের দ্বারা। জয়সূর্য তাঁর যৌন-ক্ষুধা মেটাবার যন্ত্র মাত্র—এর বেশী কিছু নয়। তাঁর স্বামী ও-রেলির প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল। স্বামীর

অসহায় অবস্থার কথা অন্তরে উপলব্ধি করতেন। তাই —"বেচারী মেব্‌ল্‌। গোড়ার দিকে সে আশ-কথা পাশ-কথা বলে বলে আমাকে আমার কচ্ছপের খোলের ভিতর থেকে বের করবার চেষ্টা করেছিল, শেষটায় সে চেষ্টাও ছেড়ে দিলে।" শুধু কি তাই —"খুব সম্ভব আমারই দেখাদেখি মেব্‌ল্‌ও বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিল"।

যুক্তিবাদীরা মেব্‌লের সঙ্গে জয়সূর্যের অবৈধ সম্পর্ককে ভাল চোখে দেখবেন না হয়তো। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের কাছে মেব্‌ল্‌ সহানুভূতি অবশ্যই পাবেন। যদিও দেহই মানুষের সব নয়, মনটাই সব থেকে বড়। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে নারীর বিচার করেছেন নারীত্বে —সতীত্বে নয়। মেব্‌ল্‌কে নারীত্বের কাঠগড়ায় দাঁড় করালে তিনি নির্দোষ। যৌবনের তাড়না অনেকেই সহ্য করতে পারেন না -সে ক্ষেত্রে মেব্‌ল্‌ তো সামান্য নারী মাত্র। যৌবনের অদম্য কামনা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা বিখ্যাত সাহিত্য। মুনি, ঋষিরাও কামনা দমন করতে পারেন নি। তাঁরা যদি শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে চিহ্নিত হতে পারেন, তাহলে মেব্‌লের নারী হিসাবে বাঁচার অধিকার থাকবে না কেন! যে স্বামী তাঁর দেহের ক্ষুধা মেটাতে পারেন না, সে স্বামীকে তিনি তো অবহেলা বা ঘৃণা করেন না। বরং সব সময় নিজের অপরাধ-বোধের জন্য স্বামীর সামনে হাজির হতে পারেন না। তাকে আমরা কখনই বিশ্বাসঘাতিনী বলতে পারব না। কারণ তিনি ইচ্ছা করলে, ও-রেলিকে ত্যাগ করে জয়সূর্যকে গ্রহণ করতে পারতেন। করেননি, কারণ তাতে তাঁর স্বামীর সম্মান জড়িয়ে আছে বলে। একজন পুরুষকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে গ্রহণ-করা পাশ্চাত্য নারীর পক্ষে বিশেষ কিছু ঘটনা নয়। মেব্‌ল্‌ তাঁর অসহায় স্বামীকে ত্যাগ করতে পারতেন কিন্তু করেন নি। স্বামীর অক্ষমতার কথা লোকে জানুক এটাও তিনি চান নি।

মেব্‌লের দুর্ভাগ্য, এত রূপ ও গুণের অধিকারী হয়েও তিনি যৌন-সুখ থেকে বঞ্চিত। স্বামীকে নিয়ে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ত বাস্তবে রূপায়িত হলো না। তার চাওয়া-পাওয়া বেশী কিছুই ছিল না। বলতে গেলে সাধারণ নারীর মতোই সামান্য। কিন্তু বিধাতা তাঁকে নারীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করলেন শুধু তাই নয়, এ জগৎ থেকে চিরবিদায় নিতে বাধ্য করলেন। তাঁর এই বিদায়ের জন্য দায়ী তাঁরই স্বামী ও-রেলি। যে ও-রেলির হাত ধরে অচেনা দেশে, অজানা পরিবেশে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন, যাঁকে ভালবেসেছিলেন, তাঁরই হাতে ঘটল তাঁর মৃত্যু —এখানেই মেব্‌লের ট্র্যাজেডি।

উপন্যাসে সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে আর একটি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তা অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ। ঔপন্যাসিক নানা কৌশলে এই অন্তঃপ্রকৃতিকে উদ্ঘাটন করে থাকেন। কখনও তিনি প্রবন্ধকারের মতে বিশ্লেষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, কখনও বা নাট্যকারের মতো নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বস্তুর আলোকে বস্তুকে উদ্ভাসিত করেন, কখনও বা অন্য-কৌশল অবলম্বন করেন। 'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসের ঘটনার ক্রমবিকাশ এবং চরিত্র বিশ্লেষণে একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বিত হয়েছে, তা ও-রেলির সোমকে লেখা পত্রগুলি। এটি একটি বিশেষ কৌশল, যাকে আমরা নাটকীয় কৌশল

বলতে পারি। নাটকে লেখক উপস্থিত হতে পারেন না, স্বগতোক্তি বা পত্রের মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীর মনোগত ভাবকে রূপায়িত করেন। সেক্সপীয়ারের অনেক নাটকে এরূপ পত্রের প্রসঙ্গ আছে : ভারতীয় নাটকেও রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসে এই কলাকৌশল প্রয়োগ করেছেন। তিনি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে অনেকগুলি পত্রের সংযোজনা করেছেন। পত্রের আকার বা প্রকার যাই হোক, প্রত্যেকটি পত্রই ঘটনা বা চরিত্র প্রস্ফুটনের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসে পত্রের প্রয়োগ রয়েছে। তবে বঙ্কিমের মতো বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর নয়। শুধু একজনেরই 'পত্র' প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে. তা হলো সোমকে লেখা ও-রেলির একগুচ্ছ পত্র। তাঁর লেখা এই পত্রগুলি তাঁর হৃদয়ের উত্থান পতনের সার্থক প্রতিলিপি। সোমকে লেখা ও-রেলির প্রথম পত্র -"তবে হ্যাঁ, আমার জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা মেব্‌ল্‌কে দেখা, তাকে পেয়েও না পাওয়া।" পত্রটিতে একটি পুরুষের হতাশার সুর ব্যক্ত। পরের পত্রগুলির ব্যঞ্জনা সুগভীর। এই পত্রগুলি যেন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও-রেলির হৃদয়কে ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎচমকের মতো নিমেষে উদ্ভাসিত করে দেখিয়েছে। দু'একটি পত্র আবার আহত মর্ম হতে উৎসারিত বেদনার অশ্রুতে লেখা।

নিজের প্রিয়া তথা স্ত্রীকে হত্যা করে বিবেকের দ্বন্দ্বে ও-রেলি কতটা ক্ষতবিক্ষত তার প্রমাণ পাওয়া যায় পত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে। পুরুষের জন্ম দেওয়ার অক্ষমতা একটা নারীর কাছে যেমন কাম্য নয়, তেমনি পুরুষের কাছেও কাম্য নয়। ও-রেলি যেদিন জেনেছিলেন তাঁর অক্ষমতার কথা সেদিন থেকেই তার মন হ্যামলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। পলে পলে তিলে তিলে কত দিন ধরে এক বিশেষ দহনে দগ্ধ হয়েছেন তিনি। তাঁর এই মানসিক দগ্ধতার একমাত্র সাক্ষী তার নিজের মন। এ দহন – সময়ের মাপকাঠিতে বিবেচ্য নয়। ২০ শে আগস্টের পত্রে ও-রেলি তাঁর মনের বাসনাকে গোপন রাখেন নি। "এই গরমের দেশে শীতের দেশের মেয়েকে চাঁদের আলোতে কী রকম অদ্ভুত রহস্যময় দেখাত। মেব্‌লের এই নিশিকান্ত সৌন্দর্য আমার আত্মার ক্ষুধাকে অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে কত শতবার ভরে দিয়েছে। আস্বচ্ছ ফিকে বেগনি রঙের মসলিন নাইট ড্রেসে জড়ানো মেব্‌লের শরীর আমার কবি-মানসের শূন্যকে মৃৎপাত্রকে অমৃতরসে বারবার ভরে দিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্বালিয়ে দিত আমার সর্ব ধমনীতে এক অদম্য যৌন-ক্ষুধা।" ও-রেলির এ জ্বলার শেষ নেই। তাই পরক্ষণেই বলেছেন "আমার ভিতরকার ডন কিক্‌সট ক্রমে ক্রমে কাতর হতে হতে রোগশয্যায় পড়ল। আর আমি ও-রেলি, আস্তে আস্তে হ্যামলেটের রূপ নিতে আরম্ভ করলুম।"

২২ শে আগস্টের পত্রটিতে স্ত্রীসর্বস্ব কিন্তু যৌনসঙ্গদানে অক্ষম এক পুরুষের মর্মজ্বালা ব্যক্ত হয়েছে। সাত্ত্বিক প্রেম, রাজসিক ত্যাগ এবং ক্ষোভ ও অভিমান মিলে হৃদয়ের দরদ দিয়ে লেখা এই পত্রটি ও-রেলির চরিত্রের স্বরূপকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। ১ লা ডিসেম্বর ও-রেলি সোমকে যে পত্রটি লিখেছেন তাতে আমরা দেখি

তাঁর মনের গুহায় অনেক প্রাণী-মন আশ্রয় নিয়েছে। "মনের গুহায় আছে কত প্রাণী, হ্যামলেট, ডন কিক্সট্, ডক্টর জীক্ল্, মিস্টার হাইড এবং তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে এদের নাচাচ্ছেন আহুরে মজদা, আহির মন, ।" এতগুলো প্রাণীর মনকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারলেন না। ৫ই ডিসেম্বরের পত্রে কি ভাবে তিনটি প্রাণী (মেবল্, জয়সূর্য ও পেট্রিক) তাঁকে গ্রাস করছে, তাদের বেঁচে থাকার অর্থ কি ! এদের সমস্যার হাত থেকে কি ভাবে উদ্ধার পেতে পারেন তার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। যে স্ত্রী তাঁর একমাত্র সহায় সম্বল, তাকে জয়সূর্য কেড়ে নিয়েছে, এর থেকে দুঃখের আর কি আছে। এই পত্রটি শুধু ও-রেলির আত্মবিবেককেই উন্মোচন করেনি, ঘটনাগুলি বর্ণনা করতে যেখানে বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদের প্রয়োজন হতো, সেখানে এই পত্রের মাধ্যমে তাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। লেখকের এ কৌশল অবশ্যই প্রশংসনীয়।

'অবিশ্বাস্য' প্রেম-মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক উপন্যাস। প্রেম ও প্রবৃত্তির পরিণাম দেখান হয়েছে এই উপন্যাসে। প্রেমের জোরেই ও-রেলি হিংসামুক্ত হয়েছেন, আর প্রবৃত্তির তাড়নায় মেবল জয়সূর্যের শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছেন। প্রেমেই মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়, ও-রেলি প্রেমেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। এর জন্য তিনি শাস্তি পেতে রাজি। পত্রগুলিকে কেন্দ্র করে ও রেলির হৃদয়টিকে উন্মোচন করেছেন লেখক। তাঁর অন্ধকার জীবনে এই নীরব পত্রগুলি যেন তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত করে প্রচ্ছন্ন প্রেমবনফুলের সৌন্দর্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। 'পত্র মৌন, ও-রেলির প্রেমও মৌন', কিন্তু এ মৌনতার আবেদন যেন সহস্র কলরব-মুখরতারও অধিক। তাই ও-রেলির সোমকে লেখা পত্রগুলি গুরুত্ব ও ব্যঞ্জনা সুগভীর। পত্রগুলিকে ও-রেলির মনো-দর্পণ বললে ভুল হবে না।

উপন্যাস হলো জীবনবেদ, জীবন-দর্পণ, জীবন-আলেখ্য। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন। তাই আমরা উপন্যাসে লেখককে প্রত্যক্ষে, অপ্রত্যক্ষে উপলব্ধি করে থাকি। 'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসের নায়ক ঐ সাহেব চরিত্রটির (ও-রেলি) মূল মানুষটিকে লেখক তাঁর জীবনে কোথাও দেখে থাকবেন। এঁর জীবনের ট্র্যাজেডি, সকরুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারই জীবনালেখ্য হয়তো 'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের গঠন কৌশল সম্পর্কে কিছু বলার আছে। ঔপন্যাসিকের ধর্ম হলো ঘটনা বিন্যাসের মাধ্যমে ক্রমবিকাশের পথে চরিত্র পরিচয় পরিস্ফুট করা। তিনি স্রষ্টারূপে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখেন সত্য, কিন্তু তাঁর অপ্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় অস্বীকার করা যায় না। উপরন্তু, তিনি সুকৌশলে উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহের আশ্রয়ে আপনার জীবন দর্শনকে ব্যক্ত করেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাব ও ভাবনা তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দান করে।

আধুনিক কালের উপন্যাস, বিশেষতঃ বিংশ শতকের রচনা, বিশ্লেষণ ধর্মী হয়ে পড়ায়, তা অতিমাত্রায় মননধর্মী হয়ে পড়েছে। এর ফলে চরিত্রের চিন্তা ও ভাবনা প্রাধান্য লাভ করায় আমরা তাঁদের পরিবেশ অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান ও অপরাপর ব্যক্তিদের সম্পর্কে কিছু জানতে পারিনা। অথচ স্থানেরও সজীবতা আছে, এটি

ব্যক্তি চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। স্কটের উপন্যাসে স্থানের বর্ণনা নিতান্ত অলঙ্করণের নিমিত্ত ব্যবহৃত, কিন্তু টমাস হার্ডির উপন্যাসে এই বর্ণনা নিগূঢ় তাৎপর্যের ইঙ্গিতবহ। এখানে এগডন হিথ কে বাদ দিলে তাঁর The Return of the Native অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে। আবার এমিল ব্রন্টির Wicthering Heights উপন্যাসে স্থানিক বর্ণনা হার্ডির ন্যায় সজীব নয়. চরিত্রের অভ্যন্তরেও এর প্রভাব অনুপ্রবেশ করে নি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর বর্ণনা-রীতি দু'দিক থেকে বিচার্য। একদিকে তাঁর বর্ণনা বাইরের স্থান ও পাত্রপাত্রীকে নিয়ে, অন্যদিকে তা চরিত্র আশ্রিত স্থানকে নিয়ে অংকিত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সজাগ, কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে জীবনরসরসিকের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যটুকু গেঁথে তুলেছেন ; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি সংযত, গম্ভীর ও বিশ্লেষণধর্মী। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি কবিমনের ক্রীড়াশীলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণ করেছেন দার্শনিক মনন-ধর্ম। উভয় ধারা পৃথক পথে প্রবাহিত হয়ে কাহিনীকে রসপুষ্ট ও চরিত্রগুলিকে ব্যক্ত করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। মধুগঞ্জের পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রগুলির যেন একটা সাদৃশ্য রয়েছে। আর আইরিশম্যান ডেভিড ও-রেলি তো এই মধুগঞ্জে এসেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। ঋতুতে প্রকৃতির যেমন রূপ বদলায়, মধুগঞ্জের প্রকৃতিতেও ঋতুর পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি এক এক ঋতুতে যেমন ভিন্নতা নিয়ে হাজির হয়, এখানকার লোকেরা প্রকৃতির প্রভাবে মনের ভিন্নতা নিয়ে বাস করে। প্রকৃতির শান্ত রূপকে তারা যেমন আহ্বান জানায়, আবার রুদ্র রূপেও তাঁরা বিরক্তিবোধ করে এবং পাশবিক বৃত্তি তাদের মনে চাগা দিয়ে ওঠে। প্রবৃত্তির উদ্দামতায় জন্ম দেয় সেই মানুষদের, যারা চিরকাল অবৈধতার প্রশ্ন কাঁধে নিয়ে সারাজীবন কাটায়। ও-রেলির মনের ভাব বোঝাতে লেখক বেশ কয়েকবার প্রকৃতিকে প্রতীকী ভাবনায় আমাদের কাছে হাজির করেছেন। মধুগঞ্জ ও-রেলিকে অনেক কিছুই দিয়েছে, তাই তো তিনি বলেছেন —"মধুগঞ্জ আমাদের লণ্ডনকে হার মানায়। সেই মধুগঞ্জে আমি অনেক কিছু পেলুম। ভগবান অকৃপণভাবে ঢেলে দিলেন তাঁর সব দৌলত, তাঁর তাবৎ ঐশ্বর্য। নৌকো বাচ থেকে আরম্ভ করে পাত্রী টিলার মেয়েগুলি।"

সৈয়দ মুজতবা আলীর সৌন্দর্যলিপ্সু কবি-মন প্রধানতঃ নিসর্গ প্রকৃতির মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ। এটা তাঁর রবীন্দ্রানুগত্যের ফল। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি উন্মোচনে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিসর্গ প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন।"কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ে প্রতিবিম্ব নিপাতিত হয়।" 'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসে প্রকৃতি দর্পণে মনুষ্যহৃদয়ের ছায়া পড়েছে।

'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসে পাপ সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। কবি দান্তে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করে একটি চিতাবাঘ, একটি সিংহ ও একটি নেকড়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যথাক্রমে এরা অসংযম, পাশবিক ভাব এবং প্রতারণাসহ অন্যান্য অনিষ্টকর পাপের প্রতীক। এ জাতীয় পাপের কথা ধর্ম শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

মানবজীবনে পাপের-স্বরূপ এবং এর প্রভাব সম্পর্কে শেক্সপীয়ার তাঁর নাটকগুলিতে আলোচনা করেছেন। এর সঙ্গে প্রচলিত নীতিশাস্ত্রের সম্বন্ধ না থাকলেও জীবনের উচ্চতর নীতির সঙ্গে এদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃত খ্রীস্টান যাঁরা তাঁরা পাপ ও পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য মেনে চলেন। প্লেটোর মতে মানুষের যুক্তি ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা চলা কর্তব্য। এই পথ হতে বিচ্যুত হলে সে পাপের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। Measure for Measure নাটকে এঞ্জেলো যে মুহূর্তে বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ইসাবেলাকে কামনা করলেন, সেই মুহূর্তে তিনি পাপকে বরণ করলেন। অ্যারিস্টটলের মতে জ্ঞানের অভাব হতে পাপের জন্ম। ম্যাকবেথের ক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য। শেক্সপীয়ারের পরিণত কালের নাটকে দেখা যায় যে, পাপকে দণ্ডদানের মধ্যে নয়, ক্ষমা ও ভালবাসার মাধ্যমে জয় করা হয়েছে। The Tempest নাটকে প্রসপেরো শত্রুদের ক্ষমা করেছেন। এখানে ক্ষমা অর্থে করুণা নয়, ভালবাসাকে বুঝতে হবে। এখানে তার বক্তব্য হলো —"the rarer action is in virtue than in vengeance."

পাপের আর একটি ধর্ম আছে। সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ডানকানের হত্যাকাণ্ডের পরে ম্যাকবেথ ও লেডিম্যাকবেথ একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। মহিষীর মৃত্যু সংবাদে ম্যাকবেথের সংক্ষিপ্ত উক্তি—"She should have died hereafter" পাপ জীবন হতে যাঁরা মুক্ত হতে পেরেছেন তাঁরা স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। পাপ প্রথমে ব্যক্তিজীবনে আবদ্ধ থাকে, পরে এটি সমাজ জীবনে ছড়িয়ে পড়ে একে কলুষিত করে।

'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসে পাপ অনেকেই করেছেন। কিন্তু এই পাপ কর্মে লিপ্ত থাকার জন্য যে কজনকে এ জগৎ ত্যাগ করে চলে যেতে হলো, তাদের কথাই এই উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়। এদের মধ্যে হতভাগী নারী হলেন মেবল। পুলিশ অফিসার ও-রেলির স্ত্রী। তিনি নিহত হয়েছেন তাঁরই স্বামীর দ্বারা। নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছিলেন বলে পাপীর এই পরিণতি। অপর দিকে মেবলই শুধু পাপ করেননি। ও-রেলিও পাপ করেছেন, তিনি কখনই নিজের হাতে পাপের শাস্তি এ ভাবে দিতে পারেন না। শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি পাপ করেছেন এবং ম্যাকবেথের মতো স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রবীন্দ্রানুগত্য সম্পর্কে আমাদের কোনো সংশয় নেই। কিন্তু মেবল ও ও-রেলির ক্ষেত্রে তার রবীন্দ্রানুগত্য সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধা জাগে। এখানে পাপ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করেছেন, তা শেক্সপীয়ার ও বঙ্কিমানুসারী, কখনই রবীন্দ্রানুসারী নয়। নারীর মানসিকতথা দেহগত পাপ-বোধকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষমার চোখে দেখেছেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রও এই পথ অবলম্বন করেছিলেন। এবং তাঁর উপন্যাসে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে একটি প্রশ্ন - নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড়? রবীন্দ্রানুসারী না হলেও লেখকের দৃষ্টি ভঙ্গীতে যে ত্রুটি আছে একথা কখনই বলছি না।

পরিশেষে 'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসের রচনাশৈলী সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই পরিবেশ চিত্রণ ও পরে ভাষার কথা মনে আসে। এই উপন্যাসে শব্দের ব্যবহারে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎসম, তদ্ভব শব্দ নয়, আঞ্চলিক শব্দকে লৌকিক বেড়া থেকে মুক্ত করে রচনার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছেন। বাচনভঙ্গীর মধ্যে মানুষের যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য এখানে আমরা লক্ষ্য করি। অনেক চরিত্র তিনি চিত্রিত করেছেন। কিন্তু কলমের স্বল্প খোঁচাতেই তাদের জীবন স্পন্দন হিল্লোলিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তার চোখ ও মনকে উন্মুক্ত করে রেখেছেন। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যে সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়েছেন তা নয়। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেছে। কিন্তু মূলকাহিনীকে তিনি এমন ভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সেখানেই পাঠক বেশী আকর্ষিত ও বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েছেন। তাই অন্যান্য ত্রুটিগুলি সম্পর্কে পাঠক কোন অভিযোগ আনেন না। শেষ বিচারে একথা বললে অসত্য হবে না যে 'অবিশ্বাস্য' ভিন্নস্বাদের বিশেষ এক মনস্তাত্বিক উপন্যাস।

'শবনম' লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ৩১ শে বৈশাখ ১৩৬৭ থেকে ভাদ্র ১৩৬৭ পর্যন্ত 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের পটভূমি কাবুল, আফগানিস্থান যেখানে লেখককে প্রথম জীবনে কর্মসূত্রে বেশ কিছুকাল থাকতে হয়েছিল। সমঃকাল বাচ্চাই মাকোর অভ্যুত্থান। লেখকের অসামান্য লেখনীগুণে সে সময়কার কাবুলের এক অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাস পড়ার সময় শেষের কবিতার কথা মনে পড়ে যায়।

'শবনম' উপন্যাসের আকর্ষণীয় বস্তু হোল- শবনম চরিত্র ও এই উপন্যাসের ভাষা। উপন্যাসের নায়িকা শবনম কাবুলের মেয়ে। মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ ও চটপটে, বয়স আঠারো কি উনিশ। লেখকের চোখে "যেন তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র। শুধু চাঁদ হয় চাঁপা বর্ণের, এর কপালটি একদম পাগমান পাহাড়ের বরফের মতো ধবধবে সাদা। মন মল্লিকার পাপড়ির মত। নাকটি যেন ছোট বাঁশী, গাল-দুটো কাবুলেরই পাকা আপেলের মত লাল টুকটুকে।" এ হেন শবনমকে দেখে মজনুন (লেখক) বিস্ময়ে হতবাক। সে যেন তাঁর প্রত্যাশিত মানসী। শবনমকে যখনই তিনি দেখেছেন তখনই তাঁর সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়েছেন। "আমার বুকের ভিতর যে ছবি আমি এতদিন হিয়ার রক্ত দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম সে যেন আজ মুক্তিস্নান সেরে আমার সম্মুখে দেখা দিল। তার মুখে সব সময়েই শিশির-মধুমাস, আফগানিস্থান-হিন্দুস্থান বিরাজ করত, কপাল আফগানিস্থানের শীতের বরফের মতো শুভ্র আর কপোল বোলপুরের বসন্ত কিংশুকের মত রাঙা"। শবনমের পরিবর্তন তিনি দেখেছিলেন কেবল মাত্র চোখে।

শবনমের কাছাকাছি যতই মজনুন এসেছেন, ততই তাঁর ক্ষুধা বেড়ে গেছে। কিন্তু তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে শবনমের এসব অনেক শতগুণে বেশী। কিন্তু প্রেম এমনই যে প্রতিপত্তিকে তোয়াক্কা করে না। তাইতো মোগল রাজকন্যা জেবউন্নিসা সব কিছু ঐশ্বর্য্য ফেলে দিয়ে মোবারকের কাছে ছুটে এসেছিলেন। প্রেম

যে পাত্র-পাত্রী গ্রাহ্য করে না তারও প্রমাণ শবনম। অন্তরের তাগিয়ে তিনি মজনুনকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। আত্মীয় স্বজনের সম্মতিতে তাঁরা ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন এবং বেঁধেও ছিলেন। কিন্তু বিধাতা সকলকে সব সুখের অধিকারী করেন না। মজনুন-এর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ছিল. "হে খুদা,আদম এবং ইভার মধ্যে, ইউসুফ ও জোলেখার মধ্যে, হজরৎ ও খাদিজার মধ্যে যে প্রেম ছিল, এ দুজনার ভিতর সেই রকম প্রেম হোক"। ঈশ্বর কি মজনুনের সেই প্রার্থনা শুনেছিলেন। একদিন বাচ্চার খাঁর সেনাপতি জাফরখানের লোকেরা শবনমকে নিয়ে চলে গেল। তবে যে কি হলো তার খবর কেউ জানে না। অনেক অনুসন্ধান করেছেন মজনুন কিন্তু খুঁজে মেলে নি। নানা জনে নানা কথা বলেছেন। আমাদের বিশ্বাস শবনম কখনই কারও অধীনে থাকার পাত্রী নন। হয় নিজে শেষ হবে নয় অপরকে শেষ করবে। তাঁর সম্পর্কে তাঁর প্রিয় মজনুনের একথাই মনে হয়. "শত্রু বেদনা দেয় মিলনে, মিত্র দেয় বিরহে শত্রু মিত্রে তা হলে পার্থক্য কোথায়? অথচ মিত্র যখন দূরে চলে যায় সে তো প্রিয়জনকে বেদনা দেওয়ার জন্য যায় না। তবে কেন হাসি মুখে তাকে বিদায় দিতে পারি নে, তবে কেন হাসি মুখে তার পুনর্মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারি নে।" মজনুন প্রতীক্ষারত, শবনম একদিন আসবে। কারণ তাঁর কাছে শবনমের মৃত্যু নেই। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। দেহাতীত প্রেমের এক অপূর্ব কাহিনী এই 'শবনম'।

'শবনম' উপন্যাস সম্পর্কে বলতে পারি, জীবনালেখ্য চিত্রিত করাই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রচনায় সে জীবন-চিত্র জলের আলপনা নয়, পাষাণ-রেখা। জীবন-চিত্র পাষাণ রেখায় অংকিত হয় তখনই, যখন জীবন সম্পর্কে একটা বলিষ্ঠ ধারণা লেখকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। এই ধারণা মুহূর্তের বিলাস নয়; নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জীবন-চক্রের নাভি সম্পর্কে লেখকের অর্জিত অভিজ্ঞতাই বদ্ধমূল ধারণার রূপ নেয়। এটি যেন লেখকের প্রতি শোণিতকণায় প্রতিষ্ঠিত সত্য, এটি তাঁর অন্তরাত্মার বিশ্বাসের প্রকাশ। জীবন সম্পর্কে অন্তরাত্মার এই বিশ্বাসের তাগিদই সাহিত্যের প্রকৃত প্রেরণা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রেরণা বাইরের, বা যতক্ষণ তা প্রত্যয়ে পর্যবসিত না হয়, ততক্ষণ সৃষ্টি অস্বচ্ছ, প্রকাশও কৃত্রিম। যখন এই প্রেরণা আত্মপ্রত্যয়ের গভীর স্তর হতে উদ্ভূত হয়, তখন তা স্বচ্ছ এবং তার প্রকাশও অকৃত্রিম। জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রকাশ এভাবেই হয়। লেখকের নিজস্ব ধ্যান জীবনকে যে ভাবে অনুভব করে, জীবন-সম্পর্কে তাঁর যে দার্শনিকতা গড়ে ওঠে, লেখক তাকেই শিল্পমূর্তি দান করেন। এজন্য আবার দেখি, একই জীবন প্রথম থেকে একই খাতে প্রবাহিত হয়ে চললেও প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মানস-ভাবনায় তা স্বতন্ত্র ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। 'শবনম' উপন্যাসের মধ্যে লেখকের এক বিশেষ মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে, যাতে মজনুন ও শবনম-এর জীবনালেখ্য গড়ে উঠেছে।

গঠন কৌশলের অনবদ্যতার মতো ভাষাও একজন লেখকের নিজস্ব --ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁর অভিরুচি ও প্রয়োগ-বিধি নিরূপিত হয়। ভাষা প্রকৃতপক্ষে ভাবের বাহন, যোগ্য লেখক ভাষার ক্ষেত্রেও নিজস্ব পরিমন্ডল তৈরী করতে সক্ষম। ভাষার

ওজস্বিতা না থাকলে ভাবের অলৌকিত্ব পাঠকের চোখের সামান প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভবপর নয়। একটি রচনার গুণাবলী বিচারের পূর্বে যা আকর্ষণীয়, তা-ই হচ্ছে ভাষা। ভাষাই জানান দেয় বিষয়ের তিক্ততা, বেদনাময়তা, বিষণ্ণতা, উজ্জ্বলতা। এ কালে ভাষা হয়ে উঠেছে তির্যক, জীবন হয়ে উঠেছে জটিল থেকে জটিলতর, ভাষা বিষয়ের পেছনে পেছনে তাকে অনুধাবন করে চলেছে, বিষয়ের স্বাদ ও গন্ধের বহনকারীর ভূমিকা নিতে হয় তাকে। ব্যক্তির যন্ত্রণা থেকে লেখকের উপলব্ধি সবের দায় বহন করতে হয় ভাষাকে। শব্দকে যে ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তার পেছনে অনেক যুক্তি রয়েছে। তবু ভাষা আজকালেরই প্রয়োজনে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে, যুক্তির রৌদ্রতাপে আবেগের ভাষা ক্রমাগত নিঃশেষিত হচ্ছে। কাব্যের ভাষাতেও দৃঢ়বন্ধ স্থাপত্যের কীর্তি স্থাপিত হচ্ছে।

সমস্ত ঔপন্যাসিক অবশ্যই সমভাবে ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহমত নন, কেউ কেউ ভাষার ক্ষেত্রে ততখানি যত্নবান ও পরিশ্রমী হতে নারাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ওজস্বিতা, রবীন্দ্রনাথের সুগন্ধবহ কাব্যচমৎকারিত্বপূর্ণ ভাষা শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে সহজ ও আটপৌরে হয়ে উঠেছে।

সমাজ হচ্ছে শব্দ বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। মানুষের অনবরত সংলাপ, জিজ্ঞাসা ইচ্ছা, অহমিকা, বেদনা প্রতিদিন উচ্চারিত ধ্বনিকে ইঙ্গিতবহ করছে। আমরা যদি কখনও আমাদের কর্মে ও ইচ্ছায় সমাজ বিমুখ হই, তা হলেও সমাজ আমাদের অনুসরণ করবে ভাষা হয়ে, কখনও জাগরণে, কখনও স্বপ্নে। শব্দ চিরকাল সমাজ ও সভ্যতার স্মৃতিকে বহন করে আছে। শব্দ হচ্ছে একটি জাতির ইতিহাস, বিবেকের সাড়া। লেখকের লেখায় প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষায় শব্দের ব্যবহারে যে ত্রুটি থাকে তা জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার জন্য। "আমরা প্রথমে ভাষাকে পাই, পরে তাকে আবিষ্কার করি শাসনের মধ্যে এবং অস্তিত্বের বিচিত্র খেলায়। রুদ্ধবাক থেকে মুক্তবাক এবং অবশেষে সর্বসঞ্চয়ের অভিজ্ঞতায় স্বল্পবাক –যে কোনও প্রধান লেখকের লেখক জীবনের ক্ষেত্রে এ উক্তি চরম ভাবে সত্য। যাকে ইংরাজীতে বলে crystallizaion অর্থাৎ স্ফটিক-বন্ধন, আমাদের অভিজ্ঞতা যখন স্ফটিকের নিশ্চিত স্বচ্ছতায় পরিণত হবে, তখন অনেক কথা বলবার প্রয়োজন করবে না।" অতি অল্প কথায় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে বাঙ্ময় করবো। আমরা প্রতিদিনের জীবনের জানালায় দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতার নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছি। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে জীবনের যে সঞ্চয়, অভিজ্ঞতার আহরণ নিয়ে একজন লেখকের জীবনে তা যেমন সত্য, অন্য কারো জীবনে তেমন নয়। কারণ পাঠকের বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করা, আবেগকে পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব লেখকের। শব্দের বিন্যাসের মধ্যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার জন্ম। প্রতিদিনের ভাষা একটি তীব্র স্বাভাবিকতায় অথচ মুহূর্তের সীমাকে অতিক্রম করে একটি জীবনের স্মরণ চিহ্ন হবে। পাঠক যেখানে বাস করেন ব্যবহারের এবং প্রয়োজনের পৃথিবীতে, লেখক সেখানে বাস করেন জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভবিষ্যতের অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই পাঠককে লেখকের কাছে পৌঁছাতে হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে একথা

একান্তই প্রযোজ্য। যে ভাবে তিনি শব্দকে ব্যবহার করেছেন, শব্দকে তাঁর বহুবিধ লৌকিক পরিবেশ থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে অবিরাম গতি দিয়েছেন. মানুষের উচ্চারণ-গত বাণীভঙ্গীকে নির্মিত বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তার তুলনা হয় না। তিনি যেমন নিজে আসর জমিয়ে কথা বলতে ভালবাসতেন, তাঁর রচনাতেও সেই আসরের বৈঠকী মেজাজ এসেছে। তঁর শব্দের প্রবাহের মধ্যে তিনি শুধু একাকী উপস্থিত নন, আসরের অন্যান্য লোকেরাও সেখানে উপস্থিত রয়েছে। তাঁর রচনার সঙ্গেই বিভিন্ন মানুষের কলরব সেখানে শোনা যায়। এই দক্ষতার ফলেই মুজতবা আলী তাঁর বচনার মধ্যে একটি চতুর নাগরিক জীবনকে বাঙ্ময় করতে সক্ষম হয়েছেন।

মুজতবা আলী বেশ কিছুদিন কাবুলে ছিলেন। সেখানকার জীবনকে তিনি জেনেছেন, বিশেষ করে সেখানকার মানুষের সময় ক্ষেপণের যে সমস্ত উপকরণ ছিল, সেগুলি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আমরা সাধারণতঃ যে কাবুলকে জানি, মুজতবা আলীব কাবুল সে কাবুল নয়, তাঁর কাবুল হচ্ছে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে প্রবাহিত নগর-জীবনেব বিচিত্র মানুষের জীবন উত্থানের কাবুল। ঠিক একই ভাবে তিনি জার্মানী ও বাংলাদেশকে, ('অবিশ্বাস্য' উপন্যাসে) দেখেছিলেন এবং তার পরিচয় উদ্ঘাটন করেছিলেন। style বা বাগধারা লেখকের প্রতিফলিত মানসিকতা। লেখকের মানসিকতার পেছনে সক্রিয়ভাবে অথচ প্রায়শঃই অজ্ঞাতে বিদ্যমান তাঁর সমাজ, পরিবেশ এবং শিক্ষা , যে সমাজ ও পরিবেশ তাকে লালন করেছে এবং যার প্রশ্রয়ে তিনি সমৃদ্ধ বা লাঞ্ছিত তার মানসরূপ নির্মাণে সে সর্বদাই প্রতিশ্রুত। বাংলা শব্দব্যবহারের বিচিত্র দ্যোতনায় মুজতবা আলী নিঃসন্দেহে অনন্য সমৃদ্ধমান ব্যক্তি। 'শবনম' উপন্যাসে শব্দের ব্যবহার উল্লেখিত উক্তির যাথার্থ নির্ণয়ে কতটা সাহায্য করেছে, দেখা যেতে পারে। —

শবনমের নাম শুনে লেখকের উক্তি —"আমি তব সখী হে-শেফালী,
শরৎ নিশির স্বপ্ন, শিশির সিঞ্চিত , প্রভাতের বিচ্ছেদ বেদনা।"
এর উত্তরে শবনম হাফিজের কবিতা উল্লেখ করেছেন

গুল নিমতীস্ত হিদ্য়া ফিরিস্তাদে অজ বেহেশৎ,
মরদুম্ কবীম্তর শাওদ্ অন্দর্ নইম্-ই-গুল,

এর বাংলা অর্থ

অমরাবতীর সওগাত এই ফুল এল ধরাতলে.
ফুলের পুণ্যে পাপী-তাপী লাগি স্বর্গের দ্বার খোলে।

শবনম যখন তার মজনুনকে বলেন "শোন দিলই-মন." মুর্খই হও আর সাক্রিটিস হও, প্রেম কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না, শোন্ -

দিলগুমান দারদ কি পুশীদে অস্ত বাই-ই-ইশ করা
শমরা ফানুস পনদারদ্ কি পিনহান করদে অস্ত।

এর বাংলা করলে দাঁড়ায়

সরল হৃদয় মনে করে প্রেম লুকায়ে রাখিতে পারে,
কাঁচের ফানুস মনে মনে ভাবে লুকায়েছ শিখাটারে।

মজনুনের শবনমকে বিয়ে করতে গিয়ে মনে হয়েছে—"আমার বউ, আমার বিবাহিত স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে চলেছি। এ যেন একই দিনে দুবার সূর্যোদয়। কিন্তু তাও হয়।" পরক্ষণেই শবনমের বিয়ের সাজ দেখে - "এ যেন পূর্ণ চন্দ্রের দূরে দূরে কয়েকটি তারা ফোটানো হয়েছে চন্দ্রের গরিমা বাড়ানোর জন্য। এ যেন উৎসব গৃহের সৌন্দর্যের মাঝখানে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়েছে।"

আরও -"শবনমের স্মিত হাস্য অন্তহীন। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। হাসতে হাসতে আমাকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটের উপর তার স্ফুটিতাধরোষ্ঠ চেপে ধরে যেন অতৃপ্ত আবেগে আমার পাণ্ডুর অধরের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিতে লাগল। আমি মোহমান, কম্প্রবক্ষ, বেপথুমান। আমার দৈহিক স্পর্শকাতরতা অন্তর্হিত। আমার সর্বসত্তা শবনমে বিলীন।"

পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে "দূরে পাগমান পর্বতের সানুদেশ, চুড়া তারও দূরে দিগন্তে হিন্দুকুশের অর্ধগগন চুম্বী শিখর, কাছে শিশির ঋতুর নিদ্রাবিজড়িত বিসর্পিল কাবুল নদী, সব সৌন্দর্য সব বিভীষিকা, সব সর্বাপিকারীর অলংকার সর্ব সর্বহারার দৈন্য ভদ্রাভদ্র সকলের উপর নির্বিচারে প্রসারিত হয়েছে তুষারের আস্তরণ। আকাশের মা জননী যেন এক বিরাট শুভ্র কম্বল দিয়ে তাঁর একান্ন পরিবারের ধনী-দরিদ্র রাজা-প্রজা তার সর্ব সন্তান সন্ততিকে আচ্ছাদিত করে তাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন।"

Style বা বাগধারা যদি লেখকের প্রতিফলিত মানসিকতা হয়, তাহলে শবনমে সেই মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। প্রতিদিনের কথা একটি তীব্র স্বাভাবিকতায় অথচ মুহূর্তের সীমাকে অতিক্রম করে একটি জীবনের স্মরণ চিহ্ন হয়ে রয়েছে "এবারে আত্মচৈতন্য লোপ পেয়ে কেমন যেন এক সর্বকলুষমুক্ত অখণ্ড সত্তাতে আমি পরিণত হয়ে যাই। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা সে নয় -অথচ সর্ব ইন্দ্রিয়ই সেখানে তন্মাত্র হয়ে আছে। এখানে যেন জেগে ওঠে বানের পর বান -গম্ভীর, করুণ, নিস্তব্ধ জ্যোতির্ময় ভূর্ভুবঃস্বঃ। ওই তো শবনম, ওই তো শবনম, ওই তো শবনম।"

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য -মানবিকতা আর রবীন্দ্রানুগত্য। তাই 'শবনম' উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতার' প্রভাব লক্ষ্য করি। 'শেষের কবিতা' আইডিয়া ভিত্তিক উপন্যাস। রিয়ালিটির অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। 'শবনমও' একটি আইডিয়া ভিত্তিক উপন্যাস। রিয়ালিটির যেটুকু প্রয়োজনীয়তা লেখক সেটাই গ্রহণ করেছেন। অজস্র কবিতায় আকীর্ণ এই উপন্যাসটি পরিপূর্ণ কাব্যপাঠের আস্বাদনেই পাঠকের মনকে মন্থর করে তোলে। সুভাষিত কথার মালা গেঁথে গেছেন লেখক। এটা ক্রমশ যেন তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। ফলে উপন্যাসের ক্ষতি হয়েছে, কাহিনী দানা বাঁধতে পারে নি। পরবর্তী ক্ষেত্রে লেখক এটা বুঝতে পেরে এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং শেষে ট্র্যাজিক ঘটনাটি দিয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাস হিসাবে কতটা সার্থক হওয়ার কথা ছিল তা কিন্তু হয়নি। বহুদর্শী রসবোদ্ধা লেখকের কাছে

এটা পাঠকের অপ্রত্যাশিত। এই উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে দু' একটি কথা বলার রয়েছে, —পাণ্ডিত মুজতবা আলী অনেক ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিক মুজতবা আলীর কলম কেড়ে নিয়েছেন। পাঠক কতটা বুঝবে, গ্রহণ করবে, সেই পরিমিতি বোধ তাঁর ছিল না। হৃদয়ের জগতকে জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। এর ফলে কাহিনী হোঁচট খেয়েছে, দানা বাধতে পারেনি। তবুও বলব 'শবনমে' নায়ক নায়িকার চরিত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে। এটাই লেখকের লেখনীর উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। এটাই তাঁর অসামান্য শক্তির পরিচায়ক।

'শহ্‌র্‌-ইয়ার' (১৯৬৯) ও 'তুলনাহীনা' (১৯৭৪) সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্য-জীবনের শেষ পর্বের রচনা। দুটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু মানবজীবনের অন্তহীন দুঃখবেদনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি" —কবি প্রদত্ত এই ভাবনাকে সৈয়দ মুজতবা আলী মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তার উপন্যাসগুলিই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুসলমান মেয়েকে নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী দুটি উপন্যাস লিখেছেন, একটি 'শবনম' অপরটি 'শহ্‌র্‌-ইয়ার'। 'শহ্‌র্‌-ইয়ার' উপন্যাসের নায়িকা আধুনিকা মুসলমান রমণী। তার রূপ, বুদ্ধির দীপ্তি, আতিথি-পরায়ণতা ও কোমল সেবাপরায়ণতার কথা লেখক বার বার উল্লেখ করেছেন, যে উল্লেখের মধ্যে প্রশংসা সর্বাধিক। নায়িকা শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর দাম্পত্য-জীবনের উল্লেখে তাঁর স্বামীরা যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে আমরা দেখি তাঁর স্বামী ডাক্তার, ভদ্র ও বিনয়ী। নায়িকা শহ্‌র-ইয়ার-এর সঙ্গে লেখক নায়কের সম্পর্ক কি - এ-প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। নায়কের কথাতে "আমার বোনের চেয়েও বোন, প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়া।" নায়কের সঙ্গে যখন নায়িকার হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তখনই ভৃত্য জামালের কাছে তিনি জানতে পারলেন শহ্‌র্‌-ইয়ারকে পীরে ধরেছে। একথা জানতে পেরে তাঁর স্বামী মৃতপ্রায়, আর লেখক নায়ক হতভম্ব। কারণ নায়কের কাছে এটা অবিশ্বাস্য। একথা তিনি মানবেন কি করে? সাধারণত মুসলমান মেয়েদের নামাজ ও রোজার প্রতি যেটুকু আকর্ষণ থাকে, সেটুকু শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর কথাবার্তার মধ্যে তিনি কখনই লক্ষ্য করেন নি। বার বার তিনি বলেছেন তার হৃদয় ও প্রাণ, তার সবকিছুর ইমারৎ দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের তিনহাজার গানের তিনহাজার স্তম্ভের ওপর। এখানে গুরুবাদ কোথায়, আর পীর সাহেবই বা কোথায়! এটাই রহস্য, আর এটাও উপন্যাসের রহস্য।

লেখক শহ্‌র্‌-ইয়ারের জীবনের চারটি স্তর দেখিয়েছেন। প্রথম স্তরে, বাঙ্গালী মুসলমান ঘরের মেয়ে সামাজিক অবরোধ ভেঙ্গে কলেজে পড়াশুনা করেছে। দ্বিতীয় স্তরে, স্বামী থাকলেও তিনি সঙ্গীহীনা, কিন্তু তিনি সুগৃহিনী, মমতাময়ী, সেবাপরায়ণা সঙ্গিনী ও রবীন্দ্ররসিকা। তৃতীয় স্তরে, পীর-শরণাশ্রিতা। চতুর্থ স্তরে, বিদেশযাত্রিনী অন্তঃসত্ত্বা নারী।

শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর স্বামী ডাক্তার, তিনি ব্যস্ত থাকেন তাঁর চিকিৎসা নিয়ে। প্রাসাদোপম নির্জনগৃহে তাঁর সময় কি করে কাটে? সন্তান-সন্ততী বা সঙ্গী থাকলে

হয়তো সময়টা কেটে যেত। কিন্তু সন্তানহীনা, স্বামীসঙ্গবিচ্যুতা শহর-ইয়ার-এর দিন আর কাটে না। তাই অবসর কাটাতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন সাহিত্য-সঙ্গীতে। সঙ্গীতে বলতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত বিশেষ করে। ঠিক এই সময়েই লেখক নায়কের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। দিনে দিনে এই পরিচয় গাঢ়তর হয়েছে, নায়ক অনুভব করেছেন নায়িকার নিঃসঙ্গতা ; রবীন্দ্রসংগীতকে অবলম্বন করে নায়ক দিনে দিনে আবিষ্কার করেছেন এই অসামান্য নায়িকাকে। "কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ কুসুম চয়নে" গানের রেকর্ডটি পরস্পরকে কাছাকাছি এনেছে। নায়িকা কেবল রবীন্দ্রভক্ত নন, তিনি সুগায়িকাও। তাঁর নিজের কথায় —"আমার জীবনরস রবীন্দ্র সঙ্গীত। ঐ একটিমাত্র জিনিস"। পর পর যে সব গান তিনি শুনেছেন ও গেয়েছেন, তার থেকে নায়িকার আনন্দ, বেদনা, নিঃসঙ্গতা, জীবনানুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—"তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি", "ঐ মরণের সাগর প্যারে, চুপে চুপে তুমি এলে", "কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না", "জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না", "তোমারে সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে", "নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা", "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে"।

প্রিয় বান্ধবী আর পীরভক্ত নায়িকা শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর এই দুটি রূপে লেখক নায়ককে করেছে বিভ্রান্ত। পীরভক্ত শহর ইয়ারকে দেখে নায়কের বেদনা আর সংশয় যায় না। নতুন মানুষ হলে কোনো ভাবনাই ছিল না, কিন্তু পুরানো মানুষকে নতুন করে চিনবে কি করে ? এর থেকে বেদনাদায়ক আর কী কিছু আছে। আর শহর-ইয়ার-এর সঙ্গে যদি নায়কের সম্পর্ক প্রণয়ের হতো তবে তার আজকের অবহেলা অন্যদিকে পুষিয়ে যেত। প্রেম হলো পূর্ণ চন্দ্র। তাই তার চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু বন্ধুত্ব শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো, রাতে রাতে বাড়ে, আর চতুর্দশীতে এসে থেমে যায়। পূর্ণিমাতে পেঁছায় না। তাই তার গ্রহণ নেই, ক্ষয় নেই, কৃষ্ণপক্ষও নেই। তবু এই বন্ধুত্বের ওপর কিসের করাল ছায়া ? এই চিন্তা নায়ককে ব্যাকুল করে তুলেছে। পীরভক্ত শহ্‌র্‌-ইয়ারকে নায়ক রবীন্দ্র-রেকর্ড বাজাতে বলেছেন "তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।" নায়িকা বাজিয়েছেন কিন্তু আগের মতো কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁর দেখা যায় নি। আর দেখা যাবে কি করে ? কারণ তিনি তো আর রবীন্দ্রলোকে নেই, তিনি চলে গেছেন সুফীপীরের দরবারে। রাতের আঁধারে নায়ক শুনেছেন শহর-ইয়ার অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে গাইছেন জপগীত -আরবী দোঁহা— "ইয়ালতীফুল। তুফ্‌বি না। নাহ্‌নু বিদক্‌ / কুল্লি না।" এর বাংলা অর্থ —হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য্য আমাদেরকে দাও। আমরা তোমার পূজারী, আমরা সকলেই। পীরভক্ত নায়িকাকে নায়ক যতই দেখেন ততই বিস্মিত হন। তাঁকে তিনি যতটা জানেন, তাঁর ডাক্তার স্বামী যতটা জানেন, সে জানাটা তাঁকে সম্পূর্ণ জানা নয়। অপরিচিত মানুষের চোখে, 'তিনি অগ্নিশিখা' তাতে নায়কের বিস্ময় আরও বেড়ে যায়। পীরভক্ত নায়িকাকে নায়ক বার বার রবীন্দ্র ধর্মসংগীতের আনন্দ

অনুধাবন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি ম্লান হেসে জানিয়েছেন—"ঐসব গানের রেকর্ড তার বুকের ভিতর সাড়া জাগায় না।"

উপন্যাসের শেষে শহর-ইয়ার-এর দীর্ঘ পত্র মারফৎ তাঁর মানসিক পরিবর্তনের ইতিহাস, তাঁর দাম্পত্য জীবনের ট্র্যাজেডি—তাঁর নিঃসঙ্গ নারী-জীবনের ক্রন্দনাদীর্ণ কাহিনী বর্ণিত। রবীন্দ্রধর্মসঙ্গীত আর তাঁকে টানে না, এ কথা স্বীকার করেও তিনি রবীন্দ্রনাথের শরণ নিয়ে তাঁর সমস্যার বিবরণ দিয়েছেন "যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম"। জানিয়েছেন, তিনি যথাযথ জানেন না তাঁর কিসের ব্যথা, অভাব কোনখানে, যার ফলে বিলাসবৈভবের মাঝখানেও যেন কোনো এক অসম্পূর্ণতার নিপীড়ন তাঁকে অশান্ত করে তুলেছে। শহর-ইয়ার-এর সমস্যা কী? পুরুষ মানুষ কি কখনো নারীর মন বুঝতে পারে, চিনতে পারে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে? তিনি তাঁর জীবনে শূন্যতার চরিত্র অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পুনরায় রবীন্দ্রনাথের স্মরণ নিয়ে বর্ণিত হয়েছে তাঁর অবস্থা-

ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সমুখে ঘন আঁধার
পার আছে কোন্ দেশে॥
হাল-ভাঙা পাল ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে॥
পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায়
কী আছে শেষে!

শহর-ইয়ার-এর তীক্ষ্ন আত্ম জিজ্ঞাসা—"মেয়েদের এই শূন্যতা, দীনতা, ফ্রাসট্রেশনের জন্য দায়ী কে?" তিনি অবশ্য বলেছেন, "নারী হয়েও বলবো, তার জন্য সর্বাগ্রে দায়ী রমণীকুল।" অন্ধ ঐতিহ্য, আনুগত্য নষ্ট করে দিয়েছে তাঁর দাম্পত্য জীবন, তাঁর ব্যক্তি জীবন। এখন মুক্তি কোন্ পথে? পীরের স্মরণ তিনি নিয়েছেন: স্মরণ নিয়ে যে পরিবর্তন তা পরিব·ন নয়—নবজাগরণ। তিনি নিরাশাবাদী নন—জীবনকে ঢেলে সাজাতে চান নতুন ভাবে। এ বিশ্বাস তাঁর আছে।

রূপনারায়ণের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ·।

রবীন্দ্রনাথের অন্তিম কবিতা এই নায়িকার কাছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে।

'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসের ও-রেলির মতো শহর-ইয়ার-এর বিশ্লেষণমূলক দীর্ঘ পত্র তাঁর জীবনের টেস্টামেন্ট। লেখক নায়ক ধীরে ধীরে অতি নিপুণতার সঙ্গে উন্মোচন করেছেন তাঁর জীবনের তিনটি স্তরকে। আর শেষ তথা চতুর্থ স্তরে,

তিনি শেষ কেরামতি দেখিয়েছেন—শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর সঙ্গে ডাক্তার স্বামীর ভুল ভেঙেছে, আগুনে পুড়েছে ট্রাডিশনে মোড়া পাষাণদুর্গ। শেষ হয়েছে তাঁর স্বামী-নিঃসঙ্গ-জীবন, স্বামীর সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা শহ্‌র্‌-ইয়ার চলেছে নবজীবনের সন্ধানে সুইডেনে। সেখানে গিয়ে তিনি কি পাবেন নির্জনতা? আবার দেখা হবে তো? নায়কের দুটি প্রশ্নের জবাবে নায়িকা জানিয়েছেন—"জানি, কী হবে।" এটাই তো স্বাভাবিক জীবন অনন্ত-রহস্যময়, কে জানে কী হবে? "পথের শেষ কোথায়! কী আছে শেষে!"

সৈয়দ মুজতবা আলীর শেষ উপন্যাস 'তুলনাহীনা'। পটভূমি প্রত্যক্ষ কোলকাতা, আগরতলা, শিলং: অপ্রত্যক্ষে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান। ইয়োহিয়ার বুটের তলায় নিষ্পেষিত পূর্ব পাকিস্তান—আজাদীর জন্য অপেক্ষারত রক্তস্নাত বন্ধমুষ্টি পূর্ব পাকিস্তান। এটি একটি প্রেমের উপন্যাস। এ উপন্যাসের নায়ক, নায়িকা কীর্তি চৌধুরী আর শিপ্রা রায়। শিপ্রা কোলকাতার খানদানী ঘরের মেয়ে, বেয়ারাদের কথায়-'খাঁটি মিশিবাবা' পবিত্র মহরম মাসে ইয়াহিয়া খুনখারাবী করতে ইতঃস্তত করতে পারে, এই ধারণা নিয়ে কোলকাতা, আগরতলা আর শিলঙের অনেক মুসলমান যখন বসে ছিল, তখন কিছু ধর্মভীরু মুসলমান আর হিন্দুর সব আশা-ভরসা নির্মূল করে বজ্রের মতো নেমে এল ২৫-এ মার্চের 'ক্র্যাক ডাউন'। এই রক্তাক্ত পটভূমি প্রত্যক্ষে নেই কিন্তু দূরে থেকেই তার প্রভাব পড়েছে ভারতবর্ষের সবস্তরে সকল মানুষের ওপর।

লেখক তার অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথকে হাজির করেছেন। প্রেমিক কীর্তি চৌধুরীর সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিতা শিপ্রা অপেক্ষা করছেন শিলঙে। অপেক্ষা করে তিনি যখন ধৈর্যের শেষ সীমানায় তখনই এল কীর্তির আগমন সংবাদের 'তার'। আর তখনই লেখক পেয়ে গেলেন এক বিরাট সুযোগ—এসে গেলেন রবীন্দ্রনাথ—শিলঙ আর দার্জিলিঙের তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে।

উপন্যাসের শেষে ইয়োহিয়ার বর্বর আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াবেই এ আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হয়েছে। শিপ্রার রোমান্টিক প্রেম কীর্তিকে পেয়ে ধন্য হবে। নায়িকা হিসাবে শিপ্রা নিজ স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। শহ্‌র্‌-ইয়ার যদি অসামান্য নারীচরিত্র হয়ে থাকে তাহলে শিপ্রাও। উভয়ের সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতিতে কত ব্যবধান। আর এই ব্যবধান সত্ত্বেও দুজনে একই ধাতুতে গড়া। দুটি নায়িকার বক্তব্য উপস্থাপনার রীতি কত আলাদা, তবু একই গানের ব্যবহার। "করুণ তোমার অরুণ অধর তোলো হে তোলো।" তবে শহ্‌র্‌-ইয়ারের ইনটেলেকচুয়াল বিশ্লেষণ প্রবণতা শিপ্রার নেই, কিন্তু কীর্তির কথায়—'তুমি সত্যি শিপ্রা—শব্দটি এসেছে ক্ষিপ্রা থেকে, অর্থাৎ যে দ্রুতগতিতে চলে। তুমি প্রথম যেদিন আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি প্রসন্ন স্মিত হাস্যের আভাস দিয়েছিলে"—সে দিনই এই কথাগুলির মাধ্যমে শিপ্রা জেনে নিয়েছেন কীর্তিকে।

বাংলাদেশের শেষ বিজয়ের আশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে কীর্তির জন্য শিপ্রার ভালবাসা। "শিপ্রার মত সরল চোখে তাই (কীর্তি) দেখতে পেল, সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি।"

উপন্যাসগুলির আলোচনা শেষে সূচনার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে বলতেই হয় যে ঔপন্যাসিক আলী জীবনের গভীরে ডুব মেরে যে কয়েকটি রত্ন তুলে আনলেন, তাতে কান্না মেশানো থাকলেও এ যে 'জীবন' সে কথা স্বীকার আমাদের করতেই হবে। এই জীবনের বিভিন্ন পরিচয় স্থল —'অবিশ্বাস্য', 'শবনম', 'শহর্-ইয়ার' ও 'তুলনাহীনা'।

'অবিশ্বাস্য' একটু ভিন্ন ধরণের উপন্যাস। তাই এটি আলাদা ভাবে বিচার্য। 'শবনম'ও 'শহর্-ইয়ার' এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে মিল আছে। দুটি উপন্যাসই লিখেছেন অসামান্য দুজন মুসলমান রমণীকে নিয়ে। দুটি উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং লেখক। দুটিতেই প্রেমের বেদনাময় কাহিনীর প্রাধান্য, রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য। রবীন্দ্র-কাব্য আর রবীন্দ্র-সংগীতে জীবনের ব্যর্থ সাধনার তাৎপর্য আর সান্ত্বনা অন্বেষণ; দুটি উপন্যাসেই তত্ত্বালোচনার প্রাধান্য —ঈশ্বর বিশ্বাসীর সত্যান্বেষণের পরিচয় দানের চেষ্টা. দুটিতে শিথিল-গ্রথিত কাহিনীতে নায়কের ওরফে লেখকের কথার নেশা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

'শবনম', 'শহর্-ইয়ার' ও 'তুলনাহীনা' এই ত্রয়ী উপন্যাসে রবীন্দ্রচর্চা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'শবনম' ও 'তুলনাহীনা' প্রেমের উপন্যাস। উপন্যাস দুটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কথা। কেবল রঙ্গস্থলের আকস্মিক সাদৃশ্য দেখে (তুলনাহীনা) একথা বলছি না, প্রেমালাপনেও (উভয় উপন্যাস) বন্যা-মিতার (লাবণ্য-অমিত) কথা মনে পড়ে যায়। 'তুলনাহীনা' উপন্যাসে কীর্তিকে শিপ্রা আদর করে কখনো ডাকে 'ফিতা', কখনও বা 'মিতা'। শিপ্রা কীর্তিকে সেই অধরা প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন যে বাঁধনে অমিত রায় বাঁধতে চেয়েছিল লাবণ্যকে। তফাৎ এখানে, লাবণ্য অমিতের প্রেমে শেষ ভরসা রাখেনি, কীর্তি শিপ্রার প্রেমে তা রাখতে চেয়েছে। রবীন্দ্রকাব্য আর উপন্যাসের ভাষার স্বাদ পাই মুজতবা আলীর উপন্যাসে -"তোমার প্রেমই দেখিয়ে দেবে পথ, ভরে দেবে আমার বুক সাহস দিয়ে, আর সবচেয়ে বড় কথা -আমার মত অপদার্থকে করে দেবে কর্মনিষ্ঠ। যেখানেই যাই না কেন, যেতে যেতে যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ি না কেন, তোমার কথা ভাবলেই পাব নবীন উৎসাহ।" 'শহর্-ইয়ার' উপন্যাসে শহর্-ইয়ার তাঁর শেষ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের যে প্রেমগীতির শরণ নিয়েছেন, 'তুলনাহীনা' উপন্যাসে শিপ্রাও বিদায় বেলায় সেই গানেরই শরণ নিয়েছেন। এই ভাবে ত্রয়ী উপন্যাসে রবীন্দ্রানুগত্যের ঝুরি ঝুরি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

'শবনম' ও 'শহর্-ইয়ার' উপন্যাস দুটিতে লেখক স্বয়ং নায়ক বলে তত্ত্বালোচনার মাত্রা একটু বেশী হয়ে পড়েছে। 'শবনম' উপন্যাসে নায়কের জীবনের ট্র্যাজেডি, তীব্র

বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া অসহায়তা—একটা পরিপূর্ণ রূপ নিতে পেরেছে। আর শহর্-ইয়ার-এর সৈয়দ সাহেব-কে লেখা (শেষ) পত্রটি একটু বক্তৃতা ও তত্ত্বহুল, তৎসত্ত্বেও উপন্যাসের প্রকৃত গুণ 'শহর্-ইয়ার'-এ রয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলী মূলত কবি। গদ্য রচনা করলেও তার মন ছিল কবির, দৃষ্টি ছিল কবির দৃষ্টি। তাই যেখানেই দেখেছেন কোন অবিচার, অত্যাচার, দুঃখ ও শোক, সৎ নিরপরাধ লোকের শাস্তি ভোগ, সেখানেই তাঁর কোমল হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সাহিত্য রচনার প্রেরণা কোনদিন তিনি অনুভব করেন নি। তবুও তাঁর রচনা-শৈলীর একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। তিনি তাঁর মনের ভাব বাচনভঙ্গীর ওপর এঁকে দিতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর রচনায়। অনেক আরবী, ফার্সি শব্দ ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দকে বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর কলমের গুণে তাঁর ব্যবহৃত নতুন শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গেছে। তাঁর ভাষায় [শবনম] ফার্সি গদ্য সাহিত্যের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্নতা লক্ষ্য করি। লঘু চালের ভাষায়, বুদ্ধি-দীপ্ত রচনা-শৈলীতে, চমকে ও শ্লেষে এক অভিনব রচনাধারা সৃষ্টি হয়েছে তাঁর উপন্যাসাবলীতে।

চিত্তরঞ্জন লাহা

প্রেমেন্দ্র মিত্র : পটপরিবর্তনে অন্যতম পুরোধা

প্রেমেন্দ্র মিত্র বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম। সাহিত্যে নানা বিভাগে তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। শিশুসাহিত্য এবং গোয়েন্দা কাহিনীতেও তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। অনুবাদকর্মেও তাঁর অসম্ভব পারদর্শিতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর অনুবাদ মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়বাহী। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান সুচিহ্নিত, দখল পাকা ; ছোটগল্পের ধারাবাহিকতায় তাঁর সৃষ্টি এক অসামান্য সংযোজন। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য সংশয়াপন্ন। যদিও স্বীকার্য যে, আধুনিক উপন্যাসের যথার্থ ভূগোলটির ক্ষেত্র মীমাংসা তাঁর হাতেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এই তথ্যটিও বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, প্রারম্ভিক প্রত্যাশা কাঙ্ক্ষিত পরিণতি প্রাপ্ত হয়নি। 'পাঁক' অনন্ত সম্ভাবনার অপূর্ণ আভাস হয়েই থেকে গেল, সেই সম্ভাবনা স্বাভাবিক প্রবণতায় নিটোল নিরুপম পঙ্কজ সৃষ্টির দিকে এগিয়ে গেল না। তার একটা কারণ হয়তো প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীর বহুমুখীনতা, জীবনের বিচিত্র রূপ ও রহস্যকে সাহিত্য-শিল্পের বিভিন্ন পাত্রে পরিবেশনের প্রবণতা। কারণ যাই হোক, কবি প্রেমেন্দ্র বা ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্রের কাছে ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র তুলনায় যথেষ্ট নিষ্প্রভ যদিচ বাংলা উপন্যাসের পটপরিবর্তনে তাঁর দান ও স্থান অনন্য ও অনস্বীকার্য। 'পাঁক' সেই পটপরিবর্তনের প্রধান সাক্ষী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম উপন্যাসেই বাংলা উপন্যাসের নতুন ঠিকানার নির্ভুল পরিচয়। একদা এক অশ্বারোহী পুরুষের করাঘাতে বাংলা উপন্যাসের রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল, আর একদিন কাজ করে মজুরী না পাওয়ার ক্রোধে ফেটে পড়া এক অন্ত্যজ পুরুষের আর্ত চীৎকারে বাংলা উপন্যাসের কুঁড়ে ঘরগুলির বন্ধ দরজা চিরকালের জন্য খুলে গিয়েছিল। এই দুটি ঘটনার মধ্যে ব্যবধান কম বেশী প্রায় ষাট বছরের। রোম্যান্সের রাজপথ নয়, মধ্যবিত্ত মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস বা রিরংসার কানাগলি নয়, মাটির কাছাকাছি যে মানুষ তার কাছে পৌঁছানোর অজ্ঞাত অথচ অভ্রান্ত এই পথটির আবিষ্কারের সবটুকু কৃতিত্ব 'পাঁকে'র স্রষ্টার। এই পথ পরিক্রমায় তিনি অক্লান্ত উৎসাহী ও অখণ্ড মনোযোগী ছিলেন না, সে অভিযোগ আমাদের থাকবে কিন্তু সেইসঙ্গে একথা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাও থাকবে যে, সমকালীন যৌনাবেগ বা বিশিষ্ট কোনো মতবাদের প্ররোচনায় নয়, সম্পূর্ণ মানবিক কারণেই তিনি বস্তিজীবনের মূক, মূঢ়, ম্লান মুখে ভাষা জুগিয়েছিলেন, তাদের দারিদ্র্য-পিষ্ট এবং হতাশা-ক্লিষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনকে আলোক-পিপাসায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। পাঁকের বুকে পা রেখেছিলেন তিনি কিন্তু তাঁর দু চোখে ছিল পঙ্কজের একনিষ্ঠ প্রত্যাশা। এই আদিম মানবতার পিচ্ছল ভূমিতে তাঁর পরে অনেকেই পা ফেলেছেন এবং তাঁদের অনেকের চোখে-মুখে আদিম রিপুর লেলিহান শিখাটিকে প্রজ্জ্বলিত হতে আমরা দেখেছি, দেখেছি ক্ষেত্রবিশেষে প্রচারধর্মী

সাহিত্য রচনার অত্যুৎসাহকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এসব থেকে আশ্চর্যভাবে মুক্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'পাঁক' তাঁর প্রথম রচনা এবং তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। তাঁর নিজের ভাষায়, 'বাদ' বিসংবাদ তখনও সাহিত্যে এখানকার চেহারায় দেখা দেয়নি। তাই সাহিত্যের সিধে সড়ক ছেড়ে নতুন কোন দিকে অভিযান প্রাণ ও মান হাতে নিয়েই সেদিন করতে হয়েছে নিজের দুঃসাহস মাত্র সম্বল করে। সেই দুঃসাহসেরই দুর্লভ ফসল 'পাঁক'।

'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন,

'মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে।
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম হিংসা সমেত —
গোটা মানুষের মানে চাই।'

এই 'মানের' সন্ধান তাঁর সব উপন্যাসেই দেখতে পাই। 'পাঁক' উপন্যাসেও। চারদশক পরে লেখা 'প্রতিধ্বনি ফেরে' উপন্যাসেও সাংবাদিক অসীম রাহার বকলমে সেই মানেরই অনুসন্ধান এক পৃথক পরিবেশে। এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্যামুর 'দি আউটসাইডার' উপন্যাসটির অনুবাদও করেছিলেন 'অচেনা' নামে।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে 'পাঁক' এক অচেনা জগতের অভাবিত আবিষ্কার। বিশের দশকে যে ধরণের উপন্যাস প্রকাশিত হত এবং জনপ্রিয় হত সেই পরিমণ্ডলে 'পাঁক' ছিল এক সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি, এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং প্রকাশভঙ্গী সবই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কালের ব্যবধানে এই অভিনবত্ব অনেকখানি ম্লান হলেও এর ঐতিহাসিক গৌরবটুকু কোনোদিনই মুছে যাবার নয়। লেখকের দাবী—"যত দোষ ত্রুটিই থাক, 'পাঁক' উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে প্রথম যে একটি নতুন রাস্তা খোঁজার চেষ্টা ছিল একথা নিন্দুকেরাও স্বীকার করেন" -ইতিহাস-সমর্থিত।

শীর্ণকায় এই উপন্যাসটিতে অনেকগুলি চরিত্র ভীড় করেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি চরিত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য দুই ভাই বোন কালাচাঁদ ও পাঁচী। একদা এই নোংরা পুকুরের চারপাশে খোলার ছাওয়া বস্তিতে কালাচাঁদের বাবার জুতার দোকান ছিল। এখন আর দোকান নেই, বাবাও বেঁচে নেই। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কোনোরকমে বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে নিরত দুই ভাই বোন। এক আশ্চর্য প্রীতি ও ঘৃণার সম্পর্ক এই দুজনের। মুচিপাড়ার বাসিন্দা তারা। এখানের বিপন্ন অস্তিত্বের মানুষগুলির মধ্যে কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে পাঁচী ও কালাচাঁদ। অভাবের অতলস্পর্শী শহরে এদের অবস্থান। দুবেলা দু মুঠো আহার এবং লজ্জা নিবারণের মতো একটি কাপড়ও এদের জোটে না। পাঁচীকে দুর্বিষহ লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে "কালাচাঁদ নিজের ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে হাত দিয়ে

কাপড়খানা বাইরে ফেলে দিয়ে বললে, 'আমার কাপড়টা কেচে দিস তো পাঁচী। এখন আর আমায় ভাত না হলে ডাকিস নি।—কাল রাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি, একটু ঘুমবো।' তারপর সশব্দে দরজার হুড়কো দিয়ে দিলে।" বোনের লজ্জা নিবারণের জন্য ভাইকে তার পরিধেয় একমাত্র বস্ত্রটি খুলে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমের ভান করতে হয়। অত্যন্ত সতর্ক, সংযত এবং শালীন ভাষাচিত্রে বস্তিবাসী মানুষের অভাবী জীবনের এবং অপমানিত অস্তিত্বের আলেখ্য রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের দক্ষতা অসাধারণ।

দুবেলা দুমুঠো আহার্য যোগাড়ের অনিবার্য তাড়নায় জাত ব্যবসা ছেড়ে কালাচাঁদকে রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ের কাজ ধরতে হয়। সেখানেই আলাপ হয় নেত্যর সঙ্গে। কাজ করার সময় অসাবধানে হাত থেকে পড়ে গিয়ে একটা ছবি ভেঙে ফেলেছিল বলে বাবু তাকে মজুরী না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কালাচাঁদ প্রতিবাদ করে বলেছিল 'বা, আমার মজুরী পাব না কি রকম?' মজুরী সে পায়নি, তার সঙ্গীরাও বাবু যে তাকে পুলিশে না দিয়ে শুধু মজুরীটুকু কেটে নিয়ে অব্যাহতি দিয়েছিলেন তাতেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছিল এবং কালাচাঁদকেও সেই সান্ত্বনার শরিক করতে চেয়েছিল। কিন্তু কালাচাঁদ মজুরী না পাওয়ার জন্য নির্বোধ আক্রোশে মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পরবর্তী ঘটনা ভদ্রলোক সাইকেল-আরোহীর সঙ্গে কালাচাঁদের সংঘাত। সেখানেও তার প্রতিবাদী চরিত্রটি এবং এই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলির প্রতি তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর মানুষের নীচতাটুকু নিরতিশয় রূপেই পরিস্ফুট। কালাচাঁদের এই প্রতিবাদী চরিত্রটি তার সহকর্মিনী একটি নারীর বুকে প্রেমের আলো জেলেছিল। তারই নাম নেত্য। ধীরে ধীরে কালাচাঁদ আর নেত্যর পরিচয় প্রণয়ে পরিণত হয়। তারা বিবাহ করলে হয়তো তাদের তিনজনের জীবনেও কিছু রূপান্তর ঘটতে পারত। কিন্তু তাদের বিবাহের পথে বিষম বাধা হয়ে দাঁড়ায় পাঁচীর মনের কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কার ও বিশ্বাস। পাঁচী নিজে মুচি কিন্তু সে জানে নেত্য এই সমাজের অদৃশ্য জাতিপ্রথার সিঁড়িতে আরো কয়েক ধাপ নীচে। পাঁচীর মতামত অগ্রাহ্য করে কালাচাঁদ নেত্যকে বিবাহ করতে পারে না। তাছাড়া তার মোহভঙ্গ হয় যখন সে জানতে পারে নেত্য কুমারী কন্যা নয়। আগেও তার বিবাহ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিবাহের নিয়মকানুন সে মানতে চায় না। তার কাছে বিবাহ মানেই নারীর ও পুরুষের সানন্দ সহবাস। এ বিবাহ হয় না। কালাচাঁদ নেত্যর জীবন থেকে সরে যায়। এদিকে প্রচণ্ড জ্বরে ভুগে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পাঁচী মারা যায়: অনিবার্যভাবেই একথা মনে হয় যে, এই তিনটি চরিত্র নিয়েই যদি সমগ্র উপন্যাসটি রচিত হত তাহলে সমাজের নিম্নস্তরের এই তিনটি চরিত্রের মানসিকতা, সামাজিক পরিবেশ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েন অনেক জীবন্তভাবে উপস্থিত হতে পারত। কিন্তু ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য শুধু এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই তিনি আরো কিছু চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন। তাদের সকলের সম্বন্ধে বলার অবকাশ নেই। কিন্তু আহ্লাদী নামক চরিত্রটির সম্পর্কে দু একটা কথা বলা

প্রয়োজন। পথের ভিখারী এবং অন্ত্যজ সমাজভুক্ত আহ্লাদী এক দরদী মিশনারী যুবক স্ট্যানলির সাহায্যে এক সভ্য এবং পরিচ্ছন্ন সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়। কিন্তু যখনই সে তার পরিচিত পরিবেশের মধ্যে ফিরে আসে, তখনই এই দুই সমাজের বৈপরীত্য তার মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে, এই বৈপরীত্যের পদ্ধতি 'পাঁক' উপন্যাসে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে এটাকে এক টেকনিক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গরীব কালাচাঁদের প্রতি এক ভদ্রবেশী অভদ্রের রূঢ়, অশালীন এবং অমানবিক ব্যবহার, আর একজন তথাকথিত ভদ্রলোকের তাকে কাজ করিয়ে মজুরী না দেওয়ার ঘটনা সমাজের উচ্চবর্ণের হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক। আর তার পাশেই নেত্য পাঁচীর জন্যে বিনা, বাক্যব্যয়ে তার শাড়ী দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছে। অথচ আয়রনি এই যে, সামাজিক প্রথা ও জাতিভেদের আশৈশব বিশ্বাস নেত্য ও কালাচাঁদের মিলনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বৈপরীত্যের ধারণাটিকেই দানা বাঁধতে দেওয়ার জন্য সম্ভবত ঔপন্যাসিক অশান্ত কর্মকার ও স্ট্যানলির চরিত্র দুটিকে এই উপন্যাসে এনেছেন। এই দুটি আরোপিত চরিত্র ঔপন্যাসিকের প্রচ্ছন্ন স্বপ্নকে সোচ্চার করলেও 'পাঁক' উপন্যাসের ক্ষতিই করেছে। বৃহত্তর সত্তার ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে পাঁকের মানুষগুলিকে নিজস্ব নিয়মে পঙ্কজের উদ্ভাসিত জগতে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে চান ঔপন্যাসিক। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ধর্মান্তরের মাধ্যমে এই বিকাশ সম্ভব নয়। ঔপন্যাসিকের এই ধ্যান ধারণার প্রতীক এবং প্রতিনিধি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং দরিদ্র সেবায় সমর্পিত প্রাণ অশান্ত কর্মকার। চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থিত করা হয়নি। পাঁকের বুকে আরোপিত এক টুকরো পঙ্কজ-স্বপ্ন হয়েই থেকেছে। 'পাঁক' চোখে দেখা বাস্তবের ছবি, পঙ্কজ রোমান্টিক মানসিকতার সন্তান। পাঁক এবং পঙ্কজের মিল হয়নি। হলে বাংলা উপন্যাসের তালিকায় একটি মহৎ সৃষ্টির যোগ হত। কিন্তু যা হয়নি তা নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। পাঁক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের জগতে প্রথাবহির্ভূত পথ পরিক্রমার এক আশ্চর্য দলিল, বাংলা উপন্যাসে গণদরদী চেতনার প্রত্যুষ-চেতনা, নীচুতলার মানুষের অত্যাশ্চর্য আবির্ভাব ও অধিকার ঘোষণার বিবর্ণ কিন্তু বিশুদ্ধ অভিজ্ঞান।

সম্পাদকের সংযোজন ঃ

'কল্লোল' বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রকেই, বলা চলে, শেষ প্রতিনিধি স্থানীয় শিল্পী যিনি ৩রা মে ১৯৮৮ সালে পরিণত বয়সে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। তিনি ছিলেন অসামান্য কল্পনাশক্তির অধিকারী, সৃজনশীলতায় অনর্গল এক কৌতুহলী কথাশিল্পী। তাঁর প্রথম সফল উপন্যাস--'পাঁক', যদিও সাহিত্যিক

ও সহপাঠী অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে যৌথ ভাবে লেখা 'বাঁকা লেখা' উপন্যাসই তাঁর প্রথম সৃষ্টি।

'পাঁক' উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনায় ডঃ লাহা ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টিশক্তির যে মূল্যায়ন করেছেন, তা যথার্থ। চোদ্দ বছর বয়সে লেখা ও অনেক পরবর্তীকালে প্রকাশিত এই উপন্যাসকে 'অপজাত ও অজ্ঞাত মনুষ্যত্বের ব্যর্থতাকে নিয়ে লেখা' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে বাংলা উপন্যাসের ধারায় এটি একটি নতুন বাঁক-রূপেই চিহ্নিত। এই পাঁক উপন্যাসটি 'এমন একটি উপন্যাস যা গণসাহিত্য রচনার পথিকৃত হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে চিত্রিত করেছে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও স্বীকার্য যে এই উপন্যাস কিশোর-সুলভ রোম্যান্টিক দিবাস্বপ্নের আবেশে আবিষ্ট।

প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যায় যে, এই সময়ে যখন এক নতুন ধরণের ভাব-প্রবণতা দেখা দিল, যখন দরিদ্র অবজ্ঞাত বস্তিবাসী, শ্রমিক ও পতিতার জীবন—বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাত হতে লাগল, তখন এই বাস্তবতার মধ্যে প্রকাশিত হতে লাগল কিছু সমবেদনা, কিছু জিজ্ঞাসা, কিছু রোম্যান্টিক কল্পনাবিলাস। এই ভাবতরঙ্গে প্রভাবিত হয়েই আবির্ভূত হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ নতুন সাহিত্যিকের দল। নরেশচন্দ্রের 'শুভা'য় বেশ্যাবৃত্তি, জগদীশ গুপ্তের 'দুলালের দোলা'-য় যৌনবৃত্তি, শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠীর গল্প'-তে খনি শ্রমিকের জীবনবৃত্ত, অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'-তে বোহেমীয় জীবনের যৌন চেতনা ও বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভোর বৃষ্টি' উপন্যাসে রোম্যান্টিক রিয়ালিজমের পরিচয় পরিস্ফুট হল। এর পাশে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কিছুটা সফল সৃষ্টি 'পাক'-এ নীচুতলার মানুষের জীবনের ভয়াল অন্ধকার যে যন্ত্র সভ্যতারই ভয়ঙ্কর অভিশাপ, সেই সত্যই হল উদ্ঘাটিত। এই প্রসঙ্গেই একটি পত্রে তিনি অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছেন :

> "মানুষের দিকে তাকিয়ে আজকাল কি দেখতে পাই জানিস ? সেই আদিম পাশব ক্ষুধা, হিংসা, বিষ আর স্বার্থপরতা। চোখের বাতায়ন দিয়ে শুধু দেখতে পাই সুসভ্য মানুষের অন্তরে আদিম পশু ওৎ পেতে আছে। যে চোখ দিয়ে মানুষের দেবতাকে দেখতুম সেটা আজ অন্ধপ্রায়।… হ্যাঁ দুঃখও দেখেছি বটে। দেখেছি বটে কদর্যতা। মার চোখের জল দেখেছি' গলিত কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহংকার, উন্মাদ, বিকলাঙ্গ, রুগ্ন-গলিত শব।"

ধীমান লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবিকাই ছিল সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্যই ছিল তাঁর ধ্যান, তাঁর ব্রত। সেই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি ছিলেন সদাই তৎপর ; ফলে সারা জীবনে তিনি সাহিত্যের নানান শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন, এমনকি কোন কোন শাখায় তাঁর অনন্যতা সর্বজন স্বীকৃত। তবুও সমালোচকেরা মনে করেন যে উপন্যাস শাখায়

কমবেশি পঞ্চাশ খানি গ্রন্থ রচনা করেও তিনি সাফল্যের স্বর্ণসাক্ষ্য রাখতে পারেন নি। এমন কোন একটিও উপন্যাস লেখেননি যা বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস-ভান্ডারের একটি স্থায়ী সংযোজন রূপে চিহ্নিত হতে পারে, একটি স্থায়ী মূল্যে মূল্যবান সম্ভার রূপে কীর্তিত হতে পাবে। তবুও আমার বিশ্বাস—বাংলা উপন্যাস-ধারায় 'পাঁক' ও তার পরবর্তী অনেকগুলি উপন্যাসই আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস সাহিত্যে একদিকে মানুষ ও সমাজ পর্যবেক্ষণের পরিচয় যেমন প্রকাশিত, অন্যদিকে তেমনি এ যুগের সন্দেহের জ্বালা ও যন্ত্রণা, ব্যর্থতা ও বেদনার রূপও পরিস্ফুট। তাই 'পাঁক' উপন্যাসের পরবর্তী স্তরে 'মিছিল', 'মৌসুমী', 'পা বাড়ালেই রাস্তা' প্রভৃতি রচনায় আমরা যুগযন্ত্রণা ও জীবন-যন্ত্রণার সুরই অনুরণিত হতে দেখি, দেখি মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্র ত র 'অমলতাস', 'প্রতিধ্বনি ফেরে', 'কুয়াশা', 'স্বপ্নতনু' প্রভৃতি উপন্যাসে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় তাঁর এইসব উপন্যাসে কোথাও যৌনতার নগ্ন চিত্র অংকিত হয়নি যদিও তাঁর উপন্যাসের একটি মৌল বিষয়—'প্রেম'। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'অমলতাস', 'প্রতিধ্বনি ফেরে' প্রভৃতি উপন্যাসেব উল্লেখ অপরিহার্য।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আমরা কখনো তার নগর-চেতনা ও গণ-চেতনা, কখনো তাঁর সংশয়াচ্ছন্ন মনের প্রশ্ন-মনস্কতা আবার কখনো বা তাঁর ইহবাদিতা ও মুক্তি-আকুলতার সন্ধান পাই। উদাহরণ হিসেবে 'আগামীকাল', 'মিছিল', 'প্রতিশোধ', 'সমাধান', 'হৃদয় দিয়ে গড়া' প্রভৃতি উপন্যাসকে নগর-চেতনা ও গণ-চেতনার', 'মনু-দ্বাদশ', 'যিনি বিধাতা', প্রভৃতি উপন্যাসকে সংশয়াচ্ছন্ন মনের 'প্রশ্ন-মনস্কতার', 'অন্য এক নাম', 'বান্ধবী', 'সেই যে শহর রাজোলি' প্রভৃতি উপন্যাসকে ইহবাদিতা এবং 'উপনায়ন', 'দিকভ্রান্ত' প্রভৃতি উপন্যাসকে মুক্তি-আকুলতার উপন্যাস রূপে চিহ্নিত করা যায। এ ছাড়াও তাঁব ইতিহাস ও ভূগোল চেতনার সাক্ষ্য বহন করেছে 'সূর্য কাঁদলে সোনা', 'ডাকিনীর চর' উপন্যাসদ্বয়। তবে এই ধরণের শ্রেণী বিন্যাস কখনো শেষ কথা হতে পারে না; কেননা একই উপন্যাসে একাধিক চেতনার ও মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটতে পারে এবং তা কোনক্রমেই অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হতে পারে না।

মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রেখে তাঁর উপন্যাসাবলীর বিচার করলে আমরা পাই সেই সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যিনি নগরজীবনের ব্যথা-বেদনা, ব্যর্থতা-হতাশা, জীবন-যন্ত্রণা, সংশয়-সংঘাতের এক সার্থক রূপকার। স্বীকার করতেই হবে, সমসাময়িক ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের পথ থেকে তাঁর পথ অনেকখানি স্বতন্ত্র।

ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমসাময়িক কালের কোন কোন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে যৌনতার রূপাঙ্কন থাকলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প ও উপন্যাস যৌনতার স্পর্শ পায়নি। বিদ্যালয়-জীবনের বন্ধু অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টির পার্থক্য স্পষ্ট। অচিন্ত্যকুমারের 'প্রাচীন প্রান্তর' বা 'আকস্মিক' উপন্যাসে যৌন

প্রেমের যে বিকৃতি অথবা বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' বা 'রাতভোর বৃষ্টি'-তে যে অর্থে যৌনচেতনা রূপায়িত হয়েছে প্রেমেন্দ্রের কোন উপন্যাসেই তা হয় নি। এই সব উপন্যাসের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক মিত্রের 'অমলতাস', 'প্রতিধ্বনি ফেরে' বা 'স্তব্ধ প্রহর' প্রভৃতি উপন্যাসকে উপস্থাপিত করলে দেখা যায় যে প্রেমেন্দ্র মিত্র যৌন-বাস্তবতার বিলাসকে আশ্রয় না করে অবলম্বন করেছেন রূঢ় বাস্তবকে। 'প্রতিধ্বনি ফেরে' উপন্যাসে উমাপতির সঙ্গে নীরজা দেবী, মেয়ে মলয়া ও অন্য এক যুবতী জয়ার সম্পর্ক অংকিত হলেও যৌন সম্পর্ক কোথাও চিত্রিত হয় নি। এমনকি তিনি তাঁর উপন্যাসে যৌনতা-আশ্রয়ী সংলাপও প্রয়োগ করেন নি। বলা বাহুল্য, তাঁর উপন্যাসে কোথাও অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় নি, যা বেশ খানিকটা পরিমাণে প্রকাশিত হতে দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যেখানে প্রেমে আছে অন্ধ যৌনক্ষুধা ও আনুষঙ্গিক বিকার। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'চতুষ্কোণ' বা 'সরীসৃপ'-র নামোল্লেখ করা যায়। যদিও একজন সমালোচক 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌন-বিষয়ক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করে মন্তব্য করেছেন : '... চতুষ্কোণ'-কে অবলম্বন করে মানিকবাবুর রচনায় জীবন কম যৌনতা বেশি—এ অভিযোগ করা অসমীচীন।'

তবে ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এক জায়গায় সাদৃশ্য আছে, তা হল দুজনের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জীবনচিত্রণে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'শহর বাসের ইতিকথা', 'শহরতলী', 'প্রতিবিম্ব' প্রভৃতি উপন্যাসের পাশাপাশি 'পাঁক', উপনায়ন', 'কুয়াশা' প্রভৃতি উপন্যাস উপস্থাপিত হলেই এই মন্তব্যের যাথার্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মার্ক্স-বাদে দীক্ষিত, আর প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন রাজনীতির বাইরে সার্বজনীন মানব সত্যে উদ্বুদ্ধ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল তাঁর রোম্যান্টিক স্বপ্নের মোহভঙ্গ জনিত এক বিশেষ রূপাঙ্কন। এই ঔপন্যাসিকের সাহিত্যালোচনায় একজন সমালোচক তাঁর উপন্যাসে 'inverted romanticism'-এর সন্ধান পান।

সাহিত্যজীবী প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যালোচনায় প্রাসঙ্গিক ভাবেই আর এক সাহিত্যিকের নাম স্মরণে আসে তিনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই দুই ঔপন্যাসিকই কল্লোলের কালবৃত্তের মধ্যে উপস্থিত কল্লোলীয় সাহিত্যাদর্শ বজায় রেখে নীচুতলার মানুষের মর্মবেদনার রূপ ফুটিয়ে তুললেন তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে। প্রেমেন্দ্র দৃষ্টি দিলেন বস্তিজীবনের দিকে : রচিত হল 'পাঁক', আর শৈলজানন্দ দৃষ্টি ফেরালেন খনি মজুরের দিকে : সৃষ্টি হল 'কয়লাকুঠীর দেশ'। প্রথম জনের উপন্যাসে বস্তিজীবনের দুঃখ দুর্দশাদীর্ণ বস্তিজীবনের জীবনালেক্ষ্য যেমন ফুটে উঠেছে, দ্বিতীয় জনের উপন্যাসে তেমনি বহুদিন ধরে শোষিত কুলি মজুর-জীবন ধারার রূপাঙ্কন আছে। তবুও একথা সত্য যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র এই 'দুঃখ'-কেই শেষ সত্য বলে স্বীকার করেননি, বরং ভাগ্যহত মানুষের আবার উত্তরণ ঘটবেই—এই বিশ্বাসকেই বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে প্রকাশ করেছেন।

বিজ্ঞানমুখী মনের অধিকারী প্রেমেন্দ্র মিত্র কোথাও কোথাও যন্ত্র-সভ্যতার বিকলাঙ্গ রূপ দেখে শিহরিত হন। তিনি শহুরে কুৎসিত-বিকৃত-পঙ্কিল-পরিবেশ দেখে ব্যথিত হন। সেই সঙ্গেই মানুষের দুঃখ দারিদ্রের মূলে সর্বমানবের যে পাপ, তার থেকে মুক্তির পথ হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রলয় কামনা করেন। অনুসন্ধান করেন আদর্শের। 'প্রতিধ্বনি ফেরে' উপন্যাসে তাই তাঁর মন্তব্য :

> "অসাম্য দূর করবার পরীক্ষা অনেক হয়েছে ও হবে, কিন্তু তার সঙ্গে সব সাম্য যা না হলে বৃথা হয়ে যায়, জীবনের পূর্ণতার সেই আদর্শ খুঁজে পেতে হবে।"

বলা বাহুল্য, তাঁর প্রায় সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভারেই আমরা এই অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হতে দেখি। অন্নদাশংকর রায় ও লীলা রায় রচিত **Bengali Literature'** গ্রন্থে তাই আশাবাদী প্রেমেন্দ্রের কথাই উল্লিখিত হয়েছে :

> **"Premendra is a breoken hearted dreamer still hoping for the best from a revolution."**

শৈলজানন্দও একেবারে আশাহীন নন। এই দুই শিল্পীর পার্থক্য প্রধানতঃ নিহিত আছে তাঁদের যুক্তিবাদিতায়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রীতিতে ও ভাষা-ভঙ্গিতে।

আধুনিক মনের অধিকারী প্রেমেন্দ্রের উপন্যাসাবলী সমসাময়িক কালের পাঠক মনে প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়নি, তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির ধারা যে দিকে দিক্ পরিবর্তন করেছিল তা তাঁকে উপন্যাস সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভে সহায়তা করেনি বলেই আমার বিশ্বাস। এই ধারাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের (১৯৩৯-৬৪) প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক গ্রাহাম গ্রীণের পরিভাষায় 'এন্টারটেনমেন্ট' মূলক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বিচিত্র পথের পথিক প্রেমেন্দ্রের নতুন যাত্রা শুরু হল গোয়েন্দা কাহিনী রচনার মাধ্যমে। যদিও গোয়েন্দা উপন্যাস রচনায় তিনি কোন ভাবেই পথপ্রদর্শক নন। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনী এসেছে পাশ্চাত্য গোয়েন্দা কাহিনীর পথ ধরে। এ ব্যাপারে যিনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর নাম আজকের প্রজন্মের কাছে প্রায় অপরিচিত। তিনি ঔপন্যাসিক পাঁচকড়ি দে, যিনি অনেকখানি পরিমাণে অনুকরণ করেছিলেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক উইল্‌কি কলিন্সের রচনা ও ফরাসী ডিটেকটিভ-উপন্যাস লেখক এফিল গাবোরিয়ার ইংরাজী অনুবাদ। এর 'মায়াবিনী' (১৯২৮) যেখানে পাঁচকড়ি দের গোয়েন্দা 'দেবেন্দ্রবিজয়' একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র, যে চরিত্রের সঙ্গে শার্‌লক হোমসের কিছু সাদৃশ্য আছে বলেই কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। এর অন্যান্য গোয়েন্দা উপন্যাসের নাম 'গোবিন্দরাম' 'নীলবসনা সুন্দরী', 'মৃত্যু বিভীষিকা', 'ভীষণ প্রতিশোধ' প্রভৃতি। হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলুগু, মারাঠী প্রভৃতি বহু ভাষায় অনূদিত হওয়ার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় ঔপন্যাসিক পাঁচকড়ি দের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। পাঁচকড়ি দের জনপ্রিয়তার পরেই যিনি এই ধারায় নিজের প্রতিভার পরিচয় রেখেছিলেন তিনি দীনেন্দ্র কুমার রায়

(১৮৬৯-১৯৪৩) যাঁর 'রহস্য-লহরী' সিরিজ তাঁকে সাধারণ পাঠকের কাছে সুপরিচিত করে তুলেছিল। বিশেষভাবে তাঁর লিখিত 'চীনের ড্রাগন' অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। দীনেন্দ্র কুমারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনের নাম উচ্চারণ করতে হয়, তিনি হেমেন্দ্র কুমার রায়, তবে পূর্ববর্তী দুজনের মত সফল গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে পারেন নি। তবে এঁদের পরে বাংলা ভাষায় নবীন ধারায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা উপন্যাসের সৃষ্টি কর্তা নিঃসন্দেহে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধায়। ইনি কোনান ডয়েলের অনুকরণে বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসের সৃষ্টি করেছেন, যেখানে আমরা পেয়েছি অমর চরিত্র 'সত্যান্বেষী ব্যোনকেশ'কে। ব্যোমকেশের মতই আর একটি চরিত্র আধুনিক পাঠকের স্মৃতিতে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছে সেই অনন্য চরিত্রটি —পরাশর বর্মার, যাকে আমরা পেয়েছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের গোয়েন্দা কাহিনীতে। পরাশর বর্মাকে নায়ক করে, লেখা তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীগুলি পাঠক মনকে পরিতৃপ্ত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম —এ মন্তব্য অযৌক্তিক নয় , কেননা যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি এই উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন, যেহেতু এগুলিকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের চেয়ে জাতে ছোট একথা তিনি 'মনে করেননি', বরং এর গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। এক সমালোচক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "এই কাহিনীগুলি ছিল তাঁর 'মনমাতানো ছুটি'।" দৃষ্টান্ত হিসেবে তার 'হার মানলেন পরাশর বর্মা" 'প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা', 'আদ্যোপান্ত পরাশর বর্মা', 'ঘোড়া কিনলেন পরাশর বর্মা' 'ঘুড়ি ওড়ালেন পরাশর বর্মা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলির উল্লেখ অপরিহার্য।

গোয়েন্দা কাহিনীগুলি জনপ্রিয় হলেও এগুলি তাঁকে সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভে সহায়তা করেনি। এরপর তিনি আর একটি ধারার সূচনা করলেন, যা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে নতুন বলেই স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য। এক্ষেত্রে তাকে পথিকৃৎ ও 'প্রথম শিল্পী' রূপে চিহ্নিত করা কোন ভাবেই অযৌক্তিক হবে না। এই নতুন ধারাটি কল্পবিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস—ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'Science fixtion'।

ইংরাজী 'Science fixtion-এর অন্যতম উল্লেখ্য লেখক জুল ভার্ন এর লেখা পড়ে তিনি বাংলায় প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখেন 'পিঁপড়ে পুরাণ' (১৯৩১)। প্রাসঙ্গিক ভাবেই কল্পবিজ্ঞানধর্মী উপন্যাসের আলোচনায় অনুপ্রবেশ করতে হয়। এই ধারাটি মূলত পাশ্চাত্য Science fixtion'-এর অনুসরণে ও অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে উপস্থাপিত হয়েছে —তা অনস্বীকার্য।

ইংরাজী সাহিত্যে 'Science fixtion-এর সূচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে চলে যেতে হয় ১৯২৬ সালে, যখন এই জাতীয় রচনাকে উল্লেখ করা হয়েছিল 'Scientifiction' বলে এবং এই প্রসঙ্গে যে, লেখকের নাম উচ্চারণ করা হয়েছিল — তিনি Hugo Gernsbaet। তিন বছর পর ১৯২৯ সালে 'Science fixtion' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই Science fixtion-এর স্রষ্টাদের অগ্রদূত হিসেবে এডগার এ্যালেন পো, জুল ভার্ন এবং এইচ. জি. ওয়েলস্-এর নামোল্লেখ করা হয়ে থাকে।

তবে বিদগ্ধ আলোচকেরা এই সব স্রষ্টার সৃষ্টিকে 'Science fixtion' না বলে 'Science romance' বলাই সঙ্গত মনে করেছেন। 'Science romance'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে,

> "Scientific romance of its simplest consists in the use of scienitific (or more often quasi-scientific) elements in highly coloured romantic fixtion." [Science fixtion : Its criticsm and Teaching / Patrick Parrinder, 1980]

ইংরাজী সাহিত্যে এই জাতীয় রচনার উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে 'The-Birth mark' (1843) ও 'Rappaceini's Daughter' (1844)-কেই চিহ্নিত করা হয়। তবে 'Science fixtion' ও 'Science romance'-এর পার্থক্য খুব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এইচ. জি. ওয়েলস্ 'Scientifie romance' কে 'Science fixtion'-এ গোত্রান্তরিত করার অন্যতম পুরোধা। এই 'Science fixtion -এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে লেখা হয়েছে ঃ

> "Science fixtion came to be recognized as a distinct literary genre, largely because it had so insistently arrived as a social phenomena"

স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যের এই নবোদ্ভূত ধারাটি এইচ. জি. ওয়েলস্-এর পর বিভিন্ন শক্তিশালী লেখকের লেখার দ্বারা সুসমৃদ্ধ হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে কল্প-বিজ্ঞান-ধর্মী গল্প-উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা নিঃসন্দেহে প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিশোর সাহিত্য হিসেবে 'ঘনাদা' চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে তিনি যে সব কাহিনী সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকে উপন্যাস না বলে উপন্যাসধর্মী রচনা বলাই সঙ্গত, যা 'Science romance' রূপে চিহ্নিত হওয়ার উপযোগী বলেই মনে হয়। এগুলিকে 'ফ্যাণ্টাসি' বলাও বোধহয় অসঙ্গত নয়। তাই ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস-আলোচনায় এইগুলির অন্তর্ভূক্তির অবকাশ খুবই সীমিত।

উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনায় 'আঙ্গিক' প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া জরুরী। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই স্বীকার করতে হয় যে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর উপন্যাসে 'প্লট' কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই গড়ে তুলেছেন এবং এই 'প্লট'কে সুসংবদ্ধ করতে হলে 'চরিত্র সৃষ্টি' 'সংলাপ' ও 'ভাষা' যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। সেই সাক্ষ্যই বহন করছে তাঁর 'পাঁক' উপন্যাসের কালাচাঁদ, নেত্য, পাঁচী ও আহ্লাদী 'অমলতাস' উপন্যাসের 'দেবলা', 'প্রতিধ্বনি ফেরে' উপন্যাসের উমাপতি, মলয়া, 'মিছিল' উপন্যাসের নন্দপাল ও গোঁসাইজি, 'উপনায়ন' উপন্যাসের বিনু প্রভৃতি অনেক চরিত্র। তবে সংলাপ অনেক ক্ষেত্রে উপযোগী হলেও কোথাও কোথাও তা পরিবেশ অনুযায়ী হয়নি বলেই মনে হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'পাঁক' উপন্যাসে যেখানে বস্তিবাসীর ঝগড়া বর্ণিত হয়েছে, সেখান দুই একটি পংক্তি উদ্ধার করলেই সংলাপের কৃত্রিমতা পরিস্ফুট হবে। 'মাগী' শব্দটি প্রযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কৃত্রিমতা ঢাকা পড়েনি।

কালাচাঁদ অলক্ষুণে কদাকার বাঁকা বুড়ীকে দেখে চিৎকার করে, "আমার চোখের সামনে থেকে শীগ্‌গির সরে যা অপয়া মাগী। কি করতে মরতে এখানে এসেছিলি।" অথবা বুড়ী বলেছে "ঘাট হয়েছে বাবা, কিন্তু দোহাই ভগবান, কোন অপরাধ করিনি ..." এইসব সংলাপে মার্জিত শব্দের প্রয়োগ সংলাপকে কিছুটা পরিমাণে যে কৃত্রিম করে তুলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে কোথাও কোথাও তাঁর সংলাপের মুন্সীয়ানাও লক্ষ্য করার বিষয়। যেমন 'কুয়াশা' উপন্যাসে লুপ্ত-স্মৃতি এক যুবক যে এক সময়ে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য ব্যবসায়ে বেশ পাকা ছিল তাকে কেন্দ্র করে নিম্নলিখিত সংলাপটি লক্ষ্যনীয় ঃ

> "লোকটা কুৎসিত মুখে অশোভন ভাবে হাসিয়া বলিল –বন্ধু চমকে গেছ, কেমন দাদা। দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে থাকবার চেষ্টায় ছিলে ; কিন্তু মধুর রায়কে ফাঁকি দিতে পারলে না। কেমন খুঁজে বার করেছি তো "

বলা বাহুল্য, এই সংলাপ শুধু পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামাঞ্জস্যপূর্ণই নয়, চকিতে নিষিদ্ধ মাদক বিক্রেতা যুবক প্রদ্যোৎকে আবিষ্কারের মধ্যে যে চমক প্রকাশিত তাতে ঔপন্যাসিকের মুন্সীয়ানারই প্রমাণ মেলে।

সংলাপ রচনার মত ভাষা প্রয়োগেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজস্বতা উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারে কখনও তিনি চলিত ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন, কখনো বা 'সাধুরীতির'। কিন্তু যে রীতিই তিনি ব্যবহার করুন না কেন তার মধ্যে আমরা বুদ্ধিদীপ্ত শব্দ প্রয়োগই লক্ষ্য করি। তাঁর এই ভাষা মূলত ভাবালুতা বর্জিত অথচ সালংকারা। এই বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে উপন্যাস নির্মাণ-শিল্পের এক বড় বৈশিষ্ট্য বলেই স্বীকৃত হতে পারে। দুই একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এক। 'প্রিয়তমের আশাতীত দেখা পাওয়ায় বাইশ বছরের শরীর বুক যেমন করে কাঁপে তেমন-ই কাঁপছিল। ময়লা কাপড়ের আড়ালে চামড়ার তলায়— রক্ত রাঙা হৃদয়ের গোপনতায়।' [পাঁক]

দুই। 'জীবনের তুচ্ছতম দাবীও মৃত্যুর চেয়ে বড়, একথা মানুষ বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই বোঝে, মৃত্যুর শূন্যতা তাই বার বার ভরিয়া ওঠে জীবনের কোলাহলে, সমাধির তিক্ততা ঢাকিয়া যায়।' [কুয়াশা]

তিন। 'তাঁর স্মৃতি নিরাসক্তিতে ঝাপসা বিবর্ণ।' [অন্য এক নাম]

চার। 'মনের ওপরকার স্বচ্ছ প্রশান্তির ঢাকনাটা হিংস্র ভাবে ছিঁড়ে ফেলে বাস্তব বর্তমান প্রবল বন্যাবেগে যেন ঝাঁপিয়ে এল তার চেতনায়।' [স্তব্ধ প্রহর]

পাঁচ। 'সময় তো মানুষ নয় যে হার মেনে আক্রোশ পুষে রাখবে।' [প্রতিধ্বনি ফেরে]

পরিশেষে, 'কল্লোল'-আকাশের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে যে সত্যটি অস্বীকার করা আদৌ সম্ভব নয়, তা হল —এই জনদরদী কথাশিল্পী সাহিত্যকে নিজের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করায় সৃজন ক্ষমতাকে 'অর্থ-প্রসূ' পথের পাথেয়

করে তুলতে সম্ভবত কেন, অবশ্যই বাধ্য হয়েছিলেন ; তাই তাঁকে গোয়েন্দা কাহিনী, কল্পবিজ্ঞানধর্মী কাহিনী, এমন কি সিনেমা জগতে প্রবেশ করে চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। এর ফলে বিশুদ্ধ সাহিত্য সাধনার পথে তাঁর যাত্রা যে কিছুটা পরিমাণে ব্যাহত হয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। প্রাসঙ্গিক ভাবে মনে পড়ে আর একজন বাঙালী ঔপন্যাসিকের কথা যিনি প্রায় দুশোটি উপন্যাস রচনা করেও ঔপন্যাসিক হিসেবে কোন স্বীকৃতি পাননি। তিনি শৈলজানন্দ। চলচ্চিত্র পরিচালক শৈলজানন্দের কাছে পরাজিত হয়েছেন ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে যাঁর কলম থেকে —

"আমি কবি যত কামারের আর
কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের।"

প্রভৃতি পংক্তি বেরিয়েছিল, যিনি কাব্যের ক্ষেত্রে 'প্রথম আবেগময় পৌরুষ, গদ্যময় দাঢ্য, ও দুরাচারী রোমান্টিকতা' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এতদিনের প্রচলিত ও পরিশীলিত 'শব্দের সাজানো ফুল বাগানে' দুরন্ত আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি এক 'স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শের পূর্বাভাস' দিতে সক্ষম হয়েছিলেন ; যিনি 'শুধু 'কেরানী' ও *'গোপনচারিনী' শীর্ষক ছোট গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন আনতে পেরেছিলেন* এবং ক্রমে ছোটগল্প স্রষ্টাদের মধ্যে সাময়িক ভাবে হলেও অপ্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে আসীন হয়েছিলেন, যাঁকে শক্তিশালী লেখক হিসেবে জগদীশ গুপ্তের উত্তরসূরী ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমধর্মী বলে উল্লেখ করতে কেউ কেউ আগ্রহী,—সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবননিষ্ঠ জীবন-দর্শন, গভীর-গর্ভ জীবনবোধ, বিচিত্রমুখী সৃজন প্রবণতা ও ক্লান্তিহীন সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী হয়েও উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাফল্যের স্থায়ী সাক্ষ্য রাখতে পারলেন না ; কিছুটা উপেক্ষিতই রয়ে গেলেন। জীবনে যিনি অনেকবার নানা পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন, বার বার বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে সম্মানিত হয়েছেন, তিনিই পারলেন না মহৎ উপন্যাস স্রষ্টার শিরোপা পেতে। বাঙালী উপন্যাস-পাঠকদের এই আক্ষেপ হয়ে থাকল চিরকালীন।

তথ্যসূত্র ঃ

[সংযোজিত অংশের]

১। কল্লোল যুগ / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
২। প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও ঔপন্যাসিক / ডঃ রামরঞ্জন রায়।
৩। Science fixtion : It criticism and Teaching / Patrick Parrinder,
৪। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি উপন্যাস।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

সতীনাথ ভাদুড়ী : অন্তর্দর্শনে প্রতিহত মানুষ

যাঁর ভেতরে একটি গভীর জীবনবোধ-সম্পন্ন শিল্পী বসে আছে তাঁর পক্ষে বিশেষ একটি রাজনৈতিক ফ্রেমের মধ্যে চিরকাল নিজেকে আবদ্ধ রাখা বোধহয় সম্ভব নয়। এই কথাটি বুঝতে গেলে সতীনাথের জীবনভঙ্গিকে একটু বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করতে হয়। নম্র স্বভাবের লাজুক ছাত্র সতীনাথ পড়াশোনায় যে বেশ ভালো ছিলেন তা-তো সকলেরই জানা। কিন্তু কোন্ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ সে দিকে নজর দেবার মতো গুরুজন কেউ ছিলেন না। আত্মীয়দের আগ্রহেই তিনি বিজ্ঞান পড়ে ফিরে আসেন আর্টসের ছাত্র হিসেবে। অর্থনীতি পড়েন। তখন অর্থনীতি-শাস্ত্র এখনকার মতো 'বৈজ্ঞানিক' হয়ে ওঠে নি। তারপর আইন পড়েন এবং তাঁর বাবার মতো তিনিও জীবিকা হিসেবে বেছে নেন আইন-ব্যবসা। কিন্তু এই ব্যবহারজীবীর জীবনে খুব একটা আকর্ষণ তাঁর ছিল না। এই প্রায়-অভ্যস্ত জীবিকার পাশাপাশিই চলেছিল তাঁর সাহিত্যিক আড্ডা, পড়াশোনা, বিদেশী ভাষা-চর্চা। জীবিকার বাইরে এই আত্ম-আবিষ্কারই তাঁকে তাঁর স্বক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। শুধু নিজের জীবনে নয়, সতীনাথের যাবতীয় সৃষ্টিতেই এই আত্ম-সন্ধানের মগ্নতা লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু এমন একটা উত্তাল পরিবেশে তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল যে এই আত্ম-সন্ধানের চেয়ে পরিবেশের আকর্ষণটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে। তাঁর স্কুল-কলেজের জীবনকাল রাজনৈতিক উত্তেজনায় কাঁপছিল। অসহযোগ থেকে আইন অমান্য পর্যন্ত সেই উত্তেজনাময় কাল প্রথমটা অবশ্য অন্তর্মুখী সতীনাথকে তেমন-ভাবে টানে নি। কিশোর লেখালেখিতে স্বাদেশিক অভিমানের ছিটেফোঁটা প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। ওকালতি করবার সময় এমন কিছু জনসেবার কাজ তিনি করেছিলেন বা দেশোদ্ধারের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন যাতে মনে হতে পারে ; তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছেন। পুজোয় বলি বন্ধ করা, মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে পিকেটিং করা —এসবই তিনি করেছেন একটি আদর্শের টানে। সতীনাথ-গ্রন্থাবলীর সম্পাদক এইসব কাজকর্মকেই সতীনাথেরই মনোভঙ্গির অনুসরণে 'তুচ্ছ ও ক্ষণিক' বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী শিল্পী-জীবনের কথা ভাবলে এগুলোকে 'তুচ্ছ ও ক্ষণিক' বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এসবই তাঁর শিল্পী-জীবনের উপকরণ। তাঁর সামনে যে রাজনৈতিক ফ্রেমটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাকে অনুসরণ করা, তাকে ভেঙে ফেলা বা তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়ে অন্য কোনো ফ্রেমের কথা ভাবা, বা সব ফ্রেম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যাদের জন্যে এই ফ্রেম-তৈরির চেষ্টা সেই সাধারণ মানুষের সংগঠন-শক্তি কোন্ শৃঙ্খলায় কীভাবে গড়ে তোলা যায় তার জন্যে চিন্তা করা—এই সবই তাঁকে নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টির বাইরে এমন

এক সামাজিক সম্পর্কের অপরিহার্য টানা-পোড়েনের জগতে নিয়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে নির্দিষ্ট ছকের রাজনীতিকে ধরে রাখা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। ঔপন্যাসিক সতীনাথকে বুঝতে গেলে, এই 'তুচ্ছ ও ক্ষণিক' ব্যাপারগুলির সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক আন্দোলন ও আন্দোলনের গতিবিধি, রাজনৈতিক সঙ্গীদের চেহারা-চরিত্র এবং মত ও পদ্ধতির পরিবর্তন-চিন্তা সবই লক্ষ্য করতে হয়। বিশেষ করে 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিতমানসে'র শিল্পীকে বুঝতে গেলে তো এই 'তুচ্ছ' ব্যাপারগুলোই বড় হয়ে ওঠে। তাঁর এই দুটি উপন্যাসের তথ্য, পরিবেশ এবং ঘটনার গতি-পথ তো এই অভিজ্ঞতা-জাত মানসিকতাই ঠিক করে দিয়েছে।

যাঁরা সতীনাথ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন, তাঁর জীবন সম্পর্কে তথ্য আহরণ করেছেন তাঁদের অনেকেরই লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমি শুধু সেই জীবন-যাপনের ধারার একটি সূত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিরিশের দশকের প্রথম দিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব যখন বিহারে ছড়িয়ে পড়ে এবং গান্ধীজী পূর্ণিয়ায় যান, তখন সতীনাথ সে-সবের কৌতূহলী দ্রষ্টা—ঢোঁড়াইয়ের কাহিনীতেও সে সব অভিজ্ঞতার কথা ছড়িয়ে আছে। এসব অভিজ্ঞতা তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়কার অভিজ্ঞতা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার কাছাকাছি সময়ে যখন তিনি বাড়ি ছেড়ে হঠাৎই কংগ্রেসের সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে আশ্রমে চলে গেলেন তখন সেই সিদ্ধান্তের কথা আত্মীয়-স্বজনেরও জানা ছিল না। মা-র মৃত্যু ও দিদির মৃত্যুতে এই অন্তর্মুখী মানুষটি সংসার-উদাসীন হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এবং নিজের এই রাজনৈতিক জীবন বেছে নেবার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কারো পরামর্শও তিনি নেন নি। অন্তর্মুখী মানুষের এ এক জেদী মনোভঙ্গিরই পরিচয়। তারপর থেকে মিতাহারী. মিতবেশী সতীনাথ কংগ্রেসের অক্লান্ত সেবক ও শিক্ষক। 'ভাদুড়ীজী'-নামে পরিচিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তারপর আন্দোলনে তিনি জেলে গেছেন, জেলে পড়াশোনা করেছেন, ভাষা শিখেছেন. পড়িয়েছেন। আর তার সঙ্গে উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন—'জাগরী'।

কিন্তু গ্রন্থাবলীর সম্পাদক যেমন বলেছেন, স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি টের পেয়েছেন রাজনীতির নিষ্ফলতা, ব্যাপারটা কিন্তু তা ঠিক নয়। কংগ্রেসের একজন উদ্যোগী কর্মী হয়েও বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তিনি রাজনৈতিক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নি। অনেক আগে থেকেই তিনি সোস্যালিস্টদের পক্ষপাতী, কংগ্রেসের অংশী হিসেবেই তিনি সোস্যালিস্ট। জয়প্রকাশের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ। আবার কম্যুনিস্টদের সংগঠন ক্ষমতারও তিনি প্রশংসা করেন। কিন্তু পুরোপুরি বিদেশী নকলের তিনি বিরোধী। কংগ্রেসের অন্তর্কলহ এবং পুঁজিবাদী মনোবৃত্তিতেও তিনি হতাশ। স্বাধীনতার পরেও তিনি প্রায় বছরখানেক কংগ্রেসে ছিলেন। তারপর রাজনীতিতে তাঁর বিরাগ আসে। বোঝা যায়, স্বাধীনতার পরে তাঁর এই 'প্রকাশ্য' বিরোধের মূলে ছিল অনেক দিনের অশান্তি। কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি তাঁর মনে মনে পছন্দ ছিল না বলেই তিনি সমাজবাদে ঝোঁকেন এবং কম্যুনিজম্ সম্পর্কে 'কৌতূহলী'

হন। আসলে তাঁর গোপন শিল্পীমনে তাঁর মানবিক বোধটি পীড়িত হচ্ছিল। তাই অন্য মতে, বিশেষ করে সোস্যালিস্ট পার্টিতে, তাঁর ক্ষণিক আশ্রয়। তবে আকর্ষণ অনেক আগে থেকেই। তাই 'জাগরী'তে কংগ্রেসী, সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট এই তিন শ্রেণীর চরিত্রই ফুটে উঠেছে এবং তিনটি মানুষের পার্থক্যের মধ্যে নিছক আত্মীয়তার সূত্রে মানবিক টানটাই বড়ো। 'জাগরী' যে রাজনৈতিক আদর্শের সংঘর্ষের কাহিনী হয়েও মূলত মানবিক দলিল তা এই কারণেই। একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের সমর্থক হয়েও সতীনাথের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর শিল্পীমন অবহেলিত মানুষের জাগরণ চেয়েছিল। এবং একই যুদ্ধকে প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী এবং পরে 'জনযুদ্ধ' বলার পেছনেও যে নকলিয়ানা তাও বোধহয় তাঁকে পীড়িত করে থাকবে। যে সত্যনিষ্ঠ মানবিক বোধ তাঁর মনোজগতে মতান্তরের অস্থিরতা এনেছিল সেই অস্থিরতাই তাঁর জীবনযাপনের মৌলিক সূত্র, সেই সূত্রই তাঁর 'জাগরী'র আঙ্গিকের প্যাটার্ন তৈরী করেছে, 'জাগরী'র রাজনৈতিক বোধকে গভীরতর মানবিক বোধে পৌঁছে দিয়েছে।

[দুই]

'জাগরী'তে তিনটি রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা আছে। বাবা বা মাস্টার-সাহেব গান্ধীবাদী, বড় ছেলে বিলু সোস্যালিস্ট এবং ছোট ছেলে নীলু কম্যুনিস্ট। কিন্তু এই তিন মতের সংঘর্ষ দেখানো জাগরী-র উদ্দেশ্য নয়। পদ্ধতিগত কারণে বাবার কাছ থেকে দুই ছেলে নিঃশব্দে সরে গেছে অন্য আদর্শে। আবার আর একটি মতের প্রভাবে ছোট ভাই নীলু সরে গেছে দাদা বিলুর আদর্শ থেকে। এবং তিন-জনেরই চিন্তার ভেতরে রয়েছে আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টা, এবং এই চেষ্টার মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন বা মানবিক বন্ধনই বড় হয়ে উঠেছে। হয়তো মানবিক সম্পর্কটিকে বড় করে, গভীর করে দেখাবার জন্যই রাষ্ট্রীয় পরিবারের কল্পনা। রাষ্ট্রীয় পরিবার এক অর্থে মানব-পরিবারেরই প্রতীকী রূপ। মত-পথের ভিন্নতার মধ্যে মানবিক সম্পর্কগুলি টানা-পোড়েনের সৃষ্টি করে। এক এক সময় সেই টানা-পোড়েন বড়ই মর্মান্তিক। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার পঙ্‌ক্তির কথা মনে পড়ে 'সমগ্র মানব তুই পেতে চাস?— এ কী দুঃসাহস?' হ্যাঁ। দুঃসাহসের ব্যাপার হতে পারে। মত-পথের বিভিন্নতা যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে তা মানুষকে খুব গভীরভাবে বেদনাহত করে তোলে। তাই সমগ্রভাবে মানবতাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দুঃসাহসের ব্যাপার হলেও খুবই স্বাভাবিক। বাবা, মা, বিলু, নীলু এই চারজনের আত্ম-সন্ধানের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতার বেদনাই ছড়িয়ে আছে। এবং বোধহয় এই বিচ্ছিন্নতার বেদনা মাস্টার সাহেবের স্ত্রী অর্থাৎ বিলু-নীলুর মা-র মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এর দুটি কারণ। প্রথমত, তিনি গান্ধীবাদী স্বামীর অনুগামিনী হয়ে জেলে এসেছেন। যুক্তি-বুদ্ধির বিচারে আসেন নি, স্ত্রী

হিসেরে স্বামীর সঙ্গে ধর্মবন্ধনের সংসারে এসেছেন। কাজেই জন্মগত সংসারের টানে আসা স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অসহায়তা আছে। দ্বিতীয়ত, অন্য আদর্শের টানে দুই ছেলের দল পরিবর্তনে বাবার যে ঔদাসীন্যে তা মা-র মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই নেই। সন্তান হিসেবেই মা তাঁর ছেলেদের দেখেন। কাজেই 'রাষ্ট্রীয় পরিবারে'র আদর্শ জননী রক্তের টানে মূলত বিলু-নীলুর মা। এখানে মতামতের সংঘর্ষ দেখানো যেমন হয় নি, তেমনি একাধারে স্ত্রী এবং জননীকে রেখে মতামতের পার্থক্যের ওপরে রক্তের টানটিকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। রাজনৈতিক মতামত যে গভীর মানবিক সম্পর্ককে আহত করেছে তার প্রতিই লেখকের নজরটা বেশি। তাই বিলু-নীলুর মা-র কথাটাই আগে বলছি।

স্বামীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, 'তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছ সত্য, কিন্তু আমাকে তো একটুও স্বাধীনতা দাও নি, কতদিন ভেবেছি যে ছেলেরা বড় হলে একথা একদিন ছেলেদেব বলব।' ছেলেদেব ঘিরে মা-র এই মুক্তির স্বপ্ন বাবা-র রাজনৈতিক চরিত্রের অসম্পূর্ণতাকেই প্রকাশ করেছে। মা-র এই স্বাধীনতার স্বপ্ন বিলুর ফাঁসির আদেশ আব নীলুর সাক্ষী হওয়াতেই চুরমার হযে গেছে। বাবা ও দুই ছেলের অসহায়তা নিদারুণ ঠিকই, কিন্তু মা-র অসহায়তার সঙ্গে তুলনা হয় না। স্বামী ও সন্তানদেব নিযে যে বিশ্বাস ও সংস্কাবে তিনি পরিবাবেব আত্মিক সূত্র— সেই সূত্রটি ছিঁড়তে বসেছে। বলা উচিত, মূল্যবোধই ভেঙ্গে পড়েছে মর্মান্তিকভাবে. 'গান্ধীজী, তুমি আমার এ কি করলে, তুমি আমাকে একেবাবে পথেব ভিখিবি করে ছেড়েছ ; সত্যিকাবেব ভিখিরি। নিজের ঠাকুব দেবতা ছেড়ে তোমাব পুজো করেছি। তোমার জন্যে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়েছি। তাব প্রতিদান তুমি খুব দিলে। তোমাব দেখানো রাস্তায় স্বামী স্ত্রীব মধ্যে মনের মিল হয় না, বাবা-ছেলেতে ভালবাসাব সম্পর্ক থাকে না। ভাই ভায়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, গৃহবিচ্ছেদে সংসাব ছারখার হয়ে যায়।'

এইসব কথা রাজনৈতিক মুক্তির কথা অবশ্যই নয়। কিন্তু এই খণ্ডতার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক মানুষ এগিয়ে যায়, পারিবারিক বন্ধনগুলো ভাঙতে ভাঙতেই তাকে দেশের সংহতি ও আন্দোলনের কথা ভাবতে হয় এই মর্মান্তিক স্ববিরোধী সত্যটিকেই লেখক কি দেখাতে চান। নইলে মায়েব মাতৃত্বই তো তার পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে না। মা ভয় পাচ্ছেন, জেলের মধ্যে লাডলির মা ছেলেকে তার কাছে দেবে না, কারণ তিনি তো নিজেই ছেলেকে খোয়াতে বসেছেন। অসহায় অভিমানে তিনি ভাবেন, 'আবার মা বলে ডাকতে আসে! আমি রাজ্যসুদ্ধ ছেলেব মা, জেলায় সব কংগ্রেসীর মা, আমার তো বিশ্বজোড়া ছেলে! কিন্তু মন যে বিলু-নীলুব উপর পড়ে থাকে। এদের ছাড়া অন্য কোনো ছেলের মা হতে চাই নি!' আবার এই কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি লাডলির কান্না থামাবার জন্যে তাকে কোলে তুলেও নিয়েছেন। সংস্কারের টানে তিনি আদর্শ মা, কিন্তু রক্তের টানে তিনি ছেলেদেরই মা। শেষ পর্যন্ত তিনি এইসব

পরিণতির জন্যে নিজেকেই দোষ দিয়েছেন। বিলুর অসুখের সময় যে মানত করেছিলেন তার পুজো তিনি যথাস্থানে দিয়েছিলেন তো ? বরং সেখানে বিলু হওয়ার সময় যে ইঁটটা তিনি বেঁধেছিলেন, তা কি খোলা হয়েছিল ? কিংবা বোধহয়, সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর বিয়ে দেননি বলেই হয়তো ডিহুওয়ার ঠাকুর তাঁর এই দশা করেছেন। নিজের ভুলের জন্যে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইছেন, ছেলের জীবন পেতে চাইছেন। যা নিছক রাজনীতির খেলা তাকে যুক্তি হিসেবে মানতে চাইছে না মাতৃত্ব, নিজের মধ্যেই কোনো ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবচেতনের এই 'বাস্তবতা'কে তুলে ধরাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

বিলুর আত্মকথনের সূত্রে বলতেই হয় তার কেন্দ্রীয় চারিত্রিক গুরুত্বের কথা। তার আসন্ন ফাঁসিই অন্য সব চরিত্রগুলিকে আত্মবিশ্লেষণের মুখোমুখি করেছে। রাজনৈতিক স্রোতের অনিবার্য টানে ভেসে যাওয়া মা-কে তো দেখাই গেল, তঁর মাতৃত্বের গভীরে পৌঁছে গেছেন তিনি। বাবও তাঁর পিতৃত্বের কেন্দ্রে পৌঁছেছেন, আর নীলুও তার দাদার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় পৌঁছে গেছে। কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা বিলু আগস্ট আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগেই দোষী হয়ে ফাঁসি যাচ্ছে আগামী ভোরবেলায়। সোস্যালিস্ট হিসেবে গান্ধীবাদ বা মার্কসবাদ কোনটিকেই বিলু পুরোপুরি মেনে নিতে পারে নি। অন্যদিকে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ফ্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দেশের শাসক গোষ্ঠীকে কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন স্বাধীনতাকামী কোনো কর্মীই মেনে নিতে পারে নি। এই পার্টির সদস্য নীলু তাই দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছে। তারই ফলে আগামী ভোরে ফাঁসির অপেক্ষায় সেলের মধ্যে একা বিলু আত্মমগ্ন। মা-র ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি, স্মৃতিচারণার সূত্রে পারিবারিক সম্পর্ক, প্রতিবেশী-সান্নিধ্য, রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রে দেশ ও কালের ছবি স্পষ্ট হয়েছে। অতীত-বর্তমানের যোগসূত্রটাই বেশি। ভবিষ্যৎ-ও অবশ্যই আছে, তুলনায় কম।

বিলু তার পরিবার ও সহকর্মীদের কাছে 'আদর্শ' মানুষ। এই আদর্শ সম্পর্কে সে সচেতন। সচেতন বলেই জীবনের শেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে আশংকার ভাব দেখাতে সে দ্বিধা করে। তবু শেষ সময়ে জেলের সেলের মধ্য থেকে বাইরের ভারি বুটের আওয়াজ বিলুর কাছে নবমীর রাতে ঢাকীর বাজনার চেয়েও তীব্র ও প্রবল হয়ে ওঠে। নীলুর কথা তুলতে চাইলেও তার ছোটবেলাকার স্মৃতির মধ্যে বিলু অনিবার্য টানে ঢুকে পড়ে। আবার নীলুর মুখ মনে আনতে গিয়ে ' জৌরি মাহাতোর বুলডগের মতো মুখটি মনে পড়ে। হঠাৎ এই বীভৎস মুখ মনে পড়ার পেছনে কি নীলুর নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়া আছে ? নীলুর সম্পর্কে তার প্রায়-নীরবতা ছোট ভাইয়ের প্রতি গভীর স্নেহের আড়ালে তার সহ্যের অতীত গূঢ় কোনো বিতৃষ্ণাই কি কাজ করছে ? মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ছোট ভাইয়ের এই নিষ্ঠুরতা তার পক্ষে বীভৎস মনে হতেই পারে। বিশেষত তার মতো সংযত বিবেচক আদর্শবাদী কর্মীর চাপা প্রতিক্রিয়ায় এই বীভৎস ছবি ভেসে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। একমাত্র এই অস্বস্তিকর কিন্তু অনিবার্য স্মৃতি-

সূত্রে ভেসে ওঠা ছবিটি ছাড়া নিজের ও অন্যের বিশ্লেষণে সে নির্লোভ, জ্ঞানপিপাসু, আদর্শনিষ্ঠ। মা-বাবর প্রতি সে শ্রদ্ধান্বিত এবং তাঁদের স্মৃতিতে তার মনও কোমল, এবং মৃত্যুর মুখে আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মীর অবিবাহিত থাকার কর্তব্য ভুলে গিয়ে সুখী সংসার-জীবনের স্বপ্ন সে দেখেছে, টুকরো স্মৃতিতে সিঁদুর-পরা শাঁখা-হাতে সরস্বতী হানা দিয়েছে। ফাঁসির হাত থেকে রেহাই পাবার স্বাভাবিক স্বপ্নও সে দেখেছে—হঠাৎ কোনো ভূমিকম্পে জেলের দেওয়াল ভেঙে পড়া, জল্লাদের অসুখ কিংবা ফাঁসি রদ হবার কোনো শেষ মুহূর্তের আদেশ! এই গভীরতম মানবিক বোধটুকুই বিলুর রাজনৈতিক খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

বিলুর বাবা আদর্শ গান্ধীবাদী। অসহযোগ থেকে আগস্ট আন্দোলন পর্যন্ত বাবা গান্ধীজীর আদর্শেই 'মাস্টারসাহেব'। আজ ওয়ার্ডের মধ্যে নিঃশব্দ ব্রত-পালনের মধ্যে তিনিও আত্মজিজ্ঞাসু। আদর্শনিষ্ঠায় তিনি পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে একটু দূরত্বে থেকেছেন। এই দূরত্বের জন্যে স্ত্রী তাঁকে অসংখ্য অনুযোগ করেছেন। এই ঔদাসীন্যের জন্যেই তিনি ছেলেদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পথে যাবার ব্যাপারে তর্ক বা প্রশ্ন করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। সামাজিক নীতি অনুযায়ী স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে তাঁর অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েই আশ্রমে এসেছেন। ছেলেরা ভিন্ন মতে চলে গেলেও স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে ছাড়া সম্ভব নয়। তাই স্ত্রীর অসহযোগের মধ্যে স্বামীকে অনুসরণ করে আশ্রমে আসার এই পরিণতিও একটা বড় সূত্র। কিন্তু তাঁর আদর্শনিষ্ঠ স্বামীও বিলুর জন্যে অনুতপ্ত। নিজে তিনি কর্মফলকে আশ্রয় করে যেভাবে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন, ছেলেও সেই পথে আসন্ন মৃত্যুর মুখে সান্ত্বনা খুঁজুক এই তিনি চান। স্ত্রীর আত্মজিজ্ঞাসায় তো স্বামীকেই দায়ী করে বলা হয়েছে ঃ 'বাপ হয়ে ছেলেদের কি পথে এনেছো!' কিন্তু এটাও ঠিক, তাঁর ইচ্ছেতেই সংসার আশ্রম হয়েছে। বিলু তাঁর ইচ্ছে জেনে নিয়েই কাশী বিদ্যাপীঠে পড়েছে। কিন্তু সেই বিলুই রিলিফের কাজের পারিশ্রমিক দিয়ে যে ছোট ভাইকে ইংরেজি কলেজে পড়িয়েছে—এই নীরব প্রতিবাদের অর্থ এখন বাবার কাছে স্পষ্ট। ছেলেদের সঙ্গে তাঁর গড়ে-তোলা ব্যবধানকে তিনি নিজেই এখন অন্যায় মনে করছেন। বিলু কেন সোস্যালিস্ট হলো, নীলু কেন মার্কসবাদী হলো--এ নিয়ে তিনি কোনো প্রশ্ন করেন নি। তাঁর মতো ঠাণ্ডামাথার প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে এ প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। তিনি দেশপ্রেমের আবেগ বোঝেন, নিজের দলের দোষত্রুটিও বোঝেন। দেশপ্রেমের টানে ছেলেরা অন্য মতে ও পথে গেলে তাঁর পক্ষে বোঝা অসম্ভব নয়, কেন সে গেল। অথচ তিনি বিলুর সোস্যালিস্ট হবার মুহূর্তে উপযুক্ত শাসন করেন নি বলে অনুতাপ করেছেন। আবার একথাও ভেবেছেন, 'তাহার ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে। বড় হইয়া সে নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইয়াছে।' আসলে তিনি ভেবেছেন, তাঁর কর্তব্যচ্যুতি ঘটেছে, তাঁর আশ্রমই তাঁর পরিবারকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর পিতৃত্বই সমস্ত রাজনৈতিক আদর্শকে ছাপিয়ে উঠেছে। বিলু যেন তাঁকে শেষমুহূর্তে দোষ না দেয়, নীলুর কাছে থাকা দরকার—

পাছে সে হঠাৎ কিছু করে বসে, বিলুর পাগল হবার সম্ভাবনা, নীলু যেন মন শক্ত রাখে বা বিলুর মা যেন সহ্য করবার শক্তি পায় —ইত্যাদি বিচিত্র এলোমেলো অসংলগ্ন কিন্তু স্বাভাবিক চিন্তা তাঁর রাজনৈতিক খোলসটিকে খসিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে, শান্ত সংযত মিতবাক আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীর ভাই যে তখনকার বামপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই দাদার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে একথা অন্য চরিত্রের মুখে শুনে নিয়েই আমরা নীলুর আত্মকথন পড়ি। বাবা-মার কাছে দুটি ছেলে আলাদা নয়, অথচ নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেই ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বাদ দিয়ে নীলু দাদার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছে। 'আমাকে পার্টির দৃষ্টিকোণ দিয়া সকল ধর্ম বিচার করিতে হইবে।' কিন্তু সে জেনেছে, তার দল অন্য দলের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে পারে। কিন্তু অন্য দলের কর্মীকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে এমন কাজ রাজনৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। মা-বাবার চোখে, জ্যাঠাইমার চোখে তাকে ছোটবেলা থেকে একগুঁয়ে স্পষ্টবাদী হিসেবেই দেখানো হয়েছে। দাদার চোখেও তাই। 'নীলু কখনো নিজের পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না।' এই একগুঁয়েমি ছাড়াও ছোটবেলাকার নানা আপাততুচ্ছ ঘটনায় বাবা-মা-বিলু বুঝেছে বিলুর ওপর নীলুর চাপা হিংসা ও আক্রোশ আছে। বিলুর সাফল্য ও জনপ্রিয়তা নীলুর অভিজ্ঞতা। এক সঙ্গে একই দলে থাকতে সে দাদার ভালোবাসা পেয়েছে এবং বুঝেছে। আবার তার কলেজে পড়ানোর খরচ যে দাদাই জুগিয়েছে তা-ও তার জানা। সব মিলিয়ে দাদার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে সে নিজেকে ছোট মনে করেছে। তাই নীলুর স্বীকারোক্তি —'রাজনীতিক মতবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বোধ হয় আমার ব্যক্তিগত জিদের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছিল!' তার মনস্তত্ত্বের গভীরে তার অন্য একটি আক্রোশী ও ঈর্ষান্বিত সত্তাকে চিনিয়ে দেয়।

তবু অন্য চরিত্রের মতো তার এই নিঃসঙ্গ আত্মচিন্তা তাকে অনুতপ্ত করেছে। এবং মনে মনে সে দাদার সামনে হাজিরও হয়েছে। দাদার কাছে তার এই বক্তব্যটুকু জানাতে চেয়েছে। শেষ মুহূর্তে কার কথা দাদা বেশি ভাববে? 'মা-র, জ্যাঠাইমা-র না আমার?' নিশ্চয় তারই কথা ভাববে। আর, 'চিন্তা ভরা থাকিবে গ্লানিতে, বিষাদে, আমার উপর অভিমানে।' দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্রের 'ছি ছি' ধিক্কার, দাদার কথা 'মার সঙ্গে দেখা করিস' পাকুড় মার্ডার কেসের খবর পড়ে মার কথা 'মাগো ভায়ে ভায়ে এমন হয় নাকি' —ইত্যাদি স্মৃতি এবং জ্যাঠাইমার নীরব ভর্ৎসনার কল্পনা —মা, বাবা বা দাদার মতোই গোঁড়া রাজনৈতিক আদর্শের বাইরে নীলুকে বিশুদ্ধ মানবিক সম্পর্কের মধ্যে এনে ফেলেছে।

তাই মনে হয় সতীনাথের গভীর মানবিক বোধ তাঁর মনোজগতে মতান্তরের যে অস্থিরতা এনেছিল, যে অস্থিরতার জন্যে তিনি আদর্শান্তরে গিয়েছিলেন। অন্যদের সংগঠন-ক্ষমতায় শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন। সেই বোধই তাঁকে 'জাগরী'-র চারটি পৃথক চরিত্রে আত্মজিজ্ঞাসার ছক তৈরিতে সাহায্য করেছে। এবং চারটি চরিত্রই রাজনৈতিক

আদর্শের বাইরে চলে গিয়ে সাধারণ ভাবে মানবিক দ্বন্দ্বের দলিল তৈরি করতেও সাহায্য করেছে। কোনো রাজনৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াই দেখানো জাগরী-র কাজ নয়। যে কোনো রাজনৈতিক মতে ও পথে এগোতে গেলে মানবিক সম্পর্কগুলি এসে বাধা দিয়ে মত ও পথের অর্থহীনতাকেই প্রমাণ করে দেয় এমনই একটা মনোভাব জাগরীর চারটি আত্মজিজ্ঞাসারই শেষ সিদ্ধান্ত। এবং এই দিক থেকে 'জাগরী'কে শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যাবে কিনা এবিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। যদিও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ভিত্তিতেই চরিত্রগুলির আত্মজিজ্ঞাসা শুরু হয়েছে।

বাবা-র আত্মকথনের ভাষায় নির্বিকার শিক্ষিত আদর্শবাদী মন যেমন কাজ করেছে, বিলুর ক্ষেত্রেও তাই। তবে বিলুর আত্মকথনে স্মৃতি-অনুষঙ্গ বেশি। মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়েছে বলেই তাঁর বাঁচবার কল্পনায় অসম্ভব সম্ভাবনার প্রাচুর্য। নীলুর বক্তব্যের ভাষা স্পষ্ট, জোরালো কিন্তু আত্মগ্লানিময়। আর মা-র চলতি কথায় মেয়েলি ভঙ্গি প্রায়ই এসে পড়েছে। বোধহয় অন্তরঙ্গতার খাতিরেই মা-র মুখে চলতি ভাষা। কিন্তু অন্য তিনটি চরিত্রেও কি চলতি ভাষা প্রয়োগ করেও এ পার্থক্য রাখা যেতো না? রাখা নিশ্চয় যেতো। কিন্তু চলতি ভাষায় উপন্যাস লেখার রেওয়াজ তখন শুরু হলেও অনেক বিখ্যাত গল্প-উপন্যাসকারই সাধু ভাষায় লেখার ট্র্যাডিসনটি ছাড়েন নি। তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মানিক তাঁদের সাধুরীতি পুরোপুরি ছাড়েন নি। প্রভাবশালী শরৎচন্দ্রও মূলত সাধুভাষারই লেখক। কেবল রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীই তখন চলতি রীতিতে এসেছেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং জগদীশ গুপ্ত সাধুরীতিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কল্লোলের অনেকেই প্রথমে সাধুভাষায় শুরু করে চলতি রীতিতে এসেছেন। বয়সের দিক থেকে কল্লোলের গল্প-উপন্যাসকারেরা সতীনাথের সমসাময়িক। কিন্তু সতীনাথের মধ্যে একটু আগেকার বয়োজ্যেষ্ঠ উপন্যাসিকদের সাধুরীতি অনুসরণের চেষ্টাই দেখি। প্রচলিত রীতিকেই তিনি মেনেছেন। কিন্তু মায়ের জবানিতে তিনি চলতি রীতি এনেছেন মেয়েদের আন্তরিক মেয়েলি প্রকাশভঙ্গির বাস্তবতাকে রক্ষা করার জন্যে। এই বাস্তবতার তাগিদেই তাঁকে অভ্যস্ত সাধুরীতি থেকে সরিয়ে এনেছে মনে হয়। যাই হোক, সাধু বা চলতিরীতিতে যার জবানিই লিখুন, সতীনাথ দুটি রীতিতেই সহজ ভঙ্গিতে চরিত্রের অভীরতম অন্তর্দেশটি স্পর্শ করেছেন। বিশেষ করে, দুঃখ অভিমান ও হতাশার ভাষায় যে স্বরভঙ্গি এনেছেন তাতেই আবেগ সৃষ্টি হয়েছে। মা, বাবা, বিলুর উক্তিতে তো আছেই, স্পষ্টবক্তা নীলুর উক্তিতেও শেষ পর্যন্ত এমন স্বরভঙ্গি আছে, তার নিজের অন্যায়কে অস্বীকার করার মধ্যে এমন অন্তর্জ্বালা আছে, যা তার দৃঢ় রাজনৈতিক বিশ্বাসকেও নাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাসের অন্তর্গত যে মানুষ বৃহত্তর মানবসত্তার সঙ্গে জটিল সূত্রে বাঁধা, 'জাগরী'তে সেই মানবসত্তারই প্রকাশ।

[তিন]

'জাগরী'-র ঠিক পরেকার উপন্যাস 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (১৯৪৯)। এই উপন্যাসের অভিজ্ঞতাও সতীনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাঁর সম্পর্কে অন্যের স্মৃতিচারণা সূত্রে জানতে পারি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে কাটিহার জুটমিলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের তিনি সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁরই চেষ্টায় ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়, শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা আদায় হয়। চিত্রগুপ্তের ফাইল-এর ঘটনার শুরু গান্ধীজী-হত্যার পরের দিন। জুটমিলের শ্রমিকনেতা অভিমন্যু মারা গেছে। তার মৃত্যুতে মিলের সাহেব ম্যানেজার থেকে শুরু করে এদেশী সহকারী ম্যানেজার এবং মজুর পরিবারের সকলেই নিজেদের অপরাধী ভাবছে। গান্ধীজীর মৃত্যু যেসব সমকালের অনেক মানুষেরই বিবেকদংশন, পৌরাণিক অভিমন্যুর অসহায় মৃত্যুবরণ যেমন একাধারে বীর্যময় ও করুণ, এখানে তেমনি একটি বিক্ষত বিবেকের কাহিনী সাজানো হয়েছে। অভিমন্যুর চিতার অদূরে শ্রমিক নেতা শিউচন্দ্রিকা বিবেকের তাড়নায় বিপর্যস্ত। অভিমন্যুর প্রেমিক মীনাকুমারীরও দূরে বসে কাঁদছে। মীনাকুমারী অভিমন্যুর ডাকে সাড়া না দিয়ে অভিমন্যুর চিঠি হস্তান্তরিত হতে দিয়েছিল। তার ফলে মিল কর্তৃপক্ষ অভিমন্যুকে অপদস্থ করে, অপঘাতে অভিমন্যুর জীবন শেষ হয়। অভিমন্যুর সর্বক্ষণের সঙ্গী শিউচন্দ্রিকার চিন্তার স্রোতে এইসব ঘটনাই ভেসে আসে। মনে পড়ে অভিমন্যুর চিঠিটি মিলের কতৃপক্ষ কীভাবে যোগাড় করে অভিমন্যুর বিরুদ্ধে এবং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে এবং পার্টির মিটিং-এ অভিমন্যুর কড়া সমালোচনা করা হয়, অভিমন্যুকে সরিয়ে দেওয়া হয় শ্রমিক ফ্রণ্ট থেকে কিসানফ্রণ্টে- মখৈলী থানার শিরনিয়া গ্রামে। সেখানে চাষীদের ফসলের ভাগ আদায় করার দাবি তোলে অভিমন্যু। আন্দোলন শুরু হলে জমিদারের লেঠেল আর থানার পুলিশের হাতে মার খেয়ে অভিমন্যু আধমরা হয়। তারপর জমিদার-পুলিশের যোগসাজসে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা বেরোয়। তখন অর্ধমৃত অজ্ঞান অভিমন্যুকে আনা হয় বলীরাম জুটমিলের ইউনিয়ন অফিসে। সেখানেই সাধ্যমতো চিকিৎসা করা সত্ত্বেও অভিমন্যু নিউমোনিয়ায় মারা যায়।

শিউচন্দ্রিকা নিজেকে যাচাই করে। নিজের দোষ কতোটা, অন্যের দোষই বা কতোটা। বিচলিত হয়ে সে মীনাকুমারীর কাছে অভিমন্যুর শেষ স্মৃতির ঝোলাটা পাঠায়। চিঠি লিখে মীনাকুমারীকেই অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী করে। সব চিঠি পড়ে মীনাকুমারী বুঝতে পারে নিজের ভুল, বুঝতে পারে মিল কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র। মনে পড়ে, অভিমন্যু তাকে ডেকেছিল দীক্ষিতদের মাঝখানে একটি আমবাগানে। সেই আমবাগানে সে ছুটে যায় অভিমন্যুকে মানসিক ভাবে অন্তত ফিরে পাবার জন্যে। যন্ত্রণার তীব্রতার মধ্যে সে অভিমন্যুর নিবিড় আশ্লেষ অনুভব করে।

চিত্রগুপ্ত ছদ্ম-নামে প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক নির্মোহ দৃষ্টিতে অভিমন্যুর

মৃত্যু আর মীনাকুমারীর আত্মহত্যার বর্ণনা দিয়েছেন। এমনকি তিনি যশঃপ্রার্থী তরুণ ঔপন্যাসিকের প্রতি নির্দেশের সূত্রে ভাবাবেগে ব্যঙ্গও করেছেন। চিত্রগুপ্ত নামের মধ্যেও লেখকের কটাক্ষ অবশ্যই আছে। হিন্দুবিশ্বাসে মানুষ নিজেকে জীবনের চালক ভাবলেও আসলে চিত্রগুপ্তই চালক। তাঁর নির্দেশে গল্পের মীনাকুমারীকে আত্মহত্যা করতে হয়। চিত্রগুপ্তের রহস্যভেদ হয়েছে উপন্যাসের শেষে। মাত্র সাড়ে তিনশো টাকায় পনেরটি কোর্সে বা পাঠে উপন্যাস রচনার পাঠক্রম সরবরাহকারী চিত্রগুপ্তের মুখোশ খুলে দেন লেখক, শ্লেষের আড়ালে ফুটে ওঠে তাঁর নির্মোহ বুদ্ধিদীপ্ত মন।

রাজনৈতিক একনিষ্ঠ কর্মী, অনমনীয় বিবেকের অধিকারী শক্ত চোয়ালের শিউচন্দ্রিকা যুক্তি দিয়ে সব কিছুই যাচাই করে। পার্টি লাইন ছাড়া তার কাছে জনসাধারণের ভালোমন্দ বোঝার আর কোনো লাইন নেই। তারই দৃষ্টিকোণে কাহিনীটি বলা হয়েছে। অভিমন্যুর সঙ্গে শিউচন্দ্রিকার কোনো মিল নেই, না চেহারায়, না চরিত্রে। স্বভাবে হাল্কা, খেয়ালী অথচ নির্লোভ মানুষটিকে শিউচন্দ্রিকা পছন্দ করে। অভিমন্যুর বেপরোয়া ভঙ্গি ও আত্মত্যাগের ক্ষমতাই বোধহয় পার্টির বাঁধা লাইনের মানুষ শিউচন্দ্রিকার পছন্দ। মজুরেরা শিউচন্দ্রিকাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভালোবাসে অভিমন্যুকেই। সহকারী ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ অভিমন্যুর প্রেমপত্রকে ত্যাগী কর্মীর নৈতিক চরিত্রের 'প্রমাণপত্র' হিসেবে দেখিয়ে কীভাবে শক্তিশালী ইউনিয়নকে পরাস্ত করে তা-ই বলা হয়েছে শিউচন্দ্রিকার স্মৃতি-রোমন্থনে।

অভিমন্যু পৌঁছেতে পারে নি মীনাকুমারীর কাছে, মীনাকুমারীও পারে নি অভিমন্যুকে পেতে। শিউচন্দ্রিকাও পায় নি তার বন্ধুর মনের অন্তস্থলের হদিস। ফাইলের পাতাগুলি মীনাকুমারী, শিউচন্দ্রিকা এবং মজুরদের কাছে অভিমন্যুর অন্তস্থলের আসল মানুষটিকে চিনিয়ে দিয়েছে। মানুষকে ভুল বোঝার দৃষ্টান্ত হয়ে রইল অভিমন্যু এবং একটু ব্যাপক অর্থে সংসারকে না বোঝা। ঘটনাচক্র এবং খানিকটা ভাগ্যও যেন মানুষকে অন্যের বোধগম্যতার অতীত কোনে পরিণতিতে পৌঁছে দেয়। তারপর দুটো-একটা সূত্রে দুর্জ্ঞেয়তার কোনো অংশে আলো প'ড়ে জীবনের সূচনা ও পরিণতির একটা ছক ফুটে ওঠে, যে ছকটা মানুষই তার অজান্তে তৈরি করে বসে। শিউচন্দ্রিকা বুঝতে পারে, সে ছক-বাঁধা জ্ঞানে মূর্খ বলেই অভিমন্যুকে সে বুঝতে পারে নি। মীনাকুমারী বোঝে নি, অভিমন্যুর অভিমানী পৌরুষকে সে প্রত্যাখ্যান করে অপমান করেছে। রুক্মিনীও বোঝে নি, মীনা ও অভিমন্যুকে সে কতো স্নেহ করে। আর অভিমন্যুও ধরে নিয়েছিল, মীনাকুমারীই চিঠিটি দিয়েছে মিলের কর্তৃপক্ষকে। জীবনের এই স্বকৃত অথচ ভুল সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই যে অজ্ঞাতপূর্ব ছক তৈরী ক'রে মানুষের পরিণতি নিয়ে আসে, ধর্মঘটীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে সেই দুর্বোধ্য মানবিক জটকেই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে! 'জাগরী'-উপন্যাসের মতোই এখানেও রাজনীতিটা খোলস।

তার আড়ালে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক বাইরের নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভঙ্গিতে চাপা পড়ে যায় সেই সম্পর্কের জটিল, অথচ অবধারিত টানটাই বড় কথা।

[চার]

'জাগরী' এবং 'চিত্রগুপ্তের ফাটল'-উপন্যাসের মতো 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'ও সতীনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসে রামায়ণের আদল নিয়েছে। রামায়ণের কাহিনী-ভঙ্গি ও রামের চরিত্র-প্রভাব সতীনাথের ঢোঁড়াই-এর চরিত মানস-সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। গ্রামজীবনের সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর গভীর সম্পর্ক, তার আঞ্চলিক পরিবেশের প্রতি লেখকের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিষ্ঠা, ঢোঁড়াই-এর মহাকাব্যাশ্রয়ী রূপ, ঢোঁড়াই চরিত্রের চলমানতা ইত্যাদি নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। আমি শুধু স[illegible] পন্যাসিক মনোভঙ্গির দিক থেকে ঢোঁড়াইকে দেখার চেষ্টা করবো। টা ঠিকই যে, এমন সঠিক অর্থে নিরক্ষর সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে মহাকাব্যিক ছাঁচে উপন্যাস লেখার চেষ্টা এই প্রথম। ঢোঁড়াই-এর জীবন এমন একটি মানুষের জীবন যাকে আমরা ভারতীয় সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সহজেই মেনে নিতে পারি। আবার অনড়, সংঘিষ্ট জীবন নয়, পরিবেশ যাকে বদলে দিতে পারে, নতুন কোনো সম্ভাবনা যাকে প্রতীক্ষা করার মতো মানসিকতা দিতে পারে। যে কোনো শিক্ষিত মনের পক্ষেই এই ঢোঁড়াই-এর মতো চরিত্রের অনুভবের রাজ্যে প্রবেশ করা দুরূহ বিশেষত উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে থাকে সর্বক্ষণই রাখতে হবে। সতীনাথের এ এক নতুন এবং কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু এই নিরক্ষর জটিল একটি মানুষের মনকে বিশেষ একটি পরি[illegible]শে রেখে তার মানবিক এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে লক্ষ্য করে যাওয়াটাই সতীনাথের বহুদিনের বাসনা। হয়তো কঠিন হলেও এই অ্যাডভেঞ্চার নতুন বলেই তাঁর আকর্ষণ।

একটু আলগা ভঙ্গিতে ছোট ছোট অধ্যায়ে মহাকাব্যিক আদলে এই গণ-রামায়ণ ভারতীয় সাধারণ মানুষের মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করবে ভেবেই ঢোঁড়াই-এর চরিত্র গড়ে তোলার দিকে তাঁর মন। বিহারবাসী মানুষ গান্ধীজীকে রামচন্দ্রের অবতার হিসেবে যেভাবে পুজো করতো তাতে ঢোঁড়াই-কে সমকালীন বিহারের রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা [illegible] খুবই বেশি।

ব্যক্তি ও সমাজের চলিষ্ণু সম্পর্কটি ঢোঁড়াই চরিতে উপেক্ষিত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। কিন্তু পরিবেশ ও মানুষ পরস্পরকে বদলায় এ তো সতীনাথের নিজেরই ধারণা। মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত সতীনাথ ব্যক্তি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে বুঝতেন না - এমন ভাবাটাই অন্যায়। মার্কসীয় দর্শনের প্রয়োগ নিয়েই তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তা অনেকখানি পরিণতি পেয়েছিল। তাতমাটুলির বস্তির সমাজ জীবনটা তিনি চিনতেন। এই বদ্ধ সমাজে রোজা বা গুণিনের প্রতি বিশ্বাস, ঘরামির কাজ আর কুয়োর বালিছাঁকার কাজের মতো নির্দিষ্ট রোজগার এবং

তুলসীদাসী রামায়ণে অচল বিশ্বাস ও প্রতি পদে তার ব্যবহার—এই হচ্ছে তাদের জীবন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাদের জীবন বদলায় নি। বস্তির বাইরে তাদের খুব একটা যাতায়াতও নেই। এই বন্ধ সমাজের ছেলে ঢোঁড়াই বারবারই ঘা দিয়েছে তার সমাজকে। কোশী-শিলিগুড়ি রোডের একধারে তাতমাটুলি। অন্যদিকে ধাঙড়টুলি। দুটি টুলির মধ্যে রেষারেষি থাকলেও ঢোঁড়াই ধাঙড়দের বন্ধু। সমাজের নিষেধ না মেনে ঢোঁড়াই ধাঙড়দের সঙ্গে রাস্তা মেরামতির কাজ নিয়েছে। পঞ্চায়েতের মতামতকে অগ্রাহ্য করে সে ধাঙড়দের সঙ্গ নিয়েছে। ছত্রীদের যজ্ঞোপবীত নেওয়াতে নেতৃত্বও দিয়েছে সে। তাতমা-প্রধানের খোঁড়া মেয়েকে বিয়ে না করে অন্য জাতের মেয়ে রামিয়াকে বিয়ে করেছে—যার 'রসম রেওয়াজ' আলাদা। তাতমা সমাজকে সে ঘা দিয়েছে এই বিয়ে করে। জাতের রোজগার ছেড়ে ঢোঁড়াই গোরু আর গাড়ি কিনে পাক্কী ধরে ধান পৌঁছে দেয় দূরে, অন্য জায়গায়, নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ জীবন ছাড়িয়ে। ঢোঁড়াই-এর জীবনটাই ব্যক্তি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মূর্ত প্রমাণ। যে সমাজে 'ঘর বৈঠে বুদ্ধ পঁয়তিস, রাই চলতে বুদ্ধ পাঁচ, কচহরী গযে তো একো ন সুঝে ; যো হাকিম কহে সো সচ।' অর্থাৎ, ঘরে বসে থাকলে বুদ্ধি পঁয়ত্রিশ, পথে বেরলে বুদ্ধি পাঁচ, কাছারী পৌঁছে একও দেখতে পায় না। আর যা হাকিম বলে তাই সত্যি অর্থাৎ আদালতের সামনে বুদ্ধির পরিমাণ শূন্যে ঠেকে! এই রকম সমাজে ঢোড়াই যা করেছে তা বিদ্রোহ তো বটেই। আরও আছে। বাওয়ার চালাটিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতমা আর ধাঙড়দের যুবকরা বুঝতে পারে এ কাদের কাজ। তারা রতিয়া ছড়িদারের চুলের গোছা ধরে আসল কথা আদায় করে নেয়। কিন্তু থানায় গিয়ে ছোট দারোগার ধমকে তারা (শনিচরা আর বিরসা) ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায়। এই রকম সমাজে ঢোড়াই সাহস দেখিয়ে 'পঞ্চ'-কে যেভাবে অগ্রাহ্য করেছে তাকে দ্বন্দ্বগত পরিবর্তন ছাড়া আর কী বলা যায়?

আরও একটা অভিযোগ আছে। ঢোঁড়াই-এর কোনো প্রতিপক্ষ নাকি উপন্যাসে নেই। এই অভিযোগের উত্তর তো এখনি দেওয়া হলো। তাতমা সমাজের কর্তাব্যক্তিরাই তার প্রতিপক্ষ। দুর্নীতি-গ্রস্ত লোভী ঈর্ষান্বিত বুড়ো মাহাতোর সভা হচ্ছে 'পঞ্চ'। যারা টাকা খায়, বিচ্ছেদের বিধান দেয়, সভার অনুমতি দেয় তারা তো বটেই, সেই বাবুলাল চাপরাসি, রতিয়া ছড়িদার, ধনুয়া মাহাতোর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকেরাও ঢোড়াই-এর প্রতিপক্ষ। ঢোড়াই-এর ভাষায় এরা 'পঞ্চায়েতী ছাগল'। ঢোঁড়াই চরিতের প্রথম চরণেই ঢোড়াই-এর এই বিদ্রোহের পরিচয় খুব স্পষ্ট। এই দুর্নীতিগ্রস্ত অচল সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই ঢোড়াই চলে গেছে নতুন জীবনের সন্ধানে।

আবার গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঢোড়াই-এর ক্রান্তিদলে যোগ দেওয়াটার ব্যাখ্যাও নাকি এই উপন্যাসে নেই বলে অনেকে মনে করেছেন। এর উত্তরে বলতে হয়, জিরানিয়া শহরে ছোটবেলা থেকেই ভিক্ষার জন্যে ঢোঁড়াই যাওয়া-আসা করতো।

সীতারামের গান গেয়ে ভিক্ষা পাওয়া যখন কণ্টকর হলো, তখন 'বটোহী' গান গাইতে শুরু করে ঢোঁড়াই। এই 'বটোহী' গান আসলে দেশপ্রেমমূলক গান। স্বদেশী যুগে এই গান খুব চলতে শুরু করে। কাজেই দেশপ্রেমের গান সে ছোটবেলা থেকেই গাইছে। জিরানিয়া শহরে বাঙালী সমাজের মধ্যে যে স্বদেশী হাওয়া আসে ঢোঁড়াই খুব কাছ থেকে তা দেখেছে। তাদের সঙ্গে থেকে ঢোঁড়াই স্বদেশী ভাবাপন্ন হয়েছে। ধান নিয়ে যেতে যেতে, মাটি ফেলার কাজ করতে করতে ঢোঁড়াই এই বিরাট দেশের অচেনা কত গ্রামের খবর পেয়ে তার মন ভরিয়েছে, তার জাতের লোক যার কণামাত্রও জানে না।

এই বিরাটত্বের আঁচ পাওয়া ঢোঁড়াই 'গান্ধী বাওয়া'র সভায় গেছে। তাতমা বা 'ইংরেজ' যে সমাজেরই হোক, অন্যায় সে সহ্য করতে পাবে না। 'কলক্টর' সাহেবের বিরুদ্ধে সে মাথা তুলেছে। 'গানহী বাওয়া'র আবির্ভাব প্রাথমিক স্তরে শুধু কৌতূহলের ব্যাপার ছিল, পরে তিনি হয়ে উঠেছেন মহাত্মাজী। তাঁর নামে সবাই লড়াই-এ নামে, 'নমক' তৈরির কাজে, লাইন তোলার কাজে, থানায় আগুন লাগাবার কাজে, 'সতিয়াগিরি' বা সত্যাগ্রহের কাজে। কাজেই ঢোঁড়াই-এর পক্ষে গান্ধী বাওয়াকে অনুসরণ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

এখন বুঝতে অসুবিধা হবে না, ভারতীয় জনজীবনের পটভূমিতে রামায়ণের মজ্জাগত প্রভাব, তাত মাটুলির গণ্ডিবদ্ধ প্রভাব, রোজা-বোদগারের প্রভাব ছাড়িয়ে কীসের তাড়নায় ঢোঁড়াই এসেছে জনজীবনের পথে। ভিক্ষার সূত্রে, সন্ন্যাসীর চেলা হওয়ার সূত্রে, তামাকক্ষেত্রের কৃষি-মজুর হওয়ার সূত্রে ক্রান্তিদলের কর্মী বার বার তার বাঁধা ছক ভেঙেছে। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত সূত্রে মায়ের ও স্ত্রীর আশ্রয় গেছে, বোকা বৌয়ার আশ্রয় গেছে। তারপর বিসকান্ধায় জাগিযার আশ্রয় এবং শেষে অ্যান্টনির আশ্রয় থেকে তার বিচ্যুতি ঘটেছে। ঢোঁড়াইরামের এই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে-পড়া বহু-ঢোঁড়াই-সত্তাই লেখকের উদ্দিষ্ট ছিল। হয়তো শিল্পী হিসেবে ঢোঁড়াই-এর অভিপ্রেত বিশালতা আনতে পারেন নি বলে আক্ষেপ ছিল তাঁর। কিন্তু ঢোঁড়াই যেভাবে তার সমাজের খোলস ভেঙে ভেঙে ধীরে ধীরে জন্মভূমির বৃহত্তর সত্তার অর্থাৎ ভারতবর্ষের বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃৎকম্পন শুনেছে তাতে তাকে বিশাল অশিক্ষিত জনতার প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না।

যে যুগের মধ্য দিয়ে সতীনাথ ঢোঁড়াইকে নিয়ে গেছেন সেই বিক্ষুব্ধ ও স্বপ্নময় যুগে শিক্ষিত মনের 'উদ্দীপনা'র চেয়ে অশিক্ষিত মনের 'জাগরণ' সতীনাথের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। এই অশিক্ষিত মনের রোমাঞ্চ ও শিহরণ শিক্ষিত মনের উদ্দীপনার তুলনায় অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ও জটিল, হয়তো অশিক্ষিতের নিজের কাছেও তার অস্পষ্টতা শিক্ষিত কৌতূহলী মনের কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয়। সেইজন্যই সতীনাথ এই ঢোঁড়াই-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রায় fixation হয়েছিল তার —অশিক্ষিতের বোধের জাগরণকে, তার সত্তার ক্রমিক ব্যাপ্তিকে

তিনি লক্ষ্য করে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ বোধ তাঁর কেটে যায়। যাই হোক, এমন নিরক্ষর মানুষের চেতনায় সমাজ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসকে প্রতিফলিত করার কঠিন চেষ্টা শুধু বাঙলা উপন্যাস কেন, সাধারণভাবে উপন্যাস-জগতেই অভিনব। ঢোঁড়াই-এর সঙ্গে তার সমাজের সংযোগ ও সংঘর্ষ, তার ব্যক্তিত্ব ও চেতনার ব্যাপ্তি তার মধ্যে মহাকাব্যিক লোকনায়কের ব্যাপ্তি যে এনেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। রামায়ণের সত্যের আদর্শ তাকে যেমন এগিয়ে নিয়ে গেছে তেমনি তার মতো রক্তমাংসের আবেগপ্রবণ মানুষ কখনোই আত্মস্থ হতে পারে নি। পুরোণো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে গেছে তার জীবনে। স্বার্থান্ধতা আর প্রতিযোগিতা তাকে জর্জরিত করেছে। তার ছেড়ে-যাওয়া স্ত্রী রামিয়ার গর্ভজাত ভেবে অ্যান্টনিকে নিয়ে সে সংসারের পথে ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কেবলই সত্যের সঙ্গে বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে কোনো মূল্যবোধের খোঁজ পায় নি, স্থির জীবন তার ভাগ্যে নেই। নিঃসঙ্গতায় তার জীবন শেষ হয়েছে, রামায়ণজীর রামায়ণটাও তার সঙ্গী নয় তখন। পিতৃহীন মাতৃপরিত্যক্ত নিরক্ষর এক মানুষ একে একে জন্ম, মাতৃস্নেহ, সমাজবন্ধন সব ছেড়েছে সত্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায়। তারপর রাজনৈতিক কুটিলতায় সে পরাস্ত হয়েছে। তার আক্রোশে যেমন লেখক এনেছেন লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাসের ছবি, তার শক্তিহীন রিক্ততার মধ্যেও সেই একই সংস্কার-বিশ্বাসের ছবি। পঞ্চ-মাহাতোদের চক্রান্তে ক্ষিপ্ত ঢোঁড়াই-এর বর্ণনায় লেখক বলছেন, 'তার হিংস্র চোখের মধ্য দিয়ে ঠিক্‌রে পড়ছে অজস্র বজ্রের স্ফুলিঙ্গ। বজরঙ্গবলী মহাবীরজীর অসীম শক্তি এসে গিয়েছে তার দেহে আর বাহুতে।' আবার যখন ঢোঁড়াই অ্যান্টনির মা-র কাছে জেনেছে তার স্ত্রী মারা গেছে, অ্যান্টনি তার গর্ভজাত সন্তান নয়, তখন লেখক বলছেন, 'কপেকটা কথার বালি পড়ে তার শরীরের আর মনের সব যন্ত্রণাগুলো বিকল হয়ে গিয়েছে। জুয়ো খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে সে। অবচেতনের মতো সে উঠোন থেকে বেরিয়ে আসে।' 'কথার বালি' এই রূপকেই প্রমাণ ঢোঁড়াই-য়ের চারিত্রিক আগুন বালি পড়ে নিবে গেছে। আমাদের কাজ ছিল বালি ছাঁকার। তুলনাটা বোধহয় সেই কারণেই। যাই হোক, এখত সর্বস্বান্ত জুয়ারী সে। অনেকদিন আগেকার মেলায় এই জুয়োখেলাব স্মৃতিটা তার একটু আগেই মনে এসেছিল। এখন শুধু হেরে যাবার শূন্যতা। এখন বিকল-ইন্দ্রিয় ঢোঁড়াই শুধুই 'অবচেতন'। বুড়ো এতোয়াবীর ভাষায় 'ঢোঁড়া সাপের দাঁত'। সমস্ত উপন্যাসটি ভরে আছে 'পাক্কী'র আশে-পাশে দেহাতী মানুষের আচার-সংস্কার, পৌরাণিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বচনের এক বিচিত্র জগৎ। আর সবকিছু ছাড়িয়ে উঠেছে তাদেরই এক বিদ্রোহী অথচ আদর্শবাদী গণ-নায়কের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ব্যবধান, নিজেকে বোঝানোর ব্যর্থতা এবং সংসারকে না বোঝার ব্যর্থতা যেমন জাগরী-তে, চিত্রগুপ্তের ফাইলে, এখানেও তেমনি, ঢোঁড়াই-এর জীবনে। তিনটি উপন্যাসেই মানুষের আত্মবিচারে, অবচেতনের উন্মোচনে একই ছবি।

[পাঁচ]

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিতে সতীনাথ তাঁর মাকে এবং দিদিকে হারিয়েছিলেন। রাসভারী পিতৃ-ব্যক্তিত্বে ভীত এবং স্নেহবঞ্চিত সতীনাথ অন্য দুটি মহিলার স্নেহ পেয়েছিলেন। সেই স্নেহই শিল্পীর মনোজগতে 'টান-ভালোবাসা'র জন্ম দিয়েছিল সম্ভবত। ঠিক প্রেম নয়, ঠিক স্নেহও নয় —এমন এক অস্পষ্ট বা ব্যাখ্যায় অতীত আকর্ষণের ছবি তার পরবর্তী উপন্যাস 'অচিন রাগিনী'-তে। একই রকমের অন্তর-লোকের উন্মোচনের মাধ্যমে এই বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। অন্য তিনটি উপন্যাসের মতো এখানেও বিষয়বস্তু আলাদা। পিলে, নতুন দিদিমা আর তুলসী, তিনজনকে নিয়ে এই টান-ভালোবাসার গল্প।

এই জাতীয় উপন্যাসের অনুভূতির সূক্ষ্ম মীড়গুলোই বড়ো। সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যায় না। সম্পর্কের জট লাগা আর খোলার ইতিহাসটি আপাত দৃষ্টিতে এতাই তুচ্ছ যে তাকে নিরেট বিষয়বস্তু বলে গ্রাহ্য করা যায় না। অথচ এই সম্পর্কগুলোই মানুষকে কখনো কাছে টানে, কখনো দূরে ঠেলে দেয়।

গল্পটি পিলের মুখে শোনা। মধ্য-যৌবনে এসে কৈশোর-স্মৃতি থেকে শুরু করেছে সে। মাঝে মাঝেই ফিরে আসছে তার বর্তমান মধ্য-যৌবনে। পিলে এই গল্পের বক্তা, আবার ব্যাখ্যাতাও বটে।

দিদির সঙ্গে সে যখন নতুন দিদিমাদের বাড়ির উঠোনে রোজ খেলা করতে যেতো তখনই নতুন দিদিমাকে তাব ভালো লাগে। তারপর সে ভালোবাসার ছেদ পড়ে। ওই বয়সে ভালো লাগার একটা ঝোঁক আসে। আবার ঝোঁক চলে যায়। কিছুদিন দিদিকে, কিছুদিন তুলসীকে, কিছুদিন মিস্ত্রির ছেলেটাকে, কিছুদিন হয়তো নিতুদার কনে বৌকে। ঝোঁকটা যেন স্থায়ী হবার জন্যেই আসে। তারপর কখন অকালেই চলে যায়।

ঠিকেদার বাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী দেখন-ঠাকরুণের বাগানে কলাচুরি করতে গিয়ে তুলসী, পিলে এবং অন্যান্য ছেলেরা ধরা পড়েছে। ধরা পড়ার পর ঠিকেদারবাবুর স্ত্রীর কাছে নিজের অন্যায় কাজের লজ্জা কাটাতে গিয়ে তুলসী খুব রাগ দেখিয়ে বলে, 'সদ্‌গোপ'রা তো ভালো লোক। আমি আপনাদের বলি বদ্‌গোপ।' বদ্‌গোপ শুনে ঠিকেদারবাবুর স্ত্রী হেসে ফেলেছেন। সে হাসি থামে নি। তুলসীর মাথাটি নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। তাঁর ঠোঁট দুটির ফাকে হাসি-র আওয়াজ বেরুচ্ছে। তুলসীকে মারতে গিয়ে তাঁর এই আদর পিলে কোনোদিনই ভোলে নি। এই সময় থেকে পিলে ও তুলসীর কাছে ঠিকেদারবাবুর স্ত্রী 'নতুন দিদিমা'। নতুন দিদিমার কাছে পিলে হয়ে যায় 'সংক্রান্তির ধামুন', তুলসীকে তিনি বলেন 'গন্ধপাতা', 'গন্ধবামুন'।

নতুন দিদিমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক লোকজনের কাছে ঘটা করে বলার মতো নয়। এই টান-ভালোবাসায় ছেলেমেয়েরা জড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিযোগিতায় যেন কাড়াকাড়ি চলতো। নতুন দিদিমা কাকে বেশি ভালোবাসেন। কে 'ফাস্', কে 'সেকেন', কে

'থাড', কে 'ফোড়'। পিলের হিসেবে তুলসী ফার্স্ট. সে নিজে 'সেকেণ্ড', গুটলিদি 'থাড়', কেষ্ট 'ফোর', তারাদা লাস্ট। পিলে তার 'সেকেণ্ড'-কে মেনে নিয়েছে। এ নিয়ে বেমানান কিছু করা তার সাজে না। নতুন দিদিমা কী ভাববে! ছিপছিপে চকচকে মিষ্টি মুখ তুলসী ভালোবাসা আদায় করতে জানে।

আবার নতুন দিদিমার দিক থেকেও এই টান-ভালোবাসার চেহারা কেমন দেখা যাক ঃ 'একদিন যদি গন্ধপাতা কিংবা গন্ধবামুন বলে না ডেকেছ অন্তত একবারও, অমনি মুখ হয়ে উঠবে হাঁড়ি – এতখানি। এতো ছেলে মেয়ে তো আসে আমার কাছে নিত্যি তিরিশ দিন, একদিন তুই না বলে তুমি বলতো কাউকে, অমনি ফাটাফাটি লেগে যাবে। খেলাধুলো মাথায় উঠবে। এই মনটুকুই তো আসল।' এই স্নেহ-কাঙাল অভিমানী মনটিই তো অচিন রাগিনী বাজিয়ে তোলে। নতুন দিদিমা এই 'অচিনকে' ভালোই চিনতেন তাঁর সহজাত মন-দেওয়া-নেওয়ার ভঙ্গিটি দিয়ে।

এই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই নতুন দিদিমাকে কেন্দ্র করে রাসলীলা, থিয়েটার, হিন্দুস্থানীদের 'যুগীরা' গান, মহরমের লাঠিখেলা, ছটপরবে পিদিম ভাসানো, চড়ুইভাতি-র উৎসাহ ও উৎসব।

আবার নতুন দিদিমার দুঃখও তুলসী-পিলেকে টানতো। তেত্রিশ বছরের বড় স্বামীর সঙ্গে নতুন দিদিমার মেলামেশা, আগের পক্ষের ছেলেমেয়েদের আপন করে নেওয়া, নিজস্ব কিছু অধিকাব আদায় করা —এই সব মানিয়ে নেওয়ার সমস্যাও তার ছিল। সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াব কিছু কিছু যন্ত্রণাময় মুহূর্তের সাক্ষীও ছিল তুলসী আর পিলে।

কলকাতা থেকে পিলে একবার ফিরে গিয়ে শোনে, তুলসী নেপালে। নতুনদিদিমাকে জিগ্যেস করায় তিনি বলেন, তাঁদের বাড়ির পেয়ারা গাছে উপদ্রব হচ্ছে দেখে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, এই হনুমানগুলোর দৌরাত্ম্যে একটাও পেয়ারা পাই না। তারপরে গন্ধপাতা তুলসী মুখ হাঁড়ি করে গাছ থেকে নেমে একেবারে নেপাল চলে যায়। কতোখানি অভিমান বোধ ছোটদেব মনের মধ্যে থাকলে অভিমানের আবেগে তারা অন্য দেশে পাড়ি দিতে পারে তা এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। পরিণত মনের কাছে এ ঘটনা হয়তো কৌতুকের ব্যাপারই। কিন্তু ছোটদের কাছে কখনোই নয়। তুলসী ফিরে আসার পর নতুনদিদিমার স্বগত চিন্তা ঃ 'ফিরে তার কাছেই ছুটে এসেছে প্রথমেই, এইটেই বোধহয় ফেরবার চাইতে বড় কথা।' আবার নতুন দিদিমার অনুপস্থিতিতে তুলসী ও পিলে দিন গোনে। তিনি ফিরে এলে তাদের নানান প্রশ্ন ঃ তোমাদের রাস্তার গন্ধটা কী রকম? মালতী ফুল চুরি করতে গেলে বকতো না? ইত্যাদি।

নতুন দিদিমা যেদিন বিধবা হলেন সেদিন তাঁর কান্নার শব্দটা পিলের মনে পড়ে। মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় শব্দটা যেন গোঙানি হয়ে যায়। পরে নতুন দিদিমার মুখে সে শুনেছে ঃ 'বাড়ির মানুষ' চলে গেলে 'সে কী লজ্জা, সে কী লজ্জা।' এই 'লজ্জা' শব্দটির অর্থ নিশ্চয় পিলে-তুলসী তখন বোঝে নি। কিন্তু নতুন দিদিমাকে চেনবার পক্ষে এটি দরকারী।

নানা ঘটনাচক্রে পিলে চলে গেছে পড়তে নতুন দিদিমার অজস্র স্মৃতি নিয়ে। বছর দুয়েক বাদে ফিরে দেখে তুলসী ও নতুন দিদিমা গড়ে তুলেছে নিজস্ব জগৎ। পিলে যেন সে জগতে ঢুকতে পারে না। তার কষ্ট হয়। নতুনদিদিমার স্বভাবে লুকোচুরি ছিল না, এখন যেন হয়েছে। তবু তার অভিমান চেপে সে যায় নতুন দিদিমা আর তুলসীর সঙ্গে দেখা করতে। বুঝতে পারে সে একটু আলাদা হয়েছে। কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন সতর্কতা। প্রাণখোলা ভাব নেই। পিলে নানান মনগড়া ব্যাখ্যা করে। নতুন দিদিমার প্রাত্যহিক জীবনের একটা সময় শুধু তুলসীর জন্যেই। এটাও তার কাছে খুব দুঃখের।

দ্বিতীয় বার ফিরে এসে পিলে ভাবছে সমস্ত ব্যাপারটা খুব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে সে দেখেছে। আসলে নতুন দিদিমার সমালোচনাই সে মনে মনে শুরু করেছে। সে হিসেবী মনে পড়ায় মন বসাতে চায়, কিন্তু বে-হিসেবী মনটা তার পড়ে থাকে নতুন দিদিমার দিকে। মেডিকেল পড়ার শেষ বছর সে যখন নতুন দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, কবিকংকণ চণ্ডী উপহার দেয়, তখন নতুন দিদিমার সেই আগেকার হৈ-হৈ-করা ভালোবাসা নেই। এখনকার মৌন আদরের গভীরতা, চোখের জল যেন 'একটি নিবিড় মুহূর্তের সম্পর্ক' বলে পিলের মনে হয়। ওদিকে তুলসীর মায়ের উপহার দেওয়া তার মহাভারতখানা নতুন দিদিমা ফেরত দিলে তুলসী ঝগড়া করে চলে যায়। পরের দিন চোখের জলে নতুন দিদিমার সঙ্গে আবার মিল। নতুন দিদিমার স্বভাবে মাঝে যে লুকোচুরি দেখা দিয়েছিল তা যেন এখন নেই। এখন অভিমানী তুলসীর জন্যে ব্যাকুলতা দেখে পিলের মনে হয় তুলসী চিরকালই 'ফার্স্ট'. সে 'সেকেন'।

ডাক্তার হয়ে ফিরে পিলে শোনে তুলসী মদ খায়। সবাই ছি ছি করে। তারা, গুটলি এরা সবাই অনুযোগ করে। তুলসী ঠিক সেই সময়েই আসে। নতুন দিদিমা তাঁ'র মুখের ওপরেই বলেন, 'তুই আর কখনো আসিস না এ বাড়িতে।' তাঁর গলা বেয়ে কান্না ঠেলে আসে। তুলসী বেরিয়ে যায়। পিলে তখন ভাবে. 'সব কথা বলা যায় না সংকোচ ভীরু টান ভালাবাসার ক্ষেত্রে।' তারপর কয়েকটা বছর কাটে। তুলসী নাটুনদের দলে যোগ দিয়েছে। পতরঙ্গী নামে এক নাটুন মেয়ের সঙ্গে থাকে। সেই পতরঙ্গীই একদিন খবর দেয়, তুলসী মৃত্যুশয্যায়। নতুন দিদিমা পূর্ণনাথের ছেলের সংসার ছেড়ে পিলেকে নিয়ে তীর্থে বেরোন। আসলে সেই নষ্ট-হয়ে-যাওয়া গন্ধলতাকে ফিরে পেতে চান। নতুন দিদিমাকে বস্তিতে রেখে পিলে তুলসীকে অনুরোধ করতে যায়। তুলসী ফিরিয়ে দেয় : 'সে আর হয় না রে পিলে।' এখন কী করে সেই গভীর আত্মপ্রত্যয়-ভরা মুক্তির আনন্দে উদ্দীপ্ত নতুন দিদিমাকে পিলে বলবে এই প্রত্যাখানের কথা? তাঁর এতো মনের জোর তো কাজে লাগলো না। '· তুলসীর মাথার চুল ভিজে উঠেছে ঘামে। লাল স্যাওলার তল থেকে ভুড়ভুড়ি কাটছে হীরাধারের জলে। বুদ্‌ বুদ্‌ বুদ্‌—একটা, দুটো, তিনটে · । গন্ধবামুন · গন্ধপাতা····ও আমার গন্ধপাতা।' পিলের অবচেতন যেন হীরাধারের জল। তার

বুদ্‌বুদে তুলসীকে ডাকা নতুন দিদিমার কণ্ঠস্বর। তাঁর টান-ভালোবাসা সংকোচের গভীরতা থেকে উঠতে পারে না। গন্ধপাতাকে পাওয়া হলো না তাঁর।

জাগরী, চিত্রগুপ্তের ফাটল বা ঢোঁড়াই-য়ের কথাকার এখানে মনের আর এক জটিল লোকে পেঁাছেছেন। এখানে ভুল বোঝা বা না বোঝার ব্যাপার নয়, যে অনুভূতি আসে, সমাজের তথাকথিত সংসারের মধ্যে যার প্রবেশ সংকুচিত. যাকে যোগ্য সম্মান দেওয়াও যায় না, এ সেই রকম এক জটিল অনুভূতি। এই 'অচিন রাগিনী'কে তখনও পর্যন্ত কোনো কথাশিল্পী এমন আন্তরিক সূক্ষ্ম কারুকার্যের দক্ষতায় চিনিয়ে দিতে পারে নি। একটা কথা এই সূত্রে বলে রাখা ভালো, তুলসীর দিক থেকে এই টান-ভালোবাসার একটি অবদমিত রূপও আছে যা তৃপ্তির পথ না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খলার দিকে তাকে টেনে নিয়ে গেছে বলেই মনে হয়। তার মতো অভিমানী আবেগপ্রবণ কিশোর নতুন দিদিমার সঙ্গে যে ধরণের তৃপ্তি খুঁজেছে সেটা নতুন দিদিমার কাছে পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই তার আত্মক্ষয়ের ঝোঁকটা দেখা দিয়েছে। অচিন রাগিনীর এও এক সম্ভাব্য গভীর মাত্রা বলেই আমার মনে হয়েছে।

[ছয়]

তুলসী ও পিলে যেমন নতুন দিদিমাকে কেন্দ্র করে এক বিচিত্র অন্তর্লোকের রাগিনী শুনিয়েছে, 'সংকট' উপন্যাসেও তেমনি অন্তর্লোকের আর একটি উন্মোচন। 'অচিন রাগিনী'তে পিলে কথক, এখানে কথক বিশ্বাসজী—যুক্তিনাথ বিশ্বাস। চেতনা ও স্মৃতির পথে তাঁর আত্মানুসন্ধান চলেছে। 'বিচিত্র দৃশ্য ও নির্বাচিত মুহূর্তে''র ভেতর দিয়ে বিশ্বাসজীর অন্বেষণ শুরু হয়েছে। বলা উচিত জীবনের কিছু সংকট-মুহূর্তের সংকলন—ঔপন্যাসিক যাকে বলেছেন 'উজ্জ্বল মুহূর্ত'।

এই সংকট-মুহূর্তের একটি হলো মুনিয়ার জীবনকে কেন্দ্র করে। এই সংকটটিকে তিনি মনে মনে যাচাই করছেন। মুনিয়াকে তার স্বামী ত্যাগ করতে চাইছে, কারণ মুনিয়া বন্ধ্যা। মুনিয়া তখন নিজেই স্বামীর ঘর ছেড়ে মা-র কাছে চলে আসে। মা-ও তাকে আঁটকুড়ী বলে গালাগাল দেয়। ইতিমধ্যে মুনিয়ার স্বামী চিঠি লিখে জানায় আবার বিয়ে সে করেছে। সে লিখেছে শাশুড়ীর কথাতেই সে গিয়েছিল সতীথানে ইঁট বাঁধতে। কিন্তু ফল হয় নি। মুনিয়া এই আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ইঁট খুলতে চায়। সতীমায়ের আশীর্বাদ পাবার তার দরকার নেই। সতীথানে গিয়ে দেখে ইঁট নেই। অঘোরী বাবাকে জিগ্যেস করলে সে দ্বিধা করে। বাবার মুখে-চোখে অপরাধীর ভাব ফুটে ওঠে। তাতে বোঝা যায়, তারই কাজ। মুনিয়ার পক্ষে এইটেই সংকট-মুহূর্ত। বিশ্বাসজীর কাছে সে ছুটে যায়। বিশ্বাসজী অঘোরীবাবাকে প্রহার করেন। অঘোরীবাবা পালায়। তারপর বিশ্বাসজীর বাড়ির চাকর রামধনীর সঙ্গে মুনিয়ার মা আর মুনিয়া তীর্থ করে ফেরে একটি কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেকে নিয়ে।

পরে মুনিয়া ভেবেছে কেন এমন হলো। মনে হয়েছে ধুনুচিই তার সর্বনাশের মূল। সেটা রেণুর বাসি বিয়ের দিন রেণুর কাপড়ের বাক্সে গুঁজে দিয়েছিল। রেণুও শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসে। তার সংসারে ভাঙন ধরে। অঘোরীবাবার বিপদ ঘটিয়েছিল ধুনুচিটাই।' আবার রঘুয়াও অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে পথে বেরিয়েছিল। যারা এই ধুনুচিটার জন্যে বিপদে পড়েছে তারা কি কোনো অপ্রাপ্ত বাসনাকে পূরণ করতে চেয়েছিল।

শোনপুরের মেলায় তাঁবু খাটিয়ে বিশ্বাসজী শুয়ে শুয়ে ভাবছেন। হঠাৎই মনে পড়ে পুজারীর মা-র কথা -'এক জায়গায় বাঁধা পড়ে ধুনুচিটার ধক মরেছে।' ভয় পেয়ে তিনি উঠে বসেন। ধুনুচিটা নিজের কাছে রেখে তিনি ভুলই করেছেন। এতোগুলো ঘটনার মধ্যে তিনি যোগসূত্র খুঁজছেন। ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্যে একটা কোনো যুক্তি খুঁজছেন। ভাবছেন, মুনিয়া যে ধুনুচিটা তাঁকে দিয়েছিল তা নিশ্চয় অন্য কোনো ধুনুচি। পাশে ঘুমিয়ে থাকা মহাত্মাকে ডেকে গেলেন। তারপর সেই রাত্রিতেই তিনি শোনপুরে চলে যান। বাড়ি পৌঁছে পুঁটলি খুলে দেখেন সেই ধুনুচিটাই। তারপর আবার ভাবেন, ধুনুচিটা আসার আগেই তো তিনি অস্থির হয়ে ঘুরছেন! তবু ঠিক বিশ্বাস হয় না। এই গুজরাতীর মা-র কাছে ধুনুচিটা ফেরত দিয়ে দেন। সবকিছু মেনে নিয়েই হয়তো মানুষের শান্তি থাকে। কিন্তু মানুষের দুর্মর সংস্কার তার জানার জগৎটাকে নড়বড়ে করে দেয়। অজানা কোনো শক্তি এসে সব কিছু উলটে দেয়। এই ওলোটপালোটের কাহিনীই 'সংকটে'র বিষয় বস্তু।

'সেক্রেটারির কথা' অংশে দেখি, ধুনুচিটা ফেরত দেবার পর বিশ্বাসজীর জীবনে চারটি পর্ব আসে। প্রথম পর্বে তিনি জ্যোতিষ চর্চা করেন, বাগান পরিচর্যা করেন। দ্বিতীয় পর্বে তিনি বাইরের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন না। ফুল গাছ আর বাগান সাজানো নিয়েই আছেন। তৃতীয় পর্বে দেখি, তিনি বাড়ি থেকে দুতিন বছর বেরোন নি। ঘুমোন না। অস্থিরতা কাটে নি। চতুর্থ পর্বে দেখি, রেণু এসে মন্ত্রদীক্ষা নিতে চায়। তিনি দিতে চান না। রেণুর হাতে একটি ক্রোটনের ডাল দেন। অন্ধকার বাগানে পায়চারি করেন। তারপরেই তাকে আর পাওয়া যায় না। পাতানো বৌদি রেণুর মা আর রেণুদের কাছে, তার শখের বাগানে, আর ফেরেননি তিনি।

উপন্যাসের শেষে দেখছি, বিশ্বাসজীর বাড়িতে লাইব্রেরী হবে। জ্ঞান ও যুক্তির চর্চা হবে। যুক্তির চর্চাতে হেরে গেলেন তিনি, তাই তারই চর্চা হবে। 'সংকটে' বিষয়বস্তুর ভার নেই, আত্মানুসন্ধানেও যে নাটকীয়তা আছে তাও নয়। তবু মানুষের যুক্তির গড়া জগৎ আর তার সংস্কারের জগৎ -এই দুয়ের সংঘর্ষে যে ব্যর্থতা আসে, বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় জীবনকে বা জীবনের সংকট মুহূর্তকে যে ধরা যায় না তারই করুণ বিষাদ বিশ্বাসজীর জীবনকে স্মরণীয় করে রেখেছে। আত্মানুসন্ধানের এই দুরপনেয় সংকটই 'সংকটে'র নায়ককে আধুনিক করে তুলেছে। জীবনের কিছু সংকটমুহূর্ত এবং মুহূর্তগুলির যোগসাধনে মননশক্তির ক্রিয়ায় যুক্তি ও সংস্কারের দ্বন্দ্বই এখানে বিশ্বাসজীর চরিত্রটিকে আধুনিক মাত্রা দিয়েছে বলে মনে করি।

[সাত]

শেষ উপন্যাস 'দিগভ্রান্ত' আরেক ধরনের আত্মানুসন্ধানের কাহিনী। এ কাহিনীতেও ঘটনাগত কৌশল তেমন নেই। সুবোধ ডাক্তার, স্ত্রী অতসীবালা, পুত্র সুশীল, কন্যা মণি এবং বাইরে থেকে আসা একটি চরিত্র হরিদাস এই কাহিনীর চরিত্র। সুবোধ ডাক্তারের সংসারে হরিদাস এসেছে ধূমকেতুর মতো। পরিচয় দিয়েছে স্ত্রী অতসীবালার গ্রাম সুবাদের ভাই হিসেবে। অতসী তাকে চেনেন না, তবে নামটা জানেন। অতসীর ডাক নাম যে 'আতা' তা হরিদাস জানেন। কাজেই হরিদাস সংসারে ঢুকলো। কিন্তু সুবোধবাবু তাকে স্বীকৃতি দিলেন না এবং তাতেই পারিবারিক জীবনের বিপর্যয় শুরু হলো। সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-বিচার জানা ছিল হরিদাসের। নানারকম ভাবে তুষ্ট করার চেষ্টাও সে করেছে। তবু সে বুঝেছে, সুবোধবাবু তাকে ভালো চোখে দেখেন না। কেউ বলে নন-ম্যাট্রিক শালার চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে, কেউ বলে চমৎকার কীর্তন গান করে হরিদাস। কিন্তু সুবোধ-বাবুর কম্পাউন্ডার, ড্রাইভার এবং পুত্র সুশীল হরিদাসকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। শেষে অতসীও ক্রুদ্ধ হন যখন কম্পাউন্ডার আর মেয়ে মণিকে জড়িয়ে হরিদাস ইঙ্গিত করে। এর পরে, দেওঘরে যাওয়ার সময় অতসীবালা স্বামীর অযত্ন হবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু আশ্রমে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সেখানে বাবাজী আছেন, আছেন প্রিয় শিষ্য চিত্রাদাসী -স্ত্রীবেশে পুরুষ সাধক, আছেন ব্রজমা। অতসী ধর্মের জালে ধরা দিলেন, নিরামিষাশী হলেন। ওদিকে সুবোধবাবু ক্রুদ্ধ হলেন অতসীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে। তাঁর ধারণা হলো, স্ত্রীকে হরিদাসই ধর্মীয় হুজুগে মাতিয়েছে। যাই হোক, অতসী ফিরলেন সঙ্গে শ্মশ্রুগুম্ফত্যাগী হরিদাসকে নিয়ে। সংসারে তাঁর আহারের আলাদা ব্যবস্থা হলো।

সংসারে থেকে মালা জপলেও নিঃসঙ্গতা কাটে না অতসীর। ছেলেকে দলে টানার চেষ্টা করেন। সুবোধবাবু বিরক্ত হন। স্বামী-স্ত্রীতে দূরত্ব বেড়ে যায়। ছেলে সুশীলের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেলে অতসী হরিদাস আর ছেলেকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে এলেন। মেয়ের বিয়ের আগেই চলে এলেন। বৃন্দাবনে মানসিক স্বস্তি তিনি পান নি। কিন্তু ধর্মের মোহজালে তিনি মুগ্ধ। আর ছেলে সুশীল যুক্তি-নির্ভর ছিল, পড়াশোনাতেও ভালো ছিল। ডাক্তার হবার ইচ্ছে ছিল। বাবা ডাক্তার বলে বাবারও সেই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আশ্রমের প্রভাবে সে আই. এ পড়তে এলো। কিন্তু ছুটি হলেই সে আশ্রমে দৌড়োয়। ডাক্তার স্ত্রী-পুত্রের ওপর অধিকার হারিয়ে নিঃসঙ্গ হলেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মেয়ে বিধবা হয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে বাবার কাছে ফিরে এলো। বৃন্দাবনে মা ও ছেলে। বাড়িতে বাবা ও বিধবা মেয়ে। দুটি জগতের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। সুবোধ ডাক্তার বাইরের কর্মজগতে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু বিধবা মেয়ে মণি আর তার শিশুর মধ্যে তাঁর মনটা গুটিয়ে আসে।

শেষ পর্যন্ত আশ্রমজীবনের ফাঁকি ধরা পড়লো। রুগ্ণ অতসী বাড়ি ফিরলেন। এই পারিবারিক পুনর্মিলনে ছকটা পাল্টালো। কিন্তু নিঃসঙ্গতা বাড়লো বই কমলো না। অন্তত সুবোধবাবুর দিক থেকে মেয়ে এবং বিশেষ করে ছেলে তো মাকে নিয়েই ব্যস্ত। সঙ্গী শুধু নাতি, ডায়েরি লেখা, ভাবনাচিন্তা। অন্য দিকে শয্যাগত মা-কে নিয়ে ছেলে-মেয়েরাও ভাবে। সকলেই একটা অদ্ভুত ব্যবধানের মধ্যে নিজেকে নিয়ে ভাবে, অন্যের আচরণের ব্যাখ্যা খোঁজে। অন্তত সুশীল বুঝতে পারে, মা-র দুর্বলতা খানিকটা ডায়াবিটিসের মধ্যেই। কিন্তু সবটা নয়। আশ্রমের আদর্শ ছেড়ে সংসারে ফিরে আসার কুণ্ঠায় একটা আড়াল তৈরি করেছেন তিনি। খাওয়া-দাওয়ার বাড়াবাড়িতে অতসী নাতির কাছে বাতাসা চান। মেয়ে ছেলেকে সাবধান করে দেয়, দাদুর কাছে বলিস না। অতসীকে নিয়ে জটিলতা বাড়ে। বাড়ির চারজনেই পরস্পরের কাছ থেকে আড়ালে চলে যায়। স্বামী-স্ত্রী ছেলে মেয়ে স্নেহ-ভালোবাসার টান থাকলেও পরস্পরের কাছাকাছি যেতে পারে না।

এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি আনে অপ্রত্যাশিত এক চমক। যে হরিদাস বলে এসেছে স্ত্রী-পুত্রের বন্ধন তার নেই, পূর্ব পাকিস্তানে রেখে এসেছে—সেই স্ত্রী পুত্রের বন্ধন তার সত্যিই নেই। সবাই মারা গেছে। তার ভণ্ডামি ধরা পড়েছে। সুবোধ ডাক্তারের বাড়িতে তার প্রবেশ নিষেধ। শেষ পর্যন্ত বাড়ির সামনে যজ্ঞডুমুর গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে সে। এই গাছটি কাটা হবে কিনা এই নিয়ে কথা ওঠাতে এক সময়ে সুবোধবাবুর কথাতেই গাছটা কাটা হয় নি। সেই গাছটিতেই হরিদাস দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করলো।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় চারটি মানুষ যেন তাদের ভারসাম্যে ফিরে আসে। সন্ত্রস্ত চারটি মানুষ স্বামী-স্ত্রী ছেলে মেয়ে জটিলতার জট খোলার আশায় অপেক্ষা করছে। যারা পরস্পরের আড়ালে থেকে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলেছিল তারা হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে প্রাচীর ভেঙে চলে আসছে সংগতির প্রত্যাশায়।

[আট]

নিজের স্বার্থ, প্রতিপত্তি, মোহ, আদর্শ এবং অভিমানের আড়ালে আত্মসম্মান রক্ষায় কিংবা অশান্তির ভয়ে যে মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে মিলতে পারে না, বুঝতে পারে না, বোঝাতে পারে না, অপরের চোখে নিজেকে ভুল বোঝায়, নিজেও ভুল বোঝে, সেই রহস্যময় জটিল মানুষের মনের বিশ্লেষণই সতীনাথের লক্ষ্য। জাগরী, চিত্রগুপ্তের ফাইল, ঢোঁড়াই চরিত মানস, অচিন রাগিণী, সংকট, দিগভ্রান্ত—এই ছটি উপন্যাসই নানা আধারে জটিল অন্তর্লোক-উন্মোচনেরই কাহিনী। ঘটনার গুরুত্ব যাই থাক, ঘটনার পেছনে যে মন কখনো জাগরীর বাবার মতো অসহায় আদর্শবাদী, জাগরীর মায়ের মতো অভিমানী, বিদ্রোহী কিংবা সংস্কারভীরু, জাগরীর নীলুর মতো আক্রোশী ও ঈর্ষান্বিত কিংবা বিলুর মতো ফাঁসি রদ হওয়ার স্বপ্ন দেখে, শিউচন্দ্রিকার

মতো যে-সব ছকবাঁধা চিন্তার ব্যর্থতা বোঝে, ঢোঁড়াই-এর মতো বিদ্রোহের ব্যর্থতা বোঝে, নতুন দিদিমার মতো টান-ভালোবাসার অতৃপ্তি বোঝে, বিশ্বাসজীর মতো যুক্তি-সর্বস্বতার ব্যর্থতা বোঝে কিংবা অতসীবালার মতো যে-মন আদর্শের ফাঁকি থেকে মুক্তি নিয়ে সংসারে এসে আত্মসম্মানের প্রাচীর তৈরী করে, সেই মনই সতীনাথের লক্ষ্য। এই মনের ভাষা সতীনাথ প্রথম থেকে রপ্ত করেছিলেন। বিশেষ করে জাগরী-র মা-র আত্মকথা তো তুলনাহীন। অচিন রাগিণী পর্বে চিন্তাশীল মনের প্রকাশে স্মৃতি-অনুষঙ্গে ফুটকি (ডট) দিয়ে চিন্তন-চিহ্ন খুব বেশি মাত্রায় ব্যবহার করেছিলেন তিনি। পরে 'সংকট' এবং 'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসে তারও দরকার হয় নি। মানসিক বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলি প্রকাশে আলাদা চিহ্নের প্রয়োজন আর তিনি বোধ করেন নি। বিশ্লেষণের স্বাভাবিক দক্ষতায় মনের গভীরতম জায়গাগুলি স্পর্শ করতে পেরেছেন। 'সংকটে'র বিশ্বাসজী আত্মচিন্তায় 'ক্ষণাভিসার' শব্দটি খুঁজে পেয়েছিলেন। সতীনাথের উপন্যাসের চরিত্রেরা এই ক্ষণাভিসারেই তাদের মনের সুপ্ত তন্ত্রীকে ঘা দিয়ে এক একটি নিঃশব্দের জগৎকে টেনে বার করে এনেছে। অত্যন্ত সংযত ভঙ্গীতে তিনি চরিত্রের বাইরের আড়াল সরিয়ে তার ভেতরকার আপন কান্নাকে টেনে আনতে পেরেছেন। জীবনের সংকট মুহূর্তগুলির অন্তর্নাটককে ফুটিয়ে তোলবার যে সচেতন ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে শুরু হয়েছিল সতীনাথের মননশীলতায় তারই সমৃদ্ধি দেখি। সচেতনভাবে প্রুস্তীয় ভঙ্গিতে নিজের বিচার-বুদ্ধি মতো প্রয়োগ করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে। তারপর সতীনাথই দ্বিতীয় ঔপন্যাসিক যিনি এই চৈতন্যের প্রবাহকে দক্ষতার সঙ্গে উপন্যাসে নিয়ে এলেন। মাঝখানে গোপাল হালদারের 'একদা' 'অন্যদিন' ও 'আর এক দিনের' (শেষ দুটি উপন্যাস জাগরী-র পরে লেখা) বিত্তশীলতার ভাষা আরোপের চাপে একটু অগভীর মনে হয়। চেতনাপ্রবাহের ভাষায় ধূর্জটিপ্রসাদের অতিরিক্ত বিচারশীলতা এবং গোপাল হালদারের অতিরিক্ত রোম্যাণ্টিক ভাবালুতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনতে পেরেছিলেন সতীনাথ। তাই বিচার ও অনুভূতির মিশ্রণে তাঁর উপন্যাসের পাঠ্যগুণ এই দুই ঔপন্যাসিকের তুলনায় বেশি বলেই মনে হয়। তার ওপর অন্তর্দর্শনের ফলে ভুল বোঝা এবং না-বোঝার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত, স্তম্ভিত, প্রতিহত মানুষের যে ছবিগুলি সতীনাথের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তা বাঙলা উপন্যাসের চরিত্র-গ্যালারিতে নতুন-দেখা কিছু মুখের সারিও বটে।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

প্রবোধকুমার সান্যাল : শিল্পিব্যক্তিত্বে বৈশিষ্ট্য

কোন ঔপন্যাসিকের রচনা বৈশিষ্ট্য নিরূপণের শেষ লক্ষ্য তাঁর শিল্পসত্তার স্বরূপ-অন্বেষণ। প্রবোধকুমার সান্যালের ক্ষেত্রে এই অন্বেষণের পথটি নিতান্ত সুগম ও সহজ নয়। এর একটা বড় কারণ, তাঁর ব্যক্তিত্বের নানামুখী প্রবণতার মধ্যে এক ধরণের আপাত বিরোধ।

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রবোধকুমারের আবির্ভাব ঔপন্যাসিক রূপে নয়, ছোটগল্পকার রূপে। মাত্র ষোলো বছর বয়সে কল্লোলের পৃষ্ঠায় (মাঘ ১৩৩০) আত্মপ্রকাশ করলেন একটি ছোট গল্প নিয়ে। সেই থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে অক্লান্ত লিখে গেছেন আমৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আনুমানিক একশ। এই বিপুলায়ত রচনাসম্ভারের মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-চেতনার নানামুখী প্রবণতা স্বভাবিক ভাবেই চোখে পড়ে। প্রবোধকুমার সারাজীবনে যা কিছু লিখেছেন, তার বেশির ভাগই গল্প-উপন্যাস, কিন্তু তবু অনেকের চোখে তার প্রতিষ্ঠা ঔপন্যাসিক রূপে নয়, বরং মুখ্যত বিচিত্রস্বাদী ভ্রমণ সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে। উদাসীন যাযাবর জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির এক অপরূপ কথাকোবিদ্ তিনি। এ ছাড়াও দেখতে পাই, কখনও তিনি হতশ্রী বাস্তব জীবনের রূপকার, কখনও বা ব্যঙ্গ নিপুণ সমাজদ্রোহী, কখনও বা স্বপ্নদর্শী রোম্যান্টিক, আবার সবশেষে হয়তো বা এক নিগূঢ় অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু সত্তা।

ব্যক্তিত্বের এই জটিল রেখাজালের মধ্য থেকে প্রবোধকুমারের শিল্পিসত্তার সামগ্রিক রূপটি চিনে নেবার তাহলে উপায় কী ? নিশ্চিত ভাবে কোন কিছু হয়ত আলোচনার এই স্তরে বলা সম্ভব নয়, তবে এটুকু অবশ্যই বলা চলে যে, প্রবোধকুমারের সৃজনীপ্রতিভাকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে তাঁকে তাঁর দেশ, কাল এবং ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভবের প্রেক্ষাপটে রেখেই বিচার করতে হবে। কোন সাহিত্য স্রষ্টার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবশ্য দেশ-কাল ও ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গ নতুন কিছু নয়। কিন্তু প্রবোধকুমারের শিল্পিসত্তা গঠনে এই সব প্রসঙ্গের তাৎপর্য বা মূল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচনার ভেতরে প্রবেশ করলেই এর কারণ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

। দুই

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন কল্লোলগোষ্ঠীর আরও অনেক লেখকের মতই প্রবোধকুমারও নিতান্ত বালক। ক্রমশ সেই স্ফুটনোন্মুখ স্পর্শকাতর কিশোর হৃদয়ের ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সমস্ত অভিঘাত এসে পড়ল। এই পর্বের অন্তর্লীন অনিকেত যাযাবর জীবনবোধ ভেতরে ভেতরে টান দিল কিশোর চিত্তের শিকড় ধরে। একদিকে হতাশা সংশয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়জনিত যন্ত্রণা তরুণ মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলে,অন্যদিকে আবার সেই কালের অন্তর্নিহিত দুর্মর রোম্যান্টিক প্রেরণা

পুরনো জীর্ণ সব কিছু ভেঙে নতুন সৃষ্টির জাল বুনে চলল প্রাণচঞ্চল যৌবনকে ঘিরে। বাংলা ১৩৩০ সালে 'কল্লোল'-এর আবির্ভাব হয়েছিল এই সব নানামুখী জটিল চেতনা ও মননের অনিবার্য টানে। সেই 'কল্লোল'-এর চারপাশে একে একে যেসব তরুণ লেখক এসে মিলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সেদিন প্রবোধকুমারও ছিলেন।

আগেই বলেছি, কল্লোলে তাঁর প্রথম রচনা 'মার্জনা' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু শুধু এই বহিরঙ্গ কারণেই নয়, কল্লোলের সঙ্গে প্রবোধকুমারের যোগ ছিল শিল্পিসত্তার গূঢ় প্রবণতার দিক থেকেও। অচিন্ত্যকুমার লিখেছিলেন, "তারুণ্য থেকেই কল্লোলের আবির্ভাব।" – বস্তুত এই 'তারুণ্যের' চেতনাই ছিল কল্লোলর অন্যতম মূল প্রেরণা। আর এই চেতনাই প্রবোধকুমারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগসাধন করেছিল কল্লোলের।

কল্লোল-পর্বের এই যৌবন-চেতনা কালধর্মের প্রভাবে এক বিশেষ প্রবণতা লাভ করেছিল। সেই যুগের অর্থনৈতিক সংকট ও প্রত্যয়ভঙ্গের বেদনার আঘাতে সেই যৌবন-স্বপ্ন বিহ্বল ক্লান্ত আবার তারই মধ্যে দেখি নতুন আদর্শ ও আশায় উজ্জীবিত যুবচিত্ত সংগ্রাম ও বিদ্রোহের জন্যও যেন প্রস্তুত। সব মিলিয়ে বলা চলে, কল্লোল-পর্ব যৌবনের বহু বিচিত্র সুরে অনুরণিত। আর সেই যৌবন-চেতনাকে—যৌবনের স্বপ্ন-উল্লাস, হতাশা-যন্ত্রণাকে সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব ও প্রকাশ করেছিলেন সেদিনের তরুণ লেখক প্রবোধকুমার। বলা যেতে পারে, কল্লোলেব যৌবনধমের মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি। এর একটি বড় কারণ, প্রবোধকুমারের অমিত প্রাণবেগ। যৌবনচেতনার মূলে থাকে এই স্বতঃস্ফূর্ত দুর্বার প্রাণশক্তি। প্রবোধকুমারের সমগ্র ব্যক্তিত্ব সেই প্রাণ-শক্তিরই অঙ্গপ্রত্যয় উজ্জ্বল।

প্রবোধকুমারের সমকালীন কল্লোল-পন্থীদের অনেকেরই শিল্পসত্তা এই যৌবন-চেতনায় প্রাণিত সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই চেতনার সুষ্ঠু পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি তাঁদের রচনায়। এর মূলে আছে, এঁদের নাগরিক সফিস্টিকেশন ও সচেতন বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। প্রবোধকুমারের উপন্যাসে-গল্পেও এই সচেতন বাগ্‌শৈলী ও নাগরিক প্রবণতা চোখে পড়ে। তবু সেসব তাঁর শিল্পসত্তার মোল বৈশিষ্ট্য নয়। ঋজু বলিষ্ঠ প্রাণধর্ম ও যৌবনচেতনা তাঁর সত্তার দুকূল ছাপিয়ে গিয়েছে যেন। প্রাণধর্মের উত্তাল ঢেউয়ে নাগরিক প্রবণতা ও নিপুণ বাগ্‌ভঙ্গি সব ভেসে গেছে।

নাগরিক বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও প্রবোধকুমারেব ব্যক্তিত্বে যে অমেয় যৌবনবেগ, তার মূলে আছে বাঁধন-ছেঁড়া ভবঘুরে এক পথিকমন। এই বোহেমীয় যাযাবর ধর্ম প্রবোধকুমারের সমকালীন জীবন ও সাহিত্যের মর্মচেতনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজেব হতাশা, সংশয় ও মূল্যবোধের ভাঙচুরের ভিতর দিয়ে ক্রমশ এক বেপরোয়া জীবনবোধ মাথা তুলছিল। এই কালপর্বে যুবমন যখন কোন স্থির মূল্যবোধের সন্ধান পাচ্ছেনা, এক ধরণের অনিকেত 'রুটলেস্‌নেসে'র যন্ত্রণায় যখন তা' অতি বিহ্বল, তখনই এই অস্থিরতার ভিতর থেকে জন্ম নিল এক ধরণের রোম্যান্টিক বোহেমীয় যাযাবরবৃত্তি। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে গোকুল নাগের 'পথিক', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'বেদে', উপন্যাসে এই প্রবণতার ছবি আছে। তবে গোকুল নাগ বা অচিন্ত্যকুমার যাযাবর-চেতনার কাহিনী লিখলেও এঁদের নিহিত সত্তায় যথার্থ বোহেমীয়

যাযাবর-প্রবণতা নেই। কিন্তু প্রবোধকুমারের সমগ্র সত্তা জুড়ে এলোমেলো পথ-চলার নেশা। আবাল্য তিনি পথিক। পাঁচ বছরের বালক লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন পথে পথে। বালক ক্রমে যৌবনে পা দিয়েছে। কিন্তু দূরের প্রতি আকর্ষণ কমেনি। কখনো হয়তো পথ ছেড়ে ঘরে ফিরেছে, কিন্তু পথের নেশা তাকে স্থির হয়ে বসতে দেয় নি, দূরের আকাশ, দুর্গম তীর্থপথ আর দুরারোহ পর্বতচূড়া তাকে বিহ্বল তৃষ্ণার্ত করে তুলেছে।

প্রবোধকুমারের যাযাবর মনকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল হিমালয়। দূর দুর্গম হিমালয়ের গুহাহিত রহস্য তার জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র অভিযাত্রীর মন যে প্রবল রোম্যাণ্টিক তৃষ্ণা ও অস্থিরতায় সেদিন আলোড়িত হয়েছিল, তারই মধ্যে ঔপন্যাসিক-গল্পকার প্রবোধকুমারের অন্তর্গূঢ় সত্তার যথার্থ প্রতিফলন।

প্রবোধকুমারের নিজের কথায় :

"মনে পড়ে সেদিন চিত্তলোকে একটা প্রবল আলোড়ন ছিল। কিছু আমার চাই, কিন্তু তার সত্য স্বরূপ আমার জানা নেই। একথা জানতুম সে প্রশ্ন উঠে দাঁড়ায় অস্তিত্বের মূল কেন্দ্র থেকে।" [কথাসাহিত্য : বৈশাখ ১৩৫৯]

বস্তুত প্রবোধকুমারের ব্যক্তিত্বের গভীরে ছিল যাযাবরের নেশা। কিন্তু আগেই বলেছি, তার চেতনায় যে বোহেমীয় ভবঘুরের দেখা পাই, সমকালীন লেখকদের মধ্যেও এই 'নেশা' ছড়িয়ে পড়েছিল অল্পবিস্তর। অর্থাৎ 'কল্লোলে'র চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল পথচলার সুর। শুধু তাই নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কণ্টিনেণ্টাল বিশেষত স্ক্যান্ডিনেভীয় সাহিত্যের একটা মুখ্য সুর এই বোহেমীয় যাযাবর জীবনের। বস্তুত সেই বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শই কল্লোলপর্বের তরুণ চিত্তে ভবঘুরে জীবনের নেশাকে গাঢ়তর করে তুলেছিল। স্ক্যান্ডিনেভীয় লেখক হামসুন আর বোয়ারের উপন্যাসের সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদগুলি 'কল্লোলের' অন্যান্য অনেক লেখকের মত প্রবোধকুমারের তরুণ চিত্তকেও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বলেছেন,

"ওই সময়ে কী আনন্দ জোগাতো মহাদেশী সাহিত্য। বড় অনুরক্ত ছিলাম স্ক্যান্ডিনেভীয়ার দুজন লেখকের —নুট হামসুন আর যোহান বোয়ারের।" শুধু তাই নয়, এঁদের লেখা প্রবোধকুমারের পথ-চলা মনকে এতদূর অভিভূত করেছিল যে শেষ পর্যন্ত তিনি বোয়ারের একটি উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ (The prisoner who sang) থেকে বাংলায় অনুবাদ করলেন : 'বন্দী বিহঙ্গ'। মনে রাখতে হবে, এই উপন্যাসের নায়কও এক ভবঘুরে 'বহুরূপী জীবনসন্ধানী মানুষ। প্রসঙ্গত বলি, বোয়ারের এই গ্রন্থের বহুরূপী নায়কের কথা অনিবার্য ভাবে মনে পড়ে প্রবোধকুমারের 'আঁকা-বাঁকা', 'হাসবানু' পড়তে গিয়ে।

এই ভাবেই গড়ে উঠেছিল প্রবোধকুমারের বোহেমীয় যাযাবর মন। একদিকে সমকালীন জীবনের মূল্যবোধের অনিকেত রূপ এবং দেশি বিদেশি সাহিত্যে বোহেমীয় জীবন-চেতনা, অন্যদিকে আপন চিত্তের সহজাত তীব্র প্রবণতা। সব মিলিয়ে প্রবোধকুমারের শিল্পব্যক্তিত্ব এই চেতনার অন্তর্গূঢ় প্রবল স্রোতের টানে চঞ্চল সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বার বার।

প্রবোধকুমারের সমগ্র শিল্পিসত্তার মূলে রয়েছে এই যাযাবর মনের দৃষ্টি। তাঁর পথ চলার বিচিত্র কাহিনী কেবল কয়েকখানি রসমধুর ভ্রমণ কথার মধ্যেই সীমিত নয়, বলা যেতে পারে, তাঁর প্রায় সমস্ত রচনা - প্রায় সব উপন্যাস, গল্প ও স্মৃতিকথা এই পথিকমনের নানান্ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিরই বিচিত্র রসরূপ। বস্তুত তাঁর এরকম উপন্যাস কমই আছে যেখানে ভবঘুরে বা ভ্রাম্যমান জীবনেরছবি একেবারে অনুপস্থিত। তাঁর নায়ক নায়িকাদের অনেকেই ভবঘুরের মত ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে, যাযাবর জীবনের উদ্ভ্রান্ত সুর তাদের রক্তেরগভীরে যৌবনের উদ্দাম নেশা জাগিয়ে তুলেছে।

প্রবোধকুমারের মনের এই প্রাণচঞ্চল যাযাবর ধর্মের নিদর্শন কেবল তার বিষয় বা চরিত্র সৃষ্টিতেই মেলে তাই নয়, এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার রচনাশৈলীতে। তাঁর উপন্যাসের গঠন ও ভাষা বিন্যাসে 'স্বভাব শিল্পী'র যে অনায়াস-প্রাঞ্জলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত বেগে চোখে পড়ে তা বস্তুত লেখকের অন্তর্লীন জঙ্গম পথিক সত্তারই প্রক্ষেপ। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও সচেতন নৈপুণ্য সত্বেও ভাষাশিল্পে এই প্রবল প্রাণ-ধর্মের জন্যই তাঁর সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর যে অভিধা'—'Nature's own prose writer' সেটিকে নিছক অত্যুক্তি মনে হয়না।

[তিন]

প্রবোধকুমারের ভবঘুরে জীবনের নেপথ্যে একদিকে যেমন এক ধরণের বোহেমিয়ান রোম্যান্টিক যৌবনবেগ ছিল, অন্যদিকে তেমনি এই অকারণ এলোমেলো পথ-চলার মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনকে খুব কাছ থেকে স্পষ্ট করে নানান্ দুঃখ বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে চিনবার জানবার অজস্র সুযোগও হয়েছিল প্রবোধকুমারের। বিভিন্ন দেশে বিচিত্র মানুষের ভিড়ে তিনি পথিকের মন নিয়ে ঘুরেছেন, মিলেছেন মানুষের প্রতিদিনের সুখ দুঃখের সঙ্গে। সমগ্র ভারতভূমি বার বার পরিক্রমা করেছেন প্রবোধকুমার। শহরে গ্রামে অরণ্যে পর্বতে প্রাচীন তীর্থের পথে পথে যেখানেই গেছেন এই যাযাবর পথিক - সর্বত্রই মানুষ, মানুষের জীবনের অন্তর্গত পিপাসা যন্ত্রণা বিকৃতি ও বিচিত্র রহস্য তাঁকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছে। জীবনের প্রতি এই দুর্মর আকর্ষণই ভ্রাম্যমান প্রবোধকুমারের জীবনে এনে দিয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিচিত্র বর্ণ উপকরণ। আর বাস্তব জীবনের সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিই ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে ঔপন্যাসিক-গল্পকার প্রবোধকুমারকে। বস্তুত চির-পথিক প্রবোধকুমারকে যতই রোম্যান্টিক উদাসীন বলে মনে হ'ক না কেন, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম মুখ্য প্রেরণা কিন্তু জীবনের বাস্তবতা। স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ

"নিছক আর্টের আনন্দ বিতরণ করবো, ফুল, চাঁদ, লতা, মৌমাছি আর বিরহ মিলন নিয়ে কাহিনী ফাঁদবো—এ আমি কোন কালেই ভাবতে পারিনি। আমি ভাবতুম মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধারা যে লেখায় ছোটে নি, তাকে কিছুতেই সাহিত্য সৃষ্টি বলা চলবে না! আমি সেজন্য পথে-ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি —স্টিমার ঘাটে, চটকলের ধারে, রেল স্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফস্বলের ওয়েটিং রুমে, তীর্থপথের মেলায়—আমি গল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে পেতুম।"

ঔপন্যাসিক প্রবোধকুমারের শিল্প-ব্যক্তিত্বের সমীক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর ভবঘুরে পথিকসত্তার স্বরূপ নির্ণয় যেমন অপরিহার্য, তেমনি অবশ্য প্রয়োজন তাঁর বাস্তবতাবোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার। ওপরের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে গল্প উপন্যাসকে মনগড়া কল্পনা দিয়ে তিনি রচনা করতে চান নি। অভিজাত সুখী সম্পন্ন মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনের প্রতি তরুণ প্রবোধকুমারের কোন আকর্ষণ ছিল না। বাইরের ভঙ্গুর হতশ্রী রূপের প্রাণের অমিত প্রাচুর্যে, অনন্ত হৃদয়ানুভূতির ঐশ্বর্যে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় অথচ অন্তরালে জীবন যেখানে পাবে না, দুঃখ দারিদ্র ও প্রতিকূল সামাজিক প্রতিবেশের কঠিন পাষাণের আঘাতে রক্তাক্ত হয় --বাস্তব জীবনের সেই বিস্ময় ও বেদনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন সেদিনের এই তরুণ কথাশিল্পী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 'যত দূরে যাই' গ্রন্থের শেষাংশে প্রবোধকুমার গ্রাম-বাংলার মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার এক চিত্তস্পর্শী ছবি বলিষ্ঠ রেখায় এঁকে গেছেন। এই জীবনগত অভিজ্ঞতার উপকরণ লেখক একদিকে যেমন খুঁজে পেয়েছেন পথে-ঘাটে চলতে চলতে, অন্যদিকে পেয়েছেন তেমন নিজের জীবনের দুঃখ দারিদ্র ও নিত্য পরিবর্তমান জীবিকার নানান বৈচিত্র্যের মধ্যে। প্রবোধকুমারের শৈশব-কৈশোরের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি-ভরা দিনগুলির আশ্চর্য সজীব ছবি আছে 'তুচ্ছ', 'যত দূরে যাই' ইত্যাদি গ্রন্থে। সেদিনের সেই সজাগ সংবেদনশীল কৈশোর-চেতনার ওপর ছোটবেলার মামার বাড়ির নানান রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রভাব প্রবোধকুমারের শিল্পিজীবনে ব্যর্থ হয় নি। এইসব 'তুচ্ছ' ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যের আলোয় প্রবোধকুমারের শিল্পিমনের বাস্তব জীবন-পরিক্রমা শুরু হয়েছে। সেই পরিক্রমার পথে মূল্যবান পাথেয় জুগিয়েছে তাঁর বিচিত্র জীবিকা। তাঁর জন্ম-রোম্যান্টিক যাযাবর মন কখনো কোন বিশেষ জীবিকাকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে নি। জীবনের নানা পর্বে নানা রূপে তাঁকে দেখা গেছে—প্রাইভেট টিউটর, ডাকঘরের সামান্য চাকুরে, বর্দ্ধমান কম্যাণ্ডের সেনাবাহিনীর নগণ্য কেরাণী, ছাপাখানার ম্যানেজার, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, লবণ হ্রদের মাছের কারবারী। আর সর্বোপরি ছিন্নবাধা যাযাবর। এই নানা ধরণের জীবিকা তাঁকে খুব কাছে থেকে জীবনকে দেখার সুযোগ এনে দিয়েছে। কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতার পাত্র তাঁর জীবনে বারবার উপছে পড়েছে। তিনি লিখেছেন :

"আমি লিখতুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রি, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে এইসব চরিত্র নিয়ে। কারণ তাদের জীবনযাত্রাটা চোখে দেখতুম। তাদের নিয়ে গল্পের ইন্দ্রজাল সহজেই বুনতে পারতুম। কোথাও অনাচার ঘটলো, কেউ বিনা রোগে মারা গেলো, কেউ অহেতুক অপমানে নুয়ে পড়লো —অমনি আমার গল্প লেখা সুরু।"

নিজের কথাসাহিত্যিক জীবনের উৎস-নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রবোধকুমারের এই স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। 'মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধারা' উপন্যাস-গল্পের মধ্য দিয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছেন তিনি। জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন বলিষ্ঠ মন নিয়ে।

অবশ্য একেবারে গোড়াতেই যে উপন্যাস লিখলেন, সেই 'যাযাবর' এই রূঢ় কঠিন বাস্তবতার বদলে ভবঘুরে পথিকচিত্তের রোম্যান্টিক কাব্যময় দৃষ্টির পরিচয় আছে।

হতশ্রী ভঙ্গুর জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, দুঃখ-দারিদ্রে জীর্ণ জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু সেই জীবনের কাহিনী যখন বলেছেন, তখন তার মধ্যেও মাঝে মাঝে শোনা গেছে পথ-চলা উদাসী বাউলের সুর। কিন্তু তিনি তাঁর সমকালীন কল্লোলপন্থী অচিন্ত্যকুমার-বুদ্ধদেবের কাব্যময়তার অতিরেক থেকে অনেকাংশে মুক্ত। জীবনের সঙ্গে তার নির্মম দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে তাঁর পরিচয় অনেক বাস্তব।

বিশেষ ভাবে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের নানা বাস্তব সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রথম পর্বের বিভিন্ন উপন্যাসে —'কলরব', 'প্রমীলার সংসার' ও 'নবীন যুবক'-এ। সাধারণ মানুষের দারিদ্রের যন্ত্রণা ও গ্লানি, পারিবারিক ও সামাজিক পীড়ন—অনাচারের বিচিত্র সমস্যা-দীর্ণ রূপ তাঁর কলমের আঁচড়ে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে ওইসব রচনায়। 'কলরব' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে ঃ

"একটা বাড়ীতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত।" আর্থিক অসংগতির পটভূমিতে মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মমর্যাদা রক্ষার কঠিন প্রশ্নটি এখানে জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। সামাজিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের কঠিন আঘাতে দামিনী, শংকর, রীণার মত বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র রূপ ফুটেছে এই উপন্যাসটিতে। রবীন্দ্রনাথ তরুণ প্রবোধকুমারের এই অন্তর চেতনার বিশেষ প্রশংসা করে লিখেছিলেন, "·এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভীড়; কোনটাই মনে হয়না বেঠিক। এতগুলো মেয়ে-পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের।" [পরিচয় —বৈশাখ, ১৩৪০]

শহর —কলকাতা ও শহরতলীর নিম্নবিত্ত জীবনের সর্বাত্মক ভাঙনের নানান্ ছবি ছড়িয়ে আছে প্রবোধকুমারের সারা জীবনের বিভিন্ন রচনায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কিংবা যুদ্ধোত্তর পর্বের কোন কোন মর্মস্পর্শী গল্পের কথা যেমন, 'অঙ্গার', 'ক্ষয়', 'কল্পান্ত' ইত্যাদি। এই একই কালপর্বের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে 'বনহংসী' উপন্যাসের কাহিনী। উপন্যাসটির শেষ পরিণতি সম্পর্কে পাঠক-মনে দ্বিধা-সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের যে-ছবি লেখক এখানে এঁকেছেন, তা নিঃসন্দেহে বাস্তবনিষ্ঠ। এই উপন্যাসে অতনুকে লক্ষ্য করে দ্বিজেন এক জায়গায় যা' বলেছে, তার মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসের প্রেক্ষা-পটের করুণ তিক্ত বাস্তবতা পাঠকের মনে এক মুহূর্তে সজীব হয়ে উঠেছে ঃ

"তুমি ত যুদ্ধে গিয়েছিলে, আমাদের খবর রেখেছিলে কিছু? বোমা পড়বার ভয়ে আমরা কোথায় গিয়েছিলুম, দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের কেমন ক'রে চললো, কন্ট্রোলের চাল ধরতুম কেমন করে, কাপড়ের জন্য ছুটতুম কোথায়, কয়লা আনতুম কোন্ কায়দায়, বছরের পর বছর কী অশান্তিতে কেটেছে, রেশন পাবার জন্য কী মারামারি—এসব জেনেছ কখনো? আমি কি একা? হাজার হাজার ছেলে কিরকম খারাপ হয়ে গেছে জানো? লেখাপড়া? এক মুঠো ভাত আর একখানা কাপড়ের জন্যে দিনরাত এখানে-ওখানে হানাহানি আর দাঙ্গা। তুমি খবর রেখেছিলে কিছু?"

[চার]

দুঃখ-দারিদ্রে জীর্ণ ভঙ্গুর জীবনের ছবি যেমন প্রশংসনীয় বাস্তবতায় এঁকেছেন প্রবোধকুমার, তেমনি একথাও সত্য যে, তাঁর রচনা কেবল চিত্রধর্মী নয়। তার মধ্যে ব্যর্থ হতভাগ্য মানুষের প্রতি গভীর মমতা ও ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আছে। এই হৃদয়ধর্মের ঐশ্বর্যের দিক থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। 'নবীন যুবক' উপন্যাসে গণপতির পরিবারের নিদারুণ দারিদ্রের জ্বালায় তার শিক্ষিত বেকার ভাইয়ের আত্মহননের দুঃসহ বেদনা, ভগবতী ও হেমন্তের মত বঞ্চিতা নারীর অন্তরের তীব্র আর্তি লেখকের গভীর সমবেদনার স্পর্শে পাঠকচিত্তকে বিহ্বল করে তোলে।

কিন্তু মনে রাখতে হ'বে, প্রবোধকুমার নিছক কোমলপ্রাণ সংবেদনশীল ন'ন। তিনি কল্লোলের যৌবনচেতনায় উদ্দীপ্ত এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাই হতভাগ্য নরনারীর বেদনায় তিনি অশ্রুপাত করেন না, বরং তাদের উদ্বোজিত করে তোলেন প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদের চেতনায়। 'নবীন যুবক' উপন্যাসে প্রচলিত নির্মম সমাজব্যবস্থা ও প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নায়কের চোখে ভাসে নতুন আদর্শ সমাজের স্বপ্ন। যৌবন-দৃপ্ত প্রবোধকুমার সৃষ্ট নায়কের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রতিবাদের বলিষ্ঠ প্রবণতা। 'নবীন যুবকে'র সোমনাথ অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছে। আর এই আদর্শের প্রেরণায় সে উপেক্ষা করেছে নিজের আর্থিক সচ্ছলতা, বিষয়-সম্পদ্ সবকিছু।

প্রবোধকুমারের উপন্যাসে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও মূল্যচেতনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিন্নতর এক ছবি ফুটেছে 'দুই আর দুয়ে চার' উপন্যাসে। সে ছবি সমাজ ও পরিবারকে উপেক্ষা ক'রে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছবি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনেক সময় ফেটে পড়তে চায় বিদ্রোহের আগ্নেয় রূপে। এই উপন্যাসে সেই বিদ্রোহ রূপ নিয়েছে মুখ্যত যৌন অনাচারকে আশ্রয় ক'রে। 'প্রেমকে অস্বীকার করে লালসা-লোল প্রবৃত্তিকেই বড় করে' দেখেছে উপন্যাসের নায়ক রমাপতি। কিন্তু এ ধরণের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ছবি তাঁর উপন্যাসে থাকলেও প্রবোধকুমার নিজে এই জীবনচর্যায় আস্থাশীল ন'ন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রবোধকুমার নরনারীর যৌন সম্পর্কের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সেই দৃষ্টিতে একালের প্রগতিবাদী তরুণের চোখে নারী 'প্রিয়া' নয়, 'প্রিয়বান্ধবী'। প্রবোধকুমারের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের প্রেমের সম্পর্কে যৌনতা ও আবেগের আতিশয্য নেই, তার বদলে এক ধরণের নিরুচ্ছ্বাস বন্ধুত্বের 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'তে তিনি একালের তরুণ-তরুণীকে বাঁধতে চেয়েছেন। সমালোচক-প্রবর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : "লেখক। প্রেম হইতে যৌন ও আবেগমূলক এই উভয়বিধ উপাদান বর্জন করিয়া তাহাকে বন্ধুত্বের উত্তেজনাহীন শান্ত-স্নিগ্ধ পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন।" [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ৪৭৭ পৃ. (৪র্থ সং)] নরনারীর এই নিরুচ্ছ্বাস বন্ধুত্বের প্রকাশ দেখেছি 'প্রিয়বান্ধবী'-র বাউণ্ডুলে যুবক জহর আর স্বামী-পরিত্যক্তা সুখলতা ওরফে শ্রীমতীর মধ্যে। 'আঁকাবাঁকা'-য় উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণী কঙ্কর ও

মীনাক্ষীর জীবনাচরণের মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন চোখে পড়ে। কঙ্কর-মীনাক্ষী দুজনে একসঙ্গে উদ্দেশ্যহীন ভাবে নিরন্তর পথ চলে ভবঘুরের মত। তবু তাদের মধ্যে দেহ-কামনা কিংবা রোমান্টিক উচ্ছ্বসিত প্রেমের প্রকাশ ঘটেনি। নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এধরণের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির উৎসমূলে প্রবোধকুমারের নিজস্ব পথিক-বৃত্ত যাযাবর মনের প্রভাব যে সক্রিয় থেকেছে, তাতে সন্দেহ নেই। জীবনের বহু বিচিত্র পথে চলতে চলতে একালের তরুণ-তরুণী পরস্পরের কাছে আসে। এর ফলে তাদেব চেতনায় হয়ত রং লাগে, সুর জাগে। কিন্তু তবু তাদের পথচলার শেষ নেই। নীড়ের সংকীর্ণ বৃত্তে তাদের জীবন সীমিত হয় না। তারা চির-পথিক। নরনারীব এই বিচিত্র সম্পর্কের ভাবনা যে প্রবোধকুমারের শিল্পিসত্তার সঙ্গে কত অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে, তার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর সারা জীবনের অসংখ্য গল্প উপন্যাস। কেবল প্রথম দিকের রচনাতেই নয়, পরিণত বয়সেব নানা উপন্যাসেও যেমন 'হাসুবানু', 'বনহংসী', 'উত্তরকাল', 'পুষ্পধনু', 'ইস্পাতের ফলা' ইত্যাদিতেও প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এই ধরণের বিদ্রোহী মনোভাবের ধারা অব্যাহত রয়েছে। বস্তুত প্রবোধকুমারের এই মনোভঙ্গির মূলে আছে বিশেষ ভাবে নারী সম্পর্কে তাঁর প্রথাবিরোধী দৃষ্টি। 'জলকল্লোল' গ্রন্থের পুরোটাই লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ কিনা জানিনে। এ বইয়ে কয়েকটি নারীর যে ছবি আছে, তা যদি আংশিকভাবেও তথ্য নির্ভর হয়, তাহলে নারী সম্পর্কে প্রবোধকুমারের 'মৌলিক' ও 'বিপ্লবী' মনোভাবেব কিছুটা ব্যক্তিগত বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। 'জলকল্লোল'-এ গিরিবালা ও সাধু নামে যে দু'টি মেয়ের কথা আছে, তারা প্রবোধকুমারের বিক্ষুব্ধ 'বিদ্রোহিনী' নারীত্বের বিদ্রোহস্বরূপ। সাধু-র যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তা মূলত তাঁর সমস্ত 'বিদ্রোহিনী' নারী সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

বস্তুত নারী-পুরুষ সম্পর্কে প্রবোধকুমারের ধারণার অনেকটাই কিন্তু গড়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব দেশ-কালের আলো-হাওয়াব সংস্পর্শে। তিনি সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে, সেই অসহযোগ আন্দোলন ও 'কল্লোল'-এর আগ্নেয় দিনগুলির স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন :

"ছেলেরা বেকার, মুক্তি-পিপাসু, অসন্তুষ্ট—প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাইছে তারা বিপ্লব এবং মেয়েদের মনেও তাই। তারা চলতি সমাজ শৃঙ্খলার শাসন আর চায়না, গৃহধর্মে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই বলে বিক্ষুব্ধ, তারা আলো-বাতাসের মাঝখানে আসতে চায়। মেয়েরা ও পুরুষ অপেক্ষা অনেক কঠিন, পুরুষ অপেক্ষা তারা গতিবাদিনী।" [অমৃত, ৫ কার্তিক, ১৩৭২]

ছেলেদের এই 'বিপ্লব'ও বিদ্রোহ-চেতনা এবং 'বিক্ষুব্ধ' ও 'গতিবাদিনী' মেয়েদের মনোভাবের মধ্যে প্রবোধকুমার কেবল রোম্যান্টিক বোহেমীয় স্বপ্নবিলাসের সন্ধান পা'ন নি, একধরণের আদর্শবাদের আভাসও লক্ষ্য করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস রচনার পিছনে সর্বদাই আদর্শচেতনার এই প্রেরণা বর্তমান ছিল। প্রসঙ্গত তাঁর স্বীকারোক্তি উল্লেখযোগ্য :

"একটা আদর্শ, একটা ব্যঞ্জনা, একটা কোন দুরূহ ভাবনার পথ—এ যদি সব গল্পের মধ্যে না থাকে তবে গল্প লিখে লাভ কি?" [গল্প লেখার গল্প] প্রবোধকুমারের অধিকাংশ উপন্যাসে নরনারীর গভীর মনোবিশ্লেষণের চেয়ে স্ফুটতর

হয়েছে মুখ্যচরিত্রগুলির অনিঃশেষ প্রাণধর্ম ও আদর্শের বোধ। প্রথম যুগের উপন্যাস 'নবীন যুবক'-এর নায়কের স্বপ্ন-কল্পনার মধ্য দিয়ে লেখকের এই প্রবণতার নিশ্চিত সাক্ষ্য মেলে :

"সবাই মিলে দল বাঁধব,·· আদর্শ সমাজ গড়ব। আদর্শ সমাজটা কি ? এই ধরো মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ। শিক্ষায়, জ্ঞানে, সভ্যতায়, চিন্তাধারায় সবাই পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু। সম্পত্তির সবাই সমান অংশীদার, সবাই সম-অবস্থাপন্ন।"

প্রবোধকুমারের ব্যক্তিসত্তায় এই প্রগতি-চেতনা ও মহত্তর জীবনবোধ সুস্পষ্ট। সীমিত স্বার্থ-সংকীর্ণ জীবন থেকে উত্তরণ তাঁর অন্বিষ্ট। তিনি লিখেছেন :

"ঘরের থেকে বাহির, সে বাহির অনেক বড়। বিধি-নিষেধের বাহিরে যে-জীবন — সে-জীবনের আস্বাদ আমার দরকার ছিল। স্নেহ-মোহ-বন্ধনের অতীত যে মহাজীবনের ডাক তার অচ্ছেদ্য আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যেত।"

সেই মহাজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িয়ে আছে লেখকের অমেয় জীবনপ্রীতি। তাঁর নায়ক-নায়িকাদের বিদ্রোহ-চেতনার সঙ্গেও অনুস্যূত হয়ে গেছে মনুষ্যত্বের এই মূল্যবোধ। আর এই কারণেই 'প্রিয়বান্ধবী'র নায়িকা শ্রীমতী শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচারিণী-রূপে আত্মোৎসর্গ করেছে মানবসেবায়। 'আঁকাবাঁকা'র নায়ক-নায়িকা কঙ্কর-মীনাক্ষীর ভবঘুরে জীবনেও এই আর্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে।

প্রবোধকুমারের মনের এই নিহিত প্রগতিপন্থী মানবিক আদর্শবোধের প্রতিফলন হয়েছে অনেক উপন্যাসে : 'নদ ও নদী', 'কাঁটাকাটা হীরে', 'উত্তরকাল', 'হাসুবানু' ইত্যাদি গ্রন্থে লেখকের এই আদর্শনিষ্ঠ চিন্তা-চেতনার সুনিশ্চিত পরিচয় আছে।

প্রবোধকুমার তাঁর সমকালে হতাশা ও বিপর্যয়ের যে গ্লানিকর ধূসর পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা থেকে উত্তরণের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এক বলিষ্ঠ প্রাণধর্মে উজ্জীবিত জীবনচেতনার মধ্যে। এমনি এক প্রবল, পৌরুষ-দৃপ্ত প্রাণধর্মের ছবি আছে 'নদ ও নদী' উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক নীরেশ জনকল্যাণের মহৎ আদর্শ নিয়ে কাজ শুরু করতে গিয়ে অজস্র বাধা ও বিপন্নতার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু তবু সে কখনো হতোদ্যম হয়নি। আপন পৌরুষ-দৃপ্ত আত্মশক্তির উপর ভর করে সে তার স্বপ্নকে সফল করেছিল। অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ধরণের উপন্যাস-ধৃত নরনারীও তাদের জীবন সর্বত্র বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাসযোগ্য হতে পেরেছে কিনা। আমরা মনে করি এর উত্তর নেতিবাচকই হ'বে। ভবিষ্যৎ কালের কথা জানিনে, কিন্তু বর্তমান কালের বাঙালী জীবন-পরিবেশে এ-ধরণের চরিত্র নিশ্চয় বাস্তব নয়। জহর-শ্রীমতী (প্রিয়বান্ধবী), কঙ্কর-মীনাক্ষী (আঁকাবাঁকা) কিংবা হিরণ-হাসুবানু (হাসুবানু) বা অতনু-ভাস্বতী (বনহংসী) কেউই পাঠকের দৃষ্টিতে পুরোপুরি প্রত্যয়-সিদ্ধ হয়ে ওঠে নি। বাহুল্য আশঙ্কায় আর দৃষ্টান্ত বাড়ালাম না। বিশেষভাবে যা লক্ষ্যণীয়, তা হ'ল, প্রবোধকুমারের উপন্যাসে একেবারে, সূচনাপর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত এই একই ধরনের চরিত্র বার বার দেখা দিয়েছে। আসলে এই চরিত্রগুলি লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়,

এরা তাঁর স্বপ্নলোকের, তাঁর প্রত্যাশার জগতের অধিবাসী। তাঁর বোহেমীয় ভবঘুরে পথিক-চিত্ত থেকে, তাঁর স্বপ্নদর্শী আদর্শবাদী মন থেকে এরা উঠে এসেছে। কঠিন বাস্তব পৃথিবীতে যা অপ্রাপ্য, যে সব ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়—প্রবোধকুমারের ভাববাদী মন সেইসব 'কল্পিত' উপাদানে রচনা করেছিল এইসব চরিত্রের পরিকল্পনা।

সচেতন পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন, উপন্যাসে চরিত্রস্রষ্টা হিসাবে প্রবোধকুমারের ব্যর্থতার মূলে এক ধরণের 'অবাস্তবতা' ও বৈচিত্র্যের অভাব। বস্তুত তাঁর অধিকাংশ চরিত্রকেই যেন এক বিশেষ বক্তব্য বা ভাবাদর্শের ছকে ফেলে লেখক রচনা করতে চেয়েছেন। এর ফলে চরিত্রের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত গতি অনেকখানি হারিয়ে গেছে। পূর্ণায়ত একটি চরিত্রে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিল মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার উন্মোচন আমরা প্রত্যাশা করি, 'প্রবোধকুমারের সৃষ্ট চরিত্রে তার আত্যন্তিক অভাব স্পষ্ট'। তাঁর এ ধরনের চরিত্রগুলি যে সহজ মাটির পৃথিবী থেকে উদ্ভূত না হয়ে লেখকের এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জন্ম নিয়েছে, সেটা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের চলায় বলায়, তাদের 'অবাস্তব' আদর্শবোধের উত্তুঙ্গতায় ও উদ্ধত বিদ্রোহ-চেতনায়। এইসব উপন্যাসের কাহিনী, ঘটনা সংস্থান, চরিত্র—সবই যেন পথ-চলা এক যাযাবরের চোখে-দেখা চলমান জীবনের কতকগুলি চিত্তাকর্ষক ছবি। দ্রষ্টার পথ-চলতি মনের ওপর দিয়ে সেগুলি বহুবর্ণ মেঘের মত বারবার ভেসে যায়, মনকে মুগ্ধ ও স্বপ্নাবিষ্ট করে তোলে একথা সত্য, কিন্তু তারা সত্তার গূঢ় নিভৃতলোককে রহস্যে জিজ্ঞাসায় আলোড়িত বিক্ষুব্ধ করে তোলে না।

এই অর্থে প্রবোধকুমারের উপন্যাস হয়ত অনেকাংশে বাস্তব নয়। একে কেউ কেউ বলতে পারেন 'পলাতক' যাযাবর মনের 'স্বপ্নবিলাস', সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের যন্ত্রণা ও জিজ্ঞাসা যেখানে যথার্থ ভাবা পায় নি।

[পাঁচ]

কিন্তু প্রবোধকুমরেয় অন্য এক ধরণের জিজ্ঞাসার ছবি আছে। সেই জিজ্ঞাসা কোথাও কোথাও তীব্র হয়ে বেজেছে। আর বস্তুত তার আকর্ষণ প্রবোধকুমারের শিল্পসত্তায় অমোঘ। হয়ত একথা বললে তেমন অত্যুক্তি হ'বে না যে সেই রহস্য-জিজ্ঞাসার সন্ধানেই তিনি এতদূর চলে এসেছেন—জীবন ও শিল্পসাহিত্যের এতখানি পথ। সেই জিজ্ঞাসার স্বরূপ কি? উত্তরে বলা চলে, সে তাঁর মনের নিগূঢ় অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা। বলাবাহুল্য, এই অধ্যাত্ম-পিপাসা প্রচলিত ধর্মীয় অর্থে তার মনে আদৌ নেই। এই পিপাসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর প্রগাঢ় আদর্শবোধ আর চির-ভ্রাম্যমান উদাসী তীর্থগামী মন। প্রবোধকুমার নিজেই লিখেছেন :

"আমি তীর্থগামী।⋯আপন চিত্তের অশ্রান্ত গতি কামনা করি। যে গতি গঙ্গার, যে-গতি সৃষ্টিলোকের, সেই গতিই জীবনের⋯।"

[দেবতাত্মা হিমালয় (২য় খণ্ড)]

প্রবোধকুমারকে একবার এক তরুণ কথাসাহিত্যিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মানুষের কোন্ পরিচয় আঁকতে আপনি ভালবাসেন ? সামাজিক, রাজনৈতিক না আধ্যাত্মিক ?" প্রবোধকুমার উত্তর দিয়েছিলেন :

"মানুষের Socio-spiritual পরিচয়টাই আমার আঁকতে ভাল লাগে।"

[ছোটঘর : পৃথিবী : জীবন / প্রফুল্ল রায়।—দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৬]

এই স্বীকারোক্তির তাৎপর্য যথেষ্ট। ঔপন্যাসিকের কাছে প্রত্যাশিত সমাজ-চেতনা প্রবোধকুমারের রচনায় নিশ্চয়ই অনুপস্থিত নয়। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে তাঁর দৃষ্টি সমাজ পরিবার ও সাম্প্রতিকের সীমা অতিক্রম করে মাঝে মাঝে আরও দূরের দিকে প্রসারিত হ'তে চেয়েছে। বস্তুত প্রবোধকুমারের মনের সেই দূরযানী তৃষ্ণাই তাঁর অনেক উপন্যাসের Socio-spiritual বাতাবরণ রচনা করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'বনহংসী' উপন্যাসটির কথা। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কলকাতা শহরের নিম্নবিত্ত মানুষের দুঃখ দারিদ্র নৈতিক বিকৃতি ও অন্যান্য সমকালীন সমস্যা নিয়ে। নিঃসন্দেহে এরকম বিষয়বস্তু থেকে বাস্তবধর্মী সমাজ-সচেতন একটি উপন্যাসের জন্মই প্রত্যাশিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটি তা' হয় না। উপন্যাসের শেষ দিকে সমস্ত বাস্তব সামাজিক সমস্যাকে অতিক্রম করে অতনু-ভাস্বতীর নিগূঢ় সম্পর্কের রহস্য-জটিলতা ও ভাস্বতীর আত্ম-জিজ্ঞাসার সুরই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'বনহংসী' থেকে দু'টি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি সম্ভবত আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করবে :

(ক) অতনুর চিন্তা : "সমগ্র পরমায়ুব্যাপী যে ভগ্নতা ব্যর্থতা অবসাদ অপমৃত্যু আর নৈরাশ্য পিছনে ও সামনে পড়ে রইলো— তারই বুকের রক্তে দুই চরণ রাঙ্গা করে ভাস্বতী আজ কোথায় চললো ? সে কি কোন পরম তৃষ্ণার তৃপ্তির পথ ? সে কি কোনো জটিল অধ্যাত্ম-জীবনের আকর্ষণ ? সে কি অপার্থিব কোনো সুখ ? কোনে দয়াহীন স্বর্গ ?"

(খ) "ভাস্বতী বললে আমি পালাইনি, পালাইনি, পালাইনি। ছোট সংসার ছেড়ে বড় সংসারে এলুম, এর নাম কি পালানো ? এখানে দুঃখটাও বড়, আনন্দটাও বড় !"

এই হ'ল প্রবোধকুমারের socio-spiritual প্রবণতার ছবি। আর এই প্রবণতাকে বলতে পারি তাঁর শিল্পিসত্তার একটি 'স্থায়ী ভাব'। একথা সত্য যে এই প্রবণতা বা প্রয়াসের ফলে প্রবোধকুমারের উপন্যাসের বাস্তবরস অনেক সময়েই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু তাই বলে যেন মনে না করি প্রবোধকুমার জীবন-পলাতক শিল্পী। উপরে উদ্ধৃত ভাস্বতীর জবানীতে ('খ' অংশ) যেন স্বয়ং লেখকই এর উত্তর দিয়েছেন। জীবন-দৃষ্টিতে ও সাহিত্য-রচনায় 'বাস্তবতা' তাঁর শেষ লক্ষ্য নয়। আসলে তিনি আদর্শবাদী, আত্মজিজ্ঞাসু। সমাজ বাস্তবতার মূল্য তিনি অস্বীকার করেন না নিশ্চয়। কিন্তু তার চেয়েও তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে ব্যক্তিমনের গূঢ় জিজ্ঞাসা। আর তাই তাঁর সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় বারবার দেখা দিয়েছে

কতকগুলি সামাজিক-পারিবারিক বন্ধনহীন অনিকেত যাযাবর মানুষ, যারা অতৃপ্ত বিদ্রোহী ও চিরপথিক, যাদের সত্তাকে ঘিরে অজস্র জিজ্ঞাসার উত্তাল ঝড়।

[ছয়]

প্রবোধকুমারের ঔপন্যাসিক সত্তার যে নানামুখী প্রবণতার উল্লেখ করলাম, মনে হতে পারে তাদের মধ্যে স্ববিরোধ আছে। একই লেখককে কখনও মনে হয় যেন হতশ্রী বাস্তব জীবনের রূপকার, কখনও ব্যঙ্গনিপুণ সমাজপ্রেমী, কখনও রোম্যাণ্টিক উদাসীন যাযাবর, আবার সবশেষে হয়তো বা এক নিগূঢ় অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু সত্তা।

মনে রাখতে হবে, প্রবোধকুমারের শিল্পসত্তা যে-কালপর্বের আলোহাওয়ায় গড়ে উঠেছে, সেই কল্লোলের কালের মধ্যেই ছিল এক অন্তর্গূঢ় 'স্ববিরোধ'। আসলে এটা জটিল আধুনিক জীবনের নিহিত দ্বন্দ্বময় রূপেরই প্রকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অস্থির অনিশ্চয়তার দিনগুলিতে তরুণ লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'স্ববিরোধ' নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। তাই কল্লোলপন্থী অনেক লেখকের রচনাতেই পাশাপাশি চোখে পড়েছে ভগ্ন বাস্তবতা আর স্বপ্নাতুর রোম্যাণ্টিকতা, স্পর্ধিত বিদ্রোহ-সংগ্রাম আবার অন্যদিকে করুণ 'ব্যর্থতার মাধুরী'। একদিকে সুগভীর আশা অপর দিকে অতল নৈরাশ্য। অবশ্য প্রবোধকুমারের দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকে 'স্ববিরোধী' বলে মনে হয়েছে, তার মূলে কাল-ধর্মের প্রভাবের চেয়েও প্রবোধকুমারের ব্যক্তিগত প্রবণতাই অধিক বলে বোধ হয়। বস্তুত প্রবোধকুমারের ব্যক্তিত্বের মূলে আছে জীবন-সন্ধানী এক পথিক-সত্তা। এর ফলে কোন সুসংবদ্ধ ও সুসমঞ্জস দৃষ্টিভঙ্গির 'সংকীর্ণ' ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পিসত্তা আবদ্ধ হয় নি। বরং প্রখর বাস্তবতা থেকে বোহেমীয় রোম্যাণ্টিকতা এবং ব্যঙ্গপ্রবণ সমাজদ্রোহ থেকে গূঢ় অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় তা অনায়াসে সঞ্চরণ করেছে। এই নানামুখী আপাত-বিরোধী প্রবণতাগুলি তাঁর উপন্যাসে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু সমন্বয় লাভ করেনি, যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্ববিরোধী প্রবণতার অবাঞ্ছিত মিশ্রণের ফলে 'হাসুবানু' কিংবা 'বনহংসী'-র মত সম্ভাবনাপূর্ণ উপন্যাস যথার্থ রস-পরিণাম লাভ করেনি। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এইসব ব্যর্থতার মূলে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির 'স্ববিরোধ' থাকলেও, প্রবোধ কুমারের ব্যক্তিসত্তার গভীরে -যেখানে তিনি 'চিরপথিক', সেখানে কিন্তু কোন 'স্ববিরোধ' নেই। পথিকের উদার উদাস জীবনসন্ধানী দৃষ্টির প্রসারিত পটে উগ্র বাস্তবতা ও স্বপ্নাতুর আদর্শবোধ, যৌনচেতনা ও অধ্যাত্মপিপাসা জীবনের প্রখর আলো ও মেদুর ছায়া সবই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত। পথিক-শিল্পীর চোখে জীবনের কোনো ছক নেই, কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ নেই। জীবনের বহুবর্ণ রূপের মধ্য দিয়ে বস্তুত তিনি জীবনকেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন, জীবনের রস ও রহস্যের অন্বেষণে এক তীর্থ থেকে আরেক তীর্থে পথপরিক্রমা করেছেন।

সুবিনয় মুস্তাফী

বুদ্ধদেব বসু ঃ কৈশোরের কাব্যময় স্তুতি

বুদ্ধদেব বসুর অতিপ্রজ লেখনী 'আর্ট'কে প্রায় 'ইণ্ড্রাস্ট্রি'তে পরিণত করে তুলতে সফল হয়েছিল, এবং এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে ধাত্রীত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর বিদ্যুৎবহ ভাষায় অপ্রয়াসী প্রবাহ ও এক ধরনের হিবস্ময় বাষ্পাচ্ছন্নতা যাকে অনেকেই কবিতা থেকে পৃথক করে দেখতে পারেন না। তাঁর ঈর্ষনীয় সংখ্যক উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হলে এক কথায় বলতে হয়, তাঁর উপন্যাস কৈশোরের কাব্যময় স্তুতি। এদের অভাবে বাংলা সাহিত্য অনেকাংশেই রিক্ত হয়ে থাকত ; কেননা, এগুলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ কিশোরের এবং অনতীত-কৈশোর প্রাপ্তবয়স্কের, যদি 'কিশোর' শব্দটিকে adolescent-এর অনন্যোপায় প্রতিশব্দ হিসেবে ধরা যায়। 'মৌলিনাথ' উপন্যাসের কৈশোর-প্রশস্তিকে প্রসঙ্গচ্যুত করার স্বাধীনতা নিলে বলা যায়, সামগ্রিক ভাবে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস সেই জীবনবোধে আবিষ্ট এবং "সেই লাবণ্যে জড়ানো যার নিজেকেই সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই, অথচ যে নিজেকে ঠিক জানেই না এখনো ।" এক বুদ্ধি-দীপ্ত, কৌতূহলী অথচ পরিণত চিন্তায় তথা জীবন-ভাবনায় অনাগ্রহী ভাব-তন্ময় কিশোর বার বার হাজির হয় তাঁর প্রায় সব উপন্যাসে। সেই কিশোরের নাম পালটায়, ভূমিকা পালটায়, পোষাক পালটায়, কিন্তু অমলিন, অবিকৃত থাকে মৌল চারিত্র্য প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে। সে কখনো সোমেন, মৌলিনাথ, সাগর বা নীলাঞ্জন ; কখনো রাজীবলোচন, রণজিৎ মিত্র বা নয়নাংশু : কখনো 'শুদ্ধ' শিল্পের সবত্যাগী উপাসক, কখনো নারী-মাংসের কুশল শিকারী, কখনো মনোলোকের লূতা-তন্তুচারী ঊর্ণনাভ। বহুরূপ, চারিত্র্য এক —কৈশোরকতা, যার প্রকাশ পলায়নে : কখনো মৃত্যুতে, কখনো নান্দনিকতায়, কখনো উদ্দাম যৌনাচারে, কখনো প্রদর্শনবাদী আত্মনিগ্রহে, কখনো অন্তর্চেতনার জ্যোতির্ময় অন্ধকারে, কখনো বা 'সব-পেয়েছি'র সবুজ দ্বীপে।

কিশোর তার ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে বহিজগতের দ্বন্দ্বের সহজতম উত্তরণ খোঁজে পলায়নে এবং ঊনিশ শতকী ইউরোপীয় সাহিত্যের একটি প্রধান ধারা উত্তরণ খুঁজে নিয়েছিল এই কৈশোরক পলায়নে : কখনো উদ্ধত শিল্প-সর্বস্বতায় তথা শুদ্ধ নান্দনিকতায়, কখনো জীবন-বিমুখতায়, কখনো জীবন-বিতৃষ্ণায়, কখনো শুদ্ধ-শব্দের ভিত্তিহীন কারুময় প্রাসাদে ; কখনো বা ইন্দ্রিয়ময় অনুভূতির জগতে, কখনো বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীলাকাশে, কখনো অন্তবীক্ষনী চেতনার লোকে, কখনো আত্মঅনুকম্পায়, কখনো ক্যাথলিক গীর্জার ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধতায়, কখনো বা সমাজ বিদ্রোহে। ভিলিয়ে দ্য লিল্-আদাম, হুইজমান্স, বোদলেয়র, ভেরলেন, মালার্মে, ওয়াল্টার পেইটার, লায়নেল জনসন, আর্নেস্ট ডাউসন, আর্থার সাইমন্স, মার্সেল প্রুস্ত —দেশকালে ভেদ সত্ত্বেও এদেরকে এক নিঃশ্বাসে যথেচ্ছভাবে উচ্চারণ করলে

কোনো ক্ষতি হয় না। এদের সাহিত্যিক কুললক্ষণ এক, উচ্চারণ বিভিন্ন। আর্থার সাইমন্‌স-এর স্পর্ধিত উক্তি, সমাজই মানুষের চূড়ান্ত ও প্রতিশ্রুত শত্রু ; বন্ধু প্লার্‌-কে লেখা চিঠিতে ডাউসনের সক্ষোভ মন্তব্য, 'What a terrible, lamentable thing growth is !' ভিলিয়ে দ্য লিল্‌-আদামের নায়ক আক্সেলের স্মরনীয় দুর্বিনয় : 'Vivre ? les serviteurs feront cela pour nous' (—Live ? Our servants will do that for us.) ; বোদলেয়রের 'অ্যালবাট্রস্‌' ঃ 'The Poet's like the monarch of the cloude…/ Exiled on earth amid the shouting erowde. He cannat walk, for he has giant's wings'; সাংগীতিকী শব্দের নৈঃশব্দে আত্ম-নির্বাসিত মালার্মের কাব্য-দর্শন ঃ "Expunge reality from your song, for it is common… The only thing the poet has to do is to work mysteriously with his eye turned upon Never" ; ভেরলেন্‌-এর শুভ্র-জ্যোতি সমাজ-নির্বাসিত কবি ঃ…profound and gentle, far from the hubbub of life and disorderly shock of mercernary arms, behold, ascending ineffable heights, the group of Singers clad in white …The world, which their profound words have troubled, banishes them. They, in their turn, banish the world" - সবই আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র, পশ্চিমী শিল্পায়নের তথা ধনবাদের নিজস্ব দ্বন্দ্বসৃষ্ট মানস-সংকটের বহিঃপ্রকাশ। ডাউসন্‌ ভুলে যেতে চেয়েছিলেন যে বয়ঃবৃদ্ধি শুধুমাত্র বিনষ্টির অলক্ষ্য ও অনিবার্য পরিণতি নয়, গাঢ়তর জীবনোপলব্ধিরও প্রস্তুতি। আক্‌সেল নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন প্রাকৃতজনের আত্মতৃপ্ত দৈনন্দিনতা থেকে অনেক দূরে দুভেদ্য অরণ্য দুর্গে। মানবিক সম্পর্ক-বিবর্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের নির্বাধ চর্চায়। লাস্যময়ী সুন্দরীর প্রেম, অমেয় ঐশ্বর্যের নিশ্চিতি, যা-কিছু জীবনকে ক'রে তোলে রম্য ও ঋদ্ধ, সেই সব-কিছুকেই আক্‌সেল মনে করতেন 'বিশুদ্ধ' জীবনের মজ্জাবাক্‌ শত্রু। তাই ভৃত্যের হাতে জীবন যাপনের ভার তুলে দিয়ে ভাব-জীবনের পূজারী আক্‌সেল প্রেমিকাকেক সঙ্গে নিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। হুইজ্‌মান্‌সের 'আ হব্যুর' ('A rebours')-র নায়ক দ্যুক্‌ দ্য এস্‌স্যাৎ (Duke des Esseintes) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর নানাবিধ উপাচারে ও ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্য-সম্ভাবে সজ্জিত বিশাল গ্রন্থাগার দিয়ে নিজের জন্যে গড়ে তুলেছিলেন এক মনোময় নিভৃত জগৎ, 'অন্ন-দাস' মানুষের সমাজ থেকে, এমন কি প্রকৃতি থেকেও, বহু দূরে।

'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুকেই সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত করেছিল উনিশ শতকী ইউরোপীয় সাহিত্যের এই অবক্ষয়ী ধারার নান্দনিকতা ও ব্যক্তিসর্বস্বতা। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলেও তাঁর সমকালীন, বা প্রায় সমকালীন, ঔপন্যাসিকেরা —যেমন তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ এবং এক বিশেষ অর্থে, জগদীশ গুপ্ত —যখন বাস্তব জীবনাশ্রয়ী 'সামাজিক' মানুষের উপন্যাস

রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তখন বুদ্ধদেব তাঁর লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এমন এক জীবনবাদ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, যা মূলতঃ পলায়নধর্মী ; ফলতঃ কৈশোরক এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা অবশ্যই পুষ্ট হয়েছিল ঊনিশ শতকী ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বিধা-দীর্ণ মানসের সেই ধারায় যা সম্প্রসারণশীল ধনবাদের সংকটকে উপেক্ষা করতে চাইছিল সমাজকে অস্বীকার ক'রে, অন্তর্চেতনার দ্বীপভূমিতে আশ্রয় নিয়ে, শিল্পকেই জীবনের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ ক'রে।

'মৌলিনাথ' উপন্যাসের শুরুতে একটি গ্রীষ্ম সকালের বর্ণনা আছে ঃ "এ-রকম সকাল বছরে একটি-দুটির বেশি আসে না ; চৈত্র-বৈশাখের কোন এক অপ্রত্যাশিত তিথিতে হঠাৎ সে দিনের দিগন্তে এসে দাঁড়ায় : পৃথিবীর লোক বাজার করে, রান্না করে, আপিশে যায়, হয়তো ও-সব করতে তাদের ভালোই লাগে সেদিন, কিংবা একটু বেশি ভালো লাগে। কিংবা হঠাৎ বোঝে, বুঝে অবাক হয়, কেমন একরকম বিনম্র বিস্ময়ে পথের ধারে ঘুঁটের গন্ধে চকিতে উপলব্ধি করে যে ও-সব-কাজ যাতে মনে হয় কষ্ট ছাড়া কিছু নেই - ও-সব কাজ প্রতিদিনই ভালো লাগে তাদের।" আপাতদৃষ্টিতে নিরপরাধ, অব্রণ বর্ণনা। কিন্তু মনোযোগী অনুধাবনে ধরা পড়ে, দ্বিতীয় বাক্যটিতে উত্তমপুরুষের বদলে প্রথম পুরুষের ব্যবহার ('পৃথিবীর লোক', 'তাদের') লেখকের অজ্ঞাতসারে -'বিনম্র' শব্দটির উপস্থিতি সত্ত্বেও —এমন একটি বোধের সঞ্চার করে যেন তিনি পৃথিবীর বহমান জীবন থেকে বহুদূরে কোন মিনার থেকে পৃথিবীর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে দেখছেন, অন্তরঙ্গ মমতায় নয়, নিরুত্তাপ কৃপার দৃষ্টিতে। বস্তুত, বুদ্ধদেবের উপন্যাসে যে জীবনচেতনা ধরা পড়ে, তা তিনটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এক, জীবন-যাপন একমাত্র প্রাকৃত জনেরই নির্ধারিত নিয়তি : দুই শিল্পের জন্যেই জীবন, জীবনের জন্য শিল্প নয় ; তিন, ব্যক্তির চেতনার বাইরে কোন জগত নেই, থাকলেও উপেক্ষণীয় ঃ "শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত" ; "আকাঙ্ক্ষার পশ্চাদ্ধাবনে মত্ত হয়ে ভোলা'যায় লোলজিহ্ব হন্তা প্রকৃতির প্রতরণা কিন্তু আমি তাকেও ছাড়িয়ে এক অন্য বিশ্ব গড়ে তুলি, বায়বীয় ধারণার উপাদানে।" এবং এই যুক্তির স্বপক্ষে অজস্র সাক্ষ্য জোগাড় করা যায় তার উপন্যাস থেকে। 'রুপালি পাখি'-র কপিল ভাবে ঃ "আমাদের এই বিরাট সিসটেম প্রায় সব মানুষকেই শোষণ করে নিয়েছে। মুক্তির রাস্তা আছে কেবল তাদের, যারা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক, যারা কবি, যারা শিল্পী" আর তাই তার প্রার্থনা, "আমার জীবন হোক আর্টের মধ্যে"। বাসবের আত্মতৃপ্ত উক্তি ঃ "আমরাই হচ্ছি বর্তমান যুগের সন্ন্যাসী, আমরা যারা শিল্পী। আমরাই চাই পৃথিবী থেকে দূরে সরে যেতে, নিজের জীবনকে সৃষ্টি করতে। কোন শঙ্করাচার্যের, কোন সেইন্ট ফ্রান্সিসের পৃথিবীর ওপর এমন বিতৃষ্ণা ছিল না -যা আছে আমার আর তোমার (কপিলের)।" 'যেদিন ফুটলো কমল'-এর পার্থপ্রতিম বলতে কুণ্ঠা বোধ করে না যে "সমাজের বিরোধী হওয়া .. অন্তত, সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের প্রতি কর্তব্য। সুখী হবার সেটাই একমাত্র উপায়।.... সমাজের সঙ্গে আমার

সম্পর্ক কি?” মৌলিনাথের মনে প্রশ্ন জাগে ঃ “বেঁচে থাকা আর শিল্পী হওয়া, এ দুই কি একই সঙ্গে সম্ভব?” ‘ভিড়ের চেনা-অচেনা ময়লা হাওয়ায়’ প্রায় দমবন্ধ সোমেন (‘নির্জন স্বাক্ষর’) ট্রামে যেতে যেতে যে ‘নতুন’ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে তা শোষণমুক্ত নতুন সুখী পৃথিবীর স্বপ্ন নয়, প্রোটন বোমার আঘাতে ‘অশ্লীল’ জনতার জঞ্জালমুক্ত নতুন পৃথিবী : “একদিন কোন এক প্রোটন কি ইলেকট্রন বোমা পড়বে, তারপর এ সবও বদলে যাবে। আর তখন যারা বেঁচে থাকবে…তারা অবশ্য পারবে ‘নতুন’ পৃথিবী গড়তে।” ‘সাড়া’ উপন্যাসের নায়ক শিল্প-তন্ময় সাগর “বাঁচিয়া থাকার জন্য ইহার-উহার মুখের দিকে তাকাইবার প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়াছে- এখন নিজেকে লইয়াই তাহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়।”

এ-সবই সমাজ নামক অদৃশ্য, আকৃতি-অবয়বহীন অথচ শক্তিমত্তায় অপ্রতিরোধ্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-সত্তার ক্রমজায়মান বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, যে-বিক্ষোভ ধনবাদী উৎপাদন তথা বন্টন ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ও তার স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করা ও সেই উপলব্ধিকে উপন্যাসের বুনেটে বিন্যস্ত করার তাগিদ বা সাধ্য কোনটি-ই বুদ্ধদেবের ছিল না। মন্দির গাত্রের কারুকার্যের সঙ্গে মন্দিরের ভারবাহী স্তম্ভের সম্পর্ক যতটা গুরুত্বপূর্ণ তাঁর উপন্যাসের বুনটের সঙ্গে এইসব প্রতিবাদী মন্তব্যের সম্পর্কও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার জটিল প্রক্রিয়ায় এরা কখনোই তাঁর উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে না। এই সব ‘বৈঠকী’ মন্তব্য আসলে কিছুটা মননশীলতার বাতাবরণ সৃষ্টির প্রচেষ্টা এবং বিশাল অংশে কৈশোরক রোম্যান্টিকতার দায়িত্বভারহীন জগতে পলায়নের উপলক্ষ্য মাত্র।

বুদ্ধদেবের প্রথম উপন্যাস ‘সাড়া’, ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রগতি’ পত্রিকায়। ‘সাড়া’র নায়ক সাগর স্বপ্নচারী কবি, যদিও তাঁর কবিতার সঙ্গে পাঠকের কোন পরিচয়ের সুযোগ নেই। শৈশবে মাতৃহীন সাগর স্কুলে যায় নি, বাবার তত্ত্বাবধানে এবং সমৃদ্ধ পারিবারিক গ্রন্থাগারে নিজেকে সাহিত্যে দীক্ষিত করে তুলেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে কলকাতায় পড়ার সময় সে ভালবাসে সুন্দরী ধনাঢ্য পত্রলেখাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মোহভঙ্গ হয়। সে বি. এ. পরীক্ষা না দিয়েই দেশে বাবার আশ্রয়ে ফিরে যায় ও মণিমালাকে বিয়ে করে। কিন্তু পেনসন-ভোগী বাবার নিরাপদ স্নিগ্ধ আশ্রয়ে ও স্ত্রী মণিমালার ভালবাসায় কর্মহীন সাগরের কবি-সত্তা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। তাই সে একদিন সব বন্ধন ছিঁড়ে কলকাতায় চলে আসে। সাত-আট ঘন্টা কেরাণীগিরির পরে হোটেলের ছোট্ট ঘরে তার সত্যিকারের জীবন শুরু হয়।

“কাগজের সঙ্গে প্রায় মাথা ঠেকাইয়া টেবিলের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটানা সে লিখিয়া যায়— একটি-একটি করিয়া কথার ফুল ফোটে —কী আশ্চর্য সেই ফুল! —পৃথিবীর আর কিছুর সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। নিজের এই ক্ষমতায় সে

নিজেই মুগ্ধ হয়, নিজের হাতের লেখার প্রেমে পড়িয়া যায়।" সাগর এখন স্ব-নির্ভর, স্বয়ং-সম্পূর্ণ—তার প্রথম ও শেষ দায় কবিতার কাছে, কবিতার জন্যেই তার বেঁচে থাকা। এই সময় এক রাত্রে সাগরের সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হয় তার শৈশব-সঙ্গী—বর্তমানে অধ্যাপক মুকুলেশ সেনগুপ্তের স্ত্রী—লক্ষ্মীর। লক্ষ্মী প্রতিশ্রুতি দেয় যে, পরের দিন খুব ভোরে, কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার আগে, সে সাগরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। লক্ষ্মীর প্রতীক্ষায় সাগর সারারাত ঘুমায় না, ছাতে পায়চারি করে। অবশেষে ভোর রাত্রে এক চিত্ত-বিভ্রমের মুহূর্তে কল্পনায়-গড়া এক ছায়া-মূর্ত্তিকে লক্ষ্মী মনে ক'রে আলিঙ্গন করতে গিয়ে সাগর ছাত থেকে ফুটপাথে পড়ে গিয়ে আঘাতে মৃত্যুবরণ করে।

সাগরের মৃত্যু অবশ্য নীতি শিক্ষার রূপক নয়। অর্থাৎ কল্পনা ও বাস্তবের সীমারেখা অতিক্রমের জন্য অথবা পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণের জন্য সাগরের প্রতি ঔপন্যাসিকের মৃত্যু-দণ্ডাদেশ নয়, যেমন নীতিভ্রষ্ট রোহিনীর প্রতি বঙ্কিমের। বরং সাগরের মৃত্যুর প্রতি লেখকের একটি গরিমাদীপ্ত প্রশ্রয় আছে, যেন স্বপ্নের অলীকতায় নির্দ্বিক আত্মসমর্পনের মধ্যেই জীবনের পরম সার্থকতা। এক দিক থেকে সাগরের মৃত্যু বাস্তবের বিরুদ্ধে কৈশোরক বিদ্রোহ। কেননা, সাগরের মৃত্যু ততটা মৃত্যু নয় যতটা আত্মহনন, কিন্তু ততটা আত্মহনন নয় যতটা আত্মহননের মধ্য দিয়ে কল্পলোকের জীবনের চিরন্তনত্বে উত্তরণের অথবা পলায়নের প্রয়াস।

তার উত্তরকালীন উপন্যাসগুলিতে যে-মানসবিবর্তনের দাবী বুদ্ধদেব 'সাড়া'-র ২য় সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৫৯) করেছেন, তার খুব বেশি সমর্থন মেলে না। যে কৈশোরক রোম্যাণ্টিকতা নিয়ে তিনি বাংলাসাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন, পরবর্তী-কালেও তিনি সেই রোম্যাণ্টিকতা থেকে নিষ্ক্রমন খোঁজেন নি, যে রোম্যাণ্টিকতা প্রায় সর্বাংশেই ঊনিশ শতকী ইউরোপীয় সাহিত্যের অবক্ষয়ী রোম্যাণ্টিকতার অনুকরণ মাত্র, অভিজ্ঞতা-লব্ধ নয়, সাহিত্যলব্ধ; তার কারণ যে-ধরণের আগ্রাসী পুঁজিবাদ উনিশ শতকের ইউরোপে 'অবক্ষয়ী রোম্যাণ্টিকতার' প্রসূতির ভূমিকা নিয়েছিল, ঠিক সেই ধরণের পুঁজিবাদী বিকাশ বুদ্ধদেবের সমকালীন বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে ঘটেনি এবং পরবর্তী স্তরেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তর চূড়ান্ত হয়নি। 'রূপালি পাখী' (১৯৩৪), 'সেদিন ফুটল কমল' (১৯৩৩)-এর মতো অবাস্তব, বায়বীয় -অনেকের মতে 'কাব্যিক'—উপন্যাসগুলিকে বাদ দিলেও, 'নির্জন স্বাক্ষর' (১৯৫১), 'মৌলিনাথ (১৯৫২), 'পাতাল থেকে আলাপ' (১৯৬৭), 'গোলাপ কেন কালো' (১৯৬৮) প্রভৃতি উপন্যাসেও বুদ্ধদেব মূলতঃ 'সাড়ার' মানসতাকে বহন করে এনেছেন। অর্থাৎ পরবর্তী উপন্যাসে তাঁর মানসতার সম্প্রসারণ ঘটেছে, কিন্তু পরিবর্তন ঘটেনি, পরিণতি তো নয়ই।

মৌলিনাথ-ও সাগরের মতই, 'জীবন' যাপন করে না; 'শিল্প' যাপন করে। যেহেতু তার কাছে জীবন শিল্পের সহযোগী পার্শ্বচর নয়, বরং মুখোমুখী দাঁড়ানো আপোষহীন শত্রু, তাই সে তার শিল্পী-জীবনের সঙ্গে 'সাধারণ' মানুষের গতানুগতিক

সাংসারিক জীবনের বিরোধের আশংকায় স্নেহ-প্রেম-প্রীতি অর্থাৎ লৌকিক জীবন-যাত্রার 'সাধারণত্ব' থেকে, এমন কি প্রকৃতি থেকেও বহুদূরে উত্তর কলকাতার এক ভাড়াটে বাড়িতে শিল্পের নিদর্শক শব্দময় জগতে নিজেকে নির্বাসিত করে। শিল্পের সঙ্গে বিরোধের আশংকায়, পৃথিবীতে তার একমাত্র স্বজন তার মাকে ছেড়ে আসতেও সে দ্বিধা করে না, গ্রামীন প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, অধ্যাপনা ছেড়ে দেয়, চিত্রা ও গীতা উভয়ের ভালবাসাকেই উপেক্ষায় ফিরিয়ে দেয়। হর্টুমারিয়া থেকে গীতা-বিমলেন্দুর বিয়ে উপলক্ষে সে লেখে ঃ "জীবনে আমি যা হারিয়েছি, ইচ্ছে করেই হারিয়েছি, তার মূল্য বুঝে সবল হয়ে উঠলাম আমি।" এই মনস্তাপ তার কাব্যিকতার উপলক্ষ্য মাত্র, সে-কাব্যিকতা অনেকাংশেই রাবীন্দ্রিক, ভাষায় ও ভাবে। এই 'সবল হয়ে ওঠা' তার জীবনযাত্রাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করে না, বুদ্ধিগত তাত্ত্বিক পর্যায়েই থেকে যায়। মৌলিনাথ আসলে জীবন থেকে বিযুক্ত এবং এই বিযুক্তি-তেই তার আনন্দ। মৌলনাথ বস্তুত হুইজম্যানস্-এর দ্যুক্ দে এস্স্যাৎ, ভিলিয়ে দ্য লিল-আদামের আক্সেল্ ও বোদলেয়রের অ্যালব্রাটস্-এর সমন্বয়।

'নির্জন স্বাক্ষরের' সোমেনও মৌলিনাথের মতই জীবনের চেয়ে ভালবাসে কবিতার। শিল্পের জগত—রিলকের, গগ্যার স্থিতিহীন অনিশ্চিত এষনার জগত। লায়নেল জনসন সম্পর্কে ইয়েটস্-এর একটি উক্তিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে বলা যায়, সোমেনও "loved his 'poetry' better than mankind"। "রিলকের নিজের জীবনটা মনে পড়ল সোমেনের বিয়ে করেছিলেন একটি কন্যাও জন্মেছিল ?—কিন্তু তার পরেই জীবনের মতো বিচ্ছেদ। ঘুরে-ঘুরে একা-জীবন কাটিয়েছেন কখনো প্যারিসে, কখনো ইতালিতে, জার্মানিতে, হয় রোদ্যার আশ্রয়ে, নয় কোন ধনী গৃহিনীর আতিথ্যে। তখনো ধনী ছিলো ইউরোপ, আর নীল রক্ত সমস্তটাই তখনো লাল হয়ে যায় নি। কী রকম জীবন ? মন্দ কী, কবিতা লিখতে পেরেছিলেন তো।" কিন্তু যে আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের সে শিকার, যা তার কবি-সত্তাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে বলে সে মনে করে, তা সম্যক উপলব্ধি করার অথবা প্রতিরোধ করার তাগিদ সোমেনের নেই ; বরং এই সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি তার 'কেউ-আমাকে-বোঝে না— ভালবাসে-না' ধরণের কিশোর-সুলভ অভিমান-বিলাস আছে। "বিরোধের ফলে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের ফলে জটিলতা, জটিলতার ফলে সমৃদ্ধি" এই ক্ষণিক উপলব্ধি তার চারিত্র্যে মৌল পরিবর্তন আনতে পারে না। কেননা, এই উপলব্ধি তার ক্ষেত্রে জীবন-সত্য হয়ে উঠতে পারে নি—পুঁথিলব্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানের পর্যায়েই থেকে গেছে। এর কারণ সোমেন ঔপন্যাসিক তাকে কবি হিসেবে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হলেও—আসলে aesthete, কবি নয়। কবি- বা যে-কোনো শিল্পীর—প্রথম ও তীব্রতম প্রেম ঃ জীবন ; aesthete -এর প্রথম ও তীব্রতম প্রেম ঃ শিল্প। শিল্পী জীবন-প্রেমের দাবী মেটানোর জন্য কবিতা লিখতে বাধ্য হন : aesthete শিল্প-প্রেমের দাবি মেটানোর জন্য জীবন-যাপনে বাধ্য হন এবং নিতান্তই অসম্ভব না-হলে কাউন্ট আক্সেলের মতোই জীবন-যাপনের ভার ভৃত্যের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। বেদনার নিবিড় মুহূর্তে সেইন্ট

লরেন্সের মতই কবিও বলেন ; "Turn me over, brothers, I am done enough on this side ?" অপরপক্ষে aesthete জীবনকে, মৌলিনাথের-ই মতো, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যান 'পায়রা-পাখায় কোঁকড়া বাতাসে হালকা', কেননা জীবন তার কাছে গ্লানিময়, গরিমারিক্ত, শুধু যাপনীয় নগর ট্রামের শব্দে জাগে / মলিন মশারি রটায় আবিল বাষ্পে, ধুলো-পড়া কাচে উঁকি দেয় হিংসুক আরো একদিন –ধূসর, কঠিন, দুঃসহ দিন।" মৌলিনাথের মতই, সোমেন-ও জীবনকে ভালবাসে নি —স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি তার করুণা আছে, প্রেম নেই। এমন কি যে মালতী সেন তার ব্যর্থতা-ধূসর জীবনে দারুচিনি-দ্বীপের মেদুর স্নিগ্ধতা নিয়ে আসে, তার প্রতিও সোমেনের প্রেম নেই, আছে 'লিবিডো সজল' আতুরতা। গভীর প্রেম যে-দৃপ্ত পৌরুষ দেয়, যে মহান দায়িত্বের উত্তরাধিকার দেয়, যে নিবিড় ট্র্যাজিক উল্লাস দেয়, তা সোমেনের চরিত্রে অনুপস্থিত। তাই ঘটনা-চক্রে মীরা ও মালতী সেন তার জীবনে যে সংকট সৃষ্টি করে, তা থেকে সোমেন নিষ্ক্রমণের সহজ উপায় খুঁজে নেয় আত্মহননে। এই আত্মহত্যায় ট্র্যাজিডির অমোঘ অবশ্যম্ভাবিতা নেই, আছে প্রেমের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতির সহজতম বিকল্প। ট্র্যাজিডির নায়ক ধ্বংস হয়, পরাজিত হয় না। সোমেন ধ্বংসের আগেই পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তার আত্মহত্যা সংকট-বিহ্বল ভীরু কিশোরের গৃহত্যাগের মতো।

সাগর স্বপ্নকেই সত্য মনে ক'রে মৃত্যুবরণ করে, মৌলিনাথ শিল্পের ধূসর নিঃসঙ্গতায় নিজেকে নির্বাসিত করে, সোমেন আত্মঘাতী হয়, আর 'গোলাপ কেন কালো'-র নায়ক রণজিৎ মিত্র পলায়ন করে প্রদর্শনবাদী আত্মনিগ্রহে, যদি অবশ্য তার উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচারের আত্মতৃপ্ত বর্ণনাকে আদৌ আত্মনিগ্রহের মর্যাদা দেওয়া যায়। রণজিৎ মিত্র এক অর্থে বুদ্ধদেব বসুর 'দেবদাস'। প্রাক্-স্বাধীনতা বাংলাদেশের রাজনীতি মিতু বর্ধন ও রণজিতের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তোলে। রণজিৎ মিত্র বিলেতে চলে যায়। বিলেত থেকে ফিরে আই-সি-এস রণজিৎ মিত্র বিয়ে করে বোম্বাইয়ের ধনকুবের রতনদাসের কন্যা সুন্দরী নাগিনী ব্রোকারকে। কিন্তু স্ত্রীকে—এমন কি নিজের সন্তানদেরও সে ভালবাসতে পারে না। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি উপেক্ষার মাধ্যমে সে যেন তার প্রাক্-বিবাহ প্রেমের ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে চায়। নলিনীর মৃত্যুর পরে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি-সমাজ-জনতা ইত্যাদির অশ্লীল অরণ্য থেকে বহুদূরে উটকামন্ডের বিলাস-বহুল বাংলোয় মিতু বর্ধনের প্রাক্তন প্রেমিক ব্যর্থ প্রেমের শোকে কিছুটা কোন এক কাজল মামীর সঙ্গে যৌন-ব্যভিচারের গ্লানিতে (?) মগ্ন হয় মদে, নারী-মাংসে, কদাচিৎ নতুন প্রজাতির গোলাপের চাষে, যেমন 'পাতাল থেকে আলাপ'-এর নায়ক ক্যানসার রোগগ্রস্ত রাজীবলোচন আশ্রয় নেয় সরমা বা যূথিকার সঙ্গে যৌনমিলনের বিভিন্ন 'উৎকট ব্যায়ামের' রসসিক্ত স্মৃতি-রোমন্থনে। 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'-ও এক অর্থে পলায়নী উপন্যাস। তবে, এই পলায়ন যৌনতায় নয়—যৌন-স্বাধীনতার, ভাষান্তরে ব্যক্তিস্বাধীনতার, আপাত-অসীম আকাশের সন্ধানে এবং মনোলোকের বিচিত্র ভাবানুভূতির দ্বন্দ্ব-জটিল অথচ নিষ্ক্রিয়তার জগতে।

বুদ্ধদেবের সবচেয়ে সার্থক—এবং বোধহয় জনপ্রিয়—উপন্যাস 'তিথিডোর'। কিন্তু তিথিডোরের দুর্বলতা ও শক্তি একাধারে তার বিবর্জন ও অতিসরলীকরণ। রাজেন-সত্যেন-শ্বাতী-শাশ্বতী-হারীতের জগত এক রমনীয় দ্বীপভূমি, যার আকাশে অমঙ্গলের মেঘ মাঝে-মধ্যে দেখা দিলেও সত্যিকারের কোন দুর্যোগ ডেকে আনে না, যার বেলাভূমিতে—হিংসা-ঘৃণা-ক্রুরতা-দারিদ্র্যের আবিল উচ্ছ্বাস থেকে বহুদূরে—মৃদুজ্যোতি আলোকস্তম্ভের মত জ্বলতে থাকে অভিমান-স্নিগ্ধ ভালবাসার স্বল্পপরিসর পারিবারিকী জীবন, যেখানে প্রেমিক তার বাঞ্ছিত প্রেমিকাকে, প্রেমিকা তার বাঞ্ছিত পুরুষকে পেয়ে যায় স্বপ্নের অলীক স্বাভাবিকতায়; যে-অলীকজীবন-পরিবেশের ক্ষনিক-মেঘচ্ছায়াকে ব্যঙ্গ-পরিহাসের হালকা হাওয়ায় সরিয়ে দেয় একজন বিদূষকের উপস্থিতি—কমিউনিজমের ক্যারিকেচার হারীত; যে অলীক জগতের স্নিগ্ধ নিরাপত্তাকে অর্থের অনটন কোন সময়েই বিঘ্নিত করতে পারে না। 'তিথিডোর' সুখপাঠ্য উপন্যাস, ইচ্ছাপূরণের উপন্যাস, বাণীবন্ধ দিবাস্বপ্ন, ফলতঃ কৈশোরক, 'যেদিন ফুটলো কমল' এবং 'অদর্শনা' (১৯৪৪)-র সমধর্মী। যে বাস্তবে বুদ্ধদেব প্রবেশ করতে গিয়েছিলেন 'কালো হাওয়া'য়, তারও উপসংহার অরুণ-মহামায়ার ব্যভিচারী মিলনের অকথিত অর্থবহ ইঙ্গিতে অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির ফ্যাণ্টাসিতে। বস্তুতঃ বাস্তবতা, মাঝে-মধ্যে তাঁকে আক্রান্ত করলেও, তাঁর উপন্যাসের প্রলম্বিত দিবাস্বপ্নের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশমাত্র। বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য নয়, উপলক্ষ্য।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই নয় যে, তা রোম্যাণ্টিক অথবা জীবনের এক বিশেষ সময়-গ্রন্থির অপরিণত জীবনোপলব্ধির চিত্রণ। রোম্যাণ্টিকতা যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তবে সে-অপরাধে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে যেমন আণ্ডার দ্য গ্রীনউড ট্রি, ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড, অনদিঈভ, উয়দারিং হাইটস, কপালকুণ্ডলা—নির্বাসন দণ্ড দিতে হয়। এবং অনুরূপ ভাবে বিসর্জন দিতে হয়, 'টু অ্যাডোলেসেনটস', 'দ্য ভ্যাগাবণ্ডস', 'তা শ্রপশায়ার ল্যাড', সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি', মানবজীবনের বিশেষ সময়-গ্রন্থির মানসতা প্রতিবিম্বনের জন্যে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের বিরুদ্ধে মুখ্য অভিযোগ এই যে, তারা কৈশোরকতাকেই জীবনের চূড়ান্ত ও একমাত্র মান্য লক্ষ্য হিসেবে দেখাতে চায়, যদিও একথা অস্বীকার করা যায় না যে কথাশিল্পে বিভিন্ন ধরণের আঙ্গিক প্রয়োগের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত ক'রে তিনি এক দিক থেকে পথিকৃতের কাজ করেছেন।

আঙ্গিক নিয়ে বহুরকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কৃতিত্ব বুদ্ধদেবের অবশ্যই প্রাপ্য। কখনো 'সর্বজ্ঞ', আখ্যায়কের পরিপ্রেক্ষণে বর্ণনা যেমন 'তিথিডোর', 'সাড়া', 'রুপালি পাখি', 'মৌলিনাথ', ইত্যাদি; কখনো আত্মজীবনীমূলক বা স্বীকারোক্তিমূলক বর্ণনা যেমন 'গোলাপ কেন কালো', 'পাতাল থেকে আলাপ' ইত্যাদি। এমনকি একই উপন্যাসে একাধিক আঙ্গিক প্রয়োগ করার সাহসী স্বাধীনতা নিতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। মূলতঃ সর্বজ্ঞ আখ্যায়কের পরিপ্রেক্ষণে বর্ণিত হলেও 'তিথিডোরের' শেষাংশে 'যে জয়েসীয় গদ্যরীতির' ব্যবহার করা হয়েছে তার উৎকর্ষ ও সফলতা

সম্পর্কে আমরা অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত নাও হতে পারি, তবে তা 'ভবিষ্যৎ-প্রভাবী', সন্দেহ নেই। 'নির্জন স্বাক্ষর' মূলতঃ আখ্যায়কের পরিপ্রেক্ষণে বর্ণিত ; কিন্তু আবার সোমেনের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তার জীবনকে দেখার জন্য সোমেনের কয়েকটি দিনের রোজনামচা ব্যবহার করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। আঙ্গিকের অভিনবত্বে ও প্রয়োগের কুশলতায় সবচেয়ে কৃতিত্বের দাবী জানাতে পারে 'রাত ভ'রে বৃষ্টি', যেখানে প্রবৃত্তি ও অনুশাসনের সংঘর্ষে দীর্ণ দুটি বিচ্ছিন্ন নর-নারীর—যারা অন্ততঃ সামাজিকতায় স্বামী-স্ত্রী —অনুচ্চারিত চিন্তা-অনুভূতি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব- কখনো সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হ'য়ে, কখনো পরস্পরের-চিন্তা-প্রবাহের মধ্যে গ্রথিত হয়ে মানব-সম্পর্কের এক অনুন্মোচনীয় জটিলতার রূপক হয়ে উঠেছে। আবার 'সাড়া'-র প্রথমদিকে বর্ণিত সাগরের একটি স্বপ্নাংশ এবং শেষতম অংশে বর্ণিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা উপন্যাসটিকে একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আঙ্গিকের চাতুর্য ও অভিনবত্ব সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বুদ্ধদেবের উপন্যাসে—'তিথিডোর' বা 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'-র মতো দু' একটি উপন্যাস বাদ-দিলে—নির্মিতির কলাকৌশল ও তার দক্ষপ্রয়োগ প্রায় বিরল। রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে 'প্লটহীন' উপন্যাসের স্বপক্ষে যুক্তি-বিস্তারের যে-ব্যগ্রতা বুদ্ধদেব দেখান, তা তার নিজের উপন্যাসের নির্মিতির দুর্বলতা-সম্পর্কে অস্বস্তিদায়ক সচেতনতার পরোক্ষ স্বীকারোক্তি এবং সেই দুর্বলতার স্বপক্ষে যুক্তি-খোঁজার অবগুণ্ঠিত প্রযাস। বুদ্ধদেব মনে করেন 'সবুজপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথের "ঊনিশ শতকী মোহ কেটে গেল ; উপন্যাস হয়ে উঠল বক্তব্য-প্রধান, ভাব-নির্ভর।" ঊনিশ শতকী "প্লটের অর্থ ছিলো খানিকটা ঘোর প্যাঁচ, কী-হয়-কী-হয় রুদ্ধশ্বাসে পাঠককে টেনে নিয়ে যাওয়া, নেহাতই বাইরে থেকে উত্তেজনা এনে কৌতূহল জাগিয়ে রাখা, তারপর গ্রন্থি-মোচনে সমস্ত কিছু মিলেয়ে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া।"

"রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-উপন্যাসে একটা অস্বস্তিকর ভাব ধরা পড়ে, যেন লেখকের বুদ্ধি আর প্রবৃত্তি ভিন্ন পথে যেতে চাচ্ছে। যখন হৃদয় চায় হৃদয়ের কথা বলতে। তখন মগজেব কারখানায় চলছে প্লটের চতুরালির চেষ্টা।" "প্লটের গল্প যান্ত্রিক কৌশল ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ (করে) না। এ ধরণের গল্প তারাই সাধারণতঃ লেখেন, যারা ভাবুক নন, জীবনের ব্যাখাতা নন, অথচ বুদ্ধি যাদের দ্রুতগ এবং লেখনী তৎপর।" রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন উপন্যাস সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সপ্রশংস উক্তি ঃ "...কাহিনীর অংশ সরল হ'লো, লঘু হ'লো উদ্ভাবনার দায়, এলো স্বগতোক্তি মননশীলতা, বিশ্লেষণী পদ্ধতি। প্রধান হয়ে উঠল পাত্র-পাত্রীর মন ; তারা কি করছে, কী ঘটছে তাদের জীবনে, সেটা যেন উপলক্ষ্য মাত্র, অপরিহার্য ছল। তার উত্তরজীবনের কথাসাহিত্যে নিছক গল্প বলতে চান নি রবীন্দ্রনাথ, মানুষের গহন মনে আলো ফেলতে চেয়েছিলেন ; চেয়েছিলেন উপন্যাসকে কাব্যের সধর্মী ক'রে তুলতে।" এই সব মন্তব্য যতটা-না রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রকে আলোকিত

করে তার চাইতেও বোধ হয় বেশি করে বুদ্ধদেবের নিজের উপন্যাসের চারিত্র্য ও দুর্বলতা।

প্লট শুধু মাত্র কতগুলি ঘটনা ও চরিত্রের গ্রন্থিল বিন্যাস ও তার কুশলী ক্রমোন্মোচিত অর্থাৎ রহস্যোপন্যাসের মার্জার-মূষিকের রুদ্ধশ্বাস লুকোচুরি নয়ঃ কার্য-কারণের নিগূঢ় সূত্রে গাঁথা কতগুলি ঘটনা ও চরিত্র এমন ভাবে বিন্যস্ত বেণীবন্ধ যা শিল্পীর থীমের প্রতীক হয়ে ওঠে। এবং যেহেতু থীম আসলে শিল্পীর জীবনভাবনা ও অভিজ্ঞতার নির্যাস, প্লট হচ্ছে শিল্পীর জীবন ভাবনার ও দর্শনেরই শিল্পিত তথা প্রতীকী প্রতিভাস।

থীমের গরিমা প্লটকে সমৃদ্ধ করে; পক্ষান্তরে, তার অভাব প্লটকে দারিদ্র্যের পাণ্ডুরতা দেয়। কিন্তু ভুললে চলবে না থীমকে বিকশিত করতে সাহায্য করে প্লট। থীম ও প্লটের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক এবং একে অপরের পরিপূরক। প্রায় একই ভাবে প্লট ও চরিত্র পরস্পর নির্ভরশীল। 'তিথিডোর' বা 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'-র মতো উপন্যাস বাদ দিলে, সাধারণভাবে বুদ্ধদেবের উপন্যাসের নির্মিতি শিথিল, সরলরেখিকঃ একটি মাত্র চরিত্রকে স্পর্শ করে কয়েকটি ঘটনা অথবা বলা যায় কয়েকটি কালানুক্রমিক সংবাদ বা তথ্যের—নির্গ্রন্থিল, আনুভৌমিক সমাবেশ মাত্র। এই ছায়াশরীরী প্লট তাঁর উপন্যাসের দুই দিক থেকে শত্রুতা করেছে। এক, তাঁর উপন্যাসে ঠিক সেই ধরণের ঘটনা বা ঘটনা-চরিত্রের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় উৎসারিত ঘটনা-শৃঙ্খল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই যা তার থীমের, এলিয়ট থেকে ধার নিলে, 'তন্ময় সংশ্লেষ' বা 'objective correlative' হয়ে উঠতে পারে। ব্যাখ্যা মেলে না কেন ব্যর্থ প্রেম রণজিৎ মিত্রকে অতিনাটকীয় sadism ও ইন্দ্রিয় পরায়নতার দিকে ঠেলে দেয়: কেন না, মিতু বর্ধন ও রণজিৎ মিত্রের প্রেম যে খুব গভীর ছিল তা কোন ভাবেই ফুটে ওঠে নি। অনুরূপভাবে পদ্মিনীর প্রতি রাজীবলোচনের খানিকটা শৌখিন, খানিকটা সেণ্টিমেণ্টাল, 'দূর-থেকে-ভালবাসা' তার যৌনাচারের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। রাজীবলোচনের মানস গঠনকেও পদ্মিনীর প্রতি তার প্রায় Platonic ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না। এমন কোন ঘটনা নেই যা রাজীবের বা রণজিতের ইচ্ছাকৃতভাবে সামাজিক নীতি বা মূল্যবোধকে এবং তার মধ্য দিয়ে গোটা সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করার উপযুক্ত ব্যাখ্যা হয়ে উঠতে পারে। 'মৌলিনাথ', 'রূপালি পাখি', ইত্যাদিতে শিল্প ও সমাজের পারস্পরিক বৈরিতার প্রশ্ন বার বার উচ্চারিত হলেও যে পরিস্থিতিকে আগ্রাসী ধনবাদী আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত ব্যক্তিকে বিযুক্তির দিকে ঠেলে দেয় তেমন কোন ঘটনা-বিন্যাসের অনুপস্থিতি উপন্যাসটিকে কৈশোরক ভাবালুতার অবাস্তব স্তরে রেখে দেয়। 'সাড়া' উপন্যাসে ২য়, স্তবক ৪র্থ খণ্ডের মধ্যে সাগরের বাল্যসখী লক্ষ্মীর উল্লেখ মাত্র নেই, লক্ষ্মীর সঙ্গে পত্র বিনিময় তো দূরের কথা। অথচ শেষ (অর্থাৎ ৫ম) খণ্ডে দেখা গেল "তাহারা (লক্ষ্মী ও সাগর) মোমবাতি জ্বালাইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে, আর তাহাদের সামনে টেবিলে একরাশ পুরানো চিঠি ও কাগজপত্র স্তূপীকৃত।" ফলে সেই

লক্ষ্মীর জন্য লেখক সাগরকে যেভাবে ছাদে সারারাত পায়চারি করিয়ে মৃত্যুবরণ করিয়েছেন, তার অবাস্তবতা ও অতিনাটকীয়তা বটতলার যাত্রালেখকদেরও সমীহ জাগায়। দ্বিতীয়ঃ, তাঁর ক্ষীণতনু অতিসরল প্লট অর্থাৎ জীবনের সংকীর্ণ পারিপার্শ্বিক তাঁর সৃষ্টি চরিত্রগুলোকে করে তুলেছে দ্বিমাত্রিক এবং অনেক ক্ষেত্রে নিষ্প্রাণ। আমাদের দিকে তারা সেই মুখ পার্শ্বটিই সর্বক্ষণ ঘুরিয়ে রাখে, সেই মুখপার্শ্বটিই বারংবার আমরা দেখতে পাই, যার ওপর ও যতক্ষণ লেখক তার সম্পাতি আলোটি ধরে রাখেন। বিচিত্র ভাব-অনুভূতির তীব্রতায় ও জটিল ঘটনার আবর্তে নিজস্ব জীবন পেয়ে জেগে ওঠে না, জীবনের বাস্তবতা নিয়ে আলোছায়ার জটিল বিন্যাসে ঝলসে ওঠে না তাদের মুখ। কতগুলি প্রোফাইল আমাদের দিকে চেয়ে থাকে প্রস্তরখোদিত চিত্রমালার অনুক্ত ভূমিতে—শিল্প-তন্ময় মৌলিনাথ, নীলাঞ্জন, সাগর, পার্থ প্রতিম, সত্যেন, কপিল, সোমেন নির্বিরোধী নিঃসঙ্গ রাজেন বাবু, লাম্পট্যকে যে শিল্পে পরিণত করেছে সেই বর্ণাজিৎ মিত্র মৈথুনশিল্পী রাজীবলোচন, মনোলোকের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-জটিলতায় বন্দী ফলত নিষ্ক্রিয়তার শিকার নয়নাংশু, কম্যুনিজমের ক্যারিকেচার হারীত, সদা-স্নেহময়ী শ্বেতা।

'কাহিনী ও রচনায়' প্লটহীন মনস্তত্ত্ব-প্রধান উপন্যাসের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব মন্তব্য করেছেন: "বাঙালীর জীবনে ঘটনার ক্ষেত্র অনধিক, বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, সেইজন্য আমাদের উপন্যাসের ঝোঁক প্রথম থেকেই হওয়া উচিত ছিল মনস্তত্ত্বের দিকে।" মন্তব্যটি কৌতুককর এই কারণে যে, নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত উচ্চতা থেকে দেখলে পৃথিবীর যে-কোন গোলার্ধেরই জীবন আসলে জন্ম-মৃত্যু মৈথুন, এই তিনটি মৌল ও সনাতন ঘটনার সমষ্টিমাত্র; কিন্তু এই অনতিপরিসর বৃত্তের মধ্যেই জন্ম নেয় অসংখ্য ঘটনা, কেননা মানুষের মনের বৈচিত্র্য অপরিসীম এবং মনের সঙ্গে মনের ও মনের সঙ্গে বস্তুজগতের দ্বন্দ্বের ফলে জন্ম নেয় বা নিতে পারে অন্তহীন ঘটনা-প্রবাহ। দেখবার ইচ্ছে থাকলে বুদ্ধদেবও দেখতেন বাঙালীর জীবনেও মদ, মৈথুন ও ভাবালু-প্রেম যা তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় ছাড়াও আরো কিছু ছিল: দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, সংস্কৃতির অবক্ষয় বা রূপান্তর, শিল্পায়নের সমস্যা, সাম্যবাদী ক্রিয়াকলাপ ও তার ব্যর্থতা ইত্যাদি অনেক ঘটনা ছিল যা 'দ্য গ্রোথ অব দ্য সয়েল', বা 'দ্য ভার্জিন সয়েল আপটার্নড্'-এর মত উপন্যাসের জন্ম দিতে পারত। এগুলিকে বুদ্ধদেব লক্ষ্য করেন নি, তা নয়। তাঁর উপন্যাসে প্রক্ষিপ্ত বিভিন্ন মন্তব্য ও বর্ণনা—যা কখনো অনুকম্পামিশ্রিত, কখনো লঘু পরিহাসোজ্জ্বল, কখনো ব্যঙ্গাত্মক থেকে মনে হয় এইসব ঘটনা তাকে এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু এইসব ঘটনা উপন্যাসের উপজীব্য উপাদান হয়ে উঠতে পারে, একথা তার একবারও মনে হয় নি। আসলে ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভাসিত জীবনের বহুমাত্রিক রূপ উদ্ঘাটিত করার সাধ বা সাধ্য কোনটিই তাঁর ছিল না। কাজেই 'বাঙালীর জীবনে ঘটনার ক্ষেত্র অনধিক'—এই মন্তব্যটি আসলে

তাঁর নিজের উপন্যাসের কৃশতনু, অপ্রসূ প্লটের দীনতা আচ্ছাদনের প্রয়াস হিসেবে ধরা যেতে পারে।

তিনি বেছে নিয়েছিলেন এমন এক ধরণের প্লট যার শিথিলতা তার ভাবুকতাকে প্রশ্রয় দেয়, যাকে আশ্রয় করে তিনি গড়ে তুলতে পারেন মনোজগতের ইতস্ততঃ ভাসমান ভাব ও অনুভূতির বর্ণিল বুদ্বুদের এক শব্দময় প্রাসাদ।

যে-কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন কবিতায় অথচ বলতে পারেননি অথবা বলা সম্ভব ছিল না, তাদের বাণীবন্ধ করার উপলক্ষ্য তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন উপন্যাসের প্রশস্তকর পরিমণ্ডলে—নতুন আঙ্গিকে, শিথিল গল্পবন্ধে। "কোন একটি গল্প তার বলার আছে বলেই লেখে না, গল্পটাকে উপলক্ষ্য করে অন্য কিছু কথা সে বলে দিতে চায়।"—মৌলিনাথের সম্পর্কে বুদ্ধদেবের এই উক্তি তাঁর নিজের উপন্যাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই প্রসারিত করা যায়, এবং এই দিক থেকে দেখলে তঁর উপন্যাস তঁর কবি-ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ তথা আবেগের উপজাত শিল্প।

একথা মানতেই হবে অজস্র কবিতা লিখলেও বুদ্ধদেব এমন একটি প্রেমের কবিতা লেখেন নি যা তীব্র, সংরক্ত, যা বারংবার পাঠককে টানে ; রুপালি শব্দের চুমকি ছড়ানো চটুল ছন্দের কয়েকটি মোলায়েম পদ্য বাদ দিলে এমন কোনো কবিতা লেখেন নি যা তাঁর নিবিড় প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় বহন করে : এমন কোনো কবিতা তিনি লেখেন নি যা সমাজ-সভ্যতা বা মানবেতিহাসের ওপর হীরক-খচিত মন্তব্য হ'য়ে উঠতে পারে ; এমন কোনো কবিতা তাঁর নেই যা জীবনের ট্র্যাজেডির নিবিড় উচ্চারণ।

বস্তুত তাঁর সার্থকতম ও তীব্রতম কবিতায়--যে-কবিতা সব সময়েই কবিতার জন্য প্রতীক্ষার কবিতা অথবা কবিতা শিল্প-বিষয়ক কবিতা- মনোযোগী অনুধাবনে ধরা পড়ে শরীর-নির্ভর মানুষের প্রতি এক ধরণের প্রচ্ছন্ন ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা ; তাঁর মনের গহন মানসপটে মানুষের যে রূপটি লুকিয়ে থাকে, পীড়া দেয়, তা এক দেহ-সর্বস্ব, ফলতঃ ক্লেদাক্ত, পচনশীল জন্তুর, মানুষের প্রায় যে-রূপটি সেইন্ট অগাস্টিনের নির্মোহ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল : inter urinas it faeces, nascimur ('We are born between urine and faeces') এবং যা ঊনিশ শতকী ইউরোপের অবক্ষয়ী চিন্তাকে নেপথ্যে পুষ্টি জুগিয়েছে ঃ

(ক) ঘটায়, ঘোমটার তলে, মৌলিকের নিত্য রূপান্তর –
পদার্থের, চেতনায় ; স্পন্দমান মাংসের, মানসে ;
বিষ্ঠার, প্রোজ্জ্বল ফুলে ; অঙ্গারের, নবান্ন-পায়সে ;
এবং মলের ভাণ্ডে ছেঁকে তোলে সম্ভাব্য ঈশ্বর।

(খ) 'ইচ্ছায় চঞ্চল, আজও মানিস না অদম্য উজান,
যূপবন্ধ জন্তু, তুই এইটুকুই ভাগ্য ব'লে মান।'

(গ) 'চর্মসার কদর্য পুঁটুলি হবে, যা তোমার আগুনের ভাঁড়,
মলত্যাগী খাদক জঞ্জালমাত্র, যা আজ ফুৎকারে ওঠে জ্ব'লে ;

এমনকি স্মৃতিও নাড়ে না যাকে, ঠাণ্ডা ক-টি বস্তা-বাঁধা হাড় —
অন্ধ, মূক, জান্তব অস্তিত্ব শুধু —হৃৎপিণ্ড তখনো সচল।·'

যেহেতু··· 'প্রতিভা ও প্রাণের প্রকাশমাত্র, আর প্রাণ শরীর-নির্ভর', এই জান্তবতা থেকে উত্তরণের দুটি সম্ভাব্য পথ ঊনিশ শতকী দ্বিধা-দীর্ণ কবি শিল্পীর কাছে— যেমন বুদ্ধদেবের কাছেও —খোলা ছিল কার্ডিন্যাল নিউম্যানের বিখ্যাত খেদোক্তিতে : "Poetry is the refuge of those who have not the Catholic Church to flee to and repose upon" ঊনিশ শতকের অনেক কবি / শিল্পীই উত্তরণের সোপান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন হয় ক্যাথলিক চার্চ অথবা 'the holy city Byzantium': বুদ্ধদেবকে বেছে নিতে হয়েছিল উত্তরণের দ্বিতীয় বিকল্প —'the holy city of Byzantium', 'the artifice of eternity' :

(ক) ভগবান, ভগবান, অন্তর এটুকু দাও, যাতে
পারি কোনো কবিতার ছায়াভরা জ্যোৎস্নায় বোঝাতে
আমরাও আঁতুর ছিলো দেবতায় বিধ্বস্ত নীলিমা।

(খ) হয়তো বা আমাকেও তবে
অন্তরের ক্ষমাহীন তিলোত্তমা, রূপের বাস্তবে
ধরা দেবে একদিন— শুধু যদি অপেক্ষার ধৈর্য না ফুরায়।

কিন্তু এই 'তিলোত্তমা', যিনি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সুন্দরীর মতই চির-অধরা, কোন কবিকেই পূর্ণভাবে ধরা দেন না, যেমন বুদ্ধদেবকেও দেন নি, যদিও তাঁর ভাষা ছিল অমিতবিত্ত, অনুভবের বিস্তৃতি ও সূক্ষ্মতা ঈর্ষণীয় এবং আবেগ সতত-প্রবাহী। স্তিমিত প্রেরণার অবসন্ন মুহূর্তে অতৃপ্তি-তাড়িত বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল যে তিনি তাঁর জীবন-এষণার বা তার মৌলিক বিশ্ববিষাদের সেই পূর্ণতম, মহত্তম ও চূড়ান্ততম উচ্চারণ দিতে পারেন নি বা পারবেন না, যা তাকে দিতে পারে বাঞ্ছিত অমরত্ব। তাই কবিতায়-অনিঃশেষিত, উদ্বৃত্ত এবং বর্জ্য অথবা উপেক্ষিত ভাবনা-আবেগ অনুভূতি ও শব্দপ্রীতিকে স্থানান্তরিত করেছিলেন তাঁর কথাশিল্পে। যে চিত্রময় শব্দের অনাবিল বিচ্ছুরণ, যে ভাবনা-অনুভূতির ধ্বনিময় কারুকার্য এবং সর্বোপরি যে রোমান্সধর্মিতা তাঁর উপন্যাসে একধরণের কাব্যিক-সিম্ফনির আবেশ সৃষ্টি করে, তা আসলে তাঁর কবিতার অপ্রসৃত, উদ্বৃত্ত —এবং, কিছু পরিমাণে, ব্যক্তিগত জীবনের অবদমিত—আবেগ বাসনা ও অনুভূতির প্রতিফলন। এই 'কাব্যিকতা' সত্ত্বে· বুদ্ধদেবের উপন্যাস কাব্য-ধর্মী উপন্যাস নয় যে অর্থে হার্ডি-র 'আণ্ডার দ্য গ্রীন উড, ট্রী', 'ফার ফ্রম্ দ্য ম্যাডিং ক্রাউড্'। ইউস্নারি কাবাবাতা-র 'থাউজনড্ ক্রেইনজ্', হামসুন-এর 'প্যান', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবা-রাত্রির কাব্য' বা বুনিনের ছোটগল্প 'দ্য সান্-স্ট্রোক্', জীবনের রূঢ় বাস্তবকে উপেক্ষা না করেও কবিতার সহযাত্রী। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে যে-ধরণের কাব্যিকতা দেখতে পাওয়া যায় তা আসলে বাস্তব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার আয়োজন মাত্র। তাঁর উপন্যাসের অন্তঃসত্তা কবিতা নয়, কৈশোরকতা।

তাতে এমন কোনো ব্যঞ্জনা নেই, এমন কোনো প্রতীকী সম্মিধি নেই যা আমাদের তৃতীয় নয়ন খুলে দিতে পারে, যা আমাদের বোধ ও বোধির সেই সুন্দর প্রত্যাশাতীত বিপর্যয় ঘটাতে পারে, যা কবিতা-পাঠের অন্তিম পুরস্কার। কাব্যিকতা তার উপন্যাসের অপরিণতি ও কৈশোরকতাকে আরো প্রকট ক'রে তোলে, যেমন চিকনের কাজ-বরা সিল্কের পাঞ্জাবী কিশোরকে বয়স্কের মর্যাদা ও সৌন্দর্য তো দেয়-ই না উপরন্তু তার অপরিণতিকে নগ্নতর করে তোলে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ
২। Mark Longaker (ed), The Pomes of Ernest Dowson.
৩। Villiers De L'isle Adam, Axel.
৪। Baudelelie, Selected Poems, trans, & ed., Joann Richardson,
৫। Ernst Fischer, The Necessity of Art A Marxist Approach.
৬। Verlaine, Prologue to Poemes Saturniens, উদ্ধৃত ও অনূদিত, Vivian De Sola Pinto, Crisis in English Poetry.
৭। যেদিন ফুটলো কমল (১৯৩৩)
৮। নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১)
৯। সাড়া (পরিমার্জিত, ১৯৫৯)
১০। W. B. Yeats, Selected Poems.
১১। বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য'।
১২। The New Cambridge Modern History, XI (ed) F. H. Hinoley.

রবীন্দ্র গুপ্ত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন খুঁজতে শিল্পের খোঁজে

তিরিশ-চল্লিশের দশক বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রতিভার পদধ্বনিতে মুখর। তখনই 'কল্লোল-কোলাহলে' প্রেমেন অচিন্ত্য বুদ্ধদেব, প্রবোধ সান্যাল শৈলজানন্দ, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করেছেন। মানিক হয়তো সে-অর্থে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' নন। তবে অতসী মামী, দিবারাত্রির কাব্য, জননী পুতুল নাচের ইতিকথা ও পদ্মা নদীর মাঝি ১৯৩৫-৩৬ সালের মধ্যে রচিত। এই সময়ের মধ্যেই তিনি খ্যাতির তুঙ্গশিখরে অথচ তাকে ঘিরে কিছু সাহিত্যিক বিতর্ক তখন থেকেই চলে আসছে। আজও তার শেষ হয়নি।

যে-কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই এটা সুলক্ষণ। কেউ মানে, কেউ মানে না, কিন্তু কারো পক্ষেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ বাজি রেখে গল্প সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেও শৈশব থেকেই তার স্বভাবে ছিল এক দুর্নিবার কেন-র তাড়না। অনেকটা বঙ্কিমের জিজ্ঞাসার মতো : 'এ জীবন লইয়া আমি কি করিব' ... প্রশ্নের সন্ধানে ব্রতী যে-মানুষ, সে শিল্পের লক্ষ্যে উপনীত হবেই। মানিক তাই গতানুগতিকের সরণি ধরে হাটেন নি দিবারাত্রির কাব্য বাংলা কথাসাহিত্যে ব্যতিক্রমী রচনা। হেরম্ব সুপ্রিয়া অশোক আনন্দের কাহিনী বঙ্কিম-রবীন্দ্র শরতের উপন্যাসের ছকের বাইরে। সুপ্রিয়া। পুরনো প্রেমস্মৃতি, প্রথম যৌবনের দাম্পত্য অশোকের সুখী সংসার সুপ্রিয়াকে দ্বন্দ্বে ফেলেছে। কিন্তু লেখক বোধহয় অজ্ঞাতে ঢুকে পড়েছেন হেরম্বর মধ্যে। তার বিজ্ঞানীর মতো জীবনকে দেখা, উপভোগ না নিরীক্ষা এক্সপেরিমেন্ট বাংলা উপন্যাসে নতুন। এই নিরীক্ষা, কৌতূহল যত তীব্র, বাস্তব অভিজ্ঞতা ততটা গভীর নয়। অনেকটাই কল্পনাবিলাস। তাই গদ্যবাহন উপন্যাসে এসেছে কবিতা অনিবার্য টানে। এর তিনটি ভাগ দিবা, রাত্রি এবং দিবা-রাত্রি। অখণ্ড জীবনের প্রেক্ষিতকেই রূপকাশ্রয়ে হাজির করে। একই সঙ্গে রোম্যান্টিক এবং এ্যান্টিরোম্যান্টিক মুহূর্ত এসেছে। প্রেমের যেটা প্যাশনের দিক তার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা হিংস্রতা থাকাও অসম্ভব নয়। বিশেষত প্রেমের মন যখন রহস্যাবৃত, অংশত বা সম্পূর্ণত নাগালের বাইরে, তখন তাকে ধ্বংস করে দেখতে ইচ্ছে করে, তার বিনাশের বীভৎস চেহারা। প্রেমাস্পদ হয়ে উঠতে পারে আততায়ী। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চেয়েছেন মানিক দিবারাত্রির কাব্যে। বাংলা উপন্যাসের পাঠক নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেল। এই উপন্যাসের কোন চরিত্রই সুবলয়িত বা পূর্ণায়ত চেহারা পায়নি। কারণ মানিক কেবল তাঁর সেই সময়ের নিরীক্ষাকেই শিল্পিত করতে চেয়েছেন। 'চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection —

মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক ভগ্নাংশ'। লেখকের এই উক্তি গভীর তাৎপর্যবহ। শেষের কবিতার কবিতাংশ রবীন্দ্রনাথের মহুয়া কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে অন্বিত। রবীন্দ্র-মানসের বিবর্তন অনুসরণে তাকে বোঝা যায়। নিবারণ চক্রবর্তী পাঠকের চেতনায় কোন আকস্মিকের ধাক্কা দেয় না। দিবারাত্রির কাব্যের কাহিনী বয়নের রূপকাশ্রয়, চরিত্রের মানসিক ভগ্নাংশ এবং কবিতার মুখবন্ধ মিলে জীবনের রহস্য-সন্ধানী মানিকের নতুন উপন্যাস-নিরীক্ষা।

[দুই]

'জননী'র বিষয় 'দিবারাত্রির কাব্য' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বয়স এবং সামাজিক-পারিবারিক সংস্থান বদল হলে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব বদলায়। অন্তত শ্যামার মতো আত্মসচেতন মেয়ের ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন সত্য হতে পারে। প্রথম জননী হবার প্রস্তুতি, আকুলতা, আশংকা—পরে অভ্যাসিক নিয়মে পর্যবসিত। শ্যামা তখন গৃহিণী। আবেগের অংশ কর্তব্যে এবং সংসারের নিয়মে রূপান্তরিত। মেয়ের প্রতি বাৎসল্য, সেই মেয়ে মা হল, তখন দুই মা প্রতিদ্বন্দ্বী। মনোবিশ্লেষণ কথাসাহিত্যিকের কাজ এবং বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তিনজনেই পুরুষের চেয়ে নারীর মনোজগৎ উন্মোচনে বেশি উৎসাহী হয়েছেন। তবু জননীর মহিমার আড়ালে যে কূটৈষা বা গূঢ়ৈষা, তার এমন নির্মোহ নিখুঁত চিত্রণ এর পূর্বে দেখা যায়নি।

'জননী' উপন্যাসের গঠন একেবারে নাটকীয়তামুক্ত। কোন অসাধারণের চমক, বিপুল আত্মত্যাগ, গভীর দেশপ্রেম, জেলের বর্ণনা, দ্বন্দ্ব-জটিল প্রেমের টানাপোড়েন বা জৈব রিরংসা কিছুই জননী-তে নেই। বোঝা যায়, লেখক বাইরে থেকে ঝড় তুলবার কোন আয়োজন করেন নি। শ্যামার মনের জগতেই এ কাহিনীর পরিধি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সে পরিধির রঙ, সীমা, আয়তন বদলেছে। তবু শ্যামার অস্তিত্ব শ্যামার মধ্যেই। কলকাতার শহরতলী থেকে বনগা, আবার শহরতলী, নিজের বাড়ি বিক্রির পর সেই বাড়িরই ভাড়াটে বাসিন্দা—এতগুলি অবস্থান্তর অবশ্যই শ্যামার মনে আলো-ছায়া ফেলেছে। কিন্তু সে-সবই শরতের মেঘের মত অচিরস্থায়ী। সাধারণতঃ বাংলা উপন্যাসে অবস্থান্তরের মানস-প্রতিক্রিয়া ভাব-প্রবণতার চোরাবালিতে নিয়ে যায়। তাতে পাঠকেরও স্বস্তি। নিজের চেহারা বিম্বিত হয় কাহিনীর দর্পণে। নিজের ক্ষমতা ও বিফলতার যেন আশ্রয় মেলে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মায়ের মনের বিচিত্র 'মুড', তার ইচ্ছা বেদনা শোক ঈর্ষা আত্মদৈন্য এবং তৃপ্তির আনন্দ—বিচিত্র অভিঘাতে পরিস্ফুট করেছেন। কাহিনী-বিন্যাসের এই বাহুল্য বর্জিত চরিত্রভিত্তিক ছক লেখকের প্রবল আত্মবিশ্বাসের সূচক। গন্তব্যে পৌঁছতে পারার সিদ্ধি বিষয়ে লেখকমাত্রেরই সংশয় থাকে। প্রথম পর্বে তা আরও স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূচনাপর্ব আত্মবিশ্বাসে সুস্থিত।

এক নম্বর ছক ঃ বিহঙ্গ চোখে কাহিনীর তিন পর্যায়

	১ কলকাতা পর্ব			২ বনগাঁ পর্ব	৩. কলকাতা পর্ব
শ্যামা	মাতৃত্বের স্বাদ	প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ ও পুত্র শোক	অনুবৃত্তি। বিধান, বকুল মণি ও ফণী	রাখালের সংসারে কর্মব্যস্ত। নিজের সন্তানের প্রতি খর দৃষ্টি। বিধানের জন্য খাবার চুরি। বকুলের গান শেখার আগ্রহ। সুপ্রভার স্নেহের সদ্ব্যবহার। শংকর বা মোহিনীর সঙ্গে বকুলের হৃদ্যতা বিষয়ে কৌতূহল।	শ্যামা বিধানের চাকরি। বিভা-শামু। বিভার প্রণয়াথী বনবিহারী। তুলনায় বকুলের ভবিষ্যৎ চিন্তা। বিধানেরও। বিভা বা শামু কি বিধানের পছন্দসই। বিধান-সুবর্ণ। ঈর্ষামিশ্র মনোভাব। ক্লান্তি, অবসাদ। শীতলের শিয়রে মৃত্যু। সুবর্ণের মাতৃত্বের সম্ভাবনা। কর্ম-ব্যস্ততা। কাহিনীর সমাপ্তি।
মন্দা	বঞ্চিত মাতৃত্ব, চাপা ক্ষোভ	বলপূর্বক মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা. পূর্ণতৃপ্তি			
বিষ্ণু-প্রিয়া	ঈর্ষামিশ্র দৃষ্টি, মাতৃত্বের স্বাদ	পুত্রশোকের ছবি কি রকম। প্রৌঢ়তা, রূপচর্চা	× × × ×	বাড়ি-বিক্রীর টাকা নিয়ে শ্যামার সঙ্গে সংঘাত। × ×	

দ্ব নম্বর ছক ঃ শ্যামা-শীতলের দ্বন্দ্ব

	ক মাতৃত্বের পূর্বে	খ. প্রথম মাতৃত্বের পর	গ আরো তিন সন্তানের পরে	ঘ.
শ্যামা	অসুখী। স্বামীর হাতে লাঞ্ছনা, প্রহার। হাতে-পেটে কাটা দাগ। বন্ধ্যাত্বের বেদনা সব অপমানের চেয়ে বড়ো।	অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ, অনুভূত অনুভব। নবজাতকের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। মন্দাকে তিরস্কার। সুখী বর্তমানের দিকে তাকিয়ে বর্তমানে ত্যাগ-বর্জনে তৃপ্ত।	সুখী। সন্তান নিয়েই বিভোর। তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য রুচি নিয়ে উদ্বেগ। শীতলের স্থান সংকুচিত। ব্যতিক্রম বসন্তে ছাতের আহ্বান।	বিধানকে নিয়ে পরীক্ষা। শীতলের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।
শীতল	মামার সম্পত্তির লোভ. আলস্য বন্ধুপ্রীতি, অমিতব্যয়িতা, স্ফূর্তি। মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি। দায়ভারহীনতা।	যেন সে বাইরের লোক। মন্দার তিরস্কার। দ্বন্দ্বের বীজ রোপণ। বর্তমানকে নিয়ে আনন্দ সম্ভোগের বাসনা. চপল ইচ্ছা অতৃপ্ত।	অবহেলিত হবার যন্ত্রণা। বিরোধ। বকুলের আশ্রয়। বিধান মার, বকুল শীতলের। পায়েস নিয়ে কলহ। বিছানার অংশ নিয়ে। বকুলের সঙ্গে উধাও —নতুন জামা ও খেলনাসহ অনেক রাতে ফেরা।	পিতৃত্বের বোধ। ছেলেকে শাসনের ইচ্ছা, কর্তৃত্ব। বিধানের পড়া-ধরা এবং নিজের অক্ষমতায় আত্মগ্লানি। শ্যামার উক্তি আগুনে ইন্ধন। বিধানকে প্রহার —চাপা আক্রোশের বিস্ফোরণ।

দুনম্বর ছক ঃ (অনুবৃত্তি) শ্যামা-শীতলের দ্বন্দ্ব

	ঙ.	চ.	ছ.
শ্যামা	সংসার গোছানোর আগ্রহ বৃদ্ধি। সকলকে নিজের সন্তানের স্বার্থে কাজে লাগানো। বিষ্ণুপ্রিয়া, শংকর, মামা ইত্যাদি। দোতলার ঘর। গৃহিণীপণার আর এক ধাপ। শীতলের সঙ্গে পরামর্শ নয়। শীতলের জেল ঠেকাতে চুরির টাকা বার করে নি। সন্তানের ভবিষ্যৎ বড়ো। জায়া-সত্তা নিহিত।	ষোল আনা নিজের বক্তে। কর্তৃত্বের নিশ্ছিদ্র সুযোগ বিবিধ কৌশলে সংসার নির্বাহ। গৃহিণীপণার নতুন পর্যায়। ঘাতসহ মন। অপমান লাঞ্ছনা হজম—বিধানের জন্য। মামা সম্পর্কে দোদুল্যমানতা, ভয় এবং ভরসা। বাড়ির একাংশে ভাড়া। বনগাঁ যাত্রা। জায়া-সত্তার মৃত্যু।	নিজের বক্তে প্রতিষ্ঠিত। সন্তানদের এবং শীতলেরও অভিভাবক। রাখালকে বলে প্রেসের চাকরি। বিধানের চাকরিতে গরবিনী মা-র সিদ্ধি। শীতল অবাঞ্ছিত। অসুস্থ অতিথি মাত্র। সমবেদনা ও সেবা—মাতৃত্বেরই অন্য প্রকাশ। সুবর্ণকে মাতৃত্বে পৌঁছে দিয়ে ছুটি।
শীতল	অবহেলিত হবা, যন্ত্রণা বৃদ্ধি। অসহায়তা। বিস্ফোরণের ইচ্ছা। শ্যামাকে শাস্তি দেবার মতলব। নিজের দায়হীনতার উজ্জ্বল ছবি হিসেবে মামার প্রতি আকর্ষণ। টাকা চুরি। শ্যামার ঘর দোতলা যেন না হয় পাশবই নিয়ে উধাও। নির্বোধের শেষ অস্ত্র—পাঁচজনের কাছে বৌকে হেয় করা। চিত্ত-বিকার। আত্মহননের পথ। পুলিশের হাতে এবং জেল।	অনুপস্থিত।	উপস্থিত। মূঢ় মূক দর্শক মাত্র। মৃত্যু।

[তিন]

মানিকের প্রথম পর্বেরই উপন্যাস পুতুলনাচের ইতিকথা ও পদ্মানদীর মাঝি। দুটি উপন্যাসে ভিতরের মিল অল্প, প্লটের বিন্যাসও ভিন্নতর। একই সময়সান্নিধ্যে মানিকের মনে জিজ্ঞাসা একই ছিল—শশী ব্যর্থ হল কেন? কেতুপুরের মানুষ ভালোবেসে ময়নাদ্বীপ যায়নি—তবে যেতে বাধ্য হল কেন? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন লেখক।

ঘটনা হিসেবে আশ্চর্য, পদ্মানদীর মাঝি এবং পুতুলনাচের ইতিকথা-র একই বছরে (১৯৩৫) আত্মপ্রকাশ। একটিতে পদ্মার মাছমারাদের জগৎ, এবং একটি অঞ্চলের ভদ্রেতর মানুষের জীবনযাত্রা; দ্বিতীয়টিতে লেখক পেয়েছেন আসল চাবিকাঠি। মানবমনের রহস্যকন্দরে প্রবেশের চাবি। এ কেবল কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপ যাত্রা নয়, গাওদিয়া ও কলকাতার দ্বন্দ্বে জর্জরিত শশীর ত্রিশঙ্কু মানসিকতার স্নায়ুযুদ্ধ। এতে ক্লান্তি আছে, মোহও কম নেই।

পুতুলনাচের ইতিকথা প্লটসর্বস্ব উপন্যাস নয়। প্লটকে ছাপিয়ে আছে একটা বক্তব্য। সেটিকে এই ভাবে বিন্যস্ত করা চলে :

১. মানুষ মনে করে, সে নিজের ইচ্ছায় চলে। কিন্তু তা কি সত্য? অদৃশ্য হাতে কে যেন সুতো ধরে রেখেছে। স্পষ্টতই নিয়তিবাদে আস্থা? কেবল কুসুমের বাবা অনন্ত বলেনি : যাদব গোপাল শশী ও বিন্দু নন্দলাল চরিত্রে এই নিয়তিবাদ সত্য হয় নি?

হেরম্ব অশোক সুপ্রিয়া অনাথ মালতী আনন্দ কেউই স্বাভাবিক নয়; কম বেশি বিকারগ্রস্ত—মানসিক গূঢ়ৈষার শিকার। আনন্দ মানিকের অসামান্য কবিকল্পনার সৃষ্টি। সে কোন বাস্তবিকা নারী নয়, হেরম্বর মতোই জীবনকে নিয়ে নিরীক্ষায় মেতেছে। তাই বয়সের ব্যবধানে কিছু আটকায় নি। সুপ্রিয়া টানতে পারেনি হেরম্বকে, বিপত্নীক প্রৌঢ় হেরম্ব ধরা দিয়েছে কিশোরী আনন্দের কাছে। আনন্দ তারই সৃষ্টি। তার চন্দ্রকলানৃত্য আশ্চর্য রূপক। আবার নিরাবরণ নিরাভরণ পরীনৃত্য ও আগুন জেলে নৃত্যচ্ছন্দে আনন্দের আত্মাহুতি হেরম্বর প্যাশানের জাগরণ ও মৃত্যুর স্মারক। প্রেমও মরে এবং মরার পরও বাঁচে—এই হল দিবারাত্রির কাব্য।

২. শশী ভেবেছে 'Man proposes, God disposes'. 'যে-বিষয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই ভেস্তাইয়া যায়।' 'একটা অদৃশ্য দুর্বার শক্তি যেন অহরহ তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। রূপসী সেনদিদির স্নেহপাত্র ছিল, কুরূপা সেনদিদিকে এড়াইয়া চলিবার ইচ্ছার জন্য তাই নিজেকে আজ অশ্রদ্ধা করিতে হয়।' কুসুমের মন, মতির ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে বলে সে অনুতাপবিদ্ধ।

৩. অথচ মানিকের যুক্তিনিষ্ঠা, বিশ্লেষণী স্বভাব সরল বিশ্বাসে পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারে নি (যা পেরেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র), গোপাল পারেনি. শশী তো বিদ্যা বুদ্ধির জোরে পুরোপুরি 'ব্যক্তি' হয়ে

উঠতে চেয়েছে। শশীর বিজ্ঞানী-দৃষ্টি জানে, শীতলা বসন্ত দেয় না, সূর্য বিজ্ঞানে মৃত্যু গণনা অসম্ভব, যাদবের পৈতের কালিমাখানো নীল দাগটি তার নজর এড়ায়না। সেনদিদির ছেলের জন্য গোপালের মমতার তত্ত্ব তার কাছে স্পষ্ট। তবু সে এসবের সীমা পেরিয়ে যেতে চায়। কুসুমের প্রেমে সে অনুপ্রাণিত, সন্দীপিত ; অথচ তাকে স্বীকৃতি দিয়ে একটা কিছু ঘটানো তার পক্ষে অসম্ভব। পরাণের কাছে সমাজের কাছে, নিজেব বিবেকেব কাছে সে দায়বন্ধ।

৪. ঘুড়ি আকাশে উড়লেও শেষ পর্যন্ত নেমে আসে মাটিতে, যেমন পাখি আসে নীড়ে। কঠোর অন্তঃসংগ্রামের পর গোপাল পারল না শশীকে আয়ত্ত করতে, শশীও না পাবল গাওদিয়াকে বদলাতে, না পারল শহরে যেতে, বিদেশ যাওয়া তো দূরের কথা। দুজনেই যেন ভাগ্যের হাতে পুতুলের মতো নেচে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামল। 'নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে মানুষেব জীবনের স্রোত বহিতে পারে ? মানুষের হাতে কাটা খালে তাব গতি এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন. অপবিবর্তনীয়।'

৫ তবে কি মানুষ অসহায় ? দৈবের হাতে পুতুল ? বিজ্ঞানমনস্ক মানিক নিশ্চিতভাবে তা অস্বীকার করেন নি পদ্মানদীর মাঝি ও পুতুলনাচের ইতিকথায়। পদ্মানদীর মাঝিতে আছে হোসেন মিঞার স্বপ্নরাজ্য, (ইউটোপিয়া) ইতিকথায় ভালোবাসার টান। গোপাল শশী কুসুম সকলেরই হার হয়েছে ভালোবাসায়। যাদবের খ্যাতিমোহ এক ধরনের ভালোবাসা—আত্মপ্রীতি। মতি-কুমুদের খাপছাড়া কাহিনীর তাৎপর্য এইখানে যে, তারা মুক্ত প্রাণ, তারা পুতুল নয়। কিন্তু যেহেতু পুতুলসত্তাব অসহায় ছটফটানি এবং ব্যর্থতা ইতিকথার উপজীব্য, তাই মতি-কুমুদ কথা সংক্ষিপ্ত। শশীকে নাড়াদেবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি নয়। পরে মতি-কুমুদ কাহিনী লেখা হবে প্রতিশ্রুতি দিলেও সে-কারণে লেখক প্রতিশ্রুতি পালনের দায় অনুভব করেন নি।

ইতিকথার সূচনাটি গভীর তাৎপর্যবহ। এক পলকেই শশীর পরিচয় মেলে। বজ্রাহত হারুঘোষের চিত্র -প্রতিকুল নিসর্গ বা দৈবনির্বন্ধের সূচক। ভালো মানুষ, সুস্থ হারু গিয়েছিল মতির জন্য সুপাত্র খঁুজতে। হঠাৎ বজ্রাঘাত। সর্পসংকুল একটি নদীর পাড়ে অন্ধকার ঝোপে মৃত হারুকে কে দেখবে ? শশী ভুত দেখার কৌতূহল নিয়েই নৌকা ভিড়িয়েছিল। দেখা গেল, হারু ঘোষ নিথর, নিস্পন্দ, বজ্রদগ্ধ। বহু কষ্টে গোবর্ধনের সাহায্যে হারুর দগ্ধ শব নৌকায় তুলে এনে সে গাওদিয়া পেঁৗচেছে। হাতে হ্যারিকেন দিয়ে গোবর্ধনকে গ্রামের মধ্যে পাঠিয়ে একা অন্ধকারে মৃতদেহের মুখোমুখি বসে কাটিয়েছে শশী।

দুটি জিনিস এখানে লক্ষণীয়। (১) শশীর আর্তসেবা গাওদিয়া-ভিত্তিক, গাওদিয়ার আকর্ষণ তার মজ্জাগত ; (২) গ্রামের মানুষ হলেও সে গ্রাম্যসংস্কারমুক্ত ; প্রেতভয়, দুঃসহ অন্ধকার, বীভৎস মৃত্যু তার কাছে ভয়াবহ নয় ; কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে সে জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক সূত্রে মনের সত্য জেনেছে—আরও জানতে চায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিপর্যবেক্ষণ কেবল বর্ণবহুল দৃশ্যের বর্ণনা নয় · প্রকৃতি এখানে চরিত্রের সঙ্গে অন্বিত। 'বটগাছের ঘন পাতাতেও বেশিক্ষণ বৃষ্টি আটকাইল না। হারু দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল। স্থানটিতে ওজোনের সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরে ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থির ভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়াই বটগাছের কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল।' দৃশ্য গন্ধ, বর্ণের সমাবেশ, সাপের মোহান্ধতা, মৃত হারুর প্রতি মুহূর্তের জন্য সচকিত হওয়া, তারপর তাকে অ-ক্ষতিকারক গাছপালার মতো মনে করে তারই দুপায়ের মধ্য দিয়ে আত্মাপসরণ শশী দেখেছে। নিসর্গের রহস্যময়তা, মৃত্যু ও জীবিকান্বেষণের অভিযান একই সঙ্গে চলেছে। জীবনের এই সত্যই শশীকে উন্মনা করে। হারুর আকস্মিক মৃত্যুর আঘাত তো আছেই—তার চেয়ে বড়ো শশীর মৃত্যু-কেন্দ্রিক জীবনভাবনা। 'আত্মীয়পরের মৃত্যুতে যাহারা মরা-মানবের জন্য শোক করে শ্মশানে শশীর শ্মশানবৈরাগ্য আসে না। জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য, অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়।' তাই ডাক্তার হিসেবে এবং ব্যক্তি হিসেবেও 'মৃত্যুর সান্নিধ্য' তাকে ব্যথিত করে। গোবর্ধন নিতাই নবীন শ্রীনাথের কাছে সে মানসিক প্রতিক্রিয়া আশা করা যায় না।

শশীর দিক থেকে গোপাল-সেনদিদি কাহিনীর কি তাৎপর্য : যেমন ছোটবাবু কুবেরের ধলা-পোলার জনক (পদ্মানদীর মাঝি), তেমনি গ্রামীন সমাজের গোপন অথচ সুবিদিত ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত · সেনদিদি তার চেয়ে বেশি—গোপালের অলঙ্ঘ্য নিয়তি। শশীর সামনে শক্ত মানুষ মহাজন গোপাল মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। মধ্যরাতে তার কাছে আকুল প্রার্থনা জানায়—সেনগিন্নির জন্য। কাশীযাত্রায় গোপালের পরাজয় সম্পূর্ণ। এ পরাজয়ে গ্লানি নেই। শশী গোপালেরই আত্মজ—তারই প্রতিক্রিয়া। গোপালের বাৎসল্যের এক চেহারা। সেনগিন্নির ছেলেকে নিয়ে বাৎসল্যের আর-এক চেহারা। তবু শশীর পিতৃত্বেই সে গর্বিত। এই গোপন ভালোবাসায় চরিত্রটি বিচ্যুতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। কেন শশী বিলেত-কলকাতার আকর্ষণ ত্যাগ করে গাওদিয়াতেই থেকে গেল, তারও কিছু ব্যাখ্যা মেলে।

শশী-কুসুমের প্রেমের স্বরূপ ? স্পষ্টতঃই মতি-কুমুদের দায়ভারহীন স্ফূর্তিসর্বস্ব প্রেম নয়। লেখক বলেছেন, 'অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সঙ্গে না মিশিলে একথা কেহ টের পাইবে না যে, তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতি মূলক বিচারপদ্ধতি আছে।' আছে বলেই কুসুমের ভালোবাসায় সে বিগলিত হতে পারেনি ; বন্ধু পরাণের একান্ত নির্ভরশীলতাকে সে আততায়ীর সুযোগে পরিণত করতে চায় নি। কলকাতা যাবার আগে নাকি 'শশীর হৃদয় ছিল সংকীর্ণ, চিন্তাশক্তি ছিল ভোঁতা, রসবোধ ছিল স্থূল' ; কিন্তু যে-শশী কলকাতা থেকে

গাওদিয়া ফিরে এসেছে সে ভিন্ন মানুষ। 'এখন তোমরা হরিবোল দিও না, হারু শ্মশানযাত্রা করেনি, বাড়ি যাচ্ছে।'—এই সূক্ষ্মবোধ গাওদিয়ার আর কারও ছিলনা। গোলাপের চারা মাড়িয়ে কুসুম যেমন তার বিক্ষত ভালোবাসার ইঙ্গিত দিয়েছে, তেমনি সেদিকে দেখেও দেখতে চায়নি শশী। তবু তার আহ্বানে তালবনে যাওয়া এবং টিলার ওপরে সূর্যাস্ত দেখার সাধ শশীর এস্থেটিক চেতনারই পরিচয়বহ। 'লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়, যায় না ? লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, এ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে ? কুসুম কি বেঁচে আছে ?' মানিক বলতে চেয়েছেন, 'আপনা হইতে যে-প্রেম জাগিয়াছিল, আপনা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে আবার তা লয় পাইয়াছে।' এই সরলীকরণে কুসুম-শশীর সম্পর্কের যথার্থ মূল্যায়ন হয়না।

ঝোঁকের মাথায় কাজ করার অভ্যাস শশীর কোনদিন ছিল না। এই ফিরে দেখা, থিতিয়ে ভাবা, নির্লিপ্ত ভঙ্গি শশীকে উচ্ছ্বসিত হতে দেয়নি। গাওদিয়াকে ভালোবেসেই সে গাওদিয়া-সমাজকে বদলাতে চেয়েছে। পারেনি। যাদব বিন্দু সিন্ধু পরাণ, শ্রীনাথ মুদীর দোকানের মজলিস—যার যার বৃত্তে অনড় থেকেছে। যে-শিক্ষা ও বিজ্ঞানচেতনা তাকে দিয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার, তার স্পর্শ পায়নি ওরা। শশীর ট্র্যাজেডি আসলে তিরিশের দশকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আশাহত ব্যর্থতার ট্র্যাজেডি। কলোনি ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মার প্রতীক হয়ে উঠেছে শশী। উপন্যাসের শেষে, তার মন্থর গতি, বাজিতপুরে মামলা চালানো, হাসপাতাল চালানো এবং তালীবনে না-যাওয়া, টিলার উপর সূর্যাস্ত দেখায় অনীহা তার আত্মিক মৃত্যুরই ইঙ্গিত দেয়। একটি সারণিতে উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্য দেখানো যায়

গাওদিয়া—১	কলকাতা	গাওদিয়া—২
গোপাল শশী সেনদিদি যামিনী সিন্ধু বিন্দু মতি কুসুম পরাণ হারু মোক্ষদা ইত্যাদি। →	মতি কুমুদ রাজনীতি সাহিত্য। মুক্তজীবনাস্বাদ সোশ্যাল কমিটমেণ্ট।	ভিন্ন শশী। পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব। কুসুম-শশী সম্পর্ক। যাদবের মৃত্যু। গোপালের পরাজয় শশীর কাছে। শশীর পরাজয় গাওদিয়ার কাছে। ←

উপন্যাসের সূচনা গাওদিয়া-(২) তে। উপন্যাস ফিরে গেছে গাওদিয়া-(১)-এ : স্বল্প সময়ের জন্য। তেমনি কলকাতা পর্বও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—এখানেই শশীর মানসগঠন স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে। গাওদিয়া (২)-এর মধ্যেও একটা অতি সংক্ষিপ্ত কলকাতা-পর্বের interlude আছে। মতি-কুমুদের গার্হস্থ্য জীবন, কতটা মতির গ্রাম্য সরলতা প্রকৃতিস্থ করল কুমুদকে—তাই দেখতে শশীর কলকাতা

আসা এবং কুমুদের প্রভাবে মতির ভাসমানতা ও বোহেমিয়ানিজম্ ওয়ার্ডস্বার্থের 'মাইকেল' কবিতার লুকের অবস্থায় শশীর ব্যর্থতাবোধ। কলকাতা-লব্ধ মানসিকতা নিয়েই গাওদিয়ার দ্বিতীয় পর্বে শশীর আত্মসমর্পণ। গাওদিয়ার দুই পর্বেই কলকাতার টান—কলকাতামুখী তীরে তারই সংকেত।

[চার]

ঔপন্যাসিকের মন ও মননের সবটুকু আলো পড়েছে কেতুপুর গ্রামে। পুরো গ্রামে নয়—জেলে পাড়ায়, আরো সুনির্দিষ্ট, কুবের পরিবারে। পদ্মার সঙ্গে সংযুক্ত কেতুপুর, সোনাখালি, দেবীগঞ্জ, চরডাঙা, আমিনবাড়ী, আকুর-টাকুর এবং উপন্যাসের পক্ষে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ—চাঁদপুর হয়ে ময়নাদ্বীপ।

পদ্মানদীর মাঝি পদ্মাবাহিত জীবনেরই অংশ, তাই পদ্মার ঋতুবদলের সূত্রেই এই উপন্যাসের জোয়ার ভাঁটা নিয়ন্ত্রিত। আষাঢ় শ্রাবণ থেকে শীতশেষ, পৌষ মাঘ অর্থাৎ ন' মাসে ঘটনাকালের বিস্তার। কচি আমপাতা অনিবার্য ফাল্গুনের ইশারা। কাহিনী সমাপ্ত। কার্তিক-অগ্রহায়ন পৌষ-মাঘের কাহিনী আছে নেপথ্যে। ধনঞ্জয়ের নৌকো ছেড়ে কুবের তখন গেছে হোসেন মিঞার নৌকো নিয়ে চাঁদপুরে—সেখান থেকে ময়নাদ্বীপে। উপন্যাসের ভেতরেই ঢোকা যাক।

> 'বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।····লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চক্‌চক্ করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়।'

এরপরেই কেতুপুরে জেলেদের কথা। জীবনের অন্য নাম সংগ্রাম। অনেকেরই নিজের নৌকো নেই, জাল নেই, নেই মূলধন। আছে জমিদার মেজোকর্তা অনন্ত তালুকদার, তার মুহুরি শীতল ঘোষ, গঞ্জের আড়তে চালানবাবু লোকনাথ—সবাইকে নিয়ে গরীব শোষণের চেনা-জানা বৃত্ত। তবে লেখকের অনবধানে অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও সংঘর্ষের দিকটি উপেক্ষিত থেকে গেছে।

কেতুপুরের জেলেপাড়া মানে কয়েকটি ঘর এবং পীতম যুগল রাসু যুগী গোপী মালা ধনঞ্জয় গণেশ আমিনদ্দি জহর।

> 'জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গভীর নিরুৎসব বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে।····ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।'

এই বর্ণনা যতই তাৎপর্যের হোক, ঠিক এই জায়গায় অবান্তর। কারণ উপন্যাস এর আগেই শুরু হয়ে গেছে। পদ্মানদীর মাঝির গঠন যথার্থ নাটকীয় নয়। কুবের বা মালার জীবনে নাটক নেই।·কপিলা এনেছে কুবেরের প্রচণ্ড আলোড়ন এবং নাটক।

যথার্থ নায়ক বোধহয় পদ্মা। সে-ই নায়কের বিকল্প। উপন্যাসের ভাঙা-গড়া তারই সৃষ্টি। পদ্মার ঝড়ে মাঝিদের বিপর্যয় আমিনদ্দি ঘর ধসে পড়া ; বিবি ও ছেলের ইন্তেকাল ; গোপীর পা ভাঙা। ময়নাদ্বীপ এখনও কেতুপুরকে গ্রাস করে নি। প্রতিকূল নিয়তি এবং তার প্রতিস্পর্ধী হোসেন মিঞা মানিকের আশ্চর্য সৃষ্টি। আমিনদ্দি দেখতে পারে না হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপকে—তবু তাকেই যেতে হল কুবেরের আগে। গোপীর চিকিৎসা করাতে টাকা দিয়েছে হোসেন। তার কালির খতে সেদিনেই কুবেরের ঠিকানা বদল হয়েছে ময়নাদ্বীপে।

শ্যামদাসের বউ কপিলাকে নিয়ে যে উপকাহিনী, তাই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় মূল কাহিনী। মানুষের জীবনের রহস্য, অবদমিত কামনার জাগরণ, মানিকের জীবন-নিরীক্ষা, সব মিলিয়ে একটি গোপন অবৈধ অথচ আবেগ গাঢ বাস্তব প্রেমের কাহিনী। একেবারেই বাহুল্যবর্জিত। কিশোরী কপিলার লীলালাস্যময়ী চেহারা যুবতী কপিলার ওপরে আরোপিত হয়। 'হ, সেই পুরনো দিনের স্মৃতি গাঁথা হইয়া গেছে কুবেরের মনে।' নীল ডুরে শাড়ী, আলুলায়িত চুল, গায়ে-পড়া হাসি কুবেরকে চঞ্চল করেছে। বাবুদের বাড়ি পুজোর দলোনে একটি মুহূর্ত ; কুবের ও কপিলা পরস্পরের আয়নায় নিজেকে দেখছে।

'লোকে বলিবে কি' ভেবেছে কুবের, কপিলা নয়। যে কপিলা অচ্ছেদ্যভাবে কুবেরের অন্তরে—তার ছবি ঃ 'নদীর বাতাসে কপিলাকে স্পষ্ট করিয়াছে, শাড়ীখানি মিশিয়া গেছে অঙ্গে। বেগুনী রঙের শাড়ীখানি পরিয়াই সে যে আজও পথে বাহির হইয়াছে, এতক্ষণ কুবের তাহা লক্ষ্য করে নাই।' অন্যত্র বর্ণনা আছে—'দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলার, বর্ষার পদ্মার মত।' বর্ষার ভরা পদ্মার সঙ্গে কপিলার ভরা যৌবনের তুলনা !

হোসেন মিঞা বলেছিল, 'খুশ হৈলে না পারি কি।' তাই কপিলাকে নিয়ে কুবের যেতে পেরেছে ময়নাদ্বীপে। পুলিশের তাড়া, ঘটি চুরির নিন্দাভয় একান্ত তুচ্ছ। একটি ছকে কেতুপুর ও ময়নাদ্বীপে কাহিনীর বিস্তার দেখানো যেতে পারে।
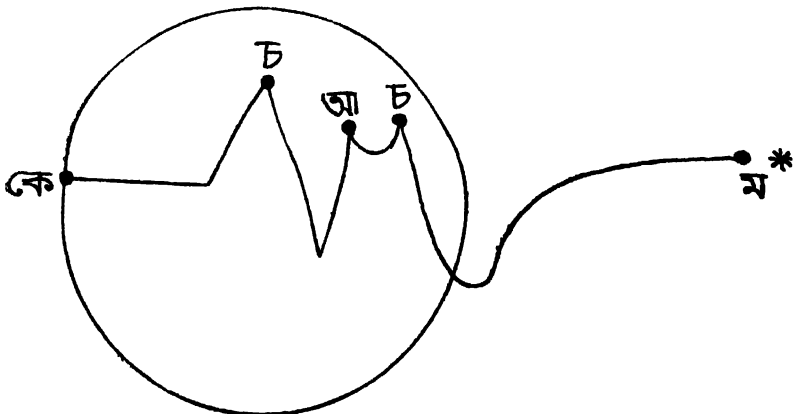
কে = সমতল জীবন। চ = চরডাঙা। আ = আকুর টাকুর। ম = ময়নাদ্বীপ।

প্রথমে কেতুপুর / বৈচিত্র্যহীন জীবন-প্রবাহ সরলরেখা / দ্বিতীয় অধ্যায় / চরডাঙা কপিলা সঙ্গে সাক্ষাৎ / কুবেরের চিত্তে আলোড়ন / আ —উত্তেজনার স্মারক বিন্দু / চ—কুবেরের আত্মসাক্ষাৎ / তৃতীয় অধ্যায় / আবার কেতুপুর সমতলে বিক্ষেপ / চতুর্থ অধ্যায় / আকুর টাকুর / কুবেরের উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা, তাই আ-বিন্দুটি চ-এর নীচে। আবার চ-কে-তে গেছে অনিবার্য টানে। কপিলাকে কুবেরের চাই। যে মেয়ে কুবেরকে টানছে তার উত্তোলিত দুই বাহু, ছলনাময় হাসি, 'বসিবার দুর্বিনীত ভঙ্গি' / তেলেভেজা চুল ও কপাল, বেগুনী শাড়ী / স্মৃতির পর্দা ঠেলে উঠেছে পুকুরের স্নানের দৃশ্য।

স্বপ্ন দেখেছে কুবের, হোসেন বলছে, 'তাই করুম কুবীর ভাই তাই করুম —আইন্যা দিমু কপিলারে।' এর পরেই দুজনের নিরুদ্দেশ যাত্রা ময়নাদ্বীপে। কুবের আর ফিরে আসে নি। পীতম যুগলরাসু গোপীমালা সব রইল পড়ে। সে জন্যই চরডাঙা কেতুপুর আকুরটাকুর আমিনবাড়ী নিয়ে উপন্যাসের বৃত্ত। তার বাইরে ময়নাদ্বীপ। সেখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

[পাঁচ]

ঔপন্যাসিক মানিকের মূল্যায়নে সব উপন্যাসের ধারাবাহিক আলোচনা অবশ্যই সবচেয়ে নিরাপদ ও নির্ভুল পদ্ধতি। কিন্তু বর্তমান আলোচকের তা লক্ষ্য নয়; তার প্রয়োজনও নেই। বিখ্যাত উপন্যাস-সমালোচক আরনল্ড কেটল যে নির্বাচন-মূলক পদ্ধতি অনুসরণে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকদের শিল্পকৃতিত্ব বিচার করেছেন, আমার কাছে সেটিই গ্রহণীয় মনে হয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাতেই লেখকের দোষ-গুণ, বিশেষ প্রবণতা, এমন কি বিশ্বাসের মুদ্রাদোষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। তাঁর নিজস্ব জীবন-ধারণা ('Pattern') চরিত্রবিন্যাসে অনুস্যূত হয়।

মানিক-সাহিত্যের অন্যতম দুর্বোধ্য এবং বিতর্কিত উদাহরণ 'অহিংসা'। সমকালীন অহিংস সত্যাগ্রহের রাজনীতি বনাম বিপ্লবপন্থার সঙ্গে উপন্যাসের কোন যোগ নেই। কিন্তু 'অহিংসা' গভীর ও গূঢ় অর্থে উদ্দেশ্যমূলক বস্তুবাদী। ধর্মের আড়ালে ভণ্ডামি, ব্যবসা, বৈষয়িকতা, ক্ষমতার লড়াই, গুপ্তহত্যা, অবদমিত যৌন-আকাঙ্ক্ষার বিকার, প্রতিহত লালসার বীভৎস পৈশাচিক প্রতিহিংসা এবং সর্বোপরি এসবের অস্তিত্ব জেনেও মানুষের ধর্ম-মাদকে আসক্তি কত প্রবল উপন্যাসের তাই বিষয়বস্তু।

প্রাণীবিজ্ঞান মতে, মানুষ যুক্তিবাদী জানোয়ার। জানোয়ার-সত্তাকে আড়াল করতে তার যুক্তি বা বুদ্ধির অছিলা নানা মত ও প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে। সাধু বাবাদের আশ্রম ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান। সাধন-ভজনে ফাঁকি সদানন্দের, মহেশ চৌধুরীর, ভক্তিতে ফাঁকি শ্রীধর শশধর উমা রত্নাবলীর। মজার কথা এই, উভয়-পক্ষই পরস্পরের ফাঁকি সম্বন্ধে অবহিত। তবু ঠাট বজায় থাকে দুই পক্ষেরই। সেই ঠাটের অর্থ-ভিত্তি যোগায় লম্পট মহীগড়ের রাজা।

হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপের সঙ্গে তুলনীয় বিপিনের আশ্রম। হোসেনের মতো বিপিনও সদালাপী ; কেউ স্বেচ্ছায় ময়নাদ্বীপে যায়নি, যেতে বাধ্য হয়েছে : তেমনি বিপিনের আশ্রমে যারা এসেছে –তারাও বিপিনের কবলে আসতে বাধ্য হয়েছে। উমা-রত্নাবলী সংসার পীড়নে বিরক্ত হয়ে এসে উঠেছে আশ্রমে। মহীগড়ের রাজার কিছু পাপ গোপনের দায় নিয়েছিল আশ্রম, তাই অনেকখানি জমি বন্দোবস্ত পেয়েছে। তাঁর ছেলে নারায়ণের ব্যভিচারের শিকার মাধবী। তাকে ব্যবহার করে বিপিন আশ্রম-ব্যবসায়ে পশার জমাতে চেয়েছিল। পেরেছিলও। আমবাগান এবং 'বন্দোবস্ত-জমির মালিকানা। কিন্তু সদানন্দের অবদমিত যৌন কামনা উদগ্র হয়ে উঠেছে মাধবীর ভরা যৌবন দেখে। এখানে ফ্রয়েডের প্রসঙ্গ সঙ্গতভাবেই এসে পড়ে। দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন' অথবা যুক্তিবাদী জানোয়ার। কোন কারণে যুক্তিলোপ পেলে থাকে শুধু জানোয়ার। বিপিন সদানন্দ মহেশ তিনজনেই জানোয়ার। পাকা ব্যবসায়ী। তিনজনেই ভন্ড ধার্মিক - অথচ যশের কাঙাল, ধর্ম-উপদেশের মাতলামি-রসে বিহ্বল। মাধবীরও চিত্তবিকার আছে। আগুন কেমন পোড়ায়—অনেকে হাত পুড়িয়ে জানতে চায়। মাধবী জানে, নারায়ণ বিপিন সদানন্দ একই-রকম। শশধর বিবাহিত, তবু গোপনে রত্নাবলীর সঙ্গে রাত্রিতে মস্করা করতে আসে। সদানন্দের লোলুপ দৃষ্টির মানে সে বোঝে। এ দৃষ্টি লম্পট জমিদারনন্দন নারায়ণেরই। হাড়-পাঁজর ভেঙে দেবার মত আলিঙ্গন। পশুর দেহপিপাসা। এই হল স্বামী সদানন্দ। প্রকাশ্যে প্রশান্ত ভাব, প্রসন্ন হাসি, স্বল্পবাক, ধর্মীয় উপদেশ ইত্যাদি, অন্দরে এবং অন্তরে কুৎসিত পশু।

বিপিন-সদানন্দের অন্তরঙ্গ আলাপ পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে। অত্যন্ত স্বার্থপর, নীচ, ব্যবসায়ী দুই বন্ধু। পরস্পরকে ভালোবাসে এবং ঘৃণা করে। নীচতার সহযোগই বন্ধুত্বের অন্য নাম। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। আশ্রমের শান্তির আড়ালে দুই পুরুষের শক্তি, ঈর্ষা ও কামনার কুটিল দ্বন্দ্ব। ফুল লতা-পাতা পাখির ডাক রাধাই নদী মিলে একটা আশ্রমিক বাতাবরণ সত্ত্বেও ঘৃণ্য ক্লিন্ন একটা পরিবেশ।

এমন জায়গায় এসে পড়েছে মাধবী পুরুষের রক্তধারায় আগুন জ্বালতে পারে এমন সুন্দরী এক নারী। সামন্ত প্রভুদের কাছে নারী নিছক উপভোগের বস্তু, জীবন্ত মানুষ নয়। এমনই এক জননী-জঠরের লজ্জা কুমার নারায়ণ। বিপিনের মাধ্যমে জেনেছি, তার বাবা মহীগড়ের রাজার বিলাসকক্ষে অনেক নগ্নিকার ছবি টাঙানো। বিলাস বিকার ব্যভিচারে ঐশ্বর্যপুষ্ট এদের শরীরে মালিন্যের ছাপও অচিরস্থায়ী। নারায়ণের কামনার শিকার মাধবী—তাকে সে আশ্রমে চালান করেছে। এই সুযোগে বিপিন কিছু সম্পত্তি বাড়িয়েছে। মাধবীর পূর্বেও ছটি মেয়ে এইভাবে এসেছিল, কোথায় চালান হয়ে গেছে কে জানে। মাধবী সপ্তম। সে হেলাফেলার যোগ্য নয়। খুব ব্যক্তিত্বময়ী। অংশত সেও মানসিক বিকৃতির বিকার। মাধবী জানে, সদানন্দ বিপিন দুজনেই পিশাচ। এদের ঘনিষ্ঠ আলাপ সে শুনেছে, দেখেছে

দুজনেরই চোখে লালসার দৃষ্টি! মাধবীর স্বভাবে কিছু জিগীষা ছিল—পুরুষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল না। তাই বিভূতির চোখেও সে নারায়ণ-সদানন্দের কামনার আগুন চিনতে পেরেছে। ঐ জিগীষার জন্যই সে একা সদানন্দের ঘরে গেছে, সদানন্দের দেহপীড়ন সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করেছে, বিপিনের সঙ্গে নদীর ধারে গেছে, তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। বিপিনের প্রতি সদানন্দের ঈর্ষায় তার মনের কুশ্রী তলদেশ পর্যন্ত তার জানা হয়ে গেছে।

তবু যদি বিকারের খোলস ছেড়ে মাধবী সুস্থ মানবী হবার চেষ্টা করে থাকে, সে বিভূতির ঘরণী রূপে। বোধহয় লেখকের বিশেষ অভিপ্রায় ছিল বিকারগ্রস্ত নরনারীর চিত্তলোকের পরিচয় দেওয়া : তাই বিভূতিই উপন্যাসে ক্ষণস্থায়ী চরিত্র এবং শঠ প্রতারক ধর্মধ্বজীদের শক্তিব্যূহের আক্রমণে সে অকালে মৃত্যু বরণ করেছে। সে সমাজসেবী, দেশপ্রেমিক, পুলিশের চোখে দেশদ্রোহী, যুব-সংগঠক। কিন্তু পাকা-মাথা শয়তানদের তুলনায় শিশু। বাবার অপমানের প্রতিশোধ, নিম্নবর্গের মানুষের যাত্রার আসরে অপমানের প্রতিকার—কোন অভিযানেই সে সফল হতে পারে নি। কায়েমী স্বার্থের বনেদী প্রতিষ্ঠান পুলিশ-প্রশাসন, ধর্মাশ্রম এবং ব্যভিচারী সামন্তব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে একজোট।

তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রতিবাদী তার বাবা মহেশ চৌধুরী। অনেকে ভাবতে পারেন, মহেশ প্রকৃত ধর্মভীরু, মহেশ সত্যবাদী : এমনকি পুত্রহন্তা সদানন্দ-বিপিন তার সাক্ষ্যতেই বাঁচে। কারণ মধ্যরাতে দলবল নিয়ে আশ্রমে হামলাবাজি তাঁর ছেলেরই দোষ। তাঁকে গ্রামবাসী যে আক্রমণ করেছিল, সেজন্যও বিভূতিই দায়ী। এ এক আশ্চর্য আপোষ। সত্যবাদিতাই যদি মহেশের চরিত্রের ভিত্তি হয়, তবে সদানন্দ-বিপিন ভণ্ড জেনেও কেন সে ভেজাল-ভক্তি নিয়ে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে? সদানন্দকে নিজের আশ্রম-ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতেই কি অজ্ঞাত পরিচয় মাধবীর সঙ্গে বিভূতির বিয়ে দেয়নি? স্ত্রী ও পুত্রের মতামত যাচিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি। আশ্রমের গাছতলায় বৃষ্টির মধ্যেও অনশনে ধর্না দিয়ে সে যেমন গুরুর প্রতি টান দেখিয়েছে, তেমনি আশ্রমের ভিতরে এবং বাগবাদা-নন্দনপুর পর্যন্ত তার নিষ্ঠা-মহিমাও প্রচারিত হয়েছে। মহেশের 'সদানন্দের আশ্রম' প্রতিষ্ঠার সূচনা তো এখানেই। বিপিনের মতো মতলববাজ পায়ে পড়েছে মহেশের ; সদানন্দকেও মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়েছে মহেশের আশ্রয়ে। এখানেই শেষ নয়। বিপিনের আশ্রম কানা করেই সে ক্ষান্ত হয় নি। তার হাজার বিঘের আশ্রম-আবাস-অট্টালিকা, পুষ্পবিতান—সব তার চাই। পুত্র যেন অন্তরায়। জীবিত থাকতেও পিতা-পুত্রে সহমত ছিল না। মৃত্যু যখন ঘটে গেছে, তখন তার মৃত্যুর মূল্যেই হোক মহেশের চরম ইচ্ছাপূরণ। আদালতের সাক্ষ্যে লোকে জানল মহেশ অসাধারণ সত্যনিষ্ঠ। এতে ধর্মব্যবসায়ের তার পসার বরং বাড়বে। কদর্য কামনার তাড়নায় প্রৌঢ় সদানন্দের মনের অন্ধকার কুঠুরি থেকে যেন লালাসিক্ত কীটগুলি সব বেরিয়ে পড়েছে। 'মাধুকে আমার চাই'—এ জানোয়ারের ক্ষুধা আর গোপন থাকবে না। সুতরাং সদানন্দ-

মাধবীকে রাতের অন্ধকারে নৌকাযোগে বার করে দেওয়া হয়েছে। বিপিন চতুর, মহেশ বুদ্ধিমান। নিশ্চয়ই উপযুক্ত বেতন ও ভরতুকির টাকা নিয়েই নীরবে সদানন্দ বিদায় নিয়েছে। মহেশ-বিপিনের নবপর্যায় আশ্রম-ব্যবসায়ে উপন্যাসের সমাপ্তি।

সন্ন্যাস বিষয়ক মানসিক জটিলতার আর-একটি উপন্যাস তেইশ বছর আগে পরে। সেখানেও সাধু পুরুষ, ভণ্ডামি, কামনার আগুন, পাপ। উপন্যাস-গঠনের দিক থেকে পরের উপন্যাসের চেয়ে 'অহিংসা' সার্থকতর সৃষ্টি। ঘৃণা + ভালোবাসা + ব্যবসায়বুদ্ধি = আশ্রম। বিপিন সদানন্দ মহেশ মাধবী মূল চরিত্র। কোন ত্রিভুজ নেই, বৃত্ত আছে। ব্যক্তির ঈর্ষা, দেহজ আকাঙ্ক্ষা এবং যশোলিপ্সার কক্ষপথে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র হেঁটেছে। মুক্তির পথ কারও জানা নেই। সকলেই বন্দী আশ্রমিকতায়। মধ্যে মধ্যে মানিকের মন্তব্য আছে। উপন্যাসের পক্ষে খুবই অসঙ্গত। তার দ্বারা নতুন কোন তাৎপর্য যুক্ত হয়নি—কাহিনী সংক্ষেপও নয়। উপন্যাসের বিষয়ের চেয়ে ব্যাখ্যাংশ জটিলতর। এই ত্রুটি 'তেইশ বছর আগে পরে' এবং 'হলুদনদী সবুজ বনে' আরও বেশি।
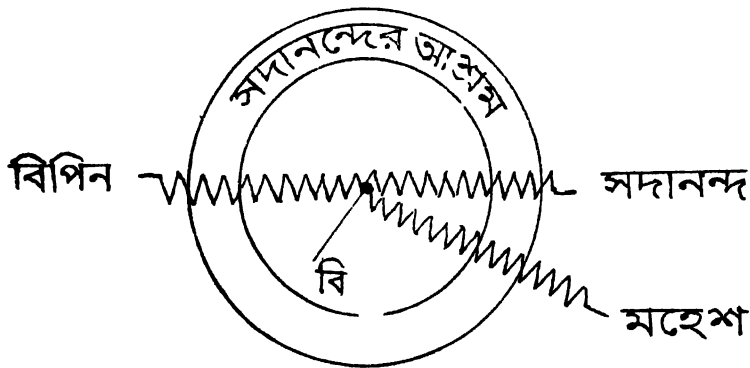
মাধবী কেন্দ্রবিন্দু, তাকে কেন্দ্র করেই আশ্রমের ধর্ম + ঘৃণা + ঈর্ষা + দেহকামনার বৃত্ত। বিপিন, সদানন্দ ও মহেশের সরীসৃপ কামনার গতি সর্পিল চিহ্নে বর্ণিত। মহেশ ছিল বাগবাদায় —আশ্রমের বাইরে তাই সর্পিল রেখা আশ্রমবৃত্তের বাইরে দীর্ঘায়ত। যখন মাধবী মহেশের কাছে অপ্রাপ্য, তখনই পুত্রবধূর ছলনায় শিকার ধরা। বিভূতি সরল সোজা মানুষ। বিভূতি-মাধবীর দাম্পত্যরেখাটি তাই সরল এবং ক্ষুদ্র।

চতুষ্কোণ মানিকের ফ্রয়েডীয় সমীক্ষার উপন্যাস। রাজকুমার চরিত্রই অদ্ভুত। তার জীবনজিজ্ঞাসা মানেই শরীরবিষয়ক যন্ত্রণা। রোগী স্বভাবের। বয়ঃসন্ধিতে মেয়ে ও পুরুষের কিছু কিছু শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুভবেরও বদল হয়। যৌনচেতনার উন্মেষ ঘটে। রাজকুমার বয়ঃসন্ধি পেরিয়েছে। তার কৌতূহল মেয়েদের মন জানা নয়, শরীরকে জানা। উপন্যাসের ক্ষেত্রে অভিনব নিরীক্ষা অবশ্যই, দুঃসাহসেরও পরিচয় আছে। যখন মানিক 'চতুষ্কোণ' লিখছেন, তখনও য়ুরোপ-

আমেরিকায় দেহকামনানির্ভর অতি আধুনিক উপন্যাসের প্রচলন হয় নি। কিন্তু উপন্যাস-শিল্পের দিক থেকে 'চতুষ্কোণ' মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

ঔপন্যাসিকের মন, তার বিশ্বাসের জগৎ এবং শিল্পরীতি একই সমতলে চিরকাল থাকে না। বিশেষত যাঁদের শিল্পসৃষ্টি জীবনের শ্রেয়স সন্ধানের সঙ্গে অন্বিত। মানিকের কথাসাহিত্য বারে বারে বাঁক ফিরেছে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও কর্মী হয়ে ওঠার পরই এমন ব্যাপার ঘটেছে, এই সরলীকরণে অনৌচিত্যবোধই প্রকট হয়ে পড়ে। দিবারাত্রির কাব্য থেকে চতুষ্কোণ, পুতুলনাচের ইতিকথা থেকে আরোগ্য কিংবা প্রতিবিম্ব থেকে শহরতলীর সম্পর্ক কি বিবর্তনের রাজপথ ধরে অগ্রসর? তবে শ্রেণীচেতনার দৃষ্টি থেকে জীবনের সমস্যাকে দেখলে তার একটা নির্দিষ্ট রাস্তা-বদল ঘটে। যিনি লিখলেন—সবার আগে চাই, রাঘব মালাকার, স্থানে ও স্থানে, পেটব্যথা কিংবা বাগ্দীপাড়া দিয়ে, হারানের নাতজামাই, ছোট বকুল পুরের যাত্রী, তাঁর কলমে আর সরীসৃপ, মমতাদি, ওমিলনাইন, মুখেভাত লেখা হতে পারে না।

[ছয়]

উত্তরকালের মানিকের প্রথম পদচিহ্ন যে-উপন্যাসে, তার নাম শহরতলী। তারপর পেয়েছি, সোনার চেয়ে দামী, হলুদ নদী সবুজ বন, শান্তিলতা, মাটি ঘেঁষা মানুষ ইত্যাদি।

শহরতলী উপন্যাসের মূল সংঘর্ষে ব্যক্তিপ্রেম নেই, তাই প্রেমের ত্রিভুজের ছক অনুপস্থিত। হালভাঙা পালছেঁড়া জীবনতরীর কতগুলি মানুষ— ধনঞ্জয় সুধীর গোলক সুবীর। তারা যশোদার বাড়িতে জুটেছে। বিনা ভাড়ার অতিথি। তাদের জন্য আছে যশোদার কমিউনিটি কিচেন। এরা সব অসংগঠিত বেকার, তবে কেউই লুম্পেন নয়। যশোদা প্রৌঢ়া, স্বাস্থ্যবতী, স্বভাবে কর্ত্রী ও নেত্রী। এই হল একদিক —দরিদ্রশ্রেণী। অন্যদিকে সত্যপ্রিয়, জ্যোতির্ময়, সত্যপ্রিয়ের ম্যানেজার, পুলিশ, প্রশাসন। মিল-মালিক পুঁজিপতির চরিত্র তার শ্রেণীস্বরূপে উপস্থিত। নরমে-গরমে তার ব্যক্তিত্ব সকলকে প্রভাবিত করে। শেষ পর্যন্ত বস্তির উচ্ছেদ। সংগঠিত শাসক শোষকশ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষে, নিছক ব্যক্তি নয়, সমবেত সংঘশক্তির প্রয়োজন। এসব কথাই শহরতলীর উপজীব্য। শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে বিরোধ হলে একমাত্র মেয়ে জামাইকেও তাড়িয়ে দিতে বাধেনা, বিশ্বস্ত কর্মচারীর বিয়েতে শ্রেণীমনস্তত্ত্ব অনুধাবন করেই নকল গয়না দিয়ে আসলের মর্যাদা আদায় করা যায়।

বক্তব্যপ্রধান শহরতলী উপন্যাসের গঠন খুব শিথিল বিন্যস্ত। তবু এই প্রথম শ্রমিক-মালিক বিরোধ, পুঁজিপতির শ্রেণীচরিত্র, মিথ্যা মামলায় ভ্যানগার্ড শ্রমিকদের জড়ানোর যথার্থ উপন্যাস প্রেক্ষিত পাওয়া গেল। দ্বিতীয় পর্বে শ্রেণীবিরোধের তত্ত্ব অনেক খানি সামলেছেন, কিন্তু প্লটের শৈথিল্য আরও স্পষ্ট।

সোনার চেয়ে দামী মধ্যবিত্তের মিথ্যা ভ্যানিটির অন্তঃসারশূন্যতার উন্মোচন। রাখাল-সাধনার মনের শ্রেণীচ্যুতি। সেজন্য ভোলার মা এবং অন্যদের কলোনির ছবি। কিন্তু কাহিনীর ফ্রেম এত দুর্বল যে উপন্যাসের শিল্প উৎকর্ষে পৌঁছয়নি। তবু মানিকের শিল্পী-মানসের উত্তরণের দিক থেকে উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। ঠিক তেমনি উল্লেখ্য মাটি ঘেঁষা মানুষ বা চাষীর মেয়ে কুলীর বৌ। শ্রমিক ও কৃষকের মনোজগতের গড়ন আলাদা। এ নিয়ে লেনিন, স্তালিন, মাও-সেতুঙ্, গোর্কির মত পার্টিজান বিপ্লবী তত্ত্ববিদ ও বুদ্ধিজীবীদেরও সর্বদা মতৈক্য ঘটে নি। মানিক প্রসঙ্গটি সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন উপন্যাসে। আজ যে চাষীর মেয়ে, কাল সে মজুরের বৌ। তার মানসিক দ্বন্দ্ব, পরিণামে কৃষক-মজুর ঐক্যে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সংকেত। শান্তিলতা আলাদা প্রবন্ধের দাবি রাখে। কাটা কাটা কথা। ছোট ছোট বাক্য। ধারালো মন্তব্য। কখনও তির্যক ভঙ্গি। পরিবর্তিত কালের প্রভাব। মধ্যবিত্তের শ্রেণীচ্যুতি। অ-নায়ক নায়কের প্রতিষ্ঠা।

মানিকের 'সহরতলী' বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে কোন বাংলা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে এমন এক চতুর মুনাফা শিকারী শিল্পপতিকে দেখা যায়নি। সত্যপ্রিয়ের স্বদেশীয়ানার অছিলা, শিল্প উদ্যোগের নামে শ্রমিক পীড়ন, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন রূপে সাহিত্য প্রচেষ্টা, মিথ্যা অজুহাতে সচেতন শ্রমিককর্মী ছাঁটাই, প্রভাবশালী যশোদার কাছে বহুতর বিনয়ের ভান, মালিকে নিবেদিতপ্রাণ জ্যোতির্ময়-অনাথ-কেষ্ট সম্পর্কে দারুণ অবজ্ঞা—সব মিলিয়ে বাংলা উপন্যাসের বক্তব্যে অবশ্যই কিছু নতুন সংযোজন।

শহরতলী দুখণ্ডের উপন্যাস, প্রকাশের কাল ১৯৪০, ১৯৪১, দ্বিতীয় খণ্ড প্রায় প্রথম খণ্ডেরই অব্যবহিত পরের রচনা। অর্থাৎ প্রথম ভাগের সময়ই দ্বিতীয়ভাগের কথা লেখকের ভাবনায় ছিল, এরকম মনে করাই সঙ্গত। যেমন সোনার চেয়ে দামী প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব। কিন্তু 'শহরতলী' উপন্যাসের নিবিষ্টপাঠে এ ধারণার সমর্থন মেলেনা। এরকম রচনায় প্রথম ভাগের চেয়ে দ্বিতীভাগে আরও পরিণতি, আরও গভীরতা-জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', প্রেমাংকুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' বা বনফুলের 'জঙ্গম'। (অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে।) কিন্তু শহরতলী দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করেনা।

মানিকের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের সূচনা একটা আকস্মিক মোচড়ের মধ্য দিয়ে। ভূমিকার ব্যাপারটা গৌণ। তিনি একেবারে বিষয়ের মধ্যে ঢুকে যান। শহরতলী ব্যতিক্রম। এর সূচনা নাটকীয়। মঞ্চের সজ্জা-বিন্যাসের বিকল্প হল বর্ণনা।

উত্তর শহরতলী। ট্রামলাইনের সীমা ছাড়িয়ে আরও কিছু দূরে। গরীব মানুষদের আস্তানা। টিনের ঘর, পাকাবাড়ি পাশাপাশি। বিদ্যুতের আলো, পাশে কেরোসিনের ডিবরি। ছোট কারখানা -কামারশালা, বড় কারখানার উদ্ধত চিমনি। মধ্যবিত্ত, ধনী এবং গরীব মেহনতী মানুষ তিন পর্যায়ের নরনারী।

১. সাজানো মণিহারী দোকান—সাবান, কেশতৈল, স্নো, ক্রিমে ঠাসা।

২. বিপরীতে ভূষণচন্দ্র নন্দীর কয়লার আড়ত-খুচরা পাইকারী। পুরীষ ও পাঁকের সমাহার। কয়লাবাহী ঠেলার মহিষের বিনোদন।
৩. রাধানাথ দের ডায়মণ্ড র‍্যাস্টুর‍্যান্ট-ফাস্টকেলাশ চা রুটি মাখন চপ কাটলেট ডবল ডিমের মামলেট।
৪. লোচন সাউয়ের টিনের চালা—মুড়িচিড়া তিলুড়ির দোকান।
৫. বিবিধ : স্যাকরা / কামার / মগ-বালতি সারাই / সাইকেল মেরামতি।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যশোদার সঙ্গে পরিচয়ের আগে এরকম পটভূমি-বিস্তার মানিকের উপন্যাসে বিরল। বোঝা যায়, লেখক উপন্যাসের অকুস্থলের বিশেষ পরিবেশটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গ্রামের সঙ্গে শহরের পার্থক্য সুস্পষ্ট, শহরের সঙ্গে শহরতলীর ? অন্তত 'শহরতলী'-র আগে শহরতলীর পরিবর্তনের ছবি, ধনী শিল্পপতিদের গরীব বসতির প্রতি আগ্রাসী মনোভাব, প্রয়োজনে পুর কর্তৃপক্ষের সহযোগে বাড়ি-জমি দখল এবং কারখানা সম্প্রসারণের নেপথ্য কাহিনী এমনভাবে উপন্যাসের সিংহভাগ অধিকার করেনি।

যশোদা বাংলা উপন্যাসের নতুন নারীচরিত্র। সে নিজে শ্রমিক নয়, কিন্তু শ্রমিক-দরদী, তার দুটি বাড়ি জুড়ে অনেক মানুষ—একটিতে মধ্যবিত্তের সংসার, অন্যটিতে বেকার, অসংগঠিত কর্মপ্রার্থীদের ভিড়। সুধীর, মতি, ধনঞ্জয়, জগৎ প্রভৃতি ছন্নছাড়া মানুষের সমাবেশ তার বাড়িতে। একবার শুনি যশোদাকে কুড়ি-বাইশ জনের রান্না করতে হয়, অন্যত্র উনিশ জনের আহারের আয়োজনের কথা আছে। এরা তার ভাড়াটে, কিন্তু ভাড়া দেয়না, পোষ্য কিন্তু অনাত্মীয়। এহেন যশোদার বর্ণনা—'সাধারণ বাঙালী ঘরের গেটোকয়েক স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে অনায়াসে গড়া চলিত এতখানি মাল-মসলা দিয়া ভগবান তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' গতযৌবনা মধ্যবয়সী যশোদা প্রথম থেকেই 'চাঁদের মা', কিন্তু চাদ মৃত, বাৎসল্য তাই ভাই নন্দকে ঘিরেই প্রকাশিত। মতির বয়স পঞ্চাশ, যশোদার প্রতি সে আকৃষ্ট। এ আকর্ষণ ঠিক প্রেম নয়। ধনঞ্জয় বরং যশোদার পছন্দসই পুরুষ।

> 'ধনঞ্জয় আসিলে যশোদার ঘরখানা যেমন ভরাট হইয়া গেল। নন্দের বদলে যশোদার ভাই হইলে তাকেই মানাইত ভাল।'

তবে কি সম্বন্ধ-টা স্নেহের, বাৎসল্যের ? রান্নাবান্না বেশী হলে মনে পড়ে ধনঞ্জয়কে। পা-খোঁড়া ধনঞ্জয়ের প্রতি মমতা আরও গভীর। কে এক কেদার ছিল, কুস্তির ওস্তাদ। 'মাথা গিয়া ঠেকিত ঘরের ছাতে, দরজা দিয়া যাতায়াত করিতে হইত পাশ ফিরিয়া, রাস্তায় ষাঁড়কে সরাইয়া সে পথ চলিত।' পালোয়ানের মত শক্তিধর, যশোদার চোখে হয়ত 'রূপকথার রাজপুত্রের মতো।' যশোদা নাকি আজও সেই নিরুদ্দিষ্ট ভালবাসার লোকটির পথ চেয়ে আছে।

যশোদা সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ ঃ

১. পোষ্য ভাড়াটে সুধীরের ২৫ টাকা জরিমানা সে দেয়।
২. ১নং মিলের ধর্মঘট ২নং মিলে ছড়িয়ে দেওয়া শ্রমিকদের উচিত ছিল। —যশোদার পরামর্শ।

৩. সে জানে ধর্মঘটীদের মনোবল দীর্ঘকাল অটুট রাখা কঠিন।

৪. সবারই দুঃখে সে কাতর —সমবেদনা প্রকাশের ভঙ্গিতে হয়ত নিষ্ঠুরতাই মুখ্য। (রাধাচরণ কবরেজকে চড় মারার প্রসঙ্গ)

৫. 'মানুষকে কাজ জুটাইয়া দিতে যশোদা বড় ওস্তাদ।' ভারতলক্ষ্মী লুমের মালিক কেন যে তার কথায় কাজ দেয়, তা যশোদারও অজানা। good, bad মন্তব্য অনুযায়ী তাদের নিয়োগ হয়। কারখানার কাজ গেলে অন্তত চায়ের দোকানের হেল্পার।

৬. 'নিজের স্থানটির সীমা যশোদা কখনও অতিক্রম করবে না, চেষ্টা করিয়া পরিসর বাড়াইবার চেষ্টাও করে না।'

৭. শ্রমিক-ধর্মঘটে পরোক্ষ যুক্ত থাকায় হাজতবাস।

৮. পুত্রবধূর অসুখে প্রতিবেশিনী যশোদার ওপরে প্রবল শক্তিধর সত্যপ্রিয়র স্ত্রীর একান্ত নির্ভরতা।

উত্তরকালের রচনায় মানিক অনেক নতুন নরনারীকে উপস্থিত করেছেন। 'দিবা-রাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি-র চরিত্রের তুলনায় ভোলার মা, কৈলাস, ঈশ্বর বাগ্দী, রবার্টসন, লখার মা, ভিমনা নতুন জগতের বাসিন্দা। কেতুপুরের জেলেদের মত এরা কোন হোসেন মিঞার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে নি, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে, বলা যায় ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়েছে। কখনও জিতেছে কখনও হেরেছে, কিন্তু লড়াকু মনোভাবের চরিত্র তৈরি হয়েছে নতুন মানসিকতা নিয়ে। সত্যপ্রিয়, যশোদা, জ্যোতির্ময় প্রমুখ চরিত্রের আদলও স্রষ্টার মূল্যবোধের জগতে পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ।

প্রথম পর্বের সমাপ্তি এইভাবে ঃ ১. জ্যোতির্ময়ের মোহভঙ্গ —সে বুঝতে পারে, তার স্ত্রীকে সুদৃশ্য বাক্সে নকল গহনা দিয়েছেন সত্যপ্রিয়। স্ত্রীর অসুখ সত্ত্বেও সে ছুটি নিতে পারেনি। কারণ ছুটি বিষয়ে সত্যপ্রিয় নির্মম। হাসপাতালে তার স্ত্রী অপরাজিতার মৃত্যু। 'রিজাইন' করে শৃঙ্খলমুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তার, কিন্তু সেটা বাস্তবে পরিণত করার মতো মেরুদণ্ডের জোর নেই। ২. সুধীর মতি ধনঞ্জয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যশোদার প্রতি তীব্র আসক্তি প্রকাশ করেছে। ঈর্ষ্যার আগুনে জ্বলেছে। ফ্রয়েডীয় কামাবেগে চরিত্রগুলি তাড়িত। কিন্তু উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্বের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত। ৩. মূল শ্রেণীদ্বন্দ্ব · শ্রমিক স্বার্থ বনাম শিল্পপতির স্বার্থ— তিনটি ধর্মঘটের পটভূমিতে বিন্যস্ত, যশোদা বনাম সত্যপ্রিয়ের বিরোধ। শ্রমিকদের বিভেদসৃষ্টির লক্ষ্য নিয়েই যশোদার মাধ্যমে সমঝোতা, প্রতিবার মীমাংসার সময় কিছু ছাঁটাইয়ের স্বীকৃতি, ষাট টাকা বেতনে তার ভাই নন্দের চাকরি, যশোদার জন্য সত্যপ্রিয়র গাড়ির ব্যবস্থা, তার বাড়ি ঘন ঘন যাতায়াত —কাশীনাথের কৌশলের পিছনে সত্যপ্রিয়র কুশলী চক্রান্ত। ৪ যশোদার 'কমিউনিটি কিচেন' সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষ-গুলির মধ্যে বিশ্বাসের ভাঙন, তার প্রতি দোষারোপ, সত্যপ্রিয়র ইচ্ছাপূরণ। ৫. যশোদার ঘটকালিতে জগৎ-চাঁপার এবং সুধীর-কালোর বিবাহ। নন্দ-সুবর্ণর (জ্যোতির্ময়ের বোন) রোম্যান্টিক প্রেম নিরুদ্দেশ যাত্রার অপেক্ষায়।

দ্বিতীয় পর্বে মূল শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিণতি। প্রবল প্রতাপ ও সূক্ষ্ম কৌশলের অধিকারী সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী পুর কর্তৃপক্ষের সহায়তায় রাজেন-কুমুদিনীর বাড়ি কিনেছে, আইন মোতাবেক নোটিশ দিয়ে যশোদাকে বাড়ি বেচতে বাধ্য করেছে। কারখানার হয়েছে সম্প্রসারণ। অজিতা-সুব্রতার সংসর্গে এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার আগুনে পোড় খেয়ে যশোদার মনোভাব অনেক বদলেছে। শ্রমিক-সংগঠন ও নারীসংগঠনে সে এখন পোক্ত। মহিলা সংঘ এই পর্বে যশোদার দ্বিজত্বের হেতু। অনেক অবান্তর উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের বাহুল্য সে কাটিয়ে উঠেছে। সত্যপ্রিয়র শ্রেণীসত্তা উন্মোচনের জন্য যামিনী-যোগমায়া কাহিনীর সংযোজন। তাদের পক্ষে যশোদার ভাড়াটে হওয়া এবং সেজন্য সত্যপ্রিয়র প্রতিহিংসা উপন্যাসের আভ্যন্তর প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি। ধনঞ্জয়-সুধীর থেকে আবার কুমুদিনীর স্বামী রাজেনের যশোদা-আসক্তি যুক্ত হল কেন ? প্রথম পর্বে এর আভাসমাত্র নেই। 'আমরা দুজনে একা' বলার পরে কুমুদিনীর সাত বছরের ছেলের উল্লেখ ; নিরুদ্দিষ্ট কেদার নামটি দ্বিতীয় পর্বে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত। অজস্র নতুন চরিত্রের নাম মাত্রে অবস্থান অমূল্য আশাপূর্ণা অতসী বনলতা রমেন অনুরূপা প্রভা অমলা অলকা মায়া বিধুবাবু প্রভৃতি—উপন্যাসের বক্তব্য ও তার বাঁধনকে সংহত হতে দেয়নি। কেবল অসংগঠিত সর্বহারার বদলে সচেতন শ্রমিকসংহতি, সংগঠিত মহিলা-আন্দোলন, মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতার লড়াই এবং পরিণামে সহরতলীর সর্বনাশ দেখাতেই দ্বিতীয় পর্বের অবতারণা। প্রথম পর্বের দোষ-ত্রুটি এতে ঢাকা পড়েনি, বরং নতুন নতুন অসামঞ্জস্য যুক্ত হয়ে উপন্যাসের শিল্পকেই সার্থক হতে দেয়নি।

[সাত]

অভিজ্ঞতার জগতে প্রবল ধাক্কা লাগলে লেখকের বিশ্বাসের জগতেও সংশয়ের ঝড় ওঠে ; তারপরে ঘটে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেন'-সচেতন শিল্পীমানসে বাইরের ঘটনার চাপও অল্প ছিল না। অক্ষয়ের মত আত্মকেন্দ্রিক সুরা-সম্ভোগী সুখী মানুষও জীবনের অনিবার্য দৃশ্যপরম্পরার টানে মিছিলমুখী হয়ে ওঠে, উপেক্ষিত সহধর্মিনীকে প্রথম স্বতন্ত্র নারীব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেয়। এহেন পরিস্থিতিতেই মানিকেরও মনোজগতে পরিবর্তন ঘটল। 'চিহ্ন' তারই চিহ্ন।

নাটক অথচ নাটকের মতো নয়, তার নাম এ্যান্টি-প্লে। নায়ক অথচ প্রচলিত নায়ক-ধারণা থেকে পৃথক, তাকে বলা যায়, এ্যান্টি-হিরো। চিহ্ন-কে কি বলা যায় ? এ্যান্টি-নভেল ? না, নামটি পছন্দসই মোটেই নয়। কারণ উপন্যাসের ধরণ-ধারণে অন্য শৈলী সত্ত্বেও উপন্যাসটা জীবন থেকে উঠে এসেছে। মনে পড়ে, পাঁচের দশকে লেখা সজল রায়চৌধুরীর একটি নাটক, 'জনান্তিকে'। উপন্যাসের আকারেও বিন্যস্ত হতে পারত। লিখতে চাইছেন নাট্যকার মঞ্চের উপযোগী নাটক। বাস্তব পরিস্থিতি বাধা দিচ্ছে, নাটক লেখা হচ্ছে না। সেই পরিস্থিতিতেই স্টেজে উপস্থাপিত। কোন উপন্যাস লেখার জন্য নায়ক-নায়িকা, প্রতিনায়ক অথবা প্রতিনায়িকা, প্রেম-বিরহের দ্বৈরথদ্বন্দ্ব, দারিদ্র্য, ধর্মঘট, শ্রেণীসংগ্রাম ইত্যাদির যত ব্যাপক প্রস্তুতির কথাই লেখক

ভাবতে পারেন, তিনি প্লটের একটা সম্ভাব্য চেহারা অবশ্য ছকে নেন। অবশ্যই উপন্যাসের তাগিদে সেই ছক লেখকের মনের মধ্যে তৈরি হয়—আরোপের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

'চিহ্ন' পূর্বপ্রস্তুত ছকের শিল্পায়ন নয়। মহাকাব্যের ক্যানভাসে এর সূচনা। একটা রণক্ষেত্র, লড়াইয়ের ময়দান। অসম যুদ্ধ। একদিকে নিরস্ত্র মানুষের মিছিল, থমকে আছে: অন্যদিকে ঢাল-বন্দুক হেলমেটধারী এক পুলিশবাহিনী। ছাত্র-যুব-কেরানী-শ্রমিক, ক্ষুব্ধ মানুষের যূথবদ্ধ চেহারা। সকলের চেতনার স্তর সমান নয়। তবু মানুষ সমবেত। কৌতূহল, প্রতিবাদ, ক্ষোভ, হয়ত প্রতিরোধেরও সংকল্প। অন্যদিকে আক্রমণের জন্য উদ্যত শাসকের শান্তিরক্ষীবাহিনী—যারা সহজেই মানুষ মেরে শ্মশানের শান্তি আনতে পারে।

এই রণক্ষেত্রে যার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়, সে কোন লড়াকু মানুষ নয়। গ্রামের জীবনের লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে শহরে এসেছে বাঁচতে। ক্যামারণ কোম্পানীর গোপন ব্যবসাযে সে একজন পরিস্থহীন মজুর। তার মাথায় বোঝা, সে এগোতে চায়, পারছে না, পুলিশ জনতার গতিরোধ করেছে। পুলিশের গুলি তার পাঁজর ভেদ করে গেছে। গণেশ নিজের যন্ত্রণায় কাতর নয়, মিছিল কেন এগোয়না জানতে ব্যাকুল। এমন ময়দানজোড়া বিপুল আয়োজন সে এর আগে দেখেনি। চেতনা হারানোর আগে তার জিজ্ঞাসা: 'এরা এগোবে না?'

দেযাল ঘেঁষে মাথা গুঁজে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়। তার নাম ওসমান। একসময় ট্রাম-শ্রমিক। দাঙ্গার দুর্দিনেও হিন্দু-মুসলমান মিলে ধর্মঘট সফল করেছে। জিওনলালের লরিতে তুলে ওসমান গণেশকে পাঠাল হাসপাতালে। পরের মানুষ হেমন্ত। মিছিলে সে যেতে চায়নি। সতীর্থদের সঙ্গে মিটিং-মিছিল নিয়ে তার প্রবল মতবিরোধ। তবু সে জড়িয়ে পড়েছে পরিস্থিতির অনিবার্য টানে। তার একটা নিজস্ব মত আছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিশ্চয় জানবে একজন ছাত্র, বিবিক্ত থেকে, সরাসরি নেমে পড়বে না রাজনীতির আন্দোলনে। পঙ্কজ, শুদ্ধসত্ত্ব, আনোয়ার, শিবনাথ পরিচিত। বক্তৃতা দিল তারই এক সহপাঠী। হেমন্ত অভিভূত। বক্তব্যে তারও সায় আছে। ঈর্ষ্যা ও বিরূপতা ছাপিয়ে কোন মুহূর্তে হেমন্তের মনে জেগেছে প্রশংসা, তখনই সে ওদের একজন, সুতরাং পালাবার প্রশ্ন ওঠে না।

> শীতের তাজা রোদে উজ্জ্বল দিন। কি তাজা দেখাচ্ছে এদের মুখগুলি। কত উজ্জ্বল সকলের দৃষ্টি। দুঃখ বোধ করেছিল হেমন্ত। অপচয়ে ক্ষয়ের ছাপ পড়ে না, ভ্রান্ত আদর্শ কাবু করেনা, এমন যে অফুরন্ত তরুণ প্রাণশক্তি আর বিশ্বাস, তার কি শোচনীয় অপব্যবহার! একবার ভেবেছিল হেমন্ত, চলে যায়। কিন্তু চলে যেতে সে পারেনি।
>
> প্রদীপ্ত মুখগুলি, নির্ভীক চোখগুলি, আশ-পাশের ছাড়া-ছাড়া কথা ও

আলোচনার টুকরোগুলি, সমস্বরে শ্লোগান উচ্চারণের ধ্বনিগুলি আর
অনুভূতির এক অদ্ভুত দুরন্তপনা তাকে আটকে রেখেছে।

শুদ্ধসত্ত্ব, আনোয়ার পরীক্ষাতেও ভালো ফল করে এবং রাজনীতির পরিস্থিতি কত ভালো বোঝে, বয়সোচিত চাপল্যে মোটেই প্রগল্ভ নয়। সুতরাং হেমন্ত হোঁচট খায়। কেতাব আয়ত্ত করা ছাড়াও জীবনের ব্যাপক মানে খুঁজে পেয়েছে বা খুঁজছে ওরা। হেমন্ত যেন বদলে যাচ্ছে। ময়দান থেকে ট্রামে যেতে পনের মিনিট তাদের বাড়ি। তবু এই লড়াইয়ে থমকে-দাঁড়ানো মিছিলের স্রোতে যুক্ত হেমন্ত থেকে মা যেন দূরে, অনেক দূরে। সীতাও যেন অনেক দূরে।

পরিস্থিতির অনিবার্য টানে এসে পড়েছে দুই নারী—অনুরূপা ও সীতা। একজন প্রৌঢ়া, শিক্ষিকা, অনেক প্রতিকূলতার ঝড় এড়িয়ে রমা-হেমন্ত-জয়ন্তদের বড়ো করে তোলার স্বপ্ন ও সংগ্রাম ; অন্য নারী একালের মেয়ে, কলেজর ছাত্রী, স্বদেশ-স্বজনকে যে প্রথম চিনছে জানছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যাযের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তখন ছাত্রদের অংশগ্রহণ কোন বিতর্কের ব্যাপার নয়, বাস্তব সত্যে পরিণত।

সীতা ও অনুরূপাকে লেখক মুখোমুখি এনেছেন চরম উত্তেজনার মুহূর্তে। সীতা চঞ্চল, পুলিশ রসিদ আলি দিবসের ছাত্রমিছিলে গুলি চালিয়েছে, কারা মারা গেল, কজন আহত হল জানা যাচ্ছে না, সুতরাং পরদিন আরো বড় আকারে প্রতিবাদ মিছিল বার করতে হবে, সেজন্য উদ্বিগ্ন। এর মধ্যে অনুরূপা এসেছেন হেমন্তর সংবাদ জানতে। সীতার সঙ্গে হয়ত হেমন্তর বিয়ে হবে, সুতরাং ঠিকপথে তার এবং হেমন্তর চলা-বলা সম্বধে অনুরূপার কিছু জানবার অধিকার আছে বৈ কি ! অন্তত মনের মধ্যে অচেতনভাবে এ জোরটা তাঁর ছিল। শিবনাথ, আনোয়ার, শুদ্ধসত্ত্ব এবং আরো অনেক তাজা ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে অনুরূপার কোন কৌতূহল নেই। তারা গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে কেন ? মধ্যবিত্ত মাতৃত্বের এই সংকীর্ণ সন্তানবাৎসল্যের জগৎ ভেঙে পড়ছে কঠোর বাস্তবের অভিঘাতে, অনুরূপারও পরিবর্তন ঘটল। মানিকের আত্মজিজ্ঞাসা অনুরূপার মধ্যে, অক্ষয়-সীতা-গণেশ-আবদুলের মধ্যে সঞ্চারিত। 'শহরতলী' উপন্যাসে লেখক বিশ্বাসের জগতের একটা নতুন ঠিকানা পেয়েছিলেন। শহরতলীতে প্রাসাদবাসী শিল্পপতির শহরতলীর বস্তিদখল, তার আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার শিকার হয়েছে অনেকগুলি মানুষ। সত্যপ্রিয়র কাছে পুত্রকন্যা, মনিবের কাজে আত্মনিবেদিত জ্যোতির্ময় এবং প্রতিবাদী জ্যোতির্ময় সবই সমান ; প্রয়োজনে সে বিনা দ্বিধায় সকলকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

'চিহ্ন' উপন্যাসে সমবেত মানবগোষ্ঠীর জাগরণ। 'মব' নয়, অথচ তারা জনতারই অংশ, পরস্পরকে চেনেনা, সুতরাং সুসংগঠিত নয়, অথচ একেবারে অসংগঠিত বললেও সংকল্পে দৃঢ় সমবেত মানুষের বিপদবরণের মানসিক শক্তিকে খাটো করা হয়। নেতা বসন্ত রায় সময় বুঝে গা ঢাকা দিয়েছেন, তাঁর প্রতিনিধি অমৃত মজুমদার এসে পুলিশ ভ্যানে দাঁড়িয়েই শৃঙ্খলাবন্ধ থেমে থাকা জনতার ক্ষোভের আগুনে জল ঢেলে

দিলেন। অমৃত এবং তাঁর স্ত্রী অরুণার আলাপে নেতৃত্ব নিয়ে উঁচু মহলের ব্যক্তিকলহ এবং পুলিশের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক ভালোই ফুটেছে। লেখকের দৃষ্টির ফোকাস ধীরে ধীরে ময়দানের বাইরে যাচ্ছে, ফ্যাশব্যাকের কায়দায়, চিরবাগী গ্রাম, জমিদার চপলাকান্ত বসু, তাঁর মূল আড়কাঠি জিয়াউদ্দীন, জমির লড়াই, পঞ্চাশের মন্বন্তর, রিলিফ কমিটি ; মধুখালির গণেশ, যাদব, কেশব বদ্যি, ধান তোলার লড়াইয়ে কৃষক-সংহতি ইত্যাদি। আবার ফিরে আসছে তাঁর নজর ওসমান-আবদুলদের বাসস্থানে, ধরা যাক, রাজাবাজারের শ্রমিক অঞ্চলে। অন্যায়ের প্রতিবাদে, পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে কেউ কারখানায় যায়নি, দাঙ্গায় ট্রাম-শ্রমিকদের সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রেক্ষিতে (মিশিরজী-ইসমাইলের হাতে হাতে পতাকা এবং ড্রাইভারদের হাতে হাতে ক্রশ আকারে হাতুড়ি) শ্রমিক হরতাল, ছাত্রমিছিল স্বতই হয়ে উঠেছে সর্বাত্মক প্রতিবাদের মিছিল। হাবিব ওসমান রসুল সুধীর মনোমোহন রজত শান্তি—কেউ পূর্ণাঙ্গ রেখায় আঁকা গোটা মানুষ নয় ; এ উপন্যাসের বক্তব্য সেরকম 'দাবির' ওপরে দাঁড়িয়ে নেই। মানুষ-গুলি আসছে যাচ্ছে, হাজারো মানুষের আকাঙ্ক্ষা ক্ষোভ ঘৃণা ভালোবাসার ইঙ্গিতগুলি অন্ধকারে আলোকিত শিখার মত জ্বলে উঠছে -এই সত্য, এই যথার্থ।

অধ্যাপক অমলেন্দু সেন উত্তাল চল্লিশের দিনগুলির উত্তেজনাময় মুহূর্তগুলি, আবেগ-ভালোবাসায় স্পন্দিত মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিজ্ঞার প্রহরগুলিকে ইতিহাসের ফ্রেমে বাঁধতে চেয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক জীবনের চলমান প্রবাহের বিশেষ বাঁকে দাঁড়িয়ে জীবন্ত চরিত্রগুলির দুর্দম সংকল্প, দ্বিধা, দ্বিধামুক্তি এবং নির্ভয় আত্মদানের ছবিগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রশস্ত অর্থে জীবনশিল্পী ঐতি-হাসিকও। কিন্তু ইতিহাস রচনা তাঁর কাজ নয়, তাঁর শিল্প মানুষের মনকে নিয়ে। সেদিক দিয়ে বিচার করলেও 'চিহ্ন' একটা ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন এলাকার মেহনতী মানুষ-মধ্যবিত্ত-ছাত্রশ্রেণীর সার্বিক জাগরণের পরিচয়বহ।

বিপুল ভাঙা-গড়ার আন্দোলনে মনেরও বদল ঘটে, আত্মকেন্দ্রিকতার বেড়াগুলি মনের অমোঘ নিয়মেই সরে সরে যায়। হেমন্ত তার ব্যক্তিগত উচ্চাশার বেড়া ভেঙে বাইরে এসেছে, দুঃখ পেয়েও শেষ পর্যন্ত অনুরূপাও তাঁর নির্মোকের বাইরে, জয়ন্ত-রমাও ঘরের বাইরে দেশ-কালকে জানছে। অক্ষয় মদ খায়, সেই সব সত্য নয়, মদে তাকে খেয়েছে ; কারণ কর্তব্যবুদ্ধি, সংসারের দায় সবই শুঁড়িখানায় বিসর্জিত ; এহেন অক্ষয় মদ খেতে গিয়ে বিভ্রান্ত। ময়দান এলাকা জুড়ে কিসের এ যুদ্ধ আয়োজন ! পুলিশের লাঠি-গুলি সত্ত্বেও এত মানুষ সমবেত, কেউ নড়ছে না ! এত জোর এই মানুষগুলি পেল কোথা থেকে ? একদিকে সংকল্পবদ্ধ নিরস্ত্র জনতা, অন্যদিকে সশস্ত্র বাহিনী। অবিভক্ত বাংলার এই জনতা শাসকশ্রেণীর নানা শয়তানী চক্রান্তের স্বরূপ চিনতে পেরে শেষ সংগ্রামের জন্য তৈরি ছিল। 'বিচারপতি, তোমরা বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে সেই জনতা'—এ কেবল গণসংগীত নয়, গণচেতনার প্রজ্জ্বলন্ত আবেগের ঐতিহাসিক উচ্চারণ।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে বই আকারে বেরোবার সময়ে (১৯৪৬) লেখক

জানিয়েছিলেন, 'বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা। একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই। এ ধরনের কাহিনী যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।' লেখকের সমর্থনে বলতে হয়, 'চিহ্ন' উপন্যাসে 'সাজানোর রীতি' সঙ্গত কারণেই প্রথাসিদ্ধ রীতি ভঙ্গ করেছে, তাতে কেবল 'কাহিনী জোরালো' হয়নি, বক্তব্যের নতুন ধরন নতুন টেকনিকই চাইছিল। বরং প্রচলিত রীতির পিছুটানেই চরিত্রগুলিকে সামাজিক প্রেক্ষিতে পূর্ণাবয়ব দিতে মধুখালি-চিরবাগীর অবতারণা, দুই গ্রামের সঙ্গে কাহিনীর যেটুকু অতীত সংযোগ, অনায়াসেই তা ময়দান-সংশ্লিষ্ট সংলাপে জুড়ে দেওয়া যেত। হাবিবের পশ্চাৎপট ওসমান-আমিনার প্রসঙ্গে উপন্যাসের প্রয়োজনকে না ছাপিয়ে সংযুক্ত হতে পেরেছে, তেমনি জমিদার জগৎ ও চপলাকান্তের কথা প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন না করেই ময়দানে উঠে আসতে পারত। তাহলে অক্ষয়-অলকার (সুধা) দাম্পত্যজীবনে লেখকের অভিলষিত তাৎপর্য আরোপ আমাদের অভিনিবেশে আবো সহজ হয়ে উঠত। মদ্যপের হৃদয় পরিবর্তন মানিকবাবুর রচনায় একটি প্রিয় মোটিফ, অক্ষয় সেই মোটিফকেই ব্যক্ত করেছে।

অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছে অক্ষয়। তার বোন ললিতা বা স্ত্রী অলকার কাছে এ কোন নতুন সংবাদ নয়। খাবার ঢাকা থাকে, অক্ষয় না খেয়েই শুয়ে পড়ে। কিন্তু আজ সে খেতে চাইছে। সে নাকি মদ না খেয়ে এসেছে। সে আজ রাতেই পূর্ব স্বভাবের জন্য মায়ের কাছে ক্ষমা চাইবে। সকলের ধারণা এও মাতলামির একটা পর্যায়। অক্ষয় চায়, অলকা তার মুখ শুঁকে পরখ করুক, সে মদ খায়নি। আসলে ময়দানের পরিস্থিতি, ছেলে-বুড়ো, ভদ্রলোক ও শ্রমিক-মজুরের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী-চেহারায় অক্ষয়ও অভিভূত। অল্প চেষ্টাতেই পুরনো অভ্যাসের দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে আসল মানুষ। অক্ষয়ের চেতনা হেমন্ত-ওসমান-শিবনাথের মতো শাণিত নয়, তবু দায়বোধে স্থিত—এ পরিবর্তনও লক্ষণীয়। অক্ষয়ের উক্তি ও ভাবনার পাশাপাশি দুটি রূপ—

১. ঝুলো বুড়ী মাগী, শাড়ি সেমিজ পরে কচি বৌ সাজতে লজ্জা করেনা? খোল্, খোল্, শিগ্‌গির খোল্।

২. প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে তার, অনেক প্রায়শ্চিত্ত।...মাথাটা আজ যেন সাফ মনে হয় অক্ষয়ের। এই প্রথম ও নতুন নেশা ('বাঁচাব জন্য বাঁচাবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা') এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়ত সে খাবে দু' একবার নিজের দুর্বলতায়, কিন্তু সেটা দু একবারের বেশি খাবে না, কারণ ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে—গেঁজানো রক্ত।

মদ্যপ যখন 'কারণ' খোঁজে, তখন তার চৈতন্য, যুক্তিবোধ ফেনিল সুরায় সম্পূর্ণ আবিষ্ট হতে পারে না। লেখক অক্ষয়ের নবজন্মের সংবাদ দিয়েছেন।

'হৃদয়-মনে কোটি বসন্ত আসে অক্রয়ের।'
'আজ তাদের আবার বিয়ে হবে নতুন করে।'

গণেশকে সম্পূর্ণ করে তুলতে বিদ্যুৎ লিমিটেডের অবতারণা। ফুলবেড়ের গফুর-আমিনাই জানিয়েছে, জমিহীন কৃষাণ থেকেই মজুর আসে। চিরবাগীর গ্রামীন পটে গণেশদের জমির লড়াই উল্লিখিত, সেই গণেশই বিদ্যুৎ লিমিটেডের কর্মী। ব্যবসা দাশগুপ্তের, বিদ্যুৎসরঞ্জাম তৈরী ও সরবরাহ। কিন্তু আসল ব্যবসা নারীমেধের। তিনতলা অ্যাপার্টমেন্ট, খাদ্য পানীয়ের ঢালাও ব্যবস্থা, চন্দ্রের ম্যানেজারি, কল-গার্লের সরবরাহ। রেডিওর বাক্সে বিলিতি মদ বহন করছিল গণেশ। হাসপাতালে তার মৃত্যু, রেডিওবাক্স পুলিশ হেফাজতে। গণেশের বাবা-মার সঙ্গে কি জঘন্য আচরণ! মুনাফাশিকারী চন্দ্র-দাশগুপ্তদের হৃদয়হীনতার উন্মোচন।

অনুরূপার কথা একটা সমে এসে পৌঁছিতেই দৃশ্যান্তর। অজয়ের কথা উপন্যাসের স্রোতোপম কাহিনীতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অনিবার্য সূত্রে মিছিল কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অনুরূপা যেমন নিজের সংসার-সর্বস্ব দুনিয়ার বাসিন্দা ছিলেন, অনন্ত তারই অনুরূপ। তিনিও এযুগের ছেলেমেয়েদের চালচলন বুঝতে পারেন না। কি করে অজয় ও মাধু? মাধুর বিয়ের ভাবনার কোন সমাধান-দিগন্ত দেখতে পায়না অনন্ত। আজ যখন কেউ কাজে যাচ্ছেনা, হরতাল —আজই তো অজয়ের অফিস যাওয়া উচিত। কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ার এমন সুযোগ নষ্ট করা মূঢ়তা। অনেক বাক্যব্যয় এবং ভাবনা-চিন্তার পরে অনন্তের মনেও লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। অফিস যাওয়ার পক্ষের যুক্তিগুলির ধার ভোঁতা হয়ে এসেছে।

> আজ আপিস যেওনা। সবাই যখন আপিস যাচ্ছেনা, তোমার যাওয়া উচিত হবে না। সবাই যা করে, তাই করাই ভালো।

দারিদ্র্যের চাপে অন্য বাড়ি রাঁধুনির কাজে যাবে মাধু. কিন্তু তার আগে, পরি-স্থিতির অনিবার্য টানে মাধু প্রতিবাদ-মিছিলে যায়। অজয়কথা যুক্ত হয়েছে গণেশ-কথার সঙ্গে। যাদব-রাণী, গণেশের বাবা-মা শহরে এসেছে বিদ্যুৎ লিমিটেডের সন্ধানে। ছেলের সঙ্গে দেখা করবে। গণেশ কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছে, এই মিথ্যা সংবাদে বিশ্বাস করেই তারা পথ চলছিল। কিন্তু সব পথই তো মিলেছে চৌরঙ্গী এলাকার রণাঙ্গনে। অজয় হেমন্তের চেয়ে বেশি নির্লিপ্ত, সে মিছিলে জড়িত হতে চায়নি। পারিবারিক অনটনের লড়াইতেই সে জেরবার। তবু সে জড়িয়ে পড়ল, পুলিশের আচরণে বাঁ-হাতটা খোয়াল। ময়দানের পথ বাৎলে দিয়েছে অজয়। যাদব ও রাণী শেয়ালদা, সেখান থেকে বিদ্যুৎ লিমিটেড। আবার শেয়ালদার দিকে। কিন্তু —

> লালদীঘির সামনা-সামনি পৌঁছে তাদের থামতে হয়। চারদিক লোকারণ্য, ভিড় ঠেলে এগোনো অসম্ভব। বিরাট এক শোভাযাত্রার মাথা লালদীঘির ওদিকে মোড় ঘুরছে, সামনে তিনটি তিন রকম বড় পতাকা উত্তুরে হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। শোভাযাত্রার শেষ এখনো দেখা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনি উঠছে হাজার কণ্ঠে। এবার যাদবের মনে হয়, বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।

গেঁয়ো যাদব আর-এক গেঁয়ো গণেশের ইচ্ছাপূরণ করেছে। 'এরা এগোবে না' এই প্রশ্ন গণেশের ; উপন্যাসের মূল বক্তব্যও। সব চরিত্রই লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রী। গণেশ মৃত, গণেশের সাধ পূর্ণ যাদবে। 'আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি, আমরা এগিয়েছি।' যাদবের এই সক্রিয়তায় অজয় অনুপ্রাণিত, দীপ্ত। 'মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে।'

জনতাকে নিয়ে উপন্যাস। জনতা দৃশ্যে সূচনা, জনতাদৃশ্যে সমাপ্তি। নিরীক্ষা হিসেবে অভিনব। শিথিল প্লটের উপন্যাস ? এ অভিধাও উপযুক্ত নয়। কারণ তাতে শিল্পনিরীক্ষার অন্তরে প্রবেশ করাই যাবেনা। 'চিহ্ন' উপন্যাসকে এইভাবে দেখা যাক।

[আট]

নানা দিক থেকে মিছিল আসছে এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে। রশিদ আলি দিবস। ১৯৪৫। ইংরেজ শাসনের অন্তিম লগ্ন। প্রত্যহ একটি করে প্রতিবাদ মিছিল। পুলিশের বাড়াবাড়ি। প্রতিবাদে পরদিনও মিছিল-সমাবেশ। সময়ের অস্থিরতার স্মৃতি আজও ভোলা যায় না। সেই রকম একটি দিন। পুলিশের বাধায় মিছিলের গতি রুদ্ধ। লেখকও শরিক। সঙ্গে ক্যামেরা ও রেকর্ডার আছে ধরে নিলে শটগুলি চেনা যায়—অতি দ্রুত, চলচ্চিত্রের মতো।

দৃশ্য—১. গণেশ আহত। ওসমানের সহায়তায় জিওনলালের লরী হাসপাতালে নিয়ে গেল। [পৃ ১—৮]
দৃশ্য—২. ভিড়ের মধ্যে হেমন্ত, তার ভাবনা। [পৃ ৮—২২]
দৃশ্য—৩. ঘোড়ায় চড়া পুলিশ। রজত নারায়ণ শান্তি। [পৃ ২২—২৯]
দৃশ্য—৪. রসুল আবদুল ইত্যাদি। লাঠিচার্জ আসন্ন। পিছু হটে ভাবনা. স্মৃতির চিরবাগী। [পৃ ২৯—৩৮]

পৃষ্ঠা সংখ্যা বসুমতী সংস্করণের।

এই ভাবে সাজানো যায়। জনতার নানা অংশে আলো পড়েছে। উঠে এসেছে মানুষের মুখ—জীবন্ত, ক্ষুব্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অথচ নিরস্ত্র। অক্ষয় অনুরূপা যাদব-রাণী অজয় সকলেই মিছিলের ঐক্যে গ্রথিত। একক ব্যক্তি হিসেবে কেউ কিছু নয়। তাদের সংকল্প, ক্রোধ, প্রতিবাদও মূল্যহীন। কিন্তু সমবেত মানুষের ইচ্ছার সংহতি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পুলিশকেও থামতে হয়। পাইকারী হারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে মানুষকে আসামী বানানো যায় না। 'চিহ্ন' এই অসামান্য পরিস্থিতির কথাশিল্প।

রিপোর্টাজ বিশ্বাসযোগ্য হলেই উপন্যাস হওয়া কি সম্ভব, এ প্রশ্নও উঠতে পারে। 'রিপোর্টাজ' প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর, শিল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারটি লেখকের শক্তিসাপেক্ষ। মানিক নিছক ক্যামেরাম্যান বা রেকর্ডপ্লেয়ার নন ; তাই চরিত্রের শ্রেণীমূলে পৌঁছতে তিনি ফ্ল্যাশব্যাক পন্থায় গেছেন মধুখালি,

চিরবাগীতে, গেঁথেছেন শ্রমিক কৃষক ছাত্র কেরানীদের এক সূতোয় ; চন্দ্র-দাশগুপ্ত বা চপলাকান্ত—জিয়াউদ্দীনদের সূক্ষ্ম কর্ম-কৌশল এবং শ্রেণীচারিত্র্য চিনিয়েছেন। উপন্যাসের মর্মবস্তু যে জীবন-অন্বেষা, জীবনের মূল্যমান সন্ধান, তার জোরেই জনতা থেকে ব্যক্তি, ব্যক্তি-প্রতিনিধি থেকে শ্রেণীগত পরিচয় উন্মোচনে ঔপন্যাসিকের সিদ্ধি।

১৯৪৫ আরম্ভ নয়। ধরা যাক, ১৯৪২ সালে আরম্ভ। গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো', সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুববিদ্রোহ, সোশালিস্ট পার্টির ইংরেজবিরোধিতা, ট্রাম-ট্রেন ধ্বংসের কর্মসূচী ; ১৯৪৩ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, হাজার হাজার মানুষের অসহায় মৃত্যু, প্রবল জনবিক্ষোভ, নেতারা কারারুদ্ধ, সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুন জন্ম, ৪২-৪৩-এর অন্ধকারে যুদ্ধের কনট্রাকটর, দালাল ও চোরাকারবারী শ্রেণীর প্রাধান্য ; ১৯৪৫ তারই অনুবৃত্তি। সঙ্গত কারণেই উপন্যাসে এই ইতিহাসসূত্র রক্ষিত। যেমন জমিদার চপলাকান্ত বসু। দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামে রিলিফ সেন্টারে বাধা দিয়েছিলেন। যাতে ওঁর চালের চোরা কারবার আরও তেজী থাকে। কি কৌশলে চপলাকান্ত-জিয়াউদ্দীনরা অফিসারদের ঘুষ দিয়ে চোরাকারবার বহাল রাখে, শহরে-তাদেরই দোসর বিদ্যুৎ লিমিটেডের মত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সত্য এই যে, তবু দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে ওঠে, লঙ্গরখানা চলে, হিন্দু মহাসভা-কংগ্রেস-কমিউনিস্ট পার্টি একসঙ্গে রিলিফের কাজে গ্রাম-বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই অব্যবহিত অতীতের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই তো আবদুল গণেশ রসুলদের সৃষ্টি। এরাই চল্লিশের দশকের সামাজিক প্রগতির অক্ষৌহিনী।

খুব সংক্ষেপে উপন্যাসে উচ্চারিত কিছু সমাজসত্য উল্লেখ করা যাক।

১. শ্রমিকের ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনের বিরুদ্ধে মালিকদের প্রচার—'স্বদেশী মার্কা মালিকের পাপের ছুতো যেমন এই যুক্তি যে ইণ্ডাস্ট্রিতেই দেশের উন্নতি।'

২. 'গাঁয়ের শতকরা আশিজন প্রজা মুসলমান। আসল নায়েব নকুড় ভট্টাচার্য, শাসন চালায় জিয়াউদ্দীন শত অত্যাচার চালালেও কেউ যাতে না বলতে পারে যে হিন্দু অত্যাচার করেছে মুসলমানের ওপর।'

৩. কাল থেকে গুলি চলছে কলকাতায়, চারিদিকে লড়াই সুরু হয়েছে সারা শহরে, ভীষণ কাণ্ড। কালকের ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে আজকের ভোরের কাগজে। (উত্তাল চল্লিশের ছবি)

মোট দুদিনের ঘটনা উপন্যাসে বিধৃত। স্থান ঃ কার্জন পার্ক লালদীঘি সংলগ্ন এলাকা। রশিদ আলি দিবসের পরদিন পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ মিছিল। কাহিনীর বিন্যাস অনেকটা এইরকম।

রণাঙ্গনে থমকানো দৃশ্যপরম্পরা ঃ 'ওরা এগোবেনা ?'

	মধ্যবিত্ত	কৃষক	শ্রমিক
ছাত্র —	অক্ষয় অজয় নিরঞ্জন	মধুখালি	ওসমান
	শিবনাথ হেমন্ত আনোয়ার	চিরবাগী	হানিফ
	শুদ্দসত্ত্ব সীতা শান্তা	গণেশ আবদুল	আবদুল
	রজত নারায়ণ জয়ন্ত		রেজ্জাক

এসপ্লানেড-লালদীঘি এলাকা

সব পথ মিলেছে ময়দানে। আবার চরিত্রগুলির আইডেনটিটি প্রতিষ্ঠা দিতে কলকাতার শ্রমিক-এলাকা, শহরের কয়েকটি মধ্যবিত্ত পরিবার এবং দুটি গ্রামের দিকে কাহিনীর অনিবার্য যাত্রা।

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির জগৎ	**শ্রেণীগত অবস্থান ঃ শোষক চরিত্র**
অলকা ললিতা অনুরূপা অরুণা	চপলাকান্ত জগৎ জিয়াউদ্দীন নকুড়
	দাশগুপ্ত চন্দ্র ঘোষ

মানিকের 'চিহ্ন' ব্যতিক্রমী শৈলীর উপন্যাস। দেখেছেন যা লিখেছেন, লিখতে লিখতে ভেবেছে এবং ভাবতে ভাবতে লিখেছেন। তাই কোন কোন জায়গায় দীর্ঘ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, অহেতুক, অসংশোধিত। কতগুলি ব্যাপ্ত আছে নামেই, চরিত্রের স্বল্পবেখায়নও উহ্য, অক্ষয়ের স্ত্রী অলকা হয়েছে সুধা। মদ খাওয়া-না খাওয়া নিয়ে ভাবালুতা এই ধরনের উপন্যাস-টেকনিক লেখকের অভিপ্রায়ের অন্তরায়।

দ্রুত লিখনের ত্রুটি মার্জনার অভাব, চরিত্রের চটজলদী নামকরণ এবং পরমুহূর্তে বিস্মরণ মানিকের সাহিত্যকর্মের সাধারণ দোষ। তিনি নিজে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন কিনা জানিনা। তাঁর অনুরাগী মহলেও সারস্বত কর্তব্যনিষ্ঠা অল্প ছিল। নতুবা একই গল্পের 'রামপদ' 'কেশব' হল, সেই ভুল পঞ্চম সংস্করণেও নজর এড়িয়ে গেল ? তবু মানিকবাবু অনন্য সাধারণ। কারণ চলমান জীবনকে আয়ত্ত করতে তার তীব্র আগ্রহ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরমার্থ পরিবর্তন এবং নতুন চরিত্রের প্রবর্তনা —মানিক সাহিত্যের দিকে সংবেদী পাঠককে আকর্ষণ করবেই।

সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়

সুবোধ ঘোষ : গভীরাশ্রয়ী জীবনবোধে সুচিহ্নিত

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রান্তর-ভূমি আজ নেহাৎ অনুর্বর নয়। আপন ব্যক্তিত্বে, স্বাতন্ত্র্যে, জীবন ও জীবিকার কঠিন সংগ্রামের পরাকাষ্ঠায়, আধুনিক সমাজ-বোধের অত্যুজ্জ্বল মানবী-চেতনায় এবং সর্বোপরি পুরুষ ও রমনীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে- বাংলা উপন্যাসের বিশাল-বিস্তৃত নভোমণ্ডল ঋতু-ভেদে প্রকৃতি-আকাশের মতই নানা বর্ণময়, রূপময় ও চিত্রময় হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষাংকে এসে তাই বাংলা উপন্যাসের জগতটি হয়ে উঠেছে বেশ উজ্জ্বল ও ঐশ্বর্যশালিনী। জীবন-যৌবনের সোচ্চার প্রকাশ, অবহেলিত নর-নারীর জীবনের দ্যোতনা, মধ্যবিত্তের সামাজিক সমস্যা, মানুষের মন ও মতি এবং পাপ বোধ, দুর্নীতি, অহংকারবৃত্তি, অন্ধ রাজনীতি, ধনী হওয়ার জন্যে বণিক বৃত্তি এবং সর্বোপরি অর্থ, নারী ও সুরার জলতরঙ্গ – আজ আমাদের আধুনিক উপন্যাসের শিরা-উপশিরা। সেখানে যৌবনের কোলাহল আছে, নিঃসঙ্গের গান আছে, প্রেম আছে ; আছে অপ্রেমের বলাৎকার। আর আছে যৌন আকাঙ্ক্ষার চরম নির্লজ্জ ভিক্ষাবৃত্তি। বাংলা উপন্যাসের খাতা বদল হবে কি হবে না, তার গতি ও প্রকৃতি, রুচি ও স্বাদে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হবে কিনা তার জন্য অপেক্ষা করবে আগামী প্রজন্ম। কারণ সমাজ পাল্টাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর দামামা-বাজছে। সমাজে ও জীবনে পরিবর্তন আসছে।

বাংলা উপন্যাসের এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমাদের আলোচ্য বিষয় শ্রী সুবোধ ঘোষের বাংলা উপন্যাস।

'কল্লোল' যুগ ও সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে ঘটেছিল প্রবল বারিপাত। এর ফলে বঙ্গসাহিত্যে শুরু হল আধুনিকতার সূচনা। এই আধুনিকতায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের সৌরভটি উল্লেখনীয়। নব্য চেতনায় জোয়ার, প্রাচীন ধর্মাধর্ম ও আদর্শকে মুছে ফেলার চেষ্টা, নানা বল্গাহীন দেশাত্মবোধ, অকৃত্রিম প্রকৃতি প্রেম ও আধুনিক চিন্তা ও মননশীলতায় জীবনের বিচার করার বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিলেন কল্লোলীয় লেখক ও কবিগণ। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন কাজী নজরুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু। প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনীশ ঘটক, শৈলজানন্দ, গোকুলনাগ, নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও মুরলীধর বসু। চিন্তায় চেতনায় জীবনের পথ চলায় এঁরা ছিলেন নির্ভেজাল প্রগতিবাদী সাহিত্যিক। প্রচলিত সনাতন আদর্শকে কল্লোলীয় লেখকগণ অস্বীকার করলেন। কল্লোল (১৯২৩) কালিকলম (১৯২৬) ও প্রগতি (১৯৩৭) এই ত্রয়ী পত্রিকায় ত্রি-ধারা স্রোত ছিল নব্যতর আধুনিকতার এক সু-উচ্চ লাইট হাউস। নরেশ সেনগুপ্তের স্বৈরিণী 'শুভা' (১৯২০) 'সর্বহারা' (১৯২৩), বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' (১৯৪৯)। 'মৌলিনাথ' (১৯৫২), গোকুল নাগের 'পথিক' (১৯২৫), মনীশ ঘটকের 'পটল ডাঙ্গার পাঁচালি' (১৯৫৬), প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক'

(১৯২৬), অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'বেদে' (১৯২৮) প্রভৃতি রচনায় আধুনিক চেতনায় সোচ্চার প্রকাশ বিদ্যমান। 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে'র জোয়ার থেকে উঠে এলেন জগদীশ গুপ্ত, তারাশংকর, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কথাসাহিত্যিকগণ। এঁদের কালি ও কলমে-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা কথা বলে উঠল। ডোম, সাপুড়ে, চোর, ডাকাত, মদ্যপ, লম্পট, ভিক্ষুক, পতিতা, শ্রমিক, কৃষক, মজুর প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষেরা কল্লোলীয় লেখকগণের লেখায় কলরব করে উঠল! কল্লোলীয় লেখকগণের ছোট গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নতুন সমাজবাদের এক আলো-আঁধার মেশা রোম্যাণ্টিক চেতনার সৃষ্টি করল। বাংলা সাহিত্যের এই আলো-আঁধারি রোম্যান্টিক চেতনায় ফ্রয়েডবাদ, মার্কসীয় দর্শন, সমাজ-বিপ্লব প্রভৃতি ভোগসর্বস্ব বস্তুবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। তাঁদের রচনায় প্রকাশের আলো ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতায় অন্ধকারও যে ছিলনা সে কথাই বা অস্বীকার করি কি করে? তাই বাংলা সাহিত্যের আকাশে দেখা দিল আলো-আঁধারির দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কিরণ-মালার স্বর্ণচ্ছটা। তবু এর মধ্যে জগদীশ গুপ্তের 'বিনোদিনী', তারাশংকরের 'বেদেনী', শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠি', 'বধূবরণ' প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুতুল ও প্রতিমা', 'মৃত্তিকা' প্রবোধ সান্যালের 'নিশিপদ্ম', অচিন্ত্য কুমারের 'হাড়ি-মুচি-ডোম', 'কাঠ-খড়, কেরোসিন' গল্প গ্রন্থগুলি অনন্য সাধারণ।

কল্লোলীয় লেখকগণের সাহিত্য-সাধনার নেপথ্যে সক্রিয় ছিল যশস্বী হবার এক প্রবল বাসনা। পাশ্চাত্য শিক্ষায়-দীক্ষায় এবং পশ্চিমী মূল্যবোধের আদর্শ অহংকারে প্রবৃত্ত হয়ে এই যুগের কোন কোন লেখক গজদন্ত মিনারের মোহাবেষ্টনের মধ্যে কালাতিপাত করতে করতে মাতৃভাষায় আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রকাশের ব্যাকুল তাগিদ উপলব্ধি করতেন। তবু তাঁদের কৃতিত্বটুকু অস্বীকার করার কোনও অবকাশ নেই। কারণ—'আমি পাপী, পাপ করেছি- হিন্দুর সন্তান হয়ে গো-মাংস ভক্ষণ' করেছি-- এই কথা স্বীকার করার মধ্যে নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিকতা আছে। এটাও এক ধরনের রোম্যাণ্টিকতা। কল্লোলীয় লেখকগণের চেতনায় এই ধরনের রোম্যাণ্টিকতার আতিশয্য দেখা যায়। বন্ধনহীন উন্মাদনা—'Anything which is new'-এর প্রতি আস্পৃহা, প্রেম, প্রণয়, নারী দেহের সম্ভোগ প্রভৃতি সম্পর্কে সমস্ত প্রচলিত ধ্যান-ধারণার অর্গল ভেঙে ফেলে, প্রাচীন মূল্যবোধের কবাটকে উপড়ে ফেলে নতুন কিছু পাবার আশায়, নতুন সূর্যোদয় কে দেখার বাসনায়,—'কল্লোলীয়' রচনাকারগণ রোম্যাণ্টিক হতে চেয়েছিলেন। " উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আন্দোলন ।"

[—অচিন্ত্যসেনগুপ্ত / কল্লোল যুগ, পৃঃ ৩০]

এই বন্ধনহীনতার জোয়ারে সাহিত্যে দেখা দিল এক বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। কল্লোল যুগের কথিত সাহিত্যিকগণের লেখায় সেই বিদ্রোহের আঁচ ও উত্তাপ পাওয়া যায়।

জোয়ার যখন আসে তখন যেমন সেই জোয়ারের জলে-মলিনতা থাকে তেমনি সেই স্রোতে ভেসে আসে ফুল-পাতা অথবা মৃত পশুর কংকাল। সেই জোয়ারের জলে যেমন গান থাকে, ভাষা থাকে তেমনি সেই জোয়ারে থাকে প্রবল গতিবেগ। এই গতিবেগের প্রাবল্যই 'কল্লোলীয়' লেখকগণের বৈশিষ্ট্য।

'কল্লোল', 'কালি-কলমে'র সময়ের সামান্য কিছু পরে, দেখা দিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লোলীয় লেখকগণের অদম্য প্রচেষ্টায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে বীজ রোপিত হয়েছিল—তার অঙ্কুরোদ্গমের প্রত্যাশায় এক ঝাঁক-পাখির মত উড়ে এলেন এক ঝাঁক কথাসাহিত্যিক। এঁদের সাহিত্যে এল শিল্প-সুষমা ও সমন্বয়-চিন্তা। তাই কল্লোল ও কালি-কলমের পর এই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগকে আমরা বলতে পারি সমষ্টি সমবায় ও সমন্বয়ের যুগ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একেই বলেছেন —**'Age of fragments'**

[—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় / সাহিত্য ও সাহিত্যিক, পৃঃ ১০২]

কল্লোল ও কালি-কলমের আবেগ কিছুটা যখন থিতিয়ে এসেছে। জোয়ারের পরে বাংলা সাহিত্যের প্রান্তর-ভূমিতে যখন পলিমৃত্তিকা পড়েছে, তখন নিঃসন্দেহে সেই পলিমৃত্তিকার বুকে দেখা গেল কল্লোলীয় সাহিত্যিকগণের নিত্যবিরাজমান পদচিহ্ন। বাংলা-সাহিত্য-জননীর অস্বচ্ছ অলক্ত চরণ-যুগল আবার রঞ্জিত হল এক নূতন চেতনার রঙে। পরাধীন ভারতে তখন এসেছে স্বাধীনতা। কিন্তু সেই স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে স্বোপার্জিত কিনা, সে বিচারের-ক্ষেত্র এখানে নয়। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঝাঁকায় দেখা দিল অনেক সমস্যার বোঝা। মন্বন্তর, মহামারি, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, লড়াই, দেশভাগ বাস্তুহারার আগমন, ছিন্নমূলের সমস্যা, বেকারত্ব, রাজনৈতিক-চেতনা, অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব, শোষক ও শোষিত শ্রেণীর ভেদাভেদ, কালোবাজারি, নর-নারীর প্রেম প্রভৃতি সমস্যাক্লিষ্ট সমাজের বুক থেকে জন্ম নিল আর এক মহীরুহ। কল্লোলের কলধ্বনি আর নেই। কালি-কলমের চিৎকার-অপসৃয়মান। তার বদলে এল—আত্মোপলব্ধির ধ্যান-মগ্নতা, আত্মসচেতনতা এবং ভ্রাম্যমান জীবনান্দের স্বাদ গ্রহণের অভীপ্সা, সৌন্দর্য-পিপাসা—নারীশক্তি ও পুরুষ চেতনার মধ্যে অভিনবকে আবিষ্কার করা। সঙ্গেসঙ্গে সমাজের গহন অন্ধকার-দিকগুলির বিচার-বিশ্লেষণ, নবীন দৃষ্টির মূল্যায়নে পুরোন ও প্রাচীনকে বিচার করা। সব কিছুকেই বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। অর্থাৎ **'The matter to disect' (Intellect** এবং **Emotion')**-এর সাথে মিশে রইল ধর্মবোধ, ঈশ্বর চিন্তা; বুদ্ধি এবং আবেগ। মনেরাখতে হবে যে, এই সময়ে সত্যকে, ন্যায়পরায়ণতা কে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা যেমন প্রবল ছিল, তেমনি সমাজের ক্লেদাক্ত অন্ধকার গলি-ঘুঁঝির নরনারীদের সাহিত্যে তুলে আনার প্রচেষ্টাও দেখা দিল। সমাজের পাপ, গ্লানি, অন্যায়, শোষণ অন্ধকার কে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করার সাহস দেখালেন কল্লোলোত্তর কথাসাহিত্যিকগণ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,

বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, সন্তোষ ঘোষ, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, বিমল মিত্র, জ্যোতিরীন্দ্র নন্দী, বিমল কর, প্রতিভা বসু, গজেন্দ্র মিত্র প্রমুখ।

তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে কল্লোলোত্তর কালের কথাসাহিত্যিকবৃন্দের রচনায় সমসাময়িক কালের কান্না-ঘাম-রক্ত এবং হাসি-ভালবাসার কলরবধ্বনি সদা জাগ্রত। সমকালীন সমাজের আবর্তসঙ্কুল পটভূমিকায় কল্লোলোত্তর কথাশিল্পীগণ বিচরণ করেছেন। কালোত্তীর্ণ হতে পেয়েছেন কিনা সে বিচারের ভার আগামী প্রজন্মের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সু-সঙ্গত। একদিকে সমসাময়িক কাল, জীবন-জীবিকা, যৌন-চেতনা ও বোধ এবং মনস্তত্ত্বের নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যায়নে মানুষের সুখ-দুঃখ, পার্থিব-অপার্থিব চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণে প্রয়াসী হলেন এই সময়কার লেখকগণ। সমকালীন সমাজের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ সাংসারিক-চাঞ্চল্য, বিপর্যয়, সমস্যাদীর্ণ সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এদের রচনায় প্রতিফলিত হয়ে উঠল। আমাদের মনে হয় এই প্রতিফলনের মধ্যেই কল্লোলোত্তর সাহিত্যিকগণের ব্যক্তি সত্তা অনেকাংশে অন্তর্মুখী। হয়ে উঠেছে সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতার গান গেয়েছেন এরা। কখনো কখনো একাকীত্ব, আবার কখনও বা স্মৃতি-চারণ-ই (Retrospietiveness) ছিল এ-যুগের কোন কোন লেখকগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কল্পনার মনি-মাণিক্য খচিত মিনার থেকে এ'রা নেমে এসেছেন—রূক্ষ, সূক্ষ্ম কঠোর কঠিন কংকরময় বাস্তবের রাস্তায়। তাই কল্লোলোত্তর সাহিত্যিকগণের লেখায় সমাজ-বাস্তবতাবোধ একটি বড়ো মূলধন। কাচকে এ'রা কাচ বলেই মনে করেন,—হীরা মনে করেন না। যা কিছু কৃত্রিম, ঝুটা, মেকী, নকল, তাকে এই আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যিকগণ সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছেন "ইহা অসত্য"। এ'রা ময়ূরের-পালক কুড়োলেন, কল্পনার পেখম ওড়ালেন, কিন্তু ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক সাজলেন না। তাই সমাজ-বাস্তবতা কল্লোলোত্তর লেখকগণের সাহিত্যে শীলমোহর-ছাপের মত বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট। তবে কল্লোল গোষ্ঠীর ভাবাদর্শ ও ঐতিহ্য থেকে কল্লোলোত্তর লেখকগণের সাহিত্য মুক্ত কিনা তা বিবেচনার বিষয়।

কল্লোল যুগের পরে বাংলা কথা-সাহিত্যে যে স্রোতের ধারাধাবিত হয়ে এলো, সেই ধারার একটি খরস্রোতা নদী সুবোধ ঘোষ। তাঁর 'ফসিল' ও পরশুরামের 'কুঠার' উল্লেখ্য গল্প বাংলা সাহিত্যের বেণু-বনে এক সুবঝঞ্ঝা। আর্টের বিচারে এই দুটি গল্প উল্লেখ্য নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। ' ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানব মনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবন সংঘটনের অনেক বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। জীবনের বিরল-পথিক সীমান্ত-প্রদেশ হইতে তিনি কতনা মৃদু সৌরভ পূর্ণ বন্যফুল চয়ন করিয়াছেন। বিষয়-বৈচিত্র্য অপেক্ষা পটভূমিকা রচনায় লেখক উচ্চতর কৃতিত্বের অধিকারী। কোন বিশেষ ঘটনা-পরিস্থিতি বা অন্তরের সূক্ষ্ম, অলক্ষ্যপ্রায় আবেগ ফুটাইয়া-তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনা-গূঢ় বাক্যাবলী তীক্ষ্ন ধার বর্শা-ফলকের মত বর্ণিত বিষয়ের

মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরতম রূপটি উদ্ঘাটিত করে। স্বল্প কয়েকটি সুনির্বাচিত রেখায় অর্থ-ভূয়িষ্ঠ সামান্য কয়েকটি মন্তব্যে পাঠকের সম্মুখে এক বর্ণোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠে, এক অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয় ।"

[—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা / শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

সুবোধ ঘোষের উপন্যাসের ক্যানভাসটি প্রশস্ত। সেই ক্যানভাসে আছে রঙ-বেরঙের তুলির আঁচড়। সুবোধ ঘোষের উপন্যাসে আকস্মিকতার কোন চমক নেই। জীবনকে লেখক খণ্ড-খণ্ড ধারায় না দেখে অখণ্ড ও সামগ্রিক মর্মবস্তুরূপে দেখার চেষ্টা করেছেন। জগৎ, জীবন ও মানব সংসার সম্পর্কে অখণ্ড চেতনা ও বোধ-ই সার্থক ঔপন্যাসিকের বড়ো ধর্ম। সুবোধ ঘোষ মানব-জীবন-বোধের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। আহরণ করে এনেছেন জীবন-সংসারের রঙ, রেখা ও গান। কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজ জগত জীবনের বহু-বিচিত্র গতিপথকে অনুসরণ করে-ই ঔপন্যাসিককে পথ চলতে হয়। কল্লোলোত্তর যুগে পরিবর্তনের, বিচিত্র খাত বদলের সন্ধিক্ষণে সুবোধ ঘোষ এক অনন্য সাধারণ—দূরদর্শী পথিক। আধুনিক যুগের দ্রুত পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করে নিয়েই লেখককে পথ চলতে হয়। ওয়ালটার অ্যালেন বলেছেন– "The modern age is unpropitious to the novelist's art."– সুবোধ ঘোষের উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন ও আঙ্গিক আলোচনায় এখন আসা যাক।

'তিলাঞ্জলি' সুবোধ ঘোষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি দুর্ভিক্ষ ও রাজনীতি। এই উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসেনি তবে স্বাধীনতার দামামা বাজতে শুরু করেছে। ১৯৪২-এর আন্দোলনের জোয়ার তখনও চলছে। সেই সময়ে দেশবাসীর মনে রাজনৈতিক সচেতনতা, স্বাধীনতা লাভের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উগ্র-বাসনা উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক নেতারা কেউ অন্তরীণ, কেউ আত্মগোপন করেছেন। কংগ্রেসের মধ্যে চলছে রাজনৈতিক শলা-পরামর্শ, সভা-সমিতি, ইস্তাহার, প্রচার। চলছে ইংরাজদের সঙ্গে কনফারেন্স। মহাত্মা গান্ধীর সক্রিয় ভূমিকা ইত্যাদির প্রবল স্রোতে স্বদেশের নৌকা যখন দোদুল্যমান, তারা কিছুকাল পরেই সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ। কোনও কোনও বিদগ্ধ সমালোচক 'তিলাঞ্জলি'-কে রাজনৈতিক প্রচার-ধর্মী উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। এ কথা সত্য যে এই উপন্যাসের বেদিকা নির্মিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক প্রচার প্রভৃতির মাল-মশলা দিয়ে। রাজনীতির কল-কোলাহলে মুখরিত হয়েছে, কয়েকটি চরিত্র। যুক্তি-তর্কের সংঘাতে, রাজনৈতিক প্রচারে আপন আপন দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এবং তাদের জয়পতাকাকে উড্ডীন করতে প্রয়াসী হয়েছে। গত দুর্ভিক্ষের বাস্তবানুগ বর্ণনা এই উপন্যাসে সুচিত্রিত। রাজনৈতিক শ্লাঘা, কংগ্রেস-কমিউনিস্টের মতাদর্শের সংঘাত-এই উপন্যাসে সুগভীর হয়ে আছে। মনে প্রশ্ন জাগে, লেখক কি দায়-বদ্ধ ? একদলকে অন্য দলের থেকে প্রাধান্য

দিতে ? সাহিত্যের শিল্প-সুষমা, আর্টের কলা-নৈপুণ্যকে উপেক্ষা করে লেখক যদি এক দৃষ্টি-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন, তাহলে সেই উপন্যাসের বেদিকায় দেবী আসেন কিন্তু দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, হয় কি ? উচ্চকণ্ঠ, সোচ্চার ও সরব মন্ত্রোচ্চারণই সেখানে সব নয়, আত্মসমাহিত ভাব, ধ্যানমগ্নতা, প্রাণাৎ প্রাণের ভক্তি-উৎসর্গ হোল সেই পূজার নীরব মন্ত্রোচ্চারণ। কোলাহল মুখর শ্মশান, হরি ধ্বনি, শবকে ঘিরে রোরুদ্যমান প্রতিবেশ, ডোমদের চিৎকার, জ্বলন্ত চিতার ধোঁয়া সবই সত্য সবই নিয়ম কিন্তু ভাবের দিক, সৌন্দর্যের দিক হল সেই শ্মশানেই শব শিব হয়েছেন। শ্মশানচারী শিব এখানে গৃহত্যাগী, সংসারে উদাসীন, নিরপেক্ষ নিরহংকারী, সমদৃষ্টি ভাবাপন্ন—এক নিঃস্বার্থ, নির্ভেজাল সন্ন্যাসী-পথিক। ঔপন্যাসিক ও তাই। ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিকে সেই ভাবাদর্শের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠতে হবে।

সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের কনটেন্টের মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশের কারণে কোথাও কোথাও কাহিনীতে 'শ্লোগানে'র রঙ্ লেগেছে। উপন্যাসের বক্তব্য মানে রাজনৈতিক প্রচার নয়। " বক্তব্যকে প্রচারের রং-চংয়ে পোষাক ছাড়তে হবে এবং রাজনৈতিক প্রচার নয়—জীবনমুখী বক্তব্যময় হতে হবে। অর্থাৎ দলীয় রাজনীতির মূলে যে সমাজ দর্শন ও জীবন দর্শন থাকে সেই মৌলিক সত্যকে উদ্ভাসিত করতে হবে। সাহিত্যকার-কে আরও গভীরে যেতে হয় এবং সেই মৌলিক সত্যকে প্রকাশ করতে হয়—যা জীবন-মুখী এবং পরিবর্তন-মুখী। মার্কস যেমন বলেছেন—চেতনার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক সিদ্ধান্তের মত তা উঠে আসা চাই। এঙ্গেলসও বলেছেন যে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী প্রবণতা 'Snould arise of itself out of the situation and action, without being sapecially emphasised. [—'ছোট গল্পের অশ্ব এবং আরোহী বিষয়ক সন্তাপ' / বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত (পৃঃ ৫১-৫২)]

এ-কথা আগেই স্বীকার করেছি যে 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারে রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত, দুর্ভিক্ষের বিধ্বংসী চিত্রে, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মানসিক সংঘর্ষে কয়েকটি চরিত্রের অবতারণায় 'তিলাঞ্জলি' কাহিনী মুখরিত। শিশির ও সিতার সম্পর্ক—উভয়ের যুক্তিতর্কের বেড়াজালে সম্পর্কটি নিঃসন্দেহে মাধুর্য-মণ্ডিত। একের অপরের প্রতি আকর্ষণের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্তির ছোঁয়া আছে। কিন্তু সংশয়দীর্ণ এই প্রেম-বৈচিত্র্য কোন মহৎ আদর্শের দিকে নির্দিষ্ট নয়। বরং বলা যেতে পারে কিছুটা লিরিক্যাল। অবনীনাথ, অরুণা, জ্যোৎস্না কংগ্রেসের পতাকাবাহী চরিত্র। কংগ্রেসী আদর্শে অনুপ্রাণিত ইন্দ্রনাথের চরিত্রটি আন্তরিক হলেও একক ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল নয়। এরই মধ্যে শিশিরের দেশানুরাগ পাঠকের চিত্তকে মহিমান্বিত করে। শিশিরের ঈর্ষাবোধ আছে। সে অবনীনাথকে ঈর্ষা করে। সিতার প্রতি মোহ তার হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তোলে। ঘড়ির দোলকের

মত তার চিত্ত দোল খায়। দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়। কংগ্রেসের আদর্শ ত্যাগ করে শিশির জাগৃতি সংঘে যোগ দেয়। আবার স্ব-দলে প্রত্যাবর্তন করে। এই ভাবাবেগে দোদুল্যমান তরঙ্গ —শিশির চরিত্রকে সমুদ্রের বেলাভূমির জল বলে মনে হয়। শিশির সমুদ্রের মাঝখানকার অঞ্চল, স্থির শান্ত সমাহিত জল নয়। সিতা সেইদিক দিয়ে উপন্যাসের এক সফল নারী চরিত্র। সিতা চরিত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আছে। সিতা তাই উপন্যাসের এক dynamic চরিত্র। আবার সিতা কোথায় যেন একাকিনী-নিঃসঙ্গ ও বেপথু দীপ-শিখা। সিতার অন্তরঙ্গে সিতা একা। তবু তার মধ্যে প্রেম, রূপজ মোহ আছে। কামনা-বাসনার তীক্ষ্ন-শাণিত তরবারিকে সিতা প্রকাশিত না করে হৃদয়ের কোষে রাখতেই ভালবাসে।

'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের অন্য স্তরে দেখতে পাই যুদ্ধের পদধ্বনি শঙ্কিত সমাজে মানুষের মধ্যে আশংকা, সাইরেনের চীৎকার, খাদ্যাভাব তথা দুর্ভিক্ষের অন্ধকার, মানুসের হাহাকারের মন স্তুদ চিত্র সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে যেন এক কালো ধোঁয়া। কাহিনীর বর্ণনা বাস্তবানুগ সন্দেহ নেই, কিন্তু কোথাও কোথাও সংবাদপত্রধর্মী। যা আমাদের হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে তোলে। ঘৃণ্য, ক্লেদাক্ত পাপাত্মা প্রভৃতির বাস্তব অবতারণা সাহিত্যে যথাযথভাবে অভিপ্রেত কিনা তা আলোচনার বিষয়। তবু বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোসের প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' অব্যর্থ না হলেও ব্যর্থ নয়।

'গঙ্গোত্রী' —সুবোধ ঘোষের এক বিক্ষিপ্ত প্রণয ও প্রেমবোধের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ উপন্যাস। পল্লীগ্রামের শীতল শান্ত ছায়া-ঘেরা-সুনিবিড় প্রতিবেশের মধ্যে 'গঙ্গোত্রী' উপন্যাসের ঢল নেমে এসেছে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির বাজনা বেজেছে। প্রেমের আবেগানুভূতিতে কয়েকটি পুরুষ ও রমণীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ এই উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। মাধুরী, কেশব, পরিতোষ, অজয়, বাসন্তী, প্রৌঢ় সঞ্জীববাবু ও সারদা 'গঙ্গোত্রী' উপন্যাসের বিভিন্ন তরঙ্গ। এই তরঙ্গগুলির অন্তরে প্রেম ও প্রণয় সমুজ্জ্বল। বাত্যাতাড়িত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউ যেমন বেলাভূমিতে এসে আছড়ে পড়ে, এই উপন্যাসেও তেমনি মাধুরী-কেশব-পরিতোষ-অজয় প্রেমাবেগের গভীরে আছড়ে পড়েছে। প্রেমে আন্দোলিত হযেছে। প্রেমের গ্রহণ-বর্জন, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব, সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা, নৈকট্য-ব্যবধান, কৃচ্ছ্রসাধনের স্পৃহা, বৈরাগ্য-অনুভূতি সবই এসেছে —একে, একে। কিন্তু প্রেম-বোধের সোচ্চার প্রকাশ, মহৎ প্রেমের উদার শঙ্খধ্বনি এখানে অনুপস্থিত। লৌকিক পল্লীকেন্দ্রিক চরিত্রগুলি আপন আপন ব্যক্তি-মহিমায় সমুজ্জ্বল কিন্তু সর্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ নয়। অথচ রাজনৈতিক চেতনা সার্থক-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসে (১৯৪৩ সেপ্টেম্বর)। লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম-মনস্তাত্ত্বিক বিচার প্রভৃতি উপস্থাপিত হয়েছে 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের চার 'অধ্যায়ের' কথা আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। যদিও উভয়ের সাহিত্য ভাবনার মধ্যে পার্থক্য আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সার্থকভাবে প্রকটিত হয়েছে। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটির শেষাংশে

রাজনৈতিক বক্তব্য স্বর্ণাভ আলোক-দ্যুতিতে পাঠকের হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করে তোলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসে মনোজিনীর চরিত্রটি জীবন-বোধের মেঘ-মেদুর ছায়ান্ধকার আকাশে এক নীল-নব-ঘন অভিব্যক্তিহীন নীরব নিস্তব্ধ মেঘমালার মত বিরাজিত। মনোজিনীর ভাবলেশহীন এই অব্যক্ত অকথিত চরিত্রটির মধ্য থেকেই উপন্যাসের গতিপথ নির্ধারিত। 'তিলাঞ্জলি'-র শিশির-সিতা এবং প্রতিবিম্বের মনোজিনী ও সীতানাথ এই প্রসঙ্গ তুলনীয়। বিশেষতঃ সিতা ও মনোজিনীর মধ্যে কোথায় যেন এক সূক্ষ্ম রেশমী সুতোর সংযোগ বিদ্যমান। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যতোখানি জীবনমুখী, সুবোধ ঘোষ ততখানি নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাথর উল্টিয়ে অন্ধকার গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছেন। গহ্বরের অন্দরমহলকে অবলোকনের জন্যে দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে গেছেন। সুবোধ ঘোষের পথ চলাও তীব্র কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ততখানি বেগবান নয়। তিনি ঝাঁপ না দিয়ে অবকাশ মত অপেক্ষা করে অগ্রসর হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন জীবনবোধ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে মানুষ ও তার সমাজ। কবি তাঁর 'সাহিত্যের প্রাণ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন —"সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ" - এই গুণ আমরা দেখতে পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। আবো পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক লেখায়। সুবোধ ঘোষের লেখাতেও তার কিছু পরিচয় আছে।

সুবোধ ঘোষের 'ত্রিযামা' উপন্যাস নিঃসন্দেহে এক অনন্য সাধারণ রচনা। উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারে বাইরের ঘটনার চেয়ে নর-নারীর অন্তরের সমস্যাদীর্ণ ঘটনাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। দ্বন্দ্ব, দ্বিধা ও সংশয়ের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছে নায়ক-নায়িকার চিত্তপটে। মনস্তত্ত্বমূলক ঘটনার সন্নিবেশ, রূপকধর্মিতা ত্রিযামা উপন্যাসের ক্যানভাস-কে সুমহান গরিমা দান করেছে।

'ত্রিযামা'-র কুশল চরিত্রটি অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্ব-দীর্ণ নায়িকা নবলা-কুশলকে প্রত্যাখ্যান যেমন করেনি, তেমনি দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতেও পারেনি। বর-মাল্য দিয়েছে দেবী রায়কে। ভোগবৃত্তি, লালসা-কামনার ফেনায়িত বিলাস-ব্যসনের জগত নবলাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেছে সংসারের আরামপ্রিয় জগতের দিকে। সেখানে শান্তি নেই, সুখ আছে। ভক্তি নেই, ভোগ আছে। আরতি নেই, উত্তাপ আছে। বিপরীতে কুশলের জীবন এক মন্দাক্রান্তা ছন্দের পথে পথিক। কুশলের জীবন কোষ্টিতে রয়েছে সাংস্কৃতিক চেতনার দীপারতি। শিল্পানুরাগ ও পুরাকীর্তির প্রতি তার আকর্ষণ কুশল চরিত্রটিকে পবিত্র পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মত উদাত্ত করে তুলেছে। অতীতের তন্ময় করা জীবনবোধের প্রতি কুশল ভাবলেশহীন পাথরের মত পথ চলেছে। প্রাচীন শিলামূর্তির মধ্য থেকে কুশল নিজের আত্মোপলব্ধির সূর্য কিরণকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। কখনও কখনও নবলার চিত্ত, চেতনার ক্ষণিক আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দিয়াশালাই শলাকার মত জ্বলে উঠে সে কুশলকে চিঠি দিয়েছে, সমস্যার সমাধান চেয়েছে,

অন্য আর এক নায়িকা স্বরূপা'র চরিত্রটিও এখানে বিচার্য। দীর্ঘনীরব প্রতীক্ষার এক নির্জন ছবি হল স্বরূপা চরিত্রটি। কুশল ও স্বরূপার মিলন সম্ভাবনার প্রেমের বেদীটিতে যে ফলকগুলি আমাদের চোখে পড়ে, তার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির রঙের বিচ্ছুরণ আমাদের কাঁদায়, ভাবায়। কুশল-স্বরূপার নির্মোহ-প্রেম যেন শুভ্র প্রাসাদ স্তম্ভের শ্বেত কপোত-কপোতীর মত নীরবে নির্বাক হয়ে বসে আছে। কুশল সেই ভাঙা-চোরা শিলামূর্তির অন্তঃস্থল থেকে জীবনকে অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন ও সমস্যাকে অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী হয়েছে। মিলনাকাঙ্ক্ষায় স্বরূপে ও কুশল যখন একে অপরের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেছে, তখনই কুশলের ব্যক্তিসত্তায় সৌন্দর্যবোধের সফেন সাগর উথলে উঠেছে। তাই মনে হয় স্বরূপা ও কুশলের প্রেম, প্রেম নয় একটি জীবন দ্যোতনা। আর ঐ খণ্ড-বিখণ্ড শিলামূর্তিগুলি এই জীবন-দ্যোতনার সায়রে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ বীচিমালা। 'ত্রিযামা' কাহিনী এই বিচিত্র অর্কেস্ট্রায় মৃগেনবাবু, নন্দাদেবী ও দেবী রায় প্রভৃতি চরিত্রগুলি জলতরঙ্গের এক একটি বাটি। যাদের সুর ও শব্দের তান-তরঙ্গ পৃথক ও স্বতন্ত্র। ধ্বনিগুলির চেহারা ভিন্ন ভিন্ন। " মনস্তত্বজ্ঞানের নিপুণ প্রয়োগ, আখ্যানবস্তুর কুশল সন্নিবেশ ও সর্বোপরি ব্যঞ্জনা-বিন্যাসের সার্থক পরিবেশনে এক অপরূপ ভাবসঙ্গতি-পূর্ণ আবহ-সৃষ্টিতে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিভাগের শীর্ষস্থানীয় রূপে গণ্য হইতে পারে।" । —বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা । শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

'শর্তাকিয়া' সুবোধ ঘোষের এক ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। মিনার থেকে নয় এখানে সুবোধ ঘোষ নিচু তলার মানুষের ঘরে, তাদেব গাঁয়ে-গঞ্জে খালি পায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য তাই এই 'শর্তাকিয়া' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের সূচনাটি শিল্পগুণ-সমৃদ্ধ। যখন লেখক বলছেন —বেশ কিছুকাল পরে দাশু ঘরামি জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বগ্রামে ফিরছে, দাশুর চিরকালের মধুকুপী গ্রাম, ডরানি নদী তাকে মাতৃ-স্নেহের মত আহ্বান জানাচ্ছে। ঘরে রয়েছে তার স্ত্রী মুরলী। দাশুর দীর্ঘ দিনের মনে থাকা কামনা-বাসনা, আদর-ভালবাসা, সোহাগ-সহানুভূতি মুরলীকে পেয়ে রং মশালের মত ঝরে পড়বে। আশা ও উদ্দীপনাব দ্রুত পাদবিক্ষেপে দাশু ঘরামি এগিয়ে আসে। কিন্তু দাশু ঘরামির দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে ডরানি নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। কতো পরিবর্তন। কতো হেব ফের। এক নয় দুই নয়—একেবারে 'শর্তাকিয়া' দাশু ও মুরলিব পুনর্মিলনে যেমন মধুকুপী গ্রামের আকাশে ঝড় উঠেছে, তেমনি রোদ হেসেছে। বৃষ্টি পড়েছে। কালবৈশেখীর ধূলিঝড়ে দাশু ও মুরলি একে অপরকে নতুন করে চিনতে চেষ্টা করেছে। সন্দেহ তিরস্কারে জ্বালা-যন্ত্রণার বহতা বক্ত উভয়ের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে প্রতিধাবিত হয়েছে। 'শর্তাকিয়া' উপন্যাসে দাশু ও মুরলীকে কেন্দ্র কবে গড়ে উঠেছে মূল কাহিনী। এই কাহিনীর পটভূমি

মধুকুপী গ্রাম। মধুকুপীর ডরাই নদী, কপালবাবার জঙ্গল ও আসন। মধুকুপীর গাছ-গাছালি, কাকডুমুর, বাবলা আর মুলি বাঁশের জঙ্গল—'শতকিয়া'-র কাহিনীকে লালন-পালন করেছে। দাশু ঘরামি ও মুরলীকে কেন্দ্র করে জড়ো হয়েছে অনেক চরিত্র। মধুকুপীর সমাজকে জীবন্ত করে তুলেছেন লেখক। মুরলীকে ঘিরে পলুশ হালদার ও দাশু ঘরামির প্রেমের মধ্যে এক আদিম অরণ্য-প্রকৃতি জেগে উঠেছে। পলুশ হালদার সকালীকে ছেড়ে পর স্ত্রী মুরলীকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। ওদিকে মুরলীর স্বামী দাশু ঘরামিকে নিয়ে সুখ শয্যা রচনা করতে চায় পলাশ বনের নায়িকা কিষানী। পলুশ, মুরলী, সকালী, দাশু ও কিষানীকে নিয়ে 'শতকিয়া' উপন্যাসের জগতের কোলাহল এক বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। পলুশ হালদারের উদগ্র বাসনার কাছে মুরলী নিজেকে আত্মসমর্পণ করে বটে কিন্তু আবার পলুশকে ত্যাগ করতেও মুরলীর দ্বিধা হয়না। খৃষ্টান কালচার, সেবা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা, কনভেন্ট-আদর্শ-সিস্টার দিদির ভালবাসা ও রিচার্ড ডাক্তারের চারিত্রিক মহিমা মুরলীর জীবনে—এক সেবিকার চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। দাশু ঘরামির কিষানী যৌবনবতী মুরলী উপন্যাসের শেষে হয়ে ওঠে যেন এক ব্রতচারিণী। অন্য দিকে বেহালার করুণ রাগিনী হয়ে নিঃসঙ্গ একাকী কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত দাশু ঘরামির জীবন যেন হাহাকার করে ওঠে। এই ট্র্যাজিক পরিবর্তিটি উপন্যাসে সার্থক ও শিল্পমণ্ডিত। দুর্ভাগ্য পীড়িত দাশুর জীবনে শুধু হাহাকার। মিথ্যে মামলায় দাশু-ঘরামি আবার গ্রেপ্তার হয়। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দাশু জঙ্গলের শিশাল, খয়ের ও কাঠ কয়লা চুরি করেছে। কিছুকাল পরে দাশু মুক্তি পায়। কিন্তু তার আদরের সোহাগী স্ত্রী মুরলী পলুশ হালদারের ঘরে। পলুশ হালদার চরিত্রটি লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। সে মুরলীর তপ্ত যৌবনকে ভোগ করতে চায়। মুরলীকে মাতৃত্ব দিতে চায়। সন্তান চায়। কিন্তু মুরলীর পেটে দাশু ঘরামির সন্তান। সে সাজ-সজ্জা সোনা-দানা, খেতে-পরতে চায়। তাই বিরোধ চরমে ওঠে। মুরলী পলুশের ঘর ছাড়ে। সিস্টার দিদির স্নেহ-শীতল ছায়ায় এসে মুরলী শান্তির আশ্রয় পায়। সে খৃষ্টান হয়ে যায়। মুরলী আর মুরলী নয়, সে হয় জোহানা। এই পরিবর্তন শিল্প-সম্মত হয়েছে। দাশু ঘরামি পলুশ ও সকালীর বিচ্ছেদকে মিলনে পরিণত করে এক আদর্শের মহিমা সৃষ্টি করেছে। জোহানারূপী নবচেতনার ব্রতচারিণী মুরলীর সঙ্গে দাশুর সাক্ষাৎ হয়। দাশুর কাতর আত্মা খৃষ্টান জোহানার মধ্য থেকে মুরলীকে পাবার জন্য হাত বাড়ায়। দাশু তার ছেলেকেও দেখতে পায়! স্বামী ও পিতার এক স্নিগ্ধ মিলন হয় দাশুঘরামির জীবনে। কিন্তু বিয়োগান্ত সুরের মূর্চ্ছনা বাঁশের বাঁশিতে কান্নার মত ঝরে পড়ে। "-ঐ তো দাড়িয়ে আছে মুরলী। ডাকে কেনে মুরলী? ইঠা আবার তুমার দয়ার কোন্ মজা বটে কপাল বাবা? মধুকুপীর দাশু কিষান কিষানকে কি উয়ার রংদার ছাতার তলে ঠাঁই লিতে ডাকছেক মুরলী?" আর্টের চরম উৎকর্ষতায় সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই স্বীকৃত। তাই আমার বিবেচনায় 'শতকিয়া' সুবোধ ঘোষের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। যে উপন্যাসে

মানবজীবনের জয়গান, অরণ্য জঙ্গল আদিম বন্য প্রকৃতি ভেদ করে অকৃত্রিম উদার ধ্বনি-ছন্দে বাঁশের বাঁশিতে সুর-ঝংকারে মূর্চ্ছিত হয়ে উঠেছে। তাই 'শতকিয়া' উপন্যাসের শেষ গতি-প্রকৃতি অর্গান টিউন নয়, পিয়ানো নয়, —মাটিও মানুষের এক নির্ভেজাল দেশী বাজনা। হৃদয় দ্যোতনায় আলোকিত এক লিরিক্যাল সুমহান সঙ্গীত। যে সঙ্গীতের মধ্যে সাগর-তরঙ্গ আছে, আর আছে ঝিনুক।

সুবোধ ঘোষের উপন্যাসের আঙ্গিক পর্যালোচনার কথা মনে এলেই আমাদের কাছে যেটা বড়ো হয়ে দেখা দেয় তা হল লেখকের ভাষার স্থূলতা ও স্বচ্ছতা। সুবোধ ঘোষ তাঁর ভাষা ও শব্দ-চয়নকে চরিত্রানুগ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ভাষা ও শব্দ এবং বর্ণনা তাই ভাবলেশহীন নয়। তা জীবন্ত ও সরস। কল্পনার অনাবিলতায় লেখকের ভাষা ডানা মেলে উড়তে চায়নি। মাটির এই পৃথিবী ও মানুষের হৃদয় আকাশের মধ্যেই সুসংহত ভাবে বিচরণ করেছে। সুবোধ ঘোষের উপন্যাসের 'Form' ও 'Content' একই সুরে একই সঙ্গে পথ চলেছে। র‍্যালফ ফক্স উপন্যাস বা গল্পের content-কেই 'প্রাইম্যাসি' বলেছেন। কিন্তু তাই বলে 'Form'-এর গুরুত্বও কিছু কম নয়। "From reacts on content and never remains passive"

[The novel and the people : Ralph fox]

সুবোধ ঘোষ তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক ও প্রকরণের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। " প্রসঙ্গ নির্বাচন ঘটতে থাকে জীবনের অভিজ্ঞতার ধারায়, শিল্পীর নির্বাচনী চেতনার গুণে, আর, সেইসঙ্গে শিল্পের রূপ বা বাহন বা প্রকরণ বিষয়ে পরিমার্জন চলতে থাকে শিল্পীর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের শাসনে। একালের কর্তব্য নিষ্ঠ বাঙ্গালী লেখকদের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যাচ্ছে।"

[—সাহিত্য পাঠকের ডায়েরি
হরপ্রসাদ মিত্র]

সুবোধ ঘোষ তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যকে সাহিত্যের মত করেই সাজিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি অনুগত থেকেছেন মানুষ ও সমাজের প্রতি। তাঁর উপন্যাসে বাঙালীর সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলনে উপন্যাসের ফর্ম (আঙ্গিক ও প্রকরণ) ও কনটেন্টের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় নি। 'ত্রিযামা' উপন্যাস থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক -

" স্যান্ডেল জোড়া পায়ে লেগেই আছে, খুলতে ভুলে গিয়েছে স্বরূপা। জরির পাড়ের প্লেন সাদা শাড়ি, আর মুগার কাজ করা ঘাসিরঙের ব্লাউজ, ঠিক এই সাজেই একদিন মিত্রা মাসির সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছিল স্বরূপা," উপন্যাসের বিষয়-সত্যকে কোন আঙ্গিক ও প্রকরণের নিরিখে লেখক প্রকাশ করবেন সেটাই বিচার্য। যেমন কোন্ জ্বালানীতে উনুনের আঁচ ভালো হবে, সেকথা বোঝে পাকা রাঁধুনি। কারণ রান্নার বস্তুর (content) সুপক্ক ও সুস্বাদু হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আঁচ ও মশলা (Form) অত্যন্ত প্রয়োজন। স্তিমিত আঁচ ও অসমভাবে মশলা

প্রয়োগ খাদ্য ও ব্যঞ্জনাদি-কে বিস্বাদ করে দিতে পারে। ফর্ম ও কনটেন্টের বিচারে সাহিত্যও তাই। 'ত্রিযামা' উপন্যাসের আর এক জায়গায় আছে—"··ক'দিন থেকে শীতের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। হ্যাপিনুকের রাতগুলি বদলে যেতে আরম্ভ করেছে আরও কালো হ'য়ে। টু-সিটার থেকে নেমে একসঙ্গে গল্প করতে করতে গেট পার হয়ে ভিতরে ঢোকে দেবী রায় আর নন্দা দেবী, সে গল্পের শব্দ শুনে হলঘরের টেবিলের উপর একটা আলো যেন হঠাৎ মুখ ঢাকা দেয়।"

সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিক তথা ফর্মের পথ চলাটুকু অত্যন্ত মনোরম ও বাস্তবানুগ। ভাষা, শব্দচয়ন, রচনারীতি 'শতকিয়া' উপন্যাসে অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। ফুলদানির সঙ্গে ফুলকেও মানানসই করে সাজাতে হবে। পাকা মালীর কাজও তাই। 'শতকিয়া' উপন্যাসে সুবোধ ঘোষ ফর্মের বিচারে খুবই সতর্ক। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক -

" ছোট একটা বাবলার বন। বাবলার শুকনো সরুটি সরু পথের উপর ফণা-তোলা মরা সাপের মত ছড়িয়ে রয়েছে ।" এখানে বিষয়-বর্ণনার রূপকল্পটি ভাষায় ধরা পড়েছে। 'শতকিয়া' থেকে আরও একটি উদাহরণ —

" ঐ তো, ঐ সেই পাপীটা! গোবিন্দপুর থানার কসাইটা! দাঁতাল বনবরাহর মত শুধু তেড়ে এসে মানুষের গায়ে হাত বসাতে ভালবাসে। ওরই নাম চৌধুরীজী ।"

আরও একটা উদাহরণ

" আমি কি তুমার ঘরের গাই যে, আমার এত কাছে এইসে দাঁড়াবে আর তাকাবে · ?"

অথবা —" বুকের ভিতর দাউ দাউ করছে একটা পোড়া বাতাস ।" 'শতকিয়া' উপন্যাস থেকে আর মাত্র একটি উদাহরণ দেব। " পর পর চার দিনের মধ্যে ভোলিয়া মুণ্ডির চারটে বাচ্চার কাঁচা প্রাণ যেন পাখি ঠোকরানো নটেফলের মত পট পট করে ফেটে মরে গিয়েছে। দুটো বাচ্চার পেট হঠাৎ ফুলে গেল : " আমাদের শাস্ত্রে আছে শব্দই ব্রহ্ম! সাহিত্যে শব্দই হল আঙ্গিক বা প্রকরণ। এই শব্দই হল ভাষার উপাদান। আর এই ভাষাই হল সাহিত্যের হাতিয়ার। সিদ্ধ বকুল সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ভারত প্রেমকথা'-য় এই সত্যের প্রমাণ রেখেছেন। প্রমাণ রেখেছেন 'শতকিয়া' উপন্যাসে।

সৌমেন সেন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য : মনন ও ইতিহাসবোধের বিশিষ্ট সমন্বয়

[এক]

উপন্যাসের তত্ত্ব-চিন্তায় পণ্ডিত ও ঔপন্যাসিক অনেকেই বিভিন্ন সময়ে নানা উক্তি করেছেন, তাতে উপন্যাস-ধারণা সমৃদ্ধই হয়েছে বলা যায়। পক্ষপাত যা-ই থাকুক, মুক্ত-বিচার অভীষ্ট হলে এইসব উক্তি-নির্ভরে উপকারই হয়। উপন্যাস-পাঠক নিশ্চয়ই এ-সবের ধার ধারেন না। তাঁরা পড়েন, প্রীত হন, কখনো-বা অপ্রসন্ন। কেউ ভাবার জন্য পড়েন, কেউ পড়েন গল্পের জন্য, আর একজন হয়তো খোঁজেন সমাজ-মানুষ-ইতিহাস, কেউ-বা রহস্য ও অভিনবত্ব। নিছক সেণ্টিমেণ্টও বাদ পড়ে না বোধকরি। যাঁরা শুধু এ-ভাবেই উপন্যাসকে গ্রহণ করতে রাজি নন, তার বিষয়-প্রস্তাব-গঠন নিয়ে ভাবতে চান, ভাবেন, তাদের কাছে এইসব তত্ত্বচিন্তা জরুরিই বটে। সব উপন্যাস-পাঠকের জন্য উপন্যাস-চিন্তা, আলোচনা নিশ্চয়ই জরুরি নয়, এতে তাঁরা ছোট হয়ে যান না, দরকারই বা কী তাদের। কিন্তু যারা উপন্যাস সেভাবে পড়তে চান যেমন পড়েন ইতিহাস বা পদার্থবিজ্ঞান, তাদের কাছে কিন্তু তত্ত্বমীমাংসা প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে। বিশেষত সেই সব লেখক ও তাদের উপন্যাস বোঝার জন্য যাঁরা নিজেরাও উপন্যাসকে ছাত্রের মতোই গ্রহণ করেন। ইতিহাস পড়ার সময় যেমন তাঁরা জানেন, জানতে চান, কেন পড়ছেন, সাহিত্য ও অংকশাস্ত্র পড়তেও তেমনিই ভাবেন ; লিখতে ব'সে এই প্রক্রিয়া তারা মানেন না, তা ভাবার কোন কারণ নেই। 'কেন লিখছি' তা তাঁরা জানেন। অবশ্যই সে-অর্থে নয়, যে-অর্থে সেই সব লেখকরা এই প্রশ্নের উত্তর জানেন, যাঁরা গপ্পো শুনিয়ে ফুরিয়ে যান, বাজার-প্রাপ্তি তাঁদের যতো বড়-ই হোক না কেন !

আমরা যে সব ঔপন্যাসিকের কথা ভাবছি, যারা কিছু ভেবেছেন, ভেবে লিখেছেন আর সেই সব ভাবনায় তাড়িত হয়ে তাদের উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করেছেন, তাঁদেরও আবার নানা শ্রেণীতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বা প্রেমচন্দ, প্রুস্ত্ বা মান্, জয়েস বা রলাঁ, মানিক বা তারাশঙ্কর, গোর্কী বা হ্যামসুন প্রমুখ কতোই তো ভেদাভেদ। কাফ্কা, কামু, সার্ত্র্-র নামও তো একদা একস্বরে উচ্চারণ করেও জানা গিয়েছিল তাঁরা এক গোঠে নেই। তাঁদের প্রত্যেকের লেখকসত্তারও তো কতোই না ভাঙচুর, অদলবদল ! আর এইসব বিশিষ্ট লেখকদের উপন্যাস নিয়েই তো মুখ্যত আমাদের উপন্যাস-চিন্তা।

এই উপন্যাস-চিন্তার শরিক সেই ঔপন্যাসিকরা, যাঁদের কাছেই আমরা জেনেছি যে, সত্যের কাছে অবনত হওয়াই শিল্পের লক্ষণ। কিন্তু সত্যেরও তো রকমফের আছে। কোন লেখকই বা স্বীকার করবেন যে, তিনি সত্য অস্বীকার করেন ! সেইসব কূটতর্কে না গিয়ে প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, আমাদের লেখকরা, যাঁদের কাছে

আমাদের সত্যের পাঠ, তাঁরা ও আমরা, সেইসব পাঠকরা, যারা অন্য পাঠশালায় যেতে চাই না, সত্য বলতে ইতিহাসবোধই বুঝি। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় —'ডকুমেণ্টেশন', যেমন ঐতিহাসিকরা ইতিহাস রচনা করেন, সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞান।

এই উক্তির ফলে একটা তর্ক উঠবে জানি। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে ব্যক্তির তুলনায় সমষ্টির মূল্য বেশি। অবশ্য ইতিহাস বলতে এখানে সমাজ-ইতিহাস বুঝতে হবে, রাজারাজড়ার কথাকাহিনী নয়। সেই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণে একক তথ্য তেমন মূল্য পায় না, পাওয়ার কথাও নয়। ব্যক্তি তো সমষ্টির একজন বটে ; ব্যক্তিসত্তাও বিচার্য হবে সমাজসত্তার বিশিষ্ট পটভূমিতে। সমাজবিজ্ঞানীর কাছে সত্য ও ব্যক্তির সমষ্টিগত রূপ-চরিত্রই প্রধান। অথচ এই উক্তিও তো আমাদের অজানা নয় যে, উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাস নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তি মানুষ। তাহলে কেনই বা আমরা বলছি, হয়তো মোটাদাগেই বলছি, ঐতিহাসিক যেমন ইতিহাস রচনা করেন, সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞান, যার ভিত্তি ডকুমেণ্টেশন, তেমনি ঔপন্যাসিকও রচনা করেন তাঁর উপন্যাস। এই দুই উক্তিতে আপাতবিরোধ থাকলেও মৌলিক বিরোধ যে নেই, তা হয়তো বোঝা যাবে যদি আমরা মনে রাখি যে, ব্যক্তি স্বতন্ত্র হলেও একান্ত নয়। প্রতিটি ব্যক্তির সম্পূর্ণতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা যায়, তার স্বতন্ত্র অবস্থান সময় ও সমাজ-নিরপেক্ষ নয়। উপন্যাস যদি ব্যক্তির অস্তিত্ব-সংবাদ হয়, তবে সে-অস্তিত্বের শেকড় সময়ে, সমাজে।

আমাদের বিচার্য যেহেতু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস অতএব তাঁর উক্তিতেই আমাদের যুক্তির সমর্থন খুঁজি : 'ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের যে অবশ্যম্ভাবী সংঘাত ও ফলে সমাজ-জীবনে বা ব্যক্তি-জীবনে যে রূপান্তর তা যেমন কথাসাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে, তেমনি ইতিহাসেরও। এখানেই কথাসাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের মিলন সম্ভবপর। সব উপন্যাসই ইতিহাস।'

উপন্যাস কী —এ-প্রশ্ন বোধহয় অনেকের কাছেই আজ আর জরুরি নয়। অনেক মামুলি গল্পই এখন উপন্যাস হিসেবে দিব্যি বিকিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জেনেছি উপন্যাস কী। এবং সে-জানার ফলে বলা যায় যে, কোনো সীমাবদ্ধ অর্থে ও সংজ্ঞায় আজ আর উপন্যাসকে বাধা যায় না। কিন্তু তবু তো তার একটা চেহারা আছে, চরিত্র আছে। নইলে কেনই-বা অনেক সাধারণ 'উপন্যাস'-গ্রন্থ পাঠেই যখন কোনো পাঠকপাঠিকা ভাবেন উপন্যাস পড়লেন, তখন আমাদের সমস্যা তৈরি হয়। কী করেই বা বোঝা যায় যে উপন্যাস জেনে তিনি যা পড়েছেন তা আদৌ উপন্যাস নয়, একটি 'গপ্পো' মাত্র। কয়েকটি পাত্রপাত্রীর মজাদার সম্পর্ক, তার টানা-পোড়েন, আদি-মধ্য-অন্ত এইরকম হিসেবে কাহিনীর গঠন ; কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের থেকে আলাদা কিছু হলেই যে উপন্যাস হয় না তা কী করেই বা বোঝানো সম্ভব! পাঠককে তাঁর উপন্যাস-চর্চা ও ইতিহাস-জ্ঞানের সম্মিলনেই জেনে নিতে হয় উপন্যাস কী। এবং তাত্ত্বিকেরা সে-কাজে সাহায্য করেন। আমার উপন্যাস-চর্চার সঙ্গে তাঁদের তত্ত্ব বিচার যুক্ত হলেই আমি জানব উপন্যাস কী,

যদিও আমিই অস্বীকার করছি কোনো সংজ্ঞার সীমায় তাকে বেঁধে দিতে। এতে কোনো জটিলতা নেই।

গদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে উপন্যাসের উদ্ভব। কবিতার মতো গদ্য একান্ত নয়; বহু কণ্ঠস্বর, সংলাপ ও সংঘাতের সূত্রে গদ্য কাহিনীতেই তার সত্যকণ্ঠ শোনা যায়। এবং যেহেতু এই কণ্ঠস্বর একক নয়, বহু, তাই সেই কণ্ঠস্বরে ইতিহাস স্ফূর্তি পায়। প্রতিটি কণ্ঠস্বরের মালিক প্রতিটি ব্যক্তি তখন তাঁর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়েও সমষ্টির একজন হয়ে যান। অন্তত আধুনিক উপন্যাসের অন্বেষা তাই। গোরা বা বিনোদিনী কিংবা কুমু, কুবের বা ঢোঁড়াই প্রভৃতি অনেকেই শেষ পর্যন্ত মাত্র 'একজন' হয়ে থাকে না। এই এক-একজন প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, কিন্তু একান্ত নয়। তাদের চারপাশে যে সময় ও সমাজ জীবন্ত ও সচল, তারা প্রত্যেকেই তার আংশিক সত্তা। উপন্যাসে তাই অন্তর্মুখীনতা ও বহির্গামিতা সংলাপে-সংবাদে-সংঘাতে একাকার হয়। এই প্রক্রিয়া কতোটা বস্তুগত তার উপরই নির্ভর করে উপন্যাসের সত্যকার উপন্যাস হয়ে-ওঠা। কারণ বস্তুজগৎ তো মাত্র উপস্থিত নয়, সেই উপস্থিতিতে যে দ্বান্দ্বিকতা ক্রিয়াশীল, তার ফলে, বস্তুবিশ্বের অস্তিত্বও সংঘাতময়, পরিবর্তনশীল। এই বস্তুজগতকে চেনা, যাকে আমরা বাস্তবতা বলি, তা-ই ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট। ব্যক্তিকে তিনি এই বাস্তবতায় স্থাপন করেন। এবং জানেন যে, এই বাস্তবতা একটি বিশেষ সামাজিক, জাগতিক ও শ্রেণীগত অবস্থা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য এ-কারণেই বলেন, সব উপন্যাসই ইতিহাস। এবং যখন উপন্যাস ইতিহাস হয়ে উঠতে চায়, তখন ব্যক্তিকে একটি পারম্পর্যে ধরা যায়। ব্যক্তি ও পরিস্থিতি স্পষ্ট হয় এক দ্বান্দ্বিক যৌক্তিকতায়। মনে রাখতে হবে উপন্যাস একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির গল্প-মাত্র নয় প্রতিটি চরিত্রই, এমনকি মুখ্য চরিত্রও, অন্যের সঙ্গে সহাবস্থানে এবং অবশ্যই সংঘাতে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই কি 'সৃষ্টি'র দীপায়নের আত্মপরিচয় এই রকম : 'আমি অপাপবিদ্ধ, অম্লাবির নই। আমার রক্ত শুধু আমারি রক্ত নয়, আমার মন শুধু আমার হাতেই তৈরী নয়। সবাই কি তিল তিল করে রক্ত-মাংস, হৃদয়-মন দিয়ে এই অপূর্ব শিল্পটি তৈরী করেনি যার নাম দীপায়ন চৌধুরী।' দেশ-কালের নিয়ন্ত্রণেই প্রতিটি অস্তিত্বের মিলন, বিরোধ ও শেষ পর্যন্ত প্রামাণিকতা। প্রামাণ্য না হলে উপন্যাসের চরিত্র নিরবয়ব হয়ে যায়। এই প্রামাণিকতার নেপথ্যেই থাকে ঔপন্যাসিকের ইতিহাসবোধ। যত স্পষ্ট সেই বোধ, তত স্পষ্ট হবে তার রচিত উপন্যাস। 'যোগাযোগ' তো মাত্র কুমু-মধুসূদনের গল্প নয়, তৎকালীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অংশ, সময়গ্রন্থির বিবরণ। এবং এ-কারণেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের চরিত্রকুলের নিয়ন্ত্রক। কুবেরকে যে হোসেন মিয়ার সঙ্গে যেতে হবে তা কুবেরের জানা ছিল না, কিন্তু 'পদ্মানদীর মাঝি'র লেখক জানতেন। এ কিন্তু চরিত্রের নিয়তি নয়। কোনো উপন্যাসের কোনো চরিত্রই নিজে নিজে বেড়ে ওঠেনা, ঔপন্যাসিক তাকে গড়ে তোলেন, তবেই সে প্রামাণ্য এবং এই প্রামাণিকতা নির্ভর করে ঔপন্যাসিকের বাস্তববোধ ও ইতিহাসবোধের উপর।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসের এই দায় স্বীকার করতেন বলেই ঘোষণা করতে পারেন যে, উপন্যাসও ইতিহাস। সে-উপন্যাস লেখার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতার কাঠামো বা তারাশঙ্করের বাস্তবতার কাঠামোর সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাঠামোর তফাৎ আছে বৈকি। প্রত্যেকেই প্রত্যেক থেকে সে-বিচারে আলাদা : কেউ বা অন্য-একজনের কিছু কাছাকাছি। যেমন ধূর্জটিপ্রসাদ ও সঞ্জয়। এই অর্থে যে, দুজনেই উপন্যাসে মনন চর্চায় গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া বুদ্ধিজীবীদের জীবনচর্যা, তাঁদের বিশ্বাসের সংকট, চিন্তাবিশ্ব এঁদের আগে বাংলা সাহিত্যে আর-কেউ তেমন ক'রে আনেন নি। ধূর্জটিপ্রসাদ তো একটি 'ট্রিলজি'র বেশি আর লিখলেন না : ফলে তাঁর উপন্যাস-কাঠামো ব্যাপ্তি পেল না তেমন। মনে হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য সে-কাজ অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

[দুই]

উনিশশ' একচল্লিশ থেকে উনিশশ' আটষট্টি, প্রায় তিন দশকে বিশটি উপন্যাস রচনা করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় উনিশশ' একচল্লিশে। যদিও কোনো সমালোচক উনিশশ' বেয়াল্লিশে প্রকাশিত 'বৃত্ত'কেই তাঁর প্রথম উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেন, হয়তো বা এ-কারণে যে এই উপন্যাসেই 'তাঁর মনোবাদী ও পরীক্ষানিরীক্ষোন্মুখ সতর্ক-সচেতন কথাশিল্পীর অভিপ্রায়-রুচি সুস্পষ্ট।' কোন্‌টি, 'মরামাটি' না 'বৃত্ত' তাঁরপ্রথম উপন্যাস সে-খবরে আপাতত আমাদের উৎসাহ নেই, কারণ আমাদেরও বিচার এই যে, 'বৃত্ত' উপন্যাসেই ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিশিষ্টতার প্রথম প্রকাশ। আমরা যে বিশিষ্টতা তার উপন্যাসে লক্ষ্য করেছি—মননচর্চা ও ইতিহাসবোধ—তা 'বৃত্ত' থেকেই শুরু। তাই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, যখন সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে লেখেন ; 'বৃত্ত ১৯৪০-এ লেখা। সে-সময়কার একদল বুদ্ধিজীবীর পরিবেশ এখানে ধরা আছে। আজ এ-রচনার কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়ত চলে, কিন্তু কথাগুলো পরিবর্তিত হলে ১৯৪০-এর কলকাতা বইটি থেকে হারিয়ে যাবে।' অর্থাৎ ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে স'রে আসতে তাঁর অনীহা। এবং বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্বও যে সময়ের সঙ্গে গাঁঠছড়া-বাঁধা, সে-সত্যও তাঁর উপলব্ধি।

বিশের দশকের শেষ দিকে দ্বিতীয় পর্যায় 'সবুজপত্রে'র প্রকাশ বন্ধ হয়। সেই সময়, কিছুটা আগে-পরে, বিশের শেষে বা তিরিশের গোড়ায়, 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও কিছুটা 'বিচিত্রা'র সাহিত্য-আদর্শের দুই প্রান্তে আবির্ভাব 'কল্লোল', 'কালিকলম', ও 'পরিচয়' পত্রিকার। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত গদ্যসাহিত্যে, তখন মোটামুটি তিনটি ধারা। 'প্রবাসী'-'ভারতবর্ষ' গোষ্ঠী পূর্বকালীন সাহিত্যাদর্শ বজায়

রাখছেন, 'বিচিত্রা'য় চলছে একরকমের মধ্যস্থতা, 'কল্লোল'-'কালিকলম'কে মোটামুটি দামাল আধুনিকতার ঠিকানা হিসেবেই চেনা গেছে ; আর 'পরিচয়ে'র ভাগ্যে জুটেছে উন্নাসিকতার অভিযোগ—যেহেতু বিশ্ববীক্ষা ও মননচর্চাই তার লক্ষ্য, সে-অর্থে কিছুটা 'সবুজপত্রে'র সঙ্গী।

ত্রিশের দশকেই প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে মাসিক, 'পূর্বাশা' প্রকাশিত হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়। তখন তাঁর প্রয়োজন ছিল কোনো-এক পথ-খোঁজার, যা বিশিষ্ট। শুরুতে বোধকরি মধ্যপন্থাই শ্রেয় মনে হয়েছিল, অন্তত লেখক সমাবেশে তাই মনে হয়। অবশ্য একে এক ধরণের মুক্তপন্থাও বলা যেতে পারে। চিন্তার মুক্তি, বিতর্ক ও সহনশীলতা যে সঞ্জয়বাবুর অন্বিষ্ট, প্রথমাবধি, তা তাঁর বহু উক্তি ও রচনায় জানা যায়। তবে, শেষ বিচারে মনে হয় 'কল্লোল' 'কালিকলমে'র রোম্যাণ্টিক আধুনিকতার বিপরীতে বুদ্ধিমার্গের স্থিরতায় তার আস্থা ক্রমশই প্রকাশিত। 'কল্লোলে'র আধুনিকতার তরলতা সঞ্জয়বাবুর পক্ষে স্বীকার করাও বোধহয় কঠিন ছিল। পত্রিকার প্রয়োজনে যতোটাই বা সমঝোতা ঘটুক, তাঁর উপন্যাস পাঠে অন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। সে-অর্থে তিনি অনেকটাই ধূর্জটিপ্রসাদের সহগামী। আর সেই কারণেই, তারাশঙ্কর, বিভূতি ও মানিক, এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবতার কাঠামোও তিনি স্বীকার করেন নি। তাছাড়া বিষয় হিসেবে বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্বই তাঁর গ্রাহ্য—এর বাইরে তিনি ক্বচিৎ এগিয়েছেন। সে-কারণেও বটে, তার সমকালীন লেখকদের থেকে তিনি আলাদা। এই স্বাতন্ত্র্যই একাধারে তাঁর শক্তি ও সীমাবদ্ধতা। 'বৃত্ত' থেকে 'প্রবেশ প্রস্থান' পর্যন্ত যে-ধারাবাহিকতা তাতে এই উপলব্ধিই ঘটে। লেখকের আত্মদর্শন ও আত্মসমীক্ষাই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস-সমগ্র। 'বৃত্তের' সত্যবান কি নানা পথ পেরিয়ে আবার 'প্রবেশ প্রস্থানে' ফিরে আসে না ? আর তা কি স্বয়ং লেখকের আসা-ই নয় ?

বুদ্ধিজীবী হিসেবে বুদ্ধিজীবীর আত্মানুসন্ধান এছাড়া বোধকরি গত্যন্তরও নেই। উপন্যাস হলেও 'প্রবেশ প্রস্থান' যে সঞ্জয়বাবুর জীবনচরিত-প্রায় তা জানলে বোঝা যায় যে, দেশকালকে আত্মস্থ করার স্পৃহায় একজন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে অনেক সময়ই নিজের সীমার বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় না। স্রষ্টা হিসেবে তাঁদের সীমাবদ্ধতা সেখানেই। এইজন্যই তাঁদের উপন্যাস-সমগ্র শেষাবধি জার্নাল হয়ে ওঠে। প্রবেশ প্রস্থানে'র সুদত্ত তাই লেখে : 'নিজেকে মানুষ হিসেবে যতদিন তুমি না জানছ, দ্বিতীয় মানুষটিকে কী ভাবে তুমি জানবে। পরকে জানার প্রথম শর্তই তো আত্মানুশীলন। তা করতে হলে জার্নাল রাখা খুবই জরুরি। মন ছাড়া মানুষ কী ? দৈহিক কার্যের বোঝা ?'

আক্ষরিক অর্থে কিন্তু সঞ্জয়বাবুর সব উপন্যাস জার্নাল নয়। কিন্তু প্রায় প্রতিটিই সদর্থে 'লেখকের জার্নাল' হয়ে ওঠে। তার কারণ আর কিছু না, ব্যক্তি সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, সময় সম্পর্কে তাঁর মনে এমন কিছু তির্যক প্রশ্ন ছিল, যা প্রকাশের তাগিদে ও দায়ে উপন্যাসের সেই কাঠামোকেই বেছে নেওয়া জরুরি ছিল, যাকে আমরা মনন-প্রধান বলে থাকি।

এবং এই রীতির উপন্যাস-রচনাই যে তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন তা-ও তাঁর স্বীকৃতিতেই আমরা অবশ্যই জানতে পারি। আগেই মন্তব্য করেছি এই কাজে তাঁর অবস্থান ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছাকাছি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য যখন উপন্যাস লিখছেন তখন রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র তো বটেই, এমন কি জগদীশ গুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, তারাশংকর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ ও আরো অনেকেই তাঁদের নিজস্ব উপন্যাস-কাঠামো তৈরি করেছেন। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁদের কারো কাছেই যেন যেতে চাইলেন না। তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাস 'মরামাটি' পল্লী ও চাষী জীবনের কাহিনী। কিন্তু এই উপন্যাস তাঁর অন্য সব উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন। এর পর আর তিনি তাঁর অভ্যস্ত ও শ্রেয় উপন্যাস-ভঙ্গি থেকে সরে যান নি। অথচ সেই সময় প্রায় সব লেখকই গ্রামজীবন ও অন্ত্যজ জীবন নিয়ে রচনায় আগ্রহী। কারো ক্ষেত্রে তা রোম্যান্টিক, কেউ-বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য জানতেন, এই দুই দলের কোথাও তিনি স্বস্তি পান না। তিনি জানতেন, তা তাঁর সাধ্যেরও অতীত। এ-প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য: "কখনো সমসাময়িক যুগের প্রতিক্রিয়ায় কখনো ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় বা কারো সঙ্গে আলোচনার ফলে সোস্যাল কনটেন্ট আমার উপন্যাসে এসেছে। তবে ধূর্জটিদা যেমন বলে ছিলেন, এদেশে এখনো বুর্জোয়া উপন্যাসই হলো না, তো কম্যুনিষ্ট উপন্যাস। ধূর্জটিদার সে কথা মনে ছিলো, যখন আমি 'দিনান্ত' লিখি।"

শুধু 'দিনান্ত' লেখার সময় কেন, সম্ভবত এ-কথা তাঁর সর্বদাই মনে থাকত। নইলে এর পর ('দিনান্ত'র প্রকাশ কাল ১৯৪৩) আর তো তিনি ফিরে তাকান নি। তবে কি ধূর্জটিপ্রসাদ-কথিত 'বুর্জোয়া উপন্যাস'ই তাঁর অভীষ্ট ছিল? তাঁর স্বীকৃতি-অনুযায়ী 'দিনান্ত' উপন্যাস লিখতে বসেই ধূর্জটিপ্রসাদের উক্তি তিনি মনে রেখেছিলেন; কিন্তু কাজটি শুরু হয়ে যায় তার আগেই, 'বৃত্ত' রচনাকালে। এবং সেই যে শুরু করেন, অতঃপর আর থামেন না। এমন কি এই প্রবহমান ভ্রমণে বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে গেছেন; কিন্তু সর্বত্র সর্বদা তিনি স্বয়ং উপস্থিত। কখনো হঠাৎ এমনও মনে হয় যে, 'প্রবেশ প্রস্থান' উপন্যাসের মুখ্যচরিত্রাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'বৃত্ত' 'রাত্রি' 'কল্লোল' 'মৌচাক' 'সৃষ্টি' ইত্যাদিতে।

আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে সঞ্জয়বাবুর কয়েকটি উক্তি স্মরণ করা যাক। যেহেতু তিনি জানতেন, যে কোনো মহৎ লেখক যেমন জানেন, কী তিনি বলতে চান, কী ও কেন লিখতে চান, সেহেতু কোথায় তিনি থাকবেন, কোন্ ধারা গ্রহণ করবেন, কোন্‌টাই বা বর্জন করবেন তাও তাঁর জানা ছিল। তাই খুব স্পষ্ট করেই তিনি জানান: "অতি-আধুনিক নামক সময়ে -তথা ইতিহাসের প্রত্যেক বিন্দুতেই বিভিন্ন বয়সের সাহিত্যিক থাকে এবং বিভিন্ন রুচিরূপ নক্সার সাহিত্য তৈরি হয়—সমাজ-মানস তৈরি থাকে পরিণত বয়সের লেখকদের যুগচিন্তা গ্রহণ করার জন্যে। তরুণ লেখক তাতে আঘাত হানেন। তরুণতম আবার তরুণ সাহিত্যের বিরোধী হয়ে দাঁড়ান। সমাজ সব সময়ের

এই বিভিন্ন বয়সীতেই তৈরী। সব সময়ের ইতিহাসও সে-কারণে দ্বান্দ্বিক। সমাজ-তন্ত্রের আওতায় ইতিহাসও পালটায়। আজ তাই দেখছি আমি। যে-আমি ১৯৩১-এ 'অতি-আধুনিক' দলে উপস্থিত হই নি।"

কেন তিনি উপস্থিত হননি তাও তার উক্তিতেই জানা যায়। এবং তাতেই তাঁর সাহিত্যরুচি ব্যক্ত হয়। সেই 'অতি-আধুনিক দল' যখন ভাঙনের উল্লাসে উল্লসিত, উচ্চকিত, রবীন্দ্রনাথ সহ অনেককেই এবং অনেক সাহিত্য-ইতিহাস দর্শনকে নস্যাৎ করতে দলবদ্ধ, তখন সঞ্জয় ভট্টাচার্য ভেবেছেন : "ইতিহাস আমাকে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জীবন-কাঠামো সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে। শিখিয়েছে অতীতের আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট বর্তমানকে প্রচুরভাবে আলোকিত করতে। শ্রদ্ধাবিষ্ট না হ'লে সে-ইতিহাস-চেতনা আসে না। কিন্তু তা ব'লে আমি এমন অন্যায় কথার সমর্থক নই যে, বর্তমান শুধু অতীত দিয়েই আচ্ছন্ন বা সজ্জিত বা আলোকিত থাকবে। মোম জ্বালিয়ে বিদ্যুৎদীপকে সরাতে চাই নে। কিন্তু ফিউজের দুর্ঘটনা আশঙ্কা ক'রে মোমকে পাশে রাখতে হয়।"

যে-স্মৃতিচর্চা থেকে এই উদ্ধৃতি তারই অপর অংশে আরো স্পষ্ট ও মূল্যবান পক্ষপাত প্রকাশ পায় : "১৯৩৫-এই যেমন ভূমিকাহীন সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' বেরোল তেমনি আমার 'সাগর'। 'অর্কেস্ট্রা'র সঙ্গে 'সাগরে'র বন্ধন ও মুক্তি-প্রসঙ্গ কেউ আলোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ বাংলা কবিতায় আধুনিক যুগ সম্পর্কে অনেক বালভাষিতাই শ্রবণ ও পঠন করছি। আধুনিক যুগ নামে যদি কোনো কালকে স্বীকার করতে হয় তার আবির্ভাব বিশের দশকে ও পরিণতি ত্রিশের দশকে। নর-নারীর প্রেমের ভঙ্গী পালটায় একেকটা যুগে তার ছবি কবিতার দর্পণেই প্রকাশ্য হয়। সুধীন্দ্রনাথ তার 'অর্কেস্ট্রায়' 'অতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা' নারীকে নিয়ে যদি ধ্রুপদী মনোভঙ্গী দেখিয়ে থাকেন আমি আমার যৌবনের প্রেমবোধকে নিয়ে পলায়ন করেছি রূপকল্পে ও উল্লেখে। ধ্রুপদে স্থিতির জন্যেই উল্লেখ। আর রূপকল্প হল উপমাকে নতুন ভঙ্গীতে আনবার প্রয়াস। উপমা বিস্তৃতিতে রূপকল্প আর সংক্ষিপ্তিতে শব্দসার হয়ে কাব্যিক প্রতীক হতে পারে। জ্যেষ্ঠ সুধীন্দ্রনাথ তার নাটকীয় অভিজ্ঞতাকে অভিজ্ঞান নিয়ে যে কালে ধ্রুপদী হতে চেষ্টা করেছেন —তখন আমার অভিজ্ঞতাকে আমি স্বপ্নলীন করতে চেয়েছি। সব জীবন যেমন একই খাতে বয়ে চলে না, তেমন সব কবিকৃতিও না। তবু বৈচিত্র্যকে অন্বিত করবার একটা শক্তি হয়তো কবিমর্মে ক্রিয়াশীল। সে শক্তির হদিস পেলে পান একমাত্র দার্শনিক। সুধীন্দ্রনাথ যদি আমাকে কবি হিসেবে আবিষ্কার ক'রে থাকেন, আমি তার দর্শন-মানস আবিষ্কার করেছি। এখানেই আমাদের দুজনার স্থায়ী বন্ধন। আর মুক্তি! তা তো আমার কবিতাতেই প্রকাশিত।"

কবিতায় এই 'বন্ধন' ও 'মুক্তি'র সংবাদ এই উক্তিতে যদি পাই, তাহলে গদ্যের জন্য পাব অন্য এক সংবাদ যা প্রথমটির পরিপূরক। উপরিউক্ত 'দর্শন-মানস' সম্পর্কিত। সুধীন্দ্রনাথ ও 'পরিচয়' যেমন, সঞ্জয় ও 'পূর্বাশা' যেমন, তেমনিই তো প্রমথ চৌধুরী

ও 'সবুজপত্র'। এবং ঐ একই ঘরানার টানে যদি নামগুলো এভাবে আসে—প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, সুধীন্দ্রনাথ, সঞ্জয়—তাহলে বোধহয় ইতিহাস মর্যাদা পায়। তাতে মিলন ও বিরোধের দ্বান্দ্বিকতাও স্পষ্ট। আবার ওই দ্বান্দ্বিকতাতেই যথার্থ সহমর্মিতা। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের আরো দুটি উক্তি: 'পূর্বাশা'র সম্পাদকের কাছে 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর সেই পত্র-রচনায় আমার 'কপালের রেখা' ও বিশ্বাস আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত; তা এই: 'এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমি একজন একঘরে সাহিত্যিক। অর্থাৎ তরুণ সাহিত্যিক নই, অথচ প্রবীণ সাহিত্যিক হতে পারলুম না। এককাল ছিল, যখন আমি পাঠকের মুখ চেয়ে লিখতুম না, কেন না, আমার বিশ্বাস ছিল আমার কোন পাঠক নেই।" "কত্তুত ত্রিশের দশকে সম্পাদকতার শিক্ষানবিশীর পর প্রমথ চৌধুরীর এ-কথাগুলো আমার স্মরণে স্থায়ী হয়ে আছে: 'মানুষের মন শুধু সাহিত্যের গণ্ডীবদ্ধ নয়। ধর্ম পলিটিক্স্ প্রভৃতির সঙ্গে সে-মনের যোগাযোগ আছে! বাঙালীদের মনও যে এ-সব বিষয় থেকে আলগা নয়, তার প্রমাণ, নিত্য তাদের কথাবার্তায় পাওয়া যায়। আমিও অবশ্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলেছি, যেমন সামাজিক লোকে নিত্য বলেন। যে-সব বলা-কওয়া হচ্ছে আসলে স্ব-সমাজের সঙ্গে কথোপকথন।"

এই যে স্ব-সমাজের সঙ্গে কথোপকথন—বোধ করি তা-ই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস সমগ্রের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। এবং যথার্থ মনন-প্রধান উপন্যাসের শর্তও তাই। সে-কারণেই ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা, প্রমথ চৌধুরীর উক্তি তাঁর স্মৃতিতে স্থায়ী হয়, আর কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী আদর্শ তাঁকে শিক্ষিত করে। যদিচ, নানাভাবেই তাঁদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্যও স্পষ্ট।

[তিন]

স্ব-সমাজের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে, ইতিহাসের বোধে-বুদ্ধিতে এই যে কথোপকথন এবং সেইসূত্রে আত্ম-আবিষ্কার, তা-ই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। এবং এক বিস্তৃত ও আত্মস্থ ধারাবাহিকতা। তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা, সেই সময়ের নানা দর্শনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সঞ্জয়বাবুর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা তাঁর মতোই আত্ম-আবিষ্কারে মগ্ন। এবং স্ব-সমাজ ও সময়ের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। সঞ্জয়বাবু একদা জানিয়েছিলেন: "চাল্লশের দশকে, যুদ্ধ-স্বাধীনতা আন্দোলন-মন্বন্তর-দাঙ্গার সংকট-সময়ে ভবিষ্যতের দিকে অনেকেই মন প্রক্ষেপ ক'রে কখনো কবিতায় কখনো বা উপন্যাসে কথা ব'লে মন তাজা রাখতে চেষ্টা করেছেন। আজকের দিনের যুবসম্প্রদায়ের মতো অ্যাঙ্গুইশ-অ্যাঙ্গারের অগ্নিদাহে হাহাকার হন নি। অ্যাংজাইটি আমাদেরও ছিল, অস্তিত্ববাদীদের মতোই, কেন না শিয়রে শমন। আমার সে-সময়কার মাঝারি উপন্যাস: 'রাত্রি', 'কল্লোল', 'মৌচাক' ও 'সৃষ্টি'।"

এইসব উপন্যাসে তাঁর অন্বিষ্ট কি ছিল তা মোটামুটি ধারণা করা যায়, যখন লক্ষ্য করি বাংলার ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায় প্রায় ডকুমেণ্টেশনের ধাঁচে তাঁর উপন্যাসগুলিতে উঠে আসে। আমরা সচেতন —যে উপন্যাসে, বিশেষত মনন-প্রধান উপন্যাসে, ব্যক্তিমানুষেরই বিশিষ্ট ভূমিকা। কিন্তু আমরা আবার এ-সত্যও জানি, যার উল্লেখ এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে করা হয়েছে যে, এই ব্যক্তিমানুষকে একটা সময়ের প্রেক্ষিতে দেখতে চাইলে ডকুমেণ্টেশন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষত তাঁদের উপন্যাসে, যারা, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো, স্পষ্ট উচ্চারণ করেন : 'সব উপন্যাসই ইতিহাস'। চল্লিশের দশকের নানা টানাপোড়েনের কালে রচিত তার যে চারটি উপন্যাসের উল্লেখ তিনি করেছেন তাতে স্পষ্টতই ঐ ডকুমেণ্টেশন উপস্থিত। 'কল্লোলে'র প্রতীপ বা 'সৃষ্টির' দীপায়নের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তফাৎ থাকতেই পারে, কিন্তু তারা যে সময়কে প্রতিমুহূর্তে নিজের মধ্যে বহন করছে গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াতেই, উপন্যাসগুলিকে সেই একই সূত্রে গ্রথিত করে তা-ই, যাকে বলা যায় সময়-চেতনা। 'সৃষ্টি'র এই দীপায়নকেই এবং তার সময়-পরিবেশকে আমরা আবার অন্য নামে-চেহারায় কিন্তু সময়চেতনার ঐ ধারাবাহিকতাতেই, ফিরে পাই অনেক পরে 'প্রবেশ প্রস্থানে'। 'মৌচাকে' একটি পরিবারের গল্পের চারটি অংশের শিরোনামে থাকে চারটি সময় : উনিশশ' বারো, উনিশশ' চব্বিশ, উনিশশ' ছত্রিশ এবং উনিশশ' আটচল্লিশ। দ্বাদশ বর্ষের হিসেবে চারটি যুগ যুগলক্ষণ সমেত। আর এই উপন্যাসের তিতু-মিতুদের কি ফিরে দেখা যায় না 'সৃষ্টি', বা 'প্রবেশ প্রস্থানে' ?

যুগসন্ধির সব সংবাদই তাই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাসে উপস্থিত। এবং প্রতিটি চরিত্রই, নারী-পুরুষ, সময়ের আবর্তনে চিত্রিত। 'সমস্যা ও চিন্তা-প্রধান উপন্যাসের নিয়মে এখানে সমস্যার প্রবেশ প্রস্থান দিয়েই পাত্রপাত্রী প্রত্যেকের জীবনেতিহাস রচিত হয়েছে।' সমালোচকের এই উক্তি 'বৃত্ত' উপন্যাস সম্পর্কে হলেও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রতিটি উপন্যাস সম্পর্কে প্রযোজ্য। 'বৃত্তে'র প্রসঙ্গ প্রধানত নরনারীর প্রেম, প্রেমের বিনাশ ও পুনরুত্থান। পরবর্তী অন্য উপন্যাসে এই প্রেমই আবর্তিত হয় প্রধান চরিত্রাবলীর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তা-দর্শন, কর্মপ্রণালীর গ্রহণ-বর্জনের দ্বান্দ্বিকতায়। পরিপ্রেক্ষিত : সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন।

'কল্লোলে' এই ব্যাপারটা বিশেষ স্পষ্ট হয়ে এসেছে। কারণ এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র - প্রতীপ ও সুজাতা রাজনীতিমনস্ক। তাছাড়া স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতীয় তথা বঙ্গীয় রাজনীতিতে যে টানাপোড়েন, এই উপন্যাস ও চরিত্রাবলী সেই টানাপোড়েনে আক্রান্ত। সুজাতা ও প্রতীপ পরস্পরের কাছাকাছি আসছে আবার সরে যাচ্ছে, যেন সেই নিয়মেই, যে-নিয়মে ওরা যাচ্ছে ও ফিরছে তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলন ও মতাদর্শে। উপন্যাসের অন্য প্রধান চরিত্ররাও— প্রদীপ (দীপু), সমীর, সন্তোষ, অবনী, লতিকা প্রত্যেকে। আর প্রেক্ষাপট সেই সময়ের আন্দোলিত কলকাতা - গান্ধী, সুভাষ, কম্যুনিস্ট পার্টি, মুসলীম লীগ - নানা মতাদর্শ আর আন্দোলন। ওয়েলিংটন স্কোয়্যার, ধর্মতলা, বৌবাজার, বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া,

দেশবন্ধু-শ্রদ্ধানন্দ-দেশপ্রিয় পার্ক এপার-ওপার তখন উত্তাল-উদ্দাম। উপন্যাসের প্রথম পাতাতেই জেনে যাওয়া যায়ঃ 'কাল ধর্মতলার রাস্তায় পুলিশের গুলিতে রামেশ্বর মারা গেল।' রামেশ্বর তো উপন্যাসের কোনো চরিত্র নয়, শহীদ, এবং উনিশশ' ছেচল্লিশের কলকাতার ইতিহাস। এই সবই প্রায় সাংবাদিক ডকুমেণ্টেশনে উপস্থিত এই উপন্যাসে। আর সেইসব ঘটনা, মতাদর্শ গ্রহণ-বর্জনের আঘাতে-প্রতিঘাতে প্রতিটি চরিত্র তাদের ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে 'সামাজিক' তো বটেই ; আর যাকে বলি 'টীপিক্যাল', তা-ই। প্রতীপ কিংবা অবনী, সন্তোষ বা প্রদীপ, সুজাতা বা লতিকা, প্রত্যেকে সেই সময়ের প্রামাণ্য প্রতিনিধি। এরা এইসব আন্দোলনের,. মিছিলের, শরিক ; সেই সময়ের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিতর্কে সক্রিয় অংশীদার। আশ্চর্য কিছু নয় যে, ঐ সময়ের তরুণী সুজাতা এইসব ঘটনায় উদ্দীপিত হয়ে স্বগতোক্তি করে : 'এখন বসবাস করতে হবে শুধু ঘটনায়।' আর এই ছেলেমেয়েদের, যারা বুক পেতে গুলি নিচ্ছে, যারা মিছিলে অকুতোভয়, তাদের 'কী দুর্দান্ত সাহস অথচ কী সুন্দর সংযম !'

তখন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাদের 'অ্যাংজাইটি ছিল' : কিন্তু তারা ভবিষ্যতের দিকেই 'মন প্রক্ষেপ ক'রে' রেখেছিলেন। যে-প্রতীপ, ৪২-এর প্রদীপ্ত, উৎসাহী প্রতীপ নিজেকে তখন 'নিধূম, নির্বাপিত জড়পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই' ভাবতে পারছে না, নিজের অন্তরে ও বাইরে আন্দোলিত পৃথিবীতে, সময়ে খুঁজে চলেছে নিজেকেই, সেও কুণ্ঠাহীন অনুরোধ জানায় কনিষ্ঠদের : আব্দাস সেলামের শবযাত্রায় তোমরা যেও। খাকসার আব্দাস সেলাম ওই মৃত্যুটিই তোমাদের শোভাযাত্রাকে স্মরণীয় করেছে।' এই অনুরোধ জানিয়ে সে ভাবতে থাকে : 'আব্দাস সেলাম। এগিয়ে যাবার পণ নিয়ে একমুঠো ধুলোর মতো যে জীবনকে ছুঁড়ে দিতে পারে, সমস্ত মনপ্রাণ কি তাকে প্রণাম জানাতে চায় না ? একটি মুখ, যে-মুখ চারিদিককার সাধারণ মানুষের নয় —পিকাসোর আঁকা নূতন পৃথিবীর জন্মদাতারই যেন কারো মুখ।.. হয়তো জন্ম নেবে নূতন পৃথিবী ! এতো মৃত্যু, এতো রক্ত, এতো ব্যথার পরও কি পৃথিবী স্নাত পবিত্র হয়ে দেখা দেবে না ? মানুষের এতো আত্মাহুতি-- য়ুরোপ, আফ্রিকায়, চীন-জাপান-মালয়-ভারতবর্ষে –সবই কি অনর্থক ? · কালো মলাট ছিঁড়ে ফেলে কি মানুষের শুভ্র ইতিহাস নূতন সূর্যের আলোতে বেরিয়ে আসতে চায় না ?'

তা সত্ত্বেও প্রতীপ কেন অবসন্ন বোধ করে, কেন তার 'আশা ফুটে ওঠে না', কেন সে 'নূতন পৃথিবীর অনুভবে রোমাঞ্চিত হয় না ?' কারণ তখন সে তার অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্বে দিশেহারা। গান্ধীজী কি আর পথ দেখাতে পারবেন ? ৪২-এর আন্দোলন কি যথার্থ সার্থক ? সুভাষের পথটাই কি ঠিক ? মার্ক্‌স্‌ যা-ই বলুন, স্তালিনপন্থী কম্যুনিস্টরা কি নূতন ভাঙনের খেলায় মেতে নেই —তারা কি ভারতবর্ষে কোনো পথ দেখাতে পারবে ? না কি মার্ক্‌স্‌ ও গান্ধীকে মেলানো সম্ভব ? অথচ কী উত্তাল সময় ! কোন্‌ পথে মানুষ এগোবে ? ওদিকে যার কাছে এইসব তর্ক

তেমন মূল্যবান নয়, যে জীবনের দায়েই রাজনীতিতে ছুটে আসে, সেই সুজাতার অনুভব অনেক স্পষ্ট : 'জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসতে গেলে বুঝি পলিটিক্সকেও ভালোবাসতে হয়।' আবার মনে মনে আবৃত্তির মতো প্রতীপের কথাগুলো উচ্চারণ করে সে : 'যে কম্যুনিজমকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন মার্কস্—তাকে মানবীয় করে তুলেছেন গান্ধীজী। মার্কস্ শুরু করেছেন, শেষ হবে গান্ধীজীকে দিয়ে।' কিন্তু কোথায় সেই মিলন ? আদৌ সম্ভব কি ? উপন্যাসটি যেন তাই এমন প্রতীকী আভাসে শেষ হয়ে যায় : 'প্রতীপ দাঁড়িয়ে রইল। আবারও সুজাতা হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তবু যেন প্রতীপ নড়তে পারছে না। সুজাতার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল। তারপর ছোট গলির পীচের উপরও সে শব্দ আর শোনা গেল না। এবার এসে বারান্দায় দাঁড়াল প্রতীপ। গলি পার হয়ে রাস্তায় চলে গেছে তখন সুজাতা। প্রতীপ ঘরে ফিরে এলো—তখনও কানে তার সেই দৃঢ় পদধ্বনির গুঞ্জন।– কঠিন, নিটোল প্রত্যেকটি ধ্বনি। একটুও দুর্বলতা নেই—একটুও শিথিল হয়ে যাওয়া, থেমে-থাকা নেই। ডাণ্ডি-যাত্রার ছবিটির উপর কে যেন প্রতীপের চোখকে টেনে নিয়ে গেল। ঘরে ফিরে এসে ছবিটিকে আবার নূতন ক'রে আবিষ্কার করল প্রতীপ।'

এইরকম পথভেদ, মতভেদ, বিতর্ক, পথানুসন্ধান। অথচ সবাই, প্রত্যেকে সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর নেপথ্যে সারি সারি ঘটনার মিছিল : রসিদ আলি দিবস, আই. এন. এ., নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি আর মুখের মিছিল : মার্কস, গান্ধী, সুভাষ, রামেশ্বর, আব্দাস সেলাম, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। সময়ের ডকুমেণ্টেশন, ইতিহাসের পাঠ। ব্যক্তির জীবনে-মননে কল্লোল।

'মৌচাকে' যে পর্ববিভাগ দ্বাদশবর্ষের যুগের হিসেবে তাও তো ইতিহাসের পর্ব-ভাগ। ১৯১২, ২৪, ৩৬, ৪৮ স্বদেশী আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা। একটি পরিবারের কয়েকজনের কাহিনী তো মাত্র তাদের কাহিনী নয়। পিতা মোহিনী ১৯১২-র যুবক, তার জীবনের চার পাশেই তো তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। যদিও সে তখন পেশায় দারোগা। আবার হয়তো সময়ের চাপেই ১৯২৪-এ তার দারোগাগিরিতে ইস্তফা। তারপর সময় ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়—১৯৪৮-এ কনিষ্ঠ পুত্র মিহিরের আশা ও আশাহীনতার স্বপ্ন ও স্মৃতিতে। অথচ সকলেই, স্বয়ং ঔপন্যাসিকসহ, 'ভবিষ্যতের দিকে মন প্রক্ষেপ ক'রে মন তাজা' রাখেন। এমন নয় যে এরা সবাই, 'কল্লোলের পাত্র-পাত্রীর মতো, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। মোহিনী গৃহস্থ, বিরজা তার গৃহিনী, শিশির-মিহির সেই পরিবারেরই সন্তান। শুধু মিহির সামান্য খাপছাড়া, কিন্তু সে-ও প্রত্যক্ষ রাজনীতির চরিত্র নয়। এই মৌচাকে পারিবারিক উত্থান-পতনের পাশাপাশি বয়ে যায় ছত্রিশ বছরের ইতিহাস, বঙ্গীয় ইতিহাস। খুবই স্পষ্ট যে, এই চরিত্রাবলীর গড়াপেটা হয়েছে সেই সুপরিকল্পিত কালপর্বে, যার যার 'সমকালীন' সময়েই– ১৯১২ থেকে ১৯৪৮, মোহিনী হয়তো পারিবারিক দায়ে গৃহস্থ, শিশির শেষাবধি পরাজিত : কিন্তু মিহির তো এই পরিবার ও সময় থেকেই চেতনা সংগ্রহ ক'রে পা রাখে ঘরে ও ঘরের বাইরে। শেকড় সেই

'ঘরে'ই —সর্বলীন সর্বাঙ্গীন স্ব-অস্তিত্বের অভিজ্ঞতায়। যখন সে ফিরে এল প্রাচীন গৃহে, হয়তো সাময়িক সে-ফিরে-আসা, তখন আত্ম-আবিষ্কারেই যেন জানতে পায় : 'নিজেকে এমন সম্পূর্ণতায় আর হয়ত কোনদিন পাওয়া যাবে না।' এবং 'পেছনেও স্পন্দন আছে —ওঠা-নামায় দুলছে সমুদ্রের জল—মুক্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে না আকাশে—কিন্তু আঁকাবাঁকা রেখায় রূপায়িত করছে আকাশ। সমুদ্র জুড়েই ঢেউ, এখানে আর এখন বলেই নয় —সব জায়গায়, সমস্ত সময়ে।' অর্থাৎ ব্যক্তির অস্তিত্বও এক ধারাবাহিকতা। গড়ে ওঠে মানুষ এই ধারাবাহিকতাতেই, তার অভিজ্ঞতার সবটুকু আত্মস্থ করে। মিহিরের চরিত্রের কাঠামো তার একার তৈরি নয় —সেখানে উপস্থিত বাবা, মা, দাদা, যতীনদা, সুপ্রিয়, শম্পা —সবাই। তাদের জীবন, তাদের জগৎ, তাদের চৈতন্য আশ্রয় ক'রেই মিতু হয়ে ওঠে মিহির। যেমন পানু হয়ে ওঠে দীপায়ন, 'সৃষ্টি'তে। আর এই হয়ে-ওঠাতেই যেন মিহির আবিষ্কার করে: 'আমি মুক্ত, আমি মুক্ত'। এই মুক্তি অস্তিত্বের সমগ্রতায়, সময়-সত্তার বিজড়িত তাৎপর্যে। সমষ্টির চেতনায় বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়ে যা সঞ্চারিত হয়, ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা-ই ঘটে তার ঘনিষ্ঠ সময়ে, পরিবারে, সমাজে।

আর খুব আশ্চর্যের কিছু না, এই পারিবারিক ঘটনাবলী, সামাজিক-রাজনৈতিক উত্থান-আন্দোলনের পাশাপাশি চলে তাত্ত্বিক তর্ক ও বিচার—সন্ত্রাসবাদ, গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ। ভুললে তো চলবেনা, সব কাহিনীর নেপথ্যেই তার স্রষ্টার মন-মনন সক্রিয় থাকে। সময়ের, বিশিষ্ট যুগের, তার ঘটনাবলী, তার সত্যের যে-পাঠ স্রষ্টা তাঁর চেতনায় গ্রহণ করেন অথবা গ্রহণ-বর্জনের দ্বান্দ্বিকতায় আবিষ্কার করতে চান সময়ের সত্যকে, তা-ই তো প্রতিফলিত হয় তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি ও সমষ্টির চৈতন্যে। অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র চৈতন্য তাই সঙ্গতিহীন ও তাৎপর্যহীন। উপন্যাসে তো বিষয়ই নিয়ন্ত্রণ করে দৃষ্টিকোণ। এই দৃষ্টিকোণ দেশকাল নিরপেক্ষ নয়। এটুকু জানা থাকলে উপন্যাস হয়ে ওঠে ইতিহাস।

আসলে, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সব উপন্যাসই যেন আত্মজীবনী। যে-সময়কালে তিনি বেঁচেছেন, প্রবল ভাবে বেঁচেছেন, সমগ্র চৈতন্যে সে-সময়কে, সমাজকে, বিশ্বভাবনাকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন, তারই যেন এক ধারাবাহিক প্রকাশ 'বৃত্ত' থেকে 'প্রবেশ প্রস্থানে'। 'বৃত্তে'র সত্যবান, 'কল্লোলের' প্রতীপ-প্রদীপ, 'মৌচাকে'র তিতু-মিতু, 'সৃষ্টির' দীপায়ন-অনিরুদ্ধ, 'প্রবেশ প্রস্থানের' সুদত্ত-অভি প্রত্যেকেই যেন এই এক ধারাবাহিক সত্তার খণ্ড-প্রকাশ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য যেন ছড়িয়ে আছেন শুধু মুখ্য চরিত্র-মূলে নয়, প্রতিটি দেহে, যারাই উপস্থিত এইসব উপন্যাসে। এ কী অভূতপূর্ব আত্মসাক্ষাৎকার!

তারই তো শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তিনি রেখে গেলেন 'প্রবেশ প্রস্থানে'। একটি উপন্যাসে যে সময় এমন প্রবলভাবে তার জল-মাটি-আকাশ সমেত উপস্থিত হতে পারে মানবচৈতন্যে, তা বাংলা উপন্যাসে বিশেষ দেখা যায় নি। বাংলার এক প্রান্তের একটি শহরকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে সময়ের ধাপে ধাপে। তার গড়ে-ওঠা, তার বিস্তার।

তার গর্ভধারণ। সেই গর্ভেই তো খেলা করছে সময়। এবং ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস। শতাব্দীর শিশুকাল থেকে মধ্যবয়স পর্যন্ত। আর শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলে যাওয়া কয়েকটি নারী-পুরুষ; তাদের গ্রহণ, তাদের বর্জন; পরস্পরকে জড়িয়ে আবার ছাড়িয়েও তারা চলে যায় প্রত্যেকে। 'মৌচাকে' পর্বভাগ ক'রে যদি দেশ-কাল উপস্থিত হয়ে থাকে, 'প্রবেশ প্রস্থানে' যেন তা পরতে পরতে খুলে যায়। আর তার কেন্দ্রে থাকে কয়েকজন নারী পুরুষ মাত্র নয়, তাদের ধারণ করছে যে-ভূমি, ভূমণ্ডল, তাও। শুরু হয় একটি শহরে, তারপর কলকাতায়, আসা-যাওয়া—কিন্তু সব একাকার হয় সময়গ্রন্থিতে; প্রত্যেকের সত্তা উন্মোচিত হয়। এই উন্মোচনের শুরু এইরকম: 'স্বপ্নের মতোই মনে হয়। তেমন ধুসর, আবছা। রাত্রি-দিন নেই। কিন্তু একটা আশ্চর্য আলোতে যেন সব-কিছু দেখা যায়। অতীত! যা এখন থেকে অনেক বছর পেছনে। এ শতাব্দীরও অতীত, আমারও। শতাব্দীর কৈশোর তখন, যখন আমার জন্ম। জন্ম সেই ছোট শহরে যার শরীরে তখনও পল্লীর সুরভি। অনেক পুরনো শহর। সপ্তম শতকের ইতিহাসেও নাকি তার নাম আছে। নিশ্চয়ই পুরনো। পল্লীকে যখন জড়িয়ে আছে, তার বয়েস কে বলতে পারবে? শতকের মাপে কি আর বাংলার পল্লীকে মাপা যায়? অবাক লাগে কলকাতার প্রমত্ত জীবনে ত্রিশ বছর বসবাস করবার পর। লুব্ধ, গৃধ্নু, প্রতিদ্বন্দ্বী, বিলাসী মানুষের ভিড়ে আমি যে হারিয়ে যাইনি তা বোধহয় আমার জন্মভূমিরই গুণে।' এই উক্তি যার, 'প্রবেশ প্রস্থানে'র সেই অভি তাই হয়তো তার আবাল্য সুহৃদ্ সুদত্তকে বলে: 'তোকে দেখলেই ফিরে আসে সব, মা-বাবা, আমাদের শহর, স্কুল-কলেজ—পুরনো দিনগুলো।' কারণ তার বিচারে, তথা তার ও তাদের স্রষ্টা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সমগ্র অস্তিত্বেই, 'প্রবেশ প্রস্থানে'র প্রধান পুরুষ সুদত্ত 'এ-শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশ' হয়ে ওঠে।

সুদত্ত আত্মহত্যা করে। এ কি একটি ব্যক্তির আত্মহত্যা? নাকি সময়ের? সব বিষ আহরণ ক'রে চলে-যাওয়া? এ-তো আশ্চর্যের কিছু না—বাংলার ইতিহাসে এই শতক যে-আশা-উন্মাদনা নিয়ে শুরু হয়, সর্বভারতীয় রাজনীতির পাকচক্রে সেই শতকে চল্লিশের দশকের প্রান্তে এসে বাংলার তারুণ্যকে যে-দুর্বিপাকের মুখোমুখি করে, তা তো বুদ্ধিজীবী-চৈতন্যে হাহাকার তুলবেই। এই দশকের প্রান্তেই তো আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের দেশভাগ। সুদত্ত-অভির, এই শতকের প্রথমার্ধের বাংলার, দুর বাংলার, নগর কলকাতার বাংলার, সবটুকুই আত্মস্থ করে যখন যৌবন অতিক্রম করে প্রবীণ প্রৌঢ়ত্বে উপস্থিত হয়, তখনই যেমন তাদের, তেমনি বাংলারও যেন 'প্রস্থান'! অভি হয়তো শেষ পর্যন্ত দর্শকের দূরত্বে বেঁচে যায়, সুদত্ত পারে না। কারণ তখন তো তার সব প্রেম, সব স্বপ্ন, সব প্রত্যাশার মহাপ্রস্থান ঘটে গেছে, বাংলার 'প্রস্থানে'র সঙ্গে সঙ্গে। তার জীবন-স্মৃতির শেষ পৃষ্ঠা তাই এই রকম: "জীবন-স্মৃতির শেষ পৃষ্ঠা লিখছি। লিখছি আর দেখছি মার মুমূর্ষু মুখ—যার সামনে দাঁড়ালে আমার মৃত্যু হয়। লিখছি আর শুনছি: 'আমার সোনার বাংলা, আমি

তোমায় ভালবাসি।' প্রসাদের মুখে, তারপর খুকীর কণ্ঠে। যেন খুকীর আহ্বান। বালিকা খুকী বালক খোকাকে ডাকছে। সাড়া দিচ্ছি আমি : 'নিহত বাংলা, তোমায় ভালোবাসি!' প্রতিধ্বনি।" শৈশব-সুহৃদ্ প্রসাদের আশাভঙ্গ, স্বাধীন ভারত—বাংলার আশাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে, শৈশব-সঙ্গী খুকীর মৃত্যুর সঙ্গে প্রেমের মৃত্যু, যার মৃত্যুর পনেরো দিনের মধ্যে আত্মহনন—এই সবকিছুর সঙ্গে ছবি শেষ হয় বঙ্গবালার, বঙ্গদেশের, সুদত্তর 'নিহত বাংলা'র।

আর এই যে-ছবি, এই শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশের ছবি, তা 'কল্লোল', 'মৌচাক', 'সৃষ্টি'র, 'করুণ রঙিন পথ' ধ'রে চলে এসেছে 'প্রবেশ প্রস্থানে' : পুনর্বার। যা ছিল খণ্ড-প্রকাশ, তা স্পষ্ট-ও সম্পূর্ণ অবয়ব পেল 'প্রবেশ প্রস্থানে'। 'কল্লোল' তো স্পষ্টতই কয়েকটি দিনের 'কল্লোলিত' কলকাতার তৎকালীন রাজনীতির ছবি ও কাহিনী। 'মৌচাকে' সময়কাল ১৯১২ থেকে ১৯৪৮, আর তা প্রকাশিত তিন চারটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ; 'সৃষ্টি' মূলত দীপায়নের অনন্য আত্ম-আবিষ্কার, 'প্রবেশ প্রস্থানে' এ-সবই মিশে গেছে—সেই সময়, সেই সব চিত্র চরিত্র এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য স্বয়ং। এই উপন্যাস তাই একাধারে উপন্যাস ও আত্মজীবনী।

'সৃষ্টি'র দীপায়ন কি তাই জেনে যায় : 'আমাকেই চেয়েছি আমি, হয়তো আমাকেই পাব' 'দুহাতে আমি নিজেকে জড়িয়ে আছি ', আর মানুষ যেমন নিয়ে থাকে তার শৈশব, কৈশোর, যৌবনকে, পৌঁছোয় প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্যে, তেমনি তার সঙ্গে মিশে থাকে তার প্রেম। দীপায়নের শেফালি, দীপায়নের বীনাদি, দীপায়নের তোতা আর শেষ তার সুপর্ণা, শুধু তো দীপায়নকেই গড়ে তোলে। কারণ দীপায়ন শুধু নিজেকেই গড়ে। তার গহন-অবগাহন শুধু নিজেতেই : তার গমন নারীতে, তবু নারীতে নয়, প্রেমে তবু প্রেমে নয় ; সর্বাত্মক আত্ম-আবিষ্কারে। দীপায়নের আত্মপোলব্ধি তো এই রকমই . 'যে যা হবে তা নিজের ভেতরই তৈরী হতে শুরু হয়, বাইরে থেকে কেউ এসে তৈরী করে দেয় না। মাটিতে সব-কিছুই আছে তা থেকে কোন্ গাছ কী টেনে নেবে, ওটা গাছেরই কাজ। কিংবা 'তৈরী ক'রে তুলতে হয় একটি সত্তা--একটি মাত্র সত্তা। ওটা তোমারই অস্তিত্ব —কোন শাশ্বত মনের প্রতিভাস নয়—আবার কালাতীত কল্পনাও নয়— অলীক নয়— দুঃস্বপ্ন নয় বাস্তব। —নিজের সাযুজ্য খুঁজে বেড়াচ্ছ। জনতা-মুক্ত —কেউ নেই তখন তোমার চারপাশে - শুধু তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছো তুমি —তোমরা দু'জন শুধু তুমি নাম আর তুমি রূপসী।' দীপায়ন তাই রাজনীতি-মনস্ক হলেও, রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাবলীর ঠিক মাঝখানে থেকেও, প্রেমেই খোঁজে মুক্তি। অথচ প্রেম তাকে শুধু ছুঁয়েই যায়, কারণ সে যে খোঁজে তাকেই, নিজেকেই, একমাত্র নিজেকেই। 'প্রবেশ প্রস্থানের' সুদত্ত-ও তো এমনি নিজেকেই খুঁজতে চেয়েছিল। 'বৃত্ত'তে যে প্রশ্ন সরল গতিতে শুরু হয়, 'সৃষ্টি' ও 'প্রবেশ প্রস্থানে' এসে তা জটিলতা পায় ; প্রেম কেন? তার বিনাশ কীসে? মুক্তির? 'বৃত্তে' সত্যবান, 'মৌচাকে' মিহির বা মিতু, 'সৃষ্টি'তে দীপায়ন, এবং 'প্রবেশ প্রস্থানে' সুদত্ত যা জানতে চায়। আশ্চর্যের

কথা কিছু নয় যে, কোনো এক নারী সে-প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। হয়তো পারে একযোগে অনেকে। কোনো এক মুহূর্তে হয়তো প্রেম, নারী ও সে এক হয়ে যায়। দীপায়নের কিংবা সুদত্ত-র অনুভব তো প্রায় সেরকমই। আর তারা জানে, তারা জানায় যে তখনই তারা এসে দাঁড়ায় 'সৃষ্টির মুহূর্তে'।

এ কোন্ সৃষ্টি? নিজেকে নয়? আর এই যে নিজেকে তৈরি করা, নিজেকে দেখা, চেনা, জানার প্রক্রিয়া, তা-ই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস। 'বস্তু' থেকে 'প্রবেশ প্রস্থান'। দীপায়নের উক্তি ও উপলব্ধি, তার যুগপৎ প্রেম ও আত্মআবিষ্কার তো সুদত্তেরও। যেমন ছিল কিছুটা সত্যবানের, অঙ্কুরিত অবস্থায়। এবং শেষ আখ্যান 'প্রবেশ প্রস্থানে' প্রেম, দেশ, কাল পূর্ণ মাত্রা পায়। মিশে যায় ইতিহাসে, বঙ্গদেশে।

[চার]

যে বিশিষ্টতায় আমরা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাসকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি তার সূত্র ধরেই তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারে কয়েকটি লক্ষণ স্পষ্ট হয় যা তৎকলীন অনেক ঔপন্যাসিকের আঙ্গিক-লক্ষণ থেকেই আলাদা। উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার ইদানীং নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই হচ্ছে কিন্তু একটি সূত্রে সম্ভবত অনেকেই একমত হবেন যে গৃহীত বিষয় ও বাস্তবতা-বোধই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঙ্গিক নির্দিষ্ট করে দেয়। অবশ্য যদি আমরা সাধারণ ভাবে উপন্যাস কি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হই তাহলে হয়ত উপন্যাসের নান্দনিক এককের সন্ধান কেউ কেউ করবেন। ইদানীং তা হচ্ছেও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মিখাইল বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব ও সেই সূত্রে বিস্তৃত আলোচনা। এই অনুসন্ধান অবশ্য আপাতত আমাদের কাছে জরুরি নয়। উপন্যাস কেন উপন্যাস তার তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ব্যস্ত না হয়েই, উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের সাধারণ জ্ঞান নির্ভর করেই একজন ঔপন্যাসিকের বিশিষ্টতা সন্ধান করা যায়। বাংলার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যেকের আঙ্গিক কেন আলাদা তা সম্ভবত তঁদের একান্তভাবে বাস্তবতাবোধ ও বিচারের ওপরই নির্ভরশীল। তারাশংকরের বাস্তবতাব কাঠামো মানিকের নয়, বিভূতিভূষণেরও না। এমন কি সবোজকুমার রায়চৌধুরী, যিনি কখনোসখনো তারাশঙ্করের এলাকায় চলাফেরা করেছেন তিনিও তারাশংকরের বাস্তবতার কাঠামো সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। একই ধারায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর ঘনিষ্ঠ পূর্বসূরী ধূর্জটিপ্রসাদ থেকেও যথেষ্ট আলাদা।

একটি সাধারণ সত্য কিন্তু আমাদের মানতেই হয়। সত্যটি এই যে, উপন্যাসের প্রয়োজনে ঔপন্যাসিককে উপন্যাসের ভেতরে উপস্থিত থাকতে হয়। আরো একটা সত্যও হয়তো আমাদের মেনে নিতে হয় যে, ঔপন্যাসিক খুব নির্দিষ্টভাবেই এগোন তাঁর কথাবস্তু নিয়ে কোনো এক সিদ্ধান্তের দিকে। অর্থাৎ তিনি শুধু কোনো এক গল্প শোনাবার জন্য লিখতে বসেন না। উল্লেখযোগ্য 'সৃষ্টি' উপন্যাসে অনিরুদ্ধ

ঘোষালের উক্তি ঃ "আমি অনিরুদ্ধ ঘোষাল, আমার বন্ধু দীপায়ন চৌধুরীর কথা বলতে গিয়ে যতটুকু সম্ভব নিজেকে সামনে টেনে আনছি। তবে এ-কথা ঠিক যে দীপায়নকে বুঝতে হলেও আমাকেও আপনাদের বুঝে নেওয়া দরকার। আমি যেমন বাংলা কাগজগুলোর পুজোসংখ্যার লেখকগোষ্ঠীর কেউ নই, তেমনি দীপায়নও একজন মহাপুরুষ নয়। দীপায়নের জীবনী-পাঠে যে ভবিষ্যৎ বাংলা গড়ে উঠবে এমন গর্হিত আশা আমরাই যখন পোষণ করিনে, আপনারাও নিশ্চয়ই তা করবেন না। এখন কথা হচ্ছে —আপনারা মানে কারা? নিশ্চয়ই তাঁরা নন, যাঁরা ইদানীং কোনো বই-এর অণ্টম, নবম বা দশম সংস্করণের জন্ম দিচ্ছেন।" ঔপন্যাসিক জানেন যে তাঁর কথাবস্তুর অবতারণা ঠিক সেই পদ্ধতিতেই তাঁকে করতে হবে, যে পদ্ধতিতে তিনি সময়-সমাজ-ব্যক্তি-গোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন এবং সেই সিদ্ধান্ত পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। এ-কারণেই তাঁকে সর্বদাই উপস্থিত থাকতে হয় তাঁর উপন্যাসে। যদি জানা যায় যে উপন্যাসের চরিত্ররা স্বয়ং গড়ে ওঠে না, তাদের গড়ে তোলা হয়, তাহলেই বোধহয় বোঝা যায় ঔপন্যাসিকের এমন উপস্থিতি। ব্যাপারটা হয়তো অন্য আর এক ভাবেও প্রকাশ করা যায় যে, ঔপন্যাসিক (কিংবা যে কোনো শিল্পী ও দার্শনিক) নিজেকে, তাঁর পরিপার্শ্ব, সময় ও ব্যাপ্তি, তার অর্থ ও ব্যঞ্জনা, ইত্যাদি সমগ্রই বুঝে নিতে চান সংলাপে ও সংঘাতে, যেমন একদা সক্রেটিস বুঝতে চেয়েছিলেন ও পৌঁছোতে চেয়েছিলেন তাঁর ধারণাগত স্থায়ী সত্যে। উপন্যাসে এই কাজটা বেশি সহজ এ-কথা ভেবেই একদা শিল্পীরা রোম্যান্স ও লিরিক থেকে সরে এসে উপন্যাসের কাঠামো গঠন করেছিলেন। এই জন্যই সহজ যে, উপন্যাসের বিশ্লেষণী বিস্তারে ও সংশ্লেষে, সক্রেটিসের মতই সত্যকে বারম্বার যাচাই করা সম্ভব। আর সে-কাজটা কে করছেন? ঔপন্যাসিকই তো! তাই তো উপন্যাসে তাঁর প্রবল উপস্থিতি।

এই উপস্থিতিই ঔপন্যাসিকের কণ্ঠস্বর। এবং সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নির্দিষ্ট হয় তাঁর আঙ্গিক। তিনি খুঁজে নেন সেই আঙ্গিক, যাতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। একই ভাষাতেই তো আমরা কথা বলছি, তবু একজন যতোটা যে ভাবে সেই ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করেন, অন্যজন তা করেন না। এই করা-না-করার (বা পারা-না-পারার) অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার বলা-না-বলার সূত্রে। কী বলবেন জানা থাকলেই কী ভাবে বলবেন স্থির করে নেওয়া যায়।

মনন-প্রধান উপন্যাসে এই প্রয়োজন আরো বেশি জরুরি হয়ে ওঠে। কারণ এই শ্রেণীর উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের কণ্ঠস্বরটি অনেক বেশি সচেতন ও নির্দিষ্ট। মনন-প্রধান উপন্যাস নামে উপন্যাসের একটি 'ক্যাটিগরি' যদি আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকি, তাহলে তার আঙ্গিকেরও একটি বিশিষ্টতা মেনে নিতে হয়। আমরা মেনে নিচ্ছি-ও। আমরা জানি কাহিনী কথাসাহিত্যের একটি অনন্য লক্ষণ। উপন্যাসে কাহিনী যথার্থ মাত্রা পায় চরিত্র-সংঘাতে ও সংলাপে। আর ঐ চরিত্র-সংঘাতও কি প্রকাশ পায় না সংলাপে? কথার অর্থ কথোপকথনে? তাহলে নাটক ও উপন্যাসে

তফাৎ কোথায় ? তফাৎ এই যে, সংলাপ ও সংঘাতের ব্যাখ্যার একটি মাত্রা আমরা পাই উপন্যাসে, যা পাই না নাটকে। সাম্প্রতিক ব্রেখ্টীয় নাটকের কথা মনে রেখেও এ-কথা বলা যায়। আর এই ব্যাখ্যা মনন-প্রধান উপন্যাসে যতো তির্যক ও ঔপন্যাসিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তা অন্য ধারার উপন্যাসে অপ্রাপ্য। সেখানে যতটা ব্যাখ্যা হয় ঘটনা ও চরিত্রের, সংলাপ কিংবা মননের ততটা নয়।

এই সূত্র ধরেই আমরা প্রবেশ করি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস ও তার আঙ্গিকে।

একটি উদ্ধৃতি দিযেই শুরু করি। উদ্ধৃতি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টি' উপন্যাস থেকে : "পরদিনই আবার পানু পেছনের বেঞ্চিতে ফিরে আসে, কিন্তু বলে, জানিস অনি, ওঁদের কাছে ভালো সেজে লাভ নেই—আমরা মাস্টারমশাইদের কাছে তেতো হয়ে গেছি।" [কথাগুলো আন্তরিক ছিল, কেন না পরেও দীপায়ন ছাত্র-আন্দোলনের কথায় এ-ধরণেরই মন্তব্য করত। "ছাত্ররা মাস্টারদের শ্রদ্ধা করতে পারেনা আজ-- ব্যাপারটাকে মনোরম বলছিনে—সত্যি যা তা-ই বলছি। কিন্তু কেন পারে না শ্রদ্ধা করতে—দোষ কি সবটুকু ছাত্রদেরই ? আরুণি-একলব্য যে নেই আর—কেন ? গুরুমশাইরা কি দূরে সরে যান নি অনেক ? কোথায় সে-স্নেহ—পুত্র-স্নেহ—ছাত্রদের জন্যে ? আইন-কানুন, আচার-আচরণ জীবনের একটা খোলস জীবনের আসল চেহারা ভালোবাসা। কাকে তুমি কতোটুকু ভালোবাসতে পারছ তা দিয়েই তোমার জীবনকে মেপে নেব—তাছাড়া মাপবার আর কোনো পদ্ধতি নেই। বাসবের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলতে-বলতে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ত দীপায়ন ; মনে হত কোন্ একটা অদৃশ্য ক্ষতে যেন আঘাত লেগেছে ওর, তা থেকেই রক্ত ঝ'রে-ঝ'রে নিস্তেজ ক'রে দিচ্ছে শরীরের ভঙ্গী।"]

পাঠকের অবগতির জন্যে, অনিরুদ্ধ ঘোষালের বকলমে স্বয়ং লেখক কি এই ব্যাখ্যাতার ভূমিকা সচেতনেই গ্রহণ করেন না ? অনিরুদ্ধ তাই জানায়, "দীপায়নকে বুঝতে হলে আমাকেও আপনাদের বুঝে নেওয়া দরকার। দীপায়ন আমাদের বন্ধু বটে কিন্তু ও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের বন্ধু দীপায়ন চৌধুরী লোকটি কেমন, মশাই ? তাহলে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করব, কিছু বলতে পারব না। হয়ত এই অসুবিধেটা দূর করবার জন্যেই বন্ধুবান্ধবরা ওর জীবনী লিখতে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন।" কী আশ্চর্য দেখুন, সতর্ক হতে গিয়েও আবার লেখক-আমি-র আবির্ভাব হচ্ছে ! বিষয়ের কথা বলতে বিষয়ী উঁকি দিচ্ছে !

এই যে সংলাপ ব্যাখ্যার সূত্রে চরিত্র ব্যাখ্যা ও সতর্ক হতে গিয়েও লেখক-'আমি'র আবির্ভাব, তাতেই এই উপন্যাসের আঙ্গিক-পরিচয়। বস্তুত ঔপন্যাসিক সতর্কই ছিলেন। তাঁর জানা ছিল সংলাপ-সংঘাত-কথোপকথন ও আত্মকথন মিলিয়েই দীপায়নের মতো চরিত্রের প্রস্তাবনা সম্ভব। কারণ তা মননের বিকাশেই ঘটবে এবং এই মনন যে স্বয়ং লেখকের বাস্তব-ব্যাখ্যার সূত্রে অর্জিত জ্ঞান, তা-তো তাঁর জানা-ই ছিল। সেই জ্ঞান-বিতরণের তাগিদেই তো তাঁর উপন্যাস-রচনা।

দীপায়ন তো মোটে একটি চরিত্র নয়, সে সাধারণের একজন বলেই একটি সময়, একটি দেশ এবং সেই সময় ও দেশের দ্বান্দ্বিকতাতেই তো এমন চরিত্র প্রতিষ্ঠা পায়। একদিকে জীবনীকারের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আর অন্যদিকে স্বয়ং দীপায়নের আত্মকথন—তার জার্নালে।

আশ্চর্যের কিছু নয় যে, দীপায়নের জার্নাল উপন্যাসের অনেকটাই জুড়ে আছে আর অনিরুদ্ধর জীবনীরচনা সেই জার্নালের পরিপূরক। দীপায়ন ও অনিরুদ্ধ যেন মাঝে মাঝেই মিলেমিশে যাচ্ছে, যেমন মিশে যাচ্ছেন লেখক তাঁর চরিত্রের সঙ্গে: 'সৃষ্টিতে যদিও-বা এই মিশেল একটু অ-প্রত্যক্ষ. 'প্রবেশ প্রস্থানে' তা আরো বেশি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

'সৃষ্টি'র দীপায়নের জার্নালের ধাঁচটা এই রকম: 'দীপায়নের আজ পানুর [উল্লেখ্য : পানু দীপায়নের ডাক নাম] এই রুমাল-কাব্যটির কথা মনে পড়ছে গাঁয়ের প্রথম স্মৃতির সঙ্গে। মনে পড়ছে কয়েকটি মুখ—কয়েক টুকরো হাসি। সে-হাসির ধ্বনি আর নেই এখন, তার সবটুকুই আলো, সবুজ জ্যোৎস্না। যেন আকাশের কোথায় এখনও তাকে পাওয়া যাবে। মন থেকেই যেন একটা দীপ্তি কোথায় ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। যা আছে তা-ই কি আমাদের সব? যা ছিল তা কি কিছু নয়' দীপায়ন কি বলতে পারে পানু তার কেউ নয়? রাত্রির সেই স্বপ্নের পর—সেই আলোর পরও কি আজ বলবে প্রত্যেক মুহূর্তে আমি নূতন? নিজেকে শুনিয়ে, অপরকে শুনিয়ে আমি বলেছি অনেকদিন: আমি নামহীন, গোত্রহীন, পরিচয়হীন আমি নাড়ী ছিঁড়ে দিয়ে একা দাঁড়াতে পারি—নূতন সত্তায় ঝলমল করে উঠতে পারে আমার শরীর। কিন্তু পারলাম না ত! কোথায় কি যেন ছিল আমার রক্ত-মাংসের কোষতন্তুতে—কী এক দুর্নিরীক্ষ গতি, বিদ্যুতের কী এক ঐক্যতান পথ এঁকে দিচ্ছে আমার অন্ধকারের বুক চিরে। একসময় আমার ইচ্ছা পথ তৈরী করতে চেয়েছিল-তার নিঃসঙ্গ, উদ্ধত ভঙ্গী ভালো লেগেছিল আমার। কিন্তু আমি কি জানতাম আমার ইচ্ছা আমারই একার নয়! আমায় গাঁযের ইচ্ছা- পিসিমার, শেফালির, হয়ত কেশব মাস্টারেরও ইচ্ছা, আমার শহরের ময়নার আব বীনাদির ইচ্ছা, আর সবচেয়ে বড়ো ইচ্ছা বাবার আর মার—ওসব ইচ্ছাইতো একে একে মিশেছে আমার ইচ্ছার গায়ে! আমার ইচ্ছা বলেও বা কিছু ছিল কি কখনও? পৃথিবীর প্রথম মানুষ নই আমি। আমি অপাপবিদ্ধ, অনাবির নই। আমার রক্ত শুধু আমারই রক্ত নয়, আমার মন শুধু আমার হাতেই তৈরী নয়। যাঁদের আমি দেখিনি, জানিনে কোনোদিন, তাঁরাও হয়ত আছেন আমার দেহে—কোনো অণুতে, কোনো পরমাণুর ছন্দে। ন'দাদুরও আগে—তারও আগে যাঁরা ছিলেন বাংলাদেশের গাঁযে আর শহরে· তাঁরা সবাই কি তিলতিল ক'রে রক্ত-মাংস, হৃদয়-মন দিয়ে এই অপূর্ব শিল্পটি তৈরি করেননি, যার নাম দীপায়ন চৌধুরী!'

এই যে দূর-পরম্পরাগত ঐতিহাসিক 'আমি', তারই তো সংবাদ এই উপন্যাস। এই 'আমি'র উপস্থিতিই মনন-প্রধান উপন্যাসের মূল। তার কাঠামোও তাই আত্মচেতন,

আত্মবর্ণনে, আত্ম-আবিষ্কারে মগ্ন মননচর্চা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই তো সংলাপের পরেও সংলাপের ব্যাখ্যা, কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকেই জার্নাল। দীপায়নের জীবনীকার জার্নালের সূচনাতেই যেন তাঁর জীবনীগ্রন্থের এই প্রধান সূত্রটি জানিয়ে দিলেন। যে-ইতিহাস তিনি রচনা করতে চান, যাকে তিনি উপন্যাস বলেন, তার অবয়বটা কী হবে, তার শেকড় কোথায়, সেইসব সংবাদই জার্নালের এই প্রথম পাতায় প্রকাশ পায়। এ-তো আত্ম-আবিষ্কার। সময়ের মুখোমুখি, ইতিহাসের দর্পণে, পরম্পরায় নিজেকে চেনার তাগিদ। একজন দীপায়ন চিনে নেয়, জেনে নেয় নিজেকে, নিজের জার্নালে। কিন্তু এই জার্নালের রচয়িতা কি দীপায়ন ? কিংবা তার জীবনীকার অনিরুদ্ধ ঘোষাল ? ভুললে তো চলবে না, জীবনী ও জার্নাল দুই-ই এক ঔপন্যাসিকের রচনা। তিনি এই জীবনী গ্রন্থে, এই জার্নালে প্রতিষ্ঠা করেন সমষ্টিকে, ইতিহাসকে, সমাজকে, শুধু ঘটনা-পরম্পরায় নয়, মননে, আত্মীকরণে। উপন্যাসে তাই তাঁর প্রবল উপস্থিতি।

অথচ একটি চমৎকার কাহিনীসূত্র এই উপন্যাসকে একটি আলাদা মর্যাদা দেয়। দীপায়নের জার্নালেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। অনিরুদ্ধ ঘোষালের বলা কাহিনী তো আছেই। লক্ষ্য করার মতো যে, কাহিনী বিন্যাসে জীবনীকারের (তথা ঔপন্যাসিকের) ব্যাখ্যা তেমন নেই, নেই ঘটনার ব্যাখ্যা, যেমন আছে সংলাপের। যেমন : 'দীপায়নের ও-কথার প্রতিক্রিয়ায় আজ এই তত্ত্বই আবিষ্কার করেছি··' ; 'কিন্তু এ-ধরণের সব কথাই অনেকদিন পরেকার দীপায়নের—যখন সে বুদ্ধিজীবী' ; 'দীপায়ন বারবারই বলত তখন এ-কথা। ভাবত সব সময়। ফুটো বেলুনের মতো চুপসে-যাওয়া মনে হত নিজেকে ওর। যে পৃথিবীতে খানিকটা অস্তিত্ব ছিল আমাদের, তা নষ্ট হয়ে গেছে। আরেকটি পৃথিবী হয়ত জন্ম নেবে—তৈরি হও সে-পৃথিবীর জন্যে, তৈরি করো নিজেকে।' এইরকম উদ্ধৃতি এই উপন্যাস থেকে অনেক দেওয়া যায়। অনিরুদ্ধ ঘোষালের অন্যতম কর্তব্যই যেন দীপায়নের উক্তির ব্যাখ্যা করা। যতোটুকু দীপায়ন বলল, তার চেয়েও বড় তাৎপর্য আবিষ্কার করা। কারণ দীপায়নের জীবনী-কার তো শুধু দীপায়নের জীবনী রচনা করছেন না। তাঁর দায় যে আরো বেশি : 'আমার এমন মাথা-ব্যথা উপস্থিত হল কেন যার ফলে শ্যোভিয়ান ভঙ্গীতে রচনাটি ভূমিকা-সর্বস্ব হয়ে উঠতে যাচ্ছে ? কলম থামিয়ে পায়চারি করতে হ'ল খানিকটা, মন হাতড়ে দেখতে হ'ল কোন বোধ সেখানে কাজ করে চলেছে ! কিছু কি দেখা গেল ? দেখা গেল। দীপায়নকে দেখতে গিয়েই যে আজ আমি ১৯৩৮-কে দেখতে পাচ্ছি তা নয়, স্বাধীনভাবেই আমি আজ ১৯৫০-এ ১৯৩৮-এর ছায়াকে ভেসে উঠতে দেখছি।'

কে দেখছেন ? কাকে দেখছেন ? কী দেখছেন ? আশ্চর্য নয় কি যে এক তীব্র পুষ্ট আঙ্গিকের আয়নায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ, দীপায়ন, সময়, সমাজ এবং নিজেকে বারবার দেখছেন ? এই বিশিষ্ট আঙ্গিকটি বাংলা উপন্যাসে ব্যাপকভাবে তিনিই নিপুণ প্রয়োগ-প্রচলন করলেন বলা যায়। আঙ্গিকের এই দ্বান্দ্বিকতা সময়ের দ্বান্দ্বিকতার তরঙ্গে সুর মিশে যায়। দীপায়নের জার্নালে দীপায়ন নিজেকে দেখতে চায়, খুলে ধরতে চায় ; অনিরুদ্ধ অর ব্যাখ্যায় সে-দেখার বিস্তার দিতে চায় আবার এই

ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় থেকেও নিজেকেও যেন সে দেখে নেয় : 'দীপায়নকে দেখতে গিয়েই যে আজ আমি ১৯৩৮-কে দেখতে পাচ্ছি তা নয়, স্বাধীনভাবেই আমি আজ ১৯৫০-এ ১৯৩৮-এর ছায়াকে ভেসে উঠতে দেখছি। তৃতীয় মহাযুদ্ধের মেঘলা আকাশের ছায়া এ নয়, আমার মনেরই অস্বস্তির ছায়া। মনে হচ্ছে, সব ভেঙে পড়ছে, জোড়াতাড়া দিয়ে কিছুই আর খাড়া রাখা যাবে না —পৃথিবী রূপান্তর চায়, সামুদ্রিক রূপান্তর।' আশ্চর্য নয় কি যে, অনিরুদ্ধও ক্রমে কাহিনীর একটি বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে উঠছে ? একই ধরণে তো মাঝে মাঝেই দীপায়ন জার্নালের বাইরে এসে নিজেরই জীবনীকার হয়ে ওঠে, কাহিনী-বিন্যাস ক'রে চলে, উপন্যাসের এক-একটি পরিচ্ছেদ রচনা করে, যেমন 'সৃষ্টি' উপন্যাসের পরিচ্ছেদ (২৯)। এইসব পরিচ্ছেদে যেমন জার্নালের আত্মকথন ঘটে, তেমনি চলে কাহিনী-বিন্যাস।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য সতত সতর্ক ছিলেন যে, উপন্যাসটি যেন শ্যোভিয়ান ধাঁচে ভূমিকা-সর্বস্ব না হয়। তাই তার এই নতুন আঙ্গিক-অনুসন্ধান। ভূমিকা, ব্যাখ্যা, জার্নাল, জীবনীরচনা, সংলাপ ও কাহিনী-বিন্যাস —সব মিলিয়ে-মিশিযে এমন এক দ্বান্দ্বিক সমন্বয় তিনি ঘটান যে, বাংলা মনন-প্রধান উপন্যাসে এই আঙ্গিকটি বিশিষ্ট হয়েই রইল।

এই বিশিষ্টতা আমরা প্রথম আবিষ্কার করি 'সৃষ্টি'তে। সঙ্গত কারণেই আমি 'সৃষ্টি'র আঙ্গিক বিচারের সূত্রে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস-আঙ্গিক বিশদ করে বুঝে নিতে চেয়েছি। এই উপন্যাস থেকে উদাহরণ ও উদ্ধৃতি তাই অতিরিক্ত মনে হলেও নিরুপায় কেননা তা ইচ্ছাকৃত। 'বৃত্ত' উপন্যাসে 'মনোবাদী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষোন্মুখ সতর্ক-সচেতন কথাশিল্পীর অভিপ্রায় রুচি সুস্পষ্ট' হলেও যে আঙ্গিক 'সৃষ্টি'তে পূর্ণতা পায়, তা তখনও প্রযুক্ত হয়নি। 'কল্লোল', 'মৌচাক' ও 'রাত্রি'তেও না। এই উপন্যাসগুলিতে মনন-চর্চা থাকলেও কাহিনী-বিন্যাসই প্রধান, যে পদ্ধতি আবার ফিরে আসে শেষপর্বের উপন্যাস 'মুখোস' ইত্যাদিতে। ব্যতিক্রম 'প্রবেশ প্রস্থান'। নানা কারণেই আমাদের মনে হযেছে 'প্রবেশ প্রস্থান' 'সৃষ্টি'র পরিপূরক। 'সৃষ্টি'তে যে আবহ তিনি তৈরি করতে চেযেছিলেন, তাকেই আরো বহুব্যাপ্ত ক্যানভাসে ধরতে চেয়েছেন 'প্রবেশ প্রস্থানে।' যাতে দীপায়ন-অনিরুদ্ধ স্বয়ং লেখক-সহ আরো স্পষ্ট, আরো ইতিহাস-সচেতন ও 'ঐতিহাসিক' হয়ে ওঠেন। 'প্রবেশ প্রস্থানে' যেন উপন্যাসের চরম অভিব্যক্তি স্থির হয়ে গেছে। উপন্যাস তার বিষয়কে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছে। 'প্রবেশ প্রস্থান' তাই সমাপ্ত হয় এইরকম কয়েকটি বাক্যে : 'আমি সুদত্তকে এ-শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশ বলেই জানি। তা যদি কিছু বোঝায়, কোনো অনুভূতির জন্ম দেয় কারো মনে তাহলেই যথেষ্ট। ··সুদত্তর মত মুখ স্মরণ ক'রে আজ শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ও ওর অপাপবিদ্ধ অন্নাবির সত্তার যোগ্য করেই নিজ প্রকৃতি বা চরিত্রে বিভিন্ন দিক তৈরি করেছিল, চরিত্রগুলোর যোগ্য অভিনেতাও। সুদত্ত ওর সত্তাকে উন্মোচিত ক'রে, নিজেকে উন্মোচিত ক'রে রঙ্গালয় থেকে বিদায় নিয়েছে।'

এই যে উন্মোচন, এই যে বিভিন্ন চরিত্রে একজনের প্রকাশ বা একজনের বহুর,

কিংবা যেমন লেখক জানাতে চান একটি দেশের, বাংলাদেশের ও একটি সময়ের, এ-শতকের প্রথমার্ধের, উন্মোচনই অভীষ্ট ছিল। তাহলে একজনের একটি জার্নালেই তো তা উন্মোচিত হয় না ; আর হলেও তার নিজস্ব ভাষ্যই হয় সেটা। তাই সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর দ্বান্দ্বিক আঙ্গিকের যে-সূচনা করলেন 'সৃষ্টি'তে, যা 'বৃত্ত'-'কল্লোল'-'মৌচাক' অতিক্রমী আঙ্গিকের সারাৎসার, তাকেই আরো ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করলেন 'প্রবেশ প্রস্থানে'। অথচ যেন মনে হয়, 'সৃষ্টি'র আঙ্গিককে ছাপিয়ে 'মৌচাকে'র কাহিনীর পর্ববিভাগগুলো একটি অর্ধশতাব্দীর ধারাহিকতায় সম্পূর্ণতই কাহিনী-বিন্যাসে মুক্তি পেল। আপাতভাবে তা হলেও বস্তুতই অনিরুদ্ধর জীবনীরচনা, দীপায়নের জার্নাল ও মাঝে মাঝেই নানা পরিচ্ছেদে দীপায়নের নিজের ও সম্পর্কিত নরনারীর গল্প বলা 'প্রবেশ প্রস্থানে' ভিন্ন মাত্রা পায় অভি ও সুদত্তর পর্যায়ক্রমিক কাহিনী-বর্ণনায়। অভি গল্প বলছে, সুদত্ত-ও বলছে, সে-গল্পে আসা-যাওয়া করছে কতো চরিত্র, কতো ঘটনা এবং বাংলাদেশ ও অর্ধশতাব্দী। জার্নালেরই একটি নূতন রূপে যেন প্রকাশ পেল এই প্রত্যক্ষ-রূপে কাহিনীতে। 'সৃষ্টি'র আঙ্গিক পরিত্যক্ত হয় নি। সে-আঙ্গিক যেমন জন্ম নিয়েছিল 'বৃত্ত'-'কল্লোল'-'রাত্রি'-'মৌচাকে'র অভিজ্ঞতায়, 'প্রবেশ প্রস্থানের' ঐ পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা দীপায়নের জার্নালকে যেন সুদত্তর জীবন-বৃত্তান্ত করে তুলল। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উক্তি-উপলব্ধিতে যা বাংলাদেশ-বৃত্তান্ত।

'মৌচাকে' পর্ববিভাগ, 'সৃষ্টি'তে পরিচ্ছেদ ইত্যাদি, পরিত্যক্ত হল 'প্রবেশ প্রস্থানে'। এখানে ধারাবাহিকতা। অন্তঃস্থ বিষয়ই নির্ধারণ করল এই ধারাবাহিকতা। পৃষ্ঠা এক থেকে পাঁচ যদি হয় অভির কথা, পাঁচ থেকে চোদ্দ তবে সুদত্তর, আবার চোদ্দ থেকে একুশ অভি বলছে গল্প, যেমন সুদত্ত শোনাচ্ছে কাহিনী একুশ থেকে তেত্রিশ। এই রকম ক্রমপর্যায়। জার্নালের মতোই এই কাহিনী-বিন্যাস। 'সৃষ্টি'তে যেমন দীপায়নের কাহিনী স্ব-কথনে মাঝে মাঝেই জার্নাল থেকে বেরিয়ে পরিচ্ছেদে প্রবেশ করেছে, যেমন অনিরুদ্ধর দীপায়ন-জীবনী রচনা প্রায়শই আত্মকথনে মিশে গেছে, এখানে, 'প্রবেশ প্রস্থানে' অভি-সুদত্ত, একে-অনেকে, হয়তোবা দীপায়ন-অনিরুদ্ধও, এমন কি 'কল্লোলের' প্রতীপ কিংবা 'মৌচাকের' মিহির আর 'বৃত্তের' সত্যবান সবাই এসেছে এই 'প্রবেশ প্রস্থানের' জীবন-নাটকে, সময়ের ও দেশের মঞ্চে।

সম্ভবত 'বৃত্ত' থেকে 'প্রবেশ প্রস্থান' পর্যন্ত এক অনন্য সত্তার উন্মোচনই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অন্বিষ্ট ছিল। মনে হয় যেন তার উপন্যাসাবলীর মুখ্য চরিত্র একটিই, প্রকাশিত অনেক চরিত্রে। বিভিন্ন স্বতন্ত্র চেতনা প্রতিফলিত কোনো এক অখণ্ড চেতনায় —'প্রবেশ প্রস্থানে' যার পূর্ণতা-প্রাপ্তি। আর যেহেতু এই চেতনা স্বয়ং রচয়িতার, তাই সংলাপে, কাহিনীতে, জার্নালে, পর্ববিভাগে, পরিচ্ছেদে এবং পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক বিষয়-উন্মোচনে সেই চেতনাই বহু স্তরে প্রতিফলিত হয়। লক্ষ্যনীয় যে 'বৃত্ত' থেকে 'সৃষ্টি' হয়ে 'প্রবেশ প্রস্থানে' সমবেত নারী চরিত্রাবলীও এই উন্মোচনের সবিশেষ সহায়ক। নারী-চরিত্রেরা আলাদা ভাবে যেন উন্মোচিত হয় না, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। তারা স্পষ্ট ক'রে তোলে মৌল চেতনাকেই, মুখ্য একটি

চরিত্রকে. যা নানা চরিত্রে ধারাবাহিক বিকশিত। আর এই বিকাশ দেশ-কালের ব্যাখ্যায়। আর এই ব্যাখ্যা তাৎপর্যান্বিত করার কর্তৃত্ব স্বয়ং রচয়িতার, আধুনিক বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের।

তাই সদর্থেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য বাস্তববাদী-চেতনাশ্রয়ী 'রোম্যাণ্টিক' শিল্পী। তাঁর বাস্তববাদ সময়-সমাজের বীক্ষায় অর্জিত ; রোম্যাণ্টিকতা সেই বীক্ষার আলোকে যথার্থই ভবিষ্যৎমুখী : আর সবই এক মৌল-স্বতন্ত্র যুক্তি-শৃংখলায় সুনির্দিষ্ট। এই বিশেষত্ববাদী আত্মসচেতনতার উদ্ভাবন নিশ্চিতই দাবি করে এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত যুক্তির শৃংখলাকে। তাই তাঁর অনুসৃত আঙ্গিক আকস্মিক কিছু নয়, অন্যমনস্ক তো নয়ই। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই সচেতন শিল্প-দৃষ্টি তাঁর উপন্যাসের সীমা অতিক্রম করে অনায়াসেই পেঁৗছে যায় ইতিহাসে, ইতিহাসবোধের অনিবার্য যুক্তি-শৃংখলায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। 'সৃষ্টি ঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং ১৩৬৩।
২। মৌচাক ঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কথাকলি, ১৩৫৭।
৩। প্রবেশ প্রস্থান ঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সম্বোধি পাবলিকেশন, ১৯৬৬।
৪। কল্লোল ঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পূর্বাশা, ১৯৪৭।
৫। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ঃ জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী, সরোজ দত্ত, বাগর্থ, ১৯৭২।
৬। দেশ কাল সাহিত্য ঃ নিখিলকুমার নন্দী, নবপত্র, ১৯৮৪।
৭। পূর্বাশা (পত্রিকা) নবপর্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় থেকে সপ্তম সংখ্যা।
৮। পূর্বপত্র (পত্রিকা) দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা / ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ সৌমেন সেন।

শংকর চক্রবর্তী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : অন্তর্মুখিনতাই প্রথম

উপন্যাসের লক্ষ্য মানবজীবনকে সমগ্রভাবে দেখা। সেই জীবন যা শুধু বাইরের রূপের পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হয়না, মানুষের অন্তরালবর্তী যে মানুষ তাকে বিচিত্র পরিবেশের প্রেক্ষাপটে রেখে তার নানা অন্তরঙ্গ স্বরূপের পরিচয় উদ্ঘাটন করে বিচিত্র আঙ্গিকে। উপন্যাসের স্রষ্টা যেহেতু মানুষ, সেই হেতু সৃষ্টিকর্মের পার্থক্য ধরা পড়ে ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুসারে। তাই একই যুগে, একই পরিবেশে বেড়ে-ওঠা দু'জন লেখকের রচনা ভিন্নতা পায়। তবে সমাজকে, বিশেষ সময়কে, হয়ত বা কখনো কখনো প্রচলিত মূল্যবোধকে পুরোপুরি অস্বীকার করা কোন লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয় না নানা কারণে।

বাঙলা উপন্যাসে সময়ের নানা বাঁকে পরিবর্তন এসেছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক রোমান্স-সর্বস্ব যে জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছিল, এমন কি সামাজিক উপন্যাসের যে বিষয়বস্তু পাঠকের গোচরীভূত হয়েছিল তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল তাঁরই সময়ের অন্যতম বাস্তব-সচেতন ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য়। রবীন্দ্রনাথে ব্যক্তিমানসের সর্বাঙ্গীন মুক্তি, ব্যক্তিমানসের মধ্যের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেল . শরৎচন্দ্রে নারীমুক্তি, মধ্যবিত্ত জীবন-সঙ্কট প্রধানতম বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেও চিরন্তন মানব প্রকৃতির মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ও আকর্ষণ আছে তাকেই মেনে নেওয়া হ'ল মধ্যবিত্ত মানসিকতায়। যদিও কোন বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে কিংবা সংগ্রামী চেতনায় সে সাহিত্য আলিপ্ত হতে পারলো না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট কোন খণ্ড গণ্ডির মধ্যে মানুষকে রেখে চিহ্নিত করার প্রয়াসকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালো এবং এই প্রথম সামগ্রিকভাবে বিশ্ব মানবিক সমস্যার দিকে আমাদের লক্ষ্যকে নিয়ে যাবার সুযোগ ঘটালো। পুরাণো মূল্যবোধ ঝরে পড়ল জীর্ণ পাতার মতো। পুরাণো চিন্তা, পুরাণো সমাজ, পুরাণো বিশ্বাস সব কিছুকেই জলাঞ্জলি দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন, অনীকেত, অবয়বহীন বিশ্বাসের ওপর ভর করে অতঃপর সাহিত্য রচিত হতে লাগলো।

এই সময়ে যাঁরা সাহিত্য-রচনা শুরু করলেন তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক সমাজের একান্ত বাস্তব, স্থূল জীবনের ডকুমেন্টারীকেই উপন্যাসের আওতায় এনে রূপ দিতে চাইলেন। অন্য দল বাস্তব সমাজের স্থূল স্বরূপকে এড়িয়ে কিংবা অস্বীকার করে এক স্বপ্নকল্পনার জগতে পাড়ি জমালেন যেখানে নির্মিত হ'ল আশ্চর্য এক মায়া-জগৎ যা মানুষের মনকে অতি সহজেই খুশি করতে পারে। এই পর্যায়ের উপন্যাসকে সামগ্রিক ভাবে প্রভাবিত করেছে যুদ্ধ ছাড়াও ফ্রয়েডীয় মতবাদ এবং রুশ-বিপ্লবোত্তর নতুন জীবনের বাস্তবগ্রাহ্য বিশ্বাসের জগৎ যা মার্কসীয় দর্শনের ছত্র-চ্ছায়ায় নিজেকে বিকশিত করে তুলেছে পরবর্তী বিশ্বব্যাপ্ত চিন্তাধারাকে। আর মাত্র কুড়িটি বছরের ব্যবধানে সংঘটিত হ'লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভার্সাই সন্ধির চুক্তির মধ্যেই ছিল যার সুপ্ত বীজ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে একের পর এক নেমে এল নানা আঘাত— দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ৪২-এর ভারত-ছাড়ো আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা এবং সর্বব্যাপ্ত এক অমানুষিক সংকট যা উপন্যাসের বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, আঙ্গিক ও মূল্যবোধ—সব কিছুকে পাল্টে দিল নির্মম অবহেলায়! নিতান্ত অলস যে, কিংবা উদাসীন তাকেও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নেমে পড়তে হ'ল। ভবিষ্যৎ এক বিপুল অন্ধকারে আলিপ্ত, ছন্নছাড়া বর্তমান অবস্থা যা আর কোনদিন আমাদের সমাজে এভাবে আসেনি বলেই জানি। বলা যায়, এ'এক বিরাট সংকট যা মানুষকে, মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার বাসনাকে চ্যালেঞ্জ করে কিংবা অস্তিত্ব রক্ষার নিদারুণ সংকটের মধ্যে মানুষকে ফেলে দিয়ে অন্য আর সমস্ত চিন্তাকে বিপন্ন করে তোলে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে আমরা দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে কিংবা সামান্য পরে কিছু বলিষ্ঠ ঔপন্যাসিককে পেয়েছি কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই সমাজ ও জীবনকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন নি বলেই একধরণের স্থূল পাঠক-ভুলানো উপন্যাস পাওয়া গেছে যা কোন কিছুকেই সমগ্রভাবে দেখতে কিংবা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। একেই বলা যেতে পারে সাহিত্যের সংকট। তবে কম হলেও জগদীশ গুপ্ত এবং আরও বেশি করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যা পাওয়া উচিৎ তার একটা যথার্থ হদিশ হয়ত পাঠক পেয়ে থাকবে। এই সময়ে কিংবা কিছু আগে পরে অনেক ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন যাঁদের লেখার বেশ কিছু অংশই যথার্থ সাহিত্য হিসেবে বেঁচে থাকবে। কিন্তু মহৎ সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন স্বীকৃতি, রচনার সংখ্যার তুলনায়, বড়োই নগণ্য বলে গণ্য হবে।

উপন্যাস রচনার কোন উদ্দেশ্য থাকে কিনা, কিংবা পাঠকের মনের কি ধরণের চাহিদা সে পূরণ করে থাকে সে সব কূটতর্কে না-গিয়েও বলা যায় উপন্যাসের অন্বেষার বিষয় বিচিত্র মানব-জীবন- সে মানুষ সৎ কিংবা অসৎ, উদার কিংবা নীচ সে প্রশ্ন অবান্তর—পাঠক চায় মানব জীবনের সত্যরূপ কিংবা আরও স্পষ্ট ক'রে বলা যায় সমগ্র স্বরূপ। সাহিত্যের ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে কখনো কোনো একজন লেখক সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় এই দুরূহ শিল্পকর্মকে সার্থক ভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কখনো বা এক ঝাঁক লেখক জীবনের বিচিত্র স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করেছেন বিভিন্নভাবে। তাঁদের মধ্যে আদর্শের, জীবন ভঙ্গীর, দেখার চোখের পার্থক্য থাকে সে বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় যে ফসল উৎপন্ন হয় তার মধ্যেই সেই বিশেষ যুগের মানসিক পরিচয় নিহিত থাকে।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ঔপন্যাসিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন ধারা নয়। এবং এই লেখক এমন মারাত্মকভাবে আত্মকেন্দ্রিক যে তাঁর নিজস্ব জগতের চৌহদ্দির বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিচার কিংবা উপলব্ধি করতে যাওয়া ব্যর্থতারই নামান্তর। অথচ তাঁর 'বারো ঘর এক উঠোন'র মতো উপন্যাস না-থাকলে হয়তো তাকে খুব বড়ো মাপের ঔপন্যাসিক বলে মেনে নিতে অনেকেই দ্বিধান্বিত হতেন, কারণ তখন 'মীরার দুপুর' কিংবা 'নীলরাত্রি' ছাড়া বলার মতো কোনো

উপন্যাস হয়ত আর অবশিষ্ট থাকতো না, তাঁকে শক্তিশালী কোনো ছোটগল্পকার বলেই তখন চিহ্নিত করা হোতো। বস্তুতঃ তাঁর অনেক উপন্যাসকেই ছোটগল্পের বিস্তারিত রূপ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ দেখে যে একথা বলা হচ্ছে তা' নয়, তাহলে তো হেমিংওয়ের 'The old Man and the Sea' অলবেঅর কামুর 'Outsider' উপন্যাসকে উপন্যাসই বলা সম্ভব হোতো না।

উপন্যাস বিশিষ্ট শিল্পকর্ম তাই তার বিচারে তিনটি বিষয়ের ওপর নজর দিতেই হয়। যথা—১. লেখক কোন পদ্ধতিতে জীবনকে দেখেছেন। ২. জীবন থেকে তাঁর গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়টি কি? এবং ৩. তাঁর সমস্ত বক্তব্য কোন নৈতিকবোধকে প্রকাশ করে? এবং এই তিনটি বস্তুই একই মতবাদে বিশ্বাসী দু'জন লেখকের লেখাকে পৃথক করে। তাই উপন্যাসের শিল্প-কর্মের বিচার শেষ পর্যন্ত লেখকের মানস-বিচারে পর্যবসিত হতে বাধ্য। লেখকের মনোভঙ্গীই (attitude twords life) তঁর চালিকা-শক্তি যা গল্পের কাহিনী বয়নে, চরিত্র সৃষ্টিতে, ভাষা নির্মাণে এবং জীবন-দর্শনে বিলক্ষণ অনুভূত হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম স্মরণীয়। তাঁদের উপন্যাসগুলি মূলত রচিত হয় সমকালীন কলকাতার অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পটভূমিতে। এ সময় পারিবারিক সম্পর্ককে আরও বেশি জটিল করে তুলল অর্থনৈতিক নানা সমস্যা। সতীত্ব-মাতৃত্ব-নারীত্ব প্রভৃতিকে এতকাল যে শ্রদ্ধার মূল্য দান করা হোতো, সেগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে লাগল চোখের সামনে। ধীরে ধীরে সমাজ সহ্য করে নিল নারীর দেহগত শুচিতার বিনষ্টিকে। এখন আচরণ সীমা বলে অন্তত আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। 'মীরার দুপুর' উপন্যাসে নায়িকা অভিসার যাত্রা করেছে বার বার এবং অক্ষম স্বামীকে সব কিছু মেনে নিতে হয়েছে মুখ বুজে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকে আত্মহত্যার দ্বারাই জীবনের জ্বালা জুড়াতে হয়েছে। এমন কি 'বারো ঘর এক উঠোনে'র শেষ দিকে শিবনাথের স্ত্রীর শৈথিল্যকেও মেনে নিতে হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল', 'মোমের পুতুল' (সুধার শহর) প্রভৃতি উপন্যাসে নানামুখী ভাঙনের ব্যবহাব দেখা যায়। অবক্ষয়ের মুখোমুখি বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনের বিশ্বস্ত রূপকে তিনি ব্যবহার করেছেন নিপুণ ভাবে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আবির্ভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার দু'বছর পূর্বে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে। সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২১-৮৫), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯২৬-৭৫) ছিলেন তাঁর চাইতে বয়েস অনেক ছোট। এমনকি কমলকুমার মজুমদারও তাঁর তিন বছর পরে জন্মেছেন। বছরের দিক দিয়ে বিচারে তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি দুটি বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী তাবৎ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী। এই সময় সীমায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে বেশ কয়েকজন নামকরা লেখকের আবির্ভাব হয়েছে যঁারা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের স্মরণীয় রূপকার। তারাশংকর,

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব প্রমুখ লেখকদের বিপুল সাহিত্যকর্ম তাঁর মনে কোনো গভীর আলোড়ন তুলেছে বলে মনে হয় না —তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রভাব যে তার ওপর গভীর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ ক'রে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে তার রচনায় ডি. এইচ. লরেন্সের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। অলবেঅর কামুও হয়তো তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে থাকবেন একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতি বিষয়ে। স্বীকার করতেই হবে যে এই প্রভাব তাঁর ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে কিছু সহায়তা করলেও তার স্বকীয়তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। ধীরে ধীরে নিজস্ব পথকে তিনি আবিষ্কার করেছেন নানা অভিজ্ঞতার নিরিখে।

লেখককে বুঝতে গেলে তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ তার নিরিখেই লেখকের ব্যক্তিসত্তার জাগরণের প্রকৃত হদিশ মেলা সম্ভব। তার জন্ম অবিভক্ত বাংলা দেশের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়ায়। কর্ম —সাব-এডিটর যুগান্তর পত্রিকা, (১৯৩৬), জে. ডবলিউ টমসন কোম্পানীতে (১৯৪০), পরে কিছুদিন 'জনসেবক' ও কিছুদিন 'আনন্দ বাজার পত্রিকায়'।

সাধারণ গ্রাম্য শিশুদের শৈশব যেভাবে কাটে তার জীবন সেভাবে অতিবাহিত হয়নি কারণ শৈশবের দামালপণা, খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ কিংবা যাত্রা, মেলা বা এই ধরণের কোনো অনুষ্ঠানের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাঁকে টানতো নির্জন শান্ত প্রকৃতি, পুকুর ঘাট, শব্দহীন জনহীন দীর্ঘব্যাপ্ত পথ কিংবা মাথার ওপর ডানামেলা লাল টকটকে আকাশ। বিরলবাক, আত্মমগ্ন, নিঃসঙ্গতা প্রিয় এক আলাদা জাতের মানুষ ছিলেন তিনি।

তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল গন্ধের প্রতি একটা সদাজাগ্রত আগ্রহ। ধানের গন্ধ, ঘাসের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, পোকামাকড় আর পাখির গায়ের গন্ধ তাকে পাগল করেছে সারা জীবন। তার রচনায় আর আছে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, রূপের প্রতি সুগভীর তৃষ্ণা। গন্ধ-স্পর্শ-বর্ণ ও সৌন্দর্য তার উপন্যাসে বারবার সাড়া তুলেছে। কিন্তু সব কিছুই মনের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর রঙে রঙীন হয়ে এসেছে তার রচনায়। এইভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে তার লেখক সত্তা। তিনি বিশ্বাস করেন, "একটা মানুষের জীবনে সাহিত্য-রচনা, শিল্পসৃষ্টি কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একটু একটু করে সে গল্পলেখক হয়ে ওঠে, ঔপন্যাসিক, কবি বা চিত্রকর হয়ে ওঠে। বিন্দু বিন্দু ক'রে তার রক্তে শিহরণ সঞ্চারিত হয়।" [আমার সাহিত্য জীবন, আমার উপন্যাস।]

আলোচ্য ঔপন্যাসিকের রচনায় প্রকৃতির প্রভাব বড়ো বেশি। বস্তুত প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাঁর উপন্যাসের নারীর রূপ বর্ণনা অসম্পূর্ণ। তাঁর প্রকৃতির বর্ণনা পাঠ করতে করতে পাঠকের বিভূতিভূষণ অথবা জীবনানন্দের কথা মনে পড়বে, কিন্তু সে প্রকৃতি উদার উন্মুক্ত ও দিগন্তব্যাপ্ত পল্লীপ্রকৃতি নয়, আধুনিক শহরের আশে-পাশে, অনভিজাত জীবনের কাছাকাছি এখনো যে গাছ-পালা, ঝোপ-জঙ্গল, পুকুর বা

কুযোতলা দেখতে পাওয়া যায়, তাদের রূপ রং গন্ধ স্পর্শ তাঁর একাগ্র দৃষ্টিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ-ছাড়াও আছে সেই মানুষগুলির পরিচয় যারা অধিকাংশই বিপন্ন, বিপর্যস্ত ও অবক্ষয়িত সমাজের মানুষ। যারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অনিবার্য অন্ধকারে ক্রমেই নীচে নেমে যাচ্ছে উপায়হীন, দুঃসহ, অস্তিত্বহীন এক অসহায়তার শিকার হয়ে !

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁর মতো লেখকের পক্ষে তা' লেখা সম্ভবও নয়। কারণ শুধু কি লিখব নয়, কেমন করে লিখব সে চিন্তাও অহরহ তাঁকে আলোড়িত করেছে। ভেবেছেন অনেক, যা লিখেছেন তাকে বারবার নির্মম ভাবে কাট-ছাঁট করেছেন আবার নতুন করে রূপ দিয়েছেন। সে ভাঙাগড়ার কর্মশালার কাজ অনেকটাই নিজের মধ্যে, একান্তে সাধিত হয়েছে। তাই তাঁর রচনায় একটি শব্দও অবান্তর নয় বরং অনিবার্য।

লেখকের প্রতিটি উপন্যাস খতিয়ে দেখা, কিংবা চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য প্রবন্ধের ক্যানভাস পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু তাঁর প্রতিভাকে বোঝবার পক্ষে যে গ্রন্থগুলি অপরিহার্য তাদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটিকে এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছি। হয়ত তার মধ্যে দিয়েই মোটামুটি ভাবে তাঁর নির্মাণ কর্মের একটা পরিচয় ধরা পড়বে যাকে বলা যায় লেখকের বিশ্বস্ত ও সত্য স্বরূপের উদ্ঘাটন !

তাঁর কয়েকটি ছোট উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বসন্ত রঙিন', 'নীলরাত্রি' ও 'হৃদয় জ্বালা'। এই তিনটি উপন্যাসেরই শেষের দিকটায় একটা নাটকীয়তা আছে এবং বক্তব্যের মধ্যে খুব একটা অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায় না। 'বসন্ত রঙীন' উপন্যাসে শহরের যান্ত্রিক যন্ত্রণা, অজস্র মানুষের ভীড় আর নিথর অন্ধকারে গুমরে-মরা এক বারবনিতাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সম্পন্ন চাষী মুকুন্দ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে। সেখানে সে সবকিছু দিয়ে ভরিয়ে তুলতে চায় রেবতীর জীবন। রেবতী মুকুন্দের মধ্যে খুঁজে পায় দেবতাকে। প্রথম স্বামী মারা যাবার পর একমাত্র ছেলেটাকে নিয়ে শুধু মাত্র দেহ দিয়ে রোজগার করে সে দুর্বিষহ জীবন কাটিয়েছে। তারপর ছেলেও মারা গেল একদিন।

বয়স যখন চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই, তখন এই মর্যাদার আসনাম মুকুন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায়। কিন্তু এই মনোভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় না। ঘটনাচক্রে সে জানতে পারে যে মুকুন্দর প্রথমা স্ত্রী একজন রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। মুকুন্দর দাবী সে প্রথমা স্ত্রীর সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে সে বিরাট বিরাট সিন্দুকগুলি রয়েছে সেগুলির দিকে তাকিয়ে তার সন্দেহ গাঢ় হয়। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে মুকুন্দ তাকে পুতুল বানিয়ে রাখতে চায়, এমন কি তার গতিবিধির ওপরেও আছে এক অদৃশ্য বাধা। রেবতীর আড়ালে সিন্দুকগুলি সরিয়ে ফেলতে তার মনে সন্দেহ আরও গভীর হয়। হাহাকার করে ওঠে তার মন। মুকুন্দর আচরণে সে বিরক্ত হয়, আঘাত পায়। ঠিক এমনি একটি মুহূর্তে তার জীবনে সত্যিকারের ভালোবাসা আসে। এই প্রথম প্রায় তার পুত্রের

বয়সী সতেরো বছরের এক যুবকের প্রেমে সে অভিভূত হয়ে যায়। এই প্রথম এত বছরের নানা পুরুষের সঙ্গ-পাওয়া রেবতীর সমগ্র সত্তায় ছড়ালো আগুন. "রেবতী লজ্জিত হ'ল। আবার স্তম্ভিতও হ'ল। অদ্ভুত এক জীবন তার। বেঁচে থাকলে তার হাবুল ঠিক এতবড় ছেলে হোতো। এমন সুন্দর একটি কিশোর। আর এই কিশোর কিনা তার রক্তে ঝড়ের মাতন তুলল। রেবতী। হুঁ রেবতী এখন বুঝলো, রাখালের কাছে এই প্রথম শিখলো ভালোবাসা কি, উন্মাদনা কি? মোহ কাকে বলে, কেমন করে একটি পুরুষ একটি মেয়েকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।" মুকুন্দর মনেও একটা সন্দেহ জেগেছিল রাখাল সম্পর্কে। তাই রাখালের সঙ্গে রেবতীকে শিবতলার মেলায় যেতে দিতে সে নারাজ। এবং এই প্রথম উপলব্ধ সত্য কথাটা সে মুকুন্দকে শোনায়, "আমি যা' ছিলাম, আমি যা আছি সেই চোখ নিয়ে, সেই মন নিয়ে তুমি আমায় দেখছো, সে রকম ব্যবহার করছ, আমাকে একচুল বেশি সম্মান দিচ্ছ না." আরও স্পষ্ট করে বলে, "আমি রাস্তার বেশ্যা ছিলাম, এখন তোমার হয়ে আছি। রক্ষিতার সঙ্গে মানুষ যে ব্যবহার করে তুমিও তাই করছ।"

আশ্চর্য। সেই বিরাট সিন্দুকগুলির চাবি মুকুন্দর কাছে নেই. আছে বলাইয়ের কাছে। কিন্তু চাবি না নিয়ে আসা পর্যন্ত মুকুন্দর রেহাই নেই। তাই কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য পথে এসে নামে রেবতী। মুকুন্দ পথ আগলে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু পারে না। রেবতী আজ তার অধিকার কতটুকু তা' দেখতে চায়। তাই পুনরায় বাড়িতে ফিরে যেতে হয় মুকুন্দকে। আর এদিকে, "একটা আতঙ্ক নিয়ে, বিমূঢ় দ্বিধা নিয়ে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রেবতী কাঁপতে লাগল অজানা আতঙ্কে। আর ঠিক তখনই হাতে জামায় রক্ত মেখে এত বড়ো একটা চাবির গোছা আঙুলে ঝুলিয়ে মুকুন্দ হাসতে হাসতে তার সামনে এসে দাঁড়ালো! রেবতীর মনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও ক্রমবিবর্তনের ধারাগুলি লেখক এত নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন যার তুলনা মেলা ভার। ছোট চরিত্রগুলির মধ্যে রাখাল, বলাই প্রমুখ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

'নীলরাত্রি' উপন্যাসের নায়ক বিপত্নীক নীরদ। বাড়িতে তার পঙ্গু ছেলে বাবু। হরির মা নামে এক বৃদ্ধা তার দেখা-শোনা করে। নায়িকা মালা স্বামীর প্রচণ্ড অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের সংসার ছেড়ে ভাইয়ের সংসারে এসে উঠেছে। বৌদি রমলা স্কুলে পড়ায়, দাদা প্রফুল্ল চাকরি করে। কাজেই সংসারের যাবতীয় কাজ তাকেই করতে হয়, মায় বৌদির কোলের ছেলেটা দেখা পর্যন্ত। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে নীরদের গোপন প্রণয় জমে ওঠে। রাতের অন্ধকারে চলে অভিসার। মালা তাকে বিয়ে করতে বলে। কিন্তু নীরদ জানায় এখনো সময় হয়নি, প্রতীক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে একদিন মালার স্বামী মানিক তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসে। কিন্তু মালার দাদা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। তবে রমলার পরামর্শে শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল চিঠি লেখে মানিকের কাছে মালাকে নিয়ে যেতে। মালা শেষ বারের মতো নীরদের কাছে জানতে চায় সে তাকে বিবাহ করবে কিনা ব্লাউজের তলায় বিষের

পুরিয়া লুকিয়ে নিয়ে। এবং নীরদের কথায় বুঝতে পারে আসলে সে কাপুরুষ, অপদার্থ। তাকে গ্রহণ করার মতো সামর্থ তার নেই ইচ্ছাও নেই। শেষ পর্যন্ত মালাকে স্বামীর কাছেই ফিরে যেতে হয়।

লেখক নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মালার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। নীরদের মতো তথাকথিত কাপুরুষদের মনের আসল নোংরা চেহারাকে উদ্ঘাটিত করেছেন অসীম সাহসে। কোন তথাকথিত নীতি সামাজিক শৃঙ্খলা, কিংবা স্থূল ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া না করে নারীর জীবনের অসহায়তার স্পষ্ট চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষতায়। নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেখক নারীর জীবন যে এখনও পুরুষের কাছে পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়, তা বুঝিয়ে দিতে ভোলেন নি। ঠিক মালার মতোই নির্মম উপেক্ষার শিকার মিসেস ভৌমিকের মতো শিক্ষিতা মহিলারাও মি. চ্যাটার্জীদের মতো পুরুষদের হাতে। এই উপন্যাসের ঘটনা সংস্থাপন পরিবেশ পরিকল্পনা সংলাপ সংযোজন সবই অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির উদাহরণ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

'হৃদয়-জ্বালা' উপন্যাসের নায়ক রুদ্রনাথ ব্যাঙ্ক থেকে আট হাজার টাকা চুরি করে তার বন্ধু নীলমণি ডাক্তারের কাছে জমা রেখেছে যার থেকে সে মাঝে মাঝে কিছু নেয়। চুরির দায়ে তার চাকরি গেছে তাই তাকে এখন মিষ্টির দোকানে খাতা লিখে রোজগার করতে হয়। রুদ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী কমলা তার অত্যাচারে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে মেয়ে বকুল পালিয়েছে এক গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে ছেলে ভোম্বল পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছে। এরপর একাকীত্ব ঘোচাতে সে আবার নিতান্ত অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনেছে। বসন্ত রঙিন' উপন্যাসের নায়িকা রেবতীর মতো রুদ্রনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী মালতী ছুতোর মিস্ত্রী মধুর সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত হয়েছে। গভীর রাতের অন্ধকারে ছাগল ঘরে তাদের মিলন হয়। মালতী মধুর সঙ্গে গৃহত্যাগেও প্রস্তুত হয়। ঠিক এই সময় নীলমণি ডাক্তার রুদ্রনাথের গচ্ছিত টাকা দিতে অস্বীকার করলে সে লোহার রড মাথায় মেরে তাকে মেরে ফেলে এবং টাকা ও সোনাদানা নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরে আসে। পূর্বে যে চুরির কথা গোপন করেছিল বলে মালতী তাকে ঘৃণা করত এবার কিন্তু মালতী খুশিই হল। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে এই প্রথম মালতী তার বুড়ো স্বামীর বুকের কাছটিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল খুশি মনে। মধু দরজায় টোকা দিলেও সে না শোনার ভান করে শুয়ে রইল। মেয়েদের মনোভাব যে কত দ্রুত পাল্টায় এবং কি বিচিত্র ও রব তার মনের গতি হয়তো লেখক সেই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। এখানে প্রেম নয় সম্পদই মালতীর ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বলেই দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু তার মানসিক পরিবর্তনের যথার্থ কারণ বিশ্লেষিত না হবার ফলে পরিণতি যেন হঠাৎ এসে পড়েছে বলে মনে হয় পাঠকের মনকে অপ্রস্তুত করেই।

'মীরার দুপুর' উপন্যাসটির রচনা করার পর বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপস্থিতি স্থায়িত্ব লাভ করল। কারণ লেখকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সমস্ত লক্ষণ এই উপন্যাসটিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হোলো।

তেইশটি বসন্ত নির্বিঘ্নে পার করে আসা সুন্দরী মীরাকে নিয়ে এই উপন্যাস। অধ্যাপক স্বামী হীরেনের সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান এবং রূপের পার্থক্য অনেক। মীরা ফিটফাট, গোছাল, হীরেন ঠিক তার উল্টো। হীরেন এখন চারদেয়ালের কারাগারে বন্দী। অপারেশন হয়েছে, চাকরি গেছে। কতকাল ঘরে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে তার কোন স্থিরতা নেই। মীরাকেই সব ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে, তা' ছাড়া চাকরির উমেদারীও।

কলেজে পড়ার সময় সাহিত্যের ওপর হীরেনের প্রবন্ধগুলি পড়ে মীরা তার প্রেমে পড়েছিল। তারপর তাদের বিয়ে হ'ল! বিয়ের আগে কত ছেলেই তো ছিল তার রূপ-মুগ্ধ। হীরেনের চাইতে অবস্থাও তাদের অনেক ভালো ছিলো। স্বামীর চাকরি যাবার পর যেভাবে তাদের সংসার চলছে, সেভাবে নিদারুণ কষ্টে তাকে দিন চালাতে হত না। তাছাড়া শুধুমাত্র ধারের ওপর নির্ভর করে অনিশ্চিত জীবন-যাপন করার বিড়ম্বনা যে কী ভীষণ মীরা তা' পদে পদে অনুভব করেছে।

চাকরি যাবার পর ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে বাস করে এক ধরনের অসুস্থ মানসিকতার শিকার হয়েছে হীরেন। স্ত্রীকে সে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। এমন কি চাকরি পাবার পরেও মীরা মনের ধিক্কারে সে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

পাশেই থাকে শিল্পী মৃগাঙ্ক, যে সব সময় মীরার দেহের প্রশংসা করে। বলে মীরা আধুনিক সুন্দরী। শিল্পীর কাছে তার দেহভঙ্গীমার একটা গভীর আবেদন আছে! হীরেন তাই মৃগাঙ্ককেও সন্দেহের চোখে দেখে। মীরা ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে বেপরোয়া। বন্ধু অমরেশ তাকে সান্ত্বনা দেয়। অনেক টাকার চেক লিখে দেয় যাতে সে স্বামীর সেবা করতে পারে ঘরে বসে। স্বামীও মানসিক শান্তি লাভ করে যাতে দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারে। যদিও অমরেশ স্বীকার করে এ-ভাবে বাচা সম্ভব নয় কোন মানুষের পক্ষে! অমরেশ সেই ধরনের মানুষ যারা জীবনে কখনো ভালো রেজাল্ট করেনি, মনে কোনো উচ্চাশা পোষণ করেনি, বিয়ে করতে চায় না। অন্ততঃ হীরেনের মতো তার মধ্যে কোন ব্রিলিয়েন্স নেই। তবুও অমরেশ চরিত্রকে বাস্তব বলতে বাধে। বিনা দ্বিধায় তার এই ঔদার্য মেনে নিতে কষ্ট হয়। নিশ্চয়ই কোন একটা কারণ কোথাও অবশ্যই আছে। অন্ততঃ এই জাতীয় চরিত্রকে বাস্তব বলতে সঙ্কোচ স্বাভাবিক।

কিন্তু 'মীরার দুপুর' উপন্যাসের শেষটা যেন হঠাৎ এসে পড়া নাটকীয়তায় বিহ্বল। অন্ততঃ আগের অংশের মতো ধীর বিশ্লেষণে আকীর্ণ মনের অন্তর্গহন-চিন্তার শ্লথ গতিত্ব সেখানে নেই। শিল্পী মৃগাঙ্কের পকেটমার হিসাবে ধরা পড়া, কাগজে বেরুনো খবরের মধ্যে মীরার তাকে স্বামী বলে ছাড়িয়ে আনা, ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে হীরেনের আত্মহত্যা, পুলিশকে বোঝাতে মৃগাঙ্কের পরামর্শে মীরার স্বামীর সমস্ত প্রেশকিপসান রেডি রাখা —সবই যেন একটা দ্রুত, নাটকীয় অনেকটাই জোর করে আনা পরিণতি যা উপন্যাসটিকে কোন যথার্থ লক্ষ্যে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় না। তবে চরিত্রের মনঃস্তত্ত্ব বর্ণনার গভীরতা ও রং-এর প্রয়োগ, প্রকৃতিকে

অভ্রান্তভাবে কাজে লাগানোর নৈপুণ্য অবিস্মরণীয় শিল্পকর্মের পরিচায়ক। সম্ভবত এই উপন্যাসটিই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে স্মরণীয় ঔপন্যাসিকের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। আসলে এ এমন একটা সমাজের, এমন একটা সময়ের কাহিনী, এমন একটা পরিবেশে গড়ে উঠেছে যা বিপন্ন এক সময় ও মানুষকেই চিহ্নিত করেছে, যে মানুষেরা কোথাও স্থির কিংবা নিশ্চিত হতে পারে না।

১৯৭১ সালে প্রকাশিত 'সূর্যমুখী' উপন্যাসের পটভূমি মফঃস্বল শহর। ট্রাম বাস ছাড়া সেখানে সব কিছুই আছে। এমন কি শহরে যা নেই, সেই নির্জনতা! যোগীন ডাক্তার গড়ে ওঠা এই শহরের সব কিছুকেই ভালো চোখে দেখেন। তাঁর খুবই পছন্দ আধুনিক জীবনধারা, ছেলে-মেয়েদের অবাধ জীবন, মেলামেশা। কিন্তু উকিল অটল-বাবুর কাছে এই অন্ধ আধুনিকতার সব কিছুই প্রশংসার যোগ্য নয়। আধুনিকতার বাইরের চাকচিক্য ও আপাত ভদ্রতাবোধের আড়ালে রয়েছে ভাঙনের বীজ সমাজের বন্ধনকে আলগা করে দিয়ে একটা অবক্ষয়ের দিকে তাকে ঠেলে দেওয়া যা সত্যিকারের অগ্রগতির সহায়ক নয়। অটলবাবুর শিক্ষিত পুত্র নিশানাথই এই উপন্যাসের নায়ক। সে সাজে-পোশাকে, আদব-কায়দায় আলট্রা মডার্ণ যুবক। তার কাজ ক্লাব, পার্টি অভিনয়ের রিহার্শালের আড়ালে ব্যবসায়ী নিরঞ্জন রায়ের জন্য নারী পাঠানো। তার জন্যেই তার ব্যাঙ্কের চাকরি, বড়ো পদপ্রাপ্তি। স্কুলের নবনিযুক্ত হেড-মিস্ট্রেস অরুণা সেন তার এই কাজে সায় না দেওয়ায় তার সঙ্গে বিবাদ। এবং সেই কারণেই তাকে স্কুল থেকে তাড়ানোর নানা ষড়যন্ত্র। তাঁর স্কুলের এক ছাত্রী শান্তিকে নিশানাথ নিরঞ্জন রায়ের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায় রাতে, একলা। শান্তির অন্ধ পিতা পুলিন ব্রহ্ম হেড-মিস্ট্রেসকে চিঠি দিয়ে জানতে চান লেখাপড়ার সঙ্গে কন্যার রাতে রায়ের বাড়িতে যাবার কি সম্পর্ক আছে। অরুণা সেন পত্রটি সরাসরি নিশানাথের পিতা অটলবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন। অটলবাবুর কাছে সব শুনে এই প্রথম আধুনিকতার পূজারী যোগীন ডাক্তারের চোখ খুলে যায়। গোটা ব্যাপারটা মুহূর্তে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই রাতেই যোগীন ডাক্তার নিরঞ্জন রায়ের গাড়ি থেকে নিজের মেয়েকে নামতে দেখে উভয়কেই গুলি করে মারেন। এবং নিজেও আত্মহত্যা করেন।

এই ঘটনায় শহরে দু'একদিন আলোড়ন জাগে। শোক সভায় তাকে সেন্টিমেন্টাল, আধ-পাগলা ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়। উঠতি যুবক-যুবতীদের হৃদয়ধর্মকে বুঝতে না-পারার অক্ষমতাকে দোষ দেওয়া হয়। তারপর আবার যা কিছু যেমন চল-ছিল তেমনই চলতে থাকে। শুধু এই উপন্যাসের নায়িকা সূর্যমুখী অরুণা সেনকে স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হয়। তথাকথিত সভ্যতা, আধুনিকতার অন্তরালে সে বর্ণচোরা সরীসৃপটি আপন খেয়ালে সমাজকে সভ্যতার নামে কুরে কুরে খাচ্ছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে লেখক যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রায় তুলনাহীন। মহৎ উপন্যাস হয়ে ওঠার প্রায় সর্বকিছু গুণই এই গ্রন্থে বিদ্যমান, এমন কি বিরাট ব্যাপ্তি যা 'বারো ঘর এক উঠোন' ছাড়া অন্য কোন উপন্যাসে সম্ভবত নেই!

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন বলা যায়, তার

বেশি কিছু নয়। অন্ততঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ কিংবা বিমল করের উপন্যাসের চাইতে তাঁর উপন্যাস উন্নততর একথা বলতেও দ্বিধা আসা স্বাভাবিক। তবে এঁরা কয়জন মিলে যে উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন তা' এক বিশেষ সময়ের মধ্যবিত্ত সমাজের সামগ্রিক মানসিকতার পরিচয়বাহী এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। তবে আলোচ্য লেখকের 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসটির কথা যখন চিন্তা করি তখন অনায়াসেই তাঁকে মহৎ ঔপন্যাসিক বলতে সাধ যায়। কারণ এখানে তিনি গভীর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনকে, মানুষকে ও সমাজকে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যা আছে তাকেই বস্তুস্বরূপে দেখা মহৎ ঔপন্যাসিকের একমাত্র কাজ নয়। কারণ "বাস্তবের দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে না উপলব্ধি করা পর্যন্ত সমগ্রকে ধারণ করাও সাধ্যাতীত।" তা'ছাড়া মহৎ উপন্যাসে যা আছে সেটাই নয়, যা হতে পারে তাকেও যথার্থভাবে প্রকাশ করা চাই। মহৎ উপন্যাসে শুধু সমস্যা বর্ণনাই একমাত্র কাজ নয়, উত্তরণের আভাসও দেওয়া চাই না-হলে তা' শুধু দিন যাপনের গ্লানিতে পর্যবসিত হয়ে পড়বে। বলা বাহুল্য, আলোচ্য উপন্যাসে সে সম্ভাবনা ছিল, হয়তবা খুব উপযুক্ত পরিমাণেই ছিল কিন্তু তাকে ব্যবহার করার যথার্থ প্রতিভার অভাব দেখা গেল। নাহলে এত অসংখ্য চরিত্রকে আনা, অনুপুঙ্খের ব্যবহার, বিচিত্রমুখী সমস্যার টানা-পোড়েন- সবই ছিল। কিন্তু শুধু ক্লীবের মতো বেঁচে থাকা এবং মরা, শুধুমাত্র জীবনের অন্ধকার দিকটিকে একমাত্র সত্য বলে মেনে নেওয়া খন্ড দৃষ্টির পরিচায়ক। প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "জ্যোতিরিন্দ্রবাবু যেন সমকালীন জীবনকে নিষ্ঠুরের কালো রঙে ছাপিয়ে দেখতে চান। তাঁর দৃষ্টি এর ফলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।" এই উপন্যাসের পর দেখা গেল, আর তাঁর বক্তব্যগত কোনো গতি নেই, তখনই এক বিবিক্ততার সাধনা তাঁকে পেয়ে বসেছে। এ বিবিক্ততা জীবনোপলব্ধির কোনো অনিবার্য আকর্ষণে উদ্ভূত নয়। বক্তব্যের শূন্যতাকে আচ্ছন্ন করার জন্যই এর জন্ম। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্র-শিষ্য বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক রচনার মধ্যে সে পূর্ণতার স্বাদ আছে তা আলোচ্য লেখকের রচনায় প্রাপ্তব্য নয়। উদাহরণ হিসাবে 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য' কিংবা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র নাম উল্লেখ করতে হয়। "সত্যসন্ধ লেখকমাত্রেই একথা বোঝেন যে জীবন শিল্পের থেকে বড়ো বলেই শিল্প কখনো জীবনের কোল ছাড়া হতে পারেনা। শিল্পকে খুঁজে ফেরেন তিনি জীবনকে খুঁজতে খুঁজতেই।" [বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়] কিন্তু লেখকের চারপাশে দেখা বিবর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু, সদা দুর্গন্ধময় পরিবেশে টিকে থাকা জীবনের ছবি আঁকতে-আঁকতে একটা উজ্জ্বল, সজীব সুস্থ জীবনের প্রতি আকর্ষণ থাকা চাই, না হলে সে জীবন হবে ঘোলা জলের ডোবা, তরঙ্গিত নদীর মতো প্রাণবন্ত প্রবহমানতার স্বপ্ন দেখা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

তবে 'বারো ঘর এক উঠোনে'র পূতিগন্ধময় অন্ধকারের আবর্তে ঘুরে-মরা বিচিত্র

মানুষগুলির সুখ-দুঃখ যন্ত্রণাও মেনে নেওয়ার অসাড় প্রবৃত্তির রূপায়ণে লেখক যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা' বিস্ময়কর। একই আবর্তে আন্দোলিত অথচ এক নয় শুধু এই অন্ধকারের খাঁচা থেকে বেরিয়ে না আসতে পারার যন্ত্রণায় এক —এমনি একটি পরিবেশের কিছু মানুষের কাহিনী অনেক সময় পাঠকের মনকে একটা অবুঝ বিশ্বাসের আওতায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সেটা মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। দুঃখের ব্যাপারে এই যে, এখানে কারো মোহমুক্তির উপায় নেই। না নির্মোহ চেতনায়, না মহত্তর জীবনে। এই কারণেই আলোচ্য উপন্যাসকে স্মরণীয় বলা চলে, কিন্তু অবিস্মরণীয় নয় কিছুতেই।

সাধারণতঃ উপন্যাসে যেমন একটি কাহিনী থাকে সেই রকম কোন কাহিনীধারা এ উপন্যাসে নেই। বারোটি ঘর ও একটি উঠোন নিয়ে গড়ে উঠেছে কাহিনী বস্তু। বলা যায় একটানা কাহিনীর পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন কিছু চিত্রের সমষ্টি, যারা সবাই মিলে একটি সময়ের বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠতে পেরেছে।

যে কটি পরিবার এই উপন্যাসে স্থান করে নিতে পেরেছে তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে শিবনাথ ও রুচি। কারণ তারা উভয়ে উচ্চশিক্ষিত। যদিও শিবনাথ এখন চাকরি খুইয়েছে কিন্তু রুচি স্কুলের শিক্ষিকা। সমগ্র উপন্যাসটিকে দেখা হয়েছে শিবনাথের দৃষ্টিকোণ থেকে। এদের পরিবারে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। তবে শিবনাথ সংসারে থাকত উদাসীন বাউলের মতো। হয়ত বা স্ত্রীর উপায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকাটা তার আত্মসম্মানে আঘাত হানতো।

বস্তির মালিক পারিজাত ও তার স্ত্রী দীপ্তির সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হবার পর তার চরিত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। পরে দীপ্তির স্বামী ত্যাগের পর পারিজাতের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা আরও গভীর হয়। পারিজাত যাতে নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে তার জন্যে সে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। ধীরে ধীরে তার আর্থিক উন্নতিও হতে থাকে। কিন্তু এই প্রথম তার স্ত্রী তাকে সন্দেহ করতে শুরু করে বিশেষ করে দীপ্তির স্বামী ত্যাগ করার পর। দীপ্তির সৌন্দর্য ও যৌবনশ্রী তার মনে একটা অহেতু সন্দেহের উদ্রেক করে।

ঠিক এমনি সময়ে উপন্যাসে আবির্ভাব ঘটে নারী সৌন্দর্যের রসগ্রাহী চারু রায়ের, যার সঙ্গে রুচির কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। নোংরা মানসিকতার কে. গুপ্ত রুচির সঙ্গে চারু রায়ের অবৈধ সম্পর্ক সম্বন্ধে শিবনাথের মনে সন্দেহ জাগাতে প্রচার করে যে দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে সে নাকি চারু রায়কে রুচিকে চুম্বন করতে দেখেছে। বলা বাহুল্য, এর পরে তাদের দুজনের মধ্যে যে চিড় ধরেছে -তা' আর কোনদিন জোড়া লাগা সম্ভব হয় নি!

শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কে. গুপ্ত চরিত্রটিকে 'সধবার একাদশী' নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রের নিকৃষ্টতম সংস্করণ বলে অভিহিত করেছেন। কথাটা আংশিকভাবে সত্য। কারণ নিমচাঁদের প্রতিভা, পরিবেশ, আর্থিক সংগতি,

বন্ধু-বান্ধব-সঙ্গ—কোন কিছুই কে· গুপ্ত দাবী করতে পারে না। তাছাড়া তার জীবনের বিপর্যয়গুলিকে তিনি চরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন। তার স্ত্রী সুপ্রভা এই নরককুণ্ডের মধ্যে যেন পদ্মফুল। এই নিদারুণ অন্ধকারের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। কথাটা হয়ত ভুল বললাম। বরং বলা ভালো প্রতিটি আঘাতের ক্ষত অন্তরের গভীরে লুকিয়ে রেখে যে অমানুষিক যন্ত্রণা তিল তিল করে সহ্য করেছেন, তারই প্রকাশ ঘটেছে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। চরিত্রটির সংযম, আভিজাত্য, অপরিসীম সহ্য ক্ষমতা ও নিদারুণ পরিণাম পাঠকের মনে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত বেদনার উদ্রেক করে।

এতসব সত্ত্বেও মহৎ উপন্যাসের শিরোপা 'বারো ঘর এক উঠোনের' প্রাপ্তব্য হোলো না। কারণ ঐ একটাই-- এই উপন্যাসের কোন চরিত্র অন্ধকারকে অস্বীকার করে আলোর প্রত্যাশী হতে পারলো না। নরককেই একমাত্র সত্য ভেবে তার মধ্যেই বেঁচে থাকার নয়, টিকে থাকার পাথেয় খুঁজেছে। এই উপন্যাসে গড্ডলিকা প্রবাহের মতো ভেসে-যাওয়া আছে, সংগ্রাম নেই। কোনরমে বেঁচে থাকা আছে, বাঁচার মতো কেন বাঁচছি না —সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কোন চেষ্টা নেই। তাই এই উপন্যাসকে মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত না-করতে পাবার ক্ষোভ যাবার নয়। অথচ এই একটি মাত্র উপন্যাসই যদি তিনি রচনা করতেন তাহলেও বাংলা সাহিত্যে মর্যাদার সঙ্গেই বেঁচে-থাকা তার পক্ষে কোন অসুবিধা হোতো না। শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "উপন্যাসটি দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বাঙালী জীবনের অবক্ষয়ের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে সাহিত্যে স্মরণীয়।"

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাসের কয়েকটি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য :

এক ॥ উপন্যাসের আকৃতি খুবই ছোট (মীরার দুপুর, সূর্যমুখী, বারো ঘর এক উঠোন বাদে)।

দুই ॥ নায়কেরা প্রায়ই অসুস্থ মনের, বিপত্নীক ও একগুঁয়ে স্বভাবের [রুদ্রনাথ– 'হৃদয় জ্বালা', নীরদ– 'নীলরাত্রি', অসুস্থ দেহ মনের হীরেন 'মীরার দুপুর'। 'বসন্ত রঙিন' উপন্যাসের নায়ক মুকুন্দ প্রমুখ।]

তিন ॥ নারীদের মধ্যে অনেকেই হয় স্বামী পরিত্যক্তা, নয় বারবিলাসিনী। রেবতী— 'বসন্ত রঙীন', মালতী - 'মীরার দুপুর', মালা -'নীলরাত্রি', দীপ্তি - 'বারো ঘর এক উঠোন'।

চার ॥ অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্তা স্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত স্বামীর কাছেই ফিরে গেছে। তবে তা' ভুলের অন্তে ভালোবাসার নবজাগরণে নয়, নিদারুণ অসহায়তায়। [রেবতী 'বসন্ত রঙীন', মালতী—'হৃদয় জ্বালা', মালা — 'নীলরাত্রি'।]

পাঁচ ॥ স্বামী থাকা সত্ত্বেও অন্য পুরুষে তীব্র আসক্তি। [মালতীর-ছুতোর মিস্ত্রী মধুর প্রতি —'হৃদয়-জ্বালা' ; রেবতীর ছেলের বয়সী দোকানের কর্মচারী রাখালের প্রতি আকর্ষণ —'বসন্ত রঙিন', মালার নীরদের প্রতি —'নীলরাত্রি' ; মীরার-অমরেশের প্রতি আকর্ষণ —'মীরার দুপুর'।]

অনেক সমালোচক তার রচনায় ডি. এইচ লরেন্সের ও অলবেঅর কামুর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, কেউ কেউ সার্তের কথাও বলেছেন। আমার সে কথা মনে হয় না। কারণ সে প্রভাব এতই ক্ষীণ যে তা' কখনও তাঁর রচনার চালিকা-শক্তি রূপে প্রতিভাত হয়নি বরং তাঁর ওপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু গুরুত্ব প্রভাব আছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে একটিদিক বিচার করলে তাঁকে প্রশংসা না-করে পারা যায় না তা' হল এই যে তিনি তাঁর একটা নিজস্ব দেখার চোখ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যা' অনেকের দ্বারা প্রথম দিকে প্রভাবিত হলেও শেষ পর্যন্ত একটা নিজস্ব পূর্ণতায় স্থিত হতে পেরেছিল। একজন লেখকের পক্ষে এটা কমকৃতিত্বের কথা নয়। তাছাড়া তিনি কখনো তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে গিয়ে তথাকথিত জনপ্রিয় কোন চটকদার উপন্যাস রচনা করতে যান নি। হয়ত তাই জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কোন দিন সে রকম জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁর উপন্যাসের সত্যমূল্য যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে অনেক দিন পরে হলেও কোন একদিন তা' বাংলা সাহিত্যে যথার্থ মূল্য পাবে—এই বিশ্বাসে নির্ভরতা রাখাই ভালো।

॥ রচনাশৈলী ॥

যেকোন লেখকের প্রথমদিকের রচনাবলীতে পূর্ববর্তী মহান লেখকদের প্রভাব-পড়া অসম্ভব নয় বরং সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লেখককে নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। তখন ধীরে ধীরে তাঁর রচনায় নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তখন তার গদ্য পড়লেই ব্যক্তিটিকে অতি সহজেই চিনে নিতে পারা যায়। ইংরাজীতে এই ধরনের লেখকের পরিচয়বাহী গদ্যকে বলা হয় 'Personality in Prose'

গদ্যের প্রয়োজন বক্তব্যকে একটা শারীর-স দান করা। অর্থাৎ সেই গদ্য আবিষ্কার করা দরকার যার মাধ্যমে লেখক তার বক্তব্যকে সুন্দরতম ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় যে গদ্যের বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কিনা - এবং যদি থাকে তাহলে তা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রে চলেছে - এই প্রসঙ্গে দার্শনিক ক্রোচের কথা স্বাভাবিক-ভাবেই মনে আসতে পারে। তার কাছে 'কি বোলছি' তার চাইতে 'কেমন করে বোলছি' সেটাই আসল কথা। আমার মনে হয় 'কি বোলছি' সেই বক্তব্যটাই যদি অত্যন্ত সুন্দর করে বলা হয় তাহলেই সব দিক বজায় থাকে। সেখানে যে মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটে, তখনই তা' সার্থক সাহিত্যের মর্যাদা পায়।

লেখককে তাই নিজের সৃষ্টির উপযোগী ভাষা সৃষ্টি করে লিখতেই হয়। তার জন্য প্রয়োজন অমানুষী পরিশ্রম আর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা শেষ পর্যন্ত লেখককে তাঁর প্রয়োজনীয় সিদ্ধির দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো লেখকেরা যেহেতু বাইরের ঘটনাবহুল নাটকীয়তাকে পছন্দ করেন না বরং মনকে নিয়ে খেলা করতেই তাঁদের আনন্দ বেশি, সেইহেতু একটা নিজস্ব কল্পনার

জগৎ কিংবা নিজস্ব চোখ দিয়ে দেখার জগতকে প্রকাশ করতে তাঁদের চাই নিজস্ব ভাষা যা' তাঁর সৃষ্টির পক্ষে একান্ত উপযোগী হতে পারে!

সকলে যে-পথে চলে থাকে সে পথে আলোচ্য লেখক চলেননি কোনদিন। "শৈশব হইতে আর পাঁচজন শিশুর সঙ্গে তাঁহার কোন মিল ছিল না। আর পাঁচজন শিশু যে বয়সে হুটোপাটি করে, খেলার জন্য বায়না করে, মেলার নাম বলিলে আহ্লাদে নাচিতে থাকে সেই বয়স হইতে জ্যোতিরিন্দ্র পুকুর ঘাট কিংবা রাস্তা কিংবা লাল দগদগে আকাশের দিকে তাকাইয়া এক মনে কি ভাবিতে ভালবাসিতেন। শৈশব হইতেই তিনি নিঃসঙ্গতাপ্রিয়, বিরলবাক্ এবং অন্তমর্গ্ন। ভাসানের দিনে কিংবা ভাদ্র মাসের নৌকা দৌড়ের সময় তিতাসের বুকে কত নৌকা, কত আনন্দ। আর পাঁচটি শিশুর মতো ভালো জামা কাপড় পরিয়া সেই ভীড়ের মধ্যে তিনি যাইতেন কিন্তু কখনো আনন্দে দিশেহারা হইতে পারিতেন না। আত্মসংবৃত কোন ভাবনায় তিনি নিবিষ্ট থাকিতেন।" [ছোট গল্পের বিচিত্র কথা ঃ সরোজমোহন মিত্র]

তার লক্ষ্য সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়া নয়, সকলের সান্নিধ্যেও একলা থাকা। এই বিশেষ মনোভঙ্গীই তার উপন্যাসের শিল্পরূপ গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। তবে কেউ যদি অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে তাঁর ওপর কোনো লেখকের প্রভাব খুঁজতে চান তাহলে দুজন লেখকের কথা অতি সহজেই মনে পড়বে। যথাক্রমে জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সে প্রভাব এড়িয়ে তিনি নিজস্ব শিল্পের জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন অতি অল্পদিনের মধ্যেই!

তাঁর উপন্যাসের ভাষা এত গভীর ও শিল্পসম্মত যে, যে কোন অসতর্ক পাঠকের চোখেও তা' সহজেই ধরা পড়তে বাধ্য। তবে তার শ্রেষ্ঠ রচনাকালের সময় সম্ভবত ১৯৫৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৬৪ খ্রীঃ পর্যন্ত। যার মধ্যে তিনি রচনা করেছেন 'মীরার দুপুর', 'বারো ঘর এক উঠোন' ও 'সূর্যমুখী'র মতো উপন্যাস।

কত সামান্য বর্ণনায় রূপ, রং, মেজাজ এবং সব ছাড়িয়ে একটা বেদনা করুণ উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এই অংশটুকু থেকে ঃ

"তারপর পরনের ঝকঝকে বেগুনি মাদ্রাজি শাড়ি ছেড়ে ফেললো ও ছাড়লো চকচকে কালো শার্টিনের ব্লাউজ। শুধু শায়া, রক্তের মতো লাল শায়া আর জংলি ছিটের আধ ময়লা ব্রেসিয়ারে মীরাকে,মাত্র কয়েকসেকেন্ডের জন্য যদিও, মীরার শরীরটাকে কেমন অদ্ভুত হিংস্র, অশ্লীল মনে হয় হীরেনের।

"তারপর অবশ্য আটপৌরে ঢাকাই বুটিদারে ও শরীর জড়িয়ে ফেলে। শান্তশিষ্ট ঘরোয়া মীরা।"

"ঘরোয়া মীরা, হিংস্র মীরা, সবুজ বেগুনি মেরুনে ঢাকা উজ্জ্বল এঞ্জেল মীরা।"

[মীরার দুপুর ' পৃঃ ২১ / ১ম সং]

আর একটি স্থান উদ্ধৃত করা যাক ঃ

"প্রশস্ত কাঁধ একটু পিছনে হেলানো অমরেশের। সূর্যের শেষ রশ্মি পড়েছে ওর

পিঙ্গল চোখে। বাঘের চোখের মতো লাগছিল অমরেশের সবুজ হরিদ্রাভ ঈষৎ রক্তিম চোখ। কিন্তু সেই চোখে হিংসার জ্বালা ছিল না। চোখের রং ভেবে ভেবে মীরার মনে পড়লো, একটু আগে ধর্মতলার একটা হোটেলে বসে অমরেশ বীয়ার খাচ্ছিলো কাচের গ্লাসে। সোনালী হরিদ্রাভ পানীয়ের মাথায় রক্তের ছিটার মতো লক্ষ লক্ষ ফেনার রঙ ঘুরপাক খাচ্ছিলো!" [মীরার দুপুর / পঃ ১০৫ ' ১ম সং]

কিংবা

"না সে ভাবছিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ের পর এই দেড় বছর এভাবে-সেভাবে, কখনো কথা কয়ে, কখনো চুপ থেকে বা সম্পূর্ণভাবে একটানা তিনদিন হয়ত একেবারেই নিরঞ্জনের সামনে না এসে সকল সহযোগিতা বন্ধ রেখে মেয়েটি এই বোঝাতে চেয়েছে, তৃপ্ত নই, আমি তৃপ্ত নই।' [সূর্যমুখী পঃ ৬ ১ম সং]

'নীলরাত্রি' উপন্যাসের একটি সুন্দর বর্ণনা উদ্ধৃতিযোগ্য বলে মনে করি ঃ

"সত্যি বাইরে রাত্রির চেহারা তখন অপরূপ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। এলো-মেলো হাওয়া আর মেঘে মেঘে আকাশের কি বিশ্রী চেহারা ধরেছিল। এখন সে সব কিছুই নেই। না একটু বাতাস, না মেঘের ছিটেফোঁটা চিহ্ন কোথাও। শান্ত, স্তব্ধ নীল আকাশের মাঝখানে রূপোর ডিমের মতো এক চাঁদ চুপ করে তাকিয়ে হাসছে। আর সেই হাসি আকাশ চুঁইয়ে নীল সুধার মতন পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়ছে।" [১ম সং পঃ ১২৭-১২৯]

আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাক ঃ

"বিকেলটা আরো সুন্দর লাগছিল। দিন দিন যেন গাছপালা, আকাশ-মাটি সুন্দর সুন্দর হচ্ছিল। পাখির শব্দ বাড়ছিল। নানারকম ফল, ফুল, কুঁড়ি কচি পাতার সঙ্গে বাতাস উত্তাল হয়ে উঠছিল। আর মিষ্টি হাওয়া। যেন শরীরের রক্ত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছিল বসন্তের এই হাওয়া আর পাখির গান আর কুঁড়ি পাতা ফুলের গন্ধ।" [বসন্ত রঙিন / ১ম সং পঃ ৮৭]

সংলাপ রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন একথা বলতে গেলেও কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। তাঁর রচিত সংলাপ গাছ থেকে পাতা, কিংবা ফুল গজাবার মতোই একান্ত স্বাভাবিক। আলাদা করে তাকে বিচার করা যাবে না। তবু সেই সংলাপের মধ্যে একটা অদ্ভুত সজীবতা লক্ষ্য করা যায়, একটা দীপ্তি যা নিজের স্বাতন্ত্র্যে পাঠককে আপ্লুত করে দেয়।

একটা নমুনা দেওয়া যাক ঃ

"থাক, আমায় তুমি একটু কমই ভালোবাসবে। একটু কম দিলে খুলেই আমি ভালো থাকব। রেবতীর চোখ দুটো আবার ছল ছল করে উঠেছিল। একটা মানুষকে তো উজাড় করে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলে, তাতে তুমি কি পেয়েছিলে দেখলে তো আমাকে একটু কম ভালোবাসা দিলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব।'

[বসন্ত রঙিন / ১ম সং পঃ ৫৬]

আর একটি নমুনা ঃ

"কথা তো সেটা নয়। দুঃখ হয় ওই, কি যেন নামটা বললেন, ছাগলটার জন্যে। বৌ বাচ্ছা আছে শুনেছি। আরে মেয়েমানুষ আমরা জীবনে কম দেখিনি। তা বলে কি তুই একেবারে গলায় গেঁথে নিবি? আহাম্মক! মদ খাবি, গ্লাসটা দাঁত দিয়ে চিবোবি কেন, সিগারেট খা যত খুশি, জিহ্বায় ছাই মাখবি কেন? জল খেতে গিয়ে পুকুরে কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে দেওয়া, তুই দেখছি সেই রাস্তার পথিক। ইডিয়েট!" [১ম সং / পৃঃ ২০৬]

বলাই বাহুল্য 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের কে. গুপ্ত ছাড়া এমন সংলাপ বলার ক্ষমতা অল্পলোকেরই হতে পারে।

আর একটি সংলাপ ঃ

"ডিমান্ড। এখনই ডিমান্ডের বুঝেছ কি দাদা যাক না কটা দিন —আর একটু পুরণো হোক, ঘাগী হোক, সেদিন লুট করতে হাতের কাছে মনের মতন জিনিসটি না-পেলে —না মাথায় চুল নেই তোর, সেটা ছিঁড়তে পারবে না, পিঠের চামড়া খুলে ফেলবে এই বলে রাখলাম।" [হৃদয়-জ্বালা / ১ম সং পৃঃ ৪৫]

পরিবেশ রচনায় আলোচ্য লেখক যথার্থ শিল্পীর মতোই প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন সংযত নৈপুণ্যে। তার রূপ রং শব্দ গন্ধ স্পর্শ এত বিরল শিল্পচাতুর্য্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে যা সচরাচর চোখে পড়ে না। তার পরিবেশ রচনা শুধুমাত্র বাইরের অনুপুঙ্খ বর্ণনাতেই পর্যবসিত হয় নি, তার ভাবরূপকেও যথার্থভাবে তুলে ধরবার প্রয়াসে সচেষ্ট থেকেছে। তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই এই কৃতিত্বের পরিচয় প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাঁর মধ্যে ছিল শান্ত, সংযত বিরল এক শিল্পী যিনি পূর্ণাঙ্গ মানবচরিত্র অংকনে আপন অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও উপলব্ধিকে যথার্থভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন কিছুটা নিরাসক্তভাবে।

কবি জীবন শিল্পী। ঔপন্যাসিকও তাই। কিন্তু দু'জনের অন্বিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন হলেও পন্থা এক নয়। কবি যাকে ভাবরূপে ধরার চেষ্টা করেন ঔপন্যাসিক তাকে ধরতে চান বস্তুরূপে। কবি খোঁজেন আত্মার আলো আর ঔপন্যাসিক খোঁজেন আত্মার আধার। এই অন্বেষণের শেষ নেই।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সেই অর্থেই স্মরণীয় ঔপন্যাসিক, কিন্তু অবিস্মরণীয় নন। কারণ মানুষ যা আছে, যেভাবে আছে শুধু সেইটুকুই যথার্থভাবে বর্ণনা করা মহৎ ঔপন্যাসিকর একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। সমাজের বিবর্তন ধারায়, জীবনের বাঁকে বাঁকে জমে উঠে যে গ্লানি, অসহায়তা তাকে জয় করবার চেষ্টার মধ্যেই আছে মহত্ত্ব, শুধুমাত্র অবুঝ আত্মসমর্পণে নয়। এবং সেখানেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কিংবা বিমল করের কাছে নয় আমাদের যেতে হবে টলস্টয়, গোর্কী, গলসওয়ার্দি কিংবা রবীন্দ্রনাথের কাছে! অথবা মাত্র কিছু দূরে ফেলে-আসা তারাশংকর কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, যাঁরা কেবলমাত্র টিকে থাকা নয়, মানব জীবনের অপরাজেয় জয়যাত্রার স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

নরেন্দ্রনাথ মিত্র : মমতাসমৃদ্ধ জীবনরস বোধে প্রদীপ্ত

প্রশ্নাতীত মৌলিকতায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭ –১৯৭৫) বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উপন্যাসে একজন লেখকের চরিত্র লেখার চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর সাহিত্যে এক উন্নত রুচিশীল সাহিত্যাদর্শকে জীবনের বীজমন্ত্র রূপে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তেমন একজন লেখক, যিনি তাঁর মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প ও উপন্যাসে 'চারপাশের মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনকে সাদা কাগজের নেগেটিভে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।' সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিজে মমতাসমৃদ্ধ জীবনরসবোধকে লালন করতেন বলেই কোন একটি গল্পে তিনি সুস্পষ্ট আত্ম-স্বীকারোক্তিতে উচ্চারণ করেছেন –"যেন এ-কথা মনে রাখতে পারি মাটি খুঁড়ে যাঁরা হাঁটুজল অবধি তুলেছেন, তাঁরাও সেই সিন্ধুর সগোত্র।" সত্যনিষ্ঠ মানসিকতা নিয়ে উপন্যাস বা গল্পের উপাদান সন্ধানে তিনিও জীবনমুখীন –জীবনের প্রীতিস্নিগ্ধ মাধুর্য, তার সাফল্য-অসাফল্য, দ্বেষ-বিদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা-প্রসারতার নানা উপাদান ছড়িয়ে-থাকা জীবন থেকেই তিনি আহরণ করেছেন, তার শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও এ-কথা সত্য। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অজস্র অসাম্য, অন্যায় দুর্নীতি ও সংগ্রামের কাছে বিধ্বস্ত মানুষের কাছে তার ছিল নির্বিশেষ অসামান্য প্রীতি ও ভালোবাসার উচ্চারণ –অজস্র প্রতিবন্ধকতার কুটিল-জটিল বন্ধনমোচন করে মানুষকে তিনি জয়ী করেছেন তার রচিত উপন্যাস ও ছোট গল্পের মালায়। মমতাসমৃদ্ধ সাহিত্যবোধ এবং মনের সুস্নিগ্ধ কমনীয়তাকেই তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে 'মরূদ্যানের' চিরকালীন আশ্রয়ে পরিণত করেছেন। কিন্তু যে তুলনায় সিদ্ধি তার করায়ত্ত –সে তুলনায় সৃষ্টির পূর্ণ ফসল তিনি সাহিত্যের আঙিনায় তুলতে পারেননি। তার অকাল-মৃত্যুর পর তাই তাঁর নিজের উক্তি পাঠক-পাঠিকাদের অন্তরে প্রতিধ্বনি তোলে –'সবাই কি আর সব লিখতে পারে। যে কোন লেখকেরই অলিখিত লেখার তুলনায় লিখিত রচনা সামান্য।' এ-কথা তার নিজের সাহিত্য-জীবন সম্বন্ধেও অসামান্য রূপে সত্য। মানুষ ও তার পারিপার্শ্বকে তিনি যত দৃষ্টিকোণে যে-ভাবে জেনেছিলেন –তাদের সকলের কথা তিনি লিখে যেতে পারেননি। গ্রন্থিভরা জীবনের সন্ধানী ও শিল্পী হয়েও জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর নিঃশব্দ আকস্মিক প্রস্থান ঘটেছিল। গল্প বা উপন্যাস-সৃষ্টির বাক্-সিদ্ধির অহংকার তার জানা ছিল না। বরং তাঁর সৃষ্টি ও সত্তায়, ডায়েরীর পাতায়, টুকরো কাগজের উড়ো জমিতে জমিয়ে রাখতেন বহু গল্পের উদ্ভাস। একটি নাম, একটি ঘটনার লিখিত সামান্য উল্লেখ, কখনও বা একটি টেলিফোন নম্বর বা ঠিকানা তিনি বহু যত্নে সঞ্চয় রাখতেন—'যা চকিতে একটি গল্পগর্ভ-মুখছবি তাঁকে মনে করিয়ে দিত –তিনি কি লেখেননি বা তাঁকে কি লিখতে হবে।' আকস্মিকভাবে তাঁকে চলে যেতে না হলে

সেই লিখে রাখা নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্যের মধ্যে, অস্ফুট কোন গানের কলির উল্লেখের মধ্য দিয়ে, রহস্যময় অনুভূতির দু'ছত্র প্রগাঢ় চিত্রণের মধ্য দিয়ে নতুন গল্প বা উপন্যাসের অভাবনীয় জন্ম তিনি দিতে পারতেন। নিজের অনুভূতির সঙ্গে নিজের কোন, লুকোচুরি তাঁর মধ্যে ছিল না। এ বিষয়েও তাঁর ভবিষ্যৎ-জ্ঞান আশ্চর্যরূপে তাঁর জীবনে মিলে গেছে "নিজের দৌড় বোঝাবার মতো বয়স হয়েছে। মোল্লা যে মসজিদ পর্যন্তও পেঁছিতে পারবে না তা টের পেতে বাকি নেই। তবে আর দৌড়ে লাভ কি! কিন্তু সত্যি সত্যি দৌড়তে পারলে লাভ আছে। মসজিদে নয়, মন্দিরে নয়, —যাত্রীর আনন্দ-যাত্রার মধ্যে। কিন্তু সেই যাত্রাটা হচ্ছে না। এক পা এগুতে না এগুতেই দাঁড়িয়ে পড়ছি, থেমে যাচ্ছি। ছোটা শুরু হতে না হতেই বার বার ছুটি নিচ্ছি।" স্বগতোক্তির সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির পরিণাম অদ্ভুত ভাবে সমমাত্রিক। কিন্তু তবু যা রেখে গেছেন - তারও দক্ষ অসাধারণতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় অসামান্য গল্পকার হয়েও সে-পরিমাণ তিনি আলোচিত নন। শ্রমসাধ্য অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে তিনি গবেষকের পত্র-সন্নিবিষ্ট হয়েও প্রকাশিত নন।

নরেন্দ্রনাথ নম্র ও স্নিগ্ধ। চেনা জগৎ ও চেনা-ভালবাসার চিরন্তন লেখক। কাছের পরিচিত হৃদয়ে তাঁর অভিযাত্রা। সেই অভীষ্ট তাঁর লেখনীতে রসগম্য হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের উপন্যাস, বা গল্পের কেন্দ্রবিন্দু তাঁর সচেতন মনের দ্বারা স্থিরীকৃত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবভূমি আর লেখকের ব্যক্তিত্বের স্বাদিষ্ট রস 'মুখ আর মুখোশের রহস্য।' উপন্যাসে এই রহস্যের উন্মোচনে তিনি চেনামহলের ভালোবাসার মানুষ, ভালোবাসার লেখক। আশ্চর্যরূপে ঘরোয়া। জীবনের প্রতি আকর্ষণ, সকলের প্রতি টান, গ্রাম-গঞ্জ-নগর-বন্দর -মানব সংসারের সর্বক্ষেত্রের তিনি রূপকার। তাঁর লেখক-জীবনের সুরু সেই আদিম মূলধন ভালোবাসার ভাবলোক থেকে বস্তুলোকের নানা চরিত্রের নানা গভীরতা থেকে। তাঁর জীবনদৃষ্টি কোমল হয়েও মর্মতলভেদী। বাংলা উপন্যাসের অনন্য শিল্পী নরেন্দ্রনাথ চলিষ্ণু হয়েও সতত-চলিষ্ণু নন—তাঁর লেখায় পর্বে পর্বে ফিরে তাকানো আছে, ভালোবাসার স্মৃতিকোমল মন্থরতা আছে, সুপরিচিতকে নতুন করে পরিচিতি-ঘটানোর আবিষ্কারক আনন্দ আছে।

মৌলিকতায় প্রশ্নাতীত হলেও কথাসাহিত্যে তিনি পূর্বসূরী-স্পর্শ থেকে স্বভাবত সম্পূর্ণ মুক্ত নন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জীবনবোধের বা অভিজ্ঞতার কালগত দূরত্ব অনেকখানি হলেও নরেন্দ্রনাথ সেখানে কিছু ঋণী। তাঁর কথাসাহিত্য বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের অন্তরঙ্গ রূপটিও মুখ্য। নরেন্দ্রনাথের উপন্যাসের গ্রামীন স্পন্দন বিভূতিভূষণকে অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু বৈসাদৃশ্যও কম নয়। নগরজীবনে বিভূতিভূষণ রুদ্ধশ্বাস কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নগরজীবনের প্রতি একান্ত আগ্রহে অন্বিষ্ট না হয়েও 'মহানগর' রচয়িতা। এ-ক্ষেত্রে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের নগরচেতনার রহস্যবোধ বা জটিলতা থেকে মুক্ত। নগরজীবনের বাস্তবতাবোধ বিষয়ে তাঁর শিল্পীমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে উদ্দীপ্ত নয়। তথাপি তাঁর নাগরিক ভালোবাসা স্পর্শকাতর।

কঠিন আর কোমলের অসম্ভবপর সহাবস্থান নরেন্দ্রনাথের শিল্পী-আত্মা। একদিকে তাঁর হৃদয়ের আর্দ্রতা, আর একদিকে জীবনের রুক্ষতা। পূর্ববঙ্গের ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়ের নিরুপদ্রব পরিবেশে নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছেন। পূর্ব-বাংলার সদরদি নামে সেই বর্ধিষ্ণু শান্ত গ্রাম তাঁর নানা উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। সদরদির পশ্চিমে কুমার নদী, পূবে খোলা মাঠ এবং ধান ক্ষেত, খেজুর গাছের সারি, সুপুরি-বন, আম-কাঁঠালের বাগান, খাল-বিল-ডোবা, থৈ থৈ সীমাহারানো বর্ষার জল তাঁর মনকে দুরন্ত আকর্ষণে টানতো। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি ফরিদপুর জেলা শহরের কলেজে ভর্তি হলেন। বন্ধুদের উৎসাহে তিনি কলেজ-জীবনের রোম্যাণ্টিক অভিযানে নগর-কেন্দ্রিক সাহিত্য-সৃষ্টির উন্মাদনায় মত্ত হলেন। হাতে-লেখা পত্রিকায় তখন সাহিত্য সৃষ্টির দুর্দম লেখা ও রেখার স্পন্দন। সম্পাদনার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যরসে আত্মস্থ হতে লাগলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দেশভাগের জন্যে কলকাতায় চলে এলেও স্মৃতি তখনও শৈশবের অতিক্রান্ত অতীতের নানা সুখ-দুঃখে ভরপুর। শহরবাসী মধ্যবিত্ত ভাড়াটে জীবনযাত্রার স্পর্শ নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যে নতুন মাত্রা যুক্ত করল অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের নতুন সংযোজন চেনা-মহলকে নতুন আয়তনে-অবয়বে বিস্তৃত করল। গ্রামীন অভিজ্ঞতাকে অনেকখানি আত্মস্থ রেখেই নরেন্দ্রনাথ মহানগরের কৃত্রিম, জটিল, আশাভঙ্গের সংক্ষুব্ধ বার্তাকে হৃদয়েরই ভারবহ করে এক বাধ্য, অনিবার্য, অভ্যস্ত মধ্যম জীবনকে তিনি বহন করতে লাগলেন। কলেজ জীবন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহিত্যিক শিক্ষানবিশী পর্বেরও অন্ত ঘটল। কঠিন জীবন-সংগ্রামের মুখোমুখি হলেন ঔপন্যাসিক ও শিল্পী নরেন্দ্রনাথ। বৃত্তির সন্ধানে তাঁর শিল্পীসত্তা তখন ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ। পশ্চাৎপটে শহরের বিচিত্র ইতিকথা। এই সময়ে তিনি সংগ্রামী ঔপন্যাসিক নায়ক নিজেই। স্থায়ী বাস নেই কখনও নারকেলডাঙ্গা, কখনও বাগবাজার, আবার কখনও বা বেনে-পুকুর। বৃত্তির সন্ধানে কখনও ব্যাংক কখনও 'স্বরাজ' কখনও 'সত্যযুগ'। এই নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যেই শিল্পী নরেন্দ্রনাথের তখন সঞ্চয়ের মহার্ঘ্য উত্তরাধিকার-পর্ব চলছে তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং চল্লিশের দশকের প্রারম্ভ মধ্যবিত্তের এই মহা-সংকটের সামাজিক ও আর্থিক পটভূমি সেদিন তার অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত করেছে। সেই সংকটের বিহ্বলতা স্পর্শ করেছে তার উপন্যাসকেও। এই পর্যায় সেদিন তার বাংলা উপন্যাসে তাঁকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর প্রতিনিধি ক'রে তুলেছে।

জন্মসালের কাল বিচারে এঁরা ১৯০৮-১৯০৯ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে আবির্ভূত! এঁদের প্রত্যেকেরই প্রথম গল্প-প্রকাশের সময়সীমা ১৯৪০ থেকে ১৯৫০। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম ১৯১৭ সালে। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে নরেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মৃত্যু ও জীবন' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সাল নানা দিক দিয়েই উত্তপ্ত এবং সময়ের স্রোতও অস্থির। সবেমাত্র যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অন্নবস্ত্রের অভাব, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, কৃত্রিম তেজী কালোবাজার, সাম্রাজ্যবাদ, উত্তাল সশস্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রাম ফ্যাসীবাদের

বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধতা, ফ্যাসীবিরোধী লেখক-শিল্পীসংঘের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নব্য চেতনা ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে চলমান কালের শরীর প্রচণ্ড তপ্ত, আর সেই অসুস্থ শরীর মেজাজেও বিদ্রোহী। এই সময়সীমায় গল্পকার ও ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা সম্পূর্ণ সমর্পিত। কিন্তু সময়সীমার রুগ্ন মানসিকতা ও উত্তাপ, সর্বধ্বংসী নেতিবাদ তাঁর শিল্পীসত্তাকে স্পর্শ করেনি। স্খলন-পতন-ত্রুটিকে শিল্পী নরেন্দ্রনাথ জীবনে সত্য বলেই মেনেছেন। শঠতা-অসততা ও হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ জীবন পরিধিতে খড়ির গণ্ডি টেনে তিনি অনায়াসে জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যেই উচ্চতর কর্মাদর্শ এবং মহত্তর ভাব-ভাবনার পরিধি সযত্নেই নির্মাণ করে নিয়েছেন। তাঁর সেই গণ্ডী-কাটা খণ্ডাংশ-জীবনও চেতনার স্বাতন্ত্র্যে বৃহত্তর জগতেরই পরিমণ্ডল। সেখানে স্খলন-পতন-ত্রুটি সত্য-তাৎপর্য লাভ করেও যেখানে আমরা মহৎ, শক্তিমান সেখানেই জীবনের মহত্বের ভূমিকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। বিরোধী শক্তিকে দূরে সরিয়ে জীবনের পাথুরে মাটির অভ্যন্তরে যে অলক্ষ্য রসের ঝর্ণাধারা আছে—তার মুখটিকে সহজেই মুক্ত করে দিয়েছেন। প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে তিমিরে-আবদ্ধ মানুষের মানসিক মুক্তি ঘটিয়েছেন আলোকিত পৃথিবীতে। জীবনের শিষ্ট রস ও সৌন্দর্যানুভূতির সন্ধানে শিল্পী নরেন্দ্রনাথ নিমগ্ন থেকেছেন।

'দেশ' পত্রিকায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে। অতীতের স্মৃতিময় জীবনের আনন্দধারা এই উপন্যাসের ভুবনে বহমান। উপন্যাসের পটভূমিরূপেও তা দীপ্যমান। লেখকের পরিচিত বাস্তব পৃথিবীর দলিল রূপে 'চেনামহল' চিহ্নিত। আন্তরিক বাস্তবের সত্যের গভীরতাকে তিনি উপন্যাসের শিল্পরস সঞ্চারে তাৎপর্যের গভীরতা দিয়েছেন। মধ্যবিত্তের প্রেম-পরিণামের চিত্রণ এখানে খুবই নিষ্ঠুর। অথচ সেই নিষ্ঠুরতা আহৃত হয়েছে একান্ত সত্য-পরিণামকেই ভিত্তি করে—সেখানে 'ক্যানভাস' হল নাগরিক হিন্দু মধ্যবিত্তের সহজ অনাড়ম্বর প্রাত্যহিক জীবনের সত্যের চালচিত্র। অরুণ ও করবীর অবধারিত অব্যয় প্রেম জীবনের পরিণামে ব্যর্থ হল। বিজু ও প্রীতির আত্মক্ষয়ী পরিণামের নেপথ্যেও ভঙ্গুর সমাজের বাস্তব রূপই প্রতিচ্ছবিত। অপরদিকে অতুল ও রমার কাহিনীর মধ্যে ক্রমশঃ অধঃপতনের নিম্নমুখী সামাজিক কঠিন ভবিষ্যতের পথকে সুনির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন নরেন্দ্রনাথ। নিম্ন-মধ্যবিত্তের বহু-পরীক্ষিত পথ এবারেপ্রসারিত চটকল বা শ্রমিকবস্তির দিকে অবধারিত গতিপথ রূপে নির্ণীত হয়েছে।

'চেনামহল' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যজীবনের মধ্যপর্বের নাগরিক জীবনকেন্দ্রিক একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। এই উপন্যাসে বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে শৈল্পিক গুণসমৃদ্ধ পূর্ণতা এসেছে। এখানে অবনীমোহন ও বৈদ্যনাথ, বাসন্তী ও কনকলতা, করবী ও অরুণের আত্মজীবনের নানা সমস্যা-জর্জরতার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। অরুণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের একাকীত্ব, স্বার্থমগ্ন অরুণের দেবার ও নেবার অক্ষমতা —বহিরঙ্গ পরিচয়ে তার একক সত্তার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু অন্তরঙ্গ স্বরূপে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ

তার সমকালীন যুগ ও কালেরই অনিবার্য প্রতিফলন। অরুণ যেন বাংলা উপন্যাসে সাম্প্রতিক কালে আবির্ভূত নিঃসঙ্গ নায়কদেরই পথিকৃৎ। 'চেনামহল' উপন্যাসের মানব-মানবী যেন লেখকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অবশ্য চরিত্রগুলি পরিচিত আত্মীয়-অনাত্মীয়দের মধ্য থেকেই সংগৃহীত। তাঁর 'আত্মকথা'য় এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। চেনামহল যখন লিখি, তখন থাকি সপরিবারে লিণ্টন স্ট্রীটের বাড়ীতে। সে বাড়ীর অবস্থা ভালো ছিল না। প্রায় বস্তিবাড়ীর তুল্য। কিন্তু বন্ধুগণের আনাগোনায় আর লেখার প্রাচুর্য, স্ফূর্তিতে সেই গৃহটির কথা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চেনামহলের বহু চরিত্রের সঙ্গে কলকাতায় আমার বৃহৎ আত্মীয় পরিবারের অনেকের মিল দেখা যায়। সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু হুবহু এক ছিল না। চরিত্রগুলির আখ্যান-ভাগের সঙ্গে খানিকটা খানিকটা মিল থাকলেও বইয়ের আখ্যানভাগের সঙ্গে তাদের জীবনকাহিনীর তেমন কোন মিল ছিল না। যেটুকু সাদৃশ্য ছিল, তার জন্যে আমার সঙ্গে কেউ কোনদিন বিসদৃশ আলোচনা করেন নি। তাঁদের স্মিত মুখ দেখে আমার মনে হয়েছে —আমার লেখার উপাদান হতে তাদের আপত্তি নেই। লেখাটি উপাদেয় হলেই হল।' ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র তার রচিত 'আমাদের কথা' গ্রন্থে বড় দাদা নরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্বন্ধে নিজের কথা আন্তরিকভাবে প্রকাশ করেছেন : "কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজন কম— মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ যা একটু পেতাম দাদার শ্বশুরবাড়ীতে। ওঁরা বাগবাজারে থাকতেন। নিবেদিতা লেনে দাদার মামাশ্বশুর মেসোশ্বশুরের বাসা ছিল। আমরা সে বাসাতেও যেতাম। দুই পরিবার একসঙ্গে—বাড়ীতে অনেক লোকজন। দাদার 'চেনামহলে' তাদেরই আদল এসেছে।"

প্রথম পর্বের উপন্যাসে গ্রামীন জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাস। রচনাকালের বিচারে প্রাক্ 'চেনামহল' পর্বের হলেও নাগরিক চেতনার পরিচয়বহ নরেন্দ্রনাথের 'চেনামহল' পূর্বে আলোচনা করে তাঁর একটি স্বকীয় স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণের পরিচয় আমরা দিয়েছি। দুটি উপন্যাস দুই ক্যানভাসে রচিত হলেও সমানভাবেই বাস্তবনিষ্ঠ, নিখাদ শৈল্পিক গুণে সমৃদ্ধ। 'দ্বীপপুঞ্জ' ১৯৪৭ সালে 'দেশ' পত্রিকায় 'হরিবংশ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৮২ বঙ্গাব্দের 'দেশ' (সাহিত্য সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথের 'আত্ম-কথা'য় উল্লিখিত হয়েছে : "হরিবংশ (দ্বীপপুঞ্জ) আমাদের সদরদি গ্রামের অনেকেই এসে ভীড় করেছিল। আমাদের মধ্যপাড়ার উত্তরে ছিল সাহা পাড়া। দোকান-পাট ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল এদের জীবিকা। সেই সাহাপাড়ার অনেকেই এসে ভীড় করেছিল আমার প্রথম উপন্যাসে। বইখানির মধ্যে একটি কীর্তনীয়ার দল আছে। একটি চরিত্র আছে আত্মভোলা কীর্তনীয়ার। এই চরিত্রে আমার সেই বাল্য-শিক্ষকের ছাপ পড়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

উদ্ধৃত স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে- 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের পরিবেশ-সৃষ্টির উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট স্থল সেদিনের সেই গ্রামীন জীবন—যার কথা তিনি পরবর্তীকালের শিল্পীচেতনার স্মৃতি-সত্তা ও ভবিষ্যতের মধ্যে লালন

করেছিলেন। 'দ্বীপপুঞ্জ' সেই অনাড়ম্বর পল্লীজীবনের একান্ত অনুভূত আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। উপন্যাসখানিতে লেখকের অনুভূত সত্য শিল্পরূপ পেয়েছে বলেই বাস্তবতা গভীরতা পেয়েছে। লেখকের আন্তরিক সততার স্পর্শে সংহত প্রাণময় জীবনের রসাবেদন আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। লেখকের সততার উপলব্ধি এই উপন্যাসের জীবনোপলব্ধির মূল পাঠ। বাংলা উপন্যাস-সম্ভারে পল্লীবাংলা নিয়ে রচিত নরেন্দ্রনাথের এই সৃষ্টি সার্থক, সমুজ্জ্বল এবং বাস্তবধর্মী। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের ফ্রেমে আকাশ-বাতাস-কীর্তনমুখরিত এক পরিবেশ। বিষয়বস্তু স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। স্বামী সুবল অতি-পরিচিত এক সাধারণ গ্রাম্য অনুজ্জ্বল চরিত্র—দোষগুণে মেশানো, বুদ্ধিতে-নির্বুদ্ধিতায় মেলানো মাটিতে জড়ানো সাধারণ মানুষ। স্ত্রী মঙ্গলা কিছুটা ব্যতিক্রম—সে ব্যক্তিময়ী প্রগল্ভ চরিত্র। বাইরে পরিপূর্ণ—কিন্তু ভিতরে পিপাসার্ত এক নারীসত্তাকে লেখক স্তরে স্তরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। লম্পট সংসর্গের মধ্য দিয়ে এই নারী চরিত্র বিস্মৃতময় জীবনমন্থনে অভিজ্ঞা এবং জীবনের যে স্বরূপের মধ্যে চরিত্রটিকে এনে দাঁড় করিয়েছেন—তার পরিচয় দুঃসাহসী। উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রের মতো গতিময়। অন্তঃস্বত্ত্বা মঙ্গলা যখন নৌকোয় চলেছে তখন সেই প্রবল জলস্রোতের মধ্যে সাক্ষ্যহীন জনশূন্যতায় কঠিন সংকল্প নিয়ে সুবলের আবির্ভাব ঘটল, আর সেই মুহূর্তেই মঙ্গলার কাছে তার অসহায় আত্মসমর্পণের মধ্যে সুবলের মঙ্গলা-হত্যার সমস্ত কঠিন সংকল্প হার মানল। মঙ্গলাকে ঘিরে এক দুর্বলতা তাকে পরাজিত করল। তার বিরুদ্ধে সুবলের মানসিক সমস্ত কঠোর সংকল্প হার মানল। মঙ্গলা-হত্যা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। আকস্মিক নৌকোডুবির চূড়ান্ত মুহূর্তে "ছই-এর ভিতর থেকে কোনরকমে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে মঙ্গলা দু-হাতে জড়িয়ে ধরল সুবলকে, অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে—'ওগো বাঁচাও।' ··· অনেককাল পরে সুবলের সর্বাঙ্গ যেন আবার শিউরে উঠল, কিন্তু মুখে কোন কথা ফুটল না।···মঙ্গলা কোন কথা বলল না। আঠার মতো সে লেগে রয়েছে সুবলের দেহের সঙ্গে। সুবল ঝাঁপ দিয়ে পড়লো জলে। জলের মধ্যে মানুষের ভার কমে যায় এমন কি এক গর্ভিণী নারীকেও মনে হয় সোলার মতো হাল্কা।" এরপর গর্ভিণী স্ত্রীকে নিয়ে সুবল ফিরে আসার আগেই লেখক উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে জীবনের দাবীর কোন সমাপ্তি নেই। মঙ্গলা-সুবলের মানবজীবনের জমিনে ঘর-সংসার প্রতিষ্ঠিত হবে। সংসারকে ঘিরে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক স্বপ্ন হয়তো আবার জাগবে। তখন বর্ষার খর স্রোতের মধ্যে মৃত্যুর অস্বাভাবিক আশঙ্কা ঘটাবার কোন কারণ হয়তো থাকবে না। নরেন্দ্রনাথের এই উপন্যাস থেকে সমস্ত 'অবাস্তবের আবরণ'কে যদি সরিয়ে নেওয়া যায়—তাহলে আমরা যে রিয়ালিস্ট ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথকে পাবো, তিনি কঠিনে-কোমলে মেশানো এক রিয়ালিস্ট। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভাষ্য-রচয়িতা। মনে হয়—"মাঝে মাঝে হঠাৎ কোমলতার আবরণ যখন খসে পড়ে, তখন কঠিন সত্যের এক-একটা ঝলক চকিতে বিদ্যুতের ছুরির মতো বুকে এসে বাজে। তখন আর সেই রিয়ালিজমের

গোত্রকে চিনে নেওয়া আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয় না।" 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসেও এই বাস্তবতাবোধের তর্কাতীত প্রমাণ[১] প্রতিষ্ঠিত। ছোট গল্পের ধর্ম শিল্পীকে এখানেও স্পর্শ করেছে। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কল্পনার যে মানসিক সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যায় —তার মধ্যে কল্পনা স্থির বস্তু-নিবন্ধ। উপন্যাসখানি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র নিকটতম জ্ঞাতি হয়েও উভয় রচনায় শিল্পীর মানসিক রসচেতনার মানদণ্ড বিপরীত। বিদ্যুৎগর্ভ ইংগিতময়তার মধ্য দিয়ে মানিকের মানস-বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা স্বাভাবিক কারণেই এখানে অনুপস্থিত। কারণ পল্লীবাংলার সুখ-দুঃখের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের আন্তরিক সংযোগ-সূত্র এ-ক্ষেত্রে বজায় থেকেও নরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক জীবনভঙ্গীকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে -তা হল তাঁর 'সহজ শান্ত নিরুত্তাপ বিরলবর্ণ বস্তুসংস্থাপনার রীতি। তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই জীবনরূপকে যা একই সঙ্গে তীক্ষ্ণ-তীর্যক, কঠিন এবং নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুরতাকেও সাহিত্যে শিল্পরূপের মধ্যে কতোটা মহার্ঘ্য করে তোলা যায় 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথ তার অসামান্য পরীক্ষার উত্তীর্ণ। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে মঙ্গলা-সুবলের জোড়ভাঙা জীবনের পরিসমাপ্তিতে বেঁচে থাকার মধ্যেও দুটি নর-নারীর দিনযাপনের মেনে নেওয়া রীতির মধ্যেও কিন্তু লেখক নিষ্ঠুর নীরব দূরত্ব এনেছেন। চরিত্র ও ঘটনার এই দূরত্বকে ট্র্যাজিক পরিণামী করে তুলেলেন নরেন্দ্রনাথ। সমাপ্তিতে মঙ্গলা-সুবলের এই মিলনটি কি প্রকৃতই মিলন? মনে হয়, এই জাতীয় পরিসমাপ্তির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' বা তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি'র পরিসমাপ্তি আরও কমনীয়। সেখানে আকার ইঙ্গিত নেই. ছলনা নেই। এই কঠিন বাস্তবের নির্মমতাকে শিল্প-সত্যে উত্তীর্ণ করার যে দুঃসাহসিকতা নরেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—তা আমাদের বিস্মিত করে।

'সূর্যসাক্ষী' নরেন্দ্রনাথের আর একখানি সুবিখ্যাত উপন্যাস। এর ফ্রেম এবং পাত্র-পাত্রী নরেন্দ্রনাথের অচেনামহল থেকেই সংগৃহীত 'চেনামহলের' ব্যর্থ অরুণের সঙ্গে 'সূর্যসাক্ষী'র কৃতী গোত্রের চরিত্র শশাঙ্কের সঙ্গে যে অমতিসূক্ষ্ম আত্মীয়তা লক্ষ্য করা যায় উভয়ের নিঃসঙ্গতার সূত্রই সেই সংযোগসূত্র রচনা করেছে। 'সূর্য-সাক্ষী'তে নায়ক-নায়িকা অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের এবং এ উপন্যাসের জীবন-পরিবেশও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে একাত্ম। আধুনিকতম এবং জটিলতম উপন্যাস হিসেবে 'সূর্যসাক্ষী' স্বীকৃতিযোগ্য। দৈবী অসন্তোষকে পাথেয় করে এ-ক্ষেত্রে তিনি দুর্গমের পথযাত্রী। আখ্যানে লেখক জীবনের বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন। সংযম ও সততা দিয়ে জীবনের সিদ্ধিকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথের আর একখানি সামাজিক উপন্যাস 'সহৃদয়'। উপন্যাসটিতে আর্থিক কৌলীন্যের আভিজাত্যের সঙ্গে সংঘাতে প্রেমের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাঙ্কের মালিক সুরপতি চক্রবর্তীর আফিসে অসিতের সামান্য বেতনে চাকরীলাভ, ব্যাঙ্কে সতীর্থ শ্যামলের সংগে তার পরিচয়, ব্যাঙ্কের আর্থিক সংকট, কর্মচারী সমিতির

(১) শিল্প-সাহিত্য-দেশকাল—সত্যেন্দ্রনাথ রায়। পৃঃ ১৭৭

আন্দোলন, সুরপতির লোভ, ক্রমাগত ব্যাঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে বিরোধ ইত্যাদি মিলিয়ে উপন্যাসখানি ঘটনাপ্রধান। কিন্তু অসিতের সঙ্গে সুরপতির কন্যা সুজাতার প্রেম উল্লেখযোগ্য একটি দিক। অভিজাত উচ্চবিত্ত ঘরের কন্যা সুজাতার হৃদয় প্রেমের ঐকান্তিক অনুভূতিতে বাঁধলো নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অসিতকে। কিন্তু কর্তৃত্বের স্পৃহা, সামাজিক আভিজাত্য অসিতের সঙ্গে সুজাতার মিলনের অন্তরায় হল। এই উপন্যাসের আর একটি এপিসোড হল শ্যামল-উমা-নীলা এপিসোড। এপিসোড দু'টি লেখকের শিল্পীমনের বাস্তবতার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লেখকের 'গোধূলি' উপন্যাস গ্রাম ও নগরজীবনের সমন্বয়ে গ'ড়ে উঠেছে। নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের এক সাবলীল পারিবারিক চিত্র এই উপন্যাসের পটভূমি। নায়ক অনুপম ছাড়াও চিন্ময় ও অরুন্ধতীকে কেন্দ্র করেও উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এ-ছাড়াও উল্লেখযোগ্য তিনটি উপন্যাস হল -'দূরভাষিণী', 'সঙ্গিনী', 'অনুরাগিনী'।

'দূরভাষিণী' উপন্যাসটি সম্ভবতঃ 'অকথিতা' নামে ১৩৫৭-৫৮ বঙ্গাব্দে 'গণবার্তা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারে উপন্যাসখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে। 'দূরভাষিণী' উপন্যাস রচনার পশ্চাৎপটে একটি ছোট ঘটনা জড়িয়ে আছে। নরেন্দ্রনাথ তখন নারকেলডাঙ্গার বাসিন্দা এবং 'স্বরাজ' পত্রিকায় কর্মরত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্ন জনকে ফোন করতেন। কিন্তু একদিন অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এক্সচেঞ্জ থেকে লাইন না পেয়ে বিরক্ত হয়েই তিনি টেলিফোন-গার্লকে কিছু উত্তেজিত কথা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু মহিলাটি বিরক্ত না হয়ে শান্তকণ্ঠে তাদের অসুবিধার কথাগুলি নরেন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিয়ে তাঁদের অসুবিধার কথা ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। নরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হয়ে তাদের অসুবিধার কথা জানতে চাইলে—মহিলা লেখকের পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় জেনে মহিলা নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন —তাঁদের অর্থাৎ টেলিফোন-গার্লদের সম্বন্ধে জানাতে। নরেন্দ্রনাথ মহিলাটির সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁদের জীবন ও পেশার তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে অভিজ্ঞতার ফসল তুলে দিলেন পাঠক-পাঠিকার হাতে। জন্ম নিল 'দূরভাষিণী' উপন্যাস। প্রত্যক্ষ দেখার এই অন্তর্গতের মধ্যেই ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শক্তি ও সিদ্ধির উৎস।

নরেন্দ্রনাথের 'সঙ্গিনী' উপন্যাসখানি 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে রচিত এই উপন্যাসখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে।

নরেন্দ্রনাথের 'অনুরাগিনী' উপন্যাসটি ১৩৬২ বঙ্গাব্দের 'জনসেবক' পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে। এই উপন্যাসে নিম্ন মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনচিত্র বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের ভাবে ও আঙ্গিকে নরেন্দ্রনাথ প্রত্যেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যচেতনার সততার যুগলবন্দী রূপকেই বড় করে তুলেছেন। তাঁর স্মৃতিবাহী

সদরদির ভূখণ্ড নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনের ভদ্র-ভদ্রেতর সম্প্রদায়ের সুখদুঃখময় জীবনের ছবি তাঁদের চাষবাস, পাল-পার্বণের ঐতিহ্যসহ উপন্যাসের প্রথম পর্বে শিল্পিত রূপ পেয়েছে। কর্মসন্ধানের আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত মফঃস্বলের ভাসমান স্মৃতির ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ। জেলা ফরিদপুরের নগরমুখী স্মৃতির ভূখণ্ড সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস রচনায় মুখর দ্বিতীয় পর্বে। ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথের সন্ধান-তৎপর তৃতীয় ভূখণ্ড মহানগরী কলকাতা এই পর্বের উপন্যাসে প্রক্ষিপ্ত। কলকাতার নাগরিক জীবনের বিপুল সমগ্রতা হয়তো নয়—মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের খণ্ড ও ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত শহর ও শহরতলীর বিশেষ কিছু অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিকজীবন যে রকম —তার চিত্র রচনায় মগ্ন। উচ্চকণ্ঠ কোন জীবনতত্ত্বঅনুরূপ মহাকাব্যিক উপন্যাসের আধারে নয়—অনুগ্রসহিষ্ণু সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ শিল্পী উপন্যাসের সহজ গ্রন্থন-নৈপুণ্যে, জটিলতাকে বিক্ষোভহীন বিবেকে ধারণ ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক।

'সুখদুঃখের ঢেউ' উপভোগ্য উপন্যাস। সেই উপভোগ্যতাকে তিনি গভীর-সঞ্চারী করে তুলতে পেরেছেন কিনা—তা নিয়ে সমালোচক মহলে দ্বিধা রয়েছে। উপন্যাসে মানবচরিত্রের বোধ যখন সমাজবোধের সঙ্গে সমানুপাতিক মিশ্রিত হয় - তখনই তা গভীরতা-দ্যোতক পরিণাম লাভ করে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অনুচ্চারিত সমাজবোধের প্রচ্ছন্নতার মধ্য দিয়েই সত্যের সংগে পূর্ণ সাক্ষাৎকার ঘটেছে। তঁার আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল -'গোধূলি', 'শুক্লপক্ষ', 'ছাত্রী', 'বিলম্বিত লয়' প্রভৃতি।

খাঁটি উপন্যাস ছাড়াও নরেন্দ্রনাথ আর এক শ্রেণীর সাহিত্যাদর্শ সৃষ্টি করেছেন। আকারে সেগুলি মিতায়তন হলেও—গুণগত দৃষ্টিকোণে তাঁর মধ্যে গল্পধর্মিতার দিকটিই মূল শিল্পধর্ম। আর এ-কথা আমাদের অবিদিত নয় যে, ছোটগল্পের আঙ্গিকে সিদ্ধিই নরেন্দ্রনাথের করায়ত্ত। এ-গুলি হল উপন্যাস-কল্প বড় গল্প —যা সাহিত্য শিল্প লক্ষণে অধুনা 'নভেলেট' রূপে চিহ্নিত। এ-ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ হয়তো স্তবকের সামগ্রিক সৌন্দর্যের পরিবর্তে স্বতন্ত্র পুষ্পে স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান করেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই জাতীয় উপন্যাস-কল্প রচনাগুলি হল —'অক্ষরে অক্ষরে', 'সুরের বাঁধন', 'অনমিতা', 'পরম্পরা', 'সেতুবন্ধন', 'তিনদিন তিনরাত্রি', 'দেহমন' ইত্যাদি। গল্পের স্ফীত ও কৃত্রিম সংলাপকে বাদ দিলে নরেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনাগুলির অবস্থান তাঁর উপন্যাসগুলির পাশেই। এ সহাবস্থানেও তিনি একজন স্বতন্ত্র শিল্পী।

বাংলা উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনের আপাততুচ্ছ অংশ থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচিত জীবনরূপকেই তুলে এনেছেন। পারিবারিক জীবনের সমস্যা-পীড়িত জটিলতার মধ্যেও মানুষ ও তার আচার-আচরণের মধ্যে সংহতি বজায় রেখেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যমানের মধ্যেও আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে বিচার করেছেন—মানুষ কেন নীচতার আশ্রয় নেয়! বেঁচে থাকার তাগিদ তাকে সচেতনভাবে কেন ভ্রান্তির পাপে পতিত করে। সামান্যের মধ্যেও বৃহত্তের সেই মহাস্পন্দনকে তিনি দু' কান পেতে শুনেছেন।

জীবনের স্বাভাবিক সংরাগ যৌন আবেগ বা প্যাশানকে নরেন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে নানা পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে শিল্পসংযোগেই অনিবার্যভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন। তবে

সাধারণভাবে প্রায় সকল উপন্যাসেই পারিবারিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যৌনসমস্যাকে তিনি এনেছেন। 'চেনামহল' উপন্যাসে যৌন সমস্যা অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে মিশ্রিত হয়ে বিস্তৃতি পেয়েছে। 'দ্বীপপুঞ্জ' এবং 'দেহমন' উপন্যাস প্রধানত যৌন সমস্যামূলক।

মধ্যবিত্ত জীবনে উপন্যাসগুলির মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র আপোষমূলক মনোভংগীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি তাঁর শৈল্পিক স্বতন্ত্র অধিকার। গণতান্ত্রিক চেতনাগত মধ্যবিত্ত জীবনের কতকগুলি প্রধান মূল্যবোধ জীবনের সংগঠনমুখী চেতনায় নানাভাবে প্রতিফলিত —আর্থিক সাচ্ছন্দ্য, পারিবারিক জীবনে সমানাধিকার বোধ, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে সমানাধিকার, প্রেমাচরণের স্বাধীনতা, বিবাহিত বা বিবাহিতা জীবনেও স্বামী-স্ত্রীর অন্য পুরুষ বা নারীর প্রতি আকর্ষণ এ দাবীগুলিকে নরেন্দ্রনাথও তাঁর উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেই স্বীকৃত দিয়েছেন। উপন্যাসগুলিতে খণ্ড খণ্ড সংঘাতের আকারেই সমস্যাগুলি এসেছে। শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ সমস্যাগুলিকে প্রায়শঃই প্রাধান্য না দিয়ে আপোষে সমাধান চেয়েছেন। সুভদ্র-সংযত নরেন্দ্রনাথ পারিবারিক সংহতিকেই এ-ভাবে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন। নরেন্দ্রনাথের ভারতীয় মন তাই শুভ অবস্থায় একজন স্থিতধী শিল্পী। তাই অপ্রীতিকর জীবনের দিকগুলি বিষয়ে সজাগ হয়েও তার চিত্রণের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ নৈতিবাদী দৃষ্টিকোণ প্রয়োগে রাজী নন। স্বামী অসহায় এবং বেকার হলে স্ত্রীর বাড়িতে পুতুল তৈরী করে সংসার নির্বাহের আপ্রাণ কৃচ্ছ্রতাসাধনের মধ্যেও দেহরক্ষার জৈবিক তাগিদ নয়—নিঃসংশয়িত ভালোবাসার উজ্জ্বল মহত্তম প্রকাশ ও বিকাশ সেখানে স্বাস্থ্যকর-মানসিকতার জীবনমুখী প্রকাশ। ঈর্ষা-অসততা-হিংসা মানুষের মহত্ত্বকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত করতে পারে না। 'তিন দিন তিন রাত্রি' উপন্যাসে বাস্তবতাবোধের দ্বারা এই মহত্ত্বকে তিনি জয়ী করেছেন।

নরেন্দ্রনাথের উপন্যাস বা উপন্যাসকল্প 'নভেলেট' গুলি বিশ্লেষণ করলে শিল্পধর্মের দিক দিয়ে যে 'রিয়ালিজম্' বা বাস্তববাদ আমাদের বিস্মিত করে—তা হল, তাঁর এই বাস্তবতায় উচ্চকণ্ঠের কল্লোলীয় প্রতিবাদ নেই, প্রগতি-শিবিরের শ্লোগান ঘোষণায় তিনি আশ্চর্যরূপে নিরুচ্চার থেকেও সাধারণের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে বাঁধা। সমালোচকের যথাযথ বিচারে 'এ যেন এক অর্ধমনস্ক, প্রায় আত্মবিস্মৃত বাস্তববাদ।' সেই আপোষের মধ্যেও মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে কোমলতার আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়। নরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন -'সত্য যে কঠিন।' হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তার শাণিত দীপ্তিতে শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে নতুন করে চিনতে হয় তাঁর চিত্রিত 'রিয়ালিজমের' গোত্র স্বতন্ত্র। আর উপন্যাসে এই স্বাতন্ত্র্যের ধর্মকে নরেন্দ্রনাথ ছোটগল্পেরই প্রাণরসকে আভাসিত করেছেন। গল্পরচয়িতা নরেন্দ্রনাথের করায়ত্ত সিদ্ধি উপন্যাসেও সেই ছোটগল্পরীতির শিল্পবিন্যাসেই কেন্দ্রিত। তাঁর উপন্যাসের গঠনভঙ্গী সরল রৈখিক। মনস্তত্ত্বের কূট পরীক্ষায় 'উত্তীর্ণ' হয়েও সে রীতি বাহুল্যবর্জিত, শান্ত ও সাবলীল হয়েও অন্তর্মুখী। আপাতস্নিগ্ধ দৃষ্টিও প্রয়োজনে মর্মতলভেদী। ভাষারীতির স্পষ্টতা সতত-চলিষ্ণু জীবনের গতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 'চেনাহমল'-এর শিল্পী নরেন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতার যৎসামান্য মূল্যবোধকে বহুগুণিত করে জীবনে সত্যান্বেষণ ও সত্যপ্রতিষ্ঠার 'সূর্যসাক্ষী।'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ শিল্প-ব্যক্তিত্বের সংকট

উত্তেজিত, এমন কি প্ররোচিত রচনাও বলা যায়। কিন্তু বিতর্কিত সেই প্রবন্ধের মধ্যেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টির ভাবপ্রেরণার সন্ধান মেলে। প্রবন্ধের সিদ্ধান্তবাক্যটি নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, আপাতত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট এবং ঘোষিত জীবনাদর্শের পরিচয় নেওয়া যাক—

> "বাংলা দেশের আরো অনেক লেখকের মতোই আমিও কলম ধরে ছিলাম পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃসহ অগ্নিযন্ত্রণার মধ্যে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণ। পড়ছি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য', নজরুলের কবিতা, বাজেয়াপ্ত 'দেশের ডাক', 'ফাঁসির সত্যেন', আমাদের হাতে ঘুরছে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সবহারাদের গান', বিমল সেনের 'ফুলঝুরি'. প্রেরণা দিচ্ছে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'বেণু' পত্রিকা, কানে বাজছে প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই আশ্চর্য পংক্তিগুলো : 'দারুণ দেবতার ডাক যে পেল তার আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।' সে দিনের বালক মনে তখন একটি মাত্র সংকল্পই আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। যদি কলম ধরতে হয়, তবে তা দেশের জন্য : যদি লিখতে হয় তবে তা স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে দেবার জন্য।" ('শিল্পীর স্বাধীনতা', দেশ, ২০ পৌষ ১৩৬৯, পৃ. ৮৯৫)।

ত্রিরিশ সালে লবণ সত্যাগ্রহ বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স অবশ্য মাত্র বারো বছর, ফলে সেই সময়ে তিনি ঠিক কি দেখেছেন বা কতটা দেখেছেন তা বলা কঠিন। তবে দিনাজপুর জেলা স্কুলে পড়বার সময় হয়তো সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে। ১৯৩৪-৩৫ সালে তিনি ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে আই-এ ক্লাসের ছাত্র। সহপাঠী অচ্যুত গোস্বামী স্মৃতিচারণকালে জানিয়েছেন, 'যতদূর মনে পড়ে তার গায়ে ছিল খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি। গান্ধীজীর আইনঅমান্য আন্দোলন তখন সবে সাঙ্গ হয়েছে : সুতরাং একজন আদর্শনিষ্ঠ তরুণের মধ্যে তার ছাপ দেখতে পাওয়া তখনকার দিনে মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আলাপ করে বুঝলাম তারকনাথ যা বিশ্বাস করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করে। সেই সময়ে সে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী [বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শিবানন্দজীর কাছে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন] গান্ধীজীর নীতিতে পরম বিশ্বাসী' যুবসমাজের উন্নতির জন্য ঋজু কঠিন ব্রহ্মচর্যের আদর্শ দরকার বলে সে বিশ্বাস করে এবং যা সে বিশ্বাস করে তা সে অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করতে ইতস্তত করে না।' ('কিশোর তারকনাথের স্মৃতি', কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, পৃ. ৬১৯-২০)। কিন্তু বাংলা দেশে সে সময়টা

ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের কাল। 'উপনিবেশ' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক জানান, 'অহিংসার রাজনীতি থেকে বিপ্লববাদের পথেও পদক্ষেপ করতে হলো একদিন।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভাবের কথাও এখানে স্মরণীয়। গোপাল হালদার লিখেছেন, 'নারায়ণের বাল্য-কৈশোরের সন্ধিস্থলে তাঁর অগ্রজ, তরুণ শেখর গাঙ্গুলী ছিলেন সে দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের গোপন পথিক। নারায়ণের কাছে তাঁর সে রূপ গোপন ছিল না। নারায়ণের মনে সমতুল্য শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল দাদার মেধায় ও চরিত্রে। কলেজের প্রথম ধাপেই পুলিসের কবল থেকে সেই দাদা যে উধাও হয়ে যান আর বাড়ি-ঘরে তাঁকে নারায়ণ দেখেন নি বহু বৎসর। উত্তর প্রদেশের বিপ্লবী গোপন কর্মীর জীবন, সেখানকার নানা জেল ও দেউলির বন্দীনিবাস পেরিয়ে কর্মে ও মতে রূপায়িত হতে হতে ক্রমে আবার প্রকাশিত হয় সে প্রদেশের কৃষক আন্দোলনে—তারপর বিহারের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যমে-প্রয়াসে।' ('সংস্কৃতির সতীর্থ", কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, পৃ. ৪৯৫)। দাদার প্রতি শুধু শ্রদ্ধা ও আস্থা পোষণ নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে তরুণ বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, এবং সেই সময়েই পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃসহ অগ্নিযন্ত্রণা অনুভব করেছেন। তাঁর উপন্যাসে তাই তিরিশ ও চল্লিশের দশকের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু প্রেক্ষাপটরূপে ব্যবহৃত হয় নি, চরিত্রের অন্তর্বিকাশে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লক্ষণীয় যে, তাঁর প্রথম পর্বের অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কই বিপ্লবী আন্দোলনের শরিক। আবার পরবর্তীকালে শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতোই এই নায়কেরা কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, যার পরিণতি মার্কসবাদে দীক্ষাগ্রহণ এবং নতুন সমাজগঠনের স্বপ্ন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনও পর্যন্ত লেখা হয় নি। ফলে দিনাজপুর, ফরিদপুর ও বরিশালে তাঁর জীবনের তিনটি পর্ব সম্বন্ধে আমরা খুব অল্পই জানতে পারি। তুলনায়, ১৯৩৯ সালে কলকাতায় আসার পর তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনার অনেকটা ধারাবাহিক পরিচয় মেলে। অচ্যুত গোস্বামী পূর্বোদ্ধৃত স্মৃতিচারণে জানান, 'অনেক বছর পরে কলকাতায় এক ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে এসে তারকনাথের সঙ্গে আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎলাভ করি। জানতে পারলাম, সে এখন মার্কসবাদের প্রতি অনুরক্ত। ভারতবর্ষে *People's War* নামক পত্রিকাটিকেই সে একমাত্র সুস্থ মস্তিষ্কের পত্রিকা বলে মনে করে।' এখানে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের যে সাহিত্য-সম্মিলনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হয়েছিল ৩ মার্চ ১৯৪৫। তখনও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে কলেজে পড়ান, 'জলপাইগুড়ির ঔপন্যাসিক' হিসাবে সেখানে তাঁর উপস্থিতির কথা জানিয়েছেন চিন্মোহন সেহানবীশ। ৪৬ নম্বরের বুধবারের বৈঠকেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিয়মিত উপস্থিতির কথা জানা যায় সেহানবীশের বিবরণে, 'নারায়ণ গাঙ্গুলীর ধীর ও সবিনয় প্রস্তাবে অবস্থার মোড় ফেরার উপক্রম হতো।' (৪৬ নং ঃ একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, ১৯৮৬,

পৃ. ৯)। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, সেদিক থেকে দেশকালের পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁর পক্ষে কম্যুনিস্ট-পরিচয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব হয়েছে, 'আমি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য নই, কোনোদিন ছিলামও না। যতদূর জানি, কম্যুনিস্ট লেখক হতে গেলে এই চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হতে হয়, সক্রিয়ভাবে তার কর্মধারার অংশীদার হতে হয়, অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।' ('শিল্পীর স্বাধীনতা')। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও কম্যুনিস্ট লেখক হওয়া যায়, কম্যুনিস্টরা যাঁদের সহযাত্রী বলে অভিহিত করেন। আমরা দেখবো গোপাল হালদার থেকে শুরু করে সুশীল জানা[১] পর্যন্ত অনেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে পার্টির বন্ধু হিসাবে বর্ণনা করেছেন ('শিল্পীর স্বাধীনতা' লেখার পরেও)। শুধু অন্যের সাক্ষ্য বা মতামত নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে যেমন, তেমনই তাঁর প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে বিপ্লবী মার্কসীয় সাহিত্যাদর্শের স্বীকৃতি দেখা যায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে (১৯৪৮) তিনি লিখেছেন,

> "আসলে জীবননিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যই প্রগতিশীল হতে পারে—যদি তার দৃষ্টি সাম্যবাদের আদর্শে নিবদ্ধ থাকে। আর সেই সঙ্গে যদি সে যথাযথ শ্রদ্ধা নিয়ে স্বীকার করতে পারে তার বৈপ্লবিক উত্তরাধিকারকে, তাহলেই তার আদর্শ সার্থক হবে। আজ বিপ্লবী সাহিত্য আর প্রতিবিপ্লবী সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণে যেন অনেক বেশি সতর্ক হই আমরা। সাম্যবাদী শিক্ষায় মানুষকে দীক্ষিত করতে গিয়ে, আদর্শগত বিবর্তনের বাণীকে ঘোষণা করতে গিয়ে 'historical concreteness of the artistic portrayal' সম্পর্কে যেন আমরা অবহিত থাকি। অত্যুগ্র বিপ্লবের বাণী শুনিয়ে সাহিত্যে যারা অ্যানার্কিজম বয়ে আনছে, মার্কসবাদের নামে আনছে উন্নাসিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—Socialist Realism এর সংজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত থাকলে তাঁদের সম্পর্কে কোনো মোহই আমাদের থাকবে না। সাহিত্যে কে বিপ্লবী আর কে প্রতিবিপ্লবী, নিঃসংশয়ে এ থেকেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। ('প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য', নতুন সাহিত্য, বৈশাখ ১৩৫৫। দ্র. ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮০, পৃ. ১৫৮-৫৯)।"

অগ্রজ শেখর গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে একটি চিঠিতে (২৫ জুলাই ১৯৮৯) জানিয়েছেন, "খুব অল্প বয়স থেকে আমাদের দুজনের রাজনীতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কারণ ছিল আমাদের এক বড় জাঠতুত ভাই। উনি কয়েকবার স্বদেশী আন্দোলনে জেল খেটেছিলেন। ওঁর কাছ থেকে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক কথা এবং ইংরেজদের অত্যাচারে—জালিনওয়ালাবাগ ইত্যাদির কথা জানতে পারি। এতে আমাদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার এবং বিপ্লবের জন্য বলিদান দেবার ইচ্ছার সৃষ্টি হয়। তবে ঐ সময় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে আত্মদানের ইচ্ছা আমার

চাইতে নারায়ণের বেশি ছিল। কারণ তখন আমি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় বেশি প্রভাবিত ছিলাম। এ নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে অত অল্প বয়সেও প্রায় তর্কবিতর্ক হতো। কারণ বয়সের পার্থক্য খুব কম থাকায় আমাদের মধ্যে বড়-ছোটর সম্পর্কের চাইতে বন্ধুত্বের সম্পর্কই বেশি ছিল।

"কিন্তু ১৯৩০ সালে স্কুল যাবার রাস্তায় হুজুকে পড়ে আমি জেলে চলে যাই। এই ঘটনাকে আমাদের দুজনের জীবনের এক নির্ণায়ক ঘটনা বলা চলে। জেল থেকে ফেরবার পরে এ নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়।

"নারায়ণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সংবেদনশীল ছিল। ওর বক্তব্য ছিল যে আমাদের দুজনের মধ্যে কেবল একজন দেশের জন্য নিজেকে সমর্পিত করতে পারে। তা না হলে বাড়িতে অসুস্থ বাবাকে দেখাশোনা করবার জন্য কেউ থাকবে না। তাই, আমি আগেই নেমে পড়ায়, অত্যন্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, নারায়ণ আমাকেই সুযোগ ছেড়ে দেয়।

"আমি বিপ্লবী দলে যোগ দিই। অত্যন্ত তীব্র ইচ্ছাকে চেপে রেখে নারায়ণ বাকায়দা দলের সদস্য হয় না। কিন্তু সদস্য না হলেও নারায়ণ কেবল 'action' ছাড়া পার্টির অন্য সমস্ত কাজ করতে থাকে। বেআইনী কাগজপত্র, বই, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া আসা, লুকিয়ে রাখা, পলাতকদের আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া, খবর নেওয়া-দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজ ও পার্টির সদস্যদের মতোই করতো। পার্টির নেতারা ওকে খুব বিশ্বাস করতেন।

"সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর থেকে আমরা সুযোগ মতো খদ্দর ব্যবহার করতে আরম্ভ করি। বাবার এতে কোনো আপত্তি ছিল না—বরঞ্চ উনি এতে খুশি হয়েছিলেন। মনে হয় এই অভ্যাস নারায়ণ কলেজে পড়বার সময় বজায় রেখেছিল।

"সন ১৯৩৪ এর মধ্য থেকে বাড়ির সঙ্গে আমার অনেক দিন সম্পর্ক ছিল না। কারণ তখন থেকে ১৯৩৮এর মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি প্রথমে পলাতক অবস্থায় এবং পরে জেলে ছিলাম। এই সময় কানপুর জেলে আমার সঙ্গে কয়েকজন কম্যুনিস্ট নেতার দেখা হয়। এঁরা হরতালের জন্য জেলে ছিলেন। এঁদের সম্পর্কে এসে আমি মার্কসবাদী সাহিত্য ভালো করে পড়তে আরম্ভ করি এবং পরে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেব বলে মনস্থ করি।

"উত্তরপ্রদেশে প্রথম কংগ্রেস সরকার হওয়ার পরে, ১৯৩৮-এ আমি এলাহাবাদের নৈনি জেল থেকে ছাড়া পাই। ছাড়া পেয়ে আমি সোজা কানপুর চলে যাই এবং সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টির বাকায়দা সদস্য হই।

"এই সময় আবার আমার নারায়ণের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ হয়। ও তখন ছাত্র ছিল। আমি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছি জেনে নারায়ণ খুব খুশি হয় এবং আমাকে জানায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মতবাদ এবং কম্যুনিস্ট পার্টি এই বিচারধারার উদ্ভব—অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পার্টি।

"যাব যাব করেও এ সময় আমি বাড়ি যেতে পারি নি। কারণ পার্টির আদেশে

উত্তর প্রদেশের দুটি জেলায় পার্টি বানাবার কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে সময় করে উঠতে পারি নি।

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার অল্পদিন পরেই আমি আবার গ্রেপ্তার হই এবং প্রায় ৬ বছর পরে ১৯৪৫-এর শেষে ছাড়া পাই। ছাড়া পাবার কয়েকদিন পরেই আমি নারায়ণের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কলকাতা চলে আসি। কারণ আমি জানতাম যে পার্টির কাজের বোঝা তুলে নিলে আবার সময় করা মুশকিল হবে।

"নারায়ণ তখন কলকাতায় সিটি কলেজে অধ্যাপনা করছিল। ওর সঙ্গে আলোচনায় আমি জানতে পারি যে ও কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিতে আস্থাবান এবং পার্টির সমর্থক। কিন্তু ও কখনো পার্টির বাকায়দা সদস্য হয় নি। ছাত্রজীবনে বাবার কথা মনে রেখে, ইচ্ছা থাকলেও নারায়ণ কোনো ঝুঁকি নিতে সাহস করে নি। এখন নিজের কাজ এবং লেখা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে ওর পক্ষে পার্টির কাজ করা সম্ভব নয়। ওর মতে যদি পার্টির কাজ না করতে পারে তো সদস্য হওয়া অনৈতিক। তবে ও কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক এবং সেই হিসাবে যতদূর সম্ভব পার্টির কাজে সাহায্য করেছে, করছে এবং করবে। তারপর নারায়ণ হাসতে হাসতে বলেছিল—তোমার মনে আছে ছেলেবেলার কথা—যখন আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমাদের মধ্যে একজন সক্রিয় রাজনীতি করবো, আর তুমি ওটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে। ১৯৪৮ সালের পরে 'রনদিভের সময়ে'ও কম্যুনিস্ট পার্টির উপর ওর বিশ্বাস অটুট ছিল।

"বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সিদ্ধান্তের উপর ওর বিশ্বাসের মূলে চীন দ্বারা ভারত-আক্রমণ ভয়ংকর আঘাত দেয়। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত এই আঘাত ও সামলে উঠতে পারে নি। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিল। নারায়ণ কখনো মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক হয় নি।'

ভবিষ্যতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনাকালে এবং তাঁর সাহিত্য-কৃতির বিচারে শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা এবং ধারণা সহায়তা করবে জেনেই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি অপরিহার্য মনে হয়েছে। কৈশোরে নিজের দাদার মতো বিপ্লবীদলে আরও অনেক দাদার সন্ধান পেয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁদের বর্ণনা পাওয়া যাবে 'তিমির তীর্থ' (১৯৪৪), 'স্বর্ণসীতা' (১৯৪৬), 'মন্দ্রমুখর' (১৯৪৫), 'বৈতালিক' (১৯৪৮) এবং বিশেষভাবে 'শিলালিপি' (১৯৪৯) উপন্যাসে। তবে অল্প বয়সে বিপ্লবীদলের গোপন রহস্যময় কার্যকলাপ, সহিংস বিপ্লবের আদর্শ, আত্মোৎসর্গের উন্মাদনা যতটা অভিভূত করে, ততটা বিচারবোধ বা সমাজ বাস্তবতার পরিচয় দেয় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষত প্রত্যেক যুগের মতোই তিরিশের দশকেও রাজনীতি ক্ষেত্রে স্ববিরোধী অনেকগুলি ধারা-উপধারা মিলেমিশে একত্র অবস্থান করেছে। বিপ্লবী তরুণের পক্ষে গান্ধীজীর আইনঅমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়া যেমন অসম্ভব ছিল না, তেমনি কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য সাম্যবাদী চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়াও অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে সব কিছুর

মধ্যেই কাজ করেছে এক ধরনের রোমাণ্টিক আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা। প্রথম উপন্যাস 'তিমির তীর্থে' একদিকে ঝড়ের বর্ণনা—'ঝড় আসিল এবং বহিয়া গেল। ভাঙিয়া-চুরিয়া যাওয়াটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।... যাহারা আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল, জীবনের সূর্যোদয়-সম্ভাবনায় যাহারা বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহারা তিরোহিত হইল অন্ধকারের পটভূমিকায়।' অন্যদিকে ঝড়ের খেয়ার সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা—'ধারা কি এমনিই চলিবে—অনন্তকাল ধরিয়া, যুগ-যুগ, কাল-মহাকাল ধরিয়া? ঝড়ের যে ডঙ্কা বাজিল, তাহার আহ্বানে কোথাও কি সাড়া জাগিল না? মানুষ এতকাল ধরিয়া সুন্দরের যে তপস্যা করিয়াছে, এমনি করিয়াই কি তাহা চিরন্তনের চক্রাবর্তে বিলীন হইয়া যাইবে?' এ যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতারই গদ্যভাষ্য—'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন? / নিদারুণ দুঃখরাতে / মৃত্যুঘাতে / মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা / তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?' কিন্তু প্রতিধ্বনি এখানে ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করেছে কি না, এ প্রশ্নও জাগতে পারে উপন্যাস-পাঠকের মনে।

১৯৪২ সালে জলপাইগুড়িতে আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনাকালেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রগতি সাহিত্যান্দোলনে যোগ দিয়েছেন। এই সময় কলকাতায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, আর তার কয়েকমাস পরে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতছাড়ো আন্দোলনের সূচনা। ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন ওঠে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে তা কিভাবে ভাবিয়েছে জানা যায় না। 'মন্দ্রমুখর' উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে ১৯৪২-এর ১২ আগস্ট। 'নির্যাতন ও কারাবাস যার বিদ্রোহী প্রাণকে অবদমিত করতে পারেনি, সেই অক্লান্ত দেশকর্মী মেজদা শ্রীশেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে' উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছে। আমরা জানি শেখরনাথ সে সময় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, এবং ৪২-এর আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ ছিল বলে মনে হয় না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্ভবত জলপাইগুড়িতে বসে আন্দোলনের উত্তাপ-উত্তেজনা অনুভব করেছেন, কিন্তু তঁর ভূমিকা দর্শকের ভূমিকা। ফলে 'মন্দ্রমুখর' রিপোর্টাজ হিসাবে মূল্যবান হলেও উপন্যাস হিসাবে দানা বাঁধে নি। 'তিমির তীর্থে'র মতো এখানেও ভাবীকালের ইঙ্গিতের মধ্যে কাহিনীর সমাপ্তি -'ভাতারমারীর মাঠ, মরা দিঘির উঁচু পাড়ি আর টিলার নিচে এক সংগ্রামের রক্তাক্ত স্বাক্ষর রয়ে গেল। জ্বলে-যাওয়া গ্রাম আর মরা-মানুষের ভাঙা পাঁজরে যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রইল তা উদ্ধার করবে আগত-কালের প্রত্নতাত্ত্বিক, স্বাধীন-ভারতের ঐতিহাসিক। এখানে তা লেখবার অধিকার নেই।· যাদের সামনে পথ ছিল না, যারা শুধু নতুন সূর্যের আলোতেই প্রাণ পেয়েছিল, তাদের বুলেটবেঁধা বুকের রক্তের ছাপ আর পুড়ে-যাওয়া ঘরের কালো কালো খুঁটিগুলি দিক্-নির্দেশক হয়ে রইল আগামীকালের সৈনিকের জন্যে। রাত্রির তপস্যা দিন আনবেই—এ বাণী কবির নয়, দার্শনিকের নয়, মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষেরই।' অবশ্য ইতিমধ্যে পরিবর্তন কিছু ঘটেছে, 'শান্ত-নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বিগ্ন ভারতবর্ষ', মনু-পরাশরের

ভারতবর্ষ'কে বুঝি আর রক্ষা করা সম্ভব নয়। আগস্ট বিপ্লবের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে আরও বড়ো বিপ্লবের সম্ভাবনা, আর কম্যুনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ সেইভাবেই দেখেছিলেন এই বিস্ফোরণকে—'যা হারিয়েছ, যা ত্যাগ করেছ —যতখানি রক্ত দিয়েছ — তার ঋণ একদিন শোধ করবেন বিশ্বের ভাণ্ডারী। কিন্তু ভুল করেছিলে ভাই—বিপথে গিয়েছিলে। আত্মস্থ হও—প্রকৃতিস্থ হও। বিপ্লবের প্রদীপকে নিবিয়ো না—বুকের রক্ত দিয়ে জ্বালিয়ে রাখো—ঐক্যবদ্ধ হও —শক্তি অর্জন করো। আকস্মিক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ নয়—গণসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।'

কাকে বলে ভুল, আর কোন্‌টা বিপথ —তা কে জানে! 'শিলালিপি'র রঞ্জন যখন যুগান্তর পার্টি'তে যোগ দেয় তখন তার মনে হয়েছে, 'উনিশশো তিরিশ সালের অহিংস সত্যাগ্রহ পরাজয়ের একটা কুৎসিত অপচ্ছায়া—ঐ ছায়াটাকে দূর না করা পর্যন্ত শান্তি নেই, বিশ্রামও নেই।' দাদাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে পরম প্রত্যয়ের সুর, 'আমাদের এই যুগান্তর পার্টি'। মানিকতলা বোমার মামলার ইতিহাস পড়েছ তো? সেদিনের সেই বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয়ে যায় নি। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, বাঘা যতীনের পার্টি'। সে মরতে পারে না, আমরা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, যতদিন স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন বাঁচিয়ে রাখবই।' কিন্তু মাত্র তিন বছর (১৯৩০-৩২), তারপরই নিজেদের মধ্যে বিরোধ, অনৈক্য—পথ আর বিপথ, ঠিক আর ভুল নিয়ে ঝগড়া। এ শুধু যুগান্তর আর অনুশীলন দলের বিরোধ নয়, আরও গভীরে ছড়িয়ে গেছে তার শিকড় —'দেশব্যাপী যে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা ছিল নেতাদের, যে প্রত্যাশা ছিল ভারতবর্ষে'র প্রতিটি প্রান্তে চট্টগ্রামের মতো অগ্নিযজ্ঞ জাগিয়ে রাতারাতি ইংরেজের শাসন পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া—সে আশাকে এখন মরীচিকা মনে হয়, মনে হয় তা আকাশকুসুমের চেয়ে বেশি নয়। এ হয় না, এ হতে পারে না।' কেন, তাও রঞ্জনের অজানা নেই —'অবধি নেই দলাদলির। প্রত্যেকেই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, প্রত্যেকেই কাজে নেমেছে প্রাণের ভেতর আগুন জ্বেলে, নিজের সর্বস্ব বিসর্জনের সংকল্প করে। কিন্তু এই মৃত্যুঞ্জয়, এই নির্ভীক মানুষগুলো কেন নিজেদের মুক্ত করতে পারে না দলাদলির ক্ষুদ্রতা থেকে? পরে রঞ্জন জেনেছে, শুধু এই দুটো দলই নয়—আরো আট-দশটা দল-উপদল আছে এবং পরস্পর সম্পর্কে তাদের বিদ্বেষ আর সন্দেহের যেন অন্ত নেই। শুধু তাই নয়। সংগঠন একটু জোর বেঁধেছে কিংবা হাতে দুটো একটা অস্ত্র এসেছে —তাহলেই আর যেন বীরত্বের লোভ সামলাতে পারে না তারা। অকারণে দুটো-চারটে মানুষকে হত্যা করে বসে এবং সেই প্রত্যক্ষ ফলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটাই ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায়।' হয়তো এই আত্মজিজ্ঞাসাই রঞ্জনের মধ্যে গভীরতর যথার্থ সমাজজিজ্ঞাসা জাগাতে পারতো, অন্তত 'লালমাটি'র মধ্যে সে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোনও কিছুরই ভিতরে প্রবেশ না করে উপর থেকে দেখার পরিণাম এক ধরনের ভাবালুতা, যার নিদর্শন মিলেছে 'তিমির তীর্থে' মুসলমান সমাজের ক্ষেপে ওঠার চিত্রের মধ্যে, আর মুন্‌সি সাহেবের থর থর করে কাঁপা উদাত্তকণ্ঠের ভাষণে, 'মানুষকে যারা মানুষের বিরুদ্ধে ভুল বোঝায়, অন্যের

পরামর্শে যারা নিজেদের বুকে ছুরি মারতে চায়, আল্লা তাদের কোনোদিন দয়া করেন না।' আবার 'লালমাটি'তে চল্লিশের দশকে আলিমুদ্দিন মাস্টারও সেই একই ভাবে বলে ওঠেন, 'ধর্মের নাম নিয়ে শয়তানি বরদাস্ত করা যাবে না।...হিন্দু হোক মুসলমান হোক পণ্ডিত হোক মৌলবিই হোক —শয়তান আর অত্যাচারীর জায়গা নয় পাকিস্তান। আজাদী রসুলের নাম নিয়ে আমরা গড়বো আজাদী দুনিয়া—সমস্ত শঠ-বঞ্চকদের নিকাশ করবো সেখান থেকে।' কিন্তু কেমন করে? শুধু উদাত্ত আহ্বানই কি যথেষ্ট? কংগ্রেস বা মুসলিম লীগকে নিয়ে বিপ্লবী দলের তেমন কোনও চিন্তা ছিল না, কিন্তু চল্লিশের দশকের রঞ্জন যখন কৃষাণ সমিতির কাজ করছে তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

কৈশোরে রঞ্জন যখন রুশ বিপ্লবের কাহিনী পড়েছে ('নতুন নেতার হাতে গড়া একটা দেশ।.. সমস্ত মানুষের রাষ্ট্র, তোমার আমার চাষার শ্রমিকের সকলের গড়া রাষ্ট্র।') তখন অভিভূত হলেও দেশ থেকে ইংরেজ তাড়ানোই তার বা বেণুদার প্রাথমিক কাজ মনে হয়েছে। কারাবাসকালে বা কারামুক্তির পর বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই আদর্শচ্যুত হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ আছে 'শিলালিপি'তে। 'বৈতালিক' উপন্যাসের 'ঘটনাকাল ১৯৩৪ সাল। যখন বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সমাপ্তি-যুগ আর গণ-আন্দোলন আসবার মুখে।' বিপ্লবী অতুল মজুমদারের কাজ শেষ হয়েছে, চামারহাটির মুচিদের ছেলে তরুণ যোগেন বা প্রবীণ মানীলোক মহিন্দর রুইদাস সেই কাজের ভার নিয়েছে, আলকাপের গায়কের কণ্ঠরোধ করা বুঝি আর সম্ভব নয় 'মহাজন রক্তচোযা / জমিদার ফোঁস মনসা ' দারোগা সে লাটের ছাওয়াল / মোদের হৈল কাল।' কিন্তু এখনও যেন সব ব্যাপারটা অস্পষ্ট, যোগেন চরিত্রটির প্রতি লেখকের বিশেষ পক্ষপাত থাকা সত্ত্বেও তার রাজনৈতিক চেতনা মহিন্দর রুইদাস বা হারানের থেকে খুব বেশি পরিণত নয়।[২]

'বৈতালিকে'র অনেক পরে 'মহানন্দা' (আশাদেবীর অনুমান ১৯৫৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)। 'মহানন্দা'র নায়ক নীতীশ একদা বিপ্লবী দলের নির্দেশে ডাকাতি করে দীর্ঘ বারো বছর কারাবাসের পর গ্রামে ফিরেছে। বিপ্লবী তরুণদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করেছে, যেমন খগেন— 'এ পথ খগেনের ছিল না, এর সংস্কার স্বাভাবিক ছিল না ওর রক্তের ভেতরে। সেই বিশেষ বয়সে কৈশোরের একটা উন্মাদনা প্রতিদিনের পরিচয়ে আকীর্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল পথটার সীমা ছাড়িয়ে একটা অনিশ্চিতের রহস্য রোমাঞ্চিত অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার নেশা খগেনকে সেদিন ডাক দিয়েছিল। ছেলেবেলার অনেক মোহ, অনেক মানসিক বিলাসের মতো এটাও যথানিয়মে একদিন খগেনকে মুক্তি দিয়েছে—বিশেষ করে তিন বছরের জেল খেটে আসাটা ভালো করেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়েছে ওকে।' কিংবা 'রাজবন্দী প্রকাশ নয়, ব্যাঙ্কের কেরানি, নীল খামে বৌকে চিঠি লেখা প্রকাশ দত্ত' যে আজ 'লাল-বিপ্লবীদের উৎপাতে প্রায় ঝালাপালা' হয়ে উঠেছে—এটাই যেন স্বাভাবিক পরিণাম। আসলে বিপ্লবপন্থা সম্বন্ধে প্রাক্তন্ বিপ্লবীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে; শুধু

'মহানন্দা'য় নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিণত বয়সের একাধিক উপন্যাসে শোনা যাবে বিপ্লবীদের আত্মসমালোচনা—'জেলে বসে যা পড়াশুনো করেছে তাতে অবশ্য এটা বুঝেছে যে আগেকার মতে চলে আর এখন লাভ নেই, তিনটে সাহেবকে সাবাড় করে আরো তেত্রিশটাকে ডেকে আনা হবে মাত্র। তাতে না মেলে দেশের সহানুভূতি, না পাওয়া যায় সহায়তা। সুতরাং বেশ বড় করে আরম্ভ করা দরকার। সমস্ত মানুষের হাতে হাতিয়ার তুলে দেওয়া চাই, তিনটে রিভলভার আর দুটো পিস্তলের কাজ নয়।'* তাহলে কি শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে'র রমেশের মতো গ্রামোন্নয়ন বা গ্রামসংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে নীতীশ? কিন্তু স্কুলের ছাত্র ফেডারেশনের সেক্রেটারি অলকার মুখ দিয়ে এই ধরনের কাজের সমালোচনা সম্ভবত নতুন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ লেখকের নিজেরই বক্তব্য—'ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে যোধপুর [গ্রাম] স্বাধীন হতে পারবে না। চল্লিশ কোটি মানুষের হিসাব না রেখে তিন হাজার মানুষের ভেতরে বিপ্লব অসম্ভব। যে কাজের ভেতর দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন আপনারা, তার পরিণতিও তো চোখেই দেখেছেন। বিপ্লবের পেছনে অনেকখানি সংগঠন চাই, অনেক বড় আয়োজন চাই। সব সমস্যার মূল সেইখানেই আছে।' শ্যামনগর বম্-কেসের হিমাংশু কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে নীতীশকে যখন তাদের দলে যোগ দিতে আহ্বান জানায় তখন প্রাথমিক দ্বিধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের সামিল হয়ে নীতীশ আহত হয়। তার মুখে শুনতে পাই, 'তোমাদেরই দলে নেমে এলাম। কতদূর চলতে পারবো জানি না, হয়তো পার্থক্যও থেকে যাবে দৃষ্টিভঙ্গির। কিন্তু সেটা বড় নয়। লড়াই যখন শুরু হয়ে গেছে তখন ভবিষ্যৎ ভারতে শাসনতন্ত্র কী হবে, তা নিয়ে ভাবনা না করে পথে নেমে পড়াই সবচেয়ে বেশি দরকারি।' কিন্তু 'নেমে' আসার প্রশ্ন ওঠে কেন, আর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নিয়ে, ভাবনা না করে পথে নেমে পড়া কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীর কাছে প্রত্যাশিত কি না তাও বলা মুশকিল। বিশেষত পাশে যখন আছে অলকা—'অলকার প্রবল একটা আগ্রহ জাগছে নীতীশের মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিতে—কপালের উপর আঙুল বুলিয়ে পরম যত্ন আর একাগ্রতায় তার সমস্ত যন্ত্রণা মুছে দিতে।'

বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার মধ্যে এক ধরনের তাৎক্ষণিক ভাবোত্তেজনা, রোমান্টিক আদর্শবাদ কাজ করেছিল। কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার মধ্যেও কি সেই একই ধরনের আদর্শবাদ কাজ করেছিল? অবশ্য যেখানে বুদ্ধি-বিচার কাজ করে, মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পথের সন্ধান মেলে, সেখানেও স্ববিরোধিতা আছে, মধ্যবিত্তসুলভ পিছুটান অনেক সময়েই ভাববাদী দর্শনের মধ্যে নৈতিক সমর্থন খোঁজে। 'নির্জন শিখরে'র (১৯৬৮) অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্য বালক বয়সে বিপ্লবীদলের সিদ্ধার্থের সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তার সঙ্গে মত ও পথের মিল নেই বলে দূরে সরে গেছেন, তিরিশ সালের সত্যাগ্রহের ডাকও অগ্রাহ্য করেছেন, আর আজ মার্কসবাদকেও গ্রহণ করতে পারছেন না। ছেলে বারীন যখন বলে 'বাবা, তোমার মার্কস পড়া উচিত।' তখন তাঁর মনে হয়, 'মার্কস? ফয়েরবাখ্—হেগেল

পর্যন্ত আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মার্কস? দর্শন কি শুধু অর্থনীতির সূত্রেই বাঁধা? তার বিস্তার নেই—প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে কোথাও জ্যোতির্ময় মুক্তি নেই তার? তাহলে তো মিল-হিউমকে আমি দার্শনিক বলে স্বীকার করতুম।'

কিন্তু আসল আপত্তি মার্কসবাদে নয়। বরং বারীন যখন রাজনীতির পথ ছেড়ে আখের গোছানোর কাজে 'ম্যানেজ' করার নীতি গ্রহণ করেছে তখন অধ্যাপক-পিতার ক্ষোভের অন্ত থাকে না—'আমি ওদের রাজনীতি মানি নি। আমি বারীনের মতো মার্কসিজমকেই মানুষের শেষ আদর্শ বলে বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু ওর বন্ধুদের মধ্যেই কি দেখি নি—কাকে বলে ত্যাগ—কার নাম দুঃখবরণ? কেমন করে ভুলব তার কথা—পুলিশের রাইফেলের সামনে যে বুক তুলে ধরে কলকাতার পথে রক্তের স্বাক্ষর রেখে গেল? কেমন করে তাকে ভুলব—ফিল্ডওয়ার্ক করে করে যে আজ যক্ষ্মায় ভুগছে,—হয়তো বাঁচবে, হয়তো বাঁচবে না? কেমন করে তাদের আমি অস্বীকার করবো—যারা ক্যারিয়ারের সব স্বপ্ন চোখ থেকে মুছে ফেলে তিল-তিল আয়ু দিয়ে গড়ে তুলছে আন্দোলন—ঘুরছে গ্রামের কাদাভরা দুর্গম পথে পথে, কারখানা আর বস্তির আটকানো আবহাওয়ায়—যাদের চোখে আর এক ভবিষ্যৎ নতুন অরুণোদয়ের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে? তাদের বিদ্রে করলো বারীন?' মার্কসবাদীদের মতো, বিপ্লবী আন্দোলনকে 'ওগুলো সব পোলিটিক্যাল অ্যাডভেঞ্চারিজম' বলতে পাবেন না দেবনাথ, আবার তিরিশের সত্যাগ্রহ বা বিয়াল্লিশের রক্তঝরা পথে নামতেও পারেন না অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে। অথচ এর নিন্দা বা বিরোধিতা বা সমালোচনাও পারেন না সহ্য করতে। মধ্যবিত্তের এই আত্মসংকট দক্ষতার সঙ্গে উপন্যাসে চিত্রিত, কিন্তু এরই মধ্যে ঔপন্যাসিকের বিশ্বাস তথা জীবনদর্শনের ভিতও নড়ে যায়—'আমি রাজনীতির কাছাকাছি অনেকবার এসেছি। [কিন্তু] আমি রাজনীতি করতে পারি নি, আমার চরিত্রের মধ্যে তা ছিল না। ভীরুতা? হতে পারে। আমার যেখানে শান্ত মৌন, তার [অর্থনীতির ছাত্র বারীনের] সেখানে উদ্ধত কোলাহল—কলকারখানার আওয়াজ—মিছিলের শ্লোগান। দর্শনের জন্য নির্জন শিখর, পোলিটিক্যাল ইকনমির জন্যে মন্দ্রিত সমুদ্র।' নির্জন শিখরেই অবস্থান, অথচ তার জন্য তীব্র যন্ত্রণাবোধ। ফ্লোবেরের সঙ্গে তুলনাও কি তাই শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য? নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবতে ভালো লাগে, 'আমরা সেই ফরাসি লেখক গুস্তাভ ফ্লোব্যারের মতো—যখন সমস্ত দেশটা যুদ্ধের আগুন আর পরাজয়ের অপমানে পুড়েখাক হয়ে যাচ্ছে, তখন নিজের থিওরির জগতে—অনাবশ্যক ভাবনার গজদন্ত-মিনারে স্থির-স্থবির হয়ে বসে থাকি। ভুষণ্ডীর কাকই পৃথিবীর সর্বকালের সেরা দার্শনিক।' কিন্তু তিনি ফ্লোবের-গোত্রের লেখক নন। তিনি তো শুরু করেছিলেন মিখেইল শোলোকভকে সামনে রেখে ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে। আর তাই সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকে পিছনে রেখে অন্তর্মুখী আত্মবিশ্লেষণের, হয়তো আত্মরতির অবলম্বন সহজ ছিল না তাঁর পক্ষে।

আমরা জানি ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্কলহ কিভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিচলিত বিমূঢ় করেছে—'কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সময় দেখেছি তাঁর যন্ত্রণাকাতর মুখ। এটা তাঁর কাছে রাজনৈতিক সংকট তো ছিলই, ব্যক্তিগত সংকটও ছিল। কারণ উভয় পক্ষেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিলেন,। দুদিকের দুই বিপরীতমুখী টানে তিনি দীর্ণ হতেন।' (চিত্তরঞ্জন ঘোষ, 'পড়শী', পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, পৃ ৪৪৬)। তারপর ১৯৬৭-৬৮ সালের সেই উত্তাল দিনগুলি, যখন তরুণ কম্যুনিস্টরা সন্ধান করেছে নতুন পথের। কিন্তু সেই জন্যই কি 'তৃতীয় নয়নে'র (১৩৭৬) ভূপেশের মতো লেখককে বলতে হবে—'সতেরো বছরের বিশ্বাস যদি একদিন হঠাৎ দেউলে হয়ে যায়, তাহলে দাঁড়াবারও আর জায়গা থাকে না।' কোনও সন্দেহ নেই ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একই সঙ্গে নীতিগত এবং স্বার্থগত বিরোধ প্রকট করে তোলে, যার পরিণাম ১৯৬৪ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণা। শেখর গঙ্গোপাধ্যায় যদিও জানিয়েছেন, 'জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিল। নারায়ণ কখনো মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক হয় নি।' কিন্তু 'সমর্থক' শব্দের তাৎপর্য আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। কলেজে দীর্ঘদিনের সহকর্মী সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য এদিক থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, 'নারায়ণবাবুর রাজনীতি-জিজ্ঞাসা ছিল। সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন সমর্থক-সমালোচক। পার্টিম্যান হলে যে গোঁড়ামি ও মতান্ধতা প্রায়ই প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিচ্যুতি ও বিকৃতিকেও সমর্থনের প্রবণতা দেখা দেয়, পার্টিম্যান না হওয়ায় নারায়ণবাবুর তা ছিল না। স্বাধীনচিত্ততা অনেকখানি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এতে আমাদের লাভও হয়েছিল।' ('নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে', কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, পৃ· ৫০৪)। অবশ্য সবটুকু 'লাভ' কি না বলা কঠিন। সমালোচনা, বিশেষত আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচনা করতে গিয়ে তা যদি মার্কসিজ্‌ম বা কম্যুনিজ্‌মের প্রতি অনাস্থায় পরিণত হয় তাহলে সমালোচনাও সেখানে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ভূপেশের যন্ত্রণা ও ক্ষোভ বুঝতে পারি না তা নয়—"তারপর ঘুলিয়ে উঠলো রাজনীতির আকাশ। ইন্দো-চায়না বর্ডার ক্ল্যাশ্‌। দেখতে দেখতে অশোভন বিশ্রী রূপ নিল। হিমালয়ের অম্লান তুষার কলুষিত হলো মানুষের রক্তে—'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' কলঙ্কিত হয়ে গেল ঘৃণায়, কটুভাষণে, রাইফেল-মর্টার-বোমার শব্দে। ··চিরদিন যারা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি—তারা এক মুহূর্তে এ ওর বীভৎসতম শত্রু হয়ে উঠলুম। দুদিন আগেও যাদের একান্ত আপনার বলে জেনেছি—কটুতম অর্ধ-সত্য, অসত্য আর কুৎসার বিষ ছড়িয়ে তাদের আমরা দূর-দূরান্তে সরিয়ে দিলুম। যে-মানুষটা এতদিন তিলে তিলে রক্ত দিয়েছে—চূড়ান্ত দুঃখবরণ করেছে, তাকে অসংকোচে বলতে পারলুম 'স্পাই'! যে-নেতার কথায় দুদিন আগে পুলিশের রাইফেলের সামনে প্রাণ দিতে পারতুম—তারদিকে আঙুল বাড়িয়ে স্পষ্ট গলায় ঘোষণা করলুম ঃ ট্রেটার—পুলিসের ইনফর্মার!" কিন্তু শুধু এই জন্যই কি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে এতকাল পরে এই রকম চড়া গলায় ঘোষণা করতে হলো—

"আমি পেশায় অধ্যাপক, সুতরাং একটা স্বাভাবিক কৌতূহলেই আরো দশটি জিনিসের সঙ্গে কমিউনিজ্‌ম সম্পর্কেও কিছু পড়াশুনো করেছি— কিন্তু তা নিতান্তই সামান্য ; এই আদর্শের কর্মপদ্ধতির সঙ্গেও আমার কোনো যোগ নেই। অতএব কম্যুনিস্ট লেখক হওয়ার গৌরব বা অগৌরব যাই বলুন—আমার পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব হয় নি।
দেশের শুভাশুভের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রয়োগফলের উপরেই যে কোনো মতবাদকে আমি বিচার করি। আজ দেখছি, কমিউনিজ্‌ম চৈনিক পররাজ্যলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হয়েছে। এই কমিউনিজ্‌ম আমার শত্রু, সমস্ত মানবতার শত্রু। আমার লেখায় তার বিরুদ্ধে ধিক্কার সহস্রকণ্ঠে ফেটে পড়ুক।" ('শিল্পীর স্বাধীনতা')

এ কথা থেকে কি মনে হয় না যে, কম্যুনিজ্‌ম সম্বন্ধে আগ্রহ-আকর্ষণের ('একটা স্বাভাবিক কৌতূহল') মধ্যে কোথাও একটা সাময়িক উত্তেজনা কাজ করেছে, যা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত? অবশ্য এর মধ্যে ভুল বোঝার ব্যাপারও থাকতে পারে, বিশেষত ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ অনেক সময়েই কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীর পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ হয় নি (প্রসঙ্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়বে)। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময়ে এক ধরনের সুবিধাবাদী মনোভাব কম্যুনিস্টদের আচরণেও প্রকাশ পেয়েছে, যার প্রক্রিয়া ও পরিণাম ঐতিহাসিকের বিচার্য। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যখন জীবনসায়াহ্নে 'স্রোতের সঙ্গে'[৪] উপন্যাস লেখেন, তখন তাঁকে 'ডি-পোলিটিক্যালাইজ্‌ড' বলা যাবে কি না সন্দেহ (তুলনীয়, 'মহানন্দা'র প্রকাশ), কারণ তিনি তো 'কৃষ্ণচূড়া'র নায়ক ঔপন্যাসিক কিরণ বসু নন যে তার সম্বন্ধে ভাবা যাবে—'এখন কোনোমতে একটা অস্তিত্ব টেনে নিয়ে চলা, তারই ফাঁকে ফাকে কিছু যন্ত্রণা আর খানিক বুদ্ধির আবর্ত ফেনিয়ে তোলা—এর বেশি কী আর করা যায় বাংলা দেশে? কিরণ যদি রাজনীতি করতো, যদি পলিটিক্যাল নভেল লিখতে পারতো, তাহলে অন্তত মানুষকে একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারতো সে। কিন্তু সে তো পলিটিক্‌সে বিশ্বাস করে না।' 'রাজনীতি' না করলেও 'পলিটিক্‌সে' বিশ্বাস করা যায়, আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সেই বিশ্বাসের পরিচয় মেলে সর্বত্র। 'এই কমিউনিজ্‌ম আমার শত্রু' হতে পারে, কিন্তু অন্য কোনও কমিউনিজ্‌মের সন্ধান চলেছে সারা জীবন।

একে কি মেঘের উপর প্রাসাদ রচনার প্রয়াস বলবো, না কি 'ভস্মপুতুল' মধ্যবিত্তের শুধু স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া? স্বাধীনতার পর 'ছিন্নমূল কতগুলো অগোছালো সংসারে প্রত্যেকদিন ক্রোধ, ঘৃণা, অবিশ্বাস, প্রতিবাদ আর নৈরাজ্যচেতনা' কি ভাবে দেখা দিয়েছে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তা জানা ছিল। কিন্তু 'স্রোতের সঙ্গে' উপন্যাসে প্রবীর বা প্রতুল যে-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, তার সঙ্গে উদ্বাস্তু-জীবনের কোনও যোগ না থাকলেও ১৯৬৭-৬৮ সালের টালমাটাল দিনগুলি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার যুবক হয় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেয়, অথবা ওয়াগান ব্রেকারদের দলে যোগ দেয়—এমন ধারণা

এই সময়কার উপন্যাসে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল (সমরেশ বসুর কয়েকটি উপন্যাসের কথা মনে পড়বে)। এর ব্যাখ্যা ছিল এই রকম—'আসলে বাতাসটাই কালো হয়ে যাচ্ছে। কারো নিস্তার নেই। বস্তিতে এপিডেমিক লাগলে পাশের প্রাসাদের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে দিয়েও ব্যাক্‌টেরিয়াকে ঠেকানো যায় না!' কিন্তু বামপন্থী নেতারাও যুক্তফ্রন্টকে ব্যাক্‌টেরিয়ার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারলেন না? এ কথা অবশ্যই সত্য যে, 'সময়ের চেহারাটা বড্ড তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। সমস্যাগুলো নিষ্ঠুর আর বাস্তব হয়ে উঠছে, তাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে সব, পথ জটিল হচ্ছে—যারা নেতৃত্ব নিচ্ছে তারাও সমস্তটা মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না।' কিন্তু তাই বলে 'একটা বছরও বত্রিশ পয়েণ্টের উপর স্টিক্ করতে পারলো না। কী কৈফিয়ৎ দেব লোকের কাছে?' আসলে 'যখন মনে হয়েছিল সমাজতন্ত্রবাদী শক্তিগুলো সব এক হয়েছে, হাতে হাত মিলিয়ে, পথের নিশ্চিত করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন চাকাটা ঠিক উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করলো। শ্রমিকের সংহতি ভাঙছে, কৃষক কৃষকের বিরুদ্ধে হানাহানিতে নেমেছে; ছাত্র, মধ্যবিত্তের সংগ্রামী শক্তি এ ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। লেনিনের শিক্ষার কোথায় মেলে? অত্যাশ্চর্য আজকের এই বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্ব! প্রত্যেকেরই উত্তর অতি সহজ এবং সোচ্চার। আমরাই মাত্র নির্ভেজাল বিশুদ্ধ বিপ্লবী। বাকি সবাই প্রতিক্রিয়াশীল, ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশী গুপ্তচর। সুতরাং হাতে-কলমে এবং মুখে পরস্পরের মুণ্ডপাতই বিপ্লবকে এগিয়ে আনবার রাজপথ—অটো বান্!' এতো শুধু প্রবীরের কথা নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই যেন ক্ষোভে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বলে ওঠেন 'চীন আর সোভিয়েটের মধ্যে নীতিগত প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিতে পারে তাই বলে আমাদের স্বার্থও বদলে গেল? Of the entire people, against the enemy of the entire people—এই সেই একতার নমুনা কোন্ পাকে ঘুরছে বিপ্লবের চাকা?' 'মুখ্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য কোন্দলে গলা চড়াচ্ছেন—কী রমণীয় যুক্তফ্রণ্টের চেহারা? ওদিকে আর এক নেতা দিনক্ষণ গুণে ঘোষণা করছেন এই মন্ত্রিত্বের বারোটা বাজবে। খাসা চলছে! আর শ্রমিক ঝরাচ্ছে শ্রমিকের রক্ত, কৃষক কৃষকদের ঘরে আগুন দিচ্ছে। আমরা দায়ী নই—ওরা। ওরা কারা? প্রতিবিপ্লবী? তাছাড়া আর কী আলাদা পার্টি যখন!'

মনে হয়, ক্রমশ এক ধরনের হতাশা নৈরাশ্য গ্রাস করছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে, পলিটিক্যাল বিশ্বাস আর রক্ষা করতে পারছেন না, নৈরাজ্যবাদী মনোভাবও প্রচ্ছন্ন থাকছে না। লেখক নিজে যেন স্বগতোক্তি করেন বারবার, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যোগ করেন একেবারেই নিজের উপলব্ধি—"আমি জানতুম—এ যে হবেই আমি জানতুম। যেদিন কতগুলো অস্পষ্ট ইডিওলজির সুতো ধরে, কিছু দলীয় নেতার জেদ আর অহংকারের কোঁদলে তোমরা ভেঙে গেলে, আমি সেদিনই জানতুম। জনতা তোমাদের বিশ্বাস করেছিল, তাকিয়েছিল তোমাদের মুখের দিকে, কিন্তু তাদের দিকে তাকাও নি। এক-চক্ষু হরিণের মতো চেয়ে থেকেছ দলের দিকে, পুজো দিয়েছ নিজেদের অহমিকার পায়ে। এখন তার দাম শোধ করতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। তোমাদের সেই ভুলের ঋণ মেটাতে গিয়েই আনন্দরা অন্ধের মতো ঝাঁপ দিয়েছে স্রোতে। 'বীরের এ

রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা।' বাংলা দেশে জন্মে ভুল করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কথাগুলোকে অসংলগ্ন প্রলাপের মতো মনে হয় এ-দেশে। কোনো বিশ্বের ভাণ্ডারীর ঘরে এত অতিরিক্ত সঞ্চয় নেই যে নির্বুদ্ধিতার দেনা শুধে দেবেন তোমাদের।"

আনন্দরা নিয়েছে সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রামের পথ—তারা জানে 'পার্লামেন্টারি পলিটিক্সে কিছু হবে না—এগুলি সব ভাঁওতা।' কলকাতার পথে পথে দেওয়াল লিখন দেখা দেয়—'নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও। শ্রীকাকুলম জিন্দাবাদ।'—'রোদে লেখাগুলো ক্রোধের মতো জ্বলছে। দেশ। অনেক ঋণ জমে উঠেছিল, অনেক দুঃখের ভেতর দিয়ে শোধ করার পালা। সেদিন আসছে—আসবেই। কিন্তু কী হবে সেই ঋণশোধের চেহারাটা ? কাদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ ? কি ভাবে ?' এই জিজ্ঞাসা জাগে ঔপন্যাসিকেরও মনে। কিন্তু একদা বিপ্লবীদের সঙ্গে যে একাত্মতা ঘটেছিল, একালে আনন্দের সঙ্গে তা ঘটে না। নানা প্রশ্ন জাগে মনে—'তোমরা চীনের পথ সামনে রেখেছ, কিন্তু লং মার্চের দেশকালের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটে গেছে এখন। এই ভারতবর্ষের ক' ইঞ্চি জমি আছে যেখানে মুক্তাঞ্চল গড়বে তোমরা ? ইণ্ডিয়ান আর্মি চিয়াঙের সেই অসন্তুষ্ট বিশৃঙ্খল বাহিনী নয় যে রাইফেল কাঁধে করে তোমাদের সংগ্রামের শরিক হবে। ম্যাকাডাম রোড—হেলিকোপ্টার—সাঁজোয়া গাড়ি—মডার্ন মিলিশিয়া—কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে সামনে ?…যেখানে থেকে থেকে সাম্প্রদায়িকতার নাড়িতে টংকার বেজে ওঠে, গুপ্তধন পাবার আশায় এখনো লোকে নরবলি দেয়, গো-হত্যা বন্ধ নিয়ে দিল্লিতে সব চাইতে বড় আন্দোলন ফেটে পড়ে আর সাধুরা নেয় তার নেতৃত্ব, সেখানে কিছু বিক্ষুব্ধ ছাত্র আর বঞ্চিত কৃষক কতদূর পর্যন্ত এগোবে বিপ্লবের রাস্তায় ? রাইফেলই শক্তির উৎস। কিন্তু কটা রাইফেল যোগাড় করতে পারবে তোমরা ? আর বাকি সম্বল কি তীর-ধনুক ? এবং তাই দিয়ে মোকাবিলা করবে ট্যাঙ্ককে, মেশিন গানকে, বোমারুকে ?…এখানে তোমাদের ঘরে ঘরে শত্রু দেখা দেবে। তারা সবাই ট্রেটর নয়, কিন্তু তাদের অন্য মত আছে, অন্য আদর্শ আছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থী শক্তির চেহারা বাংলা আর কেরল থেকে—অন্ধ্রের কটি অঞ্চল থেকে—তোমরা অনুমানও করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত সেই শক্তির চূড়ান্ত রূপ যখন শিক্ষিত সেনাবাহিনীর পাশে এসে দাঁড়াবে—তখনকার অবস্থা ভাবতে পারো ? ভারতবর্ষে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা তৈরি হোক, তাই কি তোমরা চাও ?… পার্লামেন্টারি ডিমোক্র্যাসি ভেঙে ফেলতে চাও ? চমৎকার কথা। কিন্তু তার পরের অধ্যায়টা কী জানো ? বীভৎস এক সিভিল ওয়ার। তাতে জমিদারী—পুঁজিবাদী—সাম্প্রদায়িকতাবাদী সব এক সঙ্গে হাত মেলাবে। তার শেষ ফল : নৃশংসতম নরহত্যার পালা শেষ হয়ে পাকা ফ্যাসিজমের রাজত্ব।' এসব প্রশ্ন বা আশঙ্কার যে কোনও উত্তর নেই তা নয়, আনন্দ বা মুকুল উত্তরও দিয়েছে। কিন্তু তবু সংশয় দূর হতে চায় না। 'তৃতীয় নয়নে'র ভূপেশের মতোই পুরানো কম্যুনিস্টদের মনে হয়—'ছেলেগুলোর চোখ জ্বলজ্বল করছে, যেন হাতের মুঠোয় এক-একটা বজ্র আঁকড়ে ধরেছে, এই রকম মনে হলো আমার। আনতে পারে—এদের মতো ছেলেরাই বিপ্লব আনতে পারে, ঘুরিয়ে দিতে পারে ইতিহাসের চাকা। তবু আমার যুক্তি ওদের মানতে চাইল না। যেন বড় তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে চাইছে—যেন বিজ্ঞানসম্মত কয়েকটা ধাপ এক-

একটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে যেতে চাইছে। জানি, ভারতবর্ষের অধিকাংশ কৃষকই আজ ভূমিহীন আর সর্বহারা—শোষণের সেই বিকট বীভৎস চেহারা পূর্ব বাংলাতেই তো আমি কী নিদারুণভাবে প্রত্যক্ষ করেছি, তবু সেই সাধারণ তত্ত্বশিক্ষাটা—ভারতবর্ষের কৃষক কি এখনো তার প্রপার্টি ইন্‌স্টিংট ভুলে গিয়ে রেভোলিউশনের ভ্যানগার্ড হতে পারে? হতে পারে আজ ভূমিহীন কৃষক আর বঞ্চিত-শ্রমিকের ক্রোধে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু কৃষকের মধ্যে সেই সর্বাত্মক সংহতির কতখানি আয়োজন হয়েছে? অন্য কোনো দেশের নীতি কি এখানে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য—সব মাটির পজিটিভ কন্‌ডিশ্যন কি এক?' সেই একই ধরনের নিজের কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আর শেষ পর্যন্ত নির্মম স্বীকারোক্তি—'কিংবা আমারই ভুল। আমারই সাহস নেই। আমিই অভ্যস্ত ভাবনার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারছি না। বিচার ইতিহাসই করুক। আমি পারছি না।' 'শিল্পীর স্বাধীনতা' লেখার এই হলো পটভূমি। এখন তাঁকে বলতে হয় –

> "যে-কোনো রাজনীতিক মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োগফল এবং দেশের প্রসঙ্গে তার শুভাশুভের প্রেক্ষিতেই মাত্র তাকে গ্রহণ বা বর্জন করবো। মানুষের জন্যই রাজনীতি, রাজনীতির জন্য মানুষ নয়। যেখানে দেখবো দেশের কল্যাণ, দেখবো শুভচেতনা—তাকে সানন্দে স্বীকার করবো। নিছক মতবাদের রুদ্ধ-প্রাচীরে শিল্প-ব্যক্তিত্বকে আমি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নই।"
> ('শিল্পীর স্বাধীনতা')

'নির্জন শিখরে'র নায়কের সঙ্গে এখানেই লেখকের একাত্মতা—দেবনাথ ভট্টাচার্যের মুখে যে কথা শুনি সে কথা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও বলতে পারতেন, 'মত মিলুক আর নাই মিলুক, মানুষের যেখানে মহত্ব, সেখানে স্বীকার করতে আমার বাধে না। সেখানে মতের ওপরের দীপিত চরিত্রটাকেই আমি দেখি।'

[দুই]

কিন্তু 'শিল্প-ব্যক্তিত্ব' নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বদেশকে ভালোবাসতেন, মানুষের মহত্বের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু শুধুমাত্র আবেগ-সম্বল সেই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাহায্যে মহৎ উপন্যাস লেখা কি সম্ভব? আমরা যে উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলির মধ্যে লেখকের অভিজ্ঞতার প্রকাশ-প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অবশ্য অভিজ্ঞতার বর্ণন বলতে শুধু নিজের জীবনের ঘটনাবলীর বিবরণ নয়, নিজের কালকে ধরার কথাই বলা হচ্ছে। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ১৯৭০ সাল—এই কালপরিধির মধ্যে তিনি অনেক কিছু দেখেছেন, কিন্তু শুধু সেইটুকু দেখা নয়, আরও বড় পটভূমিতে তিনি দেখতে চেয়েছেন বাংলা দেশকে—'আমি বাঙালী আর ভারতবাসীর কথা লিখবো লিখবো তাদের দুঃখের কাহিনী, বেদনার রূপ, সংগ্রামের ইতিহাস।' ('শিল্পীর স্বাধীনতা')। এদিক থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টির একটা বড় অংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন। প্রথম যৌবনে তিনি যখন 'উপনিবেশ' (১৯৪৪-৪৬) লেখেন, তখন তিনি দেখাতে চেয়েছেন কেমন করে 'উপনিবেশের বর্বর যৌবন পূর্ণতার, প্রবীণতার পথে

আগাইয়া চলিয়াছে।' আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশ্বাস, মানুষই কেবল ইতিহাস রচনা করে না, ইতিহাসও মানুষ রচনা করে—'ইতিহাস রচনা করিয়াছে মানুষকে। ঘুমের দেশ এই ভারতবর্ষ। শক আসিল, হূন আসিল, গ্রীক আসিল, মুসলমান আসিল—কুম্ভকর্ণের মাটিতে পা দিয়া তিন দিনের বেশি কেউ তাহাদের জাগিয়া থাকিতে পারিল না! পর্তুগীজেরাই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে কি করিয়া? বর্তমানের সূর্যও তো একদিন আস্তে আস্তে নামিবে, সেদিন ইতিহাসের এই ক্ষুধা যে তাহাকেও গ্রাস করিবে না— এমন ভবিষ্যৎবাণী আজ কে করিবে?' তবে ভবিষ্যৎবাণীর মধ্যেই উপন্যাসের সমাপ্তি 'সেদিন হয়তো দূরে নয়—যেদিন এখান হইতেই নিজেকে প্রকাশ করিবে বাংলার গণশক্তি বাংলার প্রচণ্ড ও বিপুল প্রাণশক্তি। সে ইতিহাস—দৈনন্দিন, সে ইতিহাস—ধারাবাহিক। তাহার সমাপ্তি নাই।' উপন্যাসে পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত কয়েকটি নরনারী স্থান পেলেও, উপন্যাসটি পর্তুগীজদের উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস নয়। বরং সমকালের পটভূমিতে (১৯৩২-৪২) চর ইসমাইলের রূপান্তরের কাহিনী বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য। চর পড়ে তেঁতুলিয়ার উদ্দাম করাল স্রোত মন্থর হয়ে আসে। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসে তার স্থান নগণ্য— আসলে আদিম বর্বর প্রকৃতি আর ডি-সুজা, গঞ্জালেস, মণিমোহন, হরিদাস, বলরাম—এদের নিয়েই গড়ে উঠেছে উপনিবেশের কাহিনী। লক্ষণীয়, এরা সকলেই চর ইসমাইলে আগন্তুক, এবং শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বেঁচেছে বা বাঁচতে চেয়েছে। লেখক জানিয়েছেন, 'পটভূমি আগে সৃষ্টি হলো, তারপর এলো চরিত্র।' কিন্তু পটভূমি থেকে চরিত্র উঠে আসে নি। আর এখানেই উপন্যাসের মৌলিক দুর্বলতা। মিখাইল শোলোকভের ডন কোজাকদের সঙ্গে এইখানেই মণিমোহন-হরিদাস-বলরামের পার্থক্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেছেন, 'সেখানে [শোলোকভের উপন্যাসে] ব্যক্তি-চরিত্র মুখ্য নয়, আলোড়িত-বিলোড়িত একটা বিপুল গোষ্ঠীর প্রাণ-বন্যায় ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে গেছে এবং বিলিতি অর্কেস্ট্রার বহু যন্ত্রের হার্মনির মতো বিচিত্রের অখণ্ডতা সেখানে ধ্বনিত হয়েছে সেইরকম ভাবে একটা সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে আমি প্রলুব্ধ হলুম।' কিন্তু সম্ভাবনা সত্ত্বেও সমগ্র মানবতার স্পর্শলাভে আমরা বঞ্চিত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্প-ব্যক্তিত্বের একটা অংশমাত্র ধরা পড়েছে 'উপনিবেশে'।

তুলনায় 'পদসঞ্চার' (১৯৪৯) 'an imaginative re-creation of a remote past' হিসাবে অনেক সার্থক উপন্যাস। মহানাটকের মহানায়ক ডি-মেলো ঐতিহাসিক চরিত্র। প্রথমে ভুল করে চাকারিয়ায় অবতরণ থেকে শুরু করে তার বন্দীত্ব, মুক্তিলাভে সাহেবউদ্দিনের ভূমিকা, ১৫৩৩ সালে ডি-মেলোর দ্বিতীয়বার চট্টগ্রামে আগমন, মামুদ শাহের ক্রোধে আবার বন্দীজীবন, এবং শেষ পর্যন্ত অসহায় নবাবের পর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পর্তুগীজদের স্থায়ীভাবে বাণিজ্যের অধিকার লাভ— সব কিছুই ঐতিহাসিক ঘটনা। এমন কি ডি-মেলোর ভাইপোকে ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বলিদান পর্যন্ত ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গত এসেছে হোসেন শাহ থেকে মামুদ শাহ পর্যন্ত নবাবি বৃত্তান্ত, সাসারামের বাঘ শেরশাহের ক্ষমতাবৃদ্ধি, চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খানের বিশ্বাসঘাতকতা, গোলাম আলির

ঐতিহাসিক কার্যকলাপের কথা। পাশাপাশি আছে বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিবৃত্তের পরিপূরক ভূমিকা। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থান ও তিরোধান, রায় রামানন্দের পদ রচনা, দেবদাসীর নৃত্যগীত, উদ্ধারণ দত্তের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ—উপন্যাসের সামাজিক তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। লেখকের মনে হয়েছিল 'ইতিহাসের এই আশ্চর্য সন্ধিলগ্নটি নিয়ে চর্চা করার একটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্য আছে।' শুধু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে সচেতনই নয়, তাকে শিল্পরূপদানে সাফল্যই উপন্যাস-টিকে মূল্যবান করে তুলেছে।

'অমাবস্যার গান'ও (১৯৬৫) 'পদসঞ্চারে'র মতো ইতিহাসাভিত্তিক উপন্যাস বলেই পরিচিত। কিন্তু 'উপনিবেশ'-'পদসঞ্চার' থেকে এখন অনেকখানি দূরে সরে এসেছেন লেখক। রিপোর্টাজ রচনা বা উপন্যাসকে এপিক বিস্তার দান আর কাম্য নয়, হয়তো সম্ভবও নয়। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এখানেও নেই তা নয়, কিন্তু তা যেন নিতান্তই আরোপিত। আসলে রাজনৈতিক বিশ্বাস হারিয়েছেন লেখক। ভারতচন্দ্র রাজসভার বিদূষকে পরিণত ('বিদূষক' নামে উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। অন্তর্জ্বালা বা মনঃক্ষোভ আছে সত্য, কিন্তু এক ধরনের অসহায়তাবোধই প্রবল—অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্যের সেই ডিটারমিনজম। 'পদসঞ্চারে'র পরিণামী অংশের সঙ্গে 'অমাবস্যার গানে'র অন্তিম অনুচ্ছেদটি তুলনা করলেই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।—'কিন্তু বাসিজ পুড়ছিল না। সিরাজউদ্দৌলার বন্ধু, ইংরেজের শত্রু ফরাসীদের চন্দননগর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল ক্লাইভের কামানে। চূর্ণ হচ্ছিল ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছারি বাড়ি, ভেঙে পড়ছিল নন্দদুলাল মন্দিরের চূড়া। পলাশীর যুদ্ধের বোধনমন্ত্র ছড়িয়ে পড়ছিল আমের মুকুলের গন্ধে, মাতাল বসন্তের হাওয়ায়, হাওয়ায়।'

এরপর আর বেশিদূর এগোনো সম্ভব ছিল না। তাই বলে উপন্যাস লেখায় বিরতি ঘটে নি। নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অন্তর্মুখিতা—ফরাসী উপন্যাসের আঙ্গিক—অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর তারই নিদর্শন 'নির্জন শিখর', 'কাচের দরজা', 'মোহনার নৌকো', 'হাঁসের আকাশ', 'তারা ফোটবার সময়' প্রভৃতি অনেক উপন্যাস। অবশ্য এর বীজ যে আগের উপন্যাসগুলির মধ্যে ছিল না তা নয় (রোমান্স, অসিধারা, নিশিযাপন, আলোকপর্ণা, বিদিশা, পাতালকন্যা, কৃষ্ণচূড়া, এমন কি ভস্মপুতুল এদিক থেকে ইঙ্গিতবাহী), তবে সেখানে এক ধরনের আত্ম-সচেতনা ব্যাপকতর সমাজচেতনার পরিচয় বহন করেছে।

মুখ্যত কবি, এবং সেই সঙ্গে গল্পকার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যকার পরিচয়ের কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না। তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার করলে তাই সেখানে চোখে পড়ে এক ধরনের মিশ্রশিল্পের নিদর্শন। উপন্যাসের শিল্পরূপ, অবশ্য কখনই কোনও ধরাবাঁধা আদর্শ অনুসরণ করে নি। মহাকাব্যের উত্তরাধিকার বহন করে উপন্যাস তাই তখনও এপিকধর্মী, যেমন 'উপনিবেশ' বা 'পদসঞ্চার'। সেখানে শুধু পটভূমির বিস্তার নয়, পটধৃত চরিত্রের অসামান্যতাও লক্ষণীয়।—'চর ইসমাইলের পটভূমি তার আদিমতার স্বরলিপিতে বহু চরিত্রের যন্ত্রকে ঐকতানে বাজিয়ে তুলল।' (উপনিবেশ)। তবে এর সঙ্গে উনিশ শতকী পাশ্চাত্য দীর্ঘকায় উপন্যাস সব সময়

তুলনীয় নয়। একালে কয়েক খণ্ডে উপন্যাস লেখার রীতি আর প্রচলিত নেই। কিন্তু কাহিনীকে যেখানে একটি খণ্ড কালের ক্ষুদ্র ক্যানভাসে ধরা যাচ্ছে না, সেখানে তারাশঙ্করকে 'চণ্ডীমণ্ডপে'র পর 'পঞ্চগ্রাম' লিখতে হয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে 'শিলালিপির'র পর 'লালমাটি', যদিও তাঁর মতে 'শিলালিপি উপন্যাসের সঙ্গে লালমাটির কাহিনীগত সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, শুধু ভাবগত যোগসূত্র আছে মাত্র।' অথচ ইচ্ছা করলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষে এপিক নভেল লেখা সম্ভব ছিল না, কারণ 'পৃথিবীটা অনেক বড়'—শুধু এই অনুভব থেকে শোলোকভের সমগ্র মানবতাকে ধরা যায় না। তাই 'উপনিবেশ' শেষ পর্যন্ত খণ্ডচিত্রের সমাবেশ—'পটভূমি আগে সৃষ্টি হলো, তারপর এল মানুষ'—কিন্তু উভয়ের সম্মিলনে আলোড়িত বিলোড়িত একটা বিপুল গোষ্ঠীর প্রাণবন্যায় কাহিনী জীবন লাভ করলো না।

'উপনিবেশ' হয়তো রোমাঞ্চিত কিশোর-কল্পনার ফসল। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাসেই 'ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে, যায় নি। বরং ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যই রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার পথে বাধা হয়ে উঠেছে। তবে তিনি যে আঙ্গিক সচেতন লেখক তাও পাঠক জেনেছে সেই প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস থেকে। 'সাংকেতিকতায় সমৃদ্ধ, গতিতে খরধার, ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ' গল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গল্পের মালা গেঁথে তিনি উপন্যাসও লিখেছেন, যেমন 'রোমান্স', যাকে তিনি বলেছেন 'গল্পোপন্যাস'। কিন্তু ঝোঁক সম্ভবত নাট্যোপন্যাসের দিকে—'নিশিযাপন' তাই কাহিনীর সূচনায় দেখি নাটকের মতো চরিত্রলিপি, বা 'পাতাল কন্যা'র আরম্ভ হয় ডক্টর সুবন্ধু মৌলিকের জীবনের পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে। তবে একাঙ্কমালার মতো একাধিক ছোট কাহিনীকে একত্রে পরিবেশনের ইচ্ছা থেকে 'সাগরিকে'র জন্ম হয়, যেখানে 'যে সমস্ত মানুষগুলো এর মধ্যে এসেছে গেছে, তারা অনেকেই হয়তো এক একটি পরিপূর্ণ কাহিনীর ভূমিকা।' 'স্বর্ণসীতা'র আদিরূপটি ঠিক কি রকম ছিল দেখার সুযোগ পাই নি, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানি, 'সম্প্রতি বইটি ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সে কারণে দ্বিতীয় সংস্করণে এর, কিছু কিছু নতুনত্ব চোখে পড়বে। ছায়াচিত্র ও উপন্যাসের প্রয়োজন এক নয়, সেই জন্যে উপন্যাসকে ব্যাহত না করে ছায়াকাহিনীর সঙ্গে এর সংযোগ রাখতে চেষ্টা করলাম। যেটুকু পার্থক্য রইল তা আপাত—স্বর্ণসীতার মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে চিত্র ও উপন্যাসের ক্ষেত্রগত পার্থক্য মাত্র।'

ছায়াচিত্রের কথা মনে রেখে উপন্যাস লিখলে তার মধ্যে শুধু নাট্যলক্ষণ নয়, কাহিনীগত সংহতি, সংলাপের গুরুত্ব, ঘটনার গতি ও চমৎকারিত্ব দেখা যাবে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে কোনো কারণেই হোক, জীবনের একটি পর্বে শুধু চিত্রনাট্য রচনা করেন নি, উপন্যাসকেও চিত্রনাট্যধর্মী করে তুলেছেন। এর ফলে সব সময় ভালো হয় নি, যেমন 'ট্রফি' বা 'বিদূষকে-এ। মনোবিকলনের চেষ্টা আছে, কিন্তু ব্যাপ্তির অভাবে চরিত্রের পূর্ণায়ত রূপটি দৃশ্যগোচর হয় না। এগুলি হয়তো *Nouvelle* হিসাবে বিচার্য, কিন্তু নিটোল ছোটগল্প লেখার ইচ্ছা থেকে আবার খণ্ডোপন্যাস সৃষ্টি হয় না। আসলে মিশ্রশিল্পের নিদর্শন হিসাবেই হয়তো এগুলি লেখা। কিন্তু ভাবপ্রেরণার সঙ্গে শিল্পরূপের সমন্বয় না হলে কোনও উপন্যাস বিষয়গৌরবে প্রশংসা পেলেও শেষ পর্যন্ত অতৃপ্তির কারণ হয়ে ওঠে।

অবশেষে শিল্পরূপের প্রয়োজনেই বুঝি ভাবপ্রেরণার পরিবর্তন ঘটলো। অন্তত 'সন্ধ্যার সুর' থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে টেকনিকের চমৎকারিত্ব পর্বান্তরের সূচনা করলো এমন মনে হতে থাকে। ডায়েরির ব্যবহার 'উপনিবেশে'ও দেখা গেছে, কিংবা 'কৃষ্ণচূড়া'য়, কিন্তু 'তৃতীয় নয়ন' বা 'কাচের দরোজা'য় দেখা গেল আত্মোক্তিপ্রবাহ। আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচয় ছিল, কিন্তু শেষের দিকে আধুনিক ফরাসী উপন্যাসের মননপ্রবাহ ও সাংকেতিকতা ক্রমশ প্রাধান্য পেয়েছে। 'নির্জন শিখরে'র নায়কের স্বগতোক্তি এই পর্বের উপন্যাসের স্বরূপ ব্যাখ্যার হয়তো সাহায্য করবে—'ছেলেবেলায় সেই পোড়ো বাড়িটার ঘরে ঘরে আমি ঘুরে বেড়াতুম, অল্প বয়সের কল্পনায় সেখানে অতীতের মানুষেরা ছায়ার মতো জেগে উঠতো, শুনতে পেতুম কারা যেন ঘোড়ায় চড়ে এল, উঠোনে রোদের ভেতর শুকোচ্ছে টানা দেওয়া সোনালি সুতো, কী সব অদ্ভুত গন্ধ আসছে—আলোয় ঝিকমিকে। আর অনেক কথা, অনেক কোলাহল, আমার চারপাশে অনেক মানুষের ছায়ার মতো আনাগোনা। আমার জীবনের সেই পিছনের দিনগুলোকেও আমি একটা পোড়ো বাড়ির মতো ভাবতে পারি। কিন্তু সবটা মিলবে না। অনেক বড় জিনিস ভুলে যাব, অসংখ্য ছোট কথারা এসে ভিড় করবে, সব চিন্তার ভিতরে হয়তো ধারাবাহিকতাও থাকবে না; কিন্তু রেশমের কুঠিটার মতো স্মৃতিরা আমার জীবনে কল্পনা হয়ে যায় নি, তারা বাস্তবে ছিল, এখনো আছে; কেউ কেউ ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের রেখাগুলো মিলায় নি, সেখানে আমি নতুন ছবির আদরা টেনে রঙ বুলোতে পারব না।' হয়তো এই ভাবেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নববাস্তবতার দিকে এগিয়েছেন, অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা—শিল্প ও জীবন নিয়ে পরীক্ষা। কিন্তু হঠাৎ যখন সব কিছুর অবসান ঘটলো তখন একথা মনে হতেই পাবে, যা তাঁর দেওয়ার ছিল তা তিনি দিতে পারলেন না। 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের সূচনায় 'আমার কথা'র শেষ বাক্যটি হলো—'আমি মনে করি আমার শ্রেষ্ঠ বই এখনো লেখা হয় নি। নিজের কথা আজও সম্পূর্ণ করে বলা হয় নি—কবে যে হবে তাও জানি না।' এখানে 'শ্রেষ্ঠ' শব্দের অর্থ সর্বপ্রধান নয়,—উত্তম বা উৎকৃষ্ট। আত্মজিজ্ঞাসু লেখক যে উৎকর্ষের সন্ধান করেন, তা মেলে নি। আর তার কারণ সাহিত্যাদর্শের মধ্যেই সন্ধান করা যেতে পারে: সেখানেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ—শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচা, অথবা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, তার মধ্যে কোন্‌গুলি কালোত্তীর্ণ, আর কোন্‌গুলি ইতিমধ্যে বা অনতিপরে বিস্মৃতির সামগ্রী—তা নিশ্চয় করে এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে ঝেড়েবেছে তার মধ্য থেকে শিল্প-ব্যক্তিত্বের পরিচয়বাহী উপন্যাসগুলি আলাদা করে নেওয়া দরকার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কুড়ি বছর প্রায় কাটলো, কিন্তু এখনও তাঁর উপন্যাস নিয়ে ভালোমতো আলোচনা শুরু হয় নি। নানাভাবে সে আলোচনা হবে, আর আলোচনার প্রয়োজনেই যদি নতুন করে তাঁর উপন্যাসগুলি আমরা পড়ে দেখি, তাহলে সম্পূর্ণ নিরাশ হবো এমন মনে করার কারণ নেই। আপাতত সেই আলোচনার সূত্রপাত করা গেল, কোনও মত প্রতিষ্ঠার আগ্রহে নয়, অনুরাগী একজন পাঠকের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে॥

অধিকাংশ উপন্যাসের পাঠ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত বারো খণ্ড 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী' (১৩৮৬-৯৫) থেকে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ ও পাঠান্তর মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাই নি।

১. প্রবন্ধলেখককে শ্রীসুশীল জানা ৯ জুলাই ১৯৮৯ তারিখের চিঠিতে জানিয়েছেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'ছিলেন বন্ধু হিসেবে। আমাদের তথাকথিত বাঙালী সমাজের তিনি একজন ভাবুক মানুষ, পার্টির সংস্কৃতিশাখার কর্মীরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতই। পার্টির প্রয়োজনেই এর দরকার ছিল।'

২ দ্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্রষ্টার চোখে সৃষ্টি', কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭।

৩. তুলনীয় "দাদারা কেউ কেউ গীতার মধ্যে তলিয়ে গেলেন! কেউ কেউ বা বুঝলেন 'অহিংসা পরমো ধর্ম'—খদ্দরের সুতো দিয়েই স্বাধীনতা ধরবার ফাঁদ পাততে হবে—রক্তপাতের মূঢ়তাই হলো সব ব্যর্থতার কারণ। আর এক দল তখনো চূড়ান্ত উগ্রপন্থী, তাঁরা পিংলের মতো সিপাহী-ব্যারাকে বিদ্রোহ ছড়াবেন, আর একবার চেষ্টা করবেন 'ম্যাভেরিক' জাহাজকে আমদানি করতে।

"কয়েকজন আবার জেলেই পাতিয়ে বসলেন গৃহস্থালী। মাসোহারার মোটা টাকায় তাঁরা জীবনের অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা মেটাবার সাধনায় উঠলেন তৎপর হয়ে। স্নো, পাউডার, সেন্ট, সিল্কের পাঞ্জাবি তো আছেই—দশ আঙুলে দশ-দশটা আংটিও কারু কারু শোভা পেতে লাগলো। তাঁদের দিন কাটতো সিল্কের পাঞ্জাবি পাট করতে, ঘর্মাক্ত দেহে গ্রেজকিডের জুতো পালিশ করতে। রাজনীতির চাইতে মুরগির কাটলেট সংক্রান্ত আলোচনাটাই তাঁরা পছন্দ করতেন বেশি।

"শুধু সমস্ত মন যেন কালো হয়ে গেছে অশুচিতার গ্লানিতে। যাদের অলিম্পিক মশালের শিখার মতো অনির্বাণ বলে বিশ্বাস হয়েছিল, দেখা গেল তারা শুধু হাউই—খানিকটা ছাইয়ের কালো পিণ্ড ছাড়া কিছুই তাদের অবশিষ্ট নেই।

"এবারের কাজ আলাদা, পথও আলাদা। বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে সেই পথই ধরবো আমরা। মধ্যবিত্ত বিপ্লব-বিলাসে আর ক্ষ্যাপামির হাউই ওড়াবো না, প্রাণবন্ত করে তুলবো ঘুমন্ত অগ্নিশিখরকে।"—'শিলালিপি', দ্বিতীয় অধ্যায়।

৪. 'স্রোতের সঙ্গে' উপন্যাস সম্বন্ধে 'রচনাবলী'র দ্বাদশ খণ্ডে জানানো হয়েছে 'স্রোতের সঙ্গে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। উপন্যাসটি লেখকের তিরোধানের পর প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদপট শ্রীগৌতম রায় অঙ্কিত। উৎসর্গপত্র নেই। দ্বিতীয় মুদ্রণের গ্রন্থ থেকে রচনাবলীর পাঠ গৃহীত হয়েছে।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর। 'স্রোতের সঙ্গে' উপন্যাসটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, উপন্যাসের শেষাংশ সম্ভবত আশা দেবীর রচনা (২৮ এবং ৩১ পরিচ্ছেদে 'সর্বজনশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান জননেতা হেমন্ত বসুর হত্যা'র কথা বলা হয়েছে। হেমন্ত বসু নিহত হন ১৯৭১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি)। কিন্তু 'রচনাবলী'র ভূমিকা বা গ্রন্থপরিচয় অংশে কোথাও সম্পাদকেরা জানানোর প্রয়োজন মনে করেন নি, উপন্যাসের কতটুকু অংশ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা এবং কোন্ অংশ অন্য কারও সংযোজন।

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

সন্তোষকুমার ঘোষ : আত্মজিজ্ঞাসায় উন্মুখ শিল্পী

[এক]

সন্তোষকুমার ঘোষ নামটির সঙ্গে আমরা যেভাবে পরিচিত, তাঁর লেখার সঙ্গে ঠিক তেমন ভাবে পরিচিত নই। অথচ শেষ চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক জুড়ে, এমনকি ষাটের দশকের প্রথমার্ধেও, তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি' (১৯৫০) ও শেষ প্রধান উপন্যাস 'শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে'র মধ্যে ব্যবধান বিশাল কুড়ি বছরের। উপন্যাস দুটির চারিত্রিক ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন বোধ হয় বয়সের ওই ব্যবধানকেও ছাপিয়ে যায়। বস্তুত ওই পরিবর্তন ও বিবর্তনই তাঁর লেখক তথা ব্যক্তিসত্তার মূল সঞ্চারী সুর।

এই নিয়ত পরিবর্তনের তাগিদ ও নেশা তাঁকে সমকালের চোখে ক্রমশঃ সুন্দর করে তুলেছে : আয়ত্বাধীন জনপ্রিয়তার সস্তা মোহকে নেহাৎ খেলনার মতই ছুঁড়ে ফেলেছেন তিনি। অন্তর্নিহিত জট ও জটিলতা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অগম্য না হলেও দুর্গম করে তুলেছে তাঁর শিল্পিমনকে, কাহিনীর ক্ষেত্রকে, ভাষাকে, চরিত্রের বিকাশ পথকে। অথচ প্রাপ্ত জনপ্রিয়তার খাদে আটকে না-থেকে সময়ের ঢেউয়ের তালে তালে নেচে নেচে এগিয়ে যাওয়ায় তাঁর দুর্মর আগ্রহ কোনও কালেই গেল না। বোধহয় একটু ভুল বললাম। সময়ের স্রোতে না-ভেসে তিনি বরাবরই একটু এগিয়ে থাকতে চেয়েছেন। সব সময়ই তিনি আগামীকালের মনের কথাকার, কখনোই আজকের শিল্পী নন। ফলে যতটা তার লেখার ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা, ততখানি নগদপ্রাপ্তি ঘটে নি। লেখক হিসাবে এই তার প্রাপ্তি, এই তাঁর পুরস্কার।

[দুই]

জনগণেশের কাছে তুলনায় কম পরিচিত এই লেখকের সাহিত্য আলোচনার আগে তাই তাঁর ব্যক্তি ও শিল্পি-জীবনেব প্রধান চুম্বকগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই।

জন্ম : ৯.৯.১৯২০।

মৃত্যু : ২৬.২.১৯৮৫।

জন্মস্থান : রাজবাড়ি, ফরিদপুর, বাংলা দেশ।

বাবা / মা : সুরেশচন্দ্র ঘোষ, সরযূবালা ঘোষ।

শিক্ষা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

পেশা : সাংবাদিকতা। প্রথম জীবনে 'যুগান্তর', 'প্রত্যহ', 'জয়হিন্দ', 'মর্ণিং নিউজ', 'নেশন', 'স্টেটস্‌ম্যান' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করার পর ১৯৫১ সনে দিল্লির

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডর্ডে' যোগ দেন। ১৯৫৮ সনে কলকাতার 'আনন্দবাজারে' বার্তা-সম্পাদক হয়ে আসেন। পরে 'আনন্দবাজার' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'র সংযুক্ত সম্পাদক ও শেষে 'আনন্দবাজারে'র যুগ্ম সম্পাদক হন।

বিদেশযাত্রা ঃ ১৯৫৭—বর্মা ও পূর্ব ইউরোপ, ১৯৬০ - ইংল্যাণ্ড, ১৯৬১—জার্মানি, ১৯৬৪—ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম ইউরোপ, ১৯৬৫—জাপান, ইংল্যাণ্ড, ১৯৬৬—আমেরিকা, ১৯৬৮—থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর', ১৯৭২—রাশিয়া, ১৯৮২—আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান, হংকং।

প্রথম সাহিত্যচর্চা ঃ 'মিলন সংঘ', 'কল্যাণ সংঘ' প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংস্থায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সাহিত্য-চর্চা। জগৎ দাসের সঙ্গে যৌথভাবে 'ভগ্নাংশ' নামক গল্পগ্রন্থ প্রকাশ, যার সমালোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় সন্তোষকুমারের ছোট গল্পের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপন্যাস

১। কিনু গোয়ালার গলি (১৯৫০, ডি, এম, লাইব্রেরী)
২। নানা রঙের দিন (১৩৫৯, ক্যালকাটা বুক ক্লাব)
৩। মোমের পুতুল (১৩৬১, বেঙ্গল পাবলিশার্স)। এটি পরে দে'জ পাবলিশিং 'সুধার শহর' নামে প্রকাশ করে।
৪। মুখের রেখা (১৩৬৬, ত্রিবেণী)
৫। রেণু, তোমার মন (মিত্র ও ঘোষ)
৬। ফুলের নামে নাম (এভারেস্ট)
৭। জল দাও (১৯৬৭, আনন্দ পাবলিশার্স)
৮। স্বয়ং নায়ক (১৩৭৬, গ্রন্থপ্রকাশ)
৯। শেষ নমস্কার ঃ শ্রীচরণেষু মাকে (১৩৭৮, দে'জ)
১০। সময়, আমার সময় (১৩৭৯, আনন্দ পাবলিশার্স)
১১। ফুল নদী পাখি (১৯৭৬, রামায়ণী)
১২। নিশীথ রাতে ('চতুরঙ্গে' প্রকাশিত, অগ্রন্থিত)
১৩। আমার প্রিয় সখী (১৩৭৬, ক্যালকাটা পাবলিশার্স)

বড় গল্প ঃ

১। ত্রিনয়ন (১৩৭৬, মিত্র ও ঘোষ)
২। দূরের নদী (১৩৮৪, দে'জ পাবলিশিং)
৩। সেই পাখি (১৩৮৪, বিশ্ববাণী)

ছোট গল্পসংকলন ঃ

১। শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৯, দীপজ্যোতি প্রকাশনী)
২। চীনেমাটি (১৯৫৩, মিত্রালয়)

৩। শুকসারি
৪। পারাবত (১৩৬০, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী)
৫। কড়ির ঝাঁপি (১৩৬৩, ক্যালকাটা বুক ক্লাব)
৬। পরমায়ু (১৩৬৪, ত্রিবেণী)
৭। দুই কাননের পাখি (১৩৬৬, কারেন্ট বুক শপ)
৮। চিররূপা (১৯৫৯, নাভানা)
৯। কুসুমের মাস (১৩৬৬, ক্লাসিক প্রেস)
১০। ছায়া হরণ (১৯৬১, সুরভি)
১১। বহে নদী (১৩৭০, গ্রন্থপ্রকাশ)
১২। যুবকাল (১৯৭৬, বিশ্ববাণী)
১৩। সন্ধ্যা-সকাল (১৯৭৯, আনন্দ পাবলিশার্স)
১৪। দুপুরের দিকে (১৯৮৩, আনন্দ পাবলিশার্স)
১৫। কুসুমোদ্দীপ (১৯৮৪, সংবাদ)
১৬। সমস্ত গল্প ৩ খণ্ড (১৩৮৪, ১৯৭৯, ১৯৮৩, স্বরলিপি)

নাটক :

১। অজাতক (১৩৭৬, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ)
২। অপার্থিব (১৩৭৮, মিত্র ও ঘোষ)

কবিতা :

১। কবিতার প্রায় (১৯৮০, দে'জ পাবলিশিং)
২। মিলে আসিলে (স্বরলিপি)

প্রবন্ধ :

১। বাইরে দূরে (১৩৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স)
২। বাংলাদেশ কোন্ পথে (১৯৭৩, নবপত্র)
৩। সোজাসুজি (১৩৭৭, দে'জ পাবলিশিং)
৪। রবীন্দ্রচিন্তা (১৩৮৫, হেমলতা প্রকাশনী)
৫। রবির কর (১৯৮৪, আনন্দ)

পুরস্কার : আনন্দ পুরস্কার (১৯৭১), বিশেষ আনন্দ পুরস্কার (১৯৭২), সাহিত্য অকাদেমী (১৯৭২)। তাইওয়ান কবিসংঘ থেকে ১৯৮৪-তে ডি. লিট্ উপাধি।

[তিন]

কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ—সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় নিয়োজিত হলেও সন্তোষকুমার ছিলেন মূলত ছোটগল্প লেখক। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর ছাড়া সমস্ত বাঙালি কথাসাহিত্যিক সম্বন্ধেই কথাটা এক হিসাবে প্রযোজ্য। ছোট গল্পের বিচ্ছুরিত জ্যোতি রবীন্দ্র-উপন্যাসেও দুর্লভ।

সন্তোষকুমারের প্রধান উপন্যাস হিসাবে 'কিনু গোয়ালার গলি', 'নানা রঙের দিন', 'মোমের পুতুল' (বা 'সুধার শহর'), 'জল দাও' ও 'শেষ নমস্কার'-কে গ্রহণ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে প্রকাশ সনের হিসাবে যদিও 'কিনু গোয়ালার গলি' অগ্রগণ্য কিন্তু লেখক লিখতে শুরু করেন 'নানা রঙের দিন' সর্বপ্রথম অধুনালুপ্ত 'কালান্তর' পত্রিকায়। পরস্পরের পিঠোপিঠি এই দুই উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করেছে।

তখনও উপন্যাসের মধ্যে 'স্টোরি টেলিং' তাঁর কাছে মুখ্য। লেখকের নিজের কথায় " 'নানা রঙের দিন' মুখ্যত একটি পরিবারের কাহিনী। ঘটনাকাল এই শতকের শেষ কুড়ি ও শুরু তিরিশের কয়েক বছর অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনের মধ্যাহ্ন। পরে এই আন্দোলন বিস্তৃততর হয়েছে, আপাতসফল হয়েছে, আবার অন্যরূপে প্রবেশ করেছে জনজীবনের গভীরে কিন্তু এ-উপন্যাসে সে-অধ্যায় সংযোজনের পরিসর ছিল না।

"একটি অবোধ, অর্ধবোধ কিশোর-মানসে সমসাময়িক জটিল ঘটনা রাজনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক যে ছাপ রাখে, সেইটুকুকে আশ্রয় করে এই গল্প গড়ে উঠেছে। সর্বত্র এই দৃষ্টিকোণ ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি, তবু মূল সুরটি ঠিকই আছে, এবং সেটা প্রধানত হৃদয়াবেগের।"

এই প্রতিবেদনের মধ্যে দুটি শব্দগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ এক, 'সমসাময়িক জটিল ঘটনা রাজনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক' ও দুই 'প্রধানত হৃদয়াবেগের।' সন্তোষকুমার ঘোষের কাহিনীরচনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত দুটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভুলে যাবার নয়। 'জল দাও' ও পরবর্তী কাহিনীর চেহারা ও চরিত্র যেখানে প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যক্তির অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম জটাজালে ঘেরা ও তাদের প্রকাশ মাধ্যম যেখানে মূলত মনন-পরিশ্রুত, এই দুই উপন্যাসে কিন্তু তাব ছবি ভিন্ন। 'নানা রঙের দিন'-এর প্রারম্ভটুকু লক্ষ্য করুন :

"শুভাশীষদের বাড়ীর সামনেই মিউনিসিপ্যাল সড়ক : স্টেশন থেকে বেঁকে গ্রামের দিকে চলে গেছে। ওই পথে গ্রামান্তর থেকে তরি-তরকারী, মাছ, দুধ নিয়ে হাটুরেরা আসে। তাদের ভীড় বাড়ে হাটবারে।"

বড় মাপের জীবন-কাহিনীর সূত্রপাতের জন্য দরকার হয় স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয়ের স্পষ্ট শক্ত ভিত। এই ক্লাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটেছে 'কিনু গোয়ালার গলি'তেও।

"বাস তো সদরে নামিয়ে খালাস। তারও পর প্রায় দশ মিনিট হেঁটে তবে কিনু গোয়ালার গলি।

"প্রথমে পড়ে মহেশ আড্ডি স্ট্রীট, মোটামুটি সরগরম। কেমিস্ট আছে, ড্রাগিস্ট আছে। আছে হরেকরকম বা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স স্টীম লণ্ড্রী, যার নাম 'সর্বশুক্ল'।

"আরো এগিয়ে হরিমোহন মুখার্জি রোডের মোড়ে স্কুল। এই স্কুলবাড়িটাই যা একটু পুরানো। ফটকের ওপর অর্ধচন্দ্র কাঠের ফলকে নাম : এস. এম. এইচ. ই. স্কুল। পড়ুয়া আর পাড়ার লোক জানে এস এম. মানে হ'ল সুরবালা মেমোরিয়াল। নামের নিচে প্রতিষ্ঠা সালেরও উল্লেখ ছিল : সেটা কালে আর জলে ধুয়ে গেছে।

"হরিমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের চৌমাথার পর থেকে শুরু হল গঙ্গারাম বসাক স্ট্রীট।"

সতর্ক পাঠক 'নানা রঙের দিন'-এ শব্দের বানানও লক্ষ্য করবেন : 'শুভাশীষ', 'বাড়ী'। বানান সংস্কার ও ভাষার চাকচিক্যে তখনও লেখক অন্যমনস্ক। তাঁর সামনে গোটা জীবনের বিস্তৃত ছবি, তাকে আঁকবার জন্য দরকার বলিষ্ঠ হাতের মোটা দাগের রেখাচিত্র, তখনও সন্তোষকুমারে যা ছিল অনায়াস আয়ত্বাধীন। তার ভিতরে লক্ষ্য করা যায় প্রয়োজনমতো চড়া ও উজ্জ্বল তেলরঙ : হালকা ওয়াশের জলছবির কাজ নয়।

প্রতিতুলনার জন্য 'জল দাও' উপন্যাসের গোড়াটিকেও হাজির করা দরকার।

"পিপাসায় এক ব্যক্তির মৃত্যু" মনে পড়ে, খবরের শিরোনামা ছিল : আর যেহেতু শব সনাক্ত করা যায় নি তাই একদিন কাগজে তার ছবিও বেরুল।

"চিনতে একটু সময় লাগল, পকেট হাতড়াতে হল চশমার জন্যে।"

যেন ভেতর থেকে ধরবার চেষ্টা করছেন কাহিনীকে, ভিতরের তাড়ায় ইতিমধ্যে লেখক অন্তরের সাড়া পেয়েছেন, অগত্যা খেই ধরতে হচ্ছে পাঠককেই. সমসাময়িক বিদেশি উপন্যাসের ডোল বা আঙ্গিক সুপার ইমপোজড হচ্ছে দেশি সমাজ ও ব্যক্তির জীবন-কাহিনীতে। অর্থাৎ সোজা আঙুলে ঘি ওঠে কি-না পরীক্ষা না করেই আবর্জনাবৎ পুরনো কায়দা বাদ দিয়েছেন লেখক, আঙুল বাঁকিয়ে ধরেছেন। ফলে ঘেঁকেচুরে যাচ্ছে কাহিনী কথনের ভঙ্গিমা, দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে চেনা চেহারার আদল। এই ভগ্ন, ভঙ্গ, জটিল মুখচ্ছবি আসলে সময়, সমাজ ও লেখকেরই, তাঁর সমকালীন পাঠক যাকে তখনও আয়ত্ত করতে নারাজ। প্রাপ্ত জনপ্রিয়তার সেখানেই সলিল-সমাধি।

অথচ আদ্যন্ত বিশ্বস্ত থাকবেন পণ করেছেন সন্তোষকুমার। নিজের প্রতি, সময় ও সমাজের প্রতি. লেখার প্রতি, এমনকি পাঠকের প্রতি। 'একদিন চিনে নেবে তারে' এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ; আজ না-হোক. তো কাল। কিন্তু ভাঙাচোরা সমাজের, অস্পষ্ট সময়ের মুখচ্ছবিকে মনোহর রঙে সরলীকরণের ব্যবসায় তাঁর মন নেই। কাহিনী রচনা হল তাঁর লেখকসত্তার বাঁচার হাতিয়ার. তাকে সস্তা টিনের তরোয়ালে পরিণত করবেন কেমন করে!

সন্তোষকুমার না-পেরেছেন বিষয়ের দিক দিয়ে অলীক, রঙিন. মনোহারী সেলুলয়েডের মিথ্যা প্রেমকাহিনী লিখতে, না-চেয়েছেন আঙ্গিকের দিক দিয়ে ছোট গল্পের উজ্জ্বলন্ত তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতাকে নষ্ট করে উপন্যাসের 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর', এই দুর্নীতিতে বিশ্বাস করতে। এই কারণে জনগণেশের কাঙ্ক্ষিত অতি সরলতা তাঁর গল্প ও উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য।

'কিন্তু গোয়ালার গলি' ও 'নানা রঙের দিন'-এ যে কাহিনীর তীব্রতা, সমাজ ও সংসারের স্পষ্ট কায়া লক্ষ্য করা যায়, বলেছি, পরবর্তী উপন্যাসে তার বদলে এসেছে মননে পরিশ্রুত ভাঙনের ছায়া। এবিষয়ে তাঁর শেষ বিখ্যাত উপন্যাস 'শেষ নমস্কার' (১৯৭১)-এ বলছেন "আসলে, আমার ধারণা, সব লেখকই সারা জীবন একটা লেখাই লিখতে চায়, লিখতে থাকে, ক্রমাগত চেষ্টা করে। আমিও করেছি। পারিনি। 'নানা রঙের দিন', 'মুখের 'রেখা', 'জল দাও', 'স্বয়ং নায়ক'। —মৃত বা শুধুই স্মৃত গ্রন্থ, একটির পর একটি। অবশেষে আমার সেই না-পারার কাছে এই শেষ নমস্কার রেখে ছুটি নিতে চাইছি।"

তাঁর সহজাত ও স্বকীয় বিনয়, 'শেষ নমস্কার' এর অন্তর্বর্তী মৃত্যুবোধ-এর পরেও এই উক্তির মধ্যে যেন অনাগ্রহী পাঠকের প্রতি নিরুচ্চার অভিমানবোধও স্পষ্ট। এখানে 'কিনু গোয়ালার গলি'র নাম করেন নি লেখক, তা-কি জনপ্রিয়তায় বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল বলে? না-কি তাতে বহির্জীবনের ছবি Extrokert নৈপুণ্যে রেখায়িত হয়েছিল বলে? কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে বহু মানুষের পদধ্বনিতে গম্‌গম্‌ করলেও ওই উপন্যাসেও একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিসূত্র দুর্লক্ষ্য নয়। তা হল প্রথম স্যাকরার চোখ, যা দিনরাত্রি গলির সব বাড়ির মানুষজনকে লক্ষ্য করে গেছে ও শেষ পর্যন্ত এই গলিটিকেই গল্পের প্রাণচরিত্র করে তুলেছে; খানিকটা গল্পগুচ্ছ'র 'অতিথি' গল্পের নদীটির মত।

'নানা রঙের দিন' ও 'মুখের রেখা'য় মূলত যে পটচিত্রটি আঁকা হয়েছে তা পূর্ববাংলার, যা-কিনা সন্তোষকুমারের বাল্যস্মৃতির অভিজ্ঞতার ঝাঁপি থেকে চয়ন করা। তবে তফাৎও আছে। 'নানা রঙের দিনে' উত্তাল ও অস্থির সমাজের পৃষ্ঠভূমি স্পষ্টভাবেই হাজির হয়েছে, 'মুখের রেখা' সেখানে বিষয়ে, ভাবে ও ভঙ্গিতে অন্তর্মুখী।

বস্তুত 'মুখের রেখাই' সন্তোষবাবুর উপন্যাসের টার্নিং পয়েন্ট, যেখান থেকে সহজ ও সরল জীবনকথনের ভঙ্গিমা বঙ্কিম হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আত্মচরিত্রের পিছন ফিরে তাকানোর মধ্যে পূর্বজীবনের (object) সরলতা অপেক্ষা বর্তমান-এর (দ্রষ্টার) জটিল মানসিকতাই কাহিনীকে প্রভাবিত করেছে। যা সহজ নয়, তাকে সহজভাবে দেখবেন কেমন করে, যা সরল নয়, তাকে সরলভাবে আঁকবেন কেমন করে লেখক! এখানেই তাঁর লেখক হিসাবে সততা।

অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন 'কিনু গোয়ালার গলি'র (এবং অংশত 'নানা রঙের দিন'-এর) জনপ্রিয়তা যদি এই সহজ কাহিনীকথনের জন্যই সম্ভব হয়ে থাকে এবং তার অভাবই যদি লেখকের মধ্যবর্তী উপন্যাসগুলির জনসমর্থনের বিরুদ্ধতার কারণ হয়, তবে 'শেষ নমস্কার' অমন প্রবলভাবে অভিনন্দিত হল কেন? ১৯৭১ (এপ্রিল) থেকে ১৯৮৭ (জানুয়ারি), —এই ১৫ / ১৬ বছরেই ৩০ টাকা এই দামের তুলনায় মোটা উপন্যাসের ·১২ টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। শুধুই পুরস্কারপ্রাপ্তি তার কারণ নয়।

আমাদের মনে হয় 'শেষ নমস্কার'-এর এই জনসমর্থনের পিছনে লুকিয়ে আছে ঔপন্যাসিক হিসাবে সন্তোষকুমারের দ্বিতীয় টার্নিং পয়েন্ট। গল্পকথন ভঙ্গিমায় সহজতা ও মনন অপেক্ষা আবার এখানে তিনি হৃদয়ের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তার অন্যান্য উপন্যাসের মত স্ট্রাকচারের কলাকৈবল্য, জীবনদৃষ্টিজাত দর্শন রাজনীতি-সমাজনীতি প্রসঙ্গে চাপা বিদ্রূপ এখানে কখনোই কাহিনীর ডোলটিকে নষ্ট করে নি। মাতৃপ্রেমের সজল সকরুণতার ঐতিহ্যগত বাতাবরণ তো আছেই। 'শেষ নমস্কার' যে কোন সন্তানের লেখা খোলা চিঠি। তার মায়ের কাছে। এতটাই এই ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের সার্বজনিক আবেদন।

[চার]

আগেই বলেছি, যে-শিল্পমাধ্যমটির সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের শিল্পিসত্তা আদ্যোপান্ত জড়িত, তা ছোটগল্প। তার বেশির ভাগ বইয়ের মত ছোটগল্পের বইগুলিও দুষ্প্রাপ্য। 'স্বরলিপি' প্রকাশিত তিন খণ্ড : 'সন্তোষকুমার ঘোষের সমস্ত গল্প-এ ২৩ × ৩ = ৬৯ টি গল্প সংকলিত হয়েছে সেখানে। মূলত তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'চিনেমাটি', 'কড়ির ঝাঁপি', 'শুকসারি', 'পারাবত', 'ছায়া হরিণ' প্রভৃতি প্রথম দিকের গল্পগ্রন্থ থেকেই গল্পগুলি নেওয়া। 'বহে নদী' পরবর্তী আরও অন্তত সমান সংখ্যক গল্প 'সমস্ত গল্প'-এ ধরা হয় নি, এদের অনেকগুলি আবার অগ্রন্থিত। তাঁর বিখ্যাত পূর্বযুগের উপন্যাসগুলির পুনর্মুদ্রণের মত এইসব (প্রায় দেড়শতাধিক) উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির একত্র সংকলন দরকার।

তাঁর উপন্যাসের মত প্রথম পর্বের গল্পেও প্রত্যক্ষ সরাসরি গল্প কথন ভঙ্গিমা পাঠকের নজর কাড়ে। তবে তারই মধ্যে বিদ্যুতের মত চোরাস্রোতে, গল্পের ভিতরে বয়ে গেছে। ব্যাকুলতাময় ভাষায়, চকিত উপস্থাপনা ও সমাপ্তির আঘাতে পাঠক বিস্মিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'এক সের', 'শান', 'কানাকড়ি', 'ধাত্রী', 'যাদুঘর', 'কস্তুরীমৃগ', 'স্বয়ম্বরা', 'পারাবত', 'পনেরো টাকার বৌ', 'বিষ', 'বসুধৈব', 'চীনেমাটি', 'পাখির বাসা', 'মানিক', 'প্রেমপত্র', 'গিল্টি', 'কান্নার মানে', 'পরমায়ু', 'দুই কাননের পাখী', 'স্টেন', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'ছায়াঘর', 'ঘ্রাণ', 'ঠাকুমাব ঝুলি', 'ভেবেছিলাম', 'কোনও অসতীর কথা', 'মনসিজা', 'চিররূপা', 'শোক', 'যেকোন', নকল', 'দুটি ঘর একটি নাটক' প্রভৃতি অজস্র গল্পের কথা মনে পড়ে। : াশোধ যে কোন পাঠকই এইসব গল্পের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার ফেলে আসা যৌবন ও বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের অতীত গৌরবের জন্য একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন।

কম কথন, বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দবন্ধ ভাষার ব্যবহার, যথাসম্ভব কাঠামোগত ঐক্য ও পরিমিতি, এই ছিল সন্তোষকুমারের প্রথম ও মধ্যপর্বের গল্পগুলির প্রাণ : উপযুক্ত গল্পগুলিই তার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। এবং যে শিথিলতা তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলির ক্ষতি করেছে, গল্পে তার ক্রুর ছাপ কখনোই পড়েনি। গল্পে শরীরে কাহিনীর অতিরিক্ত অংশের ভাব বা চরিত্রের বয়ানে না বলে লেখকের সশরীরে অবতীর্ণ

হওয়াকে তিনি মনে প্রাণে অপছন্দ করতেন। যে কারণে শেষ পর্যন্ত তার গল্প শরীরে তন্বী ও মনে সতেজ থেকে যেতে পেরেছিল। উপন্যাস রচনায় ব্যবসায়িক প্রয়োজন ও প্রলোভন থেকে দূরে সরে শেষ পর্যন্ত ছোটগল্পের এই একলব্যের সাধনা তাঁর সমসময়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছাড়া আর কেউই করেন নি।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, বিজ্ঞানী রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ্ সবাই জন-বিস্ফোরণের সমস্যায় বিহ্বল। কিন্তু দরিদ্র, সাধারণ মানুষের জীবনের হাহাকার, অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা ও শূন্যতাকে কোন পাকা মাথাই যাচাই করে দেখেনি। তাঁর প্রথম 'এক সের' গল্পে লেখক করুণাভরে সেদিকে তাকালেন : যৌনসুখ ভিন্ন যেখানে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে কোন আশা বা আহ্লাদ নেই সমাজ তার স্থান রাখে নি। গল্পের শেষাংশ "পা টিপে টিপে এসেছে ডাক্তার। ধমকে লাভ নেই : বকে লাভ নেই। শীতের অশত্থের শেষ থরথর পাতাটির মতো একটি মোটে সুখের তিলক আঁকা এদের কপালে। এটুকুও গেলে বাঁচে কিসে।"

সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষের জন্য এই সমবেদনা ও সহ-অনুভূতি যেমন বড় মাপের শিল্পীর হৃদয়ের পরিচয় দেয়, তেমনি ব্যক্তি-সমস্যাকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়তা ও তা থেকে বৃহত্তর অনুভূতির জন্ম দিতে তিনিই পারেন। এই প্রসঙ্গে 'ঠাকুমার ঝুলি' (২য় খণ্ড সমস্ত গল্পের শেষ গল্প) গল্পটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। কাহিনীর বিচারে এখানে তীব্র কয়েকটি বাঁকের মুখোমুখি হতে হয় পাঠককে। সত্যেনবাবু ও নিরুপমার ভরা সংসারে মধ্যবয়স্ক এই দুই নরনারীকে সহসা বিদ্ধ করে এক সমস্যা। নিরুপমা মা হতে চলেছেন বুঝি। যৌবন-উত্তীর্ণ শূন্যতার মধ্যে এই সম্ভাবনা কোন আলো জ্বালে না লজ্জার অন্ধকারকেই ডেকে আনে। এই দুই বোধের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরবর্তী স্তরে দেখি যে সেই লজ্জাকর সম্ভাবনা ছিল ভুল। এই সঙ্গে আশ্বাস ও সামাজিক লজ্জা থেকে অব্যাহতি। আবার তা থেকে জাত হতাশা! কারণ নতুন কোন প্রাণদানের ক্ষমতা তাদের আর নেই। আবার এই হতাশা থেকে গল্পের শেষে বৃহত্তর বোধে উত্তরণ। "একটি সুখের ইতি হয়ে গেল বলে নিরুপমা একদিন কেঁদে ছিলেন, তখনও এই সুখের ঠিকানা জানতেন না। সেদিন বোঝেন নি সারার পরেও শুরু আছে। যৌবনকেই একদা জীবন বলে ভুল করেছিলেন, এখন জেনেছেন জীবন যৌবনকে ছাড়িয়েও।"

অসাধারণ গল্প, তবু গল্পের ভাববস্তুগত গৌরবকথা লেখকের অংশে প্রকাশ করে বলতে হল। কিন্তু 'চারু বলিল না থাক' ('নষ্টনীড়') বা 'চন্দরা কহিল মরণ' ('শাস্তি') প্রভৃতি গল্পশেষের চমক ও চাবুক যেভাবে ছিপছিপে শরীরের এই শিল্পমাধ্যমে বিদ্যুৎশিহরণ ঘটায়, তাহার কথায় তা মেলে না। সন্তোষকুমার ঘোষের এমনই একটি গল্প 'চিনেমাটি'।

আগেই বলেছি যে এই ধ্বস্ত সমাজ-সংসারের ভঙ্গুর সম্পর্ক সূত্রগুলিকে ফুলের মালায় শ্রদ্ধেয় করে হাজির করতে পারেন নি, চান নি লেখক। সততার, বিশ্বস্ততার, আদর্শের সনাতন সেই সর্বরোগহর সূত্র আর আমাদের মধ্যে নেই, যাতে গেঁথে তোলা

যায় প্রতিটি মানুষের বিচ্ছিন্নতা আর বিষণ্ণতার ক্ষণিকাকে। তবু নীচুতলায় মানুষের জীবনের মধ্যে সেই হতাশা ও সর্বনাশ যেমন চোখ রাঙিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে প্রবেশ করে, ভদ্র সমাজে তা নয়! তার উপরে আমরা চড়িয়ে রাখি ফিনফিনে শুভ্রতার পোশাক, মিথ্যা হাসির মলাট। এই উপরিস্তলের বানানো চেহারাকে চিনতে পারে নি, 'সাহেবের' বাড়ির চাকর কুঞ্জ। সে ভেবেছিল তারা অর্থাৎ মালি-চাকরের দল যতই অশ্রদ্ধেয়, মূল্যবোধহীন শুধু জান্তব বেঁচে থাকুক, সমাজের একটা স্তরে মানুষ 'মানুষের' মতই বেঁচে আছে বুঝি বা। কিন্তু ইন্দ্রাণী আর বকুলদিতে যে কোন তফাৎ নেই, ভয়ংকর উপলব্ধির এই আঘাতে ঘটনাচক্রে বুঝতে পেরে "ওর এত দিনের গোপন সংগ্রহ, এত দিনের ছবি, পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে দিতে দিতে অস্ফুট ক্রুদ্ধ স্বরে বলল বাদি সব বাদি"। চিনেমাটির মতই ভঙ্গুর এই সংসারের মূল্যহীনতা তখন স্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের কাছে। ওই একটি ক্রুদ্ধ উচ্চারণের মধ্য দিয়েই। চিনেমাটির মতই হালকা পলকা বাহির-সুন্দর এই সমাজের ভদ্রতার বহিরাবরণ বাইরের এক টোকাতেই ভেঙে খান্‌খান হয়ে যায়।

তবে মধ্যবিত্ত সমাজের মনোবিকলনকে যেভাবে ধরতে পেরেছিলেন সন্তোষকুমার, তার একমাত্র তুলনা পূর্ববর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমকালীন নরেন্দ্রনাথ। হাজারটা ক্ষুদ্রতা ও অন্ধকার মলিনতায় ভরা তার মন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয় এজন্য তো সে দায়ী নয়। দায়ী ক্ষুদ্র ও অন্ধকার ঘর যেখানে সে থাকে। ক্ষুদ্র ও মলিন এক পরিবেশ—এই সমাজ তাকে যা দিয়েছে।

এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের সূক্ষ্ম স্তরভেদকে প্রায়ই লেখকের বানানো বলে মনে হয়। সামান্য পা ফসকে গেলেই, একটু অন্য মনস্ক হলেই নেমে আসতে হয় তথাকথিত 'নীচে'। তখন গৌরাঙ্গ বলে সামাজিক-আর্থিকভাবে 'অধঃপতিত' চরিত্রটির মনে হয় "ওদের সঙ্গে আমার তফাৎ কী বলত" মণিমালা বিস্ময়ে বলে "নেই?" "একটু ভেবে গৌরাঙ্গ বলে, আছে। ওরা বিড়ি টানে আর আমি একটা সস্তা সিগারেটই বারবার নিবিয়ে নিবিয়ে খাই।" ('পনের টাকার বউ')।

এই অনুপুঙ্খ ডিটেল তখন সন্তোষবাবুর গল্পের হাতের পাঁচ লেখক চাইলেই পান। এমনই তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি। এবং যথার্থ বড় লেখকের মত এই ডিটেল শুধু ছড়ানো-ছেটানো বহির্জাগতিক পর্যাবলীর পুঞ্জীভূত রূপ নয়, তা তাঁরই দৃষ্টি-ভঙ্গির সমর্থনসূচক ভঙ্গিমা। যেমন: "এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার। কাউকে কোনোদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।"

সারা জীবনের স্তর পরম্পরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ('কানাকড়ি') বস্তু বিশ্বের এই অভিজ্ঞতাপুঞ্জতেই শেষ জীবনের গল্প-উপন্যাস সংহত রূপ ধারণ করেছিল। ভেঙে ভেঙে ভাড়ার ঘরের খবর না দিয়ে এক নিশ্বাসে বোধ ও অনুভূতির অন্তস্থলকে ছুঁতে চাইলেন লেখক। কাহিনীর ভাষা হয়ে উঠতে লাগল এপিগ্রামের মত, চরিত্র হয়ে উঠলেন লেখক স্বয়ং। আত্মচরিত্রের মধ্যেই বহু চরিত্রের বীজকে গুটিয়ে নিলেন।

হৃদয়ের বদলে মননের প্রতিও তীব্র তীক্ষ্ম ইনভলভমেন্টের বদলে শান্ত দার্শনিকতার প্রতি তাঁর এখন আকর্ষণ। কারণ পূর্বাপরের রহস্য তিনি জেনে ফেলেছেন, অতি দূর প্রান্তরের সীমানা দেখতে পাচ্ছেন। নিজেকে তাই নতুন করে ফোটাতে চাইলেন লেখক, পাঠককে দেখাতে চাইলেন অভিজ্ঞতার নবরূপ।

আর এখানেই অসহায় পাঠক দূরে সরতে লাগলেন তাঁর শেষ পর্যায়ের কাহিনী থেকে। জ্বর ও জ্বরায় আক্রান্ত, অসহায়, অতিমাত্রায় সম্পৃক্ত, অব্যবহিতের দিনানুদৈনিকতায় ব্যস্ত, তারা সন্তোষকুমারকে আর সঙ্গী বলে ভাবত পারল না। জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী – সকলেরই এই ট্র্যাজেডি ঘটেছিল।

কিন্তু সন্তোষকুমারের অধিকতর ট্র্যাজেডির বিষয় হল এই যে, পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্টির পূর্বাপর স্তরপরম্পরা পাঠক ও সমালোচকের কাছে অদৃশ্য। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', 'বি. টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে'-কে মনে রেখেই সচেতন পাঠক 'বিবর'-পরবর্তী অংশকে দূরে সরিয়ে রাখেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস', 'টিকিট' প্রভৃতি গল্পকে মনে রেখেই পরবর্তী ফ্যাকাশে অংশকে বাদ দেন সমালোচক। কিন্তু 'কিনু গোয়ালার গলি', 'নানা রঙের দিন', 'সুধার শহর'-এর মত একই সঙ্গে শিল্পোত্তীর্ণ ও জমজমাট উপন্যাসের কথা পূর্ববর্তী পাঠকের বিস্মরণ ঘটালো কেমন করে? কিংবা 'শনি', 'কানাকড়ি', 'চীনেমাটি', 'ভেবেছিলাম', 'ঠাকুমার ঝুলি' প্রভৃতি অবিস্মরণীয় গল্প কেন নজরে পড়ল না পরবর্তী পাঠকের? বাংলা কথাসাহিত্যের এই রঙিন বৈভবের গল্প শোনানোর জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অকিঞ্চিৎকর প্রস্তাবনা।

কোন সন্দেহ নেই যে ওই বিস্মরণের পিছনে লেখকের দায় কোন অংশে কম নয়। অভিমান করে নিজেকে যেমন জনগণেশের কাছ থেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন তিনি, তেমনি যোগ্য ও সমর্থ প্রকাশকের হাতে নিজের রচনাবলীকে কোন কালেই তুলে দেন নি তিনি। আজ তাই বর্ণাঢ্য এইসব গল্প ও উপন্যাস 'আউট অব্ প্রিন্ট'। উৎসুক পাঠক ও শারীরিকভাবে মৃত অথচ দারুণভাবে জীবন্ত লেখকের মধ্যে হাঁমুখ ব্যবধান। ওই যোজনবিস্তৃত বিরহের শূন্যতাকে পূর্ণ করতে দরকার যোগ্য প্রকাশকের, উৎসাহী গবেষকের ও রসলিপ্সু পাঠকের। তাহলেই বাংলা কথা-সাহিত্যের এই হারানো বর্ণাঢ্য ইতিহাস পুনরাবিষ্কৃত হতে পারে।

সন্তোষকুমার ঘোষ যে আধুনিক বাংলা সাংবাদিকতার প্রাণপুরুষ, সেকথা সকলেই জানেন। আজ নতুন করে জানা দরকার, কীভাবে সদ্য-স্বাধীনতা-উত্তর-কালে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের পুরনো শেকল ভেঙে স্বাধীনতার অন্য মানে খুঁজেছিলেন। ব্যক্তির জীবনে, সমাজের জীবনে।

বীরেন্দ্র দত্ত

সমরেশ বসু ঃ পালাবদলের কথাকার

[এক]

যে কোন কথাসাহিত্য বস্তুত সৃষ্টির সৃষ্টি। এই পৃথিবী তার চতুর্দিককে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিত্য নতুন সৃষ্টির গতিতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ, তার অস্তিত্ব, সমাজ, ইতিহাস, আকাশ-মাটি-জল পরিব্যাপ্ত অসামান্য প্রকৃতি-পরিবেশ এক অমোঘ বিধানে, প্রবলতম বেগ-প্রতিবেগে নিত্য নতুন সৃষ্টির ধর্মে প্রাণবন্ত, প্রাগ্রসর। একজন সচেতন প্রতিভাবান লেখকের কলমে এই সৃষ্টিই আর এক সৃষ্টিতে ধন্য হয়ে ওঠে। লেখক নতুন জগত, মানুষ, সমাজের কথার সৃজনে হন বিভোর, গভীর-নিমগ্ন নব-ভাষ্যকার। এমন লেখকের হাতে এক-একটি রচনা এই বিচিত্র পৃথিবীর অস্তিত্বেরই যেনবা খণ্ড খণ্ড অংশের নির্যাস হয়ে ওঠে। স্বভাবী পাঠক বাইরের জগত থেকে আর এক নতুন জগতে প্রবেশ করেন। এই নতুন জগত পরিচিত বিশেষকে দেখায় নির্বিশেষ করে।

একাধিক উপন্যাসে পৃথিবীর এই বিশেষকে নির্বিশেষ করে দেখানোর অসম্ভব ক্ষমতা ছিল একালের বহু-বিতর্কিত কথাকার সমরেশ বসুর। তিনি বাঙালী লেখক, বাংলাদেশের মাটিতে তাঁর জন্ম, বাংলাদেশের বাতাস, মাটি, জল, আবহাওয়ায় তাঁর জীবন ও মনের বিবৃদ্ধি, সম্যক লালন-পালন। কিন্তু তিনি এই বিশেষ দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতিকে, ইতিহাস-ধর্ম-মানুষ ও কালকে গ্রহণ করে অতিক্রমণে বিস্ময়কর শিল্পী হয়েছেন উপন্যাসে। উপন্যাসে নিত্য নতুন বিষয় গ্রহণ, বিষয়ানুগ মানুষকে যথাযথ চিত্রণের মধ্য দিয়ে তিনি শিল্পীর জগতে হয়েছেন সর্বভারতীয়। আর এই সর্বভারতীয়ত্ব, জাতিকতা থেকে বৃহৎ জাত্যাভিমানে সাবলীল উত্তরণ— সমস্তই সম্ভব হয়েছে তাঁর স্ব-কালের কারণেই।

যে কোন একজন সচেতন শিল্প-প্রাণ মানুষকে গড়ে তোলে তাঁর কাল। কাল এখানে সীমা এবং অসীম - দুই অর্থেই গ্রহণীয়। সমরেশ বসুর আবির্ভাবকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সময়ের শেষ সীমার অব্যবহিত পরেই, 'আদাব' গল্প রচনার সময় ধরে। কিন্তু একটি মাত্র রচনা দিয়ে কথাকার সমরেশ বসুর আবির্ভাব ও পরিচিতির ঔজ্জ্বল্য প্রমাণ করার পরিবর্তে, বোধ হয় একথা বলাই ভাল, কথাকার সমরেশ বসুকে তৈরী করছিল তাঁর কিশোরকালের পরিবেশ, দেশীয় নানান ইতিহাস-চিহ্নিত ঘটনার উত্তাপ। যে কোন একটি কিশোর মন হয় স্পর্শকাতর, বিস্ময়-কৌতূহলে চকিত, অসীম জিজ্ঞাসায় দীপ্ত-সুদূরের জন্য আর্ত। সে সময়ের অভিজ্ঞতা, যদি সেই কিশোরের মধ্যে থাকে ভবিষ্যৎ এক কথাকারের নতুন কিছু হয়ে ওঠার বাসনা, তবে এক গোপন জারকরসের সঞ্চার ঘটায় মনের গভীরে, নিঃসাড়ে। যে গাছ একদিন মহীরুহ হয়ে সুবিশাল আকাশের বুকে তার ফুল, ফল, পত্র

শাখা ছত্রাখান করে মেলে ধরবে আত্মবিকাশ ও প্রতিষ্ঠার আনন্দে, তার পায়ের শিকড়ের শীর্ষমুখে মাটির অন্ধকারের বড় প্রাণের সমস্ত রকম যন্ত্রণা, শপথের অনুরণন তো অ-দৃশ্য থেকেই সক্রিয় থাকে ! মহীরুহের বীজে বুঝি বিস্ময় শিহরণ থাকে, ভবিষ্যতের বিশালতা ও বিরাটত্বের বিশ্বাস, প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে না।

সমরেশ বসুর কথাকার-স্বভাবের কাল-পরিবেশ তাই পরোক্ষে গড়ছে তাঁর মন। সমরেশ বসুর জন্ম উনিশ শ' চব্বিশে, তাঁর দুরন্ত ও দুর্বিনীত কৈশোর এবং প্রথম যৌবন চিহ্নিত হয় তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। তারুণ্য ও যৌবনের ক্রান্তিকাল আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সীমাচিহ্নে। আমরা যদি তিরিশের দশক শুরু থেকে পরবর্তী পনেরোটা বছর আলোচ্য সময়-সীমা ধরে নিই সমরেশ বসুর জীবন-মনের ভিতর-স্বভাব গঠনের উপযোগী কাল হিসেবে, তা হলে এই সীমাবদ্ধ সময়ে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির এক তীব্র আলোড়নের একাধিক ঢেউকে লক্ষ্য করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যে দারিদ্র্য দাপটের সঙ্গে সমাজকে অধিকার করে বসে, যে বিদেশী শাসককুলের চাপানো আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা দুবহ ভার হয় যুবজীবনে, যে হতাশা, বেদনা, অবক্ষয় ও অপচয় যুবকপ্রাণে বিশিষ্টতা পায়, তিরিশের দশকের শুরুতে এবং উত্তরকালে তার আদৌ উপশম ছিল না। মুষ্টিমেয় কিছু সৎ সাহিত্য-প্রাণ যুবকের যে 'কল্লোল' পত্রিকার আশ্রয় গ্রহণ, তার সমাজ-পরিবেশ তিরিশের দশক ধরে সমান মাপে বর্তমান ছিল।

সেই সঙ্গে দেশীয় সাম্যবাদী আন্দোলন শক্ত মাটি নিতে থাকে ধীরে ধীরে এই সময়েই। জাতীয় কংগ্রেসে দুই ভিন্ন মতের সংঘর্ষ তীব্র, সেই সঙ্গে সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনও ততোধিক তীব্রতায় বেগবান। তিরিশের দশকের শেষ দিকে শরৎচন্দ্রের লেখনী হয় চিরকালের জন্য স্তব্ধ, দু'বছর বাদে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে। এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় সুদূর প্রতীচ্য ভূমিতে। রবীন্দ্রনাথ সে যুদ্ধরথের রক্তচক্ষু আরোহী ও সারথিদের দেখে গেছেন তার বয়সান্তিক জীবনের প্রাজ্ঞ অথচ গভীরতম বেদনাদায়ক অনুভূতি দিয়ে।

সমরেশ বসুর কৈশোর ও তারুণ্য অনুভূতিপ্রাণ সচেতনায় এইসব ঘটনার সাক্ষী হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণেই আসে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা, বীভৎস সর্ববিনাশী মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কালো ধোঁয়া, ঔপনিবেশিক ভারতভূমিতে চরমতম অভাব ও দারিদ্র্যের অকল্পনীয় বিষক্রিয়া। সমরেশ বসুর জীবন ও মন এসবেরই পরিবেশে অতি ধীরে সংগোপনে পরিণত রূপ পেতে থাকে। অর্থাৎ জন্মের পর থেকে সমরেশ বসুর সময় ক্রমশ স্পর্শকাতর কিশোর ও তরুণ মনকে অন্য মাত্রা দিতে থাকে। স্কুল-পালানো সমরেশ বসু একদা বুড়িগঙ্গার তীরে স্কুল থেকে নির্বাসিত হন পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার তীরের স্কুলে। শেষে স্কুল ছেড়ে জীবনে-মনে হন বোহেমিয়ান। যতই খাঁচার বদল হোক, পাখির স্বভাবের বদল ঘটে না।

কৈশোর ও প্রাক যৌবনের সময়ে ব্যক্তি সমরেশ বসুর ছিল সংসার-উৎকেন্দ্রিক জীবন-স্বভাব, কিন্তু ভবিষ্যতের কথাকার সমরেশের কেন্দ্রানুগ মানস-গঠনের উপযোগী অন্তর্গূঢ় রসদ। কৈশোরের অস্থিরতা যৌবনে আনে অসহায়তা। এই অস্থিরতা ও অসহায়তা এক ভাবী কথাকারের মানসগঠনে কেন্দ্রানুগ রসদের যোগান দেয়। স্বচ্ছলতা নয়, দারিদ্র্যই ছিল এ যুগের যে কোন মধ্যবিত্ত সংসারের সহ-[illegible] ললাটলিখন। সমরেশ বসু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার সঙ্গে কিশোরকালের অস্থির ভাগ্য সমন্বিত হয়। যুগের অস্থিরতার সঙ্গে সমরেশ বসুর ভাগ্যের এক অদৃশ্য মিল ও মিলন রচিত হতে থাকে অলক্ষ্যে। এই অলক্ষিত স্বভাব সমরেশেরও ছিল অজানা। যুগের প্রচণ্ড তাড়নাতেই তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সমরেশ বসুর মত কথাকারের আবির্ভাব অবধারিত হয়ে ওঠে। একথা ঠিক নতুন কোন লেখকের জন্ম হয় দেশীয় সময়ের বিদীর্ণ স্বভাবের কারণেই। সময় ও যুগের দাবী যেন এমন কথাকারের জন্মদানের তাগিদ অনুভব করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল গোটা সময়টা ধরেই— প্রেরণা দিচ্ছিল নতুন কথাকার জন্ম-নেওয়ার। যেখানে শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের অবসান, কল্লোলীয় লেখকদের যাবতীয় সক্রিয়তা একটা প্রজন্মকে রক্তিম করে অপরাহ্নের আলোয় ম্লান ছায়া ফেলে, সেখানে আর এক প্রজন্মের প্রয়োজন হয় সময়ের অন্তঃশীল গতি-স্বভাবের কারণে, সময়ের দাবির বাধ্যবাধকতায়, সময়ের সংকটের কারণে। সমরেশ বসুর জন্ম ও শিক্ষা হিসেবে আবির্ভাব যেন সেই সময়, সময়-বেষ্টনকারী সমস্ত রকম কালগত ফলাফলের অবধারিত এক পরিণাম।

[দুই]

জীবন, মানুষ এবং শিল্প এই তিনটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে এবং একত্রে যে কথা-শিল্পীর আত্মার অধিগত থাকে, তিনি কখনোই আপোষ করেন না, করতে পারেন না কৃত্রিম সমাজগঠন ও জীবন-ব্যবস্থা এবং শিল্প-প্রকরণের সঙ্গে। সমরেশ বসুর কথাকার জীবনের ইতিহাস তারই প্রমাণ দেয়। এবং এই কথাকার-সত্তার ভূমি পরোক্ষে রচনা করেছে তার বাল্য ও কৈশোর জীবনই। লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে বাল্য ও কৈশোর জীবনে সমরেশ বসু, এবং যৌবনের প্রারম্ভেও তিনি, কঠিন সংগ্রাম করেছেন।

ঢাকার রাজনগরের স্কুল সমরেশ বসুকে ধরে রাখতে পারেনি, পারেনি পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটির স্কুলও। ছোটবেলা থেকেই মনের গভীরে বাসা বেঁধেছিল এক নিরাসক্ত বাউল। সে-ই তাঁকে ছবি আঁকার দিকে টানে, কখনোবা হাতে উদাস সুর-ভর্তি-করা বাঁশী ধরায়, আবার কখনো গানের সুর দিয়ে তাকে ঘরছাড়া করে দেয়। এই যে প্রচলিত প্রথাবদ্ধ সংসার-উৎকেন্দ্রিক মন ও জীবন-ভাবনা, বস্তুত, এটাই একজন শিল্পীর পক্ষে মনের মূল মাটির ভিত তৈরী করে। বাল্য ও প্রথম কৈশোরের অস্থিরতার সমস্ত দিকই ছিল একজন ভবিষ্যৎ কথাকারের উপযোগী মানস-গঠনের বিশিষ্টতা। যাঁর মনের গভীরে ছিল একজন জাত চিত্রী হওয়ার তুলি, তাঁর হাতে

এলো কথাকারের কলম। রবীন্দ্রনাথের হাতে ছিল কলম আর তুলি একসঙ্গে, অবনীন্দ্রনাথেরও তা-ই। সমরেশ বসু তুলি ত্যাগ করে ধরলেন কলমই।

কিন্তু তাঁর কলমই একসঙ্গে তুলিরও কাজ করে। একের পর এক চরিত্র আঁকলেন, কখনো সমরেশ বসুর নামে, কখনো কালকূটের কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ থেকে বের-করে আনা কলমের রেখায় রেখায়। অসমাপ্ত 'দেখি নাই ফিরে' জীবনী উপন্যাসে তো একই সঙ্গে কথাকার ও চিত্রী, কালকূটেও স্বয়ংলেখক—দুই ও তার বেশী সত্তার অত্যদ্ভুত আঁকা-জোকার কাজ এবং কারুশিল্পের চমক থেকে গেছে! তাঁর উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনার পরে, সেখানে পৌঁছবার আগে আমাদের এত সব অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা বস্তুত, কথাকার সমরেশ বসুর অতি-প্রাসঙ্গিক শিল্পী-আত্মার উপযুক্ত নান্দী রচনার প্রয়াস মাত্র।

বাল্য ও শেষ-কৈশোরের পরেই আসে তারুণ্য এবং বিশুদ্ধ যৌবন। এই সময়টাতেই তিনি অসম্ভব এক দুঃসাহসের কাজ করে বসেন—প্রেমিকা গৌরীকে নিয়ে পলায়ন, বিবাহ, আতপুরে একটি নড়বড়ে সংসার-জীবন সুরু। মুক্তি-পিপাসু মনের গভীরে যে ভয়ংকর অতৃপ্তি ও আর্তি ছিল এক জাত-শিল্পীর, যৌবনে তা রূপ নেয় বাইরের জীবনে চরমতম অপ্রাপ্তির। কিন্তু এখানেও আপোষ নেই, আছে সংগ্রাম নিরন্তর। সংগ্রাম অভাবী প্রতিকূল জীবনধারণ ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এই বয়সেই কী না করেছেন তিনি সংসার, স্ত্রী, সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আমার মতে, লেখকের বড় মানবতার একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা এখানেই বীজাভাসে থেকে গেছে। ডিমের ফেরিওলা, শুয়োরের খোয়াড়ের চাকুরে, ইছাপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরের অতি সামান্য মাইনের ট্রেসার সমরেশ বসু সংসারের ভয়ংকর এক রাক্ষসের মত হাঁ-মুখের সামনে বড় এক মহৎপ্রাণ সংসারীর পারিবারিক ও পিতৃহৃদয়ের মানবতাবোধে, উপযুক্ত প্রেমিকা গৌরীদেবীর পাশে সার্থকতম প্রেমিকের অভিজ্ঞতায় যে জীবন-অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা-ই তাঁর ভাবী কথাকার জীবনের মূল্যবান পাথেয় ছিল। তা না হলে এই অ-সম-অবস্থায় একজন মানুষ সব কিছু জাগতিক প্রয়োজনের কিছু মিটিয়ে এবং অনেকটাই না-মিটিয়ে কী মানসিকতায় 'নয়নপুরের মাটি'-র মত উপন্যাস লিখতে পারেন। শিল্পী মনের বড় ঐশ্বর্য ছিল বলেই সেই সাংসারিক ও প্রেমিক সমরেশ বসু সময় করে বসতে পেরেছিলেন লেখকের আসনে।

'অভিজ্ঞতা' যে কোন একজন বলিষ্ঠ কথাকারের বড় এবং একমাত্র মূলধন। সেই অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়ার আধার হল 'চরিত্র', আর চরিত্রের অভ্যন্তরে যে মন ক্রিয়া করে তাকে আদি-মধ্য-অন্ত চিহ্নিত এক একটি জীবনের নিটোল রূপে প্রসারতা দেয় তা হ'ল একজন শিল্পীর 'ইনটুইশন'। সমরেশ বসুর এই 'ইনটুইশন' তীব্র ও তীক্ষ্ন, স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে শুরু করে এই আপোষহীন সংগ্রামী জীবন-স্বভাবের প্রত্যক্ষ ভূমি থেকেই। সমরেশ বসু নিজের কথায় এক সময়ে যা বলেছেন, তার তাৎপর্য এই রকম—সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর দিনগুলির মধ্যে অভাবের জীবনের চরম অসহায়তার মধ্যে সামান্য মাইনের চাকরীর দৈনন্দিন দায়-দায়িত্ব মিটিয়ে বাড়ি ফিরে সামান্য কেরোসিনের আলোয় একসময়ে ঠিক লিখতে বসতেন এবং তাঁরই

কথায় —'প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা পর বাড়ি ফিরে, ক্লান্ত শরীরে লিখতে বসাটা প্রায় অসম্ভব মনে হলেও, ভিতরের উন্মাদনা কোনো ক্লান্তিকেই মেনে নিতো না।'

এই যে 'ভিতরের উন্মাদনা' এটাই এক বিদেশী সমালোচকের ভাষায় কথাসাহিত্যে 'creative imagination' বা আর একজনের কথায় 'realistic imagination'-এর একেবারে গোড়ার কথা। জীবন ধারণের সমস্ত রকম জটিলতার 'ক্রসকারেন্ট'-কে মেনে নিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্বাভাবিক, অসহায় কঠিন আড়ষ্ট এবং অবক্ষয়িত পরিবেশে নিজেকে স্থিত করেও সমরেশ বসু কলম নিয়ে বসতে পেরেছেন উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি', 'উত্তরঙ্গ' লিখতে, লিখেছেন 'আদাব' গল্প তা সম্ভব হয়েছে তাঁর বাল্য ও কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের সেই সংগ্রামী ও আপোসহীন দুর্মদ মানসিকতার কারণেই। যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল যে জীবন, সমাজ ও অর্থনীতিকে দগ্ধ করে স্তূপীকৃত ভস্মের আগুনে ঢাকা দেয়, সেই উত্তপ্ত ভস্মস্তূপ থেকেই গ্রীক পুরাণের ফিনিক্স পাখিদের মত সমরেশ বসুর জন্ম হয়ে যায়। যেন সমরেশ বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দগ্ধীভূত জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির এক অবধারিত নতুন ফসল!

কথাকার সমরেশ বসু এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'লেখাকে আমি আত্ম-চর্চাই মনে করি -তা নিজের শ্রেণী অথবা অন্য শ্রেণী যাদের নিয়েই লিখিনা।' মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত এই লেখক যা লিখে গেছেন, সমস্তই তাঁর আত্ম-চর্চারই একান্ত অনুগত। আর এই আত্ম-চর্চা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-চর্চা ও চর্যা থেকেই উঠে আসা উজ্জ্বল প্রসঙ্গ। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা, যে অনুপ্রেরণা ও অনুভাবনা সমস্তই সমরেশ বসুর কথাকার জীবনের বড় পাথেয়। কথাকার জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই সমরেশ বসুর বিশ্বাস পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবিত কোন বটবৃক্ষের প্রধান শিকড়ের একমাত্র শাঁষপ্রাণ শপথের মত ছিল 'আমি বিশ্বাস করি সাহিত্যিককে বেঁচে থাকতে হয় কেবল জৈবিকভাবে না, আরো বহুতর বাধার বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত ঈর্ষা থেকে রাজনীতি, এমন কি আত্মার আত্মজনরাও বাধার ব্যূহ রচনা করে। জটিলতা বাড়ে, সৃষ্টি নতুন দিগন্তের সন্ধান করে, আর প্রতিষ্ঠা সংগ্রামকে তীব্রতর করে, কেবল বাইরে না, ঘরেও।'

এই বিশ্বাসের জোরেই সমরেশ বসুর উপন্যাস-পরিক্রমার বেশ কয়েকটি স্তর নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সমরেশ বসুর উপন্যাসের স্তরগুলি চিহ্নিত হয় তাঁর নির্ভীক এবং নিরাসক্ত মানসভঙ্গির কারণেই। আগেও বলেছি, প্রথম যৌবনের সংসার জীবনের যে চরমতম অভাব, তার জন্য তিনি আপোষ করেননি কোথাও। তখন সে সময়ের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি করতেন, তার সূত্রে ঘটে কারাবাস। কারাজীবন থেকে মুক্তির পর চরম অভাবের মধ্যে চাকরীতে হীনমন্যতা-মলিন শর্তাধীন আপোষের টোপ সামনে এলে নির্দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করার মত সাহস, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা তাঁর ছিল। এই যে জীবনধারণে অবলীলায় এমন ঝুঁকি নেওয়া, আমাদের কথা, উপন্যাস পরিক্রমার মধ্যে সেই দুঃসাহসিক ঝুঁকি নেওয়ার দিক একাধিকবার দেখা গেছে। 'স্বীকারোক্তি', 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক', 'মানুষ',

'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' ইত্যাদি একাধিক উপন্যাসের প্রসঙ্গের মধ্যেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে।

বাল্য ও কৈশোর সমরেশ বসুর কথাকার মনের উৎস-স্থান চিহ্নিত করে, যৌবনের শুরুতে তার প্রথম বিস্তার, বিবৃদ্ধি ঘটে উত্তরকালে ক্রমশ। কিন্তু তাঁর যৌবনের শুরুতেই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর উত্তাল সময় প্রেক্ষিত। এই সময়টি চিহ্নিত হয় নানান অভিনব স্রোতে। কংগ্রেস তথা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভারত তথা বাংলাদেশের কলকাতা ও তার আশপাশের রক্তক্ষয়ী ভয়াল রূপ, অক্টোপাশের মত মন্বন্তরের সর্বগ্রাসী থাবার ভীষণতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অধোমুখ স্বভাব, কম্যুনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক ও পদ্ধতি-প্রয়োগ-নির্ভর জটিল কর্মতৎপরতা, শহর ও গ্রামমানুষের অসহায় স্থান-বদল, এসবের মধ্যেই যুবশক্তির নিরঙ্কুশ অপচয়, বুর্জোয়া সমাজের ভাঙন ও পতন, রাজনীতির ভুল-চালের খেলা, শ্রমিক-কৃষকদের অসহায়তা, সদ্য-উদ্ভূত কালোবাজারী-মুনাফাখোর-মজুতদারদের কালোরাতের তৎপরতা আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানান রঙ বদলের নীতি - এসবের মধ্যেই সমরেশ বসুর মনের অধিতলে ঔপন্যাসিক অভিজ্ঞতার মাটি সার সংগ্রহ করতে থাকে পরোক্ষে। একে একে এই সব থেকেই আসে তাঁর উপন্যাসের শক্ত মাটি, বিস্ময়কর উত্তাপ, বীজ থেকে মহীরুহ হওয়ার দুরন্ত প্রাণাবেগ।

[তিন]

কথাকার সমরেশ বসুর যাবতীয় শিল্প-প্রয়াস লক্ষনীয় বদল ঘটায় বাংলা উপন্যাসের ধারায়। যে উপন্যাসের জন্ম উনিশ শতকে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে', যার পরিপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ যৌবন-স্বভাব, বিস্ময়কর প্রতিমা রূপ নেয় বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উনিশ শতকের শেষতম চারটি দশকে, তারও বদল হয় রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালিতে' এসে। এই আধুনিক শিল্পশাখার অন্তঃস্বভাবে দ্রুত বদল ঘটতে থাকে। মনে হয় প্যারীচাঁদ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের সবল লেখনীমুখেই বাংলা উপন্যাসের যে বলিষ্ঠ, মৃত্তিকা-প্রোথিত ত্বরিত এক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, তার এক প্রতিবেগেই 'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাসের বদল ঘটায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায় আসেন কথাকার রবীন্দ্রনাথ। এর পর 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস দু'টির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-চৈতন্যের সম্যক স্বীকৃতি ও মুক্তিতে বাংলা উপন্যাস যেমন স্বভাবে বদলকে মেনে নেয়, তেমনি রবীন্দ্র-উপন্যাসেও তার ধারাপথ মোড় ফেরে। আসে 'কল্লোল'-'প্রগতি'-'কালি-কলম' পত্রিকা! এগুলির জীবৎকাল ক্ষণস্থায়ী হলেও পত্রিকাকেন্দ্রিক তরুণ লেখক-বুদ্ধিজীবীর দল সবল দ্রোহ-মানসিকতার প্রমাণ দেন বাংলা কথাসাহিত্যে। আবার বাংলা উপন্যাসের নতুন স্রোতে মুখ-ফেরানো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রেক্ষিতে আরও কয়েকজন নতুন লেখকের মধ্যে থেকে সমরেশ বসু বাংলা উপন্যাসে লক্ষনীয় পালা বদলে সামিল হন। ঐতিহ্যের

প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তিমন ও মননের বৈদগ্ধ্য, পত্রিকাকেন্দ্রিক আন্দোলনের একমুখিনতা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাড়িত উপন্যাস-ভাবনা বাংলা উপন্যাসের ধারায় যে বিস্ময়কর অভিনবত্ব আনে, তা পরবর্তী এই পাঁচটি দশককে চকিত করে রাখে, রাখছেও। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং 'কল্লোল' পত্রিকা যে বাস্তবতার স্বাদ দেয় উপন্যাসে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর উপন্যাসধারায় তা থেকেও নতুন ও বহুবিচিত্র শিল্প-বাস্তবতার সম্মুখীন হয় একালের পাঠক। সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব সেই সূত্রে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, ননী ভৌমিক, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে প্রদত্ত ঘৃতাহুতি থেকে উঠে-আসা কথাকার। মনে রাখা দরকার, সে সময়ে পূর্বসূরী লেখকরাও লেখনী নিয়ে সমান সক্রিয়। কল্লোলগোষ্ঠী ও কল্লোল-বহির্ভূত এবং কল্লোল-প্রভাবিত লেখক-কুলের মধ্যে ছিলেন জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ ও অন্নদাশংকর রায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের অব্যবহিত-পূর্বে তিন অনুজ লেখক সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের সমসময়ে বাংলা উপন্যাসে যে বাস্তবতার স্বরূপ স্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে আবির্ভূত অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখককুল সেই বাস্তবতার ভাবনা থেকে সরে আসেন। বস্তুত যুদ্ধের সর্বাবয়ব নির্মম অভিঘাতই এই বদলের মূল কারণ।

সমরেশ বসু সেই পরিবর্তিত বাস্তব-ধারণার একজন সুচিহ্নিত কথাকার। উপন্যাসের বাস্তবতাকে কল্লোলের লেখকরা অনেকটাই প্রাগ্রসর বোধ ও বোধিতে চিহ্নিত করে রাখেন তাঁদের রচনায়। 'কল্লোল' পত্রিকার দায় ও দায়িত্বের কথায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লেখককুলের সমস্তরকম শিল্প-প্রয়াসকে বলেছেন, 'নবীনতার, অনন্যতার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে, এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি।' সেই সাধনার গুহ্য মন্ত্র। আর উপন্যাসে এই নতুনের অভিনন্দনে তাঁরা বিবিধ অনালোচিত বিষয়-সন্ধানে হলেন দক্ষ ডুবুরি, বাস্তবতার প্রশ্নকে তীব্র ও তীক্ষ্ণ স্বভাবে করলেন জরুরি এবং যৌনতানির্ভর জটিল মনস্কতা ও একেবারে বিত্তহীন, নিঃস্ব মানুষ ও পরিবারের দুঃখকথায় এঁরা পুরনো আদর্শবাদের কাছে কালপাহাড়। জগদীশ গুপ্তের নির্মম নিরাসক্ত, অচিন্ত্যকুমার-বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের রচনায় রোমাণ্টিক আদর্শবাদের পাশে রূঢ় বাস্তববাদী মনের যুগধর্মী যন্ত্রণাকাতরতা, পাশ্চাত্য সাহিত্যের পঠন-পাঠনে উদ্দীপ্ত সংশয়াত্মক, নৈতিবাদী, আস্তিক্যভাবনা-শূন্য জীবনভাষ্য সে সময়ের বাস্তবতাকে 'যুগের যন্ত্রণা'র সামীপ্যে আনে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামজীবনভিত্তিক বাস্তবতার প্রোজ্জ্বল রূপ, তারাশঙ্করের আদর্শময় বাস্তবজ্ঞান, কনিষ্ঠ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বিবেকী বাস্তবতায় পরিশীলিত হয়ে বাংলা উপন্যাসে যথার্থ বাস্তবতার সংজ্ঞা নিয়ে দেখা দেয়। জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাবোধ এবং ধূর্জটিপ্রসাদ-অন্নদাশংকর রায়ের চরিত্রের মগ্ন চেতনাশ্রিত মনন মিলে-মিশে বাংলা

উপন্যাস-ধারায় যে প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের বাস্তবতার স্বাদ দেয়, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশাল অথচ নির্মম এবং সর্বগ্রাসী অভিঘাতে সমসময়ের দাবীতে আর এক 'ডাইমেনশন' পায়। সমরেশ বসুর উপন্যাসে সেই নতুন মাত্রার বাস্তবতা বস্তুত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সুস্পষ্ট দেওয়াল লিখন।

বাংলা উপন্যাসে পালাবদলে, সমরেশ বসুর উপন্যাস-রচনার প্রয়াসে বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হ'ল, কল্লোলের কাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব-সময় পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে যে যৌনতা, তার বিকৃতি ও মনস্তত্ত্ব এবং একেবারে নিম্নবিত্তের মানুষ, সংসার ও সমাজ নিয়ে যে জীবন-প্রতিচিত্রণ চোখে পড়ে, তা সমরেশ বসুর রচনাতেও আছে। কল্লোলের ও তুলনায় কল্লোল-বহির্ভূত কনিষ্ঠ লেখকরাও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিণত ও যুগ-প্রভাবিত মন এবং মননে সক্রিয় থেকেছেন উপন্যাসে, কিন্তু নিজের কালের দাবিকে যে রূঢ় ও বেপরোয়া, বিরোধী ও বিদ্রোহী, নির্মম ও নিরাসক্ত মানসিকতায় সমরেশ বসু উপন্যাসে নানা ভাবে উপস্থিত করেছেন, ঠিক সেই শৈল্পিক সত্যে ও সততায়, সেই নির্মমতা ও নিরাসক্তিতে অন্য কোন লেখক আঁকেন নি।

কবিতায় জীবনানন্দ দাস এবং উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সগোত্র সমরেশ বসু। একই কালে জ্যোতিরিন্দ নন্দী ও সন্তোষকুমার ঘোষ সেই বাস্তবতা থেকে অন্য পথ-সন্ধানী হয়েছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যেখানে মধ্যবিত্ত মানুষের অভাবী জীবন ও যৌন জীবনের জটিল অন্ধকারে বাস্তবতার সন্ধিৎসু থেকেছেন একটানা, যেখানে একান্তভাবে ব্যক্তির মগ্নচৈতন্যে নিমজ্জিত থেকে ব্যক্তিত্বের সংকট ও সংকটমোচনেই বাস্তবতার স্বচ্ছ আয়নাকে সামনে রেখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, ঠিক সেভাবে সমরেশ বসু বাস্তববোধে নিজেকে নিবদ্ধ রাখেন নি। তিনি তাঁর সমস্ত উপন্যাস পরিক্রমার বিষয় সীমাকে নানা ভাবে অতিক্রম করেছেন। আর এভাবে বিষয়ের বৈচিত্র্যেই এসেছে বাস্তবতার গভীর তাৎপর্য। বার বার তিনি বাস্তবতাকে পরীক্ষার সামনে এনেছেন। 'নয়নপুরের মাটি', 'উত্তরঙ্গ' যার শুরু, 'শ্রীমতী কাফে', 'গঙ্গা', বড়গল্প 'স্বীকারোক্তি', 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'ম্যাকবেথ', 'রঙ্গমঞ্চ', 'কলকাতা', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'টানা পোড়েন', 'খণ্ডিতা', 'যুগ যুগ জীয়ে', 'বারো বিলাসিনী', 'সংকট', 'অপদার্থ', ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে ক্রমান্বয়ে তারই টীকা-ভাষ্য রেখে গেছেন। এইভাবে উপন্যাসের বিষয়ের বিশেষ থেকে শিল্পী তথা বিষয়ীর নির্বিশেষে তাঁর বাস্তবতার স্বরূপ পেয়েছে তত্ত্বের নবস্বাদী রসভাষ্য।

[চার]

সমরেশ বসুর উপন্যাসে বাস্তবতার বিষয়টি তাঁর উপন্যাসের সামগ্রিক আলোচনার মূলগত প্রসঙ্গ হয়েই সামনে উঠে আসে। একজন সৎ, সচেতন লেখক সমরেশ বসু।

টলস্টয় এরকম লেখকের মানস বৈশিষ্ট্যের কথায় প্রকারান্তরে বুঝিয়েছেন, এরকম লেখক হতে গেলে সমগ্র পৃথিবীর সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট, সতেজ ও পরিচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা থাকা একান্ত জরুরী, কারণ সার্থক শিল্প-সৃষ্টির মূল এটাই। টলস্টয়ের ভাষ্যে ধরা এই মানসিকতার একান্ত অধিকারী বলেই সমরেশ বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে আবির্ভূত হয়ে তীক্ষ্ম সচেতনায় উত্তরকালের জটিল পটভূমিতে উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও প্রকরণকে অভিনবত্ব দিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুর মাস কয়েক আগে একটি পত্রিকায় যুগ্ম সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সমরেশ বসু বলেন, 'অবশ্য এটা ঠিকই যে, উপন্যাস যদি অত্যন্ত বাস্তব হয়—উপন্যাস হচ্ছে বাস্তবের রূপান্তরিত রূপ—এটাই আমি মনে করি।' আমরা মনে করি সেই 'রূপান্তরিত বাস্তব' বস্তুত তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উৎস-জাত। উপরি-উক্ত সাক্ষাৎকার থেকেই লেখকের আর একটা উদ্ধৃতি গ্রাহ্য প্রসঙ্গত—'একজন সাহিত্যিক আমি হয়তো আজকে অন্যভাবে লিখতে পারি, কিন্তু আমার যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তা হলে তো আমি গল্প লিখতে পারবো না।' শিল্পের বাস্তব শিল্পীর বাস্তব অভিজ্ঞতারই শিল্পীত আয়নার কাচে ধরা মনোরম মায়া। এই নবসৃষ্ট মায়া সার্বজনীন, অমোঘ এবং এর পাঠক-মনে প্রতিক্রিয়া বাস্তবের সুনিপুণ 'ডিটেল্‌স্‌' থেকে বরং অনেক বেশী প্রত্যক্ষ, শক্তিময়, ও সুন্দর।

সমরেশ বসু সেই বাস্তবকেই নতুন অবয়বে তাঁর উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন। নিজের লেখা সম্পর্কে সমরেশ বসুর স্পষ্ট মন্তব্য—'আসল কথা হচ্ছে, যে ঘটনা বাস্তব যা আমার চতুষ্পার্শ্বে ঘটছে আমি দেখতে পাচ্ছি, এমন কি আমাদের নিজেদের জীবনের ক্ষেত্রেও তার কিছু কিছু প্রতিফলন ঘটছে —এগুলোকে বাদ দিয়ে লিখি কি করে? সমাজে যা ঘটছে তাকে একেবারে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কি করেই বা লেখা হতে পারে?' এসবই পরিণত মনের ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সমরেশ বসুর শিল্পী-জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমার অভিজ্ঞতার – ঋদ্ধ উপলব্ধি। এই উপলব্ধির সার্থক প্রমাণ আছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে।

প্রশ্ন ওঠে, বাস্তবতার প্রয়োগে সমরেশ বসু কল্লোলীয় বাস্তবতাবোধ থেকে কতটা পথ বদল করেছেন, এনেছেন নতুন অভিজ্ঞতার বাস্তবচেতনা! 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের আগে সারা বিশ্বজুড়ে ঘটে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু তার আবির্ভাব, প্রভাব ও সমাপ্তি প্রতীচ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। ভারত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং বৃটিশ শাসিত ছিল বলে, এবং যেহেতু বৃটিশরা সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অন্যতম প্রধান অংশীদার ছিল, তাই সেই যুদ্ধের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব পরোক্ষে সংকট এনেছিল ভারত তথা বাংলাদেশের মানুষদের জীবনে ও মনে। তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়া সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সর্বদিক গ্রহণ করেই --দেশীয় বুদ্ধিজীবী লেখককুল তারুণ্যে ও যুবপ্রাণের স্বভাবে কল্লোলের মধ্যে ও বলয়ে ভিড় জমান। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে বাস্তবতাবোধকে শিল্পদেহে গ্রহণ করার তাগিদ ছিল, তা প্রাচীন

আদর্শপ্রবাহিত, আদর্শপ্রাণিত ও পুরনো আদর্শ এবং মঙ্গলবোধকে স্বীকার-অস্বীকার দুয়ের সমানুপাতী গ্রহণ ধর্মে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের লেখকদের বাস্তবচেতনা সেই প্রাচীন আদর্শের ধ্বংসস্তূপ থেকেই জন্ম নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত হয় প্রতীচ্য থেকে প্রাচ্য ভূখণ্ডেও, এই বাংলাদেশ তথা কলকাতায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মন্বন্তর, মহামারী, কালোবাজারীদের নীতিহীন নির্লজ্জ অর্থে লোলুপতা, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের পরিবেশ, উন্মূল সর্বহারাদের অকল্পনীয় দুরবস্থা, সামাজিক সমস্ত রকম ন্যায়নীতির সম্যক বিনষ্টি, বুর্জোয়া অর্থনীতি থেকে জাত পরিবার জীবনে একাধিক দুষ্ট ক্ষতের ভয়াল আবির্ভাব এইসব দিয়েই এই কালের লেখকরা তাদের শিল্প সৃষ্টির উপযোগী অভিজ্ঞতায় ধনী হতে থাকেন। স্বভাবতই যে বাস্তবতাবোধের মূল ভিত্তি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবজাত সমাজ কল্লোলের কালে, তা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা আনে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু প্রমুখের শিল্পীমনে। এই বাস্তবতা কোন রোমান্টিক বিলাসের স্পর্শদুষ্ট নয়, কোন পুরনো আদর্শের নীতিতে উজ্জ্বল নয়। সম্যক পর্যুদস্ত জগত, জীবন, সমাজ ও মানুষকে একেবারে মুখোমুখি crude reality-র মধ্য দিয়ে দেখার কারণেই সমরেশ বসু প্রমুখের বাস্তব-ভাবনা সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি নেয় উপন্যাসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভের বছর দুই-এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব ঘটে। কল্লোলীয়রাও তাঁদের বাস্তবভাবনার সঙ্গে কল্যাণময়তা ও মঙ্গলভাবনা যোগ করে বাস্তবতাকে সহনশীল করেছেন ধীরে ধীরে। কবিতায় জীবনানন্দ দাস, সমর সেন, উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সেই আদর্শ-প্রাণিত বাস্তববোধকে ত্যাগ করতে অনেকাংশে উৎসাহী বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাকেই বড় করে তোলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যথাযোগ্য দাবী মুখে। সমরেশ বসুর উপন্যাসে তাই বাস্তবতার কঠিন রূপ উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সূত্রে অন্য শিল্পস্বাদ আনে। কল্লোলীয় লেখকগোষ্ঠীর বাস্তবতাবোধ ছিল সেকালের আদর্শবাদেরই এক বিপরীত প্রতিক্রিয়ার শিল্পবিম্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে বাস্তবতা আসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্মম সত্যস্বরূপে।

কল্লোলের লেখকদের যে বাস্তবচেতনা, উপন্যাসে-গল্পে বাস্তববুদ্ধির প্রয়োগ, তার প্রকাশ ছিল নর-নারীর দেহমিলনের প্রত্যক্ষ চিত্রে, ছিল নিম্নবিত্ত মানুষদের নিষ্করুণ দুঃখ দুর্দশার জীবনধারণের কারণ উদ্ঘাটনে। রবীন্দ্রনাথ এমন জটিল মনস্তত্ত্ব সম্মত যৌনতার প্রতিচিত্রণকে বলেছেন 'লালসার অসংযম', নিম্নবিত্তের দুঃখচিত্রের বিম্বনকে বলেছেন 'দারিদ্র্যের আস্ফালন'। এর কারণও ছিল সম্ভবত নবীনদের যে বাস্তবভাবনা তার অস্পষ্ট ধ্যান ধারণার মধ্যে। সমরেশ বসু প্রমুখের বাস্তবতার চিন্তায় কোন অস্পষ্টতা নেই। 'বি বি. রোডের ধারে'-র শ্রমিক জীবন, 'বিবর' ও 'প্রজাপতি'র নায়কের যৌনভাবনা, 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র নায়কের রাজনীতি নিয়ে সমূহ

বিভ্রান্তি, সংশয়—এসবের বাস্তবতায় কোন অস্পষ্টতা নেই সমকালীন সমাজ, মানুষ ও জীবনের প্রেক্ষিতে।

বস্তুত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, সমাজের সংঘাত-সংঘর্ষে যে স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশীয় শাসননীতির সূত্র-পরম্পরায় তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, সমরেশ বসুর উপন্যাসে তারই যথাযথ প্রতিচিত্রণ সহজ হয়ে উঠেছে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধোত্তর ভাঙন, দেশ বিভাজন ও মধ্যবিত্ত থেকে সর্বহারাদের জীবন চর্চায় লক্ষণীয় বদল, দেশীয় শাসকদের একজাতীয় শোষণ মনোভঙ্গি, রাজনীতির জটিলতা, ব্যক্তির সম্পূর্ণ রূপে নিজের দিকে মুখ-ফেরানো এই সব কিছুই দেখা দেয় পরিবর্তিত দেশীয় পরিপার্শ্ব থেকে। সমরেশ বসুর শিল্পী-আত্মা তা থেকেই রসদ সংগ্রহ করে। মধ্যবিত্তের অসহায়তা ও ভণ্ডামি, ধর্মের নামে লাম্পট্য, মতাদর্শের রাজনীতির লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের অকল্পনীয় দুর্ভোগ ও হতাশা, ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতায় বিবর্ণ মুক্তির আশ্রয়-অনুসন্ধিৎসা, সর্বহারা ও নিম্নবিত্ত মানুষদের, কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার যাবতীয় প্রয়াস এসবই ছিল সত্য বাংলাদেশের বুকে যুদ্ধোত্তর বিগত দশকগুলিতে। সমরেশ বসুর সচেতন বাস্তবতাবোধ শিল্পের মর্মস্থান চিহ্নিত করেছে এইসব বিষয়ের কেন্দ্রে স্থিত থেকেই. নিয়ত বিষয় বদলের মধ্য দিয়ে বক্ষ্যমান লেখক নির্মম আপোষহীনতায় উপন্যাস লিখে জগত, জীবন, মানুষ ও সমকালের আর্থ-সামাজিক ভিত্তিরই চর্চা করে গেছেন। সেখানে প্রত্যক্ষ যৌন সম্পর্ক, প্রেমের নামে যৌনতা, নর-নারীর প্রেমের নামে দেহ-মিলনের ভণ্ড চালাকি, রাজনীতির মতের বিরোধিতার নামে বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয়, ব্যক্তির শুভাশুভ ও সমাজ এবং জাতির কল্যাণকর দিক উপেক্ষা করে রাজনৈতিক মতের রুক্ষতাকে আঁকড়ে থাকা—সবকেই শ্লেষ ব্যঙ্গে চাবুকের উপযোগী করেছেন লেখনীকে।

এই অর্থেই বাস্তবতার শিল্প-সম্মত রূপের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যাপ্তি। ঠিক যা আছে তাকেই হুবহু আঁকায় বাস্তবতা নয়, যা আছে, যা ঘটছে, তার ব্যাখ্যায় কার্য-করণ পরম্পরাকে pointing finger করে শৈল্পিক ঘটনা ও চরিত্র-ন্যায়ে মানুষ ও সমাজেতে ভিতরের খোলস নির্দ্বিধায় ও তান্ত্রিক নিরাসক্তিতে খুলে দেওয়া। এখানেই সমরেশ বসুর উপন্যাসের বাস্তবতার অভিনবত্ব। তার এই সূত্রেই উপন্যাসের পালাবদল সৃষ্টিতে তিনি একজন কৃতী লেখক-নায়ক। 'বি. টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', লিখে তিনি শ্রমিক ও সর্বহারাদের শরীর-সংলগ্ন হয়েছেন. 'বিবর', 'প্রজাপতি' লিখে তিনি ব্যক্তি ও সমাজ-মানুষকে এক ভয়ংকর অস্বস্তির মধ্যে, অন্ধকার এক গুহামুখের সামনে এনেছেন, 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' ইত্যাদি লিখে রাজনীতির বড় জীবন-অনুগ মানবতাবিরোধী প্রধান দলগুলি আরও বড় করে তুলে ধরেছেন। বাংলা উপন্যাসের যুদ্ধোত্তর পর্বের প্রেক্ষিতে পালাবদলে সমরেশ বসুর সচল লেখনী হয় যেন দক্ষ কঠিন কঠোর মানবপ্রেমিক সত্যসন্ধ কোন রাজার রাজদণ্ড।

[পাঁচ]

বিশেষভাবে গল্পকার এবং সামগ্রিকভাবে কথাকার সমরেশ বসুর প্রথম আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে যেমন 'আদাব' গল্প দিয়ে উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে, তেমনি বিশেষত ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটে আরও পরে, উনিশ শ পঞ্চাশ সালে। উপন্যাস লেখার শুরুর ঘটনা কিছুটা দেরীতে ঘটেছে। মনে হয়, বাল্য ও কৈশোরে এবং যৌবন শুরুর কাল পর্যন্ত যে ছোট ছোট ব্যক্তিগত জীবন-ঘটনা, অভিজ্ঞতা নানান অস্থিরতার সূত্র ধরে লেখক সমরেশ বসুকে তৈরী করছিল, সে সবের পক্ষে কথাসাহিত্য শাখার বড় শিল্প রূপে—তথা উপন্যাসে নিমগ্ন হওয়ার মত প্রেরণা কাজ করেনি। সেখানে ছোটগল্পের জন্ম দেওয়াই লেখক-সত্তার ভিতরের যন্ত্রণার একমাত্র অধিকার হয়ে দাঁড়ায়। তাই 'আদাব' এবং কয়েকটি ছোটগল্প দিয়েই লেখক জীবনের প্রথম পদসঞ্চার। উপন্যাস আসে তারও কয়েক বছর পরে।

উপন্যাসের শুরুতে কিন্তু সমরেশ বসু স্ব-কাল সচেতনায় সম্পূর্ণ স্থিত থেকে ইতিহাসের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। কোন অর্থেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের দাবি নিয়ে সে ইতিহাস আসে নি, এসেছে সম-সময়ের উপযোগী নায়ক চরিত্র আকতে বসে ইতিহাসের বিশেষ কোন ঘটনার ও সমাজ-ভাবনার প্রতীক প্রয়োগ নৈপুণ্যে। তাই 'উত্তরঙ্গ' —যদিও তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস, কিন্তু লেখকের পক্ষে প্রথম প্রকাশের মর্যাদায় সেই নায়ক চরিত্রের শিল্পন্যায়কেই সত্য করে তোলে। মনে রাখা দরকার, শুধু ইতিহাস নয়, সমরেশ বসুর লেখা প্রথম উপন্যাস (প্রকাশিত নয়) 'নয়নপুরের মাটি' ধরে পরবর্তী 'উত্তরঙ্গ', 'বি. টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'গঙ্গা', 'বাঘিনী' ইত্যাদি উপন্যাস ধারায় লেখক মানস-ইতিহাস অঞ্চল-বিশেষ, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, বিশেষ কোন সামাজিক গোষ্ঠী ইত্যাদি ধরেই উপন্যাসের প্রেক্ষিত ও বিষয় ভেবেছেন। সমকালের বাস্তব মানুষ তার জীবন, সমস্যা, সংকট, উত্থান-স্খলন-পতন সব আছে সেখানে, প্রতিপাদ্যও পরিবর্তনশীল বর্তমানের সংঘাত-সংকটেও, কিন্তু আধার ও তার সূত্র হয়েছে ইতিহাস, আঞ্চলিক জীবন, স্বদেশী আন্দোলনের অন্তর্লীন প্রকৃতি, বিশেষ গোষ্ঠীর রূপাবয়ব।

এমন ইতিহাস, অঞ্চল ও গোষ্ঠীজীবন থেকে যে উপন্যাসের আধার ও বিষয়ের অভিনব পরিক্রমা শুরু, পরবর্তী 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক', 'বিশ্বাস' ইত্যাদি ধরে, সত্তরের দশকের 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'যুগ যুগ জীয়ে', শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' ইত্যাদি উপন্যাসে লেখক-মনের পদক্ষেপ পিছনে রেখে লেখক ব্যক্তির জীবন ইতিহাসকে নিয়ে নতুন উপন্যাস রচনার আদিতে এসে থেমেছেন। তা হল 'দেখি নাই ফিরে'। কিন্তু এই উপন্যাস শেষ করার অনেক আগেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। এক পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সব শেষ প্রশ্ন যখন সম্পাদক তাঁকে করেন, 'নিজের জীবনী লেখার কথা ভাবেন ?' সমরেশ বসুর উত্তর ছিল —'আমাকে কেউ কেউ বলছেন। বলেন যে, রামকিঙ্কর লিখেছেন নিজের কথা

কবে লিখবেন ?...... একেবারে ভেবেই রেখেছি তার কোন মানে নেই, ইচ্ছে আছে যদি হয়।' অর্থাৎ রামকিংকর-নির্ভর জীবনীমূলক উপন্যাস শেষ হলে হয়ত তাঁর হাতে তাঁরই উপন্যাসোপম আত্মজীবনী পাওয়া সম্ভব হত !

আমাদের কথা হল, সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথমেই ছিল প্রখর স্ব-কাল চেতনার আলোয় দেখা ইতিহাস, আঞ্চলিক জীবন, স্বদেশীয় আন্দোলন - যা ইতিহাস-অনুগ অন্তঃস্বভাবে এবং এক একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জীবন ইতিহাস। তাঁর উপন্যাস পরিক্রমার শেষতম পর্যায়ে আবার ফিরে আসে ইতিহাস-ভাবনা, কিন্তু তা কোন দেশীয়, অঞ্চল বিশেষের বা কোন গোষ্ঠী-জীবনের ইতিহাস নয়, তা ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস—রামকিংকর বেইজের জীবন-কথা। এই জীবনের সঙ্গে সম্ভবত সমরেশ বসুর ব্যক্তি-জীবনের অন্তরাত্মার কোন সূক্ষ্ম যোগ ছিল! এই তৃতীয় পুরুষে ধরা ব্যক্তি-জীবন থেকেও তিনি আবার ফেরার কথা ভেবেছিলেন যে, তার প্রমাণ আছে উপরি-উক্ত সাক্ষাৎকার অংশের উদ্ধৃতিতে -উত্তম পুরুষে একেবারে নিজেরই কথা বলার ভাবনায়। একজন প্রতিভাবান লেখকের এই মানস-পরিক্রমা তাঁর সমস্ত উপন্যাসকেই নির্দিষ্ট নিবিড় কোন সূত্রে বেঁধে রাখে পরোক্ষে।

এই অর্থে সমরেশ বসুর উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে রাখা সম্ভব হয়। প্রথম পর্যায়ে পড়ে 'উত্তরঙ্গ', 'নয়নপুরের মাটি', 'বি. টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'গঙ্গা', 'বাঘিনী', 'জগদ্দল' —এমন কয়েকটি উপন্যাস। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক', 'বিশ্বাস' ইত্যাদি উপন্যাস। এগুলির মৌল ভাবনা ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবোধ। তৃতীয় পর্যায়ের শুরু তাঁর প্রখর প্রতপ্ত রাজনীতি চেতনার উজ্জ্বল পরিচয়-চিহ্নিত উপন্যাস রচনা থেকে। 'মানুষ শক্তির উৎস' 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'যুগ যুগ জীয়ে', 'তিনপুরুষ', 'দশদিন পরে', 'খণ্ডিতা' এই পর্যায়ের রচনা। 'টানা পোড়েন' নামের উপন্যাসটির রচনাকাল উনিশ শ' ঊনআশিতে। এখানে 'গঙ্গা'-র মত আঞ্চলিক জীবন স্বভাবের কথা নেই, নেই গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ দুঃখ দুর্দশার কথা, আছে সমরেশ বসুরই লেখক-মানসের ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবোধের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে স্বপ্নময় জীবন বরণের গোপন আর্তি। রাজনীতি নিয়ে সমরেশ বসু যখন বিশেষভাবে নিমগ্ন, এরই মধ্যে লেখা হয়ে যায় এই উপন্যাস। জীবন ও মানবপ্রেম—দুইয়ের আর্তিতে এই উপন্যাস রাজনীতির মানবিকতাবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়।

হয়ত অভিনব জীবনী উপন্যাস থেকে আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস ধরে আর একটি পর্যায় সমরেশ বসুর উপন্যাসে পরিক্রমায় ধরা পড়ত, তাঁর অকাল মৃত্যু তাতে চিরকালের ছেদ টানে। সমরেশ বসু সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'রামকিংকর তো সম্পূর্ণ বাস্তব মানুষ আমার কাছে নন! তিনি আমার কাছে একজন বাস্তব চরিত্র বটে, কিন্তু কল্পনাও অনেকখানি।' তৃতীয় পুরুষে ধরা এক ভাস্কর লেখকের কলমে বাস্তব ও কল্পনার সমন্বিত আশ্চর্য পুরুষ, উত্তম পুরুষে দেখা ব্যক্তি সমরেশ বসু কী রূপ পেতেন, তা আর জানা সম্ভব নয়। তবে সমরেশ বসুর উপন্যাস পরিক্রমায় একটাই সত্য বেরিয়ে আসে, এই লেখক ইতিহাস, আঞ্চলিক জীবন দিয়ে শিল্পীমনের যাত্রা

শুরু করে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আত্মিক সংকট ও সংকট-মোচনের কথার শেষে স্ব-কালের রাজনীতিতে দৃষ্টি ধৌত করে বড় মানবতার কথায় নিজের জীবনের কথাতেই বোধ হয় এক অস্থির শিল্পীর শিল্পের নিজস্ব শেষ কথাটুকু বলে যেতে পারতেন !

সে যাই হোক, একথাই ঠিক যে, সমরেশ বসুর মত একজন লেখকের সমগ্র উপন্যাস-পরিক্রমা প্রমাণ করে, লেখকের তীব্রতম স্ব-কাল চেতনা ও পরিশীলিত, অভিজ্ঞতাদীপ্ত বাস্তবতাবোধ, অনুপুঙ্খ সমাজবীক্ষণ ও ব্যক্তির ভয়াবহ অবক্ষয় দৃষ্ট শূন্যতাবোধ, খোলস-ছাড়ানো মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের রক্ত-মাংসের স্বরূপ—এসব যে বাংলা উপন্যাসের ধারায় লক্ষনীয় বদল ঘটায়, তা বাংলা উপন্যাসধারায় বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। আর উত্তরঙ্গ-গঙ্গা-বিবর-মহাকালের রথের ঘোড়া ইত্যাদি উপন্যাস দিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার ধরা পড়ে, বাংলা উপন্যাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের বিগত চারটি দশকে লক্ষনীয় মোড় ফিরেছে, পালাবদলে চিহ্নিত হয়েছে স্পষ্টত। বিশেষ করে 'বিবর' উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের মোড় ফেরানোর পক্ষে এক উজ্জ্বল 'মাইলস্টোন', সুলিখিত প্রামাণ্য দলিল।

[ছয়]

আমরা সমরেশ বসুর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসকে তার মানস-পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি, সেগুলির রচনার সময়সীমা উনিশ শ' উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ থেকে বিবরের রচনাকালের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ উনিশ শ' পঁয়ষট্টির ঠিক আগে পর্যন্ত এই লেখক এক বিশেষ মানস প্রবণতায় উপন্যাসগুলি রচনা করে গেছেন। এই পনেরো বছরে স্বাধীনতা-উত্তর ভারত তথা বাংলাদেশের বুর্জোয়া অর্থনৈতিক অবস্থা হয়েছে জটিল, রাজনীতিতে সাম্যবাদী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমুখে দেশীয় শাসক দলের রাজনীতি ভাবনা ও শাসন-ব্যবস্থা নানা ভাবে পর্যুদস্ত। দেশীয় আন্দোলনে উত্তাল এই বিভক্ত বাংলাদেশ। একাধিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রয়াস, জনমানসে সেগুলির সীমাবদ্ধ প্রভাব, যুদ্ধোত্তর সমাজে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের লক্ষনীয় বিবৃদ্ধি, খাদ্য-আন্দোলন, ভারত-চীন সম্পর্ক, সাম্যবাদী দলে মতাদর্শগত লড়াই-এ দলের অভ্যন্তরে ফাটল সৃষ্টির উদ্যোগ এই সমস্ত কিছু সমকালীন দেশীয় পরিপার্শ্বকে লক্ষনীয় করে তোলে।

এই পরিবেশে রচিত হয় 'নয়নপুরের মাটি', 'উত্তরঙ্গ', 'বি. টি. রোডের ধারে' 'শ্রীমতী কাফে', 'গঙ্গা', 'বাঘিনী' ইত্যাদির মত উপন্যাস। 'বিবরে'র প্রায় সমসময়েই রচিত হয় 'জগদ্দল', প্রকাশিত হয় 'বিবরে'র পর। প্রথম প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু সমরেশ বসুর প্রথম শিল্পীর সচেতন মন নিয়ে লেখা উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি'র মধ্যে লেখকের নিপুণ হাতের পরিচয় না থাকলেও, উপন্যাসটি পরবর্তী একাধিক উপন্যাসের থেকে দুর্বল মনে হলেও এর মধ্যে গ্রামবাংলাকে উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ, কৃষক পরিবারের সন্তান নায়ক মহিমের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার বিদ্রোহী মনোভঙ্গির প্রকাশ-চিত্রণ, অবৈধ যৌন-সম্পর্ক ভাবনা, গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজনীতির বস্তুভিত্তি ইত্যাদিকে তুলে ধরতে ভোলেন নি। গ্রাম ছেড়ে মহিম গেছে কলকাতায়। আবার ভরতের স্ত্রী অহল্যা—যাকে বৌদি বলে মহিম—তার প্রতি জৈবিক তাড়না ও আকর্ষণে

তার ফিরে-আসা, অন্যান্য গ্রাম-সম্পর্ক, প্রেম—সমস্ত কিছুর মধ্যে এক কারণহীন নিরাসক্তির পোষণ—এসবের মধ্যে লেখকের আঁকা প্রথম নায়কের নিশ্চয়ই শিল্পের দুর্বলতা ঢাকা থাকে নি। গ্রাম্য জমিদারের অত্যাচার, জমিদারের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষ, গ্রাম থেকে উৎকেন্দ্রিক জীবনে নিক্ষেপ, নানান অত্যাচার-চিত্র ও খুনের ঘটনাকে আত্মহনন বলে প্রচার-প্রয়াস, জমিদারের পাইক-পেয়াদাদের যাবতীয় উতরোল সক্রিয়তা সার্থক শিল্পের ন্যায়ে উঠে আসেনি। বস্তুত এ উপন্যাসে নায়কের যে অস্থিত-চিত্ততা, তা যেন সমরেশ বসুর বাস্তব জীবনের কৈশোর-যৌবনের ক্রান্তিলগ্ন কালের রূঢ় অস্থিত জীবন-ব্যবস্থারই এক শৈল্পিক বিম্বন। 'নয়নপুরের মাটি' রচনার কথা লেখক স্বয়ং একাধিক সাক্ষাৎকারে যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে আমাদের এই সিদ্ধান্ত সায় দেয়।

মনে হয় 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসে শিল্পী ছিলেন অনেকাংশে অ-প্রস্তুত, মনের দিক থেকে অগোছালো, তবু কৃষিজীবন, গ্রামজীবন, নরনারীর সম্পর্কের সমাজ-বিগর্হিত ব্যভিচার-জীবন, জমিদার-প্রজার দ্রোহ-সম্পর্কের জীবন—এসবের মধ্যে সমরেশ বসুর বাস্তবতাবোধ, সময়জ্ঞান ও সমাজভাবনা অন্তঃশীল থেকে গেছে। গোড়া থেকেই সমরেশ বসু বিবাহ-সম্পর্কশূন্য প্রেম—যাকে ব্যভিচার বলা যায়, তার প্রতিচিত্রণে ছিলেন সচেতন মনস্ক। মহিমের বৌদি অহল্যার প্রতি শারীরীক আকর্ষণ ও সম্পর্কে দেবর মহিমের প্রতি অহল্যার তার স্বামী ভরতের প্রতি মানসিক আনুগত্য সত্ত্বেও প্রচ্ছন্ন অথচ তীব্র আকর্ষণ এবং যৌন-চেতনার আকস্মিক বিস্ফোরণ লেখকের উত্তর-কালের যৌন সম্পর্ক-ভাবনার প্রথম মাটি তৈরি করে। আর এই ভাবনাই 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে নারায়ণের বউ কাঞ্চনের প্রতি অবৈধ টানকে, জৈবিক সম্পর্ককে যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত ও বিশ্বাস্য করে। কাঞ্চনের গর্ভে জন্ম নেয় লখাইয়ের সন্তান। সমরেশ বসু তাঁর শিল্পভাবনার প্রথম স্তর থেকেই নর-নারীর যৌন সম্পর্ককে অবৈধ তথা ব্যভিচারের পর্যায়ে এনে এক বিতর্কিত পরীক্ষার মধ্যে থেকেছেন। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস চটকলের সাহেব ক্রকসন অর্থাৎ কুরুসেন সাহেবের সঙ্গে তাঁর দ্বারা ধার্ষিতা শ্রীনাথের দুই বউ-এর গর্ভবতী রূপে চিত্রিত করার মধ্যে সেই যৌন ব্যভিচারের শিল্পন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। একদিকে গ্রামীণ দরিদ্র অসহায় মানুষগুলির যৌন জীবনের বিকৃতি, আর একদিকে নায়ক লখাই-এর দুই জীবনের প্রখর প্রতপ্ত সত্তার দ্বন্দ্বকে এঁকে লেখক 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে তাঁর শিল্প ক্ষমতার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে ইতিহাস আছে, কিন্তু তার প্রয়োগ প্রতীকের ব্যঞ্জনায় সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়। লখাই আদিতে ছিল সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহী হীরালাল। উপন্যাসের কাহিনীতে সে একজন পলাতক বিদ্রোহী সৈনিক। নতুন নাম লক্ষ্মীন্দর, তা থেকে গ্রামের মানুষজনের অন্তরঙ্গ কোমল সম্পর্কের সূত্রে লখাই। এর ভিতরে আছে সিপাহী বিদ্রোহের উৎস থেকে জাত সেই প্রথমতম এক ইংরেজ-বিদ্রোহীর কঠিন সত্তা, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহ-পরবর্তী ভারতের পূর্ব প্রত্যন্তে ইংরেজরা যে বাণিজ্য বিস্তারে মাতে, কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবন-পরিবেশে থেকে লখাই তার তীব্র প্রতিবাদ করে মনে মনে। সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক সিপাহী হীরালাল উপন্যাসে শ্যাম বাগ্দীর ঘরে লখাই হয়ে থেকে সেই পুরনো বিদ্রোহী সত্তাকে প্রবলতম করে তখনি,

যখন দেখে সেই ইংরেজ বণিকদল চাষ থেকে চটকল তৈরী করে ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। সমগ্র উপন্যাস লখাই তারই নিরাসক্ত দর্শক। তার সমস্ত রকম ঘৃণা ও বিরূপতা —যা তার তীব্রতম বিদ্রোহের অভিজ্ঞান –তা নিষ্ফল হয়ে যায়। কাঞ্চনের প্রতি অবৈধ সম্পর্কে, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত চটকলের প্রসারণে ও গ্রামীণ মানুষগুলির সেখানে কাজ নেওয়ার অসহায়তায়, নিজের মধ্যে দুই বিদ্রোহী সত্তার অসহায় দ্বন্দ্বে নায়ক লখাইয়ের মধ্যে যথাক্রমে নৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের শিল্পিত দ্বন্দ্বময় দিকগুলি মূর্ত হতে থাকে। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস এসবেরই উজ্জ্বল প্রবহমান আলেখ্য। লখাই-এর মত নায়ক অঙ্কনে সমরেশ বসু তারাশংকরের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী হয়েও এক নূতন জাতের নায়কের নির্দেশক! ইতিহাসকে সিপাহী বিদ্রোহ ও সমকালীন প্রথম সমাজের ভাঙন, দু'য়ের মধ্যে ধরে লখাই চরিত্রের গভীর মানসদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নিপুণ শিল্পদক্ষতায় আঁকার প্রয়াসেই আছে নায়কের নবরূপ, নতুন জগতের উপন্যাসের আধুনিকতা ও তীব্র বাস্তবতাবোধ। ইতিহাসকে ঠিক এইভাবে চরিত্রের মনোলোকের প্রতীকে প্রয়োগ এর আগে কেউ করে নি।

'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের নায়কের মধ্য দিয়ে যে রূঢ় সমাজ-বাস্তবতা, প্রথাবন্ধ নর-নারীর দেহমিলনের বিরোধিতা তথা ব্যভিচারের প্রতিচিত্রণ, যে গ্রামজীবন ও গ্রামীণ শ্রেণীভিত্তিক মানুষের অসহায়তার মর্মার্তির প্রকাশ, তা-ই লেখকের ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম পাথেয় এবং শুধু সমরেশ বসুর নয়, বাংলা উপন্যাসেও ক্রমশ পালাবদলের পথ চিহ্নিত করার উপযোগী নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ। প্রথম পর্যায়ে তাই 'উত্তরঙ্গে'র পরেই পাই 'বি. টি. রোডের ধারে' ও 'শ্রীমতী কাফে'র মত উপন্যাস। 'নয়নপুরের মাটি'র নায়ক মহিম ছিল নির্বিকার, নিরাসক্ত কিছুটা, 'উত্তরঙ্গে'র নায়ক লখাই সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের বিদ্রোহের আত্মার অধিগত থেকে এক নির্বিকার দর্শক, 'বি টি. রোডের ধারে'র নায়ক গোবিন্দ এতটা নির্বিকার নিরাসক্ত থাকেনি, সে চটকল সংলগ্ন বস্তিজীবনের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তায় বিশিষ্ট। যে চটকল স্থাপন ছিল ঔপনিবেশিক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির অন্যতম উপায় ও লক্ষ্য এবং যে ব্যবস্থাকে 'উত্তরঙ্গে'র নায়ক লখাই তীব্র ঘৃণা করত, সেই চটকলের বস্তিতেই আসে 'বি. টি. রোডের ধারে'র নায়ক গোবিন্দ। লেখকের গ্রামজীবন-চেতনা এক শ্রমিক-অধ্যুষিত গোষ্ঠীজীবন ভাবনায় অন্য মাত্রা পায়। 'নয়নপুরের মাটি'র পটভূমি কৃষিভিত্তিক গ্রাম-জীবন ও মানুষ, 'উত্তরঙ্গে'র প্রেক্ষিত ও তার তাৎপর্য গ্রামজীবনের কৃষিভূমি-বিচ্যুত মানুষদের চটকলে পেশাবদলের ট্রাজেডিতে, 'বি. টি রোডের ধারে'র প্রেক্ষিত প্রত্যক্ষভাবে শোষিত অবহেলিত সর্বহারা শ্রমিকদের জীবন রূপায়ণে। গ্রামজীবন, কৃষকজীবন থেকে লেখক প্রবেশ করেছেন শ্রমিক জীবনে।

প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে এইভাবে পটভূমি বদল হলেও, লেখক যে সব সময়েই মানবতার বড় মূল্যে সর্বহারাদের পক্ষে, তা বোঝা যায়। বস্তি ও বস্তিজীবনের জীবন্ত চিত্র এ উপন্যাস। 'ফোর টোয়েন্টি' গোবিন্দ ছুতার, শ্রমিক গণেশ ও তার আওরাৎ দুলারি, লিবারবাবুর রেন্ডিগিরি-করা মেয়ে 'প্রেমযোগিনী' ফুলকি, লোটন বউ আধবুড়ো রাঁধুনি কালো, সর্দারবুড়ী, বাজীকর, বাড়িওলা, বিরাজমোহন –এমন

সব বিচিত্র সহজ-সরল ও স্বার্থান্বেষী —সব ধর্মের মানুষদের মধ্যে যে বস্তীজীবনের কালো রঙ আরও কালো হয়ে বস্তির ওপরের আকাশ ঢেকে দেয় উপন্যাসের শেষে, গোবিন্দর মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে —তা লেখকের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার অভূতপূর্ব অনুগত। এ উপন্যাসে চটকল পটভূমি, বস্তিজীবনই লেখকের লক্ষ্য। এখানেও সেই অবৈধ যৌন সম্পর্কের ছবিকে আঁকতে ভোলেননি লেখক শিল্পের স্বাভাবিকতায়। ফুলকির কুৎসিৎ অসুখের পরিণামে বাধাহীন যৌনজীবনের বীভৎসতাকেই লক্ষ্যে রেখেছেন লেখক।

বস্তুত নায়কের মধ্য দিয়েই যে কোন সচেতন কথাকারের জীবন-জিজ্ঞাসা, কেন্দ্রীয় বক্তব্য রূপ পায়। গোবিন্দ সেই নায়ক, যার অতীত জটিলতম উৎকেন্দ্রিকতার পথে নিক্ষেপ করে তাকে, আবার আর এক জটিল জীবন পরিবেশে পথ থেকে তুলে এনে আশ্রয় দেয়। 'কিমলিস' গল্পের যা পবে লেখা –নায়ক বেচন অনেক বড় প্রেক্ষিতে গোবিন্দ হয়েই ধরা ছিল 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসে। 'বস্তি জীবনের' উত্থান-পতনের নেতৃত্বে সমরেশ বসু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কোন রাজনীতি করা কৃত্রিম ট্রেড ইউনিয়ন নেতার কথা ভাবেন নি. তার নায়কত্ব দিয়েছেন তাদেরই মধ্যেকার একজন পোড়-খাওয়া পুরুষকে —যেমন 'কিমলিস' গল্পের বেচন। শ্রেণীবিভাজিত সমাজে যে অর্থনৈতিক বণ্টন বৈষম্যের অভিঘাত —তার কেন্দ্রে গোবিন্দ দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী, প্রতিবাদী হয়ে জীবন শেষ করেছে। আগের দু'টি উপন্যাস থেকে 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসে লেখক নায়কের সঙ্গে অনেক বেশী আপনত্বে বস্তি জীবনের প্রাণকেন্দ্রে নিজেকেও বসিয়েছেন। কিন্তু এর পরিনামও যে বিষাদঘন, অসহায়, তা আঁকতে ভোলেন নি। গোবিন্দর সংগ্রাম ব্যক্তিক, তাই গোষ্ঠীজীবন থেকে অন্তঃশীল বিচ্ছিন্নতার অভিশাপে তার মৃত্যু ; তবে মৃত্যুর মধ্যেও বড় মানবতার, বড় আশার, মানুষকে ভালবাসার কথার আবেগদীপ্ত প্রতীকপ্রতিম বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখতে ভোলেন নি লেখক।

প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় মনে আসে। এ উপন্যাসে সদ্য-পরিচিত কালের সঙ্গে নায়ক গোবিন্দর কথায় বস্তির নর্দমার জল যাওয়া নিয়ে সামান্য তর্ক হয়। কালোর কথার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে 'এই ঘরে, এই দেওয়ালে, চালে, মেঝেয়, সারা বস্তি, পথ, বাজার, দুনিয়াময় থিক থিক করছে ব্যামো। ব্যামো আটকাবে তুমি ?···ব্যামো যে মানুষের মনে।' সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাস রচনার ধারায় বিভিন্ন স্তরের মানুষ, তাদের জীবন ও সমাজের গভীরে সেই 'ব্যামো'-র অর্থাৎ অসুখের জীবাণু অনুসন্ধানে ও তার স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। কালোর কথায় যেন সে সবের প্রথম সূত্র ও সাবধানবাণী। পরবর্তী মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাতিস্বিক সত্তায় ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনচর্যায় এর প্রমাণ মেলে।

'শ্রীমতী কাফে' প্রথম পর্যায়ের আমাদের আলোচ্য চতুর্থ উপন্যাস যার মধ্যে সমরেশ বসু পটভূমিকে আগের তুলনায় বাইরের মাপে ছোট পরিসরে এনে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মত দেশীয় বিপ্লবী বৃহত্তর রাজনীতি-ভাবনা তথা বৃটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী গোপন তৎপরতার জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। কেন্দ্র হল একটি ছোট রেস্তোঁরা -'শ্রীমতী কাফে', তার মালিক ভজন ওরফে ভজুলাট। তার দাদা নারায়ণ এ উপন্যাসের বুঝিবা নায়ক চরিত্র। নায়ক মহিম, লখাই, গোবিন্দ -সকলেই

পরস্পরের থেকে অনেক শৈল্পিক অমিল নিয়েও লেখকের ছকে বাঁধা এমন এক একটি নায়ক —যারা সংসার বাধে না, সংসার-কেন্দ্রচ্যুত অস্থিত-প্রাণ পুরুষ। 'শ্রীমতী কাফে'র নায়ক নারায়ণও তা-ই। এর সঙ্গেও আছে ইতিহাসের যোগ —সে ইতিহাস অর্বাচীন কালের ভারতবর্ষীয় দেশীয় ইতিহাস। 'উত্তরঙ্গে' ছিল দূরে ইতিহাস, 'বি. টি. রোডের ধারে' নতুন তৈরী হয়ে ওঠা গোষ্ঠী জীবনের ইতিবৃত্ত, 'শ্রীমতী কাফে'তে আছে দেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিকথা। সময়কাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী উনিশ শ' কুড়ি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব সময় পর্যন্ত বিস্তারিত, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের অগ্নিময় অধ্যায় পিছনে ফেলে এ উপন্যাসের উপসংহারের সময় চিহ্নিত হয় উনিশ শ' আটচল্লিশ সালের শেষের দিনগুলিতে।

'শ্রীমতী কাফে'র মূল বিষয় দেশীয় বড় রাজনৈতিক-সামাজিক মুক্তির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতিচিত্রণ। এর মধ্যে ব্যক্তির মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা ও দেশের মুক্তি-ভাবনা নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী। নায়ক নারায়ণ সংসার-বিবিক্ত স্বদেশপ্রেমে সন্ন্যাসীর ব্রতচারী এক দীপ্ত সংগ্রামী পুরুষ। তার আসা-যাওয়ার মধ্যে বন্ধন নেই। তার ভাই তাকে মুক্তি দিয়েছে সংসারের দায়-দায়িত্ব নিজে নিয়ে, এমন কি ভজনের মৃত্যুর পরেও তার স্ত্রী জুঁই ভাসুর নারায়ণকে সেই বিশাল মুক্তির মধ্যেই নির্দিষ্ট করে রাখে। স্নেহ-সম্পর্কে জুঁই বা হৃদয় সম্পর্কে প্রমীলা —কোন নারীই তাকে বন্ধন-সহিষ্ণু করেনি। এমন নায়কের কর্মতৎপরতায় সমরেশ বসু সে সময়ের রাজনীতির অহিংস আন্দোলন থেকে প্রধান স্রোত সন্ত্রাসবাদ হয়ে সাম্যবাদে আধার গ্রহণে বিশ্বস্ত হয়েছেন। কামুকে ভজুলাট যখন ঋষি মার্কসের বই পড়তে দেয় তাতেই এই সিদ্ধান্ত যথার্থ হয়ে ওঠে। দূরে ইতিহাস, গ্রামবাংলা, শ্রমিক-কৃষক জীবন থেকে সমরেশ বসু রাজনীতি ধরে নেমেছেন সাম্যবাদী ভাবনায়। কিন্তু এর মধ্যেও মনে রাখা দরকার, এই উপন্যাসেও বিবাহোত্তর বা বিবাহ নিরপেক্ষ যৌন মিলন তথা ব্যভিচার প্রসঙ্গকে আঁকতে ভোলেন নি। রমার প্রতি হীরেনের বা বিধবা ভ্রাতৃবধূর হীরেনের প্রতি যে আসক্তি —তাতে এর প্রমাণ। তবে অবশ্যই একাধিক চরিত্রের যৌন ব্যভিচারের চিত্রে সমরেশ বসুর নিরাসক্ত সহজতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা সেই বিষয়কে দিয়েছে সূক্ষ্ম শিল্পের অসীমতা।

'গঙ্গা'য় এসে সমরেশ বসু আবার আঞ্চলিক জীবন চিত্রণে দেশীয় ইতিহাসকে ছোট পরিসরে গোষ্ঠী জীবনের অঞ্চলবৈশিষ্ট্যে প্রধান করেছেন। কিন্তু 'গঙ্গা' কোনমতেই আঞ্চলিক জেলে-জীবনের উপন্যাস নয়। মাছ ধরতে আগ্রহী, মনের মত নেশাগ্রস্ত মত্ত আবেগদীপ্ত শ্রমিক মানুষগুলির নদী ধরে সমুদ্রের দিকে নেশার ঘোরে যেভাবে এক অভিনব জন্ম-মৃত্যু, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের, প্রেম ও প্রেমহীন যৌনতার জীবনে আবিষ্ট, উদ্যোগী, দুরন্ত মানসিকতায় উদ্দীপ্ত হয়, এ উপন্যাস তারই নিপুণ আলেখ্য চিত্র। এ উপন্যাস জীবন ও মানুষ নিয়ে সমরেশ বসুর যেন আর এক পরীক্ষা। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসগুলি থেকে অন্তঃস্বভাবে এখানেই এর স্বাতন্ত্র্য। জেলে জীবনচিত্র ও তাদের সমাজভাবনা গঙ্গার বুকে যাত্রার ও সমুদ্রগমন-আকাঙ্ক্ষার পট-মূল্যে উজ্জ্বল।

'লেখার আগে' নামের এক ছোট কৈফিয়ৎ-ধর্মী রচনায় সমরেশ বসু 'গঙ্গা'

উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক কথায় নিজের লক্ষ্য এইভাবে চিহ্নিত করেছেন 'চটকলের কল্যাণে খাঁটি মৎস্যজীবী খাঁটি মিস্তিরি হয়ে গেছে। অবশ্য হতে অনেকদিন লেগেছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে প্রায় পুরোপুরি। শুধু ইলিশের মরসুমে দেখেছি পাড়ার মানুষগুলিকে চটকল আর ধরে রাখতে পারছে না। শুধুই যে পয়সার জন্য, তা নয়। শুধু খাবার জন্যও নয়। আরো কিছু। বোধ হয় গঙ্গা তখন ভর করে তাদের ফেলে আসা, শিকার সন্ধানী আত্মায়। ইলশে-গুঁড়ির ঝাপটা, পুবে সাওটা তার গুরু গুরু গর্জন ডাক দেয় তাদের কারখানায় বন্দী রক্তধারাকে। কারখানা থেকে ছুটি নেয়, নয় তো কামাই।' তার উপন্যাস রচনার আদি সময় থেকে সমরেশ বসু যে প্রখর শ্রেণী-সচেতনতার প্রমাণ রেখেছেন, 'গঙ্গা' উপন্যাসে তার অকপট পরিচয়। এ উপন্যাসের নায়ক সেই পেটি-বুর্জোয়ারই শ্রমিক শ্রেণীর পাঁচুর ভাইপো 'তেঁতলে বিলেস'। অমর্তের বউয়ের চোখে যেন 'গহীন জলের বিস্ময়', পাঁচুর চোখে 'যোয়ারের লতি', বিলাস একালের মানুষ, পাঁচু সেকালের। এই দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যেই আসে মাছ-ধরা ও বিক্রীর সূত্রে 'ফড়ে-পাইকের দল', মহাজন দোখি, হিমির দিদিমা 'পাইকের দামিনী'।

আর এদের পেশার অন্তস্তলে থাকে অপদেবতা সংক্রান্ত সংস্কার। পাঁচুর দাদা নিবারণের মাছ ধরতে যাওয়ার পথে পাঁচুকে বলা কথাগুলি তার প্রমাণ দেয়। সমস্ত রকম সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যবোধ, দৈব সংস্কার, মাছ বিক্রীর উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যেই নায়ক বিলাসের অপ্রতিরোধ্য শক্তিমান ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। বিলাসের জীবনে আসতে চায় অমর্তের বউ, পাচী, হিমি। কিন্তু বিশেষ করে হিমির বিলাসকে বাঁধতে চাওয়া ও বিলাসের সেই সীমাকে অতিক্রম করার অফুরন্ত প্রাণশক্তির আবেগ ও বেগে সমরেশ বসুর নায়ক-ভাবনা ভিন্ন মাত্রা পায়। উপন্যাসের শেষে বিলাস তার কাকার ভয়কে জয় করে, হিমির ও তার মাঝখানে যে ফাঁক তৈরী হয়, তা বিলাসের অসম্ভব ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বের তেজেরই বিকীরণ! নায়ক ধার্মিকতার বিলাসের রাতের অন্ধকারে জল আনতে যাওয়ার সক্রিয়তা, হিমির ঘরে নিশিযাপন ও আত্মসমর্পণে দ্বিধান্বিত হওয়ার বাস্তবতার শিল্পিত প্রয়োগ নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিলাসের মত নায়ক পূর্ববর্তী মাধব, লখাই, গোবিন্দদের থেকে অনেক বেশী অবয়বে ও অন্তর্গঠনে প্রাগ্রসর শিল্পচেতনার অনুগ।

বিলাস তার বাবা নিবারণ সাইয়ের মতই আদিম শক্তির বেগে ও সংস্কারে দুরন্ত। এই স্বভাব তার যৌবন-প্রাণিত যৌনতায় মেশে। উপন্যাসে গামলী পাঁচীর সঙ্গে তার বিবাহের ভাবনা যখন পাঁচু ভাবে তার আগেই অমর্তের বউয়ের আকর্ষণ তাকে অমোঘ করে। যৌনমিলন ঘটে তার সঙ্গে। এই মিলনের মধ্য থেকেই এসেছে ঘৃণা ও 'বিষ'-ভাবনা। সমরেশের হাতে যৌনতা ও যৌবন সার্থক হয়েছে বলেই অমর্তের বউ –হিমিদের সঙ্গে বিলাসের সম্পর্কে এসেছে ভিন্ন মাত্রা। পুরনো বাংলা উপন্যাস যৌনচিত্রের শিল্প-বাস্তবতা এখানে জীবন-বাস্তবতার বলয়ের অভিমুখীন থেকেছে। বস্তুত যৌনতা ও যৌবনধর্মের আবেগ এবং বড় জীবনধর্মের বেগ মিলে-মিশে নায়ক বিলাসের মধ্য দিয়ে সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক সত্তাকে প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলিতে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

উনিশ শ' ষাট সালে প্রকাশিত 'বাঘিনী' উপন্যাসে সমরেশ আবার গোষ্ঠী জীবনের

সমস্যাকে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সে জীবন প্রকৃতির অকৃত্রিম প্রেক্ষাপটধৃত জীবন নয়, তা বুর্জোয়া সমাজেরই গঠিত কৃত্রিম গোষ্ঠীজীবন। যে সময়ে 'বাঘিনী' রচিত তার আগের প্রায় দশটি বছর দেশীয় শাসকদের একাধিক পরিকল্পনা দেশে রূপায়নের চেষ্টা চলে। বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজনীতির দিকে তাকিয়েই সেইসব দেশীয় পরিকল্পনার রূপায়ন প্রমাণ! আর তাই, 'বাঘিনী' উপন্যাসে এসেছে স্মাগলারদের সুনিপুণ জীবন-আলেখ্য। যে অকৃত্রিম জীবন-আলেখ্য ক্রমশ রূপ পাচ্ছিল 'নয়নপুরের মাটি', 'উত্তরঙ্গ', 'বি. টি রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'গঙ্গা' নামের উপন্যাসগুলিতে, 'বাঘিনী' উপন্যাসে সেই জীবনের গায়ে লাগে কৃত্রিমতার রঙ। স্মাগলাররা তো কৃত্রিম সমাজ ও বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি-ব্যবস্থা থেকেই জাত গোষ্ঠী! এ উপন্যাস সমরেশ বসুর শ্রেণী-সচেতনতা, তাঁর স্ব-কালচেতনা ও সমাজ-ভাবনার সম্যক অনুগ।

বিখ্যাত এক বিদেশী সমালোচক পল এ ব্যারান যাদের বলেছেন 'লুম্পেন বুর্জোয়া'—তারাই 'বাঘিনী' উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ চরিত্র। বাঁকা বাগদীর মেয়ে দুর্গা বাগদী ঘরের মেয়ে, চাষী ঘরের মেয়ে, আছে আরও একাধিক গ্রাম গঞ্জের কৃষক শ্রেণীর লোকজন। 'বাঘিনী' দুর্গার মত পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্রের পাশে এসেছে ভেঙে-পড়া মধ্যবিত্ত সংসারের চিরঞ্জীব। এই চিরঞ্জীবের মধ্যে মধ্যবিত্ত সুলভ আদর্শচেতনা ছিল বলেই, আদর্শভঙ্গের সূত্রে রাজনৈতিক জীবন এবং সে জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে কালক্রমে হয় 'লুম্পেন'। দারিদ্র্য, বেকারী, আদর্শজনিত মোহভঙ্গ, স্খলিত অর্থনৈতিক অবস্থা, নীতিবোধে অবিশ্বাস-সংশয়— এসবই চিরঞ্জীবকে সংসার-উৎকেন্দ্রিক জীবন গ্রহণে করেছে বাধ্য। স্মাগলার হয় দুর্গা, চিরঞ্জীব। এই সূত্রে আসে কবরেজ মশাইয়ের স্ত্রীর মদের ব্যবসা, বীণা, গুলি, 'তরাইয়ের বাঘ' বলাই সান্যাল, পুলিশের অফিসার-ইন-চার্জ ধূর্ত সুরেশ বাবু, নানা কারবারের কারবারী তেলিপাড়ার অক্রুর দে বা 'ওকুর দে', ভেলা, কেষ্ট ইত্যাদি। এমন চোরাই মদের কারবারে সমরেশ বসু বেহুঁস বেহেড-করা দুর্গার দেহভোগের প্রসঙ্গও নানান ভাবে রেখেছেন। উপন্যাসে দুর্গার জীবনের নির্মম নিয়তি-চিত্রে লেখক কেবল দুর্গার পরিণতিকেই প্রধান করেন নি, সেই সঙ্গে নবসৃষ্ট স্মাগলারশ্রেণীর সমস্ত রকম প্রচলিত সমাজবিরোধী সক্রিয়তার এক জীবনভাষ্য দিয়েছেন।

আমাদের আলোচ্য প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলির শেষ সীমা হ'ল 'বাঘিনী' উপন্যাস। শ্রেণী-সচেতনা ধরে সমরেশ বসু এই পর্যায়ের অকৃত্রিম জীবনমূল থেকে জাত কৃষক-শ্রমিক জীবন থেকে ক্রমশ এসে নেমেছেন দেশীয় কৃত্রিম জীবন-কাঠামোর প্রতিচিত্রণে। দেশীয় অর্থনীতি ও সমাজনীতি এমন কৃত্রিম পরিণতির জন্য দায়ী। প্রাচীন ইতিহাস ও দেশীয় আঞ্চলিক অকৃত্রিম জীবন এবং দেশীয় কৃত্রিম জীবন-স্বরূপ দিয়েই সমরেশ বসুর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস পরিক্রমার পরিসমাপ্তি। এই পর্যায়ের লেখক-মানস বৈশিষ্ট্যের লক্ষণীয় দিকগুলি হল --(১) স্ব-কালচেতনার বিস্তার ও সম্যক স্বীকৃতি, (২) শ্রেণী-সচেতনার লক্ষ্যে প্রথম সমাজভাবনার আনুগত্য, (৩) তীব্র বাস্তবভাবনার স্ফুরণ, (৪) নর-নারীর অবৈধ দেহ-মিলন বর্ণনা এবং যৌনচেতনা ও যৌবনদীপ্ততাকে সমীকরণে একাত্ম করার প্রয়াস, (৫) ক্রমশ ইতিহাস, আঞ্চলিক জীবন ও গোষ্ঠী জীবন থেকে সরে এসে দেশীয় অর্থনীতি

ও সমাজনীতির সূত্রে ব্যক্তির অন্তর্লোক উন্মোচনে নিবিষ্ট হওয়া! প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলির শুরু ও বিস্তার জাতিকতায়, শেষ শ্রেণীবিভক্ত মানুষের প্রাতিস্বিক সত্তার প্রথম উন্মোচনে। 'বাঘিনী'র চিরঞ্জীব চরিত্র এই শেষের প্রথম প্রতিনিধি।

। সাত ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে সমরেশ বসু হন নাগরিক (Urban), প্রথম পর্যায়ে তিনি ছিলেন গ্রামীণ (Rural)। এমন নাগরিক-মনস্কতার চূড়ান্ত রূপ আছে 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক', 'বিশ্বাস' ইত্যাদি কয়েকটি উপন্যাসে। রচনাকাল শুরু উনিশ শ' পয়ষট্টির শুরু থেকে সত্তর দশক শুরুর পূর্বকাল পর্যন্ত। অবশ্যই এই সময় সীমার চিহ্নিতকরণ আপেক্ষিক। এই পর্বের উপন্যাসের নায়ক-ভাবনায় লেখক বাস্তবতার নতুন তাৎপর্যের সন্ধানী। এখানে ব্যক্তি এবং তার ব্যক্তিত্ব হয়েছে প্রধান। ব্যক্তির প্রাতিস্বিক সত্তা ও বোধে সমকালের বাস্তব ভাবনা উপস্থাপিত। আর যেখানেই একান্তভাবে ব্যক্তির প্রাধান্য, সেখানেই ব্যক্তির মগ্নচৈতন্যের, স্ব-কালের সঙ্গে সংঘর্ষ এক আত্মিক সংকটের আগুন জ্বলতে থাকে। সংকটের তীব্রতায় ও ব্যক্তির অসহায়তায় দেখা দেয় গভীর শূন্যতাবোধ, আসে নির্মম বিচ্ছিন্নতা, জীবনের যা কিছু আস্তিক্যের দিক, শুভ অবলম্বনের, সুন্দরের, পূজার, মঙ্গলময়তার দিক, সেই সবের মূলেই ব্যক্তির পক্ষে দেখা দেয় অনীহা। তীব্র নগরায়নের (Urbanisation) কারণেই এই বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা বড় হয়ে ওঠে।

'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক', 'বিশ্বাস'—উপন্যাসগুলির নায়ক-নির্মাণে লেখক আত্মার প্রতিমায় সেই শূন্যতার স্বভাবকে স্থিত করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, সমরেশ বসু ব্যক্তিগত জীবনেও সেই নৈহাটি অঞ্চলের দারিদ্র্যের জীবন, গ্রামীণ জীবন থেকে অনেকটা উঠে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন শহর জীবনে। সেই সঙ্গে কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দেশীয় শাসকদের পক্ষে নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজ-নৈতিক অস্থিরতায় একাধিক আন্দোলনের তীব্রতা, শ্রমিক ও কৃষকদের জীবিকা-ব্যবস্থার পূর্বানুবৃত্ত গতানুগতিক রূপ, যুব সম্প্রদায়ের জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত অসহায়তা, দারিদ্র্য, দেশীয় সমাজব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণা, মোহভঙ্গতা, অবিশ্বাস, গঠিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব এইসব সমকালীন পরিবেশ-প্রভাব সমরেশ বসুর লেখক-মনকে টেনে আনে শহরজীবনের স্খলন, পতনের ভাবনার মধ্যে। শহুরে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ, পোশাকী, শিক্ষিত, বুর্জোয়া অর্থনীতির গড়া মানুষগুলি থেকেই তিনি তাঁর উপন্যাসের সম্যক চরিত্র ও বিষয়-ভাবনাকে নির্দিষ্ট করেন। এই সূত্রেই তাঁর বাস্তবতাবোধ ও চরিত্র-অভিজ্ঞতায় আসে নতুনত্ব।

এর প্রথম সূচনা, আগেই বলেছি, 'বাঘিনী উপন্যাসের নায়ক চিরঞ্জীব চরিত্রাঙ্কনের মধ্যে স্পষ্ট হয়। 'বাঘিনী'র রচনাকাল উনিশ শ' ষাট, এর পরে আমরা পেয়েছি তাঁর 'ত্রিধারা' উপন্যাস। গদ্যভাষা সমরেশ বসুর, বিষয় 'বাঘিনী'র নায়ক চিরঞ্জীবের এক অকুণ্ঠ আত্মোক্তি: 'যদিও এই ভোটের রাজনীতির ওপরে এতটুকু আস্থা নেই চিরঞ্জীবের। তার ধারণা, ওটা একটা খারাপ ব্যবসারের

পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সাধারণ মানুষকেই যেন বিষাক্ত এবং হতাশ করা হচ্ছে। অবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের জমি থেকে সরানো গেল না। সর্বক্ষেত্রে প্রায় তাদেরই নেতৃত্ব। 'কৃষকদের হাতে জমি দাও'—এ শ্লোগান তারা কোনদিন সার্থক হতে দেবে না। এসেম্বলী আর পার্লামেণ্ট তো এক ভিন্ন-জাতীয় কথাকারদের কারখানা। শৌখীন মলাটের সাহিত্যের মত তো হাতে হাতেই ফেরে। কোথাও কোন বীজ পড়ে না। অংকুরিত হয় না কিছুই।' 'বাঘিনী'র নায়ক চিরঞ্জীব আগে স্বদেশী করত, পরে স্মাগলার। কিন্তু এমন স্বদেশী ও স্মাগলার- দুই সত্তার মধ্যে আছে সমকাল, সমাজ ও সংসার, মানুষ-জন সম্বন্ধে গভীর ক্ষোভ, জ্বালা। তা সহজে প্রশমিত হবার নয়। তাই সে ক্রমশ তথাকথিত সুস্থ জীবন-ভাবনা ও ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পরবর্তী 'ত্রিধারা'য় অন্য আধারে লেখক তাঁর শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের যা 'বিবর' থেকে স্পষ্ট রূপ পায়, ভূমি রচনা করেছেন। পারিবারিক জীবন-পরি-বেশে বালিগঞ্জবাসী মহীতোষবাবুর তিন মেয়ে সুজাতা, সুগতা ও সুমিতার প্রেম-ভাবনা ও স্বামী-সম্পর্কগুলির মধ্যে লেখক এমন এক তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতাকে এঁকেছেন, যা ক্রমশ শূন্যতার দিকেই পাঠকমনকে নিবিষ্ট করতে সহায়ক হয়। গিরীন-সুজাতা, মৃণাল-সুগতার মানসিক সঙ্কট শূন্যতাকে প্রত্যক্ষ করায়। সুজাতার উগ্র ব্যক্তি-চেতনা, স্বামী গিরীনের থেকে উদ্‌ভ্রান্ত ক্লীব জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ রুক্ষ নাগরিক জীবনভাষ্যের অন্যতম দিক। সুজাতার ঐশ্বর্যের মুখোস, সুগতার প্রেম-বিশ্বাসে মতবাদ-নিষ্ঠা প্রচলিত সংসার, সমাজ ও প্রেম-ভাবনার লক্ষ্যকে নিয়ে আসে গভীর শূন্যতার মধ্যে। সুমিতা-রাজেনের মধ্যে নায়কের সুস্থ ও পবিত্র বিবেকের অভিজ্ঞান থাকলেও রাজেনের বিবেক দিয়ে গড়া হয়েছে 'বিবরে'র নায়ক বীরেশের বিবেকের ভিত। সেই সঙ্গে 'বাঘিনী'র চিরঞ্জীব, ত্রিধারায় সুজাতা-গিরীন' সুগতা-মৃণালের প্রেমভাবনার জটিলতা আরও এক গভীর জীবনের মর্মমূলে ধরে আকর্ষণ করার মত আধুনিক মানবিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে।

প্রসঙ্গত পাশ্চাত্য দেশের তিরিশের দশকের সাহিত্যেও কথাকার দার্শনিকদের ধারণায় ধরা 'এলিয়েনেশান্' অর্থাৎ অনন্বয় বিষয়ে কিছু কথা প্রামাণ্য হয় 'বিবরে'র 'থীম' আলোচনার ভূমিকা হিসেবে। বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়কে উপন্যাসে আঁকতে বসে তাকে সার্ত্র, কামু, ন্যাথানিয়েল ওয়েস্ট প্রমুখ বলেছিলেন তা 'nausea and the absurd' যার বাংলা হল —অনীহা এবং নিরর্থকতাদোষ। কাফ্‌কার রচনায় এই বিশেষ মনোভঙ্গিটি নায়ক চরিত্রে দেখে আয়ানেস্কো তার অভিধা দেন 'উদ্দেশ্যহীন, কারণহীন বিচ্ছিন্নতা।' বোঝা যায় মূল্যবোধের যখন সমূল বিনষ্টি দেখা দেয় মানুষের মনে তখন এক অদ্ভুত অনন্বয়বোধ শামুক স্বভাবের মত মানুষকে গ্রাস করে। ঊনিশ শ' আটত্রিশে লেখা সার্ত্রের 'Nausea' উপন্যাসেই এর স্পষ্ট পরিচয় ধরা পড়ে। অতি সাধারণ মানুষ সেলিম সেই অনন্বয়ের শিকার, এ অনন্বয় গভীর যন্ত্রণা থেকে জাত। নায়ক আঁতোয়া রকিত্যাঁ যখন অহং-এর দাবিতে চারপাশে নিজের অস্তিত্বের নিপুণ অনুসন্ধানী, এবং সে অনুসন্ধানে হতাশাকেই একমাত্র সত্য হিসেবে দেখে, তখন

একে একে প্রেমিকা অ্যানির সঙ্গে হৃদয়-সন্ধানে এসেছে নিষ্ফলত্ববোধ, তিক্ততা, উৎকট বীতস্পৃহতা, বড় বিচ্ছিন্নতা। কামুর 'দি আউটসাইডার', 'দি প্লেগ' উপন্যাস, আঁদ্রে মনরোর একাধিক নায়ক ভাবনায়, আমেরিকান উপন্যাসে অনন্বয়বাদের প্রথম প্রবক্তা ন্যাথানিয়েল ওয়েস্টের উপন্যাসগুলির মধ্যেও যে নায়ক ভাবনা তিরিশের দশকে প্রতীচ্যের উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দেয়, সমরেশ বসু ষাটের দশকের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে বসে সেই আত্মিক সংকটের বিচ্ছিন্নতাকে গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেন তাঁর দেশীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের যুবক প্রাণে। বাংলা উপন্যাসে এই ধারণা বাস্তবতার নতুন দিক! সার্ত্রের নায়ক রাকিত্যাঁ নিজের মত করে সেই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির একটা চেষ্টা করেছিল রলেবন-এর আত্মজীবনী লেখার প্রয়াসে। সমরেশ বসুর 'বিবর'-এর নায়ক বীরেশ মৃত নীতার কাছে ফিরে সেই প্রতিক্রিয়ারই যেন প্রমাণ রাখে। আমাদের কথা হল, অনন্বয়বাদ সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আমাদের দেশে সমরেশ বসুর রচনায় আঁকা হয়ে যায়। এর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই সার্ত্র, কামু, ওয়েস্ট প্রমুখ তাকে উপলব্ধি করেন গভীরভাবে। এই বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিতভাবে বিধ্বংসী যুদ্ধেরই নিক্ষিপ্ত সমস্ত কিছুর বিনষ্টির উপযোগী বিষাক্ত বীজাণু।

'বিবরে'র নায়ক বীরেশের অবধারিত অনন্বয়-অনুগ আত্মিক সংকটের মূলে আছে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও পরাধীনতাবোধের কঠিন দ্বন্দ্ব। এখানে নায়কের অনিকেত প্রাতিস্বিক সত্তার দ্বন্দ্বময় অগ্নিদহন মূলত ভস্মস্তূপের শূন্যতাকেই প্রকট করে। এই ব্যাখ্যায় বিবরের নায়ক বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী নায়ক-পরিকল্পনার ছক থেকে বাইরে চলে আসে। তার 'আর বেধ না আধারে' প্রবন্ধে সমরেশ বসু উপন্যাসের বক্তব্যের সপক্ষে বলেছেন, 'নিয়তিবাদ একটি বক্তব্য, শ্রেণী সংগ্রাম একটি বক্তব্য। নৈরাজ্যবাদও কারুর কারুর বক্তব্য হতে পারে। পাপবোধের তাড়না, যাতনা ও আলোর তৃষ্ণাও একটা বক্তব্য।' এই শেষের কথাটিই বিবরের নায়কের অন্তস্থলের কঠিন মাটি। যে নৈরাজ্য, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতাবোধ নায়কের মনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, তা থেকে পরিশীলিত আত্মায় মুক্তিপিপাসাই এই নায়কের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি। স্বয়ং লেখকের উপরি-উক্ত প্রবন্ধেই অন্যতম এক প্রশ্নাত্মক বাক্য, 'জীবনে যদি অন্ধকার থাকে, তাকে অন্ধকারেই রাখতে হবে কেন?'

নায়ক বীরেশ যে জীবন সম্পর্কে বিমুখ, তা প্রথাগত অসুস্থ জীবন। এই অসুস্থ জীবন আঁকতে গিয়ে যৌনতা, প্রেম, সমাজের গভীরে নোংরা পাঁক, পারিবারিক জীবনের অসহায় নিষ্ফলত্ব, সুখী সচ্ছল প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়-সম্পর্কের ফাঁপা রুদ্ধশ্বাস অবস্থাকে যথাযথভাবে এঁকেছেন লেখক। 'বিবর' রচনাকালীন সর্বাবয়ব সামাজিক ও দেশীয় অবস্থার প্রেক্ষিত লেখক ভোলেন নি। সেই নগরজীবন অভিজ্ঞতা, স্ব-কাল ও সমাজ চেতনাই বিবরের মত গ্রন্থ-রচনায় লেখককে গভীরভাবে প্রেরণা দেয়. তাই এ উপন্যাসের বাস্তবতা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক নয়, শিল্পের অধিগত ও অনুগত। সমরেশ বসুর ভাষায় 'জীবনকে কলা দেখিয়ে 'সাহিত্যের মন্দিরে ঘণ্টা বাজানো যায় না। সাহিত্যে যদি মাঝি

আর নদী উপস্থিত হয়, বস্তি বস্তির জীবন উপস্থিত হয়, নাগরিক নগর জীবন উপস্থিত হয়, তবে তা বাস্তবে নিষ্ঠার সঙ্গে আসবেই।'

সমস্ত দিক থেকে এই বাস্তবতার প্রয়োগেই বিবরের নায়ক বীরেশ এবং সামগ্রিকভাবে 'বিবর' উপন্যাসটিই শুধু সমরেশ বসুর উপন্যাস ধারায় লক্ষনীয় বদল ঘটায়নি, বাংলা উপন্যাসের পালাবদলে একটি উজ্জ্বল 'মাইলস্টোন' হয়ে উঠেছে। বীরেশের আত্মোক্তি দিয়ে গোটা উপন্যাসটি গড়া এবং সেই আত্মোক্তির মধ্যে আছে আদ্যন্ত নিজেকে ব্যঙ্গ করা, নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করা। নায়কের এমন সচেতনা বাংলা উপন্যাসে প্রথম। এ নায়ক বিশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধের, যান্ত্রিক সভ্যতার, বিক্ষত বিজ্ঞান-মনস্কতার অবধারিত ফল। বিভূতিভূষণের সংসার-বিরাগী অপু, তারাশংকরের একাধিক নায়কের কাঠামো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওদিয়া গ্রামের শশীর নিঃসঙ্গতা ও পূর্ণতাবোধের থেকে বীরেশ স্বতন্ত্র। সমকালীন সন্তোষকুমার ঘোষের 'স্বয়ং নায়ক', 'জল দাও' উপন্যাসের নায়কের ছায়ার সঙ্গে বীরেশেব ছায়ার যোগ ঘটতে পারে, কিন্তু দেখার স্বাতন্ত্র্যে বিবরের বীরেশ সন্তোষকুমার ঘোষের নায়কদের থেকেও স্বতন্ত্র।

'বিবর' উপন্যাসেব মূল লক্ষ্যের সঙ্গে এর নায়কের যোগ নিবিড়তম। বৃটিশ উপনিবেশবাদে দীর্ঘকাল শাসিত এই বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তর-কালের দেশীয় শাসনব্যবস্থাব মধ্যেও একজন সুস্থ সচেতন মানুষ স্বাধীন থাকতে পারে না। এটাই বুর্জোয়া এই সমাজের নির্যাত। ব্যক্তির ও সমাজের স্বাধীনতা যেটা বলা হয়, তা আসলে কুৎসিৎ পরাধীনতা- যে পরাধীনতা না থাকলে যে কোন শ্রেণীর মানুষের এই কালে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই মনে করি স্বাধীন, কিন্তু আসলে তা নয় আদৌ। স্বাধীন হতে আমবা রীতিমত ভয পাই, পরাধীনতা আমাদেব সুখ দেয়, বাঞ্ছিত প্রেম দেয়, জীবনধারণ দেয়, অর্থ-প্রতিপত্তি সব দেয়। নাযক বলছে, 'মানুষ স্বাধীনতাকে কী ভীষণ ভয় পায। বিশেষ করে ভদ্রলোক হতে গেলে তো কথাই নেই। আমরা যাদের ভদ্রলোক বলি, এই আমিই যেমন। আমিই যখন আমার চাকরীস্থলে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে ভদ্রলোক সেজে থাকি, তখন সব স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিযে, কপালে হাত ঠেকিয়ে হেসে কথা বলি, অন্তরের ভাষাটা যে কী কদর্য, নিজের কানেই শোনা যায় না প্রায।' অর্থাৎ আমরা সবাই একটা গর্তের মধ্যে বাস করি, যার নাম পরাধীনতা, এবং সেখানেই সুখ। আব সেই সুখকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরার জন্যেই পরাধীনতা সত্য স্বাধীনতার থেকে। স্বাধীনতা বড় ভয়ের। প্রেমিকার কাছে, বাড়ির পরিবেশে, অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে -সর্বত্র আমাদের এই বিবর-বাস। বীরেশের প্রেমিকা নীতা, বাবা জগদীন্দ্রনাথ, মা অনসূয়া, বোন বিদিশা, অফিসের হরলাল ভট্টাচার্য বিষযে তদন্ত করার ব্যাপাবে উঁচু পদের অফিসার মিঃ বাগচী, মিঃ চ্যাটার্জী -সকলের কাছেই যদি নায়ক 'বিবর বাসী' হ'ত তা হলে নীতা-হত্যা ঘটনা ঘটত না, অফিস থেকে সে ছাঁটাই হত না ইত্যাদি। কিন্তু নায়ক তা চায় নি। তার স্বাধীন 'ইচ্ছা'টাই তাকে জটিল করে তুলেছে। বিবরের নাযকের পক্ষে স্বাধীনতা মানে একটা দ্বন্দ্ব এবং একজন 'শেষ পর্যন্ত

বেঁচে থাকবার জন্যে শেষ চেষ্টা করেছে।' উপন্যাসের শেষে সমরেশ বসুর নায়ক মৃত নায়িকা নীতার কাছে ফিরে এসেছে এমন আত্মোক্তির—যা অকপট স্বীকারোক্তির মতই—সাক্ষ্যে—'যদি ভয়হীন লজ্জাহীন ঘৃণাহীন, (দু'জনের মাঝখানেই মাত্র যে লজ্জা ঘৃণা ভয় আছে) সত্য দুজনে দুজনের কাছে প্রকাশ করতে পারতাম, ওই সেই স্বাধীনতা, যার ভয়ে মরি, সেই স্বাধীনতা স্বাদের জন্যই, দুজনে দুজনের কাছে ছুটে আসতে পারতাম, অর্থাৎ একমাত্র সত্যের জন্যই একমাত্র পাগল হয়ে উঠি আমরা, ... সেক্স এ্যাটাচমেন্টের যেমন পাগলামি, তেমনি সত্যের কোন এ্যাটাচমেন্ট যদি থাকত'।

এমন চিন্তায় আছে 'বিবর' উপন্যাসের নায়কের বিবর্তনের পরিণামী সিদ্ধান্ত। 'বিবরে'র 'থীম'-ও বাংলা উপন্যাসের পালাবদলের সহায়ক। 'প্রজাপতি' উপন্যাসেও সুখচাঁদ অর্থাৎ সুখেন গুণ্ডার স্বীকারোক্তিতে আছে ভয়ঙ্কর শূন্যতায় রাহুগ্রস্তের মত এক নায়কের বিম্বন। মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তান সুখেনের প্রজাপতি হত্যার প্রতীকে সমস্ত রকম সৌন্দর্যবোধ, জীবনের পবিত্রতাকে অস্বীকার করার বিষয় আছে, তা 'বিবরে'র নায়কের শূন্যতাবোধের অনুষঙ্গী। পারিবারিক সম্পর্কে মা-বাবা, বড়দা-মেজদা, কারখানার সূত্রে বড়বাবু, একাধিক নারী সঙ্গে মঞ্জরী, পূর্ণযৌবনা শিখা, কিশোরী জিনা, দেশীয় রাজনীতির স্বরূপ ব্যাখ্যায় নোংরামি—এই সবই তার কাছে অবজ্ঞার, অবহেলার। চার পাশে এক গভীর অন্ধকার নিয়ে সুখেনের জীবন এবং তারই মধ্যে তার ঘটে মৃত্যু। সুখেনের যে মৃত্যু তার শূন্যতাবোধের অবধারিত অভিশাপ। 'পাতকে'র নামহীন নায়ক সুখেনের মত গুণ্ডা নয়, সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর স্বভাবের পুরুষ। কিন্তু তার অভিজ্ঞতাও সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে তার বিবমিষাকে জাগায়। এখানেও নায়কের পক্ষে আশ্রয়চ্যুত প্রাতিস্বিক সত্তার প্রতিবিম্বন সত্য। সে প্রতিবিম্বনেই উঠে আসে প্রেমিকা রত্নাকে চুম্বনের কালে পায়োরিয়ার গন্ধে বিবমিষা-ভাবনা, রঞ্জনের মায়ের তার ছেলের বন্ধু মিহিরের সঙ্গে অবৈধ যৌনাচারের ভাবনা, চাপা বিতৃষ্ণা, অধ্যাপক-সমাজ, রাজনৈতিক আন্দোলন এসবের বিসদৃশ বৈশিষ্ট্য, একাধিক নারীসংসর্গে শীতলতাবোধ। 'পাতক' উপন্যাসে যৌনতা যৌবনের বিশুদ্ধ বলয় হয়ে আসেনি, এসেছে নায়কের প্রেম ও যৌনতাভাবনার ও সম্পর্কের অবক্ষয়ের প্রতিরূপ হয়ে। প্রেমের স্বরূপ ভাবনায় পাতকের নায়কের চিন্তা—'প্যান্টের বোতাম খুললে আর নারী অন্তর্বাস সকল উন্মোচন করলেই, প্রেমিক-প্রেমিকা হওয়া যায় নাকি ?' অসাধারণ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী বেবীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রচনার কালে নায়কের বিপরীত ভাবনা—'আমি যেন শব, আমার শরীরে যেন রক্ত নেই, রক্তবাহী শিরা নেই, সবই চুপচাপ, নিথর থাকে বলে, মৃত্যু-পুরীর মত হয়ে আছে।' প্রেম-যৌনতা, দেহভোগ—এসবে নায়কের ভাবনা বিচ্ছিন্ন সত্তার আবরণ উন্মোচন করে উৎসুক পাঠকদের সামনে। এই সত্তার আর এক পরিচয় আছে 'বিশ্বাস' উপন্যাসে দুর্বল স্বভাবের নায়ক নীরেন ও তার প্রেমিকা লিপির সম্পর্কটিতে। এ উপন্যাসে লিপি, লিপির মা, মায়ের প্রেমিক লিপির বাবা, নায়কের নিজের বোন বন্ধু পরিমল, তার প্রেমিকা খুকু—এসব চরিত্র দিয়ে সেই যৌন জীবন ও প্রেম জীবনের প্রথাবদ্ধ রূপাবয়ব থেকে সরে আসা এক শূন্য বিচ্ছিন্ন জীবন ব্যাখ্যায়

নেমেছেন লেখক। এসব সূত্রে যে জীবনরূপ তা ব্যক্তিক। এ উপন্যাসে সমরেশ বসু এঁকেছেন কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙার প্রেক্ষিত। দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী ও বেরিয়ে-আসা নতুন সাম্যবাদী দল সকলের মূল ভিত্তিতেই আছে অবিশ্বাসের অন্ধকার, বিচ্ছিন্নতার সমূহ অভিশাপ।

'বিশ্বাস' উপন্যাসের নায়ক নীরেন তার পরিবার জীবন ও রাজনৈতিক জীবন সব থেকে বিচ্ছিন্ন। পার্টির কাছ থেকে মার খেয়ে ফিরে আসা নীরেনের কাছে উকিল লোকেশ্বরের শ্লেষাত্মক মন্তব্য -'বিশ্বাসের পরিণতি তো তোমার সর্বাঙ্গেই ছাপা রয়েছে। গোটা মুখে তাপ্পি।' বিশ্বাসের সর্বাবয়বে সংকটের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এই সংলাপ যেন প্রতীকী স্বভাবে উচ্চকিত। আর এই বিশ্বাসের ভয়াল ভঙ্গুর রূপই দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে প্রোজ্জ্বল। সমরেশ বসুর আলোচ্য পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে সাধারণ ভাবে (১) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংকট প্রধান কথা। (২) নর-নারীর দেহমিলনে, যৌনতায় যৌবনের জয়গান নয়, যৌবনের অপচয় ও অবক্ষয়ের উৎকট রূপই সত্য। (৩) ব্যক্তিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক তিন জীবনই হয়েছে উৎকেন্দ্রিকতার দোষে দুষ্ট। (৪) উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নায়করাই এই পর্যায়ে প্রধান হয়েছে। (৫) বিচ্ছিন্নতা সত্য হলেও তা একমাত্র লক্ষ্য হয় নি। লেখক এর মধ্যেও গভীর জলের পুকুরে মাছের হঠাৎ হঠাৎ ভেসে উঠে বাইরের বায়ুকে শ্বাস হিসেবে নেওয়ার মত সুস্থ ভালবাসার, জীবনে প্রেমের আর্তিকেও ব্যক্ত করেছেন নায়কদের ভাবনায়। বস্তুত দ্বিতীয় পর্যায়ে সমরেশ বসু 'থীম' নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে তাঁর কালের ও রাজনীতির, মানুষ ও তার পরিবারের দ্বারা চালিত হয়েছেন। আর সম-সময়ের দাবিতেই উপন্যাসগুলিতে এসেছে 'এ্যালিয়েনেশানের' গৈরিক ধূসর রূপ।

[আট]

তৃতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত উপন্যাসই রচিত হয়েছে সত্তরের দশকের শুরুর সময় থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। সত্তর দশকের শুরু তখন বাংলা দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ নানান বিপরীতমুখী ঘটনাস্রোতে উত্তাল। নানা 'ক্রস্‌কারেন্টে' দেশীয় রাজনীতি জটিলতম। একদিকে দেশীয় কংগ্রেসের অবধারিত ভাঙন, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির একাধিক ছোট-বড় খণ্ড খণ্ড দলে বিভাজন। সংশোধনবাদী, নয়া-সংশোধনবাদী, অতি বিপ্লবী এইসব আখ্যায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রে দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দশা স্পষ্ট। এরই মধ্যে দেশীয় যুবকুল যেমন দ্বিধাবিভক্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যেমন এসেছে সংকট, তেমনি কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এসেছে নতুন সচেতনায় নানা বিভ্রান্তি, বিমূঢ়তা, দেশীয় বাস্তব এই প্রেক্ষাপটে সমরেশ বসু আবার স্ব-কালকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি রাজনীতিকে লক্ষ্যে রেখে উপন্যাস লিখলেন 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'যুগ যুগ জীয়ে', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'দশ দিন পরে', 'তিন পুরুষ' ইত্যাদি।

বস্তুত এই তৃতীয় পর্যাযের উপন্যাসেও সমরেশ বসুর নাগরিক চেতনার রূপায়ন

ঘটেছে রাজনীতিকে আশ্রয় করে। নগরচেতনার প্রধান আশ্রয় হয় একদিকে যেমন ব্যক্তির জীবন-মন, অন্যদিকে তেমনি রাজনীতি। ষাটের দশকে এসে সমরেশ বসু নগর-ভাবনার নির্যাস ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাকে লক্ষ্যে রেখে যে নায়ক নির্মাণ করেছেন, আমাদের নির্দিষ্ট দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলির আলোচনায় তা দেখিয়েছি। সত্তরের দশকে এই লেখকের প্রধান লক্ষ্য হয় রাজনীতি। সে রাজনীতি অবশ্যই সমকালীন দেশীয় রাজনীতি এবং পুরনো জাতীয় কংগ্রেসের প্রবল বিরোধী। কমিউনিস্ট রাজনীতিই একমাত্র লক্ষ্য হয়। সমরেশ বসুর ব্যক্তিজীবন, আমরা আলোচনার গোড়াতেই বলেছি, ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যৌবনকালের শুরুতেই। প্রসঙ্গত জানাই, উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের এপ্রিল মাসে দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে এক 'মুখোমুখি' সাক্ষাৎকারে সমরেশ বসু জানান তাঁর উপন্যাসে বিশেষভাবে রাজনীতিকে গ্রহণ করবার কারণ, 'কমিউনিস্ট রাজনীতি আমাদের দেশে যতই বেশি বাড়ল, তত বেশি আমার প্রত্যাশাও বাড়তে লাগল যদিও আমি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসেছি সরে এসেছি এই কারণেই যে, আমি দেখলাম যে, সাহিত্যিক জীবনযাপন করতে হলে সবক্ষণের --তা হলে সক্রিয় রাজনীতিতে থাকা যায় না। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।'

সমরেশ বসুর উপরি-উক্ত মন্তব্য প্রমাণ করে, তিনি দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির কাছে অনেক বেশী প্রত্যাশা করতেন। লেখকরা সবসময়েই মানবতার প্রতি প্রবল আগ্রহী থাকেন। কমিউনিস্ট রাজনীতির মূল ভিত্তি মার্কসীয় মতবাদ এবং সে মতবাদ আন্তর্জাতিক মহামানবতায় গভীরভাবে দায়বদ্ধ। সমরেশ বসুর মধ্যে বড় মানবতার আকাঙ্ক্ষা ছিল বলেই দেশীয় রাজনীতির সদস্য পদ থেকে সরে এসেছিলেন। আলোচ্য পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সেই বড় মানবতার আকাঙ্ক্ষা বার বার ধাক্কা খাওয়ার কারণেই একাধিক উপন্যাস লিখে নতুন নায়ক রচনা করে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রয়োগগত পরীক্ষাকে শিল্পের প্রকরণে সত্যরূপ দিতে সচেষ্ট থেকেছেন।

অর্থাৎ সমরেশ বসু আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসে মানবতার জন্য যেভাবে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবোধের মধ্যেও সন্ধিৎসু হন, ঠিক সেই ভাবেই সত্তরের দশকের উপন্যাসগুলির মধ্যে মার্কসীয় রাজনীতির সূত্রে বড় মানবতাবাদের সন্ধানে সুস্থ আন্তর্জাতিক চেতনার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। লক্ষণীয়, উপন্যাসের 'থীম'-এর দিক থেকে প্রথম পর্যায়ে যে লেখক ছিলেন গ্রামীণ, দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি হন নাগরিক। এই নাগরিক চেতনার প্রয়োগে মানবিকতাবোধের আর্তি যা 'বিবর'র বীরেশ ইত্যাদি চরিত্রে অন্তঃশীল ছিল সমস্তরকম বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও, তা আন্তর্জাতিক মহামানবতাবোধের জন্য উদগ্রীব হয়। সত্তরের দশকের রাজনীতি সচেতনার মূলে লেখকমন এভাবেই সক্রিয় থেকেছে। দেশীয় রাজনীতির পটে আন্তর্জাতিক মানবতাবোধের অনুসন্ধানেই লিখেছেন 'মানুষ শক্তির উৎস', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোজে', 'যুগ যুগ জীয়ে', 'তিন পুরুষ', 'দশ দিন পরে' ইত্যাদি উপন্যাস। সমরেশ বসু তাঁর 'স্বীকারোক্তি' নামের বড় গল্প - যেটি ষাটের দশকের গোড়ায় লেখা, তার মধ্যে প্রথম রাজনীতি গ্রহণ করার

কথা স্বীকার করেছেন নিজের লেখা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধের মধ্যে। উনিশ শ' অষ্টআশি সালের মার্চে লেখা ওই রচনায় তিনি নিজের লেখায় রাজনীতি অবলম্বন সম্পর্কে জানিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায় —'রাজনীতি এ তো মানে অনিবার্য ব্যাপার, যে-আমার সাহিত্যে আসবে বলে আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি না —আসবেই। একদিক থেকে যা আমার বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাসে যখনই আঘাত লেগেছে এবং যা আমার প্রত্যাশা ছিল তা যখনই দেখলাম শুধু অপূর্ণ থাকছে না —সেই প্রত্যাশাকে ভেঙে খান খান করা হচ্ছে—বিশ্বাসের—সমস্ত বিশ্বাসকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, অথচ যারা এই বিশ্বাস ভাঙছে তারা বলছে তারা সত্যবাদী —যা আমি বুঝতে পারছি আমার নিজের চিন্তার দিক থেকে যে তারা সত্যি কথা বলছে না —এরকম ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপন্যাস, যদি রাজনৈতিক উপন্যাস বলে কোনও কিছু থাকে এবং রাজনৈতিক উপন্যাসকে নিশ্চয়ই শিল্পরসে উত্তীর্ণ হতেই হবে।'

দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বিশ্বাস' উপন্যাসে নায়ক নীরেনের ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক জীবন—দুইকে একই সঙ্গে আঁকতে গিয়ে সমরেশ বসু যে দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির একাধিক বিভাজন ও মতভিন্নতার কারণে সংঘাতের ছবি এঁকেছেন, এঁকেছেন নায়কের বিশ্বাস ভঙ্গের কথা, তা-ই বড় প্রেক্ষিতে, জাতীয় জীবনের প্রেক্ষিত ধরে আরও বড় রূপ পেয়েছে। 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাস তার প্রমাণ দেয়। বোঝা যায় লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবেই এবং ধীরে ধীরে ব্যক্তির বিশ্বাস ও বিশ্বাসের সংকট থেকে মার্কসবাদের বড় প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের বড় শিকড়কে ধরতে চাইছেন। নগর জীবনে অভ্যস্ত ব্যক্তির রাজনীতি-চেতনা থেকে কৃষক-শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনীতি-ভাবনার গভীরে রাজনীতির মহামানবিক বড় প্রত্যয়কে শিল্পের আলোয় যাচাই করতে চাইছেন। এই সূত্রেই আসে 'রুইতন কুর্মি'র মত কৃষক চরিত্র, এঁকেছেন নাওয়াল আগারিয়ার মত শ্রমিক চরিত্র।

কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রে দেশীয় নকশালবাড়ি আন্দোলনই সমরেশ বসুকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে। যেমন বিভ্রান্ত করে সমকালের আর এক লেখক সন্তোষ কুমার ঘোষের নায়ক তিমিরবরণকে তার 'জল দাও' উপন্যাসে। বন্দুকের নল সমস্ত শক্তির উৎস এই রাজনৈতিক ফতোয়ার সামনে লেখক উপস্থিত করেন 'মানুষ শক্তির উৎস' উপন্যাস। নকশাল আন্দোলনে শ্রেণীশত্রু খতমের একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল বিভক্ত খণ্ড খণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির কোন কোন অংশে। সমরেশ বসুর নায়ক রাজনৈতিক কর্মী, সচেতন, সতর্ক অনুভূতি-প্রাণ। নায়িকা যমুনার ভাবনা, নায়কের আত্মবিশ্লেষণ ও দলগত বিশেষ মত প্রয়োগের সীমাবদ্ধ মানবতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়া মূলত মানুষকেন্দ্রিক বিচারবুদ্ধিহীনতাকে বিশ্বাস্য করে তোলে। শ্রেণী-শত্রু খতমের নামে মানুষকে গোপনে অতর্কিতে নির্মমতায় খুন করার সন্ত্রাসবাদী তত্ত্বে সত্যকারের রাজনীতির বিচার চেয়েছেন লেখক তথা লেখকের সচেতন নায়ক। রাজনীতি জীবনেরই অন্যতম অঙ্গ। সেই রাজনীতি যখন মতবাদ প্রাধান্যে নীরস, কঠিন দ্বিধাদীর্ণ হয়, তখন স্বভাবতই গভীর ব্যর্থতাবোধ, হতাশা, অসহায়তা শিকড় গেড়ে বসবে মানবিকতায় বিশ্বাসী মানুষের মনে। আলোচ্য উপন্যাসের নায়কের মনে তা-ই দেখা দিয়েছে, 'আহ্, আবার রাজনীতি। আবার আমি

থাকবে, কিন্তু এই জানার মধ্যে সহিংস সাম্যবাদ ও অহিংস গান্ধীবাদ তাঁকে নানাভাবে আন্দোলিত করে।

কারণ দেশীয় রাজনীতির গান্ধীবাদ আর আন্তর্জাতিক রাজনীতির মার্কসবাদ দু'য়ের দূরত্ব ও বিরোধ থাকতে বাধ্য, যদিও দু'য়েরই মূল লক্ষ্য মানুষ তথা মানবতাবাদ। সমরেশ বসু ক্রমশ যে পরোক্ষে গান্ধীবাদে তার রাজনীতি ভাবনার কিছু আশ্রয়ের সন্ধানী ছিলেন, রুহিতনকে গান্ধীজীর কারাবাস বিষক ঘটনার সামীপ্যে এনে প্রমাণ দিয়েছেন। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'যুগ যুগ জীয়ে' গ্রন্থে সেই গান্ধীবাদেব বিচারনামে সমকালীন কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রেক্ষিত এনেছেন। এ উপন্যাসের নায়ক ত্রিদিবেশকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত করেছেন গভীরভাবে। রাজনীতি ধারাবাহিক হয়েছে দেশীয় আন্দোলনের ইতিহাস ধরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে দেশীয় কংগ্রেসী রাজনীতি ও কমিউনিস্ট মতাদর্শগত সংঘাত ছিল বিচিত্র জটিল। সেই উনিশ শ' বিয়াল্লিশ থেকে উনিশ শ' আটচল্লিশের মধ্যবর্তী কালের রাজনীতির মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে নায়ক ত্রিদিবেশ। উপন্যাসের শেষ তৃতীয় খণ্ডে সমরেশ বসু ত্রিদিবেশের আঁকা ছবির প্রতীকে বড় মানবতাবাদের কথা বলেছেন মতবাদদুষ্ট রাজনীতির সংকীর্ণ দলীয় সংঘাত-সংঘর্ষকে গৌণ করে। 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে আছে রাজনীতির আর একস্তরের প্রয়োগমূলক পরীক্ষার কথা—সংসদীয় রাজনীতির কঠিন সীমার শিক্ষার কথা। কমরেড, একদা সংগ্রামী মজদুর নওয়াল আগারিয়ার বর্তমান অবস্থার স্মৃতি সূত্রে স্বপ্নভঙ্গের যে কাহিনী এঁকেছেন লেখক, তার মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে সংশয় ও কমিউনিস্টদের তার মধ্যে আশ্রয় দিয়ে বিপ্লবী মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের অক্ষমতা দেখানোর প্রয়াস আছে। নাওয়ালের মধ্যেও আছে পার্টি-নির্ভর রাজনীতি বিষয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ভবনাথ নাওয়ালকে যে গান্ধীজীর মত ও শিক্ষার কথা বলে, যেন বা তারই সূত্রে আসে 'তিনপুরুষ' উপন্যাসে গান্ধীবাদী ঠাকুর্দা সূর্যমোহন। এখানে লেখক, রাজনৈতিক মতবাদের সংঘর্ষচিত্রে এঁকেছেন পিতা সৌরীন্দ্রের মত মন্ত্রী সুযোগসন্ধানী, আদর্শবিচ্যুত সি. পি. আই(এম) নেতাকে পুত্র সুদীপ এমন এক যুবক যে একাধিক মতে বিভ্রান্ত রাজনীতির মধ্যে কল্পনা করে 'লেনিন মানবতাবাদী, গান্ধীও তাই। দুজনেই পৃথিবীর দুই মানবপ্রেমিক মহান ব্যক্তি।' সমরেশ বসু যে উপন্যাসে রাজনীতি ও তার কেন্দ্রস্থ 'যত মত তত পথ'-এর মত জটিল 'ক্রস্‌ কারেন্টে' একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছিলেন, একাধিক রাজনীতি ভাবনা বিষয়ক 'থীমে' তার শিকড় মেলে।

উপন্যাস ধারার দ্বিতীয় পর্যায়ে সমরেশ বসু যে ব্যক্তির সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ও একক প্রাতিস্বিক সত্তার শূন্যতাবোধের পট আঁকতে সনিষ্ঠ ছিলেন, রাজনীতিকে বিষয় করে সেই বিচ্ছিন্নতাকে বৃহত্তর রাজনীতিচেতনা তথা মানব-ভাবনার সূত্রে দেখাতে চেয়েছেন। রুহিতন, নাওয়াল আগারিয়া, ত্রিদিবেশের মত নায়কদের যে বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবোধ—তা ব্যক্তির স্বার্থে ছোট নয়, তা সমষ্টি মানুষের বৃহত্তর মহত জীবনবেগ ও আবেগের মূল্যে অনেক বেশী উজ্জ্বল। সেখানে আন্তর্জাতি

মানবতাবাদের বিনষ্টির ভয় ও বিষণ্ণতা বড় হয়। এই ভাবনার মধ্যেও জীবনের দিকে সুস্থ জীবনবরণের প্রশ্নে নায়কদের আন্তর-স্বভাবে তৎপর হতে দেখি।

সমরেশ বসু, আগেও বলেছি, কখনোই নিজেকে উপন্যাসের 'থীম' নির্বাচনে পুনরাবৃত্তির মধ্যে নিয়ে যেতে চাননি। তিনি রাজনীতির সূত্রেই এঁকেছেন মাস্তানদের কথা 'দশ দিন পরে' উপন্যাসের, জীবনের মধ্যে অস্তিত্বের সংকটের কথা চিন্তা করেছেন 'সংকট' উপন্যাসে, আবার সুবিধাভোগী মানুষ যারা দেশীয় আইন, রীতিনীতির সুযোগ নিয়ে আত্মস্বার্থ ও ভোগ এবং যৌনজীবন চরিতার্থ করতে চায় তাদের কথায় নির্বিকট হয়েছেন 'অপদার্থ' উপন্যাসে। সত্তরের দশকে বসে তিনি আবার আঞ্চলিক জীবনের কথা ভেবেছেন 'টানা পোড়েন' উপন্যাসে। তাঁতি-শ্রমিক জগৎ কীতের পুত্র পঞ্চানন কীত এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাদের শ্রমিক-জীবন ও ব্যবসায়ী জীবনের সূত্রে সমরেশ বসু গোষ্ঠী জীবনের কথাই বলেছেন। বিশেষ গোষ্ঠীর কথা সত্তরের দশকে বসে আবার ভেবেছেন। এই গোষ্ঠী জীবন বড় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত— লেখকের লক্ষ্য তা-ই। 'তীর্থ বঞ্চনায়' তাঁত শিল্পের নকশার সঙ্গে অবৈধ যৌন-জীবনকে লেখক এঁকেছেন এ উপন্যাসে টুকি-পাঁচুর যৌন জীবন-স্বভাবের মধ্য দিয়ে। সমরেশ বসু যোগসাধনা তন্ত্র-মন্ত্র, অধ্যাত্ম-বিশ্বাস এসবও ভেবেছেন 'পরম রতনে'। বস্তুত নিত্য নতুন বিষয় সন্ধানে তিনি যে কত নিষ্ঠাবান ছিলেন তার প্রমাণ মেলে, যখন আমার এক পুরোহিত বন্ধুর কাছে প্রমাণ পাই, তিনি দেশীয় পুরোহিততন্ত্র নিয়েও লেখার কথা ভেবেছিলেন। বস্তুত ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু ছিলেন সদা-অস্থির, বৈচিত্র্য-সন্ধানী, গভীর জীবনজিজ্ঞাসায় ও আত্মানুসন্ধানে দৃঢ়চিত্ত এক সাধক-কথাকার।

নয়

সমরেশ বসুর উপন্যাসের শরীর, কাঠামো গড়ে উঠেছে বিষয় নির্বাচনের মতই বৈচিত্র্যে ও স্বতঃস্ফূর্ততায়। উপন্যাসের বিষয়কে পরিবেশন করার যে আধার – তাতে আছে কাহিনী বহন করার উপযোগী প্লট, চরিত্র-বস্তু, গদ্যভাষা। গদ্য আছে লেখকের বর্ণনায়, চরিত্রচিত্রণে ও চরিত্রের মনোলোক, অবচেতনলোক উন্মোচনে, সংলাপ প্রয়োগে এবং প্রকৃতি বর্ণনায়। সমরেশ বসুর উপন্যাস ধারার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের প্লটে আছে বৈচিত্র্যের স্বাদ, চরিত্র-কাঠামো নির্মাণে আছে স্বাভাবিকতা, গদ্যভাষায় আছে বাংলা অ সাধারণ ধারা। সমরেশ বসুর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে বক্তব্য অনেক প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু তাতে উপন্যাস কাঠামোর ওপর তা ভার বলে মনে হয়নি। আখ্যানকে তিনি নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তাঁর উপন্যাসে কখনোই কাহিনী বর্জিত হয়নি, কিন্তু কাহিনী সর্বস্ব হয়নি তা কোথাও। প্লটের নিখুঁত বন্ধনে কাহিনীবস্তু যথেষ্ট পরিমিত, সংযত। 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসে যে প্লটের দুর্বলতা বিষয়ের সীমায় কিছুটা স্পষ্ট ছিল, 'উত্তরঙ্গে'র মধ্যে তা অ-দৃশ্য। 'বি. টি রোডের ধারে' থেকে 'শ্রীমতী কাফে' হয়ে 'গঙ্গা'য় তাঁর কাহিনী রচনা, চরিত্র নির্মাণ ও ভাষারীতি অনেক সংযত, একমুখীন স্বভাব পেয়েছে।

'বিবরে' এসে লেখক হন আত্মমুখীন, শ্লেষ-ব্যঙ্গে এর নায়ক বীরেশ কঠিন

আত্মসমালোচক। তাই এই পর্বের একাধিক উপন্যাসে বর্ণনারীতির থেকে সরে এসে হন আত্মকথনমূলক রচনাভঙ্গীর সফল অনুরাগী। চতুষ্পার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা বোঝাতে, আত্মিক সংকটজাত শূন্যতার প্রতিচিত্রণের ভাষায় তিনি বেছে নিয়েছেন সংক্ষিপ্ত ও শিল্পের সংযম। নায়ক চরিত্রে একাধিক ডাইমেনসানে আলো ফেলে দেখার রচনারীতি ও ভাষা ভিন্ন হবেই। বাংলা উপন্যাসের পালা-বদলে তাই সিনিক নায়ক বীরেশের আত্মোক্তিমূলক ভাবনার ভাষা অভিনব। যেমন, 'কোন আঘাতেই যে ভেঙে পড়েনি, পবিত্রতাও হারায়নি, (বন্দরের আবার পবিত্রতা, বেশ্যার আবার ভেঙে পড়ার ভ., যেন কলকাতা বন্দরকে আমরা চিনি না, জানি, কাপ এ্যাসাইড ইওর লিরিক, শালুক চিনেছে ।) কারণ, গানটার বক্তব্য প্রায় সেইরকমই, একটি শান্ত অক্ষত বন্দরে সে নোঙর করতে চেয়েছে' না কি নিজের ঘরে রেকর্ড বসানো গান শুনতে শুনতে নায়কের কি মনে হয়েছিল মত নিজের সাথে বসে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ও স্ব-কালের সমাজ চিন্তায় তা তুলে ধরাই এমন বন্দনার মধ্যে অন্য স্বরে কথা বলার কারণ। এতে বক্তব্য আরও যেমন জোর হয়, তির্যক হয়, আঘাত করার পক্ষে একমাত্র উপযোগী হয়, তেমনি নায়কের আর একটা সত্তাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই। এই রচনারীতি বাংলা উপন্যাসে প্রথম ব্যবহৃত। পরবর্তী 'প্রজাপতি', 'পাতক', 'বিশ্বাস' ইত্যাদি উপন্যাসে নায়কের শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা বোঝাতে লেখক গদ্যরীতির মধ্যে ছোট ছোট ভাবনাচিন্তার বাক্য ব্যবহার করে আত্মচিন্তার গাঢ়তা বুঝিয়েছেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসের সব নায়কই নগর-পরিবেশের। এদের কথায় ও চিন্তায় আছে কলকাতার 'ককনি'। 'প্রজাপতি'র নায়ক সুখেন গুণ্ডা স্নেহ-কে বলে 'স্তেহ', তার প্রেমিকা শিখার স্বামী-পরিত্যক্তা দিদি বেলার সঙ্গে শহরের নামী-দামী মানুষদের সম্পর্ককে বলে 'নালানি-বোলানি', তার নিজের বড়দাকে বলে 'অমায়িক ভাবের ত্যাদড়' এই সব শব্দ বাস্তবতা ও বাস্তব চরিত্রের রক্ত-মাংসকেই স্পর্শ করায়।

বাস্তবতাই সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক অভিজ্ঞতার একমাত্র ভিত্তি। সুখেনের মুখের অশালীন ভাষা কলকাতার ককনির অনুগত। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ'র নায়কের বর্ণনায় লেখক এনেছেন মনসামঙ্গল কাব্যের চিত্রকল্প। লখীন্দর তথা লখাইকে মনে হয়েছে 'সাপে-কাটা-মরা' আর তাতে সাধারণ মানুষের মনে হয়েছে—'ভেলায় ভাসা নীল মড়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে মা মনসা, বিরাট ফণা তুলে জিভ দিয়ে বিষ তুলে নিচ্ছে।' উপন্যাসে চটকলের বর্ণনায় সাপের বিষ ও ক্ষিপ্ত হওয়ার সমস্কার বিষাক্ত সাপের অনুষঙ্গ এনে লেখক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বাস্তবের চরিত্র এঁকেছেন। 'বি টি. রোডের ধারে' উপন্যাসেও আছে একাধিক উপমার প্রয়োগ যেমন রাস্তার পাশে নোংরা বস্তির বর্ণনায় লিখেছেন—'বোমা বস্তির ছাদে ধুঁয়ো যেন তরল কালির মত ঝরছে কারখানায়, রাস্তায়, বস্তিতে।' আবার এ উপন্যাসে কোথাও কোথাও প্রকৃতির পটভূমিতে আছে গদ্যের অন্তর্নিহিত কাব্যরস। কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষকে উপমা-রূপকচিত্রকল্পে তাঁর উপযোগী বাস্তবতাতেই রেখেছেন। যৌন সম্পর্কের চিত্র আছে পরিচ্ছন্ন ভাষার প্রলেপে 'শ্রীমতী কাফে' উপন্যাসে 'রমা লতার মত জড়িয়ে ধরে হীরেনকে। রমার তপ্ত আলিঙ্গন, নিঃশ্বাসের

স্মৃতির সঙ্গে যেন সংলাপ বিনিময়েই উপন্যাস শেষ করেছেন। কাহিনী প্লটের বন্ধনে ধরা পড়েছে এইভাবেই। এই ধারাতেই এসেছে 'মহাকালের রথের ঘোড়া'র প্লটগ্রন্থি। মোট কথা, সমরেশ বসুর উপন্যাস পরিক্রমায় উপন্যাসের আঙ্গিক রচনারীতি ও গদ্যভঙ্গি এবং ভাষাবৈশিষ্ট্যে একটি কথাই প্রধান হয়ে ওঠে প্রখর বাস্তব চেতনা দিয়েই তার উপন্যাসের সামগ্রিক গঠন হয়েছে নিয়ন্ত্রিত এবং তা বাংলা উপন্যাসের ধারা নতুন পথের নির্দেশক একাধিক ক্ষেত্রে।

দশ

সমরেশ বসুর উপন্যাসের থীম কে কেন্দ্র করে স্বভাবী পাঠক ও সমালোচক মহলে গোড়া থেকেই যে দুটি দিক নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় ওঠে যে বিতর্কের সামনে দাঁড়িয়ে নানা সময়ে নানাভাবে লেখককে সম্মুখীন থেকে জবাবদিহি করতে হয়েছে সেই দুটি দিক হল (১) উপন্যাসের বিষয়ে নরনারীর যৌনতা যৌন-মিলন চিত্র এর যৌন জীবনের সঙ্গে জড়িত সমস্যা এর অবধারিত প্রয়োগ (২) সমকালীন কমিউনিস্ট রাজনীতির মতবাদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আবির্ভাব বিষয়ক ভাবনা ও মতবাদের লেখককৃত বিচার বিশ্লেষণ। প্রথমটি অর্থাৎ যৌনতা বিষয়ক চিত্রের সূত্রে একেবারে গোড়া থেকেই অশ্লীলতাদোষে লেখককে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। দ্বিতীয়টির বিতর্ক শুরু হয় অনেক পরে সত্তর দশকের সি. পি. আই ভেঙে সি. পি. আই (এম) এবং নকশাল গোষ্ঠীর আবির্ভাবের কালে।

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস উত্তরঙ্গ প্রকাশিত হতে চিন্মোহন সেহনবীশ এর মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের বাস্তব চিত্রে ও ভাবনায় অশ্লীলতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অবশ্য তার মতের বিপরীত বক্তব্যও পাঠকরা তখন শোনেন একাধিক প্রবন্ধে। এবং এই অশ্লীলতার অভিযোগ তীব্রতর হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলি প্রকাশের কালে। 'বিবর প্রজাপতি পাতক' বিশ্বাস ইত্যাদি উপন্যাসে সমরেশ বসু যেন যৌনতা ও নর-নারীর দেহ-মিলন ও দেহ-বাসনা নিয়ে যথেচ্ছাচার, বাড়া-বাড়ি করেছেন এমন ধারণা স্বভাবী পাঠকদের হয়েছে। প্রজাপতি' উপন্যাসকে একদা অশ্লীলতার দায়ে দেশীয় আইন বিচারের কাঠগড়ায় উঠতে হয়েছিল।

কিন্তু সমরেশ বসুর উপন্যাসে যৌনতার দোষগুলি যদি উপন্যাসে বাস্তবতার নতুন ভাবনা দিয়ে দেখি তা হলে তা অশ্লীলতা দোষদুষ্ট হয় না। যৌনতা নিয়ে কল্লোলের কালে এবং ইউরোপের ডি এইচ লরেন্স আলবার্তো মোরাভিয়া হেনরি মিলার নুট হামসুনকে পাঠক-জগতের অভিযোগের দরবারে আসতে হয়েছিল। কল্লোলীয়দের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বুদ্ধদেব বসু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নর-নারীর সম্পর্কে যৌনতা নিয়ে একাধিক উপন্যাস গল্প রচনা করলেও সেগুলি বড় মাপের ও মানের সাহিত্য হয় নি। তুলনায় সমরেশ বসু নতুন বাস্তব ব্যাখ্যায় যৌনতাকে শিল্পিত করেছেন। প্রথম কথা হ'ল সমরেশ বসুর উপন্যাসের যৌনতাকে বাইরের ভদ্র জীবনের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখলে ভুল করা হবে, দেখতে হবে উপন্যাসের চরিত্র-বাস্তবতা ও সমকালীন সমাজ-ন্যায়ের কেন্দ্রে স্থিত হয়ে। দ্বিতীয়, লেখকের

যৌনতা প্রথম পর্যায়ে ছিল সুস্থ যৌবনের পরিপূরক শক্তি। 'গঙ্গা' উপন্যাসের দেহজীবী রমণীদের বিস্তারিত বর্ণনা অশ্লীলতা ও যৌনতাকে সরিয়ে দেয় তখনি, যখন নায়ক পাঁচু মাছ বিক্রীর সঙ্গে বেশ্যাদের দেহ বিক্রীর তাৎপর্যগত যোগ ঘটায়। তৃতীয় বক্তব্য, 'বিবর', 'প্রজাপতি' প্রভৃতি উপন্যাসে যৌনবোধকে কেন্দ্র করে লেখক মানুষের প্রাতিস্বিক সত্তা ও সমাজ-সত্তা —একটি ভিতরের একটি ওপরের —দুই সত্তার জগতকে উন্মোচিত করেছেন। তাতে যে কথায় স্ল্যাং-এর প্রয়োগ, যৌন ক্রিয়ার জীবন্ত চিত্রের উপস্থিতি—সবই বাস্তবতার শিল্প সত্য পেয়ে যায়। মনে রাখা দরকার, প্রেম, যৌনতা জীবনের একটা আংশিক দিক মাত্র, পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ ও অর্থনীতি আমাদের এতাবৎকাল শিখিয়েছে, এই দুটি জীবনের প্রধান সত্য। লেখক সমরেশ বসু সেই মধ্যবিত্ত 'ইলিউশান্'-কে কুঠারাঘাতে নির্মূল করতে চেয়েছেন বলেই যৌনতার চিত্র এত বিস্তারিত ও নিরাসক্ত হয়ে উঠেছে। এই চিত্রের বড় মাপ দেখানোর জন্যই লেখক ইতিহাস, পুরাণ, নানান সংস্কার, উপমা-চিত্রকল্প, লোককথা ইত্যাদিকে প্রাসঙ্গিক ভাবে এনেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সমরেশ বসু বহু নারীসঙ্গ করেছেন ঠিকই, কিন্তু উপন্যাসে কোথাও সেই নারীসঙ্গকে 'মটিভেটেড' করে আঁকেন নি। বাস্তবতার দাবীই একজন সচেতন প্রতিভাবান বাস্তববাদী লেখকের কাছে বড় দাবি। অশ্লীলতা নয়, অতিরিক্ততা নয়, যা সত্য তাকে, সমস্ত রকম সেন্টিমেন্ট, কৃত্রিমতা, তথাকথিত ভদ্রতা, পুরণো সংস্কার ইত্যাদিকে ঠেলে সরিয়ে সর্বাধিক বড় মাপের ও মর্যাদার শিল্পে আকার জন্যই যৌনতা সমরেশ বসুর উপন্যাসগুলিতে একটা আলাদা জগত, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অনুগ বিষয় হয়ে উঠেছে। বটগাছের অনেক পাতা মরা, শুকনো, অপ্রয়োজনীয়। গাছের পক্ষে অকারণ ভার মনে হতে পারে, কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশী পাতা তার জীবন, যৌবন, শক্তির স্মারক হয়ই। সমরেশ বসুর উপন্যাসে যৌনতার, নর-নারীর দেহভাবনার একাধিক ছোট বড় বিষয়কে এইভাবেই মেনে নেওয়া শ্রেয়। বড় কথা, প্রতিভাবানের লেখনীতে কখনই কোন অশ্লীল বিষয় সাহিত্য হতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যে অশ্লীলতা বড় শিল্পের লাবণ্যে ও গরিমায় তার আভধা মুহূর্তে পরিত্যাগ করে।

সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনীতি বহু বিতর্ক এনেছে মূলত তাদের মধ্যে, যারা কমিউনিস্ট মতবাদের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে কোন না কোন গোষ্ঠীর অনুগ। সমরেশ বসু সংশোধনবাদী, নয়া সংশোধনবাদী, অতিবিপ্লবী কমিউনিস্ট ও গান্ধীবাদী সকল দেশীয় মতবাদে দীক্ষিত চরিত্রই এঁকেছেন তাঁর একাধিক উপন্যাসে। সমরেশ বসু নিজে যৌবনকালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পরে সচেতনভাবেই রাজনীতি থেকে সরে আসেন এবং সাহিত্য করতে গেলে যে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা, রাজনীতির একটি গোষ্ঠীর কর্মী হওয়া যে তিনি উচিত মনে করেন না, তা তাঁর একাধিক সাক্ষাৎকারে প্রমাণ মেলে। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'র রুহিতন কুরমির দল থেকে সরে-আসা, মোহভঙ্গ হওয়া ও পার্টির অতিবিপ্লবী কার্যকলাপ ও নয়া সংশোধনবাদীদের

ভূমিকা, খুনের রাজনীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, হতাশা, ক্ষোভ, অবসাদ, নৈরাজ্য, অনুশোচনা—এসমস্ত নিয়ে একাধিক রাজনীতিবিদ ও সমালোচক প্রশ্ন তুলতেই পারেন, কিন্তু সমরেশ বসু রাজনীতি ও মানুষ তথা মানবতার প্রশ্ন তুলে যে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে এক শিল্পীর আত্ম-উৎকণ্ঠা ও আত্মিক সংকটের যন্ত্রণা-জর্জর অভিব্যক্তি যে, একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই। লেখক রাজনীতিকে দেখেছেন মানবতা তথা মহামানবতার কঠিন মাটির ওপর পা রেখে। দেশীয় দলীয় রাজনীতির নানা দল, মত, বিভ্রান্তি, নীতিভিন্নতা ও নীতি বিচ্যুতি তাঁকে তাঁর শিল্পীসত্তাকে তাড়িত করেছে, এখানেই তাঁর রাজনীতি-ভাবনার মূল।

আসলে দেশ ও কালের জটিল জিজ্ঞাসাকে যেমন ব্যক্তির চরিত্রে ধরতে চেয়েছিলেন লেখক, তেমনি রাজনীতির মধ্য দিয়েও বুঝতে চেয়েছিলেন সমরেশ বসু। তাঁর রাজনীতি-ভাবনার মূলে ছিল দু'টি প্রধান কথা (১) মানুষের অসম্ভব শক্তি ও সংগ্রামের কথা, (২) মানুষকে অকৃপণভাবে ভালোবাসার কথা। 'মানুষ শক্তির উৎস' উপন্যাসের নায়ক যখন উপন্যাসের সবশেষে এসে বলে 'আমার চোখে আর আগুনের জ্বালা বোধ করছি না। মানুষের শক্তির কথা ভাবছি, যে-শক্তি তার নিরন্তর অসহায়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল।' আর বড় মানবতার দাবী ছিল আন্তর্জাতিক তথা মহামানবিক মতবাদ-ধন্য মার্কসীয় মতে বিশ্বাসী কমিউনিস্টদের কাছে। সেই দাবীতেই উপন্যাসে নানা খানা করে কমিউনিস্ট মতবাদকে, কখনো কখনো গান্ধীবাদী মতাদর্শকে বাস্তব চরিত্র ও ঘটনা অভিজ্ঞতায় রেখে বিচারে বসেছেন। তাই দুই ভাবনায় সমরেশ বসুর উপন্যাসের রাজনীতি-চিন্তা অনেক বড় দলীয় মতাদর্শের বিচারে সে সবের সমস্ত-রকম সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও। তাঁর উপন্যাসের রাজনীতি-ভাবনা যদি মত-সংঘর্ষের পরিণামী সিদ্ধান্তে কোন অতৃপ্তি এনে থাকে, যদি শিল্পের বিচারে কোন অসঙ্গতি দেখিয়ে দেয়, অবাক হওয়ার কিছু নেই, শুধু মনে রাখতে হবে, তাঁর এই বিষয়-গৃহীত উপন্যাসের যাবতীয় অসম্পূর্ণতা, ভাবনার বৈপরীত্যের মূল কারণ সেই সময়ের কেন্দ্রেই নিহিত। লেখক তা থেকে বিবিক্ত কোন ব্যক্তিত্ব নন, কালের শিকার।

একালের এক সমালোচক জানিয়েছেন, 'গ্রামীণ সমাজ থেকে শ্রমিক সমাজ এবং শ্রমিক সমাজ থেকে পেটি-বুর্জোয়া সমাজ বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনের যে ধারা সমরেশ তাঁর রচনাইতে সাথক নিদর্শন। তাই আধুনিক বাংলা উপন্যাস বুঝতে হলে সমরেশ হচ্ছেন একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক।' আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনার সিদ্ধান্তে একথা মানি। পূর্বসূরী এবং সমকালীন— সমস্ত লেখকদের থেকে সমরেশ বসু উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও প্রকরণে নতুন এক বাস্তবতায় যে শিল্প-উপচার উপহার দিয়েছেন তাঁর উপন্যাস পরিক্রমার সূত্রে, তা প্রমাণ করে, তিনি বাংলা উপন্যাসের ধারায় লক্ষণীয় পালাবদলের প্রথম এবং প্রধান নায়ক।

দ্বিতীয় খণ্ড

দিলীপ কুমার মিত্র

ইন্দ্রনাথ থেকে শিবরাম : হাস্যরসের প্রবাহ

যথার্থ হাসি শুভ্র হৃদয়ের সমুজ্জ্বল প্রকাশ। হাসির মধ্যে থাকে একটা দীপ্তি একটা মাধুর্য প্রসন্নতা ; কখনো তাতে পাওয়া যায় সুন্দরের তীক্ষ্ণ প্রকাশ। প্রকৃত হাসি প্রাণের পবিত্র উন্মীলন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বিশুদ্ধ হাসিতে বুদ্ধির ভেজাল নেই, সে অশ্রুশিশিরেতে ধৌত, যখন 'ঊষার মত অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখির নীলাম্বরে গভীর অনুভাবে' সেই হাসিই পরম কাম্য। তবে কখনো হাসি ছুরির মতো কাটে, কখনো তা উচ্চহাস্যে বিস্ফারিত হয়ে পড়ে। 'সাহিত্যদর্পণ' রচয়িতা বিশ্বনাথ ছ ধরণের হাসির কথা বলেছেন স্মিত হসিত বিহসিত অবহসিত অপহসিত এবং অতিহসিত

ঈষদ্বিকাসি নয়নং স্মিতং স্যাৎ স্পন্দিতাধরং।
কিঞ্চিল্লক্ষ্যদ্বিজং তত্র হসিতং কথিতং বুধৈঃ॥
মধুর স্বরং বিহসিতং সাংসশিরে কম্পমিবহসিতং।
অপহসিতং সাস্রাক্ষং বিক্ষিপ্তাঙ্গং ভবত্যতিহসিতম।

এখানে মূলত স্মিতহাসি ও উচ্চহাসির পৃথকতা নির্ণয় করা হয়েছে। 'সঙ্গীত সর্বস্বকার জগন্ধব-ও ছধরণের হাসির কথা বলেছেন

স্মিতং চ হসিতং চৈব বিহসিতং সাহসিতম্।
ভবেৎ প্রহসিতং চাপি তথাহতিহসিতং ভবেৎ ;
ষড়ভাবসংশ্রিতং হাস্যমেবং ষড়্বিধমুচ্যতে॥

বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ্রসৌন্দর্য থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথে অপরূপ জ্যোতির্ময় হয়ে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস যেন ইন্দ্রধনুর বর্ণবিলাসে দীপ্ত সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বাংলা উপন্যাসে হাস্যরসের প্রবণতা নির্ণয় করতে গিয়ে পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের স্মরণ করা প্রয়োজন। হাসির উপাদান নিহিত থাকে চরিত্রে অথবা ঘটনায় (প্রথমটা যদি হয় comic in character তাহলে দ্বিতীয়টা হল comic in situation). চরিত্র ও ঘটনাগত অসঙ্গতি আতিশয্য বৈষম্য হাসির সঞ্চরণ ঘটায়। দার্শনিক Bergson হাস্যরসের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Laughter গ্রন্থে বলেছেন যে, মানুষের যান্ত্রিকতা বা Mechanism, প্রসারণ ব্যর্থতা বা Inelasticity এবং জড়তা ও স্বয়ংক্রিয়তা বা Automatism হাসির উদ্রেকের জন্য দায়ী। বার্গসোঁ আরও জানিয়েছেন যে পুনরাবৃত্তি বা Repetition, বিপরীতরীতি বা Inversion এবং পৌনঃপুনিক ক্রম বা Reciprocal inversion of series হাসির কারণ। মানুষ হাসে কেন ? মানুষ হাসে নিজেকে বড় ভাবে বলে এবং অপরকে অনুকম্পা করে। মানুষ ব্যঙ্গ করে কেন ? নৈতিকতার জন্য মানব জীবন ও সমাজকে শুদ্ধ করার জন্য : অথবা

তার সংগোপনে থাকে ঈর্ষা ও কামনা। মানুষের উচ্চহাস্যের কারণ কি? চিত্তের লঘুত্ব। বিদগ্ধ হাস্য কেন? নিজের শিক্ষাদক্ষতা প্রকাশ করতে। হাসির অন্তরালে এইসব হাস্যকর কারণ পণ্ডিত জন অন্বেষণ করেছেন। তবু হাসির আবেদন কমে না। **Humour Satire Wit Fun Grotesque** ইত্যাদি বিচিত্র হাস্যরস সাহিত্যে নিত্যই লব্ধ হয়। হাসির দ্বারাই মানুষ অন্যান্য জীবকুল থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র-চিহ্নিত করে। **Joseph Addison** বলেছেন যে **Man is distinguished from all other creatures by the faculty of laughter.** হাসির মধ্যে স্নিগ্ধতা থাকে, পবিত্রতা থাকে, থাকে হৃদয়ের অম্লান উদ্ভাস। তা জীবনকে সুন্দর সুসমঞ্জস করে। ঔপন্যাসিক **Thackeray**-র মতে **A good laugh is sunshine in a house.** বাংলা উপন্যাসে আমরা হাসির অপরূপ বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ দেখি। বাংলা উপন্যাস কখনো হিউমারের প্রসন্নতায় ঝলমল করে ওঠে, কখনো থাকে স্যাটায়ারের তীক্ষ্ণতা, কখনো উইট-এর ঝকমকে চমৎকারিত্ব অথবা থাকে ফানের উদ্ভট উচ্চকিত প্রকাশ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ আলোচ্য স্রষ্টারা হাস্যরসের কারবারী এবং হাস্যভাবের বিভাবানুভাবব্যভিচারীসংযোগাদ রসনিষ্পত্তি ঘটান। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি"। বক্রভাষণ ও বক্রদর্শনের সঙ্গে জীবনের প্রতি সমাজের প্রতি মানুষের প্রতি একটা গভীর ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ আলোচ্য লেখকদের রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং সেজন্যই বাংলা সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে তাঁদের চিরকালের আসন পাতা।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯১১) ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের বা Satire-র নিপুণ স্রষ্টা। **How terrible a weapen is satire in the hand of a great genius (Colley Cibler).** হাস্যরসের এক বিশেষ রীতি স্যাটায়ার যা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রবল আঘাত করে তাকে আহত বিপর্যস্ত করে তোলে। হাস্যরসের প্রবল উৎসারণে সে টালমাটাল হয়ে পড়ে এবং তীব্র সূচীমুখ ব্যঙ্গের আক্রমণ তার বুকে ঘটায় রক্তক্ষরণ। অকারণ আঘাত-আক্রমণ নয়, সামাজিক নিয়ম নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করাই যথার্থ ব্যঙ্গশিল্পীর উদ্দেশ্য জীবনের ভ্রান্তি, অসংগতি, ভাবনার অন্তঃসারশূন্যতা, বোধের বিকৃতিকে আমূল উৎপাটিত করে সুস্থ ও স্বস্থ সমাজব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি প্রয়াসী হন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই সত্য প্রতিপাদনে ব্রতী ছিলেন। পাঁচুঠাকুর যে বঙ্গবাসীর জন্য পঞ্চানন্দীয় রঙ্গব্যঙ্গের আসর সাজিয়ে ছিলেন তা রসিক জনের কাছে উপাদেয় হয়েছিল। তাঁর আক্রমণ তীব্র ছিল 'কল্পতরু' (১২৮১) 'ক্ষুদিরাম' (১২৯৪) উপন্যাসে। 'কল্পতরু' বাংলায় প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাস' - এ মত ব্যক্ত করেছেন ডঃ সুকুমার সেন এবং প্রথম আবির্ভাব মাত্রই গ্রন্থটি যেভাবে সমাদৃত হয়েছিল তা বিস্ময়কর ; বিশেষ উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তিবাচক মূল্যায়ন যা এখন আমাদের কাছে অভাবনীয় বলেই মনে হয়।

'কল্পতরু' উপন্যাসে আক্রমণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নরনারীরা। তৎকালীন নব্যহিন্দুসমাজের প্রবক্তারা সনাতনী হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের কালে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেতে পারেন নি ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাকে। ব্রাহ্ম স্ত্রী-পুরুষের প্রচলিত হিন্দুসংস্কারবিরোধ। ও অনেকটা পাশ্চাত্যআদর্শতাড়িত রীতিনীতি আলাপআচরণ জীবনচর্যা ইন্দ্রনাথের বিরাগ উদ্রেক করেছিল এবং 'কল্পতরু'-তে তরুণ ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথকে তিনি আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য বিকারগ্রস্ত দুর্নীতিপরায়ণ ভণ্ড চরিত্রগুলিও তার আক্রমণ এড়াতে পারেনি। অন্যকে বিপথগামী করতে সদা তৎপর শঠ প্রতারক রামদাস পরোপকারের ছদ্মবেশে পরকে শোষণ করে স্বার্থ উদ্দেশ্য সাধনপটু গবেশচন্দ্র, নীচ-প্রবৃত্তির পোষক কদাচারী বৈষ্ণব বাবাজী ও তার বৈষ্ণবী—সকলকেই লেখক তীব্র আঘাতে জর্জরিত করেছেন। মানবচরিত্রের এইটি বিচ্যুতি অসংগতির চিত্রকে তিনি অতিরঞ্জনস্ফীত আতিশয্যমণ্ডিত করে তুলে ধরেছেন। 'এই সকল চিত্র প্রকৃতিমূলক কিন্তু তাহাদের কার্য আত্যন্তিকতা বিশিষ্ট। যে যাহাতে উপহাসের বিষয়, রহস্যলেখক তাহার সেই প্রবৃত্তিঘটিত কার্যকে আত্যন্তিক বৃদ্ধি দিয়া চিত্রিত করেন। এ আত্যন্তিকতা দোষ নহে এটি লেখকের কৌশল। এই গ্রন্থে বিবৃত সকল কার্যই আত্যন্তিকতা বিশিষ্ট। গ্রন্থে এমন কিছুই নাই, যে আত্যন্তিকতা বিশিষ্ট নহে। মনুষ্যহৃদয়ের সদগুণের পরিচয় লেখকের অভিপ্রেত নহে। যাহা তাহার অভিপ্রেত, তাহাতে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন বলিতে হইবে (বঙ্কিমচন্দ্র)।

'ক্ষুদিরাম' (১২৯৪) ঠিক উপন্যাস নয়, কয়েকটি কাহিনীর শিথিল গ্রন্থন মাত্র, লেখকের ভাষায় এই গ্রন্থটি 'উপন্যাস নহে, গালগল্প'। ব্রাহ্মধর্ম ও জীবন যাপনের নতুন বাধন-ছিন্ন রীতি এখানেও ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম, স্ত্রী স্বাধীনতা ও নিরঙ্কুশ প্রেমচর্চায় ও জীবনচর্যায় বিশ্বাসী চরিত্রগুলির আপাতপ্রশংসার ছলে তাদের নির্মম আক্রমণ করেছেন শ্লেষের মাধ্যমে। বর্ণনাভঙ্গীর রসোচ্ছলতা উদ্ভট ও বীভৎস কৌতুকময়তা কখনো প্রবল হয়ে উঠেছে যেমন নারী-পুরুষের সমানাধিকারের যুগে প্রসববেদনার ভার স্বামীর গ্রহণ করার দাবি ও তজ্জনিত আন্দোলন ইত্যাদি। তবে ইন্দ্রনাথের হাসির অন্তরালে স্বদেশ ও সমাজের প্রতি প্রবল অনুরাগই প্রকাশিত হয়েছে বলে অনেকের স্থির বিশ্বাস। সাহিত্য-সাধক চরিতমালাকার এ বিষয়ে বলেছেন—

"ইন্দ্রনাথের শ্লেষবাণ উদ্দেশ্যহীন ছিল না। কেবল হাসাইবার জন্য তিনি হাসাইতেন না। তাহার হাসির নিম্নস্তরে ধাবমান দীর্ঘশ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিত। তাহার হাসির হলহলার মধ্যে শোকের সকরুণ রোদন ধ্বনি শুনা যাইত। দেশের দুঃখ ও সমাজের অধোগতি দেখিয়া রোদনে কুলাইত না বলিয়া তিনি হাসিতেন তাহার 'ক্ষুদিরাম' পুস্তিকায় এই শ্মশানের বিকট হাস্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ক্ষুদিরাম যে পড়িতে জানে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবে অথচ উহার শব্দচাতুরী এমনই অপূর্ব, উহার ভাব ও ঘটনাবিন্যাসকৌশলে এমনই অসামান্য যে, এক এক স্থানে পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করা যায় না।"

ইন্দ্রনাথের কাহিনী শিথিল এলায়িত, গল্পের গ্রন্থন দৃঢ় নয়, ঘটনা অতিরঞ্জিত, চরিত্রগুলিও চড়া রঙে আঁকা, সুরুচি সংযমের অভাবও অনেকসময় প্রকট হয়। তবু সমাজসংস্কার প্রাবল্য ও আদর্শের প্রকাশ, ধর্ম ও সভ্যতার রক্ষণপ্রয়াস তাকে মূল্য দিয়েছে। বিভিন্ন রচনায় 'বৈঠকী মেজাজের সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গের রশান চড়িয়ে ছোট ছোট তীক্ষ্ন মন্তব্য সাজিয়েছিলেন তিনি' এবং 'তরল কৌতুকরস সৃষ্টির বিশেষ ক্ষমতা' (ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর প্রকৃতই ছিল। তাঁর মন্তব্য ও বর্ণনার মধ্যে যথার্থ প্রহসন ও কৌতুকশিল্পীর পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'কল্পতরু' থেকে কটা নিদর্শন দেওয়া যায়। যেমন অতুলের বাড়ীর সম্মুখে অপেক্ষমান নরেন্দ্রনাথ 'আস্তাবলে ঘোড়ার মত মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন' রেলগাড়ীর বর্ণনা 'রেলের গাড়ীর সহিত শূকরীর বহুলাংশে সাদৃশ আছে। উভয়েই একগুঁয়ে; বেগে দৌড়িয়া যায়, এবং যাইবার সময় সম্মুখ ভিন্ন পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপও করে না, এবং অভিমুখ পথের এক পাও এদিক্ ওদিক্ ব্যতিক্রম করে না। তদ্ভিন্ন একবার মাত্র প্রসব করিলে উভয়েই এক একটি ষষ্ঠীদেবীর প্রতিপালন করিতে পারে'। অথবা সাক্ষ্য দিতে যাওয়া নরেন্দ্রনাথের বর্ণনা 'তাহাকে ডাকিবামাত্র, তিনি সেই গোল ঠেলিয়া, আজিমগঞ্জ রেলওয়ে গতিতে, সাক্ষীর আসনে গিয়া দাঁড়াইলেন'। এসব বর্ণনা শতাব্দীশেষেও সমান আকর্ষণীয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৪৪—১৯০৫) অনেকটা ইন্দ্রনাথের আদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' বেশ কয়েকটি খণ্ডে আত্মপ্রকাশ করে ১ম ভাগ ২৯.৭.১৮৮৬, দ্বিতীয় ভাগ ১.১০.১৮৮৬, ৩য় ভাগ ১ম অংশ ২৫.৬.১৮৮৭ ও ২য় অংশ ১০.১০.১৮৮৭ ৪র্থ ভাগ ১২৯৫ সালে। ১২৯৭ সালে চারভাগ একত্রে প্রকাশিত হয়। 'চিনিবাস চরিতামৃত'-র প্রকাশ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে। 'নেড়া হরিদাস' ১৯০১-এ প্রকাশ পায়। 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র প্রকাশ কাল ১৯০২।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যরচনার অন্তরালে এক উদ্দেশ্য আছে, তা হল সদ্ধর্মস্থাপন। এবং বক্তব্য প্রকাশের জন্য তিনি অবলম্বন করেন ব্যঙ্গের পথ। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "যোগেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় ছিল, তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদের ধর্ম্মে ভেল, আমাদের কর্ম্মে ভেল, আমাদের সমাজ-সংস্কারে ভেল, আমাদের সাহিত্য সাধনায় ভেল, আমাদের ব্যবসায় বাণিজ্যে ভেল আমাদের বিজ্ঞাপনে ভেল, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে ভেল, আমাদের দেশহিতৈষণায় ভেল। তাই তিনি সাহিত্যগুরু ইন্দ্রনাথের ন্যায়, এই ভেল নিবারণের জন্য, এই ভেল উড়াইবার পুড়াইবার তাড়াইবার ছাড়াইবার জন্য সুতীব্র বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেন।' সমাজ সংস্কারই যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য তা নিশ্চয়। নতুন ভাবে গড়ে ওঠা অন্ধ সাহেবীয়ানায় মত্ত বঙ্গ সমাজ এবং হিন্দুধর্মের দূষক ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবর্গ তার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হলেও সমাজের সর্ববিধ পাপ, দুর্নীতি দূরীকরণেই যে সচেষ্ট ছিলেন তিনি, তা অনস্বীকার্য।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রকৃতপক্ষে ছিল হিন্দু সমাজের মুখপত্র; তবে, খাঁটি বাঙালীয়ানার প্রতি নিষ্ঠা এতে আন্তরিকভাবে রূপ পেয়েছে।

ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মের পরিণাম কুরীতি ও কদাকারকে এই পত্রিকায় ব্যঙ্গ করা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপাদিত হয়েছে হিন্দু ধর্মের মহিমা ও প্রকৃত বাঙালীত্বের আদর্শ। বিশেষ উল্লেখ্য এই যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' (১৯০২) প্রথমে সংক্ষেপে বঙ্গবাসীতেই প্রকাশিত হয়। "যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইন্দ্রনাথের সাহিত্যশিষ্য। তবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় ইন্দ্রনাথের স্বাচ্ছন্দ্য নাই। রস কিছু যে নাই তাহা নয়, তবে মাত্রাধিক্যে তাহা প্রায়ই বিরস। চরিত্রচিত্রণে অতিশয়োক্তি না থাকিলে ইঁহার উপন্যাস-কাহিনী সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে মর্যাদা পাইত' (ডঃ সুকুমার সেন)।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উপন্যাসসমূহ উপর্যুক্ত ভাবনাসমূহের প্রতিপাদনে ব্রতী। তিনি স্যাটায়ার ক্যারিকেচারের দ্বারা তীক্ষ্ণ আঘাত ও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তার 'মডেল ভগিনী' 'কালাচাদ', 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'নেড়া হরিদাস' 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি উপন্যাসের বঙ্গসাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। "ইহারা ঠিক উপন্যাসের গঠন বা আকৃতির অনুবর্তন করে না মন্তব্য, ধর্ম ব্যাখ্যা, নীতি প্রচার, অতিপ্রাকৃতের অবতারণা প্রভৃতি নানা উপাদানের মধ্যে উপন্যাসের বাস্তবচিত্রণ ও চরিত্রবিশ্লেষণ সসংকোচে একটু সঙ্কীর্ণ অধিকার করিয়া আছে' (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপন্যাসে পিকারেসকীয় প্রভাব থাকলেও তা অতিশয্য ও বাহুল্যের মধ্যেও একটা সত্যকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয় এবং উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যেই নিজেকে সংবৃত রাখতে প্রয়াসী হন। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এলায়িত শিথিল-বিস্তার বৃহদাকার উপন্যাসগুলি (যেমন জেমস জয়েসের Ulysses) যদি পাঠকের অনুমোদন লাভ করে যোগেন্দ্রচন্দ্রও নতুন বিচার বিশ্লেষণের প্রত্যাশী হতে পারেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেল ভগিনী' ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য বিশিষ্ট চিহ্নিত হয়ে আছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দু ধর্মের গভীর ব্যাখ্যা ও মহিমা প্রচার। ধর্মের সংকীর্ণতা ও অন্ধত্বও লেখকের আক্রমণের বিষয় হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা কমলিনীর চিত্রণে লেখক দক্ষতা দেখিয়েছেন তার অতিশয্য ছলনা প্রেমাভিনয় রঙ্গ-বিলাসের যথাযথ চিত্র পাওয়া যায়। অবশ্য বুদ্ধি-[illegible] পুত্তলিকার হৃদয় [illegible] উন্মোচিত হয়েছে তবে শেষ অংশে তার প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা এই আকর্ষণীয় চরিত্র ও তার শিল্পিত প্রকাশকে বেশ কিছুটা ব্যাহত করে। তার স্বামী রাধাশ্যাম ধর্মাদর্শে সহজ জীবনবোধে স্বাভাবিকত্বে বাস্তব হয়ে উঠেছে প্রেমিক কৈলাসচন্দ্রও পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কাহিনীতে হাস্যরসের অতিরঞ্জন ও আতিশয্য প্রচুর হলেও কখনো কখনো স্থূলত্ব ও রুচিবিকার বিরক্তির উদ্রেক করে।

'নেড়া হরিদাস' গ্রন্থে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা বন্ধ করার প্রয়াস এবং প্রকৃত ধর্ম সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আছে। গ্রন্থের মুখবন্ধে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে

"নেড়া হরিদাস বর্তমান শতাব্দীর শ্রীমদ্ভাগবত পাষণ্ডদলনের নিমিত্ত, এবং জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রকাশিত।

অপধর্ম্ম-পাপাগ্নিতে যে সকল পতঙ্গ পড়িয়া দগ্ধ হইতেছে, সেই পতঙ্গকুলকে দিন থাকিতে সতর্ক করাই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

রসসাহিত্যের অনন্যস্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৭—১৯১৯) শতাব্দীর অতিক্রান্ত প্রহরেও সমান উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছেন। বহু বিচিত্র দর্শন ও অভিজ্ঞতায় আকীর্ণ ছিল তাঁর মন। দুঃখ পেয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন, একমুঠো অন্নের জন্য প্রাণ হয়েছে ওষ্ঠাগত —ম্যাক্সিম গোর্কীর মত পৃথিবীর পাঠশালা থেকে চরম তিক্ত সত্য অর্জন করে তাকে মহৎ শিল্পে উদ্বর্তিত করেছেন। তিনি উদ্ভট রসের সাধক হাস্যরসকে অদ্ভুত বিস্ময় ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করে সম্ভব অসম্ভবের সীমাকে অতিক্রম করে কল্পনাকে তিনি অনন্ত প্রসারিত করে তুলেছেন। বস্তুকে অবলম্বন করেও বস্তু হতে সত্যান্তর যে মায়া তারই সৃজনে তিনি তৎপর ছিলেন। উদ্ভট কল্পনা সমন্বিত লৌকিক অলৌকিক ভাবনার সংমিশ্রণে তিনি যে হাস্যরসাত্মক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের কেবল প্রথম নন, অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রূপে পরিগণিত। "প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনার মেশামেশিতে তিনি যে বে-পরোয়া, অকুতোভয় মনোভাব দেখাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার বিশেষত্ব নিহিত। অনৈসর্গিক বিষয়ের অবতারণায় তিনি যেরূপ অজস্র উদ্ভাবন শক্তি ও অকুণ্ঠিত কল্পনা ক্রীড়ার পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই মনস্তত্ত্ব-সমন্বিত বিশ্বাস উৎপাদনের যত্নে অনন্য সাধারণ। ভূত, প্রেত, পিশাচ, জীন, পরী প্রভৃতি অলৌকিক জীবের কল্পনায় তাঁহার মন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল ও তিনি যে কোনও উপলক্ষ্যে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে ইহাদিগকে গাঁথিয়া দিয়াছেন"। জগৎ জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য গভীর বিস্ময়কে উপলব্ধি করতে এই ফ্যানটাসির প্রয়োগ অপরিহার্য। আধুনিক absurd বা অধিবাস্তব তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা Eugene Ionesco এই বোধেই বলেছেন যে 'The true nature of things, truth itself can be revealed to us only by fantasy, which is more realistic than all the realism.' আবার জীবনরসিক শিল্পীর প্রকৃত স্বভাব অনুযায়ী অদ্ভুত উদ্ভটত্বের সঙ্গে দয়াশীলতা ও পরহিতৈষিতার অর্থাৎ মানবিকতার নিবিড় ও নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'কঙ্কাবতী' প্রকাশিত হয় ও ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য সাধনার যথার্থ সূত্রপাত ঘটে—বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়ের উন্মোচন ঘটে। 'কঙ্কাবতী'র প্রথম অংশ সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ এবং দ্বিতীয় অংশ অলৌকিক কল্পলোকের। প্রত্যেক বস্তুর জগতের সঙ্গে বর্ণাঢ্য রূপকথার কল্পিত রাজ্যের সম্মেলন শিল্পীর মহৎ কল্পনাকেই প্রকট করে। ধূলিধূসর মৃত্তিকার ওপর অসম্ভবের সৌধ নির্মাণে লেখক যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছেন তা নিঃসন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ 'কঙ্কাবতী'-র উদ্ভটত্ব অসংগতি অসংলগ্নতার উল্লেখ করেও বলেছেন, "এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধা নিয়ম, কোন চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিনী কল্পনাকে একটা নিগূঢ় নিয়ম পথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার বিষয় বাহ্যত যতই অসংগত ও অদ্ভুত হউক না কেন রসের অবতারণা হইলে তাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য সারল্য তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন,

ইহা তাহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।" ত্রৈলোক্যনাথের 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬) গ্রন্থের রচনাগুলি বিশেষত 'লুল্লু'ও পরিচিত জগতের সীমানা ছাড়িয়ে অসম্ভব উদ্ভটের রাজ্যে চলে যায়, আমাদের সঙ্গতি পরিমিতবোধকে আঘাত দিয়েও রসচেতনাকে তৃপ্ত করে। আমীর এবং লুল্লু, গোগাঁ ও অন্যান্য ভূতেদের কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মত মনোরম ও আকর্ষনীয়, সহজ লৌকিক কিম্ভূত অলৌকিকের সমন্বয়ে গড়ে তোলে উদ্ভট জগত যেখানে অবিশ্বাস্য ঘটনার সংস্থাপন সকৌতুক বিশ্বাসের উৎপাদন করে। লেখকের সৃষ্ট ভূত সম্প্রদায় মানুষের অনুরূপ হয়ে উঠেছে। জল জমে যেমন বরফ হয় তেমনি অন্ধকার জমে ভূত হয়। ভূতের বেকার জীবন, চাকরী, বিবাহ বাসনা, সভ্যভব্য হবার ইচ্ছা, ঈর্ষা স্বার্থপরতা, সংবাদ সম্পাদক হয়ে ঠিকমত পত্রিকা চালান ইত্যাদির মধ্যে কৌতুকের সঙ্গে বিদ্রূপের খোঁচাটিও নিশ্চিতভাবে অবস্থান করে। খ্যাঁখো ভূতের সঙ্গে নাকেশ্বরীর বিবাহে পৃথিবীর সমস্ত ভূতকে নিমন্ত্রণের কথা হলেও ভারতবর্ষের ধর্ম ও নীতিজ্ঞান সম্পন্ন ভূতেরা ভারতের বাইরের ভূতদের নিমন্ত্রণ করতে রাজী হয়নি কারণ "সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল ভ্রষ্ট হইব"।

ফোকলা দিগম্বর (১৯০১) প্রণয় ও কৌতুকের সমন্বয়ে একটি যথার্থই সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী রচনা হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে নৈতিকতার বিষয় প্রকট হয়নি, আজও তার পরিণাম মসীলিপ্ত চিত্র পায়নি, অলৌকিকেও মেলেনি অতীন্দ্রিয় ছায়া। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পটভূমিকায় স্থাপিত এই ঘটনাপ্রধান উপন্যাসটি (ত্রৈলোক্যনাথের সব কাহিনীর মতই) ঝাঁঝবিহীন তীব্রব্যঙ্গের কটুগন্ধমুক্ত সরস শিল্পিত রূপ পরিগ্রহ করেছে যা সহৃদয় পাঠকচিত্তে অনেকটাই নির্মল কৌতুকোচ্ছল আনন্দের প্রস্রবিনী বইয়ে দেয়।

'ডমরু চরিত' (১৯২৩) ত্রৈলোক্যনাথের শেষ ও অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। কীর্তিমান পুরুষ ডমরুধরের জীবনের বিচিত্র কীর্তিকথার সমন্বয়ে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানে অলৌকিকের প্রতিবেশ নেই, গঞ্জিকার ধুম্রাবরণ নেই, আসরের উন্মত্ত ঝোঁক নেই। সম্ভবের অসম্ভব সীমায় প্রসারিত, বাস্তবের কল্পনার শেষ প্রান্তে অবসিত, জীবনবোধের অলৌকিক প্রত্যন্তে নিহিত ঘটনা ও বিষয় উপন্যাসের অঙ্গীভূত হয়ে বিচিত্র স্বাদের সঞ্চার করেছে। অনন্য চরিত্র ডমরুধর সব কাহিনীর নায়ক ও কথক—তার কৌশল, স্বার্থবুদ্ধি, হৃদয়হীনতা, অপরিসীম লোভ, অবিবেকী মন, পরনারী-আসক্তি, চরিত্রটিকে অনন্য করে তুলেছে। অদ্ভুত ও উদ্ভট ঘটনা তার জীবনে ঘটে এবং সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধ বাতাস শেষ পর্যন্ত তার অনুকূলে চালিত হয়। 'মা জগদম্বা'র কৃপায় সে সর্ববিপদ থেকে মুক্তি পায়—পারিষদ সকাশে কথিত তার বিচিত্র বিস্ময়কর জীবনের কথাগুলি উপন্যাসকে গেঁথে তোলে এবং পাঠকদের হাস্যবেগে উদ্ভাসিত করে তোলে। "এই সমস্ত অসম্ভব-কল্পনা-প্রসূত আখ্যানের মুকুরে ডমরু-চরিত উহার সমস্ত বীভৎসতা, আত্মপ্রসাদ, কূটবুদ্ধি ও ভক্তি-অভিনয় লইয়া আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ডমরুধর পৃথিবীর ব্যঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার সমস্ত দুষ্ক্রিয়াশক্তি ও ঘোরতর নীচ স্বার্থপরতা সত্ত্বেও তাহার

সপ্রতিভতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আপনার সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচ সত্যভাষণের জন্য সে আমাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় না" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। ভাঁড়ু দত্ত তার পূর্বসূরি, ফলস্টাফের সঙ্গে তার আত্মীয়তার বন্ধন, দাদামশাই বীরবল পরশুরামের মধ্যে তার কার্যক্রম ভাবনা নতুন বিস্ময়ে অভিনব প্রত্যয়ে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ দক্ষ ভাষাশিল্পী। ইংরাজী সংস্কৃত পারসী হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ব্রাত্য শব্দেরও প্রয়োগও তাঁর রচনায় বিশেষ দৃষ্ট হয়। গম্ভীর ভাব প্রকাশে তিনি সার্থক আবার নিতান্ত লোকায়ত বক্তব্যও যথাযথ রূপ পেয়েছে তাঁর রচনায়। ব্যঙ্গ কৌতুকের সৃজনে তিনি দক্ষ। ঘটনাস্থাপনা সামাজিক অনৈক্য বিষমতা চারিত্রিক ভারসাম্যহীনতায় হাস্যরস উদ্বেল হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে যেমন তিনি উদ্ভট কৌতুক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু হাসি যখন অস্ত্র হয়ে ওঠে তার মধ্যে তীব্র জ্বালা যেন ঝলসে ওঠে। বর্তমান অংশটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

"ব্যাঙের অপূর্ব মূর্তি। সেই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কংকাবতী বিস্মিত হইলেন। ব্যাঙের মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেণ্টুলেন, ব্যাঙ সাহেবের পোষাক পরিয়াছেন। ব্যাঙকে আর চেনা যায় না। রংটি কেবল ব্যাঙের মত আছে। সাবাং মাখিয়াও রংটি সাহেবের মত হয় নাই। আর, পায়ে জুতা নাই। জুতা এখনও কেনা হয় নাই, ইহার পর তখন কিনিয়া পরিবেন। আপাততঃ সাহেবের সাজ পরিয়া, দুই পকেটে দুই হাত রাখিয়া, সদর্পে ব্যাঙ চলিয়া যাইতেছেন।

এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া, এই ঘোর দুঃখের সময়েও কংকাবতীর মুখে ঈষৎ একটু হাসি দেখা দিল। কংকাবতী মনে করিলেন, 'ইহাকে আমি পথ জিজ্ঞাসা করি'।

কংকাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্যাঙ মহাশয়! গ্রাম কোন দিকে? কোন দিক দিয়া যাইলে লোকালয়ে গিয়া পৌঁছিব'?

ব্যাঙ উত্তর করিলেন, 'হিট্ মিট্ ফ্যাট্'।

কংকাবতী বলিলেন— 'ব্যাঙ মহাশয়! আপনি কি বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভাল করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কোন দিক দিয়া যাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়'?

ব্যাঙ বলিলেন —'হিশ্ ফিশ্ ড্যাম্'।

কংকাবতী বলিলেন—'ব্যাঙ মহাশয়! আমি দেখিতেছি,—আপনি ইংরেজী কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজী পড়ি নাই, আপনি কি বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া যদি বাঙ্গালা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি'।

ব্যাঙ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, কেহ কোথাও নাই। কারণ, লোক যদি শুনে যে, তিনি বাঙ্গালা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার জাতি যাইবে, সকলে তাহাকে 'নেটিব' মনে করিবে। যখন দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই, তখন বাঙ্গালা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।

অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে ব্যাঙ বলিলেন '…দেখিতেছিস, আমি সাহেব ! তবু বলে, ব্যাঙ মশাই, ব্যাঙ মশাই ! কেন ? সাহেব বলিতে তোর কি হয় ?…কেন ? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় না কি ? আমাব নাম। মিষ্টার গমীশ'।

বাঙালীর উগ্র ইংরাজীআনাকে যেমন ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিদ্ধ করা হয়েছে তেমনি গোঁড়া স্থবির প্রাচীন পন্থী সমাজ ব্যবস্থাও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। 'ডমরু-চরিত'এ যম বলিলেন—"ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা করিলে এখন মানুষের পাপ হয় না, অশাস্ত্রীয় খাদ্য খাইলে মানুষের পাপ হয়।…গোমাংস, মেষমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, গাধামাংস, ছাগমাংস, উষ্ট্রমাংস ও মৃগমাংস—এই অষ্টবিধ মাংসকে মহামাংস বলে।…মন্ত্রে সংশোধন করিয়া লইলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও এই সমুদয় মাংস ভক্ষণ করিতে পারে।" কিন্তু একজন লোক জীবনে অনেক পুণ্যের কাজ করলেও ভ্রমক্রমে একাদশীর দিন পুঁইশাক খেয়ে ফেলেছে। সে কথা শুনে "যমের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—সর্বনাশ ! করিয়াছ কি ! একাদশীর দিন পুঁইশাক ! ওরে ! এই মুহূর্তে ইহাকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ কর ! ইহার পূর্ব পুরুষ, যাহারা স্বর্গে আছে, তাহাদিগকেও সেই নরকে নিক্ষেপ কর। পরে ইহার বংশধরগণের চৌদ্দপুরুষ পর্যন্তও সেই নরকে যাইবে"। এরূপ তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ ভণ্ড ভ্রষ্টাচারী সমাজের মর্মমূলকে বিদ্ধ করে যেন রক্তক্ষরণ ঘটায়।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩—১৯৪৯) সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমানা বিশেষ প্রসারিত করেন নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং বহির্ভারতে তাঁর যাতায়াত হলেও সাধারণ বাঙালীর সহজ জীবনচর্যাকেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন। এমন কি উচ্চ বা মধ্যবিত্ত নয়, নিতান্তই বাংলার করণিক সমাজই হয়েছে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা। 'কলিকাতার আশেপাশের কেরাণীকুলকেই তিনি সাহিত্যে নবজন্ম ও নূতন মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা হাস্য-পরিহাস লইয়াই সাহিত্যের রেল-পথে তাহার ডেলি-প্যাসেঞ্জারি এবং ক্যানভাসারি' (শনিবারেব চিঠি)।

অভিনয় কাব্য, রসকবিতা, ভ্রমণ সাহিত্য, লিপি-চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন রীতির রচনায় কেদারনাথের সৃষ্টি বিকশিত। সরস মাধুর্যমণ্ডিত উপন্যাসও তিনি নিয়েছেন। কোষ্ঠীর ফলাফল (১৯১৯), ভাদুড়ী-মশাই (১৯৩১), আই হ্যাজ (১৯৩৫) প্রভৃতি উপন্যাসও অনেক কেদারনাথের রসস্নিগ্ধতার উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে। অতি সাধারণ বাঙালী জীবনের হাসি-কান্না, আশা-আনন্দ, প্রত্যাশা-বিফলতাকে চিত্রিত করেছেন ব্যঙ্গকৌতুকে ও সহানুভূতি-সমবেদনায়। ভাববৈচিত্র্যে ও গভীরতায় তাঁর এই জাতীয় রচনাগুলি আস্বাদ্যমানতায় একান্ত হয়ে উঠে। তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি যেন হাসি করুণা বিদ্রূপ ও বেদনার বিচিত্র রামধনু।

কেদারনাথের রচনার ভাষা অনেকটাই সরল, প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও আছে সহজ অনাড়ম্বর বিন্যাস। তিনি কলকাতাতে থাকতেন—সহরের উত্তরপ্রান্তের নাগরিক রীতি বিশেষত উত্তর কলকাতার কথ্যভাষার ঢঙ তাঁর রচনায় ছাপ ফেলেছে। হিন্দী শব্দ ও বাকরীতির প্রয়োগও তাঁর রচনায় প্রায়শই দেখা যায়। ভুল হিন্দী বলা বাঙালীর উক্তি

এবং ভাবভঙ্গী হাস্যরসকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। ইংরাজী বিকৃত উচ্চারণ ও বাক্য প্রয়োগ দ্বারাও তিনি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিকৃতিও সেখানে ধরা পড়ে। যেমন 'আই হ্যাজ' উপন্যাসে বিচক্ষণ সাবজজ রায় বাহাদুর হরগোবিন্দবাবু ইংরাজীতে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছেলে ননীগোপালকে নিয়ে গেলেন ছোটলাটসাহেবের কাছে—

প্রথমে নিজে ঢুকে ভূমি স্পর্শ করে সেলাম জানালেন—আপনাদের কৃপায় ছেলে এবার এম. এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে Ist class Ist হয়েছে। সে সঙ্গে এসেছে, হুজুরের কাছে Deputy mountainship-এর জন্যে ভিক্ষাপ্রার্থী। লাটসাহেব ছেলেকে দেখতে চাইলেন। সে দোর গোড়াতেই ছিল। বাপের কথা তার কানে যাচ্ছিল আর মুখ-নাক চোখ বিষম কোঁচকাচ্ছিল—হরগোবিন্দবাবু তাকে ডেকে এনে লাটকে দেখিয়ে বললেন—

It is I son Sir.

লাটসাহেব বললেন—It is you son Haragobind,—very very good. I shall see he gets Deputy mountainship.

হরগোবিন্দ সেলাম করে বললেন—'Your see' and 'our done' same thing, my lord.

ছেলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে লাল মারছিল আর ঘামছিল। বেরিয়ে এসে বাঁচলো। তার রুষ্ট বিরক্ত মুখ দেখে বাপ বললেন—

'যদি হয় তো ওই I son-এই হবে। তুই তোর ছেলের বেলায় my son বলিস। তাতে চাপরাসিগিরিও জুটবে না'।

আত্মকথায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য সৃজনের আদর্শ সম্বন্ধে বলেছেন —"কি লিখব? আমার লেখা পড়বেই বা কে এবং কেন? উপদেশাত্মক কথা—সার্মন নিজেরই ভাল লাগে না, দেশে তার অভাব নেই।…কি লিখি? শেষে অনেক ভেবে জীবন ও সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি যথাসম্ভব হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করবার পথ খুঁজি, তাতে যদি পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি পাই।…মধ্যবিত্ত ভদ্রদের ও ভদ্রপরিবারের কষ্টের জীবন আমাকে চিরদিনই বেদনা দিয়েছে ও দেয়, বিশেষ মহিলাদের দুঃখের জীবন, যা অন্তরে চেপে প্রসন্ন মুখে নীরবে তাঁরা বহন করে চলেছেন ও চলেন। দুঃসাহসের কাজ হলেও আমাকে তা হাসির আবরণে বলে যেতে হয়েছে।… কল্পনার উপর নির্ভর করিনি। গরীবদের লোক গরীব বলে এবং ধনীদের ধনী বলে জানে, মধ্যবিত্তদের সে আশ্রয় নাই, বাঁচোয়াও নাই। 'দেনা' আর 'উঠ্‌নোই' তাদের মা-বাপ"। তবে কৌতুক ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও তিনি সিদ্ধহস্ত—সমাজ-সচেতন শিল্পী তো উদ্দেশ্যহীন সৃজনে বিশ্বাস করেন না।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩—১৯৭৮) বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র-চিহ্নিত শিল্পী। হিউমারের উদার প্রসন্ন মাধুর্য তাঁর গল্প-উপন্যাসে সর্বদা পাওয়া যায় না, স্যাটায়ারের শাণিত তীক্ষ্ম বিদ্বেষও সেখানে নেই, ফ্যান্টাসির উদ্ভট অভিনবত্ব তাকে দুরান্বয়ী

রহস্য ও বিস্ময়ে দ্যোতিত করে নি, ফানের বিপুল কৌতুকও সেখানে প্রবল আতিশয্যে উদ্‌গীর্ণ হয় নি। তবু শিবরামের গল্প উপন্যাসে এর সবগুলিই যেন অন্তর্নিহিত হয়ে হাস্যরসের প্রবাহকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। শিবরাম চক্রবর্তীর রচনায় বিশেষ করে পাওয়া যায় বাক্‌রূপের চমৎকারিত্ব ও বৈদগ্ধ্য বা Wit যার মধ্যে বুদ্ধিমার্গীয় মনস্বিতার প্রকাশ আছে। তাঁর গল্প উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধিকতার সাযুজ্যকরণ যার দ্বারা তিনি সমাজবোধ ও মানবিক প্রত্যয়কেই ব্যক্ত করেছেন। বাইরে এত হাসি কিন্তু অন্তরে কখনো নিবিড় হয়ে থাকে সজল বেদনা যা জীবনেরই ধর্ম। উইট-নিপুণ শিবরামের রচনা পড়তে গিয়ে মনে পড়ে বিদগ্ধজনের কথা। Lord Chesterfield একদা বলেছিলেন -'If you have wit use it to please, and not to hurt' কিংবা আরো নিবিড়ভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথে—"কৌতুক জিনিষটা কিছু রহস্যময়।...অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রু জলে পরিণত হইতে থাকে।" কথার লঘু মারপ্যাঁচের সঙ্গে চোখ ধাঁধানো শব্দের অসি ক্রীড়া, তির্যক কৌতুকবোধের সঙ্গে অর্তাদ্দৃত বিচারবুদ্ধি, লঘু কৌতুকের অন্তরালে হৃদয়ধর্মের ক্বচিৎ উদ্ভাস শিবরামের রচনায় এনেছে বিরল স্বাদ।

এটা শিবরাম চক্রবর্তীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিবরাম চক্রবর্তী হাস্যরসের স্রষ্টা রূপেই বিশেষ চিহ্নিত কিন্তু তাঁর হাস্যরসের অন্তরালে জীবনের গভীর বেদনা, সুতীব্র মর্মদাহ বিরাজ করছে। তাঁর হাসির কাহিনীর অন্তরালে কত অশ্রুজল নিবিড় হয়ে থাকে সহজে বোঝা যায় না। প্রেমেন্দ্র মিত্র যে বলেছেন, 'কার চোখে কত জল কে বা তা মাপে' শিবরামের সাহিত্য-সাধনায় তা আশ্চর্যভাবে বোঝা যায়। আগে অনেক লিখলেও মৌচাকের জন্য সুধীর সরকারের কাছ থেকে দাবী করে প্রথম টাকা চেয়ে ও পেয়ে তাঁর যে মানসিক অনুভূতি হয়েছিল সেই প্রকাশ তীব্র ও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে—"টাকাটা পেতেই না, আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন হেসে উঠল তক্ষুনি। সেই হাসিই ক্রমে বন্যার আকার ধরে আমার আগেকার সব লেখাপত্তর ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে হাসির গল্প হয়ে দেখা দিয়েছে তার পরে...বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, শিশু সাহিত্যেও প্রথম নয় নিশ্চয়, কিন্তু আমার হাতে প্রথম হাসির গল্প ছিল সেইটাই" (ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, ১৯৭৪)। ক্ষুধাতুর অন্নকাতর অসহায় একটি ঘোড়ার কাহিনী প্রকৃতপক্ষে লেখকেরই নিষ্করুণ জীবন চিত্র। গল্পটার নাম 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ'। লেখকের কথিত কাহিনী স্মরণ করা যাক। গরীব পঞ্চাননের একটা বেতো ঘোড়া ছিল। পঞ্চানন তাকে বেদম খাটাত কিন্তু খেতে দিতে পারত না। খিদের জ্বালায় ঘোড়াটা ছটফট করত—তেলেভাজা থেকে শুরু করে টর্চ লেপতোষক মশারি যা পেত তাই সে খেত। পঞ্চানন ঘোড়াটা বিক্রী করে দেয় গাঁয়ের মোড়লকে। একদিন মোড়ল সেই ঘোড়ায় চেপে হাকিম সাহেবের কাছে গেল। সেখানে হাকিমের ঘোড়ার সঙ্গে তাকেও দানাপানি দেওয়া হল। সেই সব বাদাম ছোলা ইত্যাদি ঘোড়াটা কোনদিন চোখে দেখেনি, চেখে দেখা তো দূরের কথা। এই সব দেখে সে বেচারা খাওয়ার বদলে

আকাশের দিকে মুখ করে হাসতে শুরু করল—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। খাবে কি, খাবার দেখেই তার চক্ষুস্থির! সে আত্মহারা! মর্মভেদী হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসতে হাসতেই বেচারা শেষ পর্যন্ত মারা গেল। এটাই হল গল্প। তারপর লেখকের মর্মভেদী স্বীকারোক্তি—"আসলে সেই ঘোড়াটা আর কেউ না, এই আমিই।…সেই ঘোড়ার হাসি, লিখে প্রথম টাকা পাওয়া আমার সেই গোড়ার হাসিই তারপর আমার সব গল্পে আমদানি —আমার সব লেখাতেই ছড়িয়ে যাওয়া এখন অবধি। আগাগোড়া একই হাসাহাসির ব্যাপার।"

শিবরাম চক্রবর্তী শব্দের যাদুকর, কথার তরবারি খেলায় নিপুণ—তিনি যথার্থই বাক্‌শিল্পী। তিনি বলেছেন—"কথার খেলাকে নিতান্ত খেলার কথা ভাববেন না। শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ব্রহ্মের রহস্য কী, আমি জানিনে, কিন্তু শব্দদের চিরদিনই আমার রহস্যময় মনে হয়। একেকটি word যেন একেকটি world। তার মন নিয়ে, মনন নিয়ে স্বতন্ত্র এক একটি শব্দ, প্রায় মন্ত্রের মতই, কেবল যে তার অর্থের সহিতই জড়িত তাই নয়, তার মধ্যে একাধিক অর্থ, বিচিত্র রস, আশ্চর্য দ্যোতনা, সব উহ্য থাকে। এক স্বরে একাধিক ব্যঞ্জনা, এক ব্যঞ্জনায় একাধিক স্বর। ভাবলে অবাক হতে হয়। এক কথার পানজনায় অর্থবহ একাধিক বাক্যের ব্যঞ্জনা। অবাক হয়ে ভাববার। শব্দরূপ, শব্দরস আর শব্দতত্ত্ব -সব মিলিয়ে পরম রহস্য। আমি হয়ত চেয়েছিলাম তাই দিয়ে জগন্নাথের ভোগ বানাতে। জগন্নাথ মানেই জগজন।" তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' থেকে উদ্ধৃত এই কথায় শিবরামের ভাবনা সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর pun কেবল শব্দগত নয় ভাবগতও বটে। চার্লস ল্যাম্ব 'পান'কে কোন কোন সময়ে পছন্দ না করেও বলেছেন যে, 'A pun is a noble thing per se. It fills the mind; it is as perfect as a sennett; better.' শব্দ প্রকাশের এই সহজ অনায়াস মহৎ রীতি, এই শঙ্খধ্বনি শিবরামের রচনায় দেখা যায় তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে জগজনের চেতনা অর্থাৎ সামাজিক বোধ। এই বিশেষ ভাবনাটি হাস্যকৌতুককর ফেণোচ্ছল তরঙ্গভঙ্গে অনেক সময় হারিয়ে যায়। শিবরাম জানিয়েছেন এই উপন্যাসেই—"যথার্থ সাহিত্যিক, আমার ধারণায়, তাঁর নয়া সাহিত্য সৃজনের সাথে, নতুন সমাজও সৃষ্টি করে থাকেন, সমাজব্যবস্থা পালটে দেন, সময়ের ধারা বদলে দিয়ে যান। যেমন রুশো, ভলটেয়ার, গোর্কি, সিনক্লেয়ার, ইবসেন ইত্যাদি। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল আর সুকান্ত" (ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা)। শিবরামের 'মস্কো থেকে পণ্ডিচেরী' প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থে, 'যখন তারা কথা বলবে' প্রভৃতি নাটকে, 'ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা' প্রভৃতি উপন্যাসে এই সত্যের প্রতিপাদন আছে।

শিবরামের 'মনের মত বৌ' চতুষ্কোণ প্রেমের চতুরঙ্গ খেলা। এদের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন "মনের মত বৌ অনেকটা উপন্যাস জাতীয়"। কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি মাত্র যারা মূল কাহিনীর সঙ্গে অনিবার্যভাবে গ্রথিত হয় নি। অনুরূপ-মনোরমার প্রথম মিলনের কাহিনী অত্যন্ত জমাটি, এবং তাদের শেষ

পরিণতির কথা—প্রথম জীবনের আকর্ষণীয় প্রেমভরা মনোরমার পরবর্তীকালে ভয়ংকরীরূপে আবির্ভাব—উভয়ত হাস্যকর ও বেদনাদায়ক। দাম্পত্য সম্পর্কের যে প্রেমপ্রীতি বর্জিত নির্মম ধ্বংসব চিত্র বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় অঙ্কিত হয়ে মানবজীবনের এক শোচনীয় অবস্থাকে তুলে ধরে শিবরামের রচনায় ব্যঙ্গকৌতুকের মধ্য দিয়ে তাই প্রস্ফুটিত হয়েছে যদিও হাস্য পরিহাসের মধ্যে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের ভয়ানক পরিণতির বিষয়টা অপ্রত্যক্ষ থাকে না। মানব জীবনের এ এক দুর্বার অভিশাপ। মনের মত বৌ এর প্রারম্ভিক পংক্তি সমূহে উজ্জ্বল অনুকরণীয় শিবরাম জানাচ্ছেন—"প্রয়োজনের সীমা পাব হয়েই প্রিয়জনের সীমানা। প্রয়োজন এবং প্রিয়জন চিরাচরিত দ্বন্দ্ব ভুলে একটিমাত্র জায়গায় এসে এক হয়েছে—একমাত্র ভার্যায়। "প্রয়োজনের 'ভাব' এবং প্রিয়জনের 'আব যা' মিলে মিশে এক হয়ে যে ভার্যা, তাকে মনের মত করে পাবার ইচ্ছা কার না ?" (মনের মত বৌ, বসুমতী, ১৩৬২)। But what is woman ?—only one of Nature's agrreable blunders—এ কথা জানিয়েছেন Hannah Cowley আর এক ইংরেজ মহাজন George Granville আরো একটু এগিয়ে বলেছেন—Of all the plagues with which the world is cursed of every ill, a woman is the worst "প্রকৃতির সৃষ্টি ফুল ক্রমে ভুল হয়ে জীবনে হুল ফোটায়, কিন্তু সেই মারণ যন্ত্রকেই তাবণ মন্ত্র পড়ে মানুষ বরণ করে। সে শেষকালে তার কলে শেষ হবার সময় বোঝে যে পবিণয় কবা নারী আদৌ পরী নয এবং প্রায়শ চিত্ত চাইলেও প্রায়শ্চিত্ত করার আর তখন উপায় থাকে না"।

'রক্তের টান' (গ্রন্থাবলী, বসুমতী, ১৩৬২) ফিল্ম কাহিনী। শিবরাম জানাচ্ছেন ভূমিকায় যে "শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীর সঙ্গে সংলাপাংশ জুড়ে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই উপন্যাস"। একটা বাচ্চা মেয়ে ও কলকাতাবাসিনী প্রায় বাঙালী এক পঞ্জাবী মার কাহিনী। গঙ্গার ঘাটে তার মার কাছ থেকে মেয়ে হাবিয়ে যায়; সে গুণ্ডাদের হাতে পড়ে, পালায়, বস্তিবাসী দুই সহৃদয় মানুষের কাছে আসে ও আশ্রয় পায়; এবং শেষ পর্যন্ত মায়ের সাক্ষাৎ পায়। বাংলায় বিশেষ কবে বিদেশী ভাষায় এরকম কাহিনী অনেক আছে। এই ছোট উপন্যাসটি পরে প্রকাশিত হয় 'পথ থেকে হারিয়ে' (১৩৭৫) নামে যা ঈষৎ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত, এবং পরিণতিও ঘটে আরো সুখপ্রদ আবো মিলনাত্মক। হারানো মেয়ে ভাবিনীকে অনাথ আশ্রমেব সহৃদয় মালিক অনাথ পোষ্য নেয় ধর্ম মেয়ে রূপে। ভাবিনী মা কে বলে—'তা হলে মা, তুমিও ওব ধর্মপত্নী হয়ে গেলে তো'। তার প্রতি অনুরক্ত অনাথের প্রতি মা প্রথম দিকে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হলেও অনাথের উদারতায় ও কন্যাব এই অদ্ভুত মানসিকতা ও দাবীতে মার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। উপন্যাস হিসাবে উচ্চ পর্যায়ের না হলেও শিবরামেব প্রসন্ন অনুভূতি মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং উজ্জ্বল বাকনির্মিতি ও সৃজন রূপের চমৎকারিত্ব 'রক্তের টান'কে মনোরম ও সুখপাঠ্য করেছে।

'প্রেমের পথ ঘোরালো'-কে (গ্রন্থাবলী, বসুমতী, ১৩৬২) লেখক বড় গল্প বলেছেন। এটি পরে 'এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী' (১৩৮২/১৯৭৫) রূপে পরিচিতি লাভ

করে। শিবরামের স্বভাবসিদ্ধ বাকবৈদগ্ধ্য হতে প্রকাশিত হলেও উপন্যাসরূপে এটা মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে নি। প্রেমৈক ভাবনার প্রকাশ থাকলেও হৃদয়ধর্মে জীবনবোধে রচনাটি গভীর হয় নি এবং শিল্প গ্রন্থনের বিচ্যুতিতে উপযুক্ত কলাসিদ্ধি অর্জনে অসফল হয়েছে।

শিবরামের শিল্প তথা উপন্যাস সাধনা পূর্ণতা পেয়েছে 'ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা'য়। এটা একটা মানুষের হয়ে ওঠার কথা, তাঁর অন্তর্জীবনের অকথিত কাহিনী যাতে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে দুঃখবেদনা আনন্দ মাধুর্যের অফুরান বৈচিত্র্য ও বিস্ময় যা প্রজ্ঞানিষিক্ত জীবন-দর্শন ও মানবিক সংবেদনায় অতুলন হয়ে উঠেছে। শিবরামের ভাবনা বাকরীতির বুদ্ধিমার্গীয় চমৎকারিত্বে, শব্দরূপের হীরকদীপ্তিতে বাচনভঙ্গীর তীক্ষ্ণ তির্যকতায় একটা ঋদ্ধ শিল্পমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। 'ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা'য় জীবনবোধ একটা যথার্থই প্রজ্ঞাময় মননদিগ্ধ প্রকাশ পায়—

"জীবনে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। যেমন প্রিয়জনের তেমনি বিরূপজনের। সৌহার্দ্য ভালবাসা বাধাবিপত্তি সব কিছুই জীবনে সত্যি—সব জড়িয়ে মোট মূল্যেই সার্থক।

সবই আমাদের এগিয়ে দেয়—যাত্রাপথের পাথেয় যোগায় সকলেই। কালক্রমেই সেটা জানা যায়। তখনই বোঝা যায় যে, সুবিস্তৃত মহাকালের বুকে নৃত্যপরা মহাকালীর লীলা খেলায় একদিকে যেমন তাঁর মস্ত খড়্গ, অন্যদিকে তেমনই তাঁর অভয়হস্ত। এক হাতে ধৃত যেমন আমার ছিন্নমস্তক, তার কাছাকাছিই অপর হাতে ধরা আমার জন্য তাঁর বরমাল্য

তাঁর এই কালীয়দমন কাণ্ডে সময়-মন্থন তাবৎ হলাহল—জীবনে যা হল আর যা হল না—সব কিছুরই পরম অমৃতায়ন—যথাকালেই জানা যায়। কালক্রমে হতে থাকে। সবলের জীবনেই—কোনো তার ইতরবিশেষ হয় না কখনো।

জীবনের আঁক কষতে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত দেখি, যা নাকি কিছুতেই মেলেনি, যত না গরমিল আর অমিল ছিল, সমস্তই মহাকালের কোলে এসে কেমন করে যেন মিলে গেছে। মাতৃ অঙ্কে এসে মিলে যায় সমস্ত –জীবনের যত আঁকিবুকি সব মিলিয়ে চমৎকার ছবি হয়ে দাঁড়ায়। সেই অঙ্কন আর কারো নয়, মার আপন হাতের।

কালোত্তীর্ণ এই অমৃতের সন্ধান পেলেই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার দরকার। নইলে এই বাঁচার—এমন করে বেঁচে থাকার কোনই মানে হয় না জীবনের নানা বৃত্তে, বিভিন্ন বৃত্তিতে, সুখদুঃখের নানান দশায় দশমহাবিদ্যার বিদ্যমানতা দেখে জন্ম সার্থক করার জন্যই আমাদের জীবন।

এক কালের দুঃখ অপর কালে কেমন করে যে মুক্তির কারণ হয়! এক সময়ের তাবৎ বাধা আরেক সময়ে সর্বাত্মক মুক্তি হয়ে ওঠে—অঙ্ক কষার যত ভুল কেমন করে মিলে যায় শেষটায়! সকল অসংগতি মহাকালের সঙ্গমে সঙ্গত হয়ে যায় যেন।

মহাজ্যোতিষ্কের গগনবিদ্যার উদার অভ্যুদয় যেমন সার্থক, সেই সার্থকতা ক্ষণ-দীপ্তির জোনাকিরও।

মহাকালের বিরাট জ্যোতির্লিঙ্গ নাই হওয়া গেল, দুঃখ কিসের। ক্ষণকালের জোনাকির স্ফুলিঙ্গ হয়েও সুখ আছে।

চুটকি লেখার এই চটক।"

রঙ্গে ভরা বঙ্গদেশে হাস্যরসের অন্ত নেই—আলোচ্য উপন্যাস সমূহে তা উপলব্ধ হয়; যদিও অনালোচিত রসিক স্রজনও কম নেই। হাস্যরসের এক একটি রূপ ও বৈশিষ্ট্য এক একজনের সৃজনে মূর্ত হয়েছে। ইন্দ্রনাথের কাছে Laughter is a weapon—তদানীন্তন ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির ত্রুটি বিচ্যুতি অসঙ্গতিকে তিনি আক্রমণ করেছেন। ফরাসী শিল্পরীতিকে আশ্রয় করে তিনি স্যাটায়ারকে ব্যঙ্গচিত্রের উপযোগী করেছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ইন্দ্রনাথের আদর্শেই সমাজ সংস্কারে ব্রতী। হিন্দু ধর্মের মহিমার প্রতিপাদন ও ভিন্ন রীতির ধর্মকে আঘাত ও তদ্দ্বারা জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ তাঁর উদ্দেশ্য। কেদারনাথের হাস্যরস অনেক প্রাণখোলা ও উদার। তাঁর রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে তিক্ত তীব্র পরিহাসের বদলে এক সহৃদয় মমতামথিত ভালবাসা রূপায়িত হয়। ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গ হাস্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—ফ্যানটাসী রচনায় তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমপর্যায়ভুক্ত। গভীর অন্তর্বোধ প্রখর কল্পনা এবং বিস্ময়কর শিল্পসৃজন ক্ষমতা তাঁর হাস্যরসাত্মক রচনাকে সমুন্নতি দান করেছে। শিবরামের শব্দের তীক্ষ্ণ নিপুণ প্রয়োগ বাকরীতির বিদ্যুৎ শাণিত দীপ্তি এবং সরল সহাস্য মন তাঁর উপন্যাসকে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস আজও উৎসারিত হচ্ছে এবং তা নিঃসন্দেহে সুখকর। হাস্যরসের মধ্যে যে একটা মহৎ মানবিক দিক আছে এবং তা এগিয়ে চলা সভ্যতার পক্ষে অনিবার্য এ সত্য ক্রমশই প্রতিভাত হচ্ছে। হাস্যরস আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সেই জ্যোতির্ময় আত্মস্বরূপকেই উন্মোচিত করে।

দীপা চক্রবর্তী

বিস্মৃতপ্রায় মহিলা ঔপন্যাসিক ঃ সৃষ্টি ও সুর বৈশিষ্ট্য

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাস অঙ্গনে বেশ কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিকের উপস্থিতিকে সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্মরণীয় ঘটনা' বলে উল্লেখ করে এক ঐতিহাসিক সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। অতীতের পুরুষ-প্রধান বাঙালী সমাজে নারীরা চিরকালই ছিল পুরুষ-নির্ভর। তাই অস্বীকার করার উপায় নেই যে সামাজিক প্রথা ও মনস্তত্ত্বের বিচারে বাঙলা সাহিত্যে পুরুষ-প্রাধান্যের মধ্যে অস্বাভাবিকতা ছিলনা, তা ছিল অনিবার্যই। পুরুষ-নির্ভর রূপে বর্ণিত নারীরা কোন ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার দাবি করেতে পারেনি, এমন কি উপন্যাসের পুরুষ-প্রধান উপজীব্য যে প্রেম, নরনারীর পরস্পরের আকর্ষণ রহস্যে যা রহস্য মণ্ডিত—সেই ক্ষেত্রেও পুরুষেরাই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে পুরুষাঙ্কিত নারীচিত্র ও চরিত্র হয়েছে নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। এই সব ক্ষেত্রে নারী চরিত্রের চিত্রণ ও বিশ্লেষণের প্রাধান্য অপেক্ষা পুরুষের বক্তব্য বিশ্লেষণই ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিতে প্রধান হয়ে উঠেছে। সত্যের স্বার্থে তাই বলতেই হয় যে সেই সমাজে ও সাহিত্যে নারী মুখ্যত গৌণই থেকে গেছে।

আলোচ্য সময় ও সমাজ-পরিবেশে নারীরা মূকই থেকে গেছে, মুখর হতে পারেনি ; নারীরা 'আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার?' – বলে প্রত্যয়ী প্রশ্ন তুলতে পারেনি। পুরুষের ইচ্ছার বশবর্তী হওয়া অথবা প্রতিরোধ করাই ছিল সেই সময়কার নারীর প্রধান ধর্ম। ফলে পুরুষ সৃষ্ট উপন্যাসাবলীতে হয় নারীর জীবনের বিশেষ কোন অধিকার বা সঙ্গতদাবী অস্বীকৃত হওরায় সেই নারী হয়েছে মর্যাদাচ্যুত অথবা সেই নারী আদর্শলোকের অধিবাসিনী বা কল্পলোকের বিচরণকারিণী রূপে চিত্রিত হয়েছে। ফলে এই সব নারীচরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছে।

ইংরাজী সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন রোমান্টিকতার প্রবল প্রাধান্য, সেই সময়ে আত্মপ্রকাশ করে ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিক জেন অস্টেন (১৭৭৫—১৮১৭) যে উপন্যাসগুলি রচনা করলেন সেগুলিকে কোনক্রমেই পূর্ণাঙ্গভাবে রোমান্টিক উপন্যাস বলা চলে না। যে ইংরেজ সমাজেও নারী ছিল অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ও নীরব, সেই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেও জেন অস্টেন তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে আনলেন নারীত্বের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। তাঁর কিছুটা তির্যক ও ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র বিশ্লেষণ আজও সার্বজনীন আকর্ষণের বস্তু। কিছুটা রোমান্টিকতার ছোঁয়া থাকলেও তাঁর 'Pride and Prejudice' (১৮১৩) 'Emma' (১৮১৮) উপন্যাস এই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। আর একজন স্রষ্টা—জর্জ এলিয়ট। এই নামের অন্তরালে উপস্থিত ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিক, আমাদের বাংলা সাহিত্যে যেমন 'অমলাদেবী' ছদ্মনামের অন্তরালে ছিলেন একজন পুরুষ কথাশিল্পী। এই জর্জ এলিয়ট ও ব্রণ্টিভগ্নীদ্বয়

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পুরুষ-প্রধান ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যে নিঃসন্দেহে নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন, নতুন ভাবনার ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। এই সব মহিলা ঔপন্যাসিকেরা ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যে সংযোজন করলেন নারীত্বের সুর। ব্রন্টি-ভগ্নীদ্বয় অর্থাৎ শারলটী ব্রন্টির Jane Eyre (১৮৪৭) ও এমিলি ব্রন্টির Wuthering Heights (১৮৪৭) প্রভৃতি সৃষ্টিগুলি আনল সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল লালিত যে বৈষম্য, তারই বিরুদ্ধে এক আত্যন্তিক অনুযোগের সুর। শুধু তাই নয়, তাঁদের রচনায় পাওয়া গেল প্রথম আত্মজিজ্ঞাসা ও গভীর-গর্ভ বিশ্লেষণ—যার মধ্যে নিহিত ছিল 'আপন অধিকারবোধ' সম্পর্কে বিদ্রোহোন্মুখতার ইঙ্গিত।

জর্জ এলিয়ট প্রথম দিককার উপন্যাসে যে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ছোঁয়া এনেছিলেন তাতে অনেকেই নারীর হাতের লঘুকোমল স্পর্শ আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

সামগ্রিক বিচারে বলা চলে যে এই সব প্রমীলা—সাহিত্যস্রষ্টাদের উপন্যাসাবলীতে এক ধরণের সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য ছিল, যদিও পরবর্তীকালের ইউরোপীয় সমাজে পুরুষ ও নারীর বৈষম্য যতই দূরীভূত হয়েছে, সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের সুর ততই অপসারিত হয়েছে, কেননা জীবনবৃত্তের বাস্তব উপস্থাপন, চরিত্র চিত্রণ ও জীবন সমস্যার গভীরতা প্রতি-পাদনই সমস্ত উপন্যাসের অন্যতম উল্লেখ্য লক্ষ্য।

প্রকৃত পক্ষে, নারীর নিজস্ব সৃষ্টিতে সংসার, সমাজ ও বিশ্ব জাগতিক বস্তুকে দেখার একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণের সন্ধান যেমন এঁদের রচনায় পাওয়া গেল, তেমনি নারীদের স্বজাতি সম্পর্কে তীব্র তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সুকঠিন সত্যবাদিতার প্রকাশও লক্ষ্য করা গেল। ফলে এতদিন ধরে পুরুষ-সৃষ্ট উপন্যাসে নারীর যে আদর্শায়িত অথবা অবহেলিত রূপাঙ্কনধারা প্রবাহিত ছিল তাতে এল পরিবর্তন, এল বাস্তবতার ছোঁয়া। উল্লিখিত ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিতে এই সত্যেরই সন্ধান সহজ লভ্য।

[দুই]

ঠিক এমনি ভাবেই প্রায় একশো বছর পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কয়েকজন বাঙালী মহিলা ঔপন্যাসিক উপন্যাস সাহিত্যকে এক নতুন ঠিকানায় পেঁছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরা উপন্যাস সাহিত্যের দিগন্তকে হয়তো সুদূর-প্রসারী করে তুলতে পারেন নি, কিন্তু রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে কাঠবেড়ালির যে ভূমিকা, এরা সেই ভূমিকাই পালন করেছিলেন, যা কোন বিচারেই তুচ্ছ নয়।

একথা স্মরণে রেখেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী সমাজে নারীরা ইউরোপীয় সমাজের নারীদের মত সোচ্চার হতে ও বিদ্রোহিনী হতে পারেননি, তাদের প্রচেষ্টা ছিল মূলত অন্যায়, অত্যাচার ও বৈষম্যের হাত থেকে আত্মরক্ষা; কেননা সেই সমাজে কোন কোন পুরুষের লোলুপ পশুশক্তির আক্রমণের মুখে অভি-ভাবকহীন নারীর অসহায়তা, স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নির্মমতা, প্রতারণা ও বঞ্চনা আর বিয়ের মধ্যে বণিকবৃত্তির স্থূলতা এই সমাজের নারীদের আত্মমর্যাদায় প্রবল আঘাত হেনেছিল বলেই যুগযুগান্তরের নিষ্ক্রিয় নিশ্চল জীবন সম্পর্কে নারীদের মধ্যে এসেছিল

সামান্য সচেতনতা—এক কথায়, ঘটেছিল কিছুটা 'নারী জাগরণ'। তবে এই জাগরণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পুরুষের সক্রিয় ভূমিকার পরিচয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাসঙ্গিক ভাবেই প্রাথমিক পর্বে রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ করতে পারি; নারী জাগরণের ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা অনন্য সাধারণ। এঁদের মতই আরো কয়েকজন অগ্রণী পুরুষের লেখনীতে সমাজের বিরুদ্ধে নারীর অনুযোগ সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে; শুধু তাই নয়, নারীকে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করেছে।

অনুপ্রাণিত হয়েই প্রথম বাঙালী মহিলা ঔপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি, স্বর্ণকুমারীদেবী সমাজ সচেতনতা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসে; আর তার পরবর্তী পর্বে এলেন অনুরূপা ও নিরুপমা দেবী, যাঁরা 'ভাগলপুর গোষ্ঠী'র অন্তর্ভুক্ত বলেই পরিচিত। এ'দের আলোচনা পৃথক ভাবেই করা হয়েছে, তাই এই তিনজন মহিলা ঔপন্যাসিকের মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের বিষয় নয়।

এই তিনজন মহিলা ঔপন্যাসিক ব্যতীত আরো যে কয়েকজন প্রয়াত প্রমীলা কথা-শিল্পী তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি সম্ভারে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা হলেন সীতা ও শান্তা দেবী, আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া ও প্রভাবতীদেবী সরস্বতী। সামগ্রিকভাবে এ'দের সৃষ্টির মূল্যায়ন হওয়া জরুরী; এই প্রবন্ধে সেই উদ্যোগই প্রধান স্থান নিয়েছে।

মহিলা ঔপন্যাসিকেরা অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে নিজেদের সৃষ্টিশক্তির স্বতন্ত্র নিদর্শন রাখতে পারেন। প্রথমত, পুরুষদৃষ্টিতে অনাবিষ্কৃত নারী জীবনের অংশের ওপর আলোকপাত করে এবং দ্বিতীয়ত, নারী মনের অবগুণ্ঠিত অংশ—যা পুরুষের পক্ষে সহজে আবিষ্কার করাই সম্ভব নয়, যে অপরিচয়ের আবরণ থেকে এক নারী অন্য এক নারীর কাছে সহজেই নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারেন—সেই অজানিত পরিচয়কে প্রকাশ করে। এই দুটি ক্ষেত্রেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিকার অনেক বেশী। তাই এ বিষয়ে নারীর সাহিত্য সৃষ্টি অনেকাংশে উৎকর্ষের উৎস রূপে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে। এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত অনুসরণীয়। তিনি লিখেছেন ঃ

> "...নারীর যে বিশেষত্ব তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার বলার ভঙ্গীতে, তাহার আবেগ কম্পিত ভাব প্রকাশে, তাহার স্নেহব্যাকুল, অশ্রুসজল আশীর্বাদ-ধারায় ফুটিয়া উঠে, তাহার রচিত সাহিত্যে তাহাই লালিত্য ও কমনীয়তা সঞ্চয় করিতে পারে। তাহার জীবন সমস্যা বিশ্লেষণ, তাহার মন্তব্য ও চিন্তাধারার মধ্যেও এই ললিতগুণের আধিক্য ও তীক্ষ্ম পরুষতার অভাব সমালোচকের চক্ষে ধরা পড়িতে পারে।"

মূলত, এই বক্তব্যের আলোকেই এই প্রাবন্ধিক বিস্মৃত-প্রায় কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের মূল্যায়ন করেছেন।

[তিন]

জেন অস্টেন, জর্জ এলিয়ট কিংবা ব্রণ্টি ভগ্নীদ্বয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে প্রতিভার পরিচয় রেখেছিলেন, যে পর্যবেক্ষণ-শক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করে স্বর্ণকুমারীদেবী, অনুরূপা ও নিরুপমাদেবী ও আরো কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিক সেই সব ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকদের সমপর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়তো হতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মৌলিকতার অভাব কোথাও সূচীত হয়নি

ইংরাজী সাহিত্যাকাশের যুগ্মতারা ব্রণ্টি ভগ্নীদ্বয়ের মতই বাংলা সাহিত্য-কাননের এক বৃন্তে ফুটে ওঠা দুটি ফুলের মত সহোদরা সীতা ও শান্তা দেবী রচিত উপন্যাসা-বলীতে একটি নতুন পর্বের উন্মোচন হয়েছিল, সে সত্য স্বীকার্য। এঁদের দুজনের মধ্যে প্রতিভার কোন তারতম্য ছিল না, তাই দুজনেরই বিষয়বস্তু, জীবন সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ শক্তি জীবন-ভাবনা ও ভাষারীতিতে তেমন সুনির্দিষ্ট কোন পার্থক্য নেই। যুগ্মভাবে রচিত 'উদ্যানলতা' উপন্যাস সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

'প্রবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতাদেবী 'হিন্দুস্থানী উপকথা' নিয়ে সাহিত্য সাধনা শুরু করলেন ; ক্রমশই তিনি এগিয়েছিলেন গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসায়। ফলে উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবেশ ছিল প্রায় অপ্রতিরোধ্য। এঁর সৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসেবে 'পথিকবন্ধু' (১৩২৭), 'রজনীগন্ধা' (১৩২৮ , 'পরভৃতিকা' (১৩৩৭), 'বন্যা', 'মাতৃঋণ' ও 'জন্মস্বত্ব' উল্লেখ্য। এগুলির মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচারে 'রজনীগন্ধা'ই প্রথম—যার মধ্যে নারীর অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত। শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসকে একটি নতুন আর্টের নিদর্শন রূপেও গ্রহণ করা সঙ্গত।

'রজনীগন্ধা' উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে ক্ষণিকা, মেনকা ও লালু এই তিন ভাইবোন, তাদের চিররুগ্ন পিতা ও অকর্মন্য স্বার্থপর, কাণ্ডজ্ঞানহীন দাদা প্রবোধ, তরুণী শিক্ষয়িত্রী মনোজা, অধ্যাপক অনাদিনাথ ও যুবক চিন্ময়কে নিয়ে। কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে উপস্থাপিত ক্ষণিকা মূলত ভাগ্যাবিড়ম্বিত। চিররুগ্ন পিতার অকর্মণ্যতার ফলে কৈশোর থেকেই তার ওপর গুরুভার অর্পিত, ফলে কিশোরী মনের স্বভাব সুলভ উচ্ছলতা আর আনন্দ উদ্বেলতা অনুপস্থিত হয়ে চরিত্রকে বাস্তবের স্পর্শ দিয়েছে। এক তরুণী শিক্ষয়িত্রী মনোজার অর্থসাহায্যে তার শিক্ষার পালা অকালেই শেষ হয়ে যায়নি, কিন্তু পিতার গুরুতর অসুখের ফলে, অবস্থা বেগুণ্যে তাকে কাজের সন্ধানে বেরোতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বভাব ভোলা, উদাসীনচিত্ত অধ্যাপক অনাদিনাথের গৃহস্থালীর দায়িত্ব গ্রহণের কাজ মিলেছে। প্রথম দর্শনেই এই অধ্যাপকের প্রতি ক্ষণিকা আকৃষ্ট হয় ; অথচ এই অধ্যাপকের ঔদাসীন্য ও আত্মসমাহিত অনাসক্তি তার প্রণয় মাধুর্যের মধ্যে সঞ্চার করেছে দুঃসহ ব্যথা। ক্ষণিকার এই ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় গভীরতাচারী 'আত্মজিজ্ঞাসা', ক্ষুব্ধ করুণ দীর্ঘশ্বাস', ভাগ্যের বিরুদ্ধে 'ধূমায়িত বিদ্রোহ' যে ভাবে চিত্রিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ সংযোজন। আর এ কৃতিত্ব

নিঃসন্দেহে এক মহিলা ঔপন্যাসিকের। অধ্যাপক সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "ক্ষণিকার এই অন্তস্তাপ দুঃসহ প্রেম, শান্ত মৌনতার অন্তরালে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপী দাহ আমাদিগকে Charlotte Bronte-এর উপন্যাস Rochester-এর প্রতি Jane Eyre এর জ্বালাময় প্রণয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। Jane Eyre-এর মত ক্ষণিকার বহিঃসৌন্দর্যের কোন আভাস নাই—তাহারই মত তাহার অতৃপ্ত বুভুক্ষা ও অসংকোচ অধিকার প্রার্থনা।"

শেষ পর্যন্ত শিক্ষয়িত্রী মনোজার সঙ্গে অধ্যাপক অনাদিনাথের বিয়ের সংবাদ ক্ষণিকার বাসনাতপ্ত হৃদয়ে প্রবল প্রতিঘাত সৃষ্টি করেছে। ক্ষণিকার এই ব্যর্থ প্রেমের জ্বালাময় অনুভূতির যে চিত্র মহিলা কথাশিল্পী সীতাদেবী এঁকেছেন, যে ভাবে এই চরিত্রটির মনোবিশ্লেষণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে বাস্তবানুগ। এই মনোজাই দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তার অক্লান্ত সেবাশুশ্রূষার মাধ্যমে সে পূর্বে পাওয়া উপকারের ঋণ পরিশোধের ছদ্মবেশে নিজের ব্যর্থ, অন্তর্দাহকারী প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে নিষ্ক্রমণের পথ করে দিয়েছে। অন্তর্দৃষ্টিতে ক্ষণিকার এই চাতুর্য সহজেই ধরা পড়েছে। মনোজার মৃত্যুর আগেই একই প্রণয়পাত্রকে কেন্দ্র করে দুটি নারীর এই যে অনুরাগ তা পরস্পর পরস্পরের কাছে শেষ পর্যন্ত গোপন থাকেনি। আলোচ্য দুটি নারীমনের এই স্বরূপ উদ্ঘাটন মহিলা ঔপন্যাসিক যে ভাবে চিত্রিত করেছেন, তা কোন পুরুষ ঔপন্যাসিকের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু এই সঙ্গেই যখন মনোজার মৃত্যুতে গভীর শোকে অনাদিনাথ বাহ্য জগতের সঙ্গে ক্ষণিকাকেও বিস্মৃত হলেন, তখনই এই দুঃসহ বেদনায় দীর্ণ ভাগ্যহতা নারী তার আবাল্য সুহৃদ চিন্ময়ের প্রেমাহ্বানকে স্বীকার করে নিল। এক্ষেত্রে প্রথম প্রেমের দুর্দমনীয় আবেগ নেই বরং আশাভঙ্গের হতাশা ও তিক্ততা এই প্রেমের মাধুর্যকে কিছুটা ম্লান করলেও পরবর্তীকালে এই দুই পুরুষ ও নারীর মিলন ব্যর্থতার বোঝা বহন করে নি, সহজতায় স্নিগ্ধই হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও মহিলা ঔপন্যাসিক সীতাদেবী নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রতিরোধনীয় প্রভাবের যে চিত্র চিত্রিত করেছেন, তা খুব সহজলভ্য নয়।

সীতাদেবীর এই একটি উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনায় আমরা এই মহিলা ঔপন্যাসিকের কাহিনী গঠনে ও চরিত্র সৃজনে কল্পনা শক্তি ও মনোবিশ্লেষণের যে ক্ষমতার পরিচয় পেলাম, তাই প্রমাণ করে যে তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন স্থায়ীত্বের দাবী নিয়ে। তবে এ কথা না স্বীকার করে উপায় নেই যে 'রজনীগন্ধা'য় যে সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরিচয় আছে তারই অন্যান্য উপন্যাসে তা নেই। কেননা 'পরভৃতিকা' উপন্যাসের ঘটনা-বাহুল্য ও বৈচিত্র্য এই উপন্যাসের রসবিকাশে সহায়তা করে নি, যেমন নতুন ধরণের আখ্যান সম্মিলিত হওয়া সত্ত্বেও 'পথিকবন্ধু'-র মধ্যে প্রকৃতি ও পথের বর্ণনা যেন ভ্রমণ কাহিনীর স্বাদই সৃষ্টি করেছে, উপন্যাসকে অগ্রসর করতে তা তেমন সহায়তা করে নি। দেবপ্রিয় ও অনিন্দিতার প্রেমে মাধুর্য ও হৃদয়াবেগ সৃষ্টিতে এই বর্ণনা কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটালেও এই উপন্যাসের

পরিপূর্ণ রস সংহতির পক্ষে তা কিছুটা বাহুল্য বলেই বিবেচিত হয়েছে। তাঁর আর একটি উপন্যাস – 'বন্যা' গড়ে উঠেছে এক সামাজিক অসংগতিকে কেন্দ্র করে, যেখানে পিতার অজ্ঞাতে সুবর্ণার মা সুবর্ণার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার বিয়ে দেন, যে শ্রীবিলাসকে একজন সমালোচক 'রূপকথার রাক্ষসদৈত্যের আধুনিক সংস্করণ' বলে উল্লেখ করেছেন, কেউ তাকে 'দানবিক' চরিত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে এ কথা সত্য যে লজ্জা-কুণ্ঠিত, অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূ সুবর্ণার আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন নারীতে রূপান্তরের যে চিত্র সীতাদেবী অঙ্কন করেছেন তা মনস্তত্ত্বের বিচারে খুব গভীরসায়ী নয়। মূলত শ্রীবিলাস সুবর্ণা ও সুদর্শনের প্রণয়ের পথে বহির্জগতের এক আকস্মিক বাধাই কাহিনীর আশ্রয় হয়ে ওঠায় উপন্যাসটি গভীর জীবনবোধে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি। এরপর সীতাদেবী আরো দুটি উপন্যাস লেখেন—'মাতৃঋণ' ও 'জন্মস্বত্ব'—যা বৈশিষ্ট্যের বিচারে কোন বিশেষত্ব দাবী করে না। তবুও এই দুটি উপন্যাসে যৌন সম্পর্কের গড়ে ওঠা প্রেমই কাহিনীর উপজীব্য যা আকর্ষণ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় নি। আঙ্গিকের বিচারে কোন অভিনবত্ব না থাকলেও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীতাদেবীর সহজ, সংযমী প্রকাশরীতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সীতাদেবীর সহোদরা শান্তাদেবীর ছোট গল্পের সংখ্যার তুলনায় উপন্যাসের সংখ্যা সীমিত, যদিও তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু প্রবন্ধ চর্চার মাধ্যমে। তাঁর সৃষ্ট উল্লেখ্য উপন্যাস 'জীবনদোলা' ও 'চিরন্তনী'-র মধ্যে দ্বিতীয়টি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এই উপন্যাসটির সঙ্গে সহোদরা সীতাদেবীর 'রজনীগন্ধা'র সাদৃশ্য সহজেই আমাদের আকর্ষণ করে। 'রজনীগন্ধা'র নায়িকা ক্ষণিকার মত 'চিরন্তনী'র নায়িকা করুণার জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবন সমস্যা এবং পরিবার-প্রতিবেশ প্রায় অভিন্ন বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় পরস্পরের প্রতিচ্ছবি বলাই বোধহয় সঙ্গত। ক্ষণিকার মতই করুণার পরিবারও গড়ে উঠেছে ভাই, বোন ও একজন সংসার উদাসীন অভিভাবককে নিয়ে। 'রজনীগন্ধা'র মেনকা, 'চিরন্তনী'র অরুণা, আর 'রজনীগন্ধা'র লালু 'রেণু'তে রূপান্তরিত হয়েছে—এমন মন্তব্য অসঙ্গত নয়। শুধু এটুকু সাদৃশ্যই নয়, ক্ষণিকা ও করুণার মধ্যেও এ সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। দুজনেরই অবসরবিহীন জীবনে এসেছে 'অকাল গাম্ভীর্য', দুজনেই অনলস, কর্মব্যস্ত জীবনের জোয়ালে বাঁধা। তবে বৈসাদৃশ্যও যে নেই তা নয়। ক্ষণিকা যেভাবে ভাগ্য-লাঞ্ছিতা সেই তুলনায় করুণা কম ভাগ্যাহতা। অলভ্য প্রেম ক্ষণিকার জীবন-যুদ্ধকে প্রায় অসহনীয় করে তুলেছে, অন্যদিকে করুণা অবাঞ্ছিত প্রেমের অভিঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সদাই সচেষ্ট। অপ্রাপণীয় প্রেমের প্রত্যাশায় ক্ষণিকার অতৃপ্ত হৃদয় বার বার হয়েছে ক্ষুব্ধ, নিষ্ফলতার নৈরাশ্য তাকে ঘিরে ধরেছে। তার অতৃপ্ত কামনায় হৃদয়ে হাহাকার উঠেছে যা অগ্নি স্ফুলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে। সংযমের বাঁধ, ধর্মের অনুশাসন, কৃতজ্ঞতাবোধের বাধা ভেঙে ক্ষণিকার প্রেম যেন বিদ্রোহে পরিণত হতে চাইছে। অন্যদিকে অবিনাশের নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত আশ্রয়ের দিকে শান্তির আশায় করুণা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। তবুও প্রেমের এই ভীরু অসম্মতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত মনের অবস্থা করুণার ছিল না।

সে অবিনাশের প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি, তাই পল্লীজীবনের নিভৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করে সে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নিমগ্ন থেকেছে। বলাবাহুল্য, এর ফলে ক্ষণিকা ও করুণা শেষ পর্যন্ত দুই ভিন্নপথের যাত্রিনী হয়েছে। মনের সঙ্গে বোঝাপড়াব এই অংশে সাহিত্যিক শান্তাদেবী তাঁর সৃষ্টিশক্তির সুন্দর পরিচয় রেখেছেন। এই পল্লীজীবনে করুণা পেয়েছে সেই শতদলকে যার বর্ণনার মাধ্যমে করুণা পল্লীজীবন সম্পর্কে গড়ে তুলেছে তার ধারণা। আর এই পল্লীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত থেকে এর শান্ত জীবনযাত্রার প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে করুণার মনে জেগেছিল উন্মুখতা। অথচ এই করুণার জীবনেই এসে উপস্থিত হল আর এক পুরুষ সুপ্রকাশ। এই পুরুষটি করুণার কল্পনাদৃষ্টিতে পল্লী সৌন্দর্যের যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে প্রতিভাত। তাই করুণার অপ্রত্যাশিত পল্লীবাসের সময়ে সহজ-সান্নিধ্যে এসে সুপ্রকাশ অতি সহজেই প্রভাব বিস্তার করেছে তার অন্তরে। তখন দুজনেই প্রবল আবেগে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণই করেনি, শেষ পর্যন্ত এই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ সুগভীর প্রেমে পরিণত হয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, উপন্যাসের এই অংশ যেখানে করুণা ও সুপ্রকাশের প্রেমানুভূতির কবিত্বময়তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগসাধন, বিশেষভাবে আত্মবিস্মৃত মুগ্ধ তন্ময়তা - সেই সব প্রকাশে শান্তাদেবী পরিশীলিত মন ও সৃজনী প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন।

কিছুটা কল্পলোকের অধিবাসিনী হলেও কোনভাবেই করুণা চরিত্রকে রোমান্সের নায়িকা রূপে চিহ্নিত করা যায় না। তার চরিত্রে বাস্তবতার স্পর্শ দুর্লক্ষ্য নয়; নয় বলেই অবিনাশের প্রভুত্বময় প্রেমকে সে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি, আর পারেনি বলেই তার অন্তর হয়েছে দ্বন্দ্বমথিত। এই দ্বিধাদীর্ণ জটিলতা থেকে মুক্তি পেতেই সে চেয়েছে শতদলের সহায়তা। এই প্রত্যাশায় শতদলের সান্নিধ্য তার মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, শান্তাদেবী তার সেই অনুভূতির সুন্দর চিত্রণ করেছেন। এ বর্ণনায় স্বাভাবিক ভাবেই নারী হাতের স্পর্শ সুস্পষ্ট। শান্ত, সহিষ্ণু ও অতীত স্মৃতিসুখে বিভোর শতদলের স্নিগ্ধ সান্নিধ্য, সেই সঙ্গে পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধতা তাকে করুণার দ্বন্দ্বমথিত অন্তরে এনেছে প্রশান্তির প্রলেপ। এরই মাধ্যমে তার জীবনে এসেছে প্রকৃত প্রেম। সেই প্রেমের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুপ্রকাশ। সুপ্রকাশের সঙ্গে করুণার এই প্রণয়পর্ব সংক্ষিপ্ত হলেও এই পর্ব আত্মমগ্নতার ভাব সম্পদে ঋদ্ধ। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সুবিন্যস্ত সমৃদ্ধ প্রেমপর্বে এসেছে সাময়িক বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ একদিকে সুপ্রকাশের সদাচঞ্চল ভ্রাম্যমানতায় ও করুণার নীরব ধ্যানমগ্ন নিস্ফলতায়। শেষ পর্যন্ত প্রণয়ীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে করুণার প্রেমের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা যেন তার অন্তরের নিরুদ্ধ কামনার প্রবল আর্তি রূপেই দেখা দিয়েছে। শান্তাদেবী নারী হৃদয়ের এই সূক্ষ্মানুভূতি প্রকাশে তাঁর কল্পনাশক্তি, অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টি সামর্থকে উজাড় করে দিয়েছেন।

শুধু নারী চরিত্র অঙ্কনেই নয়, শান্তাদেবী পুরুষ অবিনাশের চরিত্র সৃজনেও যথেষ্ট

মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তার চরিত্রের যে রুক্ষ পৌরুষ, যে স্পর্ধিত প্রেম-প্রার্থনা, যে উগ্র অসহিষ্ণুতা—তারই নেপথ্যে সুপ্রকাশের প্রতি বরুণার ক্ষমাসুন্দর ও স্নেহকোমল ব্যবহারের যে বর্ণনা মহিলা ঔপন্যাসিক দিয়েছেন তা শুধু সুনিপুণ ভাবেই চিত্রিত নয়, মনস্তত্ত্ব সম্মতও বটে। তা সত্ত্বেও সুপ্রকাশ চরিত্রটি সুবিকশিত ও সুসম্পূর্ণ—এমন কথা বলা চলে না। শতদলের চরিত্রটি স্বল্পরেখায় আঁকা হলেও তা বাস্তবসম্মত ও আকর্ষণীয়। এই চরিত্রটি ক্রিয়াশীলতার বিচারে কিছুটা নিষ্প্রভ হলেও অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ নয়। তবে প্রেমের ব্যাপারে তার অন্তর্বিক্ষোভের যে মর্মস্পর্শী বর্ণনা প্রত্যাশিত ছিল তা পাওয়া যায় নি ; সে চিত্র কিছুটা ম্লান ও অনেকটাই বিবর্ণ। গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে রেণুর তুলনায় অরুণা চরিত্রটি সুচিত্রিত। দিদির প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনাবোধে চরিত্রটি অনেকটাই সজীব। 'জীবনদোলা'—এই উপন্যাসের তুলনায় কিছুটা অনুজ্জ্বল। সামগ্রিক বিচারে, মহিলা ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র 'চিরন্তনী' উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃজনশীল সাহিত্যে তাঁর স্থান শুধু সুচিহ্নিতই করেন নি, সুস্থায়ীও করতে সমর্থ হয়েছেন। ভাষাভঙ্গির সরসতা ও মাধুর্যও তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে কেউ কেউ শৈল্পিক সুষমার বিচারে শান্তাদেবীকেই প্রথমা বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক ভাবে সীতা ও শান্তাদেবীর যুগ্ম উদ্যোগে রচিত 'উদ্যানলতা' উপন্যাসটির আলোচনা অপরিহার্য। প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ্য তা হল এই দুই সহোদরার রচনারীতির অভিন্নতা যা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণেও প্রায় অধরাই থেকে যায়। এঁদের দুজনের জীবনদৃষ্টি ও দর্শনেও যেমন কোন ভিন্নতা নেই, তেমনি নেই বর্ণনা শক্তিতে ও চরিত্র সৃজনে। তবে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য করে তুলতে দুজনেই সফল।

উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে এক চিরকিশোরী মুক্তিকে কেন্দ্র করে, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল দুটি পুরুষ—জ্যোতি ও ধীরেন। এই দুজনের বিপরীতমুখী আকর্ষণের অভিকর্ষে মুক্তির মনে যে ক্ষীণ দোলা লেগেছিল তা চটুল হাস্যপরিহাস চঞ্চল এই কিশোরী মনকে কোন জটিলতায় আবদ্ধ করে নি, বোর্ডিং বাসিনী এই মেয়েটি মান-অভিমান ঈর্ষা-কলহের গণ্ডী অতিক্রম করে কখনও উপলব্ধির জীবন পথের যাত্রিনী হয় নি। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কিছু আতিশয্য ও অসংগতি আছে, তারই নিদর্শন মুক্তির পিতা শিবেশ্বর ও মোক্ষদা। সামগ্রিক বিচারে এই উপন্যাসটি গভীর জীবন-বোধের কোন সাক্ষ্য রাখে নি। তবুও স্বীকার করতেই হবে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সমৃদ্ধি সৃজনে মহিলা ঔপন্যাসিক সীতা ও শান্তাদেবীর উদ্যোগ হয়েছিল স্বর্ণপ্রসূ।

[চার]

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের অবস্থান-গত ব্যবধান ক্রমহ্রাসমান। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক মেলামেশা, দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক রূপান্তর এই পরিবর্তনের পথ সুগম করেছে। তবুও শেষ পর্যন্ত বিষয় নির্বাচন, উপস্থাপন-রীতি, বর্ণনাভঙ্গি ও জীবন-ভাবনায় এমন একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যা নারীর রচনা রূপে

উপন্যাসগুলিকে চিহ্নিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন,

"সম্প্রতি পরিবার জীবনে যে নূতন ধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে, পারিবারিক আদর্শবাদের ক্রম বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও পরিবার ভুক্ত নরনারীর মধ্যে দারুণ স্বার্থ সংঘাত, ঈর্ষা-অসহযোগ, ক্ষোভ-ঔদাসীন্য প্রভৃতি যে বৃত্তিগুলি অস্বস্তিজনক ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে নারীর উপন্যাসে তাহারই চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যৌথ পরিবারের প্রেতাত্মা এখনও কোন কোন নারী রচিত উপন্যাসে নানা জটিলতার সৃষ্টি করিয়া ও নানারূপ অশান্তি বিক্ষোভ ঘটাইয়া বাসা বাঁধিয়াছে। এখনও মাতৃকেন্দ্রিক বহু গোষ্ঠী সমন্বিত পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিনষ্ট ও ভারসাম্যচ্যুত জীবনাভিনয়ের কাহিনী উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই।"

একটু দীর্ঘ হলেও এই তাৎপর্যপূর্ণ সমগ্রতাধর্মী মন্তব্যের আলোকেই আরো কয়েকজন প্রয়াত মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের মূল্যায়নে অগ্রসর হওয়া যায়।

প্রথমে আশালতা সিংহের উপন্যাস—'সমর্পণ'-এর উল্লেখ করতে হয়, যার মধ্যে আছে সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতির পেলবতা—আছে নারীর হাতের এক নিশ্চিত নিপুণ স্পর্শ। এই উপন্যাসটির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে নায়িকা সুরমা, যে নারী তার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য ও সুরুচিবোধ নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ধরণের জীবনাদর্শের আতিশয্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নীরব প্রতিমূর্তি রূপে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত পক্ষে, এই নারী একদিকে একান্নবর্তী প্রাচীন পরিবার-সৃষ্ট ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ইতরতা প্রভৃতির দ্বারা যেমন পীড়িত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অতি আধুনিকতা-উপজাত চিত্তবিক্ষেপ, স্বৈরাচারী মানসিকতা, ঐশ্বর্য-তৃষা এবং সর্বোপরি এক ধরণের প্রেমহীনতায় সে পীড়িত হয়েছে। মহিলা ঔপন্যাসিক আশালতা সিংহ তাঁর উপন্যাসে এই নায়িকাকে সম্মুখে রেখেই আধুনিক যুগের অতিবাস্তবতার নানা চিত্রই শুধু আঁকেননি, সুরুচি, সংযম ও সৌকুমার্যের অপ্রত্যাশিত বিকৃতির বিরুদ্ধেও যেন প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

চরিত্র হিসেবে নায়িকা সুরমা কিছুটা বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে কেন না ঈর্ষা-বিদ্বেষহীন সৌকুমার্যে সেই চরিত্র যেমন চিহ্নিত, তেমনি আত্মতন্ময়তায় সেই চরিত্র বিশিষ্ট। সেই তুলনায় পুরুষ চরিত্র হরলাল কিছুটা নিষ্প্রভ: সে কোন ক্রমেই আধুনিক বাস্তবচরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা পায়নি। সুরমার সঙ্গে হরলালের প্রণয়—দুটি বিপরীত ধর্মী চরিত্রের তার্কিকতায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সুরমা ; সেই সুরমাই আবার যার কাছে প্রণয়-প্রত্যাশী হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে সেই সুপ্রকাশ চরিত্র ধর্মে উদাসীন ও অনাগ্রহী। তাই সুপ্রকাশ ও সুরমার বিবাহবন্ধনে এই উপন্যাসের যে পরিণতি দেখানো হয়েছে, তা বর্ণিত কাহিনীর প্রত্যাশিত পরিণতি নয় বলেই মনে হয়।

মহিলা ঔপন্যাসিক আশালতা সিংহের 'সমর্পণ'-এ যেমন প্রেমই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য, তেমনি জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'ছায়াপথ' উপন্যাসের বিষয়ও প্রেম, তবে তা প্রত্যাখ্যাত প্রেম।

শূন্যগর্ভ ভাবাবেগে চালিত নায়ক অজিতের প্রেম নেহাতই ভাববিলাস, তাই কঠিন বাস্তবের কঠোর আঘাতে সেই প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতাই অনিবার্য ভাবেই প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রকৃত পক্ষে, উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে প্রথম প্রণয়ীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এক নারীর সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি এক ধরণের বিমুখতা ও সংকল্প-দৃঢ় স্বাধীন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু এই সুপ্রিয়ার বিবাহ বিমুখ মনের গভীরে পরবর্তী স্তরে একটু একটু করে প্রেমের যে সঞ্চার ঘটেছে, তা মূলত বিভাসের প্রতি তার আকর্ষণের ফল। তাই দেখা যাচ্ছে, পুরুষের প্রতি এই নায়িকার যে নিগূঢ় অভিমান, যা প্রবল, উদ্ধত বিদ্রোহে রূপান্তরিত হওয়া প্রত্যাশিত ছিল, জ্বালাময় চিত্তদাহে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠা অনিবার্য ছিল, তা ঘটল না। তার পরিবর্তে আমরা দেখলাম নায়িকার নীরব, দৃঢ় সঙ্কল্প ও 'কুণ্ঠিত অনাগ্রহ'। রাহুগ্রস্ত জীবনের স্বাধীন স্ফুরণের সাধনায় রত হয়ে নারীকে আমরা পুরুষের প্রবল প্রভাবে কেবলমাত্র প্রভাবিত হতেই দেখলাম না, দেখলাম অভিভূত হতে। নারীর অন্তর-মনের এই পরিবর্তনের চিত্রটি জ্যোতির্ময়ী দেবীর তুলির স্পর্শে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, একটি নারীর ধূসর মনে প্রেমের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রদানেও তিনি সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হওয়া বিবাহোত্তর জীবনে সুপ্রিয়ার সব সমস্যার সহজ সমাধান ঘটেনি, বরং দাম্পত্য জীবনে এই প্রভাব সৃষ্টি করেছে আবর্ত। তবে এই আবর্ত সুপ্রিয়ার বিবাহিত জীবনকে দীর্ঘদিন জটিলতার জালে আবদ্ধ রাখেনি, পরিণতিতে সমস্ত প্রকার তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, ক্ষোভ, আদর্শ-বিরোধ অপসারিত হয়ে মিলনের সঙ্কেতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এই সব ঘটেছে এমন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে যা এই মিলনকে তাৎপর্যবাহী ও সার্থক করে তুলেছে। লেখিকা আরাবল্লী পর্বতের পার্বত্য প্রাকৃতিক রুক্ষতা ও ধূসরতার প্রেক্ষাপটে বর্ষাস্নিগ্ধ শ্যামশ্রীর বিচিত্র বিস্তার চিত্রিত করে সুপ্রিয়ার প্রেমরিক্ত উষর জীবনে প্রেমানুরাগের ক্রমশ সঞ্চারের রূপটুকু সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন এবং বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পরিধিকে প্রসারিত করার মাধ্যমে তাঁর কল্পনাশক্তির ও সৃজনী ক্ষমতার স্পষ্ট পরিচয় রেখেছেন। বলা চলে, বর্তমান দাম্পত্য জীবনে নারীর নিম্নাবস্থানের যে হীনতা ও অগৌরব—অনাগত আগামীতে এই অবস্থার পরিবর্তনের যে আদর্শ রচিত হবে তারই এক অর্ধস্ফুট অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে, যার ফলে উপন্যাসে সমস্যার বিশ্লেষণই মুখ্য হয়ে উঠেছে, চরিত্র সৃজন হয়েছে গৌণ। সার্বিক বিচারে স্বীকার করতেই হবে যে এই উপন্যাসের লেখিকা সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশে তাঁর নায়িকা সুপ্রিয়ার ব্যক্তিত্বের বিকাশের চিত্রাঙ্কন করতে বসে নারী অন্তরের সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতি ও গভীর মননশক্তির রূপাঙ্কনে কৃতিত্বের সাক্ষ্য রেখেছেন। তা তাঁকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে স্থায়ী আসনে আসীন করেছে।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' নগর কলকাতার

পটভূমিতে এক একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র যেখানে পরিবারের নানান চরিত্র, নানান মানুষের হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতার নিষ্ঠুরতা ও ঐশ্বর্যের দম্ভ এই পরিবারেরই পিতৃমাতৃহীন যুবক নীতীশকে প্রবল আঘাত দিয়েছিল। সে হয়েছিল সম্পত্তি বঞ্চিত। সহায় সম্বলহীন এই যুবক মধ্য ও পশ্চিম ভারতে স্বাধীন জীবন যাপনের আশায় একটি পাত্র সংগ্রহ করে। এই যুবকই শেষ পর্যন্ত রাজনীতির আবর্তে আবর্তিত হয়ে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাগারে মৃত্যু বরণ করল। এই কাহিনীসূত্রে নীতীশের যে জীবনালেখ্য অংকিত হয়েছে তাতে এই চরিত্রটির মাধ্যমে জীবন সংগ্রাম ও জীবন সমীক্ষার যে পরিচয় চিত্রিত হয়েছে তা একদিকে যেমন লেখিকার বর্ণনা শক্তির পরিচয় বহন করছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর মননশীলতারও পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মৃত্যুর মাধ্যমে নীতীশ চরিত্রের যে পরিণতি তাঁর জন্য লেখিকা পাঠকদের প্রস্তুত করে তোলেন নি। ফলে ঘটনাটির মধ্যে আকস্মিকতার আবির্ভাব ঘটেছে। সমস্যাবলীর একটা সহজ সমাধানে পৌঁছে দেওয়ার প্রবণতা লেখিকার দৃষ্টির গভীরতার পরিবর্তে সৃষ্টিশক্তিকে খানিকটা সীমিত করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও মাত্র কয়েকটি উপন্যাস রচনা করে জ্যোতির্ময়ী দেবী ঔপন্যাসিক হিসেবে পাঠক স্মৃতিতে সততই সজীব থাকবেন।

বিষয় নির্বাচনে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেখেছিলেন আধুনিক প্রজন্মের পাঠকদের কাছে প্রায় অপরিচিত মহিলা কথাশিল্পী শৈলবালা ঘোষজায়া। সাম্প্রতিক কাল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন। এই সংকটময় কালে যখন হিন্দু মুসলমান মৈত্রী বন্ধন সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই শৈলবালাদেবীর উপন্যাসগুলির কথা স্মরণে আসে। তারা যেন নতুন করে প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায়। এঁর রচিত 'শেখ আন্দু' (১৯১৭), মিষ্টি সরবৎ (১৯৩০), মূলত মুসলমান জীবনাশ্রয়ী দুটি উপন্যাস।

মুসলিম শেখ আন্দু কর্ম জীবনে ধনী চৌধুরী বাড়ীর ড্রাইভার, যাকে নায়ক করে রচিত হয়েছে এই উপন্যাস। বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকের কাছাকাছি সময় এক জন হিন্দু নারীর পক্ষে একটি মুসলমান ড্রাইভারকে নায়ক করে উপন্যাস রচনার এই প্রয়াস সবিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এই চৌধুরী বাড়ীর পরিমণ্ডলে প্রায় অবিশ্বাস্য প্রেমের দোলায় দুলেছে নায়ক আন্দু। এরপর সে নিল পুলিশের চাকুরি। কিন্তু এখানেও এক অতৃপ্তি তাকে অস্থির করে তুলল, ফলে সে মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিল অন্য পথ। সে জাহাজে বিদেশে পাড়ি দিল। এমনি নানা নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে কাহিনী বৃত্ত রচনা করতে বসে শৈলবালা শেখ আন্দুর মানস জগতের যে দ্বন্দ্ব তাও সুন্দরভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। তবে আধুনিক অর্থে যাকে মনোবিশ্লেষণ বলি, নিশ্চয়ই ততটা গভীরতায় এই প্রয়াস পৌঁছায়নি। তবে সমুদ্র ও জাহাজ যাত্রার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে তা স্থায়ী সম্পদ রূপেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তাই কি বিষয় বিচারে, কি বর্ণনা শক্তিতে ও চরিত্র সৃষ্টিতে শৈলবালা স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরো তিনটি উপন্যাস 'নমিতা'

(১৯১৮) 'জন্ম অপরাধী' (১৯২০) ও 'অরু'-র (১৯৩৯) নাম করতে হয়। এ ছাড়াও 'বিভ্রাট' ও তেজস্বী উল্লেখ্য।

স্বল্পখ্যাত শৈলবালার মতই আরো যেসব বাঙালী মহিলা ঔপন্যাসিকদের নাম করা যায় তাঁদের মধ্যে কুসুমকুমারীর 'শুভবিবাহ', ইন্দিরা দেবী ওরফে সুরূপাদেবীর 'স্পর্শ মণি' (১৯১৭), পূর্ণশশী দেবীর 'পথে বিপথে', পুষ্পলতা দেবীর 'মরুতৃষ্ণা' ও বহুপ্রসূ প্রমীলা কথাশিল্পী প্রভাবতীদেবী সরস্বতীর উল্লেখ করতে হয়। প্রভাবতীদেবীর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল 'অন্ধ' (১৯১৫) 'আয়ুষ্মতী', 'বিজিতা' 'হৃদয়ের চাপে' (১৯২১) 'দানের মর্যাদা' (১৯২৫) 'সংসার পথের যাত্রী' (১৯২৫) 'জীবন মুক্তির আহ্বান' (১৯২৬)। এ ছাড়াও আরো অনেক উপন্যাস আছে তার মধ্যে 'নিশীথের চাঁদ' উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

সর্বশেষে আলোচনায় উপস্থাপিত হবেন সেই কথাশিল্পী যিনি 'অমলা দেবী' ছদ্মনামের অন্তরালে নিজেকে গোপন রেখেও দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস উপহার দিয়ে ছিলেন — 'সুধার প্রেম' (১৯৪০) ও 'সরোজিনী' (১৯৪২)। প্রতিভাশালিনী এক মহিলা কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে বলে মনে হয়েছিল সেকালের পাঠকদের, পরবর্তী কালে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে ইনি এক পুরুষ-প্রতিভা। কেন পরবর্তী পর্যায়ে এই নিঃসংশয় বিশ্বাস ? প্রকৃত পক্ষে, আধুনিককালের সমালোচকেরা 'সুধার প্রেম' উপন্যাসে সুধার ভয়াবহ সমস্যা ও কারুণ্যের আর 'সরোজিনী'তে নায়িকার কার্যকলাপ বর্ণনায় পুরুষোচিত দৃষ্টিভঙ্গিই আবিষ্কার করেছেন। আসলে এই দুই উপন্যাসে পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত পরিধি, আবেগহীন জীবন সমালোচনা, কাব্যের সুসংযত পরিমিতিবোধ, ভাবাদ্রতার অনুপস্থিতি ও কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক সরলতায় নারী অপেক্ষা পুরুষ স্রষ্টার স্পর্শই যেন বেশী পরিমাণে অনুভূত হয়। তবুও এই উপন্যাস দুটি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

উপসংহার টানার পূর্বে একটি বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত না করলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। লক্ষ্য করার বিষয়—আলোচিত মহিলা ঔপন্যাসিকেরা 'কল্লোল' 'কালি কলম' 'সংহতি' ও 'ধূমকেতু'র সময় কালের কিছু আগে উপস্থিত হয়ে এই কালের পরবর্তী বেশ কিছু সময় ধরে উপন্যাস রচনায় যুক্ত থেকেও (অর্থাৎ ১৯১৮ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সময়ে) কখনও তৎকালীন যে সাহিত্যান্দোলন ঘটে গিয়েছিল, সাহিত্যের যে নতুন দিগন্ত ক্রমোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার দ্বারা কোন ভাবেই প্রভাবিত হয়নি। এমনকি বিষয় নির্বাচনে, চরিত্র সৃজনে বা উপস্থাপনে - কোথাও এই পরিচয় স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান জরুরি !

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিম-উপন্যাস ঃ বিচিত্র চরিত্রের চিত্রশালা

| এক

কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পুরুষ ও নারী চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত করাই আমাদের এ আলোচনার লক্ষ্য। বস্তু, চরিত্র, সংলাপ, কাল ও ঘটনা-সংস্থান, স্টাইল এবং জীবনদর্শন—উপন্যাসের এই ছয়টি উপাদানের মধ্যে বস্তু ও চরিত্রের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে পণ্ডিত মহলে একদা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন, উপন্যাসে চরিত্র-সৃষ্টিই মুখ্য, আবার অ্যারিস্টটলের নাটক বিচারের সূত্র মনে রেখে কেউ কেউ বস্তু বা প্লটকেই গুরুত্ব দিতে চান। এই দুয়ের বিরোধ ছাড়াও পরবর্তীকালে কেউ কেউ জানিয়েছেন যে সামাজিক অবিচার-অন্যায়ের বিরুদ্ধে তর্ক এবং সেই সূত্রে সমাজ-চিত্রই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করবে। আরো পরে উপন্যাসে এসেছে মনোবিশ্লেষণের পথ ধরে 'চেতনা-প্রবাহ' (stream of consciousness). এই মতবাদের সমর্থকেরা বলেন বাইরের ঘটনায় চরিত্রের সচেতন ও অবচেতন সত্তা আন্দোলিত হলে মনের মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতি যে অবিরাম নিগূঢ় প্রবাহ দেখা দেয়, তাকে আশ্রয় করে ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করাই ঔপন্যাসিকের কাজ। ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য সম্পর্কে এই নানা মতের মধ্যে একটি সত্য অস্বীকার করা যায় না যে উপন্যাসে গল্প, মনোবিশ্লেষণ, তর্ক, ব্যক্তিত্ব পরিচয়—যাই থাক না কেন, তা হবে চরিত্র-আশ্রয়ী। আর চরিত্রের মধ্য দিয়েই মানব জীবন সম্পর্কে একটি গভীর ও ব্যাপক সত্যকে রূপ-দানই তার কাজ।

বঙ্কিমচন্দ্র এক হিসেবে বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা। যে ভাঙা-গড়ার কালে তিনি এসেছিলেন, তখন সমাজ চিত্রও তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট নয়। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির কোনো ঐতিহ্যই তাঁর চোখের সামনে ছিল না। তাই তর্ক, মনো-বিশ্লেষণের অতি সূক্ষ্ম গভীরতা, 'চেতনা-প্রবাহ'-এর আলোকে উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করি না। তিনি গল্পকে বা বস্তুকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েও চরিত্র চিত্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর চরিত্র চিত্রণে গভীরতার অভাব নেই, কিন্তু বিশ্লেষণের অভাব কতকটা আছে। চোখে দেখা জী ও সর্বস্তরের সামাজিক মানুষের অভিজ্ঞতা কম থাকায় তাঁকে সৃষ্টিশীল বা বিত্বপূর্ণ কল্পনার সহায়তা নিতে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই এবং ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার দিকেই তাঁর প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা গেছে।

উপন্যাসের চরিত্র একদিক থেকে দুটি শ্রেণীর অন্তর্গত হতে পারে। কিছু কিছু চরিত্র হয় একরঙা—একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা ভাবের ওপর ভিত্তি করেই সেগুলির সৃষ্টি। অন্য দু'একটি ছোটখাটো বৈশিষ্ট্য থাকলেও একটিই বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। যখন একাধিক গুণ যুক্ত হয়ে চরিত্রটিকে সরল থেকে জটিল ক'রে তুলতে চায়, তখন তা

অন্য কোঠায় গিয়ে পড়ে। প্রথমোক্ত শ্রেণীটির নাম টাইপ চরিত্র—পূর্বে এ চরিত্রকে বলত 'humours'—এখন এ হল 'টাইপ' বা ফ্ল্যাট'—কখনো বা 'caricatures' এ চরিত্রকে একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করা চলে। আবির্ভাব মুহূর্তেই এ সব চরিত্রকে চেনা যায়। এ সব চরিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে না- এদের জন্যে ঔপন্যাসিককে কোন প্রতিবেশ সৃষ্টিও করতে হয় না। সহজেই পাঠক পাঠিকার মনকে এরা অধিকার করে বসে এবং পাঠের শেষেও এরা সহজেই স্মৃতিপথে উদিত হয়। উপন্যাসে জটিল চরিত্রের পাশে এদের অবস্থান বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, নানাভাবে তার শিল্পমূল্যকে বৃদ্ধি করে। অবশ্য কমিক চরিত্র হিসেবেই এদের সার্থকতা বেশী। এদের ট্র্যাজিক ক'রে তুললে হয় অস্বস্তিকর। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কখনো কখনো এইসব চরিত্র অবলম্বনে 'wonderful feeling of human depth' সঞ্চার করেন। আর রাউন্ড বা জটিল চরিত্রই হ'ল উপন্যাসের প্রকৃত গৌরব। এরা ট্র্যাজিক-ভার বহনে এবং সর্বপ্রকার অনুভূতি প্রকাশে সক্ষম। ঘটনার মধ্য দিয়ে বা ঘাত প্রতিঘাতে এই শ্রেণীর চরিত্র বিকশিত হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের শক্তি অশক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা এই চরিত্র চিত্রণে। এইসব চরিত্র 'Capable of surprising in a convincing way'.

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে দুই ধরণের চরিত্রই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সন্ন্যাসী জাতীয় চরিত্রগুলি সবই flat এমন কি 'দুর্গেশ নন্দিনী'র বিমলা ছাড়া আর সব চরিত্রই ব্যাপক অর্থে এই শ্রেণীভুক্ত। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস থেকেই round বা জটিল চরিত্র-সৃষ্টির দিকে তিনি মনোযোগী হয়েছেন। এই দুই শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে তাঁর সার্থকতা কিরূপ তা আমরা পরে লক্ষ্য করব।

ঔপন্যাসিকের চরিত্রগুলি বাস্তবতার পথেই অঙ্কিত হবে—এ দাবী আমরা করলেও মনে রাখতে হবে তারা বাস্তবের অবিকল প্রতিচ্ছবি নয়। আবার তারা অসম্ভাব্য কল্পনার অবাস্তব সৃষ্টিও নয়। বস্তুতান্ত্রিক লেখক বলতে যা বুঝি, বঙ্কিম তা না হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে বাস্তবতা-গুণের অভাবের জন্য চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ এমন মনে করা উচিত নয়। দেখতে হবে, তাঁর চরিত্রগুলি আমাদের কল্পনায় সত্য হয়ে উঠেছে কিনা (real to our imagination) কিংবা সেই Trollope's phrase অনুযায়ী তারা মাটির ওপর ঠিক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কিনা (Do they stand upon the ground ? অথবা Forster এর কথায় তারা আমাদের শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত করছে কিনা ! এই মানদণ্ডে বিচার করলে বঙ্কিমের বহু চরিত্রই উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে সার্থক।

উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণ পদ্ধতিও দু' রকম—প্রত্যক্ষ বা বিশ্লেষণাত্মক (analytical) এবং গৌণ বা নাটকীয় (dramatic). প্রথম পদ্ধতিতে ঔপন্যাসিক বাইরে থেকে চরিত্র চিত্রণ করেন—তাদের ভাবাবেগ, উদ্দেশ্য, চিন্তা এবং অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করেন, ব্যাখ্যা করেন, মন্তব্য করেন এবং কখনো বা তাদের সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত জোরের সঙ্গে জানিয়ে দেন। অন্য পদ্ধতিতে তিনি দূরে থাকেন। চরিত্রগুলিকে নিজস্ব পথে বিকশিত হবার সুযোগ দেন—নিজেদের কথায় ও কাজে এবং অন্য চরিত্রের কথায় তাদের

আত্মবিশ্লেষণকে তুলে ধরেন—এ ছাড়া আরো একটি পথেও চরিত্র চিত্রিত হতে পারে—একে আত্মজৈবনিক পন্থা (auto biographical) বলে। ঔপন্যাসিক নিজে এখানে কিছু বলেন না—উত্তম পুরুষে কোন চরিত্র বা চরিত্রগুলি কথা বলে যায়। একই উপন্যাসে প্রথম দুই পদ্ধতির সাধারণতঃ মিশ্রণ থাকে আর তৃতীয় পন্থাটি আদ্যন্ত কোন বিশেষ উপন্যাসে অবলম্বিত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রথম দুই পদ্ধতি তো প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসেই লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর 'রজনী' এবং 'ইন্দিরা'-তে তৃতীয় রীতিটিরও প্রয়োগ লক্ষ্য করি।

ঔপন্যাসিকের চরিত্র চিত্রণ সম্পর্কে এই সাধারণ কয়েকটি কথা মনে রেখে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পুরুষ ও নারী চরিত্র পরিচয়ে অগ্রসর হচ্ছি।

[দুই]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অসংখ্য পুরুষ ও নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। ঐতিহাসিক, সামাজিক, তান্ত্রিক, সমস্যামূলক, দেশপ্রীতি বিষয়ক—নানা উপন্যাসে বিভিন্ন প্রয়োজনে বহু চরিত্রেরই দেখানে ভিড়। আমরা তাঁর সৃষ্ট প্রধান চরিত্রগুলির কথাই বলব, তবে যেসব চরিত্র সৃষ্টিতে যেখানে বঙ্কিম মানসের বিশেষ কোনো দিক উজ্জ্বল হয়েছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করব।

পুরুষ এবং নারী চরিত্র নিয়েই উপন্যাস—এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দেশভেদে সমাজভেদে পরিবার ভেদে সব পুরুষ বা সব নারী চরিত্র এক নয়। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাও চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষাও চরিত্রের রূপ পরিবর্তিত করে। আবার সকলের মনের গড়ন এক রকম নয়। কারো মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্য, কারো মধ্যে হৃদয়ধর্মের প্রাবল্য। কারো মর্যাদা সমাজে স্বীকৃতি পেলে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব আত্মস্বাচ্ছন্দ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যেরও অন্ত নেই। কেউ দুর্বল বা ভীরু, কেউ সাহসী বা তেজস্বী। কেউ নির্বোধ, কেউ বুদ্ধিমান বা অতিশয় চতুর। কেউ হাস্যরসিক বা বাক্‌পটু, কেউ গম্ভীর বা স্বল্পবাক। কেউ ভোগী ও অসংযত কামনার দাস, কেউ সংযমী বা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। কেউ স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা কেউ বা উদার হৃদয় পরার্থপর আদর্শবাদী। পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্র সম্পর্কেই এ সব কথা সত্য। আবার সমাজে একই পুরুষ বা নারী পারিবারিক সম্পর্কের দিক থেকেও তার নানা রূপ। কেউ পিতা, কেউ সন্তান, কেউ প্রণয়ী যুবক বা ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় কিংবা আরো নানা পরিচয়ে তিনি বিশিষ্ট। নারীও সেইরূপ কন্যা, বধূ, গৃহিণী, মাতা ইত্যাদি রূপে পরিচিতা। এ ছাড়া রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাণী বা বেগম, জমিদার, পুরোহিত, জ্যোতিষী, দাস-দাসী, তান্ত্রিক, দস্যু ইত্যাদি পরিচয়েও চরিত্রকে আমরা দেখতে পাবি। মোটকথা উপন্যাস বস্তুতান্ত্রিক পথে জীবনেরই দর্পণ—সে জীবনে যেমন বহু বৈচিত্র্য, বহু স্তর, বহু রূপ উপন্যাসেও ঠিক তাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস (বাংলা ভাষায়) 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ঐতিহাসিক রোমান্স। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে বাংলার সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছিল। যে হিন্দুসমাজে তিনি জন্মেছিলেন সেই সমাজ ও ধর্ম একটি অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রথম উপন্যাস রচনাকালে সমাজের রূপটি খুব স্পষ্ট না থাকায়, তিনি কল্পনার ওপরে অধিক নির্ভর ক'রে রোমান্স রচনা করলেন। ইতিহাস যে-টুকু এই দুর্গেশনন্দিনীতে আছে, তার পরিমাণ স্বল্প। তবুও ঐতিহাসিক একটি পরিমণ্ডলের মাঝখানে—সেই মোগল পাঠানের বিরোধের জাঁতাকলে গড় মান্দারণের একজন ভূস্বামীর পারিবারিক জীবন কিরূপ দলিত হয়েছিল, তা এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। ইতিহাসের ঝঞ্ঝায় কয়েকটি জীবন আলোড়িত হয়ে যে সাহস, বীরত্ব, ত্যাগ ও দুঃসাহসিক কাজ করেছে, যে গতিবেগের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মধারাকে ছুটিয়েছে, তা সাধারণ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় সম্ভবপর ছিল না। প্রথম উপন্যাস রচনার সময়ে বহুলাংশে কল্পনার ওপর যেমন বঙ্কিমকে নির্ভর করতে হয়েছিল, তেমনি ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কটের 'আইভ্যান হো'র প্রভাব হয়তো কতকটা তাঁকে চালিত ক'রে থাকবে। 'আইভ্যান হো'র লেডি রোয়েনা এবং রেবেকা, 'দুর্গেশনন্দিনী'র তিলোত্তমা ও আয়েষার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্তা। স্কটের Bois guilbert এবং Ivanhoe বঙ্কিমের ওসমান ও জগৎসিংহ, 'আইভ্যান হো'র Wamba এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিদ্যাদিগ্‌গজে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। অবশ্য পার্থক্যও যথেষ্ট Rowena র দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ তিলোত্তমায় নেই। রেবেকা চরিত্রের পূর্ণতাও আয়েষাতে নেই। Wamba fool হলেও অত্যন্ত চতুর, বঙ্কিমের বিদ্যাদিগ্‌গজে এই চাতুর্য নেই।

সে যাই হোক, মানসিংহ, কতলু খাঁ, বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ, ওসমান, বিদ্যাদিগ্‌গজ ও অভিরাম স্বামী প্রধানতঃ এই কয়েকটি পুরুষ চরিত্র এবং বিমলা, তিলোত্তমা ও আয়েষা—এই তিনটি নারী চরিত্র নিয়েই এই উপন্যাস।

ইতিহাসের ঝটিকায় বেগবান ঘটনাধারায় চরিত্র চিত্রণের অবকাশ বঙ্কিমচন্দ্র এখনে পাননি। বিদ্যাদিগ্‌গজ ও অভিরাম স্বামীকে বাদ দিলে বাকী সব চরিত্রই তো ঐতিহাসিক। কিন্তু এঁদের ঐতিহাসিক পরিচয়ও যেমন অল্প, তেমনি জগৎসিংহ ও ওসমান ছাড়াও আরো কোন ঐতিহাসিক পুরুষ চরিত্রের ফাঁক কল্পনার সাহায্যে ভরাট করার তেমন চেষ্টা নেই। শুধু অল্প দু' একটি রেখার টানে তিনি চরিত্রগুলির একটি স্থূল পরিচয় দিয়েছেন। দুর্গস্বামী বীরেন্দ্র সিংহের মোগল সেনাপতি মানসিংহের প্রতি ক্রোধ ও তীব্র বিদ্বেষ গুরুর নির্দেশে ও কন্যা বাৎসল্যে শেষ পর্যন্ত সেই মানসিংহের অনুগামী হতে সম্মতি, পাঠান কর্তৃক দুর্গ মধ্যে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েও তাঁর তেজ, অধীরতা, দাম্ভিকতা এবং বীরের মতো মৃত্যুবরণ তার চরিত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। মোটকথা বীরত্ব, চিত্তের অস্থিরতা, দাম্ভিকতা কন্যাবাৎসল্য ও গুরুভক্তি—এতোগুলি বৈশিষ্ট্য এ চরিত্রে থাকলেও এগুলিকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখানোর অবসর নেই। কতলু খাঁর নিষ্ঠুরতা ও ক্রোধ, মানসিংহের শৌর্য-বীর্যের সামান্য ইঙ্গিত মাত্রই আছে।

অভিরাম স্বামী অনৈতিহাসিক চরিত্র ও বীরেন্দ্র সিংহের গুরু। তিনি বহুদর্শী, তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং জ্যোতিষী। বীরেন্দ্রের কন্যার ভবিষ্যৎ গণনা করে তিনি তাঁকে মোগল পক্ষাবলম্বনের পরামর্শ দেন। এই ধরণের চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশেষ প্রবণতা যে ছিল, তা পরবর্তী অনেক উপন্যাসে দেখা যাবে।

জগৎসিংহ ও ওসমান ঐতিহাসিক চরিত্র। মানসিংহের পুত্র রাজপুত বীর সুদর্শন যুবক জগৎসিংহ। আর ওসমান, কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বীর সেনাপতি। কিন্তু এই দুই বীরের প্রেমিক রূপ কল্পনা করে বঙ্কিমচন্দ্র এদের মধ্যে বিশেষতঃ ওসমানের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব সৃষ্টি করেছেন। বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে প্রথম দর্শনে তিনি ভালোবেসেছেন। কিন্তু তার পিতৃ-পরিচয় জেনে তাকে পাওয়ার আশা ত্যাগ করলেও বিমলার নির্দেশে শেষ সাক্ষাৎ তার সঙ্গে করতে গিয়ে পাঠানদের হাতে তিনি বন্দী হয়েছেন—যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা শুশ্রূষার দ্বারা তাঁকে সুস্থ করতে গিয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু জগৎসিংহের তাঁর প্রতি কোন দুর্বলতা নেই। তিনি সুস্থ হয়ে দিগ্‌গজের কথায় তিলোত্তমার নবাবের উপপত্নী হওয়ার সংবাদ পেয়ে তাঁর চরিত্রে সন্দিহান হন। পরে অবশ্য তাঁর সে ভ্রম কতলু খাঁই দূর করেন। তখন আর এদের মিলনে কোন বাধা থাকে না। ওসমানও বীর মার্জিত রুচি, শিক্ষিত বুদ্ধিমান, মহৎ ও উদার। তিনি আয়েষাকে ভালবেসেছিলেন কিন্তু আয়েষা তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন। আয়েষা জগৎসিংহের প্রতি আসক্ত জেনে তিনি জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে দুজনেই আহত হন। সে যাই হোক, ইতিহাসগত পরিচয়ের সঙ্গে এঁদের প্রেমিক সত্তাকে যুক্ত করেই এ দুই চরিত্রের পরিকল্পনা। বিদ্যা দিগ্‌গজ মূর্খ ও তার কথবার্তা ও আচরণ হাস্যরস সৃষ্টি করে। তার দেহের দৈর্ঘ্য, নাসিকার মাংসবহুলতা আশমানির সঙ্গে অদ্ভুত প্রেম কল্পনা প্রভৃতি হাস্যরসের হেতু। টাইপ চরিত্র হলেও একে উচ্চস্তরের বলা যায় না।

নারী চরিত্রের মধ্যে বিমলা, তিলোত্তমা ও আয়েষার রূপ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই এঁদের পার্থক্যের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। বঙ্কিমের মতে তিলোত্তমার সৌন্দর্য বাসন্তী মল্লিকার মতো—'নবস্ফুট ব্রীরা সংকুচিত, কোমল নির্মল পরিমলময়। বিমলার সৌন্দর্য অপরাহ্নে স্থলপদ্মের মতো—"নির্বাস মুদিতোম্মুখ শুষ্কপল্লব অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধু পরিপূর্ণ। আর আয়েষার সৌন্দর্য নব রবিকর ফুল্ল জলনলিনীর মতো সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ· ···না সংকুচিত না বিশুষ্ক, কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল।' সংস্কৃত সাহিত্যের নায়িকাদের রূপ বর্ণনার রীতির সঙ্গে এই বর্ণনার সাদৃশ্য থাকলেও তিনটি চরিত্রকে তিনি যে স্বতন্ত্র করতে চাইছেন—এটি লক্ষ্য করবার। আমরা পরে দেখব, বঙ্কিমের প্রায় সকল নায়িকা নারীই সুন্দরী। বিমলার বয়স তিলোত্তমা ও আয়েষার থেকে অধিক হলেও সে সুন্দরী। তিলোত্তমা ফুলের মতোই কোমল। তার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না কিন্তু সৌন্দর্যে সে অতুলনীয়া। তিলোত্তমা ও আয়েষাকে অবলম্বন ক'রে ঔপন্যাসিক প্রেমের দুই রূপ দেখিয়েছেন। তিলোত্তমা ও আয়েষা দুইজনেই

জগৎসিংহকে ভালবেসেছিলেন। দুজনেরই প্রেম ছিল আন্তরিক ও গভীর। কিন্তু আয়েষা যখন জানলেন যে জগৎসিংহ তিলোত্তমাকেই হৃদয়-দান করেছেন, তখন তিনি এ দুয়ের মাঝখানে আর দাঁড়াতে চাইলেন না। জগৎসিংকে 'প্রাণেশ্বর' বলে ঘোষণা ক'রেও তিনি তিলোত্তমার জন্য জগৎসিংহকে ত্যাগ করলেন—অন্তরে জগৎসিংহের স্মৃতি রইল অম্লান হ'য়ে কিন্তু বাইরে মিলন হল না। জগৎসিংহ তাঁর সেবা যত্নে মুগ্ধ হলেও তাঁকে প্রেম-নিবেদন করেন নি। প্রতিদানহীন প্রেমের এমন চিত্র যতই আদর্শ-স্থানীয় হোক, বাস্তব জীবনে দুর্লভ। বিমলাই এ উপন্যাসের সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র। বুদ্ধিমত্তা, সাহস, বাক্‌পটুতা, গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। উপন্যাসে এমন চরিত্রই প্রত্যাশিত। গুরুতর বিপদে এ নারী যে নবাবের বুকে ছুরি বসাতেও দ্বিধাহীন, তাও আমরা বিমলার মধ্যে লক্ষ্য করেছি। পরে 'রজনী' উপন্যাসে লবঙ্গলতার মধ্যে এ-চরিত্রের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করব। একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে পুরুষ বা নারী চরিত্রাঙ্কনে কোন একটি স্থির আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হননি। বিমলা, উপন্যাসে দাসীরূপে নিজ পরিচয় দিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে তিলোত্তমার বিমাতা; কিন্তু তিলোত্তমার প্রতি তাঁর জননী সুলভ বাৎসল্যের চেয়ে সখীসুলভ আবেগেই অধিক। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পারস্পরিক আকর্ষণ ও মিলন কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত মনকে অধিকার করেছিল —আর সে কাহিনীকে সফল করার জন্যে বিমলার তৎপরতাই সর্বাধিক। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। এ উপন্যাসে কয়েকটি বীর পুরুষ চরিত্র থাকলেও নারীর শক্তিই অধিক—এ শক্তি দৈহিক নয়, তার আকর্ষণী শক্তির কাছে পুরুষ দুর্বল। ওসমানের মত বীরও আয়েষাকে কাতরস্বরে বলেছেন, 'আমি আশা লতা ধরিয়া আছি, আর কতকাল তাহার তলে জল সিঞ্চন করিব?' জগৎসিংহও তিলোত্তমা দর্শন থেকেই সম্পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত হয়েছেন। বিমলা চরিত্র অনেকখানি উজ্জ্বল।

[তিন]

'দুর্গেশনন্দিনী'র পরবর্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) রোমান্সধর্মী উপন্যাস হলেও দুর্গেশনন্দিনীর রোমান্স থেকে পৃথক। এখানে নারী চরিত্র বলতে কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি মেহেরউন্নিসা ও শ্যামাসুন্দরী এবং পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নবকুমার, কাপালিক ও অধিকারী। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও ইতিহাসের প্রভাব খুব বেশী নয়—বিশেষ ক'রে মূল কাহিনীতে এর কোন প্রভাব নেই—শুধু দূর অতীতে গল্পকে স্থাপন করার জন্যেই এসেছে ইতিহাস। মতিবিবি ও মেহেরউন্নিসা চরিত্র অবশ্য ইতিহাসের স্পর্শ আছে। এ উপন্যাস নায়িকা চরিত্র কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-কল্পনার এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। সমাজ সংসার ও লোকালয় থেকে নিতান্ত শৈশবে নির্বাসিত হয়ে সমুদ্রতীরের এক অরণ্যে কাপালিক আশ্রয়ে সে প্রতিপালিতা। এখন বনদুহিতা কপালকুণ্ডলা উদ্ভিন্নযৌবনা। দেবী ভবানীর কাছে কপালিক তাকে বলি দেবে নিজের সাধনায় সিদ্ধির জন্যে। কিন্তু মমত্ববশতই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক,

এখনও তাকে উৎসর্গ করা হয় নি। এই অরণ্যে আর এক পূজারী আছেন - তিনি মঙ্গলময়ী দেবী কালিকার ভক্ত-পূজারী। এই অধিকারীরও অপরিমেয় স্নেহলাভে কপালকুণ্ডলা ধন্যা। উন্মুক্ত অরণ্য প্রকৃতির প্রভাবও যেমন, তেমনি ভয়ঙ্করী ও কল্যাণময়ী শক্তিরূপা দেবীর প্রভাবও তার ওপর কম নয়। পথভ্রষ্ট তরুণ নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে স্বাভাবিক করুণাবশতঃ কপালকুণ্ডলা রক্ষা করেছিল। অধিকারীর চেষ্টায় ব্রাহ্মণ নবকুমারের সঙ্গে তার বিবাহও হয়েছিল। নবকুমার তাকে সপ্তগ্রামে নিজ বাড়ীতে এনেছেন বধূ বেশে। ভগ্নী ও স্বামীত্যক্তা শ্যামাসুন্দরীর ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল তার বন্ধনহীন মনকে সংসারমুখী করতে। কিন্তু কিছুতেই সংসারে তার আসক্তি জন্মাল না। তার এ দুর্বলতার সুযোগ নিল নবকুমারের পূর্বপত্নী মতিবিবি (পদ্মাবতী) ও কাপালিক। স্বামীর চোখে তিনি হলেন অবিশ্বাসিনী। কাপালিক স্বপ্ন দেখেছে কপালকুণ্ডলাকে দেবীর কাছে উৎসর্গ না করায় তার অপরাধ হয়েছে। তাই নবকুমারকে দিয়েই হবে কপালকুণ্ডলার বধ সাধন। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হল না। দেবীর আদেশ শুনেছেন—মৃত্যুর জন্য সে প্রস্তুত। মৃত্যুর পূর্বে জানালো যে সে অবিশ্বাসিনী নয়। নবকুমারের প্রেম উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু যেখানে কপালকুণ্ডলা দাঁড়িয়েছিল, সেখানকার ক্ষয়িতমূল তটদেশ গঙ্গার জলস্রোতে ভেসে গেল। কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে কবি বঙ্কিমের পরীক্ষার অন্ত নেই। বনবিহারিণী, সামাজিক জ্ঞানবর্জিতা, ভয়শূন্যা এই প্রকৃতি দুহিতা কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের গৃহিনী বা বধূ হতে হয়েছিল ঘটনাচক্রেই। তার মধ্যে ছিল আদিম নারীসুলভ সরলতা আর সহজ করুণা। সপ্তগ্রামে সে হ'ল মৃন্ময়ী। শ্যামাসুন্দরীর কেশবিন্যাসে ছিল না তার উৎসাহ, বনে বনে স্বচ্ছন্দে বিচরণেই ছিল তার আনন্দ। শ্যামার দুঃখে তার সহজাত করুণাই জাগ্রত হয়েছিল—তার অন্তরের গভীরে নবকুমারের কোনো স্থান ছিল না। পুরুষবেশী মতিবিবির ধৃত হস্ত ছাড়িয়ে নেওয়ায় এবং তার স্পর্শে শিহরিত হয়ে ওঠায় কিঞ্চিৎ সামাজিক বোধ তার মধ্যে অবশ্য দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া যে অবিশ্বাসিনী নয়—একথা স্বামীকে বোঝানোর মধ্যেও ঐ একই সামাজিক বোধ। তবু তার ওপর অরণ্যের ঐ দেবীর প্রভাবই প্রবল। আমাদের পরিচিত জগতে এমন নারীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে রহস্যময়ী কাব্যের জগতেই এমন নারী সম্ভব।

নানা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে মতিবিবির চরিত্র বেশ জটিল। তিনি নবকুমারের পূর্বপত্নী পদ্মাবতী। বাল্যবয়সেই নবকুমারের পিতা তাকে ত্যাগ করেন। ঘটনাচক্রে পদ্মাবতীর পিতা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হলে ঐ কন্যাও পরিত্যক্তা হয়। স্বামি-সুখ তার জীবনে আসে নি। আগ্রায় লুৎফুন্নেসা ও মতিবিবি নাম নিয়ে বিলাসের স্রোতে সে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিল। অনেককেই সে রূপের আকর্ষণে বশীভূত করেছিল—এমন কি আকবর তনয় সেলিমকেও। সম্রাজ্ঞী হওয়ার স্বপ্নও ছিল তার। কিন্তু মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিম আকৃষ্ট হওয়ায় তার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়। সেলিমের ওপর এর জন্যে সে প্রতিশোধও নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। মোগল অন্তঃপুরে বাস করলেও সে কাউকেই ভালোবাসে নি। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের

মধ্যেও তার অন্তরের তলদেশে ছিল একটি হাহাকার। চটিতে আকস্মিকভাবে পূর্বস্বামী নবকুমারকে দেখে তার সেই হাহাকার তীব্র হয়ে উঠল। তাঁর মধ্যে দেখা দিল আশ্চর্য পরিবর্তন। সে সব কিছু ত্যাগ করে নবকুমারকেই পেতে চাইল। কিন্তু এই ভোগ-পঙ্কিল কদর্য জীবন যাপনের পর নবকুমার তাকে কেনই বা গ্রহণ করবেন? এ কথা সচেতন মনে জেনেও সে হৃদয়ের দাবীতে নবকুমার লাভের আশায় দিন গুণতে লাগল। নবকুমার রূঢ়ভাবে তার সকল প্রলোভন তুচ্ছ ক'রে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এমন কি তার দাসী হয়ে থাকার সাধও মেটালেন না তিনি। তখন কপালকুণ্ডলাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাপালিকের চক্রান্তে সে যোগ দিল। কিন্তু তার সে প্রয়াসও সফল হল না। মতিবিবি অত্যন্ত জটিল চরিত্র। সে সুন্দরী, শিক্ষিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী আবার প্রয়োজনে প্রতিহিংসাময়ী। নবকুমারের সঙ্গে চটিতে সাক্ষাতের পূর্বে তার মধ্যে প্রেম জাগ্রত হয় নি। প্রেমের তাড়নায় অনেক কিছুই সে করেছে—কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে বধ করার কথায় তার অন্তর সায় দেয় নি। তবু তার হৃদয়ের হাহাকার ঘুচল কৈ?

জটিল চরিত্র-চিত্রণ লক্ষ্য করা গেছে মেহেরউন্নিসাকে আশ্রয় করেও। সেও অপরূপ সুন্দরী বুদ্ধিমতী নারী। যৌবনে তার রূপের জালে সেলিম বন্দী হয়েছিলেন, সেও তাঁর প্রতি আসক্তা হন। অবশ্য বিবাহের পর কায়মনোবাক্যে স্বামী-সেবা করলেও তার অন্তরের অবচেতন স্তরে সেলিমের প্রতি একটি দুর্বলতা ছিলই। সেলিম জাহাঙ্গীর হলে অতর্কিতভাবে তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, "সেলিম দিল্লীর সিংহাসনে, আর আমি কোথায়?" জাহাঙ্গীর তার স্বামী শের আফগানকে হত্যা করলে সে তাঁকে ক্ষমা করতে পারে নি ঠিকই, কিন্তু ঐ দুর্বলতা থেকেও তার ছিল না মুক্তি। মেহেরের জীবনে এই সচেতন ইচ্ছা ও ঐ অবচেতনের কামনা দুই-ই লক্ষণীয় হয়ে চরিত্রটিকে জটিল করেছে।

শ্যামা-সুন্দরী এ উপন্যাসের গৌণ চরিত্র। সেও সুন্দরী ও যুবতী। কিন্তু কুলীন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা বলে সেও স্বামী সেবার সুযোগ পায় নি। এমন স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা যুবতীর ওপর ভার ছিল কপালকুণ্ডলাকে 'মৃন্ময়ী' করার। জীবনে তার দুঃখের অন্ত নেই—তবু সে বাইরে প্রসন্না। স্বামী এতো নিকটে থাকা সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলা কেন এমন উদাসীন তা সে বুঝতে পারে না। তাঁর ধারণা কপালকুণ্ডলার কোলে একটি সন্তান এলেই তার সংসারে মন বসবে। এই শ্যামারই স্বামীকে বশ করার জন্যে বনে ওষুধ আনতে গিয়ে কপালকুণ্ডলার জীবনে এল শোচনীয়তা। কপাল-কুণ্ডলাকে রাত্রিতে বাইরে যেতে যে শ্যামা নিষেধ করতো, সে কেন তাকে পাঠাল? আত্মস্বার্থ? অশিক্ষিতা নারীর এ অপরাধ হয়তো মার্জনীয়।

এ উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে প্রথমেই নবকুমারের কথা। নবকুমার শিক্ষিত, সাহসী, সৌন্দর্যরস রসিক ও পরোপকারী। কাষ্ঠ আহরণের ব্যাপারে গ্রন্থের শুরুতেই তাঁর এ সমস্ত গুণের পরিচয় মেলে। কাপালিকের খর্পর থেকে কপালকুণ্ডলা তাঁকে উদ্ধার করেছিল ব'লে তিনিও তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। অধিকারীর মতে তাঁর উক্তিতে প্রমাণ পাই তিনি নিজ জীবন দান করেও কপালকুণ্ডলাকে ঐ হৃদয়হীন

কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রস্তুত। অবশ্য কপালকুণ্ডলাকে বিবাহের মূলে অবশ্য একমাত্র কৃতজ্ঞতাই কাজ করে নি—রূপাসক্তির প্ররোচনাই ছিল প্রবল। মতিবিবির সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রলোভন তিনি যেভাবে তুচ্ছ করেছিলেন, তাতে তাঁর গভীর আত্মসংযমের পরিচয় আছে। তবুও এ চরিত্রে দুর্বলতাও কম ছিল না। পদ্মাবতীর বয়স যখন বারো, তখন তিনি সেই বিবাহিতা বালিকাকে শয়নগৃহ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীলা কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করতে তিনি পারেন, কিন্তু ঘটনার ফেরে পিতার মুসলমান হয়ে যাওয়ায় তিনি পিতৃ-অনুগতো পত্নীকে ত্যাগ করেছিলেন কেন? মতিবিবির জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর দায়িত্ব কিছু কম? আবার কপাল-কুণ্ডলাকে গৃহে নিয়ে এলেও তার প্রতি স্বামীর যে কর্তব্য তা তিনি ঠিক পালন করেন নি। কপালকুণ্ডলাকে তিনি অবিশ্বাসিনী ভেবেছেন। মতিবিবির পুরুষ বেশ বোঝবার বুদ্ধি তাঁর নেই। তিনি কপালকুণ্ডলাকে অবিশ্বাসিনী ভেবে আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন, আবার কাপালিকের প্ররোচনায় বধ করতেও চেয়েছেন। শেষের দিকে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রেম আরো একটু পূর্বে জাগ্রত হল না কেন? বহু সদগুণ থাকা সত্ত্বেও রূপাসক্তি, বুদ্ধির অভাব এবং স্বামীর কর্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা তাঁর চরিত্রের প্রধান ত্রুটি।

নিজ প্রতিবেশে কাপালিক চরিত্রটি স্বাভাবিক ও জীবন্ত। বিকটদর্শন তাঁর কণ্ঠে অস্থিমালা, চারপাশে নরকঙ্কাল আর নর রক্তেই তাঁর দেবী সাধনা। সাধনার এ পথ বীভৎস। কিন্তু এখানে তাঁর নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কপালকুণ্ডলা তাঁর পালিতা কন্যা হলেও তিনি দেবীপূজার উপচার। কপালকুণ্ডলা তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে পলায়ন করায় তিনি দেবীর কাছে অপরাধী এ স্বপ্ন তাঁর মিথ্যা নয়। তবুও বধ্যভূমিতে কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁর একবিন্দু করুণাও দেখা গেছে। তাঁর আচরণ যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন, তাঁর আচরিত ধর্মের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ।

এই কাপালিকের বিপরীত চরিত্র অধিকারী। তাঁর দেবী ক্ষেমংকরী। কপালকুণ্ডলাকে তিনি বলতেন 'মা'। নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে এই মাকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য ও রসিকতা লক্ষ্য করা যায়।

[চার]

'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসে মৃণালিনী, মনোরমা ও গিরিজায়া এই তিনটি প্রধান নারী চরিত্র। 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী উপন্যাস হলেও এর চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য নয়। দুর্গেশনন্দিনীর কিছু কিছু চরিত্রের সঙ্গে এ উপন্যাসের চরিত্রের মিল লক্ষ্য করা যায়—অবশ্য 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে মোটা তুলিকায় অংকন এখানে তা আরো কিছু সূক্ষ্মতা লাভ করেছে। সুন্দরী মৃণালিনীর প্রকৃতি স্বভাবতই শান্ত। স্বামী হেমচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। স্বামী তাঁর প্রতি অবস্থা-বিশেষে দুর্ব্যবহার করেছেন, চরিত্রে সন্দিহান হয়েছেন, তথাপি অবিচল তাঁর স্বামী ভক্তি। ক্ষমাশীলতাও তাঁর চরিত্রকে সুন্দর করেছে। দুঃখের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় তাঁর মতো

শান্ত নারীরও তেজ আমরা লক্ষ্য করি, তিলোত্তমার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও এ চরিত্র অনেক পরিণত।

এ উপন্যাসে মনোরমার চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিম অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আয়েষার কাছে তিলোত্তমা অনেকখানি ম্লান, তেমনি মনোরমার কাছে মৃণালিনীও। মনোরমার বয়স পঞ্চদশ কি ষোড়শ বঙ্কিম তা স্পষ্টভাবে বলেন নি। মন্ত্রী পশুপতির কথায় মনোরমা "গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী।' তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতিভার দীপ্তি এবং হেমচন্দ্রের আহত অবস্থায় তাঁর সেবা আয়েষার কথা স্মরণে আনে। সে নিজেকে বাল্যবিধবা বলেই জানে যদিও পশুপতিই তাঁর স্বামী। তিনি হেমচন্দ্রের সেবা করলেও তাঁর প্রতি অনুরাগবতী নন। এ চরিত্রটিও বেশ জটিল এবং রহস্যময়। মনোরমার রূপের কথায় বঙ্কিম বলেছেন, 'বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ'। হেমচন্দ্র প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে বালিকাই মনে করেছেন ; কিন্তু গভীর রাত্রিতে পরে ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে তাঁকে গায়ের জ্বালা মেটাতে দেখে এই লজ্জাহীনা ভয়শূন্যা মনোরমা মানবী কি না সে সন্দেহ জেগেছে। পশুপতিও মনোরমার আনন্দময়ী 'সরলা বালিকামূর্তি' এবং গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রখর বুদ্ধিশালিনী—দুই মূর্তিই দেখেছেন। আয়েষার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার রহস্যময়তা কতকটা তার চরিত্রে সম্মিলিত হয়েছে যেন।

বিমলার সাহস, গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা গিরিজায়ার হয়তো নেই, কিন্তু বিমলার পরিহাস রসিকতা এবং প্রসন্নতা গিরিজায়া চরিত্রে লক্ষণীয়। তার কণ্ঠের গানগুলি উপন্যাসের বড় সম্পদ। তার বুদ্ধিমত্তা ও রসজ্ঞতার পরিচয় আছে এই গানগুলিতে। তার বিবাহোত্তর জীবনে তার কণ্ঠের অবারিত উৎসার আর লক্ষ্য করি না।

'মৃণালিনী'র পুরুষ চরিত্রের মধ্যে হেমচন্দ্র, পশুপতি ও মাধবাচার্যের কথা বলতে হয়। হেমচন্দ্রের সঙ্গে জগৎসিংহের এবং মাধবাচার্যের সঙ্গে অভিরাম স্বামীর সাদৃশ্যের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। জগৎসিংহের চেয়ে হেমচন্দ্রের চরিত্র অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ এবং বাস্তব। তিনি বীর এবং দেশপ্রেমিক। যে বক্তিয়ার খিলজি তাঁর পিতৃরাজ্য হরণ করেছিলেন, তাঁকে তিনি ক্ষিপ্ত হস্তীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন স্বহস্তে বধ করবেন বলেই। নবদ্বীপে তিনজন আক্রমণকারীকে পর্যুদস্ত করার ব্যাপারেও তাঁর বীরত্বের পরিচয় পাই। বীরত্বের সঙ্গে প্রেম জগৎসিংহের মতো তাঁর চরিত্রেও আছে, কিন্তু অতিরিক্ত আছে দেশপ্রেম, অধৈর্য, অভিমান, মোহ ও ক্রোধ। তথাপি এ চরিত্রটি উপন্যাসে সার্থক হয়ে ওঠেনি। মাধবাচার্য তাঁকে যবনের প্রতিদ্বন্দ্বী করতে চেয়েছিলেন মৃণালিনী থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন ক'রে। মৃণালিনীর মোহেই তিনি পিতৃরাজ্য হারান। আবার গৌড়ে মাধবাচার্য সামন্তরাজদের ঐক্যবদ্ধ করার যে দায়িত্ব তাঁকে দেন, মৃণালিনীর চিন্তায় তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। যথার্থ নায়ক চরিত্রের গুণ তাঁর মধ্যে লক্ষণীয় হয় নি। মনোরমা ও গিরিজায়ার চোখে তিনি বীর নন। অবশ্য জগৎসিংহের মতো ইনিও স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান ও পরে তাঁরই মতো সন্দেহনিরসন ঘটেছে।

পশুপতি রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী। বাল্যবিধবা মনোরমা তার স্ত্রী হলেও তিনি তা জানেন না। তিনি তার রূপে মুগ্ধ। তাকে বিবাহে ইচ্ছুক হলেও সমাজের ভয়ে এ কাজে অগ্রসর হতে পারছেন না। রাজা হলে সে ভয় থাকবে না—তাই লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেবার জন্যে তাঁর ষড়যন্ত্র। যখন তিনি জানলেন, মনোরমা তার পূর্ব পরিণীতা স্ত্রী, তখন বিলম্ব হয়ে গেছে খুব। মুসলমানেরা জয়ী হলেন বটে, কিন্তু তাকে রাজা করা তো দূরে থাক, তাকে বধ করল তারা। স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, কামপরায়ণ চরিত্র পশুপতি।

মাধবাচার্য অভিরাম স্বামীর শিষ্য জ্যোতিষ চর্চা করেন। তার রাজনৈতিক জ্ঞানও স্বচ্ছ। তারই নির্দেশে হেমচন্দ্রের সকল সক্রিয়তা। ইনি হেমচন্দ্রের গুরু।

'চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) উপন্যাসে চন্দ্রশেখর প্রতাপ ও শৈবলিনী প্রধান চরিত্র এবং মীরকাশিম, লরেন্স ফস্টর, দলনী, সুন্দরী, রূপসী অপ্রধান চরিত্র। নারী চরিত্রের মধ্যে শৈবলিনীর চরিত্র সর্বাপেক্ষা গোলা এবং জটিল। বঙ্কিমের অন্যান্য নারীর মত শৈবলিনীও সুন্দরী। বিমলা ও মতিবিবির সাহস তার ও আছে। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য বিমলা ও মতিবিবিকে ছাড়িয়ে গেছে। তিনি বাল্যে প্রতাপ নামক এক কিশোরকে ভালোবেসেছিলেন—প্রতাপও। কিন্তু প্রতাপ তাদের জ্ঞাতি বলে এ বিবাহ সম্ভব নয়। তাই প্রেমের দায়ে দুজনেই গঙ্গার জলে ডুবে মরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রতাপ ডুবলেও শৈবলিনী জীবনের মায়ায় ডুবলেন না—ভাবলেন 'প্রতাপ আমার কে'। প্রতাপকে চন্দ্রশেখর নামক এক শাস্ত্রানুশীলনে তন্ময় স্বল্পভাষী যুবক উদ্ধার করলেন। এঁরই সঙ্গে হল শৈবলিনীর বিবাহ। নিরন্তর পড়াশোনায় ব্যাপৃত এমন স্বামীর সঙ্গে প্রবৃত্তিময়ী শৈবলিনীর সংসার সুখের হল না। বাল্যের এ প্রতাপের প্রতি আকর্ষণ তাকে চঞ্চল করে তুলল। আট বছর চন্দ্রশেখরের ঘর করেও তিনি লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে একদা গৃহত্যাগ করলেন প্রতাপের আশায়। প্রতাপ তাকে কৌশলে উদ্ধার করতে গিয়ে বন্দী হয়েছেন—তিনিও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতাপকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিবাহিত প্রতাপ শৈবলিনীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। শৈবলিনী যে প্রতাপের আকর্ষণে এমন দুঃসাহসিক কাজ করলেন, তা ব্যর্থ হল। প্রগল্‌ভতা ও পরিহাস-রসিকতা যা শৈবলিনীর মধ্যে আছে, তা বিমলা, গিরিজায়াতেও আছে। কিন্তু তার অসামান্য সাহস বিস্ময়কর। তিনি লরেন্স ফস্টরকে ছুরি দেখিয়ে বশীভূত করেন, নিশ্চিন্তে ইংরেজদের নৌকায় তিনি নিদ্রা যান। প্রতাপকে উদ্ধারের জন্যে তার স্ত্রীরূপে পরিচয় দেন। কিন্তু এত করেও প্রতাপকে তিনি পেলেন না। আর তখন থেকেই দেখা দিল তার চিত্তে দারুণ অনুতাপ। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত বা মানস-নিগ্রহ অবলম্বন করে এসেছে এক যন্ত্রণা। এই প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে তার প্রতাপমুখী মন হয়েছে চন্দ্রশেখরমুখী। মানস-ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হলেও তিনি যে দৈহিক দিক থেকে ভ্রষ্টা নন এই প্রমাণ দেওয়া হয়েছে রমানন্দের সহায়তায়। রমানন্দই যোগবলে করেছেন তার চিকিৎসা। তার প্রবৃত্তির পথে প্রবল অসংযম ও

আত্মবিসর্জনে কুণ্ঠার জন্যেই বঙ্কিম তাঁকে বলেছেন 'পাপিষ্ঠা'। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত বর্ণনা অতি উচ্চ কবি কল্পনার নিদর্শন হলেও এখানে নীতিবাদী বঙ্কিম অনেকখানি ধরা দিয়েছেন। অবশ্য শিল্পী বঙ্কিম উপন্যাসের শেষদিকে এই শৈবলিনীকে দিয়ে যখন বলান 'স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বসে থাকিবে জানি না'। কিংবা প্রতাপকে বলেন, "তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।" তখন মনে হয়, প্রায়শ্চিত্ত দৃশ্যের সকল জবরদস্তিকে ঠেলে তার অন্তর কথা কয়ে উঠেছে। আর এখানেই শিল্পী বঙ্কিমের জিত।

এই শৈবলিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র স্বামীগতপ্রাণা দলনী বেগম। স্বামীকে ত্যাগ করে প্রত পের অভিসারে পথে বের হয়েছেন শৈবলিনী, আর স্বামীর কল্যাণের জন্যে পথে বেরিয়েছেন দলনী। কিন্তু সরলা কোমলা এই নারী পথে বেরিয়ে অদৃষ্টের চক্রান্তে জীবনের শোচনীয় পরিণামকে ডেকে আনলেন। রাজ অন্তঃপুরে তিনি আর ফিরতে পারলেন না। রমানন্দ স্বামী তাকে প্রতাপের বাসায় রেখে এলেও তিনি ইংরেজদের দ্বারা অপহৃতা হলেন। স্বামীর সঙ্গে মিলনের আশায় তিনি ফস্টরের নৌকাও ত্যাগ করলেন শেষে অবস্থা এমনই হল যে স্বামী মীরকাশিম তাকে বিষ খেয়ে প্রাণ দিতে বললেন। তকী খাঁর কদর্য প্রলোভনকে উপেক্ষা করে তিনি স্বামীর দণ্ডই মাথা পেতে নিলেন। পরে স্বামী যখন শুনলেন, তিনি ছিলেন অপাপবিদ্ধা তখন আর কিছু করার নেই। নির্মম নিয়তির ক্রূর চক্রান্তের করুণতম বলি এই দলনী বেগম।

পল্লীবধূ প্রতাপের স্ত্রী সুন্দরীর পতিভক্তি ও সাহস অল্প আয়তনে চমৎকার ফুটেছে।

চন্দ্রশেখর ধীর, স্থির, স্বল্পভাষী ও সুপণ্ডিত। তিনি নবাব মীরকাশিমের গুরু এবং রমানন্দ স্বামীর শিষ্য। তিনি ক্রান্তদর্শী। বাস তার চৌত্রিশ সর্বদা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে ব্যস্ত। স্ত্রীকে সঙ্গদান করার অবসর নেই তার। তথাপি তিনি শৈবলিনীকে ভালবাসেন যদিও সে ভালবাসা অনুচ্ছ্বসিত। শৈবলিনীর মত সুন্দরী নারীকে বিবাহে তার ইচ্ছে ছিল না কারণ এমন বিবাহে মনের বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতাপ চরিত্র চন্দ্রশেখরের মত ধীর স্থির নয়—তার মধ্যে রয়েছে প্রাণ-চাঞ্চল্য। তথাপি তার আত্মসংযমও সীমাহীন। শৈবলিনীকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন এবং এ-জন্মে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই জেনে তিনি প্রাণবিসর্জন দিতেও দ্বিধাহীন। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহের পর এবং নিজে রূপসীকে বিবাহ করে শৈবলিনীর চিন্তাকে তিনি সংযত করেছেন। বাহুবল যেমন তার, চিত্তবলও তেমনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ইন্দ্রিয়জয়ী বীর বলে সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু তারও মনের অবচেতনে শৈবলিনীর জন্যে একটি দীর্ঘশ্বাস ছিল। রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী? এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত

ভালবাসিয়াছি। আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।" শিল্পী বঙ্কিম এখানে কথা কয়ে উঠেছেন।

মীরকাশিম চরিত্রে উদারতা ও মহত্ত্বের সঙ্গে অদৃষ্টের চক্রান্তে একটি বিচার-ভ্রান্তিও দেখান হয়েছে যার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ।

এ উপন্যাসেও অভিরাম স্বামী ও মাধবাচার্যের মত রমানন্দ স্বামী আছেন। ইনি পরোপকারী এবং যোগবল বিদ্যায় নিপুণ। ভারতের লুপ্ত দর্শন-বিজ্ঞান তাঁর নখ দর্পণে। শৈবলিনীর রোগমুক্তি ও দলনী চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণের জন্যে উপন্যাসে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

[পাঁচ]

রাধারাণী (১৮৭৫), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৩) ও ইন্দিরা (১৮৭৩) এই তিনটি আখ্যায়িকা ঠিক উপন্যাস নয়, আবার এগুলিকে ছোটগল্পও বলা যায় না। এ-দুয়ের মাঝামাঝিতে এদের স্থান। চরিত্র চিত্রণের চেয়ে ঘটনার ওপর এগুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে। তবুও কিছু কিছু চরিত্র উল্লেখের দাবী রাখে। 'রাধারাণী'তে রাধারাণীর চরিত্র সরলভাবে একই রূপে দেখা দিয়ে শেষের দিকে গতি ও দ্যুতি লাভ করেছে। রাধারাণীর বয়স যখন দশ-এগার তখন রথের মেলায় বনফুলের মালা বিক্রয় করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তার প্রথম দেখা ও তাঁর করস্পর্শ লাভ। প্রথমে হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার আকারেই দেখা দিয়েছিল তার ভাবী প্রণয়। পরে এই কৃতজ্ঞতাই প্রেমে পরিণতি লাভ করে। দেবেন্দ্রনারায়ণের মনের কথা যেভাবে রাধারাণী পরে বের করেছে, তাতে তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে হয়। শেষের দিকে প্রগল্‌ভতা ও লজ্জা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। অমরনাথ চরিত্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনারায়ণের কতকটা মিল আছে। ইনিও পরোপকারী ও উদার। অবশ্য ইনি যেমন বিপত্নীক, তা অমরনাথ নন। তাছাড়া অমরনাথের অন্যান্য গুণ তাঁর মধ্যে নেই।

যুগলাঙ্গুরীয়তে হিরণ্ময়ী ও পুরন্দরের বাল্যপ্রণয় 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের মতো অভিসম্পাত-দুষ্ট হয় নি। হিরণ্ময়ী ও পুরন্দরের মিলনের পথে অবশ্য প্রবল বাধা সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত মিলন ঘটেছে। 'হিরণ্ময়ী'র চরিত্র চিত্রণে লেখকের কৃতিত্ব অবশ্যই আছে। সামাজিক বুদ্ধি ও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মৃদু সংঘাত এবং শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের দাবী পুরন্দরকে ঘিরে কিরূপ প্রকাশ পেয়েছে, হিরণ্ময়ী চরিত্রে তা চমৎকার দেখানো হয়েছে। এখানেও হিরণ্ময়ীর পিতৃগুরু আনন্দ স্বামী আছেন। তাঁরই চেষ্টায় এদের মিলনের পথে গ্রহদোষ খণ্ডিত হয়েছে।

অল্পায়তন 'ইন্দিরা' উপন্যাসেও চরিত্র-চিত্রণ মন্দ হয় নি। কামিনী বোতল, হারাণী ঝি, সোনার মা সব গৌণ চরিত্রই দু' একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়েছে। ইন্দিরা

ও সুভাষিণীর চরিত্রও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইন্দিরার পরিহাস-প্রিয়তা, সুভাষিণীর সারল্য ও সখী-প্রীতি, সোনার মার কৌতুককর ঈর্ষা ও আত্মবিস্মরণ গৃহিণীর পুত্রবাৎসল্য ও সন্দেহ—অল্প অবসরে ভালই ফুটেছে। অবশ্য চরিত্র-চিত্রণে গভীরতা এখানে কোথাও নেই। এখানে নারী চরিত্রের বিশেষত ইন্দিরা চরিত্রেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'রজনী'তে (১৮৭৭) বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণে দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর নায়িকা 'রজনী' অন্ধ ফুলওয়ালী। যদিও ফুল-বিক্রয়ে তার বড় একটা আগ্রহ নেই—সে তার আত্মীয়কে এ-বিষয়ে সাহায্য করে মাত্র। লর্ড লিটনের 'Last Days of Pompeii' নামক উপন্যাসের নিদিয়া চরিত্রের আদর্শে অন্ধ রজনী চরিত্রটি পরিকল্পিত হলেও বঙ্কিমের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। অন্ধ যুবতীর হৃদয়ে প্রণয়ীর কণ্ঠস্বর ও স্পর্শ কিভাবে ধীরে ধীরে প্রেমোন্মেষ ঘটায়, সেই চিত্র এখানে বঙ্কিম অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। রজনী কুমারী ও যুবতী কোমল ফুলের সংস্পর্শে তার চিত্তও কোমল ও মধুর হয়ে উঠেছে। ধনী সন্তান সুশিক্ষিত শচীন্দ্রের এই দরিদ্র ফুলওয়ালীর প্রতি সমবেদনাজনিত কিছু কথা এবং তার করস্পর্শ রজনীকে উতলা করে তুলল। শচীন্দ্রের রূপ তো শচীন্দ্রে নেই আছে তার মনে। রজনী অন্ধ বলেই তার শ্রবণ ও স্পর্শানুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এদেরই সহায়তায় তার চিত্তে শচীন্দ্র-প্রেম জাগ্রত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ-প্রেমের পথে ছিল বাধা। সেই বাধা উত্তীর্ণ হতে বর্ষাকালে একাকিনী অন্ধ রজনী যে সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছে তা বিস্ময়কর। শেষে দস্যুর কবল থেকে তাকে উদ্ধার করলেন যিনি সেই সুশিক্ষিত পরোপকারী উদার হৃদয় যুবক অমরনাথকে ঘিরে তার জীবনে এল নতুন দ্বন্দ্ব। অমরনাথ শুধু তার প্রাণদান করেনি সে যে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী এই গোপন তথ্যও উদ্ধার করে দিয়েছেন তিনি। শচীন্দ্রের সকল সম্পত্তি রজনীরই। একদিকে শচীন্দ্রের প্রতি গভীর প্রেম ও অন্যদিকে অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা—এ দুয়ের দ্বন্দ্বে কাতর রজনী অমরনাথের বিবাহ প্রস্তাবকেই গ্রহণ করবে স্থির করল। কিন্তু তার পূর্বে তার হৃদয়ের কথাটিও অমরনাথকে জানাল। উদারচেতা অমরনাথ রজনীর হৃদয়ের দাবীকে মেনে নিয়ে নিজে সরে দাঁড়ালেন। রজনীর মিলন হল শচীন্দ্রের সঙ্গেই। তন্ত্র-মন্ত্রের সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর অন্ধত্ব দূর করলেন এবং পরে রজনী-শচীন্দ্রের সন্তানের নাম 'অমরপ্রসাদ' রেখে রজনী তার কৃতজ্ঞতাকেও বিস্মৃত হল না।

এ উপন্যাসের নারী-চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র লবঙ্গলতা। সেই 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা-চরিত্রেরই এ-যেন এক অভিনব উন্নততর সংস্করণ। বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের পত্নী হয়েও দাসী-রূপে তিনি উপন্যাসে পরিচিতা এবং তাঁর সপত্নী-কন্যার তিনি সখী। লবঙ্গলতা কিন্তু গৃহিণী এবং সপত্নী-পুত্রের প্রতি স্নেহশীল। বিমলার বুদ্ধি-চাতুর্য, রসিকতা ও বাক্‌পটুতা এবং অনেকখানি সাহস বিমলার মতোই। ইনি বাল্যকালে অমরনাথকে ভালবাসলেও কৌলীন্য দোষে সে বিবাহ হয় নি।

—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব যিনি সুখ-দুঃখের অতীত তাহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

অমরনাথের পাশে শচীন্দ্র চরিত্র অনেকখানি ম্লান।

'সত্যকচ্যুৎশ্চুশাৎ' পত্রিকার সম্পাদক হীরালাল চরিত্রে প্রশংসনীয় কিছু নেই। মদে ও বিবাহে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট করতে তিনি উৎসাহী। রজনীকে নিয়ে তিনি যা করেছেন, তাতে তার চরিত্রের কদর্য দিকটি স্পষ্ট হয়েছে। সেকালের বাঙলায় এই শ্রেণীর সম্পাদক ছিল বলেই বঙ্কিম এমন চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

'রজনী'তেও সন্ন্যাসী আছেন। তিনি তান্ত্রিক যাগযজ্ঞ কার্যে অতিশয় নিপুণ। তিনি হাত দেখে ভবিষ্যৎবাণী করেন, চাল চালেন, চোর বলিয়া দেন। লবঙ্গলতার মুখে শুনি যে তিনি পিতলের জিনিসকে সোনা করে দিতেও সিদ্ধহস্ত। সন্ন্যাসী বলেছেন, "জ্ঞান অনন্ত কিছু ইংরেজ জানে, কিছু আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানিতেন।—ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই, সেই সকল আর্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। আমরা কেহ কেহ দুই-একটা বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি কাহাকেও শিখাই না। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ছিলেন এক সন্ন্যাসীর দীক্ষিত। তার নিজেরও সন্ন্যাসীদের ওপর শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল গভীর।

[ছয়]

'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, হীরা হেমবতী ও কমলমণিই আলোচিতব্য নারী চরিত্র। আর পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রের কথাই মুখ্য।

সূর্যমুখী নারীদের মধ্যে সর্বপ্রধান চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রেরও এই চরিত্রের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সূর্যমুখী রূপসী, মঞ্জুভাষিণী, শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না নারী। স্বামী নগেন্দ্রনাথের প্রতি তার গভীর অনুরাগ এবং স্বামীর প্রতিও তার অবিচল বিশ্বাস। স্বামীগতপ্রাণা সূর্যমুখী বলেছেন, 'পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তা সে স্বামী। অথচ এমন সূর্যমুখী কি তার স্বামীর রূপমোহে পতিত হলেন। বিধবা কুন্দের অপার্থিব রূপমোহ তাকে দিশেহারা করে উদভ্রান্ত করে তুলল। সূর্যমুখী প্রথমত ব্যাপারটি বিশ্বাস করেন নি। মনে হয়েছিল স্বামী অসুস্থ হয়েছেন কারণ স্বামী তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাচ্ছেন, দু' একটি ছোট্ট ঘটনায় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝলেন স্বামী কুন্দনন্দিনীতে প্রবলভাবে মোহগ্রস্ত। ননদিনী কমলমণির কাছে চিঠিতে সব জানলেন। তিনি একথাও বুঝলেন স্বামী এই পথ থেকে ফিরে আসবার জন্যে নিজের সঙ্গে নিজে সংগ্রাম করে

চলেছেন, অথচ তিনি জয়ী হতে পারছেন না। একবার মনে হল, কুন্দনন্দিনীই হয়তো এর জন্য দায়ী। এদিকে ঈর্ষাপরায়ণা হীনমনা দাসী হীরার চক্রান্তে তিনি কুন্দের প্রতি সন্দিহান হয়ে একদিন তাকে জানালেন, "আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়ীতে ঠাঁই দিই না। কুন্দ দত্তগৃহ ত্যাগ করে হীরার বাড়ীতে আশ্রয় নিল। এতেও স্বামী সূর্যমুখীর প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন। শেষে সূর্যমুখী অনেক ভেবে অনেক চিন্তে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যেই উদ্যোগী হয়ে কুন্দের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। কিন্তু এ যে তাঁর বুকে কত বড় আঘাত তা সেই মুহূর্তে বোঝবার তার শক্তি ছিল না। কমলমণিকে চিঠিতে জানালেন তা "অন্তঃকরণের আধখানা আজিও 'আমি'তে ভরা। নইলে আত্মবিসর্জন করে অনুতাপ কেন?" তিনি গৃহত্যাগিনী হয়ে নিরুদ্দিষ্টা হলেন। দুঃখের দহনে ও অনুতাপের অগ্নিতে তার ঐ 'আমি'টুকু দূর হয়ে গেল। স্বামীরও বিবাহে তার জীবনে এল পরিবর্তন। হীরার চক্রান্তে কুন্দও বিষপান করলেন। স্বামীর সমস্ত অন্তরজুড়ে যখন সূর্যমুখীর অচল আসন আবার তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন সূর্যমুখীর সঙ্গে ঘটল মিলন।

হাস্যপরিহাসে, স্বামী-সোহাগিনী কমলমণি পরম সুখী। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্যজীবনের বিপরীত ছন্দে মধুর জীবন তাদের। তাদের একটি ছোট্ট শিশু ঐ দম্পতীর জীবনের মধুর গ্রন্থিকে দৃঢ়তর করেছে যার একান্তই অভাব সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের জীবনে। 'মৃণালিনী'র গিরিজায়ার কিছু ছায়া কমলমণিতে পাওয়া যাবে। কমলমণি ছোট পরিবারের সুখী বধূ। সূর্যমুখী বৃহৎ পরিবারের যোগ্যা বধূ। স্বামীপ্রাণা হলেও কমলের মতো তাকে চোখে চোখে রাখার অবসর কম। তাছাড়া নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের মত স্ত্রৈণ নন, কমলমণিও সূর্যমুখীর মত আত্মাভিমানিনী নন।

কুন্দ চরিত্র চিত্রণে শিল্পী বঙ্কিমের প্রয়াসই লক্ষ্য করি। বিধবা-বিবাহের পরিণাম দেখানোর জন্যে এ-চরিত্র চিত্রিত নয়। তিলোত্তমার কোমলতা, ভীরুতা ও সরলতা কুন্দের মধ্যেও ছিল। কুন্দ যেন অর্ধ প্রস্ফুটিত কুসুম সম্পূর্ণ বিকশিত হবার পূর্বেই ঝরে গেছে। অপরূপ সুন্দরী কুন্দের প্রতি নগেন্দ্র অপার্থিব এক মায়ামোহ অনুভব করেছিলেন। অদ্ভুত সহনশীলতা তার। নগেন্দ্রের ঘন ঘন সান্নিধ্যে ও প্রেম-নিবেদনে ধীরে ধীরে তাঁরও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন— তার সেই আকর্ষণ যথার্থই অন্তরের প্রেম। কিন্তু সূর্যমুখীর মনে তিনিও তার নিন্দিতর কোপ-দৃষ্টিতে পড়বেন তেমন দুঃস্বপ্নে তার মনে অস্ফুট হয়েছেন একথা কুন্দের অজ্ঞাত। পাপিষ্ঠা হীরা দেবেন্দ্রের রূপে মুগ্ধ। দেবেন্দ্রকে লাভের চেষ্টায় কুন্দকে পথের কাঁটা ভেবে সে কুন্দের মহাসর্বনাশ সাধনে অগ্রসর হল। এদিকে বিবাহিত জীবনে কুন্দকে একান্ত আপন করে পেয়েও অল্পদিনের মধ্যেই নগেন্দ্র তার প্রতি বিতৃষ্ণ হলেন। কুন্দও জানলেন তাঁরই জন্যে সূর্যমুখীর এই দশা। মরণ ভিন্ন তার আর পথ নেই। এ হেন মানসিক অবস্থায় হীরার প্ররোচনাকেই তিনি শ্রেয় বিবেচনা করলেন —বিষপানে আত্মহত্যা করলেন। এ যেন এক দৈবী চক্রান্ত 'চন্দ্রশেখরের দলনী বেগমের মতো।

হীরাও বঙ্কিমচন্দ্রের এক সার্থক সৃষ্টি। ভদ্রবংশের দরিদ্র ঘরের মেয়ে হীরা দত্ত বাড়ীর কনিষ্ঠা দাসী হলেও বুদ্ধির প্রভাবে সকলের শ্রেষ্ঠা। হীরা বাল্য-বিধবা অত্যন্ত মুখরা। সধবার মত কেশবিন্যাস করলেও তার চরিত্রে কলঙ্ক গে তার দিকে ছিল না। হীরা নিভৃতে গান গায়, দাসীতে দাসীতে কলহ বাধিয়ে তামাসা দেখে, পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়। ঘুমন্ত ব্যক্তির মুখে চুণ কালি দিয়ে সং সাজায়। অদম্য প্রাণচাঞ্চল্য তার মধ্যে। কিন্তু দোষও তার ছিল। দত্ত বাড়ীর আতর গোলাপ চুরি করতে তার বাধত না।

কুন্দ দত্ত বাড়ীতে এলে তার পরিচর্যার ভার পড়ে হীরার ওপর। হীরা বুদ্ধিমতী, সাহসিকা, চতুরা এবং লোভী। বেনারসী শাড়ীর লোভ দেখিয়ে সূর্যমুখী তাকে হরিদাসী বৈষ্ণবীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করার ভার দেয়। হরিদাসী বৈষ্ণবী যে আসলে দেবেন্দ্র দত্ত একথা সূর্যমুখীকে সে জানালেও কুন্দের সম্পর্কে সে সত্য কথা বলে নি। হীরা পরশ্রীকাতরা। সূর্যমুখীর সুখ এবং প্রভুত্ব সে সহ্য করতে পারে না। তাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি তার কাম্য। সে জানে কুন্দর প্রতি নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র দুজনেই আসক্ত। যে কোন একজনের হাতে কুন্দকে সমর্পণ করতে পারলে তার আর্থিক লাভ। কিন্তু সে নিজেই দেবেন্দ্রের প্রতি আসক্ত। সুতরাং নগেন্দ্রের হাতেই কুন্দকে দেওয়া ভাল। আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে বলেছে, "পরের চোর ধরতে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল।" তার সমস্ত চিত্ত জুড়ে এখন দেবেন্দ্র। কিন্তু দেবেন্দ্র হীরাতে মোটেই আসক্ত না। রূপমোহগ্রস্তা হীরাকে কৌশলে মুগ্ধ করে তার সযত্নরক্ষিত চারিত্রিক দৃঢ়তাকে নষ্ট করে ও পদাঘাত করে একদিন তিনি চলে গেলেন। অপমানিত হীরা তখন দেবেন্দ্র বা কুন্দের সর্বনাশের চেষ্টা করতে লাগল। এদিকে কুন্দ মারা গেল। দেবেন্দ্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের আর প্রয়োজন হল না। কদর্য একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। হীরার বিষবড়ি মারাত্মক। পাপের এত ভয়াবহ চিত্র বঙ্কিম আর অঙ্কন করেন নি। ইয়াগোর শয়তানী বুদ্ধি ছিল হীরার, কিন্তু শুদ্ধ অনুভূতির। সে দেবেন্দ্রকে ভালবেসেছিল। তার কুচক্রান্তের ভয়াবহ পরিণামে দেখছি সে হয়েছে উন্মাদিনী। রোহিণীর সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে তার মিল চোখে পড়ে।

নগেন্দ্র শিক্ষিত যুবক। তার অনেক গুণ। দাম্পত্য জীবনেও তিনি পরম সুখী। তা সত্ত্বেও তার চরিত্রে সংযমের কিছু অভাব ছিল। স্ত্রী যতই গুণবতী হোক না কেন, পুরুষের সকল কামনা একই নারী সব সময় পূরণে সমর্থ হয় না। কিন্তু স্বামী সংযমী হলে এ অভাব সংসারে কোন অশান্তি সৃষ্টি করে না। নগেন্দ্রের মধ্যে এই চিত্ত সংযমের অভাবই অনুকূল অবসরে, কুন্দের সাহচর্যে বড় হয়ে উঠেছে। তিনি যে আত্মদমনের চেষ্টা করেননি তা নয়, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি। তিনি শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন কুন্দর প্রতি তার অতি প্রবল আকর্ষণের মূলে রয়েছে 'জগদীশ্বরের হাত' আর তাঁকে না পেলে তিনি হবেন উন্মাদ। কিন্তু যাই হোক, বিবাহের পরে অপ্রাপণীয়াকে প্রতিদিনকার ঘনিষ্ঠতায় পেয়ে তিনি

লালকে সুখী করবার চেষ্টা তার কোথায় ? সেখানেও নিশাকরকে নিয়ে তার আবার অভিনয় রহস্যময় তার আচরণ—অথচ সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী নারী। গোবিন্দলালকে রূপমোহে রোহিণী চঞ্চল করেছিল, কিন্তু তাঁর অন্তরে স্থান ক'রে নিতে পারে নি।

গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরও স্বামীভক্তিপরায়ণা। স্বামীর সঙ্গে তার আত্মিক যোগ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বাঙালী বধূ করেই অঙ্কন করেছেন। কিন্তু ভ্রমর বড়ই অভিমানিনী। এই অভিমানবশতঃই তিনি স্বামীকে সঠিক পথে চালনা করতে পারেন নি। গুরুতর সংকটকালে তাঁর পিত্রালয় যাত্রাই তার মহা সর্বনাশের হেতু হয়েছে। সূর্যমুখীর সঙ্গে তার স্বামীর পরিশেষে মিলন ঘটেছিল। কিন্তু ভ্রমরের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ একবার ঘটলেও ভ্রমর চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর স্বামী খুনের অপরাধে দেশে দেশে ঘুরে ফিরেছেন। শেষে অপরাধ মুক্ত হলেও তিনি আর ভ্রমরকে ফিরে পান নি। সংযম শিক্ষার অভাবই গোবিন্দলালের অধঃপতনের কারণ। এও ভ্রমরের অদৃষ্ট—সূর্যমুখীর মতোই।

গোবিন্দলাল ধনীর সন্তান এবং উদারচেতা হৃদয়বান শিক্ষিত যুবক। ধনীর সন্তানের যে সব দোষ হরলালের ছিল, তা তাঁর মধ্যে নেই। স্ত্রী ভ্রমরকে পেয়ে তিনি ছিলেন আত্মতৃপ্ত। কোন অভাব তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁরও নগেন্দ্রের মতোই সংযম শিক্ষা হয় নি। ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রী বাল্যবিধবা রোহিণীর রূপের কাছে তাই গোবিন্দলাল একদিন ধরা দিলেন। তাকে নিয়ে প্রসাদপুরে চলে গেলেন ভোগময় জীবন যাপনের জন্যে। একান্ত নিকটে পেয়ে তিনি বুঝলেন রোহিণীর ভালবাসা ভ্রমরের মতো গভীর নয়। পুষ্পে পুষ্পে মধু আহরণই রোহিণীর স্বভাব। বারবার ভ্রমরের স্মৃতি জেগে উঠল তাঁর মনে। এমন সময় নিশাকরের প্রতি রোহিণীর দুর্বলতা লক্ষ্য করে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বুঝলেন এ স্নেহ নয়, সুখ নয়, এ রূপতৃষ্ণা। তিনি গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করলেন রোহিণীকে। তার শ্বশুর খুনের অপরাধ থেকে তাকে মুক্ত করলেন বটে, কিন্তু অভিমানিনী ভ্রমর আর তার সঙ্গে বাস করতে চাইলেন না। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আশ্য স্বামীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী হলেন এবং ভগবৎ চরণে নিজেকে নিবেদন করে ভ্রমরাধিক পেয়েছেন বলে সান্ত্বনা দিলেন নিজেকে। কিন্তু একি দুর্বলের উপায়হীন স্তোকবাক্য মাত্র রজনীর অমরনাথও তো বৈরাগ্য আশ্রয় করে ঈশ্বর চিন্তায় শান্তি পেতে চেয়েছিলেন। অমরনাথ ও গোবিন্দলালের এই ঈশ্বর-অনুধ্যান বঙ্কিমের কাছে খুব একটা লঘু ব্যাপার নয়। সংসারের সকল ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝখানে এই দুই পুরুষের করণীয়ই বা কি - ভাবতীয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, 'জীবন লইয়া কি করিব চিন্তার' সমাধানী বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্মতত্ত্বের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের ট্রাজেক অন্ধকারের মধ্যেও জ্যোৎস্নার আলো দেখেছিলেন। এবং তাই বোধ হয় পরমা-শান্তির কারণ।

হরলাল অতিশয় স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা—গোবিন্দলালের বিপরীত চরিত্র একই পরিবারে থেকে বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে। মাধবীনাথ কন্যা ও জামাতার কল্যাণের

জন্যে অনেক কিছুই করেছেন। বিষয়বুদ্ধি এবং বাস্তববুদ্ধি তাঁর প্রবল। তবুও শেষে রক্ষা হল না। কন্যাকে তিনি চিরতরে হারালেন।

[সাত]

বঙ্কিমচন্দের অভিমত অনুযায়ী তার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' (১৮৯৩ ৪র্থ সং) এ বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এর মধ্যে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক দুই শ্রেণীর চরিত্রই আছে। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে কিংবদন্তী বা কল্পনার সাহায্যে তিনি উপন্যাসের উপযোগী করে নিয়েছেন। আর অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলিকে নিজস্ব পথেই অঙ্কন করেছেন। সাধারণ অবস্থায় মানুষের মধ্যে যে সব প্রবৃত্তি সুপ্ত থাকে ইতিহাসের দোলায় সেগুলির আকস্মিক বিকাশ চরিত্রগুলিকে কিরূপে অসাধারণ করে তোলে, তা বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন। দস্যু মানিকলাল প্র ভক্ত দেশপ্রেমিকে পরিণত হয়েছে। দরিয়া একজন সাধারণ নারী। তার স্বামী মবারকের প্রতি ছিল একনিষ্ঠ ভালবাসা। কিন্তু ইতিহাসের ঝটিকায় সে অসাধ্য সাধন করেছে। সৈনিকবেশে সে স্বামীর জীবনরক্ষা করেছে আবার যুদ্ধান্তে সেই প্রিয়তমের প্রাণহন্ত্রী হয়েছে। অদৃষ্টের নির্মমতায়। মবারক জেব-উন্নিসার প্রতি আসক্ত হওয়ায় মর্মভেদী হৃদয় বেদনায় সে অস্থির হয়েছে, কিন্তু তবুও স্বামীর কল্যাণকাঙ্ক্ষিনীরূপে তাঁর অনুগমন না ক'রেও পারেন নি। ঔরঙ্গজেবের অনুদারতা, কূটনৈতিকতা ও হিন্দু-বিদ্বেষ, একগুঁয়েমি ও নিষ্ঠুরতার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর হৃদয়ের তলদেশের হাহাকারকে শুনেছেন এবং ইমলিবেগমের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর সেই দীর্ঘশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। নির্মলকুমারী সাধারণ রাজপুত কন্যারূপে কল্পিত হলেও সে তার বুদ্ধি-মত্তা, সাহস বাকপটুতায় বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকেও পরাস্ত করেছেন। মবারক বাদশাহজাদীর ভোগের উপকরণরূপে অভিনয় করতে রাজী হন নি ; সে শাহজাদীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। সে নির্ভীক, সাহসী যোদ্ধা এবং বিবেকবান ব্যক্তি। মানবিকতার খাতিরেই সে স্বজাতিদ্রোহী। কিন্তু এর প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণে সে নিঃসংকোচ। রাজপুত-মোগলের যুদ্ধে সে প্রাণ দিয়েছে কিন্তু তার স্ত্রী দরিয়ার ভ্রমবশতঃ হিতে বিপরীত হয়েছে— দরিয়ার গুলি স্বামীকেই বিদ্ধ করেছে। চঞ্চল কুমারীকে রাজপুত নারীর মতোই বীরাঙ্গনা ও বীর-পূজারিণী ক'রে অঙ্কন করা হয়েছে। তাঁর স্বাজাত্যাভিমানও রাজপুত নারী-সুলভ। ইতিহাসের প্রবল আলোড়নে তার চরিত্রের স্বাধীন বিকাশ খুব বেশী লক্ষণীয় নয়। তাই রাজসিংহের প্রতি তার শ্রদ্ধা কীভাবে প্রেমে পরিণত হল, সেই প্রেমিকা চঞ্চলকুমারীর পরিচয় খুবই সংক্ষিপ্ত। একমাত্র জেব-উন্নিসা চরিত্র-চিত্রণে বঙ্কিম এখানে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম দিকে জেব-উন্নিসার মবারকের প্রতি কোন ভালবাসাই ছিল না—অথচ সেই সুদর্শন যুবকের মাঝে মাঝে সঙ্গ কামনা করতেন তিনি। বিলাসব্যসন ও বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত যে

কোনো যুবককে ভোগ্যবস্তু বলে মনে করতেন। স্থায়িভাবে কোনো পুরুষকে বরণ ছিল তাঁর কাছে হাস্যকর। মবারককে ঘন ঘন তাঁর কক্ষে আহ্বানের মধ্য দিয়ে মবারকের তাঁর প্রতি আকর্ষণ জন্মেছিল কিন্তু তার প্রস্তাবকে তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর এই মবারক যখন তার চোখের আড়ালে থাকতে চেয়েছে, তখন তাকে ভয়াবহ শাস্তিদানে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। মবারককে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েই বাদশাহজাদীর সমস্ত অন্তর মথিত করে যথার্থ প্রেম জাগ্রত হয়ে উঠেছে। তখন সে এক অন্য নারী। তাঁর সকল অহংকার ও ঔজ্জ্বল্য এখন কোথায় নির্বাসিত। অনুতাপে, বেদনায় অন্তর্দ্বন্দ্বে জেব-উন্নিসা তখন সাধারণ এক প্রেমভিখারিণী নারীতে পরিণত হয়েছেন। 'রাজসিংহ'কে এ উপন্যাসে ধর্মপ্রাণ বীর পরোপকারী, সুবিবেচক অথচ প্রেমিকরূপে অংকন করা হয়েছে।

[আট]

'আনন্দমঠ' ১৮৮২ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতির উপন্যাস। স্বদেশ-প্রীতি সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট ভাবনা এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি অবলম্বনে বোঝান হয়েছে। সত্যানন্দ, জীবানন্দ ভবানন্দ, মহেন্দ্র ও অদৃশ্য মহাপুরুষ চরিত্র যেমন আছে, তেমনি শান্তি কল্যাণী নিমাইমণি ও গৌরী দেবীও আছে নারী চরিত্ররূপে।

আনন্দমঠের সন্তানদলের অধিনায়ক সত্যানন্দ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও শাস্ত্রবিৎ। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি সন্তানদলকে তার গুরু মহাপুরুষের নির্দেশে বিপ্লববাদে দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর সকল চিন্তার মূলে আছে ধর্ম। তিনি বৈষ্ণব হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবপন্থী নন। তাই 'দুষ্টের দমন ও ধরিত্রীর উদ্ধার'ই তাঁর লক্ষ্য। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ অথচ নির্লোভ। দেবী দুর্গা ও দেশমাতৃকা তাঁর চিন্তায় অভিন্ন। তাঁরই চেষ্টায় দুবার সন্তানদল যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। তবুও ইংরেজদের হাত থেকে দেশ উদ্ধার করতে না পারার বেদনা তাঁর প্রবল। মহাপুরুষ তাঁর চিন্তার অসম্পূর্ণতা দূর করে দিলেন হিমালয়ের শিখরে নিয়ে গিয়ে।

জীবানন্দ সত্যানন্দের দক্ষিণহস্ত। সন্তানধর্মের দীক্ষা নেবার পূর্বে তিনি অধ্যাপক কন্যা শান্তিকে বিবাহ করেছিলেন। দীক্ষা গ্রহণ করলে দেশের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী বা সন্তানাদির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু মহেন্দ্র-কল্যাণীর কন্যা সুকুমারীকে ভগ্নী নিমাইমণির কাছে রাখতে গিয়ে তিনি ভগ্নীর অনুরোধে শান্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন দেশোদ্ধারের চেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে শান্তিতে বাসের জন্য চিত্তে তাঁর আলোড়ন উপস্থিত হয়। শান্তি স্বামীকে ধর্মচ্যুত করতে চান না। অথচ ব্রতভঙ্গের জন্যে স্বামীর শাস্তিও যে কঠোর, তা তিনি জানেন। শান্তি আনন্দমঠে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে হলেন নবীনানন্দ। তিনি পাশে থেকে নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত করলেন স্বামীকে। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে অসাধারণ কীর্তি অর্জন করলেন জীবানন্দ। আহত জীবানন্দ মহাপুরুষের চিকিৎসায় ও শান্তির সেবায় সুস্থ হলেন।

কিন্তু তিনি প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আর মাতৃসেবার অধিকার পেলেন না। হিমালয়ের উপর কুটীর তৈরী করে তাঁরা চিরব্রহ্মচর্য পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভবানন্দ নির্ভীক অনন্যমাতৃক দেশ-সন্তান হলেও তিনি রূপাসক্ত। কল্যাণীর জীবন রক্ষা ক'রে তাঁকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসার সময় তিনি তাঁর অতুলনীয় রূপের কাছে ধরা দিলেন—অথচ কল্যাণী সন্তানবতী ও মহেন্দ্র তাঁর স্বামী। চার বছর নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করেও তিনি এই দুর্বলতা জয় করতে পারেন নি। কল্যাণী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ব্রতচ্যুত অধর্মী ব'লে। কিন্তু গোবিন্দলালের মত ভবানন্দ কর্তব্যচ্যুত হন নি। তিনি প্রচণ্ড আত্মগ্লানির মধ্য দিয়ে মৃত্যুকামনা করেছেন। যুদ্ধে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেও তিনি বন্দেমাতরম গাইতে গাইতে ও বিষ্ণুপদ ধ্যান করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন। জীবন বিসর্জন দিয়ে তিনি স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

মহেন্দ্র পদচিহ্ন গ্রামের ধনীর সন্তান। তিনি সন্তান ধর্মে দীক্ষা নিলেন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে। তিনি যখন জানলেন তাঁর স্ত্রী ও শিশুকন্যা মৃতা, তখন এই দীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি জীবনব্রত উদযাপন করতে চাইলেন। পদচিহ্ন গ্রামে সত্যানন্দের নির্দেশে দুর্গ নির্মিত হল, কামান গোলা বন্দুকের কারখানা স্থাপিত হল। মহেন্দ্রের সহযোগিতাও সন্তানদলের দুইটি যুদ্ধে কিছু কম ছিল না। যুদ্ধান্তে সত্যানন্দ তাঁকে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে মিলিত করে গার্হস্থ্য জীবনে ফিরিয়ে আনলেন।

আদর্শ নারী চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমের একটি বিশিষ্ট ধারণা ছিল। সেই সুন্দরী নারী হবে বিশেষভাবে শক্তিরূপিণী। আর তারই মধ্য দিয়ে তার কুমারী জীবন, বধূজীবন বা জননী-জীবন মূর্ত হয়ে উঠবে। বধূরূপে স্বামীকে সে ঘরের কোণে বন্দী করে রাখবে না—প্রয়োজন হলে দেশের সেবায় তাকে ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করবে। এমনকি সত্যানন্দ যেখানে দেশসেবায় সন্তানদল স্ত্রী-পুত্র বর্জন করার কথা বলেছেন, সেখানে আনন্দমঠের শান্তি নিজেই স্বামীর নিকটে মঠে বাস করেও সত্যানন্দের ধারণাকে অসত্য প্রমাণ করেছেন। শক্তিরূপিণী নারীর পক্ষে এত যে সম্ভব, তা বোঝানোর জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বইতিহাস আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় থেকে ব্যায়াম ও অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন শান্তি। এক সন্ন্যাসী তাঁর প্রতি আসক্ত হলে তিনি তাঁকে আঘাত ক'রে অচৈতন্য করেছেন। এমন নারী, স্বামীর ধর্ম-কর্ম সহায় বলেই বঙ্কিম মনে করতেন। ঔপন্যাসিকের এই ভাবনা প্রফুল্ল চরিত্রে পূর্ণতা পেয়েছে।

কল্যাণী সাধারণ ঘরের গৃহবধূ হলেও তিনি জননী। শিশু সন্তানের প্রতি তাঁর অসামান্য বাৎসল্য। শিশু-কন্যার জন্যে তিনি নিজেও প্রাণ বিসর্জন করতে চেয়েছিলেন। মাতৃত্ব-সম্পদে তিনি বিশিষ্ট। ভ্রমর ও নিমাইমণি দুজনেই মৃতবৎসা। মাতৃত্বের মহিমা তাঁদের মধ্যে ফোটে নি। কমলমণির শিশু-সন্তান কমলের দাম্পত্য জীবনকে সুদৃঢ় করেছে। মাতৃত্বের মহিমা সেখানে আর একভাবে দেখা গিয়েছে।

কল্যাণীই বঙ্কিমচন্দ্রের এই দিক থেকে সার্থক সৃষ্টি। অনিন্দ্যসুন্দরী কল্যাণীর মধ্যে আত্মসংযম প্রবল ধর্মজ্ঞান গভীর। ভবানন্দের প্রস্তাবকে তিনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বামীর ধর্ম রক্ষার জন্যে তিনি সন্তানবতী বধূ হয়েও ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনকে বরণ করেছিলেন। প্রয়োজনে নারী যে কতখানি কষ্ট স্বীকার করতে পারে, স্বামীর কল্যাণের জন্যে কতখানি ত্যাগ বরণ করতে পারে কল্যাণী তার দৃষ্টান্ত।

নিমাইমণির সন্তান ছিল না। তাই সুকুমারীকে পেয়ে তার মাতৃস্নেহ সহস্রধারে উৎসারিত হয়েছিল। এই সুকুমারীকে তার মা-বাপের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তার ব্যথা ও ক্রন্দন খুবই স্বাভাবিক। স্নেলতা কন্যার জন্যেও নারী মাতারূপে কিরূপ চঞ্চল হয়ে ওঠে তারই দৃষ্টান্ত নিমাইমণি।

গৌরীদেবী এ উপন্যাসে অল্প অবসরে কতকটা হাসির হাওয়া এনেছে।

[নয়]

'দেবী চৌধুরাণী'র ১৮৮৪) প্রফুল্লই বঙ্কিমের নারী চরিত্রের প্রায় পূর্ণতম রূপ। প্রফুল্ল সুন্দরী। তাঁর 'চাঁদপানা মুখ' শাশুড়ীকে মুগ্ধ করেছে। স্নেহ-প্রেম-মাধুর্যে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ। তিনি সন্তানবতী নন কিন্তু তাঁর অন্তরে মাতৃসুলভ স্নেহ মমতা। এক রাত্রির স্বামীর আদরে তিনি তীর্থ-দর্শনের পুণ্য লাভ করেছেন। প্রফুল্ল চরিত্রের এই কোমলতার সঙ্গে তেজস্বিতা ও সাহসিকতার সম্মেলন ঘটেছে। প্রফুল্লের দুই রূপ—একদিকে তিনি গৃহলক্ষ্মী এবং অন্যদিকে তিনি 'দেবী-চৌধুরাণী'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য। কিন্তু এ-জীবনে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে চাই ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা, সাহস এবং লোক-কল্যাণকামিতা। আর সেই প্রয়োজনেই ভবানী পাঠকের কাছে তাঁর নিষ্কাম কর্মে দীক্ষা। ভবানী পাঠকের নিকটে পাঁচ বছর শিক্ষায় প্রফুল্লর জ্ঞানার্জনী, শারীরিকী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকল সম্যক বিকশিত হয়েছে। আরো পাঁচটি বছরে এই শিক্ষার প্রয়োগ কৌশলও তিনি শিখেছেন। দেবী চৌধুরাণী রূপে নইলে তার ভূমিকা 'দোকানদারি' ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর বুদ্ধি, সাহস ও কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় দেবী চৌধুরাণী রূপেই দেখি। শ্বশুর তাঁর অমঙ্গল করতে চাইলেও তিনি তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী। বরকন্দাজদের প্রাণ তার নিজ প্রাণের চেয়ে অধিক মূল্যবান। তিনি একা ধরা দিয়ে ফাঁসি বরণ করতে চেয়েছেন। নিস্কাম-কর্ম শিক্ষা করলেও তিনি একাদশীতে মাছ খেয়ে সধবার ধর্ম রক্ষা করেছেন। তাঁর পতিপরায়ণতা বিস্ময়কর। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্বপণ করতে গিয়ে তিনি স্বামীর কথাই মনে করেন। ভবানী পাঠকের শিক্ষায় প্রফুল্ল গৃহলক্ষ্মী হবার যথার্থ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তিনি বাঙালী ঘরেরই বধূ। এই কারণে দেবী-চৌধুরাণীর জীবন-শেষে তিনি যখন সংসারে প্রবেশ করেছেন তখন সংসার হয়ে উঠেছে সুখ ও শান্তির নিলয়। রাণীগিরির পর বাসন মাজা ভাল লাগবে বলেই তিনি

সংসারে এসেছিলেন। স্ত্রীলোকের এই ধর্ম,—এ ধর্ম বড় কঠিন। তিনি বলেছেন, "ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়"। প্রফুল্ল সংসারের সকলকে সুখী করেছেন —স্বামীর কাছে সগৌরবে ফিরে এসেছেন।

গৃহিণীরূপে ব্রজেশ্বরের মাতার চরিত্রটি সার্থক। কোমলতা কর্তব্যপরায়ণতা, পুত্র বাৎসল্য, বুদ্ধিমত্তা, অতিথিবাৎসল্য সবই তার আছে। অবশ্য স্বামী হরবল্লভের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় তিনি প্রতিবাদ করতে পারেন নি। তবু তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রফুল্ল সংসারে আপন স্বার্থে ফিরে আসে।

নয়ান-বৌ ও সাগর-বৌ ব্রজেশ্বরের দুই স্ত্রী। এর মধ্যে নয়ান বৌ হিংসুটে, ঝগড়াটে ও স্বার্থপর। সপত্নীকে সে সহ্য করতে পারে না। স্বামীর সঙ্গেও তার ব্যবহার ভাল নয়। প্রফুল্লের সংস্পর্শে নয়ান-বৌ এর পরিবর্তন ঘটেছে। সাগর-বৌ তার বিপরীত চরিত্র। বয়স তার কম। সে ধনীর দুলালী। বাইরে তার মধ্যে চপলতা যতই থাক, আসলে তার অন্তরটি মধুময়। বড় অভিমানিনী সে। প্রফুল্লের সঙ্গে বরাবরই তার মধুর সম্পর্ক। তবুও সংসার-ধর্মে তার কিছু অপূর্ণতা ছিল —নয়ানকে সে মেনে নিতে পারেনি। প্রফুল্লের সংস্পর্শে তারও লাভ হয়েছে অনেক।

দিবা ও নিশির মধ্যে নিশার চরিত্রই অধিকতর জীবন্ত। দুজনেই ভবানী পাঠকের শিষ্যা। দেবী চৌধুরাণীকে সে খুব ভালবাসত। তার শাস্ত্রজ্ঞান কিছু নেই। পরিহাস-রসিকতায় সে নিপুণ। নিশি ভবানী ঠাকুরের শিক্ষায় সে কৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণা। ছেলেবেলায় সে মল্লবিদ্যা শিখেছে ডাকাতদের দলে অপহৃতা হ'য়ে। প্রফুল্লের স্বামীবিরহে কাতরতায় সে বিস্মিত। আবার বহু লোকের প্রাণের বিনিময়ে স্বামীর প্রাণ রক্ষায় প্রফুল্লের অনিচ্ছায় সে খুশী। ত্যাগ ও মমতায় এ এক অপূর্ব চরিত্র।

পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে ব্রজেশ্বরই প্রধান। তিনি পিতৃভক্ত, সাহসী, বিনয়ী ও পরিহাসপ্রিয়। তিন পত্নীর সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলার তাঁর অদ্ভুত মানসিকতা। ঝগড়াটে নয়নতারা, এবং অভিমানিনী সাগর-বৌ এর সঙ্গে তিনি যথোপযুক্ত ব্যবহারই করেছেন। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারলেও তিনি বুঝেছিলেন যে প্রফুল্লের প্রতি হৃদয়হীন আচরণ করা হয়েছে। তিনি প্রফুল্লের রূপ-মুগ্ধ এবং প্রফুল্লের ভিতরের সৌন্দর্য-মাধুর্য ও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রফুল্ল 'ডাকাত' এই সংবাদে তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হলেও সে দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি তাঁর 'মহামোহময়' রূপ দেখেছেন। ভারতীয় আদর্শের প্রতি অবস্থাবান বলে তিনি কখনও পিতার অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন নি। ঘোড়ায় চড়া, বন্দুকচালনা, তরবারি চালনা ইত্যাদিতে ব্রজেশ্বর যে নির্ভীক, তা বোঝা যায়। রঙ্গরাজ সহজে তাঁকে বন্দী করতে পারেনি। 'সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কার' চড় দিতে তিনি নিঃসংকোচ। সহিষ্ণুতায়, সাহসে ও আত্মসংবরণের মধ্য দিয়ে নানা ঘটনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকট হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের বাংলার এক জমিদার চরিত্রের নীচতা, স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতা হরবল্লভ চরিত্রে ধরা পড়েছে। আর ইতিহাসের ভবানী পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্র নবরূপে

দিয়েছেন। গীতার কর্মযোগের আলোকে এ চরিত্র ভাস্বর। ঐশ্বর্যে, কর্মনৈপুণ্যে, লোক কল্যাণে, বাগ্মিতায় সংগঠন শক্তিতে—সর্বোপরি দেশপ্রীতিতে তিনি এক আদর্শ চরিত্র। অন্যের কাছে তিনি ডাকাত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাকে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে এক সর্বত্যাগী পুরুষ রূপে অঙ্কন করেছেন। রঙ্গরাজ যেমন কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল তেমনি নীচাশয়, অত্যাচারী ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন শয়তান চরিত্র হল দুর্লভ চক্রবর্তীর।

সীতারাম (১৮৮৭) উপন্যাসে শ্রী ও সীতারামের চরিত্রই মুখ্য। এখানেও ধর্মতত্ত্বের বঙ্কিমচন্দ্র তার বিশিষ্ট আদর্শে- গীতোক্ত একটি শ্লোকের আলোকে এক হিন্দু ভূ-স্বামীর অধঃপতন বর্ণনা করেছেন। সীতারাম বীর, সাহসী, পরোপকারী ও বিচক্ষণ মহৎ ব্যক্তি। তিনি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও তার নাম রাখলেন মহম্মদপুর। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে জীইয়ে রেখে রাজ্য প্রতিষ্ঠা মঙ্গলকর হতে পারে না বলেই তিনি জানতেন। কিন্তু এতো গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন একটি সুন্দরী নারীর রূপ মোহের কাছে ধরা দিলেন যিনি তাঁর স্ত্রী হলেও অপ্রাপনীয়া। এই রূপমোহের বশবর্তী হয়ে তাঁর আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ ঘটল। স্বাধীন রাজা সীতারাম নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর ওপর নিজের অধিকার বিস্তার করতে না পেরে রাজ্যের ওপর বিশৃঙ্খলা ও নিজ কর্তব্যচ্যুতির স্রোত বইয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে তিনি এক কামার্ত পশুতে পরিণত হলেন, সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীকে বেত্রঘাত দৃশ্যে তাঁর সেই পশুত্বের চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল। গ্রন্থের শেষে সীতারাম চরিত্রের নৈতিক উদ্ধার-সাধনের প্রয়াস করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাতে তাঁর পতনের মধ্য দিয়েও মহত্ত্বকে স্মরণ করা হয়েছে। কিন্তু রূপমোহের পরিণাম নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের জীবনে যে সংগ্রাম বাধিয়ে তুলেছিল—সীতারামে তার অভাব আছে। চাণক্যের মতো রাজনীতি জ্ঞান সম্পন্ন সীতারামের গুরু চন্দ্রচূড় শিষ্যের চরম অধঃপতন লক্ষ্য ক'রেও চিত্ত-বিশ্রামে রাজ্যের সুন্দরী নারীদের আনয়ন-প্রয়াসে ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তীর্থযাত্রা করলেন। ভবানী পাঠকের মতো নিষ্কাম কর্ম শিক্ষা দেবার সুযোগ তার হয়নি—কিন্তু তিনিও অসাধারণ বুদ্ধিমান ও রাজ্য সংগঠক।

শ্রীর চরিত্রও এ উপন্যাসে খুব আকর্ষণীয় হয় নি। স্বামী সীতারামকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসলেও প্রিয় প্রাণহন্ত্রী হবার ভয়ে (জ্যোতিষ গণনায়) তিনি স্বামীকে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর কাছে দীক্ষা নেন। কিন্তু পরে যখন চিত্তবিশ্রামে আবার স্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে লাগল, তখন তিনিও স্বামীর ওপর আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। তাই পলায়ন করলেন তিনি। স্বামীর কাছে ধরা না দেওয়ার জন্যে স্বামীর রাজ্য গেল, চরিত্র গেল মহা সর্বনাশ হল—অথচ প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হবার ভয়ে তিনি সন্ন্যাসিনী হয়েছেন,—ধরা দেবেন না। প্রফুল্লের সঙ্গে তাঁর কতো পার্থক্য—অথচ দুজনেই ভরা যৌবনে স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা ও

স্বামীগতপ্রাণা। স্ত্রীর চরিত্রের পরিবর্তন খুব বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। জয়ন্তী চরিত্র টাইপ জাতীয়—তথাপি বিচারের দৃশ্যে তাঁর চরিত্রে লজ্জার আবির্ভাব তাঁকে রক্তমাংসের মানবী করে তুলেছে।

পুত্রবৎসলা প্রতিপ্রাণা রমা চরিত্র খুবই সজীব। অত্যন্ত ভীরুস্বভাবা রমা—পতিপুত্র নিয়েই সুখে জীবন কাটাতে চান। পুত্র-স্নেহেই তিনি নিজের ও সীতারামের সর্বনাশ করে বসলেন। বিচারের দিন এই কোমলা স্বল্প-ভাষিণী রমার আর এক মূর্তি দেখি। ছেলের 'মুখ দেখলে' তাঁর সাহস জাগ্রত হবে। ভ্রমরের পতিপ্রবণতা, তিলোত্তমার কোমলতা ও দলনীর ভীরুতার সঙ্গে পুত্র স্নেহ যুক্ত করে রমার সৃষ্টি।

একটি অনতিপরিসর প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট সকল নর-নারী চরিত্রের পরিচয়-প্রদান অসম্ভব ব্যাপার। তবু আমরা তাঁর রচিত সমস্ত উপন্যাসগুলির কথা মনে রেখে সকল প্রধান প্রধান চরিত্র এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সংখ্যক গৌণ চরিত্রের আলোচনা করেছি। মাঝে মাঝে কিছু চরিত্র অনেকখানি বাস্তব-পন্থায় অঙ্কিত হলেও মোটের ওপর বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী ঔপন্যাসিক। ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস এবং কিছু সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের আনাগোনা। তথাপি বহু চরিত্রেরই তিনি স্রষ্টা এবং চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্বও স্মরণীয়। উপন্যাসের প্রয়োজনে নানা ধরনের চরিত্র সৃষ্ট হলেও পুরুষ এবং নারী চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর এক বিশিষ্ট আদর্শ কাজ করেছে। সামগ্রিকভাবে তার উপন্যাসে নারীরই প্রাধান্য। আর পতির প্রতি ভক্তি রেখে নিজেকে সংসারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হল নারীর সবচেয়ে বড় কাজ। নারীকে তিনি ভীরু-দুর্বল করে অঙ্কন করতে চান নি। নারীর মধ্যে থাকবে শক্তি, তেজ ও সাহসিকতা। ধর্মতত্ত্বে তিনি মানুষের যে বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ চেয়েছিলেন—নারী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। নারী সেগুলির বিকাশের মধ্য দিয়ে সংসার ধর্ম পালন করবে। আদর্শ বধূ বা গৃহিণী হতে গেলে তাঁর মতে প্রফুল্লের গুণাবলী চাই। আবার প্রয়োজন হলে সে নারী স্বামীর ধর্ম-কর্মের ও দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনেও সহায়ক হবে যেমন আনন্দমঠের শান্তি। অনুশীলন-ধর্মের বৃত্তিগুলি ঠিক মত বিকশিত হলে নারীর মধ্যে কোমলতা, দয়া, মায়া, পরার্থপরতা, সেবা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, বাক্‌পটুতা, রসিকতা সবই দেখা দেবে। নানা নারী চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রফুল্ল তাঁর আদর্শ পূর্ণতা পেয়েছে।

পুরুষ চরিত্র নিয়েও ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নিজের অজ্ঞাতেই পরীক্ষা করে গেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নারী চরিত্র সৃষ্টির মত গভীর মনোনিবেশ তাঁর মধ্যে দেখি না। তবুও চন্দ্রশেখর, অমরনাথ এবং রাজসিংহ—এই তিনটি চরিত্র যেন তাঁর সেই পুরুষ সম্পর্কিত চিন্তা-বিবর্তনের তিন সোপান। মনে হয়, 'রাজসিংহ' চরিত্রের মধ্যেই অনুশীলনতত্ত্বের বঙ্কিম-ভাবনা অনেকখানি রূপ পেয়েছে। কিন্তু রাজসিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র—তাঁকে নিয়ে স্বাধীন কল্পনার স্বেচ্ছামত সৃষ্টি সম্ভব নয়। সেইজন্য আমরা অমরনাথকেই বঙ্কিম-আদর্শের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলে মনে করেছি।

শিক্ষা, সুবিবেচনা, সংযম, সংবেদনশীলতা, সাহস, তেজস্বিতা চিত্তস্থৈর্য, পরোপকার বৃত্তি—এগুলি পুরুষের শ্রেষ্ঠগুণ। রূপমোহই পুরুষের সংসারে, জীবনে এবং বৃহত্তর কর্তব্যপালনে সব থেকে বড় শত্রু। সুবিবেচক পুরুষের জীবনেও অনেক সময় এই মোহ তার মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়ে তোলে। এমন মোহগ্রস্ত ব্যক্তি রূপের জালে জড়িয়ে গিয়ে অর্থাৎ পদস্খলনের মধ্য দিয়েও উদ্ধার পায় বটে; কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতিকেও স্বীকার করতে হয়। কখনো কখনো এ ক্ষতি ভয়াবহ। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্তকেই এখন বেছে নিতে হয়—কখনো বা সংসার জীবনের সব ক্ষয়-ক্ষতিকে অগ্রাহ্য ক'রে পরমা শান্তির আশায় বৈরাগ্যমূলক মনোভাবকে আশ্রয় করতে হয়—ভগবৎ-চিন্তাই তখন একমাত্র সান্ত্বনা। বীর, ধর্মপ্রাণ রাজসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র এ পরীক্ষার মধ্যে নিয়ে যাননি। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, পশুপতি, দেবেন্দ্র দত্ত, সীতারাম, ভবানন্দ প্রভৃতি চরিত্রে এ পরীক্ষা হয়ে গেছে। এ পরীক্ষায় চূড়ান্ত সংকট আসন্ন হওয়ার পূর্বেই অমরনাথ নিজেকে সংবরণ করে নিতে পেরেছে। তবুও ভিতরের গভীরতম ব্যথাকে বিস্মৃত হওয়ার জন্যে তিনিও বৈরাগ্যমূলক মানসিকতায় চিরশান্তির অনুসন্ধান করেছেন।

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র উপন্যাসঃ আধুনিক পুরুষ ও নারীর উপস্থিতি

[এক]

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি ক্ষমতা। সৃষ্টি কার্যের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ হল চরিত্র সৃষ্টি। বাংলা উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আজও অদ্বিতীয়। তাঁর উপন্যাসগুলি যেন চরিত্রের চিত্রশালা। উপন্যাসে কাহিনীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেও বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রসৃষ্টির দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন —"উপন্যাসলেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন।" অবশ্য এই 'অন্তর্বিষয়ের প্রকটন' বঙ্কিম উপন্যাসের চেয়ে রবীন্দ্র উপন্যাসে আরও বেশী পরিমাণে লক্ষণীয়। তার কারণও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যথার্থ অর্থে সার্থক ঔপন্যাসিক— তিনিই প্রথম কথাকার যাঁর লেখায় রোমান্সরস থাকলেও বাস্তব জীবনরস রসিকতা যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত। কিন্তু রূপকথা উপকথাব রসে অভিসিঞ্চিত পাঠক সহসা সাহিত্যে মাটির কাছাকাছি বাসকারী আমাদেব নিত্য পরিচিত মানুষগুলিকে ঠিক ঠিক মেনে নেবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই তাঁর বেশীর ভাগ উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে তিনি একটু কালগত, কখনও দেশগত দূরত্ব বজায় রেখে তাঁব উপন্যাসেব পাত্রপাত্রীর চবিত্র সৃষ্টি কবেছেন। তাঁর পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য জীবনবসবসিত চিত্ত রবীন্দ্রনাথ, রেঁনেসাসের নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাসে সভ্য মানবের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে যথোচিত মর্যাদা দিযে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁব কথাসাহিত্যে তাই নারী ও পুরুষ চরিত্রের ব্যক্তিত্ববোধের ক্রমোন্মেষের লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রধান প্রধান নাবী ও পুরুষ চরিত্র আশ্রয়ে এই বিশেষ দিকটিই আমাদের বক্ষ্যমান প্রবন্ধের অনুসন্ধানের বিষয়।

[দুই]

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' (পত্রিকায় প্রকাশকাল ১২৮৪-১২৮৫) তাঁর নিতান্ত কিশোর বয়সের রচনা —এটিকে কেউ কেউ অসম্পূর্ণ উপন্যাস বলেছেন, কেউ আবার এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের পবিণত রচনার অঙ্কুর লক্ষ্য করেছেন। উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র এই দুইয়ের কোনটির অধিক প্রাধান্য তা নিয়ে মনীষী এরিস্টটল থেকে একাল পর্যন্ত নানা তর্ক বিতর্ক আছে —রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের এই রচনায় ঘটনা ও চরিত্রের প্রায সম প্রাধান্য লক্ষণীয়। ঘটনার ঘনঘটার দিকে তিনি যেমন নজর দিয়েছেন তেমনি নানা চরিত্রের অবতারণা করেছেন। কিন্তু চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা এই উপন্যাস রচনাকালে অত্যন্ত অল্প ছিল। তাই 'করুণা'র চবিত্র চিত্রণে লেখকের অক্ষমতা সহজেই প্রকট। নায়িকা করুণা সাংসারিক জ্ঞানশূন্যা, নানা ছেলেমানুষী কল্পনায় সমুগ্ধা সরলা বালিকা। সে আত্মরক্ষায় অসমর্থা, সম্পূর্ণরূপে ঘটনা তাড়িতা, এইজন্য নিজের পিতৃগৃহ থেকে চরিত্রহীন স্বামী কর্তৃক

সে বিতাড়িতা। পিতার আশ্রিত দরিদ্র নরেন্দ্র তার বাল্য সহচর। পরে পতিপদে উন্নীত; কিন্তু ভোগাকাঙ্ক্ষী, নির্লজ্জ পাপশক্তি নরেন্দ্রকে পাঠকের কাছে খল বা দুর্বৃত্ত চরিত্রে পরিণত করেছে। তার মধ্যে কোন উচ্চ ভাব, কর্তব্যবোধের সন্ধান পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ বসু যথার্থই বলেছেন —"তোমার করুণা খুব ভালো কিন্তু অসম্পূর্ণ— একটি ফুলমাত্র, ফল নয়, কল্পনামাত্র, কাব্য নয়, দৃশ্যমাত্র, আদর্শ নয়।" রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের প্রতিভা যে সুপ্ত আছে তার প্রমাণ দুর্লক্ষ্য নয়।

[তিন]

'বৌঠাকুরাণীর হাট' রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। প্রকাশ কাল ১২৮৯ পৌষ। এটি একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিঞ্চিৎ প্রভাব এই গ্রন্থ রচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর অবশ্যই পড়েছিল। তবু এই উপন্যাস থেকেই চরিত্র চিত্রণে কবির মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। কবি নামমাত্র ইতিহাসের কাহিনীকে এখানে অবলম্বন করেছেন কিন্তু আসলে উপন্যাসে চিত্রিত পুরুষ ও নারী চরিত্রের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রতাপের দিকে। প্রতাপ রায় বার ভূঁইঞার অন্যতম —তার চরিত্র অবলম্বনে পরবর্তীকালে যে দেশপ্রেমের ধারণা গড়ে উঠেছিল প্রতাপের প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয় উদ্ঘাটিত করে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করেছেন। গ্রন্থসূচনায় তিনি নিজেই সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"এই উপলক্ষে একটা কথা বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনা আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তাঁর নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক। দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অজানিত ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে প্রতাপকে দুষ্কৃতকারী অত্যাচারী ক্ষমতালোলুপ বুদ্ধিহীন এক নরপতিরূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি হয়তো বীর ছিলেন কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো অবিমৃষ্যকারী শক্তিহীন রাজাও ছিলেন, উপরন্তু তিনি ছিলেন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ হয়তো তেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না কিন্তু এই চরিত্র চিত্রণে তিনি মানব-স্বভাবের সবদিক ভালভাবে ভেবে দেখেন নি তাই চরিত্রটি কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। পরিণত বয়সে কবির নিজের চোখেও এই ত্রুটি ধরা পড়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, "চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্র বলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে।"

এই 'পুতুলের ধর্ম' প্রধান প্রধান চরিত্র ছাড়াও পার্শ্বচরিত্রের রামচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আবার শুধু উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রেই নয়, নারী চরিত্রের মধ্যেও এই ধর্ম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে প্রধান নারী চরিত্র দুটি—বিভা ও বৌরাণী সুরমা প্রতাপাদিত্যের হৃদয়হীনতার জন্যই এই চরিত্র দুটিও শেষ পর্যন্ত ঐ 'খেলার পুতুলে' পরিণত হয়েছে।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রতাপ চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্র মনোভাবের কথা আগেই উল্লেখ করেছি কিন্তু উদয়াদিত্য চরিত্রের প্রতি কবির বিশেষ সহানুভূতি লক্ষ্য করার মতো। পিতামাতা পরিষদবর্গ কর্তৃক অবহেলিত এই চরিত্রের মধ্যেও যে কতকগুলি মহত্বের লক্ষণ আছে তা তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি—উদয়াদিত্য লোকপ্রিয়, দরিদ্রের বন্ধু, আদর্শবাদী, প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী সর্বদাই তার মধ্যে সুপ্ত আছে এক কবিমন। কেউ কেউ উদয়াদিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রক্ষেপ লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাটকে যুবরাজ চরিত্রের পূর্বাভাস পর্যবেক্ষণ করেছেন।

'বৌ ঠাকুরাণীর হাটে' আর একটি চরিত্র আছে যা আমাদের সহজেই মুগ্ধ করে তা বসন্ত রায়ের চরিত্র। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী এই চরিত্রে রবীন্দ্র নাটকের 'ঠাকুর্দা' শ্রেণী'র চরিত্রের পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছেন। বসন্ত রায় বৈষ্ণব কবি বসন্ত রায়ের সঙ্গে অভিন্ন না হলেও তিনিও বৈষ্ণব এবং কবিস্বভাব বিশিষ্ট। বুড়ো বয়সে তিনি তলোয়ার ছেড়ে সেতারকে সহচরী করেছেন। তবে তাঁর রাজত্বে প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। লড়াই করার কোন বাসনাই আর তাঁর নেই —ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা সে প্রয়োজনও যেন তাঁর আর না হয়। এদিক থেকে তিনি ভাইপো প্রতাপাদিত্যের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তাঁদের দুজনের স্বভাব বৈপরীত্যের পরিচয় দিয়ে কবি আদর্শ রাজার চিত্রটিই যেন পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। পরবর্তী উপন্যাস 'রাজর্ষি'তে তার পরিচয় আরও পরিস্ফুট হয়েছে।

[চার]

উপন্যাস হিসাবে 'রাজর্ষি' রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের প্রথম পর্বের অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনা। এটি রবীন্দ্রনাথের এক স্বপ্নলব্ধ কাহিনীর সঙ্গে ত্রিপুরায় রাজবংশের ঐতিহাসিক কিছু তথ্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত। 'আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ।' পূর্ববর্তী উপন্যাস বউ-ঠাকুরাণীর হাটেও এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে—প্রতাপাদিত্য ও রঘুপতি বস্তুতঃ একই উপাদানে গঠিত সুরমার মৃত্যু ও রাজসিংহের আত্মবলিদান একই তাৎপর্যবহ। উদয়াদিত্য গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পূর্ণতা লাভ করেছে।

অবশ্য চরিত্র হিসাবে গোবিন্দমাণিক্য ততটা সার্থক নন। লেখকের মনের একটা ভাবাদর্শের প্রতীক হিসাবেই তাঁর সার্থকতা। জীবন্ত চরিত্র রূপে গোবিন্দমাণিক্য, আমাদের হৃদয়ে তত প্রভাব বিস্তার করেন না, যত রাজার তথা 'রাজর্ষি'র চরিত্রের আদর্শরূপে প্রতিভাত হন। গোবিন্দমাণিক্যকে তিনি প্রেমধর্মের প্রতিনিধি করেই

দেখতে চেয়েছেন তাই গোবিন্দমাণিক্য হয়েছেন অন্তর্দ্বন্দ্বহীন একমুখী, আদর্শবাদী চরিত্র।

উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্যের প্রতিপক্ষ রঘুপতির চরিত্র অপেক্ষাকৃত জটিল এবং বিচারের মানদণ্ডে তিনিই উপন্যাসের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র। অসামান্যতার সঙ্গে অমানুষিকতার মিলনে ট্র্যাজিক নাটকের যে ভয়াবহ নায়কের জন্ম হয় যেমন 'ম্যাকবেথ' রঘুপতির মধ্যে আমরা যেন তারই একটা ছোট খাটো সংস্করণ দেখতে পাই। রঘুপতি এই নাটকে অহমিকার প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে উপযুক্ত কারণেই নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ্যত্বের প্রতিনিধি বলে মেনে নেওয়া যায় না। তিনি ব্যক্তিসর্বস্ব অহংবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত বলে তাঁকে ষড়যন্ত্রকারী এবং সুবিধাবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছে। ধর্মাধর্ম—হিংসা অহিংসা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ অতি বিচিত্র—হিন্দুত্বের কোন্ পথ অবলম্বন করে তিনি চলেছেন তা আবিষ্কার করা দুরূহ। রাজনৈতিক তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও অনমনীয় তেজস্বিতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তবে জয়সিংহ সম্পর্কে তাঁর স্নেহ-দুর্বলতা চরিত্রটিকে মানবীয় করে তুলেছে। অবশ্য নক্ষত্র রায়ের কাছে অপমানিত হয়ে শেষে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে প্রেমের প্রাধান্যকে স্বীকার করে—পরাজয় বরণ করার মধ্যে চরিত্রটির শেষরক্ষা হয়তো হয়নি, তবু ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে রঘুপতি চরিত্রটিই এই উপন্যাসে সবচেয়ে জীবন্ত।

প্রধান দুটি পুরুষ চরিত্রের পাশে দাঁড়াবার মতো নারী চরিত্র এই উপন্যাসে একটিও নেই এ সম্পর্কে যে নারী চরিত্রটি এখানে আছে সে অপ্রধান চরিত্ররূপেও উপন্যাসে বিশেষ স্থান অধিকার করতে পারে নি।

[পাঁচ]

'রাজর্ষি' রচনার পরে প্রায় পনেরো-ষোল বছর রবীন্দ্রনাথ আর কোনও উপন্যাস লেখেননি। ছোটগল্প অবশ্য অনেকটা লিখেছেন এবং বড় আকারে ছোটগল্প 'নাটনীড়ে' শুধু মহাকায় কাহিনী রচনা নয়, উপন্যাসোপম চরিত্র নির্মাণকৌশলও এই দীর্ঘ গল্পে লক্ষ্য করা যায়। ইতিমধ্যে 'বিনোদিনী' নামে একটি গল্পের খসড়াও করে ফেলেছেন। এই দুটি রচনার পরেই 'চোখের বালি'র আবির্ভাব আকস্মিক নয়, খুবই স্বাভাবিক।

বস্তুত 'চোখের বালি'ই বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস —রবীন্দ্রনাথেরও সার্থক উপন্যাস এইখানিই। প্রকৃত প্রস্তাবে বাস্তব মানুষের চরিত্রচিত্রন রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন এখান থেকেই। এই গ্রন্থ দিয়েই বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের যথার্থ সূচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নতুনত্বই এইখানে। মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে তার 'অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে' রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম যথার্থ অর্থে 'যত্নবান' হয়েছেন। মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করে নারী ও পুরুষের চরিত্রের নানা দিক, আমাদের সমাজ জীবনের নানা জটিল সমস্যা উদ্ঘাটিত করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। নারী পুরুষের 'ব্যক্তিত্ব' বিকাশের নানা সঙ্কট

তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং 'ব্যক্তি' হিসাবে পুরুষের পাশে নারীকেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অংকন করার চেষ্টা করেছেন এই সময় থেকেই।

'চোখের বালি'র নায়িকা বিনোদিনীর আত্মপ্রতিষ্ঠার উগ্র বাসনা পাঠকের দৃষ্টিকে প্রথম থেকেই আকর্ষণ করে। বিনোদিনীর মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করার জন্য লেখক প্রথমাবধিই সচেষ্ট—তিনি তাঁর শিক্ষা ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে —"বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না। কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারী মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা এবং কারুকার্য শিখাইয়াছিল।" আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তা স্বতন্ত্রময়ী এই রমনীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ কিন্তু ঘটেছে প্রেমেরই পথে যে প্রেম সর্বনাশা—আশা মহেন্দ্রের সুখের সংসারে যা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, মহেন্দ্রের সুপ্ত প্রকৃতিকে জাগ্রত করেছে। বঙ্কিমের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে অনেক বেশী বস্তুতান্ত্রিক ফরাসী সাহিত্যিক ফ্লোব্যারের মতই চরিত্রচিত্রণে তাঁকে "নামতে হল মানব সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি, হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।" বিনোদিনীর মধ্যে বঞ্চিতা নারীর অন্তর যাতনা ও দুরন্ত প্রবৃত্তির ঝাপটা তিনি একই সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত তার চারিত্রিক বিবর্তন দেখাতে গিয়ে বিহারীর প্রেমের স্পর্শে তাকে কোমল ও ত্যাগমুখী করে তুলেছেন। একই নারীর মধ্যে বিভিন্ন সত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে লেখক আপনার অন্তর্দৃষ্টির যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি বিহারীর সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিধবা বিনোদিনীর অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাশীবাসী হওয়ার ঘটনাও বিনোদিনী চরিত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে খুব অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিনোদিনীর মধ্যে লেখক আগাগোড়া যে যুক্তিবাদিতা, দৃঢ়তা ও সত্যকে স্বীকার করার সৎসাহস দেখিয়েছেন—তার কাশীবাসের সংকল্পে অনেকে হয়তো সেই ব্যক্তিত্ব-হীনতার আভাস দেখে দুঃখিত হবেন কিন্তু লেখক এখানে ব্যতিক্রমধর্মী এই আচরণের মধ্য দিয়ে বিহারীর প্র ত বিনোদিনীর আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধেরই পরিচয় দিয়েছেন—সামাজিক মিলনে তার মাহাত্ম্য হয়তো ক্ষুন্ন হত।

আশা চরিত্রটি স্নিগ্ধ, সরল, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি নারী চরিত্র হলেও উপন্যাসের শেষ দিকে তার মধ্যে কিছুটা ব্যক্তিত্বের জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে তাকে বিনোদিনীর হাতের কাঁচা মাটির পুতুল বলে মনে হয়, কিন্তু পরে দুঃখের দহনে তাতে পোড়া মাটির আকারও ধরেছে—. । পরনির্ভরশীলা বালিকা বধূটি বেদনার হাতুড়ির ঘায়ে সহসা গৃহিনীর আত্মপ্রত্যয় ও দায়িত্বজ্ঞানে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। মহেন্দ্রের আদর সোহাগের পুতুলটি কখন খেলাঘর ছেড়ে কর্তৃত্ব পরায়ণা গৃহিনীর আসনে এসে উপবিষ্ট হয়েছে তা লক্ষ্য করে পাঠক উল্লসিত হন।

মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মী ও কাকীমা অন্নপূর্ণা সংসারের আর পাঁচটা মা-কাকীর মতই নিতান্ত স্বাভাবিক চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন "চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা।" কিন্তু পুত্রের প্রতি স্নেহের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা এই উপন্যাসের মূল সংকটের মুখ্য কারণ কিছুতেই

নয় ; মহেন্দ্রের চারিত্রিক দুর্বলতা, বিনোদিনীর ছলনাময়তা, আশার অতিরিক্ত সরলতা —সবকিছুই উপন্যাসের ঘটনার জট পাকানোয় অংশ গ্রহণ করেছে। তবে রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে কিছুটা পোষকতা করেছেন একথা বলা চলে।

পুরুষ চরিত্র বলতে মহেন্দ্র ও বিহারী —এই দুজন পরস্পর বন্ধু ও প্রতিযোগী নায়ক-প্রতিনায়ক রূপে এই উপন্যাসে তাদের নিজ নিজ স্থানটুকু অধিকার করেছে। মহেন্দ্র চরিত্রটি সবল ও জটিলতাবিহীন। তার জীবনের সমস্যা অনেকটাই তার স্বেচ্ছাকৃত। শৈশব থেকেই অতিরিক্ত স্নেহ পেয়ে পেয়ে সে যেমন আত্মাভিমানী হয়ে উঠেছে তেমনি প্রকৃতিকে সংযত করায় শিক্ষাও হারিয়েছে। ফলে তার চরিত্রে পরস্পর বিপরীত আচরণ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়—মাতৃভক্তির আতিশয্যে বিবাহে অসম্মতি আবার বিবাহের পরেই প্রবল প্রণয়োচ্ছ্বাসে বাস্তববোধ বিসর্জন, আশাকে নিয়ে বিহারীর সঙ্গে অশালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তার বাধে নি, আবার বিনোদিনীকে নিয়েও সে বিহারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে—বিনোদিনীকে কখনও অবজ্ঞা করেছে কখনো তাকে নিয়ে নির্লজ্জ মাতামাতি করেছে। আসলে সে একজন আত্মমগ্ন পুরুষ আপন খেয়াল-খুশিতেই বিভোর। তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে, কেবল আশার সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্ক ও বিনোদিনীর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ এই দুই বিপরীত-মুখী চিন্তা তাকে কিছুটা বিপর্যস্ত করেছে। মহেন্দ্রের পর্যুদস্ত আত্মমর্যাদার শেষ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং ঔপন্যাসিক তাকে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

উপন্যাসের লক্ষণ বিচারে বিহারী 'চোখের বালি'র প্রতি নায়ক চরিত্র। প্রথমাবধি তাকে কিছুটা সংসার জ্ঞানহীন আত্মভোলা নিরাসক্ত প্রকৃতির মানুষ রূপেই লেখক অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বিহারীর মধ্যে আত্মভোলা প্রকৃতি ও আদর্শ-নিষ্ঠাকে কবি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং "উপন্যাসের কল্যাণময় পরিণতির জন্য সমস্ত কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিহারীরই প্রাপ্য। প্রয়োজন সময়ে—যেমন সে বারে বারে সংকট ত্রাতারূপে দেখা দিয়েছে। তেমনি তারই চরিত্রস্পর্শে প্রলয়াগ্নি বিনোদিনীর দীপশিখায় রূপান্তর ঘটেছে।" আবার বিনোদিনীর সংস্পর্শে এসেই বিহারী 'নিজেকে আবিষ্কার করেছে'—তার অন্তরে প্রেমের জাগরণ ঘটেছে, তার মধ্যে হয়েছে পৌরুষের উদ্বোধন, একান্ত বহির্মুখী বিহারী ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে। সুতরাং বিহারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিনোদিনীর ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

[ছয়]

একদিকে নারীচরিত্র বিনোদিনী ও অন্যদিকে পুরুষ চরিত্র বিহারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যে 'চরিত্র সৃষ্টির যথার্থ সূচনা। কিন্তু রবীন্দ্র-উপন্যাসের মুখ্যচরিত্রের ব্যক্তিসত্তার ক্রম উন্মোচন ও আত্ম-আবিষ্কারের যে নতুন রীতিটি চোখের বালিতে লক্ষ্য করা গেল তা পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি'তে

আবার অস্পষ্ট হয়ে গেল। অথচ এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। 'জীবনসত্য গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর'—বিধাতার রচিত জীবন নাট্যের কোন কোনও নাটকীয় মুহূর্তে এমন ঘটনাও ঘটে। উপন্যাসের নায়িকা কমলার জীবনের তেমনি একটি নৌকাডুবির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই উপন্যাসের শেষ পরিণতি রূপকথাধর্মী মিলনান্তক হয়েছে—'স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে' তারই জোরে কমলা তার 'অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে ছিন্ন করতে পেরেছে। কমলার মতো "কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবার রূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদ মানেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে" কিন্তু কমলা নাম্নী এক মহিলাকে আশ্রয় করে উপন্যাসের প্রথমদিকে লেখক যে নারী ব্যক্তিত্বের চকিত স্ফুরণ ক্ষণে ক্ষণে দেখাচ্ছিলেন —যেমন তিরিশ পরিচ্ছেদে কমলার বিদ্রোহ রমেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চক্রবর্তী খুড়োর সঙ্গে গাজিপুরে যাওয়া, একত্রিশ পরিচ্ছদে লেখক নিজেই যার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—"তাহার মুখের ভাবের মধ্যে স্বাধীনতার তেজ ছিল। তাহার সম্মুখে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্তত মনে মনেও সে প্রশ্ন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।" —কমলার সেই স্বাধীন সত্তার বিকাশ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। যে মুহূর্তে সে জেনেছে রমেশ তার স্বামী নয়, সেই মুহূর্তেই সে তথাকথিত স্বামীত্বের সংস্কারে আবদ্ধ হয়েছে। না জেনে স্বামী বলে মেনে এতদিন সে যে রমেশের ঘর করেছে তার প্রতি তার কোন দুর্বলতাই আর লেখক আমাদের দেখান নি—অথচ এই উপলক্ষে তার মনে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আত্মখণ্ডন—প্রভৃতি দেখিয়ে তবে 'ব্যক্তিত্ব'টুকু লেখক অনায়াসেই ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় নারী চরিত্র—হেম নলিনী। সে শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও ব্রাহ্ম 'কালচার' দ্বারা পরিশীলিত। তার চরিত্র ঘিরে একটা সুকঠিন গাম্ভীর্য ও সমুন্নত মহিমা লেখক প্রথম থেকেই অংকন করতে চেয়েছেন। বিংশ শতকের শিক্ষিতা নারীর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে বিরল নয়,—সে নিজস্ব মতামত দ্বারা চালিত যে—অপরের দ্বারা সহজে প্রভাবিত হতে চায় না। আসলে এই উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা ঘটনার গ্রন্থনেই লেখক অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাই চরিত্র বিকাশের তেমন সুযোগ এখানে নেই। অবশ্য ঘটনার চাপে বিকাশোন্মুখ এক নারী ব্যক্তিত্ব যে কিভাবে নীরন্ধ্র বেদনায় বিদ্ধ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত তিনি রেখেছেন হেম নলিনীতে।

পুরুষ চরিত্র রমেশ নায়ক হয়েও নায়কের মর্যাদাচ্যুত হয়েছে। যদিও সিন্ধবাদের মত এক নৈতিক দায়িত্বের ভার কাঁধে নিয়ে সে আধুনিক কালের মতনও সমাজের মানসিকতাই পরিচয় দিয়েছে। এবং এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়েছে। "তার দুঃখকাতরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয়, যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে।" অর্থাৎ এখানেও সেই ঘটনার ঘন ঘটারই প্রাধান্য, চরিত্র চিত্রণ তথা চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশ উপেক্ষিত। অপর প্রধান

পুরুষ চরিত্র নলিনাক্ষ অতি সজ্জন—কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন, তুলনায় অপ্রধান চরিত্র অথচ অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলা চলে।

[সাত]

চার বৎসর পরে প্রকাশিত 'গোরা' মহাকাব্যিক এপিক উপন্যাস—রবীন্দ্রনাথের মহোত্তম সৃষ্টি। বক্তব্যের বিশালতায়, সর্বমানবিকতার আবেদনে, সত্যানুসন্ধিৎসায় গোরা মহাকাব্যিক উপন্যাসই বটে। আয়তনে সুবিশাল এই উপন্যাসে ঘটনা বৈচিত্র্য তেমন লক্ষ্য করা না গেলেও চরিত্র সৃষ্টিতে কিছু অভিনবত্ব অবশ্যই লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য মতবাদ প্রধান এই উপন্যাসকে চরিত্রের নিজস্ব 'ব্যক্তিত্ব' দুর্নিরীক্ষ্য হলেও প্রধান দুটি পুরুষ চরিত্র গোরা ও বিনয় এবং নারী চরিত্র সুচরিতা ও ললিতা দুটি স্বতন্ত্র প্রেমোপাখ্যানের নায়ক ও নায়িকা রূপে পাঠকের দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করে। অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে পরেশবাবু, কৃষ্ণদয়াল, হারানবাবু (পানুবাবু) মহিম এবং আনন্দময়ী, বরদাসুন্দরী হরমোহিনী বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

বস্তুতঃ গোরা থেকেই রবীন্দ্রনাথ চরিত্রচিত্রণে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। অবশ্য তাঁর এই কৃতিত্ব সাধারণ চরিত্র অপেক্ষা অসাধারণ কিছু চরিত্র সৃষ্টিতেই লক্ষণীয়। গোরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম, ভারত-চিন্তা তথা বিশ্বাত্মবোধের প্রতীক। গোরাকে গোঁড়া হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরূপে অঙ্কিত করে কবি শেষ পর্যন্ত তাকে বিশ্বমানবরূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন—তাকে জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়িয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানব রূপে দেখাতে চেয়েছেন। তার জন্ম রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর সে পরেশবাবুর কাছে যে কথা বলেছে—"আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতের কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না। যিনি কেবল হিন্দুরই দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের—দেবতা।" তার মধ্যেই কবির আসল মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। গোরার মধ্যে একাধারে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধের উপাসনা ও ভারত সত্তার পরিচয় বিবৃত হয়েছে। গোরার মারফৎ লেখক স্বদেশ প্রেম, ভারত মাতার প্রতি গভীর ভক্তি, বিদেশী শাসনের যন্ত্রণা, স্বাধীনতার স্বপ্ন দর্শন, দেশকাল নিরপেক্ষ সত্যোপলব্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তর্কের অবতারণা করেছেন। গোরা তর্ক করেছে —সময় সময় তা পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর মনে হতেও পারে, কিন্তু তার তর্ক যতটা যুক্তি-নির্ভর তার চেয়ে বেশী অনুভূতি প্রধান—তার তর্কেরও প্রাণ আছে -যে প্রাণ-চাঞ্চল্য বিরুদ্ধ পক্ষকে অনায়াসেই অভিভূত করে ; গোরা চরিত্রের সেই প্রাণবান সত্তার পরিচয় লেখক যথাসম্ভব তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মানব মনস্তত্ত্বের ওপর সহজ অধিকার বোধের পরিচয় দিয়েছেন। অথচ চরিত্রটির মধ্যে অযথা জটিলতা নেই বা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অতিরিক্ত আতিশয্য নেই। গোরা প্রচলিত অর্থে প্রাণচঞ্চল জীবন্ত চরিত্র না হলেও এই উপন্যাসের অনন্য আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে। গোরা চরিত্রে স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, সুইডিস যুবক হ্যামার গ্রেন প্রমুখদের প্রভাব অনুমান করে সমালোচকগণ তৃপ্ত হয়েছেন।

গোরা চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কিছু মতাদর্শের প্রভাব থাকায় চরিত্রটি পুরোপুরি বাস্তবধর্মী না হযে কিছুটা ভাবধর্মী হয়ে উঠেছে এমন কথা যদি সত্যও হয়, এই উপন্যাসে বাস্তবধর্মী চরিত্রেরও অভাব নেই। বিনয় গোরার বন্ধুই শুধু নয়—এই উপন্যাসের জীবনধর্মী উপন্যাসের নায়ক রূপে সে গোরার সম্পূরক চরিত্র বলা চলে। "বুদ্ধিতে, ক্ষমতাতে বিনয় কোনো অংশে আমার থেকে ছোটো নয়"—তার সম্পর্কে গোরা নিজেই সেকথা বলেছে এবং বিনয়ের মধ্য দিয়েই গোরার মত, বিশ্বাস, ধারণা—এমন কি ভাব মতবাদের ত্রুটিটি পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিনয়কে দিয়েই আমরা গোরাকে সহজে বুঝতে পারি। বিনয়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তার দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে, তার নিশ্চয়তায়, তার গোরার প্রতি একান্ত ভালবাসা এবং তার সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনায় —লেখক অভ্রান্তভাবে এই চরিত্রটিকে বিকশিত করে তুলেছেন। গোরার প্রতি একান্ত আনুগত্য সত্ত্বেও এই উপন্যাসেই গোরা—নিরপেক্ষ বিনয়ের স্বাধীন সত্তারও প্রকাশ লেখক দেখিয়েছেন ললিতার সঙ্গে তার প্রেম ও বিবাহ সংকল্পের প্রসঙ্গে। ললিতার সংস্পর্শে এসেই তার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আঘাতে গোরার আড়ালে বিনয়ের চাপা পড়া ব্যক্তি সত্তার জাগরণ সম্ভব হয়েছিল। বিনয় ও ললিতার প্রণয় সঞ্চারের উপকাহিনী যে এই উপন্যাসের অতি উপাদেয় অংশ তাতে সন্দেহ নেই।

এই উপন্যাসের নায়িকা সুচরিতা রবীন্দ্র উপন্যাসের সেই বিশেষ ধরনের চরিত্র যাকে বারে বারেই ফিরে আসতে দেখি—সে কখনও হেমনলিনী, কখনও কুমুদিনী কখনও বিমলা কখনো আবার লাবণ্যের পূর্বগামিনী ছায়া। সে শিক্ষিতা, শান্ত, রুচিশীলা, বুদ্ধিমতী—'তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা। কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী কোমল হইয়া দেখা দিয়াছে। মুখের ডৌলটি কী সুকুমার অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন একটি কোমল কুঁড়ির মত রহিয়াছে।"

সুচরিতা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাই ব্রাহ্মসমাজের নারীসুলভ শিক্ষা রুচি ও শিষ্ট ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সে যদিচ নম্র, শান্ত কোমল স্বভাব তথাপি, সে যুক্তি বিরহিতা ব্যক্তিত্বহীনা নয়। তবে ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎবিকাশ লক্ষ্য করা যায়, হারাণ বাবুর কটু মন্তব্যের প্রতিবাদে। ব্রাহ্মসমাজের কর্তাব্যক্তি হলেও হারাণ বাবুর সব কথা নত মস্তকে মেনে নিতে সে প্রস্তুত নয়। হরমোহিনীর আনা বিবাহ প্রস্তাবকেও সে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছে।

সুচরিতা যেভাবে গোরাকে আকর্ষণ করেছে এবং তার প্রতি বিমুখতা ত্যাগ করে মনোযোগী হয়ে উঠেছে তার মধ্যেই এই চরিত্রের অসামান্যতা পরিস্ফুট হয়েছে। গোরার কারাবাসের ঘটনা উভয় হৃদয়কে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে; পরিণতিতে সমাজ ও সংস্কারমুক্ত হযে পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সুচরিতার চরিত্রের এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ

লক্ষ্য করা যায়—তবে অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মখণ্ডন বিশেষভাবে লেখক আমাদের দৃষ্টি গোচব করেছেন।

আবার শুধু প্রেম নয় সুচরিতার চরিত্রের আর যে বৈশিষ্ট্যের দিকে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা তার আধ্যাত্মিকচেতনা –পরেশবাবুর প্রভাবে যার জন্ম কিন্তু গোরার সাহচর্যে যার পরিপুষ্টি। গোরার প্রতি তার আকর্ষণ প্রেমমুগ্ধ হৃদয়ের আবেগসর্বস্ব আকর্ষণ মাত্র নয়, গোরার স্বদেশ-চেতনা, ভারতচিন্তা, দেশবাসীর প্রতি সুগভীর প্রীতি তাকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে, সে মনে মনে গোবাকেই গুরুপদে বরণ কবে নিয়েছে। কিন্তু গোবার প্রেম লাভ না করলেও তাব জীবন যে ব্যর্থ হয়ে যেত না, একটা অধ্যাত্মবিশ্বাস তার ব্যক্তি সত্তাকে যে বাঁচিয়ে রাখত তাতে সন্দেহ নেই। ললিতার মত সে বিদ্রোহের ধ্বজা না তুললেও তার অন্তরে যে কোথাও একটি গভীর শান্তির উৎস ছিল তা অনুভব করতে পাঠককে বেগ পেতে হয় না। সুচরিতা স্বভাব সুকুমার আত্মদমনশীল ও প্রকাশকুণ্ঠ কিন্তু সত্যসন্ধানে একনিষ্ঠ। অন্তরের বিশুদ্ধতার সৌরভে তার চরিত্র কিন্তু স্নিগ্ধ-বস্তুজগৎ তাকে পীড়ন করতে চাইলেও তার আলোর আভাকে কখনো মলিন করতে পারেনি।

চরিত্র হিসাবে এই উপন্যাসে ললিতা সবচেয়ে আকর্ষণীয়, সবচেয়ে উজ্জ্বল, জীবন্ত, বাস্তব। সে বিদ্রোহিনী নারী—তার বিদ্রোহ ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে, বিনয়ের ব্যক্তিত্বহীনতার বিরুদ্ধে। চারিত্রিক দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদিতার জন্য তাকে সকলেই সমীহ করে—তার মা বরদাসুন্দরী পর্যন্ত তাকে ভয় করেন। তার মধ্যে এক সহজ সত্যনিষ্ঠা আছে যা পরেশবাবুকে মুগ্ধ করেছে—তিনি তার এই দুরন্ত প্রকৃতির কন্যার মধ্যে এক সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন –"তাহা রঙের সৌন্দর্য নহে, গড়নের সৌন্দর্য নহে তাহা অন্তরের গভীর, সৌন্দর্য। তাহার মধ্যে কেবল লালিত্য নহে, স্বাতন্ত্র্যের তেজ এবং শক্তির দৃঢ়তা আছে—সেই দৃঢ়তা সকলের মনোরম নহে। তাহা লোক বিশেষকে আকর্ষণ করে, কিন্তু অনেককেই দূরে ঠেলিয়া রাখে।" বিনয় এই গুণেই ললিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ললিতা নিজে যেমন ব্যক্তিত্বময়ী তেমনি ব্যক্তিত্ববান পুরুষই তার পছন্দ, তাই বিনয়ের মুখে অবিরত গোরার মতামত—গোরার নাম শুনে শুনে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। বিনয়কে গোরার প্রভাবমুক্ত করার জন্য সে উঠে পড়ে লেগে যায় এবং অবশেষে কৃতকার্য হয়।

ললিতা অভিমানিনী, জেদী রমণী। বিনয়ের প্রতি তার অনুরাগ বিরাগের পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছে। বিনয়কে সে সময় সময় দুঃখ দিয়েছে। নিজেও তার জন্য দুঃখ পেয়েছে। সে যেমন কারোও কাছে নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না, তেমনি আবার অকারণে বা সামান্য কারণে পরাজয় স্বীকার করে—এ চিন্তাও তার কাছে অসহ্য ছিল। বিনয়কে যে গোরার প্রভাবমুক্ত করতে সে এত আগ্রহী তারই অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে সে আত্মীয় স্বজন ছেড়ে একাকী বিনয়ের সঙ্গে স্টীমারে চড়ে বাড়ি ফিরেছে। পথে বিনয়ের ভদ্র ও সংযত আচরণ ঐ চরিত্রের প্রতি তাকে আরও আকৃষ্ট করেছে। এর পরেও তার কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল—বিনয় সম্পর্কে তার মনোভাব স্ববিরোধমুক্ত হতে পারে,

কিন্তু তাদের সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের অনুদারতা, পানুবাবুর হীন আক্রমণ ও কুৎসাপ্রচার তার অন্তরের বিদ্রোহী সত্তাকে জাগ্রত করেছে—সে প্রকাশ্যে বিনয়কে বিবাহের সংকল্প ঘোষণা করেছে। আর এজন্য বিনয়কে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণেও সে বাধা দান করেছে। তার নিজের যেমন আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল তেমনি তার জীবনসঙ্গীও সম আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট হবে এটাই সে প্রত্যাশা করেছে এবং সেই কারণেই বিনয়কে সেইভাবে সে পেতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত পিতার উদার প্রশ্রয়ে ও আনন্দময়ীর স্নেহসাহচর্যে ললিতা ও বিনয়ের প্রেম সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে -ললিতার অশান্ত হৃদয় হয়েছে শান্ত। বস্তুতঃ ললিতার মধ্য দিয়ে লেখক বিশ শতকের ব্যক্তিত্বমতী তেজস্বিনী,মনস্বিতায় উদ্দীপ্ত একটা জীবন্ত চরিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন। আধুনিক শিক্ষিতা রমণীর আদর্শস্থানীয়া এই নারী চরিত্র গোরার নায়িকা সুচরিতার পাশে এসে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সুচরিতাও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট কিন্তু তার শান্ত-স্বভাব আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি তাকে যে সংযত নারীচরিত্রের রূপ দিয়েছে, ললিতা তার তুলনায় আরও বেশী সতেজ, কর্মচঞ্চল, প্রতিবাদমুখর কিছু প্রগল্‌ভ এক ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট চরিত্র হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসে পরেশবাবু অপ্রধান চরিত্র হলেও একটি অসাধারণ চরিত্র—তাঁর মধ্যে লেখক হয়তো এক আদর্শ মানব চরিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন যে মানুষ—পাণ্ডিত্য, বিশ্বাস, সততা ও স্নেহভালবাসার এক প্রশান্ত বিগ্রহ। পরেশবাবুর আচার-আচরণ, কথাবার্তা স্বভাব সব কিছুই এক আদর্শ মানবের প্রতিকৃতি রচনাতেই সাহায্য করেছে—বলা বাহুল্য, সেই কারণেই চরিত্রটি একটু বাস্তবতাবর্জিত হয়েছে। লেখক তাঁর মুখে বিস্তর ভালো কথা বসিয়েছেন–কথাগুলি কথাই থেকে গেছে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি তাঁকে দিয়ে সুচরিতাকে নানা শিক্ষাদান করেছেন কিন্তু, তার তুলনায় তাঁর পত্নী বরদাসুন্দরী বরং কিছু প্রাণরসসঞ্জীবিতা। তার কথায় যথেষ্ট জোর আছে তার মধ্যে উত্তেজনা আছে, রাগ আছে—যা পরেশবাবুর মধ্যে নেই বললেই হয়। এই উপন্যাসে অন্যান্য অপ্রধান চরিত্র—হরি মোহিনী কৃষ্ণদয়াল, পানুবাবু, মহিম—এদের স্থান উপন্যাসে খুব বেশী অংশ জুড়ে নয়, কিন্তু এরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে আপনাপন চারিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য আনন্দময়ী অপ্রধান চরিত্র হয়েও শেষ পর্যন্ত ভারতজননীর প্রতিমূর্তি রূপে গোরার কাছে, আমাদের কাছে এক অসাধারণ মহিমায় উন্নীত হয়েছেন। তাঁর সর্ব-সংস্কারমুক্ত উদার মাতৃস্নেহের আশ্রয়ে গোরাই শুধু আশ্বস্ত হয়নি পাঠকও পরিতৃপ্ত হয়েছে।

[আট]

'গোরা' রচনার প্রায় ছ' বছর পরে ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন এই চার মাসে 'সবুজপত্রে' যে চারটি গল্প পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয় তারাই পরে ১৩২৩ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে 'চতুরঙ্গ' নামে মুদ্রিত হয়। 'চতুরঙ্গ' থেকে রবীন্দ্রনাথ

চরিত্র বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। ঘটনা ছেড়ে তত্ত্বকে মুখ্যতর আশ্রয় করার ফলে এই উপন্যাসে চরিত্র বিন্যাসে দেখা দিয়েছে বিশিষ্ট কিছু প্রবণতা। বাস্তবতা ছেড়ে অন্তঃবাস্তবতার দিকে তাঁর লক্ষ্য নিবিষ্ট হয়েছে। চরিত্রচিত্রণে তিনি চরিত্রের স্বাধীন বিবর্তনের ওপরেই জোর দিয়েছেন ফলে এক জীবনেই এক একটি চরিত্রের ঘটেছে জন্ম-জন্মান্তর। চতুরঙ্গের নায়ক যদি শচীশকে বলি তবে তা একজন শচীশের কাহিনী না হয়ে নানা শচীশের একখানি মালা গাঁথা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাসের মত এখানেও চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে কিন্তু চতুরঙ্গে ব্যক্তির পূর্ণতা লাভের প্রয়াসের এক বিচিত্র রূপ লক্ষ্য করা যায়। কবি জোর দিয়েছেন চরিত্রের স্বরূপ সন্ধানের ব্যাকুলতার ওপর।

শচীশের স্বরূপ উদ্ঘাটনে কবিতার রূপের বর্ণনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। উপন্যাসের গোড়াতে 'জ্যাঠামশাই' অংশে শ্রীবিলাস বলেছেন—"শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে, তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম।" দৈহিক রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়েই কবি যেন শচীশের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের তথা অসাধারণত্বের পরিচয় মুদ্রিত করে দিয়েছেন। তার অসামান্যতার আর এক পরিচয় তার প্রতিভাদীপ্ত চারিত্র্য বর্ণনায় পাওয়া যায়।

জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর লক্ষ্য করি শচীশের চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে—সে লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রসের পথে জীবনের অর্থ সন্ধানে অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য এই রসও তার কাছে প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে লভ্য বলে মনে হয় নি; তাকে সে পেতে চেয়েছে অন্তরের মধ্যে একটা উপলব্ধি রূপে—এখানেও সে আইডিয়ালেরই উপাসক। এমনকি এই পর্যায়ে দামিনীও তার কাছে আইডিয়া রূপেই প্রতিভাত হয়েছে।

এরপর আবার এক পরিবর্তনের ধারা এসেছে। তার একান্ত ধর্মনিষ্ঠা ও অক্লান্ত গুরু সেবার মাধ্যমে নিজের মধ্যে একটা ফাঁকি অনুভব করে সে বিচলিত হয়েছে। দামিনীর প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করে, শ্রীবিলাসের প্রতি কামিনীর সহজ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দেখে সে তার প্রতি ঈর্ষা বোধ করেছে। পরে সে যখন বুঝেছে দামিনীকে অস্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব তখন সে তাকে তাদের ধর্মকার্যে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছে—এ আহ্বান প্রেমের না হলেও কর্তব্যের এবং এর মধ্য দিয়েই তার কাছে দামিনী ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে কিছুটা ধন্য হয়েছে। দামিনী শচীশকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু দামিনীর সেবাযত্নে অতিষ্ঠ বোধ করে শচীশ এরপর অন্তরের উপলব্ধি—অরূপের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে কৃতসংকল্প হয়েছে—শুরু হয়েছে তার জীবনের চতুর্থ তথা শেষ পর্ব। শচীশের সাধনায় এই স্তরে তার অন্তর্মুখী চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

শচীশ চরিত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ওপরেই রবীন্দ্রনাথ অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন দেখা যায়—বাস্তব পটভূমির গুরুত্ব তাই এই উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়েছে।

এই উপন্যাস থেকে রবীন্দ্র সাহিত্যে অন্তশ্চেতনার বিশ্লেষণ যাকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে Stream of Consciousness বা চেতনা প্রবাহ পদ্ধতি নাম দেওয়া হয়েছে—তার প্রভাব অনুমান করেছেন কোন কোন সমালোচক। শচীশ চরিত্রে তারই পরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীবিলাস এই উপন্যাসের সূত্রধার-তত্ত্ব প্রধান চরিত্ররাজীর মধ্যে সেই কেবল বাস্তব ও জীবননিষ্ঠ চরিত্র। সে শচীশের অকৃত্রিম বন্ধু কিন্তু তার ছায়া মাত্র নয়—'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী' এই চরিত্রটিতে শচীশের টানে লীলানন্দ স্বামীর রসের সাধনায় যোগ দিয়েছিল বটে, কিন্তু নাস্তিক জ্যাঠামশাই-এর যোগ্য শিষ্য শ্রীবিলাস ক্ষণিকের মোহ কাটিয়ে উঠতে দেরী করেনি। জীবন রসের রসিক শ্রীবিলাস সহজে স্বাভাবিক একজন মানুষ—সে তত্ত্ব নয়, দর্শন নয়, সাধকও নয়—জীবন-রস রসিক এক বাস্তব বিগ্রহ।

জ্যাঠামশাই জগমোহন প্রত্যক্ষবাদী, মানবদরদী এবং নাস্তিক—'বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়' তিনি উৎসর্গকৃত প্রাণ। আর এই কারণেই তিনি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এক আদর্শ মহাপুরুষ চরিত্র। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য এই অদ্ভুত চরিত্র রবীন্দ্র সাহিত্যে অদ্বিতীয়, 'সমস্ত আসক্তির মধ্যে একটা সরল নির্লিপ্ততা, সমস্ত প্রবৃত্তি-সংঘাতের মধ্যে একটা প্রসন্ন-নির্মল জীবন স্বীকৃতি, একটা উদার বৈরাগ্য শান্তি, এই চরিত্রটির অনন্যতার কারণ।

দামিনী এই উপন্যাসের এক বিশিষ্ট চরিত্র—রবীন্দ্র উপন্যাসে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নারী চরিত্র। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীবিলাস বলেছে—"দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে।" শচীশ তার সম্পর্কে লিখেছে—"সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ। সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।"

এই দুই বর্ণনার মধ্যেই দামিনীর বাইরের রূপ যেমন তেমনি অন্তরের স্বরূপটিও ফুটে উঠেছে। তার তেজস্বিতা, ব্যক্তিত্ব, চঞ্চলতা তার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা—সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দামিনী সত্যি সত্যিই বিদ্যুৎ শিখারই মত, অবশ্য তার এই স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে শিবতোষের গৃহের গার্হস্থ্য জীবন থেকে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে বৈধব্য জীবন যাপনের মধ্যে। দামিনীর নারী ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্বটুকু রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

[নয়]

'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ' এক বছরেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এই দুই উপন্যাসের প্রতিপাদ্যের মধ্যেও একটু মিল লক্ষ্য করা যায়—"রাজনৈতিক চরমবাদের প্রগল্ভ

প্রতিনিধি সন্দীপ—যার আধুনিক অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার স্বাধীন সাধক শচীশ। দুটো মেলালে একটা সময়ের ছবি পাই—বাঙালী রাজনৈতিক চরমবাদেব প্রথম অধ্যায় এবং তার গৈরিক পরিশিষ্ট শ্রীঅরবিন্দ।

অবশ্য সন্দীপকে উপযুক্ত কারণেই স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য প্রতিনিধি বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বরং তার মধ্যে বাক্ সর্বস্ব স্থূল স্বার্থ লোলুপ, মাংসল স্বভাব সম্পন্ন, আত্মাদর-পরায়ণ তীক্ষ্মবুদ্ধি, সুযোগ-সন্ধানী এক শ্রেণীর ভণ্ড দেশ প্রেমিককেই কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন। দেশপ্রেম এদের কাছে মগ্ন স্বার্থপরতার ছল আবরণ মাত্র, এরা স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের ধারে কাছে পেঁছুতে পারে নি — তাদের অন্যায় প্যারডি রচনা করেছে মা্ ে। তবে এই ধরনেব চরিত্র যে অসম্ভব নয়, এমন কি দেশপ্রেমিকের ছদ্মবেশে এরা যে সেকালে ও একালে ঘুরে ঘুরে এসেছে তাও 'সত্য'। অন্য চরিত্র হিসাবে সন্দীপ বেশ জীবন্ত এবং একমুখী বা সরল। আত্মকথন মূলক ভঙ্গীতে রচিত বলে তার নিজের কথাতেই তার চরিত্রটি বিশ্লেষিত হয়েছে। সন্দীপ বলেছে—"যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমাব এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।" নিখিলেশের আত্মকথায়ও সন্দীপের চরিত্র যথাযথভাবেই বিশ্লেষিত হয়েছে—"সন্দীপের প্রকৃতিব মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। আর সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাছে দৌরাত্মের দিকে তাড়না করে। তাব প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ম বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড়ো নাম দিয়ে সাজিয়ে তোলে।"

সন্দীপের বাক্যে ও কার্যে, অপরের সঙ্গে কথা বলার সময় মনস্তাত্বিকজ্ঞানের পরিচয়দানেব ভিতর দিয়ে তার চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি অতি সরলীকৃত টাইপ চরিত্রে পরিণত হয়েছে বলা চলে।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশি মন্তব্য করেছেন —"রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে দুটি করিয়া প্রধান পুরুষ-চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়—বিনয় ও গোরা ; নিখিলেশ ও সন্দীপ ; বিপ্রদাস ও মধুসূদন। এগুলি জোড় বাঁধা চরিত্র। ভাবের সূত্রে বা বৈষম্যের সূত্রে ইহাবা পবস্পর গ্রথিত। তাহাদেব মধ্যে ব্যক্তিরূপের চেয়ে শ্রেণীরূপের বিকাশই প্রবলতর।" সন্দীপের মধ্যে যেমন স্বদেশী আন্দোলনের একশ্রেণীর ভণ্ড দেশপ্রেমেব চরিত্র পবিস্ফুট তেমনি নিখিলেশের মধ্য দিয়ে আর একশ্রেণীর আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক জমিদাব চবিত্র অঙ্কিত হয়েছে—সব দিক দিয়েই সে সন্দীপের বিপবীত। তার স্বদেশ প্রেম সন্দীপেব মত বক্তৃতা-সর্বস্ব উত্তেজনাময় একটা আইডিয়া মাত্র নয়, তা সমবায়-মূলক সংগঠন কার্যের মধ্য দিয়ে প্রজাদের যথার্থ কল্যাণকামী মূর্তিতে প্রকাশোন্মুখ। আসলে নিখিলেশের মারফৎ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রাজনৈতিক মতামতই প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে। মাতানো ও খ্যাপানোর রাজনীতিতে তিনি কোনোদিনই শ্রদ্ধাবান ছিলেন না —তিনি চেয়েছিলেন আত্মশোধন ও আত্মগঠন। নিখিলেশ সেই দিকটাই তুলে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে শুধু রাজনীতিই নয়

সমাজ নীতিরও একটা দিক আছে এবং সেদিক থেকেও নিখিলেশ রবীন্দ্র জীবনদর্শনের ছায়াবহ। 'ঘরে বাইরে'র সমস্ত ঘটনাসূত্র নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যে তত্ত্বপরীক্ষায় তা নিখিলেশের জীবনতত্ত্ব বলা চলে। মানুষের মনুষ্যত্বের ওপর তার ছিল গভীর বিশ্বাস। নিখিলেশ নিজের দাম্পত্য জীবনে তার এই বিশ্বাসকেই যাচাই করতে চেয়েছে—বিমলাকে স্ত্রীরূপে নয়, নারীরূপে -তার মনুষ্যসত্তার বিকাশে সকল সুযোগ করে দিয়ে। ঘরের মানুষকে বাইরের জগতের নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের করে পেতে চেয়েছে। তার এই বিশ্বাসকে দাম্পত্য-জীবনে প্রতিফলিত করে দেখার চেষ্টাতেই উপন্যাসের মূল সমস্যা জট পাকিয়েছে, সত্যের মুখোমুখি হতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে নিখিলেশের হৃদয় দগ্ধ হয়েছে, কিন্তু সে আদর্শে অটল থেকে বিমলার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করেছে। তার এই আদর্শনিষ্ঠা উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে কিছুটা প্রাণহীন, নির্জীব করে পাঠকের সামনে তাকে উপস্থিত করেছে—একথা সত্য, কিন্তু তার অন্তর্বেদনা ও সন্দীপের প্রতি মৃদু ঈর্ষা তাকে প্রেমিক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছে, বিশেষ করে তার কবিত্বপূর্ণ আত্মকথা তার বেদনার কেন্দ্রে পাঠককে পৌঁছে দিয়েছে। উপন্যাসের শেষাংশে লেখক তার হৃদয়ে আদর্শ প্রিয়তার কিছুটা বাস্তববোধেরও পরিচয় দিতে পেরেছেন চন্দ্রনাথ বাবুর পরামর্শে নিখিলেশ বিমলাকে নিয়ে কলকাতা যাওয়ার চিন্তা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদর্শের জন্যই সে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছে। সন্দীপ যে বাক্-সর্বস্ব, ভণ্ড দেশপ্রেমিক তা তার আচরণ দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে—মুসলমানদের হাতে মৃত্যুর আশঙ্কা করে 'বীরপুঙ্গব' সন্দীপ রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে, আর হিন্দুর ওপর মুসলমানদের আক্রমণের খবর পাওয়ামাত্র নিখিলেশ ঘোড়া ছুটিয়ে, সব নিষেধ অমান্য করে বাইরে চলে গেছে এবং মাথায় আঘাত নিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ফিরে এসেছে। অধ্যাপক বিশী যথার্থই মন্তব্য করেছেন- "বাংলাদেশে সন্দীপ আর একটিমাত্র নয়। সমস্ত বাংলা-দেশ আজ সন্দীপের জনতায় পরিপূর্ণ। আর এক দিকে নিখিলেশের দল সংখ্যায় ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে।" বলা বাহুল্য, লেখকের সহানুভূতি সন্দীপের চেয়ে নিখিলেশের দিকেই অধিক। তাঁর সহানুভূতির অভাবে সন্দীপ নিখিলেশের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীই হয়ে উঠতে পারে নি, সে কখনো ভাঁড়ের মতো ব্যবহার করেছে, কখনো Mock Hero র অভিনয়ও করেছে। বাক্-সর্বস্ব এই সহানুভূতির প্রতি বিমলায় সশ্রদ্ধ ভক্তি নিবেদনের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় ব্যঙ্গ লক্ষ্য করেছেন অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়িকা বিমলাই সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র। তার চরিত্রে একটা ক্রমবিকাশ আছে—প্রবৃত্তির দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের অভিঘাতে কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার এবং নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তার স্বভাবে প্রত্যাবর্তন—সংক্ষেপে এই হল বিমলা চরিত্রের বিবর্তনের রেখাচিত্র। মায়ের কাছে পাওয়া ঐতিহ্যগত এক সতীত্বের সংস্কার ও অন্তঃপুরিকা নারীর স্বভাব নির্মলতার জোরে সে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনায় কিছুদিনের জন্য পদস্খলিত হয়ে ক্ষণিকের আবিলতা শোধন

করে দেহমনে আদিম শুচিতাকে অক্ষুন্ন রেখেই পূর্ব জীবনে ফিরে গেছে। মনের গোপনে ভক্তির একটি বিনম্র শিক্ষাকে সে সযত্নে পালন করে এসেছে। সন্দীপের আপাত মনোহর ব্যক্তিত্বের মোহে সে কিছুদিনের জন্য কেন্দ্রভ্রষ্ট হলেও, তার দাম্পত্য অনুরাগ ক্ষণ বিধ্বস্ত হলেও, তার পরিবার-চেতনা অন্তঃপুরিকার স্বভাব নির্মলতা, স্নেহ, মমতা, গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য, নিষ্ঠা তাকে আবার স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে এনেছে। নিখিলেশের আপাত নির্লিপ্ততা যেমন তার পতনকে ত্বরান্বিত করেছে তেমনি সন্দীপের লোভ ও কাপুরুষতা তার প্রত্যাবর্তনকে সন্দেহ করে ফিরেছে। দুটি পুরুষের বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির মধ্যে ক্ষণবিভ্রান্ত এক নারীচরিত্রের চিরন্তন অন্তর্দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের উপজীব্য হলেও বিমলার মধ্যে দু একটি নতুন চারিত্রিক মাত্রা যোজনা করে লেখক তার আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে হয়। বিমলার মধ্যে সধবা রমণীর পরকীয়া প্রেমের ; তারপর পুরুষাসক্তির চিত্রাঙ্কনে কবির এই আধুনিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ঘরের নারীকে বাইরে এনে কোনও একটা ছুতোয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করে দেওয়ায় ঘটনায় কবির সময় মনস্কতারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিমলার আধুনিক নারী জনোচিত শিক্ষায় প্রসঙ্গ নতুন কিছু না হলেও তার মধ্যে 'বাংলা দেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি' হওয়ার যে আকাংক্ষার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তা সম্পূর্ণই আধুনিক নারীর মানস উপাদান সন্দেহ নেই। বিমলার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নারী চরিত্রে 'ব্যক্তিত্বে'র বিকাশ লক্ষণীয় হলেও তার আত্মকথায় বার বার সতীত্ব, স্বামীভক্তি প্রভৃতির উল্লেখ তাকে পুরোপুরি আধুনিক ব্যক্তিত্বময়ী নারীর প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠার পথে বাধা দিয়েছে। বিশেষ করে আধুনিকা রমণীর ক্ষেত্রে অপেক্ষিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোহর চুরির কলঙ্কে বিমলা নিজেকে যেভাবে কলঙ্কিত ভেবেছে তাতে তার আধুনিক মনোভাবটিই প্রকাশিত হয়েছে। অধিকন্ত মেয়ের উপর উপুড় হয়ে তার কান্না "কী হবে আমার, কী হবে! আমার কপালে কী আছে ?"—আমাদের অদৃষ্টবাদী অসহায়া রমণীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

[দশ]

'ঘরে বাইরে'র প্রায় তেরো বৎসর পরে লিখিত হয় 'যোগাযোগ' যা 'তিন পুরুষ' নাম দিয়ে 'বিচিত্রা'র পাতায় প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য 'যোগাযোগ' তিন পুরুষের নয় এক পুরুষের কাহিনীতেই সমাপ্ত হয়েছে, তবে চাটুজ্জে ও ঘোষাল পরিবারের পুরুষানুক্রমিক বিদ্বেষের রণভূমিতে কুমুদিনীর সকরুণ আত্মদানকেই লেখক উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। কুমুর মধ্যে লেখক নারীব্যক্তিত্বের মৌল স্বরূপটি উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন—তার জীবনে তথাকথিত সতীত্বের আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তি-সত্তার নিগূঢ় দ্বন্দ্ব এক সকরুণ পরিণাম রচনা করেছে। নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সংকট এই উপন্যাসে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

কুমুদিনীকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমত এক রোমাণ্টিক কল্পনার জগতের অধিবাসীরূপে

অঙ্কিত করেছেন—বিপ্রদাসের সান্নিধ্য ও শিক্ষায় শিল্পী-সৌন্দর্য ও সৎচিন্তায় সে রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডের মতোই বেড়ে উঠেছে। তার কুমারীজীবনে স্বামীর একটি কল্পিত আদর্শ ছিল যা কুমারসম্ভবের 'শিব-পার্বতীর আদর্শ' লালিত। সেই আদর্শ সতীধর্মের মহৎ প্রেরণা মনে নিয়ে সে নিজেকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু তার সূক্ষ্ম সুকুমার রুচি ও ব্যক্তিত্ব মধুসূদনের মতো একজন ধনমদমত্ত প্রভুত্বকামী দাম্ভিক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহের ফলে বাস্তবের রূঢ় আঘাত লেগে সহসা যেন ভূপাতিত হল। কুমুদিনী ভক্তিপ্রাণা কিন্তু সংস্কার-মুক্ত নয়—সেই সংস্কার আবার অনেক সময়, অজ্ঞানতাপ্রসূত ফলে ভক্তিকে যুক্তি বা জ্ঞানের সাহায্যে যাচাই না করে অন্ধভাবে তার আনুগত্য করতে গিয়ে কুমুদিনী ভুল করেই মধুসূদনকে স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর সে বুঝতে পারল তারা দুজনে সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন জগতের অধিবাসী—তারা দুজনে দুই ভিন্ন বোধ-জগতে বাস করে—তাদের রুচি সংস্কার নৈতিক বোধ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা, জীবনের সার্থকতা ও অসার্থকতা সম্পর্কে আইডিয়া সম্পূর্ণ পৃথক। এই দুই ভিন্ন জগতের মানুষ দাম্পত্য সূত্রে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হলেও মনে মনে কখনও মিলিত হতে পারে না। তাদের দুজনের সম্পর্কে মোতির মার মুখে রবীন্দ্র বক্তব্য এইরকম—"এক রকমের জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের—সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়।" এই মার কুমুদিনীর জীবনে শুরু হয়েছে বিবাহের পর ফুলশয্যা থেকেই। লেখকের ভাষায় তার বর্ণনা এইরকম—"একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে, দেবতাকে ডাকছে।" নারী ব্যক্তিত্বের প্রতি পুরুষের অমর্যাদার আশ্চর্য সাংকেতিক ভাষাচিত্র এই বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। এখানে কুমুদনী নিজেকে মধুসূদনের গর্বিতা স্ত্রী বা গরবিনী প্রণয়িনী ভাবেনি, ভেবেছে—সে যেন তার ক্ষুধার খাদ্যমাত্র।

কুমুর অন্তরের সৌন্দর্যবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা পদে পদে বাধা পেয়ে মধুসূদনের স্থূল প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সে 'কুমু' হয়ে উঠতে চেয়েছে—কেবলমাত্র ঘোষাল বাড়ির বড়ো বউ হয়ে তার জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করতে চায়নি। "আমি ওদের বড়ো বউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই।"—সমস্ত উপন্যাসে কুমুর ব্যক্তি সত্তার এই জিজ্ঞাসাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নিজের স্বামীর কাছ থেকে শুধু স্ত্রীরূপে নয়, ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছে কুমুদিনী। কিন্তু মধুসূদন স্ত্রীকে দেখেছে সম্ভোগের সামগ্রী রূপে, তাকে প্রিয়ামূর্তিতেও সে দেখতে শেখেনি, তাই কুমুদিনীও তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি—স্বামীগৃহে সে তার আপন আসনটি পায়নি বলেই আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে সে দাদার কাছে চলে এসেছে। অবশ্য তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্বামী গৃহে ফিরে যেতে হয়েছে। মধুসূদন তাকে আয়ত্তে আনার একটিমাত্র পথই খুঁজে পেয়েছে "সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা।" নারীর উপর প্রেমহীন

পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের এই আদিম বর্বর চিন্তা পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অসহায়তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বামীর কাছে অনিচ্ছার এই আত্মসমর্পণকে কুমু 'আন্তরিক অসতীত্ব' আখ্যা দিয়েছে। তার মন দেবতার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের উপসংহারের প্রয়োজনে লেখক কুমুদিনীকে সন্তানা সম্ভবা দেখিয়ে তার স্বামীগৃহে ফিরিয়ে এনেছেন বটে কিন্তু তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে অব্যাহত ছিল তার আভাস দিয়েছেন তারই এক উক্তিতে—"এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না। একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব, চলে আসবই ; তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না।" উপন্যাসের পরিণতিতে অবশ্য তার এই সংকল্পের সার্থক রূপায়ন আমরা দেখতে পাই না। তবে এই চরিত্র সম্পর্কে উপসংহারে এটুকু বলা চলে কুমুদিনী আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো নয় –সে রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া একটি অ-সাধারণ নারী চরিত্র। সে আদর্শ স্বামীর আদর্শ স্ত্রী হতেই চেয়েছিল—সে স্ত্রী কালিদাসের ভাষার অনুসরণে গৃহিনী সচিব সখী মিত্র –"প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"। মধুসূদনের জীবনে নারীর সেই ভূমিকা সে পায়নি তাই দাসী হয়ে সেখানে সে থাকতে অসম্মত হয়েছে। নারীর আপন ভাগ্য জয় করে নেবার সংকল্পের কথা এইভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে বার বারই শোনা গিয়েছে।

যোগাযোগের প্রধান পুরুষ চরিত্র দুটি বিপ্রদাস ও মধুসূদন। অধ্যাপক বিশী যাদের বলেছেন "বিজোড়ের জোড় বাঁধা' চরিত্র ; তাঁর ভাষায় বিপ্রদাস পুরাতন ধ্বংসোন্মুখ অভিজাত বংশের সন্তান ; মধুসূদন নূতন অভ্যুদয়োন্মুখ ধনী। পুরাতন ধনী ও নূতন ধনের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়াছে উপন্যাসখানিতে, আর সে-যোগাযোগের কারণ কুমুদিনী।" দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনে লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। বিপ্রদাসের প্রতি তিনি পাঠকের মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলেছেন তুলনায় মধুসূদনের প্রতি অবজ্ঞা। শিক্ষা, সুরুচি, শিল্পানুরাগ, সঙ্গীতপ্রিয়তা, স্নেহ, উদারতা প্রভৃতি নানা সদগুণে ভূষিত বিপ্রদাস লেখকের সহানুভূতির স্পর্শে অভিজাত বংশীয় একটি আদর্শ চরিত্র হয়ে উঠেছে ; পক্ষান্তরে তাঁর সহানুভূতিরহিত মধুসূদন গুণ অপেক্ষা দোষের আকর হয়ে দুর্বৃত্ত জাতীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের কঠিন নিরেট চেহারার বর্ণনা থেকেই লক্ষ্য করা যায় তার প্রতি লেখকের কঠোর মনোভাব –"মধুসূদন দেখিতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবশুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট ঃ মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, বাজে কথা, বাজে বিষয় বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই।" বণিকবৃত্তি সম্পন্ন এই চরিত্রটিকে রুচিহীন স্থূল করে গড়ে তোলার জন্যই লেখক তার বাইরের চেহারাটার এই বর্ণনা দিয়েছেন। বৈষয়িক জীবনে সফল এই চরিত্রটি ব্যবসায়ীদের শ্রেণী-চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে উপন্যাসের নায়ক চরিত্র হিসাবে তেমন সম্ভ্রম আকর্ষণ করতে

পারেনি অবশ্য রক্তমাংসের মানুষরূপে এই উপন্যাসে সে তার একটা স্থান করে নিতে পেরেছে। লোভ, স্বেচ্ছাচার, অধিকার বোধ, ঔদ্ধত্য, সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য, গৌরবের প্রতি ঈর্ষা প্রভৃতির প্রতীকরূপে এই চরিত্র অংকনে ঔপন্যাসিক যতটা সফল চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে ততখানি নন।

'যোগাযোগে' শুধু মধুসূদনেরই নয় —বিপ্রদাস এমনকি কুমুদিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে লেখক বিশেষ কালক্ষেপ করেননি, তিনি অসংখ্য নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের প্রথমে উপস্থাপিত বক্তব্যকে উপসংহারের দিকে নিয়ে গেছেন। যদিও তিন পুরুষের কাহিনী বর্ণিত না হওয়ায় অবিনাশ ঘোষালের কথা এখানে অকথিতই থেকে গেছে।

[এগার]

পরবর্তী উপন্যাস 'শেষের কবিতা'য় ঘটনার পরিমাণ আরও কম এক প্রেমিক-যুগলের নিরবচ্ছিন্ন প্রেমালাপেই উপন্যাসের কাঠামো গড়ে উঠেছে। 'যোগাযোগে' রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, দুই অসম রুচি ও মানসিকতায় স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন যেমন সংঘাতমুখর হয়ে দুজনেরই জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটাতে পারে, "শেষের কবিতায় দেখাতে চেয়েছেন শিক্ষা, রুচি, মানসিকতাব মিলও সর্বদা সুখী দাম্পত্য জীবনের নিশ্চিত ভিত্তি নয়। এখানে নায়ক নায়িকার মিলন না ঘটিয়েই রবীন্দ্রনাথ সমস্যাটিকে দেখিয়েছেন।"

উপন্যাসেব নায়ক অমিত পরিপূর্ণ রোমান্টিক চরিত্র—সে রোমান্সের পরমহংস, স্টাইলের পূজারী। নিজের মনের খেয়াল খুসীর খেলায় মেতে থাকতে ভালবাসে। তার চরিত্রটি উচ্ছ্বাসপ্রবণ, বাস্তব সমাজবিমুখ কল্পনাবিলাসী। মনেব উচ্ছ্বাসবশে একদা ভালবেসে সে কেটিকে যেমন নিজের হাতের আংটি পরিয়েছিল, সেই কল্পনাবিলাসী মনোধর্ম অনুসারেই শিলঙেব নির্জন পরিবেশে লাবণ্যকে দেখে তার ভালো লেগে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে সে মনের মাধুরী দিয়ে আপন স্বর্গরাজ্য রচনা করেছে। লাবণ্যেব সঙ্গে যে ভাষায় সে কথা বলে তাও বাস্তব প্রয়োজনের ভাষা নয়, কবিতারই ভাষা। লাবণ্যকে বিবাহোত্তর সম্ভাব্য জীবনের যে সব চিত্র সে উপহার দেয় তার থেকেই প্রমাণ হয় সে কতদূর কল্পনা[illegible]লাসী, আত্মকেন্দ্রিক ও কালের পক্ষে কিছুটা অবাস্তব চরিত্র।

'শেষেব কবিতা'র মতো কাব্যোপন্যাসের নায়ক চরিত্র যে রক্ত মাংসের সজীব মানব মূর্তি হবে না লেখকের পক্ষে এটা আশা করা হয়তো অন্যায় নয়, কিন্তু উপন্যাসে আমরা চাই বাস্তব পৃথিবীর মানুষ—যাদের মেনে নিতে অসুবিধা হয় না, যারা আমাদের অতিপরিচিত না হলেও অবিশ্বাস্য নয়। এই উপন্যাসের নায়িকা লাবণ্য-চরিত্র চিত্রণে লেখক সে কথাটা ঠিকই খেয়াল কবেছেন। লাবণ্য বাস্তব নারী মূর্তিই বটে। তবে সে রবীন্দ্রনাথের আর পাঁচটা নারী চরিত্রের মতই তবু সাধারণ। সে

বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বময়ী এবং রবীন্দ্র উপন্যাসে বোধকরি সর্বপ্রথম নারী—যার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে। পিতার দ্বিতীয় বিবাহের পর "সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবেনা, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে"—এমন সংকল্পের কথাই শুধু ঘোষণা করেনি—সুরমাকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে তা কাজেও পরিণত করেছে। বুদ্ধির আলোতে জীবন্ত এই চরিত্রটি জীবনের সব কিছুই স্পষ্ট করে জানতে চায় এমন কি প্রেমের পাত্রটিকেও। তার বাস্তববুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও মানব চরিত্র সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাই তাকে অমিতের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছে। মেয়েরা স্বভাবতই যেখানে নিজেকে ভোলাতে চায় এই মননশীলা রমণী সেই ভালোবাসার ক্ষেত্রেও নিজেকে ভোলাতে চায় নি, তাই অমিতকে ভালোবেসেও সে তাকে মুক্তি দিয়েছে, বিবাহের বন্ধনে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি। পক্ষান্তরে শোভনলালের আত্ম-বিলোপী নীরব ভালোবাসাকেও শেষ পর্যন্ত সে স্বীকৃতি দিয়েছে—ব্যবহারিক জীবনে 'সে তাহারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি' তারই সেবায় সে নিজেকে নিঃশেষে বলি দিয়েছে। আর অমিতকে জানিয়েছে 'হে বন্ধু, বিদায়'। লাবণ্য চরিত্রে ছোট একটু ক্রমবিকাশও আছে। রবীন্দ্রনাথ 'লাবণ্য পুরাবৃত্ত' অধ্যায়ে লাবণ্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় আধুনিক মননের পরিচয় দিলেও তার চরিত্রের অসম্পূর্ণতার দিকেও অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। সেই অপূর্ণতা ঘুচল অমিতের সংস্পর্শে এসে প্রেমের বেদনার মধ্যে জাগরণে। অমিতের সঙ্গে আলাপের আগে সে ছিল ছায়া তারপর হয়েছে সত্য। প্রেমের স্পর্শে নবজন্ম লাভ করেও সে আপনার যুক্তিযুক্ত মননকে ত্যাগ করেনি তাই—অমিতের স্বভাবকে বুঝতে তার এতটুকু ভুল হয় নি। আর ভুল হয় নি অমিতের প্রতি কেটির সত্যিকারের প্রেমকে চিনে নিতে। অমিতের মানুষকে সৃষ্টি করে নেওয়ার যে উৎসাহ তা যে কেটির মাধ্যমেই সিদ্ধ হবে তাও লাবণ্য বুঝেছিল, সেই মানুষ গড়ার সাধ তাকে দিয়ে পূর্ণ হবে না, কারণ 'সে তার ভাগ্য-বিধাতার হাতে গড়া পূর্ণ স্বভাব সুলক্ষণা মেয়ে'। কেটি তথা কেতকী এই উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র হলেও অবাস্তব নয়। সে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের নারী চরিত্রের চমৎকার প্রতিনিধিত্ব করেছে। তার হাব-ভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ আজকের অ্যাংলিসাইজড বাঙালি সমাজের অতি আধুনিকা ফ্যাশান দুরস্ত মহিলাদের মনে করিয়ে দেয়। ভাবতে অবাক লাগে সত্তর বৎসরের প্রাচীন যুবা রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা শক্তি বলে কি রকম অনায়াসে "এক দুস্তর কালসমুদ্র পার হইয়া এই একান্ত আধুনিক বর্তমানের এই অতি আধুনিক, শিক্ষিত, মার্জিত, উচ্চ মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীর মন ও হৃদয়ের মধ্যে নিজের বাসা লইয়াছেন, এবং সেখানে প্রত্যেক অলিগলির সন্ধানও তাঁহার কাছে সহজ হইয়া উঠিয়াছে।" বস্তুত কেটি-সিসি-লিসি-বিমির দলের সৃষ্টি করে এই জাতীয় ফ্যাসনবিলাসী উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রতি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এই মনোভাব প্রকাশে শ্রেণী বিশেষের প্রতি তাঁর শ্লেষ কটাক্ষ লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্কেও সমকালীন অতি আধুনিকদের বক্রকটাক্ষটুকুও তিনি উল্লেখ করেছেন—রবি ঠাকুরকে নিয়ে নিবারণ চক্রবর্তীর ঈর্ষার মনোভঙ্গির মধ্য দিয়ে।

[বার]

রবীন্দ্রনাথের সর্ব শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়'-এর নাট্য সম্ভাবনা যে প্রথম থেকেই লেখকের মনে স্পষ্টত সজাগ ছিল তা বোঝা যায় "প্রধান অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ-গুলির মঞ্চ-সজ্জা নির্দেশকল্প দৃশ্য বর্ণনা থেকে।" সংলাপে ভরা এই উপন্যাস সহজেই দক্ষ নাট্য নির্দেশনায় আশ্চর্য নাট্যরূপ নিয়েছে। "জীবনের বিচিত্র প্রবাহ একত্র মিশিয়া ঘাত প্রতিঘাতে ফেনিল হইয়া উঠিয়া" এখানে যে নাট্যদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে উপন্যাসটির নাটকীয় সার্থকতার মূলে রয়েছে সেই দ্বন্দ্ব। দেশের সমকালীন বৈপ্লবিক 'বিভীষিকা পন্থা'র তথা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় অতীন্দ্র-এলার প্রেম কাহিনী রূপেই উপন্যাসখানি পাঠ করতে স্বয়ং কবি আমাদের অনুরোধ জানিয়েছেন। সুতরাং কবির পরামর্শ শিরোধার্য করে এর পটভূমিকায় যে রাজ-নৈতিক মতবাদ ও কর্ম প্রচেষ্টার আভাস আছে তার ঐতিহাসিক বিচারের উপর গুরুত্ব না দিয়ে কাহিনীর শিল্পগত বিচারেই দৃষ্টি দেওয়া যাক এবং শিল্প বিচারে আমরা যেহেতু বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান চরিত্র বিশ্লেষণেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অতঃপর সেই চরিত্রালোচনায় অগ্রসর হওয়া চলে।

এই উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্র একটি এলা, পুরুষ চরিত্র দুটি অতীন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ। এলা সম্পূর্ণ রূপেই আধুনিকা এক নারী—উপন্যাসের ভূমিকা অংশেই লেখক তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। তার জীবনের শুরু হয়েছে বিদ্রোহ দিয়ে মা মায়াময়ীর আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছে বাবাকেও সে 'অন্যায় চুপ করে সহ্য করা'র কাজে বাধা দিয়েছে। বিবাহ সম্পর্কেও তার মনের কথায় অত্যাধুনিক নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় পাওয়া যায় "এলার মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জন্য মেয়েদের প্রস্তুত হতে হয় আত্ম-সম্মানকে পঙ্গু করে ন্যায় অন্যায় বোধকে অসাড় করে দিয়ে।" বিয়ের বাঁধন এড়াবার জন্যই সে স্বেচ্ছায় ইন্দ্রনাথের দলে যোগ দেয়। ইন্দ্রনাথ তাকে বলেছে "তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহবান তোমার মধ্যে।" এলা এই কথায় চমকে উঠলেও নবযুগের বৈপ্লবিক আহবান সে যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে কিনা সন্দেহ। তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের অভাব লক্ষ্য করা যায় দু একটি ঘটনায় -তার বেনামীতে ইন্দ্রনাথ কাগজে প্রবন্ধ পাঠালে সে আপত্তি করে না ; বিপ্লবী দলে মেয়েদের অদ্ভূত রহস্যময় এবং এক অর্থে অসম্মান-জনক ভূমিকা - বিপ্লবীদের চেতনাকে উত্তেজিত করার কাজে ইন্দ্রনাথ কর্তৃক তাদের নিয়োগ সম্পর্কেও সে কোনও প্রশ্ন করে না অথচ ইন্দ্রনাথকে স্পষ্ট করে কথা একমাত্র সেই বলতে পারতো। অন্তুর সঙ্গে সংলাপে এলার যে ভূমিকা তাও তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্তরায় হয়েছে। অতীনের প্রতি সে প্রেমাসক্ত হয়েছে এটা বোঝা যায় কিন্তু দেশের কাজের জন্য সে প্রেম সফল হচ্ছে না—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তার হৃদয়ে যে আলোড়ন ওঠা উচিত ছিল তা যথাযথ ভাবে চিত্রিত হয় নি। অতীনের ক্রম পতন ও আপন স্বভাবকে হত্যা করার যে অভিব্যক্তি উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে তার পাশে এলার অন্তর্দ্বন্দ্ব অতিশয় ম্লান। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণেই

বলেছেন—"এলার চরিত্রে রক্ত মাংসের বাহুল্য নাই—তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ অভাবাত্মক (negative) .. যে স্বদেশ প্রীতির নেশা তাহাকে প্রেমের দিকে অচেতন করিয়াছিল তাহার প্রভাবের গভীরতা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করি না।" এলার দেশপ্রেমের পরিচয় এই উপন্যাসে যথেষ্ট স্পষ্ট না হওয়ায় অতীনকে জীবনে গ্রহণ না করার জন্য তার মানসিক যন্ত্রণাও অস্পষ্ট রয়ে গেছে -"হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ বাঁধা তৎ সত্ত্বেও এত বড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে।"—তার এ কথার তাৎপর্য পাঠক হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। অতীনকে গ্রহণ করতে না পারার আরও যুক্তি সে দেখিয়েছে—অতীনের মতো অ-সাধারণ পুরুষকে নারী হিসেবে 'বায়োলজির সংকল্পেব বাহন' হয়ে সে নীচে নামাতে চায় না। অতীনের মহৎ কাজে সে তাকে মুক্তি দিতে চায়। একটা তত্ত্ব-ভাবনা মাথায় নিয়ে সে স্বাভাবিক জীবনকামনাকে অস্বীকার করেছে—অন্তু কিন্তু প্রথম দিকে পুরুষের কর্তব্য কর্ম ও ভালোবাসার মধ্যে কোনো বিরোধ কল্পনা করেনি। অবশ্য এলাব মানবিক মূর্তি ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে। অতীনের প্রতি তার প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—সে অতীনকে গ্রহণ করতেও চেয়েছে, তার যুক্তির জগৎ থেকে স্বভাবেব মধ্যে সে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু তখন বড়ো দেরী হয়ে গেছে। সে বুঝেছে অতীনেব জীবনে সে-ই ট্র্যাজেডি ডেকে এনেছে—সুতরাং বটুর হাতের নোংরা স্পর্শ এড়াতে সে দেহটিকে অর্ঘ্য রূপে তুলে ধরেছে প্রিয়তমেব প্রতি শেষ পূজা নিবেদন করার জন্য। বস্তুত এলা চরিত্রে আধুনিকা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নারী চরিত্রেব নানা উপাদানের সমাবেশ ঘটলেও তাদের যথোচিত সদ্ব্যবহাব না করার জন্য শেষ পর্যন্ত সে একটি ব্যক্তিত্বময়ী বমণীমূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেনি। ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার চরিত্রের যে আভাস দিয়েছেন উপন্যাসে তার যথোচিত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না।

উপন্যাসের নায়ক অতীন—বিবেকবান, শিল্পী, প্রেমিক পুরুষ, এক বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিতে তার পতন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—অতীনের চবিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এক, সে এলাকে পেল না, আর দুই, সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। অতীন বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল এলাকে ভালবেসে তাকে পাওয়ার জন্য। তাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পেলে তার সৃষ্টি প্রেরণা সম্পূর্ণ হ'তো -সে সার্থক হতো। এলা প্রথম সে আহ্বানে সাড়া দেয় নি। পবে যখন সাড়া দিতে এগিতে গেল তখন অতীন তার কাছ থেকে আদর্শগত ভাবে বহুদূরে চলে গেছে ও "বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পেব বন্ধনে।" এলার ব্যাকুল প্রেম নিবেদনের উত্তরে তখন অতীন বলেছে স্বভাবকেই হত্যা করেছি। সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোন অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না।" স্বভাব-ভ্রষ্ট হলেও অন্তু মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট হয় নি। এলার আহ্বানেও সে তার আচরিত রুদ্রপন্থা পরিত্যাগ করেনি। সে বলেছে "আর কি ছাড়তে পারি ? · অজায়গায় যদি এসে পড়ে থাকি, সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত।" এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই সে গীতার নিরাসক্ত কর্মযোগের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে।

স্বল্প পরিসরে হলেও 'চার অধ্যায়ে' অতীন এলার উদ্দাম 'বর্বর' প্রেমের যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা অন্যান্য নায়ক চরিত্র থেকে অতীন্দ্রকে পৃথক করেছে। অতীনই বলতে পেরেছে 'অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম'। তার কামনামদির প্রেমের প্রকাশ হয়েছে 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস,

তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।' এই পংক্তিদ্বয়।

প্রেমের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রবীন্দ্র সাহিত্যেও অভিনব।

উপন্যাসের নায়ক অতীন হলেও বিপ্লবী দলের নেতা ইন্দ্রনাথ। বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করে স্বদেশে ফিরে প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র না পেয়ে পরাধীনতার গ্লানিভারে জর্জরিত হয়ে জাতির অবসাদগ্রস্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে সন্ত্রাসবাদের পথ নিয়েছে। সে নিজেকে কর্মযোগী মনে করে এবং দেশোদ্ধারের মহাযজ্ঞে নারী ও পুরুষ উভয়কেই একত্রিত করতে চায়, তবে নারীর মোহনীয় আকর্ষণে অধিক সংখ্যক পুরুষ এই দলে যোগ দেবে—এই তার বিশ্বাস। নিজের কর্ম কর্তৃকটা নিরাসক্ত মনেই সে করে—তার মধ্যে অতিমানবতার স্পর্শ আছে—তাকে কেউ আবার চরিত্র নয় আইডিয়া মাত্র মনে করেছেন। তার মধ্যে মনুষ্যোচিত দুর্বলতার অভাব -তার ব্যবহার দুর্বোধ্য "তীক্ষ্ন মনীষাসম্পন্ন তার্কিকতার অন্তরালে তাঁহার ব্যক্তিত্ব রহস্যটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার দলপতিত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।" দলের বিশ্বাসঘাতক কর্মীর প্রতি তার ব্যবহার অবিশ্বাস্য—পুলিশে খবর দিয়ে তার ভার বর্জন করার ঘটনা বিপ্লবীদের ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। অতীন এলার প্রেমের পরিপন্থিরূপেও তার ভূমিকা এই উপন্যাসে স্পষ্ট নয়।

[তের]

রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রধান প্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে দু-একটি কথা বলে উপসংহার টানা চলে। আমরা লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি কোনও না কোনও দিক থেকে অ-সাধারণ। তুলনায় অপ্রধান চরিত্রগুলি কোথাও কোথাও কিছুটা সাধারণ বাস্তব মানব মানবী হয়ে উঠেছে। প্রধান চরিত্র চিত্রণে লেখক এক একটি আদর্শ স্থাপনেরই যেন চেষ্টা করেছেন—কখনও তাদের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা, তার 'ব্যক্তিত্ব বিকাশ' কখনও আবার নিজেকে আবিষ্কারের চেষ্টা লক্ষ্য করিয়েছেন। কোনও কোনও চরিত্র এক একটি মতবাদের বাহন হয়ে এসেছে। 'ব্যক্তি বিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের' চরিত্র-চিত্রণে এ লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথেরও। তাঁর দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে মানুষের যে সব সমস্যা এসেছে তা বিশেষ ভাবে তাঁর নিজের জীবনবোধের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। পুরুষ ও নারী উভয়কেই 'ব্যক্তিত্বের' স্বীকৃতি তিনি দিতে চেয়েছেন কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাঁর উপন্যাসে নারীর 'ব্যক্তি' হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি লাভের ঘটনা অঙ্গুলিমেয়। নারীর ব্যক্তি হিসাবে মর্যাদা লাভের মূলে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাও তিনি খুব কম

ক্ষেত্রেই বলেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও নারীর আগমনকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নি। তিনি নারীর মাধুর্য শক্তির কথাই বার বার জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন। তার উপন্যাসে দুই শ্রেণীর পুরুষ চরিত্রের মত দুই শ্রেণীর নারী চরিত্রও ঘুরে ঘুরে এসেছে—এক শ্রেণীর চরিত্র প্রেয়, অন্য শ্রেণীর চরিত্র তাঁর দৃষ্টিতে শ্রেয়। তিনি শ্রেয় চরিত্রের দিকেই তাঁর সহানুভূতির দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। তিনি পুরুষ ও নারী চরিত্রকল্পনার ভিতর দিয়ে বোধ হয় দেখাতে চেয়েছেন যে, "ব্যক্তির আপন শুদ্ধ-স্বরূপ সন্ধানের ব্যাপারে বাধাটা শুধু সামাজিক বা পারিবারিক নয়। সত্তার পরিপূর্ণ উন্মীলনের পথে তাকে অনেক কিছুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়। সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ তার নিজের মধ্যেই। নিজেকে ভেঙে গড়ার মধ্যে গড়ে ভাঙার মধ্যে।" 'চোখের বালি'তে এ পরিকল্পনা শুরু 'চার অধ্যায়ে' এই পরীক্ষার সমাপ্তি অথবা আর একটু সঠিকভাবে বলা যায় 'তিন সঙ্গী'তেই তার যথার্থ পরিসমাপ্তি। আর একটা কথা রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রধান প্রধান নারী পুরুষ প্রধানতঃ উচ্চবর্ণের মানুষ. (ব্যতিক্রম শচীশ সে সোনার বেনে) অনেক সময় আমাদের মনে হয় যেন বাঙালি উচ্চ বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ, তারা অভিজাত ঘরের সন্তান এবং কখনও কখনও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করি "জাতি-ধর্ম-দেশ কালের ঊর্ধ্বে আন্তর্জাতিক সামাজিক মানুষের স্পষ্ট ছবি।" পরিণত বয়সে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ যেমন "ভারতীয় চিত্রকর হিসেবে নয় বিশ্ব নাগরিক চিত্রকর হিসেবে সর্বত্র সসম্মান স্বীকৃতি" লাভ করেছিলেন, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি তেমনি শুধু বাঙালী বা ভারতীয়ের ছবিই আঁকেন নি, কোন কোনও ক্ষেত্রে স্পষ্টত বিশ্ব নাগরিকের চরিত্রই চিত্রিত করেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তীকালে উপন্যাসের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে এসেছেন শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যাঁদের লেখায় আমরা অমার্জিত অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের নরনারীর সন্ধান পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি, যথার্থ বাঙালী জীবনের সামাজিক পরিবেশের ছবি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তাই উপন্যাসে তিনি নায়ক নায়িকার মধ্যে বাঙালী বা ভারতীয় নর-নারীকে না দেখে বিশ্ব-মানব-মানবীকেই প্রত্যক্ষ করতে ও করাতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। রবীন্দ্র জীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২। বাংলা সাহিত্যে নরনারী : প্রমথ বিশী
৩। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৪। রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। রাতের তারা দিনের রবি : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা : নীহার রঞ্জন রায়
৭। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ : ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ
৮। রবীন্দ্র উপন্যাসের সমীক্ষা : সত্যব্রত দে
৯। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। নবীন রাজা : উজ্জ্বল মজুমদার
১১। বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়

অজিতকুমার ঘোষ

শরৎ উপন্যাসঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য

শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন, 'প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই। তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিস আছে তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস, কতকগুলি চরিত্র—তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়'। শরৎচন্দ্রের বক্তব্য আলোচনা করতে গেলে অ্যারিস্টটলের সেই প্লট ও চরিত্রের দ্বন্দ্বের কথা এসে পড়ে। অ্যারিস্টটল প্লটকে বড় বলেছেন, আবার পরবর্তীকালে অনেকে চরিত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আসলে প্লট ও চরিত্রের সমগুরুত্ব। চরিত্রকে অবলম্বন করেই প্লটের গঠন। আবার সুগঠিত প্লট অবলম্বনেই চরিত্র স্তরে স্তরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে'। কিন্তু প্লট কখনও আপনি এসে পড়ে না। লেখকের সুস্পষ্ট চিন্তা, পরিকল্পনা ও বিন্যাসকুশলতা থেকেই প্লটের উদ্ভব হয়। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে ক্রিয়া ও ঘটনার সুগঠিত, সুবিন্যস্ত রূপের মধ্যেই চরিত্র সচল, সজীব হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ চরিত্রস্রষ্টা হ'লেও কাহিনী পরিকল্পনা ও স্তরে স্তরে তার বিন্যাসে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রগুলি যতই সুঅঙ্কিত হোক, স্বতন্ত্রভাবে তাদের কোনো মূল্য নেই। চরিত্রগুলি যখন পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ এবং একটি বিবর্তনশীল কাহিনীর নানা বৈচিত্র্য বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত তখনই সেগুলি বিশিষ্টতা ও সজীবতা লাভ করে। ঘটনা ও অন্য চরিত্রের সংঘাতেই চরিত্রের বাহ্য ও আন্তর বৃত্তি ও বাসনাগুলি সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। কখনো লেখকের বর্ণনা এবং কখনো বা চরিত্রের নিজস্ব সংলাপে চরিত্র একটি বিশেষ রূপ ও প্রকৃতি লাভ করে। তবে চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক সর্বজ্ঞাতার ভূমিকাই গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি চরিত্রের বাহ্য ক্রিয়া ও আচরণ বর্ণনা করেন, আবার তার মনের অদৃশ্য স্তরও বিশ্লেষণ করেন। তবে আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাসে চরিত্র নিজেই বর্ণনাকারী লেখকের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেন।

সাহিত্যিক যখন চরিত্র সৃষ্টি করেন তখন তিনটি বিষয়ের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়, এক, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা; দুই, তাঁর দেখা চরিত্রকে ভাবনা ও অনুভূতির রসে আপন ক'রে নেওয়া; তিন, শিল্পের উপাদান প্রয়োগে তাঁর নিজের চরিত্রকে সকলের চরিত্র রূপে সৃষ্টি করা। শরৎচন্দ্র যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেগুলি তাঁর নিজের দেখা সত্য চরিত্র। শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'তাই সাহিত্যসাধনায় বিষয়বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়। তারা সংকীর্ণ, স্বল্পপরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত ক'রে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।' সত্যচরিত্র এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বলেই শরৎসাহিত্যে চরিত্র বৈচিত্র্য কম। শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার পরিধি নিয়ে আলোচনা করা যাক। শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল দেবানন্দপুরে

গ্রামে, শৈশব ও কৈশোরের কিছুকাল কেটেছে এই গ্রামে। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে বিহারের বিভিন্ন অংশে, প্রধানত মামাবাড়ি ভাগলপুরে, দু'বছর ডিহ্‌রীতে, অজ্ঞাতবাসে মজঃফরপুর এবং অন্যান্য জায়গায়। তেরো বছর ছিলেন ব্রহ্মদেশে—প্রধানত রেঙ্গুনে এবং কিছুকাল পেগুতে। মাঝে মাঝে কলকাতায় ও হাওড়ায় নানা অখ্যাত ও নিষিদ্ধ অঞ্চলে থাকতেন। রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরে ছিলেন প্রায় দশ বছর। ১৯২৬ থেকে পানিত্রাস-সামতাবেড়ে নিজের বাড়িতে থাকতে শুরু কবেন। ১৯৩৪ সালে তিনি অশ্বিনী দত্ত রোডে নিজের বাড়ি নির্মাণ করেন। কিন্তু থাকতে চাইতেন সামতাবেড়ের পল্লীপ্রকৃতি ও দরিদ্র নিরক্ষর পল্লীবাসীদের মধ্যে। এই স্থানগুলিতে যে সব মানুষের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল তারাই তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হ'য়ে উঠেছে। 'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'অনুপমার প্রেম', 'শুভদা' —এই উপন্যাসগুলিতে শবৎচন্দ্রের ভাগলপুরে অতিক্রান্ত প্রথম যৌবনের প্রেম, ব্যর্থতা, দারিদ্র্য, উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। এই উপন্যাসগুলিতে তাঁর আত্মজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। ভাগলপুর এবং বিহাবের অন্যান্য অঞ্চলের নরনারী এসেছে 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্বে, 'চরিত্রহীনে' উপেন্দ্র-সুরবালার কাহিনী ধারায়, 'গৃহদাহে' ডিহরীর পরিবেশে। 'শ্রীকান্ত', ২য় পর্বে 'চরিত্রহীনে' আংশিক ভাবে, 'ছবি' ও 'পথের দাবী'তে ব্রহ্মদেশের মানুষ, বস্তিবাসী শ্রমিক, রেঙ্গুনবাসী পলাতক বাঙালী, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী প্রভৃতি এসে ভিড় করেছে। দেবানন্দপুর গ্রামের মানুষ এসেছে 'বিরাজ বৌ', 'দত্তা', 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে। হুগলী-হাওড়ার দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শোষিত মানুষের চিত্র পেয়েছি 'পল্লীসমাজ', 'পণ্ডিতমশাই', 'অরক্ষণীয়া' ও 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে। 'পরিণীতা', 'আঁধারে আলো', 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাসে কলকাতার বিচিত্র মানুষেব পরিচয় পেয়েছি—বিব্রত মধ্যবিত্ত ভাড়াটে বাঙালী, নিষিদ্ধ বারবনিতা, অন্ধকার গলির দারিদ্র্যক্লিষ্ট নারী এবং প্রগতিশীল আধুনিক পরিবার ইত্যাদি।

যে মানুষগুলি শরৎ সাহিত্যে এসেছে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি আলোচনা করা যেতে পারে। গ্রামকেন্দ্রিক, জমিদারতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চিত্রই শরৎ সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। সুরেন্দ্রনাথ, দেবদাস, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, সতীশ, বমেশ, জীবানন্দ, বিপ্রদাস প্রভৃতি অনেকেই জমিদার চরিত্র। অনর্জিত অর্থের প্রাচুর্যহেতু এদের অনেকের মধ্যে একদিকে যেমন উদারতা, বদান্যতা, দয়াশীলতা প্রভৃতি মানবিক গুণ দেখা গেছে; অন্যদিকে তেমনি অমিতাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, খেয়ালী স্বভাব প্রভৃতি দেখা গেছে। প্রেমঘটিত যন্ত্রণা, দ্বন্দ্ব ও ট্র্যাজেডিই এ-সব চরিত্রে দেখানো হয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র যেখানে রয়েছে সেখানে একান্নবর্ত্তী পবিবারের সমস্যা, আর্থিক অভাব। শিক্ষা বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে নানা বাধা-বিপত্তি দেখানো হয়েছে। নীলাম্বর, শ্রীকান্ত, বৃন্দাবন, প্রিয়নাথ, গিরিশ, যাদব, হারাণ, কিরণময়ী, অপূর্ব-ভারতী, হেমাঙ্গিনী, নারায়নী, জ্ঞানদা ইত্যাদি মধ্যবিত্ত চরিত্র উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত ও কৃষক-শ্রমিক সমাজের মানুষও শরৎ সাহিত্যে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর লোকের ঘৃণা,

সামাজিক শোষণ ও নির্যাতন, বঞ্চিত জীবনের ক্লেদ ও কলুষ এই চরিত্রগুলিকে বাস্তব ও জীবন্ত ক'রে তুলেছে। 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্বে ও 'চরিত্রহীন' ও 'পথের দাবী'তে মিস্ত্রী, কারিগর, শ্রমিক ইত্যাদির ক্লেদাক্ত শোষণারিক্ত জীবন এবং 'দেনাপাওনা', 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গে' ভূমিহীন সর্বহারা অত্যাচারিত কৃষক সমাজের চিত্র আঁকা হয়েছে। সাগর সর্দার, গফুর, আমিনা, অভাগী কাঙ্গালীচরণ, নন্দ, টগরবোষ্টমী এরা বঞ্চিত ও শোষিত শ্রমিক-কৃষক সমাজের সত্য ও বাস্তব প্রতিনিধি। সমাজের নিয়ন্তা শাসক ও শোষক শ্রেণীরূপে শরৎচন্দ্র কয়েকটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। উচ্চবর্ণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বর্ণবিদ্বেষ নিম্নবর্ণের মানুষকে অবর্ননীয় দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলেছে। এই বর্ণ বিদ্বেষের মূর্ত প্রতীক হচ্ছে গোলোক চাটুয্যে, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী ঘোষাল ইত্যাদি চরিত্র। অত্যাচারী জমিদারের প্রতিনিধি হলেন জীবানন্দ। বেণী ঘোষাল ইত্যাদি। শোষক জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি হলেন জনার্দন।

শরৎচন্দ্রের দেখা চরিত্রগুলি তাঁরই হৃদয়ের রসে লালিত হ'য়ে তাঁরই নিজস্ব চরিত্র হ'য়ে উঠেছে। এই চরিত্রগুলি কোথাও লেখকের দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে মিশে পাঠকের প্রিয় হয়ে উঠেছে এবং কোথাও বা লেখকের ঘৃণা ও প্রতিবাদের পাত্র হয়ে পাঠকের ব্যঙ্গ ও ধিক্কারের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। সুরেন্দ্রনাথ, দেবদাস, শ্রীকান্ত প্রভৃতি চরিত্রে শরৎচন্দ্রের আত্মরূপায়ণ ঘটেছে। আর তথাকথিত নিন্দিত ও নিসিদ্ধ চরিত্রগুলির উপরে শরৎচন্দ্র তাঁর সমস্ত দরদ ও সমবেদনা উজাড় ক'রে দিয়েছেন। তারা হ'ল অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী বিজলী, কিরণময়ী রোহিণী, কমললতা, সতীশ, জীবানন্দ ইত্যাদি। এই সব চরিত্র শরৎচন্দ্রের অন্তরের গভীর স্তরে নিবিড়ভাবে অনুভূত হ'য়ে তাঁর মানসচরিত্র হয়ে উঠেছে। গোলোক চাটুয্যে, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, রাসবিহারী প্রভৃতি চরিত্রের প্রতি শরৎচন্দ্র ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়েছেন কিন্তু এমন ভাবে তাদের সৃষ্টি করেছেন যা৷ ফলে চরিত্রগুলি সর্বজনীন ঘৃণা ও ধিক্কারের পাত্র হয়ে উঠেছে। সৃষ্টি কৌশলের কি বৈশিষ্ট্যের ফলে তাঁর নিজস্ব ভালোলাগা ও মন্দলাগা চরিত্রগুলি সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের স্বল্প বর্ণনায় বিদ্যুৎবিভাসের মত এক একটি চরিত্রের গোটা ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেন। কোনো বিস্তারিত বর্ণনা নেই, কোনো উচ্ছ্বাসিত প্রশস্তি নেই, কোনো অতিশায়িত প্রশংসা নেই। 'পথের দাবী'তে সুমিত্রার সংক্ষিপ্ত রূপবর্ণনা—'বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজরানী। বর্ণ কাঁচা সোনার মত। দাক্ষিণাত্যের ধরণে এলো করিয়া মাথায় চুল বাঁধা, হাতে গাছা কয়েক করিয়া সোনার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোনার হারের কিয়দংশ চিকচিক করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরি দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে—এই তো চাই!—ললাট, চিবুক, নাক, চোখ, ভ্রূ, ওষ্ঠাধর কোথাও যেন খুঁত নাই। এ কি ভয়ানক আশ্চর্য রূপ!' এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় অসামান্যা সৌন্দর্যময়ী নারীর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব পাঠকের চিত্তে চিরমুদ্রিত হ'য়ে যায়।

অন্নদাদিদির বর্ণনা লেখক করলেন। 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগ যুগান্তর ব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এই মাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।' এখানে দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রতার মলিন আবরণের তলে অন্নদাদিদির পবিত্র শিখাময়ী রূপের আভাস দেওয়া হয়েছে সব্যসাচী সম্পর্কে অপূর্বর ভাবনার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র যে চিত্র আঁকলেন তাই পাঠকের মনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল—'তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়,– কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃংখল রচিত হইয়াছিল—কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল- সেই ত তোমার গৌরব।' সব্যসাচীর অসামান্যতা সম্পর্কে পাঠকের মনে কৌতূহল ও বিস্ময় এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে তীব্র বেগে জেগে ওঠে। জীবানন্দকে দেখে ষোড়শীর আতঙ্কিত ভাবনার মধ্য দিয়ে জীবানন্দের নির্মম, নির্বিকার জান্তব রূপটি প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা জাগিয়ে তোলে -"ইহার ধর্ম নাই, পুণ্য নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই—এ নির্মম, এ পাষাণ। ইহার মনুষ্যত্বের প্রয়োজনের কাছেও কাহারও কোন মূল্য, কোন মর্যাদা নাই।"

চরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র নিজস্ব বর্ণনা কিংবা অপর কোনো চরিত্রের ভাবনা ছাড়াও বর্ণনীয় চরিত্রের সংলাপের উপরেও অনেকখানি নির্ভর করেছেন। কথার মধ্য দিয়ে চরিত্রের নিজস্ব আবেগ-প্রবৃত্তি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বাসনা-কামনা অত্যন্ত বাস্তব ও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। এই নাট্য-রীতির প্রভাব পাঠকের কাছে তীব্রতর, কারণ পাঠক এখানে লেখকের মারফত চরিত্রের পরিচয় পান না, সোজাসুজি ও মুখোমুখি চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের নিবিড়তা অনেক বেশি। সুরেশ অচলার দুই হাত বুকের উপর টেনে নিয়ে উন্মাদ আবেগে বলছে, "অচলা, একটিবার ভূমিকম্পের এই প্রচণ্ড হৃদৎস্পন্দন নিজের দুটি হাতে অনুভব ক'রে দেখ— কি ভীষণ তাণ্ডব এই বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। একি পৃথিবীর কোন ভূমিকম্পের চেয়ে ছোট! বলতে পার অচলা, পৃথিবীতে কোন্ জাত, কোন্ ধর্ম কোন্ মতামত আছে যা এই বিপ্লবের মধ্যে পড়ে ও ডুবে রসাতলে তলিয়ে যাবে না!" এই বেগবান কথাগুলির মধ্য দিয়ে সুরেশ চরিত্রের প্রবল আগ্রাসী প্রবৃত্তিময়তা প্রকাশ পাচ্ছে। রমেশ রমাকে এক জায়গায় বলছে, "সেদিন আমার কেন জানিনে অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশী কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলুম সেই যে ছেলে বেলায় একদিন আমাকে ভালোবাসতে আজও তা একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবেছিলাম কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে তোমার ছায়ায় ব'সে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে ক'রে যাব।" কথাগুলির মধ্য দিয়ে অনেক বেদনা-দায়ক আঘাত সত্ত্বেও রমার প্রতি রমেশের সর্বরিক্ত প্রেমের আকুল আকুতি ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি এত আকর্ষণীয় এ কারণে যে তারা একটি নির্দিষ্ট ও প্রত্যাশিত ধারায় বিবর্তিত হয় না। তারা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবর্তিত

ও রূপান্তবিত হয। একই পবিস্থিতিব মধ্যে আচমকা বিপবীত রূপেব প্রতিফলন অথবা অন্য চবিত্রেব সঙ্গে আচবণে কখনো অনুবাগ থেকে বিবাগে কিংবা বিবাগ থেকে অনুবাগে হঠাৎ পবিবর্তনে পাঠকেব অভ্যস্ত ধাবণা ও স্বাভাবিক প্রত্যাশা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হযে যায। এব ফলে চবিত্র সম্পর্কে উত্তেজিত আগ্রহ ও কৌতূহল কখনো নিবৃত্ত হয না। অনুবাগ থেকে বিবাগেব একটি পবিস্থিতি। সতীশ সাবিত্রীব গৃহে পবম আদবযত্ন লাভ কবে যখন অত্যন্ত অন্তবঙ্গ হযেছে তখনই এ অন্তবঙ্গতা হঠাৎ বিপবীতমুখী হযে পডল। সাবিত্রী তিক্ত তিবস্কাবে সতীশকে বিদ্ধ কবল—'অসচ্চবিত্র। আমাব মতো একটা স্ত্রীলোককে ভালোবেসে ভালোবাসাব বডাই কবতে তোমাব লজ্জা কবে না।' সতীশেব উত্তব আবো নিষ্ঠুব। 'আমি অসচ্চবিত্র। কিন্তু সে যাই হোক সাবিত্রী, তোমাব নামটা কিন্তু তোমাব বাপ-মা সার্থক দিযেছিলেন।' বিপবীত একটি দৃশ্য তুলে ধবা হচ্ছে। দেবদাস যখন পার্বতীকে বিবাহ কবতে প্রস্তুত হযে পার্বতীব কাছে এসে বলল, 'আমি এসেছি' পার্বতী তখন তাকে শ্লেষ ও বাক্যবাণে বিদ্ধ কবে প্রত্যাখ্যান কবল। ক্রুদ্ধ দেবদাস ছিপেব বাট দিযে সজোবে আঘাত কবল। পার্বতীব মুখ বক্তে ভেসে গেল। কিন্তু তখনই হল আকস্মিক অনুবাগেব বিস্ময়কব প্রকাশ। পার্বতী আকুল হইযা কাঁদিযা উঠিযা বলল,

দেবদা গো—

দেবদাস ফিবিযা আসিল। চোখেব কোণে এক ফোঁটা জল।

বড স্নেহজডিত কণ্ঠে কহিল কেন বে পারু?

কাউকে যেন বোলো না।

নবপিশাচ জীবানন্দেব প্রতি তীব্র ঘৃণা জ্বালযে অগ্নিশিখামযী ষোডশী তাব গৃহে এসেছে। কিন্তু তাব প্রদীপ্ত ঘৃণা ক্রমে ক্রমে অনুকম্পা, এমন কি আকর্ষণে পবিণত হযেছে। জীবানন্দ ও ষোডশীব প্রত্যাশিত সংঘাত এক বেদনাময়, অনির্বচনীয় ঘনিষ্ঠতায পবিণত হযেছে। এমনি ভাবে শবৎচন্দ্র নাটকীয ভাবে বাজিকবেব মত চবিত্রগুলিকে খেলিযেছেন, মানুষেব দুর্জ্ঞেয বহস্যময়তা ও অভাবিত পবিবর্তনেব দিকে আমাদেব বিহ্বল, হতচকিত দৃষ্টিকে আকর্ষণ কবেছেন।

শবৎচন্দ্র মানুষেব এই নিযত গতিশীল ও সদা পবিবর্তমান চবিত্র দেখাবাব জন্যে মানুষেব মনেব গভীবে প্রবেশ কবে তাব দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্বিতাময, বিপবীতমুখী প্রবৃত্তিগুলি আবিষ্কাব কবেছেন। মানুষেব মধ্যে নিবন্তব চলেছে প্রেম ও ঘৃণাব লীলা চলেছে। দেবদাস-পার্বতী বমা বমেশ, শ্রীকান্ত-বাজলক্ষ্মী, সতীশ সাবিত্রী জীবানন্দ ষোডশী, সুবেশ-অচলা সকলেব মধ্যেই প্রেম বাধাকণ্টকিত, বিবাগে ও বৈবাগ্যে বিচ্ছিন্ন, সংস্কাব ও নিষেধে ক্ষতবিক্ষত। অতৃপ্ত প্রেমেব অনন্ত হাহাকাব চাওযা ও পাওযাব মধ্যে দুস্তব ব্যবধান। বাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে চেযেছে, আবাব দূবেও ঠেলে দিযেছে। বমা বমেশকে জীবনেব সব কিছু দিযে ভালোবাসে, আবাব তাব বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দেয। ষোডশী ভৈববী জমিদাব জীবানন্দেব

শত্রু আবার অলকার তৃষিত চিত্ত তাকেই সঙ্গোপনে সব থেকে কামনা করে। কিরণময়ী জীবনে সব চেয়ে ভালোবাসে উপেনকে, আবার সব চেয়ে শত্রুতাও সে তার সঙ্গে করেছে। সাবিত্রী সতীশকে ভালোবেসে তাকেই সব চেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছে। এই যে চরিত্রের বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি চরিত্রকে জটিল ও দুর্জ্ঞেয় ক'রে তুলেছে এখানেই শরৎচন্দ্রের চরিত্রের আকর্ষণীয়তা। শরৎচন্দ্র জীবনের অনধিগম্য রহস্য ও অপরিজ্ঞেয় সম্ভাবনার দিকে অনবরত আমাদের নিয়ে চলেছেন। আমাদের অভিজ্ঞতা, অভ্যস্ত ধারণা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অহঙ্কারকে প্রতি মুহূর্তে বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করে দিয়ে তিনি অবিরাম ইঙ্গিত ক'রে চলেছেন—আরো আছে—There are more things in heaven and earth—চেনার বাইরে, জানার বাইরে সেই অভাবনীয় জীবন সম্ভাবনা।

হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের আলোড়নের মধ্য দিয়েই শরৎ সাহিত্যের চরিত্র গুলির সজীব বিকাশ। কিন্তু এমন কতকগুলি চরিত্র আছে, যেগুলির অভ্যন্তরে একটি নিয়ন্ত্রী শক্তি থাকে, সেই শক্তি একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বভাবনার পথে চরিত্রগুলিকে চালিত করে। বৃন্দাবনের ব্যক্তিসত্তা তার শিক্ষকতার আদর্শের দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত। রমেশের সমাজ সংস্কারের আদর্শ বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট পথে তাকে নিয়ে চলেছে। বিশ্ববিপ্লবী সব্যসাচী তার ব্যক্তিজীবনের ঊর্ধ্বে তার অগ্নিময় বিপ্লবের আদর্শই স্থাপন করেছে। কমলের ব্যক্তিসত্তা তার তাত্ত্বিক মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অনেক সময় প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ রূপ, বর্ণ ও মেজাজ চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতি বর্ণনা এ সব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নয়, উপায় অর্থাৎ লেখক প্রকৃতির মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের এক একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। 'দেনা পাওনা'র এক জায়গায় প্রকৃতির বর্ণনা—'একদিকে শীর্ণ নদীর বালুময় শুষ্ক সৈকত আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তে অদৃশ্য হইয়াছে। আর এক দিকে বৈশাখের শস্য-শস্যহীন বিস্তৃত ক্ষেত্র চণ্ডীগড়ের পাদমূলে গিয়া মিশিয়াছে।' জীবানন্দের নিঃসঙ্গ ও নিষ্ফল জীবনের শূন্যতা ও রিক্ততা এখানে সার্থকভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। তারকেশ্বরে রমার বাড়িতে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহারের পর রমেশের চোখে প্রকৃতির একটি চিত্র ফুটে উঠল 'তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে নব বর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্ন আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল ; অর্ধনিমীলিত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল।' এখানে 'নববর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘের মধ্য দিয়ে রমেশের চিত্তের সরস প্রসন্নতা আভাসিত হয়েছে। 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্বের শেষ দিকের একটি চিত্র। রাজলক্ষ্মী সব ছেড়ে শ্রীকান্তের কাছে নিজের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করতে এসেছে, তখন শ্রীকান্তের চোখে হঠাৎ প্রকৃতির যে রূপটি ধরা পড়ল তাতে রাজলক্ষ্মীর প্রশান্ত আত্মনিবেদনের মাধুর্য ও শ্রীকান্তের পরম নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তি ফুটে উঠেছে—'সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্যকররঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল—এমনি

অপরূপ শোভায় সৌন্দর্যে যেন বিশ্বভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রি-সংসারের মধ্যে রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ হিংসা-দ্বেষ কোথাও যেন আর কিছু নেই।'

শরৎচন্দ্র চরিত্র চিত্রণে বড় বড় ঘটনা ও চমকপ্রদ ক্রিয়ার সাহায্য বিশেষ নেননি। তাঁর চরিত্রে ক্রিয়ামরতা অপেক্ষা ভাবময়তাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ পায় ছোট ছোট ক্রিয়া ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে। মানুষের জটিল মনস্তত্ব সঙ্গতিহীন, পারম্পর্যহীন আকস্মিক ক্রিয়া ও আচরণে প্রকাশ পায় এবং তার আনন্দ, বেদনা, যন্ত্রণা প্রকাশ পায় নানারূপে শারীরিক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে। সেই শারীরিক অভিব্যক্তি খুব সূক্ষ্ম, প্রায় অলক্ষিত এবং গুরুত্ববর্জিত, কিন্তু সেগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্র সকল মাধুর্য ও রম্য রস সঞ্চার করেছেন। বহু ব্যবহৃত কতকগুলি আবেগ-অনুভূতি প্রকাশক বাক্যাংশ উল্লেখ করা যাচ্ছে। যথা, 'মুক্তার আকারে টপ টপ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল', 'অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল,' 'বুকের ভিতরটা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,' 'ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,' 'পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া খাঁড়া হইয়া উঠিল,' 'মুখ কালি হইয়া গেল,' 'চোখ দুটি জলে টল টল করিয়া উঠিল।'

শরৎ সাহিত্যে পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারী চরিত্র বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তবে অনেকে আবার বলে থাকেন, শরৎ সাহিত্যে কোনো পুরুষ চরিত্র নেই। এ কথাও সত্য নয়। রমেশ, সুরেশ, সতীশ, জীবানন্দ, সব্যসাচী, বিপ্রদাস ইত্যাদি চরিত্র দ্বন্দ্বে সংঘাতে, প্রতিরোধে, সংগ্রামে, মানসিক দৃঢ়তায় কাঠিন্যে বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্র। নামকরণের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র নারী অপেক্ষা পুরুষের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন, যথা, দেবদাস, কাশীনাথ, শ্রীকান্ত, চন্দ্রনাথ, বিপ্রদাস ইত্যাদি। সুতরাং শরৎ সাহিত্যে পুরুষ চরিত্র বর্ণহীন, ব্যক্তিত্বহীন, গুরুত্বহীন—এ কথা কখনই বলা চলে না।

তবে এ কথা সত্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী চরিত্র পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী সজীব, আকর্ষণীয় ও আবেদনশীল। এর কারণ কি? এর কারণ হল শরৎচন্দ্র বহির্জগতের চমকপ্রদ ঘটনা ও ক্রিয়া বৈচিত্র্য অপেক্ষা অন্তর্জগতের হৃদয়লীলার দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ রেখেছেন। ক্রিয়া ও ঘটনায় পুরুষ প্রাধান্য এবং ভাব ও অনুভূতির ক্ষেত্রে নারীরই প্রাধান্য। হৃদয় বৃত্তিগুলির গোপন দুর্গে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের জ্বালা এবং বেদনা ও অশ্রুপাতের ধারা বর্ষিত হয় সেগুলির মধ্যেই নারীর পূর্ণ পরিচয় পরিস্ফুট। শরৎচন্দ্র বিঘ্নকণ্টকিত ও বাধা বিচ্ছিন্ন ভালোবাসার চিত্রই প্রধানত অঙ্কন করেছেন, সেই ভালোবাসার সমস্যা, দ্বন্দ্ব, দুর্ভাগ্য নারীজীবনকে যতখানি আলোড়িত ও পীড়িত করে পুরুষ জীবনকে ততখানি করে না। পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুর বিধি-বিধানের ফল ভোগ করতে হয় প্রধানত নারীকে। শরৎচন্দ্র সেই বিধি-বিধানের নিষ্ঠুরতা এঁকেছেন এবং তার বিরুদ্ধে কখনো অশ্রুসিক্ত কখনো বা বহ্নিদীপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে প্রধানত নারী চরিত্রই অবলম্বন করতে হয়েছে।

শরৎচন্দ্র কতকগুলি চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে পড়েছেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। তারা তাদের স্রষ্টার মতই কোমল আবেগপ্রবণ, স্নেহযত্ন প্রত্যাশী, অথচ নিরাসক্ত। বাঁধা পথের বাইরে তাদের এলোমেলো পদযাত্রা। প্রবল প্রবৃত্তির দাহ নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শে তাদের চিত্ত স্পন্দমান, প্রবল দাবী কিংবা প্রচণ্ড ক্ষোভ নেই। অথচ মৌন অভিমান ও অনুচ্চারিত বেদনায় তাদের অন্তর কাতর। এরা হল সুরেন্দ্রনাথ, দেবদাস, শ্রীকান্ত ইত্যাদি। এরা দৃঢ়ভাবে দাবী জানাতে পারল না। কঠোর ভাবে প্রতিবাদও জানাতে পারল না। সেজন্য এদের বিকল্প, নিষ্ক্রিয় ও বিবর্ণ মনে হয়। ঘটনা ও ক্রিয়ার মধ্যে এদের পৌরুষ পরীক্ষিত হল না। অস্ফুট আবেগ ও অবরুদ্ধ অভিমানের মধ্যেই এরা মগ্ন হয়ে রইল। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কোনোদিনই এলো না। সে পর-নির্ভরশীল এক অসহায় শিশুই চিরকাল রয়ে গেল। দেবদাস ইচ্ছাশক্তিহীন, অব্যবস্থিতচিত্ত, ভেঙ্গে পড়া ও তিল তিল ক্ষয়ে যাওয়া একটি চরিত্র মাত্র। সে কি চায় তা জানে না। সে নীরবে আত্মধ্বংস করতে পারে, কিন্তু তার কামনাতপ্ত পৌরুষ কখনো জেগে ওঠে না। তার জন্য তার অহরহ আত্মহনন তাকে কাছে পেয়েও সে নিস্তেজ দ্বিধাগ্রস্ত এবং নিবৃত্তির শীতলতায় স্তব্ধ। শ্রীকান্তের মধ্যে শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রতিফলন সবচেয়ে বেশি। শ্রীকান্ত সারাজীবন রাজলক্ষ্মীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। তবে তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম আত্মসচেতনতা ও আত্ম দর্শন রয়েছে। শ্রীকান্ত জীবনদ্রষ্টা ও জীবন ভাষ্যকার, সেজন্য সে নিজেকে সর্বসময়ে চলমান ঘটনা থেকে একটু দূরে রেখেছে, আনন্দ-বেদনার বেগবতী তরঙ্গিণীতে সে ঝাঁপ দেয় নি, তীরে ব'সে তার তরঙ্গোচ্ছ্বাস লক্ষ করেছে। সেজন্য তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কোনো বর্ণোজ্জ্বল, আবেগদীপ্ত রূপ আমরা দেখিনি।

শরৎ সাহিত্যে অপরাজিত পৌরুষে বলিষ্ঠ চরিত্র হ'ল সুরেশ, জীবানন্দ, রমেশ, সব্যসাচী ইত্যাদি। প্রবৃত্তিময় পুরুষ বলতে সুরেশ ও জীবানন্দকেই বুঝব। ক্ষুধিত দেহকামনার অস্থির উন্মত্ততা ও অতৃপ্ত জৈবপ্রবৃত্তির নিদারুণ অগ্নিদাহ এই চরিত্র দুটির মধ্যে দেখানো হয়েছে। সেজন্য ট্র্যাজেডির তীব্রতাও এদের মধ্যে দেখা গেছে। জীবানন্দের প্রবৃত্তিময়তা ষোড়শীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার দৃশ্যের পরে প্রশমিত হ'য়ে গেছে এবং ক্রমে ক্রমে সে শান্তচিত্ত, ক্ষমাশীল, পত্নীপ্রেমিক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সুরেশের অসংযত কামনা ক্রমবর্ধমান অগ্নিশিখার মত অচলাকে গ্রাস করেছে এবং নিজেও সেই অগ্নিশিখায় জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অসংযত পৌরুষের সর্বগ্রাসী দাবী এবং চরম নিষ্ফলতার অন্তহীন হাহাকার সুরেশ চরিত্রকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত করেছে।

রমেশ ও সব্যসাচী শরৎচন্দ্রের দুই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নায়ক। রমেশ সমাজবিপ্লবী ও সব্যসাচী রাষ্ট্রবিপ্লবী। রমেশ ইনজিনিয়ারিং পাশ ক'রে বিরাট আদর্শ নিয়ে গ্রামে এসেছে গ্রাম সংস্কার করতে। নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্র লোভ, অকারণ ঈর্ষা এবং অন্ধ কুসংস্কার তাকে আঘাত করেছে, সব চেয়ে বড় আঘাত এসেছে তার সব চেয়ে প্রিয়-

জনের কাছ থেকে। কিন্তু সব আঘাতের উপরে সে জয়ী হয়েছে। রমার প্রতি ভালোবাসা তার চরিত্রের একটি দিক মাত্র। সেই ভালোবাসার কাছে সে শক্তি চেয়েছিল, কিন্তু পেয়েছে শুধু আঘাত। তাই অনেকটা শূন্যচিত্তেই সে তার কর্মব্রতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। তার পাওনার ভাণ্ডার শূন্য কিন্তু তার অনিঃশেষ দানের উৎস থেকে সে সকলকে অজস্র উপকারের ধারা বিতরণ করেছে। রমেশ শরৎ সাহিত্যের মহত্তম কর্মনায়ক। তবে শরৎ সাহিত্যের বলিষ্ঠতম পুরুষ চরিত্র হল সব্যসাচী। তার বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্ব আমাদের মনে মুহুর্মুহু চমক জাগিয়েছে এবং তার অগ্নিগর্ভ ক্রিয়াকলাপ সম্ভ্রম বিস্ময়ে আমাদের চিত্তকে ভয়স্তব্ধ করে রেখেছে। এক বৃহৎ মহাদেশকে বিপ্লবের মন্ত্রে মাতিয়ে তোলা, মহাদেশের এক ব্যাপক অঞ্চলে মুক্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়া, দুই হাতে জীবন ও মৃত্যুকে অবলীলাক্রমে আঁকড়ে ধরা, সব্যসাচীর মত বাংলা সাহিত্যে অপর কোনো চরিত্রে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ।

শরৎ সাহিত্যে এমন কয়েকটি গৌণ চরিত্র আছে যেগুলির মধ্যেও বিপ্লবের আগুন প্রচ্ছন্ন আছে। সে আগুনে পাঠকের চোখ ঝলসে ওঠে। শ্রীকান্তের বজ্রানন্দ, পথের দাবীর ব্রজদাস এদের মধ্যে একজন। 'শেষ প্রশ্নের রাজেন উদ্ভূত এক শ্রেণীর অগ্রদূত। ব্রজানন্দের সমাজসেবা, ব্রজদাস তলোয়ারকরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবচিন্তা এবং রাজেনের গুপ্ত সংসারে অসমসাহসিক অগ্নিময় চরিত্রেরই সন্ধান পাই। ইন্দ্রনাথ চরিত্রও তেমনি। কাজে, উদ্ধত ভাবনায় এবং প্রতিবাদের পথে শ্রীকান্তকে আহ্বান করেছে।

উদার, আত্মভোলা, মহাপ্রাণ লোকের কয়েকটি চরিত্র শরৎচন্দ্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। এদের ব্রিয়া ও আচরণ হয়তো একটু কৌতুক সাত্মক। কিন্তু এরা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় চরিত্র। 'নিষ্কৃতি'র গিরীশ, 'বিন্দুর ছেলে'র যাদব, 'বামুনের মেয়ে'র প্রিয়নাথ ডাক্তার, 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র গোকুল প্রভৃতি এ-ধরণের চরিত্র। এদের বৈষয়িক বুদ্ধি কম। নিজেদের স্বার্থরক্ষায় এরা অপটু, কিন্তু উদার স্নেহ ও মানবিকতার দুর্লভ গুণে এরা ভূষিত। আপাতদৃষ্টিতে এরা কাণ্ডজ্ঞানহীন, বোকা, অপটু ও অনুকম্পার পাত্র, কিন্তু যথার্থ মূল্য বিচারে এরা অনেক বড়, অনেক উঁচু, অনেক মহান। শরৎচন্দ্র নিজে বৈষ্ণব ভাবধারায় অভিষিক্ত ছিলেন বলে বৈষ্ণবীয় ভাবরসে সঞ্জীবিত কয়েকটি চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এরা সদাসহিষ্ণু, নিয়ত ক্ষমাশীল এবং চিরহিতব্রত। নরোত্তমের, সৌদামিনীর স্বামী, 'শেষের পরিচয়ে'র ব্রজবাবু প্রভৃতি চরিত্র প্রেমে মধুর, সকল অপরাধে ক্ষমাশীল, সকল আঘাতে সহনশীল। এদের নিয়ে প্রথমে আমরা হাসি কিন্তু অচিরেই আমাদের হাসি সমবেদনায় করুণ হয়ে যায়।

ভালো চরিত্রের মত মন্দ চরিত্র চিত্রণেও শরৎচন্দ্রের অসাধারণ পটুতা উল্লেখযোগ্য। তার কোনো কোনো উপন্যাসে কুটিল ও ক্রূর চরিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। যেমন 'দত্তা'র রাসবিহারী ও 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে। শঠতা

ও অমানবিকতার দিক দিয়ে এদের তুলনা নেই। তবে এরা যত অসুন্দরই হোক আর্টের সৃষ্টি হিসাবে এরা হয়ে উঠেছে সুন্দর। তবে রাসবিহারী নারীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত পরাজিত, কিন্তু গোলক চাটুয্যে—বহু নারীর ক্ষতি ক'রেও অপরাজিত স্পর্ধায় সমাজের উপর রাজত্ব করেছে। শরৎচন্দ্র নীচতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, বিকৃতি ও ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যথা, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী ঘোষাল, জনার্দন রায়, নিমাই রায় ইত্যাদি। টাইপ চরিত্রের মধ্যে যে তীক্ষ্ণতা ও হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত আকস্মিক ঔজ্জ্বল্য প্রত্যাশিত এ-চরিত্রগুলির মধ্যে তা সুপরিস্ফুট।

ভূমি-নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় যুগ যুগ বাহিত আচার ও সংস্কার-সর্বস্ব সংকীর্ণ ধর্মধারা, যুক্তিহীন অনড় বিধিনিষেধ ও প্রথা-অনুশাসন এবং অলঙ্ঘ্য বর্ণবৈষম্যের অচ্ছেদ্য নাগপাশ যে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিল তার চিত্রই শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র আত্মবিকাশের সুযোগ ছিল না, সেজন্য বাধ্য হ'য়ে তাকে পুরুষশাসিত যৌথ পারিবারিক জীবনের মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দিতে হ'ত। সে কি পরিমাণে পতিব্রতা, সহিষ্ণু ও সেবাপরায়ণা তার উপরেই তার মূল্য নির্ভর করত। নিদারুণ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আঘাতে নারীর প্রত্যাশিত স্বাভাবিক জীবন-ধারা যে কিভাবে বিপর্যস্ত হ'তে পারে তার দৃষ্টান্ত মেলে বিরাজ, অভয়া, কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে। শরৎচন্দ্র যে যে বাঙালী বিধবার চরিত্র অপরিসীম সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন তাদের দুঃখ দুর্গতির মূলে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বাধীন জীবনযাপনের অক্ষমতা। স্বাধীনভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো উপায় না থাকাতে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীকে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের পরিবারভুক্ত হ'য়ে থাকতে হত। সেখানে তারা স্নেহের দাবী নিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পদে পদে বিড়ম্বিত হ'ত এবং সংসারের মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত অনর্থ ও জটিলতা সৃষ্টি করত। তাদের বঞ্চিত ও অসম্মানিত ব্যক্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রে ঈর্ষা বিদ্বেষ ও তিক্ত কলহে প্রকাশ পেত। 'রামের সুমতি'র দিগম্বরী, 'বিন্দুর ছেলে'র এলোকেশী, 'পল্লী সমাজে'র মাসী, 'অরক্ষণীয়া'র স্বর্ণমঞ্জরী প্রভৃতি চরিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসবে।

সমাজের বিধিনিষেধ ও শাস্তিবিধান নারী সম্পর্কেই বেশি সক্রিয় ছিল। একটু আধটু দুর্বলতা ও শিথিলতা নারী চরিত্রে প্রকাশ পেলেই তাকে অনপনেয় কলঙ্কে চিহ্নিত করা হত। অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, কমললতা প্রভৃতি চরিত্রের কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বাধ্য হ'য়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করবার পিছনে নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং সমাজের ক্ষমাহীন বিধানের দায়িত্ব ছিল অনেকখানি।

নারী সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ ছিল তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র সমাজের রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থাগুলি অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করতে পারেন নি। তিনি যেমন একদিকে সেগুলির যুক্তিযুক্ততা ও স্থায়িত্ব

সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, অন্যদিকে সমাজের অন্যায়-অবিচারে পীড়িত মানুষের প্রতি সীমাহীন দরদ ও সহানুভূতি বোধ করেছেন। অর্থাৎ, সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া কিছুটা মননশীল ভাবনা এবং কিছুটা বেদনাসিক্ত সহানুভূতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নারী সম্পর্কে সমাজের চিরবদ্ধমূল ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন। সমাজের যে নীতিবোধ ও ধর্মবোধের দৃষ্টিতে নারীর দুর্ভাগ্য কলঙ্ক রূপে প্রতিভাত হয়, সেই নীতিবোধ ও ধর্মবোধ সম্বন্ধেই প্রশ্ন ও প্রতিবাদ তুলেছেন। নারী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক বক্তব্য হল এই যে, তিনি সতীত্ব অপেক্ষা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে শ্রেষ্ঠতর বলেছেন। তিনি বলেছেন, একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ-সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?

নিষিদ্ধ নারীচরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ বেশি ছিল বটে কিন্তু তাঁর কোনো গোঁড়ামি ও একপেশে মনোভাব ছিল না। সংসারের সীমানার মধ্যে যে নারী সুখে দুঃখে কাজে কর্মে এবং সহজ দেনা পাওনার মধ্য দিয়ে নিত্য নৈমিত্তিক জীবন যাপন করে তাকেও তিনি সমান সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

শরৎ সাহিত্যে যে বিচিত্র নারী চরিত্রগুলিকে দেখা যায় তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে সেই সব নারীদের নিয়ে যারা সমাজের চিরচারিত আদর্শ ধ্রুব বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরে আছে। বিরাজ, অন্নদা-দিদি, সুরবালা, মৃণাল প্রভৃতি চরিত্রকে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। এরা পাতিব্রত্যকেই পরম ধর্মরূপে গ্রহণ করেছে, স্বামী এদের কাছে জীবনের অংশীদার নয় আরাধ্য দেবতা, এদের সুখ-দুঃখ, বাসনা-কামনা সব কিছুই স্বামীর সেবায় ও পরিবারের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। [illegible] হওয়ার লক্ষ্যেই এদের জীবন নিবেদিত।

শরৎ সাহিত্যের দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর নারী চরিত্র দেখা যায় যারা একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনে স্নেহ ও বাৎসল্যের মধ্য দিয়ে রস ও মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। 'রামের সুমতি'র নারায়ণী, 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দু ও অন্নপূর্ণা, 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি চরিত্রের কথা মনে আসবে। তাদের স্নেহ ভালোবাসা দূরে ও অনাত্মীয় পাত্রের প্রতি অপ্রত্যাশিতভাবে উৎসারিত, সেজন্যই তার মাধুর্য ও উপভোগ্যতা এত বেশি।

শরৎ সাহিত্যে তৃতীয় আর এক শ্রেণীর নারী চরিত্র দেখা যায় যারা আধুনিকা, ব্যক্তিত্বময়ী ও স্বাতন্ত্র্যবাদিনী। এদের বাক্য ও আচরণে একটা অনাড়ষ্ট ও অকুণ্ঠিত ভঙ্গি দৃশ্যমান, এদের হৃদয়বৃত্তির স্পষ্ট ও সাহিত্যিক প্রকাশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ললিতা, বিজয়া, সরোজিনী, বন্দনা, ভারতী প্রভৃতি চরিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসবে। এদের প্রণয় নানা বাধা বিঘ্ন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে কষিত কাঞ্চনের মত দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে।

প্রেমের স্নিগ্ধ সৌরভ ও বিচিত্র বর্ণময়তা যে নারীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তাদের কথা উপরে উল্লেখ করা হল। কিন্তু নিষিদ্ধ প্রেমের বেদনা ও অভিশাপ যাদের মধ্যে দেখা গেছে তারাই শরৎচন্দ্রের বিশিষ্টতম চরিত্র। এই নিষিদ্ধ ভালোবাসা

কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা, বিধবার ভালোবাসা, বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি ভালোবাসা এবং পতিতার ভালোবাসা। শরৎচন্দ্রের বিধবা নায়িকারা সচেতন সংস্কার ও অবচেতন হৃদয়ের দুর্বশ প্রেমের দ্বন্দ্বে পীড়িত। মাধবী, রমা, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী সকলেই এই দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এই দ্বন্দ্বের জ্বালা, অবসাদ, শূন্যতা ও অশ্রুর মন্দাকিনী-ধারা শরৎ সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষে আসক্তির চিত্র অচলা, অভয়া, কিরণময়ী ও কমল চরিত্রে পরিস্ফুট। এদের মধ্যে অচলা চরিত্রে বিপরীত মুখী প্রেমের দ্বন্দ্ব, সচেতন ইচ্ছাশক্তি ও অস্বীকৃত কামনার সংঘাতের ফলে চরিত্রটি ট্র্যাজিক হয়ে পড়েছে। অন্য চরিত্রগুলি যুক্তি ও তাত্ত্বিকতায় আশ্রয় নিয়ে নিষিদ্ধ প্রেমের দৃপ্ত সমর্থন করেছে। নিকষিত হেমের মত পতিতাপ্রেমের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আমরা দেখেছি চন্দ্রমুখী ও বিজলী চরিত্রে। পতিতার কলঙ্কিত আখ্যা লাভ করলেও একনিষ্ঠ প্রেমের হোমাগ্নি শিখায় পবিত্র কয়েকটি নারী চরিত্র দেখা যায়, যাদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্য শরৎচন্দ্র সহানুভূতি উজাড় করে দিয়ে চিত্রিত করেছেন। এরা হ'ল মেসের ঝি সাবিত্রী, মন্দিরের ভৈরবী ষোড়শী, মোহিনী বাইজী রাজলক্ষ্মী এবং আত্মনিবেদিতা বৈষ্ণবী কমললতা। এরাই শরৎ সাহিত্যের বিশিষ্টতম নারীচরিত্র।

শরৎসাহিত্যে আর এক শ্রেণীর নারী চরিত্র আছে তারা যেন ইবসেন ও বার্নার্ড শ-এর নায়িকা। প্রেমের নীরব বেদনা, নির্বাক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্রন্দিত পরিণতি নয়। প্রেমের দুর্জয় আত্মঘোষণা, যুক্তিনিশিত ঝলসানি ও প্রতিবাদমন্দ্রিত প্রতিষ্ঠাই এদের মধ্যে দেখতে পাই। অভয়া, কিরণময়ী, কমল এরা এক একটি খাপখোলা তলোয়াল, গর্জিয়ে ওঠা এক একটি আগুনের চাবুক। বিবাহ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ফাঁকি, অসঙ্গতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে এরা প্রতিবাদে মুখর। রোহিনীর বিদ্রোহ এসেছে স্বামীর নির্যাতনের ফলে, কিরণময়ীর মধ্যে ক্ষুরধার মননশীলতার সঙ্গে অতৃপ্ত চিত্তের আগ্রাসী কামনার সহ-অবস্থান দেখতে পাই। জ্ঞান ও মনীষায় কিরণময়ী সর্ববিজয়িনী। কিন্তু আত্মজীবন নিয়ন্ত্রণে সে বুদ্ধিভ্রষ্ট অবিমৃষ্যকারী। এখানেই তার ট্র্যাজেডি। কমল যেন তর্কবিতর্কের শুষ্ক অরণিকাঠ, বেদনা ও আকুতির স্পর্শে সবুজ কোনো প্রাণ স্পন্দনময়ী লতা নয়। কমলের চরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের শিল্পী সত্তা অপেক্ষা তাত্ত্বিক সত্তাই বড় হয়ে উঠেছে।

বিবেকানন্দ দেব

বাংলা ও হিন্দী উপন্যাস ঃ তুলনার আলোকে*

ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'ন্যাস' শব্দের সঙ্গে 'উপ' উপসর্গ যুক্ত করে 'উপন্যাস' শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হল সম্মুখ প্রস্তুতিকরণ অথবা জ্ঞাপন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'দশরূপকম্' গ্রন্থে 'নিয়োজন' অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ আছে। ভামহের কাব্যালংকারে 'বিন্যাস' অথবা 'স্থাপনা' অর্থে এই শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে এই শব্দের ভিন্ন প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে 'স্থাপনা' এবং 'জ্ঞাপন' দুই অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' গ্রন্থে 'উপন্যস্ত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—এর মূল অর্থ 'বিন্যস্ত'। 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি' —এই গ্রন্থে 'কথন' অর্থেই শব্দটির প্রযোগ দেখা যায়। এই ভাবেই লক্ষ্য করা যায় যে সংস্কৃত সাহিত্যে উপন্যাস শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে এই শব্দটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নতুন অর্থ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।' স্মরণে রাখতে হবে যে সমৃদ্ধ ইংরাজী কথাসাহিত্যের প্রভাবে ভারতীয় কথাসাহিত্যে এই নতুন ধারাটি প্রকাশিত হয়েছে।

কালক্রমের বিচারে হিন্দী কথাসাহিত্যে শ্রীনিবাস দাসের পরে উপন্যাসের ক্ষেত্রে কিশোরীলাল গোস্বামীর আবিভাব উল্লেখ্য। কিশোরীলাল গোস্বামী 'প্রণয়িণী 'পরিণয়' গ্রন্থের ভূমিকায় যা লিখেছেন তার মর্মার্থ হল –

> ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ হিসাবে নাটক প্রচলিত ছিল, তেমনি উপন্যাসের সৃষ্টিও প্রাচীন ভারতেই ঘটেছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বাসবদত্তা', 'শ্রীহর্ষচরিত' 'কাদম্বরী'র কথা উল্লেখ করা যায়; যা এই রীতির প্রাচীনতাকে প্রমাণ করে।'

উপরোল্লিখিত বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত, পালি ও অপভ্রংশ কথাসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাসিত হবে যে আজকের 'উপন্যাস' শব্দের যে অর্থে প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, তার সঙ্গে সংস্কৃত ও পালি কথাসাহিত্যে এই শব্দটির প্রযোগের কোন সম্বন্ধ নেই। বস্তুত উপন্যাস আধুনিক কথাসাহিত্যের এক শক্তিশালী প্রকাশ মাধ্যম—মূলত একটি কল্পনাধর্মী গদ্য সাহিত্য যেখানে বাস্তব-জীবন, বাস্তব চরিত্র ও কার্যকারণ সমন্বিত ঘটনাবলী উপযুক্ত ভাষাবাহনে চিত্রিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, যুগের পটভূমিকায় মানবজীবনের সত্য ও দর্শনের রসাত্মক রূপ সৃষ্টি করে।

হিন্দী উপন্যাসের প্রবর্তন সম্পর্কে দুটি ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কিশোরীলাল গোস্বামী মনে করেন ভারতীয় কথাসাহিত্য থেকেই উপন্যাস শব্দটি এসেছে, কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। দ্বিতীয় মতটি হল ঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যে উপন্যাস একটি বিশেষ শক্তিশালী প্রকাশ মাধ্যম যা বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দী সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।

আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে বাঙালী কথা-

---

*মূল প্রবন্ধটি হিন্দীতে লেখা। প্রাবন্ধিকের সহায়তায় এটির বঙ্গানুবাদ করেছেন সম্পাদক স্বয়ং।

শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই আধুনিক উপন্যাসের জন্ম ঘটেছে। তাঁর হাতেই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করেছে। প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খৃস্টাব্দে কিন্তু হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫ খৃস্টাব্দ) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতচন্দ্রের আখ্যান অবলম্বনে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক লেখেন, তারই ছায়ানুবাদ করে হিন্দীতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক লেখেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ইনি প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন। এঁরই অনুরোধে ঠাকুর গদাধর সিং 'দুর্গেশনন্দিনী' হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে হিন্দীতে অনূদিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আরো দুটি উপন্যাস 'মৃণালিনী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়'। ভারতেন্দুর অনুরোধেই শ্রীমতী মল্লিকা দেবী ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে 'রাধারাণী' উপন্যাসটি অনুবাদ করেন।

শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙালী ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সৃষ্ট 'স্বর্ণলতা' (১৮৭২-এ প্রকাশিত) হিন্দী অনুবাদ করেন রাধাকৃষ্ণ পাল, যিনি ভারতেন্দুর বিশেষ অনুরোধে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই ভাবেই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মাধবীলতা', পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শৈশব সহচরী' রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কন', স্বর্ণকুমারীর 'দীপনির্বাণ' প্রভৃতি উপন্যাস হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয়ে দারুণ লোকপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সময়কালেই পণ্ডিত প্রকাশনারায়ণ মিশ্র, রাধাচরণ গোস্বামী, গদাধর সিং, রাধাকৃষ্ণ দাস, কার্ত্তিকপ্রসাদ ক্ষত্রী, রামকৃষ্ণ ভর্মা প্রমুখেরা বাংলা উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদ করেন।

এই সময়কালে হিন্দী ভাষাভাষী জনমানসে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী উপন্যাসসমূহ শুধু পাঠই করেন নি, পূর্ণাঙ্গভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তার রূপ ও স্বরূপ নিজস্ব করে গ্রহণ করেছিলেন এক কথায় বলা চলে যে, তিনি ইংরাজী সাহিত্যের উপন্যাসের উপযুক্ত মন্থন করেছিলেন এবং সেই পরম্পরায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের উপন্যাসগুলিকে নিতান্ত ভারতীয় পরিবেশে ও ভঙ্গিমায় রচনা করেন। সেই জন্যই তাঁর উপন্যাসগুলিতে কল্পনার বিস্তার, চরিত্রগুলির মানসিক বিকাশ, কথাবস্তুর আকর্ষণ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি, উদ্দেশ্যের একমুখিতা পরিলক্ষিত হয়। উনি ইংরাজী উপন্যাসের রোমান্টিক ধারাকে ভারতীয় বেশে সাজিয়ে এবং ভারতীয় পাঠকদের মনের অনুকূল রূপে সৃষ্টি করে ভারতীয় সাহিত্যে এক আশ্চর্যজনক 'বিপ্লব' আনেন। হিন্দী জনমানসে বাংলা ঔপন্যাসের হিন্দী অনুবাদগুলি সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। নতুন অর্থে উপন্যাসের সার্থক প্রয়োগ প্রথমে বাংলা সাহিত্যেই হয়েছে। হিন্দী সাহিত্যে এই উপন্যাসের নতুন অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে বাংলা উপন্যাসের অনুবাদের মাধ্যমে, ফলে হিন্দী উপন্যাস সাহিত্য বাংলা কথাসাহিত্যের কাছে ঋণী।

আলোচনার সুবিধার্থে হিন্দী উপন্যাসের কালবিভাজন নীচের রীতি অনুসারে করা চলে ঃ

এক ॥ প্রেমচাঁদ পূর্ব যুগ (১৮৮২-১৯১৮ খৃস্টাব্দ)

['পরীক্ষা গুরু' উপন্যাস থেকে 'সেবাসদন' উপন্যাসের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত]

দুই ॥ (প্রেমচাঁদ যুগ (১৯১৮-১৯৩৬ খৃস্টাব্দ)

তিন ॥ প্রেমচাঁদ-উত্তর যুগ (১৯৩৬ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)

॥ প্রেমচাঁদ-পূর্ব যুগের উপন্যাসের স্বরূপ পরিচয় ॥

হিন্দী উপন্যাসের সূচনাপর্বে তিনজন ঔপন্যাসিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ; দুই শ্রদ্ধারাম ফুল্লেরী ; তিন লালা শ্রীনিবাস দাস।

ডঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের 'পূর্ণপ্রকাশ' ও 'চন্দ্রপ্রভা উপন্যাসকেই প্রথম মৌলিক হিন্দী উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এটিকে মৌলিক রচনা বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না, কারণ এই উপন্যাসটি একটি মারাঠী উপন্যাসের ছায়ানুবাদ।

পণ্ডিত শ্রদ্ধারাম ফুল্লেরী ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে রচনা করেন 'ভাগ্যবতী' উপন্যাসটি-- যা তৎকালীন যুগের স্ত্রীশিক্ষা দানের ও ভারতীয় নারীদের গার্হস্থ্যধর্ম সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয়েছিল। স্মরণে রাখতে হবে যে, এই 'ভারতেন্দু যুগ' এ পণ্ডিত শ্রদ্ধারাম ছিলেন একজন সফল সমাজ সংস্কারক। এঁর সমাজ-সংস্কার দৃষ্টিই পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর রচিত এই উপন্যাসে। উপন্যাসটি আদর্শের রঙে চিত্রিত হওয়ার ফলে উপন্যাসের বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে সমসাময়িক জীবনের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। 'ভাগ্যবতী' উপন্যাসে কিছু কিছু ঔপন্যাসিক উপকরণ থাকলেও প্রকৃত উপন্যাস সৌধ যে ভিত্তি ভূমিতে গড়ে, তা অনুপস্থিত।

লালা শ্রীনিবাস দাস রচিত ও ১৮৮২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'পরীক্ষাগুরু'কে হিন্দী কথাসাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাস বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। এই ঔপন্যাসিক পাশ্চাত্য উপন্যাস রচনার রীতি অনুসরণেই তাঁর এই উপন্যাসটি সৃষ্টি করেছেন। এই উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত কাহিনী-পরিচিত উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক নয়।

দিল্লীতে লালা মদনমোহন নামে এক অভিজাত ধনী ব্যক্তি বাস করতেন। ওঁর বংশ মর্যাদা ও ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠা ছিল যথেষ্ট ব্যাপক। যুবক অবস্থা থেকেই তাঁর এমন কিছু চাটুকর জুটেছিল যারা তাঁর [illegible] করে তাঁকে প্রমোদ-বিলাসে মত্ত করে তুলেছিল। এমনি ভাবে দিনে দিনে তিনি বিলাসের নদীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। এর একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন লালা ব্রজ কিশোর। এই ব্রজ কিশোর কর্মজীবনে ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি যেমন বিদ্বান তেমনি ছিলেন সৎ ও সাবধানী। অনুমান করা যায় এই ব্রজকিশোর চরিত্রটির ওপর স্বয়ং লেখকের চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যায় যে লেখক সেই সময় দিল্লীতে 'অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট' হিসেবে কাজ করতেন। ব্রজ-কিশোর সর্বসময়েই বন্ধু মদনমোহনকে নানা উপদেশ দিতেন ও সাবধান করার চেষ্টা

করতেন : কিন্তু মদনমোহন তাঁর এই বন্ধুর উপদেশ কর্ণপাত তো করতেনই না, বিপরীত ক্ষেত্রে তাঁকে ঘৃণা করতেন ও বিরক্তি প্রকাশ করতেন। ফলে এই ধনী মদন মোহন তাঁর বংশ মর্যাদা, আভিজাত্য ও অর্থ প্রাচুর্য হারিয়ে ফেলেন। সমাজে কোন সম্মানই আর তাঁর থাকে না, এমনকি তাঁর সমস্ত সম্পত্তিও নিলামে ওঠে। ফলে তিনি সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এই দুঃসময়েই প্রকৃত বন্ধু ব্রজকিশোর তাঁকে সাহায্য করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিপদের মুহূর্তেই তিনি উপলব্ধি করলেন প্রকৃত বন্ধু কে ? এই কঠিন পরীক্ষাতেই ব্রজ কিশোর 'গুরু' হিসেবে উপস্থিত হয়ে তাকে সচেতন করে তুললেন।

আলোচনার সূত্রেই বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে এই নগ্নধর্মী উপন্যাসটি রচনা করেন। যার ইংরাজী অনুবাদ করেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৮২ খৃস্টাব্দে। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

> আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাস জগতে খুব উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারে না। ইহাতে যে সংঘাতটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বাহিরের জিনিস –অন্তর জগতের গভীরতর সংঘাতের কোন চিহ্ন ইহাতে পাওয়া যায় না। কু-সঙ্গের জন্য আদুরে ছেলের পদস্খলন এবং বিপদের ও সৎ সঙ্গের ফলে তাহার নৈতিক পনরুদ্ধার ইহার বর্ণনীয় বস্তু "।

'পরীক্ষাগুরু' উপন্যাসটি সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য কেন না এই দুটি উপন্যাসের পটভূমিকা ও সমাজচিত্র সমধর্মী। এই দুটি উপন্যাসের কোনটাতেই জীবনের গভীরে নিহিত জটিলতার উদ্ঘাটন ঘটেনি।

আর একটি দিকেও এই দুই উপন্যাসের সাদৃশ্য লক্ষণীয়—সেটি হল ভাষা প্রয়োগ প্রসঙ্গ। প্যারীচাঁদ মিত্র তার উপন্যাসে তৎকালীন কলকাতার বাঙালী সমাজে প্রচলিত 'কথ্য' ভাষাকে প্রয়োগ করেছিলেন, তেমনি শ্রীনিবাস দাসও তৎকালীন দিল্লীতে প্রচলিত 'কথ্য' ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

'পরীক্ষাগুরু'—কে হিন্দী কথাসাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাস বলে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে হিন্দী উপন্যাসের সার্থক যাত্রা শুরু হয়েছে সামাজিক চিত্রের যথার্থ চিত্রণের মাধ্যমে। এই যাত্রা প্রেমচাঁদ, যশপাল প্রমুখ সাহিত্য-স্রষ্টাদের মাধ্যমে বর্তমান কালে এসে পৌঁছেছে। ভারতীয় জীবনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় এই সব বাস্তববাদী সামাজিক উপন্যাসেই ; কেননা এই সব উপন্যাসেই ভারতীয় জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ, যুগধর্ম—এক কথায় সামগ্রিক জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রেমচাঁদ-পূর্ব যুগে আবার তিন প্রকারের উপন্যাস দেখা যায়।

এক ।। শুদ্ধ মনোরঞ্জনকারী উপন্যাস।

এই জাতীয় উপন্যাসকে আবার দু ধরণে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(১) চাতুর্য সমন্বিত রূপকথাধর্মী রচনা। লেখকেরা হলেন

দেবকীনন্দন ক্ষত্রী, কিশোরীলাল গোস্বামী, দেবী প্রসাদ শর্মা, জগন্নাথ প্রসাদ চতুর্বেদী, হবেকৃষ্ণ জৌহব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

(১ গোয়েন্দা কাহিনী। লেখকেরা হলেন গোপালবাম গহমরী, শিবনাবায়ন দ্বিবেদী, শেব সিং, রুদ্রদত্ত শর্মা, জয়রামদাস গুপ্ত।

দুই ॥ উপদেশ-প্রধান সামাজিক উপন্যাস।

লেখকেবা হলেন—শ্রীনিবাস দাস, রামকৃষ্ণ ভট্ট, রাধাচরণ গোস্বামী, লজ্জাবাম মেহেতা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

তিন ॥ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

রচয়িতাবা হলেন কিশোবীলাল গোস্বামী, বলদেও প্রসাদ মিশ্র, কিশোব প্রকাশ সিংহ, ব্রজনন্দন সহায়, মিশ্রবন্ধু প্রমুখ ঔপন্যাসিকবৃন্দ।

শুদ্ধ মনোরঞ্জনকারী উপন্যাসে এমন সব বিস্ময়কব কাহিনীব জাল প্রসারিত হয়েছে, যাতে পাঠকেরা বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন। ঘটনাব কার্যকাবণ সম্পর্ক স্থাপনেব কোন উদ্যোগ না রেখেই লেখক তাঁর প্রয়োজন অনুসারে নানা বিস্ময়কব ও চমকপ্রদ ঘটনাব উপস্থাপন করেছেন, যাতে পাঠকেবা তাব মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে কথাপ্রবাহের সঙ্গে নিজেবাও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই সব উপন্যাসে যেমন একদিকে পাঠকদের কৌতূহল তৃপ্তির লক্ষ্যও ছিল, তেমনি ছিল বিস্ময়কর আনন্দ-সৃষ্টিব উদ্দেশ্য।

গোয়েন্দা উপন্যাসগুলিব বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই সব উপন্যাসেব কাহিনীর জটিল ঘটনাবলীব মধ্য থেকে আসল সত্যকে সন্ধান করার জন্য পাঠকদেব কৌতূহল হত উদগ্র। এঁরা এমনভাবে ঘটনাব জটিল জাল বুনতেন যাতে সহজেই অপরাধীকে আবিষ্কার করা ছিল অসম্ভব। এই বিশেষ ধবণেব কাহিনীগুলিব আকর্ষণ ছিল দুর্বার যা পাঠকদের কাছে ছিল অপরিসীম পরিতৃপ্তির আধার।

এই যুগকে মূলতঃ সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধারের যুগ বলেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জাগরণের চেতনা ধীরে ধীবে বিকশিত হচ্ছিল। এই সময়কার একদিকে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্যদিকে পাশ্চাত্য রীতির অন্ধ অনুকৃতিব ধারা তৎকালীন চিন্তাবিদ ও সাহিত্য স্রষ্টাদের অন্তরকে করে তুলেছিল বেদনার্ত। এই সব সাহিত্যিকদেব মনে রাষ্ট্রীয় চেতনা তখন অঙ্কুরিত হতে থাকলেও তা কেমন ভাবে প্রকাশ সম্ভব সে সম্পর্কে তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা তাঁদের ছিল না; কিন্তু এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কাব ও কুনীতির নানা চিত্রাঙ্কণে তাঁরা তৎপর হয়েছিলেন। আমরা যদি এই সমকালে সৃষ্ট সামাজিক-উপন্যাসগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব এই সব ঔপন্যাসিকদেব সামনে প্রকৃত সমস্যা ছিল নাবী। এই নারীবা ছিলেন সমাজে চিবলাঞ্ছিতা, চিরবঞ্চিতা, অবহেলিতা ও চিববন্দিনী। নারীদের এই সমস্যা ছিল মূলতঃ সমগ্র দেশের, যেমন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, কলহপ্রিয়তা, হীনমন্যতা, অলঙ্কার-প্রিয়তা প্রভৃতিই ছিল সামাজিক উপন্যাসাবলীর মুখ্য বিষয়। এই সমস্যাবলীর সঙ্গে নারীবা ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সময়ে আরো যেটি লক্ষণীয় তা হল নতুন ধারায়

শিক্ষিত 'নববাবুদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রাচীন প্রথানুসারী নারীদেব, বিশেষিত সহধর্মিনীদেব দৃষ্টির সংঘাত - যা তৎকালীন সামাজিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য ছিল। শুধু তাই নয়, এই সব উপন্যাসে নারী সমস্যা ব্যতীত পানাসক্তি, চাটুকাবিতা, সদাচাব ও সদ্‌বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ও সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সব উপন্যাসের বিষয় যাইহোক না কেন, এটা সত্য যে ঔপন্যাসিকেবা এই সময়কার সমাজের বহির্জীবনে প্রকাশিত সত্যকে প্রকাশ করার জন্য ঘটনাবলী ও চরিত্রাদি সৃষ্টি করলেও অন্তর্জীবনেব জটিলতা উন্মোচনে বা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে উৎসাহী হননি। এরই ফলে এই সব উপন্যাস হিন্দী সাহিত্যের আসবে স্থায়ী আসন লাভ করেনি।

আলোচ্য সময় হিন্দী সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসও প্রচুব পরিমাণে বচিত হয়েছিল। এই সব উপন্যাস সৃষ্টি কবে ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের বাষ্ট্রীয় ও সংস্কৃতির পরম্পরা ও উত্তরাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবতে প্রয়াস। হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই সময়কাব উপন্যাসগুলিতে তৎকালীন তেমন কোন যথার্থ চিত্র ফুটে ওঠেনি। আরো উল্লেখ্য যে, এই সব উপন্যাসে জটিল সামাজিক পবিস্থিতি, মানব মনের নানান আকাঙ্ক্ষা, পারস্পরিক সম্পর্কেব সূক্ষ্ম নিবীক্ষণ উপলব্ধি কবা যায় না। শুধুমাত্র সামান্য ঐতিহাসক তথ্যের যে সার্থক সমন্বয় প্রত্যাশিত ছিল তাও পাওয়া গেল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস বচনা কবতে বসে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে কল্পনা শক্তিব পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁরই অনুবর্তী রমেশচন্দ্র কিন্তু সেই কল্পনা শক্তিব পবিচয় দিতে পাবেন নি। ফলে তাঁব ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি কিছুটা নীবস হয়ে পড়েছিল, যা ঐ সময়কার হিন্দী ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির সমধর্মী। তাই সংক্ষেপে বলা যায়, এই সময়কার হিন্দী সাহিত্যেব এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি ইতিহাসেব জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেনি বলেই এগুলিকে সফল সাহিত্যকৃতি বলে স্বীকার কবতে দ্বিধা হয়।

হিন্দী সাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি, রূপ ও প্রতিষ্ঠা প্রেমচাঁদেব সৃষ্টির মধ্যেই পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসেব পর্যায় প্রেমচাঁদ পূর্ববর্তী হিন্দী উপন্যাসগুলিব কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পাবে, কিন্তু প্রকৃত উপন্যাসের গৌরবে এগুলি গৌববান্বিত নয়।

।। প্রেমচাঁদ যুগে। উপন্যাসের রূপ ও স্বরূপ পবিচয় ।।

ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে বাংলা সাহিত্যের অনেকানেক উপন্যাসের হিন্দী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বাংলা উপন্যাসগুলি একদিকে হিন্দী উপন্যাসগুলিকে অতিপ্রাকৃত, অতিরঞ্জিত, ঘটনাবহুল চাতুর্য সম্বলিত রূপকথাধর্মিতা থেকে মুক্তি দিয়েছে, অন্যদিকে এই সব উপন্যাসকে বিশুদ্ধ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অভিমুখী করেছে। বাংলা উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদের মাধ্যমে ভাষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয়। বাংলা ভাষায় রচিত তৎকালীন যুগের উপন্যাসাবলীতে তৎসম শব্দের ব্যবহারের ফলে যে মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের সমন্বয় লক্ষ্য করা যেত, তাতে হিন্দী উপন্যাসের স্রষ্টারা সেই ভাষারীতির প্রতি বিশেষ ভাবে

আকৃষ্ট হলেন। শুধু তাই নয়, এখানে কোমল ভাবনা ও সুকুমার কল্পনা প্রকাশেও অভিরুচি দেখা দিল। এইভাবে হিন্দী গদ্যের ভাষারীতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। হিন্দী সাহিত্যের এই প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হলেন শক্তিশালী কথাশিল্পী প্রেমচাঁদ। ভাষাকে আরো গতিশীল ও সম্পদ সমৃদ্ধ করে জন-জীবনের ভাষার অনুবর্তী ও নিকটবর্তী করে তুললেন তিনি।

প্রেমচাঁদের সাহিত্যেই 'যথার্থ' জীবনচিত্র চিত্রিত হল। 'যথার্থ' অর্থে শুধু গ্লানিময় জীবনই নয়, মানব মনের গভীরে যে রহস্যময় সত্য নিহিত থাকে তারই অভিব্যক্তিকে বলা হয় যথার্থ। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

> "আমি উপন্যাসকে মানব চরিত্রের চিত্র বলেই মনে করি। মানব- চরিত্রকে উদ্ঘাটিত ও তার অন্তর্নিহিত রহস্য উন্মোচন করাই উপন্যাসের মূল তত্ত্ব।"

প্রেমচাঁদের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি 'যথার্থ' শব্দকে প্রকৃত অর্থেই উপলব্ধি করেছিলেন। ওঁর উপন্যাসে প্রকাশিত 'যথার্থ' চেতনাই ওঁর উপন্যাসের মূল শক্তি ছিল। প্রেমচাঁদ এই যথার্থ জীবনকে চিনেছেন, পরখ করেছেন ও তাকে অভিব্যক্তি দান করেছেন। এখন বিচার্য বিষয় হল বাস্তবে 'যথার্থ' বলতে কি বোঝায়? 'যথার্থ' প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক যেমন, তেমনি সমাজকেন্দ্রিকও বটে। এই বক্তব্যের তাৎপর্য হল এই যে সমাজ একটি বিশেষ পরিবেশ ও পরিধিতে অবস্থিত থাকে এবং এর এক বিশেষ সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, সংঘর্ষ থাকে এবং থাকে জীবনের নানা ধরণের মূল্যবোধ। আবার একজন ব্যক্তি এই সমাজেরই একজন সদস্য। প্রত্যেক ব্যক্তিরও কিছু জীবনসত্য ও জীবনদর্শন থাকে যার মধ্যে সে বেঁচে থাকে। ব্যক্তি-জীবনের এই 'সত্য ও 'দর্শন' গঠনে সামাজিক সত্য ও তার মূল্যবোধের প্রভাব পড়ে। সুতরাং ব্যক্তিকে সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করা চলে। এই ব্যক্তি-মানুষের মনের অন্তর্মনে অন্তর্নিহিত ভাবনা, আকাঙ্ক্ষাতে সেই সমাজের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। প্রাসঙ্গিক ভাবেই বলা যেতে পারে—প্রেমচাঁদের 'যথার্থ' চেতনাতে ব্যক্তি জীবনসত্য ও সমাজ-সত্য—দুয়েরই অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এতেই 'যথার্থে'র ব্যাপক ও সত্য স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এইভাবেই প্রেমচাঁদ একের মধ্যে অনেক ও অনেকের মধ্যে একককে সার্থক ভাবে সমন্বিত করে পরিস্ফুট করেছেন।

যথার্থ-চেতনাকে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য মনীষী যথাক্রমে কার্লমার্কস ও সিগমন্ড ফ্রয়েড সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন। মার্কসের দৃষ্টিতে যথার্থ চেতনা মূলতঃ সামাজিক চেতনা এবং সেখানে ব্যক্তি-মনের একান্ত সত্য কিছুটা উপেক্ষিত থেকে গেছে। অন্যদিকে ফ্রয়েড ব্যক্তি-সত্যকে চরম সত্য বলে মনে করে ব্যক্তিসত্যের একান্ত বিশ্লেষণে নিমগ্ন হয়েছেন এবং এর ফলে ব্যক্তিকে বৃহত্তর সমাজ-জীবন-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। প্রেমচাঁদই হিন্দী সাহিত্যের প্রথম 'যথার্থবাদী' ঔপন্যাসিক, যিনি যথার্থ চেতনার সত্য রূপকে পরখ করেছেন। তিনি যথার্থ চেতনার দুই রূপ যা ব্যক্তি-চেতনা ও সমাজ-চেতনার মাধ্যমে প্রকাশিত তাকে শুধু উন্মোচিতই করেননি, তার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। এই ভাবেই প্রেমচাঁদ একদিকে সামাজিক

যথার্থ চেতনার বিভিন্নরূপ চিত্রিত করেছেন এবং অন্যদিকে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সংস্কারে পালিত ব্যক্তির অন্তর্মনে প্রবেশ করে মনের সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে সমাজের এক বিশেষ পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি একদিকে যেমন ব্যক্তির অন্তর্মনের সত্যকে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে তেমনি এই সব চরিত্র সমাজের কোন কোন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে সমাজ-চেতনার তাৎপর্যকে প্রকাশ করেছে—এইগুলিই প্রেমচাঁদ উপন্যাসের উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রেমচাঁদ উর্দু ভাষায় তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্রতী হন ১৯০৫ খৃস্টাব্দে, কিন্তু ১৯১৮ সালে 'সেবাসদন' উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর হিন্দী ভাষায় রচনার সূত্রপাত ঘটে। এই উপন্যাসটি উর্দু উপন্যাস 'বাজারে হুস্ন' (১৯১৫)'-এরই হিন্দী রূপান্তর। এরপর উনি 'প্রেমাশ্রম' (১৯২২), নির্মলা (১৯২৩), রঙ্গভূমি (১৯২৪), কায়াকল্প (১৯২৬), প্রতিজ্ঞা (১৯২৯), গবন (১৯৩০), কর্মভূমি (১৯৩২) এবং গোদান (১৯৩৬) রচনা করেই অমর কথাশিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'সঙ্গমসূত্র' অপূর্ণই থেকে গেছে, যেমন অপূর্ণ থেকে গেছে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে'। এইভাবেই তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সৃষ্টির কাজে ব্রতী ছিলেন। বস্তুত প্রেমচাঁদ দারিদ্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, দারিদ্রের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং দারিদ্রের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করতে করতেই ১৯৩৬ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উনি জীবনভর নিজেকে মজদুর বলেই মনে করেছেন। রোগগ্রস্ত অবস্থায় লেখার কাজে রত ছিলেন এবং তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হলে তিনি বলতেন ঃ 'আমি এক মজদুর। মজদুরি করা ব্যতীত আমার খাওয়ার অধিকার নেই।

এই বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা তাঁর এক বিশেষ মানসিকতাই মূর্ত হতে দেখি। এইখানে প্রাসঙ্গিক ভাবেই বাংলা সাহিত্যের দুই অসাধারণ স্রষ্টার কথা স্মরণে আসে, যাঁরা প্রেমচাঁদের মতই দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেই আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিদ্রোহী কবি-সাহিত্যিক কাজী নজরুল ইসলাম।

বহু-শতাব্দী ধরে অপমানিত, পদদলিত, নিষ্পেষিত কৃষকদের ব্যথা বেদনা প্রকাশের প্রকৃত প্রতিভূ ছিলেন প্রেমচাঁদ। পর্দার অন্তরালে পদে পদে লাঞ্ছিতা অসহায় নারী জাতির তিনি ছিলেন শক্তিশালী প্রবক্তা। গরীব, নিঃসম্বল ও নিঃসহায় মানুষের তিনি ছিলেন 'আত্মবল' স্বরূপ। যদি আমরা সমগ্র উত্তর ভারতের অগণিত জনগণের আচার-বিচার, ভাব-ভাষা, জীবনযাপন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ প্রকৃত ভাবে উপলব্ধি করতে চাই তবে প্রেমচাঁদের রচনাবলী ব্যতীত অন্য কোন প্রকৃষ্ট মাধ্যম পাওয়া সম্ভব নয়। মৃত্যু শয্যায় শায়িত থেকেও তিনি 'মহাজনী' সভ্যতা সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লেখেন তা আনে বিপ্লবের ঢেউ।

শরৎচন্দ্র দৈনন্দিন মানুষের বুকে চিরকালীন হৃদয় স্পন্দন শুনেছিলেন। তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের সাধারণ বাঙালী পরিবারের

চিত্র অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের এমন বিস্ময়কর মিলন ঘটিয়েছেন যে বার বার পড়েও পাঠকের মন তৃপ্ত হয় না। পাঠকেরা যেন নিজেদের জীবনকেই মনের মুকুরে প্রতিফলিত দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মূলতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ভাব-ভাবনা আবেগ-সংস্কার প্রভৃতির প্রকাশই প্রাধান্য পেয়েছে, যদিও তার ছোট গল্পে দলিত সমাজের বেদনার চিত্রও ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে প্রেমচাদের সাহিত্যে দলিত সমাজের পরিবেশ ও সংঘর্ষশীল শোষিত মূক জীবনের ব্যথা-বেদনা পরিস্ফুট হয়েছে। সামন্ত সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ 'জমিদারী প্রথা এবং পুঁজিবাদী অর্থাৎ 'মহাজনী সভ্যতা বিচ্ছুরিত কালিমা আচ্ছন্ন জরাগ্রস্ত সংঘর্ষরত মূক জীবনের মানবিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

প্রেমচাদ সাহিত্যে একটি নতুন 'জনবাদী' সৌন্দর্য চেতনার ভাবনা উপস্থাপিত করলেন। প্রেমচাদের ভাষায় ,

> 'হামে সুন্দরতা কী কসৌটী বদলনা হোগী। অভীতক এই কসৌটী আমীরী ঔর বিলাসিতা কে ঢং কী থী। হামারা কলাকার আমীরো কা পল্লা পকড়ে রহনা চাহতা থা। ঝোপড়ী ঔর খণ্ডহর উসকে ধ্যানকে অধিকারী ন থে। উসে ইহ মনুষ্য কী পারী। সে বাহর সমঝা থা। কভী ইন কী চর্চা করতা ভী থা তো ইনকা মজাক উড়ানে কে লিয়ে। যহ ভী মনুষ্য হাঁয় উনকা ভী হৃদয় হ্যায়, ঔর উনমে ভী আকাঙ্ক্ষায়েঁ হায় —যহ কলা কী কল্পনা কে বাহর কী বাত থী।

ভাষান্তরে দাঁড়ায়—আমাদের সৌন্দর্য-চেতনা পরখ করার আধারেরই পরিবর্তন প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত সেই সৌন্দর্য-চেতনা ধনী ও বিলাসী জীবনাশ্রয়ী। আমাদের কথাশিল্পীরা এই ধনী জীবনের সৌন্দর্য চেতনাকেই প্রাধান্য দিতেন। কুঁড়ে ঘর ও ধ্বংসাবশেষ এই সব শিল্পীর কল্পনা বহির্ভূত ছিল, যদি কখনও এই বিষয়ে চর্চার সুযোগ আসত তবে তা নিয়ে উপহাসই করা হত। ওরা যে মানুষ, ওদের যে হৃদয় আছে, ওদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে—এগুলি শিল্পের কল্পনা জগতের বাইরের বস্তু ছিল'

এই ভাবেই প্রেমচাদ এক নতুন জনবাদী সৌন্দর্য-চেতনার রীতি শুধু প্রবর্তনই করলেন না, তাকে বিকশিত করে তুললেন। বস্তুত প্রেমচাদ জনসংঘর্ষের মধ্যেই সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করলেন। তিনি যেভাবে গরীবের কুটিরে সৌন্দর্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখলেন, সেভাবে ধনীর সৌধে সৌন্দর্যের সন্ধান পাননি। এইভাবেই সাহিত্যে এক সৌন্দর্যের শুধু নতুনই নয়, এক ব্যাপক রূপ প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা চলে —বাংলা সাহিত্যের 'কল্লোল যুগ'-এর শিল্পীদের সৃষ্টিতে এই চেতনারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

কল্লোল গোষ্ঠীর ঔপন্যাসিকেরা জীবনের রূপ আঁকতে গিয়ে রোমান্টিকতার পথ সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করেননি বটে তবে তারা একটা বাস্তবসম্মত পথের সন্ধান করেছিলেন। দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন ওপর তলার থেকে নীচের তলায়। তাই রচিত

হল অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'বেদে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠীর দেশ'-এর মত উপন্যাস। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। প্রেমচাঁদের দৃষ্টি ভঙ্গীর সঙ্গে এদের দৃষ্টির মিল খুব দুর্নিরীক্ষ্য নয় বলেই মনে হয়।

প্রেমচাঁদের উপন্যাসাবলী থেকে স্পষ্ট প্রতিভাসিত হয় যে সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের দৃষ্টির উদারতা ও মহানতা অতুলনীয়। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল ব্যাপক ও উদার সহানুভূতি। তিনি কোন দিনই কোন মানুষকে আঘাত করেন নি, আঘাত করেছেন তার সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ঐশ্বর্যের উন্মাদনা, প্রাচুর্যের বিলাসিতা এবং অধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল সর্বদাই সুপ্রকাশিত।

সাহিত্যিক প্রেমচাঁদ যে উপন্যাস-ধারার প্রবর্তন ও পরিশীলন করেন, সেই ধারার অনুবর্তী হয়েই উপস্থিত হন উপন্যাসিক বিশ্বম্ভরনাথ কৌশিক। প্রেমচাঁদের মতই তিনি উপন্যাসে সামাজিক চিত্র অংকনে উদ্যোগী ছিলেন। প্রেমচাঁদ যখন সামাজিক চিত্র অংকন করতেন বা সামাজিক সমস্যাবলীর জটিল জাল বিস্তার করতেন তখন তা হত যথার্থ সমাজ-ভাবনার বাস্তব রূপায়ণ, যার মূলে সমাজের গভীরে থাকত প্রোথিত, তাই তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক যে সমস্যাই গ্রহণ করুন না কেন, তার ভিত্তি হত অত্যন্ত শক্ত। কিন্তু বিশ্বম্ভরনাথ কৌশিকের উপন্যাসে সামাজিক সমস্যাবলী ও চরিত্র চিত্রন থাকলেও সমস্যাদির গভীরে তাঁর প্রবেশ করার ক্ষমতা ছিল সীমিত। তাই তাঁর লিখিত দুটি উপন্যাস 'ভিখারিনী' (১৯২৯) এবং 'মা' (১৯২৯) সে যুগে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করলেও এই উপন্যাস দুটির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়নি।

সামাজিক সমস্যা চিত্রণের ধারা অনুসরণে যে সব ঔপন্যাসিক উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা ও তাঁদের উপন্যাসগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

জয়শঙ্কর প্রসাদ – 'কঙ্কাল', 'তিতলী'।

মান্নান দ্বিবেদী —'কল্যাণী'।

দুর্গাপ্রসাদ ক্ষত্রী—'লাল পঞ্জা'।

পাণ্ডে বেচনশর্মা উগ্র 'চন্দ হাসীনো কী খতুর', 'বুধুয়া কী বেটী' ও 'শরাবী'।

চতুর্সেন শাস্ত্রী—'হৃদয় কী পিয়াস', 'অমর অভিলাষা'।

ঋষভচরণ জৈন -'ভাই', 'মন্দির' 'দীপ', 'সত্যাগ্রহ'।

বৃন্দাবন লাল বর্মা - 'লগন', 'সঙ্গম', 'প্রত্যাগত', 'প্রেম কী ভেট', 'কুন্ডলী চক্র'।

রাধিকা রমন সিং—'রাম রহিম'।

প্রতাপনারায়ণ শ্রীবাস্তব—'বিদা', 'বিজয়'।

সীয়ারাম শরণ গুপ্ত—'বোধ', অন্তিম আকাঙ্ক্ষা'।

প্রেমচাঁদ যুগের সর্বাপেক্ষা বেশী আলোচিত দুটি উপন্যাস হল 'কঙ্কাল' (১৯২৯) ও তিতলী (১৯৩৪)। এই দুটি উপন্যাসের জনক জয়শঙ্কর প্রসাদ যিনি হিন্দী কাব্যের অন্যতম প্রধান স্রষ্টারূপে স্বীকৃত, তিনি 'কঙ্কাল' উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন বটে, কিন্তু সেখানেই এই ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য

সীমাবদ্ধ থাকেনি, বৈশিষ্ট্য আছে এক নতুন ধারা প্রবর্তনের মধ্যে—এই ধারা ছিল মূলতঃ এক রোমান্সধর্মী ধারা। প্রেমচাঁদের পদানুসরণ করে সামাজিক সমস্যার ওপর আদর্শের আরোপণ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন, সমস্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন নি এবং তৃতীয়তঃ, এই উপন্যাসে আর্থিক বিষমতাকে আধার না করে সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাকেই আশ্রয় করেছেন।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'তিতলী'-তে আমরা ভারতীয় দৃষ্টি ও ঐতিহ্য এবং কৃষি সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় পাই। ভারতীয় দাম্পত্য-জীবনের অন্তবর্তী যে সব সহজ-সুন্দর মৌল বৈশিষ্ট্যাবলী নিহিত আছে, তিনি এই উপন্যাসে কৃষি সভ্যতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তা ব্যক্ত করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায় এই উপন্যাস ভারতীয় নারীত্বের সৌন্দর্য ও সজীবতার এক আশ্চর্য চিত্রণ।

'প্রেমচাঁদ যুগেই নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদিতার প্রত্যক্ষ বিরোধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রেমচাঁদ তাঁর উপন্যাসে অসত্যের ওপর সত্যের বিজয় যে ভাবে চিত্রিত করেছিলেন, তারই বিরুদ্ধাচরণ করলেন তাঁরই সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিকেরা। উল্লেখ করা যায় যে চতুর্সেন শাস্ত্রী, পাণ্ডে বেচন শর্মা উগ্র, ঋষভচরণ জৈন প্রমুখ উপন্যাসকারদের বিশ্বাস ছিল মানবজীবনের বহুলাংশ জুড়ে আছে কুশ্রীতা, চারিত্রিক দুর্বলতা, নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি জীবনের নানা অন্ধকার দিক। এই অন্ধকার রূপের বাস্তবতা অস্বীকার করে জীবনের রূপ ও স্বরূপ আঁকা যায় না। তাই তাঁরা তাঁদের সৃষ্টি সাহিত্যে এই রূপেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এতেই তাঁরা সাহিত্যিক হিসেবে তাঁদের ধর্ম পালন করেছেন বলে মনে করেছেন। বস্তুত এঁদের মন্তব্য হল—মানব-জীবনের এই দুর্বল ও নগ্ন দিকগুলিকেই যদি উদ্ঘাটিত না করা হয়, তাহলে এই সত্যরূপের উদ্ঘাটন কী ভ ব সম্ভব! আসলে এই ধরণের রচনার মূলে ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিল। বিশেষতঃ এমিল জোলা যে রীতিতে ইউরোপে তাঁর উপন্যাসগুলি সৃষ্টি করেছিলেন তারই অনুসরণে হিন্দীতে এই সময়কার ঔপন্যাসিকেরা যে সব উপন্যাস রচনা করলেন তাতে জীবনের কুৎসিৎ দিক ও বিষমতাকে এড়িয়ে না গিয়ে তারই বাস্তব রূপাঙ্কন করতে বসে তাঁরা নগ্নতার চিত্রকেও এঁকেছেন। এরাই হিন্দী সাহিত্যে প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিক নামে পরিচিত। নগ্নতার চিত্র প্রসঙ্গে প্রায় এই সময়কার কয়েকজন বাঙালী ঔপন্যাসিকের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়—তাঁরা হলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা, যাঁরা নিজেদের সৃষ্ট সাহিত্যে নগ্নতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

॥ প্রেমচাঁদ-উত্তর যুগের স্বরূপ পরিচয় ॥

প্রেমচাঁদ হিন্দী উপন্যাসকে বাস্তববাদিতার অভিমুখী করেছিলেন। ইনি একদিকে উপন্যাসে সামাজিক জীবনের যথার্থ সম্বন্ধ, সমস্যা ও অন্যান্য বিষমতার রূপও যেমন উদ্ঘাটন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে মানুষের পরিস্থিতি সাপেক্ষ অন্তর্মনের পরিচয়ও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এইভাবেই ঔপন্যাসিক প্রেমচাঁদ সাহিত্যে বাস্তবতার দুটি রূপ

উপস্থাপিত করলেন। এক, সামাজিক; দুই, মনস্তাত্ত্বিক। প্রেমচাঁদ-উত্তর যুগে আমরা এই দুই ধারাই প্রবাহিত হতে দেখি। সামাজিক চেতনা সম্বলিত উপন্যাসের ধারা ও মনস্তত্ত্বভিত্তিক উপন্যাসের ধারা।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সময়ে নতুন নতুন ঔপন্যাসিকেরা যে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস ধারার সৃষ্টি করলেন তা প্রেমচাঁদের উপন্যাসের মনোবিশ্লেষণ থেকে ভিন্ন। এই নতুন ধারায় যে উপন্যাসগুলি হিন্দীতে রচিত হল তার মূলে পাশ্চাত্য জগতে মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে যে নব নব বিশ্লেষণ রীতি উপস্থাপিত হয়েছিল তারই প্রভাব স্পষ্ট। সেই জন্যই এই সব উপন্যাসে অচেতন মনের পরিচয়েরই প্রাধান্য, চেতন মনের প্রাধান্য নয়।

প্রসঙ্গত বলা চলে, সামাজিক উপন্যাসের যে রূপ প্রেমচাঁদ এঁকেছিলেন, এই সময়কার ঔপন্যাসিকদের সৃষ্ট সামাজিক উপন্যাসের রূপ তা থেকে ভিন্ন, কেননা প্রেমচাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এঁদের উপন্যাসে এঁরা নির্মমভাবে সমাজের নানান অসংগতি ও বৈষম্যের চিত্র উদ্ঘাটন করলেন। প্রেমচাঁদ-যুগে সাহিত্যে কিছুটা যে আধ্যাত্মিক স্বপ্নালুতা ছিল, তা ক্রমে ক্রমে ভাঙতে শুরু করে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তা সম্পূর্ণ ভাবেই বিধ্বস্ত হয়। তার ফলে এই সময়কার সাহিত্যিকেরা বাস্তবতার কঠিন স্তরের ওপর এসে দাঁড়ায়। এই কালের সামাজিক উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই সময়কার সামাজিক উপন্যাসে অচেতন মনের বিশ্লেষণের প্রভাব পড়েছে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে এই সময়কার সামাজিক উপন্যাসগুলি পূর্ববর্তী সামাজিক উপন্যাসাবলী থেকে পৃথক।

এই যুগের আর একটি ধারার প্রসঙ্গ ওঠা স্বাভাবিক, সেটি হল -আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারা। এই আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে গণচেতনার পরিচয় আমরা পাই। প্রেমচাঁদ-যুগে গণ-চেতনার পরিচয় ছিল বটে কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে রূপায়িত গণচেতনার মত তা এত সুসংহত নয়, কারণ আঞ্চলিক উপন্যাসে একটি সুনির্দিষ্ট পরিধির মধ্যেই ফুটে ওঠে কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, শিল্প নৈপুণ্য, তাই এই জাতীয় উপন্যাসে আমরা পেয়ে যাই ক্রান্তিকারী নবীনতা। আঞ্চলিক উপন্যাসেই আমরা গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার সঠিক পরিচয় প্রকাশিত হতে দেখি।

প্রেমচাঁদ যুগে ঔপন্যাসিক জয়শঙ্কর প্রসাদের 'ইরাবতী', বৃন্দাবনলাল বর্মার 'গড়কুণ্ডার' প্রভৃতি উপন্যাস লেখা হয়েছিল। তবে লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রেমচাঁদ-উত্তর যুগে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। এই ইতিহাসের কঙ্কালে রক্তমাংসের সজীবতা দিয়ে ঔপন্যাসিকরা জীবনের এক জীবন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন যার মধ্যে আছে চিরন্তন মানবিক মূল্য ও হৃদয়ভাবনার নানামুখী পরিচয়। কিছু কিছু ঔপন্যাসিক বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীত ইতিহাসকে নবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই ভাবেই আমরা প্রেমচাঁদ-উত্তর যুগে উপন্যাসের চার ধরণের ধারা প্রবাহিত হতে দেখি।

এক ॥ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস ;
দুই ॥ সমাজবাদী ও সামাজিক উপন্যাস ;
তিন ॥ ঐতিহাসিক উপন্যাস ; এবং
চার ॥ আঞ্চলিক উপন্যাস।

এখানে বিভিন্ন বিভাগগুলির বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপিত হল ।

॥ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস ॥

মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাসের মূলচিন্তা অন্তর্মনের উদ্ঘাটন, যে অন্তর্মন সামাজিক পরিবেশ কিংবা অন্য কোন প্রভাবেই পরিবর্তিত হয় না। এই জাতীয় উপন্যাসে অন্তর্মনের বাসনাগুলির অভিব্যক্তি ঘটে। এই অচেতন মন আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের কার্যাদি ও আমাদের নৈতিক আচার-আচরণের নির্মাতা ও নিয়ন্তা। আমাদের ব্যক্তিত্ব হিমশৈলীর মত যার একটুখানি অংশ মাত্রই ভাসমান দেখা যায়, বেশীর ভাগ অংশই থাকে নিমজ্জিত, যা থাকে দৃষ্টির বাইরে। এই অচেতন মনকে ফ্রয়েড যৌন-কামনা রূপে, এডলার হীনমন্যতার জটিল গ্রন্থী রূপে এবং ইয়ুং জীবনের ইচ্ছা রূপে চিহ্নিত করেছেন। মনোবিশ্লেষণের এই ধারা সাহিত্য সৃষ্টিকে বহুদূরে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। এই মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি সাহিত্যের সৃজনশীলতা ও বিচার বিবেচনাকে অনেকখানি প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে। আমাদের যে সমস্ত মূল্যবোধ বহুদিন ধরে যথার্থ জীবনস্তরে বিদ্যমান আছে, সেইগুলিকে নতুনভাবে পর্যালোচনা করার পথে শুধু অগ্রসর করে দেয় না, এই সঙ্গে নতুন জীবনসত্য ও মূল্যবোধ সন্ধানের পথ নির্ধারণে আমাদের ব্রতী করে। মানব চরিত্রের যে রূপরেখা আমরা বাস্তব বলে মেনে নিয়েছি, সেগুলিকে খণ্ডিত করে এর মধ্য থেকে নগ্ন বাস্তবতাকে উদ্ঘাটিত করাই এই জাতীয় রীতির বৈশিষ্ট্য। মনোবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্ব ও তথ্যাদি প্রয়োগের ফলে চরিত্র সম্পর্কে যাবতীয় পূর্ব ধারণাবলীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন এসেছে এবং এটি নির্ধারিত হয়েছে যে মানুষের চরিত্র ও চেতনা মন দ্বারা নির্মিত নয়, নির্মিত ও সঞ্চালিত হয় অবচেতন মনের দ্বারা। মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাসের স্রষ্টারা মানবমনের অতল গভীরে নিহিত বাসনা তথা জটিল গ্রন্থীর কুহেলিকার আবরণে পাঠক মনকে আবিষ্ট করে রাখেন এবং হৃদয়ভাবনা ও চরিত্রের বাস্তব পরিচিতির মূল্যায়ন করেন।

মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাসের এই প্রবণতা উপন্যাসের আস্বাদনে পরিবর্তন আনে। সাধারণতঃ উপন্যাসকারেরা সব কিছু সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং তারই বর্ণনা করেন। ঔপন্যাসিক নিজের হৃদয় বাতায়ন থেকে যা কিছু নিরীক্ষণ করেন তাই ব্যক্ত করেন। কবিরা যেমন তাঁদের কাব্যে রূপকল্প ও প্রতীকধর্মিতা সৃষ্টি করেন, মনোবৈজ্ঞানিক ঔপন্যাসিকেরাও তেমনি তাঁদের উপন্যাসে এই রূপ রূপকল্প ও প্রতীকধর্মিতার প্রয়োগ করেন। যে সব পাঠক এই জাতীয় কাব্যপাঠের মাধ্যমে রসাস্বাদনের অধিকারী তারাই সাধারণতঃ এই জাতীয় উপন্যাসের আগ্রহী পাঠক। মনোস্তাত্ত্বিক উপন্যাস পাঠ করলে লক্ষ্য করা যায় যে তার মধ্যে ঘটনাদির কোন সময়ক্রম

বজায় থাকে না ; থাকে শুধু মানুষের মনের প্রতিমুহূর্তের অনুভূতির অভিব্যক্তি, যা পাঠককে আনন্দে আপ্লুত করে তোলে ; যে আনন্দ শুধুমাত্র কাব্যপাঠেই লভ্য। হিন্দী সাহিত্যে মনোবৈজ্ঞানিক ঔপন্যাসিক রূপে জৈনেন্দ্রকুমার, ইলাচন্দ্র যোশী, অজ্ঞেয় এবং ডঃ দেবরাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঔপন্যাসিক জৈনেন্দ্রকুমারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি হিন্দী উপন্যাসের শুধু নতুন দিক নির্দেশই করেননি, উপরন্তু তিনি হিন্দী উপন্যাসকে প্রেমচাঁদের প্রভাব থেকে মুক্তও করেছেন। প্রেমচাঁদের প্রসঙ্গালোচনায় জৈনেন্দ্রকুমারের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে এ সত্য স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর উপন্যাসে নতুনত্ব পরিস্ফুট হয়েছিল। প্রেমচাঁদ সমাজের মাটিতেই চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। জৈনেন্দ্রের উপন্যাসে কথাবস্তু সামান্যই, কিন্তু তিনি ব্যক্তিচরিত্রগুলির মানস-মন্থনেই বেশী আগ্রহী। তাই তাঁর উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা নেই, আকস্মিকতা নেই, কৌতূহল সৃষ্টির চতুরতা নেই। আছে শুধু সহজ, সরল ভঙ্গিতে প্রবাহিত হতে থাকা উত্থান-পতনবিহীন কাহিনীরধারা। এই ভাবেই তাঁর উপন্যাসে ঘটনার স্থূলত্ব, বহুলত্ব, বৈচিত্র্যের পরিবর্তে আছে সূক্ষ্মতা ও স্বল্পতা। তিনি সমাজ জীবনের সংঘর্ষ চিত্রিত না করে ব্যক্তিমনের সংঘর্ষকেই চিত্রিত করেছেন। এইভাবে প্রেমচাঁদের উপন্যাসে বর্ণনাত্মক রূপে যেখানে দেখা দেয়, সেখানে জৈনেন্দ্রের উপন্যাসে দেখা দেয় প্রতীকাত্মক রূপে।

যদিও জৈনেন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ছিল 'পরখ' কিন্তু 'সুনীতা'র (১৯৩৬) মাধ্যমেই এই ঔপন্যাসিকের মনোবিশ্লেষণের শক্তির পরিচয় প্রকাশিত হয়। এটিকে এঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে। এরপর উনি 'ত্যাগপত্র', 'জয়বর্ধন', 'কল্যাণী', 'মুক্তিবোধ' ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেন। জৈনেন্দ্র ব্যক্তিমনের গভীরে প্রবেশ করে তাঁর অন্তর্মনের যে সংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষে পরিব্যাপ্ত মনকে এক নিশ্চিত দিগন্তে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উপন্যাস 'সুনীতা'কে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত বলেই অনেকে মনে করেন।

ইলাচন্দ্র যোশীকে কথাবিন্যাসের দৃষ্টিতে সামাজিক উপন্যাসের ধারায় এক অন্যতম স্রষ্টা রূপে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর আস্থা ছিল সমাজবাদে। উনি একদিকে ব্যক্তিমনের সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন, অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণীর মানুষের অহংকারকে আঘাত করেছেন। উনি তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রকে সমাজের উপেক্ষিত ও অভাবগ্রস্ত শোষিত জনজীবন থেকেই নির্বাচন করেছেন। যোশীজী মার্কস্‌বাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যে যেমন এই ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মার্কস্‌বাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে তিনি বৈজ্ঞানিকের মত অন্তর্মনের বিশ্লেষণ করেই থেমে যাননি, বরং তিনি এই অন্তর্মনের সংঘর্ষের নেপথ্যে যে সামাজিক কারণাবলী আছে, তাদেরই আঘাত করেছেন। অভিজাত-বর্গের সংস্কার ও অহংকার যা ছিল মূলতঃ সমাজবিরোধীই এবং যা লোক-জীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধাস্বরূপ ছিল, সেগুলিকেই তিনি

তাঁর উপন্যাসে অনাবৃত করে দেখাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলি যেমন 'সন্ন্যাসী', 'পর্দে কী রাণী', 'নির্বাসিতা', 'জিপসী', 'জাহাজ কা পঞ্ছী', 'মুক্তিপথ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হিন্দী সাহিত্যে মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাসের প্রৌঢ় রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎসায়ন 'অজ্ঞেয়'-এর নাম উল্লেখ্য। এঁর উপন্যাসগুলি সর্বত্রই সৃজনাত্মক চেতনায় সমৃদ্ধ। উনি ওঁর চরিত্রাবলীর অন্তর্মনের সত্যকে বিশ্লেষিত করার সময় মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু জীবনের অনুভূতিগুলি জীবন থেকেই নিয়েছেন, মনোবৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী থেকে নয়। জীবনের অনুভূতি বিশ্লেষণ করেছেন তিনি মনোবিজ্ঞানের আলোকে, অথচ এই অনুভূতিগুলির আহরণ করেছেন জীবনের মধ্যে দারুণ ভাবে বেঁচে থেকে। এই অনুভূতিতে আছে সত্য, আছে তীব্রতা, আছে সূক্ষ্মতা। এইভাবেই তিনি মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে শুধু সিদ্ধান্ত হিসেবেই গ্রহণ করেন নি, করেছেন তার আলোক। এই আলোতে বেঁচে থাকা মানুষগুলির অনুভূতি, মনস্তত্ত্ব, চেতন-অচেতনের সম্পর্কিত সত্য ও জীবনদ্বন্দ্ব এবং এসবের দ্বারা পরিচালিত মানুষের আচার-ব্যবহারের—এক কথায় বাস্তব জীবনের গভীরতায় প্রবেশ করে তিনি তাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। ওঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'শেখর : এক জীবনী' (১ম ও ২য় খণ্ড : ১৯৪১ ও ১৯৪৪), 'নদীকে দ্বীপ' তথা 'আপনে আপনে অজনবী'।

ডঃ দেবরাজও মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস লিখেছেন। ওঁর দর্শন ও সাহিত্য—দুটি ক্ষেত্রেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং সেই জন্যই তাঁর সৃজনাত্মক সৃষ্টিগুলি তত্ত্বভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়ায় সৃজনশীলতা ও সূক্ষ্ম সংবেদনা আহত হয়েছে। যদিও উনি সেই সময়কার নানান প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি স্বাভাবিকতা, সহজতা ও রচনাত্মক সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ওঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'অজয় কী ডায়েরি', 'পথ কী খোজ' ও 'বাহর ভীতর' উল্লেখ্য।

॥ সমাজবাদী ও সামাজিক উপন্যাস ॥

প্রেমচাঁদ পরবর্তী যুগেও সামাজিক উপন্যাসের ধারাটা অব্যাহত ছিল, সেই সব উপন্যাসের লক্ষ্য হল সামাজিক জীবনের সত্যরূপ চিত্রণ। ব্যক্তি সামাজিক জীবনের প্রবাহেই প্রবাহিত। এই ব্যক্তি জীবনের স্বত্ব মধ্যে আছে গতিশীলতা। এই জীবন নদীর দ্বীপের মত এক জায়গায় স্থিত নয়, তা সমাজের এক জীবন্ত একক। এইভাবেই সামাজিক উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ দুইই পরস্পব পরস্পরকে অবলম্বন করেই এক সুন্দর সমন্বয় সৃষ্টি ক'রে।

সমাজ-কেন্দ্রিক উপন্যাসের দুটি দিক। একটি সামাজিক উপন্যাস অন্যটি সমাজবাদী উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাসে সামাজিক চিত্রই অঙ্কিত কিন্তু সমাজবাদী উপন্যাসে একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, যার মধ্যে লেখক মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেন। লেখকদের ভাবনানুযায়ী মনীষী মার্কস্ সামাজিক সত্যের যে

বিশ্লেষণ করেছেন, সেই দৃষ্টিকে গ্রহণ করেই এই সব ঔপন্যাসিক সমাজের বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁদের ধারণা—এইভাবেই সমাজ প্রকৃত প্রগতির পথে অগ্রসর হবে। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সামাজিক উপন্যাসগুলিকে প্রগতিবাদী বা প্রগতিশীল সাহিত্য বলা হয়। বস্তুত মার্কসবাদী দৃষ্টি সমাজের ওপর তলায় উপস্থিত প্রকৃত ভ্রান্তিগুলিতে বিভ্রান্ত না হয়ে সমাজের গভীরে যে মৌলিক সত্য নিহিত আছে তারই অন্বেষণ করে। এখানে 'মৌলিক সত্য' কথাটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রত্যেক যুগেই দুটি শক্তির দ্বন্দ্ব চলতে থাকে—মরণোন্মুখ প্রাচীন শক্তি ও নবোদ্ভূত জীবনশক্তি। সামাজিক স্তরে এই পুরোনো শক্তির মধ্যে শোষকদের বাস আর নবীন শক্তির মধ্যে শোষিতের বাস। এরাই সব গরীব কৃষক, মজুর ও পরিশ্রমজীবী মানুষ। নবীন জীবনশক্তি পুরোনো শক্তিকে বিনষ্ট করে জনমঙ্গলকারী নতুন সমাজ স্থাপনের প্রচেষ্টা করে। এই শক্তি ব্যক্তি মানুষের নয় সমাজের—যার মধ্যে অভাব ও তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে আছে জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা। নবীন সামাজিক মানবতা পুরোনো জর্জরিত দানবীর শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ করতে থাকে। এইভাবেই এই সব সমাজবাদী উপন্যাসে এক বিপ্লবের ভাবনা নিহিত থাকে। এর মধ্যে সৌন্দর্যের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রথিত থাকে। এইসব ঔপন্যাসিক জনজীবনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলেন। এঁরা কখনোই অতীতের রোমান্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টির বিলাসিতায় আত্মগোপন করেন না। এঁদের কাছে তাই সংঘর্ষময় বর্তমান জীবনই সৌন্দর্যের আধার। এই সমাজবাদী ঔপন্যাসিকেরা সমাজের একটি পরিবেশকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, সেটা হল আর্থিক প্রসঙ্গ। এই ঔপন্যাসিকেরা নতুন মনোবিজ্ঞানের আলোকে তাঁদের সৃষ্টি সংঘর্ষশীল শোষিত মানবের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন।

এই সব সমাজবাদী উপন্যাসে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা'-র সৃষ্ট উপন্যাস 'বিল্লেসুর বকরিহা' (১৯৪৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে গ্রামের সমস্ত সংকীর্ণতা, অসহায়তার জীবন্ত পরিবেশে বিল্লেসুরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক একটি প্রতিবাদী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই উপন্যাসটি প্রগতিশীল এই অর্থে যে এখানে অভিজাত, সম্ভ্রান্ত জীবনের পরিবর্তে সামান্য লোক-জীবনই চিত্রিত হয়েছে। সমাজের বদ্ধমূল সংস্কারের ওপর আঘাত হানা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বিল্লেসুর জীবনের প্রয়োজনে ছাগল চড়ায় কিন্তু এই জীবিকা তার কাছে কোন-ভাবেই অমর্যাদার নয়। লোকে বিরোধিতা করলেও বিল্লেসুর একদিকে আপন অনুভূতি, অন্যদিকে সংঘর্ষশীলতার মাধ্যমে প্রমাণ করে যে কোন কাজই অমর্যাদার নয় বা উপেক্ষণীয় নয়। জাত-পাত-সমস্যামূলক এক বাহ্য কু-সংস্কার বলেই তা তার কাছে বিবেচিত হয়। সে জাতে ওঠার জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করে সব কিছুকেই চ্যালেঞ্জ জানাতে পিছপা হয় না। এইভাবেই চিত্রিত হয়েছে একটি জীবন্ত প্রতিবাদী চরিত্র। 'নিরালা'-র অন্যান্য উপন্যাস, যেমন—'অপ্সরা', 'অলকা', 'নিরুপমা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সমাজবাদী উপন্যাসে যশপালের এক বিশেষ স্থান আছে। ওঁর উপন্যাস—'দাদা কামরেড'-তে জনবাদী চেতনাকে মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার সফল প্রয়োগ হয়েছে। ওঁর অন্যান্য উপন্যাস 'মনুষ্যকে রূপ', 'ঝুটাসাচ', 'দেশদ্রোহী' 'পার্টি কামরেড', 'অমিতা' ইত্যাদি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের জীবনের যে সব অসংগতি, সমস্যাদি এবং সম্বন্ধের নানা দিক—সেগুলিকে উদ্ঘাটিত করার সুন্দর প্রয়াস করেছিলেন অমৃতলাল নাগর। উপন্যাস --'বুঁদ আউর সমুদ্র', 'মহাকাল', 'অমৃত আউর বিষ', 'নাচ্যো বহুত গোপাল' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখনীয়। এই ধারায় উপেন্দ্রনাথ অশ্ক-এর উপন্যাস 'গর্ম রাখ', 'গিরতী দীবারেঁ', 'শহর কা ঘুমতা আয়না', 'বড়ী বড়ী আঁখে', 'পথর অল পথর' প্রভৃতি উপন্যাস এই ঔপন্যাসিককে স্মরণীয় করে রেখেছে। বাবু ভগবতীচরণ বর্মার 'ভুলে বিসরে চিত্র', 'সবহিঁ নচাবত রাম গোঁসাই', 'টেরে মেরে রাস্তে', 'আখিরী দাঁও', 'সমর্থ আউর সীমা' প্রভৃতি নিঃসন্দেহে সফল সৃষ্টি। অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অটুট আস্থা অভিব্যক্ত করেছেন ধর্মবীর ভারতী তাঁর নিজের উপন্যাস 'সূরজ কা সাতমা ঘোড়া' এবং 'গুণাহোঁ কে দেবতা' তে। গঙ্গা মৈয়া, 'সতী মৈয়া কাচৌরা', 'মশাল' ইত্যাদি উপন্যাসে ভৈরবপ্রসাদ গুপ্ত সমাজের নানান অসংগতি ও হৃদয়হীন ঘটনাবলীর সার্থক উদ্ঘাটন করেছেন। মোহন রাকেশের বহু আলোচিত উপন্যাস হল– 'আঁধারে বন্দ কমরে'। এই ধারাতেই নরেশ মেহেতা-র উপন্যাস ইহ পথ বন্ধু থা,' 'ডুবতে মাস্তুল', 'ধুমকেতু' ; রাজেন্দ্র যাদবের 'উখড়ে হুয়ে লোকা 'সারা আকাশ', ; নির্মল বর্মার 'উযে দিন', 'লালটীন কী ছত', 'এক চিথরা সুখ' ; ভীষ্ম সহানীর 'তামস্, 'ঝড়োখে', 'বাসন্তী' : গিরিশ অস্থানার 'ধূপ ছাহ্‌ী বঙ্' ; জগদম্বাপ্রসাদ দীক্ষিতের 'মুরদা ঘর' ; মোহিত সিং-এর 'ইহ ভী নহ্‌ী', বিষ্ণু প্রভাকরের 'নিশিকান্ত' ; অমৃত রায়ের 'ধোঁয়া' প্রভৃতি উপন্যাস হিন্দী সাহিত্যের ভাণ্ডারকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।

।। ঐতিহাসিক উপন্যাস ।।

জীবন্ত সাহিত্য সব সময়েই নিজের যুগ ও সমাজ থেকে রস সংগ্রহ করে। কথাবস্তু পুরোণো হতে পারে অথবা নতুনও হতে পারে, কিন্তু জীবন্ত সাহিত্যে তার সংযোজন ঘটে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। অতীতের ইতিহাস থেকে সাহিত্যকার জীবনের সত্যকে খুঁজে ফেরেন এবং সেই সত্যকে এক নতুন রূপ প্রদান করে বর্তমান জীবনভূমির ওপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধুমাত্র নীরস ঘটনাবলীর বিবরণ নয়, বরং তা মানবের মূল্যবোধ ও জীবনকে নব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে। ইতিহাসের অন্ধকারে থাকা কোন ঐতিহাসিক পাত্রকে মানবমূল্যের প্রভায় প্রভাবিত করার জন্য ঔপন্যাসিক কিছু কাল্পনিক পাত্র-পাত্রীও সৃষ্টি করেন। এইভাবেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক ঐতিহাসিক পরিবেশে জীবনের মৌলিক প্রশ্নাবলী, মূল্যবোধ ও জীবনসৌন্দর্য চিত্রিত করেন, যাতে বর্তমান জীবনও তার পরিধির মধ্যে উপস্থাপিত হয়।

হিন্দীতে ঐতিহাসিক উপন্যাস উল্লেখ করার সময় জয়শঙ্কর প্রসাদের নামোল্লেখ অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'ইরাবতী' (১৯৩৭) প্রসাদের অসম্পূর্ণ উপন্যাস। অসম্পূর্ণ উপন্যাস সম্পর্কে কিছু বলা অসমীচীন কিন্তু যেটুকু পাওয়া গেছে তার সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় যে,—এই উপন্যাসে জীবনরসকে বিশুষ্ক করে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যবস্থা, তাঁর শূন্যগর্ভ অহিংসা-নীতি এবং ভোগবিলাসী রাজার জীবনের অব্যবস্থা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তৎকালীন সমাজ নিজস্ব রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক পরিবেশ নিয়ে সজীব হয়ে উঠেছিল। সমস্ত উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের মানবিক দৃষ্টি পরিব্যাপ্ত আছে।

হিন্দীতে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বৃন্দাবন লাল বর্মার নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। উনি মানবীয় কোমল প্রবৃত্তির সফল অঙ্কনে ঐতিহাসিক উপকরণের ব্যবহার করেছেন। ওঁর উপন্যাসের কথাবস্তুকে উনি এমন সুন্দর ভাবে গড়ে তুলেছেন যার মধ্যে মধ্যে ভারতের বুন্দেলখণ্ডের জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আছে এক স্বচ্ছন্দ জীবন-শক্তি স্পন্দন। শ্রীবর্মা রোমান্টিক ধারার লেখক। সেইজন্যেই তাঁর বর্ণনার মধ্যে আছে আবেগ সৃষ্টির ক্ষমতা এবং অদ্ভুত আকর্ষণ ও উন্মাদনার পরিচয়। এঁর উপন্যাসগুলি হল 'গড় কুণ্ডার', 'বিরাটা কী পদ্মিনী', 'কচনার', 'লক্ষ্মীবাঈ', 'মৃগনয়নী', 'ভূবনবিক্রম' ইত্যাদি।

ভগবতীচরণ বর্মার 'চিত্রলেখা' ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে রচিত। যদি এই উপন্যাসের কথাবস্তুকে চন্দ্রগুপ্তের সময় কালের পটভূমি থেকে সরিয়েও নেওয়া যায়, তবুও এই উপন্যাসের 'সৌন্দর্য' মোটেই ক্ষুণ্ণ হবে না। রাহুল সাংকৃত্যায়ন চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন—'সিংহসেনাপতি', 'মধুর স্বপ্ন' 'জয় যৌধেয়', 'বিস্মৃত যাত্রী'। এঁর উপন্যাসাবলীর সব চরিত্রগুলিতেই সজীবতা ও স্বাভাবিকতা বর্তমান। লেখকের মূল উদ্দেশ্য সেই যুগের পরিবেশ, জীবনচর্চা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার চিত্রাঙ্কণ করে তাকে নতুন যুগের সঙ্গে সমন্বিত করা। চতুর্সেন শাস্ত্রী 'বৈশালী কী নগর বধূ', বয়ং রক্ষাম্' ও 'সোমনাথ'—এই তিনটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন যেখানে ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এঁর নিষ্ঠার অভাব। কল্পনার সহায়তার ইনি নতুন পাত্রপাত্রী, নতুন ঘটনাবলী ও নতুন প্রসঙ্গ এনেছেন এবং পরিচিত পাত্রদের মধ্যেও একটা নতুন ভঙ্গিমা ও বাঁক এনেছেন। বাস্তবতার স্বার্থে ইনি উপন্যাসে অশ্লীলতাকেও প্রশ্রয় দিয়েছেন।

যশপালের 'দিব্যা' একটি সফল ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তিনি সমাজের গতি-প্রকৃতির সুন্দর ও সংহত চিত্র এঁকেছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু উপন্যাসকারের মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রস্তুত করা বিশ্লেষণ সকলকেই আকৃষ্ট করবে। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি ও জীবনমূল্যকে এমনভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যে সেই চিত্র আজকের সমাজের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ।

হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্টের আত্মকথা' এবং 'পুনর্নবা' সফল ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাংগে রাঘবের মুর্দো কা টীলা' একটি বহুপঠিত উপন্যাস। এর মধ্যে মহেঞ্জোদরোর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসই বিষয়বস্তু রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রস্তুত উপন্যাসে জনজীবনের শোষক সমাজ ব্যবস্থার এক সংঘর্ষের কথাবস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। এই লেখক চরিত্র সৃজনে তৎকালীন জীবনধারার প্রতি মনোযোগী তো ছিলেনই, তদুপরি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাঁর কিছু বিশ্লেষণও উল্লেখ্য। তাঁর সৃষ্ট পাবিবেশে আছে সজীবতা রচনাশৈলীর মধ্যে আছে গাম্ভীর্য এবং ভাষায় আছে কাব্যের ঝঙ্কার যা তাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। অমৃতলাল নাগরের 'শতরঞ্জ কী মোহরে' এবং 'মানস কা হংস' সফল ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইনি কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র ও কিছু কাল্পনিক চরিত্রের সহায়তায় তৎকালীন জীবন ও সমাজকে সজীব করে তুলেছেন যার মধ্যে তাঁর কৃতিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

॥ আঞ্চলিক উপন্যাস ॥

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাসের মত হিন্দী সাহিত্যেও কয়েকটি সুন্দর আঞ্চলিক উপন্যাস আছে। আঞ্চলিক উপন্যাসের নিজস্ব শিল্পরীতি বলতে বোঝায় কোন এক অঞ্চলের জীবনধারার সফল চিত্রণ। এই জীবনধারায় অভ্যস্ত মানুষগুলির যেমন আছে অন্তরের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তেমনি আছে সংবেদনা যে সংবেদনা অঞ্চলের সবাইকে একই সূত্রে আবদ্ধ করে। একটি অঞ্চল বিশেষের মাটি, সেই মাটিকে ঘিরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সেই মাটিতেই বসবাসকারী মানবজীবন, সেই মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের হৃদয় স্পন্দন ও সেই সব মানুষের জীবন সমস্যাদির কাবি, অভিব্যক্তি ঘটে আঞ্চলিক উপন্যাসে।

নাগার্জুনের উপন্যাস মূলতঃ আঞ্চলিক উপন্যাস—যার মূল সুর হল সমাজবাদী সুর। যেহেতু উনি উপন্যাসগুলির কথাবস্তু, চরিত্রাদি এক বিশেষ অঞ্চল থেকে গ্রহণ করেছেন, সেই হেতু এই উপন্যাসগুলিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে বাধা নেই; প্রাসঙ্গিক ভাবেই জানিয়ে রাখি নাগার্জুন প্রগতিশীল এক কবি-সাহিত্যিক। ইনি একটি বিশেষ অঞ্চলের পটভূমি থেকে কোন এক পাত্রকে নির্বাচন করেন এবং তাকে কেন্দ্র করেই এক সহজ সরল কাহিনী গড়ে তোলেন। আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে এখানে তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌ[illegible] পরিবেশ, স্থানীয় আচার আচরণ—এক কথায় জীবনরীতির পরিবেশকেই বোঝান হয়েছে। এঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল ঃ 'রতিনাথ কী চাচী', 'নঈ পৌধ', 'বাবা বটেশ্বরনাথ', 'বরুণ কে বেটে' প্রভৃতি।

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' একটি উপেক্ষিত অঞ্চলের জীবনের ছবিতে তার সুন্দর ও কুৎসিত রূপ; তার জীবনের সীমাবদ্ধতা, সেই সীমাবদ্ধ জীবনের অসহায়তা, মানবিক মায়া-মমতা ইত্যাদি সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এঁর রচিত 'ময়লা আঁচল' বাস্তব অর্থে শুধু অঞ্চল বিশেষেরই কথা নয়, বরং উনি ওঁর শক্তিশালী রচনাশৈলীর সাহায্যে কাহিনীবৃত্তকে এমন সুন্দরভাবে নিয়োজিত করেছেন যাতে সমস্ত অঞ্চল শুধু সজীবই

হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত অসৌন্দর্য, সেখানকার সৎ-অসৎ রূপ খুবই সূক্ষ্মতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে এঁর রচনা বিশেষ অঞ্চলের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশে জীবন্ত মানব সংবেদনা, মূল্যবোধের সংঘর্ষ এবং অন্তর্বিরোধে আবর্তিত শ্রেণী চেতনার কাহিনী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে বাঙালী ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফণীশ্বর নাথ 'রেণু' মূলতঃ সতীনাথের মতই পূর্ণিয়ার মানুষ এবং সাহিত্য জীবনে তিনি 'জাগরী' ও 'ঢোড়াই চরিত মানসের' অসাধারণ স্রষ্টা সতীনাথকেই 'সাহিত্য-গুরু' হিসেবেই বরণ করে নিয়েছিলেন, তাই তাঁর রচনায় সতীনাথের প্রভাব পড়েছে প্রায় অনিবার্যভাবেই।

এর দ্বিতীয় সফল উপন্যাস হল 'পরতী পরিকথা'। অনুভূতি-স্পন্দিত, আবেগময় ভাষায় উনি তাঁর উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারায় আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে হয়। এঁদের মধ্যে উদয়শংকর ভট্টের 'সাগর লহঁরে আউর মনুষ্য' রাংগে রাঘব', 'কব তক পুকারুঁ', দেবেন্দ্র সত্যার্থীর 'ব্রহ্মপুত্র'; শৈলেশ মতিয়ানীর 'হবলদার' এবং রাজেন অবস্থীর 'জঙ্গল কে ফুল' বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

'স্বল্প পরিসরে সুবিস্তৃত হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের রূপাঙ্কণ ও বিশ্লেষণ সুকঠিন ব্যাপার। তবুও এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি সুনির্দিষ্ট পরিচয় উদ্ঘাটনের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

কৃষ্ণচন্দ্র ভূয়াঁ

বাংলা ও ওড়িআ উপন্যাস ঃ তুলনার আলোকে

কয়েকজন সমালোচক অষ্টাদশ শতাব্দীর নীলাম্বর বিদ্যাধরের রচিত 'প্রস্তাব চিন্তামণি'কে প্রথম ওড়িআ উপন্যাসের সম্মান দেন। এই উপন্যাসটি তার কথাবস্তু অভিনব কথন-ভঙ্গি, স্বচ্ছন্দ সাবলীল সর্বজনবোধ্য ভাষার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত ওড়িআ উপন্যাসগুলি অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। ১৮৫২ সালে হানা ক্যাথারিন মুলেন্স রচিত বাংলা উপন্যাস 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রেভারেণ্ড জে স্টবিন্সের দ্বারা ওড়িআতে অনূদিত হয়ে ১৯৫৭ -৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। মুখ্যতঃ খ্রীস্টধর্ম প্রচারের অভিমুখ্য নিয়ে রচিত এই উপন্যাসকে প্রথম ওড়িআ উপন্যাস হিসেবে কয়েকজন উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি একটি অনূদিত উপন্যাস হওয়ায় প্রথম ওড়িআ উপন্যাস হিসেবে গ্রহণীয় নয়। বাংলা ভাষায় রচিত এই মৌলিক উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যতেও প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। এর ২৫ বছর পূর্বে বাংলায় রচিত হয়েছিল প্রমথনাথ শর্মা বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নব বাবু বিলাস' (১৮২৩), কেউ কেউ একে প্রথম বাংলা উপন্যাস বলেও দাবী করেন। কিন্তু তা বলার যথেষ্ট বাধা রয়েছে। পরবর্তী কালে প্রণীত সার্থক বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক প্রস্তুতি এতে লক্ষ্য করা যায় মাত্র। টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) কিছু দোষ দুর্বলতা সত্বেও প্রথম বাংলা উপন্যাসেব যোগ্যতা বহন করে। ব্যক্তিমনের প্রবণতা ও ক্রিয়াকলাপ থেকে শুরু করে আন্তর্ব্যক্তিক, আন্তঃসামাজিক সম্পর্ক, মনোবাস্তবতা ও সমাজ বাস্তবতা পর্যন্ত দৃষ্টান্ত-সকল এই উপন্যাসে স্পষ্টতঃ প্রস্ফুটিত।

রামশঙ্কর রায়ের 'সৌদামিনী' (১৮৭৮) কে কিছু সমালোচক প্রথম ওড়িআ উপন্যাস রূপে অভিহিত করার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু সমালোচক তাঁর 'বিবাসিনী' (১৮৯১ -কে প্রথম উপন্যাস বলে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু 'বিবাসিনী' রচিত হওয়ার পূর্বেই উমেশচন্দ্র সরকার 'পদ্মমালী' (১৮৮৮) উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বালেশ্বর সংবাদ বাহিকা ১৮৮৯-এর ২রা মে তারিখে লিখেছিলেন ঃ "প্রকৃত ঘটনা সম্বলিত কৌনসি উপন্যাস অবধি ওড়িআ ভাষারে প্রচারিত হোই ন থিলা। উমেশ বাবুঙ্ক এহি প্রথম উদ্যমটি বিশেষ প্রশংসনীয়। এই খণ্ডিকু ওড়িশার প্রথম Novel কহিলে অত্যুক্তি হেব নাহিঁ।" একথা উল্লেখ করলে ভুল হবে না যে 'সৌদামিনী', 'বিবাসিনী' ও 'পদ্মমালী' কিংবা বঙ্কিমেব পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির ভাষা অপেক্ষা 'প্রস্তাব চিন্তামণি'র ভাষা তুলনামূলক ভাবে অধিক আধুনিক ও স্বচ্ছন্দ। নীলগিরি ও পাঁচগড়ের ওপরে আক্রমণকে ভিত্তি করে ও কেওনঝর প্রজাবিদ্রোহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উমেশচন্দ্র রচনা করেছিলেন 'পদ্মমালী'। 'পদ্মমালী'-র ওপরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও ওয়াল্টর স্কটের প্রভাব পড়েছে বলে অনুমান করা যায়।

মরহট্টা সুবাদার শম্ভুজী গণেশের অত্যাচার, অপশাসন ও তদ্জনিত ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের চিত্র রামশঙ্করের 'বিবাসিনী' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। চিতোরের রাণী

পদ্মিনীকে পাবার জন্য আলাউদ্দিন খিলজীর চিতোর আক্রমণের কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে তিনি 'সৌদামিনী'তে জয়সিংহ ও সৌদামিনীর প্রেমকাহিনী বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যেভাবে অভিভাবকোচিত মনোভাব নিয়ে প্রেমদৃশ্যের বর্ণনা করেছেন, স্কট যেভাবে পিতৃসুলভ রীতিতে প্রেমদৃশ্য পরিস্ফুট করেছেন— উমেশচন্দ্র ঠিক সেইভাবে পরীক্ষিত ও পদ্মমালীর প্রেম প্রকাশ করেছেন। 'পদ্মমালী'-তে রোমান্সের কৌতূহল, আকস্মিকতা বা রহস্যের প্রাচুর্য্য নেই বা এতে স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয় না। উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা না করে পাঠকের মন স্পর্শ করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মত উমেশচন্দ্রও মাঝে মাঝে পরিহাস ও রোমাঞ্চিত ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনি সংস্কৃত ও প্রচলিত ভাষার মিশ্রণে উপন্যাস রচনা করলেও তাঁর ভাষা বিদ্যাসাগরীয় ভাষা দ্বারা বেশী প্রভাবিত বলে মনে করা হয়।

'পদ্মমালী' (১৮৮৮) রচিত হবার পূর্বে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭) ও রমেশ চন্দ্র দত্তের 'বঙ্গ বিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯), 'সংসার' (১৮৮৬) প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হয়েছিল।

ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম গল্প লেখক ফকিরমোহন সেনাপতি বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী ঔপন্যাসিক। সংখ্যার দিক থেকে উপন্যাস রচনায় ফকিরমোহন বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ নন। 'লছমা', 'ছমাণ আঠ গুণ্ঠ', 'মাঁমু' ও 'প্রায়শ্চিত' এই চারটি উপন্যাস তাঁর অমর কীর্তি। বর্গী অত্যাচার, নিষ্ঠুর নরহত্যা ও লুণ্ঠনের বাস্তবচিত্র 'লছমা'-তে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে 'লছমা'তে কল্পিত কাহিনী ও ইতিহাসের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনি এখানে রোমান্স সৃষ্টিই করতে পারেন নি। ফকিরমোহন ছিলেন বাস্তবের রূপকার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মত ফকির মোহনের 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' হল সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতি। কাহিনীতে সামঞ্জস্য না থাকলেও কতক স্থানের বর্ণনা, ভাষা প্রয়োগ, ও চরিত্র চিত্রণে এই দুই সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। গোবিন্দপুরের নগেন্দ্র দত্তের ঘর ও পরিবারের বর্ণনার সঙ্গে গোবিন্দপুরের রামচন্দ্র মঙ্গরাজের ঘর, পরিবার ও অসুর দীঘির বর্ণনায় সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। হরিদাসী বৈষ্ণবী (দেবেন্দ্র)-র রূপ বর্ণনার সঙ্গে টাঙ্গি মাউসী (চম্পা)-র রূপ বর্ণনার সম্পর্ক রয়েছে। ঠিক সেইভাবে দেবেন্দ্রর 'হীরা বন্দনা' ও 'বুড়ি মঙ্গলা'র (গ্রাম্য দেবী) মধ্যেও সম্পর্ক আছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাসে যেভাবে বিভিন্ন স্থানে ওড়িশার চিত্র প্রদান করেছেন, ফকিরমোহনও তাঁর 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' ও অন্যান্য উপন্যাসে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও প্রসঙ্গক্রমে বাংলার চিত্র প্রদান করেছেন। 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' ও অন্য উপন্যাসে

ফকির মোহন যে ভাবে বাস্তবতার পরিচয় দিয়ে মাটি ও মানুষের কথা প্রাঞ্জলভাবে বলতে পেরেছেন ও উপন্যাসের সমাপ্তিতে যে ভাবে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে সফলতা অর্জন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তাঁর উপন্যাসে ঠিক সেইভাবে পরিচয় দিতে পারেন নি। 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' উপন্যাসে চম্পা সারিআর মনেতে অন্ধ বিশ্বাস জন্মিয়ে প্রতারণার সাহায্যে সম্পত্তি হরণের যে দৃষ্টান্ত রয়েছে বাংলা উপন্যাসেও তার অভাব নেই। বাংলা 'রাজলক্ষ্মী' উপন্যাসে আত্মীয়-স্বজনরা এরকম পথের আশ্রয় নিয়ে ভবানী প্রসাদের জমি হরণ করেছেন। ফকির মোহনের 'লছমা' উপন্যাসের ওপর টডের 'রাজস্থানের ইতিহাস' বা বরদাকান্ত মিত্র কর্তৃক এর বঙ্গানুবাদ, অঘোরনাথের 'রাজস্থান' ও সেক্সপীয়রের 'As you like it'-এর প্রভাব পড়েছে বলে অনুমান করা যায়।

বঙ্কিম-সমসাময়িক রমেশচন্দ্র তাঁর চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রে পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'সংসার' ও 'সমাজ'-এ গ্রাম্য-জীবনের চিত্র পরিবেশনের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠতা প্রকাশ দেখেছে। পল্লী জীবনের দারিদ্র, শোষণ, এতে স্পষ্ট। ফকিরমোহনের পরে সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ধারা অব্যাহত থাকলেও রমেশচন্দ্রের মত গ্রাম্য-জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, শোষণ, দারিদ্র ও প্রতারণার নিখুঁত চিত্র প্রদান করে চিন্তামণি মহান্তি কয়েকটি স্বতন্ত্র স্বাদের উপন্যাস ওড়িআ সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর 'বুলা ফকির', 'রূপাচুড়ি', 'টঙ্কাগছ' 'শনিসংতা' প্রভৃতিতে শোষণ, শঠতা, অত্যাচার ও কুসংস্কারে জর্জরিত গ্রাম্যজীবন কি নিদারণভাবে গতি লাভ করছিল, তিনি তার এক এক সুন্দর চিত্র প্রদান করেছেন। এতে তাঁর সংস্কারবাদী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'টঙ্কাগছ' অধিকন্তু আসামের চা-বাগিচার শোষিত শ্রমিকের দুর্দশার চিত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিন্তামণি রমেশচন্দ্রের পরবর্তী ঔপন্যাসিক হওয়ার দরুণ ভিন্ন পরিবেশ, ঘটনা ও পারবর্তিত সমাজের চিত্র প্রদান করে সফলতা অর্জন করেছেন। একদা রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গ বিজেতা', 'মাধবীকঙ্কন', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' বঙ্গীয় পাঠক সমাজ দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল, অনুরূপে, জাতি প্রেম-মূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস পরবর্তী সময়ে ওড়িআ সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছিল। রামচন্দ্র আচার্যের 'বীর ওড়িআ', 'কমলকুমারী', 'পদ্মিনী', 'বীরাঙ্গনা' ও 'পীযূষ প্রবাহ' এই প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য। 'বীর ওড়িআ'তে ওড়িআ জাতির অতীত গৌরব-গাথা লিপিবদ্ধ হলেও এই উপন্যাস ওড়িশা, বাংলা ও বিহারের পৃষ্ঠভূমির উপর রচিত। ১৯২১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'কমলকুমারী'তে নায়িকা কমলকুমারী নায়ক রাণা রাজসিংহের চরিত্র চিত্রণে লেখকের সফলতা লক্ষণীয়। আওরঙ্গজেবের সময়ে নির্যাতিত হিন্দু ও রাজপুতদের কথা এতে স্থান পেয়েছে। ১৯২৯ সালে রচিত 'পদ্মিনী' ভীমসিংহের পত্নী ও আলাউদ্দীন খিলজীকে কেন্দ্র করে রচিত। 'পদ্মিনী' উপন্যাসের শৈলী ও বিষয়বস্তু সংযোজনায় নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তথাপি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে 'পদ্মিনী'র স্থান নগন্য নয়। রাজপুতানার ইতিহাসকে আশ্রয় করে তিনি যেভাবে 'পদ্মিনী' ও 'কমলকুমারী' রচনা

করেছেন ঠিক সেইভাবে মহারাষ্ট্রের ইতিহাসকে আশ্রয় করে 'বীরঙ্গনা' রচনা করেছেন। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত,-এর প্রভাব এতে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর 'পীযূষ প্রবাহ' ভিক্টর হুগোর 'লা মিজেরেবল'-র অনুকরণে লিখিত।

চিন্তামণিব পূর্ববর্তী ও ফকির মোহনের সমসাময়িক ঔপন্যাসিক গোপাল বল্লভ দাসের 'ভীমাভূয়াঁ' হল সর্বপ্রথম আদিবাসী জীবন সম্বলিত উপন্যাস। ১৮৯৮ সালে রচিত ও ১৯০৮ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাস জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত গোপীনাথ মহান্তির মত লেখককে 'অমৃতর সন্তান', 'পরজা' ও 'হরিজন' প্রভৃতি উপন্যাসগুলির রচনার ক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে। গাম্ভীর্য, মননশীলতা, নূতনত্ব, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় চেতনাবোধ, অনুভূতির গভীরতা ও প্রাণ প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ 'ভীমাভূয়াঁ, ওড়িআ সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। উপন্যাসের নায়ক আদিবাসী পরিবারের ভীমা, কণা, চিনামালী ও জেমা প্রভৃতি চরিত্র উপন্যাস জগতে বিরল। সেইসময়ে বাংলা ও প্রতিবেশী সাহিত্যে এই ধরণের কোন উপন্যাস দেখতে পাওয়া যায় না কিংবা লেখার জন্য কোন উদ্যমও হয় নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা উপন্যাসেব ক্ষেত্রে মিশ্র প্রবণতার ধাবা পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এব সূত্রধর। তারকনাথ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজের অভাব অনটনের রূঢ় বাস্তব চিত্র লিপিবদ্ধ কবে বিদুভূষণ ও সরলা চরিত্রের মধ্যে যে মর্মান্তিক ঘটনার অবতারণা কবেছেন তা এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। অনুরূপ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সময়ে ওড়িআ উপন্যাস জগতে রচনার জন্য এমন উদ্যম না হলেও পরবর্তী সময় আর্থিক অনটন, পীড়ন ও বেদনার জ্বলন্ত চিত্র কুন্তলাকুমারী সাবতের 'রঘু অরক্ষিত, রামপ্রসাদ সিংহের 'হোম শিখা', 'রক্তরেখা' ও কাহ্নুচরণ মহান্তির 'হা অন্ন'-তে প্রতিপাদিত হযেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা উপন্যাসের গতি অন্য দিকে মোড় নেয়। এর পথিকৃত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কেবল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের প্রবর্তক ছিলেন না, উপন্যাসের বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার সূত্রধরও ছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের এই ধারা প্রবর্তন ওড়িআ পাঠকগণ আরও দুই দশক পরে দেখতে পান। 'চোখের বালি' (১৯০২)-তে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী এবং তার সঙ্গে মহেন্দ্র ও বিহারীর সম্পর্কের যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক জটিলতা ব্যক্ত করেছেন তা বাস্তবে প্রশংসার দাবী রাখে। এই মনস্তাত্ত্বিক রীতির ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাহিরে' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাসগুলিতে। তার সৃষ্টিতে প্রকাশিত মার্জিত ভাব, বুদ্ধির চাকচিক্য, শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র—ঊনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক বুর্জোয়া সংস্কারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ফকির-মোহন ও গোপাল বল্লভের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনা বিন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাওয়া গেলেও কতকাংশে রবীন্দ্রনাথের মত কুন্তলাকুমারী সাবত (১৯০০-৩৮ খ্রীঃ)-এর উপন্যাস বিশেষতঃ তাঁর 'পরশমণি' ও 'রঘু অরক্ষিত'-তে চরিত্রচিত্রণে অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানসিক সংঘর্ষ ও শহরের উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, সংস্কারবাদী ব্যাক্তিদের আদর্শ ও

কর্তব্য নিষ্ঠার সুন্দর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সফলতার তুলনায় কুন্তলা-কুমারী নগন্য হলেও ওড়িআ উপন্যাসের গতি তিনিই বদলে দেন। বৈষ্ণবচরণ দাস ও উপেন্দ্রকিশোর দাসের 'মনে মনে' ও 'মলাজহ্' যথাক্রমে দুটি সফল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। 'মনে মনে' ১৯২৫) ওড়িআ উপন্যাস জগতে এক নতুন শৈলী, আঙ্গিক, পরিবেশ ও চিন্তাধারার বার্তাবহ। নীলু ও কনকের প্রেমকে ভিত্তি করে বিষয়বস্তু বিকশিত। স্নেহ, প্রেম, প্রণয় আসক্তিকে আধার করে নায়ক, নায়িকা তথা রঙ্গী, নিধি প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালা ফুটে উঠেছে। স্তরে স্তরে মানসিক দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়া প্রক্রিয়ার প্রতিফলন বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'মনে মনে' উপন্যাসের দুবছর পরে রচিত 'মলাজহ্ শৈলী ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিপ্লব সৃষ্টি করে বাস্তব মানবতাকে স্থান দেবার ক্ষেত্রে দুরন্ত প্রচেষ্টাব স্বাক্ষর বহন করে। 'মনে মনে'-র নায়িকার মত 'মলাজহ্'-র নায়িকা সত্যভামা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সত্যভামার করুণ পরিণতি অধিক মননশীল ও হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-উপন্যাসেব মনস্তাত্ত্বিকরীতি দ্বাবা প্রভাবিত হলেও তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত গ্রাম্য পরিবেশ ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বঙ্কিমের গ্রাম্যপরিবেশ থেকে ভিন্ন। কাহিনী সৃষ্টি ও চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে কিছু ওড়িআ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। গোপনাথ মহাণ্ডির অগ্রজ কাহ্নুচরণের বৈশিষ্ট্য শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে প্রায় সমান। তাঁর 'শাস্তি', 'কা' আদি উপন্যাস শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ও 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি উপন্যাসেব সমগোত্রীয়। কাহ্নুচরণকে ওড়িশার শরৎচন্দ্র বললে অত্যুক্তি হবে না। কাহ্নুচরণের 'হা অন্ন', 'তুন্ত বাইদ', 'শাস্তি', 'বজ্রবাহু' ও শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ', 'দেনা পাওনা', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি যথার্থই নাট্যরস সৃষ্টিকারী উপন্যাস। কাহ্নুচরণেব 'পলাতক', 'নিষ্পত্তি', 'ওলট-পালট' ও শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি', 'বিরাজ বৌ', 'পরিণিতা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে ⸱ ক্ষিপ্ত বিবরণীর মধ্যে উভয় স্রষ্টার ভাব ও দর্শন স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। উভয়েরই দৃশ্যে বিন্যাস ও গৌণকাহিনী হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন চিত্র পরিবেশনে তাঁদের সব্যসাচীত্ব প্রমাণিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য উভয় স্রষ্টার সৃষ্টিতে সমান ভাবে স্থান পেয়েছে। চরিত্রগুলিব ভাবনা ও ভাব প্রবণতার পরিপ্রকাশই উপন্যাসের ঘটনা ও বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। চরিত্রগুলির আত্মবিশ্লেষণ ও জীবন নিরীক্ষণের মাধ্যমে উভয়ের উপন্যাস হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। উভয়ের সৃষ্টির মধ্যে স্ব স্ব সাংস্কৃতিক জীবনধারা পরিস্ফুট হয়েছে। সনিআ, অমীয়, মধুসূদন, নরেন, [illegible] সব্যসাচী প্রভৃতি চরিত্রতে সমানভাবে আদর্শ প্রকটিত হয়েছে। কলা-সচেতন উভয় শিল্পীর সৃষ্টি রাশিতে সমান্তরাল আবার বিপরীতধর্মী চরিত্রগুলির বিকাশ ও পরিণতি সমানভাবে মূল্যবোধ বহন করে। শরৎচন্দ্র ও কাহ্নুচরণের দৃষ্টিকোণ জড়তা ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখা সদৃশ। শরৎচন্দ্র জীবনসচেতন শিল্পী হওয়াতে জীবনের জন্য কলা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কাহ্নুচরণ কলাসচেতন ও জীবনসচেতন হওয়ায় তাঁর তিরিশের অধিক উপন্যাসগুলিতে কলার জন্য কলা ও জীবনের জন্য কলা সৃষ্টি করেছেন।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ওড়িআ উপন্যাসের গতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশবিপ্লব ও বিশ্ব রাজনীতিতে পরিবর্তনের ঘটনারাশি ওড়িআ উপন্যাস স্রষ্টাদের যেভাবে প্রভাবিত করেছে ঠিক সেইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইংরেজ অপশাসন, শোষণ, প্রজাপীড়ন, লবণ সত্যাগ্রহ, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাবলীও উপন্যাস শিল্পীদের প্রভাবিত করে। বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকরাও এই প্রভাবে পুষ্ট। অধিকন্তু, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বদেশী আন্দোলন আদি ঘটনাবলী বাংলা উপন্যাসকে যেভাবে কতকাংশে প্রভাবিত করেছে সেইভাবে উৎকল সম্মিলনী, বিচ্ছিনাঞ্চল মিশ্রণ আন্দোলন, গড়জাত আন্দোলন ও প্রজা আন্দোলন প্রভৃতিও ওড়িআ উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে।

ওড়িআ উপন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ে 'সৌদামিনী' (১৮৭৮), 'অনাথিনী' (১৮৮৫), 'পদ্মমালী' (১৮৮৮), 'বিবাসিনী' (১৮৯১), 'উন্মাদিনী' (১৮৯২), 'ভীমাভূয়াঁ' ১৮৯৮) প্রভৃতি ছিল মূলতঃ রোমন্সধর্মী। ফকিরমোহন উপন্যাসের এই ধারা প্রবর্তন করে মাটির মানুষের দুঃখ বেদনার চিত্র অংকন করেছেন। এই ধাবার পৃষ্ঠপোষকতা করে রাজনৈতিক সমাজ-ভিত্তি ও সংস্কারবাদী সমাজ-ভিত্তির ওপরে উপন্যাস লেখকগণ ১৯২০ সাল থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত কলম চালিয়েছেন। চিন্তামণি মহান্তির 'যুগল মঠ' (১৯২০), 'রূপাচুড়ি', 'টঙ্কাগছ', (১৯২৪) তে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চিত্র ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'যুগল মঠ'-এ ব্যভিচাব, পাপবোধ, 'রূপচুড়ি' ও 'টঙ্কাগছ'-তে শোষণ ও ঠকানোর করুণ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কুন্তলাকুমারী সাবতের 'নঅতুন্ডী (১৯২৫) জাতীয়তাবোধের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন। তাঁর 'কালীবোহু' (১৯২৩-২৪) তে তিনি নায়ক কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিপাঠীকে কেন্দ্র করে সমাজ সংস্কার, জাতিভেদ দূরীকরণ, মানবপ্রীতি সংস্থাপন, নারীজাতির উন্নতি ও গান্ধীবাদের আদর্শ ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর 'রঘু অরক্ষিত' (১৯২৮)তেও উদ্ভাসিত। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বর উত্তোলনের জন্য নন্দকিশোর বলের 'কনকলতা' (১৯২৫)-র অবদানও সামান্য নয়। সমাজ জীবনের জাগ্রত রূপকার কুন্তলাকুমারীর উপন্যাসে অচ্যুত মিশ্র, চন্দ্রশেখর চৌধুরী, দিবাকর মিশ্র প্রভৃতি জমিদার চরিত্রগুলিতে ধর্মের নামাবলীর মধ্যে নীতি-হীনতা, সাধু পোশাকের নীচে খলবুদ্ধি, নামজপের পেছনে খাতকের সুদ হিসাবের চিত্র এঁকে এক একটি বিড়াল তপস্বী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে কুন্তলা কুমারীর যোগাযোগ ছিল। সেই কারণে তাঁর 'রঘু অরক্ষিত' ও অন্যান্য উপন্যাসে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গীয় চলন ও রীতি প্রবেশ করেছে।

স্রষ্টা লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্রের অকালমৃত্যুর জন্য 'কণামামুঁ' (১৯৩৭) অসমাপ্ত থেকে গেছে। ওড়িশার রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে 'কণামামুঁ'-র মত এক আগ্নেয় পুরুষকে প্রথমবারের মত দেখার সুযোগ হয়েছিল। উগ্র স্বদেশচেতনা 'কণামামুঁ'-কে সশস্ত্র হবার প্রেরণা জুগিয়েছিল। গ্রাম্য পরিবেশকে নিয়ে রচিত কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর 'মাটির মণিষ' (১৯৩০) এক সফল সৃষ্টি। নায়ক বরজু প্রধান গ্রাম্য

বেদীর উপর দাঁড়িয়ে সার্বভৌমত্বের স্বপ্ন দেখেছে ও বিশ্ব-মানবতার চেতনা ও গান্ধী-বাদের ডাক দিয়েছে। গ্রামের সামগ্রিক বিকাশ ও ক্রমক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক জীবনে সংহতির জন্য নায়ক ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাঁর 'লুহার মণিষ' (১৯৪৬), 'মুক্তাগড়র ক্ষুধা', 'অমর চিতা', 'আজির মণিষ' প্রভৃতি উপন্যাস কালিন্দী প্রতিভার উজ্জ্বল স্মারকী।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, অন্নদাশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সরলা দেবী প্রমুখ 'সবুজ যুগের' লেখকগণ ছিলেন সংস্কারক, বিপ্লবী ও নূতন চেতনার দিগদর্শক। ননসেন্স ক্লাবের মেরুদণ্ডের ওপরে নিহিত সবুজ সাহিত্যের সৃষ্টি সম্পদ হল 'বাসন্তী' (১৯২৪-২৬)। অন্নদাশঙ্করের উদ্যমে ন'জন লেখক-লেখিকার দ্বারা রচিত 'বাসন্তী'তে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার বিরোধী স্বর ও ধর্মীয় সমন্বয়ের বার্তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের নায়িকা বাসন্তী ও নায়ক দেবব্রত হল সমন্বিত কৃতিত্বের সার্থক ফল। বাংলা ভাষায় রচিত বারোয়ারী উপন্যাসের ধারা দ্বারা এই লেখকগণ সম্ভবত প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'সবুজ সাহিত্য সমিতি দ্বারা প্রকাশিত 'বাসন্তী' উপন্যাসের সঙ্গে মুকুর উপন্যাসমালা, আনন্দ লহরী উপন্যাসমালার সৃষ্টিতে বহু খ্যাত ও অধুনা বিস্মৃত ঔপন্যাসিক অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুকুর উপন্যাস-মালায় কুন্তলাকুমারী, চিন্তামণি মহান্তি, চিন্তামণি আচার্য্য, দয়ানিধি মিশ্র, গোবিন্দ ত্রিপাঠী ও হরেকৃষ্ণ মহান্তি প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০খ্রীস্টাব্দের পরে আনন্দ লহরী উপন্যাসমালাতে সাতাশটি উপন্যাস স্থান পেয়েছিল। 'বাণী বিনোদ গ্রন্থমালা' ও 'ওড়িআ সাহিত্য প্রচার সঙ্ঘে'র আনুকূল্যে গোদাবরীশ মিশ্র, জনার্দ্দন মহান্তি ও হরি শরণ গিরির উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে যে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র অভ্যুদয় ঘটেছিল তার প্রভাবে ওড়িআ সাহিত্যে 'সবুজ গোষ্ঠী'র আবির্ভাব ঘটে বলে বলা হয়। 'কল্লোলে'র পূর্বে 'ভারতী' সাহিত্য পত্রিকা বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। 'ভারতী গোষ্ঠী'তে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসিক সঞ্জাত এই লেখকদের গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। 'কল্লোল', 'ভারতী'র এই মধ্যবিত্ত মানসিকতার উত্তরাধিকারী হলেও তা স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। ওড়িআ সাহিত্যে এই সময়ে যেসব ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের গ্রাম্য-জীবন ও নগরজীবনের সঙ্গে সমানভাবে পরিচয় ছিল। সেইজন্য তাঁদের উপন্যাসে মিশ্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকগণের লেখনী সর্বহারা ও নিম্নশ্রেণীর ব্যথা, বেদনা, অভাব, অনটনকে স্পর্শ করেছিল। এই সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে শোষিত, নির্যাতিত শ্রেণীর কথা শোনা যায়। ঠিক সেইভাবে ওড়িআ সাহিত্যে চিন্তামণি মহান্তি, রামপ্রসাদ সিংহ, কুন্তলা কুমারী, কালিন্দী চরণ, গোদাবরীশ মহাপাত্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে এর পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশগুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনীষ ঘটক প্রমুখ

'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকগণ অভ্যস্ত বিষয়বস্তুর মোহ ত্যাগ করে নূতনত্বের সন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাংলা ও ওড়িআ উভয় সাহিত্যে যে তরুণ লেখকগণ সর্বহারা, শোষিত, নির্যাতিত মানুষের জন্য এককালে কলম ধরেছিলেন, পরবর্তীকালে দেখা যায় যে তাঁদের লেখনী থেকে সেই কথা আর প্রায় নিঃসৃত হয়নি। মধ্যবিত্ত মানসিকতার অধিকারী লেখকগণ সর্বহারা গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করবার পরিণতি এই-ই হয়।

সত্যবাদীযুগের অন্যতম সার্থক সাহিত্য স্রষ্টা গোদাবরীশ মিশ্র একজন কবি হিসেবে পরিচিত হলেও নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক রূপে তাঁর অবদান স্মরণীয়। 'অভাগিনী', 'অধর সহ সতব', 'নির্বাসিত' উপন্যাসের মধ্যে শেষ দুইটি উপন্যাস ইংরেজী উপন্যাসের ছায়ায় লিখিত। ওড়িশার অতীত গৌরবকে উপন্যাসের মুখ্য উপাদান রূপে গ্রহণ করে তিনি জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার মর্মগাথা ব্যক্ত করেছেন। ঔপন্যাসিক হরেকৃষ্ণ মহতাব ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনীতিজ্ঞ। তার জীবনানুভূতির প্রাচুর্যে 'জীবন সমস্যা', 'শেষ অশ্রু', 'আত্মদান', 'প্রতিভা', 'টাউটর', 'অব্যাপার' প্রভৃতি উপন্যাস সমৃদ্ধ। মহতাবের উপন্যাস শৈলী উচ্চশ্রেণীর না হলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'প্রতিভা'-র প্রতিভা, নবীন, 'অব্যাপার'-এর লালমোহন, কুমুদিনী, দিব্য সিংহ ও 'টাউটর'-এর রামচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম, গড়জাত আন্দোলন, নারী শিক্ষার বিকাশ, গ্রাম সংগঠন, শোষণ দূরীকরণের বার্তা তিনি প্রচার করেছেন। 'অব্যাপার'-ই মহতাবী প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী', 'ঢোড়াই চরিত মানস'-এ জাতীয় আন্দোলনের পটভূমি বিদ্যমান। তাঁর 'চিত্রগুপ্তের খাতা', 'জাগরী' ও 'ঢোড়াই চরিত মানস'-এ যে শিল্প-কর্ম ও চরিত্রগুলির মধ্যে যে ঐক্যসাধন হয়েছে, তা মহতাবের উপন্যাসে নেই। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকায় রাজনৈতিক আন্দোলনের জীবন্ত চিত্র পরিবেশনের ক্ষেত্রে সতীনাথের অপেক্ষা মহতাব অধিক সফল হয়েছেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বঙ্গীয় জীবনধারা বিশেষতঃ কলকাতা শহরের জীবনযাত্রা, সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক পটভূমি বহু ওড়িআ ঔপন্যাসিককে আকৃষ্ট করেছে ও এই জীবন চিত্র তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে'। কলকাতা ওড়িশার প্রতিবেশী শহর ও এই শহরের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ছিল। মহতাবের 'অব্যাপার', অশ্বিনী কুমার ঘোষের 'চণাবালা', চন্দ্রশেখর পণ্ডার 'অশ্রুবিন্দু', প্রাণকৃষ্ণ সামলের 'হাতীকা দান্ত', 'নীলকমল' (১৯৩৯), ত্রিশঙ্কুর 'অবলা', বটকৃষ্ণ প্রহরাজের 'পূর্ণাহুতি', রাম প্রসাদ সিংহের 'রক্তরেখা', 'প্রতিহিংসা', গোবিন্দ ত্রিপাঠীর 'মায়াবী', লক্ষ্মীধর নায়কের 'উদ্‌ভ্রান্ত' (১৯৩৪), জ্ঞানীন্দ্র বর্মার 'শতাব্দীর স্বপ্নভঙ্গ', সচি রাউত রায়ের 'চিত্রগ্রীব' (১৯৩৬), চিন্তামণি মহান্তির 'বুঢ়াফকীর', নিত্যানন্দ মহাপাত্রের 'ঘরডিহ', কুন্তলা কুমারী ও কাহ্নুচরণের কয়েকটি উপন্যাসের কোথাও সীমিত ও কোথাও বিস্তৃতভাবে কলিকাতা শহর, পরিবেশ, জীবনচিত্র, তথা বঙ্গীয় জীবন সমস্যা বর্ণিত হয়েছে।

বাংলা উপন্যাস জগতে ইতিহাসের পরিবর্তনশীলতার প্রথম সচেতন শিল্পী হলেন তারাশঙ্কর, অথচ তিনি পুরাতনের অনুগামী। গতিশীলতাকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থিতিশীলতাকেও কামনা করেছেন। এই আন্তরিক দ্বন্দ্বে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিকশিত। তাঁর দৃষ্টিতে ও অনুভূতিতে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মূলসূত্র ধরা পড়েছে। বীরভূমের এক অঞ্চল বিশেষের পটভূমিতে ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বৃহত্তর গোষ্ঠী বা শ্রেণী থেকে তিনি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাননি। এই ইতিহাস সম্মত সংঘাতের তত্ত্বটিকে তিনি চমৎকারভাবে সাহিত্যিক মূল্য দিয়েছেন। সামূহিক চৈতন্যে তিনি মোহিত, তাই তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত, জমিদার, চাষী সকলে একব্রত ও ঐক্যে সমন্বিত। তাঁর একাধিক উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ও নব্য ধনীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রকটিত হয়েছে। এই আধুনিক প্রসঙ্গটি ভিন্নভাবে কালিন্দী, 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'অভিযান', 'আরোগ্য নিকেতন', 'সন্দীপন পাঠশালা' প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। যুগোচিত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তারাশঙ্কর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় তার 'গণদেবতা', পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেতে। তারাশংকরকে অনুশীলন করার সময়ে স্বতস্ফূর্তভাবেই ঔপন্যাসিক নিত্যানন্দ মহাপাত্রের সৃষ্টিকে অনুশীলন করতে ইচ্ছা হয়। তাঁর 'হিড়মাটি'তে জীবন ব্যাষ্টিতে সীমিত হয়নি, সমষ্টির অঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মনুষ্য জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মানব জীবনের একীভূত প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে আদর্শের ব্যবধান যেখানে মূল্যহীন সেখানে আবর্জনার বর্ণনাও সারশূন্য এই ভিত্তিভূমিতে 'হিড়মাটি'র চরিত্রগুলি গঠিত। পুরাতনের প্রতি সহানুভূতিশীল মহাপাত্র বর্তমানের অস্থিরতার ওপর কুঠারাঘাত করে অনুভব করেছেন যে জীবন, মানবিকতা ও স্বাধীনতার জন্য মানুষ যুগে যুগে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধের শেষ নেই। হিড়মাটি'র মত 'ভঙ্গাহাড়' উপন্যাসে তিনি একথা ব্যক্ত করেছেন। এই বক্তব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে কতকাংশে তার 'সুখর সন্ধানে'-তে শ্রী কনকাদিত্য। তাঁর 'জ্বলন্তা [illegible]' ও 'জিঅন্তা মণিষ' কাহিনীর চমৎকারিতা, চরিত্র চিত্রণের কলাত্মক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' ও 'ধাত্রীদেবতা'-র সমধর্মী। কিন্তু 'ধাত্রীদেবতা' ও 'গণদেবতা' সমধিক কলাত্মক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে স্বীকার করতেই হয়। তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' ও 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় লক্ষ্য করা যায় যে কিভাবে পুরানো সমাজ ভেঙে পড়ছে ও নতুন সমাজ মাথা তুলছে, কিভাবে আভি[illegible]র অহমিকা ও সামন্তবাদী মিনারের দীপ্তি ধীরে ধীরে নড়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য ফুটে উঠেছে নিত্যানন্দ মহাপাত্রের 'হিড়মাটি' ও 'ভঙ্গাহাড়'তে, প্রাক স্বাধীনতাকালে হরেকৃষ্ণ মহতাবের 'প্রতিভা' উপন্যাসে, স্বাধীনতার পরে কাহ্নুচরণের 'ঝঞ্ঝা' ও সুরেন্দ্র মহান্তির 'অচলায়তন'তে। পুরনো সমাজ কিভাবে ধ্বসে যাচ্ছে, সামন্তবাদী অত্যাচার ও শোষণকে কিভাবে সাধারণ মানুষ অস্বীকার করছে, রাজা জমিদার কিভাবে দেশের সেবা করার জন্য নীচে নেমে আসছে তার মর্মগ্রাহী চিত্র পাওয়া যায় এই উপন্যাসগুলিতে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ওড়িআ উপন্যাস রচনা করার জন্য কলম ধরেন বিশিষ্ট নাট্যকার অশ্বিনীকুমার ঘোষ। 'বুঢ়াচচা', 'মুক্তি', চণাবলা', 'এ পৃথিবী কি সুন্দর' ও 'নারী' প্রভৃতি উপন্যাসের তিনি রচয়িতা। তাঁর 'চণাবলা'কে বাদ দিলে অন্যান্য উপন্যাস সফল হয় নি। 'চণাবলা'র পটভূমি হল কলিকাতা গোলদীঘি। লেখক কলকাতায় দীর্ঘদিন বাস করে যে অনুভূতি অর্জন করেছিলেন তার প্রতিফলন ঘটেছে 'চণাবলা'তে। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' দ্বারা এ উপন্যাস প্রভাবিত বলে মনে হয়।

জীবনের দ্বারদেশে তারাশঙ্কব দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা ভেদ করেছিলেন। মানব হৃদযেব বহসাকে তীক্ষ্ন বৌদ্রের মধ্যে বেখে তিনি চরিত্র-গুলির সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ কবেছিলেন। মানসিকতার দৃষ্টির দিক দিযে তারাশঙ্কব ও বিভূতিভূষণ 'কল্লোল গোষ্ঠী' থেকে ভিন্ন থাকলেও মানিক 'কল্লোলে'ব ধাবাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশ্বাস ও দৃঢ়তায় অবশ্য তিনি ছিলেন 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর ছিল গভীর প্রত্যয়জাত, নিবিড় ও ব্যাপ্ত সহানুভূতির আন্তরিক প্রকাশ। পূতিগন্ধময় ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পর্বত প্রমাণ মিথ্যা, বঞ্চনা ও ভ্রষ্টাচারকে তিনি নির্মমভাবে আঘাত হেনেছেন। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচেব ইতিকথা', 'চিহ্ন', 'শহবতলী', 'সোনাব চেয়ে দামী', 'সার্বজনীন', 'নাগপাশ' প্রভৃতি উপন্যাসে এর মর্ম গভীরভাবে অনুভূত হয়। হোসেন মিঞা, কুবের, গোপাল, শশী প্রভৃতি চরিত্রগুলো হল এক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অজ্ঞান বুদ্ধিতে তিনি বিবর্তনকে অভিনন্দিত কবলেও শেষ পর্যন্ত তাঁবও যেন জীবন সত্য "কার সাধ্য রোধে হায় প্রান্তনের গতি"-র প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'চলাচল', 'পবাধীন প্রেম', 'ছন্দপতন', 'মাশুল' উপন্যাস থেকে এই কথা মনে হয়। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুশীলন করার সময়ে ওড়িআ সাহিত্যে রামপ্রসাদ সিংহের কথা মনে আসে। আগ্নেয়গিরি থেকে জ্বলন্ত তরল লাভা উদ্‌গিরণ হয়। কিন্তু রামপ্রসাদের উপন্যাস থেকে আরও জ্বলন্ত, উত্তপ্ত, তেজবন্ত লাভাব উদ্‌গিরণ হয়েছে। অগ্নিবর্ষী ভাষায় দীপ্ত কল্পনা-শৈলীকে, প্রজ্বলিত প্রবহমান যুগরুচিকে গঠন করে মানিকের মত তিনি যে বিপ্লবেব সূত্রপাত কবেছেন তা হল অন্ন বস্ত্রের, ধর্ম-অধর্মের, সভ্যতা-অসভ্যতার, মানুষ-অমানুষেব। তাঁর 'পূর্বরাগ' (রচনা ১৯৪৪)-এর প্রত্যেক লাইনে মানবিকতা, স্বাধীনতা, অন্নবস্ত্র ও বাঁচবার তাগিদের জন্য সংগ্রামেব স্বব-শোনা যায়। প্রজ্বলিত হোমশিখার মত মানুষ অত্যাচার ও ব্যভিচারে নির্মমভাবে পুড়ে যায়। সীমাহীন জল আর বাতাস তাব জ্বালাকে শান্ত করার জন্য চেষ্টা করে মাত্র। 'হোম শিখা' (১৯৩৭)-তে তিনি বলেছেন—"বিপ্লবের অর্থ নিরর্থক হত্যা, আক্রোশময়তা ও ধ্বংস নয়। বিপ্লবের অর্থ গঠনমূলক ধ্বংস, শান্তি স্থাপনের জন্য অশান্তির কারণ উচ্ছেদ।" অন্যত্র তিনি বলেছেন—"সেদিন বুড়ো আব কথা বলতে পারল না। সকালে কেন কে জানে চাঁপটা কেঁদে উঠল। ধরণী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। ভিক্ষুক কেউ কাঁদে?

এরা কাঁদবে কিসের জন্য ?" এই ধরণী হোসেন মিঞার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সূত্র ধরে তাঁর 'মরীচিকা', 'প্রতিহিংসা', 'রক্তরেখা' (১৯৩০)-র আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৩০-এর পরে উদীয়মান লেখকদের মধ্যে লক্ষীধর নায়কের নাম বিশেষ স্মরণীয়। তাঁর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দুটো উপন্যাস 'উদভ্রান্ত', 'ভুলিল সতে সখি' প্রগতিশীল চিন্তাদ্যোতোক না হলেও স্বাধীনতার পরবর্তী উপন্যাস হায় রে দুর্ভাগা দেশ', সর্বহারা', 'বর্ষার শেষ'-এ ভাষা, শৈলী ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক দিয়ে বিচারে পীড়িত বঞ্চিত ভাগ্যহীন শোষিত মানুষের হৃদয়ের মর্মবেদনা, ব্যথা, ক্রন্দন ও বিড়ম্বিত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে তিনি মানিকের মত আন্তরিকতার সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। সচি রাউত রায়ের 'চিত্রগ্রীব' (১৯৩৬)-এর পৃষ্ঠভূমি হল কলকাতা শহর। চিত্রগ্রীব'তে লেখকের জন্য "পৃথিবীই জীবনের তীর্থক্ষেত্র। কারণ সেখানে উত্তাপ আছে, সংঘর্ষ আছে, আছে জীবনের বিকাশের পক্ষে যে জিনিষটা সর্বাপেক্ষা বেশী দরকার সেই আঘাত"। এই প্রসঙ্গে গোপীনাথের 'হরিজন' (১৯৪৮) আলোচ্য। এতে মার্কসের দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদের সঙ্গে গান্ধীবাদের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে।

বিভূতিভূষণ ছিলেন উচ্চস্তরের নিসর্গ শিল্পী, গ্রাম্যজীবনে স্বপ্নাঞ্জন লেপন করে অপরূপ বর্ণবিভঙ্গে তিনি সৃষ্টি করেছেন 'পথের পাঁচালী'। তিনি বাস্তববর্জিত না হলেও আধুনিক দৃষ্টিতে তাকে ঠিক সমাজ সচেতন শিল্পী বলা যাবে না। স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রাচুর্য্য এবং সাংসারিক অনটনের সহাবস্থানে তাঁর 'আরণ্যক' ও অন্য উপন্যাসের সৃষ্টি। বিভূতিভূষনের শিল্পী সত্তার সঙ্গে কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহীর শিল্পী-সত্তা তুলনা করার যথার্থতা আছে। প্রাণকৃষ্ণ সামলের সৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্য কিছু কম হলেও তার নীলকমল' (রচনা ১৯৩৮-৩৯), 'সহযাত্রিণী' (১৯৪৫ 'হাতি কা দাণ্ড' (১৯৪৭), 'পল্লী জীবন' (১৯৪৪) এর সঙ্গে বিভূতিভূষণের 'অথৈ জল', 'ইছামতী', 'অশনি সংকেত'-এর সামঞ্জস্য আছে। বিভূতিভূষণের চরিত্রচিত্রণ, মানবীয় মূল্যবোধ, শিল্পীসুলভ মনোভাবের সন্ধান পাওয়া যায় কতাংশে জগৎবন্ধু মহাপাত্রের 'মণিকাঞ্চন', 'ভাঙ্গা সংসার', 'বিসর্জন' প্রভৃতি উপন্যাসে।

নিত্যানন্দ মহাপাত্র, হরেকৃষ্ণ মহতাব, কালিন্দীচরণ, লক্ষীধর নায়ক, কাহ্নুচরণ মহান্তির মত গোপীনাথ মহান্তি স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় ধরে উপন্যাস রচনা করার জন্যে কলম ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যে এরকম তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও আরও এরকম অনেক সাহিত্যশিল্পী এই সময় পরিধির অন্তর্ভুক্ত। গোপীনাথ মহান্তি ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫, আবার ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত কোরাপুটে প্রশাসনিক চাকরী-জীবনকালে শুধু আদিবাসী সমাজের সম্পর্কে আসেননি, আদিবাসীদের জীবন যন্ত্রণা, অলিগলির ঘটনা, সংস্কৃতি, সমাজের সঙ্গে নিজেকে সামিল করেছেন। এই গভীর অনুভূতির পরিণতি স্বরূপ তিনি ওড়িআ সাহিত্যকে 'দাদিবুঢ়া' (১৯৪৪), 'পরজা' (১৯৪৬), 'অমৃতর সন্তান' (১৯৪৯), 'শিবভাই' (১৯৫৫), 'অপহঞ্চ' (১৯৬১) প্রভৃতি উপন্যাস উপহার দিয়েছেন। 'পরজা' উপন্যাসটি 'সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার'

প্রাপ্ত। 'অমৃতের সন্তান' হল লেখকের অনুভবের মহাকাব্যিক রূপ। পরিবর্তিত সময়ের চিত্ত সংঘর্ষের রূপায়ণ হচ্ছে 'শিব ভাই' ও 'অপহৃত'। 'দাদিবুঢ়া' হচ্ছে পরজা সমাজের শুচিপূত ধর্ম বিশ্বাসের জীবন্ত রূপায়ন। বন্য জাতি বন্য সংস্কৃতির ওপরে সুবিধাবাদী ধনিক গোষ্ঠীর অত্যাচারের ঘটনাকে নিয়ে রচিত ফরাসী ঔপন্যাসিক রেনে মারার 'বাতোয়ালা', 'নরওয়ের' কুনুট হামসুন Knut Hamsun) ও জোহান বয়ের (Johan Bojer), ফ্রান্সের রোমাঁ রোলা, ও রুশোর ডস্টয়ভস্কির উপন্যাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব। এছাড়া তাঁর অগ্রজ কাহ্নুচরণের 'মনোগহনের তলে' ১৯৪৬), 'কাদ্রুকা লোলি' (১৯৫৯), পরশুরাম মুণ্ডার 'মুলিআ শিলা', 'বসুন্ধরা মাটি' (১৯৮১), নারায়ণ মহাপাত্রের 'কাড়ে গোমাঙ্গ' (১৯৮৯), 'কাহানী সবুজ উপত্যকার' (১৯৮৫ গোবিন্দ দাসের 'লসু', অনাদি সাহুর 'মুণ্ড মেখলা (১৯৮২) প্রভৃতি উপন্যাস সম্পূর্ণভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়, আদিবাসী জীবন সমাজ ও সংস্কৃতিকে নিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। ওডিআ সাহিত্যে যেরকম আদিবাসী সমাজকে প্রাণকেন্দ্র করে অনেকগুলো উপন্যাস উত্তীর্ণ হয়েছে বাংলা সাহিত্যে সেরকম সেরকম হয়নি। এই বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে ওডিআ উপন্যাস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। প্রসঙ্গক্রমে বা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলা যায় আদিবাসী সমাজের চালচলন, ঘটনাবলী ও জীবনচিত্র নিত্যানন্দ মহাপাত্র, জ্ঞানীন্দ বর্মা, ভাগীরথী নেপাক বলরাম মিশ্রের উপন্যাসে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেইভাবে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী ও বুদ্ধদেব গুহের উপন্যাসেও রূপায়িত হয়েছে। হরিজন, সাপুড়ে, নুলিয় সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে যেরকম গোপীনাথ মহান্তি, ব্রজমোহন মহান্তি ও গণেশ্বর মিশ্র, প্রমুখ সফল উপন্যাস রচনা করেছেন সেইরকম বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় অদ্বৈত মল্ল বর্মন, তারাশঙ্কর, সমরেশ বসু প্রফুল্ল রায়, সতীন থ ভাদুড়ি এক একটি সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে বা আদিবাসী সমাজের পার্শ্ব স্পর্শ করে সফল উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, রাজনৈতিক সামাজিক পটভূমির পরিবর্তন —আর্থিক সঙ্কট, বেকার সমস্যা, দুর্নীতি, চোরাকারবার পুঁজিপতি গোষ্ঠীর শোষণ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রভৃতি সমাজ জীবনকে অস্থির করে দিল। মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনধারণের জন্য সংস্কার, আদর্শ নীতিবোধ শিক্ষা, চরিত্র জলাঞ্জলি দিয়ে দারুণ হতাশায় ভেঙে পড়ল। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের দ্বন্দ্ব, জটিলতা ও মূল্যবোধের বিপর্যস্ত অবক্ষয়িত রূপ ফুটে উঠল সাহিত্যে। বিশৃঙ্খলিত যৌনজীবন, ফ্রয়েডিয় চিন্তাধারা বিশ্লেষণ, যুক্তিবাদ বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি, মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র গান্ধীবাদও প্রভাবিত করল সাহিত্য শিল্পীদের। পশ্চিম জগতের লেখক ওয়েলস ডিকেন্স হাকসলি, মেরেডিথ, লরেন্স, মোরাভিয়া ও জোলার প্রভাবও পুষ্ট করল আমাদের উপন্যাসকে। এই সঙ্গে সঙ্গে যুগ প্রয়োজনকে লক্ষ্য রেখে শিল্প সমস্যা, ভূমিহীন কৃষক, মেহনতী মানুষের সমস্যা, অসম সমাজের সহস্রবিধ শোষণ ও বঞ্চনার

সমস্যাকে লিপিবদ্ধ করলেন মধ্যবিত্ত লেখকগণ। উপরোক্ত দৃশ্যপট দ্বারা উভয় বাংলা ও ওড়িআ উপন্যাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রিত হল।

দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে যেরকম কতকগুলো উপন্যাস সৃষ্টি হয়ে গেল, ওড়িআ সাহিত্যে উদ্বাস্তু সমস্যাকে আধার করে কাহ্নুচরণের 'তমসা তীরে', মন্মথনাথ দাসের 'অন্তরাগ', দয়ালাল ঘোষীর 'শতলেজবু জিবা' প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হল। উদ্বাস্তু সমস্যার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের মত ওড়িশা জর্জরিত হয়নি। সেইজন্য বোধহয় উদ্বাস্তু সমস্যাকে ব্যক্ত করার জন্য অন্য লেখকরা এগোননি। বাংলা সাহিত্যে 'উপনগর' (নরেন্দ্র মিত্র), 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা' (সমরেশ বসু), 'ত্রিবর্ণ' (বনফুল), 'সমদ্র সফেন' (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) 'উত্তরাধিকার' (জরাসন্ধ), 'বল্মীক', 'বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প' (নারায়ণ স্যানাল), 'আমার জীবন' (সুভাষ সমাজদার) প্রভৃতি উপন্যাস উদ্বাস্তু জীবনের পটভূমিতে রচিত। কিন্তু এর মধ্যে কোনটিকে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

রক্তাক্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তি বিষয়ের ওপরে রচিত প্রমথনাথ বিশীর 'পনেরোই আগস্ট' (১৯৫৮)। স্বদেশী আন্দোলন, সশস্ত্র আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আই এন এ গঠন ও ভারত অভিযানের পটভূমির ওপরে লিখিত এটি একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নিত্যানন্দ মহাপাত্রের সর্বশেষ দীর্ঘ উপন্যাস 'ঘরডিহ'-এর পটভূমি ভিন্ন হলেও বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার চিত্রণ পরিবেশন করার সময়ে লেখকের লেখনীতে স্বাধীনতা পূর্বের এই রাজনৈতিক দৃশ্যাবলী সজীব হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ও দেশবিভাগের সময় সীমার ফ্রেমে অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭) সৃষ্টি। এরপরে দেশবিভাগ ঘটনার মুখোমুখি হয়ে কেউ উপন্যাস লেখার জন্য ব্রতী হননি। বহু বছর আগে ছেড়ে আসা গ্রামের জন্য মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে নিয়ে মনোজ বসু লেখেন 'সেই গ্রাম সেই সব মানুষ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৎকালীন জীবন ও সমাজ, স্বাধীনতা আন্দোলন লবণ সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড় আন্দোলন, সাম্যবাদী বৈপ্লবিক চেতনার ওপরে 'ভঙ্গাহাড়', 'হিড়মাটি' রচিত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ কালীন চিন্তা ও চেতনার আধারিত আরও দুটো উপন্যাস 'কুলি' ও 'লাল ঘোড়া' লেখক হলেন যথাক্রমে অনন্ত প্রসাদ পণ্ডা ও জ্ঞানীন্দ্র বর্মা। উপন্যাসদুটি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রচনা। লাল ঘোড়া'-য় সন্ত্রস্ত পল্লী জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। গোপীনাথ মহান্তির 'মাটি মটাল' (১৯৬৪), কাহ্নুচরণ মহান্তির 'বজ্রবাহু' পল্লীগ্রামের পৃষ্ঠভূমির ওপর রচিত দুইটি শক্তিশালী উপন্যাস। উভয় উপন্যাসেই প্রতিপাদ্য বিষয় এক; রবি ও বজ্রবাহু দুই উপন্যাসের দুটি বলিষ্ঠ চরিত্র, এই প্রসঙ্গে বিভূতি পট্টনায়কের 'এই গাঁ এই মাটি' (১৯৫৯) ও 'অসবর্ণ' (১৯৮২) গ্রাম পৃষ্ঠভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত দুইটি মনোজ্ঞ উপন্যাসের আলোচনা করা যেতে পারে। জ্ঞানীন্দ্র বর্মার উপন্যাস 'ভূমিকা' রচিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে। এতে যুদ্ধের প্রভাব ও লেখকের অনুভূতির সূক্ষ্ম

চিত্র পাওয়া যায়। কালিন্দীচরণের 'আজির মণিষ' তে যে যুদ্ধচিত্র পাওয়া যায় তা তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রসূত। ওড়িশার সামাজিক জীবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে পবিবর্তনেব সূত্রপাত করল তার চিত্র পাওয়া যায় স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে রচিত এই উপন্যাসগুলোর মধ্যে। স্বাধীনতার পরে বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি শিল্প সমৃদ্ধ উপন্যাস রচিত হয়েছে।

চীনের ভারত আক্রমণ (১৯৬২), ইন্দিরা গান্ধীর এমার্জেন্সি ঘোষণা (১৯৭৫ , লেখকদের সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'মুখ্যমন্ত্রী', 'সে নহি সে নহি', 'অশোক উদ্ভিদ মাত্র', 'পুত্র পিতাকে', 'তুমি মালিনী চৌধুরী'-এর লেখক চাণক্য সেনের 'ব্রুটাস তুমিও' ১৯৮১) এমার্জেন্সিকালে দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়েয় অধ্যাপক ও প্রশাসকদের কার্যকলাপকে নিয়ে লিখিত। অতি নাটকীয় রীতিতে রচিত এই উপন্যাসে সমাজ চেতনা ও বাস্তবতার পবিচয পাওয়া যায। বাজনীতিজ্ঞ ও সাহিত্যিক হরেকৃষ্ণ মহতাব 'এমার্জেন্সিকালের ঘটনাকে নিযে রচনা করেছিলেন '১৯৭৫' ও 'তৃতীয়পর্ব'। জরুরীকালীন পরিস্থিতি ও তখনকার রাজনৈতিক অস্থিরতা যে কলঙ্কিত অধ্যায়েব সৃষ্টি করেছিল তার এক সূক্ষ্ম ও সারনির্যাস চিত্রিত হয়েছে এই দুই উপন্যাসে। জরুরীকালীন অবস্থা ও তার পূর্বের রাজনৈতিক ঘটনার ওপর '১৯৭৫' লিখিত। এতে সাহিত্যিক মূল্যবোধ কতকাংশে খণ্ডিত হয়ে থাকলেও বাস্তব ঘটনাকে নিয়ে এটি পবিপূর্ণ। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রত্যক্ষ অনুভবেই মহতাবেব জীবনের ছিন্ন পৃষ্ঠা বহন কবে 'তৃতীয় পর্ব' উপন্যাসটি সতেজ হযেছে। ভারত ও চীন যুদ্ধকালীন সামাজিক পৃষ্ঠভূমির ওপবে বচিত গোপীনাথ মহান্তির 'তান্ত্রিকাব'-এ যুদ্ধকালীন আভ্যন্তবীন সংহতির ওপব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'তিনটি বাতির সকাল'-এ এই স্বব কিন্তু খুব ক্ষীণ হযে প্রকাশিত হয়েছে।

হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণ ও পশ্চিম ইউরোপে জার্মানের দুর্বার অগ্রগতি ও সেই সময়ে ভারতে রাজনৈতিক সমস্যার পটভূমিতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ক্রান্তদর্শী' রচিত। গৌড় কিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' (১৯৮১), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে' ১৯৭১) ও 'আবহমানকাল' প্রভৃতিব ঘটনা প্রায এক সময়ের। ১৯৩৫ থেকে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনেব সূচনা হয়েছিল। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও বঙ্গীয় উপন্যাস লেখকদের কলমে এই রাজনৈতিক চিত্র সফলভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'প্রেম নেই' তে এব স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। 'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে'তে ১৯৩৫ ৫২ সালের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ। পূর্ববঙ্গের শীতলক্ষ্যা নদী সংলগ্ন কযেকটি গ্রামকে রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ কিভাবে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অস্থিরতার ভিতরে ঠেলে দিয়েছে তার ও দেশ বিভাগের প্রস্তুতির নানা স্তর ও বিভাগের পববর্তী পর্যায়ের মনোজ্ঞ চিত্র এতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য জীবন ও সাধাবণ মানুষের জীবনের প্রতি মমতার উৎস হল তাঁর এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব 'অলৌকিক জলযান' (১৯৭৫' ও তৃতীয় পর্ব 'ঈশ্বরের বাগান' (১৯৮১)।

এই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা' (১৯৭০) আলোচ্য। ১৯৪০—৫০-সালের মধ্যবর্ত্তী সময় পূর্ববঙ্গের ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী রাজদিয়া শহরের জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। রাজনৈতিক পটভূমির ওপরে রচিত 'স্বর্ণসীতা', 'মন্দ্রমুখর', 'লালমাটি', 'রাজপথ জনপথ' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যেও বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সুরেন্দ্র মহান্তির 'অন্ধ দিগন্ত' একটি সফল রাজনৈতিক উপন্যাস। ১৯২১ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ওড়িশা ও ভারতীয় রাজনীতির পৃষ্ঠভূমিতে এটি স্থাপিত। স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং তার ব্যাপকতার শিহরণ নিয়ে 'অন্ধ দিগন্ত'-র চরিত্র যত জীবন্ত স্বাধীনতার পরবর্ত্তী রাজনীতি ও সমাজের বিড়ম্বিত স্বপ্নের রূপায়নের ভিতরে এই উপন্যাসের স্বর ও চরিত্র ততই বাস্তব। নায়ক নিধিদাসের চরিত্র লেখকের অনন্য সাধারণ সৃষ্টি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিরিশ বছর পরে রাজনীতির স্বর ও স্বরূপ, গণতন্ত্রের বিপর্যয়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও নির্বাচনের ওপরে আধারিত উপন্যাস হল ব্রজমোহন মহান্তির 'নিঃশব্দ আকাশ' ও 'অন্ধ পৃথিবী' (১৯৭৭)। এই রাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমিকে ভিত্তি করে গণেশ্বর মিশ্রের 'নেতা' সৃষ্টি। রাজনৈতিক উপন্যাস 'অন্য এক সময় অন্য এক ভারত' (১৯৭৬)-এর লেখক হলেন শান্তনুকুমার আচার্য্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমিতে গ্রামের মানুষের জ্ঞান, ধারণা, মানসিকতার সঙ্গে স্বাধীন ভারতের বিড়ম্বিত ও বিপর্যস্ত মূল্যবোধকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। পরিবর্তিত সময়ের নতুন চেতনা এতে ব্যক্ত হয়েছে ও গান্ধীর পরিবর্তে মার্কসের জয়গান করা হয়েছে। সামন্তবাদীর সুবিধাবাদের সঙ্কেত ও জাতি প্রথাগত সঙ্কীর্ণতা বিদ্বেষ, রক্ষণশীলতা, শোষণ ইত্যাদি ঘটনা অভয়পুরকে স্বাধীন ভারতের সমুদ্রের ভেতরে একটি পরাধীন দ্বীপে পরিণত করেছে।

উপন্যাসের ধর্ম রক্ষা করে ও রাজনীতি তথা সাংবাদিকতার সূত্র ধরে রচিত চাণক্য সেনের 'সে নহি সে নহি', 'রাজপথ জনপথ', 'মুখ্যমন্ত্রী' ও 'তিনতরঙ্গ' এবং সৌরীণ সেনের 'কঙ্গো থেকে ফেরা', 'ভিয়েতনাম', আখের স্বাদ নোনতা'-র মত ওড়িআ সাহিত্যে উপন্যাসের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ওড়িআ সাহিত্য শ্রমিকের জীবন ও সমস্যাকে নিয়ে সংখ্যাধিক উপন্যাস রচিত হয় নি। এ ক্ষেত্রে শক্তিপদ রাজ্যগুরুর 'কেউ ফেরে নাই' ও অনাদি সাহুর 'শোনিত ফল্গু' দুই সাহিত্যের দুটি দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গক্রমে শ্রমিকের সমস্যা ও জীবন যন্ত্রণার চিত্র হয়ত বহু উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। শিল্প সভ্যতা বঙ্গীয় জীবনকে বহুল ভাবে প্রভাবিত করলেও শিল্প-শ্রমিকের জীবন চিত্রকে ভিত্তি করে বাংলায় বিশেষ উপন্যাস সৃষ্টি হয় নি। দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষজনিত অর্থনৈতিক সঙ্কটে বঙ্গোৎকল ভূখণ্ড বহুবার আক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বাংলা ও ওড়িআ উপন্যাসে দুর্ভিক্ষ ও তদ্‌জনিত সমস্যা বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষকে প্রাণকেন্দ্র করে ওড়িআ সাহিত্যে যে রকম কাহ্নুচরণের

'হা অন্ন' উপন্যাস জন্ম নিয়েছে, সেরকম সৃষ্টি ওড়িআ সাহিত্যে আর হয় নি, বোধহয়, বাংলা সাহিত্যতেও সৃষ্টি হয় নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত এক অনাহূত বিপদের পৃষ্ঠভূমিতে সৃষ্ট কতকগুলি প্রাণস্পন্দিত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হলেও ওড়িআ সাহিত্যে কিন্তু তার অভাব গভীর ভাবে অনুভূত হয়। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিদ্বেষ ও তদ্‌জনিত রক্তপাত বঙ্গীয় জীবনকে যেভাবে একদা তরঙ্গায়িত করেছিল, উৎকলীয় জীবনকে ঠিক সেইভাবে স্পর্শ না করায় ওড়িআ লেখকগণ কলম ধরার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ১৯৭২-এর আগে বাত্যাকে নিয়ে সেরকম ওড়িআ উপন্যাস রচনা হয়নি। ১৯৭০-এর ভয়ঙ্কর বার্ত্যার পৃষ্ঠভূমিতে সুরেন্দ্র মহান্তির যুগান্তকারী উপন্যাস 'কালান্তর' (১৯৭২) জন্ম নিল। বাংলা ভাষায় এই ঘটনার উপর সফল উপন্যাস সৃষ্টি হয় নি।

১৮৪০ ৫০ সালের মধ্যবর্ত্তী সময় হল বঙ্গীয় সমাজের এক ক্রান্তিকাল। এই সময়ে যেরকম ভণ্ডামি লাম্পট্য দেখা গিয়েছিল, সেইরকম নবচেতনার উন্মেষও ঘটেছিল, গণিকা মনোরঞ্জন হয়েছিল, আবার শাস্ত্র ও ক্লাসিক গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল, বিধবা-বিবাহ, নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য আন্দোলন হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ একই সঙ্গে চলছিল। এই পটভূমিতে রচিত হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই সময়' (১৯৮১ --৮২)। জাতীয় গৌরব মধুসূদন দাসের জীবনের ওপরে আধারিত সুরেন্দ্র মহান্তির শতাব্দীর সূর্য' (১৯৭০) উপন্যাসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতাপুষ্ট ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক জীবনের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তার 'নীলশৈল' ১৯৬৮ -তে প্রাচীন সংস্কৃতির সমুজ্জ্বল রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এর পূর্বে কাহ্নুচরণের 'শর্বরী'-তে ভারতের প্রাক্ সভ্যতা কালের চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে পুরাণের বিষয়কে নিয়ে উপন্যাস রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পুরাণের নবরূপায়নে কয়েকটি সার্থক উপন্যাস বাংলা ও ওড়িআ উভয় সাহিত্যে সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসুর 'শাম্ব' দেশ শারদীয় ১৩৮৬, পুস্তক ১৩৮৫) এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত শাম্বের শাপমোচন ও মুক্তি কাহিনীর নবরূপায়ণ ঘটেছে এই উপন্যাসেতে। শাম্ব সম্পর্কে লেখক বলেছেন "শাম্ব আমার কাছে এক সংগ্রামী ব্যক্তি, বিশ্বাস"। 'শাম্ব'-র পরে লিখিত প্রতিভা রায়ের 'শিলাপদ্ম'-তে এই উপাখ্যান প্রাণবন্ত। পদ্মক্ষেত্রতে প্রতিষ্ঠিত শিলাখণ্ডের বহনীয়তা এতে প্রতিপাদিত হয়েছে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে পুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়া ও নারদের নির্দেশানুসারে অনুতপ্ত শাম্ব কর্তৃক কোণার্কের নিকটস্থ মৈত্রেয়ী বনে সূর্যদেবকে উপাসনা করে রোগমুক্ত হওয়ার ঘটনাই এই উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। 'শিলাপদ্ম'-র লেখিকা 'শাম্ব' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

পুরাণ ও মিথ্ এক নয়। গবেষক মালিনোস্কির মতে মিথের জন্ম পুরাণ থেকে নয়; বরং পৌরাণিক রচনা সব লোককথা, আখ্যায়িকা ও কিংবদন্তীর থেকে জন্মলাভ করেছে। পুরাণের কথা মিথের মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ দাসের 'মীরা ও মল্লার'

(১৯৭৬)-এ এক ভিন্ন স্বর শোনা যায়। এতে জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর নিপুণ ব্যবহার দেখা গেলেও লেখক কিংবদন্তীর হাত থেকে মীরাকে উদ্ধার করে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে গড়ে তুলেছেন। মীরার ব্যক্তি-জীবন, দাম্পত্য-জীবন, রাজনীতি ও ধর্ম জীবনকে নিয়ে এ উপন্যাস অগ্রসর হয়েছে, নূতন প্রয়োগবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত শান্তনুকুমার আচার্য্যের 'শকুন্তলা'-র নামকরণে মিথ্-ই নিহিত। পুরাণের নবরূপায়নের আর এক নিদর্শন হল চিত্ত সিংহের 'বারোমাস্যা' (১৯৮১)। এতে নায়ক-নায়িকা কালী ও ফুলি চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু, ফুল্লরার আধুনিক রূপ। পুরীধামের কয়েকটি আখ্যানকে নিয়ে পুরাণ ও কিংবদন্তীমূলক বিষয়ের ওপরে বলরাম পট্টনায়কের 'অনাদি-অনন্ত' রচিত। 'বারোমাস্যা'-র মত এতে আধুনিকতার রূপ রস নেই। সুরেন্দ্র মহান্তির 'কৃষ্ণা বেণীরে সন্ধ্যা' (১৯৮৫) পুরাণ, ইতিহাস ও কিংবদন্তীর মিলনে একটি গৌরবময় সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর চরিত্রে নব মূল্যায়ন হয়েছে গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লোকপ্রিয় উপন্যাস 'পাঞ্চজন্য' (১৯৭৮-৭৯)-তে। এই দুই চরিত্রের অন্তরালে যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আছে তার উন্মোচন করেছেন লেখক। এই উপন্যাসে শুধু পুরাণ কাহিনীর নব মূল্যায়ন হয় নি, মহাভারতের কাহিনীর ভিন্ন ব্যাখ্যাও হয়েছে। 'পাঞ্চজন্য'-এর আলোচনা করার সময় প্রতিভা রায়ের 'যাজ্ঞসেনী'র কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে যায়। মহাভারতের কাহিনীর ওপর আধারিত এই উপন্যাসে আধুনিক সমাজের জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। যজ্ঞকুণ্ড থেকে জাত যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন আবেগ, কৃষ্ণসখা অর্জুনের লক্ষ্যভেদ বৃত্তান্ত ইত্যাদি ঘটনা এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে নূতন ভঙ্গিতে। কাহিনী ও বর্ণনায় উভয় উপন্যাসের মধ্যে সম্পর্ক আছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাধাকৃষ্ণ' আলোচনা করার সময়ে নীলমণি সাহুর 'তামসী রাধা' সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈষ্ণব ধর্মের চিন্তাধারা ও রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে সামাজিক মূল্য দিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। এই দৃষ্টিকোণের দিক দিয়ে সুকামিনী নন্দের 'রাই বিনোদিনী'ও আলোচ্য। লেখিকা 'মহাভারত', 'ভাগবদ্-গীতা', 'চিত্তবোধ পুরাণ' ও ভাগবদ্ গ্রন্থ থেকে রাধাকৃষ্ণ লীলাকে লোকায়িত করে 'রাই বিনোদিনী' লিখেছেন। চন্দ্রশেখর রথের 'যন্ত্রারূঢ়'-এর ওড়িআ উপন্যাস সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এই বইতে ভারতীয় দর্শন, সনাতন ধর্ম বিশ্বাস, মহা-ভারতের চরিত্র ও ঘটনাদি নতুন রূপে সমসাময়িক তাৎপর্য বহন করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'নবজাতক' ভারতীয় দর্শনের তুঙ্গভূমি স্পর্শ করেছে।

১৯৬৭-র মে মাসে যে 'নকশাল বাড়ী' আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তা ক্রমশঃ ব্যাপকতর হয়ে সমগ্র ভারত খণ্ডে প্রসারিত হয়। ভারতীয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার চাপে নিষ্পেষিত হয়ে আসা চাষী, মজুর, গরীব লোকদের সংগঠিত করে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চারু মজুমদার। এই গণ-আন্দোলনকে শিল্প রূপ দিয়ে সাহিত্যিক তাঁর মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। যে বঙ্গভূমি থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, সেখানে সৃষ্টি হল একটির পর একটি উপন্যাস নকশাল

আন্দোলনের পটভূমিতে। এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন স্বর্ণ মিত্র (গ্রামে চল-১৯৭২), অসীম রায় (অসংলগ্ন কাব্য—১৯৭৩, মহাশ্বেতা দেবী (হাজার চুরাশির মা—১৯৭৩, অপারেশন বসাই টুডু), শঙ্কর বসু (কম্যুনিস—১৯৭৫), সমরেশ বসু (মহাকালের রথের ঘোড়া—১৯৭৭), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (শ্যাওলা—১৯৭৭) জয়ন্ত জয়াদ্দার (এভাবেই এগোয়—১৯৭৮), শৈবাল মিত্র (অজ্ঞাতবাস—১৯৮০)। 'হাজার চুরাশির মা', 'অপারেশন বসাই টুডু' নকশাল আন্দোলন ভিত্তিক দুইটি সফল সৃষ্টি। এতে লেখিকা সার্থকভাবে শিল্প, দায়িত্ব ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬০ থেকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নকশাল আন্দোলনেব যে তীব্রতা অনুভূত হয়েছিল তার পটভূমিতে রচিত হয়েছে 'হাজার চুরাশির মা'। উপন্যাসের নায়ক ব্রতী একটি অনন্য সাধারণ চরিত্র। 'অপারেশন বসাই টুডু' উপন্যাসের পটভূমি হল ঝাড়খন্ড। এতে বসাই টুডুর চরিত্র, দিন মজুব ও সাঁওতালদের মুক্তির ইতিহাস সুন্দর ও স্বচ্ছন্দভাবে চিত্রিত হয়েছে। মহাশ্বেতার অন্য উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকাব' (১৯৭৭) -এ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিহারের বন জঙ্গল অঞ্চলের যুগ-যুগের নির্যাতিত আদিবাসীদের নেতা যুগ পুরুষ বীরসা মুণ্ডার বিদ্রোহ অঙ্কিত হয়েছে। নায়কের মৃত্যুতে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় না, বিপ্লবেব সত্যতা শেষ হয়ে যায় না—সেই বক্তব্যই প্রতিপাদিত হয়েছে এই শিল্পসম্মত উপন্যাসে। কিন্তু 'মহাকালের রথেব ঘোড়া'-র নায়ক রুহিতন কুরমি পরিণতিতে ভেবেছে অন্য কথা। তার বৈপ্লবিক জীবন সম্পর্কে সে সংশয় প্রকাশ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে উভয় গুণাত্মক ও পরিমাণাত্মক দৃষ্টিকোণেব দিক দিয়ে নকশাল আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমিতে অতগুলো উপন্যাস রচনা হয়ে থাকলেও ওড়িআ সাহিত্যে মাত্র একটি সফল উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে তা হল শান্তনুকুমার আচার্য্যেব 'শকুন্তলা'। সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কৃতির নামে ব্যাভিচার, জাতীয় সংস্কৃতির হত্যা, রাজনীতির নামে ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠা ও শোষণ ইত্যাদি ঘটনা এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠলেও নকশাল আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমিতে শকুন্তলার কথাবস্তু স্পন্দিত হয়েছে। মার্কস্, লেনিন, মাও সে তুঙ ও গান্ধীর মতবাদের সমন্বয়ে নকশাল আন্দোলনের নূতন দিগন্ত এই বইতে প্রকটিত হয়েছে। তাই এটি ওড়িআ সাহিত্যে সম্মানের অধিকারী। অনাদি সাউয়ের 'মুণ্ড মেঘলা' দুর্গম পল্লী ও অরণ্য প্রদেশে সংগঠিত সন্ত্রাসকে অবলম্বন করে রচিত। এতে নকশাল আন্দোলনের চিত্র আছে। বঙ্গীয় সমাজ জীবনের ওপরে নকশাল আন্দোলন যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেইভাবে উৎকল সমাজ জীবনের ওপর পড়েনি। সেইজন্য মনে হয় ওড়িআ উপন্যাসে এই স্বর স্তিমিত হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' (১৯৭১-তে একজন ব্যবসায়ী সন্তান, দুজন রাজনৈতিক কর্মী ও একজন তরুণীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাকে নিয়ে এক মফঃস্বল শহরের পটভূমিতে এই উপন্যাস রচিত। 'অগ্নির উপাখ্যান' (শৈবাল মিত্র) সাম্প্রতিক

রাজনীতিতে আদর্শহীনতার স্খলনকে কেন্দ্র করে নায়ক অগ্নির মত কয়েকজন সচেতন যুবকদের কাহিনীর ওপর এটি রচিত। চিন্তা ও আদর্শের প্রতি যারা অবিশ্বাসী হতে পারে না তাদের কথা এখানে চিত্রিত হয়েছে। 'অন্ধ দিগন্ত' (১৯৬৪)-এর নিধিদাস ও 'অগ্নির উপাখ্যান' এর অগ্নি চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' (দেবেশ রায়), 'মহিষ কুড়ার উপকথা' (অমিয়ভূষণ মজুমদার), 'ঈশ্বরী তলার রূপকথা' (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়), 'আকাশের নীচে মানুষ' (প্রফুল্ল রায়) রচিত।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে উভয় বাংলা ও ওড়িআ সাহিত্যে সফলতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতার প্রতিফলন ঘটলেও সেগুলোকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না। মানসিকদ্বন্দ্ব-জটিলতা ও সংশয়কে কেন্দ্রভূমিতে রেখে যে উপন্যাস বিকশিত হয়, তা-ই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবে গ্রাহ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, বিমল কর, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপীনাথ মহান্তি, কাহ্নুচরণ মহান্তি, নিত্যানন্দ মহাপাত্র, রাজকিশোর পটনায়েক, কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র, চন্দ্রশেখর রথ, শান্তনুকুমার আচার্য্য প্রমুখ যুগ-স্মরণীয় ঔপন্যাসিকদের কালজয়ী উপন্যাস এক্ষেত্রে স্মরণীয়। এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে প্রত্যেক লেখকের ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু যে ভাষা আত্মার উচ্চারণ বলে মনে হয় এবং যে ভাষা পাঠ করে পাঠক লেখকের আত্মাকে জানতে পারে সেই ভাষাকে কলার প্রতিকৃতি রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ভাষা উচ্চারিত হয়েছে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিন মহান্তি (গোপীনাথ, কাহ্নুচরণ, সুরেন্দ্র)-র সৃষ্টির সম্ভারে।

অতীত আশ্রয়ী জীবন বা ইতিহাস দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাসের রূপে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমসাময়িক মধ্যবিত্ত জীবনবোধের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করে কিছু লেখক অতীতের মধ্যে বিচরণ করতে পছন্দ করেছেন। প্রথমনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী', বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম', 'বেগম মেরী বিশ্বাস', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', দেবেশ রায়ের 'রক্তরাগ', প্রতাপ চন্দ্রের 'জব চার্নকের বিবি', গজেন্দ্র কুমার মিত্রের 'বহ্নি বন্যা'-কে এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ফকির মোহন থেকে স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত ওড়িআ ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি ধারা অব্যাহত ছিল। এই ধারার ধারক ছিলেন রামচন্দ্র আচার্য্য ('বীর ওড়িআ', 'কমল কুমারী', 'পীযূষ প্রবাহ', 'বীরাঙ্গনা'), গোদাবরীশ মহাপাত্র ('বন্দীর মায়া', 'রাজদ্রোহী'), চক্রধর মহাপাত্র ('বোড়ঙ্গ বক্সী', 'বলাঙ্গী'), তারিণীচরণ রথ ('অন্নপূর্ণা'), গোদাবরীশ মিশ্র ('অঠরসহ সতর') প্রমুখ স্রষ্টারা। '১৮১৭-তে সংগঠিত পাইক বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত হয়েছিল 'অঠর সহ সতর', গজেন্দ্রকুমার মিত্র যেমন পরবর্তী সময়ে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচনা করেছিলেন 'বহ্নিবন্যা' 'অঠরসহ সতর' অপেক্ষা 'বহ্নি বন্যা' অধিক সফলতা দাবী করে। ঐতিহাসিক

উপন্যাসের স্রষ্টা রূপে সুরেন্দ্র মহান্তির অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁর 'কৃষ্ণা বেনীরে সন্ধ্যা' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'-র প্রায় তের বৎসর পর রচিত। উভয়ের উপন্যাস দক্ষিণ ভারতের এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত। শরদিন্দুর উপন্যাসে তুঙ্গভদ্রা নদী ও বিজয়নগরের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে, সুরেন্দ্রর 'কৃষ্ণা বেণীরে সন্ধ্যা'-য় কৃষ্ণা নদী, বিজয়নগরকে ভিত্তি করে ওড়িশার ইতিহাসের বিপর্যস্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শরদিন্দুর অন্যতম উপন্যাস 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' মগধ রাজকুমার বিগ্রহপাল ও চেদী রাজকুমারী যৌবনশ্রীর প্রণয় ও রাজনৈতিক সংঘর্ষকে আশ্রয় করে লিখিত। অনুরূপ, এক ঐতিহাসিক উপন্যাস নৃসিংহচরণ পণ্ডার 'চণ্ডাশোক' (১৯৮৩)-এ মগধ রাজকুমার অশোকের প্রেম ও প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কলাত্মক সৃষ্টির দিক দিয়ে বিচার করলে 'চণ্ডাশোক' 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এর সমকক্ষ নয়। অনেক সময় ঐতিহাসিক উপাদানকে গ্রহণ করে অধিক কল্পনাশ্রয়ী ঘটনার ওপর রচিত কয়েকজন লেখকের উপন্যাসকে বাংলা ও ওড়িআ উভয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। প্রশান্ত চৌধুরীর 'লাল পাথর' ও গোপীনাথ পণ্ডার 'পার্টলি পুত্রর নগর বধূ' এই পর্যায়ের।

এগুলি ব্যতীত মুসলমান শাসনকালের ঘটনাকে নিয়ে 'সুলতানা' (বিভূতি পটনায়েক), 'নূরজাহান' (শান্তি মহাপাত্র) বৌদ্ধ যুগের ঘটনাকে নিয়ে 'চন্দ্র ও চম্পা' (বামাচরণ মিত্র), 'শালবতী' (বসন্তকুমার সামল), 'আজির কর অট্টহাস' (সুরেন্দ্র মহান্তি) প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস অপরিসীম শিল্প মূল্য বহন করে। জগন্নাথ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে রচিত সুরেন্দ্র মহান্তির দুইটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—'নীলাদ্রি বিজয়' ১৯৮০) ও 'নীলশৈল'-র বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশেষতঃ তাঁর 'সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার' প্রাপ্ত 'নীলশৈল' ওড়িআ ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে ওড়িআ সাহিত্যে কেন অন্যান্য সাহিত্যেও 'নীলশৈল'-র সমতুল্য উপন্যাস বিরল। ধার্মিক, উচ্ছ্বাস ও আবেগের ভিতরে জগন্নাথকে প্রতিষ্ঠা না করে রাজনৈতিক ইতিহাসে তার গৌরব প্রতিষ্ঠা করা লেখকের প্রধান অভিপ্রায়।

যৌনক্ষুধা, অসংযত যৌন আবেগ, অবৈধ প্রেম ইত্যাদিকে নিয়ে সাহিত্যে শিল্প সৃষ্টি করা যেতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ক্রমে সে আশঙ্কা দূর হল। *ফ্রয়েডিয় চিন্তাধারার প্রয়োগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে উপন্যাস লিখে সফলতা অর্জন করলেন। পরবর্তী কালে নরেন্দ্র মিত্র (দেহ মন), নীহাররঞ্জন গুপ্ত (অস্তি ভাগীরথী তীরে), বুদ্ধদেব বসু 'গোপাল কেন কালো'),* সমরেশ বসু ('বাঘিনী' 'বিবর', 'প্রজাপতি'), রমাপতি বসু ('দ্বিতীয় বিবর') সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ যৌনভিত্তিক উপন্যাস রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। শুধু জীবন যন্ত্রণা বা যৌন বিকৃতি নয়, নৈরাশ্য, হিংসা, গ্লানিতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ হয়ে গেছে সম্পূর্ণ একাকী ও একক ধর্মী। আজকের মানুষ ও তার সমাজের ফটোগ্রাফার রূপে লেখক দাঁড়িয়ে আছেন। এই ফটোগ্রাফির জন্য কলকাতা শহরের

প্রসারিত ক্যানভাস দায়ী। এই ক্যানভাস্ কটক কিংবা ভুবনেশ্বরে নেই তথাপি সীমিত পরিবেষ্টনীকে আশ্রয় করে চন্দ্রশেখর রথের 'অসূর্য উপনিবেশ', শান্তনুকুমার আচার্য্যের 'শতাব্দীর নচিকেতা', 'নর কিন্নর', কৃষ্ণ প্রসাদ মিশ্রের 'মৃগ তৃষ্ণা', 'সিংহ কটি'-তে এর ক্ষীণ সুর শোনা যায়। রোমান্স, যুগচেতনা, অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা ও তদ্জনিত নৈরাশ্য সংশয় জ্বালাকে ভিত্তিভূমি করে যেরকম তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা অমরকীর্তি ও শিল্প গৌরব অর্জন করেছেন সেইরকম ওড়িআ সাহিত্যে কাহ্নুচরণ, বাৰ্জকিশোর পটনায়েক, বিভূতি পটনায়েক, কমলাকান্ত দাস, বসন্তকুমারী দেবী, প্রতিভা রায়, মহাপাত্র নীলমণি সাউ প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা নিজের নিজের কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেছেন।

মধ্যবিত্ত সমাজের লেখকদের লেখা, মধ্যবিত্ত সমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বিষাদ, লোভ, ভীরুতা, কুটিলতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, সন্দেহ প্রভৃতি উপাদানে পুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এই অভিমুখ্য ব্যক্ত হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর 'খারিজ' এ, যেখানে এক গৃহভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যুতে বিপন্ন জগদীপ স্যান্যালের জবানীতে মধ্যবিত্ত মানসিকতা ধিকৃত হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার আর একটি নির্মম চিত্র পাওয়া যায় বিমল করের 'কালের নায়ক' (দুই পর্ব)-তে, মধ্যবিত্তের অবলম্বনহীনতা, নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তার চিন্তা চেতনাকে লেখক এই উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজের লোক কতটা নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ও স্বার্থপর হতে পারে, তার একটি উজ্জ্বল চিত্র এতে পাওয়া যায়। এর আগে নরেন্দ্র মিত্রের 'চেনা মহল', বিমল করের 'দেওয়াল', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান' -এ পক্ষাঘাত গ্রস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। 'শেষ বিচার'-এ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অবসর প্রাপ্ত জজ, পুত্র অমিয়, নাতি রঞ্জু, ও যূঁই প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের একটি মর্মস্পর্শী চিত্র প্রদান করেছেন। অনুরূপ চিত্র শঙ্করের যুগল উপন্যাস 'তনয়া' ও অন্যান্য উপন্যাসে পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত সমাজের পৃষ্ঠভূমিতে লিখিত আরও কতগুলি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, বিমল মিত্রের 'একক দশক শতক' ও 'ছাই' উপন্যাসে সমকালীন সমাজ অবস্থা, তার মূল্যবোধ ও নীতিবোধের চিত্র আছে। মনোজ বসুর 'রূপবতী'তে নারীর সৌন্দর্য্য, নৈতিক অধঃপতনের কি কারণ হতে পারে, তার চিত্র আছে। 'কাল তুমি আলেয়া'তে (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) আকাঙ্ক্ষা ও জীবন যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের এই দ্বন্দ্ব, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অস্থিরতা, অসাহয়তা ও যৌন বিকৃতি কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্রের 'মৃগনাভি', 'নেপথ্যে', প্রিয়ব্রত দাসের 'বর্ণ বিবর্ণ', সুরেন্দ্র মহান্তির 'হংসগীতি', (১৯৭৫)-তে ফুটে উঠেছে। প্রতিভা রায়ের 'পূর্ণোত্বয়া'র বর্ষা, কল্লোল, নিশীথ চরিত্রে ও 'নীল তৃষ্ণার' প্রতাপ কেশরীর চরিত্রের মধ্যে এই স্বর শোনা যাচ্ছে। বিজয়িনী দাসের 'পঙ্ক তিলক' ও সত্যানন্দ চম্পতি রায়ের 'সাবত মা'-এ এই রূপ কম বেশী ব্যক্ত হয়েছে। এই স্বর আরও স্পষ্ট শোনা যায় গোপীনাথ মহান্তির 'রাহুর ছায়া',

'লয় বিলয়', দেবরাজ লেঙ্কার 'জোকর', প্রসন্ন মিশ্রের 'অসুর', ও প্রতিভা রায়ের 'বর্ষা বসন্ত বৈশাখ'-এ। বিষয়বস্তু ভিন্নভাবে রূপায়িত হলেও চরিত্র চিত্রণ ও অভিমুখ্য ব্যক্ত করায় উভয় সাহিত্যের লেখকদের নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জীবন দর্শনের এক ও অভিন্ন স্বর শোনা যায়। অতি সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যে শঙ্কর, সুনীল, সঞ্জীব ও শীর্ষেন্দু প্রমুখ উপন্যাস স্রষ্টারা যে পাঠক জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন ওড়িআ সাহিত্যে দু তিনজন উপন্যাস স্রষ্টাকে বাদ দিলে আর কেউ সেরকম পাঠকদের পরিধিকে স্পর্শ করতে পারেননি। তা ব্যতীত মানব জীবন ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরকে ভেদ করে এবং বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে বাংলা সাহিত্যে লেখকেরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, ওড়িআ সাহিত্যে তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। পরিমাণের দিক দিয়ে ওড়িআ উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের পিছনে পড়লেও গুণাত্মক দৃষ্টির দিক দিয়ে বিচারে পিছিয়ে পড়েনি এবং উভয় ভাষার উপন্যাস এক জায়গায় পেঁাছেছে।

বিশ্বজিৎ ঘোষ

বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ একটি মূল্যায়নধর্মী সমীক্ষা

মধ্যযুগীয় জীর্ণ সামন্ত কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়ার অভীপ্সা নিয়ে উপন্যাসের জন্ম। নবোত্থিত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বুর্জোয়া-শোষিত সমাজই উপন্যাসের আদি জনয়িতা। অবক্ষয়িত সামন্তসমাজকে ভেঙ্গে দিয়ে ষোল-সতের শতকে ইউরোপে নতুন অর্থনৈতিক-শ্রেণী এবং সামাজিক শক্তির জন্ম হলো এবং তখনি ঘটলো আধুনিক রূপকল্প উপন্যাসের আবির্ভাব। উনিশ শতকের প্রারম্ভেই কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে ; শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগ্রত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতেই বাংলা উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্গম। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণে পূর্ব-বঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে শতবর্ষ বিলম্বিত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে রাখে ঐতিহাসিক অবদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববাংলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ নব্য শিক্ষিতের সমবায়ে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই ক্রমবিকশিত হচ্ছিলো ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পূর্ব-বাংলার নবজাগ্রত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনা-স্নাত কয়েকজন শিল্পীর সাধনায় রচিত হয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রাথমিক ভিত্তি।

ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী মর্মমূলে সামন্ত মূল্যবোধ ধারণ করেও বুর্জোয়া সমাজ-সংগঠনের চিন্তা-চেতনা, উদার মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদে আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৬ সালে গঠন করলো 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। অপরদিকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী অথচ বুর্জোয়া মানবতাবাদে আস্থাশীল লেখক ও শিল্পীরা গঠন করলো 'প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ' (১৯৩৯)। এই দুই সংগঠনের শিল্পীদের মানস-ভূমিতে পূর্ববঙ্গ উপ্ত করেছে স্বাতন্ত্র্যের বীজ, এবং এরাই স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীকে আধুনিক জীবন-চেতনায় অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে আমাদের ঔপন্যাসিক-চেতনাপুঞ্জ প্রবাহিত হয়েছে দুটি ভিন্ন স্রোতে। একটি স্রোতের উৎসে ছিলেন সামন্ত-মূল্যবোধে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিকেরা ; অন্যটি সৃষ্টি হয়েছে উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী কথাকোবিদদের সাধনায়। প্রথম স্রোতটি নির্মাণ করেছেন মোহম্মদ নজিবর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩), কোরবান আলী, শেখ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫) প্রমুখ ; তার দ্বিতীয়টি কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আকবর-উদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) এবং হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)। তবে এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, অসম সমাজ-বিকাশের কারণে বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসলোকে বুর্জোয়া ভাবধারার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল এবং সত্যসন্ধ। কারণ 'যতক্ষণ বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষরত, সে-পর্যন্ত বুর্জোয়া চেতনা-প্রবাহ সত্যসন্ধ।'

নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' (১৯১৪), 'প্রেমের সমাধি' (১৯১৯) এবং 'গরীবের

মেয়ে' (১৯২৩) উপন্যাসত্রয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে পূর্ববাংলার বিকাশমান মুসলিম সমাজের জীবনভাবনা এবং জীবন-বিশ্বাসের বিশ্বস্ত শিল্প-প্রতিমা। 'আনোয়ারা'র নুরুল এসলাম, 'প্রেমের সমাধি'র মতিয়র রহমান এবং 'গরীবের মেয়ে'র নুর মহম্মদ—এই তিন নায়ক চরিত্রের আচার-আচরণ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মূলতঃ ধরতে চেয়েছেন সমকালীন মুসলিম সমাজের প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন সংগ্রাম, এবং সংশয় সংকটের আলেখ্য। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, নজিবর রহমানের সকল উপন্যাসের অন্তস্রোতেই প্রবাহিত হয়েছে সামন্ত-মূল্যবোধের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ। 'আনোয়ারা' উপন্যাসে লেখক তার সবটুকু মনোযোগ ব্যয় করেছেন সতীত্বের মহিমাকীর্তনে যা একান্তই সামন্তমূল্যে বোধজাত। তবে নুরুল এসলামের আর্থিক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশের কথাই পরোক্ষ অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। লেখকের ইঙ্গিত অনুভব সঞ্চারী ঃ

> "এইরূপে নুরুল এসলাম বাণিজ্য প্রসাদাৎ অল্প সময়ের মধ্যে ধনকুবের হইয়া উঠিলেন। অর্থাগমের সহিত তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন দ্বিতল সৌধরাজিতে শোভিত হইল। নুরুল এসলামের অর্থ-সাহায্যে ও স্বজাতিপ্রিয়তায় গ্রামের দুঃস্থ লোকগণের সুখসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি দরিদ্র লোকের শিক্ষার জন্য স্বনামে অবৈতনিক মাইনর স্কুল খুলিয়া দিলেন।"

'প্রেমের সমাধি', 'গরীবের মেয়ে', 'পরিণাম' কিংবা 'হাসনগঙ্গা বাহমনী'তে নজিবর রহমান 'আনোয়ারা'র জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হলেও, পূর্ববাংলার উপন্যাস সাহিত্যের ভিত্তি-নির্মাণে ওগুলোর ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর নয়। মোহম্মদ কোরবান আলীর 'মনোয়ারা' (১৯২৫) এবং শেখ ইদরিস আলীর 'প্রেমের পথে' (১৯২৬) নজিবর রহমানের আনোয়ারা' এবং 'প্রেমের সমাধি' উপন্যাসের দুর্বল অনুকরণ মাত্র। 'আনোয়ারা'র মতোই 'মনোয়ারা' এবং 'প্রেমের পথে' উপন্যাস পতি-ভক্তির মহিমাকীর্ত্তনে সমাপ্ত হয়েছে।

আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে কাজী ইমদাদুল হক হচ্ছেন সেই শিল্পী, যিনি উপন্যাস রচনায় প্রথম মনোযোগী হলেন সমকালের প্রতি। তিনি ছিলেন সংস্কার-মুক্ত, উদার মানবতাবাদী, মননশীল এবং যুক্তিবাদী শিল্প দৃষ্টি-সম্পন্ন ঔপন্যাসিক। তাঁর 'আবদুল্লাহ' (১৯৩৩) উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের পীরভক্তি, ধর্মসংস্কার, পর্দা-প্রথা, আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া মানবতাবাদী প্রতিবাদ। আনোয়ারা'র মত এটিও সমকালীন মুসলিম জীবনবিশ্বাসের শিল্পিত ভাষ্য। তবে 'আনোয়ারা'র ঘটনা সংস্থান কিংবা চরিত্র-চিত্রণ প্রক্রিয়া যেখানে স্রষ্টার ব্যক্তিগত আদর্শ এবং নীতিবোধ-নিয়ন্ত্রিত, সেখানে 'আবদুল্লাহ'র ঘটনাংশ, চরিত্র সৃজন-কৌশল কিংবা পরিপ্রেক্ষিত-উন্মোচন একান্তই মানবতা-শাসিত। মধ্য-বিত্তের বিকাশের ফলে মুসলিম-সমাজের ভিত কিভাবে নড়ে উঠেছে তার চিত্র আছে, আছে গ্রামীণ সমাজের নানামাত্রিক জটিলতা ; তবু স্রষ্টার ধর্ম-নিরপেক্ষ উদার-মানবতাবাদী দর্শনই 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের মৌল-অভিজ্ঞান। কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণে লেখকের বক্তব্য অনুধাবনীয় ঃ

"আশীর্বাদ করি, তোমরা মানুষ হও, প্রকৃত মানুষ হও—যে মানুষ হলে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করতে ভুলে যায়, হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে আপনার জন বলে মনে করতে পারে। এই কথাটুকু তোমরা মনে রাখবে ভাই, অনেকবার তোমাদের বলেছি আবার বলি, হিন্দু-মুসলমানের ভেদজ্ঞান মনে স্থান দিও না। আমাদের দেশের যত অকল্যাণ, যত দুঃখ-কষ্ট এই ভেদ-জ্ঞানের দরুণই সব। এইটুকু ঘুচে গেলে আমরা মানুষ হতে পারব—দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারব।"

পূর্ববাংলার চর-অঞ্চলের মুসলিম কৃষক-সমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আর আশা-নিরাশার চালচিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে কাজী আবদুল ওদুদের নদীবক্ষে (১৯১৯)। মতি আর লালুর প্রেমের রোম্যান্টিক পটে এখানে উন্মোচিত হয়েছে সামন্ত-সমাজের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত মধ্যবিত্তের ভাববাদী প্রতিবাদ—যা কাজী আবদুল ওদুদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ ১৯৪১) মন্তব্য এখানে স্মরণীয় "আপনার লিখিত 'নদীবক্ষে' উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষী গৃহস্থের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরসতা ও নূতনত্বে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি ।'

কল্লোলিত পদ্মার তীরবর্তী সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারা নিয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছে হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী'। এ উপন্যাসে একটা প্রাণময় অস্তিত্ব-দ্যোতক চরিত্র হিসেবে নদীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। পদ্মার নিষ্ঠুর বৈরিতার বিরুদ্ধে তার তীরবর্তী মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়াস পায় কিন্তু নির্মম পদ্মা, গ্রীক ট্রাজেডীর অমোঘ নিয়তির মতো মানুষের স্বপ্ন দেয় ভেঙে। তবু প্রমত্ত পদ্মার প্রতিবেশী সংগ্রামী আর স্বাপ্নিক মজুমিয়া আসগর-বসির-মালেক-কুলসুম-নুরু কখনো মাথা নত করে না, পদ্মার ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়েও তারা বার নতুন আশার স্বপ্ন বোনে পাড়ি জমায় সুদূরে ভেসে ওঠা কোনো-এক সোনালি-রূপালি দ্বীপে।

যেমন কাজী আবদুল ওদুদ অথবা ইমদাদুল হকের উপন্যাস, তেমনি হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' ও ভাববাদী মানবতা-চঞ্চল জীবনসৃষ্টির শিল্প প্রতিমা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, 'নদী ও নারী উপন্যাসে হুমায়ুন কবিরের সর্বজ্ঞ-সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে স্বচ্ছল কৃষিজীবীদের প্রতি জীবনাচরণের দৃষ্টিতে কৃষক হলেও সম্পত্তি বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে তারা অকপটেই উন্মোচন করে দিচ্ছে তাদের সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি। তবু এক মানতেই হবে আশাবাদে প্রত্যাশী হুমায়ুন কবির মূলতঃ নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাবসত্যময় আবেগ-জীবনেরই রূপকার।

বিপরীতধর্মী দুই সামাজিক-শ্রেণীর বিরোধের পটভূমিতে বিন্যস্ত এবং জনৈক লতিফ দারোগার বিপর্যস্ত জীবন-কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত আকবরউদ্দীনের 'মাটির মানুষ' (১৯৩১) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে বিশ শতকের প্রথম দিককার গ্রাম বাংলার স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র। চরিত্র-চিত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের

বিচারে আকবরউদ্দীনের 'মাটির মানুষ' বিভাগ-পূর্ব কালের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

তিরিশের পশ্চিমবঙ্গীয় উপন্যাসের প্রকরণ-কৌশল এবং মনোবিশ্লেষণ রীতিকে অঙ্গীকার করে এ-পর্বেই ঘটে আবুল ফজলের দীপ্র আবির্ভাব। 'কল্লোল' (১৯২৩) 'কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি'র (১৯২৭ ঔপন্যাসিকদের হাতে বাংলা-সাহিত্যে যে নাগরিক-চেতনার উদ্বোধন, আবুল ফজলই প্রথম তা আমাদের উপন্যাসে অঙ্গীভূত করলেন ; এবং এ-অর্থেই তিনি পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যে এক নতুন মাত্রার জনয়িতা। 'চৌচির' (১৯২৭), 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' (১৯৪০) এবং 'সাহসিকা' (১৯৪৬) উপন্যাসে তিনি মনোবিশ্লেষণ-রীতিতে উপস্থিত করেছেন মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন-চেতনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে মুসলিম মধ্যবিত্ত-মানসের মৌল-লক্ষণ সমাজবিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং একই সাথে সমাজ সংশ্লিষ্ট কর্মচেতনা 'চৌচির' উপন্যাসের নায়ক তসলিম চরিত্রের মধ্য দিয়ে শিল্প-মূর্তি লাভ করেছে। এ-প্রসঙ্গেই স্মরণীয় 'চৌচির' সম্পর্কে আবুল ফজলের কাছে লেখা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য ঃ

> "আপনার 'চৌচির' গল্পটি আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও পড়েছি। আমার পক্ষে এ গল্প বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এই প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি। আপনাদের মতো লেখকদের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে এই আশা করে রইলুম।"

আবুল ফজলের 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' উপন্যাস নাগরিক মধ্যবিত্তের হার্দিক রক্তক্ষরণের শিল্প-প্রতিমা। আর 'সহসিকা' হচ্ছে বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্তের স্বাপ্নিল জীবনের বিশ্বস্ত শব্দরূপ। নাগরিক চেতনার প্রথম অঙ্গীকারে চেতনা-প্রবাহ রীতির সীমিত বিন্যাসে, বিষয়-নির্বাচনের বৈচিত্র্যে, সমাজ-অচলায়তনে বন্দী নারী ব্যক্তিত্বের উন্মোচনে এবং প্রকরণ-পরিচর্যার পরীক্ষা-প্রবণতায় আবুল ফজলের এই ত্রয়ী-উপন্যাস উন্মেষ-পর্বের পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যে সংযোজন করেছে স্বতন্ত্র এবং সুদূর সঞ্চারী মাত্রা।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সৈনিক আবুল ফজলের উপন্যাসে উদার মানবতাবাদী-চেতনা, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিশীলিত মননের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর শিল্পীদের রচনার শিল্প-সার্থকতা আবুল ফজলের সৃষ্টিতে অনুসন্ধান অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযৌক্তিক। 'কল্লোলে'র চেতনা আবুল ফজল মেধা দিয়ে অনুভব করেছেন মাত্র, প্রাত্যহিক জীবন-অভিজ্ঞতায় তা সমৃদ্ধ নয় মোটেই। কারণ পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তশ্রেণীর তখনো শৈশবকাল। তাই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তশ্রেণীর শতবর্ষের অন্ত-অসঙ্গতি, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং বিপন্ন মূল্যবোধের শব্দরূপ তাঁর রচনায় প্রত্যাশিত নয়। এ প্রসঙ্গে 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' উপন্যাসের' লেখকের কথা শীর্ষক শেষ অধ্যায় থেকে একটি এলাকা উদ্ধৃত করা এখানে অনিবার্য ঃ

" আধুনিক মানুষকে নিয়া গল্প লিখিতে বসাই এক ঝকমারি ব্যাপার। জানাইবার মতো, লিখিবার মতো কী সংবাদই বা ইহাদের আছে? আজ সকলের মনের দুর্গ মনেই তো ধসিয়া পড়িতেছে। কোন ভয়াবহ বিস্ফোরণ আজ কোথায়? কাজেই, বলা বাহুল্য কিছু একটা অঘটন ঘটিবার সমস্ত আশা রসিদ নিজ গুণেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। এই গল্পের অকাল-মৃত্যু সেই ডাকিয়া আনিয়াছে। লেখকের বিন্দু-বিসর্গ দায়িত্ব ইহাতে নাই।"

প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে গ্রামীণ সংগ্রামশীল মানুষ এবং নবজাগ্রত মুসলিম মধ্য বিত্তের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে ধারণ করেই পূর্ববাংলায় উপন্যাসের অভিযাত্রা। এ-পর্বের উপন্যাস সমূহে প্রাধান্য পেয়েছে সামন্ত-মূল্যবোধ সমূহ, তবু মানবতাবাদী চেতনার শিল্পরূপ অঙ্কনের প্রয়াস এ-পর্বে সীমিত হলেও, একেবারে উপেক্ষিত নয়। বিভাগ-পূর্ব কালের উপন্যাস প্রধানতঃ গ্রাম্যজীবন কেন্দ্রিক; তবে কখনো কখনো সেখানে এসেছে বিকাশমান নগরজীবনের খণ্ডিত ছবি। প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বের এই উত্তরাধিকারের ওপরেই নির্মিত হয়েছে বিভাগোত্তর কালের উপন্যাস সাহিত্য।

[দুই]

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'পাকিস্তান' নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রের শৃঙ্খলে পূর্ববঙ্গের উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর অগ্রযাত্রা হলো বাধাপ্রাপ্ত। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব বাংলার উঠতি পুঁজিবাদী গোষ্ঠী এবং নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণী অনুভব করলো তাদের অস্তিত্বের অন্তর্সংকট। পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজির আর্থিক স্বার্থেই পূর্ববাংলা রূপান্তরিত হল আধা-ঔপনিবেশিক আধা সামন্তবাদী একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ-বিকাশের এই প্রতিবন্ধকতা শিল্পীর চৈতন্যকে অনিবার্যভাবেই প্রভাবিত করলো। ফলতঃ বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী শিল্পীর মানসলোকে উপ্ত হলো সংকটের বীজ।

আধা-ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো ১৯২৮ সালে। ১৯৫২ সালে সংঘটিত হলো অনেকটা অসংগঠিত এবং আকস্মিক ভাবে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষা আন্দোলন। আমাদের রাজনীতি এবং সমাজ-সংস্কৃতির অন্তর্ভুবনে ভাষা-আন্দোলন সঞ্চার করলো স্বাধিকার প্রত্যাশী চৈতন্য, বায়ান্নর রক্তিম প্রতিবাদ পূর্ব বাংলার জনমনে যেমন তোলে ঊর্মিল আলোড়ন, তেমনি সামন্ত-মূল্যবোধসিক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুদৃঢ় পলল ভিতও হয়ে ওঠে শিথিল। মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক এবং মার্কসীয় চেতনাপুষ্ট শক্তিসমূহ পূর্ববাংলার সমাজজীবনের প্রায় সকল স্তরে অতি দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে থাকে— যার ফলে ১৯৫৪-র সাধারণ নির্বাচনে বেণিয়াপুঁজি ও সামন্তশক্তির ধারক মুসলিম লীগ সকল প্রয়াস সত্ত্বেও পরাজিত হয়; এবং প্রগতিশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট অর্জন করে বিপুল বিজয়। অতঃপর ১৯৫৮-র আগস্ট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের

ফলস্বরূপ বার বার মন্ত্রীসভার পতন সুগম করে দেয় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ক্ষমতা-দখলের পথ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খৃস্টাব্দে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তন-পূর্ব কাল-পরিসর এ দেশের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিশেষ পর্যায়। তাই আলোচ্য সময়-সীমায় রচিত উপন্যাসসমূহ আমরা বাংলাদেশের প্রথম পর্ব হিসাবে বিবেচনা করেছি। সময়ের এই পর্ব-বিভাজন মোটেই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নয় ; সাতচল্লিশোত্তর পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিন্যাসের পরি প্রেক্ষিতে এ-বিভাজন অবশ্যই সমাজসত্য-সংমত।

বিভাগোত্তর কালে প্রথম দশকে উপন্যাস রচনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাদের মধ্যে আবুল-ফজল, আবুল মনসুর, আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), আবু ইসহাক (১৯২৬), আকবর হোসেন (১৯১৭-১৯৮১), কাজী আফসারউদ্দীন (১৯২১-), আবু রুশদ (১৯১৯-), ইসহাক চাখারী (১৯২২), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯২৩), শওকত ওসমান (১৯১৭), দৌলতুন্নেছা খাতুন (১৯২২-), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬), আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭, সময়ের এ পর্বে প্রকাশিত উপন্যাসসমূহ প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক ঘটনাংশ আশ্রয় করে নির্মিত হয়েছে, পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হলেও ঢাকা শহরের প্রকৃত নগরায়ণ বিলম্বিত হয়েছে ঐতিহাসিক কারণেই। ফলতঃ আমাদের শিল্প-সাহিত্যেও নাগরিকচেতনার অনুপ্রবেশ হয় বিলম্বিত। তবু, সীমিত অর্থে হলেও, প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আবুল ফজল এবং আবু রুশদের শিল্পকর্মে নগরচেতনার প্রতিভাস দুর্লক্ষ্য নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে বাদ দিলে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকরা আঙ্গিক-নির্মিতি, ভাষা ব্যবহার এবং প্রকরণ প্রসাধনে একান্তই অসতর্ক, অমনোযোগী এবং অমিতাচারী।

আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত হয় আবুল ফজলের দুটি উপন্যাস--'জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮) এবং 'রাঙ্গা প্রভাত' (১৯৫৭)। 'জীবন পথের যাত্রী' ফ্রয়েডীয় মনো-বিকলনের শিল্পরূপ। এ-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা 'কল্লোলীয়' নাগরিক চেতনার বৃত্তে অনুসন্ধান করেছে জীবনের সুস্থ মূল্যবোধ। তবে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন পর্যবেক্ষণ অন্তে শুভ্রতা আর সুস্থতার জন্যে আবুল ফজলের আকাঙ্ক্ষা এবং সে-আকাঙ্ক্ষার শিল্পমূর্তি-সৃজনে এ-উপন্যাসে ঘটেনি প্রসঙ্গ ও প্রকরণের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন। গ্রাম ও নগরজীবনের পটভূমিকায় বিস্তৃত 'রাঙা প্রভাত' উপন্যাসে প্রতিভাত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শনের প্রতি আবুল ফজলের আন্তরিক বিশ্বাস। আদর্শবাদী চারুবাবুর ভাবশিষ্য কামালের সঙ্গে তাঁর কন্যা মায়ার প্রেমের রোম্যান্টিক-মেলোড্রামাটিক পটে, রাঙা প্রভাতের প্রতীকে, লেখক এখানে শোষণহীন সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত এক সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নের ছবি এঁকেছেন। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), তেমনি আবুল ফজলও যাত্রা শুরু করেছেন ফ্রয়েড থেকে, আর

পরিণতিতে গ্রহণ করেছেন কার্ল মার্কসকে। তবে মার্কসবাদী চেতনা প্রকাশে 'রাঙা প্রভাত' উপন্যাসে আবুল ফজল শৈল্পিক-সংযম রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন; ফলে এটি পরিণত হয়েছে একান্তই উদ্দেশ্যপ্রধান রচনায়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের সিদ্ধান্ত এখানে স্মরণীয় :

> "তিনি সচেতনভাবে উদ্দেশ্যপ্রধান শিল্পী। তার রচনার নায়ক-নায়িকা প্রধানতঃ সমাজসেবী, দেশপ্রেমী; প্রচলিত অর্থে ধর্মান্ধ নয়, উদার মানবধর্মে বিশ্বাসী। এ উপন্যাসেও পাকিস্তানের পটভূমিতে মুসলিম তরুণ ও হিন্দু তরুণীর মিলনের মধ্য দিয়ে তিনি বহুক্ষয়ী হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান কল্পনা করেছেন। তবে উদ্দেশ্যপ্রধান রচনার সাধারণ দুর্বলতা বক্তৃতাময় সংলাপ, ভাবাদ্রর্তা, একমুখী আদর্শ চরিত্র ইত্যাদির থেকে 'রাঙা প্রভাত' মুক্ত নয়।'

গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত শওকত ওসমানের 'জননী' (১৯৬১) উপন্যাসে শব্দবন্দী হয়েছে লেখকের উদার মানবতাবাদী জীবনজিজ্ঞাসা। পশ্চিম বাংলার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে মহেশডাঙা নামক গ্রামের কোন এক দরিয়া বিবির রূপকে এখানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সমাজ-শৃঙ্খলে বন্দী গ্রামীণ নারীর নীরব সহনশীলতা এবং আত্মত্যাগের ইতিকথা। 'জননী' মনীষাদীপ্ত উপন্যাস নয়, বরং আবেগধর্মী। প্রতিকূল সমাজ-পরিবেশের বিরুদ্ধে তীব্র জীবনসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এ-উপন্যাসে চিত্রায়িত বাঙালি-মাতৃস্নেহ। সমাজ-সত্য আছে, আছে গ্রামীণ দেবতাদের লিবিডো-তাড়িত বিকৃত বাসনার চিত্র—তবু 'জননী'র মুখ্য উপজীব্য মাতৃত্বের গৌরব-গাথা। যেমন সমাজ সত্য উপস্থাপনে ও চরিত্রচিত্রণ নৈপুণ্যে, তেমনি প্রকরণ পরিচর্যায় শওকত ওসমানের 'জননী' পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম।

ঘটনাংশ এবং প্রকরণের শৈল্পিক সমন্বয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' (১৯৪৮) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের একটি দীপ্তমান এবং অনতিক্রান্ত শিল্প-প্রতিমা। এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে ধর্মব্যবসায়ী মজিদের অস্তিত্বের অন্তর্সংকট। বাহ্যমুখী জীবন নয়, বরং মজিদের আভ্যন্তর সংকট সংশয় এবং নৈঃসঙ্গ্য এ উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য। মজিদ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক এখানে চিত্রিত করেছেন পূর্ববাংলার ধর্মব্যবসায়ীদের শোষণ ও ভণ্ডামীর চিত্র। ওয়ালীউল্লাহর পরবর্তী রচনা 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) কিংবা 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে যে অস্তিত্বের অভীপ্সা তার পূর্বাভাস 'লালসালু'তেই লক্ষণীয়। লালসালুতে আচ্ছাদিত 'মাছের পিঠের মতো মাজারে'র দিকে জমিলার পদাঘাত—সঙ্কেত অস্তিত্বের শুদ্ধ সত্তায় উত্তরণেরই প্রতীক-চিত্র। আঙ্গিক রচনাশৈলী পরিস্রুত ভাষা, পরিমার্জিত গীতময়তা এবং প্রতীক-উপমা-উৎপ্রেক্ষার সমন্বয়ে 'লালসালু' হয়ে উঠেছে একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম। 'লালসালু' উপন্যাসে লেখকের প্রকরণ-সতর্কতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'লালসালু'তে ওয়ালীউল্লাহ প্রধানতঃ ব্যবহার করেছেন ইমপ্রেশনিস্ট প্রতীকী-পরিচর্যা। যেমন, প্রকৃতির অনুষঙ্গে, তাহেরের বাপের নিরস্তিত্ব হওয়ার প্রতীকী পরিচর্যা :

"দুদিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হওয়া, আর দলে-ভারী কালো কালো মেঘে লড়াই ; মহব্বত নগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখির মত আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মত শো করে নেমে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতীর মত ঠেলে এগিয়ে যায়।"

আবু ইসহাকের স্কেচধর্মী রচনা 'সূর্যদীঘল বাড়ী'তেও ১৯৫৫ চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ-জীবনের কুসংস্কার, মহাজনী শোষণ, জোতদারের বিকৃত লালসা, দরিদ্র মানুষ জয়গুন-হাসুদের জীবন-সংগ্রামের ছবি। জয়গুনদের গ্রাম ছেড়ে শহরে নির্বাসন আসলে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সংকেত। বিষয়-গৌরবে ব্যতিক্রমী হলেও, লেখকের অমীমাংসিত জীবনদৃষ্টি, সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং সমাজ-প্রগতির ধারা অনুসন্ধানে মধ্যবিত্তসুলভ ভ্রান্তি ক্ষুণ্ণ করেছে 'সূর্যদীঘল বাড়ী'র শিল্পমূল্য। তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' ধর্মজীবীদের শোষণে নিষ্পেষিত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে উন্মূলিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম-জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী অসংখ্য জয়গুন-হাসুদের জীবন-যাপনের বিশ্বস্ত রূপবন্ধ।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'-এ (১৯৫২ সালে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত : গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৬০) মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণে জীবন-দীক্ষণের প্রতিশ্রুতি আছে ; তবে সে প্রতিশ্রুতি অতি রোম্যান্টিকতার মোহাবেশে সহসাই দ্বিধান্বিত। লেখকের সমাজবোধ ও ইতিহাসচেতনা বুর্জোয়া রোম্যান্টিকতার চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে ফলতঃ প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি বিচ্যুৎ হয়ে উপন্যাসটি মহৎ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে অঙ্কুরোদ্গমের পবেই বিনষ্ট করেছে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী-র ভাষাবোধ এবং পরিচর্যা সচেতনতা তাঁর প্রাতিস্বিক শিল্প চৈতন্যেরই স্বাক্ষরবহ।

গ্রামীণ মানুষের জীবন যাপনের একদিন-প্রতিদিনের শব্দরূপ কাজী আফসারউদ্দীনের 'চর ভাঙ্গা চর' (১৯৫১)। এটিই পূর্ববাংলার প্রথম উপন্যাস, যেখানে ঔপন্যাসিক, সীমিত হলেও, সচেতনভাবে প্রকৃতিকে উপস্থাপন করেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। মানুষ নয়, বরং প্রকৃতিই 'চর ভাঙ্গা চর'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। বর্গীর আক্রমণ থেকে পাঠান এবং মোঘল আমলে ধলেশ্বরী-চরের সংগ্রামশীল মানুষের জীবন চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। কাজী আফসারউদ্দীনের 'কলাবতী কন্যা' (১৯৫৬) এবং 'নোনাপানির ঢেউ' (১৯৫৮) এ-পর্বের দুটো জনপ্রিয় উপন্যাস। দৌলতুন্নেছার 'পথের পরশ' (১৯৫৭) ; ইসহাক চাখারীর 'পরাজয়' (১৯৫৪), 'মেঘবরণ কেশ' (১৯৫৫) প্রভৃতি উপন্যাস কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্ম ভীরু, স্থবির এবং অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত গ্রাম জীবনের বিশ্বস্ত রূপচিত্র। তবে নন্দনতত্ত্বের বিচারে, শিল্প হিসাবে এ গুলোর মূল্য যে অকিঞ্চিৎকর, একথা বলাই বাহুল্য। ঘটনাভুক পাঠকের সুখদ মনোরঞ্জনের কারণে আকবর হোসেনের 'অবাঞ্ছিত' (১৯৫০), 'কি পাইনি' (১৯৫১), 'মোহমুক্তি' (১৯৫২) প্রভৃতি উপন্যাস এ পর্বে লাভ করে সহজ জনপ্রিয়তা ; শিল্পবোধ এবং সমাজ চেতনার অভাবে, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আকবর হোসেন কোন উপন্যাসেই সচেতন পাঠকের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেননি।

আবু রুশদ 'সামনে নতুন দিন' (১৯৫৬) উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণা নগরজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন; তবে শিল্প-সচেতনতার অভাবে তাঁর এ প্রয়াস শিল্পিত হয়ে ওঠেনি। মধ্যবিত্তের জীবনসঙ্কট নয়, বোধ করি, নগরজীবনের উপরিতলের চিত্র অঙ্কনেই তিনি অধিক উৎসাহী। কেন্দ্রানুগ শক্তির অভাবে জনৈক রহমান সাহেবের জীবনের ঘটনাগুলি একসূত্রে মিলিত হতে পারেনি এবং এখানেই এ উপন্যাসের আঙ্গিকগত সঙ্কট। তবু আবু রুশদের 'সামনে নতুন দিন' উপন্যাস এ অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ যে, ষাটের দশকে আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে নাগরিক চেতনার যে প্রতিভাস, তার প্রাথমিক প্রকাশ এখানে দুর্লক্ষ্য নয়।

সরদার জয়েনউদ্দীনের 'আদিগন্ত' (১৯৫৬) গ্রাম-বাংলার নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের ভাষাচিত্র। সমাজসচেতন আশাবাদ ধ্বনিত হলেও, ভাষা-ব্যবহার ও পরিচর্যার শৈথিল্যে এবং মননশীলতার অভাবে শিল্প বিচারে 'আদিগন্ত' দুর্বল সৃষ্টি। শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) নির্মিত হয়েছে দক্ষিণ বাংলার মাঝিদের জীবনকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের চরিত্রগুলো লেখকের মধ্যবিত্তসুলভ রোম্যান্টিকতার চোরাবালিতে আত্মসমর্পণ করেছে; সংগ্রামশীল হওয়া সত্ত্বেও অন্তরধর্মে তারা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবাবেগপূর্ণ এবং উচ্ছ্বাস প্রবণ। তবু এ উপন্যাসের কবিতাস্পর্শী শব্দস্রোতে প্রতিদিনের নদীময় দক্ষিণ বাংলা কল্লোলিত যেন। এ পর্বেই প্রকাশিত হয় তাঁর আরো তিনটি উপন্যাস—'আশিয়ানা' (১৯৫৫), 'আলম নগরের উপকথা' ১৯৫৫) এবং 'জীবনকাব্য' (১৯৫৬)। যুগ পরম্পরায় প্রসারিত 'আলম নগরের উপকথা' উপন্যাসে উপকথা এবং ইতিহাসের ঘটেছে পরস্পর অন্তর্বয়ন মিলন। এ উপন্যাস লেখকের ইতিহাসজ্ঞান, সময় ও সমাজ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরবাহী। অবক্ষয়িত সামন্ত পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রাচীন সমাজ কাঠামো ভাঙ্গনের রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে এখানে উৎসারিত হয়েছে নতুন সমাজ নির্মাণের অভিলাষ।

গ্রাম ও নগরজীবনের পটভূমিতে বিধৃত এবং শিল্পচেতনা ও সমাজবোধের সমন্বয়ে রচিত আবুল মনসুর আহমদের 'জীবন ক্ষুধা' (১৯৫৫) এ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক হালিম নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের সচেতন প্রতিনিধি। এ-উপন্যাসের বিস্তৃতপটে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনা। জীবনার্থ ভাষা-ব্যবহার এবং ঘটনা-বিন্যাসের বিচারে 'জীবন ক্ষুধা' আবুল মনসুর আহমদের একটি নিরীক্ষাধর্মী শিল্পকর্ম।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭, সময়ের এ পর্বে প্রকাশিত অধিকাংশ উপন্যাসেই উৎসারিত হয়েছে ঔপন্যাসিকদের বুর্জোয়া মানবতাবাদী জীবন-ভাবনা। আলোচ্য কালসীমায় রচিত প্রায় সব উপন্যাসেই উদ্ভাসিত হয়েছে পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন। এ পর্বের ঔপন্যাসিকরা ঘটনা নির্বাচনে প্রধানতঃ গ্রামমুখীন। তবে আবুল ফজল, আবু রুশদ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখের রচনায় নাগরিক-চেতনার সীমিত প্রকাশ এ-পর্বেই লক্ষণীয়। ব্যক্তির সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার অন্তর্জীবনের বহুমাত্রিক

জটিলতার উন্মোচন-প্রয়াসও এ-পর্বের উপন্যাসের অন্যতম স্বভাবলক্ষণ। প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, এ সময়ের অধিকাংশ উপন্যাসই মহৎ-সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি, কেবলমাত্র লেখকদের সংশয়ী এবং দ্বিধান্বিত সমাজবোধের জন্য। প্রাক্ সাতচল্লিশ সময়ের ঔপন্যাসিক মূল্যবোধের সঙ্গে, এ পর্বে যুক্ত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একাকীত্ববোধ এবং অন্তরমুখিতা, আবুল ফজলের নাগরিকচেতনা, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সমাজবাদী জীবন-ভাবনা এবং শামসুদ্দীন আবুল কালামের নঞর্থক রোম্যান্টিকতা। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বায়ান্নর রক্তিম উজ্জীবনের ফলেই এ পর্বের উপন্যাসসমূহ জীবনকেন্দ্রিক, সত্য অন্বেষী এবং মৃত্তিকামূল সংলগ্ন।

[তিন]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার শিল্পীদের মনে মননে স্নায়ুতে যে প্রগতিশীল চেতনার জন্ম দিয়েছিল, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরে প্রবর্তিত আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে তা সাময়িকভাবে হয়ে গেল স্তব্ধ। পূর্ববাংলায় নেমে এল সামরিক শাসনের বর্বর অত্যাচার। নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামনে তখন অবরুদ্ধ সময়ের দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল, ধাতব অস্ত্রধারীর নিষ্ঠুর নিপীড়ন। বন্দী সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের শিল্পীরা শৃংখল মোচনের পথ নির্দেশ নয় বরং হন্যে হয়ে খুঁজলেন এক চিলতে আশ্রয়। স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী পূর্ববাংলার প্রগতিশীল যে-সব শিল্পী সময়ের প্রথম পর্বে সত্যসন্ধানী এবং জীবনকেন্দ্রিক; ১৯৫৮ সালের পর তাঁরাই হলেন জীবন পলাতক, ক্রমবিকাশে শঙ্কিত এবং আত্মবোমন্থনে পরিতৃপ্ত। মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের মতোই এরা তখন বেতার, টেলিভিশন, বি এন. আর. লেখক সংঘ এবং প্রেস-ট্রাস্টের আচ্ছাদনে পরিণত হলেন ঔপনিবেশিক শাসকের বেতনভুক সেবাদাসে। কেউবা আবার সমাজবাদী জীবন-ভাবনাকে সরাসরি প্রকাশ করতে ভীত হলেন, আশ্রয় নিলেন রূপক প্রতীক ও রূপকথা পুরাণের জগতে। কতিপয় ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্টলোকে হাতছানি দিল ফ্রয়েড—ফলে আমাদের ঔপন্যাসিক চৈতন্যে এলো লিবিডো-তাড়িত, রিরংসাপ্রিয়, পলায়নবাদী এবং বিবরসন্ধানী নঞর্থক জীবনভাবনা। এবং এ ভাবেই যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজের পচনশীলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলো পূর্ববাংলার বেশ কিছু ঔপন্যাসিক। সমকালীন ঔপন্যাসিক-চৈতন্যের এই সংকট সংশয় ও পরাভব কিভাবে আমাদের কথাসাহিত্যকে গ্রাস করেছিল, সমালোচকের লেখায় তার রূপ ধরা পড়েছে ঃ

> "আমরা যেন এক রুদ্ধ ঘরে বাস করছি। সব দরজা জানলা বন্ধ, বাইরে আকাশ তাম্রাভ, হাওয়া নেই এবং পাখিগুলির কণ্ঠ স্তব্ধ। আমাদের ঘরে গুমোট হাওয়া বহু ব্যবহৃত। আমরা শান্ত, নিঃসংগ, বিফল আত্মকণ্ডূয়নে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি, একটা বিশ্রী ঘানির সংগে যুক্ত অবস্থায় অর্থহীন পরিক্রমণে আমরা আমাদের সময়কে ক্রমাগত পুড়িয়ে নিঃশেষ করছি।"

বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশে বাস করেও সমকাল-চঞ্চল জীবনাবেগ, যুগ সংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দ্রোহ-বিদ্রোহ অঙ্গীকার করে মহৎ শিল্পী-চৈতন্য অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানস-ভূমি। সামরিক শাসনের ভয়ে আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক সমাজ-সংক্ষোভ আর জীবন সত্য ভুলে গেলেও, ব্যতিক্রম যে দু'একজন ছিলেন না, এমন নয়। স্বৈর-শাসনের শৃঙ্খলে বাস করেও কোন কোন ঔপন্যাসিক ছিলেন সত্য-সন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী এবং প্রগতিশীল সমাজ ভাবনায় উচ্চকিত।

১৯৫৮ সাল থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব-পর্যন্ত সময় সীমায় আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে ধরা পড়েছে উপযুক্ত দুটি প্রধান চেতনা-স্রোত। বাংলা দেশের স্বাধীনতার পর, সব কিছুর মতোই, আমাদের সাহিত্যেও এলো পরিবর্তন। তাই ১৯৫৮ থেকে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত উপন্যাসসমূহকে আমরা বিবেচনা করব দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস হিসেবে।

*জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে 'জননী' স্রষ্টা শওকত ওসমান এ-পর্বে সংরক্ত-সমকাল এবং সমাজ-বাস্তবতা এড়িয়ে গেলেন : আশ্রয় নিলেন রূপক-প্রতীক ও রূপকথার জগতে। আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত হয় তাঁর চারটি উপন্যাস— 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২), 'সমাগম' (১৯৬৭), 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৮), এবং 'রাজা উপাখ্যান' (১৯৭০)। 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে আইয়ুব-শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার শোষিত মানুষের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে— প্রতীকী-ব্যঞ্জনায়। 'প্রতিধ্বনির সাহায্যে গিরি-কন্দরের গভীরতা এবং দূরত্ব-জ্ঞাপনের পন্থায় রচিত' 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে শওকত ওসমান স্বকাল-সমকাল থেকে যদিও পলাতক, তবু বিষয়-ভাবনা এবং আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। 'দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে, বান্দী কেনা সম্ভব- ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না' —নায়কের এ-উক্তি -সর্বকাল, সর্বদেশের জন্যই সমান সত্য। তাঁর 'রাজা উপাখ্যান ও প্রতীকাশ্রয়ী রচনা। সাহসী হবমুজ কর্তৃক দুটো গোখরো সাপ দ্বারা শৃঙ্খলিত সম্রাট জাহুক ও অন্যান্যদের মুক্তিলাভের রূপক চিত্রে এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষী ও মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিকথা। ষাটের দশকে সামরিক-শাসনের শৃঙ্খল মোচনের জন্য মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিকথা। ষাটের দশকে সামরিক শাসনের শৃঙ্খল মোচনের জন্য মুক্তিকামী বাঙালির সংগ্রাম-সংকল্প ও প্রত্যয় প্রত্যাশা, এ-উপন্যাসে শিল্পিত ভাষ্যে রূপায়িত হয়েছে।

শওকত ওসমান 'সমাগম' উপন্যাসে বিচরণ করেছেন রূপকথার রাজ্যে। 'মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক। ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদীগণ ও তাদের অনুচরেরা ধ্বংস হোক।· মানুষের নির্বোধতম সংগঠন হিসেবে ধ্বংস হোক যুদ্ধ। সুখীতর, আরো সমৃদ্ধিতর হোক আগামী দিনের পৃথিবী।' এই-ই হচ্ছে 'সমাগম' উপন্যাসে শওকত ওসমানের মৌল-অভিজ্ঞান। নগরজীবনের পটে বিন্যস্ত 'চৌরসন্ধি' উপন্যাসে শওকত ওসমান পুঁজিপতি সমাজের হীন ষড়যন্ত্র এবং শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। শওকত

ওসমানের এ-সব উপন্যাসে রূপকের মধ্যে দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে অবরুদ্ধ জাতিসত্তার স্বাধিকার স্পৃহা। আঙ্গিকগত অভিনবত্বে এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যে শওকত ওসমানের উপন্যাস সমূহ বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকর্ম।

দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দু'টো উপন্যাস—'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ-কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের মাজারে জমিলার পদাঘাত-সংকেত অস্তিত্বের যে অভীপ্সা প্রতীকায়িত এ-দু'টো উপন্যাসে সেই অস্তিত্ব চেতনা হয়েছে আরো বর্ণায়িত এবং সুস্পষ্ট। ভয়-ভীতি অতিক্রম করে 'চাঁদের অমাবস্যা'র আরেফ আলী এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'র খতিব মিঞা উত্তীর্ণ হয়েছে পরম নির্ভীক সত্তার শুদ্ধ জাগরচৈতন্যে। 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানবমুখীন এবং কল্যাণময় অস্তিত্ববাদী দর্শনে হয়েছেন স্থিতধী। আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লার বিশেষত্ব হলো তিনি বিষয়াংশ-নির্বাচনে এবং আঙ্গিক-নির্মিতিতে সতত নিরীক্ষাপ্রিয় ও পরীক্ষা-প্রবণ। তাঁর শিল্পী-চৈতন্য ক্রম অগ্রসরমান ; স্বাতিক্রমণই তাঁর জীবনার্থের মূলকথা। চরিত্রের আভ্যন্তর সংকট ও সংক্ষোভ উপস্থাপনে ওয়ালীউল্লাহ তাঁর উপন্যাসে কখনো ব্যবহার করেছেন ইমপ্রেশনিস্ট পরিচর্যা, কখনো এক্সপ্রেশনিস্ট ; আবার কখনো বা পরাবাস্তববাদী পরিচর্যা। যেমন 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে বিকৃত-বিপর্যস্ত মুহাম্মদ মুস্তাফার অস্তিত্বহীনতা উপস্থাপনে পরাবাস্তববাদী পরিচর্যা ঃ

> "সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, এমন সময় সেটি অকস্মাৎ কাঁপতে শুরু করে ; সুটকেসটি যেন একটি শুষ্করক্ত গাঢ় রঙের কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো এবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের দিকে তাকায়। তবে কলিজাটা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেখানেও হাজির হয় এবং আকারে সহসা ছোট হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মত ডানা ঝাপ্টাতে শুরু করে। মুহাম্মদ মুস্তাফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এই আশায় যে পতঙ্গটি পুড়ে মারা যাবে, তার চঞ্চল ক্ষুধার্ত ডানা স্তব্ধ হবে, কিন্তু পতঙ্গটি স্তব্ধ হয় না। এবার মেঝের দিকে তাকালে সেখানেও কলিজাটি দেখতে পায় ; মেঝের ওপর সেটি ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত ধড়ফড় করছে যেন।"

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস আমাদের নিয়ে যায় অস্তিত্বের প্রগাঢ় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বিমিশ্র সত্তা থেকে শুদ্ধ সত্তার অভিমুখে। দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে, ভাষা প্রয়োগে, প্রতীক-চিত্রকল্প, উপমা-উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে এবং জীবনার্থের প্রাতিস্বিকতায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ত্রয়ী উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে সূর্য-প্রত্যাশী স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী।

পঞ্চাশের দশকে মার্কসবাদী চেতনায় আত্মস্থ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীও এ পর্বে অনুসন্ধান করলেন জীবনের সহজ নিরাপত্তা এবং সমর্পিত হলেন রোম্যান্টিক

নীলিমা ভ্রমণে। এ পর্বে প্রকাশিত তিনটি উপন্যাসেই ['শেষ রজনীর চাঁদ' (১৯৬১) 'নাম না জানা ভোর' (১৯৬২) এবং 'নীল যমুনা' (১৯৬৪)] তিনি হারিয়ে ফেললেন 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' এর বস্তুনিষ্ঠা ; সংরক্ত সমকাল ভুলে গিয়ে আত্মমগ্ন হলেন রোম্যান্টিক স্বপ্নচারিতায়। তাঁর 'শেষ রজনীর চাঁদ' ঢাকা শহরে একই বাড়ীর বাসিন্দা চারটি পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত একটি শাহরিক জীবনের উপন্যাস। 'নাম না-জানা ভোর' উপন্যাস নিম্ন মধ্যবিত্তের সন্তান ভাগ্যান্বেষী আলমের উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে উত্তরণের ইতিকথা। 'নীল যমুনা' উপন্যাসে গাফফার চৌধুরী নীহাররঞ্জনীয় গোয়েন্দা গল্পের রহস্য উন্মোচনে হয়ে পড়েছেন বিভ্রান্ত। তবে নগর-চেতনার প্রকাশ এবং স্বতন্ত্র ভাষা ও আঙ্গিক নির্মিতির জন্য গাফফার চৌধুরীর এ সব উপন্যাস আমাদের কথাসাহিত্যের অন্যতম শিল্পকর্ম।

'কাশবনের কন্যা' রচয়িতা শামসুদ্দীন আবুল কালামও আলোচ্য পর্বে জীবন পলাতক। সংক্ষুব্ধ পঞ্চাশ-ষাটের দশক বিস্মৃত হয়ে 'কাঞ্চনমালা'য় (১৯৬১) তিনি বিচরণ করলেন বেদে জীবন ভিত্তিক লোক কাহিনীর ধূসর জগতে। 'কাঞ্চনমালা'র কাহিনী নিরাবিল পুঁথির জগতে প্রসারিত। সমগ্র উপন্যাসের পটভূমি ও বক্তব্য পূর্বাপর পূর্ববাংলার বিখ্যাত লোকগীতিকা 'মহুয়া'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে লোককাহিনীকে আধুনিক জীবন চেতনার অঙ্গীকারে উপন্যাসের অবয়বে উপস্থাপনে শামসুদ্দীন আবুল কালাম যে সম্পূর্ণ সফল হননি, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সরদার জয়েনউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'অনেক সূর্যের আশা' (১৯৬৭) বিস্তৃত ক্যানভাসে যুদ্ধ, মহামারী, দাঙ্গা-হামাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, আর্থিক বিপর্যয়, মানুষের নৈতিক অধঃপতন এবং জীবন সংগ্রামের বহুমাত্রিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ের পটভূমিকায় রচিত 'অনেক সূর্যের আশা'র কালসীমা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতিহাস-অন্বয়ী এই উপন্যাস ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ আমাদের সমাজ চৈতন্যকে প্রতিবাদে বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত করে তোলে। উত্তম পুরুষে বিবৃত এ উপন্যাসের নায়ক রহমৎ অনেক সূর্যের আশার-আলোর উদ্ভাসক ঃ

> "তখন সুবেহ সাদিকের আলোয় আলোয় পূব আকাশ আলোর বন্যায় নেয়ে উঠেছে ; ঝলমল করে রেঙে উঠেছে দিগন্ত। মনে মনে কেবলই ভাবছি ঐ ওখানে ঐ অ... র পারে সে দেশ—সে স্বপ্নের দেশ—সে আজাদ দেশ আমার। যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই, নাই অভুক্ত জনমানব। গরীব-কাঙাল রাজা জমিদার সব যেখানে সমান, সব একই মানুষ।"

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অন্ত-অসঙ্গতি এবং লুপ্তপ্রায় দাই সম্প্রদায়ের জীবন-যন্ত্রণা নিয়ে গড়ে উঠেছে সরদার জয়েনউদ্দীনের 'পান্নামোতি' (১৯৬৫) উপন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার উৎপীড়ন এবং কৃষক-সমাজের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ—বাংলার এই আয়ত ইতিহাস জয়েনউদ্দীনের 'নীল রঙ রক্ত' (১৯৬৫) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাংশ। এই উপন্যাসে লেখকের ইতিহাসজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত

হয়েছে সংগ্রামী চেতনা। 'মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে একদিন জিতবেই'— পাবনার নীলবিদ্রোহের নায়ক তোতামীরের (বা তিতুমীর) এই উক্তির মধ্য দিয়ে লেখক পরোক্ষে প্রকাশ করে দেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামশীল চৈতন্য।

১৯৫৮ সাল থেকে স্বাধীনতা পূর্ব কালসীমায় রচিত আমাদের উপন্যাসের গতি প্রকৃতি যেমন বিচিত্রমুখী ও বৈচিত্র্য সন্ধানী ; তেমনি এ পর্বে আবির্ভূত নতুন ঔপন্যাসিকের সংখ্যাও আশাব্যঞ্জক। সময়ের এ পর্বে যে সব নতুন ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সত্যেন সেন (১৯০৭ ১৯৮১), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬ ১৯৭১), আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২-) সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-), রাজিয়া খান (১৯৩৬-), শওকত আলী (১৯৩৬ , জহীর রায়হান (১৯৩৩ ১৯৭২), মিজানুর রহমান শেলী, হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫ ১৯৭৭), আবদুর রাজাক (১৯২৪ ১৯৮১), রশীদ করিম (১৯২৫), আহসান হাবীব (১৯১৭), চৌধুরী শামসুর রহমান (১৯০২ , আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১), আনোয়ার পাশা (১৯২৮ ১৯৭১), নিলীমা ইব্রাহিম (১৯২১), দিলারা হাসেম, আহমেদ ছফা (১৯৪৩), আব্দার রশীদ (১৯৩০), ইন্দু সাহা (১৯৪০), খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৯), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫) প্রমুখ। এঁদের অধিকাংশের রচনায় উপস্থাপিত হলো মধ্যবিত্ত-জীবনের অতলগামী ক্ষয়িষ্ণুতা আর অতলান্ত শূন্যতা। ব্যক্তির বিনষ্টি-চিত্রণই এ পর্বের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট যেন। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সংক্ষুব্ধ সমকাল এঁদের অনেকের রচনাতেই অভিব্যঞ্জিত হলো না বরং উদ্ভাসিত হলো তাঁদের আত্মরতিমূলক বিবংসাপ্রিয় পলায়নী মনোবৃত্তি। এ পর্বের ঔপন্যাসিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য —রূপকল্প নিরীক্ষা, ঘটনাংশ নির্বাচন এবং ভাষ্য নির্মিতিতে তাঁরা সতত পরীক্ষাপ্রবণ, বৈচিত্র্য-অন্বেষী, কিছুটা দুঃসাহসীও বটে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-রীতি প্রয়োগে এবং আত্মমগ্ন চেতনায় ব্যক্তিক-শূন্যতা চিত্রণে যাঁরা সর্বাধিক আগ্রহী, তাঁরা হচ্ছেন রাজিয়া খান, আলাউদ্দীন-আল-আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক এবং শওকত আলী। বিপন্ন এবং সংক্ষুব্ধ বর্তমানে দাঁড়িয়ে এরা খুঁজেছেন ব্যক্তিমানুষের আন্তরিক বেদনাকে, পরম যন্ত্রণাকে। ব্যক্তির দায়িত্ব এঁদের রচনায় স্বীকৃত হলো না, বরং সেই সর্বশূন্য বিবিক্ততা আর অতলান্ত নৈঃসঙ্গ্যের মাঝে এঁরা জীবনের অর্থ খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াসে মেতে উঠলেন। সমষ্টি-অভিজ্ঞান থেকে এঁদের নায়ক-নায়িকা ক্রমশই একক ব্যক্তি অভিজ্ঞানে অন্তর্লীন হতে চাইলো ; ফলে ষাটের দশকে এসে আমাদের উপন্যাসে এলো তিরিশের 'কল্লোলীয়' একাকিত্ববোধ ও নৈঃসঙ্গ্যচেতনা।

রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' (১৯৫৯) এবং 'অনুকল্প'-এর (১৯৫৯) মঈন-সুমিতা-হেটি-তরু-শামসা-মিন্টু-রেণু-আশরাফ —সকলেই প্রেম আর শান্তির প্রত্যাশী ; কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, আধুনিক নাগরিক চৈতন্যের যন্ত্রণা এবং

মরভূ শূন্যেতায় তারা নিঃশেষিত প্রায়। নগরবাসী আধুনিক মানুষের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, দুর্মর নিঃসঙ্গতা এবং অতলান্তিক শূন্যতা উদ্ভাসিত হয়েছে রাজিয়া খানের উপন্যাসদ্বয়ে ; এবং দুটি উপন্যাসেই শতাব্দীর যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং ক্লেদ গ্লানি আর আত্মরতির পঙ্কে নির্দেশিত হয়েছে জীবনের পরিণতি। আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা এবং ব্যক্তিক মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে রাজিয়া খানের ভাষা কবিতাস্পর্শী, আবেগসিক্ত এবং গীতিধ্বনিময়।

'জেগে আছি' (১৯৫০) কিংবা 'ধানকন্যা' (১৯৫১) গল্পগ্রন্থে আলাউদ্দীন আল আজাদের মৃত্তিকা সংলগ্ন জীবনচেতনা 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' ১৯৬০ কিংবা 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' (১৯৬২) উপন্যাসে শতাব্দীর অবক্ষয়ী মূল্যবোধের পংক স্রোতে নিমজ্জিতপ্রায়। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের চালচিত্র এই উপন্যাস দুটি সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২—১৯৮৩) বিশ্লেষণ অনুভবসঞ্চারী ঃ

> "এ দুটো হলো তথাকথিক আধুনিক উপন্যাস--আমাদের উঠতি জীবন ধারায় যন্ত্রযুগের যে ক্ষয়িষ্ণুতার উপরিতলগত ও বহিঃপ্রভাবগত পরোক্ষ অনুপ্রবেশ ঘটেছে তারই প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে এতে। কোনক্রমেই আমাদের জীবনের মূল সুর এখানে উপজীব্য নয়—বরং এক উদ্ভট যৌন-সর্বস্বতা সার্বজনীন উপকরণের উত্তরাধিকারে আধুনিক আঙ্গিক ও ভাবনার ঐতিহ্যে সাম্প্রতিকতার সামিল হতে চেয়েছে এক্ষেত্রে যেন।"

তবে জীবনের সুস্থতা আর কল্যাণের প্রতি আলাউদ্দীন আল-আজাদের আকর্ষণ দুর্নিবার। তাই বিকৃতি এবং অবক্ষয়ের মধ্যে বাস করেও 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে'র নায়ক জাহেদ উপন্যাসের পরিণতিতে সুস্থ জীবনবোধে পরিস্রুত হতে সচেষ্ট হয়েছে। 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' উপন্যাসে অপগত যৌবনা বিলকিসের অবরুদ্ধ যৌনাকাঙ্ক্ষা বিকৃতির পংক নিমজ্জিত হয়েও পরিণতিতে প্রত্যাবর্তন করেছে সুস্থ-স্নিগ্ধ জীবনার্থে . এবং এইভাবেই শীতের কুয়াশা কাটিয়ে লেখক পৌঁছে যেতে চান প্রথম বসন্তের উজ্জ্বল ঊষায়।

আলাউদ্দীন আল-আজাদের এই বাসন্তি-যাত্রা সাফল্য অর্জন করেছে, 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৫) উপন্যাসে এসে। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মহামারী যুগসংক্ষোভ-স্বাধীনতা সংগ্রাম—এই বিস্তৃত ক্যানভাসে রচিত 'ক্ষুধা ও আশা' ইতিহাস চেতনা-সমৃদ্ধ এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল-আজাদের শিল্পচেতনা মহত্তর জীবনার্থের সাধনায় প্রাগ্রসরমান। আলাউদ্দিন আল-আজাদ বিশ্বাস করেন ঃ "উদ্ভবকালের মতো আজকের ঔপন্যাসিকও মুক্তিযোদ্ধা। এবং এই যুদ্ধের মানে শুধু সমাজ পরিবর্তন বা বিপ্লবের একনিষ্ঠ চারণ হওয়াই নয়, একটি উপন্যাসে একটি কুসংস্কারের মাথায় যে আঘাত হানল, সেও এই আয়োজনের সঙ্গে শরিক হল।" 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাস এই বিশ্বাসেরই শিল্পিত স্বরগ্রাম। সমাজসত্য আশ্রিত এবং মননশাসিত এই উপন্যাসে জীবনবোধের যে প্রকাশ লক্ষ্য করি, তাতে অবরুদ্ধ সমাজ-প্রতিবেশ এবং বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মধ্যে বাস

করেও আমরা উচ্চকিত হই সংগ্রামী মানবতার প্রতি। গ্রাম ও নগরের পটে বিস্তৃত খণ্ড খণ্ড জীবনচিত্র এ-উপন্যাসে কেন্দ্রানুগ-শক্তির আকর্ষণে একই মোহনায় মিলিত হয়েছে। হানিফ-ফতেমা-জোহা-জহুর—এসব নীচুতলার মানুষের জীবন-চিত্রণে ঔপন্যাসিক যতটা সার্থকতা অর্জন করেছেন, উপরতলার মুর্তজা-রেজা বা লীনার চরিত্র চিত্রণে ততটা নন। বিষয় নির্বাচনে ও প্রকরণ পরিচর্যায় 'ক্ষুধা ও আশা' বাংলা সাহিত্যেব একটি শিল্প-সফল উপন্যাস।

কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, এইসব প্রাত্যহিকতা নিয়ে গড়ে উঠেছে আলাউদ্দিন আল-আজাদের 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) উপন্যাস। কাহিনীব মানবমুখীন পরিণতিব মধ্য দিয়ে এখানেও অভিব্যঞ্জিত হয়েছে লেখকের আশাবাদী মানসিকতা। কল্লোলিত কর্ণফুলী, তার বুকে ভেসে চলা মাঝি সম্প্রদায়, কর্ণফুলী তীরবর্তী জনপদ, বিশেষ অঞ্চলের মাটি আর মানুষ, আঞ্চলিক ভাষা এবং আঞ্চলিক পরিবেশ সবকিছু এ-উপন্যাসে একাত্ম হয়ে গেছে।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব এবং লিবিডো-তাড়িত মনোবিকলনের সুখদ-অনুষঙ্গ সৈয়দ শামসুল হকের মানসলোকে সঞ্চার কবেছে আত্মমগ্ন-চেতনা, সমাজবিচ্ছিন্ন নৈঃসঙ্গ্যবোধ, রিরংসাজাত আত্মরতি এবং রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস। সৈয়দ শামসুল হক, উপন্যাস-রচনার শুরু থেকেই, মানব-সম্পর্ক নির্মাণে লেবার (Labour) নয়—ববং 'লিবিডো'কেই (Libido) প্রাধান্য দিয়েছেন। আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত হয় তাঁর চারটি উপন্যাস—'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯), 'দেয়ালেব দেশ' (১৯৫৯) 'অনুপম দিন' (১৯৬২) এবং 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪)। ঘটনাংশ-নির্বাচন এবং আঙ্গিক-পরিচর্যায় এ-সব উপন্যাস তাঁর সযত্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষরবাহী সন্দেহ নেই ; কিন্তু জীবনের অখণ্ড রূপের উপলব্ধি এর কোনটিতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ আমরা জানি ঔপন্যাসিকের কাজ অর্জুনের অস্ত্র পরীক্ষাব কালে বিচ্ছিন্নভাবে পাখির মাথাটুকুকে দেখা মাত্র নয়। সমগ্রকে জানা ব্যতীত ঔপন্যাসিকের মুক্তি নেই। এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে না উপলব্ধি করা পর্যন্ত সমগ্রকে ধারণা করাও সাধ্যাতীত।

সৈয়দ শামসুল হকের 'এক মহিলার ছবি' দৃষ্টি আকর্ষণী বিচিত্র বর্ণপ্রলেপে অন্ত-অসঙ্গতিসম্পন্ন সমাজ-পরিবেশে লালিত-বর্ধিত এক মহিলার আত্মমগ্ন চেতনার ভঙ্গিময় কথকতা। দ্বৈত-ভালবাসা এবং নারীর সন্তান-আকাঙ্ক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর 'দেয়ালের দেশ'। অবচেতন দ্বৈত-ভালবাসার দ্বন্দ্ব কবিতাস্পর্শী শব্দস্রোতে রূপায়িত হয়েছে 'অনুপম দিন' উপন্যাসে। একদিন অপরাহ্ন তিনটা থেকে পরদিন ভোর ছ'টা এই পনের ঘণ্টার সময়-সীমায় বন্দী করে, যখন বাইরে পড়ছে একটানা বৃষ্টি, জরিনা-মাসুদ-রোকসানা-আলীজাহ্—এইসব সমাজবিচ্ছিন্ন চরিত্রের হৃদয়তল-উৎসারিত অন্তর্জ্বালা এবং সত্তাবিচ্ছিন্ন একাকিত্বের যন্ত্রণা শিল্পমূর্তি পেয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের 'সীমানা ছাড়িয়ে' উপন্যাসে। আত্মকেন্দ্রিকতা এবং মনোবিকলন যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—এ-সব উপন্যাস

তারই প্রভাবজাত। যন্ত্রণাদগ্ধ এবং নৈঃসঙ্গ্যতাড়িত মানুষের অন্ত-অসঙ্গতি উন্মোচনে সৈয়দ শামসুল হকের ভাষা উপমাবহুল, গীতিময়, আবেগস্নিগ্ধ এবং কবিতাসিক্ত। 'সীমানা ছাড়িয়ে' উপন্যাস থেকে এক উজ্জ্বল এলাকা ঃ

> "বিকেলে নাবলো বৃষ্টি। তখন উঠে এলো ছাদে। বড় বড় গাছ দোলান, আকাশ নেভানো বৃষ্টি। কেবল দিগন্তে কাছে বলয়ের মতো একফালি উজ্জ্বলতা। আর বাতাস। নিমগাছের বড় ডালটায় দুটো কাক ভিজে ভিজে সারা হচ্ছে। তার চারদিক থেকে কি একটা আয়োজন যেন ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। জরিনার মনে হলো, এই তার আপন পৃথিবী। কতকাল ধরে সে অপেক্ষা করছে এমনি একটি বৃষ্টির যে বৃষ্টি তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসে ছাদে, যে বৃষ্টিতে ভেজা যায়, যে বৃষ্টির আড়ালে সাদেক, রোকসানা, আলীজাহ্ সবাই দূরে সরে যায়।"

সমাজ-প্রতিবেশে বন্দী একটি মেয়ের বাঁচার স্বপ্ন কিভাবে হারিয়ে গেল, যন্ত্রণা আর বেদনায় কিভাবে তার জীবন নিঃশেষিত হলো— এইসব কথা নিয়ে শওকত আলীর 'পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৩)। বিকৃতির ঊর্ধ্বে উঠে সুস্থ জীবনের কল্পনা এ-উপন্যাসেও হয়েছে অবরুদ্ধ। পাশ্চমী-সাহিত্য পাঠের প্রভাবজাত এ-উপন্যাসে উপেক্ষিত হলো সমাজ-সত্য ; বাস্তবজীবনের নয়, বরং ভঙ্গি-সর্বস্ব আত্ম-নিমজ্জন এবং অবক্ষয়ী জীবনচেতনাই এখানে পেল প্রাধান্য।

শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' (১৯৬২ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে উপকূলবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রাত্যহিক জীবনধারা। বিষয়-গৌরবে অভিনব 'সারেং বৌ' বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত সারেং জীবন-কাহিনীর প্রথমতম আলেক্ষ্য। জীবিকার অন্বেষণে অসীম সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে কদম সারেং, আর দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিদিন সংগ্রাম করছে নবিতুন —এদের জীবনের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ আর সংগ্রাম-সাহসের শব্দরূপ এ উপন্যাস। কদম ও নবিতুন চরিত্র-নির্মাণে লেখকের অসামান্য সাফল্য স্মরণে রেখেও একথা বলতে হয়—মৌলিক নির্লিপ্ততার অভাব, রোম্যান্টিকতার হাতছানি এবং গীতিসুরের বাহুল্য উপন্যাসটির শিল্পমূল্য ক্ষুন্ন করেছে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে ধ্বনিত হয়েছে আশায় উজ্জীবিত সংগ্রামী মানুষের সাহসী উচ্চারণ :

> "দেখল চরের দূরপ্রান্তে সবুজ রেখা। আর দেখল কয়েক হাত দূরে বঙ্গোপসাগরের ঝিলিমিলি নীল। শান্ত স্নিগ্ধ আর সুন্দর। কদম বলল, আর একটু জিরিয়ে নে রে নবিতুন। হাঁটতে হবে অনেক দূর।"

পূর্ব বাংলার উপকূলবর্তী দুটি গ্রাম —বাকুলিয়া আর তালতলিকে কেন্দ্র করে রচিত শহীদুল্লা কায়সারের সংশপ্তক (১৯৬৫) এ এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। স্রষ্টার সমাজচেতনা, ইতিহাসজ্ঞান এবং বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষরবাহী 'সংশপ্তক' উপন্যাস পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। দুটি অখ্যাত গ্রামের জীবন-ধারাকে অবলম্বন করে নির্মিত হলেও, এ-উপন্যাসের পট বিস্তৃত হয়েছে পূর্ব

বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে কলকাতা মহানগরী পর্যন্ত। উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে উঠে এসেছে সামন্ত আভিজাত্যের শেষ নিঃশ্বাস, পূর্ববাংলার গ্রাম জীবনের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন কলকাতা-জীবন এবং বিভাগকালীন ঢাকার চালচিত্র। চল্লিশের দশকের সংক্ষুব্ধ এবং কল্লোলিত পূর্ববাংলা 'সংশপ্তক' উপন্যাসে, শব্দবন্দী যেন। স্রষ্টার ইতিহাস-চেতনা এবং সমাজবাদী জীবনাদর্শের স্পর্শে উপন্যাসের চরিত্রগুলো উচ্চকিত হয়েছে দ্রোহে-বিদ্রোহে বৃহত্তর জীবনানন্দের আকাঙ্ক্ষায় তারা বেছে নিয়েছে সংগ্রাম-সঙ্কুল পথ। 'মহাভারতে' যে সংশপ্তক সেনার উল্লেখ আছে, যাদের কপালে অঙ্কিত মৃত্যুর পাঞ্জা, তারা মরে তবু লড়ে যায়, তেমনি লড়ে আর মরে 'সংশপ্তক'-এ চিত্রিত পূর্ববাংলার সাহসী মানুষ। উপন্যাসের সমাপ্তিতে সকল বাধা-বিপত্তি-হতাশা বেদনাকে ছাপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিজয়ী সূর্যমুখী আশা ঃ

> "বড় খালে জোয়ার এসেছে, জোয়ারের টানে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সাম্পান। কল কল জোয়ার বড় খালে। মইশাই বাতাসের দাপাদাপি বড় খালের বুকে, দখিন ক্ষেতে। সবকিছু ছাপিয়ে রাবুর কানে এসে বাজে শুধু একটি কথা আমি আসব। আমি আসব।"

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রূপকার সত্যেন সেনের উজ্জ্বল আবির্ভাব ঘটে আলোচ্য কালসীমায়। এ পর্বে প্রকাশিত তার উপন্যাসসমূহ হচ্ছে 'ভোরের বিহঙ্গী' (১৯৫৯), 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' (১৯৫৯), 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬৮) 'পদচিহ্ন' (১৯৬৮) 'পাপের সন্তান (১৯৬৯), 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৯৬৯), 'আলবেরুণী' (১৯৬৯), 'পুরুষমেধ' (১৯৬৯), 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' (১৯৬৯), 'কুমারজীব' (১৯৬৯), 'সেয়ানা' (১৯৬৯), 'উত্তরণ' (১৯৭০), 'মা' (১৯৭০) এবং 'একূল ভাঙে ওকূল গড়ে' (১৯৭১)। আমাদের প্রতি-বিচারে যা সাহিত্য জগতে সত্যেন সেন হতে পারেন স্বল্প পরিচিত সাহিত্যিক কিন্তু মার্কসবাদী সাহিত্যসৃষ্টিতে তার অবদান কোন সূত্রেই বিস্মরণীয় নয়। মার্কসবাদের দিকে জনচেতনাকে জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে সত্যেন সেনের মতো অধিকসংখ্যক উপন্যাস বাংলাদেশে আর কেউ লেখেন নি। ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতেও বাংলা সাহিত্যে সত্যেন সেন সংযোজন করেছেন একটি নতুন মাত্রা। গতানুগতিক প্রেম-বর্ণনায় মানস যাত্রা, কারা জীবনের অভিজ্ঞতার রূপায়ণে সে যাত্রার অগ্রগমন আর শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনায় আকাঙ্ক্ষিত উত্তরণ—এই হচ্ছে সত্যেন সেনের শিল্পী-মানসের ক্রমবিকাশ-রেখা।

সত্যেন সেনের 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' কারা-জীবনের অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ। আর 'পদচিহ্ন' হচ্ছে পাকিস্তান-সৃষ্টির পরে হিন্দু-সম্প্রদায়ের স্বদেশ-ত্যাগের ইতিকথা। তার 'পুরুষমেধ' ইতিহাস-আশ্রয়ী রূপক উপন্যাস। বৈদিক যুগে রাজা বয়কেতু রোগমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বরুণদেবের প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে এক বছর বয়সী এক শূদ্র শিশুকে বলি দিয়ে 'পুরুষমেধ'-এর অনুষ্ঠান করলেন। দীর্ঘ দিন ধরে শোষিত-নির্যাতিত শূদ্রদের মধ্যে প্রভুশ্রেণীর বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে

উঠেছিল, এই শিশু হত্যার মধ্য দিয়ে তা প্রতিবাদে বিদ্রোহে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। দূর অতীতের এই কাহিনীর রূপকে সত্যেন সেন এখানে ধরতে চেয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনে বন্দী পূর্ব বাংলার সংক্ষোভ-সংগ্রাম-দ্রোহ-বিদ্রোহের ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি স্মরণীয়ঃ

> "ধর্মীয় অন্ধতা ও অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন সেই স্মরণাতীত যুগকে বহু পিছনে ফেলে আমরা সামনে এগিয়ে এসেছি। পুরুষমেধ একটা বর্বর প্রথা, একথা আমরা সবাই বলব। কিন্তু জ্ঞানে বিজ্ঞানে আলোকিত আধুনিক জগতের মানুষ আমরা, আমরা কি সেই বর্বরতা থেকে মুক্ত? বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য যুগে ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে, জাতীয়তাবাদের নামে, শ্রেণী স্বার্থের নামে যে জগৎজোড়া ব্যাপক পুরুষমেধ অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে— হিংস্রতা, বীভৎসতা ও অমানুষিকতার দিক দিয়ে তা কি প্রাক্ সভ্যতা যুগের পুরুষমেধকে ছাড়িয়ে যায়? না... সুদাস আর ইন্দ্রের সন্তান যেতুর কথা বলতে বলতে আজকের দিনের আমাদের সমাজের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক যেতুদের [illegible] মুখচ্ছবি আমার চোখের ও মনে ভেসে উঠেছে। তাদের কথা কেমন করে ভুলে থাকব"

সত্যেন সেনের 'কুমারজীব' [illegible] প্রচার কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা ইতিহাস [illegible] উপন্যাস আর 'আলবেরুনী' হচ্ছে মধ্যযুগে [illegible] এশিয়ার [illegible] আলবেরুনীর [illegible] কথকতা। 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে পাল [illegible] শোষিত কৈবর্তদের সংগ্রাম-সাহস [illegible] বিদ্রোহের কাহিনী। তবে ইতিহাস আশ্রয়ী সাহিত্য যেমন নয় অতীত [illegible] সেখানে যেমন থাকে ইতিহাসের [illegible] রূপ [illegible] সত্যেন সেনের এসব উপন্যাসে তেমনি [illegible] ইতিহাসের অস্থি-মজ্জা [illegible]।

সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' উপন্যাস দুটি [illegible] সম্পর্কিত। দুটি উপন্যাসেরই [illegible] ওল্ড টেস্টামেন্ট [illegible] খণ্ড থেকে সংগৃহীত। রাষ্ট্রনেতা-ধর্মনেতা ও সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ [illegible], আবার [illegible] ঐক্যের [illegible], ধর্মের নামে পুরোহিত শ্রেণীর অত্যাচার ও ভণ্ডামি, জেরুশালেমের সামাজিক বৈষম্য এবং দাস শ্রেণী [illegible] —অতীতের এই বিশাল ক্যানভাসে গড়ে উঠেছে 'অভিশপ্ত নগরী'র কাহিনী। যেরেমিয়ার মানব-কল্যাণকামী সংগ্রাম কিভাবে ব্যর্থ হলো, এবং ধ্বংস হলো যিরুশালেম নগরী—তা নিয়েই সত্যেন সেনের এই মহৎ শিল্পকর্ম। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে যিহুদি জাতির পতনের ইতিহাস। যিহুদি সমাজপতিদের ধর্মীয় গোড়ামী ও রক্ষণশীল মনোভাব, মানবিকতার পরিবর্তে শাস্ত্রীয় বিধানের জয়গান, উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং পরজাতি-বিদ্বেষ যিহুদি জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেল। দূরতম এই ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে 'পাপের সন্তান'। সত্যেন সেনই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি বাইবেলের কোন কাহিনী

নিযে রচনা করেছেন শিল্প-সফল উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত স্মরণীয় ঃ

"সত্যেন সেনেব 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' এক উচ্চাশী সাহিত্য প্রয়াসের দুটি খণ্ড। এ ধরণের উচ্চাশী ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা ভাষায় বিশেষ লেখা হয়নি। ঘটনাব কাল খৃস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতক, স্থান যিরুশালেম, কাহিনী ওল্ড টেসটামেণ্ট—প্রাচীন বাইবেলের যেরেমিয়া অধ্যায় থেকে গৃহীত। স্বভাবতই হাউয়ার্ড ফাস্ট প্রমুখ লেখকদেব বাইবেল-ভিত্তিক উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। বাংলায় এ-ধরণের উপন্যাস এই প্রথম। সম্পূর্ণ নোতুন, স্বাদে বৈচিত্র্যে অভিনব।"

পদ্মাপারের গ্রামেব দেশে মালেক—ধমনীতে যার ছিল গ্রামীণ জোতদারদের রক্ত, অস্তিত্ব জুড়ে ছিল ভয়-ভীতি আর দ্বিধা-সংশয়—কলকাতাব ময়দানে সে-দিবসের জনসমুদ্র, শ্রমিকশ্রেণীব ইস্পাতদৃঢ় সংগ্রাম আর সাধারণ মানুষের সাহচর্যে এসে হয়ে ওঠে রাজনীতি-সচেতন সাহসী সূর্য-প্রতিম এক শ্রমিক এই হচ্ছে সত্যেন সেনের দীর্ঘায়তন উপন্যাস 'উত্তরণে'র' ঘটনাংশ। স্পষ্টতই এটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। সত্যেন সেন তাঁর সব উপন্যাসেই মার্কসীয় রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরেছেন। 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' ব্যতীত কোন উপন্যাসেই সত্যেন সেন রূপকল্প নির্মাণ কিংবা পরিস্রুত ভাষা ব্যবহারে সচেতন নন—কখনো তাঁর উপন্যাস আক্রান্ত হয়েছে শৈল্পিক নিরাসক্তিব অভাবে।

যেমন সত্যেন সেন, তেমনি জহির রায়হানও নিপীড়িত মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে সংগ্রাম আর সচেতনতার আলো প্রজ্বলন এবং স্বদেশকে প্রাগ্রসর করাব আন্তর গরজে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে মার্কসীয় জীবন-ভাবনা আর শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম-সাহস-সাফল্যই বার বার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকে যখন আমাদেব অধিকাংশ ঔপন্যাসিক—কখনো ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করে, আবাব কখনো বা জাগতিক মোহের কাছে—ভুলে গেলেন সমাজসত্য ও যুগ সংক্ষোভ, তখন সমাজ-সতর্ক ও রাজনীতি সচেতন জহির রায়হান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন, হয়ে উঠেছেন একজন দায়িত্ববান নির্ভীক শিল্পী। তাঁর 'শেষ বিকেলেব মেয়ে' (১৯৬০) রোম্যাণ্টিক প্রেমের গল্প ; তবে কাহিনী গ্রন্থনে অসতর্কতা ও অসংলগ্নতার জন্যে এটি অন্তরধর্মে দুর্বল রচনা। জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে হাজার বছরের সীমানায় প্রসারিত 'আবর্তনসঙ্কুল অথচ বিবর্তনহীন' ; পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন। বিষয়-ভাবনায় গৌরব-দীপ্র 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯) জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিখিত হয়েছে এ-উপন্যাস। সামরিক-শাসনের নিগ্রহের মধ্যে বাস করেও, একুশের মর্মকোষ-উৎসারিত 'আরেক ফাল্গুন' পাঠ করে আমরা হয়ে উঠি সাহসী মানুষ ; আসাদ-মুনিম-রসুল-সালমার মতোই নির্ভীক চিত্তে আমরাও বলে উঠি -'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো'। তাঁর 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) অর্থনৈতিক

কারণে বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সামগ্রিক ভাঙনের শব্দ-চিত্র। প্রতীকধর্মী উপন্যাস 'আর কতদিন'-এ (১৯৭০) অবরুদ্ধ ও পদদলিত মানবাত্মা সমস্ত ভয়-ভীতি অতিক্রম করে নবজাগ্রত জীবনচেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এ-উপন্যাসে জহির রায়হান আঁকতে চেয়েছেন পৃথিবীর অত্যাচারিত মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম-সাহস আর স্বপ্নের কথা। পূর্ববাংলার ঔপনিবেশিক শোষণের চিত্র ছাপিয়ে 'আর কতদিন'-এ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ আর বর্ণবাদের ভয়াল রূপ হয়েছে উন্মোচিত।

> "ওরা আমার ছেলেটাকে হত্যা করেছে হিরোশিমায়। ওরা আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়। আমার বোনটাকে ধর্ষণ করে মেরেছে ওরা, আফ্রিকাতে। আমার বাবাকে মেরেছে বুখেনওয়াল্ডে গুলি করে। আর আমার ভাই। তাকে ওরা ফাঁসে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। কারণ সে মানুষকে ভীষণ ভালবাসতো।"

জহির রায়হানের উপন্যাস প্রকরণ-পরিচর্যায় পরিস্রুত ও পরিমার্জিত নয়, কিন্তু জীবনার্থ এবং সমাজ-ভাবনায় নিঃসন্দেহে প্রাগ্রসর এবং ইতিহাস-চেতনা-সমৃদ্ধ। তার শিল্পীসত্তায় সমাজবাদী-চেতনার সঙ্গে রোম্যান্টিক মানসপ্রবণতা উপ্ত করেছে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ তাই তার উপন্যাসকে কখনো করেছে অতি-নাটকীয়, কখনো সংক্ষুব্ধ সমকাল-বিচ্যুত, কখনো চরিত্র চিত্রণে অবিশ্বস্ত, আবার কখনো শিল্প-সুমিতিতে অসংলগ্ন। জহির রায়হানের উপন্যাসের ভাষা আবেগ-প্রবণ, চিত্রাত্মক, চিত্রনাট্যধর্মী এবং কবিতাস্পর্শী। যেমন, 'আরেক ফাল্গুন' থেকে এক উজ্জ্বল এলাকা ঃ

> 'আকাশে মেঘ নেই। তবু ঝড়ের সঙ্কেত।
> বাতাসে বেগ নেই। তবু, তরঙ্গ-সংঘাত।
> কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহীদের খুন ভুলবো না।
> বরকতের খুন ভুলবো না। যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে।
> পৃথিবী কাঁপছে। ভূমিকম্প চৌচির হয়ে ফেটে পড়েছে দিক-বিদিক।
> শুধু উত্তর নয়। দক্ষিণ না। পূর্ব নয়। পশ্চিম নয়।
> যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে
> বিক্ষুব্ধ ছাত্র যুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে, শহীদ
> স্মৃতি অমর হোক।

আনোয়ার পাশার প্রথম উপন্যাস নীড়-সন্ধানী (১৯৬৮) আত্ম-জৈবনিক রচনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে যায় এবং বিপর্যস্ত করে তোলে মানুষের সুস্থ-জীবন—সে সমাজ-সত্যকে পটভূমি করে রচিত হয়েছে 'নীড় সন্ধানী'। সাম্প্রদায়িক সংঘাত ভুলে গিয়ে মানুষে মানুষে গড়ে উঠুক নতুন মিলন-সেতু এমনি একটি আশাবাদী উচ্চারণ উপন্যাসটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'নিশুতি রাতের গাথা'ও (১৯৬৮) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতার চিত্ররূপ। এ-উপন্যাসে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার

অব্যবহিত পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে চিত্রিত করেছেন শ্রেণীচেতনার আলোকে মানবিক দৃষ্টিকোণে। এই দুই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা সমকালীন পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের জীবনবিশ্বাস ও জীবনযন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করি। স্রষ্টার ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাস দুটির সাহিত্যিক-মূল্য হয়ত বেশি নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এগুলি মূল্যবান সৃষ্টিকর্ম।

এ পর্বে প্রকাশিত হয় আবু রুশদের তিনটি উপন্যাস - 'ডোবা হল দীঘি' (১৯৬৬), 'নোঙর' (১৯৬৮), এবং 'অনিশ্চিত রাগিণী' ১৯৬৯)। আবু রুশদের উপন্যাসসমূহে প্রতিধ্বনিত হয়েছে মুসলিম মধ্যবিত্ত সংস্কার চেতনা ও চিত্তের প্রবঞ্চনা, নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি ও জীবনবোধের দীনতা এবং দেশ বিভাগোত্তর সময়ের সামাজিক সংকট। তাঁর 'ডোবা হল দীঘি'-তে নেই জীবনার্থের গভীরতার কোন স্বাক্ষর, কিংবা ঘটনা-সংস্থান ও প্রকরণ-পরিচর্যার প্রত্যাশিত সতর্কতা। 'নোঙর' আবু রুশদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে এবং প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার যে-সব মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবার উদ্বাস্তু হল এবং পরে নতুন রাজধানী ঢাকায় স্থায়ী হল, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দুর্ভোগের কাহিনী 'নোঙর' উপন্যাসে পরিচিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটি একটি সংকট-কালের আবহচিত্র।'

আত্মকথনের ভঙ্গিতে রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ' (১৯৬১) এবং 'প্রসন্ন পাষাণ (১৯৬৩) তিরিশ-চল্লিশের যুগে কলকাতাবাসী মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্চিত্র। 'উত্তম পুরুষ'-এর নায়ক শাকের সদ্য 'কৈশোরোত্তীর্ণ' এক তরুণ, তার অনুভব-অভিজ্ঞতা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই গড়ে উঠেছে উপন্যাসের ঘটনা...। মহাযুদ্ধের পঙ্কস্রোতে হাজার বছরের লালিত মূল্যবোধের ভাঙন, মুসলিম মধ্যবিত্ত-সমাজের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং রোম্যান্টিক প্রেমের পটে জীবন অন্বেষণ এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে 'উত্তম পুরুষ'। উপন্যাসের নায়ক শাকেরের কলকাতা থেকে ঢাকা আগমনের মধ্যে দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে, ফলে উপন্যাসটি হয়ে পড়েছে জীবনের খণ্ডাংশের প্রতিচিত্র—এখানে নেই পরিপূর্ণ অখণ্ড চেতনা। এই অসংগতি ও অপরিণতি উপন্যাসের শিল্প-সিদ্ধিকে করেছে খণ্ডিত। রশীদ করীমের 'প্রসন্ন পাষাণ'-এ চিত্রিত হয়েছে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত নারীর জীবনচিত্র। নায়িকা তিশনার জীবন-অভিজ্ঞতা, পারিবারিক সঙ্কট, জটিল মনস্তত্ত্ব এবং প্রেম-আকাঙ্ক্ষা উন্মোচনে রশীদ করীম যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাব এবং কাহিনী গ্রন্থনে অসতর্কতা, চরিত্র-চিত্রণে সাফল্য সত্ত্বেও 'উত্তম পুরুষ' এবং 'প্রসন্ন পাষাণ'-এর শিল্পমূল্য করেছে ক্ষুণ্ণ।

গ্রামীণ পরিবেশে কাহিনীর সূত্রপাত হলেও আবদুর রাজ্জাকের 'কন্যা কুমারী'-তে (১৯৬০) শেষ পর্বতে বর্ণিত হয়েছে শহুরে কৃত্রিম জীবনধারা। অতি-নাটকীয়তা আর ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ 'কন্যাকুমারী'-তে একই সাথে আছে সামন্ত অবশেষের শেষ-নিঃশ্বাস, আবার উত্থিত বুর্জোয়া-সমাজের জৌলুষ ও শহুরে চাকচিক্য। 'কন্যা কুমারী'-র কাহিনী সংহত না এবং এটি আদি-অন্ত আক্রান্ত হয়েছে শৈল্পিক সংযম ও

পরিমিতি বোধের অভাবে। চরিত্র বিশ্লেষণে লেখকের সাফল্য অনস্বীকার্য এবং এ ক্ষেত্রে তিনি মনোযোগ দিয়েছেন চরিত্রের সেন্টিমেন্টের ওপর। বস্তুত, 'কন্যাকুমারী' একাধারে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স এবং শরৎচন্দ্রের সেন্টিমেন্টের আধার।

এ-পর্বে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের একটি অন্যতম প্রবণতা হচ্ছে ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনীর রূপকল্প নির্মাণ। ইবনে নশীদের 'ফাল্গুন কবা' (১৯৫৮), মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ' (১৯৬৩), আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩), বদরুদ্দীন আহমদের 'অরণ্য মিথুন' (১৯৬২, চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্তানগড় ১৯৬২), খালেক দাদ চৌধুরীর 'রক্ত রুক্ত অধ্যায়' (১৯৬৬) এবং পূর্বে আলোচিত সরদার জয়েনউদ্দীনের 'নীল রং রক্ত' ১৯৬৫, সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৭), 'পাপের সন্তান (১৯৬৯), 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৯৬৯), 'পুরুষমেধ ১৯৬৯) ও 'কুমারজীব (১৯৬৯) প্রভৃতি এ ধারার অন্যতম উপন্যাস। মোঘল আমলের শেষ পর্দে অনাচার অত্যাচার, অরাজকতা-অবিচার আর মগ-হার্মাদ-বর্গীর হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের শ্যামল প্রান্তরে, এসব অত্যাচার রোধকল্পে, একদা অমিত-পৌরুষ আর বিক্রম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐতিহাসিক চরিত্র শমসের গাজী। এই শমসের গাজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠেছে মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ'। দক্ষিণ বাংলার মগদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন উদ্ভাসিত হয়েছে বদরুদ্দীন আহমদের 'অরণ্য মিথুন' উপন্যাসে। তবে এখানে ইতিহাসের সঙ্গে মূল আখ্যান অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত হয়ে উঠতে পারেনি। ফকির মজনু শাহের বীরত্ব ও কীর্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্তানগড়'। আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' রচিত হয়েছে দেড় শতাব্দী পূর্বের ওয়াহাবী আন্দোলনের পটভূমিকায়। ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা চুনু মিয়া গোলাম নবী এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সমকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওয়াহাবী আন্দোলনকে একাত্ম করে দিয়েছেন লেখক এবং এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর। শিল্প সার্থকতা যতটা ইতিহাস-আশ্রয়ী উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলো যে মূল্যই বহন করুক না কেন, পূর্ববাংলার উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় এগুলো নিঃসন্দেহে সংযোজন করেছে নতুন এক মাত্রা।

এ-পর্বে গ্রাম কিংবা বিশেষ কোন অঞ্চলের জীবনচিত্র নিয়ে রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের তালিকাটি এ রকম : আসাদুজ্জামান হোসেনের 'মহুয়ার দেশে' (১৯৬১), বদরুন্নেসা আবদুল্লাহর 'কাজল দীঘির উপকথা' (১৯৬২), আলাউদ্দীন খানের 'অবর হিকার উপকথা' ১৯৬৫) এবং জসীমউদ্দীনের 'বোবা কাহিনী' ১৯৬৪), মীজানুর রহমান শেলীর 'পাতালে শর্বরী' ১৯৬৫), নীলিমা ইব্রাহিমের 'বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৯), দিলারা হাশেমের 'ঘর মন জানালা' ১৯৬৫, হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ' (১৯৬৫, শহীদ আহমদের 'পান্না হলো সবুজ' (১৯৬৫), নূরুল ইসলাম খানের 'রাজধানীর ইতিকথা' (১৯৬৮), আহসান হাবীবের 'আরণ্য নীলিমা' (১৯৬১) প্রভৃতি উপন্যাসে ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ পূর্ব-

বাংলার অবিকশিত নগর-জীবনের বহুভুজ-জটিলতা এবং বিচিত্র জীবনচেতনা উন্মোচিত হয়েছে।

আলোচ্য পর্বে রচিত উপন্যাসসমূহ গ্রামজীবন অতিক্রম করে ক্রমশ শহরমুখী হয়ে উঠেছে। তুলনা সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের ঔপন্যাসিকেরা গ্রামীণ-জীবনচিত্রণে যতটা স্বচ্ছন্দ এবং বস্তুনিষ্ঠ, নগরজীবন চিত্রণে ততটা নন। তিরিশের পশ্চিমবঙ্গীয় উপন্যাসের প্রভাবে এ পর্বে নবীন ঔপন্যাসিকদের রচনায় এসেছে আধুনিক নাগরিক চেতনা, লিবিডো-তাড়িত মনোবিকলন এবং পশ্চিমী অবক্ষয়ী মূল্যবোধ। কিন্তু একই সাথে একথা এখানে স্মরণীয় যে, তিরিশের শ্রম আর সিদ্ধিকে এঁদের কেউই সাহিত্যক্ষেত্রে যথার্থভাবে অঙ্গীকার করতে পারেননি। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ সংক্ষুব্ধ পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সঙ্কটও এ-সময়ের উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের তুলনায় এ-পর্বের ঔপন্যাসিকেরা অনেক বেশী আঙ্গিক-সচেতন, বিষয়াংশ-নির্বাচন, ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ-পরিচর্যায় অধিকাংশ ঔপন্যাসিক পরীক্ষাপ্রবণ ও বৈচিত্র্য-সন্ধানী। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালের এই উত্তরাধিকারের ওপরই লিখিত হয়েছে বিদেশী শত্রুমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য।

[চার]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনে পরিমাণগত পরিবর্তনের সাথে চেতনার ক্ষেত্রেও ঘটেছে গুণগত বিকাশ। স্বাধীনতার সোনালী প্রভায় আমাদের মন আর মননে যে নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে উপন্যাসে তার প্রতিফলন ছিল একান্তই প্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক যুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা এবং অর্থনৈতিক বিপদের শব্দচিত্র অঙ্কনেই হলেন অধিক আগ্রহী। দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিবোধ আর উত্তরণের কথাচিত্র নির্মাণে তাঁরা মোটেই উৎসাহী নন। এ-কারণেই নঞর্থক জীবনভাবনায় বিশ্বাসী কতিপয় ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস নির্মাণ করতে গিয়েও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে কেবল চিত্রিত করেন পাকিস্তানী ঘাতক সৈন্য কর্তৃক নারী-ধর্ষণের অনুপুঙ্খ বিবরণ। তবে এ-পর্বের উপন্যাসে আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ে জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের অবিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। যুদ্ধোত্তর সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সর্বব্যাপী হতাশা, নৈরাজ্য এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পী-মানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানস ভূমি —কোন কোন ঔপন্যাসিকের রচনায় এ-জাতীয় অভিজ্ঞান মুক্তি যুদ্ধোত্তর উপন্যাস সাহিত্যের আশাব্যঞ্জক দিক।

স্বাধীনতা-যুদ্ধে নিহত আনোয়ার পাশা সংগ্রাম-সঙ্কুল সময়ে রচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক উপন্যাস 'রাইফেল রোটি আওরাত' (১৯৭৩)। এখানে আছে ঔপন্যাসিকের আত্মজৈবনিক উপাদান এবং এর নায়ক সুদীপ্ত শাহিন আনোয়ার পাশারই প্রতিচ্ছবি যেন। সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব-সংশয় এবং শ্রেণীচরিত্র অতিক্রম করে

সুদীপ্ত শাহিন সামিল হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তিম স্রোতে। আত্ম-সমীক্ষা থেকে বিপ্লবী চেতনায় নায়কের এই উত্তরণ বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা। একাত্তরের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাক বাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ড আর বহ্নুৎসবকে কেন্দ্র করে লেখা এ উপন্যাস একদিকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল, অপরদিকে আবেগসিক্ত সার্থক সাহিত্য কর্ম। উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন কাহিনীর সমাপ্তিতে হয়ে ওঠে নির্ভীক সাহসী মানুষ, চরম বিপর্যয় আর রক্তস্রোতের মধ্যে অবস্থান করেও শেষ পর্যন্ত তার কণ্ঠ থেকে ভেসে ওঠে— এগিয়ে যাওয়ার মা ভৈঃ বাণী ঃ

> "পুরোনো জীবনটা নেই পঁচিশের রাতেই লয় পেয়েছে। আহা, তাই সত্য হোক। নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সে আর কতোদূরে? বেশী দূরে হতে পারে না। মাত্র এই রাতটুকুতো। মা ভৈঃ। কেটে যাবে।"

মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে শওকত ওসমান লিখেছেন চারটি উপন্যাস—'জাহান্নম হইতে বিদায়' (১৯৭১), 'নেকড়ে অরণ্য' (১৯৭৩), 'দুই সৈনিক' (১৯৭৩), এবং 'জলাঙ্গী' (১৯৭৬)। 'দুঃখিনী জননী বাংলাদেশ ও তার বীর সন্তান মুক্তিফৌজের জন্য উৎসর্গিত 'জাহান্নম হইতে বিদায়' উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে একাত্তরে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা, মানুষের অসহায়তা এবং বাঙালির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রধান শিক্ষক গাজী রহমান শওকত ওসমানেরই বিবেক সেন। তার 'নেকড়ে অরণ্য' আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় বিষয় ভিত্তিক কোন ঘটনা নয়; এবং এখানে নেই কোন যুদ্ধের ছবি, কোন মুক্তিযুদ্ধের অসীম বীরত্বের কথা কিংবা বিজয়ের উল্লাস বরং আছে, সমস্ত উপন্যাস জুড়েই আছে নারী ধর্ষণের স্থূল বিবরণ' যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যদের রিরংসাবৃত্তির শিকার কতিপয় বন্দিনী নারীর জীবন-যন্ত্রণার আলেখ্য এ উপন্যাস। তবে স্রষ্টার সুগভীর জীবনবোধের অভাবে 'নেকড়ে অরণ্য' শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে পাকিস্তানি সৈনাদের নারী ধর্ষণের অনুপুঙ্খ বিবরণে, তার অভিজ্ঞতাহীনতার কারণেই এখানে ফুটে ওঠেনি বন্দিনী নারীদের জীবন বেদনার গভীরতা। হাজী মখদুম মৃধা নামক জনৈক রাজাকারের দালালী এবং শেষ পর্যন্ত তার বিপর্যয় নিয়ে গড়ে উঠেছে শাওকত ওসমানের 'দুই সৈনিক'। যেমন সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬) নামক কাব্যনাট্যে, তেমনি শওকত ওসমানের এ-উপন্যাসেও আমরা সীমিত মনোযোগেই লক্ষ্য করি, স্রষ্টার সর্বজ্ঞ সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে পাক-বাহিনীর দালাল রাজাকার-আলবদরদের ওপর। 'জলাঙ্গী' উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে এক ভীরু মুক্তিযোদ্ধার ছবি, যার কাছে যুদ্ধের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে প্রেম এবং অবশেষে নিহত হয়েছে রাজাকারের হাতে। শওকত ওসমানের কোন উপন্যাসেই একাত্তরে বাঙালির বিক্রম উজ্জীবনের ইতিহাস নেই, শরীর থেকে বেরিয়ে আসা বারুদের গন্ধ নিয়ে কোন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর উপন্যাসের নায়ক হতে পারেনি; মুক্তি যুদ্ধের অনুষঙ্গে তিনি এঁকেছেন কিছু খণ্ড-চিত্র মাত্র।

শওকত আলীর 'যাত্রা' (১৯৭৬) উপন্যাসে একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পাশবিক আক্রমণে ভীত ঢাকা শহরের বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ গ্রামের পথে যাত্রা করেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। প্রথম অবস্থায় ভয়-ভীতি-দ্বিধা সংশয় কাটিয়ে মৃত্তিকা সংলগ্ন সংগ্রামশীল গ্রামীণ মানুষ অচিরেই হয়ে ওঠে এক একজন মুক্তিযোদ্ধা, তাদের মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিরোধের দুর্নিবার সাহস। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের অগ্নিকুণ্ডে থেকেও এ উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনেছে। অধ্যাপক হাসানের সংলাপে ধরা পড়েছে এই আশাবাদ :

> "আশাবাদী না হয়ে যে আমাদের গত্যন্তর নেই। আমাদের কাছে এখন দুটি মাত্র পথ হয় মৃত্যু নয়তো লড়াই। যেহেতু একটা জাতি মরে যেতে পারে না সেহেতু তাকে লড়াই করতেই হবে। আর জয়ের আশা না থাকলে কেউ লড়াই করতে পারে না। যেহেতু আমরা মরে যেতে পারি না, সেহেতু আমাদের জয়ী হতেই হবে। এখন আমাদের জীবনের আরেক নাম হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা।'

সৈয়দ শামসুল হকের 'নীল দংশন' (১৯৮১) ও 'নিষিদ্ধ লোবান' (১৯৮১) নামক উপন্যাসোপম রচনা দুটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালি জাতিসত্তার সামগ্রিক জাগরণ নয়, বরং একটি খণ্ডিত পরিচ্ছেদের শব্দরূপ। 'নিষিদ্ধ লোবান' এ লেখক সংগ্রাম আর বিজয়ের চিত্র নয়, বরং পাকিস্তানি সৈন্যদের রিরংসাবৃত্তির উল্লাস অঙ্কনেই অধিক উৎসাহী। যুদ্ধোত্তর সময়ের পটভূমিতে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী'তে স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে এসেছে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের কথা, এবং এটি অনেকটা পরিণত সৃষ্টি। উপন্যাসের নায়ক শিক্ষক তাহের এ-সত্যে আস্থাহীন যে, মুক্তিসংগ্রাম একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে গেছে, কারণ সমাজে এখনো আছে অশুভ শক্তির পদচারণা। তাই তাহেরের আত্মোপলব্ধিতে জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা :

> 'সে মৃতদের ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, কিন্তু মৃতের প্রতিশোধ গ্রহণ তো সম্ভব। ঘটনা যখন অবশ্যই রীতিতে ঘটে তখন সেই একই রীতিতে তার উপসংহারও টানতে হয়। না, তাহের যেন আর না বলে যে, হত্যা অনুমোদনযোগ্য নয়। আর শুধু প্রতিশোধই নয়, সংগ্রামে এ-এক আবশ্যিক পর্যায়। সংগ্রাম এখনো শেষ হয় নি, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই দেশ থেকে এক রহস্যময় অশুভ শক্তিসমূহ অন্তর্হিত হয়নি, এখনো অস্ত্র ধারণ করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সম্ভবত আগের চেয়ে, মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ের চেয়ে, এখনই প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে রয়েছে।"

এ উপন্যাসের ভাষারীতি প্রায়শই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়ক তাহেরের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসু মানসিকতা উন্মোচনে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এক্সপ্রেশনিস্টিক পরিচর্যা। যেমন :

"এতক্ষণ পর যেন নিমজ্জমান চেতনা একটা অবলম্বন খুঁজে পায় ; তাহের অবিলম্বে সেটা আঁকড়ে ধরে, অচিরে তার কপাল স্থাপিত হয় টেবিলে এবং টেবিল একটা ভাসমান নৌকোর মতো সহসা দুলে উঠে দিগন্তের দিকে ধাবিত হয় অত্যন্ত সাবলীল গতিতে।'

গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭) 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) উপন্যাসে উঠে এসেছে একাত্তরের গ্রামীণ জীবনের আলোড়ন-সংক্ষোভ-স্বপ্ন। উপন্যাসের নায়িকা বুড়ি মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করেছে প্রাণ-প্রতিম সন্তানকে, এবং এভাবেই সে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে পৌঁছে গেছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বৃহত্তম-স্রোতে। হলদী গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনধারার বেড়ে ওঠা বুড়ি মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্রোতে অবগাহন করে হয়ে-ওঠে সূর্য-প্রতিম। বুড়ির অপর নাম মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ও যেন হাজার লক্ষ সন্তান-হারা গর্বিতা মাতৃভূমির শাশ্বত শিল্প-প্রতিমা। এক রইসের মা থেকে বুড়ির উজ্জ্বল উত্তরণ ঘটে, ও হয়ে-ওঠে লক্ষ রইসের সর্বজনীন মা :

> "নিঃশব্দ বুকের পাঁজরে হু হু বাতাস বয়ে যায়। বুড়ি হাজার চেষ্টা করেও কাঁদতে পারে না। ছুটে বেরুতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। আর দুটো প্রাণ ওর হাতের মুঠোয়। ও ইচ্ছে করলেই এখন সে প্রাণ দুটো উপেক্ষা করতে পারে না। বুড়ির সে অধিকার নেই। ওরা এখন হাজার হাজার কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা হলদী গাঁর স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করছে। ওরা আচমকা ফোটে ওঠা শিমুলের উজ্জ্বল পাপড়ির তুলো। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুধু রইসের মা হতে পারে না। বুড়ি এখন শুধু মন্ত্র রইসের একলার মা নয়।

যুদ্ধকালীন সময়ে নাগরিক মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব অনাস্থার সংকট, আশা নিরাশার দংশন এবং চেতনাগত অন্তর্দ্বন্দ্ব শিল্পরূপ পেয়েছে রশীদ হায়দারের (১৯৪১-) 'খাঁচায়' ১৯৭৫ উপন্যাসে। এ উপন্যাসে খাঁচায় বন্দী একটি টিয়ে পাখির মুক্ত হওয়ার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রতিভাসিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে বাংলাদেশের মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা। আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যে অভিনব 'অন্ধ কথামালা' (১৯৮২) উপন্যাসে রশীদ হায়দার মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গ্রামীণ মানুষের আত্মিক জাগরণ যেমনি তুলে ধরেছেন, তেমনি উপস্থিত করেছেন পাকিস্তানের দালালদের হীন ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের কাহিনী। টুর্নামেন্ট নাইন খেলতে খেলতেই গ্রামের একদল যুবক মিলিটারীর অসার সংযোগ সেতু উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করে, কিন্তু তাদেরই একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়, ধরা পড়ে পরিকল্পনার অন্যতম সাথী বেলাল হোসেন। এই বেলাল হোসেনকে যখন বন্দী অবস্থায় চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমির দিকে সে-সময়কার তার বিচিত্র অনুভূতি আর স্মৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ দিনের কাহিনী হলেও, ফ্লাস-ব্যাকে এ উপন্যাসে উঠে-এসেছে গ্রামীণ সংগ্রামশীল মানুষের যাপিত-

জীবন, ধরা পড়েছে সামন্ত শাসক ও ক্ষমতাবানদের শোষণের চিত্র। 'নষ্ট জোছনায়' এবং 'এ কোন অরণ্য' শীর্ষক দুটো উপন্যাসোপম রচনার যুগল-বন্দী-রূপ রশীদ হায়দারের 'নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য' (১৯৮২)। তাঁর 'নষ্ট জোছনায়' চিত্রিত হয়েছে যুদ্ধোত্তর কালের সর্বব্যাপী হতাশা, সমাজের নানা ভাঙচুর ও বিপর্যয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের চৈতন্যের পরাভব ও বিপথগামিতা। যে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের শুরুতে 'শূন্যে বজ্রমুষ্ঠি তুলে বলতো, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যে স্বাধীনতা পেয়েছি তা আমাদের এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে, যে-শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে তাতে আর কোনদিন হানাহানি হবে না' - যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, তাদের শরীর থেকে বারুদের গন্ধ মুছে যেতে-না-যেতেই কেন তারা বিপথগামী হলো এই অনিবার্য রক্তাক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। তবে উপন্যাসের সমাপ্তিতে, রুবীর দৃষ্টি-কোণে, ঔপন্যাসিক মুক্তিযোদ্ধাদের পুনরায় জেগে-ওঠার আহবান জানিয়েছেন এবং এইখানেই এ-উপন্যাসের বিশিষ্টতা।

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হলেও মাহমুদুল হকের (১৯৪০-) 'জীবন আমার বোন' (১৯৭৬) উপন্যাস লিবিডো-তাড়িত ও নিষ্ক্রিয় রোমান্টিকতা-আক্রান্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণারই শব্দরূপ: এখানে নেই সাহসে জ্বলে ওঠা কোন মুক্তিযোদ্ধার কথা, কোন প্রতিবোধের কাহিনী। বাঙালির বক্তিম উজ্জীবনের সময়ও যেহেতু মাহমুদুল হকের নায়ক খোকার 'পলায়ন ছাড়া কোন ভূমিকা নেই', তাই তার বিকৃত মানসিকতায় 'অর্ধেন্দু দস্তিদার-প্রীতিলতা-আনোয়ারা মতিয়ুরের বাংলাদেশ হয়ে যায় 'একটা বাংলা মদের বোতল', 'সস্তা মদের দোকান', 'ছমছমে ঘুটঘুটে বেশ্যালয়', 'লক্ষ বছরের বেতো ডাইনী মাসি' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর 'অশরীরী' এবং 'মাটির জাহাজে'ও আছে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ; কিন্তু কোন উপন্যাসেই মাহমুদুল হক মুক্তিযুদ্ধের সদর্থক চেতনা প্রকাশে প্রয়াসী নন।

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ -এই বিস্তৃত পটভূমিতে বিন্যস্ত 'আমার যত গ্লানি' (১৯৭৩) উপন্যাসে রশীদ করীম বাঙালি জাতিসত্তার সামগ্রিক জাগরণ-উন্মোচনে মোটেই আগ্রহী নন; তাই মুক্তি যুদ্ধের অনুষঙ্গ ধারণ করেও 'আমার যত গ্লানি' পরিণত হয় উত্তম-পুরুষের জবানীতে স্রষ্টার আত্মধিক্কার এবং ব্যক্তিজীবনের গ্লানিময় আলেখ্য। রাবেয়া খাতুনের (১৯৩৫-) 'ফেরারী সূর্য' (১৯৭৪) উপন্যাসের কাহিনী গৃহীত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন নাগরিক জীবন থেকে এবং এখানে আছে যুদ্ধের কথা, প্রতিরোধের কথা পশুশক্তির বর্বরতার কথা। তবে ভাষারীতি ও আঙ্গিকগত দুর্বলতার কারণে এটি হতে পারেনি উল্লেখ-যোগ্য কোন শিল্পকর্ম। আমজাদ হোসেনের ১৯৪২-) 'অবেলায় অসময় (১৯৭৫) উপন্যাসে পাকবাহিনীর আক্রমণে ভীত কতিপয় গ্রামীণ নরনারী এক মাঝির নৌকোয় ভেসে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে, এবং এ যাত্রাপথেই তারা দেখেছে গ্রাম বাংলার বীভৎস ধ্বংসচিত্র, অনুভব করেছে গণমানুষের 'চৈতন্যের জাগরণ'। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে

আটকে পড়া বাঙালি সরকারী কর্মচারীদের বন্দী-মানসের শব্দরূপ মিরজা আবদুল হাই-এর 'ফিবে চলো' (১৯৮১) উপন্যাস। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়-ভিত্তিক না-হলেও, এ উপন্যাসে ধরা পড়েছে প্রবাসী বাঙালির দুর্নিবার স্বদেশপ্রীতির কথা। এই দেশপ্রেমের জন্যেই, আইনের নিগড় আর প্রতিকুল প্রতিবেশের বেড়া ডিঙিয়ে, হিমাংকের নীচের তাপমাত্রা সত্ত্বেও, বন্দী-বাঙালি সাহসী হয়ে উঠেছে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে স্বদেশযাত্রায়।

বাংলাদেশ ও যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিতে রচিত হয়েছে হারুন হাবীবের 'প্রিয়যোধ্বা. প্রিয়তম' (১৯৮২) উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, মুক্তির উল্লাস আর ত্যাগের মহিমা যেমন ছড়িয়ে আছে এ উপন্যাসে, তেমনি আছে হাসান ইয়াসমিনকার রোম্যান্টিক প্রেমের প্রতীকে শাশ্বত বিশ্বজনীনতা। উপন্যাসের নায়ক যার বুকের পাঁজরে লুকিয়ে আছে পাকবাহিনীর বুলেট, হাসানের আবেগসিক্ত সংলাপে ধ্বনিত হয়েছে একাত্তরে বাঙালি জাতিসত্তার রক্তিম উজ্জীবনের সৌদ্রোজ্জ্বল চেতনা ঃ

> "একাত্তরের মৃত অথবা জীবিত স্বাধীনতা সংগ্রামী আবুল হাসানরাই বাংলাদেশ। এ সত্যের মৃত্যু মানেই তো বাঙালীর ইতিহাস থেকে একাত্তর সালটা নেই। নেই পলটন ময়দান, ঘেরাও আন্দোলন, নেই রেসকোর্স উদ্যানের স্বাধীনতা-পাগল জনতা, নেই ২৫শে মার্চের কালো রাত, নেই তেইশবছরের পাকিস্তানী দুঃশাসন-বর্বরতা নিষ্ঠুরতা, নেই সাভার এর জাতীয় শহীদ মিনার, মীরপুরের বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ। বায়ান্ন থেকে সত্তরের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসই বাংলাদেশ।"

উল্লিখিত উপন্যাসসমূহে ছড়িয়ে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ তবে এর কোনটিই মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্মিলিত বাঙালির চৈতন্যের জাগরণকে যথা-যথভাবে অঙ্গীকার করতে পারেনি। এর কারণ বহুবিধ। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে আমাদের ঔপন্যাসিকদের ধারণা অভিজ্ঞতা-পরিস্রুত নয়, বরং স্মৃতি আর শ্রুতি নির্ভর। তাই মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে তাঁদের উপন্যাসসমূহেও নেই প্রত্যক্ষ উত্তাপের স্পর্শ ; অধিকাংশ উপন্যাসই স্মৃতিচারণ-মূলক, কল্পনানির্ভর কিংবা আবেগ-উচ্ছ্বাসের মনোময় কথকতা। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা আর বিপর্যয় থেকে উজ্জ্বল উত্তরণের দিকে পথ-নির্দেশ নয়, এবং সর্বব্যাপী হতাশা আর 'নিখিল-নাস্তির' গর্ভে বিলীন হতে চাইলেন আমাদের ঔপন্যাসিকেরা এবং এ ভাবেই মুক্তি যুদ্ধের অনিঃশেষ-অবিনাশী চেতনা খণ্ডিত ও বিপথগামী হলো। তৃতীয়ত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বল্পস্থায়িত্ব এটিকে যথার্থ জনযুদ্ধে পরিণত হতে দেয় নি, ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও হয়নি সর্বব্যাপ্ত এবং এরই শিকার, অধিকাংশ বাঙালির মতো, বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরাও। এ-কারণেই একটি স্বাধীন জাতির সুদূরস্পর্শী স্বপ্ন ও পরিকল্পনা শিল্পে সাহিত্যে যথার্থ ভাবে হলো না রূপায়িত। চতুর্থত, এবং সম্ভবতঃ এইটিই প্রধান কারণ, মুক্তিযুদ্ধ এখনো অত্যন্ত কাছের একটি ঘটনা, এবং এ-জন্যই অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের মুক্তিযুদ্ধের

চেতনা আবেগ উচ্ছ্বাস তাড়িত, সেখানে স্বভাবতই ফুটে ওঠে শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাব। সময় পেরিয়ে যখন আসবে নতুন প্রজন্মের ঔপন্যাসিক, হয়ত তাঁর হাতেই লেখা হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে লেখা কালোত্তীর্ণ একটি উপন্যাস। এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য, নেপোলীয়নীয় যুদ্ধের (১৮০৪-১৮১৫) অনেক পরেই রচিত হয়েছে লেভ টলস্টয়ের কালোত্তীর্ণ মহাকাব্যিক উপন্যাস 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' (রচনাকাল ঃ ১৮৬৫-৬৮)। গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিকতাকে ধারণ করে রচিত, বাঙালি জাতিসত্তার সম্মিলিত উজ্জীবনের মর্ম-মূল-উৎসারিত, কালজয়ী মহাকাব্যিক উপন্যাসটি এখনও অনাগত কালের প্রত্যাশা মাত্র।

স্বাধীনতা-উত্তর উপন্যাসে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকটা কমেছে, তুলনামূলকভাবে বেড়েছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। এ-পর্বে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক যুদ্ধোত্তর হতাশা-অবক্ষয় আর নৈরাজ্যের শব্দরূপ নির্মাণে সচেষ্ট হলেন, উৎসাহী হলেন যন্ত্রণা-দগ্ধ তারুণ্যের নষ্ট-জীবনের শিল্পমূর্তি সৃজনে। দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদে উচ্চকিত হবার পরিবর্তে অনেকেই যেতে চাইলেন হতাশার অন্তঃসারশূন্য অতল গহ্বরে এবং সবাই মিলে লিখলেন একটি উপন্যাস, যার মৌল বিষয় নাস্তি —নিখিল নাস্তি।

প্রেম একটি লাল গোলাপ' (১৯৭৮), 'একালের রূপকথা (১৯৮১) এবং 'সাধারণ লোকের কাহিনী (১৯৮২) উপন্যাসত্রয়ে রশীদ করীম মূলত যুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা ও বিপর্যয়ের শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন। সমাজ-সংলগ্ন ব্যক্তি জীবনের সুস্থ, সুন্দর এবং অখণ্ডরূপ তাঁর কোন উপন্যাসেই প্রতিবিম্বিত হয়নি। তাঁর 'প্রেম একটি লাল গোলাপ' উপন্যাস নাগরিক উচ্চবিত্ত জীবনের জটিলতা ও অবক্ষয়ের চিত্র আর 'সাধারণ লোকের কাহিনী' হচ্ছে নাগরিক মধ্যবিত্তের নিত্য দিনের পাঁচালি। রশীদ করীমের উপন্যাসের ভাষা ও চরিত্রের কথা বলার ভঙ্গি সচেতন পরীক্ষা নিরীক্ষার স্বাক্ষরবাহী এবং তাঁর উপন্যাস সংগঠনের দিক দিয়েও স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

সৈয়দ শামসুল হকের 'খেলারাম খেলে যা' (১৯৭৩ উপন্যাস যৌনতার বিকার, মনোবিকলন এবং অস্বাভাবিক মানসিক-জটিলতার শিল্পরূপ। এ-উপন্যাসের নায়ক বাবর নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে লিবিডো তাড়িত হয়ে, সে যৌন-বিকারগ্রস্ত এবং পাতি-বুর্জোয়া জীবন-দর্শনে আসক্ত। বাংলাদেশের এক মফস্বল শহরের বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ তাদের কুসংস্কার, অস্তিত্বের সংকট ভবিষ্যৎ স্বপ্নময়তা আর দ্বিধা সংশয় নিয়ে গড়ে উঠেছে সৈয়দ শামসুল হকের 'দূরত্ব' (১৯৮১) উপন্যাস। আধুনিক মানুষের নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বহুভুজ জটিলতা, এবং মনস্তাত্ত্বিক বিকার উপস্থাপনে সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস বাংলাদেশের 'কথাসাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। আঙ্গিক নির্মিত ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ-প্রসাধনে পরীক্ষা-প্রিয় সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস পাঠক-নন্দিত, সুখপাঠ্য এবং সুখদ।

সুদূর বেলুচিস্তান থেকে আসা, সম্রাট আকবরের সৈনাপত্য মুরাদ খানের

বংশধরদের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠার আধারে, ১৫৭৭ থেকে ১৯৪৭ সাল -এই প্রায় চারশত বছরের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস প্রতিচিত্রিত হয়েছে রাজিয়া খানের 'প্রতিচিত্র' ১৯৭৬ উপন্যাসে। তবে আরম্ভ এবং পরিণতিতে অসংলগ্নতা উপন্যাসটির সাংগঠনিক ভিতকে করেছে দুর্বল। ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব এবং সত্তরের দশকে তাদের পূর্ণ বিকাশ, তাদের নৈতিক অধঃপতন, বিচ্যুতি, মূল্যবোধের অসঙ্গতি এবং একই সাথে মননশীলতা, রুচিবোধ ও আভিজাত্য অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে রাজিয়া খানের 'হে মহাজীবন (১৯৮৩) উপন্যাসে। সত্তাবিচ্ছিন্ন মানুষের নিঃসঙ্গবোধ উপস্থাপনে এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা-বিশ্লেষণে রাজিয়া-খানের উপন্যাস বাংলাদেশের কথা সাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা।

সরদার জয়েনউদ্দীনের 'শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলি ১৯৭৩ স্বাধীনতা-উত্তর কালের মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং উপন্যাসের নায়ক শ্রীমান তালেব আলির বিকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড়ে উঠেছে। জয়েনউদ্দীনের 'বিবর্ণ বোদের ঢেউ (১৯৭৫) এ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাস আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ-সংগ্রামের এক শিল্পিত দলিল। ব্যক্তির সংকট এবং বিচ্ছিন্নতা নয়, এখানে উঠে এসেছে কল্লোলিত পঞ্চাশ-পঞ্চাশের দশকে বাঙালি মানুষের উত্থানের কথা, উজ্জীবনের কথা।

'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' রচয়িতা আবু জাফর শামসুদ্দীন এ-পর্বে রচনা করেন মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস 'পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৮১)। গ্রাম ও নগরের পটে বিস্তৃত এ-উপন্যাসে, খণ্ড খণ্ড কাহিনীর আধারে, অভিব্যঞ্জিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত পথ ও বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাস। তবে কেন্দ্রানুগ শক্তির আকর্ষণে এ জাতীয় উপন্যাসে খণ্ড খণ্ড চিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তে হয়ে ওঠে অখণ্ড তা 'পদ্মা মেঘনা যমুনায় দুর্লক্ষ্য। তার 'প্রপঞ্চ (১৯৮০) আমাদের দেশের পেশাজীবী রাজনীতিবিদদের ভণ্ডামীর স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস। প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ থাকলেও, আবু জাফর শামসুদ্দীনের কোন উপন্যাসেই নেই প্রকরণ পরিচয়। ও আঙ্গিক নির্মিতিতে প্রত্যাশিত প্রযত্নের ছাপ।

এ-পর্বে প্রকাশিত শওকত ওসমানের 'পতঙ্গ পিঞ্জর ১৯৮৩) প্রতীকাশ্রয়ী রচনা। পঙ্গপালের আক্রমণে বিপর্যস্ত অখ্যাত গৌর গ্রাম এখানে স্বদেশের রূপক। পঙ্গপালের আক্রমণের হাত থেকে মুক্তির জন্যে, বাইরজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন গৌর গ্রামের মানুষ অবশেষে সফল হয় 'পঙ্গপাল নিশ্চিহ্নকরণ অভিযানে' —তারা এগিয়ে আসে মশাল হাতে, যেন দীপালী উৎসব চারদিকে। পঙ্গপাল ধ্বংসের রূপকচিত্রে শওকত ওসমান জাতিক-আন্তর্জাতিক সামাজিক পঙ্গপালদের অনিবার্য ধ্বংসের কথাই উচ্চারণ করেছেন এ-উপন্যাসে। বিষয় গৌরবে বিশিষ্ট আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' (১৯৭৫) এ-পর্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় নিপীড়িত বাঙালির

জীবনাবেগের প্রেক্ষাপটে রচিত এ-উপন্যাসের শব্দস্রোতে প্রতীকীব্যঞ্জনায় বোবা-নায়িকা যেন হয়ে ওঠে কণ্ঠরুদ্ধ শৃঙ্খলিত বাংলাদেশ।

দিলারা হাশেমের 'স্তব্ধতার কানে কানে' (১৯৭৭) উপন্যাসে কলকাতার বিরাশি নম্বর এ্যান্টনি বাগান লেনের এক পঙ্গু মেয়ে, নাম যার হুমায়রা, একে একে বলছে তার জীবন-যন্ত্রণার কথা, তার গোপন অক্ষম প্রেমের কথা। প্রেমের সঙ্গে পঙ্গুত্বের দ্বৈরথে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হুমায়রার অতলান্তিক বেদনা উন্মোচনে এ-উপন্যাসে লেখক অর্জন করেছেন অসামান্য সাফল্য। মধ্যবিত্ত ঘরের এক মেয়ে, যে প্রত্যাশার সঙ্গে মেলাতে পারেনি প্রাপ্তির, স্বপ্নের সাথে সূর্যালোকের সেই মেয়ে সায়েরা—তার নৈঃসঙ্গ্য আর বেদনার কথা নিয়ে দিলারা হাশেমের গীতল উপাখ্যান 'আমলকীর মৌ' (১৯৭৮)। রোম্যান্টিক প্রেমের আধারে 'স্তব্ধতার কানে কানে' উপন্যাসে আছে চলমান কলকাতার নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলিম জীবন ; আর 'আমলকীর মৌ'-এ আছে, পার্শ্ব চরিত্রের জীবনচিত্রণ-সূত্রে, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-অনুষঙ্গ।

শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' (১৯৮৪) এ-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে সামন্ত-মহাসামন্তের অত্যাচার-অবিচার, অন্ত্যজ-প্রাকৃতজনের প্রতিরোধ আর তুর্কিদের বঙ্গ-বিজয়ের ফলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে উঠেছিল যে ঊর্মির আলোড়ন--সেই দূরাগতধ্বনির ইতিহাসের শিল্পিত-ভাষ্য এ-উপন্যাস। আজকের মতো, ইতিহাসের সেই প্রদোষ কালেও, প্রাকৃতজনেরা প্রতিনিয়ত শোষিত হয়েছে তবু কখনো কখনো তাদের মধ্যে জেগেছে প্রতিরোধ চেতনা, সামন্ত-শাসক আর বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে উঠেছে অন্ত্যজেরা, বৌদ্ধেরা—নতজানু দাসত্ব থেকে তারা চেয়েছে মুক্তি। উপন্যাসের নায়ক শ্যামাঙ্গ, যে একজন মৃৎশিল্পী, সামন্ত-মহাসামন্তদের অভিরুচির কাছে নিজের শিল্পদৃষ্টির পরাভব মানতে পারে নি, এ-জন্যেই তাকে ছেড়ে দিতে হলো শিল্পের সাধনা ; তবু কালের সীমানা পেরিয়ে তার উত্তরাধিকার বেঁচে থাকে অনাগত সময়ের স্রোতে ঃ

> "যদি কখনো পল্লী বালিকার হাতে কখনো মৃৎপুত্তলি দেখতে পান, তাহলে লেখকের অনুরোধ, লক্ষ্য করে দেখবেন, ঐ পুত্তলিতে লীলাবতীকে পাওয়া যায় কিনা—আমাদের বিশ্বাস, কোনো-না-কোনো পুত্তলিতে অবশ্যই পাওয়া যাবে—আর যদি যায়, তাহলে বুঝবেন, ওটি শুধু মৃৎপুত্তলিই নয়, বহু শতাব্দী পূর্বের শ্যামাঙ্গ নামক এক হতভাগ্য মৃৎ শিল্পীর মূর্ত ভালোবাসাও।"

সেই তিনি, যাঁর নাম এ্যারিস্টটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪—খ্রীঃ পূঃ ৩২২), প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে যেমন বলেছেন—ইতিহাস হচ্ছে সত্য ঘটনার বিবরণ, আর ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্য হচ্ছে ইতিহাসের কঙ্কালের ওপর কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য ; তেমনি শওকত আলীর এ-উপন্যাসেও আছে ইতিহাসের অস্থি-করোটিতে কল্পলোকের তনু-মন ; তবে এ কল্পনায় নেই মনগড়া ইতিহাস, এবং আছে ইতিহাসের মনোময় বিন্যাস। এই উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান পরিণত হয়েছে শিল্পে এবং এ-ক্ষেত্রে লেখকের সাফল্য অনতিক্রান্ত। সমালোচক যথার্থই বলেছেন 'গবেষণার সঙ্গে এই

বইতে যুক্ত হয়েছে দরদ, তথ্যের সঙ্গে মিলেছে অন্তর্দৃষ্টি, মনোহর ভঙ্গির সঙ্গে মিশেছে অনুপম ভাষা।'

স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে সব নতুন ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে, রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-) তাঁদের অন্যতম। বিষয় বৈচিত্র্য এবং শৈল্পিক উৎকর্ষে তাঁর উপন্যাসসমূহ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। রিজিয়া রহমানের উপন্যাসের তালিকাটা এ-রকম ঃ 'ঘর ভাঙা ঘর' (১৯৭৪), 'উত্তর পুরুষ' (১৯৭৭), 'রক্তের অক্ষর' (১৯৭৮), 'বং থেকে বাংলা' (১৯৭৮), 'অরণ্যের কাছে' (১৯৭৯), 'শিলায় শিলায় আগুন' (১৯৮০), 'অলিখিত উপাখ্যান' (১৯৮০), 'ধবল জ্যোৎস্না' (১৯৮১), 'সূর্য সবুজ রক্ত' (১৯৮১), 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪); তাঁর 'ঘর ভাঙ্গা ঘর' বস্তি জীবনের ক্লেদাক্ত যন্ত্রণার শব্দরূপ ; আর 'রক্তের অক্ষর' হচ্ছে নিষিদ্ধ পল্লীর যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাত্যহিকতার ভাষা-চিত্র। চট্টগ্রামে হার্মাদ জলদস্যুদের অত্যাচার এবং পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিকতা নিয়ে গড়ে-উঠেছে রিজিয়া রহমানের 'উত্তর পুরুষ'। বাংলাদেশে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার আর প্রতিষ্ঠা-চিত্রণ-সূত্রে এ-উপন্যাসে ফুটে উঠেছে আরাকান-রাজ সন্দ-সুধর্মার অত্যাচারের কাহিনী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের বীরত্বের কথা, পর্তুগীজদের গোয়া-হুগলী-চট্টগ্রাম দখলের ইতিহাস। এ উপন্যাসের ব্যতিক্রমী চরিত্র বনি, যে পর্তুগীজ নাগরিক হয়েও, বাংলাদেশকে দ্বিতীয় স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে, ভালোবেসেছে এদেশের শ্যামল প্রকৃতি আর শ্যামল মানুষকে এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে পর্তুগীজ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে।

'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসে রিজিয়া রহমান বাঙালির ইতিহাস সন্ধানী এবং একই সঙ্গে সমকালস্পর্শী। শ্রম-অধ্যাবসায়-ইতিহাসজ্ঞান এবং শিল্পচেতনার আন্তরমিলনে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। এখানে ইতিহাসকে তিনি স্বচ্ছন্দপ্রয়াসে পরিণত করেছেন শিল্পে ; এবং শিল্পের দাবীতেই, সঙ্গতকারণে, ইতিহাসের ধূসরতায় বিশেষ কল্পনার সৌরভ। রিজিয়া রহমান এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন শতাব্দী পরম্পরায় এই ব-দ্বীপের অবহেলিত উপেক্ষিত অধিকারহীন মানুষের যাপিত জীবন। আর সেই সূত্রেই এ উপন্যাসে উঠে এসেছে বাঙালি জাতিগঠনের অতীত ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য ঃ

> "বাংলাদেশের জাতিগঠন ও ভাষার বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসের সৃষ্টি। আড়াই হাজার বছর আগে বং গোত্র থেকে শুরু করে উনিশ শ' একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পরিব্যাপ্তির মধ্যে এ উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করা হয়েছে। বাংলার সিংহাসন চিরকাল বিদেশী ক্ষমতালিপ্সু এবং সম্পদলোভীর দ্বারা শাসিত হয়েছে। বাংলার সাধারণ মানুষ চিরকালই অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং উৎপীড়িত। জাতি হিসেবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, গণতান্ত্রিক মর্যাদা তারা কোনদিন পায়নি। 'বং থেকে বাংলা' যেমন একদিকে ইতিহাসের সঙ্গে সেই কথাটাই প্রকাশ করেছে, তেমনি কি করে সুদীর্ঘ দিনে একটি জাতি স্বাধীনতার মর্যাদায় এসে দাঁড়িয়েছে তারই চিত্রণের চেষ্টা করেছে।"

ভারত উপমহাদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত বেলুচিস্তানের স্বাধীনচেতা মানুষ যারা,

শতাব্দীর পর শতাব্দী সামাজিক-অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ভাবে বৈষম্যের শিকার, তাদের দেশপ্রেম আর সাজাত্যবোধের গর্ব গৌরব আর সাহসের অনুপম শিল্পরূপ রিজিয়া রহমানের উপন্যাস 'শিলায় শিলায় আগুন'। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ ও কালাতের যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে উপন্যাস। তবে লেখকের সচেতন শিল্প-সৃষ্টির স্পর্শে, এক বেলুচিস্তানের কাহিনীর আধারে, এখানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী শোষিত মানুষের সংগ্রাম-সাহস আর স্বপ্নের কথা।

রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষরে' নিষিদ্ধ পল্লীর যন্ত্রণাদগ্ধ প্রত্যাহিকতার ভাষাচিত্র, আর 'ধবল জ্যোৎস্না' হচ্ছে তরঙ্গ-উত্তাল সুনীল বঙ্গোপসাগরের হাঙর শিকারী জেলে, রবার বাগানের শ্রমিক আর পাহাড়ী ঝর্ণায় পা ডুবিয়ে অন্য-জীবন প্রার্থনা করা এক মেয়ে—এদের আধারে, সাগরতীরের মানুষের ধবল বেদনা আর রূপালি স্বপ্নের শিল্পরূপ। বিন্দিয়া লছমী শিউরাম-অর্জুন হরমতী-চন্দনী-বাজিন্দর-হরিয়া আর চামেলী—এসব চা-পাতা সংগ্রহকারীদের প্রতিদিনের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে রিজিয়া রহমানের 'সূর্য সবুজ রক্ত।' উপন্যাসের সমাপ্তি চামেলীর হাতের রক্ত ঝরে বাংলাদেশে, ভারতে, শ্রীলঙ্কায়—এমন একটি মাত্র বাক্য জুড়েই রিজিয়া রহমান প্রকাশ করে দেন তাঁর আন্তর্দেশিক চেতনা।

বিষয়-ভাবনার বিশিষ্ট রিজিয়া রহমানের উপন্যাস—'অলিখিত উপাখ্যান'। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্পেষণক্লিষ্ট অত্যাচারিত বাঙালির আর্তনাদ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৩৮-৯৪) আলোড়িত করেছে; কিন্তু প্রতিবাদের কলম উত্তোলন করতে গিয়েও 'মানুষ' বঙ্কিম—'সাহিত্যিক' বঙ্কিম পরাজিত হয়েছেন 'ডেপুটি' বঙ্কিমের কাছে। সেই সত্য-অন্বেষী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর অভিলাষ আর অক্ষমতার মর্মবেদনা নিয়ে গড়ে উঠেছে এ উপন্যাস।

উত্তর বাংলার সাঁওতাল-জীবন নিয়ে লেখা রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল' এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। এ-উপন্যাসে ধারণ করেছে সাঁওতাল জনপদের সুদীর্ঘকাল। এবং এখানে আছে সাঁওতালদের আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, ধর্মবিশ্বাস-কুসংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা এবং ঈর্ষা আর স্বার্থপরতার ছবি। এই আরণ্যক আদি-মানুষের জীবন সভ্যতার স্পর্শে এক সময় বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে।

> "প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের নীলাভ কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ হড়। হড়রাই সেই নীলাভ অন্ধকারের পবিত্রতা দু'হাতের মুঠোয় ভরে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। আর অনেক দূর থেকে শংখিনী সাপের আঁকা বাঁকা দেহভঙ্গীর কুটিলতা নিয়ে পথ খোঁজে খোঁজে এগিয়ে আসে সভ্যতা।"

আদিম জনপদের ঐ বিপর্যয়েরই শিল্পরূপ 'একাল চিরকাল'। ভাষায় ক্লাসিক সংহতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ইতিহাসনিষ্ঠা, সমাজ সচেতনতা এবং শৈল্পিক সতর্কতা—সব কিছুর অন্তর্মিলনে রিজিয়া রহমানের এ-উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট সংযোজন।

সেলিনা হোসেনেরও যাত্রা-শুরু স্বাধীনতা-উত্তরকালে এবং ইতোমধ্যে তিনি লিখেছেন এ-সব উপন্যাস ঃ 'জলোচ্ছ্বাস' (১৯৭২), 'জ্যোৎস্নায় সূর্যজ্বালা' (১৯৭৩), 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' (১৯৭৯), 'যাপিত জীবন' (১৯৮১), 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮৩), পদশব্দ (১৯৮৩), এবং 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪)। বিষয়-

গৌরবে সেলিনা হোসেনের প্রতিটি উপন্যাসই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী। দক্ষিণ-বাংলার চর জীবনভিত্তিক 'জলোচ্ছ্বাস' উপন্যাসে লোকমানসের সঙ্গে স্রষ্টার সুগভীর সংযোগ অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। 'জ্যোৎস্নায় সূর্যজ্বালা' উপন্যাস নাগরিক ক্লেদ আর অবক্ষয়ী জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অভিলাষী গ্রামীণ স্নিগ্ধতায় বেড়ে ওঠা বস্তিবাসী এক নারীর আপন উৎসে প্রত্যাবর্তনের শব্দচিত্র। তাঁর 'মগ্ন চৈতন্যে শিস'। নৈঃসঙ্গ্য-পীড়িত এবং স্মৃতিভারাক্রান্ত আধুনিক মানুষের অন্তর্মময় ভাবনার শব্দরূপ। তা কর্মহীন মধ্যবিত্তের শীতল প্রেম-উপাখ্যান। একজন মিতুলকে না পাবার বেদনায় উপন্যাসের নায়ক জামেরা এখানে হারিয়ে যায় অসীম নৈঃসঙ্গ্য আর অতলান্ত শূন্যতায়।

বিষয়গৌরবে বিশিষ্ট সেলিনা হোসেনের যাপিত জীবন। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংক্ষুব্ধ সময়ের পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাসে ঘটনার দ্বৈত স্রোতধারায় বিন্যস্ত হয়েছে সমাজ-সত্য এবং ব্যক্তি-সংবেদনা। কিন্তু অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার জন্যে গৌরব উজ্জ্বল পটভূমিকে ধারণ করা সত্ত্বেও এটি শৈল্পিক সিদ্ধিকে অঙ্গীকার করতে পারেনি। প্রেম এবং সংগ্রামের দ্বৈরথে নায়ক জাফর রক্তাক্ত হয়েছে এবং অবশেষে নতুন ভোরের প্রত্যাশায় সে সংগ্রামের স্রোতে মিলে গেছে। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে ধরা পড়েছে সেলিনা হোসেনের ঐতিহ্য-প্রীতি। এ-উপন্যাসে তিনি বিচরণ করেছেন হাজার বছর পূর্বের চর্যাগীতির উঠানে। ইতিহাস-নিষ্ঠা, সমাজ-সচেতনতা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অঙ্গীকারে রচিত এ উপন্যাসে হাজার বছর পূর্বের বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির এক শাব্দিক দলিল।

'মনসামঙ্গলে'র সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং সমকালের জীবন অভিজ্ঞতা—এ দুয়ের পরস্পর অন্তর্বয়নে রচিত হয়েছে সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক চাঁদবেনে মনসামঙ্গল কাব্যের সাহসী মানুষ চাঁদ সদাগরের নবীন সংস্করণ। কাহিনীর মৌল-উৎসে আছে 'মনসামঙ্গলে'র অনুষঙ্গ. তবে কেবল 'মনসামঙ্গলে'র আবহেই --চাঁদবেনে সীমাবদ্ধ নয় বরং মঙ্গলকাব্যের ধূসর পাতা ছিঁড়ে, চাঁদ সদাগরের প্রেরণায়, এখানে ফুটে উঠেছে এক ভূমিহীন শোষিত ক্ষেত মজুরের জীবন-যন্ত্রণার ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী। এ-উপন্যাসে পূজা-প্রার্থী ভয়ঙ্কর এক রাক্ষুসী মনসা নেই—তবে আছে মনসারূপী এক ভূস্বামী শোষক আজু মৃধা। মঙ্গলকাব্যের যুগে দেবতাপ্রত্যয়ী সমাজে সবার অলক্ষ্যেই যেমন জন্ম নেয় একজন বেপরোয়া চাঁদ সদাগর, যার কণ্ঠে উঠে আসে দেবতার বিরুদ্ধে অকল্পনীয় প্রতিবাদ 'আমি তেত্রিশ কোটি দেবতা মানিনা, কোন অপদেবতার পূজা আমি দেব না'; তেমনি চম্পাইগঞ্জের অবরুদ্ধ সমাজ প্রতিবেশে ভূমিহীন শোষিত ক্ষেত মজুরের ঘরে জন্ম নেয় একজন বেপরোয়া চাঁদবেনে—যার কণ্ঠে চাঁদ সদাগরের মতই প্রতিবাদধ্বনি—"আমি আজু মৃধার শোষণ থেকে মুক্তি চাই, আমি তাকে ঘৃণা করি, আমি তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি।" তবে উপন্যাসের পরিণতিতে 'লাউয়ের ডগার মতো' এক সকিনার আকাঙ্ক্ষায় চাঁদবেনের এই সংগ্রামী সত্তা আর সমাজ-ভাবনা প্রেমের কাছে পরাভব মানলো ঃ

"আজু মৃধা আমার ভিটে দখল করে নিলে আমি লড়াই করবো। পরাজিত হলে বিন্দুমাত্র গ্লানি আমাকে আচ্ছন্ন করবে না। সেই শোক লালন করে আমি আবার

প্রস্তুতি নেবো। কিন্তু একজন প্রিয়তম নারীর অভাব কাটিয়ে উঠতে পারবো না। যে নারী উর্বরা ভূমি হয়ে উত্তর-পুরুষ সৃষ্টি করে। যার ক্ষমতায় জীবনের ফসল উপচে ওঠে। যার ভালোবাসায় চম্পাইগঞ্জের মাটিতে সুদিন আসে।"

এ-উপন্যাসে লেখকের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা যেমন বহির্জীবন সন্ধানী তেমনি মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্য উন্মোচন যেন অতল হৃদয়স্পর্শী। পরিচর্যা সচেতনা, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ইঙ্গিতময়তা এবং কবিতাস্পর্শী ভাষারীতি সেলিনা হোসেনের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাস এবং ঐতিহ্য, কখনো কখনো প্রতিভার স্পর্শে, নবতর জীবন চেতনায় স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সমকাল-চঞ্চল জীবনাবেগ এবং যুগ-সংক্ষোভ অঙ্গীকার করে মহৎ শিল্পী-মানস ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আধারে সঞ্চার করে নবীন সংবেদনা। লেখকের চেতনার গভীরে প্রোথিত ইতিহাস জ্ঞান এবং সমাজবোধের স্পর্শে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যিক উপাদানের পুনর্জন্ম ঘটে, কল্লোলিত বর্তমানের অভিজ্ঞতার উত্তাপে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্তর্বয়নে মিলে যায় একালের সাথে চিরকাল। শৈল্পিক সিদ্ধির প্রশ্ন উঠতে পারে, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, শওকত আলী, রিজিয়া রহমান সেলিনা হোসেন প্রমুখ ঔপন্যাসিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করে যুদ্ধোত্তর বাংলা দেশের উপন্যাস সাহিত্যে সঞ্চার করেছেন একটি নতুন মাত্রা। তবে তুলনাসূত্রে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে উপাদানের উপন্যাস-অবয়ব সৃষ্টিতে এঁদের মধ্যে রিজিয়া রহমানের সাফল্য একক, বিস্ময়কর, অনতিক্রান্ত এবং শীর্ষবিন্দুস্পর্শী।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের আরেকজন প্রতিশ্রুতিশীল ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮)। তাঁর উপন্যাসগুলো হচ্ছে—নন্দিত নরকে (১৯৭২, 'শংখনীল কারাগার (১৯৭৩), 'শ্যামল ছায়া' (১৯৭৩), 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' (১৯৭৪), 'অচিনপুর ১৯৭৪), 'নির্বাসন (১৯৭৪), 'অন্যদিন' ১৯৮৪), 'সৌরভ' (১৯৮৪, 'তোমাকে' (১৯৮৪৷ এবং 'ফেরা' (১৯৮৪। একদা 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগার' লিখে তিনি ব্যাপক আলোচিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে, তিনি আত্মসমর্পণ করলেন সহজ ফুলেল জনপ্রিয়তার কাছে এবং লিখে ফেললেন উপন্যাসের আভধায় একগুচ্ছ বড়গল্প। সোমেন চন্দের (১৯২০ ৪২) বিখ্যাত 'ইদুর' গল্পের অনুপ্রেরণায় তিনি রচনা করেন 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগার'—এমন স্বীকারোক্তি 'শঙ্খ নীল কারাগারে'র ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সোমেন চন্দের গল্পে সুগভীর এবং মীমাংসিত সমাজবাদী চেতনা হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়নি। যুদ্ধোত্তর সময়ে বিপর্যস্ত মূল্যবোধে আচ্ছন্ন 'নরক' আর 'কারাগার' থেকে হুমায়ূন আহমেদ মুক্তির অভিলাষী; কিন্তু ঐ নরক আর কারাগার থেকে এলো না তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি—বরং 'নন্দিত' আর 'শঙ্খনীল' বিশেষণের আবরণে মেনে নেন তিনি স্বেচ্ছাবন্দিত্ব। আমরা জানি, উপন্যাসের অন্বিষ্ট পূর্ণায়ত জীবন, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের পরবর্তী উপন্যাসসমূহে সেই পরিপূর্ণ অখণ্ড জীবন-উপলব্ধি নেই। যেমন হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয়তার কাছে সমর্পিত হয়ে লিখেছেন একগুচ্ছ বড়গল্প; তেমনি আরেকজন ঔপন্যাসিক ইমদাদুল

হক মিলনও (১৯৫৫-) উপন্যাসের অভিধায় লিখেছেন বেশ কিছু বড় গল্প এবং এখানেও জীবন জিজ্ঞাসা খণ্ডিত ও বয়োসন্ধি-স্নিগ্ধ। স্বাধীনতা উত্তরকালে, এছাড়াও, আরো কয়েকজন নতুন ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে, যাঁরা বিষয়ভাবনা এবং আঙ্গিক নির্মিতির প্রশ্নে পরীক্ষাপ্রবণ এবং স্বাতন্ত্র্য অর্জনে প্রয়াসী ; তবু তাঁদের সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলার এখনো সময় হয়নি।

[পাঁচ]

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা তুলে ধরেছি পূর্ববাংলার উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি, দেখাতে চেয়েছি আমাদের ঔপন্যাসিকদের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা। প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে গ্রামমুখীন জীবনযাত্রাব রূপায়ণে আমাদের প্রবীণ ঔপন্যাসিকেরা যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা নির্মাণ করেছে পূর্ববাংলার উপন্যাস সাহিত্যের ভিত্তি। পঞ্চাশের দশকে আমাদের উপন্যাসে এলো নগবজীবন —এলো প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শব্দস্রোত। ষাটের দশকে এসে উপন্যাস সাহিত্যে প্রাধান্য পেল অবক্ষয়ী মূল্যবোধ. এলো আঙ্গিক-সচেতনা এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসরণে উপন্যাস রচনার একটি নতুন ধারা। মুক্তি-যুদ্ধোত্তর উপন্যাসে এলো বিষয়বৈচিত্র্য, কিন্তু ক্রমঅপসৃত হলো মৃত্তিকালগ্ন মানুষেরা — উপন্যাসের শব্দস্রোতে কাল্লোলিত হলো না বাঙালি জাতিসত্তার রক্তাক্ত উজ্জীবন।

যুগেব হতাশা, নৈরাজ্য, অবক্ষয়, কর্মহীন রোম্যাণ্টিকতার অকারণ যন্ত্রণা আর মৈথুন-উৎসরের চিত্র নয়—আমরা চাই তেমন একটি উপন্যাস, যেখানে আছে দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা। অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জনের কাব্যিক বর্ণনা নয় আমরা চাই উত্তরণের কথামালা। ভীরুতা, কাপুরুষতা আর রমণ-প্রিয়তাব চিত্র নয়—আমরা চাই তেমন একটি উপন্যাস যেখানে আছে নাম জানা, না-জানা হাজার-লক্ষ বীর শহীদের রক্তদান-মহোৎসবের কথা। আমরা বিশ্বাস করি, সমাজচৈতন্য ও ব্যক্তি-সংবেদনার অন্তর্মূল থেকে উৎসারিত, প্রার্থিত সেই উপন্যাসটি আমাদের উজ্জীবিত করবে উজ্জ্বল উত্তরণের লক্ষ্যে ; নতুন চেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠবে নষ্ট জীবনের আরাধনারত তরুণ সমাজ হয়ে উঠবে তারা রক্তমুখী, সূর্যমুখী, স্বপ্নমুখী। আমরা আশা করবো, একাত্তরের রক্তাক্ত উজ্জীবনের আলোয় পথ দেখে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা এগিয়ে আসবেন উত্তরণ আর শৃঙ্খলমুক্তির কথামালা সৃষ্টিতে- হয়ে উঠবেন তারা এক একজন নতুন মুক্তিযোদ্ধা।

তথ্য-সূত্র

১ সৈয়দ আকরম হোসেন : 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনা প্রবাহ ও শিল্প জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ', সাহিত্য পত্রিকা (সম্পাদক : প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম) ; সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (শীত ১৩৮০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২ মোহাম্মদ মানরুজ্জমান : 'পূর্ব পাকিস্তানী কথা সাহিত্য', আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩. 'জননী' ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হলেও, এ-উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে, দ্রষ্টব্য 'মুখবন্ধ'।

৪. হাসান আজিজুল হক : পূর্ব পাকিস্তানের কথা সাহিত্যে চিন্তার সংকট', 'পরিক্রমা' (সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম) তৃতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, ঢাকা।
৫. হাসান হাফিজুর রহমান : 'আমাদের সাহিত্য : বিভ্রান্তি, উৎক্রান্তি', "সমকাল" (সম্পাদক : সিকান্দার আবু জাফর), ষষ্ঠ বর্ষ দশম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০।
৬. 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প' (১৩৬১, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা) গ্রন্থে 'সারেঙ' গল্পটি সংকলিত হইয়াছে।
৭. ওয়াকিল আহম্মদ : 'আনোয়ার পাশার জীবন কথা', মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা (সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন), ১৯৭২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮. মোহম্মদ মনিরুজ্জামান : 'আমাদের উপন্যাস প্রসঙ্গে' "উত্তরাধিকার" সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল ইসলাম', শহীদ দিবস সংখ্যা—১৯৭৪; দ্বিতীয় বর্ষ : প্রথম—তৃতীয় সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৯. Aristotle : 'On the Art of poetry,'Classical Literary Criticism', Translated by T. S. Dorsch, Penguin Books, London.
১০. মজফ্ফর আহমদ : সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ (সম্পাদক দিলীপ মজুমদার, ১৯৭৩, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৭৮, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা) গ্রন্থের মুখবন্ধ।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় ইঁদুর গল্প সম্পর্কে কমরেড মুজফ্ফর আহমদের মন্তব্য : "সোমেন চন্দের নাম জানা ছিল। কিন্তু তাঁকে কখনো দেখেনি, কিংবা তাঁর লেখা পড়িও নি। পার্টি যখন আইন-সম্মত হল তখন বাইরে এসে সোমেন চন্দের ইঁদুর গল্পটি পড়লাম। আমার মন তখন হাহাকার করে উঠল। হায় হায় এমন ছেলেকে রাজনীতিক মনকষাকষির জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেরে ফেলল। সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে পারতেন।... এই গল্প (ইঁদুর) পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক তা পড়েছেন। 'ইঁদুর' জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।"

সৈয়দ আকরম হোসেন

বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ আঙ্গিক বিবেচনা

পবিবর্তমান সমাজচৈতন্যপ্রবাহের ব্যক্তিচিত্ত-আশ্রয়ী চেতনার অভিব্যক্ত 'image'-ই সাহিত্যশিল্প, এবং প্রবহমান সমাজ-ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে সাহিত্য-শিল্পের 'Image' অর্থাৎ Form'-ও রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সংগত কারণেই, উপন্যাসের শিল্পরীতিও পরিবর্তিত হয অনিবার্যভাবে রূপ থেকে রূপান্তরে। ফলে উপন্যাস-শিল্পের কোন স্থির ফর্ম নির্দেশ সম্ভব নয়।

[এক]

মূলতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই পুঁজিবাদী সভ্যতাগর্বী ইউরোপ রূপান্তবিত হয় সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তিতে। শুরু হয় তার সভ্যতার অবক্ষয় ও স্খলন ; দারিদ্র, অসত্য ও মূল্যবোধ-জীর্ণতায মধ্যবিত্ত সমাজ হয়ে ওঠে বিপন্ন। ধনবাদী শ্রেণীর শোষণ-উৎস যন্ত্র ও যন্ত্রজটিলতার পীড়নে সংবেদনশীল মানুষ অতি দ্রুত হয়ে যায় সমাজ-বিচ্ছিন্ন, আত্মবিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র, একাকী, নিঃসঙ্গ, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত ও অন্তর্মনস্ক। ধনবাদী ক্রুরশক্তির মর্মন্তুদ পীড়নে ইউরোপীয় শিল্পীরা ক্রমশঃ শুরু করেন মগ্নচৈতন্যে জীবনযাপন। তাঁদের কাছে উনিশ শতকী সমগ্রতাবোধ, কার্যকারণতত্ত্ব, যুক্তিবাদ রূপ নিলো মূল্যহীন ও কালজীর্ণ অবিশ্বাসে। তাঁরা তীক্ষ্ম অনুভববেদ্যতা, সহজাত-বৃত্তি, অন্তর্গত চেতনাস্রোত, কার্যকারণহীন ঘটনা ও সময়প্রবাহকে অনুধ্যান করলেন শিল্পাদর্শের পরমেশ্বর হিসেবে। যেহেতু বহমান বহির্বস্তুজগৎ এবং স্রষ্টার অনুভব-সংবেদন মন—এ দুয়ের জটিল বাস্তবতা একাত্ম হয়ে প্রকাশ ঘটায় রূপের, সে কারণে উপন্যাসের ফর্মনির্মাণের ক্ষেত্রে সাধিত হল জটিলতর রূপান্তর। সমাজ-প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিচৈতন্য ও সজাগ-অস্তিত্বের অন্তর্লীন কিংবা তরঙ্গময় সংঘাত-সংঘর্ষ যুক্ত হয়েই সাধিত হয় মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চতর ক্রমবিকাশ। সঙ্কটসঙ্কুল সমাজে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, ক্রমমুক্তির তপস্যা, নিরন্তর সংগ্রাম, দুঃসহ অন্তর্যন্ত্রণার জটিলতার জটিলতর প্রসঙ্গ, পরিসর ও প্রসারণ রূপান্বিত করাই হয়ে ওঠে এ পর্যায়ের উপন্যাস-শিল্পের বৈভব, তার ফর্মের অনিবার্যতা। প্লটবিন্যাসের কার্যকারণ, চরিত্রের বিকাশক্রম, সময়ধারণা ও বাক্যগঠনরীতির মাঝে সঞ্চারিত হলো এক অস্থির মন ও মননক্রিয়া। সৃষ্টি হলো চৈতন্যপ্রবাহরীতির। পরীক্ষাপ্রিয় ঔপন্যাসিকগণ রচনা করলেন Anti-plot, Anti-Hero, ও Anti time উপন্যাস। ঐতিহাসিক-সামাজিক, শরীরী ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে হোমারের মহাকাব্যের ওডিসিয়ুস রূপান্তরিত হয়েছে অক্ষম আইরিশ ইহুদী ব্লুমে।

[দুই]

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-অন্তর্গঠনের চেতনাপ্রবাহ বহুভুজ হতে বাধ্য। কোনো শ্রেণীর অস্তিত্বরক্ষানুগ রাষ্ট্রীয়চিন্তা, ধর্মবোধ, শিল্প-সাহিত্যাদর্শ, নীতিচেতনা, কল্যাণবোধ প্রভৃতি এবং নানাবিধ ধ্যানধারণার যোগফলই হলো সে শ্রেণীর একক চেতনাপ্রবাহ। বাংলাদেশের উপন্যাসে বিধৃত জীবন ও তার কর্মবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বময়, জটিল

সমাজসংগঠন তথা চেতনাপ্রবাহের ভূমিকা অনিবার্য। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, ১৯৪৭-এ সেই ঔপনিবেশিক-প্রক্রিয়ার রূপান্তর, ৫২ সালে নব্য শোষণ-ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে জাতীয় চৈতন্যের রক্তমুখী বহিঃপ্রকাশ, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনাস্রোত স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক জীবনবোধকে করেছে আন্দোলিত, স্পন্দিত, রক্তাক্ত ও জটিলতর। কিন্তু স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের সাহিত্যিক অভিযাত্রার উৎসকেন্দ্রে যে-শৈল্পিক উত্তরাধিকারবোধ অনিবার্য ছিলো, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় তথা অব্যর্থ ফর্ম-উদ্ভাবনে তার উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য।

প্রকরণ বিবেচনায় প্রাক-সাতচল্লিশ পর্যায়ের পূর্ব বাংলার দুটি উপন্যাসের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। একটি কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪—১৯৭০)-এর 'নদীবক্ষে' (১৯১৯): অপরটি হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬--১৯৬৯) 'নদী ও নারী'। ব্যক্তির অন্তর্গত জীবন ও বহির্বাস্তবতাকে সমন্বিত করার চেষ্টায় কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' বিশিষ্ট। চরিত্রায়ণ, চরিত্র-অন্তর্মুখ গ্রামবাংলার বহির্বাস্তবতার বিন্যাস, রবীন্দ্র-প্রভাবিত সংবেদনময় সৃষ্টিশীল গদ্যরীতির ব্যবহার ঔপন্যাসিক-ফর্ম নিরীক্ষায় 'নদীবক্ষে'র বিশিষ্টতাকে করেছে সুচিহ্নিত। হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' Epic form-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নদীপ্রবাহ, জীবনপ্রবাহ ও সময়প্রবাহকে একীভূত করে জীবনের সমগ্রতা নির্মাণের প্রচেষ্টাধন্য এ-উপন্যাস। পদ্মা-তীরবর্তী সংগ্রামশীল মানুষের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতা, তাদের প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা. স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ এবং সর্বোপরি অস্তিত্বগ্রাসী প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার মধ্যেও ভবিষ্যৎসঞ্চারী চিরজয়ী জীবনাকাঙ্ক্ষা ও সক্রিয়তার রূপায়ণে হুমায়ুন কবিরের সার্থকতা সন্দেহাতীত। এ-উপন্যাসে জীবনপ্রবাহ যেমন নদীর বহমানতার সাথে সমান্তরালভাবে উপস্থিত, তেমনি ভাষাভঙ্গিও নদীর মতোই গতিচঞ্চল, তরঙ্গময়। জীবনের সমগ্রতায় বিশ্বাস, বুর্জোয়া জীবনচিন্তা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং জীবনের যথাযথ রেখা, পরিপ্রেক্ষিত, পরিবেশ, মাত্রা ও রঙে কাজী আবদুল ওদুদ ও হুমায়ুন কবির অবলোকন করতে চেয়েছেন জীবনকে। শৈল্পিক উত্তরাধিকার ও সমকাল সংলগ্ন ফর্ম-নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লিখিত উপন্যাসদ্বয় বাংলাদেশের উপন্যাসপ্রবাহে দূরসঞ্চারী।

'নদীবক্ষে' এবং 'নদী ও নারী' উপন্যাসে যে প্রতিশ্রুতি ছিলো, সাতচল্লিশ-পরবর্তী পর্যায়ে সে প্রতিশ্রুতি-প্রত্যাশার ক্ষেত্রে বিব্রত হলাম আমরা। এ-পর্যায়ে উপন্যাসের সংখ্যা অনেক। ১৯৪৭ –১৯৫৭ কালপরিসরে যাঁরা উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই উপন্যাসের ঘটনাংশ নির্বাচনে গ্রামকেন্দ্রিক। জীবন-দৃষ্টিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদী, প্রকরণে শ্রমবিমুখ ও দ্বিধান্বিত। উপন্যাসের ভাষা-আবিষ্কারে তাঁরা অন্যমনস্ক, গঠনে অতিদ্রুততা-আক্রান্ত, কেউবা অপরিমিত। এ-সকল ঔপন্যাসিক সমকালীন বিশ্ব তথা কল্লোলীয় (১৩৩০) শিল্পবোধকে অতিক্রম করতে পারেননি। এক্ষেত্রে এক নিঃসঙ্গ ও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১)। ফর্মনিষ্ঠা বলতে যা বোঝায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মধ্যে তার

সার্থক বিন্যাস ঘটেছে। তাঁর 'লাল সালু' (১৯৪৮) উপন্যাসের পটভূমিও গ্রামজীবন। কিন্তু জীবনের উপরিতলের চিত্র-অঙ্কন না করে, তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজমূলের অসঙ্গতিকে। তাঁর কৃতিত্ব এখানে যে, অভিজ্ঞানকে তিনি নিরাসক্তিতে পরিণত করেছেন, ঘটনাকে প্রতিক্রিয়ায় রূপ দিয়েছেন এবং প্রতিক্রিয়ার আবেগকে চিত্রে অঙ্কন করেছেন, impressionist শিল্পীর মতো। চেতনালোক, চিত্রগুচ্ছ, বর্ণনাংশ, ঘটনা ও জীবনকে শিল্প-আয়তনিক ও দৃশ্যমান করতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'লাল সালু' উপন্যাসে নির্বাচন করেছেন ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ (author's omniscient point of view) মজিদ-চরিত্রের জীবন প্যাটার্ন ও সমগ্রতাবোধের অন্তর্লীন সূত্রসমূহ 'লাল সালু'র প্রথম পর্যায়ের ঘটনা, চিত্র বর্ণনাসংলগ্ন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে সমান্তরালভাবে লেখকের দৃষ্টিকোণও স্থানান্তরিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও, মজিদের মহব্বত নগরে প্রবেশের পূব তার প্রেক্ষণবিন্দুই এ-পর্যায়ে 'লাল সালু'তে প্রগাঢ় ও পরিণামসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে। সংকটদীর্ণ ব্যক্তিত্বের অন্তর্মূলে আত্মস্থ চেতনাময় প্রেক্ষণ-বিন্দু থেকে জীবন ও অস্তিত্বজিজ্ঞাসা রূপায়িত হওয়ায় 'লাল সালু'র ঘটনাক্রম ও চেতনাপ্রবাহ রূপান্তরধর্মী, বর্ণময় ও সঙ্গীতস্পন্দিত। ফলে মুখচ্ছদ উন্মোচিত, অস্তিত্বের নির্দয় সত্যের দিকে ধাবমান মজিদের ভয়ঙ্কর আতঙ্কশিহরিত সমগ্রতাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি। অন্ধকারের অধীশ্বর মজিদ হতে পারতো দুঃসময়কবলিত লুপ্ত-অস্তিত্বের ভয়ংকর প্রতিমূর্তি। তা' হয়নি, কেননা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো ভিন্ন। সুতরাং উপন্যাসের অন্ত্যপর্যায়ে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করলেন জমিলার প্রেক্ষণবিন্দু। অন্তিম পর্যায়ে জমিলার মেহেদিরঞ্জিত প্রতীকী পদাঘাত আমাদের পৌঁছে দেয় এক ত্যাদর্শী অস্তিত্ববলয়ে। দৃষ্টিকোণ-প্রেক্ষিত, বহির্জগৎ, আলম্বন বিভাব (objective correlative), ভূ-দৃশ্যচিত্র এবং চিত্র ও চিত্রকলা সৃজনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র পরিচর্যা-প্রকরণ ও পাঠকের মন-মনন ও হৃদয়বর্তী। 'লাল সালু' উপন্যাসে লেখক প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করেছেন চরিত্রের অন্তর্গত সংবেদনসিক্ত ও চেতনাময় অনেকান্ত নির্বাচিত দৃষ্টিকোণ (multiple selective omniscient point of view) চরিত্রগুলি মূলতঃ মজিদ, তাহেরের বাপ, জমিলা ইত্যাদি অস্তিত্বের অগ্নিবলয়ের মুখোমুখি, স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রেক্ষণবিন্দু-উৎসারিত পরিচর্যা (Treatment) ও অভিপ্রায়-প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে অন্তর্জগতে সঙ্গীতময়, সংকেতময়, নিবিড়, নিটোল ও সংহতিপূর্ণ। লেখকের সাংগঠনিক রীতি মন এবং মননকে, মানুষ এবং প্রকৃতিকে জৈবিক ঐক্য দান করেছে। চরিত্র কিংবা ঘটনাবিন্যাসে কোথাও প্রগাঢ় রং ব্যবহৃত হয়নি। সমাজসম্পৃক্ত কর্মদায়িত্বচ্যুত, সমাজবিচ্ছিন্ন একক 'আমিত্ব'বোধ থেকেই এই নিরাসক্তি, গীতিময়তা ও আত্মগত চেতনার জন্ম। বুর্জোয়া সমাজবিন্যাসের আন্তর্জাতিক অসঙ্গতি, সমকাল-সংকটের প্রতিক্রিয়ার সংক্ষুব্ধ চেতনাসূত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র শিল্প-অভিজ্ঞানের জন্ম। এ-অর্থে তিনি 'কল্লোল'-উত্তর চেতনার যথার্থ প্রতিনিধি।

(ক) জীবনের পরিব্যাপ্ত সময় এবং ব্যাপ্যমান সমাজের সামূহিক (collective) অভিজ্ঞতা থেকে এপিক ফর্মের জন্ম হয়। Epic একটি উত্থানপর্বের আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের শিল্পনির্মাণ। জীবনসংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ, ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করায় এর অভিযাত্রা প্রলম্বিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকাল পর্যন্ত। অবশ্য ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধও আরেকটি উত্থানের সূর্যদিগন্ত উন্মোচন করেছিলো। আমাদের কথাসাহিত্যে এপিকফর্মের উপন্যাস রচনায় যে প্রতিশ্রুতি হুমায়ুন কবিরের নদী ও নারী'তে উৎসারিত হয়েছিল, শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১), সংশপ্তক' (১৯৬৫) এ তার সিদ্ধি। গ্রাম ও নগরজীবনের সুবৃহৎ ক্যানভাসকে উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে সামন্তসমাজের অবক্ষয় এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থান প্রক্রিয়াকে 'সংশপ্তক'-এ বিন্যস্ত করেছেন লেখক। যুগচেতনা, শিল্পচেতনা এবং জীবনচেতনার সমন্বিত বিন্যাসে জীবনের সমগ্রতা এ-উপন্যাসে হয়ে উঠেছে আন্দোলিত-স্পন্দিত। ইতিহাসবোধ ও সংগ্রামী জীবনচেতনার ক্রমধারার শিল্পরূপ হলো 'সংশপ্তক.'

আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২) 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪) সম্পর্কে স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রয়োজন। এপিক-এর সাথে এর সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রেও ব্যবধান আছে—যেমন ব্যবধান 'ইলিয়াড' এবং 'ওডেসি'র মধ্যে। 'ইলিয়াডে' বিষয়, ঘটনা এবং চরিত্রের ব্যাপ্তি, 'ওডেসি'তে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার প্রসারতা ও গভীরতা। 'ক্ষুধা ও আশা'ও ব্যক্তির গভীরতর অন্তর্জীবনের এপিক। সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় না হলেও, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এপিক-ফর্ম-এর অনুসারী আরো দু'টি উপন্যাস হলো আবু জাফর শামসুদ্দীনের ১৯১১) 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪) এবং আবু ইসহাকের (১৯২৬) 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬)। আবহমান ইতিহাস-পরম্পরার সাথে সমকাল-তরঙ্গিত জীবনচেতনার সমন্বয়ে রিজিয়া রহমানের (১৯৩৯) 'বং থেকে বাংলা' (১৯৭৮) এপিকধর্মী উপন্যাসের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এ-উপন্যাসের সময়-পরিসর আড়াই হাজার বছর পূর্বকাল থেকে একাত্তর সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সময় ও সমাজপরিসরের এই বিস্তৃতির সাথে সংযুক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিকের ইতিহাস ও জীবনসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনের ইতিবাচক মূল্যমান অন্বেষায়, বিষয়ের সাথে গদ্যরীতির গতিময় বিন্যাসে 'বং থেকে বাংলা' নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল শিল্পকর্ম।

(খ) জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ যখন হয়ে ওঠে অনিবার্য, তখনি, There comes a moment of decision এবং শিল্পীমানস either breaks through to socialism or founders in fatalism, symbolism, mysticism, and reaction সুতরাং ১৯৫৮—১৯৭০ কালপরিসরে রচিত উপন্যাসের বক্তব্য প্রত্যক্ষতার পরিবর্তে নিক্ষিপ্ত হলো পরোক্ষ শিল্প-অন্বেষার জটিলতায়। সম্মুখস্থ বন্দীমুহূর্ত, অলঙ্ঘ্য, অবরুদ্ধ সমাজচেতনা ও জটিলতম সমাজগঠন অধিকাংশ ঔপন্যাসিককেই করে আত্ম-বিবরকামী ও পলায়নবাদী। কেউ হলেন ফ্রয়েড-আশ্রয়ী, কেউবা স্বপ্নভাষী, কেউবা আত্মগোপন করলেন রোম্যান্টিক স্বপ্নলোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। এ-অবস্থায় সঙ্গত কারণেই সচেতন শিল্পী প্রকাশের নবতর ফর্ম সন্ধানে সচেষ্ট হলেন। রূপক বা

প্রতীকধর্মী উপন্যাস রচনার কার্যকারণ এখানেই নিহিত। যেহেতু অসম্ভব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে আত্মনিয়োগ, সেহেতু সচেতন শিল্পীমানস সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে উপস্থাপন করতে চান সমাজজীবনমূলস্পর্শী বক্তব্যকে। সে-কারণেই রূপক-প্রতীকই হলো নিরাপদ প্রকাশমাধ্যম। সি, এস, লুইসের মতে, 'symbolism is a mode of thought, but allegory is a mode of expression.' 'স্পষ্টরূপে যা প্রকাশযোগ্য নয়, তাকে প্রতীকের মাধ্যমে এবং পরিচিত বিষয়কে গভীরতর বক্তব্যের ছদ্মাবরণে তাৎপর্যবহ করে তোলাই এ-জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

'জননী'র উচ্ছ্বাস, সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা এবং ঐতিহাসিক সান্ত্বনার কথা বাদ দিলে শওকত ওসমানের (১৯১৭) 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২), 'সমাগম' (১৯৬৭), 'রাজা উপাখ্যান' ১৯৭১) এবং 'পতঙ্গ পিঞ্জর' ১৯৮৩) ফর্মের পরীক্ষা এবং সমাজঘনিষ্ঠতায় ব্যতিক্রমধর্মী। 'ক্রীতদাসের হাসি' প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। মানুষের মুক্তিকামী আকাঙ্ক্ষার সর্বকালিক অভিব্যক্তি এ-উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য। ঔপন্যাসিক রূপবন্ধ নির্মাণে হারুণ-আল-রশীদের বাগদাদের কাহিনীকে নাট্যরীতিতে পরিচর্যা করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসবিধৃত চরিত্রপুঞ্জ একেকটি চেতনার প্রতীক। খলীফা ও মশরুর, তাতারী এবং কবি নওয়াস যথাক্রমে ক্ষমতা-অন্ধ অত্যাচারী, উৎপীড়িত মানবতার এবং শাশ্বত সৌন্দর্য-ধারণার সংকেতবহ। সংলাপপ্রধান ভাষারীতি এবং বিষয় প্রকাশে অনিবার্য শব্দচয়ন এ-উপন্যাসের আঙ্গিক সতর্কতার প্রমাণ। 'সমাগম' উপন্যাস ফ্যান্টাসীর আশ্রয়ে শওকত ওসমান সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে-বিন্যস্ত চরিত্রপুঞ্জের সকলেই প্রয়াত। সম্প্রদায় এবং জাতি-ধর্ম-অতিক্রান্ত সর্বজনীন জীবনবোধ-এর চরিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত ; যেমন ঃ আলেওল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হাজী মুহম্মদ মোহসীন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমা রলাঁ, বার্নার্ড শ, লিও তলস্তয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রাজা উপাখ্যানে' রূপকের আশ্রয়ে ঔপন্যাসিক ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা সামষ্টিক স্বার্থের জন্য মানুষের যে নিরন্তর সাধনা, তা-ই উপস্থিত করেছেন। অভিশপ্ত রাজা জাহুকের শাপমুক্তি এবং নতুন জীবনোপলব্ধিতে উত্তরণ 'রাজা উপাখ্যানে'র মৌল প্রতিপাদ্য। শোষিত-অবরুদ্ধ সমাজজীবনে ব্যক্তিস্বার্থ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয়—সামূহিক জীবন-চৈতন্যে উত্তরণই হলো প্রত্যাশিত। শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার-শৃঙ্খলজর্জরিত সমাজের প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রতীকী ইংগিতে 'রাজা উপাখ্যান' অনন্য। 'পতঙ্গ পিঞ্জর'-এ মানুষের সংঘশক্তির জয়যাত্রা বিন্যস্ত। একাত্তর সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কেবল ফর্ম-নিরীক্ষার প্রবণতাই মুখ্য। এ-উপন্যাসের গৌড়গ্রাম সমগ্র বাংলাদেশের এবং পতঙ্গকুল হানাদার পাক-বাহিনীর রূপকীয় প্রকাশ যেন। 'পতঙ্গ পিঞ্জর' উপন্যাসে রূপক-আঙ্গিকের ব্যবহারে ঔপন্যাসিক প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিবাদী। তবে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই গদ্যরীতির পরিশীলনে দুর্বলতা সুস্পষ্ট। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর অসচেতনতা বা অনুশীলনে অনাগ্রহ শওকত ওসমানের শৈল্পিক ত্রুটির উল্লেখযোগ্য প্রান্ত।

(গ) বহির্বাস্তবতা থেকে অন্তর্বাস্তবতায়, বহির্জীবন থেকে অন্তর্জীবনে এবং সমষ্টি থেকে ব্যক্তি চৈতন্যে আত্মনিমজ্জন ঔপন্যাসিককে করে তোলে আত্মমুখী, চৈতন্যের বিস্তার ও গভীরতার প্রশ্নে অনুসন্ধিৎসু। আধুনিক সভ্যতার বহুলাঙ্গিক অসঙ্গতি এই নিঃসঙ্গ ও ব্যক্তি-চৈতন্যমূলস্পর্শী শিল্প-প্রবণতার অন্যতম কারণ। চৈতন্যপ্রবাহ-রীতির ব্যবহার ঔপন্যাসিক ফর্মনিরীক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক শিল্পের এক মেধাবী সংযোজন। মানুষের অস্তিত্ববিষয়ক উৎকণ্ঠা ও জিজ্ঞাসার রূপায়ণে, চৈতন্যের বহুমাত্রিক জটিলতার স্বরূপ উন্মোচনে এবং বিন্দুর মধ্যে বৃহৎকে শব্দ-শিল্পময় করার ঐকান্তিকতায় এ-রীতির উপন্যাস বিশিষ্ট।

শিল্প প্রমূর্তির প্রশ্নে তপস্যাশুদ্ধ এবং অতিক্রমণের প্রশ্নে পরীক্ষাপ্রিয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' ১৯৬৪) এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) আমাদের ঔপন্যাসিক ফর্ম নিরীক্ষার গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'লাল সালু'তে প্রবাহিত তাঁর সমাজবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ চেতনাস্রোত, সমাজ ও সময়ের পরবর্তী জটিল রূপান্তরে আত্মনিমগ্ন, অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্থিতধী। 'কোন সংকটকালে পরিবেশকে উপেক্ষা কিংবা অতিক্রম করে ব্যক্তির যে অস্তিত্ব আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়, ব্যক্তির সেই অস্তিত্বই সার বা মূল অস্তিত্ব। ব্যক্তির এ-অস্তিত্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের বাইরে। কোন সংকট মুহূর্তে মানুষ এর আলোতে আকস্মিকভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।' 'চাঁদের অমাবস্যা'য় স্কুল শিক্ষক আরেফ আলীর আত্মগত দ্বন্দ্বে এবং পরিণামে, কাদের যে যথার্থ হত্যাকারী, এই সত্য প্রকাশেব মাধ্যমে অস্তিত্ববাদী দর্শন শিল্পায়িত হয়েছে। 'লাল সালু' উপন্যাসের বহির্বাস্তব, 'চাঁদের অমাবস্যা'য় ক্রমশ ব্যক্তিমনের জটিল অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। আপাতদৃষ্টিতে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও, এ-উপন্যাসে, মূলতঃ শিল্প-প্রক্রিয়ায় কার্যকর থেকেছে ভীত সন্ত্রস্ত আতঙ্ক শিহরিত আরেফ আলীর অতি সংবেদনশীল প্রেক্ষণবিন্দু। অস্তিত্বগত প্রান্তিক পরিস্থিতির (Border line situations) তীক্ষ্মমুখ আঘাতে আরেফ আলী আত্মযন্ত্রণাকাতর, চেতন-অবচেতনায় রক্তাক্ত, সত্যানুসন্ধানে আত্মখননকারী, জটিল ও স্তরবহুল, অভিজ্ঞতায় ক্রমসংকুচিত। তার অস্তিত্ব সংকটের এই অন্তর্ময় তীব্র, তীক্ষ্ম, প্রগাঢ় সংরাগ ও সংক্ষোভময় দৃষ্টিকোণের জনাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ 'চাঁদের অমাবস্যা'য় অনেকাংশ Expressionist। এক্সপ্রেশনিজমের মৌল বৈশিষ্ট্য হলো, উল্লাস-প্রেম-ভালবাসা কিংবা সন্ত্রাস-আশঙ্কা-আক্রান্ত সত্তার আবেগ, অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশে বহির্জাগতিক আকারের বিকৃতি ঘটানো। এই বিকৃত রূপালেখ্য মূলতঃ চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকাশ্রয়ী। বিকৃত রূপালেখ্যময় মেধাবী চিত্রকল্প ও প্রতীক, এ-কারণে 'চাঁদের অমাবস্যা'র অনুচ্ছেদ-প্রবাহে প্রায়শঃ পরিকীর্ণ। এ-উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আরেফ আলীর অন্তর্জগতের নিরুদ্ধ অনুভূতিচক্র, টানাপোড়েন ও আতঙ্কিত অস্তিত্বের উন্মোচনে স্বভাবতঃই বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যায় সুস্থির। যেখানে তাঁর পরিচর্যা চিত্রাত্মক, চিত্রকল্পময় অথবা প্রতীকী সেখানেই তিনি অনিবারণীয় উদ্ভাবনাসূত্রে এক্সপ্রেশনিস্ট। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের

অন্তর্বয়ন ভাবানুষঙ্গ-জটিল। কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, লেখকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ এবং তবারক ভুইঞার নিয়ন্ত্রিত-প্রেক্ষণবিন্দু--যুগ্মভাবে একে অপরের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের অনুচ্চারিত ও উচ্চারিত বাক্যস্রোতে রীতিমত একটি নদীর ধারায় পরিণত হয়, এখানেই 'কাদো নদী কাঁদো'র উপকরণ উৎস। তবারক ভুইঞার সংলাপ-আশ্রয়ী স্মৃতি-অনুষঙ্গে শব্দরূপ পেয়েছে বহির্বাস্তবময় কুমুরডাঙ্গার বিচ্ছিন্ন আতঙ্কগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বসংকট ও শংকামুক্তি। অপরপক্ষে তবারক ভূইঞার উচ্চারিত সংলাপে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা-আন্দোলিত ও উদ্ভাসিত চেতনাপ্রবাহের শিল্পরূপ হলো মুহাম্মদ মুস্তফার মনস্তাপ ও শূন্য-অস্তিত্বের ইতিহাস। কুমুরডাঙ্গার সমষ্টি-মনস্কতা বিন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যথাযথভাবে তবারক ভূইঞার দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করলেও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ অতিদ্রুত সমীকৃত হয়েছে মুহাম্মদ মুস্তফার প্রেক্ষণবিন্দুতে। অস্তিত্বতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এবং আত্মসমীক্ষায় মুহাম্মদ মুস্তফা খোদেজার আত্মহত্যাজনিত মনস্তাপে বিকৃতমস্তিষ্ক প্রায়। ভীতিবিহ্বল সীমাহীন নিমজ্জিত ও প্রতিরূপ মূলতঃ হয়ে উঠেছে কার্যকারণহীন, উল্লম্ফনধর্মী, স্থানকালবিচ্ছিন্ন ও স্বপ্নব্যাকরণময়। ঘটনা-বিন্যাসে লেখক বহুক্ষেত্রে নাটকীয় পরিচর্যা করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তাফা-চরিত্রের ভয়, ভীতি, দ্বন্দ্ব, আশঙ্কা ও আত্মনিমগ্ন চেতনাপুঞ্জের চিত্র-অঙ্কণে তিনি পরাবাস্তববাদী (surrealist)। তুলনাসূত্রে কর্মনিষ্ঠায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পরিচর্যাগত বিবর্তন উপস্থাপনযোগ্য। ১ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'লাল সালু'তে ইমপ্রেশনিস্ট, গীতময়, চিত্রাত্মক ও চিত্রকলাময়, ভাবানুষঙ্গে কখনো প্রতীকধর্মী। ২. 'চাঁদের অমাবস্যা'য় এক্সপ্রেশনিস্ট, বিশ্লেষণাত্মক, প্রতীকস্পর্শী। মেধাবী-চিত্রকল্পময়, এবং ৩ 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে নতুন এক শিল্পমাত্রায় পরাবাস্তববাদী।

সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫) 'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯) অন্ত-অসঙ্গতিসম্পন্ন সমাজঅন্তর্গত এক মহিলার মানসিক জটিলতার চিত্ররূপ ; আত্মমগ্নচেতনার আর্তনাদ। মানসিক দুর্বলতা, নৈঃসঙ্গ্য, অবিশ্বাস নাসিমাকে অক্টোপাশের মতো নিঃশেষ করেছে। প্রচলিত উপন্যাস-ফর্ম থেকে 'এক মহিলার ছবি' ব্যতিক্রমী। ভাঙা-ভাঙা, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভগ্নক্রম স্মৃতিচারণ ও চেতনার আবেগ এ-উপন্যাসে শব্দরূপ পেয়েছে। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ হয়েছে প্রবল আবেগের অনুরণনে ও গীতলতায়। সৈয়দ শামসুল হকের ঔপন্যাসিক গদ্যরীতি কবিত্বক্রান্ত, বৈশিষ্ট্যসূচক এবং উপমাবহুল। উপন্যাসবিধৃত চরিত্রপুঞ্জের অন্তর্যন্ত্রণা ও অন্তর্মুখিতার তীব্রতাকে ধারণ করতে তাঁর গদ্য সাবলীল। লেখকের 'স্তব্ধতার অনুবাদ (১৯৮৫) এবং 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮৪) তাঁর কর্মনিষ্ঠার ক্রমরূপান্তর নির্দেশক। তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অনুসারী মনঃকথন, বিচূর্ণিতভাবনা এবং ফর্মপরিচর্যায় তাঁর 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' বিশিষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও চেতনাবাহী এ-উপন্যাসের নায়ক শিক্ষক তাহেরের স্মৃতিচারণা এবং আত্মোপলব্ধি 'চাঁদের অমাবস্যা'র যুবক শিক্ষক আরেফ আলী অস্তিত্বজিজ্ঞাসা ও সত্তা-উত্তরণের সাথে বিষয়বিন্যাস ও প্রকাশরীতির দিক থেকে

প্রায় অভিন্ন। রাজিয়া খানের (১৯৩৬) 'অনুকল্প' (১৯৫৯) ফর্মের দিক দিয়ে সুগঠিত উপন্যাস। জীবনের সংকট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি-অন্বেষার পরিবর্তে মন-বিকলন ও আত্মরতির মধ্যেই মানবীয় পরিণতি নির্দেশিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। পরিচর্যার প্রশ্নে রাজিয়া খান জীবনের চেতনা-প্রতীতির সঙ্গে বিশ্লেষণের সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছেন। ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি স্বীকার করলেন জীবনের বাস্তব প্রচ্ছদকে। তাঁর পরিচর্যারীতি মূলতঃ বিশ্লেষণধর্মী। বিমূর্ত চেতনাপুঞ্জকে বিমূর্ত অবয়বে প্রকাশ করতে তাঁর অনাগ্রহ সুস্পষ্ট।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক জীবনের বিচিত্রমাত্রিক জটিলতায় মানুষের সামূহিক অস্তিত্ব হয়ে পড়ে বিপন্ন। ফলে, মানবিক উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ হয়ে ওঠে ব্যক্তি-আশ্রয়ী, বিপন্ন-বিধ্বস্ত বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ চৈতন্যের তমসাচ্ছন্ন অন্য গুহায় আত্মপলায়নকেই মনে করে 'জীবন।' প্রচলিত ঔপন্যাসিক ফর্ম এই মানবিক সংকটের ফলে রূপান্তর লাভ করে। জন্ম নেয় Anti-plot Anti-Hero, Anti-time উপন্যাস। ভিক্টোরীয় যুগের আদি-মধ্য-অন্ত এই ত্রিনীতি উপন্যাসের সংগঠনের প্রশ্নে এখন দূরধ্বনি মাত্র। সভ্যতা-সংকটের পটভূমিতে মানুষ যেখানে কীট-পতঙ্গের মতো নিরস্তিত্বপ্রায়, সেখানে উপন্যাসের চরিত্র, বিষয় ও ফর্ম পরিকল্পনা রূপান্তরিত হয়। অবশ্যম্ভাবী চরিত্র বা ঘটনা অপেক্ষা চৈতন্যই সেখানে উপন্যাসের মৌল উপাদান। ব্যক্তির আত্মহনন, আত্মখননই হলো সারকথা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের মুহাম্মদ মুস্তফা মনস্তাপজনিত ভীতি আতঙ্কের ফলে যে মর্মঘাতী প্রতিক্রিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়, তার ফলে সে হয়ে পড়ে আতঙ্কিত অস্তিত্বে শৃঙ্খলিত। এবং এই ভীতি তাকে ক্রমাগত করে মানববিযুক্ত, কুমুরডাঙ্গার জন-গোষ্ঠীবিযুক্ত। তার অস্তিত্ব প্রাত্যহিক আত্মমগ্ন বিবরবাসী, শর্তবন্দী, অস্তিত্বের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনে সে ব্যর্থ। ভয়-ভীতি-অনুশোচনা তাকে করে তুলেছে অস্তিত্বের দায়িত্ব পালনে অক্ষম—মৃত্যুচৈতন্য ও অস্তিত্ববিলুপ্তিতে যার পরিণাম। এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় এই ভীতি এবং ভীতি-উত্তরণ। চরিত্র বা ঘটনা এখানে মুখ্য নয়, মুখ্য হল ভয়, আতঙ্ক, একাকিত্ব প্রভৃতি Border Line situation—এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব-অনুধাবন। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উল্লিখিত শ্রেণীর উপন্যাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সৈয়দ শামসুল হকের 'নিস্তব্ধতার অনুবাদ' চৈতন্যকেন্দ্রিকতায়, মানবমনের অন্তর্গূঢ় রহস্য সন্ধানে, শূন্যতা ও নিস্তব্ধতার অতলান্তিক বোধে এ-জাতীয় ঔপন্যাসিক ফর্মের আরেক উদাহরণ। একে বলা যায়—'decentralization of self and self consciousness.'

(ঘ) মিথ-ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন বা পুনর্জন্মদান আধুনিক উপন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মননশীল শিল্পরীতি। বিষয়ের এই পশ্চাৎগমন যে সভ্যতা-সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালবিযুক্তির জটিল প্রক্রিয়া, তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে জীবন-দর্শন ও শিল্পবোধের বিভিন্নতায় এই মিথ-ঐতিহ্য-অনুসারী উপন্যাস ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র ফর্ম পরিগ্রহ করে। যেমন, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার নেতিবাচক প্রক্ষেপে জেমস্‌

জয়েসের ওডিসিয়ুসে পরিণত হয়েছে অক্ষম আইরিশ ইহুদীতে, আবার হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাস' মানবীয় সংগ্রামশীলতার চিরন্তনতার প্রতীকে।

মিথ-নির্ভর ঔপন্যাসিক ফর্ম নির্মাণে আমাদের সাহিত্যে সত্যেন সেন (১৯০৭ – ১৯৮১) ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। The Old Testament-এর ঘটনাংশকে তিনি চিরায়ত মানবীয় সংগ্রামের সাথে প্রতিন্যাস করেছেন 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৭৬) এবং 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯) উপন্যাসে। মিথের নবরূপায়ণে, গদ্যরীতির ধ্রুপদীবিন্যাসে এবং বক্তব্যের সমকালীন-সংকট বিবেচনায় এ-দু'টি উপন্যাস স্বতন্ত্র, অনতিক্রান্ত। শওকত আলীর (১৯৩৬ 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' (১৯৮৪), রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪) এবং সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭) 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪) যথাক্রমে ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং মিথ আশ্রয়ী ফর্ম নিরীক্ষার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের দূরায়ত কাহিনী অবলম্বনে অন্ত্যজ জীবনের পরাভব, বেদনা এবং উত্তরাধিকার প্রবাহের শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন শওকত আলী, তাঁর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসে। ভাষারীতির প্রশ্নেও তিনি সতর্ক, বিষয়-অনুষঙ্গী গদ্যরীতি নির্মাণেও। আরণ্যক আদি মানবের জীবনকাহিনী, তাদের প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা, বিশ্বাস-সংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা প্রভৃতির সমন্বয়ে মানবীয় সংকটের চিরন্তন স্বরূপ বিন্যস্ত হয়েছে রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল' উপন্যাসে। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরকে আধুনিক জীবন-সংকট ও সংগ্রামের পটভূমিকায় স্থাপন করে সেলিনা হোসেন রচনা করেছেন 'চাঁদবেনে' উপন্যাস। গদ্য সতর্কতা এবং সংক্ষিপ্ত, চিত্র ও চিত্রকল্প, রোম্যান্টিক প্রতীকী অভিব্যঞ্জনা এঁদের গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য।

আঞ্চলিক উপন্যাসে একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত নৃ-তাত্ত্বিক ঐতিহ্যমণ্ডিত মানবসম্প্রদায়ের ভাব এবং ভাবনা, আচার এবং উচ্চারণ, স্থূলতা এবং নান্দনিক জ্ঞান অর্থাৎ Local colour and habitation-কে পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ দান করে।

বাংলাদেশে দূরাঞ্চলের জীবন-অবলম্বনে উপন্যাস রচিত হয়েছে প্রচুর। কিন্তু বিষয় ও শিল্পের জৈবিক সমগ্রতা নির্মাণে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই অসফল। এ-শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১) 'সারেং বৌ' (১৯৬২), শামসুদ্দীন আবুল কালামের (১৯২৬) 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলি (১৯৬২) এবং সেলিনা হোসেনের 'পোকা মাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) উল্লেখযোগ্য।

উপকূলবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবন-সমগ্রতা 'সারেং বৌ' উপন্যাসের উপজীব্য। বিষয়-গৌরবে এ-উপন্যাস অভিনব, নবীতুন চরিত্রনির্মাণে গৌরবান্বিত, বেদনার শব্দরূপে অন্তরঙ্গ। অতিগীতলতা উপন্যাসের দৃঢ়তাকে দুর্বল করেছে, আবেগ-আতিশয্য পরিণামকে করে তুলেছে অস্বাভাবিক। শামসুদ্দীন আবুল কালাম মূলতঃ রোম্যান্টিক। ভাবাবেগ, অকৃত্রিমতা, উচ্ছ্বাস এবং গীতিময়তা তাঁর জীবনবোধের অন্তর্লক্ষণ। 'কাশবনের কন্যা'র চরিত্রগুলি সংগ্রামশীল হওয়া

সত্ত্বেও অতি-রোম্যাণ্টিকতার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সুদৃঢ় হতে পারেনি। রোম্যাণ্টিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসটির সম্ভাবনাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছেন। আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলি' ঈষৎ অভিজ্ঞতার রোমান্সমাত্র—বিশেষ অঞ্চলের জীবন-প্রবাহের শব্দরূপ হিসেবেই এর বিশেষত্ব। সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমুদ্রবেষ্টিত বিশেষ জনবসতির জীবনকথা। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে লেখকের গভীর জীবন-সচেতনতায় এ-উপন্যাস আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে সর্বজাতিক বোধে উত্তীর্ণ হয়েছে। জীবন অনুধাবনে এবং সুসংহত রূপবন্ধ নির্মাণে 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' বাংলা উপন্যাস-প্রবাহে বিশিষ্ট।

[তিন]

উপন্যাসের ফর্ম নিরীক্ষার দিক থেকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য আরেকজন ঔপন্যাসিক হলেন জহির রায়হান (১৯২২-১৯৭২)। তাঁর 'আরেক ফাল্গুন' ১৯৬৯ উপন্যাসে চিত্রনাট্যের পরিভাষার সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পরিচর্যার ক্ষেত্রেও তিনি মূলতঃ চলচ্চিত্রানুগ (Cinematic)। রশীদ হায়দারেব (১৯৪১) 'অন্ধ কথামালা' (১৯৮২) উপন্যাসে ক্রম-ভগ্ন স্বপ্নের ব্যাকরণ ব্যবহৃত হলেও তাঁর উপন্যাসেব বিষয় একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ। অতীত এবং বর্তমানের সমান্তরাল উপস্থাপন, এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎসঞ্চারী স্বপ্নকল্পনার আবেগী-চিত্র ব্যবহারে 'অন্ধ কথামালা' বিশিষ্ট।

[চার]

পুস্তক ব্যবসায়ী এবং উপন্যাসজীবীদের কল্যাণে তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা-বিস্ফোরণের মতো, বাংলাদেশে উপন্যাস-প্রকাশনা ক্রমাগত স্ফীতকায় হচ্ছে। আমাদের ভৌগোলিক-সীমানার মধ্যে এই অতিস্ফীতি যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমনি আন্তর্জাতিক উপন্যাসের পটভূমিতে শিল্পমানের প্রশ্নেও তা অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্য-শিল্পে আমরা পরিমান চাইনা, মান প্রত্যাশা করি। পরিমিতিবোধ শিল্পকলার একটা অনিবার্য চারিত্রধর্ম। এই সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রবৃদ্ধি উপন্যাসের শিল্প-বিবেচনার প্রশ্নে কোন গুণগত মাত্রা সংযোজন করে না। বাংলাদেশের উপন্যাস যেমন বিষয়সর্বস্বতা অতিক্রম করতে পারেনি, তেমনি উপন্যাস বিবেচনাও কেবলমাত্র বিষয়কেন্দ্রিকতার মধ্যেই আবর্তিত।

সমাজ ও সময়ের বহমানতায় আন্তর্জাতিক উপন্যাসের বিষয় ও ফর্মের যে-রূপান্তর, আমাদের উপন্যাসের পটভূমিতে তা' দূরশ্রুতিমাত্র। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৯৪৭ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রচিত বাংলাদেশের উপন্যাস পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, স্বয়ংসিদ্ধ, আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রসাধিত, প্রকরণ-সমৃদ্ধ ও রূপবান উপন্যাসের সংখ্যা কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত, হতাশাব্যঞ্জক।

তরল ও সরল ঘটনাপরম্পরা, সাদা-কালো চরিত্রের স্থূল বিন্যাস, শিথিল গদ্যশৈলী,

অশিক্ষিতপটুত্ব শ্রম-ফসলকে আমরা উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু চার দশকের জাতিক ও আন্তর্জাতিক সমাজপ্রবাহের যে অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাস-বিবেচনায় আজ সতর্ক অভিনিবেশ অনিবার্য। কেননা সময় ও সমাজের অনিবার্য গতিধর্ম অনুসারে মানুষ যেমন তার অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে অভিজ্ঞানে, জীবনজিজ্ঞাসাকে রূপ দেয় জীবনদর্শনে, আকাঙ্ক্ষাকে বিকশিত করে সৃষ্টিশীল কল্পনায়, তেমনি সমাজপ্রবাহের বৈচিত্র্য, সংঘর্ষ ও গতির জটিল ক্রিয়াশীলতা অভিজ্ঞানমণ্ডিত দৃষ্টি দিয়েই অবলোকন করতে হবে। এটা আজ স্বতঃসিদ্ধ যে, জাতীয় জীবনের রক্তাক্ত, বিনাশী, আত্মঘাতী ও সংগ্রামলগ্ন চেতনা-বিন্যাস-উপযোগী ফর্ম-যে সশ্রম সাধনা, বোধ, প্রজ্ঞা ও চৈতন্যবিস্তারের মাধ্যমে সম্ভব -আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের মধ্যেই তা, দুঃখজনক হলেও দুর্লভ, বহির্বাস্তবতার মতো মানুষের অন্তর্জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রেও সর্মাধক ব্যর্থতা পীড়াদায়ক। তবে দূরায়ত জীবন, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও মিথ-আশ্রয়ী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে কতিপয় শিল্পসিদ্ধি অর্জিত হওয়ার কারণ, বিশেষ জীবনবোধে সমকালীন সংকট অবলোকনের ক্ষেত্রে স্রষ্টার অভিনিবেশ, অভিজ্ঞান ও দক্ষতা।

আধুনিক ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতাকে হতে হয় জীবনমূলস্পর্শী শিল্পসৃষ্টির প্রশ্নে পরীক্ষাপ্রবণ ও সমকালশাসিত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, লেখকের অভিজ্ঞতাহীনতায়, জীবনের মর্মমূলস্থিত প্রত্যাশা অনুধাবনের ব্যর্থতায় এবং শিল্প-নির্মিতির প্রশ্নে নিষ্ঠা, সাধনা ও আন্তর্জাতিক বোধের অভাবে সে-গুলো বর্ণনাধর্মী বিষয়বিস্তারে পর্যবসিত হয়েছে মাত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তী নব-জীবনবেদ, জীবনজিজ্ঞাসা, পরিবর্তিত অর্থনীতি ও সমাজবিন্যাস এবং রূপান্তরিত নবমূল্যবোধ-এর পটভূমিকায় কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। যুদ্ধোত্তর জাতীয় জীবনের নৈরাজ্য, অবক্ষয় এবং হতাশা বাংলাদেশের অধিকাংশ ঔপন্যাসিককেই করে তোলে ব্যক্তিচৈতন্য-আশ্রয়ী : মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একাধিক উপন্যাসেও যার বিন্যাস সুস্পষ্ট। কিন্তু বহির্জগৎবিমুখ ব্যক্তি-অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা-সংক্ষোভ ও রক্তক্ষরণ উন্মোচনে যে মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা, বোধ, উপলব্ধি এবং অস্তিত্ব সজ্ঞানতা প্রয়োজন : জীবনের অন্তর্মুখিতা ও বৈচিত্র্য রূপায়ণে যে গভীর জীবনবোধ ও সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টির প্রয়োগ অপরিহার্য—ঔপন্যাসিকদের প্রয়াস সে ক্ষেত্রে অসফল। ব্যক্তির পরাভব, আত্মখনন ও আত্মহনন উন্মোচনে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কতিপয় সাফল্য স্বাধীনতা-উত্তরকালে কিংবদন্তির মতো উচ্চারিত ; এবং অনুসৃত।

জীবন-অবলোকনে অনভিজ্ঞ এবং শিল্প-নিরীক্ষায় অপরিপক্ক হলেও বর্তমান প্রজন্মের তরুণ লেখকদের উপন্যাস (পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত) পাঠে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী তাঁরা আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু সুসংগঠিত (well-made) উপন্যাস হলো জীবনবোধের অনিবার্য 'image'। এই অনিবার্য গুণ—বিষয় এবং আঙ্গিকের হয়ে-ওঠা সমগ্রতার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। সে জন্যই নতুন

প্রজন্মের ঔপন্যাসিকদের প্রয়োজন সশ্রম সাধনা, অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক বিস্তার, এবং সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনকে সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞা, ইতিহাস-চেতনা ও সমকাল-অন্বেষায় শিল্পরূপ দানের দক্ষতা। এ-সত্যকে রূপান্বিত করতে হলে প্রয়োজন নবতর জীবন-দৃষ্টি, সময় ও সমাজসচেতন চেতনা-প্রবাহ, অনিবার্য শব্দাবলী এবং চিত্রকল্প।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, উপন্যাস ধনবাদী সমাজের শিল্পোৎপাদন মাত্র নয়, এবং তার পৃষ্ঠপোষকও নয় 'প্রাক্‌চল্লিশ ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী', কিংবা নয় অর্ধশিক্ষিত কাহিনীভুক পাঠকশ্রেণী। উপন্যাস হলো জীবন-অতলান্তিক মহাসমুদ্রে ওডিসিয়ুসের বহির্যাত্রা ও অন্তর্যাত্রার বিস্ময়কর শিল্পিত সমীকরণ। সঞ্চরণশীল প্রগতিপন্থীদেরও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মার্কসীয় দর্শনে শিল্পসাহিত্য সমাজের conception বা propaganda নয়, বরং 'আঙ্গিক আমার সম্পদ, আমার আত্মিক ব্যক্তিসত্তা, মানুষ আর তার রচনাশৈলী অভিন্ন।'—কার্ল মার্কসের এ-উক্তি তৃতীয় বিশ্বের বর্তমান প্রজন্মের ঔপন্যাসিকদের জন্য হতে পারে অনিবার্য দিক্‌দর্শন।

রণিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী ঔপন্যাসিকঃ ইংরেজি উপন্যাস

১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) অনুমোদিত হওয়ার পরই ওয়ারেন হেস্টিংস্ ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। এই ঘটনা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সাহিত্যের ইতিহাসেও সমান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ কলকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী নির্বাচিত হওয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও প্রসারের পথও খুলে যায়। ১৭৮৩ সালে উইলিয়ম জোন্স্ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির যে মিলন ঘটে, তাতে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়। পরবর্তীকালে লর্ড মিণ্টোর আমলেও সাংস্কৃতিক চর্চার পরিধি বিস্তৃতিলাভ করে এবং রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ মণীষিদের একান্ত প্রচেষ্টায় তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে ইংরেজি ভাষায় রচিত উপন্যাসের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাষা হয়ে দাঁড়ায় 'formal, literary, and uncolloquial'. এই আলোচনা প্রসঙ্গে ই. প্যাট্রিজ্ এবং জে. ক্লার্ক রচিত 'British and American English since 1900' প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি লাইন বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য ঃ

> "indian English was always inclined to be bookish and freely garnished with phrases and turns of expressions taken from the great writers."

কিন্তু কিছু লেখকের সরাসরি ইংরেজ ভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় তাঁদের লেখনী স্বচ্ছ, সুন্দর ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গি খুঁজে পায়।

বাঙালী ঔপন্যাসিকের ইংরেজি উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে অগ্রদূত হলেন—মোহন প্রসাদ ঠাকুর, রামতনু গঙ্গোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও শশীচন্দ্র দত্ত। ১৮১৬ সালে মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের 'Persian Tales' ও রামতনু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'The Beauties of the Arabian Nights' গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয়। যদিও দুটি কাহিনীই বিদেশী গল্পের অনুকরণে রচিত তবু গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তদুপরি ১৮৩৫ সালে কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও ১৮৪৫ সালে শশীচন্দ্র দত্ত একক রাজনৈতিক প্রচারমূলক কাহিনীর সূত্রপাত ঘটান।

ভারতবর্ষের প্রথম প্রকাশিত ইং... গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। তাঁর লেখার মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা চার্লস ডিকেন্সের মত সমাজের উত্তরণের ছবি না পাওয়া যাওয়ায় 'Persian Tales' সার্থক রচনার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তবে 'Times Press' থেকে প্রকাশিত রামতনু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'The Beauties of the Arabian Nights'-এ পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের পাশাপাশি তাতার ও পার্শিয়ানদের জীবন-যাত্রা ও ধর্মের এক বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায়।

কৈলাসচন্দ্র দত্তের 'A Journal of Forty Eight Hours of the Year, 1945' এর তুলনায় শশীচন্দ্র দত্তের 'The Republic of Orissa' অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামী নানা সাহেবের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উত্থান ও পতনের কাহিনী সম্বলিত 'Shankur' জাতীয় লেখা অনেক বেশী গভীরতার দাবীদার। কৈলাশচন্দ্রের লেখায় প্লট ও চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যদিও শশীচন্দ্রের লেখার মধ্যে প্রাথমিক স্তরের হলেও উপন্যাসের বীজের সন্ধান মেলে।

১৮৬৪ সালে খুলনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজি ভাষায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's Wife' রচনা করেন। এই উপন্যাসটি কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'Indian Field' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৩৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

বাংলার এক জমিদার পরিবারের নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও দ্বন্দ্বের কাহিনী হলো 'Rajmohan's Wife' রাজমোহনের স্ত্রীর নাম মাতঙ্গিনী। গরীব কায়স্থ কন্যা হেমাঙ্গিনীর অনুরোধে তার স্বামী মাধব রাজমোহনকে চাকরি দেয়। পরে চাষযোগ্য জমি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হলেও রাজমোহন মাধবের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করে না। একদিন আকস্মিকভাবে মাধব তার উকিলের মারফৎ জানতে পারে যে, তার বিরুদ্ধে সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলের মামলা শুরু হতে চলেছে। এক রাতে মাতঙ্গিনী গোপনে শুনতে পায় যে, তার স্বামী রাজমোহন মাধবের ঘর থেকে দলিল চুরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সে গিয়ে মাধবকে সবকিছু জানিয়ে দেওয়ায় রাজমোহনের দুরভিসন্ধি ফলপ্রসূ হতে পারে না। উপন্যাসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে রাজমোহনের বিচার হয় ও শেষে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

'Rajmohan's Wife এ পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্র-চিত্রণও যথেষ্ট প্রশংসনীয়। রাজমোহনের স্ত্রী মাতঙ্গিনী তার স্বামীর নীচ স্বভাবের কথা জানা সত্ত্বেও স্বামীকে ভালবেসেছে। কিন্তু স্বামীর কুকর্মের জন্য তাকে ঘৃণাও করেছে। এইভাবেই মাতঙ্গিনী জীবনের প্রেম ও ঘৃণার মাঝামাঝি চোরাস্রোতে পড়ে গিয়ে শক্ত, নিরেট মানসিক যন্ত্রণার পাথরের আঘাতে বারেবারে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। মাধবের 'demonical look'-এর প্রত্যুত্তরে সতীসাধ্বী মাতঙ্গিনী প্রায় গর্জন করে উঠেছে ঃ

"Never !" said Matangini concentrating the energy of twenty 'men' in her look, "Never 'Yours'—Look here," and she placed immediately before him, "look ; I am a full grown woman and at least 'your' equal in brute force⋯".

['বঙ্কিম রচনাবলী', তৃতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯, পৃঃ ৮৪]

অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'Rajmohan's Wife' উপন্যাস লেখার মাঝখানে লেখা থামিয়ে দিয়ে মাতৃভাষায় উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রাসঙ্গিকভাবে ১৩৬৮ সালে রচিত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমজীবনী'র মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "কিশোরীমোহন মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রে

'Rajmohan's Wife' ইতি শীর্ষক গল্প লিখিয়া যাইতেন। গল্প শেষ হইবার পূর্বে সহসা তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিলেন পৃথিবীময় কোনও প্রসিদ্ধ লেখক মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।..." কিন্তু এই বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসটি শেষ করেছিলেন। কারণ ১৯৩৪ সালে প্রখ্যাত সমালোচক ও পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'Hindu Patriot' পত্রিকার বাঁধানো সংখ্যার সঙ্গে 'Indian Field' পত্রিকার কিছু সংখ্যা খুঁজে পান; যার মধ্যে তিনি 'Rajmohan's Wife'-এর শেষ অধ্যায় পর্যন্ত আবিষ্কার করে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন। এবং 'Rajmohan's Wife' ও 'বারিবাহিনী' উপন্যাসের মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই ইংরাজী উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ শুরু করেন কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেননি। সমাপ্ত করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র ও নামকরণ করা হয় 'বারি বাহিনী'।

'Rajmohan's Wife'-এর পর লালবিহারী দে রচিত 'Govinda Samanta' উপন্যাসটি সাড়া জাগায়। উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চাশ পাউন্ড পুরস্কারের ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, ইংরেজি অথবা বাংলা ভাষায় রচিত সেই উপন্যাস এই অর্থের অধিকারী হবে যে উপন্যাসের মধ্যে "Social and Domestic Life of the Rural Population and Working class of Bengal" যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে। উক্ত প্রতিযোগিতায় হুগলী কলেজের অধ্যাপক লালবিহারী দে রচিত 'Govinda Samania' নামক উপন্যাসটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৮৭৪ সালে 'Friend of India' ও 'Edinburgh Daily Review'-এর সম্পাদক ডঃ জর্জ স্মিথ-এর সক্রিয় সহযোগিতায় লাল-বিহারী দে তাঁর মূল উপন্যাসটির সঙ্গে অতিরিক্ত তিনটি অধ্যায় সংযোজন করে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেন। ১৮৭৪ সালে প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থটির নামকরণ হয় 'Govinda Samanta or the History of a Bengal Ryot'. কিন্তু ১৮৭৮ সালে নতুন ভাবে প্রকাশিত সংস্করণে গ্রন্থটির নাম পরিবর্তন করে করা হয় 'Bengal Peasant Life.'

'Govinda Samanta' উপন্যাসে নায়ক গোবিন্দর জন্ম থেকে নিদারুণ মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয় ও রায়ত বদন সামন্ত তার দুই ভাই মাণিক ও গয়ারামের সঙ্গে বসবাস করে। তারা চাষযোগ্য কয়েক বিঘা জমির মালিক। বদনের সন্তান গোবিন্দ গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করে এবং বদনের আশা—বড় হয়ে গোবিন্দ জমিদারের অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিতে পারবে। ঘটনা পরম্পরায় বদনের মৃত্যু হয়, জমিদারের লোকের হাতে মাণিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জমিদারের লোকেরা গোবিন্দর বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে ভস্মে পরিণত করে দিয়ে যায়। পরবর্তীকালে গোবিন্দের মা সুন্দরীর মৃত্যু হয়। এর পর ১৮৭৩ সালের মন্বন্তরে গোবিন্দ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। বহু ঘটনার মধ্যে দিয়ে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সৈনিক গোবিন্দ বর্ধমানের মহারাজ মহতাপ চাঁদ বাহাদুরের

কাছে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজের আশায় গ্রাম ছেড়ে রওনা হয়। তার শরীর, মন ও স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্যন্ত প্রিয়জনের থেকে বহুদূরে সে তার এক জরাজীর্ণ কুটিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

গ্রন্থটি প্রকাশের পর তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীগণ তা সাদরে গ্রহণ করেন। 'Origin of Species' (1859 এর লেখক চার্লস্ ডারউইন 'Govinda Samanta'র প্রকাশকের কাছে উপন্যাসটির প্রশংসা করে এক পত্র লেখেন ঃ

"I see that the Rev. Lal Behari Dey is editor of the 'Bengal Magazine' and I shall be glad if you would tell him, with my compliments, how much pleasure and instruction I derive from reading, a few years ago, his novel 'Govinda Samanta.'"

13th April, 1881

Down Bechenham Charles Darwin

খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত রেভারেন্ড লালবিহারী দে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় বসবাসকালে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসেন। সেই সময় 'Calcutta Review' পত্রিকায় তাঁর এক রচনায় দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি লেখকের মর্মযন্ত্রণার আকূতি প্রকাশিত হয় ঃ

" . They have been greatly abused. The Zamindar's 'Katchery' is the scene of the ryot's degradation where he is derided, spat upon, and treated as if he were the veriest vermin of creation."

হ্যারিয়েট স্টোই রচিত 'Uncle Tom's Cabin (1851) উপন্যাসে 'Govinda Samanta'-র মতই সমাজের নীচুস্তরের মানুষজনের মর্মান্তিক জীবন-যন্ত্রণার ছবি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'Govinda Samanta' উপন্যাসের প্লট জটিলতাহীন এবং ভাষাও স্বচ্ছ। এখানে অত্যাচারী জমিদার জয়া চাঁদ রায়চৌধুরীর পাশাপাশি ঔপন্যাসিক মহান হৃদয়ের অধিকারী জমিদার নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র চিত্রণে ত্রুটি রাখেন নি। গ্রামের সাধারণ মানুষজনের সতীদাহ প্রথায় বিশ্বাস, পাঠশালায় অমানুষিক শাস্তিদান অথবা বাধ্যতামূলক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রথাকে লেখক যেমন নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন তেমনিই আবার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় হুকার তামাকের ধোঁওয়া সেবনের প্রয়োজনের কথাও যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, যেখানে ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের রচনার প্রভাব অপ্রত্যক্ষ নয় ঃ

"Let no man grudge the Bengali rayat his hookah. It is his only solace amid his dreary toil . . should the Legislature be so inconsiderate as to tax tobacco, the poor peasant will be deprived of half his pleasures, and life to him will be insupportable burden." ['Bengal Peasant Life' ('Govinda Samanta'), Lal Behari Day, 1908, pp. 19-20]

'Govinda Samanta' উপন্যাসে জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—১৮৬৯) সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' ও গৌরীশঙ্কর-এর 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাতেও খুঁজে পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭) উপন্যাসে নীলচাষী ও মতিলালের দ্বন্দ্ব ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ -এর নীলচাষীদের ওপর ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তস্বরূপ। তবে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে জমিদারদের অত্যাচারের কলঙ্কে কলঙ্কিত নদীয়া ও যশোর জেলায় ভ্রমণ না করেও বিভিন্ন অত্যাচারের ছবি সংগ্রহ করেন। অনুমান করা যায় যে, হরিশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'Hindu Patriot' ও গলস্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট-এর 'Rural Life of Bengal'-ই তাঁর প্রধান সূত্র। পাশাপাশি চার্লস্‌ ডিকেন্সের 'David Copperfield'-এর সঙ্গে লালবিহারী দে-র 'Recollection of my School Days' তুলনীয়। তবে তালপুর থেকে কলকাতা যাত্রার বর্ণনা কোনও ভাবেই ডেভিডের ব্লাণ্ডারস্টোন থেকে 'সালেম হাউস' যাত্রার সমগোত্রীয় হয়ে উঠতে পারেনি।

শশীচন্দ্র দত্ত রচিত 'Reminiscences of a Kerani's Life', 'The Young Zamindar.' 'Realities of Indian Life' ও 'Shankur'-গ্রন্থগুলির মধ্যে 'Shankur : a tale of the Indian Mutiny of 1857' সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বাধীনতা সংগ্রামী নানাসাহেব ও ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় বিরচিত 'Shankur' উপন্যাসের অন্যতম ব্রিটিশ বিরোধী নায়ক হলো শংকুর। ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত শশীচন্দ্র দত্ত বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারিয়েট চাকরি করতেন। 'Shankur' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক বিপদের সম্মুখীন হন। এ প্রসঙ্গে প্রাইভেট সক্রেটারীকে লেখা তাঁর চিঠির অংশবিশেষ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

71, Musjeed Baree Lane
16th August, 1878

To

The Private Secretary to H. M. the Lieut. Governor of Bengal

Sir,

Shankur is a tale, I have explained to His Honour, partially founded on historical facts, as such tales usually are, while the best portion of the work is pure fiction only. All the names are of course fictitious. I put in whatever names occurred to me at the time I was writing the book."

যদিও ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'Ivanhoe' ও 'The Heart of Midlothian'-এর তুলনায় 'Shankur' উপন্যাস কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি তবু এর গৌণ ঘটনা চরিত্রসৃষ্টি ব্যতীত 'Shankur' উপন্যাস সব দিক থেকেই এক সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

'Govinda Samanta' উপন্যাসটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়ার কারণ সমাজের নীচুস্তরের অতি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুখদুঃখের কাহিনীই সেখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হলেও সেই সমস্ত উপন্যাসে নবাব, রাজা-বাদশা অথবা জমিদারের জীবনীই মুখ্য আলোচিত বিষয় ছিল। এছাড়া তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের গতিকে সাহায্য করার প্রয়োজনে শ্যামার আবির্ভাব ব্যতীত শশীভূষণ, বিধুভূষণ, হেমচন্দ্র ও স্বর্ণলতা প্রমুখ চরিত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ। সর্বোপরি রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' উপন্যাসেও ঋণদাতার দ্বারা ভীত সনাতন কৈবর্তের চরিত্র ব্যতীত আগাগোড়াই আছে মধ্যবিত্ত পরিবারের কেন্দ্রে অবস্থিত হেমচন্দ্র ও বিন্দুবাসিনীর মানসিক যন্ত্রণার আবর্তনের প্রতিচ্ছবি।

শশীচন্দ্র দত্তের পর উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, তবে ইংরেজি ভাষায় লেখা কবিতার জন্যই তরু দত্তের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় দুখানি উপন্যাস রচনা করেন--'Bianca or The Young Spanish Maiden' এবং 'Le Journal de Mademoiselle d' Arvers'. লেখিকার মৃত্যুর পর ১৮৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল সংখ্যা 'The Bengal Magazine'-এ ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'Bianca' প্রকাশিত হয়।

এই উপন্যাসে স্প্যানিশ ভদ্রলোক অ্যালোন জো গার্সিয়ার কন্যা বিয়াংকা গার্সিয়ার সুখদুঃখ বর্ণিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাসের এক শীতার্ত সকালে বিয়াংকার একমাত্র বড়বোন ইনেজ এর কবরের বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসের পর্দা উত্তোলিত হয়। এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর মৃতা দিদি ইনেজ্-এর প্রেমিক মিস্টার ইন্‌গ্রাম বিয়াংকাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে বিয়াংকা তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। মনের যন্ত্রণারূপ তরী বিস্মৃতির সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে বিয়াংকা তার বান্ধবী মার্গারেট মুর ও তার মা লেডি মুরের বাড়িতে এসে আশ্রয়প্রার্থী হয়। সেখানে লেডি মুরের তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সন্তান লর্ড মুরের সঙ্গে বিয়াংকার প্রেমের মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলে। শেষের দিকে লর্ড মুরের ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদানের খবর আসে। বাগানের মাঝখানে বিয়াংকা লর্ড মুরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভবিষ্যতে বিয়ের মাধ্যমে মিলনের গভীর আশা নিয়ে লর্ড মুর তার হাতের আঙুল থেকে আংটিটি খুলে বিয়াংকার আঙুলে পরিয়ে দিতেই উপন্যাসের যবনিকা পতন ঘটে।

এই উপন্যাসে নানাবিধ অসঙ্গতি আছে। প্রখ্যাত সমালোচক হরিহর দাসের মতে ঃ

> Had it been finished inconsistencies which now exist would have been noted and corrected (e.g., Lord Moore would not be called 'Colin' in the earlier chapters and Henry' in the later ones, nor would the rainy weather of the opening scene so quickly turn to snow).”

লেখিকার এই ত্রুটি সত্ত্বেও বিয়াংকা চরিত্রটি লেখিকার নিজের চরিত্রের অনুকরণেই যথেষ্ট সহানুভূতি সহকারে রচিত। কাহিনীর মাঝখানে, চতুর্থ অধ্যায়ে, একবার বিয়াংকার পিতা, লর্ড মুরের সঙ্গে বিবাহে মানসিকভাবে অসমর্থন জানালে, প্রত্যুত্তরে বিয়াংকা জানায় ঃ

"I will not marry him, I wish your peace and happiness above all things."

উপরিউক্ত ধরণের আত্মত্যাগ বিয়াংকার চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাসই বিয়াংকার চরিত্রে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে হাসিমুখে বরণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। বিয়াংকার এই একনিষ্ঠ ঈশ্বরভক্তিই তার রচয়িতা তরু দত্তের জীবনের পাথেয়। ১৮৭৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর মিস্ মার্টিনকে লেখা এক চিঠিতে তরু দত্তের ঈশ্বরের প্রতি এই বিশ্বাস যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

" The Lord has taken dear Aru from us. It is a sore trial for us ; but His Will will be done We know he doeth all things for our good."

বাড়ির মধ্যেও তরু দত্ত বিদেশী আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন। পাশাপাশি ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায় সরাসরি বড় হয়ে ওঠা ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শরৎ কুমার ঘোষ ১৯০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'The Prince of Destiny : the New Krishna' উপন্যাসে বিজিত ও বিজেতার সম্পর্ক সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ১৮৭৭ সালে ভরতপুরের মহারাজার সন্তান ভরত জন্মগ্রহণ করে। ভরতপুরের বিষ্ণু মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠ আশা করেছিলেন যে, নতুন করে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী গড়ে তোলার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান ভবতরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভরতপুরের রাজপুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে বিদেশী কর্ণেল উইংগেট ও তাঁর ভাগ্নী এলেন-এর উপস্থিতি প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠের ভালো লাগেনি। তিনি সব সময় ভরতকে বিদেশী প্রভাবের ছোঁওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন।

ভরতপুরে গুরু বিশ্বামিত্রের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করার পর ভরত আজমীরের রাজকুমার কলেজে ভর্তি হয়। সেখানে চিতোরের রাজপুত্র উদয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। উদয়ের সঙ্গে একদিন চিতোরের প্রাসাদে যাওয়ার পর উদয়ের বোন সুভোনাকে ভরত নিজের বোন ও বর্তমানে প্রতাপপুরের রাজবধূ ডেলিনির স্থলাভিষিক্ত করে। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে তৎকালীন নরফোককে ভরতের, মেলনোর-এর ভগ্নী নোরার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শুধু তাই নয়, দুজনে যেন পরস্পর পরস্পরকে খুঁজে পেয়ে প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তথাপি পড়াশুনোর শেষে কর্তব্যের আহ্বানে দেশে ফিরে আসার সময় নোরার সঙ্গে বিচ্ছেদের বিরহ-যন্ত্রণায় সে জর্জরিত হয়ে পড়ে। দেশে ফিরে ভরত জানতে পারে যে, ব্রিটেনের রাজনৈতিক প্রতিনিধির পরামর্শ অনুযায়ী দেশের শাসনভার পরিচালিত হবে। সেইসময় ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে মেলনোর ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত

হন। তাঁর সঙ্গে নোরাও এদেশে চলে আসে। ভরতের মনের মধ্যে পুরনো প্রণয়ের বাতাস ঝড় থেকে ঝঞ্ঝায় পরিণত হয়। বশিষ্ঠের পরামর্শ মত ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হওয়ার ফলে দেশের সবাই ভরতের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ভরত রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বিষ্ণু মন্দিরে গিয়ে সেখানকার পুরোহিতের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়। নোরা ও সুভোনা ভরতের খোঁজে বিষ্ণু মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়। সুভোনার অনুরোধে ভরতকে সুভোনার হাতে সমর্পণ করে নোরা দেশে ফিরে যায়। সুভোনা ভরতকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। বিয়ের পর ভরত রাজপ্রাসাদের বাসিন্দা না হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

উপন্যাসের শেষে নায়ক ভরত কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বুদ্ধিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠতে চায়নি। সে মনপ্রাণ দিয়ে অহিংসার পূজারীর প্রতীক ভগবান বুদ্ধের বাণীর অনুসরণে নতুন করে আত্মার আলোর সন্ধানে সন্ধানী হয়ে ওঠার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে উঠতে চেয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের সমর্থক ভরত কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের সমর্থক নয়। তার ধারণা শাসক নিজের থেকেই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের দাবীদার ভারতবর্ষের ওপর তার কর্তৃত্ব হারাবে। তাই শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের ভূমি প্রস্তুত না করাই বাঞ্ছনীয়। বর্তমান উপন্যাসে তাই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির অনুরণন শোনা অস্বাভাবিক নয়।

"Be gentle my children, be gentle, . . . There is no room for rage but for love. Conquer all things by love. Conquer even England by love Forgive the West. Though the West has crucified the East, yet forgive the West . Would you have more ? Then I say unto you that if an insect stings you and you in anger close your hand upon it to crush it, then open your hand and let it go." ['The Prince of Destiny', 1909, p. 66]

শরৎকুমার ঘোষ ভারতীয় রমণীর বিপরীতে ইংরেজ রমণীর চরিত্র-চিত্রণ করার সময় দেখিয়েছেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাই ভবিষ্যতের ভালোমন্দের প্রতি সমান-ভাবেই আগ্রহান্বিতা। ভারতীয় নারীর জলের ওপর প্রদীপ নিক্ষিপ্ত করার ঘটনার পাশাপাশি ইংরেজ বধূর বালিশের নীচে বিবাহের নামাঙ্কিত 'কেক' লুকিয়ে রাখার মাধ্যমে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের প্রতি শঙ্কা ও ভালোবাসা মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার মধ্যে চিরন্তন নারীজাতির মনের প্রতিফলন ঘটে। উপরন্তু প্লটের জটিলতা-হীনতা ও প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দর চরিত্রসৃষ্টির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়। 'The Daily Telegraph' পত্রিকায় 'The Prince of Destiny' সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

"This is but a very remarkable and intensely interesting story which cannot but enthral all readers. Here in an Indian who

gives us a study of his country and its relation to English and writes extremely good English . "

শরৎকুমার ঘোষের 'The Prince of Destiny' উপন্যাসের অনুসরণে ১৯০৯ সালে শুদ্ধমোহন মিত্র রচিত 'Hindupore—A Peep behind the Indian Unrest' নামক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা প্রয়োজন যে এই গ্রন্থটিকে আত্মজীবনীমূলক রোমান্স বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে, তবুও এর মধ্যে উপন্যাসের ধর্মও রক্ষিত হয়েছে। বর্তমান কাহিনীতে মহৎ হৃদয়ের অধিকারী ও স্বাধীন চিন্তাধারার প্রতিভূ আইরিশ সংসদের সদস্য লর্ড তারা 'নূরজাহাঁ' জাহাজে করে তাঁর বন্ধু হুবার্ট হার্ভের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসেন। জাহাজে তাঁর সহযাত্রী ভারতপ্রেমী ডাক্তার মিস্ সিলিসিয়া স্কট, যিনি পুরীতে রথের মেলায় অসুস্থদের সেবা করার নিমিত্ত রওনা হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। সুয়েজ-এ লর্ড তারার সঙ্গে ভারতবর্ষের 'হিন্দুপুর' নামক রাজ্যের রাজপুত্র রাজা রাম সিং-এর আলাপ ও ঘনিষ্ঠতার ফলে লর্ড তারা হিন্দুপুর রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত হন। সেখানে তিনি রাজকন্যা কমলার প্রেমে আপ্লুত হন এবং বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কমলার পাণিগ্রহণ পূর্বক ইংল্যান্ডের পথে পাড়ি দেন।

উপরিউক্ত গ্রন্থে বিবৃত কাহিনীর মধ্যে বিশেষ আদর্শ প্রচারের প্রচেষ্টা বিদ্যমান। জোনাথান টডি রাম সিং-এর সঙ্গে একই ট্রেনের একই কক্ষে ভ্রমণকালে 'নেটিভ'-দের প্রতি তাঁর মানসিক সংকীর্ণতার পরিচয় ব্যক্ত করেন ঃ

"I I've never travelled in my life with a nigger—I am a gentleman." [Hindupore. p. 188]

আগাগোড়া কথোপকথনের মাধ্যমে চরিত্রগুলির মানসিক গঠন, তাদের প্রেম, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, মানসিক দ্বন্দ্ব সব কিছুই প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির জন্য কারা দায়ী তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ময়নাতদন্তের আন্তরিক প্রচেষ্টা একান্তভাবেই প্রকাশিত। এটিকে এই গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আমেরিকা প্রবাসী ও প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহোদর ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুরুষে লেখা 'My Brother's Face' গ্রন্থটি ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ বারো বছরের ব্যবধানে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর লেখক আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখককে উপদেশের ভঙ্গিতে বলেছিলেন ঃ

"Humanity is one at the core—East and West are but alternative beats of the same heart." [My Brother's Face, p. 313]

উপন্যাসটির চরিত্র অঙ্কণ বাস্তব সম্মত। ডঃ কে. আর এস. আয়েঙ্গারের মতে গ্রন্থটি "...is partly autobiographical and is among the best of stories."

প্রখ্যাত অধ্যাপক ও জাতীয়তাবাদী নেতা হুমায়ুন কবীর একাধারে সমালোচক, কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৫ সালে তাঁর লেখা উপন্যাস 'Men and Rivers' প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে অবিভক্ত বাংলাদেশের পদ্মানদীর পাড়ে গড়ে ওঠা এক জনজীবনের বাঁচার লড়াই হলো গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয়। নাজুমিয়া তার গোষ্ঠীর লোকেদের নেতা অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ-এর নেতা। এক সময় সে রহিম বক্স-এর নেতৃত্বে পদ্মার পাড়ে চাষের কাজে হাত লাগায়। যৌবনের সেই সব উজ্জ্বল দিনে তার প্রিয়তম বন্ধু আসগর মিয়া আজ তার জঘন্যতম শত্রু। নাজুমিয়ার সংসার বলতে তার মা আয়েষা ও একমাত্র সন্তান মালেক। ধুলোডির হাটে জনৈক ফকির নাজুকে ভবিষ্যৎবাণী করে জানায় যে, একদিন তার জঘন্যতম শত্রুই তার প্রিয়তম বন্ধু হিসেবে স্বীকৃত হবে। কালচক্রে পদ্মানদী পার হতে গিয়ে নাজুমিয়া নদীতে ডুবে মারা যায়। এক ঝড়জলের রাতে সন্তান বিরহে পাগলপ্রায় আয়েষা বিবির মৃতদেহ পদ্মার পাড়ে খুঁজে পাওয়া যায়। মালেক-এর দুই ঝি ও বুড়ির বিশ্বস্ত চাকর বসির মালেক-এর ভবিষ্যতের দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়ে নতুন পঞ্চায়েৎ প্রধান আসগর মিয়ার কাছে এসে এ ব্যাপারে কিছু করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানায়। বসিরের অনুরোধে আসগর মিয়া সম্মতি জানালে মালেক এসে আসগর মিয়ার সংসারে বসবাস করতে শুরু করে। আসগর মিয়ার স্ত্রী আমিনা ও একমাত্র কন্যা নুরুবিবি মালেককে তাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে সাগ্রহে গ্রহণ করে।

ঘটনা প্রবাহ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। ইতিমধ্যে আসগর মিয়ার ভাগ্য-বিপর্যয় হওয়ায় সে পরিবারের সকলকে নিয়ে পদ্মানদী ও সমুদ্রের সংযোগস্থল বৈঙ্কার নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। সেখানে বড় হয়ে ওঠা মালেক প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আসগর মিয়ার ভাগ্য অনেকটাই ফিরিয়ে আনলেও অদৃষ্টের পরিহাসে আসগর মিয়ার স্ত্রী আমিনার মৃত্যু হয়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে নুরুবিবি সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। মালেক ও নুরুবিবি তাদের গভীর প্রেমের দরুণ বিবাহ বন্ধনের জন্য আজিজের মাধ্যমে আসগর মিয়াকে অনুরোধ জানালে তিনি এই প্রস্তাবে সরাসরি 'না' করে দেন। মালেক ও নুরুবিবিকে সঙ্গে নিয়ে আসগর মিয়া তার মৃতা স্ত্রী আমিনার কবরখানায় গিয়ে উপস্থিত হয় ও অতীতের কাহিনী বিবৃত করে। সে জানায় যে, নাজুমিয়ার সঙ্গে তার এক সময় গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আমিনার পাণিগ্রহণের প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে আমিনার চাচী আসগরকে অসম্মান করে ও তার বন্ধু নাজুমিয়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। তাদেরই সন্তান মালেক। পরবর্তীকালে নাজুমিয়ার মনে এই মত সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, আমিনার সঙ্গে এখনও আসগর মিয়ার সম্পর্ক আছে। অবশেষে নাজুমিয়া আমিনাকে তালাক দিয়ে দেওয়ার পর আসগর মিয়া আমিনার ভাগ্য বিপর্যয় রোধের আকাঙ্ক্ষায় এগিয়ে আসে ও আমিনাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। নুরুবিবির জন্ম হয়। তাই মালেক ও নুরুবিবি রক্তের সম্পর্কে ভাইবোন। তারা কখনই স্বামী-স্ত্রী রূপে পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারে না। আসগর মিয়ার কাছে মালেক জানতে চায়—কেন সে এই সম্পর্কের কথা আগে জানায় নি?

নিরুত্তর আসগর মিয়া ও প্রিয়তমা নূরুবিবিকে মানসিকভাবে ত্যাগ করে মালেক তার মা আমিনা বিবির কবরের পাশে স্থির, নিশ্চুপ ও অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকে। মাঝরাতে আসগর মিয়া কবরে এসে উপস্থিত হলে কোথাও আর মালেককে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বর্তমান উপন্যাসে পদ্মানদী যেন টমাস হার্ডি'র 'The Return of the Native'-এর এগডন হীথের দ্যোতক। ফ্ল্যাশব্যাকে বর্ণিত নাজুমিয়া, আসগর মিয়া ও আমিনার বন্ধুত্ব ও ত্রিকোণ প্রেম যথার্থই প্রশংসার দাবীদার। আবার নূরুবিবির সঙ্গে মালেক-এর না-মিলিত হওয়ার যন্ত্রণা রাজা অয়দিপাউসের ক্রন্দনরত, প্রায় রুদ্ধ অভিব্যক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। রাজা অয়দিপাউস তাঁর জন্মদাতৃ জননীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের শেষে নিজেকে অন্ধ করে দিয়ে পাগলের মত চীৎকার করে ওঠেন ঃ

> "Now shedder of father's blood
> Husband of mother is my name."

আলোচ্য উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টি লেখকের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। উইলিয়াম শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক 'Romeo and Juliet'-এর নায়ক নায়িকা রোমিও ও জুলিয়েট-এর মত মালেক ও নূরুবিবিও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর দুই মেরুর বাসিন্দা। মালেক ও নূরুবিবির প্রেম নিবেদনের দৃশ্য সংক্ষিপ্তভাবে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

> 'The blush on Nature's face deepened till it seemed as if it would burst into flames A couple of minutes passed. Earth and sky were held in a spell of silence. Light overflowed on all sides out of the blue depth of the sky Nuru lowered her head It seemed as if a whole world's shyness weighed him down."

[Men and Rivers, p. 140]

উপন্যাসের শেষে দুই ব্যর্থ, নির্দোষ প্রেমিক প্রেমিকার ভাগ্য নির্ধারিত ট্র্যাজেডি পাঠকের হৃদয়কে নিঃসন্দেহে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত ভবানী ভট্টাচার্য'র 'So Many Hungers' উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন গ্রাম-বাংলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষজনের ছবি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী ফৌজ জার্মানীর সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে 'Allied Forces' অর্থাৎ রাশিয়া, বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে যাবতীয় নৌকো, লড়াই-এর প্রস্তুতির জন্য, দখল করে নেওয়ায় বহু মানুষ কর্মচ্যুত হয়। পাশাপাশি তারা বহুমূল্যে সামরিক বাহিনীর জন্য চাল সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা শুরু করার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ সংবৎসরের খাদ্য বেচে দিতে থাকে। এর ফলে গ্রাম-বাংলায় দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত ঘটে। এই পটভূমিকায় লেখক এক সুন্দর বাস্তবভিত্তিক কাহিনী রচনা করেছেন।

বর্তমান উপন্যাসে সমরেন্দ্র বসু কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা ও অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে অর্থপিশাচ হিসেবে পরিগণিত হলেও তার পিতা, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী, সত্তর বছর বয়স্ক দেবেশ বসু, শহর থেকে বহুদূরে বারুণী গ্রামে সাধারণ গ্রামবাসীর দ্বারা দেবতা হিসেবে পূজিত ব্যক্তি। তিনি গ্রামে কানু, ওনু, কাজলি ও তাদের বাবা মা-র সঙ্গে বাস করেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হওয়ায় দেবেশ বসু কানু, ওনুর বাবা ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও কারাবরণ করেন।

কাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। অন্যান্যদের মতন কাজলিদের সংসারেও অভাব দেখা দেওয়ায় কাজলি সপরিবার গ্রাম ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথে কাজলি জনৈক সৈনিকের দ্বারা ধর্ষিতা হয়। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে পেটের জ্বালায় সে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। অসুস্থা মা অভাবের তাড়নায় গঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পর কাজলি পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করে। এদিকে দেরাদুন জেলের অভ্যন্তরে 'দেবতা' দেবেশ বসুর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সৎভাবে বাঁচার তাগিদে, কাজলি রাস্তায় ফেরিওয়ালার বৃত্তি গ্রহণ করে। এমন সময় খবর পাওয়া যায় যে, পুলিশ 'দেবতা' দেবেশ বসুর নাতি ও সমরেন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র রাহুলকে ব্রিটিশ-সরকার-বিরোধী কাজের জন্য গ্রেপ্তার করেছে। উপন্যাসের শেষে অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রাহুলও 'কোরাস'-এ গান গেয়ে চলেছে।

বাংলা ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের পটভূমিকায় অনেক গ্রন্থই রচিত হয়েছে। তবে ভবানী ভট্টাচার্যের উপন্যাসে গ্রামের সাধারণ মানুষের অব্যক্ত যন্ত্রণা যে ভাষা খুঁজে পেয়েছে তা অত্যুক্তি নয়। বর্তমানের আলোচ্য উপন্যাসে লেখক বারুণী গ্রামের বাসিন্দাদের দুর্দশার কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> "No way out. Trapped ! who would speak the word of wisdom : Devata in prison. The villagers in prison. And the storeman was the self-appointed trustee of the national movement ! The rice drained from the village, moving off in big city barges, a new problem came ....
>
> Presently the rice hunger that was thin thread of stream was swelling in a mighty flood." [So Many Hungers, pp. 140-41]

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ভবানী ভট্টাচার্য পর্যন্ত লেখকদের উপন্যাসের পটভূমিতে সমসাময়িক ঘটনার তুলনায় ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিক নীরদচন্দ্র চৌধুরী থেকে শুরু করে শকুন্তলা দত্ত, উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ ঘোষ, ভারতী মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাসে আবার অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনার তুলনায় বর্তমানের ঘটতে থাকা ঘটনার গুরুত্ব ও তার প্রেক্ষাপটে চরিত্রের মানসিক বিশ্লেষণ অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

ইংরেজি উপন্যাস সাহিত্যের জগতে ভবানী ভট্টাচার্য্য ও নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মধ্যবর্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত ঔপন্যাসিক সুধীন্দ্রনাথ ঘোষের আবির্ভাব। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানে তাঁর জন্ম। আইনজগতে স্বনামে খ্যাত রাসবিহারী ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালে বায়োকেমিস্ট্রিতে গবেষণার জন্য লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যান। অসম্পূর্ণ গবেষণার কাজ পেছনে ফেলে রেখে তিনি প্যারিসে পাস্তুর ইন্সটিটিউটে গিয়ে যোগদান করেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর সত্যিকারের আকর্ষণ ছিল না। তাঁর বরাবরই ঝোঁক ছিল সাহিত্যের প্রতি। তাই ইংরেজি ও বাংলা ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি ইয়োরোপীয় ভাষা শিখেছিলেন। শেষে স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রির্যাফেলাইট ব্রাদারহুড বিষয়ে গবেষণা সম্পূর্ণ করে তিনি ডি. লিট উপাধি অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতীতে তিনি ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং এক বছরের মধ্যেই আবার লণ্ডনে ফিরে যান। ১৯৬৫ সালে বিদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঔপন্যাসিক হিসেবে লণ্ডন থেকে সুধীন্দ্রনাথের পর পর চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়—'And Gazelles Leaping' (১৯৪৯), 'Cradle of the Clouds' (১৯৫১), 'The Vermilion Boat' (১৯৫৩) এবং 'The Flame of the Forest' (১৯৫৫)।

প্রমথ পুরুষে বিবৃত ছিন্নমূল লেখকের অস্তিত্বের সংকট উপরিউক্ত চারটি উপন্যাসেই নায়কের মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রথম উপন্যাস 'And Gazelles Leaping'-এ গঙ্গানদীর ধারে রানী নীলমণির বিস্তীর্ণ এস্টেটের কিণ্ডারগার্টেনে প্রকৃতি ও মানুষের প্রীতির সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। এখানে নায়কের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হ'ল রানীর হাতি মোহন। আবার অরণ্যের বারশিঙ্গা হরিণের (gazelle) মতোই নায়ক এখানে প্রকৃতির কোলে দুশ্চিন্তাহীন জীবন-যাপন করে। পরবর্তী সময়ে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঢেউ শান্ত আশ্রম-জীবনের ওপর এসে আছড়ে পড়ে। ভয় থেকে অভয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসা নায়কের মনে সাগরপারের মহিমান্বিত রূপের ছোঁওয়া এসে লাগে :

> "... The exquisite music of those singers from a land beyond the seas brought me something new. Its melody revealed a beauty hitherto unknown. It was overwhelming, it was redeeming. It was sublime." (p. 228)

দ্বিতীয় উপন্যাস 'Cradle of the Clouds'-এ নায়কের নীতিবোধ ও গোষ্ঠীর প্রতি কর্তব্য খুবই প্রবল। পেনহ্যারি পরগণার 'Red Valley'-তে অবস্থিত কুসুমপুর গ্রামে তার বাস। এই সময় দামোদর নদীর ওপর একটি বাঁধের পরিকল্পনার কথা শোনা যায়। এর ফলস্বরূপ 'Red Valley' প্লাবিত হবে ও এলাকার বাসিন্দাদের ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে স্থানান্তরিত হতে হবে। প্রগতিশীল মানসিকতার মানুষজন খুশী হলেও সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন বোধ করে। নায়ক বাস্তব সমস্যার মধ্যে না থেকে 'Blue Hills'-এর প্রকৃতি ও পুরাতত্ত্বের স্বপ্নময় জগতে কল্পনার সাতটি পাহাড়ের মধ্যে খুঁজে ফেরে কিংবদন্তীর 'Cradle of the Clouds'.

পুরাকালে একবার প্রচণ্ড গ্রীষ্মে অত্যাচারী কংসরাজা নাকি যমুনা নদীতে বাঁধ বেঁধে দিয়ে বৃন্দাবনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ-সহোদর বালক বলরাম বৃন্দাবনের পুরুষদের অনুপস্থিতিতে নারীদের নিয়ে তাঁর ছোট্ট লাঙলের সাহায্যে জমি চাষ করতে শুরু করায় দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টির দ্বারা যমুনার ওপর বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে বৃন্দাবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সেইমত পেনহারির 'Red Valley'-তে একজন কর্মযোদ্ধা বলরামের প্রয়োজন। ভাগ্যচক্রে বর্তমান উপন্যাসের নায়কের জন্মতিথি বলরামের সঙ্গে এক। অতএব পুরাকাহিনীর মত বর্তমানের নায়কও যেন এখানে পুরাকালের বলরামের প্রতিভূ।

তৃতীয় উপন্যাস 'The Vermilion Boat এ নায়ক বলরামকে হোস্টেল জীবনের অভিভাবক, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব যোগীনদা একবার একটি খেলনা vermilion boat উপহার দিয়েছিলেন। সেটি তাঁর চৌবাচ্চায় ভাসাতে গিয়ে বলরাম ভয়ঙ্কর রকম বিষাক্ত সাপেদের মধ্যে গিয়ে পড়ে। উপন্যাসের শেষে সে দেহমনের অখণ্ড অস্তিত্বের স্মৃতি অনুভব করে : ' . in embracing Roma, I knew I was worshipping Uma'.

এরই পাশাপাশি চতুর্থ উপন্যাস 'The Flame of the Forest'-এ বলরামের শিক্ষাশেষে কাজের জগতে প্রবেশের কাহিনী। ঘটনাচক্রে নায়ক জনতাকে শাস্ত্রাদি পাঠের ভারপ্রাপ্ত হয়। সে উপলব্ধি করে যে, জ্ঞানের জন্য প্রেমের প্রয়োজন, 'To understand Krishna one must seek union with Krishna.' (p. 167)

সুধীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রচুর ভাষার অলঙ্করণের খোঁজ পাওয়া যায়। রহস্যাবৃত কল্পনা ঘটনাসমষ্টির কাঠামোকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বেশির ভাগ সময় গল্পের অপ্রাসঙ্গিক শাখাবিস্তার গল্পের সরল রেখাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায়। তবু তাঁর সহজিয়া ভাষা গল্পের গতিকে কোথাও শ্লথ হতে দেয় না।

গত কুড়ি বছর ধরে অক্সফোর্ড প্রবাসী ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির দ্বারা সম্মানিত ডি লিট উপাধিতে ভূষিত লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আত্মজীবনীমূলক 'The Autobiography of an Unknown Indian' গ্রন্থটি ১৯৫১ সালে 'The Hogarth Press' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই 'Autobiography', রচনাটির মধ্যে উপন্যাসধর্মিতা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান বলেই এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত লেখক প্রবাসী হননি। যদিও তিনি ব্রিটেনবাসীকে বইটি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তদানীন্তন বাংলাদেশের গ্রামে অতিবাহিত লেখকের শৈশব ও শিক্ষার এক সংবেদশীল ও কাব্যিক বর্ণনার পাশাপাশি ছিন্নমূল হয়ে কলকাতা শহরের স্রোতে জীবন ভেসে যাওয়ার যন্ত্রণাবিধুর আর্তির স্বরও শুনতে পাওয়া যায়। এই রচনায় জনৈক সমালোচকের ভাষায় :

> " In the end. the hero is cast adrift in tragic isolation—all this a romantic echo of the classical Hindu stages of life . It is the story of a man's spiritual survival against impossible odds by keeping faith with his values."

জীবনের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে লেখক প্রথম বিদেশে যান এবং ফিরে এসে ই. এম. ফস্টারের 'A Passege to India'-র প্রত্যুত্তরে 'A Passage to England' লেখেন। এই গ্রন্থে নীরদবাবু ইংল্যাণ্ডের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক জীবনের প্রশংসার পাশাপাশি হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবন সম্বন্ধে নানারকম তির্যক ও অপ্রীতিকর মন্তব্য করেছেন।

১৯৮৮ সালে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর দ্বিতীয় আত্মজীবনীমূলক রচনা ৯০৯ পৃষ্ঠার 'Thy Hand, Great Anarch ! India 1921—1952', 'Chatto and Windus' ও পরে 'Addison-Wesley Publishing Company' থেকেও প্রকাশিত হয় এবং 'আনন্দ' পুরস্কারে ভূষিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মতামত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

"My views on Indian national leaders like Gandhi and Nehru are unflattering. So are my remarks on Mountbatten. But my attempt was to give a balanced interpretation of events."

এইভাবে লেখক তাঁর চরিত্রের মানসিক বিশ্লেষণের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত আবেগ ও মতামত জানাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। নরম্যান ফ্রায়েডম্যান-এর ভাষায় ঃ

" the author is free not only to inform us of the ideas and emotions within the minds of his characters but also of his own."

বাঙালী লেখকের বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য-চর্চার কারণ যথেষ্টই কৌতূহলোদ্দীপক। তবে তিনি ১৯৮৯ সালে ১লা এপ্রিল সংখ্যা সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ'-এ একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে এর কারণ অকপটে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"কেন আমি বাংলায় লিখিনি ? ১৯৩০-৩২ সালের পর থেকেই আমার ধারণা জন্মাল, বাংলা ভাষা বা বাংলা সাহিত্যের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তা হলে আমি সময় নষ্ট করি কেন ? ভারতবাসীর কাছে যদি বলতে হয় বাঙালীর কাছেও যদি বলতে হয়, বাইরের জগতের কাছেও যদি বলতে হয় তা হলে আমি ইংরেজিতে লিখে সকলের কাছে যেতে পারব। খালি বাঙালীর কাছে বললে বাঙালী শুনবেও না, বুঝবেও না ; কিছু করবেও না।"

পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে শকুন্তলা দত্ত, উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ ঘোষ, ভারতী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক-লেখিকারা এই মুহূর্তেই ইংরেজি-ভাষা-বিশ্বে ও বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন।

শকুন্তলা দত্ত রঘু রামাইয়ার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বর্তমানে নিউইয়র্ক থেকে শ' তিনেক মাইল দূরে সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় রত। তাঁর প্রথম ও একমাত্র উপন্যাস 'Flute' ইংল্যাণ্ডে 'Michael Joseph' ও আমেরিকায় 'Viking' প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক এ যাবৎকাল মোট তিনটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনে স্বপ্নে দেখা এক অদ্ভুত দৃশ্য থেকে

উপন্যাসের অবতারণা। এই শতকের প্রথম দিকের প্রেক্ষাপটে আঁকা দুটি বিদেশী ছেলে জুলিয়ান ও ডেন-এর সম্পর্ক শরীরী এবং ডেন আবার একটি নর্তকীকেও ভালবাসে। নিখিল জুলিয়ানের সম্পর্কে এতখানিই মুগ্ধ যে জুলিয়ান ব্যতীত নিখিলের পক্ষে বেঁচে থাকা কল্পনাতীত ব্যাপার। আবার অন্যদিকে নিখিলের বাঁশি শুনে জুলিয়ান মন্ত্রমুগ্ধ। নিখিল জানে জুলিয়ানকে একমাত্র বাঁশির সুরে আচ্ছন্ন করে রাখা সম্ভবপর। নিখিল জুলিয়ানকে শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী শোনায়। জুলিয়ানই ক্রমশঃ নিখিলের শ্রীকৃষ্ণ ওয়ে ওঠে। ঋজু লেখার ধারায় এক অতীন্দ্রিয় জগতের প্রেম, যৌনতা ও অবচেতন মনের জটিল আবর্তের মধ্যে দিয়ে যথাযথ চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে লেখিকা তাঁর কৃতিত্বের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আই এ এস অফিসার উপমন্যু চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'English August' বা 'ভারতীয় গ্রীষ্ম' উপন্যাসটি ১৯৮৮ সালে জগদ্বিখ্যাত প্রকাশক সংস্থা 'Faber and Faber' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নায়কের নাম অগস্ত্য সেন। উপন্যাসের প্রথম পাতাতেই দার্জিলিঙের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র অগস্ত্যের উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

"And our accents are Indian, but we prefer August to Agastya"

অগস্ত্য সেন সদ্য পাশ করা আই. এ. এস. অফিসার যাঁর কল্পনা, নারী, বিপদহীন নেশাবস্তু ও সাহিত্য দ্বারা অধিকৃত। ২৮৭ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে অগস্ত্যকে 'মদনা' নামের একটি অজ, পান্ডববর্জিত মফঃস্বল শহরে কর্মদায়িত্ব অর্পিত করে পাঠানো হয়েছে। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই তার সমগ্র অভিজ্ঞতা সুললিত, মধুর ও সুন্দর নয়। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু ছায়ামানুষের ভীড় পাওয়া যায়। এলিয়টের ভাষায় জীবন্মৃত বা living dead চরিত্র। শ্রীবাস্তব, কুমার, ধ্রুব, শঙ্কর, সাঠে, ভাটিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ অস্তিত্বের ভাবে ভারাক্রান্ত।

উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পৃথিবীতে তীক্ষ্ন ব্যক্তিসত্তা, মানসিক পরিমন্ডলের নিদারুণ চাপ ও গল্প বলার সুসংহত একমুখী ভঙ্গী খুঁজে পাওয়া যায়। পাশাপাশি অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসের জগতে মানুষের মানবিক অস্তিত্ব-বোধের ধারাকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে, নমনীয় ভঙ্গিতে, বুদ্ধিবাদের দ্বারা জীবন-দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি লেখকের স্বচ্ছ জীবনবোধে চরিত্রের সত্তাকে অন্তর্নিহিত কোণ থেকে টেনে এনে বইয়ের জগতের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সাহায্য করে। তবে উভয় লেখকের উপন্যাসেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকদ্বয়ের একাত্মতা উপলব্ধি করা যায়। পরে এই একাত্মতার দরুণ পাঠক প্রথমে ঔপন্যাসিকের ভূমিকায় গল্প বলিয়েকে খুঁজে পেলেও পরবর্তী সময় গল্প বলিয়ের অস্তিত্ব ক্রমশঃ হয়ে পড়ে বিলীয়মান। সেখানে তখন উপন্যাসের বিষয়বস্তুই প্রধান হয়ে ওঠে। বিশেষ চরিত্র বা বিশেষ কোনও ঘটনার ওপর এই 'Focus of narration' অথবা 'point of view' কেন্দ্রীভূত হলেও লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা যে কতখানি প্রয়োজন তা জনৈক সাহিত্য সমালোচক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

"The whole intricate question of method in the craft of fiction I take, to be governed by the question of the point of view—the question of the relation in which the narrator stands to the story. He tells it as he sees it : In the first place, the reader faces the story teller and listens and the story may be said so vivaciously that the presence of the minstrel is forgotten and the scene becomes visible, peopled with the characters of the tale."

সর্বোপরি উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে জীবনের আরও গভীরতার ছোঁওয়া ভবিষ্যতে আশা করা যায়। আর অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসে জীবনের সীমারেখা ছাড়িয়ে নতুন দর্শনের আশা রাখা অবাস্তব হবে না। বিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ জনসন একবার রিচার্ডসন ও ফিল্ডিং-এর উপন্যাসের ক্ষেত্রে খ্যাতির পরিমাপ করতে গিয়ে যা বলেছিলেন তা এখানে উপমন্যু চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ ঘোষের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে স্মর্তব্য :

"There was as great a difference between them, as between a man who knew how a watch was made and a man who could tell the hour by looking at the dial-plate."

দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট অমিতাভ ঘোষের প্রথম উপন্যাসটি 'The Circle of Reason', 'Hamish Hamilton Limited' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের পোষাকী নাম থাকলেও তার পরিচিতি 'আলু' বলে। আলুর আশা সন্তানহীন জ্যাঠামশাইকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে। মাথার আকৃতি আলুর সদৃশ হওয়ায় সেই নামেই সে পরিচিত হয়। পরে পেশায় তাঁতী আলুর কেরল যাত্রা ও সেখান থেকে আরব দেশের আলঘাজিরা হয়ে আলজিরিয়ার একটি ছোট্ট গ্রামে জীবিকার সন্ধানে উপস্থিত হওয়ার কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাহারার সেই ছোট্ট গ্রামে একদল ভারতীয়ের সঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা' মঞ্চস্থ করার মধ্যে দিয়ে তার পরম জীবনবোধের উপলব্ধি হয় যে, বিজ্ঞান ব্যতীতও মানুষের জীবনের একটা সুন্দর প্রেক্ষাপট আছে, যা মানুষকে যান্ত্রিকতার যন্ত্রণাময় কাতরতার হাত থেকে বাঁচতে শেখায়। এই অনুভবের মধ্যেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

অমিতাভ ঘোষের দ্বিতীয় উপন্যাস 'The Shadow Lines' ১৯৮৮ সালের 'Ravi Dayal Publisher' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের একদিকে ভবঘুরে ত্রিদিব চরিত্র আর অন্যদিকে ঠাকুমার চরিত্র--যিনি বিশ্বাস করেন কোনও অবস্থাতেই সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। কলকাতা, ঢাকা ও ব্যাংকক গল্পের পটভূমি। যৌবনোদ্দীপ্ত, সুন্দরী, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা খুড়তুতো বোন ইলার প্রতি লেখকের অবচেতন মনের অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে ; ইলার মানসিক অবস্থা ছিল—

" which was like an airlock in a canal, shut away from the tide waters of the past and the future by steel floodgates."

জনৈক সমালোচকের মতে ঃ " the whole book is held together by haunting introspection about mirrors and maps."

অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসে ছন্দ ও বাগৈশ্বর্যের কাব্যিক মিলনের সন্ধান পাওয়া যায় যা কিনা শুধু কাব্যের অধিকারেই নয় উপন্যাসের অধিকারের সীমারেখার গণ্ডির মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত সত্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রবাদ-পুরুষ ডঃ অমলেন্দু বসুর ভাষায় ঃ

"ছন্দ ও বাগৈশ্বর্য—এই দুইয়ে কাব্যকলার বৈশিষ্ট্য। চিত্রকলা বা নৃত্যকলা অথবা উপন্যাস বা নাটক প্রভৃতি অন্যান্য সাহিত্যিক কলা থেকে যে-কারণে কাব্যকলা স্বতন্ত্র, শিল্পের যে-করণকৌশল অনুপম রূপে কাব্যেই নিহিত, যে-করণকৌশলে বিধৃত হলে অন্য শিল্পকেও আমরা বলি কাব্যধর্মী, সেই শৈল্পিক কারুকৃতি উদ্ভাসিত হয় বাক্‌প্রয়োগের প্রায় অনির্বচনীয়প্রায় অবিশ্লেষ্য রীতিতে।"

অমিতাভ ঘোষের সমসাময়িক ঔপন্যাসিক ভারতী মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসের আলোচনায় চরিত্র ও প্লট অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অমিতাভ ঘোষের প্রথম উপন্যাসে চরিত্র প্লটের অগ্রগতির বাধাস্বরূপ হলেও দ্বিতীয় উপন্যাসে চরিত্র প্লটকে তার অগ্রগতিতে যথেষ্টই সাহায্য করেছে। তবে ভারতী মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে চরিত্র সব সময়ই গল্পের প্লটকে সাহায্য করে। তাই ডরোথি এম স্পেনসার-এর ভারতীয় সাহিত্যিকদের ইংরেজি উপন্যাস সম্পর্কে মতামত সর্বৈব সত্য নয়। তাঁর মতে লেখকদের " a lack of interest in human nature, and individual character may have hindered the development of the novel in India.".

ভারতী মুখোপাধ্যায় নবীন কানাডীয় লেখক ক্লার্ক ব্লেইজের স্ত্রী। বর্তমানে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও সিটি ইউনিভার্সিটি অফ্‌ নিউ ইয়র্কে 'creative writing' বা সৃজনধর্মী লেখা শেখানোর ক্লাসে অধ্যাপনা করেন। লেখিকার প্রথম উপন্যাস 'The Tiger's Daughter' ১৯৭১ সালে 'Penguin India' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বর্তমান উপন্যাসে কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলের জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বাণিজ্যে ব্যস্ত বাংলার বাঘ তাঁর একমাত্র কন্যা তারাকে Vassar-এ পড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দেন। এই পর্যন্ত কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু তারার জীবনের ওপর মূল কাহিনীর আলোকপাত হওয়ার পরবর্তী অধ্যায় ততখানি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। ব্যারাকপুরে অনুষ্ঠিত পিক্‌নিক্‌ ই এম ফস্টারের 'A Passage to India' উপন্যাসের পিক্‌নিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং 'The Tiger's Daughter'-এর পিক্‌নিকে একটি শান্ত, ছোট্ট জলের সাপ তারার আনন্দ নষ্ট করে দেয়। কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স বা চরম পরিণতিতে কলকাতার ব্যবসায়ী টুনটুনওয়ালা তার নিজের সঙ্গে অসচ্চরিত্রমূলক যৌন

কার্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য তারাকে প্রলুব্ধ ও বাধ্য করে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত তারা আমেরিকায় ফিরে যাওয়াই মনস্থ করে। আলোচ্য উপন্যাসে আগাগোড়াই 'Cultures in collision' পরিলক্ষিত হয়। এই লেখিকার দ্বিতীয় উপন্যাস 'Wife' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে এবং তাঁর ছোট গল্পের সংগ্রহ 'Darkness' প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে। 'Wife' উপন্যাসের নায়িকা কলকাতা থেকে আগত এক বাঙালী মহিলা, যিনি নিউইয়র্কের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য জীবন-সংগ্রামে রত।

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখিকা ভারতী মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রশংসা করলেও 'The Tiger's Daughter' উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ "লেখা ভালো এবং তরতরে, তবে উপন্যাস হিসেবে অভিনব কিছু মনে হয়নি। ছোট গল্প বেশি ভাল লেগেছে।"

প্রবন্ধের সমাপ্তি পর্বে পৌঁছে যে সত্যটি স্মরণে আসে তাহল ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশক পর্যন্ত প্রসারিত কালের প্রেক্ষাপটে যে আঠারো জন বাঙালী ঔপন্যাসিক ইংরাজী ভাষায় উপন্যাস রচনা করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েও প্রত্যাশা করব, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই সব স্রষ্টার আগামী দিনের সৃষ্টিতে বাংলা তথা ভারতের সমস্যাদীর্ণ রূপ, জীবনদ্বন্দ্ব ও জীবনের গভীরতর বোধ পরিস্ফুট হয়ে ওঠার অবকাশ পাবে। এমন আশা করা বোধহয় অসঙ্গত নয়।

তথ্য-সূত্র ঃ

১. **The Modern Indian Novel in English**, M. E. Derrett, p. 108.

২ **সেকাল ও একাল**, রাজনারায়ণ বসু, ১৯০৯।

৩ **The Fire and the Offering : The English-language Novel of India : 1935-1970**, S. C. Harrex, Calcutta, 1977.

৪ **Calcutta Review**. June 1851.

৫. **Collected Works**, ed. S. . Dutt. Second Series, Vol. I., 1885, "A Few Autobiographical Remarks by way of Preface."

৬. Le Journal de Mademoiselle d' Arvers' was translated into English by Prithwindra Mukherjee in the **Illustrated Weekly** in 1963.

৭. **Life and Letters of Toru Dutt**, Hari Har Das, 1921.

৮. **The Daily Telegraph**, November, 1909.

৯. **Indian Writing in English**. K. R. S. Iyengar, 1984.

১০. **The Theban plays**, Sophocles **King Oedipus**, Penguin Classics, 1974.

১১. **Form and Meaning in Fiction**, Norman Friedman, 1975.

১২. "দেশ" 'বঙ্গসন্তানের ইংরেজি সাহিত্য-অভিযান' মঞ্জুভাষ মিত্র, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৯০.

১৩. **The Craft of Fiction**, Percy Lubbock, 1957.

১৪. **Novelists on the Novel**, Mirriam Allot, 1959.

১৫. সাহিত্যালোক, 'সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র ঃ রবীন্দ্রনাথের বাক্প্রতিমা', অমলেন্দু বসু, জেনারেল পাবলিশার্স, ১৯৭১.

১৬. **Indian Fiction in English**, Dorothy M. Spencer 1960.

১৭. 'দেশ' ১৩ জুলাই, ১৯৯১, 'সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ', এষা দে।

উপন্যাসপঞ্জী

॥ প্রথম খণ্ড ॥

॥ ১ ॥ **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** (২৬.৬.১৮৩৮—৮.৪.১৮৯৪)

দুর্গেশনন্দিনী ; কপালকুণ্ডলা . মৃণালিনী ; বিষবৃক্ষ ; ইন্দিরা ; যুগলাঙ্গুরীয় ; চন্দ্রশেখর ; রাধারাণী ; রজনী ; কৃষ্ণকান্তের উইল ; রাজসিংহ ; আনন্দমঠ ; দেবী-চৌধুরাণী ; সীতারাম ; Rajmohon's wife –[পরবর্তীকালে 'বারিবাহিনী' নামে অনূদিত] ।

॥ ২ ॥ **রমেশচন্দ্র দত্ত** (১৩.৮.১৮৪৮—৩০.১১ ১৯০৯)

বঙ্গবিজেতা ; মাধবীকঙ্কন ; মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ; রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ; শতবর্ষ ; সংসার ; সমাজ , The Slave Girl of Agra—[পরবর্তীকালে 'মাধবী কঙ্কন' নামে বাংলায় প্রকাশিত] ।

॥ ৩ ॥ **তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** (৩১.১০.১৮৪৩—২২.৯.১৮৯১)

স্বর্ণলতা ; ললিত সৌদামিনী ; হরিষে বিষাদ ; অদৃষ্ট ; বিধিলিপি ।

॥ ৪ ॥ **শিবনাথ শাস্ত্রী** (৩১ ১.১৮৪৭ ৩০ ৯ ১৯১৯)

মেজ-বৌ ; যুগান্তর ; ছায়াময়ীর পরিণয় ; নয়নতারা ; বিধবার ছেলে ।

॥ ৫ ॥ **মীর মশাররফ হোসেন** (১৩ ১১.৪৭—১৯.১১.১৯১১)

রত্নাবতী ; বিষাদ-সিন্ধু, গাজী মিঞার বস্তানী , বিবি খোদেজার বিবাহ ; বাজীমাৎ ; খোতয়া বিবি কুলসং ।

॥ ৬ ॥ **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** (৬ ১২.১৮৫৩—১৭ ১১ ১৯৩১)

বাল্মীকির জয় ; কাঞ্চনমালা ; বেণের মেয়ে

॥ ৭ ॥ **স্বর্ণকুমারী দেবী** (২৮.৮ ১৮৫৫—৩ ৭ ১৯৩২)

দীপনির্বাণ ; ছিন্নমুকুল ; মালতী ; হুগলীর ইমামবাড়ী ; স্নেহলতা ; বিদ্রোহ ; ফুলের মালা ; কাহাকে ; বিচিত্রা ; স্বপ্নবাণী ; মিলনরাত্রি ।

॥ ৮ ॥ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (৭.৫ ১৮৬১—৭ ৮ ১৯৪১)

বৌ ঠাকুরাণীর হাট ; রাজর্ষি ; চোখের বালি ; নৌকাডুবি ; গোরা ; চতুরঙ্গ ; ঘরে বাইরে ; যোগাযোগ ; শেষের কবিতা ; মালঞ্চ ; চার অধ্যায় ।

॥ ৯ ॥ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫.৯.১৮৭৬—১০.১.১৯৩৮)**

বড়দিদি ; বিরাজ বৌ ; বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প ; পরিণীতা ; পণ্ডিত-মশাই ; মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প ; পল্লীসমাজ ; চন্দ্রনাথ ; বৈকুন্ঠের উইল ; অরক্ষণীয়া ; শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, ২য় পর্ব, ৩য় পর্ব, ৪র্থ পর্ব ; দেবদাস ; নিষ্কৃতি ; কাশীনাথ ; চরিত্রহীন ; স্বামী ; দত্তা ; ছবি ; গৃহদাহ ; বামুনের মেয়ে ; দেনাপাওনা ; নববিধান ; পথের দাবী ; বিপ্রদাস ; শুভদা ; শেষ প্রশ্ন।

॥ ১০ ॥ **নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৩ ৫.১৮৮২—১৭.৯ ১৯৬৪)**

অগ্নি সংস্কার ; রক্তের ঋণ ; দ্বিতীয় পক্ষ ; পাপের ছাপ ; কাঁটার ফুল ; পিতাপুত্র ; মিলন পূর্ণিমা ; দূরের আলো ; শাস্তি ; গ্রামের কথা ; বিপর্যয় ; ব্যবধান ; রাজগী ; তৃপ্তি ; সতী ; একা ; রূপের অভিশাপ ; তাবিজ ; দুষ্টগ্রহ ; লক্ষ্মী-ছাড়া ; সর্বহারা ; ব্রতী ; লুপ্তশিখা ; অভয়ের বিয়ে ; শুভা ; তারপর ; অন্তরায় ; ঠকের মেশ ; নারায়ণী ; ঋষির মেয়ে ; আনন্দ মন্দির ; আহুতি ..বেতারে বর ; পিছল পথের শেষে ; বিয়েব খাতা ; তরুণী ভার্যা ; পরিণাম ; টিকি বনাম টাকা ; নিষ্কণ্টক বংশধর ; শেষ পথ ; খুনের জের ; খেয়ালের খেসারত ; ভুলের ফসল ; যুগ পরিক্রমা ; ললিতের ওকালতি ; রবীন মাস্টার . আমি ছিলাম ; স্বপ্নসৌধ ; স্ত্রীভাগ্যে।

॥ ১১ ॥ **অনুরূপা দেবী** (৯.৯ ১৮৮২—১৯ ৪.১৯৫৮)

মিবারেশ্বর ; পোষ্যপুত্র ; বাগদত্তা ; জ্যোতিঃহারা ; মন্ত্রশক্তি ; চিত্রদীপ ; উল্কা ; রাঙাশাঁখা ; মহানিশা . মধুমল্বী ; রামগড় ; বিদ্যারণ্য ; মা ; পথহারা ; চক্র ; সোনার খনি ; কুমারিলভট্ট ; হারানো খাতা ; গরীবের মেয়ে ; হিমাদ্রী ; জোয়ার ভাঁটা ; প্রাণের পরশ . ত্রিবেণী ; উত্তরায়ণ ; পথের সাক্ষী ; বিবর্তন ; সর্বাণী।

॥ ১২ ॥ **নিরূপমা দেবী** (মে ১৮৮৩—৭.১.১৯৫১)

উচ্ছৃঙ্খল ; অন্নপূর্ণার মন্দির ; দিদি ; শ্যামলী ; বিধিলিপি ; বন্ধু ; পরের ছেলে ; দেবতা ; অদৃষ্টলিপি ; অনুকর্ষ।

॥ ১৩ ॥ **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৪ ৪.১৮৮৫ —২৩.৫ ১৯৩০)

শশাঙ্ক ; ধর্মপাল ; করুণা ; অসীম ; ভাষান্তর ; অনুক্রম ব্যতিক্রম।

॥ ১৪ ॥ **জগদীশ গুপ্ত** (জুলাই ১৮৮৬ -১৫.৪ ১৯৫৭)

অসাধু সিদ্ধার্থ ; রূপের বাহিরে ; শ্রীমতী ; দুলালের দোলা ; নন্দাকৃষ্ণা ; রোমন্থন ; মহিষী ; লঘুগুরু ; উপায়ন ; গতিহারা ; জাহ্নবী ; তাতল সৈকতে ; যথাক্রমে ; রতি ও বিরতি ; শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী ; স্মৃতিনী ; দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা ; তৃষিত সৃক্কনী ; কলঙ্কিত তীর্থ।

॥ ১৫ ॥ **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়** (২৩.৭.১৮৯৮—১৪.৯.১৯৭১)

চৈতালী ঘূর্ণী ; পাষাণপুরী ; নীলকণ্ঠ ; রাইকমল ; প্রেম ও প্রয়োজন ; আগুন ; ধাত্রীদেবতা ; কালিন্দী ; গণদেবতা ; মন্বন্তর ; পঞ্চগ্রাম ; কবি ; সন্দীপন পাঠশালা ; ঝড় ও ঝড়াপাতা ; পদচিহ্ন ; উত্তরায়ণ ; হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ; তামস তপস্যা ; নাগিনী কন্যার কাহিনী ; আরোগ্য নিকেতন ; বিচিত্র ; চাঁপাডাঙ্গার বৌ ; পঞ্চপুত্তলী ; বিচারক ; সপ্তপদী ; বিপাশা ; রাধা ; ডাকহরকরা ; মহাশ্বেতা ; যোগভ্রষ্ট ; না ; নাগরিক ; নিশিপদ্ম ; যতিভঙ্গ ; কান্তা ; কালবৈশাখী ; একটি চড়ুই পাখি ও কালোমেয়ে ; জঙ্গলগড় ; সঙ্কেত ; ভুবনপুরের হাট ; মঞ্জরী অপেরা ; বসন্তরাগ ; গন্নাবেগম ; অরণ্যবহ্নি ; গুরুদক্ষিণা ; হীরা পান্না ; মহানগরী ; মনিবৌদি ; শঙ্কররাই ; সুকুমারী কথা ; স্বর্গমর্ত্য ; ছায়াপথ ; কালরাত্রি ; অভিনেত্রী ; ফরিয়াদ।

॥ ১৬ ॥ **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়** (১২.৯.১৮৯৪—১.৯.১৯৫০)

পথের পাঁচালী ; মৌরীফুল ; অপরাজিতা (২ খণ্ড) ; অনুবর্তন ; আরণ্যক ; দৃষ্টিপ্রদীপ ; নবাগত ; তৃণাঙ্কুর ; দেবযান ; ঊর্মিমুখর ; অভিযাত্রিক ; যাত্রাবদল ; কিন্নরদল ; আদর্শ হিন্দু হোটেল ; জন্ম ও মৃত্যু ; যোগিনগীর ফুলবাড়ি ; অসাধারণ ; দুই বাড়ি ; হীবামানিক জ্বলে ; চাঁদের পাহাড় ; উপলখণ্ড ; ইছামতী ; উৎকর্ণ ; ক্ষণভঙ্গুর ; মুখোশ ও মুখশ্রী ; জ্যোতিরিঙ্গন ; হে অরণ্য কথা কও ; অথৈ জলে ; আচার্য কৃপালনী কলোনী ; কেদার রাজা ; বিধুমাস্টার।

॥ ১৭ ॥ **ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়** (৫.১০.১৮৯৪–১৫.১২.১৯৬১)

ত্রিধারা, মোহনা ; আমরা ও তাঁহারা, চিন্তয়নী ; রিয়ালিস্ট ; অন্তঃশীলা ; ঝিলিমিলি ; আবর্ত মোহে এলো ; বক্তব্য।

॥ ১৮ ॥ **বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়** (জুন ১৮৯৬—৩০.৭.১৯৮৭)

রাণুর প্রথম ভাগ ; নীলাঙ্গুরীয় রাণুর দ্বিতীয় ভাগ ; রাণুর তৃতীয় ভাগ ; কথামালা ; বর্ষায় ; শারদীয়া ; চৈতালী ; তালনবমী ; হৈমন্তী ; অতঃকিম্ ; কায়কল্প ; লঘুপাক ; আগামী প্রভাত ; ক্ষণঅন্তঃপুরিকা ; অষ্টক ; কথাচিত্র ; বরযাত্রী ; বাসর ; রূপান্তর ; স্বর্গাদপি গরীয়সী ; তোমারই ভবন ; দুয়ার হতে অদূরে ; গণশার বিয়ে ; বিশেষ রজনী ; দৈনন্দিন ; হাতে খড়ি ; নবসন্ন্যাস ; মিলনান্তক ; বসন্তে ; আনন্দনট ; কুশী প্রাঙ্গনের চিঠি ; উত্তরায়ণ ; কৈলাশের পাটরাণী ; নয়ান বৌ ; কাঞ্চনমূল্য ; কদম ; একই পথের দুই প্রান্ত ; তালবেতাল।

॥ ১৯ ॥ **জীবনানন্দ দাশ** (১৭.২.১৮৯৯—২২.১০.১৯৫৪)

কারুবাসনা ; জীবন প্রণালী ; প্রেতিনীর রূপকথা ; মাল্যবান ; সুতীর্থ ; জলপাই হাটি ; বাগমতীর উপাখ্যান।

॥ ২০ ॥ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়** (৩০.৩.১৮৯৯—২২.৯.১৯৭০)

যৌবন স্মৃতি ; জাতিস্মর ; ব্যোমকেশের ডায়েরী ; রাতের অতিথি ; চুয়াচন্দন ; টিকিমেধ ; ডিটেকটিভ ; ব্যোমকেশের গল্প ; বুমেরাং ; বিষের ধোঁয়া ; ঝিন্দের বন্দী ; বিষকন্যা ; ধরণী যখন তরুণী ছিল ; পথ বেঁধে দিল ; কাঁচামিঠে ; কালিদাস ; কালকূট ; দন্তরুচি ; পঞ্চভূত ; গোপন কথা ; বিজয়লক্ষ্মী ; যুগে-যুগে ; শাদা পৃথিবী ; ছায়াপথিক ; কালের মন্দিরা ; কাণামাছি ; দুর্গরহস্য ; চিড়িয়াখানা ; গৌড়মল্লার ; কানু কহে রাই ; আদিম রিপু ; মায়াবন ; বহ্নি পতঙ্গ ; আলোর নেশা ; তুমি সন্ধ্যার মেঘ মায়াকুরঙ্গী ; সদাশিবের তিন কাণ্ড ; সর্সোমিরা ; রিমঝিম ; বহুযুগের ওপার হতে ; সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড ; রাজদ্রোহী ; কহেন কবি কালিদাস ; এমন দিনে ; হসন্তী ; তনুমন ; ব্যোমকেশের ত্রিনয়না ; ব্যোমকেশের ছ'টি ; শঙ্খকঙ্কণ ; কুমার সম্ভবের কবি ; মগ্নমৈনাক ; রঙিনমেঘ , তুঙ্গভদ্রার তীরে ; সজারুর কাঁটা ; বেণী সংহার ; কল্পকাহিনী ; উত্তম মধ্যম ।

॥ ২১ ॥ **নজরুল ইসলাম** (২৫ ৫ ১৮৯৯—২৯.৮.১৯৭৬)

বাঁধনহারা ; মৃত্যুক্ষুধা ; কুহেলিকা ।

॥ ২২ ॥ **বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)** (১৯ ৭ ১৮৯৯—৯ ২.১৯৭৯)

তৃণখণ্ড : বৈতরিণী তীরে ; কিছুক্ষণ ; মৃগয়া ; নির্মোক ; রাত্রি ; সে ও আমি . ভুয়োদর্শন ; দ্বৈরথ ; জঙ্গম (৪ খণ্ড) ; সপ্তর্ষি ; অগ্নি ; স্বপ্নসম্ভব ; নঞ্ তৎপুরুষ ; ডানা (৩ খণ্ড) ; মানদণ্ড ; ভীমপলশ্রী ; কষ্টি পাথর , স্থাবর : নবদিগন্ত ; লক্ষ্মীর আগমন ; পিতামহ ; বিষমজ্বর ; নিরঞ্জনা ; পঞ্চপর্ব ; ভুবনসোম ; মহারাণী ; অগ্নীশ্বর ; জলতরঙ্গ ; উদয়-অস্ত ; দুই পথিক ; ওরা সব পারে ; হাটে বাজারে ; তিনকাহিনী ; কন্যাসু ; সীমারেখা , পীতাম্বরের পুনর্জন্ম [চার্লস্ ডিকেন্সের A Christians Carol অবলম্বনে] ; ত্রিবর্ণ ; বর্ণচোরা ; পক্ষীমিথুন ; আলোর পিপাসা ; গন্ধরাজ ; মানসপুর ; তীর্থের কাক ; অধিকলাল ; অসংলগ্না ; রঙ্গতুরঙ্গ , রৌরব ; রূপকথা এবং তারপর ; তুমি ; এরাও আছে ; সন্ধিপূজা ; প্রথম গরল ; নবীন দত্ত ; আশাবরী ; সাতসমুদ্র তেরো নদী ; লী ; অলকাপুরী ।

॥ ২৩ ॥ **শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়** (২১ ৩.১৯০০—২ ১.১৯৭৬)

কয়লাকুঠি ; ঝড়ো হাওয়া ; বধূবরণ ; জোয়ার-ভাঁটা ; মাটির ঘর ; ষোল আনা ; ছায়াছবি ; রক্তলেখা ; মাটির রাজা ; পূর্ণচ্ছেদ ; নারীমেধ ; বানভাসি ; নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী ; অতসী ; বাংলার মেয়ে ; সাঁওতালী ; অনাহূত ; নন্দিনী ; দিনমজুর ; খরস্রোতা ; বহুবচন ; উদয়াস্ত ; মারণমন্ত্র ; লহপ্রণাম ; অনিবার্য ; রায়চৌধুরী ; হে মহামরণ ; শোভাযাত্রা , অভিশাপ ; জীবননদীর

তীরে ; শুভদিন ; পূর্বাপর ; পৌষপার্বন ; ডাক্তার ; হোমানল ; মহাযুদ্ধের ইতিহাস ; ক্রৌঞ্চমিথুন ; রূপবতী ; বিজয়িনী ; গঙ্গাযমুনা ; সতী-অসতী ; আকাশকুসুম ; পাতালপুরী ; অরুণোদয় ; বিজয়া ; বন্দী ; শহর থেকে দূরে ; আমি বড় হব ; কনেচন্দন ; এক মন দুই দেহ ; রূপং দেহি ; সারারাত ; অপরূপা ; মিত্তেলীতিক ; কেউ ভোলে কেউ ভোলে না ; যে কথা বলা হয়নি।

॥ ২৪ ॥ মনোজ বসু (২৫.৭.১৯০১—২৬.১২.১৯৮৭)

বনমর্মর ; দেবী কিশোরী ; সৈনিক ; আগস্ট ১৯৪২ ; প্লাবন ; দুঃখনিশার শেষে ; শত্রুপক্ষের মেয়ে ; ভুলি নাই ; ওগো বধূ সুন্দরী ; নূতন প্রভাত ; উলু ; দিল্লী অনেক দূরে , জলজঙ্গল ; বিপর্যয় ; নববাঁধ ; কাচের আকাশ ; একদা নিশীথকালে ; পৃথিবী কাদের ; খদ্যোত ; নবীন যাত্রা ; বাঁশের কেল্লা ; রাখিবন্ধন ; বকুল ; কুঙ্কুম ; জলকল্লোল ; তিন কাহিনী।

॥ ২৫ ॥ প্রমথনাথ বিশী (১১.৬.১৯০১—১০.৫.১৯৮৫)

দেশের শত্রু ; পদ্মা ; কোপবতী ; বিপুল সুদূর যে ; জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ; চলন বিল ; অশ্বত্থের অভিশাপ ; [এই তিনটি উপন্যাস একত্রে- জোড়াদীঘির উদয়াস্ত] , মহামতি রাম ফাঁসুড়ে ; নীলমণির স্বর্গ ; সিন্ধুনদের প্রহরী ; কেরী সাহেবের মুন্সী ; লালকেল্লা ; হিন্দী উইদাউট টিয়ার্স ; ধুলা-গুড়ির কুঠি ; পনেরই আগস্ট।

॥ ২৬ ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী (আগস্ট ১৯০৩ - ২৯.৩.১৯৭২)

মনের গহনে ; দেহযমুনা ; শৃঙ্খল ; বসন্ত রজনী ; পান্থনিবাস ; ঘরের ঠিকানা ; মধুচক্র ; আকাশ ও মৃত্তিকা ; ক্ষণবসন্ত ; বন্ধনী , নীলাঞ্জন ; সোমসবিতা ; শুক্ল সন্ধ্যা ; বধূ নির্বাচন ; নতুন কলম ; অনুষ্টুপ ছন্দ ; রমণীরমন ; হংস-বলাকা ; ময়ূরাক্ষি ; গৃহকপোতী ; সোমলতা ; শতাব্দীর অভিশাপ ; কালো ঘোড়া ; মহাকাল ; কৃশাণু।

॥ ২৭ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯.৯.১৯০৩—২৯.১.১৯৭৬)

বাঁকা লেখা [প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে] ; বেদে ; ডবল ডেকার ; নবনীতা ; ঊর্ণনাভ ; আকস্মিক ; টুটীফুটী ; অন্তরঙ্গ ; ইন্দ্রানী ; অনন্যা ; নেপথ্যে ; তৃতীয় নয়ন ; তুমি আর আমি , [illegible] ; প্রচ্ছদপট ; ঢেউয়ের পরে ঢেউ ; কাক-জ্যোৎস্না , ইতি ; প্রথম অধিবাস ; অকাল-বসন্ত ; ছিনিমিনি ; জননী জন্মভূমিশ্চ ; আসমুদ্র ; সঙ্কেতময়ী ; রুদ্রের আবির্ভাব ; মুখোমুখি ; দিগন্ত ; পাখনা ; আসমান-জমিন ; কাঠ-খড়-কেরোসিন ; যায় যদি যাক।

॥ ২৮ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী (১৩.৯.১৯০৪—১১.২.১৯৭৪)

অবিশ্বাস্য ; শবনম্ ; শহর-ইয়ার ; তুলনাহীন।

॥ ২৯ ॥ **প্রেমেন্দ্র মিত্র** (সেপ্টেম্বর ১৯০৪—৩.৫.১৯৮৮)

পাঁক ; মিছিল ; আগামীকাল ; উপনয়ন ; কুয়াশা ; মৌসুমী ; অন্য এক নাম ; দিগ্‌বলয় ; স্তব্ধ প্রহর ; মনুদ্বাদশ ; প্রতিধ্বনি ফেরে ; আগ্রা যখন টলমল ; স্বপ্নতনু ; সূর্য কাঁদলে সোনা ; দ্বিতীয় জীবন ; ঠিকানা সঠিক ; অমলতাস ; সেই যে শহর ; রাজৌলি ; পা বাড়ালেই রাস্তা ; হৃদয় দিয়ে গড়া ; এলো অচেনা ; হাতে হাত রাখো ; যিনি বিধাতা ; হানাবাড়ি ; প্রতিশোধ ; আরো একজন ; ব্রজ বাবুর বরাত জোর ; ছায়াতোরণ ; গণনা ; তিত্তুলীয় উপাখ্যান ; এই শহরের কোথাও ; বেনামী বন্দর ; মৃত্তিকা ; নিশীথ নগরী ; সামনে চড়াই ; পুতুল ও প্রতিমা ; অফুরন্ত ; কুড়িয়ে ছড়িয়ে ; মহানগর ; অরণ্যপথ ; ধূলিধূসর ; সপ্তপদী ; শ্রাবণে ফাল্গুনে ; সালঙ্কারা ; ক্বচিত কখনো ; পঞ্চবার ; জলপায়রা ; যখন বাতাসে নেশা ; অষ্টপ্রহর ; অঙ্কে মেলে না ; প্রেমই ধন্বন্তরী ; নানা রঙে বোনা ; ভাবীকাল ; নহ দেবী ; আতঙ্ক আদিম।

॥ ৩০ ॥ **প্রবোধকুমার সান্যাল** (৭.৭.১৯০৫—১৭.৪.১৯৮৩)

যাযাবর ; দুই আর দুয়ে চার ; নিশিপদ্ম ; কলবব ; কন্যাসঙ্গীনী ; কাজললতা ; আমার কথাটি ফুরালো ; লাল রং ; আগ্নেয়গিরি ; পঞ্চতীর্থ ; নদ ও নদী ; দেবীর দেশের মেয়ে ; অরণ্যপথ ; এই যুদ্ধ ; চেনা ও জানা ; শুকনো পাতা ; মহাপ্রস্থানের পথে ; দেশ-দেশান্তর ; প্রিয়বান্ধবী ; রূপবতী ; স্বাগতম ; মনেমনে, অগ্নিসাক্ষী ; আঁকা-বাঁকা ; বন্দী-বিহঙ্গ ; সরলরেখা ; উত্তরকাল ; অবিকল ; জয়ন্ত ; সাযাহ্ন ; শ্যামলীর স্বপ্ন, রঙীন সুতো ; নবীন যুবক ; দিবাস্বপ্ন ; তরুণী সঙ্ঘ ; অঙ্গরাগ ; নীচের তলায় ; জলকল্লোল ; আলো ও আগুন ; পায়ে হাঁটা পথ ; ভ্রমণ ও কাহিনী ; মধুচাঁদের লাস ; অগ্রগামী ; আমিরী ; ইতস্তত ; ইস্পাতের ফলা ; জীবন মৃত্যু ; জুয়া, তুচ্ছ ; নায়ক-নায়িকা ; পুষ্পধনু ; বনহংসী ; বিবাগী ভ্রমর ; বেলোয়ারী ; মনে রেখ ; শুভাশুভ ; হাসুবানু ; অঙ্গার ; আগ্নেয়গিরি ; কলরব ; কয়েক ঘণ্টা মাত্র ; নওরঙ্গী ; স্ফুলিঙ্গ ; চিত্রবিচিত্র ; দুরাশার ডাক ; সত্যি বলছি ; রঙিন রূপকথা।

॥ ৩১ ॥ **সতীনাথ ভাদুড়ী** (২৭.৯.১৯০৬—৩০.৩.১৯৬৫)

সত্যিভ্রমণ কাহিনী ; জাগরী ; ঢোঁড়াই চরিত মানস ; চিত্রগুপ্তের ফাইল ; অপরিচিতা ; অচিন রাগিনী ; গণনায়ক ; দিগভ্রান্ত ; পত্রলেখার বাবা।

॥ ৩২ ॥ **বুদ্ধদেব বসু** (৩০.১১.১৯০৮—১৮.৩.১৯৭৪)

সাড়া ; অকর্মণ্য ; মন দেয়া নেয়া ; যবনিকাপতন ; রডোডেনড্রন গুচ্ছ ; সানন্দা ; আমার বন্ধু ; যেদিন ফুটলো কমল ; বিজয়ীবীর ; ধূসর গোধূলি ; অসূর্যম্পস্যা ; একদা তুমি প্রিয়ে ; সূর্যমুখী ; বিসর্পিল [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র

মিত্রের সহযোগে] ; বনশ্রী ; রূপালি পাখি ; লালমেঘ ; পরস্পর ; বাড়িবদল ; বাসরঘর ; পারিবারিক ; পরিক্রমা ; কালো হাওয়া ; জীবনের মূল্য ; অদর্শনা ; বিশাখা ; তিথিডোর ; মনের মতো মেয়ে ; নির্জন স্বাক্ষর ; তুমি কি সুন্দর ; মৌলিনাথ ; ক্ষণিকের বন্ধু ; বসন্ত জাগ্রত দ্বারে [প্রতিভা বসুর সহযোগে] ; শেষ পাণ্ডুলিপি ; শোনপাংশু ; নীলাঞ্জনের খাতা ; দুই ঢেউ এক নদী ; পাতাল থেকে আলাপ ; রাত ভোর বৃষ্টি ; গোলাপ বোন কালো।

॥ ৩৩ ॥ **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯ ৫.১৯০৮—৩.১২.১৯৫৬)

জননী ; পুতুল নাচের ইতিকথা ; দিবারাত্রির কাব্য ; পদ্মানদীর মাঝি ; শহরতলী ; সমুদ্রের স্বাদ ; পাশাপাশি ; সোনার চেয়ে দামী ; ইতিকথার পরের কথা ; অহিংসা ; চতুষ্কোণ ; জীবনের জটিলতা ; ধরাবাঁধা জীবন ; প্রতিবিম্ব ; দর্পণ ; শহরবাসের ইতিকথা ; হলুদপেস্তা ; চিন্তামণি ; জীয়ন্ত ; ছন্দপতন ; সার্ব্বজনীন ; আরোগ্য ; তেইশ বছর আগে ; চিহ্ন ; নাগপাশ ; শুভাশুভ ; হরফ ; পরাধীন প্রেম ; হলদে নদী সবুজ বন ; প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান ; স্বাধীনতা বৌ।

॥ ৩৪ ॥ **সুবোধ ঘোষ** (১৪.৯.১৯০৯— ১০.৩.১৯৮০)

তিলাঞ্জলি ; কিম্বদন্তীর দেশে ; অমৃত পথের যাত্রী ; বাসবদত্তা ; কালকেতু ; এসো পথিক ; নাগচম্পা . শিউলি বাড়ী ; জতুগৃহ ; সুজাতা ; চিত্তচকোর ; শুন বরনারী ; ঠগিনী ; শ্রেয়সী ; শুক্লাভিসার ; শতভিষা ; গ্রামযমুনা ; পরশুরামের কুঠার।

॥ ৩৫ ॥ **সঞ্জয় ভট্টাচার্য** (৪ ৮.১৯০৯—৪.১.১৯৬৯)

বৃত্ত ; মরামাটি ; দিনান্তে ; কল্লোল ; কর্মে দেবায় ; ফসল ; ঋণ ; নতুন দিনের কাহিনী।

॥ ৩৬ ॥ **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী** (২০.৪.১৯১২—১.৮.১৯৮২)

খেলনা ; সূর্যমুখী ; মীরার দুপুর ; চারইয়ার ; বন্ধুপত্নী ; বারো ঘর এক উঠোন ; নীড় ; এই তার পুরস্কার ; আততায়ী।

॥ ৩৭ ॥ **নরেন্দ্রনাথ মিত্র** (৩০.১.১৯১৬—১০ ৯.১৯৭৫)

দ্বীপপুঞ্জ ; পত্রাবিলাস ; সেতুবন্ধ ; মহানগর ; জল-মাটির গল্প ; শুক্লপক্ষে ; অনমিতা ; দেবযান ; অনুগমন ; দ্বৈতসঙ্গীত ; দীপান্বিতা ; প্রজাপতির রং ; অঙ্গীকার ; একটি ফুলকে ঘিরে ; নায়িকা ; পূর্বতনী ; বিন্দু বিন্দু ; রূপসজ্জা ; সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ; বিবাহ বাসর ; নালক ; দয়িতা ; বিদ্যুৎলতা ; চিলেকোঠা ; প্রতিধ্বনি ; রূপমঞ্জরী ; অনাগত ; একটি নায়িকার উপাখ্যান ; পরম্পরা ; উত্তর

পুরুষ ; উপচ্ছায়া ; সন্ধ্যারাগ ; ওপাশের দরজা ; উল্টোরথ ; অক্ষরে অক্ষরে ; তপস্বিনী : বসন্ত পঞ্চমী ; পতাকা ; অনুরাগিনী ; অসবর্ণা ; উত্তরণ ; উদ্যোগ-পর্ব : উন্মেষ [বারোয়ারী উপন্যাস] ; রাধুনি ; পতনে উত্থানে ; হলদে বাড়ী ; সূর্যসারথি : উপনগর ; তিনদিন তিনরাত্রি ; কাঠগোলাপ : দেহমন : যাত্রাপথ ; মিশ্ররাগ ; ময়ূরপঙ্খী ; অসমতল ; রূপালি রেখা ; মুগ্ধ প্রহর ; চড়াই উৎরাই ; গোধূলি ; চেনামহল ; জলপ্রপাত ; শুক্লপক্ষ , সঙ্গিনী ; সহৃদয়া ; সুখদুঃখের ঢেউ ; বসন্ত পঞ্চম ; ময়ূরী ; একূল ওকূল ; কথা কও ; কন্যাকুমারী।

॥ ৩৮ ॥ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়** (ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ ৮.১১ ১৯৭০)

উপনিবেশ (৩ খণ্ড) ; দুঃশাসন ; তিমির তীর্থ ; ভাঙ্গা বন্দর ; ভোগবতী ; মন্ত্রমুখর ; শিলালিপি ; সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী ; স্বর্ণসীতা ; জন্মান্তর ; সপ্তকাণ্ড ; সূর্যসারথি ; একতলা ; অসিধারা ; ঊর্বশী ; গন্ধরাজ ; চারমূর্তি ; ছুটির আকাশ ; নীলদিগন্ত ; পদসঞ্চার ; বিদূষক ; বীতৎস ; বৈতালিক ; ভাটিয়ালি ; মহানন্দা ; মেঘরাগ ; রাতের মুকুল ; রামমোহন ; রূপবতী , রোমাঞ্চ ; লালমাটি ; শ্বেত-কমল ; সঞ্চারিনী ; সনেত্রা ; খুশির হাওয়া ; সাগরিকা ; সাপের মাথার মণি ; ভস্মপুতুল ; অমাবস্যার গান ; একজিবিশন ; কলধ্বনি ; কালাবাদর ; কৃষ্ণচূড়া ; চিত্ররেখা ; চোখের বাহিরে ; ছায়াতরী ; জয়তী ; ট্রফি ; তৃতীয় নয়ন ; তিনপ্রহর ; দুরমেদুর ; নতুন তোরণ ; নির্জন শিখর ; নিশিযাপন ; পদ্মপাতার দিন ; পাতালকন্যা ; বনজ্যোৎস্না ; বনবাংলো ; বিদিশা ; মাটির দেবতা ; মেঘের উপর প্রাসাদ ; রঞ্জনা ; রাঘবের জয়যাত্রা ; শুভক্ষণ ; শিলাবতী ; সন্ধ্যার সুর ; ঘূর্ণি ; স্রোতের সঙ্গে ; আলেয়ার রাত।

॥ ৩৯ ॥ **সন্তোষকুমার ঘোষ** (৯ ৯.১৯২০--২৬.২ ১৯৮৫)

কিনু গোয়ালার গলি ; নানা রঙের দিন ; মুখের রেখা ; রেণু তোমার মন ; সেই আমি ; পারাবত ; ছায়া হরিণ ; চিররূপা ; জল দাও ; স্বয়ং নায়ক ; মোমের পুতুল ; সময় আমার সময় ; সকাল থেকে সকালে ; অপার্থিব ; ত্রিনয়ন ; শ্রীচরণেষু মাকে—শেষ নমস্কার ; সুধার শহর ; দূরের নদী ; অজাতক ; ফুল নদী পাখি ; সেই পাখি।

॥ ৪০ ॥ **সমরেশ বসু** (১১.১২.১৯২৪ —১২.৩ ১৯৮৮)

অকাল বৃষ্টি ; অগ্নিবিন্দু ; আচিনপুর ; অন্ধকার গভীর গভীরতর ; অন্ধকারের গান ; অন্ধকারে আলোর রেখা ; অপদার্থ ; অপরিচিত ; অবচেতন ; অবরোধ ; অবশেষে ; অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ; অমৃত কুম্ভের সন্ধানে ; অমৃত বিষের পাত্রে ; অয়নান্ত ; অলকা সংবাদ ; অলিন্দ ; অশ্লীল ; অধিকার ; আইন নেই ; আকাঙ্ক্ষা ; আঁখির আলোয় ; আটাত্তর দিন পরে ; আত্মজ ; আদি-মধ্য-অন্ত ; আনন্দ ধারা ;

আম মাহাতো ; আমার আয়নায় মুখ ; আমি তোমাদেরই লোক ; আরব সাগরের জল লোনা ; আলোর বৃত্তে ; উত্তরঙ্গ ; উজান ; উদ্ধার ; একটাই এই রকম জীবন ; একটি অস্পষ্ট ঘর ; এখানে ওখানে ; এপার ওপারে ; ওদের বলতে দাও , ও আপনার কাছে গেছে ; কামনা বাসনা ; কীর্তিনাশিনী ; কুন্তীসংবাদ ; কে নিবি মোরে ; কোথায় পাব তারে ; খণ্ডিতা ; গঙ্গা ; গন্তব্য ; ঘরের কাছে আরশি নগর ; চল মন রূপনগরে ; চড়াই-উতরাই ; চেতনার অন্ধকারে ; চৈতী ; চতুর্ধারা ; ছায়াচারিণী ; ছায়া ঢাকা মন ; ছিন্নধারা ; ছুটির ফাঁদে ; ছেড়া তমসুক ; ছোট ছোট ঢেউ ; জগদ্দল ; জবাব ; জীবন যখন একটাই ; জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য ; ঝিলেনগর ; টানাপোড়েন ; তবাই ; তিনপুরুষ ; তিনভুবনের পারে ; ত্রিধারণ ; তুষার সিংহের পদতলে ; দশদিন পরে ; দিগন্ত ; দুই অরণ্য ; দুমুখো সাপ , দুরন্ত চড়াই ; ধর্ষিতা ; ধূসর আয়না ; ধ্যান জ্ঞান প্রেম ; নয়নপুরের মাটি ; নাচঘর ; নাটের গুরু ; নির্জন সৈকতে ; নিঠুর দরদী ; পঞ্চবহ্নি ; পথিক ; পদক্ষেপ ; পরের ঘরে আপন বাসা ; পরম রতন ; পসারিণী ; পাতক ; পাপপুণ্য ; পাহাড়ী ঢল ; পুণ্যভূমে পুণ্য স্নান , পুতুলের খেলা ; পুতুলের প্রাণ ; পুনর্যাত্রা ; পৃথা প্রজাপতি , প্রাচীর , প্রচেতন , প্রাণ প্রতিমা ;–প্রেমনামে বন ; ফুলবর্ষিয়া ; ফেরাই ; বনলতা ; বনের সঙ্গে খেলা ; বন্ধ ঘরের আওয়াজ , বন্ধদুয়ার ; বাঘিনী ; বাথান ; বান্দা ; বাণীধ্বনি বেণুবনে ; বারোবিলাসিনী ; বাঁশীর তিন সুরে ; বিকেলে ভোরের ফুল ; বিকেলে শোনা ; বিজন বিভুঁই ; বিজড়িত ; বি. টি. রোডের ধারে , বিপর্যস্ত ; বিদ্যুল্লতা ; বিপরীত শব্দ ; বিবর ; বিবরমুক্ত ; বিবেকবান ; বিশ্বাস ; বিষের স্বাদ ; ভানুমতী ; ভানুমতীর নবরঙ্গ ; ভীরু ; ভুল বাড়ীতে ঢুকে ; মন চল বনে ; মনভাসির টানে ; মনোমুকুরে ; মরশুমের একদিন ; মরীচিকা ; মহাকালের রথের ঘোড়া ; মাতৃতান্ত্রিক ; মানুষ ; মানুষ শক্তির উৎস ; ম্যাকবেথ ; রঙ্গমঞ্চ কলকাতা ; মাসের প্রথম রবিবার ; মিছি মিছি ; মিটে নাই তৃষা ; মুক্ত বেণীর উজানে ; মুখোমুখি ঘর ; যাত্রিক ; যার যা ভূমিকা ; যুগযুগ জীয়ে ; যে খোঁজে আপন ঘরে ; যৌবন রজকিনী প্রেম ; রঙ্গিম বসন্ত ; রাজধানী এক্স-প্রেসের হত্যারহস্য , রাণীর বাজার ; রামনাম কেবলম্ ; রূপকথা ; রূপায়ন ; লগ্নপতি , শাম্ব ; শালঘেরীর সীমানায় ; শিমুলগড়ের খুনে ভূত ; শেকল ছেড়া হাতের খোঁজে ; শেষ দরবার ; শ্রীমতী কাফে ; ষষ্ঠ ঋতু , সওদাগর ; সঙ্কট , সবুজ বনে আগুন • স্বর্ণচঞ্চু ; স্বর্ণপিঞ্জর ; স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে ; স্বীকারোক্তি ; সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা ; সুবর্ণী ; সূর্যতৃষ্ণা ; সেই গাড়ির খোঁজে ; সোনালী পাড়ের রহস্য ; হারায়ে সেই মানুষে ; হারিয়ে পাওয়া ; হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা ; হ্রেষাধ্বনি ; হৃদয়ের সুখ ; দেখি নাই ফিরে ; 'ভ্রমর' ছদ্মনামে লেখা –শেষ যুদ্ধের সেনাপতি ; শেষ অধ্যায় ; প্রেম নিত্য ; প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত ।

সমরেশ বসুর গ্রন্থতালিকায় কালকূটের রচনা ও কিছু গল্প-গ্রন্থের নাম সংযোজিত হয়েছে ।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

॥ ৪১ ॥ **ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৪ ৫.১৮৪৮—২৩.৩.১৯১১)

কল্পতরু ; পাঁচুঠাকুর (৫ খণ্ড) ; ক্ষুধিরাম।

॥ ৪২ ॥ **ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়** (জুলাই ১৮৪৭—৩.১১ ১৯১৯)

কঙ্কাবতী : ফোকলা দিগম্বর ; মুক্তামালা ; সরমা কোথায় ; ভূত ও মানুষ ; পাপের পরিণাম ; ডমরু চরিত।

॥ ৪৩ ॥ **যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু** (৩০.১২.১৮৫৩ —১৮.৮ ১৯০৫)

মডেল ভগিনী (৪ খণ্ড) ; চিনিবাসের চরিতামৃত ; মহীরাবণের আত্মকথা ; কালাচাঁদ ; পঞ্চানন্দ ; নেড়া হরিদাস ; শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী।

॥ ৪৪ ॥ **কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়** (১৫.২.১৮৬৩ —২৯.১১ ১৯৪৯)

ভাদুড়ী মশাই ; আই হ্যাজ।

॥ ৪৫ ॥ **শিবরাম চক্রবর্তী** (১৩.১২.১৯১৩—২৮.৮ ১৯৮০)

প্রণয় বিচিত্র ; গন্ধবতী ; প্রাণ-নিয়ে টানাটানি ; এক মেয়ে ; ব্যোমভোলা বাহিনী ; দাদু নাতির দৌড়।

॥ ৪৬ ॥ **শান্তাদেবী** (১৮৯৩ –৩০.৫ ১৯৮৪)

উদ্যানলতা [সহোদরা সীতাদেবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা], চিরন্তনী, অলখ ঝোরা, জীবনদোলা।

॥ ৪৭ ॥ **সীতাদেবী** (১০ ৪.১৮৯৫—২০.১২.১৯৭৪)

পথিকবন্ধু, রজনীগন্ধা, বন্যা, পরভৃতিকা, মাতৃঋণ, জন্মসত্ত্ব।

॥ ৪৮ ॥ **প্রভাবতীদেবী সরস্বতী** (২৮ ৯ ১৯০৫—১৫.৫.১৯৭২)

অন্ধ, আয়ুষ্মতী, বিজিতা, হৃদয়ের চাঁপে, দানের মর্যাদা, জাগরণ, মুক্তি আহ্বান সংসার পথের যাত্রী, স্বামী-স্ত্রী, নিশীথের চাঁদ।

॥ ৪৯ ॥ **শৈলবালা ঘোষজায়া** (১৮৯৩—১৯৭৩)

শেখ আন্দু, মিষ্টি সরবৎ, নমিতা, জন্ম অপরাধী, অরু, বিভ্রাট, তেজস্বতী।

॥ ৫০ ॥ **জ্যোতির্ময়ী দেবী** (১৮৯৯ —১৪.১১.১৯৮১)

ছায়াপথ, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

নির্দেশিকা

॥ প্রথম খণ্ড ॥

অ

আ

প

ল

শ

স

হ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

অ

খ

গ

স

॥ সংশোধনী ॥

পৃষ্ঠা সংখ্যা	পংক্তি সংখ্যা	অশুদ্ধ পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
পঁচিশ	২৪	'ফিরে দেখা'	'দেখি নাই ফিরে'
একচল্লিশ	১৭	'আদিম থেকে আধুনিক কালে বিচরণ'	'সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথের পথিক'
৩১৯	৪	বাগমতীর উপাখ্যান	বাসমতীর উপাখ্যান
৫১৯	২০	বাত ভোব বৃষ্টি	রাত ভরে বৃষ্টি
৫২১	৩১	কয়লা কুষ্ঠীর দেশ	কয়লাকুঠির দেশ
৫৯১	১৩	সহরতলী	শহরতলী
৬০৬	২	জ্যোতিরীন্দ্র নন্দী	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৭৫৮	১৪	Conviicing	Convincing
৭৭৮	৯	রাজাসিংহ	রাজসিংহ
৭৮৮	২২	নাটনীড়	নষ্টনীড়